تفسير انوار القرآن

তাফসীরে আনওয়ারুল কুরআন

২

[৬ষ্ঠ থেকে ১০ম পারা পর্যন্ত]

রচনা ও সংকলনে

মাওলানা মোহাম্মদ আবুল কালাম মাসূম

ফাযেলে দারুল উলূম দেওবন্দ, ভারত

তাফসীরে জালালাইন শরীফের অনুবাদক

লেখক ও সম্পাদক : ইসলামিয়া সম্পাদনা পর্ষদ

সম্পাদনায়

মাওলানা মোহাম্মদ মোস্তফা

প্রকাশনায়

ইসলামিয়া কুতুবখানা

৩০/৩২ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

www.almodina.com

তাফসীরে আনওয়ারুল কুরআন (২য় খণ্ড)

রচনা ও সংকলনে ◈ মাওলানা মোহাম্মদ আবুল কালাম মাসূম

প্রকাশক ◈ মাওলানা মোহাম্মদ মোস্তফা
ইসলামিয়া কুতুবখানা, ঢাকা।

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

শব্দবিন্যাস ◈ ইসলামিয়া কম্পিউটার হোম
২৮/এ প্যারিদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা।

মুদ্রণে ◈ ইসলামিয়া অফসেট প্রেস
২৮/ এ প্যারিদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।

হাদিয়া ◈ ৫০০.০০ টাকা মাত্র

www.almodina.com

بسم الله الرحمن الرحيم

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ. وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْاَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِيْنَ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ اَمَّا بَعْدُ! : فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ. بِسْمِ
اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - "وَاَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ
يَتَفَكَّرُوْنَ" وَقَالَ رَحْمَةٌ لِلْعَالَمِيْنَ ﷺ : تَرَكْتُ فِيْكُمْ اَمْرَيْنِ مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا لَنْ تَضِلُّوْا
بَعْدِىْ أَبَدًا : كِتَابَ اللّٰهِ وَسُنَّتِىْ -

প্রথমে আল্লাহ তা'আলার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি, যিনি রহমান ও রহীম। যার দয়া অফুরন্ত ও অসীম। যিনি আমাদের উপর আপন অনুগ্রহে বেহিসাব নায-নিয়ামত দান করেছেন। বিশেষ করে অধম কে স্বীয় কালামে পাকের ব্যখ্যাগ্রন্থ 'তাফসীরে আনওয়ারুল কুরআন' রচনার তৌফিক দিয়েছেন।

আম্মা বাদ :

দুনিয়াবি ও উখরবি জিন্দেগিতে মানবতার শাশ্বত মুক্তির জন্য মহান আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীন যুগে যুগে বহু নিদর্শনাবলি পাঠিয়েছেন। হযরত আদম (আ.) থেকে নিয়ে শুরু করে হযরত মুহাম্মদ ﷺ পর্যন্ত লক্ষাধিক নবী রাসূল প্রেরণ করেছেন। কখনো বা পৃথিবীবাসীকে অপার দয়া-রহমত আবার কখনো বেদনাদায়ক আজাব-শাস্তির স্বাদ চাখিয়েছেন। কখনো বা নিজ কুদরতের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়ে অতিপ্রাকৃত ঘটনাবলির অবলোকন করিয়েছেন। সময়ে সময়ে আদেশ-নিষেধ সম্বলিত সহীফা ও কিতাব অবতারণ করেছেন। এতসব কিছুর লক্ষ্য একটাই, মানুষের বিকার মস্তিষ্কে যেন বোধের উদয় ঘটে। দুনিয়া, নফস ও শয়তানের ফাঁদ এড়িয়ে এক ইলাহে বিশ্বাস স্থাপন করতে পারে। মহিয়ান গরিয়ান রাব্বুল আ'লামীনের মানশা অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করে দুনিয়া ও আখেরাতে সিদ্ধকাম হতে পারে। কিন্তু কোনটি যে তামাম জাহানের প্রতিপালক আল্লাহ তা'আলার আদেশ ও নিষেধ– তা তো এই নগণ্য জিন ও ইনসান সম্প্রদায়ের পক্ষে অনুধাবন করা সম্ভব নয়! তাহলে এখন উপায় কী হবে? এরই ধারাবাহিকতায় আখেরি উম্মতের জন্য রাব্বানার পক্ষ থেকে উপঢৌকন স্বরূপ অবতীর্ণ করা হয় খোলাচিঠি 'আল-কুরআন'।

এই আল-কুরআনকে বলা হয় আদর্শ জীবন বিধান। এর মাঝে রয়েছে বৈচিত্রময় ও শতবাকধারী জীবনের পূর্ণাঙ্গ দিক-নির্দেশনা। বিশ্বাসগত, আধ্যাত্মিক, ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, আন্তর্জাতিক– সকল বিষয়ে রয়েছে সর্বযুগের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য মৌলিক নীতিমালা। এখানেই শেষ নয়, প্রতিটি যুগের সমসাময়িক সমস্যার সমাধানও তো কুরআনের মূলনীতি থেকেই উদ্ভাবিত হয়। তাছাড়া কুরআন তেলাওয়াত ও নামাজের মতো গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতও কুরআন ছাড়া শুদ্ধ হয় না। শুধু তাই না কুরআনের অনুকরণ ছাড়া জিন্দেগির সফলতাও সম্ভব নয়। এ সম্পর্কে সারওয়ারে কায়েনাত হযরত মুহাম্মদ ﷺ বলেন– 'তোমাদের মাঝে আমি এমন দু'টি জিনিস রেখে যাচ্ছি, যা ধরে থাকলে আমার পরে কখনো তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না। আর তা হলো আল্লাহর কিতাব ও আমার সুন্নত।' (মুসনাদে আহমাদ : ৪/৫০)

✦ বলা বাহুল্য, আমল, আখলাক, কথাবার্তা, চাল-চলন তথা বৈষয়িক জীবনে অনুপম আদর্শে সাহাবায়ে কেরামের উত্তরোত্তর উৎকর্ষ সাধনের মূল হেতু কিন্তু এই আল কুরআনের অনুধাবন ও অনুকরণ। এ সম্পর্কে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন–

كَانَ الرَّجُلُ مِنَّا إِذَا تَعَلَّمَ عَشَرَ آيَاتٍ لَمْ يُجَاوِزْهُنَّ حَتَّى يَعْرِفَ مَعَانِيَهُنَّ وَالْعَمَلَ بِهِنَّ

"আমাদের মাঝে কেউ যখন দশটি আয়াত শিখতেন, তখন তিনি সেগুলোর অর্থ অনুধাবন ও নিজের জীবনে বাস্তবায়ন ব্যতীত সেগুলোকে অতিক্রম করতেন না। (তাফসীরে তাবারী : ১/ ২৭; বৈরুত : দারুল মা'আরিফ, ১৪০৬ হিজরি)। সাহাবায়ে কেরাম তো আখেরি নবীর সোহবত পেয়ে ধন্য হয়েছেন। সময়ে সময়ে কুরআনের আয়াত অবতারণের প্রেক্ষাপট ও দৃশ্যপট আলোকন করেছেন। তার উপর আবার অবোধগম্য বিষয়াবলি নিয়ে হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর সাথে আলোচনা করে সমাধান করে নিতে পেরেছেন। কিন্তু আমরা কীভাবে কুরআনের মর্মবাণী অনুধাবন করব? সংকীর্ণ মেধাতে ইলাহী কালাম অনুধাবন করার সাধ্য কার? এর প্রেক্ষিতেই তাফসীর শাস্ত্রের বিকাশ। এর সূচনাটাও হয়েছে হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর মাধ্যমে। প্রথমত হযরত মুহাম্মদ ﷺ তো ছিলেন কুরআনেরই জীবন্ত ব্যাখ্যাপুরুষ। তাঁর পবিত্র জীবনে এই কুরআনই তো নিখুঁতভাবে চিত্রায়িত হয়েছিল। তাই তো উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা.) সাহাবাদের প্রশ্নের জবাবে বলেছিলেন– 'তিনি তো সাক্ষাৎ কুরআন।' দ্বিতীয়ত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে কুরআনকে মানুষের সামনে তুলে ধরা তো ছিল রাসূল ﷺ-এর গুরুদায়িত্বসমূহের অন্যতম। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে–

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ -

"আমি তোমার প্রতি এক স্মরণিকা (কিতাব) অবতীর্ণ করেছি, যেন তা তুমি মানুষের জন্য বয়ান তথা ব্যাখ্যা করে সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দাও, যা তাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে। (সূরা : নাহল; আয়াত : ৪৪; পারা : ১৪)

সারকথা, তাফসীর শাস্ত্রের উদ্ভব ও বিকাশ হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর মাধ্যমেই সূচিত হয়েছে এবং এটাও উপলব্ধ যে, তাফসীর হলো আল-কুরআনেরই বিশ্লেষিত রূপ। এই ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ছাড়া কুরআনের মর্ম মর্মে অনুধাবন করা অতঃপর তদনুযায়ী অনুকরণ, অনুসরণ সম্ভব নয়। তাই তো আল্লামা যারকাশী (র.) আল-বুরহান ফী উলূমিল কুরআন (১/৩৩) গ্রন্থে তাফসীরের সংজ্ঞায় বলেন-

هُوَ عِلْمٌ يُعْرَفُ بِهِ فَهْمُ كِتَابِ اللَّهِ الْمُنَزَّلِ عَلَى نَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ ﷺ وَبَيَانُ مَعَانِيهِ وَاسْتِخْرَاجُ أَحْكَامِهِ وَحِكَمِهِ -

অর্থাৎ, এটা এমন এক বিজ্ঞানের নাম, যার দ্বারা মুহাম্মদ ﷺ-এর উপর অবতীর্ণ আল্লাহর কিতাব অনুধাবন, তার অর্থের ব্যাখ্যা ও আয়াতের বিধি-বিধান এবং এর রহস্য জানা যাবে।

আর ড. মুহাম্মদ হুসাইন যাহাবী (র.) আত-তাফসীর ওয়াল মুফাসিসরূন (১/১৫-১৬; কায়রো : মাকতাবা ওয়াহাবা; ১৪১৬ হি.) গ্রন্থে তাফসীরের সংজ্ঞায় বলেন– بَيَانُ كَلَامِ اللَّهِ أَوْ أَنَّهُ الْمُبَيِّنُ لِأَلْفَاظِ الْقُرْآنِ وَمَفْهُومَاتِهَا অর্থাৎ, (এটা) আল্লাহর কালামের ব্যাখ্যা অথবা এটা কুরআনের শব্দমালা ও ভাবসমূহের সুস্পষ্টকারী।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে আমরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, মানব জীবনে দু'জাহানের শান্তি-সুখ ও সফলতা লাভের জন্য যতটুকু প্রয়োজন আল-কুরআনের, ঠিক তেমনি কুরআন অনুধাবনের জন্য তাফসীর শাস্ত্রে প্রয়োজন।

✦ ইসলামিয়া কুতুবখানা -এর উদ্যোগে ইতঃপূর্বে আনওয়ারুল কুরআন নামক পবিত্র কুরআনের একটি ব্যাখ্যাগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। সূরা বাকারা, নিসা, মায়িদা, আন'আম, আ'রাফ, আনফাল ও তাওবা -এর ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ বেশকিছু সূরার সরল অনুবাদ, শাব্দিক অনুবাদ, ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ এবং শানে নুযূলসহ প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ এর আঙ্গিকে গ্রন্থটি সাজানো হয়েছিল। সহজ ও সরল পাঠে প্রয়োজনীয় তবে নির্ভুল তত্ত্বে উপস্থাপিত ব্যাখ্যাগ্রন্থ আনওয়ারুল কুরআন পাঠক মহলে ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়। তাদের আকুতি, হৃদয়ের অনুভূতি ও অভিব্যক্তিকে কেন্দ্র করে কুরআনের একটি যুগোপযোগী তাফসীর গ্রন্থ রচনার বিষয়টি সামনে আসে। এরই প্রেক্ষিতে ইসলামিয়া কুতুবখানার সত্ত্বাধিকারী আলহাজ মাওলানা মোস্তফা সাহেব (দা. বা.) কুরআনের খেদমত করার মনস্থ করত আমাকে আনওয়ারুল কুরআনের আদলে একটি তাফসীর গ্রন্থ রচনার অনুরোধ জানান। কিন্তু কুরআনের এত বড় খেদমত

www.almodina.com

করতে গিয়ে না জানি কলঙ্কের ছোঁয়া লাগে– এই ভয়ে আমি অনুরোধে সাড়া দিচ্ছিলাম না। কিন্তু মাওলানা সাহেবও খেদমত করার সুযোগ হাতছাড়া করার ব্যক্তি নন। অবশেষে তাঁর অনুরোধকে আমি শ্রদ্ধার সাথে স্বাগত জানালাম। মূলত তাঁর দিলের তড়পেই আমি এ খেদমতে হাত লাগালাম। তাফসীর গ্রন্থটি রচনার ক্ষেত্রে আনওয়ারুল কুরআনের রচনা কাঠামোর আলোকে রচনার প্রয়াস চালানো হয়েছে। অনুবাদের ক্ষেত্রে আশরাফ আলী থানবী (র.) -এর তরজমার অনুকরণ করা হয়েছে। এক আয়াতের সাথে অন্য আয়াতের পূর্বাপর সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে ইদ্রিস কান্দেলভী (র.) এর মা'আরিফুল কুরআন কে অনুসরণ করা হয়েছে। আর তাফসীরের ক্ষেত্রে মুফতী মুহাম্মদ শফী (র.) -এর মা'আরিফুল কুরআনকে সামনে রাখা হয়েছে। এছাড়াও তাফসীরে নূরুল কুরআন, তাফসীরে বায়যাভী, তাফসীরে জালালাইন, তাফসীরে বয়ানুল কুরআন, তাফসীরে কুরতুবী, তাফসীরে মাজেদী, ইবনে কাছীর ও তাফসীরে মাজহারীর গুরুত্বপূর্ণ তাত্ত্বিক আলোচনাও সমভাবে উপাত্ত হয়েছে। দীর্ঘদিনের মেহনতের বদৌলতে তাফসীরে আনওয়ারুল কুরআন আজ প্রকাশের পথে, তাই এ আনন্দঘন মুহূর্তে আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীনের দরবারে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। পাশাপাশি পাবলিকেশনের জগতে অনুকরণীয় আদর্শ আলেমে দীন আলহাজ মাওলানা মোস্তাফা সাহেব (দা. বা.) -এর জন্য দোয়া করি– 'আল্লাহ! হযরতকে সিহহাত ও আফিয়াতের সাথে দীর্ঘায়ু দান করুন। তাঁর সমস্ত দীনি খেদমত ও প্রকাশনী প্রতিষ্ঠানকে কবুল করুন।' এবং যারা আমাকে বিভিন্ন দিক-নির্দেশনা, মূল্যবান পরামর্শ, উৎসাহ-উদ্দীপনা ও আন্তরিকতা দিয়ে সহযোগিতা করেছেন তাদের জন্যও দোয়া করি– 'হে আল্লাহ! তাদেরকে উত্তম জাযা ও খায়ের দান করুন এবং এই তাফসীর গ্রন্থের ভুল-ভ্রান্তি ও ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করে দিয়ে সর্বস্তরের পাঠক মহলে ব্যাপকভাবে কবুল করে নিন।' পরিশেষে কবিতার চরণে ইতি টানছি–

ওফাতের পরে আমি, জাহানের একক স্বামী,
তোমারি আদালতে, হাজির হব যবে।
হিসেবের খাতায় লিখে, রেখো গো যতন করে,
অধমের গ্রন্থখানি, হে দয়াময়! তবে।

মোহাম্মাদ আবুল কালাম মাসূম
৪১১দক্ষিণ, মনিপুর
মিরপুর, ঢাকা
২৩/০৭/২০১৩ ইং
১৩ রমাজানুল মুবারক

www.almodina.com

যাদের নিরলস প্রচেষ্টায় এ আনওয়ারুল কুরআনটি আলোর মুখ দেখেছে

- **মাওলানা মোহাম্মদ মোস্তফা এম. এম**
  ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ইসলামিয়া কুতুবখানা, ঢাকা।
- **মাওলানা মোহাম্মদ আনওয়ারুল হক**
  সিনিয়র সম্পাদক, ইসলামিয়া কুতুবখানা, ঢাকা।
- **মাওলানা আব্দুল আলীম**
  উস্তাদ, আল-জামিয়াতুল ইসলামিয়া ইদারাতুল উলূম, আফতাব নগর, ঢাকা।
- **মাওলানা মোহাম্মদ আকবর হুসাইন**
  ফাযেলে দারুল উলূম হাটহাজারী চট্টগ্রাম।
- **মাওলানা রফিকুল ইসলাম সিরাজী**
  ফাযেলে দারুল উলূম দেওবন্দ, ভারত।
  সাবেক উস্তাদ, জামিয়া ইসলামিয়া দারুল উলূম মাদানিয়া
  ৩১২ দক্ষিণ যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।
- **মাওলানা মোহাম্মদ মাহমূদ হাসান**
  উস্তাদ, মাদরাসা উলূমে শরী'আহ, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা
- **মাওলানা মোহাম্মদ এনামুল হাসান**
  উস্তাদ, মাদরাসা নূরুল কুরআন, ভিক্টোরিয়া পার্ক, ঢাকা।
- **মাওলানা মোহাম্মদ সালাউদ্দিন**
  মুহাদ্দিস, জামিয়া ইসলামিয়া মোহাম্মাদিয়া মোহাম্মদনগর, ঢাকা।
- **মাওলানা মোহাম্মদ কামরুল হাসান**
  ফাযেলে দারুল কুরআন শামসুল উলূম চৌধুরী পাড়া, ঢাকা
- **মাওলানা মোহাম্মদ মাহবুবুল হাসান**
  ফাযেলে জামেয়া আরাবিয়া ফরিদাবাদ, ঢাকা।
- **মাওলানা হাফেজ ইমাম উদ্দীন**
  ফাযেলে জামেয়া আরাবিয়া ফরিদাবাদ, ঢাকা।
- **মাওলানা মোহাম্মদ মোবারক হুসাইন**
  সাবেক শিক্ষক, আল ফারুক ইসলামিয়া একাডেমি চাটখিল, নোয়াখালী।

www.almodina.com

সূচিপত্র

www.almodina.com

তাফসীরে আনওয়ারুল কুরআন

www.almodina.com

৬ষ্ঠ পারা

অনুবাদ	আয়াত
অনুবাদ : (১৪৮) আল্লাহ তা'আলা মন্দ কথা মুখে আনা পছন্দ করেন না [কারো জন্য] মজলুম ব্যতীত, আর আল্লাহ [মজলুমের কথা] খুব শুনেন, [জালেমের অবস্থা] খুব জানেন।	لَا يُحِبُّ اللّٰهُ الْجَهْرَ بِالسُّوْٓءِ مِنَ الْقَوْلِ اِلَّا مَنْ ظُلِمَ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ سَمِيْعًا عَلِيْمًا (١٤٨)
(১৪৯) যদি কোনো নেক কাজ প্রকাশ্যে কর কিংবা তা গোপনে কর অথবা কোনো [ব্যক্তির] মন্দ ব্যবহার ক্ষমা করে দাও, তবে [অতি উত্তম। কেননা] আল্লাহ [-ও] অতীব ক্ষমাশীল, পূর্ণ ক্ষমতাবান।	اِنْ تُبْدُوْا خَيْرًا اَوْ تُخْفُوْهُ اَوْ تَعْفُوْا عَنْ سُوْٓءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيْرًا (١٤٩)
(১৫০) যারা আল্লাহর সাথে এবং তাঁর রাসূলগণের সাথে কুফরি করে এবং এরূপ ইচ্ছা রাখে যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণের মধ্যে [ঈমান আনয়নের ব্যাপারে] পার্থক্য করে এবং বলে, আমরা [পয়গম্বরদের] কতিপয়ের উপর ঈমান রাখি এবং কতিপয়কে অবিশ্বাস করি, আর এরূপ ইচ্ছা রাখে যে, এর মাঝামাঝি একটি পথ উদ্ভাবন করে।	اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ وَيُرِيْدُوْنَ اَنْ يُّفَرِّقُوْا بَيْنَ اللّٰهِ وَرُسُلِهٖ وَيَقُوْلُوْنَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَّنَكْفُرُ بِبَعْضٍ ۙ وَّيُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّتَّخِذُوْا بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيْلًا ۙ (١٥٠)
(১৫১) এরূপ লোকেরা সুনিশ্চিত কাফের, আর কাফেরদের জন্য আমি অপমানজনক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি।	اُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ حَقًّا ۚ وَاَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابًا مُّهِيْنًا (١٥١)

শাব্দিক অনুবাদ

(১৪৮) لَا يُحِبُّ اللّٰهُ আল্লাহ তা'আলা পছন্দ করেন না الْجَهْرَ بِالسُّوْٓءِ مِنَ الْقَوْلِ মন্দ কথা মুখে আনা [কারো জন্য] اِلَّا مَنْ ظُلِمَ মজলুম ব্যতীত وَكَانَ اللّٰهُ سَمِيْعًا عَلِيْمًا আর আল্লাহ [মজলুমের কথা] খুব শুনেন, [জালেমের অবস্থা] খুব জানেন।

(১৪৯) اِنْ تُبْدُوْا خَيْرًا যদি কোনো নেক কাজ প্রকাশ্যে কর اَوْ تُخْفُوْهُ কিংবা তা গোপনে কর اَوْ تَعْفُوْا عَنْ سُوْٓءٍ অথবা কোনো মন্দ ব্যবহার ক্ষমা করে দাও فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَفُوًّا তবে আল্লাহ তা'আলা অতীব ক্ষমাশীল, قَدِيْرًا পূর্ণ ক্ষমতাবান।

(১৫০) اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ যারা আল্লাহর সাথে এবং তাঁর রাসূলগণের সাথে কুফরি করে وَيُرِيْدُوْنَ এবং এরূপ ইচ্ছা রাখে যে اَنْ يُّفَرِّقُوْا بَيْنَ اللّٰهِ وَرُسُلِهٖ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণের মধ্যে পার্থক্য করে وَيَقُوْلُوْنَ এবং বলে نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ আমরা কতিপয়ের উপর ঈমান রাখি وَّنَكْفُرُ بِبَعْضٍ এবং কতিপয়কে অবিশ্বাস করি وَّيُرِيْدُوْنَ আর এরূপ ইচ্ছা রাখে যে اَنْ يَّتَّخِذُوْا بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيْلًا এর মাঝামাঝি একটি পথ উদ্ভাবন করে।

(১৫১) اُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ حَقًّا এরূপ লোকেরা সুনিশ্চিত কাফের وَاَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ আর কাফেরদের জন্য আমি প্রস্তুত করে রেখেছি عَذَابًا مُّهِيْنًا অপমানজনক শাস্তি।

www.almodina.com

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ وَلَمْ يُفَرِّقُوْا بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ اُولٰٓئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيْهِمْ اُجُوْرَهُمْ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا (١٥٢)

অনুবাদ : (১৫২) আর যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখে এবং তাঁর রাসূলগণের প্রতিও, আর তাঁদের কারো মধ্যে [ঈমান আনয়নে] পার্থক্য করে না, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে তাদের কর্মের বিনিময় প্রদান করবেন, আর আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল পরম করুণাময়।

يَسْـَٔلُكَ اَهْلُ الْكِتٰبِ اَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتٰبًا مِّنَ السَّمَآءِ فَقَدْ سَاَلُوْا مُوْسٰٓى اَكْبَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَقَالُوْٓا اَرِنَا اللّٰهَ جَهْرَةً فَاَخَذَتْهُمُ الصّٰعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ۚ ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيِّنٰتُ فَعَفَوْنَا عَنْ ذٰلِكَ ۚ وَاٰتَيْنَا مُوْسٰى سُلْطٰنًا مُّبِيْنًا (١٥٣)

(১৫৩) [হে মুহাম্মদ ﷺ]! আপনার নিকট আহলে কিতাবরা এই আবেদন করে যে, আপনি তাদের নিকট এক বিশেষ লিপিকা আসমান হতে এনে দেন, বস্তুতঃ তারা মূসার নিকট তার চেয়েও বড় বিষয়ের আবেদন করেছিল এবং তারা এরূপ বলেছিল যে, আল্লাহ তা'আলাকে প্রকাশ্যভাবে আমাদেরকে দেখিয়ে দাও, ফলে তাদের এই ধৃষ্টতার দরুন তাদের উপর বজ্র নিপতিত হলো অতঃপর তারা গো-বৎসকে (উপাসনার জন্য) মনোনীত করেছিল তাদের নিকট বহু প্রমাণাদি আসার পর, অতঃপর আমি তা ক্ষমা করে দিয়েছিলাম এবং মূসাকে আমি প্রকাশ্য প্রভাব দান করেছিলাম।

শাব্দিক অনুবাদ

(১৫২) وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ আর যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখে এবং তাঁর রাসূলগণের প্রতিও وَلَمْ يُفَرِّقُوْا بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ আর তাঁদের কারো মধ্যে পার্থক্য করে না اُولٰٓئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيْهِمْ اُجُوْرَهُمْ নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে তাদের কর্মের বিনিময় প্রদান করবেন وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا আর আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল পরম করুণাময়।

(১৫৩) يَسْـَٔلُكَ اَهْلُ الْكِتٰبِ আপনার নিকট আহলে কিতাবরা এই আবেদন করে যে اَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتٰبًا مِّنَ السَّمَآءِ আপনি তাদের নিকট এক বিশেষ লিপিকা আসমান হতে এনে দেন فَقَدْ سَاَلُوْا مُوْسٰٓى বস্তুতঃ তারা মূসার নিকট আবেদন করেছিল اَكْبَرَ مِنْ ذٰلِكَ তার চেয়েও বড় বিষয়ের فَقَالُوْٓا এবং তারা এরূপ বলেছিল যে اَرِنَا اللّٰهَ جَهْرَةً আল্লাহ তা'আলাকে প্রকাশ্যভাবে আমাদেরকে দেখিয়ে দাও فَاَخَذَتْهُمُ الصّٰعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ফলে তাদের এই ধৃষ্টতার দরুন তাদের উপর বজ্র নিপতিত হলো ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ অতঃপর তারা গো-বৎসকে (উপাসনার জন্য) মনোনিত করেছিল مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيِّنٰتُ তাদের নিকট বহু প্রমাণাদি আসার পর فَعَفَوْنَا عَنْ ذٰلِكَ অতঃপর আমি তা ক্ষমা করে দিয়েছিলাম وَاٰتَيْنَا مُوْسٰى سُلْطٰنًا مُّبِيْنًا এবং মূসাকে আমি প্রকাশ্য প্রভাব দান করেছিলাম।

www.almodina.com

وَرَفَعۡنَا فَوۡقَهُمُ الطُّوۡرَ بِمِیۡثَاقِهِمۡ وَقُلۡنَا لَهُمُ ادۡخُلُوا الۡبَابَ سُجَّدًا وَّقُلۡنَا لَهُمۡ لَا تَعۡدُوۡا فِی السَّبۡتِ وَاَخَذۡنَا مِنۡهُمۡ مِّیۡثَاقًا غَلِیۡظًا (١٥٤)

অনুবাদ : (১৫৪) আর আমি তাদের থেকে স্বীকারোক্তি নেওয়ার উদ্দেশ্যে তূর পর্বতকে উঠিয়ে তাদের উপর ঝুলিয়ে দিয়েছিলাম এবং তাদেরকে আদেশ করেছিলাম নগর দ্বারে বিনয়ের সাথে প্রবেশ করবে, এবং আমি তাদেরকে এই আদেশ করেছিলাম যে, শনিবার সম্বন্ধে– সীমালঙ্ঘন করো না এবং আমি তাদের থেকে দৃঢ় অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলাম।

শাব্দিক অনুবাদ

(১৫৪) وَرَفَعۡنَا فَوۡقَهُمُ الطُّوۡرَ আর আমি তাদের থেকে তূর পর্বতকে উঠিয়ে তাদের উপর ঝুলিয়ে দিয়েছিলাম بِمِیۡثَاقِهِمۡ স্বীকারোক্তি নেওয়ার উদ্দেশ্যে وَقُلۡنَا لَهُمُ এবং তাদেরকে আদেশ করেছিলাম ادۡخُلُوا الۡبَابَ سُجَّدًا নগর দ্বারে বিনয়ের সাথে প্রবেশ করবে وَّقُلۡنَا لَهُمۡ এবং আমি তাদেরকে এই আদেশ করেছিলাম যে لَا تَعۡدُوۡا فِی السَّبۡتِ শনিবার সম্বন্ধে– সীমালঙ্ঘন করো না وَاَخَذۡنَا مِنۡهُمۡ مِّیۡثَاقًا غَلِیۡظًا এবং আমি তাদের থেকে দৃঢ় অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলাম।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(১৪৮) قوله لَا يُحِبُّ اللّٰهُ الۡجَهۡرَ بِالسُّوۡٓءِ مِنَ الۡقَوۡلِ اِلَّا مَنۡ ظُلِمَ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** আব্দুর রাজ্জাক, আব্দ বিন হুমাইদ ও ইবনে জারীর প্রমূখ মুজাহিদের উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে এক ব্যক্তির আপ্যায়ন সম্পর্কে। কোনো এক ব্যক্তি কোনো এক গোত্রের মেহমান হলো, কিন্তু সে তার আতিথেয়তা বা আপ্যায়ন করেনি, সে মর্মে ঐ ব্যক্তি তার সমালোচনা করে। অতিথি ব্যক্তির সমালোচনা করার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। –[ফাতহুল কাদীর : ৫৩০/১, কুরতুবী : ৬ :৬, রূহুল মা'আনী : ২/৩-৬]

শানে নুযূল– ২ : মুকাতিল বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ–এর উপস্থিতিতে কোনো এক ব্যক্তি হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-কে গাল-মন্দ করে, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) কিছুক্ষণ চুপ থেকে তার জবাব দেন, রাসূল ﷺ দাঁড়ালেন, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! সে আমাকে গালি দিল অথচ আপনি তাকে কিছুই বলেননি? কিন্তু আমি যখন জবাব দিলাম, তখন আপনি থামলেন? রাসূল ﷺ উত্তরে বললেন, একজন ফেরেশতা তোমার পক্ষথেকে উত্তর দিচ্ছিল। কিন্তু তুমি যখন উত্তর দিলে ফেরেশতা চলে গেলেন, শয়তান উপস্থিত হলো। সে অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। –[বাহরে মুহীত : ৩৯৭ : ৪]

(১৫৩) قوله يَسۡـَٔلُكَ اَهۡلُ الۡكِتٰبِ اَنۡ تُنَزِّلَ عَلَيۡهِمۡ كِتٰبًا مِّنَ السَّمَآءِ الخ **আয়াতের শানে নুযূল : ইবনে জারীর মুহাম্মদ বিন কা'আব** আল কুরাযীর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন ইহুদিদের কয়েকজন মানুষ রাসূল ﷺ–এর নিকট এসে বলল, হযরত মূসা (আ.) আল্লাহর নিকট থেকে লিখিত কিতাব নিয়ে আমাদের নিকট এসেছিলেন। সুতরাং আপনিও আল্লাহর পক্ষ থেকে লিখিত কিতাব আমাদের প্রতি নিয়ে আসেন, তাহলে আমরা আপনাকে বিশ্বাস করব। তখন আল্লাহ তা'আলা উল্লিখিত আয়াত নাজিল করেন। –[রূহুল মা'আনী- ৬/৫/৩, ফাতহুল কাদীর : ৫৩৫/১]

আলোচ্য আয়াতসমূহের মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় আয়াতে দুনিয়া হতে জোর-জুলুমের অবসান ঘটানোর বিধান বর্ণনা করা হয়েছে। তবে তা মানব রচিত শাসক-সুলভ আইনের মতো নয়; বরং ভীতিপ্রদর্শন ও আশ্বাস দানের মাধ্যমে এক অপূর্ব কানুন পেশ করা হয়েছে। যার মধ্যে এক দিকে ইনসাফ ও ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠা ও অপরাধ দমনের জন্য মজলুমকে অধিকার দেওয়া হয়েছে যে, অত্যাচারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করতে পারবে, তাকে আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে পারবে। অপরদিকে সূরা নাহল-এর আয়াতে একটি শর্ত আরোপ করে ইরশাদ হয়েছে :

www.almodina.com

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ

অর্থাৎ, আর যদি তোমরা প্রতিশোধ নিতে চাও, তবে তোমাদের উপর যে পরিমাণ জুলুম করা হয়েছে, তোমরা ঠিক ততটুকুই প্রতিশোধ নিতে পার। তবে শর্ত হলো এই যে, প্রতিশোধ নিতে গিয়ে তোমরা আবার জুলুম ও বাড়াবাড়ি করো না; বরং ইনসাফের গণ্ডির মধ্যে থাকবে, অন্যথা তোমরাও অত্যাচারী ও অপরাধি সাব্যস্ত হবে। সাথে সাথে একথাও বলে দেওয়া হয়েছে যে, প্রতিশোধ গ্রহণ করার ক্ষমতা ও অধিকার থাকা সত্ত্বেও যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ কর এবং ক্ষমা করে দাও, তবে নিঃসন্দেহে তা তোমাদের জন্য অতি উত্তম।

এ আয়াতে কারীমার দ্বারা আরো বুঝা যায় যে, মজলুম ব্যক্তি যদি অত্যাচারীর অন্যায়-অত্যাচারের কাহিনী লোকের কাছে প্রকাশ করে বা আদালতে অভিযোগের ফরিয়াদ জানায়, তবে তা শেকায়েত ও হারাম গিবতের আওতায় পড়বে না। কারণ জালেম নিজেই মজলুমকে অভিযোগ উত্থাপন করতে সুযোগ করে দিয়েছে ও বাধ্য করেছেন।

সারকথা, কুরআন পাক একদিকে মাজলুমকে তার প্রতি জুলুমের সমতুল্য প্রতিশোধ গ্রহণ করার অনুমতি দিয়েছেন। অপরদিকে প্রতিশোধ গ্রহণ করার পরিবর্তে উন্নত চরিত্রের শিক্ষা ও ক্ষমার মনোভাব সৃষ্টি করার জন্য পরকালের উত্তম প্রতিদানের আশ্বাস শুনিয়ে ক্ষমা ও ত্যাগের আদর্শ গ্রহণ করার জন্য উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন :

إِن تُبْدُوا خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُوا عَن سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا

অর্থাৎ, "যদি তোমরা কোনো উত্তম কাজ প্রকাশ্যে কর, বা তা গোপনে কর, অথবা কারো কোনো অন্যায়কে ক্ষমা করে দাও, তবে তা অতি উত্তম। কেননা আল্লাহ তা'আলা অতিশয় ক্ষমা পরায়ণ ক্ষমতাবান।'

অত্র আয়াতের মূখ্য উদ্দেশ্য কারো অন্যায়কে ক্ষমা করার আদর্শ শিক্ষা দেওয়া। প্রকাশ্যে বা গোপনে নেক কাজ করার উল্লেখ করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, ক্ষমা করাও একটি বিশিষ্ট সৎকার্য। যে ব্যক্তি অন্যের অপরাধ মার্জনা করবে, সে আল্লাহ তা'আলার ক্ষমা ও করুণার যোগ্য হবে।

আয়াতের শেষে فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا বলে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা সর্বশক্তিমান, যাকে ইচ্ছা তিনি শাস্তি দিতে পারেন এবং যখন ইচ্ছা প্রতিশোধ গ্রহণ করতে পারেন। তথাপি তিনি অতি ক্ষমাশীল। আর মানুষের শক্তি ও ক্ষমতা যখন সামান্য ও সীমাবদ্ধ, তাই ক্ষমা ও মার্জনার পথ অবলম্বন করা তার জন্য অধিক বাঞ্ছনীয়।

এ হচ্ছে অন্যায়-অনাচার প্রতিরোধ ও সামাজিক সংস্কার সাধনের ইসলামি মূলনীতি এবং অভিভাবক সুলভ সিদ্ধান্ত। এক দিকে ন্যায়সঙ্গত প্রতিশোধ গ্রহণের অধিকার প্রদান করে ইনসাফ ও ন্যায়নীতিকে সমুন্নত রাখা হয়েছে, অপরদিকে উত্তম চরিত্র ও নৈতিকতা শিক্ষা দিয়ে ক্ষমা ও মার্জনা করতে অনুপ্রাণিত করা হয়েছে। যার অনিবার্য ফলশ্রুতি সম্পর্কে কুরআন কারীমের অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে :

فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ

অর্থাৎ, "তোমার ও অন্য যে ব্যক্তির মধ্যে দুশমনি ছিল, এমতাবস্থায় সে ব্যক্তি আন্তরিক বন্ধু হয়ে যাবে।"

আইন আদালত বা প্রতিশোধ গ্রহণ করার মাধ্যমে যদিও অন্যায়-অত্যাচার প্রতিরোধ করা যায়, কিন্তু এর দীর্ঘস্থায়ী প্রতিক্রিয়া অব্যাহত থাকে। যার ফলে পারস্পরিক বিবাদের সূত্রপাত হওয়ার আশঙ্কা বিদ্যমান থাকে। কিন্তু কুরআনে কারীম যে অপূর্ব নৈতিকতার আদর্শ শিক্ষা দিয়েছে, তার ফলে দীর্ঘকালের শত্রুতাও গভীর বন্ধুত্বে রূপান্তরিত হয়ে থাকে।

এখানে তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম আয়াতে কুরআনে পাক স্পষ্ট ফয়সালা দিয়েছে যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলাকে মান্য করে কিন্তু তাঁর রাসূলগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে না, অথবা কোনো পয়গম্বরকে মান্য করে , আর কোনো পয়গম্বরকে অমান্য করে আল্লাহ তা'আলার সমীপে সে ঈমানদার নয়; বরং প্রকাশ্য কাফের, পরকালে তার পরিত্রাণ লাভের কোনো উপায় নেই।

একমাত্র ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ধর্মে মুক্তি নেই : কুরআন হাকীমের উপরিউক্ত স্পষ্ট ঘোষণা ঐ সব বিভ্রান্ত লোকদের হীনমন্যতা ও গোঁজামিলকেও ধ্বংস করে দিয়েছে, যারা অন্যান্য ধর্মানুসারীদের প্রতি উদারতা প্রদর্শন করতে গিয়ে নিজেদের ধর্মমত ও ধর্মীয় বিশ্বাসকে বিজাতির পদমূলে উৎসর্গ করতে ব্যস্ত। যারা কুরআন ও হাদীসের স্পষ্ট ফয়সালাকে উপেক্ষা করে অন্যান্য ধর্মানুসারীদেরকে বুঝাতে চায় যে, "মুসলমানদের মতেও শুধু ইসলামই একমাত্র

মুক্তিসনদ নয়: বরং ইহুদি ও খ্রিস্টানরাও তাদের নিজ নিজ ধর্মে-কর্মে স্থির থেকে পরকালে পরিত্রাণ লাভ করতে পারে। অথচ তারা অধিকাংশ রাসূলকে অথবা অন্ততঃ কোনো কোনো পয়গম্বরকে অমান্য করে। যার ফলে তাদের কাফের ও জাহান্নামী হওয়ার কথা অত্র আয়াতে স্পষ্ট ঘোষণা করা হয়েছে।"

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, অমুসলমানদের প্রতি ইনসাফ, ন্যায়নীতি, সমবেদনা, সহানুভূতি, উদারতা ও ইহসান বা হিতকামনার দিক দিয়ে ইসলাম নজির বিহীন। কিন্তু উদারতা বা সহানুভূতি ব্যক্তিগত অধিকারের আওতায় হয়ে থাকে যা আমরা যে কোনো ব্যক্তিকে উৎসর্গ করতে পারি। অন্যের অধিকারে হস্তক্ষেপ বা অনধিকার চর্চা করা যাবে না। ইসলাম একদিকে অমুসলমানদের প্রতি সদ্ব্যবহার ও পরম সহিষ্ণুতার ক্ষেত্রে যেমন উদার ও অবারিত দ্বার, অপরদিকে স্বীয় সীমারেখা সংরক্ষণের ব্যাপারে অতি সতর্ক, সজাগ ও কঠোর। ইসলাম অমুসলমানদের প্রতি উদারতার সাথে সাথে কুফরি ও কু-প্রথার প্রতি পূর্ণ ঘৃণা প্রকাশ করে। ইসলামের দৃষ্টিতে মুসলমান ও অমুসলমানরা দুটি পৃথক জাতি এবং মুসলমানদের জাতীয় প্রতীক ও স্বাতন্ত্র্য সযত্নে সংরক্ষণ করা একান্ত প্রয়োজন। শুধু ইবাদতের ক্ষেত্রেই স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখলে চলবে না; বরং সামাজিকতকার ক্ষেত্রেও স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে হবে। এ কথা কুরআন ও হাদীসে বার বার উল্লেখ করা হয়েছে।

কুরআন পাক ও ইসলামের অভিমত যদি এই হতো যে, যে কোনো ধর্মমতের মাধ্যমে মুক্তি লাভ করা সম্ভব, তাহলে ইসলাম প্রচারের জন্য জীবন উৎসর্গ করার কোনো প্রয়োজন ছিল না। হযরত রাসূলে কারীম ﷺ ও খোলাফায়ে রাশেদীনের জিহাদ পরিচালনা করা এমন কি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নবুয়ত ও কুরআন নাজিল করা নিরর্থক হতো। –(নাউযুবিল্লাহি মিন যালিকা)

সূরা বাকারার ৬২তম আয়াত দ্বারা কেউ কেউ হয়তো সন্দেহে পতিত হতে পারেন যে, এতে ইরশাদ কর হয়েছে :

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَىٰ وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

অর্থাৎ, নিশ্চয় যারা সত্যিকারভাবে ঈমান এনেছে (মুসলমান হয়েছে) এবং যারা ইহুদি হয়েছে এবং নাসারা (খ্রিস্টান) ও সাবেয়ীনদের মধ্যে যারা আল্লাহ তা'আলার প্রতি ও কেয়ামতের দিনের প্রতি ঈমান এনেছে আর সৎকাজ করেছে, তাদের পালনকর্তার সমীপে তাদের জন্য পূর্ণ প্রতিদান সংরক্ষিত রয়েছে। তাদের কোনো শঙ্কা নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না।

অত্র আয়াতে ঈমানদারীর বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেওয়ার পরিবর্তে শুধু আল্লাহ তা'আলার প্রতি ও কেয়ামতের প্রতি ঈমান আনার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তাই যারা সামান্য পড়াশুনা করে কুরআন উপলব্ধি করতে চায়, তারা অত্র আয়াত দ্বারা ধারণা করে বসেছে যে, শুধু আল্লাহ তা'আলা ও কেয়ামতের প্রতি বিশ্বাস করাই পরকালীন মুক্তির জন্য যথেষ্ট : নবী রাসূলগণের প্রতি ঈমান আনা মুক্তির পূর্বশর্ত নয়। কিন্তু তারা একথা জানে না যে, কুরআনের পরিভাষায় আল্লাহ তা'আলার প্রতি ঈমান তখনই শুধু গ্রহণযোগ্য ও ধর্তব্য হয় যখন তার সাথে পয়গম্বর, ফেরেশতা ও আসমানি কিতাবের প্রতিও ঈমান আনা হয়। অন্যথা শুধু আল্লাহর অস্তিত্ব ও একত্ববাদ তো স্বয়ং শয়তানও স্বীকার করে। কুরআনে কারীমের ভাষায় শুনুন :

فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

অর্থাৎ, তাদের ঈমান ঐ সময় গ্রহণযোগ্য ও তারা হেদায়েতপ্রাপ্ত হবে, যখন তারা তোমাদের সাধারণ মুসলমানদের মতো পুরোপুরি ঈমান আনবে। যার মধ্যে আল্লাহ তা'আলার প্রতি ঈমানের সাথে সাথে নবীগণের প্রতিও ঈমান আনয়ন করা অপরিহার্য। আর যদি তারা বিমুখ হয়, তবে চিনে রাখ যে, তারা আল্লাহ ও রাসূলের মধ্যে প্রভেদ সৃষ্টি করতে সচেষ্ট। অতএব, আপনার পক্ষে আল্লাহ তা'আলাই তাদের মোকাবিলায় যথেষ্ট এবং তিনি সব কিছু শুনেন ও জানেন।

সূরা নিসার আলোচ্য আয়াতে আরো স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলার প্রেরিত কোনো একজন নবীকেও যে ব্যক্তি অস্বীকার করবে সে প্রকাশ্য কাফের, তার জন্য জাহান্নামের চিরস্থায়ী আজাব অবধারিত। রাসূলের প্রতি ঈমান ছাড়া আল্লাহ তা'আলার প্রতি সত্যিকার ঈমান সাব্যস্ত হয় না।

শেষ আয়াতে পুনরায় দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করা হয়েছে যে, আখেরাতের মুক্তি ও কামিয়াবী শুধু ঐ সব লোকের জন্যই সংরক্ষিত দ্বারা আল্লাহ তা'আলার প্রতি ঈমানের সাথে সাথে তাঁর নবী ও রাসূলগণের প্রতিও যথার্থ ঈমান ও আস্থা রাখে।

হযরত রাসূলে কারীম ﷺ ইরশাদ করেছেন إِنَّ الْقُرْآنَ يُفَسِّرُ بَعْضُهُ بَعْضًا

অর্থাৎ, নিশ্চয় কুরআনের এক আয়াত অন্য আয়াতের ব্যাখ্যা ও তাফসীর করে।" অতএব, কুরআনী তাফসীরের পরিপন্থি কোনো তাফসীর বর্ণনা কারো জন্য জায়েজ নয়।

কতিপয় ইহুদি দলপতি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সমীপে উপস্থিত হয়ে বলল, আপনি যদি সত্য নবী হয়ে থাকেন, তবে হযরত মূসা (আ.)-এর প্রতি যেমন লিপিবদ্ধ আসমানি কিতাব নাজিল হয়েছিল, আপনিও তদ্রূপ একখানা লিপিবদ্ধ কিতাব আসমান থেকে নিয়ে আসুন। তাহলে আমরা আপনার প্রতি ঈমান আনয়ন করব। তারা আন্তরিকভাবে ঈমানের আগ্রহ কিংবা সত্যানুসন্ধিৎসার কারণে এহেন আবদার করেনি; বরং জিদ ও হঠকারিতার কারণে একের পর এক বাহানার আশ্রয় নিতে অভ্যস্ত ছিল। আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত দ্বারা ইহুদিদের স্বরূপ উদঘাটন করে তাদের হঠকারী মনোভাব সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে ওয়াকিফহাল করেন এবং সান্ত্বনা দান করেন যে, এরা এমন এক জাতি-গোষ্ঠীর সদস্য যারা পূর্ববর্তী রাসূলগণকেও উত্যক্ত-বিরক্ত করত, খোদাদ্রোহিতামূলক বড় বড় অপরাধও নির্দ্বিধায় করে বসত। এদের পূর্বসূরিরা হযরত মূসা (আ.)-এর কাছে আবদার করেছিল যে, সরাসরি ও প্রকাশ্যভাবে আমাদেরকে আল্লাহ দেখাতে হবে। এহেন চরম স্পর্ধার কারণে তাদের উপর অকস্মাৎ বজ্রপাত হয়েছিল এবং তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল। পরবর্তী ইহুদিরা অদ্বিতীয় মা'বূদ আল্লাহ তা'আলার চিরন্তন সত্তা ও একত্ববাদের অকাট্য প্রমাণাদি অর্থাৎ, হযরত মূসা (আ.)-এর প্রকাশ্য মু'জিযাসমূহ ও ফেরাউনের শোচনীয় সলিল সমাধির দৃশ্য প্রত্যক্ষ করার পরও আল্লাহ তা'আলাকে ত্যাগ করে গো-বৎসের পূজায় লিপ্ত হয়েছিল। এসব অপকর্মের কারণে তারা সমূলে উৎখাতযোগ্য হওয়া সত্ত্বেও আমি তাদেরকে ক্ষমা করেছি এবং হযরত মূসা (আ.)-কে কামিয়াব ও বিজয়ী করেছি। তারা তাওরাতের অনুশাসন মানতে স্পষ্ট অস্বীকার করায় আমি তূর পাহাড়কে তাদের উপর তুলে এনে ঝুলিয়ে দিয়েছি, যাতে হয়তো তারা শরিয়তের বিধান মানতে বাধ্য হবে, অথবা তাদেরকে পাহাড়ের নিচে পিষে মারা হবে। আমি তাদেরকে আরো নির্দেশ দিয়েছিলাম যে, তারা যখন 'ইলইয়া' শহরের দ্বারদেশে উপনীত হবে, তখন অত্যন্ত বিনয়ের সাথে আল্লাহর আনুগত্যের প্রেরণায় অনুপ্রাণিত অন্তরে অবনত মস্তকে শহরে প্রবেশ করবে। আমি আরো জানিয়ে দিয়েছিলাম যে, শনিবার দিন মৎস শিকার করবে না। এসব তোমাদের প্রতি আমার নির্দেশ। অতএব এগুলো লঙ্ঘন করো না। এভাবে আমি তাদের থেকে দৃঢ় শপথ গ্রহণ নিয়েছিলাম কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল, তারা একে একে প্রত্যেকটি নির্দেশ অমান্য করেছে, অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছে। অতএব, আমি দুনিয়াতেও তাদেরকে লাঞ্ছিত করেছি এবং আখেরাতেও তাদের নিকৃষ্টতর শাস্তি ভোগ করতে হবে।

শব্দের বিশ্লেষণ :

تُبْدُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِبْدَاءُ মূলবর্ণ (ب . د . ا) জিনস مهموز لام অর্থ– তোমরা প্রকাশ কর।

اُجُوْرٌ : শব্দটি বহুবচন, একবচন اَجْرٌ অর্থ– হক, বদলা।

اَرِنَا : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِرَاءَةُ মূলবর্ণ (ر . أ . ى) জিনস মুরাক্কাব مهموز عين و ناقص يائى অর্থ– তুমি দেখাও।

سُجَّدًا : শব্দটি বহুবচন, একবচন سَاجِدٌ অর্থ– সেজদাকারীগণ।

لَاتَعْدُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ نهى حاضر معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْعُدْوَانُ মূলবর্ণ (ع . د . و) জিনস ناقص يائى অর্থ– তোমরা সীমালঙ্ঘন করো না।

مِيْثَاقًا : শব্দটি একবচন, বহুবচন مَوَاثِيْقُ অর্থ– দৃঢ় অঙ্গীকার।

www.almodina.com

অনুবাদ	আয়াত
অনুবাদ : (১৫৫) অনন্তর আমি তাদেরকে শাস্তিতে নিপতিত করলাম তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গের দরুন এবং আল্লাহর আয়াতসমূহের সাথে কুফরি করার দরুন, এবং তাদের অন্যায়ভাবে নবীদেরকে হত্যা করার দরুন এবং তাদের উক্তির দরুন যে, আমাদের অন্তরসমূহ সংরক্ষিত; বরং তাদের কুফরির দরুন অন্তরসমূহে আল্লাহ মহর মেরে দিয়েছেন সুতরাং তাদের মধ্যে ঈমান নেই, হ্যাঁ, খুবই সামান্য। [যা গ্রহণযোগ্য নয়, কাজেই তারা কাফের]	فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِّيْثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَقَتْلِهِمُ الْاَنْۢبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَّقَوْلِهِمْ قُلُوْبُنَا غُلْفٌ ؕ بَلْ طَبَعَ اللّٰهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوْنَ اِلَّا قَلِيْلًا ﴿۱۵۵﴾
(১৫৬) আর তাদের কুফরির দরুন এবং মারাইয়ামের প্রতি গুরুতর অপবাদ আরোপ করার দরুন।	وَّبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلٰى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيْمًا ﴿۱۵۶﴾
(১৫৭) আর তাদের এই উক্তির দরুন যে, আমরা হত্যা করেছি মসীহ ঈসা ইবনে মারাইয়ামকে যিনি আল্লাহর রাসূল ছিলেন, অথচ তারা তাঁকে হত্যাও করেনি, এবং তাঁকে শূলেও চড়ায়নি, পরন্তু তারা সন্দেহে পতিত হয়েছিল, আর যারা তাঁর সম্বন্ধে মতবিরোধ করে নিশ্চয় তারা ভ্রান্ত ধারণায় রয়েছে, তাদের নিকট তারপর কোনো প্রমাণ নেই, আনুমানিক বিষয়ের অনুসরণ ব্যতীত, আর নিশ্চিত সত্য যে, তারা তাঁকে হত্যা করেনি।	وَّقَوْلِهِمْ اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيْحَ عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ۚ وَمَا قَتَلُوْهُ وَمَا صَلَبُوْهُ وَلٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ ؕ وَاِنَّ الَّذِيْنَ اخْتَلَفُوْا فِيْهِ لَفِيْ شَكٍّ مِّنْهُ ؕ مَا لَهُمْ بِهٖ مِنْ عِلْمٍ اِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ ۚ وَمَا قَتَلُوْهُ يَقِيْنًا ﴿۱۵۷﴾

শাব্দিক অনুবাদ

(১৫৫) فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِّيْثَاقَهُمْ অনন্তর আমি তাদেরকে শাস্তিতে নিপতিত করলাম তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গের দরুন وَكُفْرِهِمْ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ এবং আল্লাহর আয়াতসমূহের সাথে কুফরি করার দরুন وَقَتْلِهِمُ الْاَنْۢبِيَآءَ এবং তাদের নবীদেরকে হত্যা করার দরুন بِغَيْرِ حَقٍّ অন্যায়ভাবে وَّقَوْلِهِمْ এবং তাদের উক্তির দরুন যে قُلُوْبُنَا غُلْفٌ আমাদের অন্তরসমূহ সংরক্ষিত بَلْ طَبَعَ اللّٰهُ عَلَيْهَا বরং তাদের অন্তরসমূহে আল্লাহ মহর মেরে দিয়েছেন بِكُفْرِهِمْ কুফরির দরুন فَلَا يُؤْمِنُوْنَ اِلَّا قَلِيْلًا সুতরাং তাদের মধ্যে ঈমান নেই, হ্যাঁ, খুবই সামান্য।

(১৫৬) وَّبِكُفْرِهِمْ আর তাদের কুফরির দরুন وَقَوْلِهِمْ عَلٰى مَرْيَمَ এবং মারাইয়ামের প্রতি আরোপ করার দরুন بُهْتَانًا عَظِيْمًا গুরুতর অপবাদ।

(১৫৭) وَّقَوْلِهِمْ আর তাদের এই উক্তির দরুন যে اِنَّا قَتَلْنَا আমরা হত্যা করেছি الْمَسِيْحَ عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ মসীহ ঈসা ইবনে মারাইয়ামকে رَسُوْلَ اللّٰهِ যিনি আল্লাহর রাসূল ছিলেন وَمَا قَتَلُوْهُ অথচ তারা তাঁকে হত্যাও করেনি وَمَا صَلَبُوْهُ এবং তাঁকে শূলেও চড়ায়নি وَلٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ পরন্তু তারা সন্দেহে পতিত হয়েছিল وَاِنَّ الَّذِيْنَ اخْتَلَفُوْا فِيْهِ আর যারা তাঁর সম্বন্ধে মতবিরোধ করে لَفِيْ شَكٍّ مِّنْهُ নিশ্চয় তারা ভ্রান্ত ধারণায় রয়েছে مَا لَهُمْ بِهٖ مِنْ عِلْمٍ তাদের নিকট তারপর কোনো প্রমাণ নেই اِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ আনুমানিক বিষয়ের অনুসরণ ব্যতীত وَمَا قَتَلُوْهُ يَقِيْنًا আর নিশ্চিত সত্য যে, তারা তাঁকে হত্যা করেনি।

www.almodina.com

অনুবাদ : (১৫৮) বরং আল্লাহ তাঁকে নিজের দিকে [আসমানে সশরীরে] উঠিয়ে নিয়েছেন, আর আল্লাহ তা'আলা মহা পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।	بَلْ رَّفَعَهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا (١٥٨)
(১৫৯) আর আহলে কিতাব [ইহুদিদের মধ্য] হতে কেউ [অবশিষ্ট] থাকবে না কিন্তু সে স্বীয় মৃত্যুর পূর্বক্ষণে [যখন আলমে বরযখ দৃষ্টিগোচর হবে] অবশ্যই ঈসাকে স্বীকার করবে, আর কিয়ামত দিবসে তিনি তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করবেন।	وَاِنْ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهٖ قَبْلَ مَوْتِهٖ ۚ وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ يَكُوْنُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا (١٥٩)
(১৬০) অনন্তর ইহুদিদের এ সমস্ত বড় বড় অপরাধের দরুন, আমি তাদের জন্য বহু পবিত্র বস্তু হারাম করে দিয়েছি যা তাদের জন্য হালাল ছিল, আর এ কারণে [ও-] যে, তারা বহু লোককে আল্লাহর পথ হতে বিরত রাখত।	فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبٰتٍ اُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَثِيْرًا (١٦٠)
(১৬১) এবং এ জন্য যে, তারা সুদ গ্রহণ করত, অথচ তাদেরকে তা হতে নিষেধ করা হয়েছিল, আর এই জন্য [-ও] যে, তারা মানুষের ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করত, এবং আমি তাদের মধ্যে যারা কাফের তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি।	وَّاَخْذِهِمُ الرِّبٰوا وَقَدْ نُهُوْا عَنْهُ وَاَكْلِهِمْ اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ؕ وَاَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ مِنْهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا (١٦١)

শাব্দিক অনুবাদ

(১৫৮) بَلْ رَّفَعَهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ **বরং আল্লাহ তাঁকে নিজের দিকে উঠিয়ে নিয়েছেন** وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا আর আল্লাহ তা'আলা **মহা পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।**

(১৫৯) وَاِنْ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ আর আহলে কিতাব হতে কেউ থাকবে না اِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهٖ قَبْلَ مَوْتِهٖ কিন্তু সে স্বীয় মৃত্যুর পূর্বক্ষণে অবশ্যই ঈসাকে স্বীকার করবে وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ আর কিয়ামত দিবসে يَكُوْنُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا তিনি তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করবেন।

(১৬০) فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا **অনন্তর ইহুদিদের** এ সমস্ত বড় বড় অপরাধের দরুন حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبٰتٍ আমি তাদের জন্য বহু পবিত্র বস্তু হারাম করে দিয়েছি اُحِلَّتْ لَهُمْ যা তাদের জন্য হালাল ছিল وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَثِيْرًا আর এ কারণে যে, তারা বহু লোককে আল্লাহর পথ হতে বিরত রাখত।

(১৬১) وَّاَخْذِهِمُ الرِّبٰوا এবং এ জন্য যে, তারা সুদ গ্রহণ করত وَقَدْ نُهُوْا عَنْهُ অথচ তাদেরকে তা হতে নিষেধ করা হয়েছিল وَاَكْلِهِمْ اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ আর এই জন্য যে, তারা মানুষের ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করত وَاَعْتَدْنَا এবং আমি প্রস্তুত করে রেখেছি لِلْكٰفِرِيْنَ مِنْهُمْ তাদের মধ্যে যারা কাফের তাদের জন্য عَذَابًا اَلِيْمًا যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

لٰكِنِ الرّٰسِخُوْنَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُوْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيْمِيْنَ الصَّلٰوةَ وَالْمُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَالْمُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ اُولٰٓئِكَ سَنُؤْتِيْهِمْ اَجْرًا عَظِيْمًا (١٦٢)

ع ٢٢/٢

অনুবাদ : (১৬২) কিন্তু তাদের মধ্যে যারা [ধর্ম-] জ্ঞানে [ও আমলে] পরিপক্ক এবং [তাদের মধ্যে] যারা ঈমান আনয়নকারী– ঈমান আনে আপনার প্রতি অবতারিত কিতাবের উপর এবং ঐ কিতাবের উপরও যা আপনার পূর্বে অবতারিত হয়েছে এবং যারা রীতিমতো নামাজ আদায়কারী এবং যারা জাকাত প্রদানকারী এবং যারা আল্লাহর প্রতি ও কিয়ামত দিবসের প্রতি বিশ্বাসী, এরূপ লোকদেরকে আমি অবশ্যই মহান পুরস্কার প্রদান করব।

শাব্দিক অনুবাদ

(১৬২) لٰكِنِ الرّٰسِخُوْنَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ কিন্তু তাদের মধ্যে যারা জ্ঞানে পরিপক্ক وَالْمُؤْمِنُوْنَ এবং যারা ঈমান আনয়নকারী– يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ **ঈমান আনে** আপনার প্রতি অবতারিত কিতাবের উপর وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ এবং ঐ কিতাবের উপরও যা আপনার পূর্বে অবতারিত হয়েছে وَالْمُقِيْمِيْنَ الصَّلٰوةَ এবং যারা রীতিমতো নামাজ আদায়কারী وَالْمُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ এবং যারা জাকাত প্রদানকারী وَالْمُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ এবং যারা আল্লাহর প্রতি ও কিয়ামত দিবসের প্রতি বিশ্বাসী اُولٰٓئِكَ سَنُؤْتِيْهِمْ اَجْرًا عَظِيْمًا এরূপ লোকদেরকে আমি অবশ্যই মহান পুরস্কার প্রদান করব।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(১৬২) قوله لٰكِنِ الرّٰسِخُوْنَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** দালায়েল নামক গ্রন্থে ইবনে ইসহাক হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বরাত দিয়ে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আলোচ্য আয়াত আব্দুল্লাহ বিন সালাম, উসাইদ বিন শুবা ও ছা'লাবা বিন শুবা সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। তারা যখন ইহুদিদেরকে বর্জন করে ইসলাম গ্রহণ করেন, তখন আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[ফাতহুল কাদীর : ৫৩৯/১, রূহুল মা'আনী : ১৪/৩/৬]

সূরা আলে ইমরানে يٰعِيْسٰٓى اِنِّيْ مُتَوَفِّيْكَ وَرَافِعُكَ اِلَيَّ আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা দুশমন ইহুদিদের দুরভিসন্ধি বানচাল করে তাদের কবল থেকে হযরত ঈসা (আ.)-কে হেফাজত করা প্রসঙ্গে পাঁচটি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। যার বিস্তারিত ব্যাখ্যা সূরা আলে-ইমরানের তাফসীরে বর্ণনা করা হয়েছে। তন্মধ্যে অন্যতম ওয়াদা ছিল তাঁকে হত্যা করার কোনো সুযোগ ইহুদিদেরকে দেওয়া হবে না; বরং আল্লাহ তা'আলা তাঁকে নিজের কাছে তুলে নিবেন। সূরায়ে নিসার আলোচ্য আয়াতে ইহুদিদের দুষ্কর্মের বর্ণনার সাথে সাথে আল্লাহ প্রদত্ত ওয়াদা বাস্তবায়নের কথা উল্লেখ করে হযরত ঈসা (আ.)-এর হত্যা সংক্রান্ত ইহুদিদের মিথ্যা দাবি খণ্ডন করা হয়েছে। এখানে স্পষ্ট ঘোষণা করা হয়েছে যে, وَمَا قَتَلُوْهُ وَمَا صَلَبُوْهُ অর্থাৎ তারা হযরত ঈসা (আ.)-কে হত্যাও করতে পারেনি, শূলেও চড়াতে পারেনি; বরং আসলে তারা সন্দেহে পতিত হয়েছিল।

সন্দেহ কিভাবে সৃষ্টি হয়েছিল : وَلٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ-এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ইমামে তাফসীর হযরত যাহহাক (র.) বলেন ইহুদিরা যখন হযরত ঈসা (আ.)-কে হত্যা করতে বদ্ধপরিকর হলো, তখন তাঁর ভক্ত সহচরবৃন্দ এক স্থানে সমবেত হলেন। হযরত ঈসা (আ.) ও সেখানে উপস্থিত হলেন। শয়তান ইবলিস তখন রক্তপিপাসু ইহুদি ঘাতকদের কে হযরত ঈসা (আ.)-এর অবস্থানের ঠিকানা জানিয়ে দিল। চার হাজার ইহুদি দুরাচার একযোগে গৃহ অবরোধ করল। তখন হযরত ঈসা (আ.) স্বীয় ভক্ত অনুচরগণকে সম্বোধন করে বললেন, তোমাদের মধ্যে কেউ অত্র গৃহ হতে বর্হিগত ও নিহত হতে এবং পরকালে জান্নাতে আমার সাথি হতে প্রস্তুত আছো কি? জনৈক ভক্ত আত্মোৎসর্গের জন্য উঠে দাঁড়ালেন। হযরত ঈসা (আ.) নিজের

www.almodina.com

জামা ও পাগড়ি তাঁকে পরিধান করালেন। অতঃপর তাকে হযরত ঈসা (আ.)-এর সাদৃশ্য করে দেওয়া হলো। যখন তিনি গৃহ থেকে বর্হিগত হলেন, তখন ইহুদিরা হযরত ঈসা (আ.) মনে করে তাঁকে বন্দী করে নিয়ে গেল এবং শূলে চড়িয়ে হত্যা করল। অপরদিকে হযরত ঈসা (আ.)-কে আল্লাহ তা'আলা আসমানে তুলে নিলেন। –[তাফসীরে কুরতুবী]

অন্য এক বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, ইহুদিরা 'তায়তালানুস' নামক জনৈক নরাধমকে সর্বপ্রথম হযরত ঈসা (আ.)-কে হত্যা করার জন্য পাঠিয়েছিল। কিন্তু ইতঃপূর্বে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে আসমানে তুলে নেওয়ায় সে তাঁর নাগাল পেল না; বরং ইতোমধ্যে তার নিজের চেহারা হযরত ঈসা (আ.)-এর মতো হয়ে গেল। ব্যর্থ মনোরথ হয়ে সে যখন গৃহ থেকে বেরিয়ে এল তখন অন্যান্য ইহুদিরা তাকেই হযরত ঈসা (আ.) মনে করে পাকড়াও করল এবং শূলে বিদ্ধ করে হত্যা করল। –[তাফসীরে মাযহারী]

উপরিউক্ত বর্ণনাদ্বয়ের মধ্যে যে কোনোটিই সত্য হতে পারে। কুরআনে কারীম এ সম্পর্কে স্পষ্ট কিছু ব্যক্ত করেনি। অতএব, প্রকৃত ঘটনার সঠিক খবর একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই ভালো জানেন। অবশ্য কুরআন পাকের আয়াত ও তার তাফসীর সংক্রান্ত রেওয়ায়েত সমন্বয়ে সিদ্ধান্ত করা যায় যে, প্রকৃত ঘটনা ইহুদি-খ্রিস্টানদেরও অজ্ঞাত ছিল। তারা চরম বিভ্রান্তির আবর্তে নিক্ষিপ্ত হয়ে শুধু অনুমান করে বিভিন্ন উক্তি ও দাবি করেছিল। ফলে উপস্থিত লোকদের মধ্যেই চরম মতভেদ ও বিবাদের সৃষ্টি হয়েছিল। তাই পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে :

وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ ۚ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ ۚ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا

অর্থাৎ. যারা হযরত ঈসা (আ.) সম্পর্কে নানা মতভেদ করে নিশ্চয় এ ব্যাপারে তারা সন্দেহে পতিত হয়েছে। তাদের কাছে এ সম্পর্কে কোনো সত্যনির্ভর জ্ঞান নেই। তারা শুধু অনুমান করে কথা বলে। আর তারা যে হযরত ঈসা (আ.)-কে হত্যা করেনি, একথা সুনিশ্চিত; বরং আল্লাহ তা'আলা তাঁকে নিরাপদে নিজের কাছে তুলে নিয়েছেন।'

কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে যে, সম্বিত ফিরে পাওয়ার পর কিছু লোক বলল, আমরা তো নিজেদের লোককেই হত্যা করে ফেলেছি। কেননা, নিহত ব্যক্তির মুখমণ্ডল হযরত ঈসা (আ.)-এর মতো হলেও তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অন্য রকম। তদুপরি এ ব্যক্তি যদি ঈসা (আ.) হয়, তবে আমাদের প্রেরিত লোকটি গেল কোথায়? আর এ ব্যক্তি আমাদের হলে হযরত ঈসা (আ.)–ই বা কোথায় গেলেন?

وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا অর্থাৎ, আল্লাহ জাল্লাশানুহু পরাক্রমশালী, রহস্যজ্ঞানী।' ইহুদিরা হযরত ঈসা (আ.)-কে হত্যা করার যত ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তই করুক না কেন, সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলা প্রজ্ঞাময়, যখন তাঁর হেফাজতের নিশ্চয়তা দিয়েছেন তখন তাঁর অসীম কুদরত ও অপার হেকমতের সামনে ওদের অপচেষ্টার কি মূল্য আছে? আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রতিটি কাজের নিগুঢ় রহস্য বিদ্যমান রয়েছে। জড়পূজারী বস্তুবাদীরা যদি হযরত ঈসা (আ.)–কে সশরীরে আসমানে উত্তোলনের সত্যটুকু উপলব্ধি করতে না পারে, তবে তা তাদেরই দুর্বলতার প্রমাণ।

পরিশেষে এ প্রসঙ্গটির উপসংহার টেনে বলা হয়েছে– وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ

অর্থাৎ, ইহুদিরা ঈর্ষা, বিদ্বেষ ও শত্রুতার কারণে তাৎক্ষণিকভাবে যদিও নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে চিন্তা করে না এবং হযরত ঈসা (আ.) সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করে, এমনকি হযরত মুহাম্মদ ﷺ–এর নবুয়তকে অস্বীকার করে, কিন্তু তাদের মৃত্যুর পূর্বে এমন এক সময় আসবে, যখন তাদের দৃষ্টির সম্মুখে সত্য উন্মোচিত হবে, তখন তারা যথার্থই বুঝতে পারবে যে, হযরত ঈসা (আ.) ও হযরত মুহাম্মদ ﷺ সম্পর্কে তাদের ধারণা একান্তই ভ্রান্তিপূর্ণ ছিল।

অত্র আয়াতের مَوْتِهِ অর্থাৎ, 'তার মৃত্যুর পূর্বে' শব্দে ইহুদিদের মৃত্যুর দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। এমতাবস্থায় অত্র আয়াতের তাফসীর এই যে, প্রত্যেক ইহুদিই তার অন্তিম মূহূর্তে যখন পরকালের দৃশ্যাবলি অবলোকন করবে, তখন হযরত ঈসা (আ.)-এর নবুয়তের সত্যতা ও নিজেদের বাতুলতা উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে এবং তার প্রতি ঈমান আনয়ন করতে বাধ্য হবে। কিন্তু তখনকার ঈমান তাদের আদৌ কোনো উপকারে আসবে না; যেমন লোহিত সাগরে ডুবে মরার সময় ফেরাউনের ঈমান ফলপ্রসূ হয়নি।

দ্বিতীয় তাফসীর যা সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীগণের বিপুল জামাত কর্তৃক গৃহীত এবং সহীহ হাদীস দ্বারা সমর্থিত হয়েছে, তা হলো مَوْتِهِ 'তার মৃত্যু' শব্দের সর্বনামে হযরত ঈসা (আ.)-এর মৃত্যু বুঝানো হয়েছে। এমতাবস্থায় অত্র আয়াতের তাফসীর হলো : আহলে কিতাবরা এখন যদিও হযরত ঈসা (আ.)-এর প্রতি সত্যিকার ঈমান আনে না, ইহুদিরা তো তাঁকে নবী বলে স্বীকারই করত না; বরং ভণ্ড, মিথ্যাবাদী ইত্যাকার আপত্তিকর বিশেষণে ভূষিত করত। (নাউযুবিল্লাহি মিন

যালিকা)। অপর দিকে খ্রিস্টানরা যদিও ঈসা মসীহ (আ.)-কে ভক্তি ও মান্য করার দাবিদার; কিন্তু তাদের মধ্যে একদল ইহুদিদের মতোই হযরত ঈসা (আ.)-এর ক্রুশ বিদ্ধ হওয়ার এবং মৃত্যুবরণ করার কথায় স্বীকৃতি প্রদান করে চরম মূর্খতার পরিচয় দিচ্ছে। তাদের আরেক দল অতিভক্তি দেখাতে গিয়ে হযরত ঈসা (আ.)–কে আল্লাহ বা আল্লার পুত্র বলে ধারণা করে বসেছে। কুরআনে পাকের এই আয়াতে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে যে, ইহুদি ও খ্রিস্টানরা বর্তমানে যদিও হযরত ঈসা (আ.)-এর প্রতি যথাযথ ঈমান রাখে না; বরং শৈথিল্য বা বাড়াবাড়ি করে, কিন্তু কিয়ামতের অতি নিকটবর্তী যুগে তিনি যখন পুনরায় পৃথিবীতে অবতরণ করবেন, তখন এরাও তাঁর প্রতি পুরাপুরি ঈমান আনয়ন করবে। খ্রিস্টানরা মুসলমানদের মতো সহীহ আকিদা ও বিশ্বাসের সাথে ঈমানদার হবে। ইহুদিদের মধ্যে যারা তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করবে, তাদেরকে নিধন ও নিশ্চিহ্ন করা হবে, অবশিষ্টরা ইসলাম গ্রহণ করবে। তখন সমগ্র দুনিয়া থেকে সর্ব প্রকার কুফরি ধ্যান-ধারণা, আচার-অনুষ্ঠান উৎক্ষিপ্ত হয়ে যাবে; সর্বত্র ইসলামের একচ্ছত্র প্রাধান্য কায়েম হবে। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন–

عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ قَالَ لَيَنْزِلَنَّ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا عَدْلًا فَلَيَقْتُلَنَّ الرِّجَالَ وَلَيَقْتُلَنَّ الْخِنْزِيْرَ وَلَيَكْسِرَنَّ الصَّلِيْبَ وَتَكُوْنُ السَّجْدَةُ وَاحِدَةً لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ- ثُمَّ قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ ﷺ وَاقْرَؤُوا اِنْ شِئْتُمْ وَاِنْ مِّنْ اَهْلِ الْكِتَابِ اِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهٖ قَبْلَ مَوْتِهٖ قَالَ اَبُوْهُرَيْرَةَ ﷺ قَبْلَ مَوْتِ عِيْسٰى يُعِيْدُهَا ثَلَا مَرَّاتٍ - (قُرْطُبِيْ) অর্থাৎ 'হযরত ঈসা ইবনে মারইয়াম (আ.) একজন ন্যায়পরায়ণ শাসক রূপে অবশ্যই অবতরণ করবেন। তিনি দাজ্জালকে হত্যা করবেন, শুকর নিধন করবেন এবং ক্রুশকে চুরমার করবেন। তখন একমাত্র পরোয়ারদেগার আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করা হবে। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) আরো বলেন– তোমরা ইচ্ছা করলে এখানে কুরআনে পাকের এ আয়াত পাঠ করতে পার যাতে বলা হয়েছে– "আহলে কিতাবদের মধ্যে কেউ অবশিষ্ট থাকবে না; বরং তারা তাঁর মৃত্যুর পূর্বে অবশ্যই তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে।" হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন : এর অর্থ– 'হযরত ঈসা (আ.)-এর মৃত্যুর পূর্বে।' এ বাক্যটি তিনি তিন বার উচ্চারণ করেন। –[তাফসীরে কুরতুবী]

ইসলামি শরিয়তেও কোনো কোনো দ্রব্য পানাহার করা হারাম ঘোষিত হয়েছে। তবে তা শারিরীক বা আধ্যাত্মিক ক্ষতিকর হওয়ার কারণে। পক্ষান্তরে ইহুদিদের জন্য কোনো দৈহিক বা আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে ক্ষতিকর হওয়ার কারণে পবিত্র দ্রব্য হারাম করা হয়নি; বরং তাদের অবাধ্যতার শাস্তিরূপে সেগুলো হারাম করা হয়েছিল।

لٰكِنِ الرّٰسِخُوْنَ فِى الْعِلْمِ الخ আয়াতে কতিপয় মহান ব্যক্তির জন্য যে বিপুল প্রতিদানের আশ্বাস দেওয়া হয়েছে তা তাঁদের ঈমান ও সকর্মের কারণে। অন্যথা শুধু জরুরি আকীদা বিশ্বাসকে সংশোধনের উপরই আখেরাতের মুক্তি নির্ভরশীল। তবে অবশ্যই ঈমানের সাথে মৃত্যুর সৌভাগ্য হতে হবে।

শাব্দিক অনুবাদ :

مَا صَلَبُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ نفى فعل ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلصَّلْبُ মূলবর্ণ (ص ـ ل ـ ب) জিনস صحيح অর্থ– তারা শূলে চড়ায়নি।

شُبِّهَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ فعل ماضى مجهول বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّشْبِيْهُ মূলবর্ণ (ش ـ ب ـ ه) জিনস صحيح অর্থ– তাকে সংশয়াবিষ্ট করা হয়েছে।

هَادُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ فعل ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْهَوْدُ মূলবর্ণ (ه ـ و ـ د) জিনস اجوف واوى অর্থ– যারা ইহুদি হয়ে গেছে।

اَعْتَدْنَا : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِعْتَادُ মূলবর্ণ (ع ـ ت ـ د) জিনস ناقص واوى অর্থ– আমরা প্রস্তুত করে রেখেছি।

مُؤْتُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِيْتَاءُ মূলবর্ণ (ا ـ ت ـ ى) জিনস মুরাক্কাব مهموز فاء و ناقص يائى অর্থ– প্রদানকারীগণ।

إِنَّآ أَوۡحَيۡنَآ إِلَيۡكَ كَمَآ أَوۡحَيۡنَآ إِلَىٰ نُوحٖ وَٱلنَّبِيِّـۧنَ مِنۢ بَعۡدِهِۦۚ وَأَوۡحَيۡنَآ إِلَىٰٓ إِبۡرَٰهِيمَ وَإِسۡمَٰعِيلَ وَإِسۡحَٰقَ وَيَعۡقُوبَ وَٱلۡأَسۡبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَٰرُونَ وَسُلَيۡمَٰنَۚ وَءَاتَيۡنَا دَاوُۥدَ زَبُورٗا (١٦٣)

অনুবাদ : (১৬৩) আমি আপনার প্রতি ওহী প্রেরণ করেছি, যেমন প্রেরণ করেছিলাম নূহের প্রতি এবং তাঁর পরে অন্যান্য নবীগণের প্রতি [-ও প্রেরণ করেছিলাম], এবং আমি ওহী প্রেরণ করেছিলাম ইবরাহীম ও ইসমাঈল ও ইসহাক ও ইয়াকূব এবং ইয়াকূবের বংশধর এবং ঈসা ও আইয়ূব ও ইউনুস ও হারূন এবং সুলায়মানের প্রতি, আর [এমনিভাবে] আমি দাউদকে যাবূর প্রদান করেছিলাম।

وَرُسُلٗا قَدۡ قَصَصۡنَٰهُمۡ عَلَيۡكَ مِن قَبۡلُ وَرُسُلٗا لَّمۡ نَقۡصُصۡهُمۡ عَلَيۡكَۚ وَكَلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكۡلِيمٗا (١٦٤)

(১৬৪) এবং এরূপ নবীদের প্রতি ওহী প্রেরণ করেছিলাম, যাদের অবস্থা ইতঃপূর্বে আমি আপনার নিকট বর্ণনা করেছি এবং এরূপ নবীদের প্রতিও যাদের অবস্থা আমি আপনার নিকট [এখনো] বর্ণনা করিনি, আর মূসার সাথে আল্লাহ বিশেষ ধরনের কথা বলেছেন।

رُّسُلٗا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةُۢ بَعۡدَ ٱلرُّسُلِۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمٗا (١٦٥)

(১৬৫) তাঁদেরকে সুসংবাদ প্রদানকারী এবং ভয় প্রদর্শনকারী নবী করে এজন্য প্রেরণ করেছি, যেন এই পয়গম্বরদের পর আল্লাহর সম্মুখে মানুষের নিকট কোনো ওজর [বাহ্যিক দৃষ্টিতেও] বাকি না থাকে, আর আল্লাহ পূর্ণ ক্ষমতাবান, বড়ই প্রজ্ঞাময়।

শাব্দিক অনুবাদ

(১৬৩) إِنَّآ أَوۡحَيۡنَآ إِلَيۡكَ আমি আপনার প্রতি ওহী প্রেরণ করেছি كَمَآ أَوۡحَيۡنَآ যেমন প্রেরণ করেছিলাম إِلَىٰ نُوحٖ وَٱلنَّبِيِّـۧنَ مِنۢ بَعۡدِهِۦ নূহের প্রতি এবং তাঁর পরে অন্যান্য নবীগণের প্রতি وَأَوۡحَيۡنَآ এবং আমি ওহী প্রেরণ করেছিলাম إِلَىٰٓ إِبۡرَٰهِيمَ وَإِسۡمَٰعِيلَ ইবরাহীম ও ইসমাঈল وَإِسۡحَٰقَ وَيَعۡقُوبَ ও ইসহাক ও ইয়াকূব وَٱلۡأَسۡبَاطِ وَعِيسَىٰ ও ইয়াকূবের বংশধর এবং ঈসা وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ ও আইয়ূব এবং ইউনুস وَهَٰرُونَ وَسُلَيۡمَٰنَ ও হারূন এবং সুলায়মানের প্রতি وَءَاتَيۡنَا دَاوُۥدَ زَبُورٗا আর আমি দাউদকে যাবূর প্রদান করেছিলাম।

(১৬৪) وَرُسُلٗا قَدۡ قَصَصۡنَٰهُمۡ عَلَيۡكَ এবং এরূপ নবীদের প্রতি ওহী প্রেরণ করেছিলাম, যাদের অবস্থা আমি আপনার নিকট বর্ণনা করেছি مِن قَبۡلُ ইতঃপূর্বে وَرُسُلٗا لَّمۡ نَقۡصُصۡهُمۡ عَلَيۡكَ এবং এরূপ নবীদের প্রতিও যাদের অবস্থা আমি আপনার নিকট বর্ণনা করিনি وَكَلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكۡلِيمٗا আর মূসার সাথে আল্লাহ বিশেষ ধরনের কথা বলেছেন।

(১৬৫) رُّسُلٗا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ তাঁদেরকে সুসংবাদ প্রদানকারী এবং ভয় প্রদর্শনকারী নবী করে এইজন্য প্রেরণ করেছি لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ যেন মানুষের নিকট বাকি না থাকে عَلَى ٱللَّهِ আল্লাহর সম্মুখে حُجَّةُۢ بَعۡدَ ٱلرُّسُلِ এই পয়গম্বরদের পর কোনো ওজর وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمٗا আর আল্লাহ পূর্ণ ক্ষমতাবান, বড়ই প্রজ্ঞাময়।

www.almodina.com

لٰكِنِ اللّٰهُ يَشْهَدُ بِمَآ اَنْزَلَ اِلَيْكَ اَنْزَلَهٗ بِعِلْمِهٖ ۚ وَالْمَلٰٓئِكَةُ يَشْهَدُوْنَ ۚ وَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا (١٦٦)

অনুবাদ : (১৬৬) কিন্তু আল্লাহ তা'আলা সাক্ষ্য প্রদান করছেন ঐ কিতাবের মাধ্যমে যা আপনার নিকট প্রেরণ করেছেন, এবং প্রেরণও করেছেন স্বীয় জ্ঞানের পূর্ণতার সাথে এবং ফেরেশতাগণ [-ও নবুয়তের] সত্যতা স্বীকার করছেন, আর আল্লাহ তা'আলার সাক্ষ্যই যথেষ্ট।

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ قَدْ ضَلُّوْا ضَلٰلًا ۢ بَعِيْدًا (١٦٧)

(১৬৭) যারা অমান্যকারী হয় এবং আল্লাহর ধর্ম হতে প্রতিরোধ করে, তারা তো দূরতর ভ্রান্তিতে উপনীত হলো।

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَظَلَمُوْا لَمْ يَكُنِ اللّٰهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيْقًا (١٦٨)

(১৬৮) নিঃসন্দেহে যারা অমান্যকারী হয় এবং অন্যেরও অনিষ্ট করে , আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে কদাচ ক্ষমা করবেন না এবং তাদেরকে কোনো পথ দেখাবেন না।

اِلَّا طَرِيْقَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ؕ وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرًا (١٦٩)

(১৬৯) জাহান্নামের পথ ব্যতীত, এরূপে যে, তারা তাতে অনন্তকাল অবস্থান করবে, আর আল্লাহর নিকট এই শাস্তি প্রদান খুবই সহজ।

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَكُمُ الرَّسُوْلُ بِالْحَقِّ مِنْ رَّبِّكُمْ فَاٰمِنُوْا خَيْرًا لَّكُمْ ؕ وَاِنْ تَكْفُرُوْا فَاِنَّ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا (١٧٠)

(১৭০) হে মানবগণ! এই রাসূল তোমাদের নিকট তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে সত্য বাণীসহ আগমন করেছেন, সুতরাং তোমরা দৃঢ় বিশ্বাস রাখ, [তা] তোমাদের জন্য উত্তম হবে, আর যদি কাফের থাক, তবে নিশ্চয় আল্লাহরই স্বত্বে রয়েছে যা কিছু আসমানসমূহে ও জমিনে আছে, আর আল্লাহ [তাদের ঈমান ও কুফরের] পূর্ণ খবর রাখেন [ও] প্রজ্ঞাময়।

শাব্দিক অনুবাদ :

(১৬৬) لٰكِنِ اللّٰهُ يَشْهَدُ কিন্তু আল্লাহ তা'আলা সাক্ষ্য প্রদান করতেছেন بِمَآ اَنْزَلَ اِلَيْكَ ঐ কিতাবের মাধ্যমে যা আপনার নিকট প্রেরণ করেছেন اَنْزَلَهٗ بِعِلْمِهٖ এবং প্রেরণও করেছেন স্বীয় জ্ঞানের পূর্ণতার সাথে وَالْمَلٰٓئِكَةُ يَشْهَدُوْنَ এবং ফেরেশতাগণ সত্যতা স্বীকার করতেছেন। وَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا আর আল্লাহ তা'আলার সাক্ষ্যই যথেষ্ট।

(১৬৭) اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا যারা অমান্যকারী হয় وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ এবং আল্লাহর ধর্ম হতে প্রতিরোধ করে। قَدْ ضَلُّوْا ضَلٰلًا بَعِيْدًا তারা তো দূরতর ভ্রান্তিতে উপনীত হলো।

(১৬৮) اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا নিঃসন্দেহে যারা অমান্যকারী হয়। وَظَلَمُوْا এবং অন্যেরও অনিষ্ট করে لَمْ يَكُنِ اللّٰهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে কদাচ ক্ষমা করবেন না وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيْقًا এবং তাদেরকে কোনো পথ দেখাবেন না।

(১৬৯) اِلَّا طَرِيْقَ جَهَنَّمَ জাহান্নামের পথ ব্যতীত এরূপে যে خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا তারা তাতে অনন্তকাল অবস্থান করবে وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرًا আর আল্লাহর নিকট এই শাস্তি প্রদান খুবই সহজ।

(১৭০) يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ হে মানবগণ! قَدْ جَآءَكُمُ الرَّسُوْلُ এই রাসূল তোমাদের নিকট আগমন করেছেন بِالْحَقِّ সত্য বাণীসহ مِنْ رَّبِّكُمْ তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে। فَاٰمِنُوْا সুতরাং তোমরা দৃঢ় বিশ্বাস রাখ خَيْرًا لَّكُمْ তোমাদের জন্য উত্তম হবে وَاِنْ تَكْفُرُوْا আর যদি কাফের থাক فَاِنَّ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ তবে নিশ্চয় আল্লাহরই স্বত্বে রয়েছে যা কিছু আসমানসমূহে ও জমিনে আছে وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا আর আল্লাহ পূর্ণ খবর রাখেন [ও] প্রজ্ঞাময়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(১৭৩) قوله إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** ইবনে ইসহাক, ইবনে জারীর, ইবনুল মুনযির ও বায়হাকী দালায়েল গ্রন্থে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বরাত দিয়ে বর্ণনা করেন, কোনো কোনো [সাকিন ও আদী বিন যায়েদ] ইহুদি বলছিল যে, হে মুহাম্মদ! মূসার পরে কোনো মানুষের প্রতি আল্লাহ তা'আলা কোনো কিছু অবতরণ বা নাজিল করেছেন, সে সম্পর্কে আমাদের জানা নেই। সে পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা উক্ত আয়াত নাজিল করেন। -[ফাতহুল কাদীর : ৫৩৯/১, রূহুল মা'আনী : ১৬/৩/৬, ইবনে কাছীর : ৫৮৫/১, বাহরে মুহীত : ৪১৩/৩]

(১৬৬) قوله لَٰكِنِ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ الخ **আয়াতের শানে নুযূল- ১ :** বায়হাকী দালায়েল গ্রন্থে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ-এর নিকট এক দল ইহুদি গমন করলে রাসূল ﷺ তাদেরকে বলেন : আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি যে, আমার জানা মতে তোমরা নিশ্চিতভাবে জান যে, আমি আল্লাহ তা'আলার রাসূল। তখন তারা বলল, আমরা সে সম্পর্কে কিছুই জানি না। তখন তাদের অসত্য কথা ও সত্যকে এড়িয়ে যাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ করেন। -[রূহুল মা'আনী ১৯/৩/৬, ফাতহুল কাদীর : ৫৪১/১]

শানে নুযূল- ২ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বরাত দিয়ে ইবনে জারীর বর্ণনা করেন إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ যখন নাজিল হয়, তখন ইহুদিরা বলল যে, তাতে আমরা সাক্ষি দিব না। সে পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। -[রূহুল মা'আনী : ১৯/৩/৬, ফাতহুল কাদীর : ৫৩৯/১, বাহরে মুহীত : ৪১৪/৩

অপর এক বর্ণনা মতে কাফেরদের জবাবে উল্লিখিত আয়াত নাজিল হয়েছে কাফেররা বলেছিল যে, হে মুহাম্মদ! আপনি যা কিছু আমাদেরকে বলেছেন, তাতে আমরা সাক্ষি দিচ্ছি না। অন্য কারা আপনার প্রতি সাক্ষ্য প্রদান করবে? তাদের এহেন ধৃষ্টতাপূর্ণ মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন-[কুরতুবী : ২০/৬]

قوله إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ -এর আলোচনা :

এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, নবীগণের প্রতি প্রেরিত আল্লাহ তা'আলার বিশেষ নির্দেশ ও বাণীকে ওহী বলা হয়। পূর্ববর্তী নবীগণের প্রতি যেমন আল্লাহ তা'আলা ওহী নাজিল হয়েছিল, হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর প্রতিও তেমনি আল্লাহ তা'আলা ওহী নাজিল করেছেন। অতএব, পূর্ববর্তী নবীগণকে যারা মান্য করে, তারা হযরত মুহাম্মদ ﷺ-কেও মান্য করতে বাধ্য। আর যারা তাকে অস্বীকার করে, তারা যেন অন্যসব নবীকে এবং তাদের প্রতি প্রেরিত ওহীকেও অস্বীকার করল।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি প্রেরিত ওহীকে হযরত নূহ (আ.) ও তৎপরবর্তী নবীগণের ওহীর সাথে তুলনা করার কারণ হয়তো এই যে, হযরত আদম (আ.)-এর প্রতি প্রেরিত ওহী ছিল একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ের। হযরত নূহ (আ.)-এর যুগেই তা পূর্ণতা লাভ করেছিল। হযরত আদম (আ.)-এর প্রতি প্রেরিত ওহী ছিল প্রাথমিক শিক্ষাস্বরূপ, ক্রমে তা উন্নত হতে থাকে এবং পরীক্ষার স্তরে পৌঁছায়। যারা উত্তীর্ণ হলো, তাদের জন্য পুরস্কার, আর যারা অবাধ্যতা করল তাদের জন্য আজাবের ব্যবস্থা করা হলো। অতএব, শরিয়তের আদেশ-নিষেধ সম্বলিত ওহীপ্রাপ্ত নবীগণের আগমন হযরত নূহ (আ.) থেকেই শুরু হয়েছিল। অপর দিকে ওহী অস্বীকারকারী বিরুদ্ধাচারীদের উপর সর্বপ্রথম আজাব ও হযরত নূহ (আ.)-এর কালেই আরম্ভ হয়।

সারকথা এই যে, হযরত নূহ (আ.)-এর পূর্বে আল্লাহর ওহীর অবাধ্য ও নবীগণের বিরুদ্ধাচরণকারীদের উপর কোনো ব্যাপক আজাব বা গজব আপতিত হতো না; বরং তাদেরকে মা'জুর সাব্যস্ত করে অব্যাহতি ও অবকাশ দেওয়া হতো। বুঝাবার চেষ্টা করা হতো। হযরত নূহ (আ.)-এর আমলে যখন ধর্মীয় শিক্ষার অধিকতর প্রচার-প্রসার হয়েছিল এবং আল্লাহর হুকুম সম্পর্কে মানুষের কাছে কোনো অস্পষ্টতা ছিল না, তখন থেকেই অবাধ্যদের উপর আল্লাহর আজাব নাজিল হতে থাকে। হযরত নূহ (আ.)-এর জমানায় সর্বনাশা মহাপ্লাবনই সর্বপ্রথম ব্যাপক ঐতিহাসিক আজাব। পরবর্তীকালে হযরত হুদ (আ.), হযরত ছালেহ (আ.), হযরত শোয়েব (আ.), প্রমুখ পয়গম্বরগণের আসলেও অমান্যকারী নাফরমান কাফেরদের প্রতি বিভিন্ন প্রকার আজাব ও গজব আপতিত হয়েছে। অতএব প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর প্রতি প্রেরিত ওহীকে হযরত নূহ (আ.) ও তৎপরবর্তীগণের ওহীর সাথে তুলনা করে মক্কার মুশরিক ও আহলে কিতাব ইহুদি ও খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের প্রতি পূর্ণ হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করা হয়েছে যে, উল্লিখিত চিরাচরিত নিয়মানুসারে তারা যদি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি অবতীর্ণ ওহী অর্থাৎ, কুরআনকে অস্বীকার বা অমান্য করে, তবে তারাও ভয়াবহ শাস্তির আওতায় পড়বে।
-[ফাওয়ায়েদে ওসমানী]

হযরত নূহ (আ.)-এর অস্তিত্বই ছিল এক অনন্য মু'জিযা। তিনি সুদীর্ঘ সাড়ে নয় শত বছর জীবিত ছিলেন। কিন্তু ইন্তেকালের পূর্ব পর্যন্ত তার দৈহিক শক্তি বিন্দুমাত্র হ্রাস পায়নি, একটি দাঁতও পড়েনি একগাছি চুলও পাকেনি। তিনি সারা জীবন দেশবাসীর নির্যাতন-নিপীড়ন অত্যন্ত ধৈর্য সহকারে সহ্য করেছেন। –[তাফসীরে মাযহারী]

وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنٰهُمْ عَلَيْكَ "এবং আরো বহু রাসূল যাঁদের ইতিবৃত্তান্ত আপনাকে শুনিয়েছি।" এ আয়াতে হযরত নূহ (আ.)-এর পরে যেসব পয়গম্বর আগমন করেছেন, তাদের সম্পর্কে প্রথমে সাধারণভাবে বলার পর তন্মধ্যে বিশিষ্ট ও মর্যাদাসম্পন্ন কয়েকজনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এঁরা সবাই আল্লাহর পয়গম্বর এবং নবীগণের নিকটে বিভিন্ন পন্থায় ওহী প্রেরিত হয়েছে। কখনো ফেরেশতাদের মাধ্যমে ওহী পৌঁছেছে, কখনো লিপিবদ্ধ কিতাব আকারে এসেছে, আবার কখনো আল্লাহ তা'আলা রাসূলের সাথে সরাসরি কথোপকথন করেছেন। সারকথা যে কোনো পন্থায় ওহী পৌঁছুক না কেন, তদনুযায়ী আমল করা মানুষের একান্ত কর্তব্য। অতএব, ইহুদিদের এরূপ আবদার করা যে, তাওরাতের মতো লিখিত কিতাব নাজিল হলে আমরা মান্য করব, অন্যথা নয়– সম্পূর্ণ আহমকি ও স্পষ্ট কুফরি।

হযরত আবূ যর গিফারি (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– আল্লাহ তা'আলা এক লাখ চব্বিশ হাজার পয়গম্বর প্রেরণ করেছেন, যাঁদের মধ্যে স্বতন্ত্র শরিয়তের অধিকারী রাসূলের সংখ্যা ছিল তিন শ' তের জন। –[তাফসীরে কুরতুবী]

رُسُلًا مُّبَشِّرِيْنَ وَ مُنْذِرِيْنَ –"পয়গম্বরগণ সুসংবাদ দানকারী এবং ভীতি প্রদর্শনকারী।" আল্লাহ তা'আলা ঈমানদারদের ঈমান ও সৎকর্মশীলতার পুরস্কারস্বরূপ জান্নাতের সুসংবাদ দান করার জন্য এবং কাফের, বেঈমান ও দূরাচারদের কুফরি ও অবাধ্যতার শাস্তিস্বরূপ জাহান্নামের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির ভীতি প্রর্শনের জন্য যুগে যুগে, দেশে দেশে অব্যাহতভাবে নবী প্রেরণ করেছেন যেন কেয়ামতের শেষ বিচারের দিনে অবাধ্য ব্যক্তিরা অজুহাত উত্থাপন করতে না পারে যে, ইয়া আল্লাহ! কোন কাজে আপনি সন্তুষ্ট আর কোন কাজে বিরাগ হন, তা আমরা উপলবিদ্ধ করতে পারিনি। জানতে পারলে অবশ্যই আমরা আপনার সন্তুষ্টির পথ অবলম্বন করতাম। অতএব, আমাদের অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি মার্জনীয় এবং আমরা নিরপরাধ। পথভ্রষ্ট লোকেরা যাতে এহেন অজুহাত পেশ করতে বা বাহানার আশ্রয় নিতে না পারে, তজ্জন্য আল্লাহ তা'আলা অলৌকিক মু'জিযাসহ নবীগণকে প্রেরণ করেছেন এবং তারা সর্বস্ব উৎসর্গ করে সত্য পথ প্রদর্শন করেছেন। অতএব, এখন আর সত্য দীন ইসলাম গ্রহণ না করার ব্যাপারে কোনো অজুহাত গ্রহণযোগ্য হবে না, কোনো বাহানারও অবকাশ নেই। আল্লাহর ওহী এমন এক প্রকৃষ্ট প্রমাণ যার মোকাবিলায় অন্য কোনো প্রমাণই কার্যকর হতে পারে না। কুরআনে পাক এমন অকাট্য দলিল যার সামনে কোনো অযুক্তি টিকতে পারে না। আল্লাহ তা'আলার হেকমত ও তদবীরের এটা এক কল্পনাতীত নিদর্শন।

মহানবী ﷺ ও কুরআন পাকের সত্যতা প্রমাণের পর আল্লাহ তা'আলা বলেন : এখনো যারা কুরআন মাজীদ ও রাসূলে কারীম ﷺ–কে অস্বীকার করে এবং তাওরাতে রাসূল ﷺ–এর যেসব গুণ-বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ রয়েছে তা গোপন করে এবং এককথায় অন্য কথা লোকের কাছে প্রকশ করে এবং তাদেরকে সত্য দীন হতে বিরত ও বঞ্চিত করে, এহেন চরম অপরাধীদের কস্মিনকালেও ক্ষমা ও হেদায়েত লাভের সৌভাগ্য হবে না। এতদ্বারা স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে যে, একমাত্র হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ–এর আনুগত্যের মধ্যেই হেদায়েত সীমাবদ্ধ; তাঁর অবাধ্যতা ও বিরুদ্ধাচারণ করা চরম গোমরাহী। অতএব ইহুদিদের ধ্যান-ধারণা, ধর্ম-কর্ম ভ্রান্ত ও বাতিল।

শব্দের বিশ্লেষণ :

رُسُلًا : শব্দটি বহুবচন, একবচন رَسُوْلٌ অর্থ– রাসূলগণ।

مُبَشِّرِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّبْشِيْرُ মূলবর্ণ (ب . ش . ر) জিনস صحيح অর্থ– সুসংবাদদানকারী।

مُنْذِرِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْإِنْذَارُ মূলবর্ণ (ن . ذ . ر) জিনস صحيح অর্থ– ভীতিপ্রদর্শনকারী।

عَزِيْزًا : শব্দটি বাব ضَرَبَ থেকে مبالغة এর সীগাহ। এটি আল্লাহ তা'আলার গুণবাচক নাম।

www.almodina.com

يٰۤاَهۡلَ الۡكِتٰبِ لَا تَغۡلُوۡا فِیۡ دِیۡنِكُمۡ وَلَا تَقُوۡلُوۡا عَلَی اللّٰهِ اِلَّا الۡحَقَّ ؕ اِنَّمَا الۡمَسِیۡحُ عِیۡسَی ابۡنُ مَرۡیَمَ رَسُوۡلُ اللّٰهِ وَكَلِمَتُهٗ ۚ اَلۡقٰهَاۤ اِلٰی مَرۡیَمَ وَرُوۡحٌ مِّنۡهُ ۫ فَاٰمِنُوۡا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ ۚ۫ وَلَا تَقُوۡلُوۡا ثَلٰثَةٌ ؕ اِنۡتَهُوۡا خَیۡرًا لَّكُمۡ ؕ اِنَّمَا اللّٰهُ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ؕ سُبۡحٰنَهٗۤ اَنۡ یَّكُوۡنَ لَهٗ وَلَدٌ ۘ لَهٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الۡاَرۡضِ ؕ وَكَفٰی بِاللّٰهِ وَكِیۡلًا (١٧١)

অনুবাদ : (১৭১) হে আহলে কিতাবগণ! তোমরা নিজেদের ধর্মে সীমালঙ্ঘন করো না এবং আল্লাহ সম্বন্ধে ভ্রান্ত উক্তি করো না। মারইয়ামের পুত্র ঈসা মাসীহ তো আর কিছুই নন, অবশ্য আল্লাহর রাসূল এবং আল্লাহর এক -[আদেশ]-বাণী [দ্বারা সৃষ্ট], যা আল্লাহ [জিবরাঈল পক্ষ থেকে] মারইয়াম পর্যন্ত পৌঁছিয়েছেন, এবং আল্লাহর তরফ হতে এক জান [রূহ], সুতরাং আল্লাহর প্রতি এবং তাঁর সমস্ত রাসূলের প্রতি ঈমান আন। আর এরূপ বলো না যে, [আল্লাহ] তিন, [এই শিরক হতে] নিবৃত্ত হও, তোমাদের জন্য উত্তম হবে, প্রকৃত মা'বূদ তো এক আল্লাহ তা'আলাই, তিনি সন্তানের জনক হওয়া হতে পবিত্র। যা কিছু আসমানসমূহে এবং জমিনে আছে সবকিছুই তাঁর স্বত্ব, আর আল্লাহ তা'আলাই যথেষ্ট কার্য সম্পাদকরূপে।

لَنۡ یَّسۡتَنۡكِفَ الۡمَسِیۡحُ اَنۡ یَّكُوۡنَ عَبۡدًا لِّلّٰهِ وَلَا الۡمَلٰٓئِكَةُ الۡمُقَرَّبُوۡنَ ؕ وَمَنۡ یَّسۡتَنۡكِفۡ عَنۡ عِبَادَتِهٖ وَیَسۡتَكۡبِرۡ فَسَیَحۡشُرُهُمۡ اِلَیۡهِ جَمِیۡعًا (١٧٢)

(১৭২) মসীহ কস্মিনকালেও এতে লজ্জাবোধ করবেন না যে, তিনি আল্লাহর বান্দা এবং সান্নিধ্য প্রাপ্ত ফেরেশতাগণও [লজ্জাবোধ করবেন] না, আর যে ব্যক্তি আল্লাহর দাসত্ব করতে লজ্জাবোধ করবে এবং অহঙ্কার করবে, তবে [পরিণাম শুনে রাখ,] নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা সমস্ত মানব কে নিজের দিকে একত্রিত করবেন।

শাব্দিক অনুবাদ

(১৭১) يٰۤاَهۡلَ الۡكِتٰبِ হে আহলে কিতাবগণ! لَا تَغۡلُوۡا فِیۡ دِیۡنِكُمۡ তোমরা নিজেদের ধর্মে সীমালঙ্ঘন করো না وَلَا تَقُوۡلُوۡا عَلَی اللّٰهِ اِلَّا الۡحَقَّ এবং আল্লাহ সম্বন্ধে ভ্রান্ত উক্তি করো না اِنَّمَا الۡمَسِیۡحُ عِیۡسَی ابۡنُ مَرۡیَمَ মারইয়ামের পুত্র ঈসা মাসীহ তো আর কিছুই নন رَسُوۡلُ اللّٰهِ অবশ্য আল্লাহর রাসূল وَكَلِمَتُهٗ এবং আল্লাহর এক -[আদেশ]-বাণী [দ্বারা সৃষ্ট] اَلۡقٰهَاۤ اِلٰی مَرۡیَمَ যা আল্লাহ মারইয়াম পর্যন্ত পৌঁছিয়েছেন وَرُوۡحٌ مِّنۡهُ এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে এক জান [রূহ] فَاٰمِنُوۡا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ সুতরাং আল্লাহর প্রতি এবং তাঁর সমস্ত রাসূলের প্রতি ঈমান আন وَلَا تَقُوۡلُوۡا ثَلٰثَةٌ আর এরূপ বলো না যে, [আল্লাহ] তিন اِنۡتَهُوۡا خَیۡرًا لَّكُمۡ [এই শিরক হতে] নিবৃত্ত হও, তোমাদের জন্য উত্তম হবে اِنَّمَا اللّٰهُ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ প্রকৃত মা'বূদ তো এক আল্লাহ তা'আলাই سُبۡحٰنَهٗ তিনি পবিত্র اَنۡ یَّكُوۡنَ لَهٗ وَلَدٌ সন্তানের জনক হওয়া হতে لَهٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الۡاَرۡضِ যা কিছু আসমানসমূহে এবং জমিনে আছে সবকিছুই তাঁর স্বত্ব وَكَفٰی بِاللّٰهِ وَكِیۡلًا আর আল্লাহ তা'আলাই যথেষ্ট কার্য সম্পাদকরূপে।

(১৭২) لَنۡ یَّسۡتَنۡكِفَ الۡمَسِیۡحُ মসীহ কস্মিনকালেও এতে লজ্জাবোধ করবেন না যে اَنۡ یَّكُوۡنَ عَبۡدًا لِّلّٰهِ তিনি আল্লাহর বান্দা وَلَا الۡمَلٰٓئِكَةُ الۡمُقَرَّبُوۡنَ এবং সান্নিধ্য প্রাপ্ত ফেরেশতাগণও না وَمَنۡ یَّسۡتَنۡكِفۡ عَنۡ عِبَادَتِهٖ আর যে ব্যক্তি আল্লাহর দাসত্ব করতে লজ্জাবোধ করবে وَیَسۡتَكۡبِرۡ এবং অহঙ্কার করবে فَسَیَحۡشُرُهُمۡ اِلَیۡهِ جَمِیۡعًا তবে নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা সমস্ত মানব কে নিজের দিকে একত্রিত করবেন।

www.almodina.com

فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَيُوَفِّيْهِمْ اُجُوْرَهُمْ وَيَزِيْدُهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ ۚ وَاَمَّا الَّذِيْنَ اسْتَنْكَفُوْا وَاسْتَكْبَرُوْا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ۙ وَّلَا يَجِدُوْنَ لَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا (١٧٣)

অনুবাদ : (১৭৩) অনন্তর যারা ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করেছে, তবে তাদেরকে তো তাদের পূর্ণ ছওয়াব প্রদান করবেন এবং তাদেরকে স্বীয় করুণায় আরো অধিক প্রদান করবেন, আর যারা লজ্জাবোধ করে থাকবে এবং অহঙ্কার করে থাকবে তাদেরকে কঠোর শাস্তি দিবেন, এবং তারা কোনো গায়রুল্লাহকে স্বীয় বন্ধু ও সাহায্যকারী পাবে না।

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَاَنْزَلْنَاۤ اِلَيْكُمْ نُوْرًا مُّبِيْنًا (١٧٤)

(১৭৪) হে মানব! নিশ্চয় তোমাদের নিকট তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে এক প্রমাণ [রাসূল] এসেছে, আর আমি তোমাদের নিকট এক উজ্জ্বল নূর [কুরআন] পাঠিয়েছি।

فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَاعْتَصَمُوْا بِهٖ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِيْ رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ ۙ وَّيَهْدِيْهِمْ اِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا ۭ (١٧٥)

(১৭৫) সুতরাং যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছে, এবং আল্লাহ [এর দীনকে] দৃঢ়রূপে ধারণ করেছে, বস্তুতঃ এরূপ লোকদেরকে আল্লাহ স্বীয় করুণায় [জান্নাতে] দাখিল করবেন ও স্বীয় অনুগ্রহে [আবৃত্ত করবেন,] এবং স্বীয় সন্নিধান পর্যন্ত [পৌছার] সরল পথ প্রদর্শন করবেন।

শাব্দিক অনুবাদ

(১৭৩) فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا অনন্তর যারা ঈমান এনেছে وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ এবং নেক কাজ করেছে فَيُوَفِّيْهِمْ اُجُوْرَهُمْ তবে তাদেরকে তো তাদের পূর্ণ ছওয়াব প্রদান করবেন وَيَزِيْدُهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ এবং তাদেরকে স্বীয় করুণায় আরো অধিক প্রদান করবেন। وَاَمَّا الَّذِيْنَ اسْتَنْكَفُوْا আর যারা লজ্জাবোধ করে থাকবে। وَاسْتَكْبَرُوْا এবং অহঙ্কার করে থাকবে। فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا তাদেরকে কঠোর শাস্তি দিবনে وَلَا يَجِدُوْنَ لَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ এবং তারা কোনো গায়রুল্লাহকে পাবে না। وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا স্বীয় বন্ধু ও সাহায্যকারী।

(১৭৪) يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ হে মানব! قَدْ جَآءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ নিশ্চয় তোমাদের নিকট তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে এক প্রমাণ [রাসূল] এসেছে وَاَنْزَلْنَاۤ اِلَيْكُمْ نُوْرًا مُّبِيْنًا। আর আমি তোমাদের নিকট এক উজ্জ্বল নূর পাঠিয়েছি।

(১৭৫) فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ সুতরাং যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছে। وَاعْتَصَمُوْا بِهٖ এবং আল্লাহ [এর দীন] কে দৃঢ়রূপে ধারণ করেছে فَسَيُدْخِلُهُمْ বস্তুতঃ এরূপ লোকদেরকে দাখিল করবেন فِيْ رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ আল্লাহ স্বীয় করুণায় [জান্নাতে] ও স্বীয় অনুগ্রহে [আবৃত্ত করবেন,] وَّيَهْدِيْهِمْ اِلَيْهِ এবং স্বীয় সন্নিধান পর্যন্ত [পৌছার] প্রদর্শন করবেন। صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا সরল পথ।

www.almodina.com

অনুবাদ : (১৭৬) লোকে আপনার নিকট [মিরাশ সম্বন্ধে] বিধান জিজ্ঞাসা করে, আপনি বলে দিন, আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে কালালাহ সম্বন্ধে ব্যবস্থা দিচ্ছেন, যে, যদি কোনো ব্যক্তি নিঃসন্তান অবস্থায় মারা যায় এবং তার একজন [সহোদর বা বৈমাত্রেয়] ভগ্নি থাকে, তবে সে অর্ধাংশ পাবে তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির, এবং এই ব্যক্তি [ভ্রাতা] ভগ্নির ওয়ারিশ হবে, যদি [ভগ্নি মারা যায় এবং] তার কোনো সন্তান না থাকে, আর যদি ভগ্নি দুই জন [বা ততোধিক] হয়, তবে তারা [উক্ত] ভাইয়ের পরিত্যক্ত সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশ পাবে, আর যদি ওয়ারিশ ভ্রাতা-ভগ্নি– পুরুষ ও নারী কয়েকজন হয়, তবে একজন পুরুষের অংশ হবে দুই জন নারীর অংশের সমান, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের নিকট [দীনের বিষয়] এই জন্য বর্ণনা করেন, যেন তোমরা ভ্রষ্টতায় পতিত না হও, আর আল্লাহ তা'আলা সর্ববিষয়ই খুব জানেন।

يَسْتَفْتُوْنَكَ ؕ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِى الْكَلٰلَةِ ؕ اِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهٗ وَلَدٌ وَّلَهٗۤ اُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَاۤ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهَا وَلَدٌ ؕ فَاِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثٰنِ مِمَّا تَرَكَ ؕ وَاِنْ كَانُوْۤا اِخْوَةً رِّجَالًا وَّنِسَآءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ ؕ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اَنْ تَضِلُّوْا ؕ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ (١٧٦)

ع ٢٤

শাব্দিক অনুবাদ

(১৭৬) يَسْتَفْتُوْنَكَ লোকে আপনার নিকট [মিরাশ সম্বন্ধে] বিধান জিজ্ঞাসা করে قُلِ আপনি বলে দিন اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِى الْكَلٰلَةِ আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে কালালাহ সম্বন্ধে ব্যবস্থা দিচ্ছেন যে اِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ যদি কোনো ব্যক্তি মারা যায় لَيْسَ لَهٗ وَلَدٌ নিঃসন্তান অবস্থায় وَلَهٗۤ اُخْتٌ এবং তার একজন [সহোদর বা বৈমাত্রেয়] ভগ্নি থাকে فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ তবে সে অর্ধাংশ পাবে তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির وَهُوَ يَرِثُهَاۤ এবং এই ব্যক্তি [ভ্রাতা] ভগ্নীর ওয়ারিশ হবে اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهَا وَلَدٌ যদি এবং] তার কোনো সন্তান না থাকে فَاِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ আর যদি ভগ্নি দুজন হয় فَلَهُمَا الثُّلُثٰنِ مِمَّا تَرَكَ তবে তারা ভাইয়ের পরিত্যক্ত সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশ পাবে وَاِنْ كَانُوْۤا اِخْوَةً رِّجَالًا وَّنِسَآءً আর যদি ওয়ারিশ ভ্রাতা-ভগ্নি– পুরুষ ও নারী কয়েকজন হয় فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ তবে একজন পুরুষের অংশ হবে দুই জন নারীর অংশের সমান। يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اَنْ تَضِلُّوْا আল্লাহ তা'আলা তোমাদের নিকট এই জন্য বর্ণনা করেন যেন তোমরা ভ্রষ্টতায় পতিত না হও, وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ আর আল্লাহ তা'আলা সর্ববিষয়ই খুব জানেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(১৭১) قوله يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ لَا تَغْلُوْا فِىْ دِيْنِكُمْ وَلَا تَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ اِلَّا الْحَقَّ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** উক্ত আয়াত নাজরানের খ্রিস্টানদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। মুকাতিল এমত পোষণ করেন। জমহুরে মুফাসসিরীনগণের মতে সকল খ্রিস্টান সম্পর্কে উক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। কারণ তাদের ত্রিত্ববাদ, তাদের আকীদা হলো পিতা, পুত্র ও রূহুল কুদুস একই মাবুদ। কারো মতে ইহুদি ও খ্রিস্টান সকলের সম্পর্কে উক্ত আয়াত নাজিল হয়েছে। আলোচ্য আয়াত দ্বারা আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে সীমালঙ্ঘন করতে নিষেধ করেছেন। –[বাহরে মুহীত]

(১৭২) قوله لَنْ يَّسْتَنْكِفَ الْمَسِيْحُ اَنْ يَّكُوْنَ عَبْدًا لِّلّٰهِ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** নাজরান প্রতিনিধিদল যখন মহানবী ﷺ–এর নিকট গিয়ে বলল, হে মুহাম্মদ! তুমি আমাদের বন্ধুর দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করছ? রাসূল ﷺ বললেন, তোমাদের বন্ধু কে? তারা বলল, হযরত ঈসা (আ.)। তাহলে এ সম্পর্কে আমি কি বলব? তারা বলল, আপনি বলবেন, তিনি হচ্ছেন আল্লাহর বান্দা ও আল্লাহর রাসূল। তখন আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়। –[রূহুল মা'আনী : ৩৭/৩/৬]

www.almodina.com

(১৭৬) قوله يَسْتَفْتُوْنَكَ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِي الْكَلٰلَةِ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** আলোচ্য আয়াত হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রা.) সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমার অসুস্থতার সংবাদ পেয়ে রাসূল ﷺ ও হযরত আবূ বকর (রা.) আমাকে দেখার জন্য আসেন। তাঁরা এসে আমাকে সঙ্গাহীন অবস্থায় পেলেন। ফলে রাসূল ﷺ অজু করে আমার উপর পানি ঢেলে দিলেন, এতে করে আমার হুঁশ বা চেতনা ফিরে আসে। তখন আমি বললাম, আমার ওয়ারিশ হচ্ছে কালালা অর্থাৎ আমার কোনো সন্তান নেই, আছে শুধু নয় বোন। সুতরাং আমার সম্পদে আমি কেমন ব্যবহার করব। তখন মিরাশের আয়াত নাজিল হয়েছে। –[রূহুল মা'আনী : ৪৪/৩/৬, ইবনে কাছীর : ৫৯২/১, ফাতহুল কাদীর : ৫৪৪/১, বাহরে মুহীত : ৪২২/৩]

قوله وَكَلِمَتُهٗ শব্দে বাতলে দেওয়া হয়েছে যে, হযরত ঈসা (আ.) আল্লাহর কালিমা। এর ব্যাখা প্রসঙ্গে তাফসীরকারগণ বিভিন্ন অর্থ গ্রহণ করেছেন।

এক. হযরত ইমাম গাযালী (র.) বলেন : কোনো শিশুর জন্ম লাভের জন্য দু'টি শক্তির যৌথ ভূমিকা থাকে। তন্মধ্যে একটি হলো নারী-পুরুষের বীর্যের সম্মেলন। দ্বিতীয় শক্তি আল্লাহ তা'আলার كُنْ (হও) নির্দেশ দান; যার ফলে উক্ত শিশুর অস্তিত্বের সঞ্চার হয়ে থাকে। হযরত ঈসা (আ.)-এর জন্ম লাভের ক্ষেত্রে প্রথম শক্তি বর্তমান ছিল না। তাই দ্বিতীয় শক্তির সাথে সম্পর্কিত করে তাঁকে 'কালিমাতুল্লাহ' বলা হয়েছে। যার তাৎপর্য এই যে, তিনি বস্তুগত কার্যকারণ ছাড়া শুধুমাত্র আল্লাহ তা'আলার كُنْ (হয়ে যাও) নির্দেশের প্রভাবে জন্মলাভ করেছেন। এমতাবস্থায় اَلْقٰهَاۤ اِلٰى مَرْيَمَ বাক্যের অর্থ হবে এই যে, আল্লাহ তা'আলা এ কালিমাটি হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর মাধ্যমে হযরত মারইয়ামের কাছে পৌঁছে দিলেন, আর হযরত ঈসা (আ.)-এর জন্মগ্রহণের মাধ্যমে তা কার্যকর ও বাস্তবায়িত হলো।

দুই. কারো মতে 'কালিমাতুল্লাহ' অর্থ আল্লাহর সুসংবাদ। এর দ্বারা হযরত ঈসা (আ.)-এর ব্যক্তি-সত্তাকে বুঝানো হয়েছে। ইতঃপূর্বে আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতার মাধ্যমে হযরত মারইয়াম (আ.)-কে হযরত ঈসা (আ.) সম্পর্কে যে সুসংবাদ দান করেছিলেন সেখানে 'কালিমা' শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে। যথা–اِذْ قَالَتِ الْمَلٰۤئِكَةُ يٰمَرْيَمُ اِنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ এবং ফেরেশতারা বলল যে, মারইয়াম! নিশ্চয় আল্লাহ তোমাকে সুসংবাদ দিচ্ছেন 'কালিমা' সম্পর্কে।

তিন. কারো মতে এখানে 'কালিমা' অর্থ নিদর্শন। যেমন, অন্য এক আয়াতে শব্দটি নির্দশন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন– وَصَدَّقَتْ بِكَلِمٰتِ رَبِّهَا

قوله وَرُوْحٌ مِّنْهُ এ শব্দে দুটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য। প্রথমতঃ হযরত ঈসা (আ.)-কে 'রূহ' বলার তাৎপর্য কি? দ্বিতীয়তঃ আল্লাহ তা'আলার সাথে তাঁকে বিশেষভাবে সম্পর্কিত করার কারণ কি?

এ সম্পর্কে তাফসীরকারগণের বিভিন্ন অভিমত রয়েছে– **এক.** কারো মতে 'রূহ' অতিশয় পবিত্র বস্তু হওয়ার কারণে এরূপ বলা হয়েছে। কেননা প্রচলিত রীতি রয়েছে যে, কোনো বস্তুর অধিক পবিত্রতা ও নিষ্কলুষতা বুঝাবার জন্য তাকে সরাসরি 'রূহ' বলা হয়। হযরত ঈসা (আ.)-এর জন্মলাভের মধ্যে যেহেতু বীর্যের কোনো দখল ছিল না; বরং তিনি শুধু আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা এবং كُنْ নির্দেশের ভিত্তিতে জন্মলাভ করেছিলেন, কাজেই দৈহিক পবিত্রতার দিক দিয়ে তিনি শীর্ষস্থানীয় ছিলেন। অতএব, প্রচলিত রীতি অনুসারে তাঁকে 'রূহ' বলা হয়েছে। আর আল্লাহ তা'আলার সাথে তাঁকে বিশেষভাবে সম্পর্কিত করার উদ্দেশ্য সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি করা। যেমন, মসজিদের সম্মানার্থে সেটিকে 'আল্লাহর মসজিদ' বলা হয়, কা'বা শরীফকে বায়তুল্লাহ বা আল্লাহর ঘর বলা হয়; অথবা কোনো একান্ত অনুগত বান্দাকে আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত করে আব্দুল্লাহ বা আল্লাহর বান্দা বলা হয়। যেমন, সূরা বনী ইসরাঈলের اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ আয়াতে হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে 'আল্লাহর বান্দা' বলে অভিহিত করা হয়েছে।

দুই. কারো মতে আধ্যাত্মিক জীবন দান করে মানুষের মৃতপ্রায় অন্তরকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য হযরত ঈসা (আ.) প্রেরিত হয়েছিলেন। দৈহিক জীবনের মূল যেমন, রূহ বা প্রাণ, তদ্রূপ হযরত ঈসা (আ.) ছিলেন আধ্যাত্মিক জীবনের প্রাণ স্বরূপ। অতএব, তাঁকে 'রূহ' বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। যেমন– وَكَذٰلِكَ اَوْحَيْنَاۤ اِلَيْكَ رُوْحًا مِّنْ اَمْرِنَا আয়াতে পবিত্র কুরআনকেও 'রূহ' বলে অভিহিত করা হয়েছে। কেননা কুরআনে পাক আধ্যাত্মিক জীবনের উৎসমূল।

তিন. কেউ বলেন– 'রূহ' শব্দটির রহস্য অর্থেও ব্যবহৃত হয়। এখানে এ অর্থই অধিক সমীচীন। কারণ, হযরত ঈসা (আ.)-এর নজিরবিহীন ও বিস্ময়কর জন্ম আল্লাহ তা'আলার অসীম কুদরতের নিদর্শন ও রহস্য এজন্যই তাঁকে 'রূহুল্লাহ' বলা হয়।

www.almodina.com

চার. আরেকটি অভিমত এই যে, رُوْحٌ (রূহ) শব্দ ফুঁক অর্থেও ব্যবহৃত হয়। আল্লাহ পাকের নির্দেশক্রমে হযরত জিবরাঈল (আ.) হযরত মারইয়াম (আ.)-এর গলবন্দে ফুঁক দিয়েছিলেন। আর তার ফলেই তিনি গর্ভবতী হয়েছিলেন। যেহেতু হযরত ঈসা (আ.) শুধু ফুৎকারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তাই তাঁকে রূহুল্লাহ খেতাব দেওয়া হয়েছে। কুরআন পাকে এদিকেই ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে– فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُّوحِنَا

এতদ্ব্যতীত আরো কতিপয় ব্যাখ্যার অবকাশ রয়েছে। তবে হযরত ঈসা (আ.) আল্লাহর সত্তার অংশ ছিলেন বা আল্লাহই হযরত ঈসা (আ.)-এর মানবীয় দেহে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন এমন অর্থ করা বা ধারণা পোষণ করা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ও বাতিল।

একটি ঘটনা : আল্লামা আলূসী (র.) লিখেছেন যে, একদিন খলিফা হারুনুর রশীদের দরবারে জনৈক খ্রিস্টান চিকিৎসক হযরত আলী ইবনে হোসাইন ওয়াকেদীর সাথে তর্কে প্রবৃত্ত হয়। সে বলল, তোমাদের কুরআনে এমন একটি শব্দ রয়েছে যার দ্বারা বুঝা যায় যে, হযরত ঈসা (আ.) আল্লাহর অংশ ছিলেন। প্রমাণ স্বরূপ সে কুরআনের رُوحٌ مِّنْهُ শব্দটি পেশ করল। তদুত্তরে আল্লামা ওয়াকেদী কুরআনে পাকের আয়াত وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ পাঠ করলেন।

এখানে جَمِيعًا مِّنْهُ শব্দ দ্বারা সব কিছুকে আল্লাহ তা'আলার সাথে সম্পর্কিত করা হয়েছে। যার অর্থ আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর পক্ষ হতে। অতএব رُوحٌ مِّنْهُ শব্দের অর্থ যদি করা হয়, হযরত ঈসা (আ.) আল্লাহর অংশ, তবে جَمِيعًا مِّنْهُ শব্দের অর্থ করতে হবে আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে তা সবই আল্লাহর অংশ। –[নাউযুবিল্লাহ মিন যালিকা]।

অতএব, হযরত ঈসা (আ.)-এর বিশেষ কোনো মর্যাদা সাব্যস্ত হয় না। এ উত্তর শুনে খ্রিস্টান চিকিৎসক নিরুত্তর হয়ে গেল এবং ইসলাম গ্রহণ করল।

قوله وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ কুরআন নাজিলের সমসাময়িককালে খ্রিস্টানরা যেসব উপদলে বিভক্ত ছিল, তন্মধ্যে ত্রিত্ববাদ সম্পর্কে তাদের ধর্মবিশ্বাস তিনটি ভিন্ন ভিন্ন মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। একদল মনে করতো– মসীহই আল্লাহ। স্বয়ং আল্লাহই মসীহরূপে পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছেন। দ্বিতীয় দল বলত– মসীহ পুত্র। তৃতীয় দলের বিশ্বাস ছিল, তিন সদস্য সমন্বয়ে আল্লাহর একক পরিবার। এ দলটি আবার দু'টি উপদলে বিভক্ত ছিল। এক দলের মতে পিতা, পুত্র ও মারইয়াম (আ.)–এ তিনের সমন্বয়ে এক আল্লাহ। অন্য এক দলের মতে হযরত মরিয়ম (আ.)–এর পরিবর্তে রূহুল কুদুস পবিত্রাত্মা হযরত জিবরাঈল (আ.) ছিলেন তিন খোদার একজন।

মোটকথা, খ্রিস্টানরা হযরত ঈসা মসীহ (আ.)-কে তিনের এক খোদা মনে করত। তাদের ভ্রান্তি অপনোদনের জন্য কুরআনে কারীমে প্রত্যেকটি উপদলকে ভিন্ন ভিন্নভাবে সম্বোধন করা হয়েছে এবং সম্মিলিতভাবেও সম্বোধন করা হয়েছে। তাদের সামনে স্পষ্ট ও জোরালোভাবে তুলে ধরা হয়েছে যে, সত্য একটিই। আর তা হলো হযরত ঈসা মসীহ (আ.) তাঁর মাতা মারইয়ামের গর্ভে জন্মগ্রহণকারী একজন মানুষ ও আল্লাহ তা'আলার সত্য রাসূল। এর অতিরিক্ত তাঁর সম্পর্কে যা কিছু বলা বা ধারণা করা হয়, তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও বাতিল। তাঁর প্রতি ইহুদিদের মতো অবজ্ঞা বা ঈর্ষা পোষণ করা অথবা খ্রিস্টানদের মতো অতি ভক্তি প্রদর্শন করা সমভাবে নিন্দনীয় ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

কুরআন মাজীদের অসংখ্য আয়াতে একদিকে ইহুদি-খ্রিস্টানদের পথভ্রষ্টতা দৃঢ়ভাবে প্রকাশ করা হয়েছে, অপরদিকে আল্লাহ তা'আলার দরবারে হযরত ঈসা (আ.)-এর উচ্চ মর্যাদা ও বিশেষ সম্মানের অধিকারী হওয়ার কথাও জোরালোভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে। ফলে অবজ্ঞা ও অতিভক্তি দু'টি পরস্পর বিরোধী ভ্রান্ত মতবাদের মধ্যবর্তী সত্য ও ন্যায়ের সঠিক পথ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا

অর্থাৎ, আসমান ও জমিনে উপর হতে নিচ পর্যন্ত যা কিছু আছে সবই আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টি ও তাঁর বান্দা। অতএব, তাঁর কোনো অংশীদার বা পুত্র-পরিজন হতে পারে না। আল্লাহ তা'আলা একাই সর্বকার্য সম্পাদনকারী এবং সকলের কার্য সম্পাদনের জন্য তিনি একাই যথেষ্ট, অন্য কারো সাহায্য-সহায়তার প্রয়োজন নেই। তিনি একক; তাঁর কোনো অংশীদার বা পুত্র-পরিজন থাকতে পারে না।

www.almodina.com

সারকথা, কোনো সৃষ্ট ব্যক্তিরই স্রষ্টার অংশীদার হওয়ার যোগ্যতা নেই। আল্লাহ তা'আলার পবিত্র সত্তার জন্য এর অবকাশও নেই, প্রয়োজনও নেই। অতএব, একমাত্র বিবেকবর্জিত, ঈমান হতে বঞ্চিত ব্যক্তি ছাড়া আল্লাহ তা'আলার সৃষ্ট কোনো জীবকে তাঁর অংশীদার বা পুত্র বলা অন্য কারো পক্ষে সম্ভব নয়।

ধর্মের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করা হারাম : لَا تَغْلُوْا فِيْ دِيْنِكُمْ আয়াতে ইহুদি-নাসারাগণকে ধর্মের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করতে নিষেধ করা হয়েছে। غُلُوٌّ শব্দের অর্থ সীমা ছাড়িয়ে যাওয়া। ইমাম জাসসাস 'আহকামুল কুরআনে' লিখেছেন–

اَلْغُلُوُّ فِي الدِّيْنِ هُوَ مُجَاوَزَةُ حَدِّ الْحَقِّ فِيْهِ অর্থাৎ, ধর্মের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করার অর্থ তার ন্যায়সঙ্গত সীমা রেখা অতিক্রম করা।

আহলে কিতাব অর্থাৎ ইহুদি-খ্রিস্টান উভয় জাতিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, ধর্মের ব্যাপারে কোনোরূপ বাড়াবাড়ি করো না। কারণ এ বাড়াবাড়ির রোগে উভয় জাতিই আক্রান্ত হয়েছে। খ্রিস্টানরা হযরত ঈসা (আ.)-কে ভক্তি-শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করেছে। তাঁকে স্বয়ং খোদা, খোদার পুত্র অথবা তিনের এক খোদা বানিয়ে দিয়েছে। অপর দিকে ইহুদিরা তাঁকে অমান্য ও প্রত্যাখ্যান করার দিক দিয়ে বাড়াবাড়ির শিকার হয়েছে। তারা হযরত ঈসা (আ.)-কে আল্লাহর নবী হিসেবে স্বীকার করেনি; বরং তাঁর মাতা হযরত মারইয়াম (আ.)-এর উপর মারাত্মক অপবাদ আরোপ করেছে এবং তাঁর নিন্দাবাদ করেছে।

ধর্মের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি ও সীমা লঙ্ঘনের কারণে ইহুদি ও খ্রিস্টানদের গোমরাহী ও ধ্বংস হওয়ার শোচনীয় পরিণতি বার বার প্রত্যক্ষ হয়েছে। তাই হযরত রাসূলে কারীম ﷺ তাঁর প্রিয় উম্মতকে এ ব্যাপারে সংযত থাকার জন্য সতর্ক করেছেন। মুসনাদে আহমদে হযরত ফারুকে আযম (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন :

لَا تُطْرُوْنِيْ كَمَا اَطْرَتِ النَّصَارٰى عِيْسَى بْنَ مَرْيَمَ فَاِنَّمَا اَنَا عَبْدٌ فَقُوْلُوْا عَبْدُ اللّٰهِ وَرَسُوْلُهٗ

অর্থাৎ, তোমরা আমার প্রশংসা করতে গিয়ে এমন অতিরঞ্জন করো না, যেমন, খ্রিস্টানরা হযরত ঈসা ইবনে মারইয়াম (আ.)–এর ব্যাপারে করেছে। স্মরণ রাখবে যে, আমি আল্লাহর বান্দা। অতএব, আমাকে আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল বলবে।' বুখারী এবং ইবনে মাদয়িনী এ হাদীস উল্লেখ করে এর সনদকে সহীহ বলেছেন।

সারকথা, আল্লাহর বান্দা ও মানুষ হিসেবে আমিও অন্য লোকদের সমপর্যায়ের। তবে আমার সবচেয়ে বড় মর্যাদা এই যে, আমি আল্লাহর রাসূল। এর চেয়ে অগ্রসর করে আমাকে আল্লাহ তা'আলার কোনো বিশেষণে বিশেষিত করা বাড়াবাড়ি বৈ নয়। তোমরা ইহুদি-নাসারাদের মতো বাড়াবাড়ি করো না। বস্তুত ইহুদি-খ্রিস্টানরা শুধু নবীগণের ব্যাপারেই বাড়াবাড়ি করে ক্ষান্ত হয়নি; বরং এটা যখন তাদের স্বভাবে পরিণত হলো, তখন তারা নবীগণের সহচর ও অনুগামীদের ব্যাপারেও অতিরঞ্জিত সব গুণ আরোপ করেছিল। পাদ্রী-পুরোহিতগণকেও তারা নিষ্পাপ মনে করতো। অতঃপর এতটুকু যাচাই করারও প্রয়োজন মনে করতো না যে, তারা সত্যিকারভাবে নবীগণের অনুগত এবং তাঁদের শিক্ষার অনুসারী না শুধু উত্তরাধিকার সূত্রে পণ্ডিত–পুরোহিত রূপে পরিগণিত হন? ফলে পরবর্তীকালে তাদের নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব এমন পাদ্রী-পুরোপহিতদের কুক্ষিগত হয়েছে যারা নিজেরা স্বার্থপর ও পথভ্রষ্ট ছিল এবং অনুসারীদেরকে চরম বিভ্রান্তি ও গোমরাহীর আবর্তে নিক্ষেপ করেছে। ধর্ম-কর্মের নামে তারা অধর্ম-অনাচারে লিপ্ত হয়েছে। কুরআনে পাক ঘোষাণা করেছে :

اِتَّخَذُوْٓا اَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ

'তারা আল্লাহকে ছেড়ে তাদের ধর্মীয় পণ্ডিতগণ ও সন্যাসীদেরকে মা'বুদের আসনে বসিয়েছিল।' রাসূলকে তো খোদা বানিয়ে ছিলই, রাসূলের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধার নামে পূর্ববর্তী নবীগণকেও পূজা করা শুরু করেছিল।

এতদ্বারা বুঝা গেল যে, ধর্মের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করা এমন এক মারাত্মক ব্যাধি যা ধর্মের নামেই পূর্ববর্তী ধর্মসমূহের সত্যিকার রূপরেখাকে বিলীন করেছে। তাই আমাদের প্রিয়নবী ﷺ স্বীয় উম্মতকে এহেন ভয়াবহ মহামারীর কবল হতে রক্ষা করার জন্য পূর্ণ সতর্কতা ও নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন।

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, হজের সময় 'রমীয়ে জামারাহ' অর্থাৎ, কঙ্কর নিক্ষেপের জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)–কে কঙ্কর আনতে আদেশ করলেন। তিনি মাঝারী আকারের পাথরকুচি নিয়ে এলে রাসূলুল্লাহ ﷺ অত্যন্ত পছন্দ করলেন এবং বললেন– بِمِثْلِهِنَّ অর্থাৎ, এ ধরনের মাঝারী আকারের কঙ্কর নিক্ষেপ করাই পছন্দনীয়। বাক্যটি তিনি দুবার বললেন। অতঃপর আরো বললেন :

www.almodina.com

إِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فِي الدِّيْنِ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِالْغُلُوِّ فِيْ دِيْنِهِمْ

অর্থাৎ, ধর্মের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি থেকে দূরে থাক। কেননা তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতসমূহ তাদের ধর্মের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করার কারণেই ধ্বংস হয়েছে। এ হাদীস দ্বারা কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ মাসায়েল জানা গেল।

কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ মাসায়েল : প্রথমতঃ হজের সময়ই কঙ্কর নিক্ষেপ করা হয় তা মাঝারী আকারের হওয়া সুন্নত। অতি ক্ষুদ্র বা বড় পাথর নিক্ষেপ করা সুন্নতের পরিপন্থি। বড় বড় প্রস্তর নিক্ষেপ করা ধর্মের কাজে বাড়াবাড়ির শামিল।

দ্বিতীয়তঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বীয় কথা ও কাজের মাধ্যমে যে কাজের যে সীমারেখা শিক্ষা দিয়েছেন, সেটিই শরিয়তের নির্ধারিত সীমা তা অতিক্রম করাই বাড়াবাড়ি রূপে পরিগণিত হবে।

তৃতীয়তঃ যে কোনো কাজে সুন্নত সম্মত সীমারেখা অতিক্রম করাই বাড়াবাড়ি রূপে বিবেচনা করতে হবে।

দুনিয়ার মহব্বতের রূপরেখা : পার্থিব ধন-সম্পদ, আরাম-আয়েশের প্রতি প্রয়োজনাতিরিক্ত আকাঙ্ক্ষা ও লোভ-লালসা ইসলামের দৃষ্টিতে নিন্দনীয়। এটা পরিত্যাগ করার জন্য কুরআন পাক বার বার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। দুনিয়ার মহব্বত বা পার্থিব মোহ সম্পর্কে সতর্ক করার সাথে সাথে রাসূলে কারীম ﷺ স্বীয় কথা ও কার্য দ্বারা তার সীমারেখাও নির্ধারণ করেছেন। যেমন, বিবাহ করাকে তিনি নিজের সুন্নত বলে ঘোষণা করেছেন, বিবাহ করার জন্য উৎসাহিত করেছেন, সন্তান জন্মদানের উপকারিতা বুঝিয়েছেন, পরিবার-পরিজনের সাথে সদ্ব্যবহার ও পরিবারবর্গের জীবিকা নির্বাহের জন্য উপার্জন করাকে فَرِيْضَةٌ بَعْدَ الْفَرِيْضَةِ বলে আখ্যায়িত করেছেন। ব্যবসায়, কৃষিকার্য, শিল্প-কর্ম, হস্তশিল্প ও মজদুরীর জন্য প্রেরণা যুগিয়েছেন। অতএব, এর কোনোটাই দুনিয়ার মহব্বতের গণ্ডির মধ্যে পড়ে না। ইসলামি সমাজ-ব্যবস্থা প্রবর্তন এবং ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করাকে নবুয়তের দায়িত্ব হিসেবে গ্রহণ করে রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বীয় প্রচেষ্টায় সমগ্র আরব উপ-দীপে একটি শক্তিশালী রাষ্ট্রের পত্তন করেন। অতঃপর খোলাফায়ে রাশেদীনের সুবর্ণ যুগে সে দুনিয়ার কোনো মোহই ছিল না। এতদ্বারা সাব্যস্ত হয় যে, প্রয়োজন অনুসারে এসব করা নিন্দনীয় নয়।

ইহুদি ও খ্রিস্টানরা এ তত্ত্বটি অনুধাবন করতে অপারগ হওয়ায় সন্যাস ব্রত গ্রহণ করেছে। তাদের এ ভ্রান্তি খণ্ডন করে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন : وَرَهْبَانِيَّةَنِ ابْتَدَعُوْهَا مَا كَتَبْنٰهَا عَلَيْهِمْ اِلَّا ابْتِغَآءَ رِضْوَانِ اللّٰهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا

অর্থাৎ, তারা নিজেদের পক্ষ থেকে সন্যাস ব্রত গ্রহণ করেছেন। যা আমি তাদের প্রতি আরোপ করিনি অতঃপর তারা তা যথাযথ বজায় রাখেনি।

সুন্নত ও বিদ'আতের সীমারেখা : ইবাদত, লেন-দেন, আচার-ব্যবহার তথা জীবনের সর্বক্ষেত্রে রাসূলে পাক ﷺ স্বীয় কথা ও কাজের মাধ্যমে মধ্যপন্থা নির্দেশ করেছেন। তার চেয়ে পিছনে অবস্থান যেমন, অবাঞ্ছনীয়, তেমনি অগ্রসর হওয়াও অমার্জনীয়। এজন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ সর্বপ্রকার বিদআতকে কঠোরভাবে প্রতিরোধ করেছেন। তিনি ইরশাদ করেছেন كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ অর্থাৎ, প্রত্যেকটি বিদআতই গোমরাহী, প্রত্যেকটি গোমরাহীর পরিণামই জাহান্নাম। রাসূলে মাকবূল ﷺ-এর কথা বা কার্যের মধ্যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যে বিষয়ের সমর্থন পাওয়া যায় না, এরূপ কোনো বিষয়কে ছওয়াবের কাজ মনে করাই বিদ'আত।

হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.) লিখেছেন : 'ইসলামের দৃষ্টিতে বিদ'আতকে চরম অপরাধ এ জন্য বলা হয়েছে যে, এটাই দীন ও শরিয়তকে বিকৃত করার প্রধান হাতিয়ার ও চিরাচরিত পন্থা। পূর্বপবর্তী উম্মতগণেরও প্রধান ব্যাধি ছিল যে, তারা নিজেদের নবী ও রাসূলগণের মৌলিক শিক্ষার উপর নিজেদের পক্ষ থেকে পরিবর্তন করেছিল। এমনকি শেষ পর্যন্ত তারা কি কি বর্ধিত করেছে আসল বিষয়টা কি ছিল, তা জানারও কোনো উপায় ছিল না।

দীনকে বিকৃত করার কারণ ও পন্থাসমূহ কি কি, কোনো গুপ্তপথে যাতে এ মহামারী উম্মতে মুহাম্মদীর মধ্যে অনুপ্রবেশ করতে না পারে, তজ্জন্য ইসলামি শরিয়ত কিভাবে প্রতিটি পথে সতর্ক ও শক্তিশালী প্রহরা মোতায়েন করা হয়েছে সে সম্পর্কে হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.) তদীয় حُجَّةُ اللّٰهِ الْبَالِغَةِ কিতাবে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

ধর্মীয় নেতাদের প্রতি ভক্তি ও সম্মানের মধ্যপন্থা : উক্ত কারণসমূহের মধ্যে অন্যতম কারণ হলো ধর্মের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করা। কিন্তু পরিতাপের বিষয় যে, নবী করীম ﷺ-এর কঠোর হুঁশিয়ারী এবং শরিয়তের কঠিন বিধি-নিষেধ সত্ত্বেও বর্তমান মুসলিম সমাজ ধর্মীয় ব্যাপারে বাড়বাড়ির শিকারে পরিণত হয়েছে। দীনের প্রতিটি শাখায় এই লক্ষণ সুস্পষ্ট ও উদ্বেগজনক। দীন ও ঈমানের জন্য সবচেয়ে ক্ষতিকর ও মারাত্মক হচ্ছে ধর্মীয় নেতাদের প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধার আতিশয্য

অথবা অবহেলা ও অবজ্ঞার মনোবৃত্তি। একদল মনে করছে যে, ধর্মীয় আলেম-ওলামা, পীর-বুজুর্গাণের কোনো প্রয়োজন নেই; আল্লাহর কিতাবই আমাদের জন্য যথেষ্ট। কারণ তারাও মানুষ আমরাও মানুষ। এমনোভাবাপন্ন কোনো কোনো উচ্চাভিলাষী ব্যক্তি আরবি ভাষায়ও অনভিজ্ঞ, কুরআনের হাকিকত ও নিগূঢ় তত্ত্ব সম্পর্কে অজ্ঞ। রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবায়ে কেরামের বর্ণিত ব্যাখ্যা ও তাফসীর সম্পর্কে ওয়াকিফহাল না হওয়া সত্ত্বেও, কয়েকখানি অনুবাদ পুস্তক পাঠ করে নিজেকে কুরআনের সমঝদার মনে করে বসছে। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর প্রত্যক্ষ শাগরেদ অর্থাৎ, সাহাবায়ে কেরাম কর্তৃক বর্ণিত ব্যাখ্যা ও তাফসীরের তোয়াক্কা না করে নিজেদের কল্পনা-প্রসূত মনগড়া বাখ্যা দিতে শুরু করেছে। অথচ তারা চিন্তা করে না যে, উস্তাদ ছাড়া শুধু কিতাবই যদি যথেষ্ট হতো, তবে আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনের লিখিত কপি প্রত্যেকের ঘরে ঘরে পৌঁছে দিতে সক্ষম ছিলেন– রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে উস্তাদরূপে প্রেরণের আবশ্যক হতো না। একথা শুধু আল্লাহর কিতাবের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং দুনিয়ার যে কোনো বিষয় বা শাস্ত্রের বই পুস্তক বা অনুবাদ পাঠ করেই কেউ উক্ত শাস্ত্রে পারদর্শী হতে পারে না। শুধু ডাক্তারী বই পড়েই আজ পর্যন্ত কেউ বড় ডাক্তার হতে পারেনি। প্রকৌশল বিদ্যার বই অধ্যয়ন করেই কোনো পারদর্শী প্রকৌশলী হয়েছে বলে শুনা যায় না। এমনকি দর্জিবিদ্যা বা পাক প্রণালীর শুধু বই পড়ে কোনো সুদক্ষ দর্জি বা বাবুর্চি হতেও দেখা যায় না; বরং এসব ক্ষেত্রে শিক্ষক, শিক্ষার্থী, শিক্ষাদান ও শিক্ষা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা সর্বজন স্বীকৃত। অথচ তারা কুরআন হাদীসকে এত হাল্কা মনে করেছে যে, এগুলো বুঝার জন্য কোনো উস্তাদের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে না। এটা সত্যই পরিতাপের বিষয়।

অনুরূপভাবে একদল শিক্ষিত লোক গড্ডালিকা প্রবাহে মেতে উঠেছে যে, কুরআন পাক বুঝার জন্য তরজমা অধ্যয়নই যথেষ্ট। পূর্ববর্তী মনীষীগণের তাফসীর ও ব্যাখ্যার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করা বা তাঁদের অনুসরণ-অনুকরণ করার আদৌ কোনো প্রয়োজন নাই। আদতে এটাও এক প্রকার বাড়াবাড়ি বা অনধিকার চর্চা।

অপরদিকে বহু মুসলমান অন্ধ ভক্তিজনিত রোগে আক্রান্ত যাকে তাদের পছন্দ হয়েছে, তাকেই নেতা সাব্যস্ত করে অন্ধভাবে অনুসরণ করেছে। তারা কখনো এতটুকু যাচাই করে দেখে না যে, আমরা যাকে নেতারূপে অনুসরণ করছি তিনি ইলম-আমল, ইছলাহ ও পরহেজগারীর মাপকাঠিতে টিকেন কিনা? তারা যে শিক্ষা দিচ্ছেন তা কুরআন ও সুন্নাহ মোতাবেক কিনা? প্রকৃতপক্ষে এহেন অন্ধভক্তিও বাড়াবাড়িরই নামান্তর।

বাড়াবাড়ির উভয় পথ থেকে আত্মরক্ষার জন্য ইসলামি শরিয়তের পথনির্দেশ হচ্ছে এই যে, আল্লাহর কিতাব আল্লাহ ওয়ালা লোকদের কাছে বুঝতে হবে এবং আল্লাহর কিতাব দ্বারা আল্লাহ ওয়ালা লোকদের চিনতে হবে। অর্থাৎ, প্রথমে কুরআন ও হাদীসের নির্ধারিত নিরিখের আলোকে খাঁটি আল্লাহ ওয়ালাকে চিনে নাও। অতঃপর দেখ তাঁরা কুরআন ও হাদীসের চর্চায় সদা নিমগ্ন এবং তাদের জীবনধারাও কুরআন হাদীসের রংএ রঞ্জিত কিনা? অতঃপর কুরআন ও হাদীসের সব জটিল প্রশ্নের সমাধানে তাঁদের অভিমত ও সিদ্ধান্তকে নিজের বুঝ-ব্যবস্থার উপর প্রাধান্য ও অগ্রাধিকার দিয়ে তার অনুসরণ করতে হবে।

আল্লাহর বান্দা হওয়াই সর্বোচ্চ মর্যাদার বিষয় : لَنْ يَّسْتَنْكِفَ الْمَسِيْحُ اَنْ يَّكُوْنَ عَبْدًا لِّلّٰهِ অর্থাৎ, হযরত ঈসা (আ.) স্বয়ং এবং আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভকারী ফেরেশতাগণ কখনো আল্লাহর বান্দারূপে পরিচিত হতে লজ্জা বা অপমান বোধ করেন না। কারণ আল্লাহর দাসত্ব ও গোলামি করা, তার ইবাদত-বন্দেগি করা, আদেশ-নিষেধ পালন করা অতি মর্যাদা, গৌরব ও সৌভাগ্যের বিষয়। হযরত ঈসা মসীহ (আ.) ও হযরত জিবরাঈল (আ.) প্রমুখ বিশিষ্ট ফেরেশততাগণ এ সম্পর্কে উত্তমরূপে অবহিত রয়েছেন। তাই এতে তাঁদের কোনো লজ্জা নেই। আসলে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো দাসত্ব বা গোলামি করাই লজ্জা ও অমর্যাদার কাজ। যেমন, খ্রিস্টানরা হযরত ঈসা মসীহ (আ.)-কে আল্লাহর পুত্র ও অন্যতম উপাস্য সাব্যস্ত করেছে এবং মুশরিকরা ফেরেশতাদেরকে আল্লাহর কন্যা ও দেবি সাব্যস্ত করে তাদের মূর্তি তৈরি করে পূজা অর্চনা শুরু করেছে। অতএব, তাদের জন্য চিরস্থায়ী শাস্তি ও অপমান অবধারিত হয়েছে। –[ফাওয়ায়েদে উসমানী]

قَدْ جَآءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ 'বুরহান' শব্দের আভিধানিক অর্থ অকাট্য দলিল-প্রমাণ। এ আয়াতে এর দ্বারা রাসূলুল্লাহ ﷺ–এর পবিত্র সত্তা ও মহান ব্যক্তিত্বকে বুঝানো হয়েছে। –[তাফসীরে রূহুল মা'আনী]

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ–এর মহান ব্যক্তিত্বের জন্য 'বুরহান' শব্দ প্রয়োগ করার তাৎপর্য এই যে, তাঁর বরকতময় সত্তা অনুপম চরিত্র মাধুর্য, অপূর্ণ মু'জিযাসমূহ, তাঁর প্রতি বিস্ময়কর কিতাব আল কুরআন অবতীর্ণ হওয়া ইত্যাদি তাঁর রেসালাতের অকাট্য দলিল ও প্রকৃষ্ট প্রমাণ। যার পরে আর কোনো সাক্ষ্য-প্রমাণের আবশ্যক হয় না। অতএব, তাঁর মহান ব্যক্তিত্বই তাঁর সত্যতার অকাট্য প্রমাণ।

www.almodina.com

আলোচ্য আয়াতে نُورٌ (নূর) শব্দ দ্বারা কুরআন মাজীদকে বুঝানো হয়েছে। –[রূহুল মা'আনী] যেমন, সূরায়ে মায়েদার আয়াত : قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللّٰهِ نُورٌ وَكِتٰبٌ مُبِيْنٌ অর্থাৎ, তোমাদের কাছে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে এক উজ্জ্বল আলো তথা এক প্রকৃষ্ট কিতাব অর্থাৎ, কুরআন এসেছে। –[বয়ানুল কুরআন]

আবার নূর অর্থ রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং কিতাব অর্থ আল কুরআনও হতে পারে। –[রূহুল মা'আনী] তবে তার অর্থ এই নয় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মানবীয় দৈহিকতা থেকে পবিত্র শুধু নূর ছিলেন।

আয়াতের বিষয়বস্তু : এ সূরার দ্বিতীয় রুকূ' হতে উত্তরাধিকারী সম্বন্ধীয় আয়াত অবতীর্ণ হওয়া শুরু হয়। কিন্তু এটা শেষ হওয়ার পূর্বেই ইহুদি ও খ্রিস্টানদের সাথে ধর্ম বিষয়ে বিচার বিতর্ক আরম্ভ হওয়ায় ঐ সম্বন্ধীয় আয়াত অবতীর্ণ হতে থাকে। ইহুদি ও খ্রিস্টানদের প্রসঙ্গ শেষ করে উত্তরাধিকার বিষয়ের অবশিষ্ট বিধি-নিষেধ অবতারণপূর্বক আল্লাহ তা'আলা এ সূরা সমাপ্ত করেছেন।

قَوْلُهُ اَلْكَلٰلَةِ এর অর্থ : كَلٰلَةٌ (কালালাহ) শব্দটি মাসদার, যার অর্থ– اَلْاِعْيَاءُ বা ভোঁতা, দুর্বল, অক্ষম। যেমন, বলা হয়–

كَلَّ الرَّجُلُ فِيْ مَشْيِهٖ كَلَالًا وَالسَّيْفُ عَنْ ضَرْبَتِهٖ كُلُوْلًا وَكَلَالَةُ اللِّسَانِ عَنِ الْكَلَامِ

অর্থাৎ, লোকটি চলার মধ্যে অক্ষম হয়ে গেছে, তরবারি প্রহার করা থেকে ভোঁতা হয়ে গেছে, জিহ্বা কথা বলার ক্ষেত্রে অপরাগ হয়ে গেছে। অবশ্য পরবর্তীতে শব্দটি অসহায় আত্মীয় অর্থে ব্যাপকতা লাভ করেছে।

আল্লামা বায়যাবী ও আল্লামা বাগাভী (র.) বলেন هُمْ اِسْمٌ لِلْمُوْرِثِ الَّذِيْ لَا وَلَدَ لَهٗ وَلَا وَالِدَ

অর্থাৎ, كَلٰلَةٌ ঐ মৃত ব্যক্তিকে বলা হয়, যার পিতামাতা এবং সন্তান-সন্ততি নেই। হযরত আবূ বকর (রা.) বলেন, كَلٰلَةٌ ঐ ব্যক্তিকে বলে যার পিতাও নেই, পুত্রও নেই। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে–

عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْكَلَالَةِ قَالَ مَا خَلَا الْوَالِدِ وَالْوَلَدِ

বস্তুত যার প্রকৃত ওয়ারিশ অর্থাৎ, পিতামাতা ও সন্তানাদি নেই, এখানে তাকেই كَلَالَةٌ বলা হয়েছে। এমতাবস্থায় তার সহোদর ভাই বোনেরা তার পুত্র-কন্যার স্থলাভিষিক্ত হবে। আর সহোদর ভাইবোন না থাকলে সৎ ভাইবোনেরাই স্থলাভিষিক্ত হবে। এক বোন থাকলে তার জন্য পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধেক, তদূর্ধ্ব বোন থাকলে দু-তৃতীয়াংশ এবং ভাইবোন মিশ্রিত থাকলে প্রত্যেক ভাই দুবোনের সমান অংশ পাবে। আর যদি শুধু ভাই থাকে, তবে সে তার বোনের পরিত্যক্ত সম্পূর্ণ সম্পত্তির ওয়ারিশ হবে।

قَوْلُهُ اُخْتٌ –এর মর্মার্থ : اُخْتٌ বলতে এ আয়াতে সহোদরা বোন এবং সৎ বোনকে বুঝানো হয়েছে।

শব্দের বিশ্লেষণ :

لَا تَغْلُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ نهى حاضر معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْغُلُوُّ মূলবর্ণ (غ . ل . و) জিনস ناقص واوى অর্থ– তোমরা সীমালঙ্ঘন করো না।

لَنْ يَّسْتَنْكِفَ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ نفى تاكيد بلن در فعل مضارع معروف বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِسْتِنْكَافُ মূলবর্ণ (ن . ك . ف) জিনস صحيح অর্থ– সে কখনো লজ্জাবোধ করবে না।

يَسْتَفْتُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ فعل مضارع معروف বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِسْتِفْتَاءُ মূলবর্ণ (ف . ت . و) জিনস ناقص يائى অর্থ– তারা ফতোয়া চায়।

يُفْتِيْكُمْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ فعل مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِفْتَاءُ মূলবর্ণ (ف . ت . و) জিনস ناقص واوى অর্থ– তিনি ফতোয়া দিচ্ছেন।

سُوْرَةُ الْمَائِدَةِ

সূরাতুল মায়িদা

মদীনায় অবতীর্ণ : আয়াত- ১২০, রুকূ'- ১৬

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْاَنْعَامِ اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّى الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرُمٌ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ (١)

অনুবাদ : (১) হে ঈমানদারগণ! প্রতিশ্রুতিসমূহ পূর্ণ কর, তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে, সমস্ত চতুষ্পদ জন্তু যেগুলো গৃহপালিত পশু সদৃশ ঐগুলো ব্যতীত, যাদের বর্ণনা সম্মুখে আসছে, কিন্তু তোমরা ইহরাম অবস্থায় শিকারকে হালাল মনে করো না, নিশ্চয় আল্লাহ বিধিবদ্ধ করে থাকেন যা ইচ্ছা করেন।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُحِلُّوْا شَعَآئِرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَآئِدَ وَلَاۤ اٰمِّيْنَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ؕ وَاِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا ؕ

(২) হে ঈমানদারগণ! আল্লাহর প্রতীকসমূহের অসম্মান করো না এবং সম্মানিত মাসসমূহেরও না এবং হরম শরীফে কুরবানি করার জন্য নির্দিষ্ট জীবেরও না এবং ঐ সমস্ত জীবেরও না যাদের গলায় দোয়াল বা পাট্টা পরানো হয়েছে এবং ঐ সমস্ত লোকেরও না যারা বায়তুল হারামের উদ্দেশ্যে গমন করতেছে, স্বীয় পরওয়ারদেগারের করুণা ও সন্তুষ্টির অন্বেষণকারী হয়ে,

শাব্দিক অনুবাদ

(১) يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا হে ঈমানদারগণ! اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ প্রতিশ্রুতিসমূহ পূর্ণ কর اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْاَنْعَامِ তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে, সমস্ত চতুষ্পদ জন্তু যেগুলো গৃহপালিত পশু সদৃশ اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ ঐগুলো ব্যতীত, যাদের বর্ণনা সম্মুখে আসছে غَيْرَ مُحِلِّى الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرُمٌ কিন্তু তোমরা ইহরাম অবস্থায় শিকারকে হালাল মনে করো না اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ নিশ্চয় আল্লাহ বিধিবদ্ধ করে থাকেন যা ইচ্ছা করেন।

(২) يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا হে ঈমানদারগণ! لَا تُحِلُّوْا شَعَآئِرَ اللّٰهِ আল্লাহর প্রতীকসমূহের অসম্মান করো না وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ এবং সম্মানিত মাসসমূহেরও না وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَآئِدَ এবং হরম শরীফে কুরবানি করার জন্য নির্দিষ্ট জীবেরও না এবং ঐ সমস্ত জীবেরও না যাদের গলায় দোয়াল বা পাট্টা পরানো হয়েছে وَلَاۤ اٰمِّيْنَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ এবং ঐ সমস্ত লোকেরও না যারা বায়তুল হারামের উদ্দেশ্যে গমন করতেছে يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا স্বীয় পরওয়ারদেগারের করুণা ও সন্তুষ্টির অন্বেষণকারী হয়ে وَاِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا আর যখন তোমরা ইহরাম ত্যাগ কর, তখন শিকার কর,

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا ۘ وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى ۖ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۖ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ (٢)

অনুবাদ : আর যখন তোমরা ইহরাম ত্যাগ কর, তখন শিকার কর, আর যেন তোমাদের জন্য সীমালঙ্ঘনের কারণ না হয়ে পড়ে ঐ সম্প্রদায়ের শত্রুতা যা তোমাদেরকে মসজিদে হারাম [-এ প্রবেশ করা] হতে প্রতিরোধ করার দরুন হয়েছে। এবং নেকী ও পরহেজগারীতে একে অন্যের সাহায্য করতে থাক, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা কঠোর শাস্তি প্রদানকারী।

শাব্দিক অনুবাদ

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ আর যেন তোমাদের জন্য কারণ না হয়ে পড়ে شَنَاٰنُ قَوْمٍ ঐ সসম্প্রদায়ের শত্রুতা اَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ যা তোমাদেরকে মসজিদে হারাম [-এ প্রবেশ করা] হতে প্রতিরোধ করার দরুন হয়েছে اَنْ تَعْتَدُوْا সীমালঙ্ঘনের। وَتَعَاوَنُوْا এবং সাহায্য করতে থাক عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى নেকী ও পরহেজগারীতে একে অন্যের وَلَا تَعَاوَنُوْا এবং একে অন্যের সাহায্য করো না عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ পাপ কার্যে ও সীমালঙ্ঘনে। وَاتَّقُوا اللّٰهَ এবং আল্লাহকে ভয় করতে থাক اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা কঠোর শাস্তি প্রদানকারী।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

যোগসূত্র : উপরে মোটামুটি ও ব্যাপক ভঙ্গিতে শরিয়তের বিধানসমূহ মেনে চলার আদেশ ছিল। সম্মুখের দিকে আদিষ্ট বিষয়ের শাখা-প্রশাখাগুলোর বিস্তৃত বিবরণ রয়েছে। তন্মধ্যে কতকগুলো শাখাবিধান, আর কতগুলো বিষয় বিরোধী দলের অবস্থাবলি সম্বলিত, আর কতগুলো উপরিউল্লিখিত বিষয়গুলোর ভূমিকা এবং পরিশিষ্ট।

নামকরণ : تَسْمِيَةُ الْكُلِّ بِاسْمِ الْجُزْءِ -এর নিয়মানুযায়ী একে সূরা 'আল মায়িদাহ' নামে নামকরণ করা হয়েছে। কেননা এ সূরার পঞ্চদশ রুকূ'তে ১১৪ নং আয়াতে 'মায়িদাহ' শব্দের উল্লেখ রয়েছে। যেমন, قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَآ اَنْزِلْ عَلَيْنَا مَآئِدَةً مِّنَ السَّمَآءِ 'মায়িদাহ' শব্দের অর্থ– হলো খাদ্যদ্রব্য, দস্তরখান, খাদ্যাধার ও ভোজৎপানীয় ইত্যাদি। ইমাম রাযী ও ইমাম রাগেব (র.) এর মতে, مَائِدَة শব্দের অর্থ অনুগ্রহ ও কল্যাণ। ফলে হযরত ঈসা (আ.)-এর প্রতি অবতারিত অনুগ্রহ ও কল্যাণসমূহ অত্র সূরায় আলোচিত হয়েছে। বিধায় এ সূরাকে 'মায়িদাহ' নামে নামকরণ করা হয়েছে।

কিছু সংখ্যক তাফসীরকারকের মতে, এ সূরাটির অপর নাম হলো سُوْرَةُ الْعُقُوْدِ 'সূরাতুল উকূদ'। যেহেতু এ সূরাতে আল্লাহর সাথে দেওয়া প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করার কথা বর্ণিত হয়েছে। আর সূরার শুরুতে 'উকূদ' [প্রতিজ্ঞা-প্রতিশ্রুতি]-এর কথা উল্লিখিত হয়েছে। আর কোনো কোনো তাফসীরকার বলেন, এর নাম 'সূরাতুল মুনকিযাহ' [আজাব হতে মুক্তিদানকারী]। কেননা এ সূরার নির্দেশাবলির উপর আমল করলে আজাব হতে রক্ষা পাওয়া যায়।

বিষয়বস্তু : মহাগ্রন্থ আল কুরআনের সর্ববৃহৎ সূরাগুলোর অন্যতম সূরা হলো 'আল মায়িদাহ'। এর বিষয়বস্তুগুলো নিম্নরূপ :

১. **মুসলমানদেরকে তাদের ধর্মীয় ও তামাদ্দুনিক বিষয়াবলি যথাযথভাবে মান্য করার নির্দেশ :** মহান আল্লাহ তা'আলার সাথে কৃত প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করা নির্দেশ হজের সফরের নিয়ম কানুনের বর্ণনা, আল্লাহর নিদর্শনসমূহের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা এবং বায়তুল্লাহ জেয়ারতকারীদের প্রতি কোনোরূপ বাধা সৃষ্টি না করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

২. **খাদ্যদ্রব্য সম্পর্কীয় হালাল হারামের বর্ণনা :** খাদ্য ও পানীয় দ্রব্যাদিতে হালাল হারামের সীমা নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে। জাহিলিয়া যুগের বিভিন্ন উদ্দেশ্যে জবাইসমূহ হারাম করা হয়েছে। আহলে কিতাবদের সাথে পানাহার করা ও তাদের কন্যাদেরকে বিবাহ করার অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। আল্লাহর নামে কৃত শপথ ভঙ্গের কাফফারা নির্দিষ্ট করা হয়েছে। ব্যভিচার ও গোপন প্রণয়নের নিমিত্তে গ্রহণ করতে নিষেধ করা হয়েছে।

www.almodina.com

৩. **বিভিন্ন বিধিবিধান :** অজু, গোসল ও তায়াম্মুমের বিস্তারিত বিধান, ন্যায়সঙ্গতভাবে সাক্ষ্য প্রদান ও সৎকর্ম করার নির্দেশক বিষয় আলোচিত হয়েছে। ইহুদি জাতির হীন প্রকৃতি, ধর্মীয় গ্রন্থের পরিবর্তন, আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদার ভঙ্গ, খ্রিস্টান জাতির ভ্রান্তি ও অধঃপতন, প্রতিমাপূজকদের অন্ধ বিশ্বাস, অজ্ঞতা এবং তাদেরকে সৎ পথে আনার জন্য রাসূল প্রেরণের বিষয় উল্লিখিত হয়েছে।

৪. **ভ্রান্ত কার্যকলাপের বর্ণনা :** হযরত আদম (আ.)-এর পুত্রদ্বয় হাবীল ও কাবীলের ঘটনা, চুরি, ডাকাতি ও খুন খারাবির বিধিবিধান, ধর্মদ্রোহীদের কার্যকলাপের কথা বর্ণিত হয়েছে।

৫. **ইসলাম ও বাতিল ধর্মের বিষয়ে বর্ণনা :** পবিত্র ইসলামের পূর্ণ পরিণতি, মুসলমান জাতির স্বতন্ত্র্য ও আত্মনির্ভরশীলতার কথা আলোচিত হয়েছে। মুসলমানগণ সে সময় শাসক গোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছিল। তাদের হাতে ক্ষমতা ও শাসনদণ্ড ছিল আর তা পূর্ববর্তী জাতিসমূহের গোমরাহী ও ভ্রষ্টতার কারণে হয়েছে। ফলে তাদেরকে উপদেশের মাধ্যমে সতর্ক করা হয়েছে।

ইহুদিশক্তি যখন চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেছে, আরবদের উত্তরাঞ্চলের প্রায় সমগ্র ইহুদি বসতি মুসলমানদের অধিকারে চলে এসেছে, এ সময় অনুসৃত ভ্রান্তনীতি সম্পর্কে তাদেরকে আর একবার সাবধান করে দেওয়া হয় এবং সত্য পথ অনুসরণ করার আহবান জানানো হয়।

বস্তুত এ সূরায় হালাল-হারাম সম্পর্কীয় বিভিন্ন বিধিবিধান, তাওরাতের বিকৃতি, ইহুদিদের ভ্রান্তনীতি ও ধ্বংস ইঞ্জীলের বিলুপ্তি, হযরত ঈসা (আ.)-এর নির্দেশাবলি, খ্রিস্টনাদের চরম পরিণতি, কুরআনের শ্রেষ্ঠত্ব, পারলৌকিক সুবিচার, শাস্তি ও পুরস্কার ইত্যাদিসহ বহু সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় বিধানাবলি পুঙ্ক্ষানুপুঙ্ক্ষরূপে আলোচিত হয়েছে।

অবতীর্ণের সময়কাল : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا ব্যতীত এ সূরার সমস্ত আয়াত মদিনায় অবতীর্ণ হয়েছে।

মুহাম্মদ আল কুরাযী (র.) হতে বর্ণিত যে, বিদায় হজে যখন রাসূল ﷺ মক্কা ও মদিনার মাঝখানে ছিলেন, তখন সূরা মায়িদাহ অবতীর্ণ হয়েছে। ঐ সময় রাসূল ﷺ উষ্ট্রীর উপর আরোহণ করেছিলেন, ওহীর ওজনের কারণে উষ্ট্রীর কাঁধ ভেঙ্গে যাবার উপক্রম হয়েছিল। তা দেখে নবী করীম ﷺ উষ্ট্রী হতে নেমে গিয়েছিলেন। –[রূহুল মা'আনী]

হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন যে, পবিত্র কুরআনে সূরাসমূহ নাজিল হওয়ার দিক থেকে সূরা মায়িদাহ সর্বশেষ নাজিল হয়েছে। এ জন্য এতে যা কিছু হালাল পাও, তাকে হালাল মনে কর, আর যা কিছু হারাম পাও, তাকে হারাম মনে কর। অর্থাৎ, সূরা মায়িদাহ-এর বর্ণিত কোনো বিধান বাতিল হয়নি। –[আহমদ, নাসায়ী]

এতে ১২০ টি আয়াত ও ১৬টি রুকূ' রয়েছে।

শানে নুযূল : এ সূরা বিশেষ কোনো ঘটনাকে কেন্দ্র বা উদ্দেশ্য করে অবতীর্ণ হওয়ার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। কেননা হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর এক বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, সূরা মায়িদাহ-এর কিয়দংশ হুদায়বিয়ার সফরে, কিয়দংশ মক্কা বিজয়ের সময়, আর কিয়দংশ বিদায় হজের সময় অবতীর্ণ হয়। –[মা'আরিফুল কুরআন]

শানে নুযূল : সূরা মায়িদাহ নাজিল হবার সময় কাল সম্পর্কে হযরত ইমাম আহমদ, আসমা বিনতে ইয়াজিদ এর বরাত দিয়ে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, সূরা মায়িদাহ যখন নাজিল হয়, তখন আমি রাসূলে কারীম ﷺ–এর আযবা নামক উটনীর লাগাম ধরে রেখেছিলাম। রাসূল ﷺ তাতে আরোহণকারী ছিলেন। নাজিলকৃত সূরা এতই ভারি ছিল যে, আযবা নামী উটনী মাটিতে দেবে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল।

হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল ﷺ যখন তাঁর সওয়ারির উপর আরোহণ করেছিলেন, তখন সূরা মায়িদাহ অবতীর্ণ হয়। সুতরাং সে সাওয়ারী তাঁকে বহন করতে অপারগ হয়ে পড়েছিল বিধায় তিনি তা হতে নেমে যান। সূরা মায়িদাহ ও সূরা ফাতাহ সর্বশেষ নাজিল হয়েছে।

হযরত জুবাইর বিন নুফাইর হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হজ করতে গিয়ে হযরত আয়েশা (রা.)–এর নিকট গমন করি, তখন তিনি বলেন, আমাকে বললেন, হে জুবাইর! তুমি সূরা মায়িদাহ পাঠ করেছ? জবাবে বললাম, হ্যাঁ! অতঃপর তিনি বলেন এটা হলো সর্বশেষ নাজিল কৃত সূরা। তার মধ্যে যা হালাল পাবে, তাকে হালাল মনে করবে। হারাম হিসেবে যা কিছু পাবে তাকে হারাম মনে করবে। –[ইবনে কাছীর : ২/২, ফাতহুল কাদীর : ৩/২]

www.almodina.com

হযবত আবূ উবাইদা মুহাম্মদ আল কারাযীর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ–এর উপর সূরা মায়েদা বিদায় হজের সফরে মক্কা ও মদিনার মাঝ পথে অবতীর্ণ হয়েছে। তখন তিনি তার উটনীর পৃষ্ঠে ছিলেন। উটনী অক্ষম হয়ে পরে ফলে রাসূল ﷺ তা থেকে নেমে পড়লেন। –[রূহুল মা'আনী : ৪৭/৩/৬]

(১)- قوله يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ الخ **: আয়াতের শানে নুযূল :** জাহেলি যুগের লোকেরা নিজেদের প্রবৃত্তির তাড়নায় আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ ব্যতিরেকে আল্লাহ তা'আলার বিপক্ষে নিজেদের উপর অনেক জীব জন্তুকেই হারাম বা অবৈধ হিসেবে নির্ধারিত করে রেখেছিল। তাদের এহেন ধৃষ্টতাপূর্ণ পন্থা অবলম্বন করার জবাবে আল্লাহ তা'আলা সূরার প্রাথমিক কতিপয় আয়াত নাজিল করেন। –[নূরুল কুলূব]

(২)- قوله يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُحِلُّوْا شَعَاۤئِرَ اللّٰهِ الخ **: আয়াতের শানে নুযূল :** আলোচ্য আয়াত একাধিক ঘটনা সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। সেগুলোর মধ্যে একটি ঘটনাটি হচ্ছে যে, হিজরি ষষ্ঠ সনে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীগণ ওমরা করার ইচ্ছা করলেন, তখন রাসূল ﷺ এক হাজারেরও অধিক সাহাবায়ে কেরামকে সাথে নিয়ে মক্কা মু'আজ্জমায় যাওয়ার জন্য ইহরাম বেঁধে যাত্রা করে মক্কার নিকটবর্তী হুদাইবিয়া নামক স্থানে পৌঁছে মক্কাবাসীকে অবগত করলেন যে, আমরা কোনো যুদ্ধ করা উদ্দেশ্যে আসিনি; বরং শুধু ওমরা আদায় করার জন্য এসেছি। সে জন্য তার অনুমতি গ্রহণ করার প্রয়োজন রয়েছে। মুশরিকরা অনুমতি প্রদান না করে অত্যন্ত কঠোর শর্তারোপ করে সন্ধি করল যে, এবার সকলই ইহরাম খুলে চলে যেতে হবে আগামী বৎসর নিরস্ত্রভাবে এসে তিন দিন অবস্থান করে ওমরা আদায় করার পর চলে যেতে হবে। তা ছাড়াও মুসলমানদের পক্ষে মেনে যাওয়া দুঃসাধ্য আরো অনেক শর্তারোপ করে। রাসূল ﷺএর নির্দেশক্রমে সাহাবায়ে কেরাম তা মেনে নিয়ে নিশ্চিন্ত মনে ফিরে গেলেন। অতঃপর ৭ম হিজরি সনে শর্তসমূহের প্রতি গুরুত্ব প্রদান করে ওমরা কাজা আদায় করেন। বস্তুতঃ হুদায়বিয়ার ঘটনা এবং মক্কার মুশরিকদের পক্ষ হতে অপমানজনক শর্তসমূহ সাহাবায়ে কেরামের অন্তরে মুশরিকদের প্রতি ঘৃণার সৃষ্টি হয় এবং চরম শত্রুতার বীজ বপন করা হয়। সে পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়েছে।

শানে নুযূল– ২ : ঘটনা হচ্ছে যে, মক্কার মুশরিকদের মধ্য হতে হাতীম বিন হিন্দ তার ব্যবসায়ীক মাল পত্র নিয়ে মদিনা মুনাওয়ারায় আসে। সে মালামাল বিক্রি করার পর নিজের আসবাবপত্র ও লোকজনকে মদিনার বাইরে রেখে সে রাসূল আকরাম ﷺ -এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে মুনাফেকি স্বরূপ নিজেকে মুসলমান হিসেবে প্রকাশ করে। মুসলমানরা যাতে করে তার প্রতি কোনো প্রকারের সন্দিহান না থাকে। তবে সে নরাধম আসার পূর্বেই রাসূল ﷺ ওহীর মাধ্যমে বলে দিলেন যে, আমাদের নিকট একটি লোক আসছে, সে শয়তানের ভাষ্যে কথা বলবে। অতঃপর সে যখন চলে গেল, তখন রাসূল ﷺ বললেন যে, এ লোক কুফরি নিয়ে এসেছিল এবং প্রতারণা ও প্রবঞ্চনার সাথে ফিরে গেল। সে রাসূল ﷺ–এর দরবার থেকে বের হয়ে সোজাসুজি মদিনাবাসীদের চারণভূমি গিয়ে তাদের পালিত পশুগুলো হাকিয়ে নিয়ে গেল। সাহাবায়ে কেরাম এ সংবাদ পেয়ে তাকে তাড়া করতে কিছু বিলম্ব হওয়ার কারণে সে মদিনা হতে বের হয়ে গিয়েছিল। পরবর্তীতে হিজরি ৭ম সনে সাহাবায়ে কেরামসহ যখন ওমরা কাজা আদায় করতে গিয়েছিলেন, তখন তালবিয়ার আওয়াজ শুনতে পেয়ে দেখতে পেলেন, সেই হাতীম বিন হিন্দই মদিনা থেকে চোরাইকৃত জন্তুগুলো কুরবানির জন্তু হিসেবে সাথে করে নিয়ে এসেছে। সে সময়ে সাহাবায়ে কেরামের উদ্দেশ্য ছিল তার উপর আক্রমণ করে নিজেদের পশুগুলো উদ্ধার করে তাকে সেখানেই খতম করে দেওয়া। সে পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে।

শানে নুযূল–৩ : হিজরি ৮ম সনে মক্কা বিজয় হয়েছিল এবং প্রায় সারা আরব জুড়েই ইসলামের কর্তৃত্ব অর্জিত হয়েছিল। তা সত্ত্বেও রাসূল ﷺ মক্কার মুশরিকদেরকে সাধারণ ক্ষমা করে ছেড়ে দিলেন। এতে করে অত্যন্ত স্বাধীনতার সাথে তারা তাদের সকল কাজ করে যেতে লাগল। এমন কি তারা মূর্খতার রীতি অনুযায়ী হজ ও ওমরা পালন করে যেতে লাগল। অবস্থা দৃষ্টে সাহাবায়ে কেরাম যখন হুদায়বিয়ায় সংঘটিত ঘটনার প্রতিশোধ গ্রহণ করার ইচ্ছা করল। তাদের ধারণা ছিল যে, আমাদেরকে বৈধ ও আল্লাহ নির্দেশিত পন্থায় ওমরা আদায় করা থেকে বিরত রেখেছিল, আমরা তাদের অবৈধভাবে হজ ও ওমরা পালন করার জন্য স্বাধীনভাবে ছেড়ে দিব কেন। সুতরাং তাদের উপর আক্রমণ করে তাদের জন্তু জানোয়ারগুলো ছিনিয়ে নিয়ে তাদেরকে ধ্বংস করে দেওয়াই উচিত। সাহাবায়ে কেরামের সে ধারণার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। –[মা'আরেফুল নুযূল : ৩৭৩/১]

সূরা মায়িদার ও সূরা নিসার মতো বিভিন্ন বিষয়ের মাসআলা-মাসায়েল, লেন দেন, পারস্পরিক চুক্তি-অঙ্গীকার ইত্যাদির বিধি-বিধান বর্ণিত হয়েছে। এ কারণেই রূহুল মা'আনীর গ্রন্থকার বলেন : বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে সূরা বাকার ও সূরা আলে ইমরান অভিন্ন। কেননা এ দু'টি সূরায় প্রধানতঃ মৌলিক বিধি-বিধান ও আকায়েদ, যথা, তাওহীদ, রেসালাত, কিয়ামত ইত্যাদির বর্ণনা উল্লিখিত হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে অনেক খুঁটিনাটি বিষয়ও বর্ণিত হয়েছে। পক্ষান্তরে সূরা নিসা ও সূরা মায়িদাহ বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে অভিন্ন। কেননা এ দু'টি সূরায় প্রধানতঃ বিভিন্ন বিধি-বিধানের বিস্তারিত আলোচনা স্থান লাভ করেছে এবং মৌলিক বিধি-বিধান প্রসঙ্গক্রমে বর্ণিত হয়েছে। সূরা নিসায় পারস্পরিক লেন-দেন ও বান্দার হকের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। স্বামী-স্ত্রীর হক, এতিমের হক, পিতামাতা ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের প্রাপ্য অধিকারের বিস্তারিত বিবরণ পেশ করা হয়েছে। সূরা মায়িদার প্রথম আয়াতেও এসব লেন-দেন ও চুক্তি অঙ্গীকার মেনে চলা ও পূর্ণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যেমন–

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَوْفُوا۟ بِٱلْعُقُودِ হে মুমিনগণ! তোমরা ওয়াদা-অঙ্গীকার পূর্ণ কর। এ কারণেই সূরা মায়িদার অপর নাম সূরা উকূদ। অর্থাৎ, ওয়াদা-অঙ্গীকারের সূরা। –[বাহরে মুহীত]

চুক্তি-অঙ্গীকার ও লেন-দেনের ক্ষেত্রে এ সূরাটি বিশেষ করে এর প্রথম আয়াতটি সবিশেষ গুরুত্বের অধিকারী। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন আমর ইবনে হাযম (রা.)-কে ঐ আমলের শাসনকর্তা নিযুক্ত করে প্রেরণ করেন এবং একটি ফরমান লিখে তাঁর হাতে অর্পণ করেন, তখন এ ফরমানের শিরোনামে উল্লিখিত আয়াতটিও লিপিবদ্ধ করে দেন।

এ সূরার প্রথম আয়াতের প্রথম বাক্যটি এত ব্যাপক অর্থবোধক যে, এর ব্যাখ্যায় হাজার পৃষ্ঠা লেখা যায় এবং লেখাও হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَوْفُوا۟ بِٱلْعُقُودِ –অর্থাৎ হে বিশ্বাসীগণ! স্বীয় চুক্তি-অঙ্গীকার পূর্ণ কর। এতে প্রথমে يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ বলে সম্বোধন করে বিষয়বস্তুর গুরুত্বের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে যে, এতে যে নির্দেশ রয়েছে, তা সাক্ষাৎ ঈমানের দাবি। এরপর বলা হয়েছে : أَوْفُوا۟ بِٱلْعُقُودِ এখানে عُقُودٌ শব্দটি عَقْدٌ শব্দের বহুবচন। এর শাব্দিক অর্থ বাঁধা, আবদ্ধ করা। চুক্তিতে যেহেতু দুই ব্যক্তি অথবা দুই দল আবদ্ধ হয়, এজন্য এটাকেও عَقْد বলা হয়। এভাবে عُقُوْد এর অর্থ হয় عُهُوْد অর্থাৎ, চুক্তি ও অঙ্গীকার।

খ্যাতনামা তাফসীরবিদ ইবনে জারীর উপরিউক্ত অর্থে তাফসীরবিদ সাহাবী ও তাবেয়ীগণের 'ইজমা' (ঐকমত্য) বর্ণনা করেছেন। ইমাম জাসসাস বলেন: দুই পক্ষ যদি ভবিষ্যতে কোনো কাজ করা অথবা না করার বাধ্য-বাধকতায় একমত হয়ে যায়, তবে তাকেই عَهْد ، عَقْد ও مُعَاهِد বলা হয়। আমাদের পরিভাষায় একেই চুক্তি বলা হয়। অতএব, উপরিউক্ত বাক্যের সারমর্ম এই যে, পারস্পরিক চুক্তি পূর্ণ করাকে জরুরি ও অপরিহার্য মনে কর।

এখন দেখতে হবে আয়াতে চুক্তি বলে কোন ধরনের চুক্তিকে বুঝানো হয়েছে? এ ব্যাপারে তাফসীরবিদগণের বাহ্যতঃ বিভিন্ন উক্তি রয়েছে। কেউ কেউ বলেন : আল্লাহ তা'আলা বান্দাদের কাছ থেকে ঈমান ও ইবাদত সম্পর্কিত যে সব অঙ্গীকার নিয়েছেন অথবা আল্লাহ তা'আলা বান্দাদের কাছ থেকে স্বীয় নাজিলকৃত বিধি-বিধান হালাল ও হারাম সম্পর্কিত যেসব অঙ্গীকার নিয়েছেন, আয়াতে সেগুলোকেই বুঝানো হয়েছে। এ উক্তি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকেও বর্ণিত আছে।

তাফসীরবিদ ইবনে সা'আদ ও যায়েদ ইবনে আসলাম বলেন : এখানে ঐসব চুক্তিকে বুঝানো হয়েছে, যা মানুষ পরস্পরে একে অন্যের সাথে সম্পাদন করে। যেমন, বিবাহ-শাদী ও ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি ইত্যাদি।

কেউ কেউ বলেন, এখানে ঐসব শপথ ও অঙ্গীকারকে বুঝানো হয়েছে যা জাহেলিয়াত যুগে একজন অন্যজনের কাছ থেকে পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতার ক্ষেত্রে সম্পাদন করত। মুজাহিদ, রবী, কাতাদাহ, প্রমুখ তাফসীরবিদগণও একথাই বলেছেন। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এসব উক্তির মধ্যে কোনো পরস্পর বিরোধিতা নেই। অতএব, উপরিউক্ত সব চুক্তি ও অঙ্গীকারই عُقُوْد শব্দের অন্তর্ভুক্ত এবং কুরআন সবগুলোই পূর্ণ করার নির্দেশ দিয়েছে।

এ কারণেই ইমাম রাগেব বলেছেন : চুক্তির যত প্রকার রয়েছে, সবই এ শব্দের অন্তর্ভুক্ত। অতঃপর তিনি বলেন, এর প্রাথমিক প্রকার তিনটি। এক, পালনকর্তার সাথে মানুষের অঙ্গীকার। উদাহরণতঃ ঈমান ও ইবাদতের অঙ্গীকার অথবা হারাম ও হালাল মেনে চলার অঙ্গীকার ইত্যাদি। দুই. নিজের সাথে মানুষের অঙ্গীকার। যেমন, নিজ জিম্মায় কোনো বস্তুর

মান্নত মানা অথবা শপথ করে কোনো কাজ নিজের উপর জরুরি করে নেওয়া। তিন. মানুষের সাথে মানুষের সম্পাদিত চুক্তি। এছাড়া সে সব চুক্তিও এর অন্তর্ভুক্ত, যা দুই ব্যক্তি, দুই দল বা দুই রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পাদিত হয়।

বিভিন্ন সরকারের আর্ন্তজাতিক চুক্তি অথবা পারস্পরিক সমঝোতা, বিভিন্ন দলের পারস্পরিক অঙ্গীকার এবং দুই ব্যক্তির মধ্যকার সর্বপ্রকার লেন-দেন, বিবাহ, ব্যবসা, শেয়ার, ইজারা ইত্যাদিতে পারস্পরিক সম্মতিক্রমে যে সব বৈধ শর্ত স্থির করা হয়, আলোচ্য আয়াতদৃষ্টে তা মেনে চলা প্রত্যেক পক্ষের অবশ্য কর্তব্য। 'বৈধ' শব্দটি প্রয়োগ করার কারণ এই যে, শরিয়ত বিরোধী শর্ত আরোপ করা এবং তা গ্রহণ করা কারো জন্য বৈধ নয়।

অতঃপর বলা হয়েছে أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْأَنْعَامِ যেসব জীব জন্তুকে সাধারণভাবে নির্বোধ মনে করা হয়, সেগুলোকে بَهِيْمَةٌ (অস্পষ্ট প্রাণী) বলা হয়। কেননা মানুষ অভ্যাসগতভাবে তাদের ভাষা বুঝে না। ফলে তাদের বক্তব্য مُبْهَمٌ তথা অস্পষ্ট থেকে যায়। ইমাম শা'রানী (র.) বলেন : সাধারণ লোকের ধারণা অনুযায়ী এসব জন্তুকে بَهِيْمَةٌ বলার কারণ এটা নয় যে, তাদের বুদ্ধি নাই এবং বুদ্ধির বিষয়বস্তু তাদের কাছে অস্পষ্ট থেকে যায়; বরং প্রকৃত সত্য হলো এই যে, কোনো প্রাণীই বুদ্ধি ও অনুভূতিহীন নয়, এমনকি কোনো বৃক্ষ এবং প্রস্তরও নয়। তবে এদের ততটুকু বুদ্ধি নেই, যতটুকু মানুষের রয়েছে। اَنْعَامٌ শব্দটি نَعَمٌ এর বহুবচন। এর অর্থ পালিত পশু। যেমন, উট, গরু, মহিষ, ছাগল ইত্যাদি। সূরা আন'আমে এদের আটটি প্রকার বর্ণনা করা হয়েছে। এদের সবাইকে اَنْعَامٌ বলা হয়। بَهِيْمَةٌ শব্দের ব্যাপকতা اَنْعَامٌ শব্দ এসে সংকুচিত করে দিয়েছে। এখন আয়াতের অর্থ দাঁড়িয়েছে এই যে, গৃহপালিত পশু আট প্রকার তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে। পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, عُقُوْدٌ শব্দ বলে যাবতীয় চুক্তি-অঙ্গীকার বুঝানো হয়েছে। তন্মধ্যে একটি ছিল ঐ অঙ্গীকার, যা আল্লাহ তা'আলা হালাল ও হারাম মেনে চলার ব্যাপারে বান্দার কাছ থেকে নিয়েছেন। আলোচ্য বাক্যে এই বিশেষ অঙ্গীকারটিই বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য উট, ছাগল, গরু, মহিষ ইত্যাদিকে হালাল করে দিয়েছেন। শরিয়তের নিয়ম অনুযায়ী এগুলোকে জবাই করে খেতে পার।

আয়াতের প্রথম বাক্যে বলা হয়েছে :

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُحِلُّوْا شَعَآئِرَ اللّٰهِ –অর্থাৎ, হে মুমিনগণ! আল্লাহর নির্দশনাবলির অবমাননা করো না। এখানে شَعَائِرُ শব্দটি شَعِيْرَةٌ শব্দের বহুবচন। এর অর্থ চিহ্ন। যেসব অনুভূত ও প্রত্যক্ষ ক্রিয়াকর্মকে সাধারণের পরিভাষায় মুসলমান হওয়ার চিহ্নরূপে গণ্য করা হয়, সেগুলোকে شَعَائِرِ اِسْلَامْ তথা 'ইসলামের নিদর্শনাবলি' বলা হয়। যেমন, নামাজ, আজান, হজ, সুন্নতি দাঁড়ি ইত্যাদি। আয়াতে উল্লিখিত 'আল্লাহর নিদর্শনাবলি'র ব্যাখ্যা বিভিন্ন ভাষায় বর্ণিত আছে। কিন্তু হযরত হাসান বসরী ও আতা (র.) থেকে বর্ণিত বাহরে মুহীত ও রুহুল মা'আনী গ্রন্থে উল্লিখিত ব্যাখ্যাটিই পরিষ্কার ও সহজবোধ্য। ইমাম জাসসাস এ ব্যাখ্যাটিকে এ সম্পর্কিত সব উক্তির নির্যাস বলে আখ্যায়িত করেছেন। ব্যাখ্যাটি এই : আল্লাহর নিদর্শনাবলির অর্থ সব শরিয়ত এবং ধর্মের নির্ধারিত ওয়াজিব, ফরজ ও এদের সীমা।

আলোচ্য আয়াতে لَا تُحِلُّوْا شَعَآئِرَ اللّٰهِ বলার সারমর্ম এই যে, আল্লাহর নিদর্শনাবলির অবমাননা করো না। আল্লাহর নিদর্শনাবলির এক অবমাননা এই যে, মূলতঃই এসব বিধি-বিধানকে উপেক্ষা করে চলা। প্রথমতঃ এসব বিধি-বিধানকে উপেক্ষা করে চলা। দ্বিতীয়তঃ এসব বিধি-বিধানকে অসম্পূর্ণভাবে পালন করা এবং তৃতীয়তঃ নির্ধারিত সীমালঙ্ঘন করে সম্মুখে অগ্রসর হওয়া। আয়াতে এ তিন প্রকার অবমাননাকেই নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

কুরআন পাক এ নির্দেশটিই শব্দান্তরে বর্ণনা করেছে :

وَمَنْ يُّعَظِّمْ شَعَآئِرَ اللّٰهِ فَاِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوْبِ অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আল্লাহর নিদর্শনাবলির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে, তা অন্তরের আল্লাহভীতিরই লক্ষণ। আয়াতের দ্বিতীয় বাক্যে কিছু বিবরণ প্রদান করা হয়েছে।

বলা হয়েছে : وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَآئِدَ وَلَآ اٰمِّيْنَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا

অর্থাৎ, পবিত্র মাসসমূহে যুদ্ধ-বিগ্রহ করে এগুলোর অবমাননা করো না। পবিত্র মাস হচ্ছে শাওয়াল, জিলহজ ও রজব। এসব মাসে যুদ্ধ-বিগ্রহ করা শরিয়তের আইনে অবৈধ ছিল। সাধারণ আলেমগণের মতে পরবর্তীকালে এ নির্দেশ রহিত হয়ে গেছে। এছাড়া হরমে কুরবানি করার জন্তু বিশেষতঃ যেসব জন্তুকে গলায় কুরবানির চিহ্নস্বরূপ কণ্ঠাভরণ পরানো হয়েছে, সেগুলোর অবমাননা করো না। এসব জন্তুর অবমাননার এক পন্থা হচ্ছে এদের হরম পর্যন্ত পৌঁছতে না দেওয়া অথবা ছিনিয়ে নেওয়া। দ্বিতীয় এই যে, এগুলো কুরবানির পরিবর্তে অন্য কোনো কাজে নিয়োজিত করা। যেমন, আরোহণ করা অথবা দুগ্ধ লাভ করা ইত্যাদি। আয়াত এসব পন্থাকেই অবৈধ করে দিয়েছে।

এছাড়া ঐসব লোকেরও অবমাননা করো না, যারা হজের জন্য পবিত্র মসজিদের উদ্দেশ্যে গৃহ ত্যাগ করেছে। এ সফরে তাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে স্বীয় পালনকর্তার কৃপা ও সন্তুষ্টি অর্জন করা। অর্থাৎ, পথিমধ্যে তাদের গতিরোধ করো না এবং কোনোরূপ কষ্ট দিও না।

অতঃপর বলা হয়েছে : وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا অর্থাৎ, প্রথম আয়াতে ইহরাম অবস্থায় শিকার করতে যে নিষেধ করা হয়েছিল, এখানে সে নিষেধাজ্ঞার সীমা বর্ণনা করা হয়েছে যে, যখন তোমরা ইহরাম থেকে মুক্ত হয়ে যাও, তখন শিকার করার নিষেধাজ্ঞা শেষ হয়ে যাবে। অতএব, তখন শিকারও করতে পারবে।

উল্লিখিত আয়াতে প্রত্যেক মানব ও পালনকর্তার মধ্যকার চুক্তির কয়েকটি অংশ এ পর্যন্ত বর্ণিত হয়েছে এতে প্রথমে আল্লাহর নিদর্শনাবলির প্রতি সর্বাবস্থায় সম্মান প্রদর্শন করতে এবং এগুলোর অবমাননা থেকে বিরত থাকতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অতঃপর বিশেষভাবে হজ সম্পর্কিত আল্লাহর নিদর্শনাবলির কিছু বিবরণ রয়েছে। তন্মধ্যে হজের উদ্দেশ্যে আগমনকারী যাত্রীসাধারণ ও তাদের সাথে আনীত কুরবানির জন্তুদের গতিরোধ ও সেগুলোর অবমাননা থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

অতঃপর চুক্তির দ্বিতীয় অংশ এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে :

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا

অর্থাৎ, যে সম্প্রদায় হুদায়বিয়ার ঘটনার সময় তোমাদের মক্কায় প্রবেশ করতে এবং ওমরা পালন করতে বাধা প্রদান করেছিল এবং তোমরা তীব্র ক্ষোভ ও দুঃখ নিয়ে ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরে এসেছিলে, এখন শক্তি-সামর্থ্যের অধিকারী হয়ে তোমরা তাদের কাছ থেকে এভাবে প্রতিশোধ নিও না যে, তোমরা তাদের কা'বাগৃহে ও পবিত্র মসজিদে প্রবেশ করতে এবং হজ করতে বাধা দিতে শুরু করবে। এটাই হবে জুলুম। আর ইসলাম জুলুমের উত্তরে জুলুম করতে চায় না; বরং ইসলাম জুলুমের প্রতিদানে ইনসাফ এবং ইনসাফে কায়েম থাকার শিক্ষা দেয়। তারা শক্তি ও ক্ষমতা হাতে পেয়ে মুসলমানদের পবিত্র মসজিদে প্রবেশ করতে এবং ওমরা পালন করতে অন্যায়ভাবে বাধা দিয়েছিল। এখন এর প্রত্যুত্তরে এরূপ হওয়া সমীচীন নয় যে, মুসলমানরা ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়ে তাদেরকেও হজের ক্রিয়াকর্ম থেকে বাধা প্রদান করবে।

কুরআন পাকের শিক্ষা এই যে, ইনসাফ ও ন্যায়বিচারে শত্রু-মিত্র সব সমান। তোমাদের শত্রু যতই কঠোর হোক সে তোমাদের যতই কষ্ট দিয়ে থাকুক, তার ব্যাপারেও ন্যায়বিচার করা তোমাদের কতর্ব্য।

এটা ইসলামেরই বৈশিষ্ট্য যে, সে শত্রুদের অধিকারও সংরক্ষণ করে এবং তাদের অন্যায়ের প্রত্যুত্তরে অন্যায় দ্বারা নয়; বরং ন্যায় বিচার দ্বারা শিক্ষা দেয়।

পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতার কুরআনি মূলনীতি :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

আলোচ্য অংশটুকু সূরা মায়িদার দ্বিতীয় আয়াতের শেষ বাক্য। এতে কুরআন পাক এমন একটি মৌলিক প্রশ্ন সম্পর্কে বিজ্ঞজনোচিত ফয়সালা দিয়েছে, যা সমগ্র বিশ্ব-ব্যবস্থার প্রাণস্বরূপ। এর উপরই মানুষের সর্ব প্রকার মঙ্গল ও সাফল্য বরং তার অস্তিত্ব ও স্থায়িত্ব নির্ভরশীল। এ প্রশ্নটি হচ্ছে পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতা। জ্ঞানী মাত্রই জানে যে, এ বিশ্বের গোটা রক্ষা ব্যবস্থা মানুষের পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতার উপর প্রতিষ্ঠিত। যদি একজন অন্যজনের সাহায্য না করে, তবে একাকী মানুষ হিসেবে সে যতই বুদ্ধিমান, শক্তিধর অথবা বিত্তশালী হোক, জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় আসবাব-পত্র কিছুতেই সংগ্রহ করতে পারবে না। একাকী মানুষ স্বীয় খাদ্যের জন্য শস্য উৎপাদন থেকে শুরু করে আহারোপযোগী করা পর্যন্ত সব স্তর অতিক্রম করতে পারে না। এমনিভাবে পোশাক-পরিচ্ছেদের জন্য তুলা চাষ থেকে শুরু করে স্বীয় দেহের মানানসই পোশাক তৈরি করা পর্যন্ত অসংখ্য সমস্যার সমাধান করতে একাকী কোনো মানুষ কিছুতেই সক্ষম নয়। মোটকথা, প্রত্যেকটি মানুষই জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে অন্য হাজারো লাখো মানুষের মুখাপেক্ষি। তাদের পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতা দ্বারাই সমগ্র বিশ্বের ব্যবস্থাপনা চালু রয়েছে। চিন্তা করলে দেখা যায়, এ সাহায্য ও সহযোগিতা পার্থিব জীবনের জন্যই জরুরি নয়– মৃত্যু থেকে নিয়ে কবরে সমাহিত হওয়া পর্যন্ত সকল স্তরও এ সাহায্য ও সহযোগিতার মুখাপেক্ষী; বরং এরপরও মানুষ জীবিতদের দোয়ায়ে-মাগফেরাত ও ইছালে ছওয়াবের প্রতি মুখাপেক্ষী থাকে।

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় অসীম জ্ঞান ও পরিপূর্ণ ক্ষমতায় বিশ্বচরাচরের জন্য এমন অটুট ব্যবস্থা রচনা করেছেন, যাতে একজন অন্যজনের মুখাপেক্ষী। দরিদ্র ব্যক্তি পয়সার জন্য যেমন ধনীর মুখাপেক্ষী, তেমনি শ্রেষ্ঠতম ধনী ব্যক্তিও পরিশ্রম ও মেহনতের জন্য দিনমজুরের মুখাপেক্ষী। ব্যবসায়ী গ্রাহকের মুখাপেক্ষী এবং গ্রাহক ব্যবাসায়ীর মুখাপেক্ষী। গৃহ নির্মাতা রাজমিস্ত্রি, কর্মকার, ছুতারের মুখাপেক্ষী এবং এরা সবাই গৃহনির্মাতার মুখাপেক্ষী। যদি এহেন সর্বব্যাপী মুখাপেক্ষিতা না থাকত এবং সাহায্য-সহযোগিতা কেবল নৈতিক শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের উপরই নির্ভরশীল হতো তবে কে কার কাজ করতে এগিয়ে আসত। এমতাবস্থায় সাহায্য-সহযোগিতার দশাও তাই হতো, যা এ জগতে সাধারণ নৈতিক মূল্যবোধের হচ্ছে। যদি এ কর্মবন্টন কোনো সরকার অথবা আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে আইন আকারে করে দেওয়া হতো, তবে এর পরিণতিও তাই হতো যা আজকাল সারা বিশ্বে জাগতিক আইনের ক্ষেত্রে হচ্ছে। অর্থাৎ আইন খাতাপত্রে সংরক্ষিত আছে এবং বাজারে ও অফিস আদালতে ঘুষ, অন্যায় সুবিধাদান, কর্তব্যবিমুখতা ও কর্মহীনতার আইন চালু রয়েছে। একমাত্র সর্বজ্ঞানী ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলার ব্যবস্থাপনাই বিভিন্ন মানুষের মনে বিভিন্ন কারবারের স্পৃহা ও যোগ্যতা সৃষ্টি করে দিয়েছে।

মোটকথা, সমগ্র বিশ্বের ব্যাবস্থাপনাও পারস্পরিক সম্পর্কের উপরই প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু এ চিত্রের একটা ভিন্ন পিঠও আছে। তা এই যে, যদি অপরাধ, চুরি, ডাকাতি, হত্যা, লুণ্ঠন ইত্যাদির জন্য পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতা হতে থাকে, চোর ডাকাতদের বড় বড় সুশৃঙ্খল দল গঠিত হয়ে যায়, তবে এ সাহায্য ও সহযোগিতাই বিশ্বব্যবস্থাকে তছনছও করে দিতে পারে। এতে বুঝা গেল যে, পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতা একটি দুধারী তরবারি— যা নিজের উপরও চালিত হতে পারে এবং বিশ্বব্যবস্থাকেও বানচাল করতে পারে। এ বিশ্ব মঙ্গলামঙ্গল, ভালোমন্দ এবং সৎ-অসতের আবাসভূমি। এ কারণে এতে এরূপ হওয়ার অসম্ভব ছিল না। এখানে অপরাধ, হত্যা, লুণ্ঠন ও কাউকে ক্ষতিগ্রস্ত করার জন্য পারস্পরিক সহযোগিতা ও শক্তি ব্যবহৃত হতে পারত। এটা শুধু সম্ভাবনাই নয়; বরং বাস্তব আকারে বিশ্ববাসীর সামনে ফুটে উঠেছে। তাই এর প্রতিক্রিয়া হিসেবে বিশ্বের জ্ঞানীগুণীরা স্বীয় হেফাজতের জন্য বিভিন্ন মতবাদের ভিত্তিতে বিশেষ বিশেষ দল অথবা জাতির ভিত্তি স্থাপন করেছে— যাতে একদল অথবা জাতির বিরুদ্ধে অন্য দল অথবা অন্য জাতির আক্রমণোদ্যত হলে সবাই মিলে পারস্পরিক সহযোগিতার শক্তি ব্যবহার করে তা প্রতিহত করতে পারে।

জাতীয়তা বণ্টন : আব্দুল করিম শাহরেস্তানী প্রণীত, 'মিলাল ওয়াননিহাল' গ্রন্থে বলা হয়েছে : প্রথম দিকে যখন পৃথিবীর জনসংখ্যা বেশি ছিল না, তখন বিশ্বের চার দিকের ভিত্তিতে চারটি জাতীয়তা জন্মলাভ করে; প্রাচ্য, পাশ্চাত্য, দক্ষিণ, উত্তর প্রত্যেক দিকে বসবাসকারীরা নিজেদেরকে এক জাতি এবং অন্যকে ভিন্ন জাতি মনে করতে থাকে এবং এর ভিত্তিতেই সহযোগিতার ভিত্তি রচিত হতে থাকে। এরপর যখন জনসংখ্যা বেড়ে যায়, তখন প্রত্যেক দিকের লোকদের মধ্যে বংশ ও গোত্রে ভিত্তিতে জাতীয়তার ধারণা বদ্ধমূল হতে থাকে। আরবের সমগ্র ব্যবস্থা এ বংশ ও গোত্রগত ভিত্তির উপরই প্রতিষ্ঠিত ছিল। এর ভিত্তিতেই যুদ্ধবিগ্রহ সংঘটিত হতো। বনূ হাশেম এক জাতি, বনূ তামীম অন্য জাতি এবং বনূ খোযায়াহ স্বতন্ত্র একটি জাতি বলে বিবেচিত হতো। হিন্দুদের মধ্যে আজ পর্যন্ত উচ্চজাত ও নীচ জাতের ব্যবধান অব্যাহত রয়েছে।

আধুনিক ইউরোপীয়রা নিজেদের বংশ তো বিসর্জন দিয়েছেই, অন্যান্যদের রক্ত-ধারাকেও তারা মূল্যহীন প্রতিপন্ন করেছে। দুনিয়ায় তাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকেই তারা বংশগত ও গোত্রগত জাতীয়তা ও বিভাগকে নিশ্চিহ্ন করে আবার আঞ্চলিক, প্রাদেশিক, দেশ ও ভাষার ভিত্তিতে মানবজাতিকে খণ্ড-বিখণ্ড করে পৃথক পৃথক জাতি হিসেবে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। আজ প্রায় সারা বিশ্বেই ভাষা এবং অঞ্চল ভিত্তিক জাতীয়তার ধারণা চালু হয়ে গেছে। এমনকি মুসলমানরাও এ জাদুর পরশ থেকে মুক্ত নয়। আরবি, তুর্কী, ইরাকী, সিন্ধীর বিভাগই নয়; বরং তাদের মধ্যেই ভাগফলকে ভাগ করে মিসরী, সিরীয়, হেজাযী, নজদী এবং পাঞ্জাবী, বাঙ্গালী, সিন্ধী, হিন্দি ইত্যাদি পৃথক পৃথক জাতি জন্মলাভ করেছে। ইউরোপীয়রা এসবের ভিত্তিতেই সরকারি কাজ-কারবার পরিচালনা করেছে। ফলে আঞ্চলিকতা ভিত্তিক বিদ্বেষ জনগণের শিরা-উপশিরায় ঢুকে পড়েছে এবং প্রত্যেক প্রদেশের জনগণ এর ভিত্তিতেই সাহায্য ও সহযোগিতা করেছে।

জাতীয়তা ও কুরআনি শিক্ষা : কুরআন পাক মানুষকে আবার ভুলে যাওয়া সবক স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। সূরা নিসার প্রথম আয়াতগুলোতে বলা হয়েছে : তোমরা সব মানুষ এক পিতা-মাতার সন্তান। রাসূলুল্লাহ [illegible] এ বিষয়টির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বিদায় হজ্বের ভাষণে ঘোষণা করেন যে, কোনো আরবে অনারবের উপর অথবা কোনো শ্বেতাঙ্গের কৃষ্ণাঙ্গের উপর কোনো

শ্রেষ্ঠত্ব নেই। আল্লাহভীতি ও আল্লাহর অনুগত্যই শ্রেষ্ঠত্বের একমাত্র মাপকাঠি। কুরআনের এ শিক্ষা إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ [মুমিনরা পরস্পর ভাই ভাই] ঘোষণা করে আবিসিনায়ার কৃষ্ণাঙ্গকে লাল তুর্কি ও রোমীর ভাই এবং অনারব নিচ জাতের মানুষকে কোরায়শী ও হাশেমী আরবের ভাই করে দিয়েছে। জাতীয়তা ও ভ্রাতৃত্বের ভিত্তি এভাবে রচনা করেছে যে, যারা আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূলকে মেনে চলে, তারা এক জাতি এবং যারা মানে না, তারা ভিন্ন জাতি। জাতীয়তার এ ভিত্তিই আবূ জাহেল ও আবূ লাহাবের পারিবারিক সম্পর্ক রাসূল ﷺ থেকে ছিন্ন করে দিয়েছে এবং বেলাল হাবশী ও ছুহায়েব রোমীর সম্পর্ককে তাঁর সাথে জুড়ে দিয়েছে।

صہیب ز روم حسن ز بصری بلال از حبش ☆ چہ خاک مکہ بوجہل ایں چہ بل عجب است

'হাসান বসরা থেকে বেলাল হাবশা থেকে ছুহাইব রোম থেকে এলেন অথচ মক্কার পবিত্র মাটি থেকে উঠলো আবূ জাহেল, এটা কেমন আশ্চর্যজনক ব্যাপার'।

এমনকি কুরআন পাক ঘোষণা করেছে : خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَّمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের সবাইকে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তোমরা দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছ– কিছু কাফের হয়ে গেছ এবং কিছু মুমিন। বদর, ওহুদ, আহযাব ও হুনাইনের যুদ্ধে কুরআনের এ বিভিক্তি কার্যক্ষেত্রে বিকাশ লাভ করেছিল। বংশগত ভাই আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্যের বাইরে চলে যাওয়ার কারণে মুসলমান ভাইয়ের ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক তার সাথে ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল এবং সে তার তরবারির নিচে এসে গিয়েছিল। বদর ওহুদ ও খন্দকের ঘটনাবলি এ সত্যের সাক্ষ্য দেয়।

এর পরিষ্কার অর্থ এই যে, যদি মুসলমান ভাইও ন্যায়ের বিরুদ্ধে এবং অন্যায় ও উৎপীড়নের পথে চলে, তবে অন্যায় কার্যে তারও সাহায্য করো না। বরং অন্যায় ও অত্যাচার থেকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা কর। কেননা প্রকৃতপক্ষে এটাই তাকে বিশুদ্ধ সাহায্য যাতে অন্যায় ও অত্যাচারের পাপে তার ইহকাল ও পরকাল বিনষ্ট না হয়।

কুরআনে পাকের এ শিক্ষা সৎকর্ম ও আল্লাহভীতিকে আসল মাপকাঠি করেছে, তার উপরই মুসলিম জাতি জাতীয়তাবাদের প্রাচীর খাড়া করেছে এবং এর বিত্তিতেই পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতার আহ্বান জানিয়েছে। এর বিপরীতে পাপ ও অত্যাচার উৎপীড়নকে কঠোর অপরাধ গণ্য করেছে এবং এতে সাহায্য-সহযোগিতা করতে নিষেধ করেছে। এক্ষেত্রে بِرّ ও تَقْوٰى দুটি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। بِرّ শব্দের অর্থ সাধারণ তাফসীরকারগণের মতে فِعْلُ الْخَيْرَاتِ তথা সৎকর্ম এবং تَقْوٰى শব্দের অর্থ تَرْكُ الْمُنْكَرَاتِ মন্দ কাজ বর্জন। إِثْم শব্দের অর্থ যে কোনো পাপকর্ম অধিকার সম্পর্কিত হোক অথবা ইবাদত সম্পর্কিত। عُدْوَانٌ শব্দের অর্থ সীমালঙ্ঘন করা। এখানে অর্থ অত্যাচার ও উৎপীড়ন করা।

সৎকর্ম ও আল্লাহভীতিতে সাহায্য করার জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন اَلدَّالُّ عَلَى الْخَيْرِ كَفَاعِلِهٖ –অর্থাৎ, যে ব্যক্তি কোনো সৎকর্মের পথ বলে দেয়, সে ততটুকু ছওয়াব পাবে, যতটুকু নিজে সৎকর্মটি করলে পেত। –[ইবনে কাছীর]

সহীহ বুখারীর হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি হেদায়েত ও সৎকর্মের প্রতি আহ্বান জানায়, তবে তার আহ্বানে যতলোক সৎকর্ম করবে, সে তাদের সবার সমান ছওয়াব পাবে। এতে তাদের ছওয়াব হ্রাস করা হবে না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি অসৎকর্ম অথবা পাপের প্রতি আহ্বান করে, তার আহ্বানে যতলোক পাপকর্মে লিপ্ত হবে, তাদের সবার সমান গুনাহ তারও হবে। এতে তাদের গুনাহ হ্রাস করা হবে না।

ইবনে কাছীর বর্ণিত তাবারানীর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : যে ব্যক্তি কোনো অত্যাচারীর সাথে তার সাহায্যার্থে বের হয়, সে ইসলাম থেকে বের হয়ে যায়। এর ভিত্তিতেই পূর্ববর্তী মনীষীগণ অত্যাচারী বাদশাহর চাকুরি ও পদ গ্রহণ করতে কঠোরভাবে বিরত রয়েছেন। কারণ এতে অত্যাচারে সহায়তা করা হয়। রূহুল মা'আনীতে فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِّلْمُجْرِمِينَ আয়াতে তাফসীর প্রসঙ্গে এ হাদীস উদ্ধৃত করা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : কিয়ামতের দিন ডাক দেওয়া হবে অত্যাচারী ও তাদের সাহায্যকারীরা কোথায় আছ? অতঃপর যারা অত্যাচারীদের দোয়াত-কলমও ঠিক করে দিয়েছে, তাদেরকেও একটি লৌহ শবাধারে একত্রিত করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

কুরআন সুন্নাহর এ শিক্ষাই জগতে সততা, ইনসাফ, সহানুভূতি ও সচ্চরিত্রতা ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতিটি ব্যক্তিকে কর্মীরূপে প্রস্তুত করেছে এবং অপরাধ ও উৎপীড়ন দমনের জন্য প্রতিটি ব্যক্তিকে এমন সিপাহীরূপে গড়ে তুলেছিল, যারা আল্লাহভীতির কারণে প্রকাশ্যে ও গোপনে স্বীয় কর্তব্য পালনে বাধ্য থাকে। এ বিজ্ঞজনোচিত শিক্ষা ও

www.almodina.com

প্রশিক্ষণের সুফল সাহাবী ও তাবেয়ীগণের যুগে জগদ্বাসী প্রত্যক্ষ করেছে। আজকালও কোনো দেশে যুদ্ধের আশঙ্কা দেখা দিলে নাগরিক প্রতিরক্ষা বিভাগ প্রতিষ্ঠা করে প্রত্যেককেই কিছু কিছু আত্মরক্ষার কৌশল শিক্ষা দেওয়ার ব্যাবস্থা করা হয়। কিন্তু অপরাধবৃত্তি নির্ধারণের জন্য জনগণকে সৎকাজের প্রতি আহ্বান প্রচেষ্টা কোথাও পরিলক্ষিত হয় না।

এটা জানা কথা যে, সামরিক কুচকাওয়াজ ও নাগরিক প্রতিরক্ষার নিয়ম অনুযায়ী এ কাজের অনুশীলন হয় না; বরং এ কাজ শিক্ষা করা ও শিক্ষা দেওয়ার উপযুক্ত স্থান হচ্ছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, আজকাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো এ বিষয়বস্তুর সাথে পরিচিতই নয়। আজকালকার সাধারণ শিক্ষাঙ্গনগুলোতে بِرّ ও تَقْوٰى তথা সৎকর্ম ও আল্লাহভীতির প্রবেশ নিষিদ্ধ এবং اِثْم ও عُدْوَانٌ তথা পাপ ও অত্যাচারের সকল পথ উন্মুক্ত। গোটা জাতিই যেখানে হালাল ও হারাম, ন্যায় ও অন্যায় ভুলে গিয়ে অপরাধপ্রবণ হয়ে যায়, সেখানে বেচারা পুলিশ কতদূর অপরাধ দমন করতে পারে? আজ সর্বত্র ও সবদেশে অপরাধ, চুরি, ডাকাতি, অশ্লীলতা, হত্যা, লুণ্ঠন ইত্যাদি রোগ রোজ রোজ বেড়েই চলেছে এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ তা দমন করতে অক্ষম হয়ে পড়েছে। বলাবাহুল্য, এর কারণ দুটি এক, প্রচলিত সরকারগুলো কুরআনি ব্যবস্থা থেকে দূরে রয়েছে। ক্ষমতাসীন ব্যক্তিরা স্বীয় জীবনে بِرّ ও تَقْوٰى সৎকর্ম ও খোদাভীতির মূলনীতি অনুসরণ করতে দ্বিধা বোধ করে যদিও এর ফলশ্রুতিতে তাদের অসংখ্য দুঃখ ভোগ করতে হচ্ছে। আক্ষেপ! তারা যদি একবার পরীক্ষার জন্য এই তিক্ত ঢোক গিলে ফেলত এবং আল্লাহর কুদরতের তামাশা দেখত যে, কিভাবে তাদের এবং জনগণের জীবনে সুখ, শান্তি আরাম ও আনন্দের স্রোতধারা নেমে আসে।

দুই. জনগণ মনে করে নিয়েছে যে, অপরাধ প্রবণতা দমন করা একমাত্র সরকারের দায়িত্ব। শুধু তাই নয়, তারা পেশাদার অপরাধীদের অপরাধ গোপন করতেও সচেষ্ট থাকে। শুধু সত্যকে প্রতিষ্ঠিত ও অপরাধ দমন করার উদ্দেশ্যে সত্য সাক্ষ্য দেওয়ার রীতিই দেশ থেকে উঠে গেছে। জনগণের বুঝা দরকার যে, অপরাধীর অপরাধ গোপন করা এবং সত্য সাক্ষ্যদানে বিরত থাকা অপরাধে সহায়তা করার নামান্তর। এটা কুরআনের আইনে হারাম ও কঠোর পাপ এবং আলোচ্য আয়াত وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ –এ বর্ণিত নির্দেশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণার শামিল।

শব্দের বিশ্লেষণ :

اَوْفُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِيْفَاءُ মূলবর্ণ (و . ف . ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ– তোমরা পুরা কর।

اَنْعَامٌ : শব্দটি বহুবচন, একবচন نَعَمٌ অর্থ– গবাদি পশু।

اَلْهَدْىَ : শব্দটি একবচন, বহুবচন هَدَايَا অর্থ– কুরবানির জন্তু।

قَلَائِدَ : শব্দটি বহুবচন, একবচন قِلَادَةٌ অর্থ– কুরবানির ঐ জন্তু, যাদের কণ্ঠে কণ্ঠাবরণ পরানো হয়েছে।

اِصْطَادُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِصْطِيَادُ মূলবর্ণ (ص . ى . د) জিনস اجوف يائى। অর্থ– তোমরা শিকার কর।

www.almodina.com

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَآ اُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهٖ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوْذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيْحَةُ وَمَآ اَكَلَ السَّبُعُ اِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ ۗ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَاَنْ تَسْتَقْسِمُوْا بِالْاَزْلَامِ ؕ ذٰلِكُمْ فِسْقٌ ؕ اَلْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ دِيْنِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ ؕ اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا ؕ فَمَنِ اضْطُرَّ فِيْ مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّاِثْمٍ ۙ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ (٣)

অনুবাদ : (৩) তোমাদের প্রতি হারাম করা হয়েছে মৃত জীব, [প্রবাহিত] রক্ত, শূকরের মাংস এবং যে পশু গায়রুল্লাহর নামে অবধারিত হয়েছে এবং যে জীব শ্বাস রোধ করার দরুন মরেছে এবং যা আঘাতের কারণে মরেছে এবং যা উচ্চস্থান হতে পড়ে মরেছে এবং যা অন্যকিছুর সঙ্গে সংঘর্ষের কারণে মরেছে এবং যাকে কোনো হিংস্র প্রাণী ভক্ষণ করতে থাকে [এবং সেই আঘাতে মৃত্যু হয়,] কিন্তু যেগুলোকে জবাই করে নিয়েছে এবং যে জানোয়ারকে জবাই করা হয় [গায়রুল্লাহর] পূজার স্থানে এবং তা [-ও হারাম] যে, [গোশত ইত্যাদি] ভাগ কর লটারীর তীরের মাধ্যমে এগুলো গুনাহর কাজ, আজ তো কাফেররা নিরাশ হয়ে গিয়েছে, তোমাদের ধর্ম [পরাভূত হওয়া] হতে, সুতরাং তাদেরকে ভয় করো না এবং আমাকে ভয় করতে থাক আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্মকে পূর্ণ করে দিলাম এবং আমি তোমাদের প্রতি স্বীয় নিয়ামত পরিপূর্ণ করে দিলাম এবং আমি ইসলামকে তোমাদের ধর্মরূপে পছন্দ করলাম, অনন্তর যে ব্যক্তি তীব্র ক্ষুধায় অস্থির হয়ে যায় [এবং নিষিদ্ধ বস্তু ভক্ষণ করে] কিন্তু কোনো পাপের প্রতি আকৃষ্ট না হয়, তবে নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, করুণাময়।

শাব্দিক অনুবাদ

(৩) حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ তোমাদের প্রতি হারাম করা হয়েছে الْمَيْتَةُ মৃত জীব وَالدَّمُ রক্ত وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ শূকরের মাংস وَمَآ اُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهٖ এবং যে পশু গায়রুল্লাহর নামে অবধারিত হয়েছে وَالْمُنْخَنِقَةُ এবং যে জীব শ্বাস রোধ করার দরুন মরেছে وَالْمَوْقُوْذَةُ এবং যা আঘাতের কারণে মরেছে وَالْمُتَرَدِّيَةُ এবং যা উচ্চস্থান হতে পড়ে মরেছে وَالنَّطِيْحَةُ এবং যা অন্যকিছুর সঙ্গে সংঘর্ষের কারণে মরেছে وَمَآ اَكَلَ السَّبُعُ এবং যাকে কোনো হিংস্র প্রাণী ভক্ষণ করতে থাকে اِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ কিন্তু যেগুলোকে জবাই করে নিয়েছে وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ এবং যে জানোয়ারকে জবাই করা হয় পূজার স্থানে وَاَنْ تَسْتَقْسِمُوْا بِالْاَزْلَامِ এবং তা [-ও হারাম] যে, [গোশত ইত্যাদি] ভাগ কর লটারীর তীরের মাধ্যমে ذٰلِكُمْ فِسْقٌ এগুলো গুনাহর কাজ اَلْيَوْمَ আজ তো يَئِسَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا কাফেররা নিরাশ হয়ে গিয়েছে مِنْ دِيْنِكُمْ তোমাদের ধর্ম হতে فَلَا تَخْشَوْهُمْ সুতরাং তাদেরকে ভয় করো না وَاخْشَوْنِ এবং আমাকে ভয় করতে থাক اَلْيَوْمَ আজ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্মকে পূর্ণ করে দিলাম وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ এবং আমি তোমাদের প্রতি স্বীয় নিয়ামত পরিপূর্ণ করে দিলাম وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا এবং আমি ইসলামকে তোমাদের ধর্মরূপে পছন্দ করলাম فَمَنِ اضْطُرَّ فِيْ مَخْمَصَةٍ অনন্তর যে ব্যক্তি তীব্র ক্ষুধায় অস্থির হয়ে যায় غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّاِثْمٍ কিন্তু কোনো পাপের প্রতি আকৃষ্ট না হয় فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ তবে নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, করুণাময়।

يَسْـَٔلُوْنَكَ مَاذَآ اُحِلَّ لَهُمْ ۭ قُلْ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰتُ ۙ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِيْنَ تُعَلِّمُوْنَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللّٰهُ ۡ فَكُلُوْا مِمَّآ اَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ ۠ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۭ اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ (٤)

অনুবাদ : (৪) মানুষ আপনার নিকট জিজ্ঞাসা করে যে, কোন কোন জীব-জন্তু তাদের জন্য হালাল করা হয়েছে? আপনি বলে দিন, তোমাদের জন্য সমস্ত হালাল প্রাণীই হালাল রাখা হয়েছে, আর যে সমস্ত শিকারি প্রাণীকে তোমরা শিখিয়ে নাও এবং তোমরা তাদেরকে লেলিয়ে দাও এবং তাদেরকে সেই প্রণালীতে শিক্ষা দান কর যেরূপ আল্লাহ তোমাদেরকে শিখিয়েছেন, অতঃপর এরূপ জানোয়ার তোমাদের জন্য যাকিছু ধরে আনবে, তা খাও, এবং তার উপর আল্লাহর নামও উচ্চারণ কর, আর আল্লাহকে ভয় করতে থাক, নিশ্চয় আল্লাহ সত্বর হিসাব গ্রহণকারী।

اَلْيَوْمَ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰتُ ۭ وَطَعَامُ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ حِلٌّ لَّكُمْ ۠ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ ۡ وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الْمُؤْمِنٰتِ وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ اِذَآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ مُحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسٰفِحِيْنَ وَلَا مُتَّخِذِيْٓ اَخْدَانٍ ۭ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِالْاِيْمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهٗ ۡ وَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ (٥)

(৫) আজ তোমাদের জন্য হালাল বস্তুসমূহ হালাল রাখা হয়েছে, আর আহলে কিতাবদের জবাইকৃত জীবও তোমাদের জন্য হালাল, এবং তোমাদের জবাইকৃত জীবও তাদের জন্য হালাল, আর সতী সাধ্বী মুসলিম নারীরাও এবং তোমাদের পূর্ববর্তী আহলে কিতাবদের মধ্যকার সতী সাধ্বী নারীরাও [তোমাদের জন্য হালাল] যখন তোমরা তাদেরকে তাদের বিনিময় [মহর] প্রদান কর এরূপে যে, তোমরা [তাদেরকে] পত্নী করে নাও, না প্রকাশ্য ব্যভিচার কর, আর না গোপন প্রণয় কর, আর যে ব্যক্তি ঈমানের [বিষয়ের] সাথে কুফরি করবে, তবে তার আমল নিষ্ফল হয়ে যাবে, এবং সে ব্যক্তি পরকালে সম্পূর্ণরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

রুকু

শাব্দিক অনুবাদ

(৪) يَسْـَٔلُوْنَكَ مَاذَآ اُحِلَّ لَهُمْ মানুষ আপনার নিকট জিজ্ঞাসা করে যে, কোন কোন জীব-জন্তু তাদের জন্য হালাল করা হয়েছে? قُلْ আপনি বলে দিন اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰتُ তোমাদের জন্য সমস্ত হালাল প্রাণীই হালাল রাখা হয়েছে وَمَا عَلَّمْتُمْ مِّنَ الْجَوَارِحِ আর যে সমস্ত শিকারি প্রাণীকে তোমরা শিখিয়ে নাও مُكَلِّبِيْنَ এবং তোমরা তাদেরকে লেলিয়ে দাও تُعَلِّمُوْنَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللّٰهُ এবং তাদেরকে সেই প্রণালীতে শিক্ষা দান কর যেরূপ আল্লাহ তোমাদেরকে শিখিয়েছেন فَكُلُوْا مِمَّآ اَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ অতঃপর এরূপ জানোয়ার তোমাদের জন্য যাকিছু ধরে আনবে, তা খাও وَاذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ এবং তার উপর আল্লাহর নামও উচ্চারণ কর وَاتَّقُوا اللّٰهَ আর আল্লাহকে ভয় করতে থাক اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ নিশ্চয় আল্লাহ সত্বর হিসাব গ্রহণকারী।

(৫) اَلْيَوْمَ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰتُ আজ তোমাদের জন্য হালাল বস্তুসমূহ হালাল রাখা হয়েছে وَطَعَامُ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ আর আহলে কিতাবদের জবাইকৃত জীবও حِلٌّ لَّكُمْ তোমাদের জন্য হালাল وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ এবং তোমাদের জবাইকৃত জীবও তাদের জন্য হালাল وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الْمُؤْمِنٰتِ আর সতী সাধ্বী মুসলিম নারীরাও وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ এবং তোমাদের পূর্ববর্তী আহলে কিতাবদের মধ্যকার সতী সাধ্বী নারীরাও اِذَآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ যখন তোমরা তাদেরকে তাদের বিনিময় প্রদান কর مُحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسٰفِحِيْنَ এরূপে যে, তোমরা [তাদেরকে] পত্নী করে নাও, না প্রকাশ্য ব্যভিচার কর وَلَا مُتَّخِذِيْٓ اَخْدَانٍ আর না গোপন প্রণয় কর وَمَنْ يَّكْفُرْ بِالْاِيْمَانِ আর যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে কুফরি করবে فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهٗ তবে তার আমল নিষ্ফল হয়ে যাবে وَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ এবং সে ব্যক্তি পরকালে সম্পূর্ণরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

www.almodina.com

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

৩- قوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** যখন নবী করীম ﷺ কে দুনিয়াতে প্রেরণের মূল উদ্দেশ্য অর্থাৎ ইসলামের সকল বিধি-বিধান পরিপূর্ণ হয়ে গেল তখন উপরিউক্ত আয়াতটি নাজিল হওয়ার বিশেষ কিছু তাৎপর্য রয়েছে। আরাফার দিন। এদিনটি পূর্ণ বৎসরের মধ্যে সর্বোত্তম দিন। ঘটনাক্রমে সেদিনটি পড়েছিল শুক্রবার। শ্রেষ্ঠত্ব ও সর্বজনবিদিত। স্থানটি হচ্ছে ময়দানে আরাফাতের জাবালে রহমত এর সন্নিকটে এ স্থানটিই আরাফার দিনে আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমত অবতরণের বিশেষ স্থান। সময় আছরের পর যা সাধারণ দিনগুলোতেও বরকতময় সময়। বিশেষতঃ শুক্রবার দিনে অনেক রেওয়ায়েতের ভিত্তিতে এ দিনের এ সময়েই দোয়া কবুলের সময়। আরাফার দিনে আরো বেশি বৈশিষ্ট্যসহকারে দোয়া কবুলের সময় হজের জন্য মুসলমানদের সর্বপ্রথম ও সর্ববৃহৎ ঐতিহাসিক সমাবেশ। প্রায় দেড় লক্ষ্য সাহাবায়ে কেরাম উপস্থিত। রহমাতুল্লিল আলামীন সাহাবায়ে কেরামের সাথে জাবালে রহমতের নীচে স্বীয় উষ্ট্রী আযবার পিঠে সওয়ার। সবাই হজের প্রধান রোকন অর্থাৎ আরাফাতের ময়দানে অবস্থানরত। এসব শ্রেষ্ঠত্ব বরকত ও রহমতের ছত্র-ছায়ায় উপরিউক্ত পবিত্র আয়াতটি নাজিল হয়।

সাহাবায়ে কেরাম বর্ণনা করেন যখন হযরত রাসূলে কারীম ﷺ-এর উপর ওহীর মাধ্যমে আয়াতটি নাজিল হয় তখন নিয়মানুযায়ী ওহীর গুরুভার সহ্য করতে না পেরে উষ্ট্রী ধীরে ধীরে মাটিতে বসে পড়ে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন : এ আয়াত কুরআনের শেষ আয়াত। এরপর বিধি বিধান সম্পর্কিত আর কোনো আয়াত নাজিল হয়নি। শুধু উৎসাহ প্রদান ও ভীতি প্রদর্শনমূলক কয়েকখানি আয়াত এরপর নাজিল হয়েছে। এ আয়াত নাজিল হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ মাত্র একাশি দিন পৃথিবীতে জীবিত ছিলেন। কেননা দশম হিজরির ৯ই জিলহজ তারিখে এ আয়াত নাজিল হয় এবং একাদশ হিজরির ১২ই রবিউল আউয়াল তারিখে রাসূলে কারীম ﷺ ওফাত পান। –[মা'আরেফুল কুরআন বাংলা ৩০৯]

৪- قوله يسئلونك ماذا أحل لهم الخ **আয়াতের শানে নুযূল– ১ :** ইবনে আবী হাতেম আদী বিন হাতেম ও যায়েদ বিন মুহালহিল দু'জনের উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তাঁরা রাসূল ﷺ-এর নিকট জানতে চান যে, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ তো মৃত জন্তুকে হারাম করেছিলেন তাহলে জন্তুসমূহ থেকে কোন জন্তুগুলো আমাদের জন্য হালাল করলেন। তাঁদের এ আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে হালাল বস্তু সম্পর্কে বর্ণনা দিয়ে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[ইবনে কাছীর :১৬/২]

শানে নুযূল– ২ : ইবনে হাতেম আবূ রাফে' রাসূল ﷺ-এর দাস এর উদ্ধৃতি দিয়ে তাঁদের বর্ণনা করেন যে, যখন রাসূল ﷺ কুকুর মেরে ফেলার জন্য হুকুম করেন, তখন তা আমি লোকদের নিকট বলে দিলাম, সুতরাং মানুষেরা এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি জন্তুগুলো মেরে ফেলতে নির্দেশ দিয়েছেন সে গুলো হতে আমাদের জন্য বৈধ প্রাণী কোনগুলো? তখন তিনি নীরব থাকেন। পরক্ষণেই বৈধ ও হালাল প্রাণীগুলোর বর্ণনা দেওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়েছে।

শানে নুযূল– ৩ : ইবনে জারীর আবূ রাফে' এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ মদিনার সকল কুকুর মেরে ফেলতে আমাকে নির্দেশ করেন। অবশেষে এমন এক মহিলার নিকট পৌঁছলাম, যার নিকট একটি কুকুর রয়েছে, সে কুকুরটি দ্বারা তার একটা উপকারিতাও রয়েছে। সুতরাং তার প্রতি দয়ার্দ্র হয়ে তা হত্যা করিনি। অতঃপর রাসূল ﷺ-এর নিকট ফিরে এসে সে সম্পর্কে অবগত করলাম। রাসূল ﷺ তাকে হত্যা করার নির্দেশ প্রদান করেন। ফলে পুনর্বার গিয়ে তাকে মেরে ফেলি। তখন মানুষেরা এসে আবেদন করল, যে সকল প্রাণীকে মেরে ফেলতে আপনি আদেশ প্রাপ্ত হয়েছেন, সেগুলো থেকে কোনগুলো আমাদের জন্য বৈধকরণ করা হয়ছে? এ আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে রাসূল ﷺ- নীরব থাকেন। তখন বৈধকরণ জন্তুগুলোর বর্ণনা দিয়ে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[ইবনে কাছীর : ১৭/২, রুহুল মা'আনী : ৬২/৬/৩, বাহরে মুহীত : ৪৪৩/৩, ফাতহুল কাদীর : ১৩/২, কুরতুবী : ৬৪/৬]

৫- قوله محصنين غير مسفحين ولا متخذي أخدان الخ **আয়াতের শানে নুযূল– ১ :** আবূ সালেহ হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ তা'আলা আহলে কিতাবীদেরকে বিবাহ করা সম্পর্কে যখন শিথিলতা করে

দিলেন, তখন তারা পরস্পরে বলছিল যে, আল্লাহ তা'আলা আমাদের ধর্মকে যদি পছন্দ না করতেন, তাহলে মুমিনদের জন্য আমাদেরকে বিবাহ করা কখনো বৈধ ঘোষণা করতেন না। তখন সে অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। –[বাহরে মুহীত : ৪৪৮/৩]

শানে নুযূল– ২ : হযরত কাতাদাহ (র.) বলেন, মুসলমানরা যখন বলাবলি করতে লাগল যে, আমরা সে সকল রমণীদেরকে কিরূপভাবে বিবাহ করব, যাদের ধর্ম হচ্ছে আমাদের ধর্ম ছাড়া ভিন্ন? তখন আল্লাহ তা'আলা وَمَنْ يَّكْفُرْ بِالْإِيْمَانِ আয়াতাংশ নাজিল করেন। –[বাহরে মুহীত : ৪৪৮/৩]

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ الخ : আলোচ্য অংশটুকু সূরা মায়িদার তৃতীয় আয়াত। এতে অনেক মূলনীতি এবং শাখাগত বিধি-বিধান ও মাসআলা বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথম মাসআলাটি হচ্ছে হালাল ও হারাম জন্তু সম্পর্কিত। যেসব জন্তুর গোশত মানুষের জন্য শারীরিক দিক দিয়ে ক্ষতিকর; যেমন দেহে রোগ সৃষ্টি হতে পারে; অথবা আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে ক্ষতিকর; যেমন চরিত্র ও অন্তরগত অবস্থা বিনষ্ট হতে পারে। কুরআনে পাক সেগুলোকে অশুচি আখ্যা দিয়ে হারাম করেছে। পক্ষান্তরে যেসব জন্তুর গোশত কোনো শারীরিক ও আধ্যাত্মিক ক্ষতি নেই, সেগুলোকে পবিত্র ও হালাল ঘোষণা করেছে।

আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে : তোমাদের জন্য মৃত জন্তু হারাম করা হয়েছে। 'মৃত' বলে ঐ জন্তু বুঝানো হয়েছে। যা জবাই ব্যতীত কোনো রোগে অথবা স্বাভাবিকভাবে মরে যায়। এ ধরনের মৃত জন্তুর গোশত চিকিৎসা বিজ্ঞানের দৃষ্টিতেও মানুষের জন্য ক্ষতিকর এবং আধ্যাত্মিক দিক দিয়েও।

তবে হাদীসে রাসূল ﷺ দুই প্রকার মৃতকে বিধানের বাইরে রেখেছেন; একটি মৃত মাছ ও অপরটি মৃত টিড্ডী। –[মুসনাদে আহমদ, ইবনে মাজা, দারাকুতনী, বায়হাকী]

আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত দ্বিতীয় হারাম বস্তু হচ্ছে রক্ত। কুরআনের অন্য আয়াতে أَوْ دَمًا مَسْفُوْحًا বলায় বুঝা যায় যে, যে রক্ত প্রবাহিত হয়, তাই হারাম। সুতরাং কলিজা ও প্লীহা রক্ত হওয়া সত্ত্বেও হারাম নয়। পূর্বোক্ত যে হাদীসে মাছ ও টিড্ডির কথা বলা হয়েছে, তাতেই কলিজা ও প্লীহা হালাল হওয়ার কথাও বলা হয়েছে।

তৃতীয় বস্তু শূকরের গোশত। একেও হারাম করা হয়েছে। গোশত বলে তার সম্পূর্ণ দেহ বুঝানো হয়েছে। চর্বি ইত্যাদিও এর অন্তর্ভুক্ত।

চতুর্থ : ঐ জন্তু যা আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে উৎসর্গ করা হয়। যদি জবাই করার সময়ও অন্যের নাম নেওয়া হয়, তবে তা খোলাখুলি শিরক। এরূপ জন্তু সর্বসম্মতভাবে মৃতের অন্তর্ভুক্ত। যেমন আরবের মুশরিকরা মূর্তিদের নামে জবাই করত। অধুনা কোনো কোনো মূর্খ লোক পীর-ফকিরের নামে জবাই করে। যদিও জবাই করার সময় আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে; কিন্তু জন্তুটি যেহেতু অন্যের নামে উৎসর্গীকৃত এবং তাঁর সন্তুষ্টির জন্য কুরবান করে, তাই সাধারণ ফিকহিবদগণ একেও وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهٖ আয়াতদৃষ্টে হারাম বলেছেন।

পঞ্চম : مُنْخَنِقَةُ অর্থাৎ ঐ জন্তু হারাম, যাকে গলাটিপে হত্যা করা হয়েছে অথবা নিজেই কোনো জাল ইত্যাদিতে আবদ্ধ অবস্থায় শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মরে গেছে।

ষষ্ঠ : مَوْقُوْذَةُ অর্থাৎ, ঐ জন্তু হারাম, যা লাঠি অথবা পাথর ইত্যাদির প্রচণ্ড আঘাতে নিহত হয়। যদি নিক্ষিপ্ত তীরের ধারালো অংশ শিকারের গায়ে না লাগে এবং তীরের আঘাতে শিকার নিহত হয়, তবে সে শিকারও مَوْقُوْذَةُ এর অন্তর্ভুক্ত এবং হারাম। مُنْخَنِقَةُ এবং مَيْتَةُ উভয়টি مَوْقُوْذَةُ তথা মৃতের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু জাহেলিয়াত যুগে এগুলোকে জায়েজ মনে করা হতো। এ কারণে আয়াতে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

হযরত আদী ইবনে আবী হাতেম (রা.) একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলেন, আমি মাঝে মাঝে চওড়া তীর দ্বারা শিকার করি। যদি এতে শিকার মরে যায়, তবে খেতে পারি কি না? তিনি উত্তরে বললেন, তীরের যে অংশ ধারালো নয়, যদি সে অংশের আঘাতে শিকার মরে যায়, তবে তা مَوْقُوْذَةُ এর অন্তর্ভুক্ত হবে এবং তুমি খেতে পারবে না। আর যদি ধারালো অংশ শিকারের গায়ে লাগে এবং শিকারকে আহত করে, তবে তা খেতে পার। ইমাম জাসসাস 'আহকামুল কুরআন' গ্রন্থে এ হাদীসটি নিজ সনদে বর্ণনা করেছেন। এরূপ শিকার হালাল হওয়ার জন্য শর্ত এই যে, বিসমিল্লাহ বলে তীর নিক্ষেপ করতে হবে।

যে শিকার বন্দুকের গুলিতে মরে যায়, ফিকহবিদগণ সেটাকেও مَوْقُوْذَة -এর অন্তর্ভুক্ত করে হারাম বলেছেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বলতেন : اَلْمَقْتُوْلَةُ بِالْبُنْدُقَةِ تِلْكَ الْمَوْقُوْذَةُ –অর্থাৎ বন্দুক দ্বারা যে জন্তুকে হত্যা করা হয়, তাই مَوْقُوْذَة –অতএব হারাম। (জাসসাস)। ইমাম আবূ হানীফা (র.), শাফেয়ী, মালেক প্রমুখ সবাই এ ব্যাপারে একমত।–[কুরতুবী]

সপ্তম : مُتَرَدِّيَة অর্থাৎ ঐ জন্তু হারাম, যা কোনো পাহাড়, টিলা, উঁচু দালানের উপর থেকে অথবা কূপে পড়ে মরে যায়। এ কারণেই হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন : যদি তুমি পাহাড়ের উপর দণ্ডায়মান কোনো শিকারের প্রতি বিসমিল্লাহ বলে তীর নিক্ষেপ কর এবং তীরের আঘাতে সে নিচে পড়ে মরে যায়, তবে তা খেয়ো না। কারণ এতে সম্ভাবনা আছে যে, শিকারটি তীরের আঘাতে না মরে নিচে পড়ে যাওয়ার কারণে মরে গেছে। এমতাবস্থায় তা اَلْمُتَرَدِّيَةُ -এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। এমনিভাবে কোনো পাখিকে তীর নিক্ষেপ করার পর যদি সেটি পানিতে পড়ে যায়, তবে তা খাওয়াও নিষিদ্ধ। কারণ এখানেও পানিতে ডুবে যাওয়ার কারণে মৃত্যু হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। –[জাসসাস]

অষ্টম : نَطِيْحَة অর্থাৎ, ঐ জন্তু হারাম, যা কোনো সংঘর্ষে নিহত হয়। যেমন, রেলগাড়ি, মোটর ইত্যাদির নিচে এসে মরে যায় অথবা কোনো জন্তুর শিং-এর আঘাতে মরে যায়।

নবম : ঐ জন্তু হারাম, যেটি কোনো হিংস্র জন্তুর কামড়ে মরে যায়। উপরিউক্ত নয় প্রকার হারাম জন্তুর বর্ণনা করার পর একটি ব্যতিক্রম উল্লেখ করে বলা হয়েছে : اِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ অর্থাৎ, এসব জন্তুর মধ্যে কোনোটিকে জীবিত অবস্থায় পাওয়ার পর জবাই করতে পারলে হালাল হয়ে যাবে।

এ ব্যতিক্রম প্রথমোক্ত চার প্রকার জন্তুর সাথে সম্পর্কযুক্ত হতে পারে না। কেননা মৃত ও রক্তকে জবাই করার সম্ভাবনা নাই এবং শূকর ও আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নাম উৎসর্গীকৃত জন্তু সত্তার দিক দিয়েই হারাম। সুতরাং এ দুটোকে জবাই করা না করা উভয়ই সমান। এ কারণে হযরত আলী (রা.), ইবনে আব্বাস (রা.), হাসান বসরী, কাতাদহ প্রমুখ পূর্ববর্তী মনীষীগণ এ বিষয়ে একমত যে, এ ব্যতিক্রম প্রথমোক্ত চারটি পরবর্তী পাঁচটির সাথে সম্পর্কযুক্ত। অতএব আয়াতের অর্থ এই দাঁড়ায় যে, এ পাঁচ প্রকার জন্তুর মধ্যে যদি জীবনের স্পন্দন অনুভব করা যায় এবং তদবস্থায়ই বিসমিল্লাহ বলে জবাই করে দেওয়া হয়, তবে এগুলো হালাল হবে।

দশম : ঐ জন্তু হারাম, যাকে নুছুবের উপর জবাই করা হয়। নুছুব ঐ প্রস্তরকে বলা হয়, যা কা'বা গৃহের আশেপাশে স্থাপিত ছিল। জাহেলিয়াত যুগে আরবরা এদের উপাসনা করত এবং এদের কাছে এদের উদ্দেশ্যে জন্তু কুরবানি করত। একে তারা ইবাদত বলে গণ্য করত।

জাহেলিয়াত যুগের আরবরা উপরিউক্ত সর্ব প্রকার জন্তুর গোশত আহারে অভ্যস্ত ছিল। কুরআন পাক এগুলোকে হারাম করেছে।

একাদশ اِسْتِقْسَامُ الْاَزْلَامِ হারাম। اَزْلَامْ শব্দটি زَلَمٌ -এর বহুবচন। এর অর্থ ঐ তীর, যা জাহেলিয়াত যুগে ভাগ্য পরীক্ষার জন্য নির্ধারিত ছিল। এ কাজের জন্য সাতটি তীর ছিল। তন্মধ্যে একটিতে نَعَمْ (হ্যাঁ), একটিতে لَا (না) এবং অন্যগুলোতে অন্য শব্দ লিখিত ছিল। এ তীরগুলো কা'বাগৃহের খাদেমের কাছে থাকত। কেউ নিজ ভাগ্য পরীক্ষা করতে চাইলে অথবা কোনো কাজ করার পূর্বে তা উপকারি হবে না অপকারী, তা জানতে চাইলে সে কা'বার খাদেমের কাছে পৌঁছে একশত মুদ্রা উপঢৌকন দিত। খাদেম তুন থেকে একটি একটি করে তীর বের করত। 'হ্যাঁ' শব্দ বিশিষ্ট তীর বের হয়ে আসলে মনে করা হতো যে, কাজটি উপকারী। পক্ষান্তরে 'না' শব্দ বিশিষ্ট তীর বের হলে তারা বুঝে নিত যে, কাজটি করা ঠিক হবে না। হারাম জন্তুসমূহের বর্ণনা প্রসঙ্গে এ বিষয়টি উল্লেখ করার কারণ এই যে, তারা এ তীরগুলো জন্তু সমূহের গোশত বণ্টনেও ব্যবহার করত। কয়েকজন শরিক হয়ে উট ইত্যাদি জবাই করে তা মাংস প্রাপ্য অংশ অনুযায়ী বণ্টন না করে এসব জুয়ার তীরের সাহায্যে বণ্টন করত। ফলে কেউ সম্পূর্ণ বঞ্চিত, কেউ প্রাপ্য অংশের চাইতে কম এবং কেউ অনেক বেশি গোশত পেয়ে যেত। এ কারণে হারাম জন্তুর বর্ণনা প্রসঙ্গে এ হারাম বণ্টন পদ্ধতিও বর্ণনা করা হয়েছে।

আলেমগণ বলেন : ভবিষ্যৎ অবস্থা এবং অদৃশ্য বিষয় জানার যেসব পন্থা প্রচলিত আছে : যেমন ভবিষ্যৎ কথন বিদ্যা, হস্তরেখা বিদ্যা, শকুন বিদ্যা ইত্যাদি সব اِسْتِقْسَامٌ بِالْاَزْلَامِ -এর অন্তর্ভুক্ত এবং হারাম।

اِسْتِقْسَامٌ بِالْاَزْلَامِ শব্দটি কখনো জুয়া অর্থেও ব্যবহৃত হয়, যাতে গুটিকা নিক্ষেপ অথবা লটারীর নিয়মে অধিকার নির্ধারণ করা হয়। কুরআনে পাক একে مَيْسِرْ নাম দিয়ে হারাম ও নিষিদ্ধ করেছে। এ কারণেই হযরত সাঈদ ইবনে জুবায়ের, মুজাহিদ ও শা'বী (র.) বলেন : আরবে যেমন ভাগ্য নির্ধারক তীরের সাহায্যে অংশ বের করা হতো পারস্য ও রোমেও তেমনি আবার ছক, চওসর ইত্যাদির গুটি দ্বারা অংশ বের করা হতো। সুতরাং তীর নিক্ষেপের মাধ্যমে নির্ধারণের ন্যায় এগুলোও হারাম। –[মাযহারী]

ভাগ্য নির্ধারক তীর দ্বারা বন্টন হারাম করার সাথে সাথে বলা হয়েছে যে, ذٰلِكُمْ فِسْقٌ অর্থাৎ, এ বন্টন পদ্ধতি পাপাচার ও পথভ্রষ্টতা। এরপর বলা হয়েছে–

اَلْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ دِيْنِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ

অর্থাৎ, অদ্য কাফেররা তোমাদের দীনকে পরাভূত করার ব্যাপারে নিরাশ হয়ে গেছে। কাজেই তোমরা তাদেরকে আর ভয় করো না। তবে আল্লাহকে ভয় কর।

এ আয়াতটি হিজরতের দশম, বৎসরে বিদায় হজে আরাফার দিনে অবতীর্ণ হয়। তখন মক্কা এবং প্রায় সমগ্র আরব মুসলমানদের করতলগত ছিল। সমগ্র আরব উপত্যকায় ইসলামি আইন প্রচলিত হয়ে গিয়েছিল। তাই বলা হয়েছে : ইতঃপূর্বে কাফেররা মুসলমানদের সংখ্যা ও শক্তি অপেক্ষাকৃত কম দেখে তাদের নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার পরিকল্পনা করত। কিন্তু এখন তাদের মধ্যে এরূপ দুঃসাহস ও বল-ভরসা নেই। এ কারণে মুসলমানরা যেন তাদের পক্ষ থেকে নিশ্চিন্ত হয়ে স্বীয় প্রতিপালকের আনুগত্য ও ইবাদতে মনোনিবেশ করে।

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا

এ আয়াতটি যেমন বিশেষ তাৎপর্য ও গুরুত্ব সহকারে অবতীর্ণ হয়েছে তেমনি এর বিষয়বস্তুও ইসলাম ধর্ম ও মুসলমানদের জন্য বিরাট সুসংবাদ, অনন্য পুরস্কার ও স্বাতন্ত্র্যের স্বাক্ষর বহন করে। এ বিষয়বস্তুর সারমর্ম এই যে, পৃথিবীতে মানব জাতিকে সত্য দীন ও আল্লাহর নিয়ামতের চূড়ান্ত মাপকাঠি প্রদানের যে ওয়াদা ছিল, আজ তা ষোলকলায় পূর্ণ করে দেওয়া হলো। হযরত আদম (আ.)-এর আমল থেকে যে সত্যধর্ম ও আল্লাহর নিয়ামতের অবতরণ ও প্রচলন আরম্ভ করা হয়েছিল এবং প্রত্যেক যুগ ও প্রত্যেক ভূখণ্ডের অবস্থানুযায়ী এ নিয়ামত থেকে আদম সন্তানদের অংশ দেওয়া হচ্ছিল, আজ যেন সেই ধর্মও নিয়ামত পরিপূর্ণ আকারে শেষনবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ ও তাঁর উম্মতকে প্রদান করা হলো।

يَسْئَلُوْنَكَ مَاذَا اُحِلَّ لَهُمْ الخ : উপরিউক্ত প্রশ্নোত্তরে শিকারি কুকুর, বা ইত্যাদি দ্বারা শিকার করা জন্তু হালাল হওয়ার জন্য চারটি শর্ত উল্লেখ করা হয়েছে।

১ম : কুকুর অথবা বাজ শিক্ষাপ্রাপ্ত হতে হবে। শিকার পদ্ধতি এই যে, আপনি যখন কুকুরকে শিকারের দিকে প্রেরণ করবেন, তখন সে শিকার ধরে আপনার কাছে নিয়ে আসবে, নিজে খাওয়া শুরু করবে না। বাজপখির বেলায় পদ্ধতি এই যে, আপনি ফেরত আসার জন্য ডাক দেওয়া মাত্রই সে কাল বিলম্ব না করে ফিরে আসবে– যদিও তখন সে কোনো শিকারের পিছনে ধাওয়া করতে থাকে। শিকারি জন্তু এমনভাবে শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়ে গেলে বুঝা যাবে যে, সে আপনার জন্য শিকার করে নিজের জন্য নয়। এমতাবস্থায় এগুলো ধরে আনা শিকার স্বয়ং আপনারই শিকার বলে গণ্য হবে। যদি শিকারি জন্তু কোনো সময় এ শিক্ষার বিরুদ্ধাচরণ করে যেমন, কুকুর নিজেই খাওয়া আরম্ভ করে কিংবা বাজপাখি আপনার ডাকে ফেরত না আসে, তবে এ শিকার আপনার শিকার নয়। কাজেই তা খাওয়াও বৈধ নয়।

দ্বিতীয় : আপনি নিজ ইচ্ছায় কুকুরকে অথবা বাজকে শিকারের পিছনে প্রেরণ করবেন। কুকুর অথবা বাজ যেন স্বেচ্ছায় শিকারের পিছনে দৌড়ে শিকার না করে। আলোচ্য আয়াতে এ শর্তটি مُكَلِّبِيْنَ শব্দে বর্ণিত হয়েছে। এটি تَكْلِيْبٌ ধাতু থেকে উদ্ভূত। এর আসল অর্থ– কুকুরকে শিক্ষা দেওয়া। এরপর সাধারণ শিকারি জন্তুকে শিক্ষা দেওয়ার পর শিকারের দিকে প্রেরণ করার অর্থেও ব্যবহৃত হয়। জালালাইন– এর গ্রন্থকার مُكَلِّبِيْنَ শব্দের ব্যাখ্যায় اِرْسَالٌ শব্দ উল্লেখ করেছেন। এর অর্থ শিকারের দিকে প্রেরণ করা। তাফসীরে কুরতুবীতেও এ উক্তি উল্লেখ করা হয়েছে।

তৃতীয় : শর্ত এই যে, শিকারি জন্তু নিজে শিকারকে খাবে না; বরং আপনার কাছে নিয়ে আসবে। এ শর্তটি مِمَّا اَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ বাক্যাংশে বর্ণিত হয়েছে।

চতুর্থ : শর্ত এই যে, শিকারি কুকুর অথবা বাজকে শিকারের দিকে প্রেরণ করার সময় 'বিসমিল্লাহ' বলতে হবে। বর্ণিত চারটি শর্ত পূর্ণ হলে শিকার আপনার হাতে পৌছার পূর্বেই যদি মরে যায়, তবুও তা হালাল হবে; জবাই করার প্রয়োজন হবে না। আর যদি জীবিত অবস্থায় হাতে আসে, তবে জবাই ব্যতীত হালাল হবে না।

ইমাম আযম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে একটি পঞ্চম শর্তও আছে। তা এই যে, শিকারি জন্তু শিকারকে আহতও করতে হবে। جَوَارِحْ শব্দে এ শর্তের প্রতিই ইঙ্গিত রয়েছে।

যেসব বন্য জন্তু কারো করতলগত নয়, উপরিউক্ত মাসআলা তাদের বেলায় প্রযোজ্য। পক্ষান্তরে কোনো বন্য জন্তু কারো করতলগত হয়ে গেলে, তা নিয়মিত জবাই করা ব্যতীত হালাল হবে না।

উপসংহারে এ নির্দেশও দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা শিকার করা জন্তু হালাল করেছেন ঠিক, কিন্তু শিকারের পিছনে লেগে নামাজ ও শরিয়তের অন্যান্য জরুরি নির্দেশের প্রতি উদাসীন হয়ে পড়া কিছুতেই বৈধ নয়।

اَلْيَوْمَ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰتُ الخ : সূরা মায়িদার প্রথম আয়াতে গৃহপালিত পশু ছাগল, গরু, মহিষ ইত্যাদির হালাল হওয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে এবং তৃতীয় আয়াতে নয় প্রকার হারাম জন্তুর বিবরণ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আলোচ্য আয়াতের বিবরণে প্রথম বাক্যেই গোটা অধ্যায়ের সারমর্ম এমনভাবে ব্যক্ত হয়েছে, যাতে বিভিন্ন জন্তুর মধ্যে হালাল ও হারাম হওয়ার বৈশিষ্ট্যসহ এর একটি মাপকাঠি ও মূলনীতি সুনির্দিষ্টভাবে জানা যায়।

ইরশাদ হচ্ছে اَلْيَوْمَ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰتِ অর্থাৎ, আজ তোমাদের জন্য সব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বস্তু হালাল করা হলো। 'আজ' বলে এ দিনকে বুঝানো হয়েছে, যেদিন এ আয়াত ও এর পূর্ববর্তী আয়াত অবতীর্ণ হয়। অর্থাৎ, দশম হিজরির বিদায় হজের আরাফার দিন। উদ্দেশ্যে এই যে, আজ যেমন তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্মকে পূর্ণাঙ্গ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ করে দেওয়া হয়েছে এবং তোমাদের প্রতি আল্লাহর নিয়ামত পূর্ণতা লাভ করেছে, তেমনি আল্লাহ তা'আলার পবিত্র বস্তুসমূহ, যা পূর্বেও তোমাদের জন্য হালাল ছিল, চিরস্থায়ীভাবে হালাল রাখা হলো। এ নির্দেশ রহিত হওয়ার সম্ভাবনা শেষ হয়ে গেছে। কেননা অচিরেই ওহীর আগমন বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।

এ আয়াতে طَيِّبَاتٌ অর্থাৎ, পবিত্র ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন বস্তু হালাল হওয়ার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে :

يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبٰٓئِثَ অর্থাৎ, আল্লাহ হালাল করেন তাদের জন্য طَيِّبَاتٌ এবং হারাম করেন خَبَائِثٌ এখানে طَيِّبَاتٌ-এর বিপরীতে خَبَائِثٌ ব্যবহার করে উভয় শব্দের মর্মার্থ বর্ণনা করা হয়েছে।

অভিধানে طَيِّبَاتٌ দ্বারা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কাম্য বস্তুসমূহকে এবং এর বিপরীতে خَبَائِثٌ দ্বারা নোংরা ও ঘৃণার বস্তুসমূহকে বলা হয়। কাজেই আয়াতের এ বাক্যের দ্বারা বুঝা যায় যে, যেসব বস্তু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, উপাদেয় ও পবিত্র, সেগুলো মানুষের জন্য হালাল করা হয়েছে এবং যেসব বস্তু নোংরা, ঘৃণার্হ ও অপকারী, সেগুলো হারাম করা হয়েছে। এর কারণ এই যে, মানব জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অন্যান্য জন্তু জানোয়ারের ন্যায় খাওয়া-পরা, নিদ্রা-জাগরণ ও জীবন-মরণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়।

সর্বশক্তিমান আল্লাহ কোনো বিশেষ লক্ষ্য অর্জনের জন্যই মানুষকে সৃষ্টির সেরা করেছেন। সে লক্ষ্যটি উত্তম ও পবিত্র চরিত্র ব্যতীত অর্জিত হতে পারে না। এ কারণেই অসচ্চরিত্র ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে মানুষ আখ্যা লাভেরই যোগ্য নয়।

কুরআন পাক এ ধরনের লোকদের সম্পর্কে বলে : بَلْ هُمْ اَضَلُّ অর্থাৎ, এরা চতুষ্পদ জন্তুর চাইতেও অধিকতর পথভ্রষ্ট। যখন চরিত্র সংশোধনের উপর মানবের মানবতা নির্ভরশীল, তখন যেসব বস্তু মানব চরিত্রকে কলুষিত ও বিনষ্ট করে, সেগুলো থেকে মানুষকে পুরোপুরিভাবে বাঁচিয়ে রাখা অত্যাবশ্যক। একথা স্বতঃসিদ্ধ যে, মানব চরিত্রের উপর পারিপার্শ্বিক অবস্থা দ্বারা যখন মানব চরিত্র প্রভাবান্বিত হয়, তখন যে বস্তু মানুষের শরীরের অংশে পরিণত হয়, তার দ্বারা মানব চরিত্র অবশ্যই প্রভাবান্বিত হবে। এ কারণে পানাহারের যাবতীয় বস্তুর মধ্যে এ বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করা খুবই জরুরি। চুরি, ডাকাতি, ঘুষ, সুদ, জুয়া ইত্যাদির আমদানি যে ব্যক্তির শরীরের অংশ হবে, সে নিশ্চিতরূপেই মানবতা থেকে দূরে সরে পড়বে এবং শয়তানের নিকটবর্তী হয়ে যাবে।

এ কারণেই কুরআন পাক বলে : يٰٓاَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوْا مِنَ الطَّيِّبٰتِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا –এখানে সৎকর্মের জন্য হালাল ভক্ষণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কেননা হালাল ভক্ষণ ব্যতীত সৎকর্ম কল্পনাতীত।

www.almodina.com

বিশেষ করে গোশত মানব দেহের প্রধান অংশে পরিণত হয়। সুতরাং যে গোশত চরিত্র বিনষ্ট করে, তা যাতে মানুষের খাদ্যের অন্তর্ভুক্ত না হয়, সেদিকে সতর্ক দৃষ্টিরাখা অধিকতর জরুরি। এমনিভাবে সে মাংস থেকেও বিরত থাকতে হবে, যা দৈহিক দিক দিয়ে মানুষের জন্য ক্ষতিকর। কেননা এতে রোগ-ব্যাধির জীবাণু থাকে। শরিয়ত যেসব বস্তুকে নোংরা ও ঘৃণার্হ সাব্যস্ত করেছে, সেগুলো নিশ্চিতরূপেই মানুষের দেহ কিংবা আত্মা অথবা উভয়কে বিনষ্ট করে এবং মানুষের প্রাণ অথবা চরিত্রকে ধ্বংস করে। এ কারণে সেগুলোকে হারাম করা হয়েছে। এর বিপরীতে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র বস্তু দ্বারা মানুষের দেহ ও আত্মা লালিত হয় এবং উৎকৃষ্ট চরিত্র গঠিত হয়। এ কারণে এগুলো হালাল করা হয়েছে। মোটকথা أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰتُ বাক্যটি হালাল ও হারাম হওয়ার দর্শন এবং মূলনীতিও ব্যক্ত করেছে।

এখন কোন কোন বস্তু طَيِّبٰتٌ অর্থাৎ, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, উপাদেয় ও কাম্য এবং কোন কোন বস্তু خَبَائِثٌ অর্থাৎ, নোংরা ক্ষতিকর ও ঘৃণার্হ, তা সুস্থ রুচিজ্ঞানের আগ্রহ ও অনীহার উপরই নির্ভরশীল। এ কারণেই যেসব জন্তুকে ইসলাম হারাম সাব্যস্ত করেছে, প্রতিযুগের সুস্থ স্বভাব মানুষই সেগুলোকে নোংরা ও ঘৃণার্হ মনে করে এসেছে। যেমন, মৃতজন্তু, রক্ত ইত্যাদি। তবে মাঝে মাঝে মূর্খতাসুলভ রীতিনীতি সুস্থ স্বভাবের উপর প্রবল হয়ে যায়। ফলে ভালো ও মন্দের পার্থক্য লোপ পায় অথবা কোনো কোনো বস্তুর নোংরামিও অস্পষ্ট হয়ে থাকে। এ ধরনের ব্যাপারে পয়গম্বরদের সিদ্ধান্ত সবার জন্য অকাট্য দলিলস্বরূপ। কেননা মানুষের মধ্যে পয়গম্বরগণই সর্বাধিক সুস্থ স্বভাবসম্পন্ন। আল্লাহ তা'আলা বিশেষভাবে তাঁদেরকে সুস্থ স্বভাব দ্বারা ভূষিত করেছেন। স্বয়ং তাঁদের শিক্ষাদীক্ষা দিয়েছেন। তাদের চার দিকে ফেরেশতাদের পাহারা বসিয়েছেন। ফলে তাদের মন-মস্তিষ্ক ও চরিত্র কোনো ভ্রান্ত পরিবেশ দ্বারা দূষিত হতে পারে না। তাঁরা যেসব বস্তুকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন আখ্যা দিয়েছেন, সেগুলো প্রকৃতপক্ষে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন।

অতএব, হযরত নূহ (আ.)-এর আমল থেকে শেষ নবী [illegible]-এর আমল পর্যন্ত প্রত্যেক পয়গম্বর মৃত জন্তু ও শূকর ইত্যাদিকে নিজেদের সময়ে হারাম বলে ঘোষণা করেছেন। এতে বুঝা যায় যে, প্রতি যুগের সুস্থ-স্বভব মনীষীরা এদের নোংরা ও ক্ষতিকর বলেই মনে করেছেন।

হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলভী (র.) 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগা' গ্রন্থে বলেন, ইসলামী শরিয়তে হারামকৃত জন্তুদের সম্পর্কে চিন্তা করলে সেগুলো দু'টি মূলনীতির অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। এক প্রকার জন্তু সৃষ্টিগত ও স্বভাবতভাবে নোংরা ও অপবিত্র এবং দ্বিতীয় প্রকার জন্তুর জবাই পদ্ধতি ভ্রান্ত, ফলে সেটাকে জবাই করা জন্তুর পরিবর্তে মৃত বলেই সাব্যস্ত করা হবে।

সূরা মায়িদার তৃতীয় আয়াতে নয়টি বস্তুকে হরাম বলা হয়েছে। তন্মধ্যে শূকর প্রথম প্রকারের অন্তর্ভুক্ত এবং অবশিষ্ট আটটি দ্বিতীয় প্রকাররে অন্তর্ভুক্ত।

কুরআন পাক وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبٰٓئِثَ বলে সংক্ষেপে সব নোংরা ও অপবত্রি জন্তু হারাম হওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। অতঃপর শূকরের গোশত, প্রবাহিত রক্ত ইত্যাদি কয়েকটি বস্তুর নাম পরিষ্কার উল্লেখ করেছে। অবশিষ্ট নোংরা ও অপবত্রি বস্তুসমূহের বর্ণনা রাসূল [illegible]-এর দায়িত্বে ন্যস্ত করা হয়েছে। তিনি কোনো জন্তুর خَبِيْثٌ তথা নোংরা হওয়ার আলামত বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন : কোনো জাতিকে শাস্তি হিসেবে কানো জন্তুর আকৃতিতে বিকৃত ও রূপান্তরিত করা হলে বুঝা যায় যে, জন্তুটি স্বভাবগতভাবে নোংরা। ফলে যারা আল্লাহর গজবে পতিত, তাকে সেসব জীবের আকৃতিতে রূপান্তরিত করে দেওয়া হয়েছে। উদাহরণতঃ কুরআনে বলা হয়েছে : جَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيْرَ; অর্থাৎ, কোনো কোনো জাতিকে শাস্তি হিসেবে শূকর ও বানরের আকৃতিতে বিকৃত করা হয়েছে। অতএব, বুঝা যায় যে, এই দুই প্রকার জন্তু স্বভাবগতভাবেই নোংরা শ্রেণিভুক্ত। নিয়মিত জবাই করলেও এগুলো হালাল হবে না এছাড়া অনেক জন্তু এমনও আছে, ক্রিয়াকর্ম ও লক্ষণাদি দ্বারা সেগুলো নোংরা হওয়ার বিষয় প্রত্যেকেই অনুভব করতে পারে। উদাহরণত : হিংস্র জন্তু অন্যান্য জন্তুকে ক্ষত-বিক্ষত করা, ছিঁড়ে-খামচে ভক্ষণ করা এবং নির্মমতাই এদের কাজ।

এজন্যই রাসূলুল্লাহ [illegible] একটি সাধারণ নীতি হিসেবে বর্ণনা করেন যে, দাঁত দ্বারা ছিঁড়ে খায় এমন যাবতীয় হিংস্র জন্তু যেমন, সিংহ, বাঘ ইত্যাদি এবং থাবা দ্বারা শিকার করে এমন পাখি যেমন, বাজ, চিল প্রভৃতি সবই হারাম এছাড়া ইঁদুর, মৃতভোজী জন্তু, গাধা ইত্যাদির স্বভাব হচ্ছে হীনতা, নিকৃষ্টতা ও অপবিত্রতার সাথে জড়িত হওয়া। এসব জন্তুর স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য এবং ক্ষতিকর হওয়া প্রত্যেক সাধারণ সুস্থ-স্বভাব ব্যক্তিই অনুভব করতে সক্ষম।

মোটকথা এই যে, ইসলামি শরিয়ত যেসব জন্তুকে হারাম সাব্যস্ত করেছে, তন্মধ্যে এক প্রকার জন্তুর মধ্যে প্রকৃতিগতভাবেই নোংরামি পরিলক্ষিত হয়। দ্বিতীয় প্রকার জন্তুর মাঝে প্রকৃতিগতভাবে কোনো নোংরামি নেই; কিন্তু জন্তু জবাই করার যে

পদ্ধতি আল্লাহ তা'আলা নির্ধারণ করেছেন তাকে সে পদ্ধতিতে জবাই করা হয়নি। এখন এর ধরন বিভিন্ন হতে পারে : **এক.** মূলত জবাইই করা হয়নি। যেমন, হেঁচকা টান মেরে ফেলা,. আঘাত করে মেরে ফেলা ইত্যাদি। **দুই.** জবাই করা হয়েছে কিন্তু আল্লাহর নামের পরিবর্তে অন্যের নাম নিয়ে। তিন. কারো নাম নেওয়া হয়নি এবং জবাই করার সময় ইচ্ছাকৃতভাবে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা হয়নি। এরূপ জবাই শরিয়তে ধর্তব্য নয়; বরং জবাই ব্যতীত মেরে ফেলারই শামিল।

وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰبَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ

অর্থাৎ, আহলে কিতাবদের খাদ্য তোমাদের জন্য হালাল এবং তোমাদের খাদ্য আহলে কিতাবদের জন্য হালাল।

এক্ষেত্রে সাধারণ সাহাবী ও তাবেয়ীগণের মতে 'খাদ্য' বলতে জবাই করা জন্তুকে বুঝানো হয়েছে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) , আবুদ দারদা, ইবরাহীম, কাতাদাহ, সুদ্দী, জাহহাক, মুজাহিদ (রা.) থেকে এ কথাই বর্ণিত আছে। –[রূহুল মা'আনী, জাসসাস]

কেননা অন্য প্রকার খাদ্যবস্তুতে আহলে কিতাব, পৌত্তলিক, মুশরিক সবাই সমান। রুটি, আটা, চাল, ডাল ইত্যাদিতে জবাই করার প্রয়োজন নেই। এগুলো যে কোনো লোকের কাছ থেকে যে কোনো বৈধ পন্থায় অর্জিত হলে মুসলমানের জন্য খাওয়া হালাল। অতএব, আলোচ্য আয়াতে আলোচ্য বাক্যের মূল বিষয়বস্তু হচ্ছে আহলে কিতাবদের জবাই করা জন্তু মুসলমানদের জন্য এবং মুসলমানদের জবাই করা জন্তু আহলে কিতাবদের জন্য হালাল।

এখানে কয়েকটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য। প্রথম, কুরআন ও সুন্নাহর পরিভাষায় আহলে কিতাব কারা? কিতাব বলে কোন কিতাবকে বুঝানো হয়েছে? আহলে কিতাব হওয়ার জন্য স্বীয় কিতাবের প্রতি বিশুদ্ধ ঈমান থাকা এবং আমল করা জরুরি কিনা? এটা জানা কথা যে, এ স্থলে কিতাবের আভিধানিক অর্থে যে কোনো লিখিত পাতাকে বুঝানো হয়নি; বরং যে কিতাব আল্লাহর পক্ষ থেকে আগমন করেছে, তাই বুঝানো হয়েছে। তাই এ বিষয়ে কারো দ্বিমত নেই যে, এখানে ঐ ঐশি কিতাবকেই বুঝানো হয়েছে, যা আল্লাহর কিতাব হওয়া কুরআনের সমর্থন দ্বারা নিশ্চিত। যেমন, তাওরাত, ইঞ্জিল, যাবূর এবং হযরত মূসা ও ইবরাহীম (আ.)-এর সহীফা ইত্যাদি। সুতরাং যেসব জাতি এমন কিতাবের প্রতি বিশ্বাস রাখে এবং তাকে খোদায়ী প্রত্যাদেশ বলে মনে করে তারাই আহলে কিতাব। পক্ষান্তরে আল্লাহর কিতাব বলে কুরআন ও সুন্নাহর নিশ্চিত পন্থায় প্রমাণিত নয়, তারা আহলে কিতাবদের অন্তর্ভুক্ত হবে না। যেমন, মক্কার মুশরিক, অগ্নিউপাসক, মূর্তিপূজারি হিন্দু, বৌদ্ধ, আর্য, শিখ ইত্যাদি। এতে বুঝা গেল যে, কুরআনের পরিভাষায় ইহুদি ও খ্রিস্টান জাতিই আহলে কিতাবের অন্তর্ভুক্ত। তারা তাওরাত ও ইঞ্জিলের প্রতি বিশ্বাসী।

তৃতীয় একটি জাতি হচ্ছে 'ছাবেয়ীন'। তাদের অবস্থা সন্দেহযুক্ত।

যেসব আলেমের মতে তারা হযরত দাউদ (আ.)–এর উপর নাজিলকৃত কিতাব যাবূরের প্রতি ঈমান রাখে, তাঁরা তাদেরও আহলে কিতাবের অন্তর্ভুক্ত মনে করেন। আর যারা অনুসন্ধান করে জানতে পেরেছেন যে, যাবূর কিতাবের সাথে এদের কোনো সম্পর্ক নেই; এরা তারকা উপাসক জাতি, তারা এদের মূর্তি ও অগ্নিউপাসকদের অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করেন। মোটকথা, নিশ্চিতরূপে যাদের আহলে কিতাব বলা যায় তারা হলো ইহুদি ও খ্রিস্টান জাতি। তাদের জবাই করা জন্তু মুসলমানদের জন্য এবং মুসলমানদের জবাই করা জন্তু তাদের জন্য হালাল।

ইহুদি ও খ্রিস্টানদের মধ্যে যারা নাস্তিক, তারা এর অন্তর্ভুক্ত নয় : আজকাল ইউরোপে বিরাট সংখ্যক ইহুদি ও খ্রিস্টান রয়েছে, যারা শুধু আদমশুমারীর দিক দিয়েই ইহুদি ও খ্রিস্টান বলে কথিত হয়। প্রকৃতপক্ষে তারা আল্লাহর অস্তিত্ব ও কোনো ধর্মে বিশ্বাস করে না, তাওরাত ও ইঞ্জিলকে আল্লাহর গ্রন্থ মনে করে না এবং হযরত মূসা ও ঈসা (আ.)-কে আল্লাহর নবী ও পয়গম্বর বলে স্বীকার করে না। সুতরাং এটা জানা কথা যে, এরূপ ব্যক্তি আদমশুমারীর নামের কারণে প্রকৃতপক্ষে আহলে কিতাবের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না।

আহলে কিতাবের খাদ্য বলে কি বুঝানো হয়েছে : طَعَامٌ শব্দের আভিধানিক অর্থ, খাদ্য দ্রব। শাব্দিক অর্থে সর্বপ্রকার খাদ্যই এর অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু সাধারণ আলেমদের মতে এ স্থলে طَعَامٌ বলে শুধু আহলে কিতাবদের জবাই করা পশুর গোশত বুঝানো হয়েছে। কেননা গোশত ছাড়া অন্যান্য খাদ্য দ্রব্যের ক্ষেত্রে আহলে কিতাব ও অপরাপর কাফেরদের মধ্যে কোনো তফাৎ নেই। কাফেরদের হাতের আহার্য বস্তু গম, বুট, চাউল, ফল ইত্যাদি খাওয়া হালাল। এতে কারো দ্বিমত নেই। তবে যেসব খাদ্য মানুষের হাতে প্রস্তুত হয়, সেগুলোর ব্যাপারে যেহেতু কাফেরদের বাসন-কোসন ও হাতের পবিত্রতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায় না, সেহেতু তা থেকে বেঁচে থাকাই উত্তম। কিন্তু এতে মুশরিক মূর্তিপূজারীর যে অবস্থা, আহলে কিতাবদেরও একই অবস্থা। কারণ অপবিত্রতার সম্ভাবনা উভয় ক্ষেত্রেই সমান।

www.almodina.com

আহলে কিতাবদের জবাই করা জন্তু হালাল হওয়ার কারণ : এটি আলোচ্য বিষয়বস্তুর তৃতীয় প্রশ্ন। এর উত্তর অধিকাংশ সাহাবী, তাবেয়ী ও তাফসীরবিদদের পক্ষ থেকে এই দেওয়া হয় যে, কাফেরদের মধ্য থেকে আহলে কিতাব ইহুদি ও খ্রিস্টানদের জবাই করা জন্তু হালাল হওয়া এবং তাদের মহিলাকে বিবাহ করা হালাল হওয়ার কারণ হচ্ছে এই যে, এ দুটি বিষয়ে তাদের ধর্মমতও ইসলামের হুবহু অনুরূপ। অর্থাৎ, আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে জন্তু জবাই করাকে তারাও বিশ্বাসগতভাবে জরুরি মনে করে। এ ছাড়া মৃত জন্তুকেও তারা হারাম মনে করে।

এমিনভাবে ইসলামে যেসব মহিলাকে বিবাহ করা হারাম, তাদের ধর্মেও তাদের বিবাহ করা হারাম। ইসলামে যেমন বিবাহ প্রচার করা ও সাক্ষীদের উপস্থিতিতে হওয়া জরুরি, তেমনি তাদের ধর্মেও এসব বিধি বিধান জরুরি।

আহলে কিতবাদের জবাই করা জন্তু হালাল হওয়ার কারণ এই যে, ইহুদি ও খ্রিস্টানদের ধর্মে অনেক পরিবর্তন সত্ত্বেও জবাই করার মাসআলাটি ইসলামি শরিয়তের অনুরূপ রয়েছে। আল্লাহর নাম ছাড়া অন্যের নামে জবাই করা জন্তুকে তারাও হারাম মনে করে এবং জবাই করার সময় আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা জরুরি মনে করে।

মোটকথা, পূর্ববর্তী আলেমদের মধ্যে যারা আহলে কিতাবদের আল্লাহর নামে ছাড়া অন্যের নাম জবাই করা জন্তু খাওয়ার অনুমতি দিয়েছেন, তাদের মতেও আহলে কিতাবদের আসল মাযহাবে এরূপ জন্তু হারাম। কিন্তু তাঁরা বিভ্রান্ত লোকদেরকেও আসল আহলে কিতাবদের সাথে এক করে তাদের জবাই করা জন্তুকেও হালাল বলেছেন। পক্ষান্তরে সাধারণ সাহাবী, তাবেয়ী ও মুজতাহিদ ইমামগণ এ দিকটি লক্ষ্য করেছেন যে, আহলে কিতাবদের মূর্খ জনগণ যে আল্লাহর নাম ছাড়া অন্যের নামে অথবা আল্লাহর নাম ব্যতীতই জবাই করে, তা যেমন ইসলামি বিধানের পরিপন্থি, তেমনি স্বয়ং খ্রিস্টানদের বর্তমান ধর্মমতেরও বিরোধী। এ কারণে ধর্মীয় বিধানের উপর তাদের কর্মের কোনো প্রতিক্রিয়া না হওয়া উচিত। তাঁরা ফয়সালা দিয়েছেন যে, তাদের জবাই করা জন্তু আয়াতে বর্ণিত আহলে কিতাবদের জবাই করা জন্তুর অন্তর্ভুক্ত নয়। সুতরাং তা হালাল হওয়ার কোনো কারণ নেই। তাদের ভ্রান্ত কর্মের কারণে কুরআনের আয়াতে নসখ তথা রহিতকরণের পথ বেছে নেওয়া কিছুতেই সমীচীন নয়।

এ কারণেই ইবনে জারীর, ইবনে কাছীর, আবূ হাইয়ান প্রমূখ তাফসীরবিদগণ এ বিষয়ে একমত যে, সূরা বাকারা ও সূরা আনআমের আয়াতসমূহে কোনো নসখ হয়নি। এটাই সাধারণ সাহাবী ও তাবেয়ীগণের অভিমত। ইবনে কাছীরের বরাত দিয়ে পূর্বেই তা উল্লেখ করা হয়েছে। এ মতই বাহরে মুহীত গ্রন্থে নিম্নোক্ত ভাষায় উল্লিখিত হয়েছে–

ذَهَبَ اِلٰى اَنَّ الْكِتَابِيَّ اِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللّٰهَ عَلَى الذَّبِيْحَةِ وَذَكَرَ غَيْرَ اللّٰهِ لَمْ تُؤْكَلْ وَبِه قَالَ اَبُو الدَّرْدَاءِ وَعُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ وَجَمَاعَةٌ مِنَ الصَّحَابَةِ وَبِه قَالَ اَبُوْ حَنِيْفَةَ وَاَبُوْ يُوْسُفَ وَمُحَمَّدٌ وَزُفَرُ وَمَالِكٌ وَكَرِهَ النَّخْعِيُّ وَالثَّوْرِيُّ اَكْلَ مَا ذُبِحَ وَاُهِلَّ بِه لِغَيْرِ اللّٰهِ ـ

"তাঁর মাযহাব এই যে, আহলে কিতাব যদি জবাই করার সময় আল্লাহর নাম উচ্চারণ না করে, অথবা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নাম উচ্চারণ করে, তবে তা খাওয়া জায়েজ নয়। হযরত আবুদ দারদা, ওবাদা ইবনে ছামেত (রা.) এবং একদল সাহাবী এ কথাই বলেন এবং ইমাম আবূ হানীফা, আবূ ইউসুফ, মুহাম্মদ, যুফার ও ইমাম মালেকের মতও তাই। নাখায়ী ও ছাওরী এরূপ জন্তুকে খাওয়া মাকরূহ মনে করেন।" –[বাহরে মুহীত : ৪৩১/৪]

বিভিন্ন সময়ে মুদ্রিত আজকালকার তাওরাত ও ইঞ্জীল থেকেও এ বিষয়ের সমর্থন পাওয়া যায়। তাদের নিম্নোদ্ধৃত উক্তিসমূহ দেখুন। বর্তমান যুগের ইহুদি ও খ্রিস্টান উভয় সম্প্রদায়ের কাছে স্বীকৃত বাইবেলের প্রাচীন আহাদনামায় জবাই সম্পর্কে এসব বিধি-বিধান রয়েছে :

১. যে জন্তু আপনা আপনি মরে যায় এবং যেসব জন্তুকে অন্য কোনো হিংস্র প্রাণী ছিঁড়ে ফেলে, তার চর্বি অন্য কাজে লাগালে লাগাতে পারে; কিন্তু কোনো অবস্থাতেই তা খেতে পারবে না। –[আহবারে : ২৪]
২. যে কোনো পন্থা-প্রক্রিয়ায় মনের আগ্রহে এবং আল্লাহ প্রদত্ত বরকত অনুযায়ী জবাই করে গোশত খেতে পারবে; কিন্তু তোমরা রক্ত কখনো পান করো না। –[ইস্তেসনা, ১২-১৫]
৩. তোমরা দেবদেবীর নামে কুরবানির গোশত, রক্ত, কণ্ঠরোধে নিহত জন্তু এবং হারাম কর্ম থেকে বিরত থাক। –[আহদ নামা জাদীদ কিতাবুল আ'মাল ১-২৯]
৪. খ্রিস্টানদের প্রধান পোপ পলিস ক্রিন্থিউনের নামে প্রথম পত্রে লিখেন : বিধর্মীরা যেসব কুরবানি করে তা শয়তানের জন্য করে, আল্লাহর নামে নয়। আমি চাই না যে, তুমি শয়তানের অংশীদার হও। তুমি আল্লাহর পিয়ালা ও শয়তানের পেয়ালা উভয়টি থেকে পান করতে পার না। –[ক্রিন্থিউন ১০-২০-৩০]

৫. 'আ'মালে হাওয়ারিয়্যীন' গ্রন্থে, আমি এ মীমাংসা লিখেছিলাম যে, তারা শুধু দেবদেবীর নামে কুরবানির গোশত থেকে এবং কণ্ঠারোধে নিহত জন্তু ও হারাম কর্ম থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখবে। –[আ'মাল : ২১-২৫]

এগুলো হচ্ছে আজকালকার বাইবেল সোসাইটিসমূহের মুদ্রিত তওরাত ও ইঞ্জিলের উদ্ধৃতি। এতে বিস্তর পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের পরও হুবহু কুরআনের বিধি-বিধানের অনুরূপ এ বিষয়গুলো অবশিষ্ট রয়েছে।

কুরআনের বক্তব্যও এমনি : "তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে মৃত জন্তু, রক্ত, শূকরের মাংস, যে জীব আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে জবাই করা হয়, কণ্ঠারোধে নিহত জন্তু, আঘাতজনিত কারণে মৃত জন্তু, উচ্চস্থান থেকে পতনে মৃত জন্তু, শিং এর আঘাতে মৃত জন্তু, হিংস্র জন্তুর ভক্ষণ করা মৃত জন্তু– তবে যদি তোমরা জবাই করে পাক করে নিতে পার এবং ঐ জন্তু, যা দেবদেবীর যজ্ঞবেদিতে জবাই করা হয়।"

দেখুন আহবার ৬-১৮-১৯ পর্যন্ত। এখানে হারাম মহিলাদের একটি দীর্ঘ তালিকা দেওয়া হয়েছে। তাদের অধিকাংশই ঐসব মহিলা, যাদের কুরআন হারাম করেছে। এমনকি جَمْعُ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ অর্থাৎ, দুই বোনকে একত্রে বিবাহ করাও হারাম এবং হায়েজ অবস্থায় সহবাস হারাম হওয়াও বর্ণিত রয়েছে। এছাড়া বাইবেলে আরো উল্লেখ করা হয়েছে যে, মূর্তিপূজারী ও মুশরিকদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্কও স্থাপন করা অবৈধ। প্রচলি তাওরাতের ভাষা এরূপ :

"তাদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্কও স্থাপন করবে না। তাদের পুত্রদের স্বীয় কন্যা দান করবে না এবং স্বীয় পুত্রদের জন্য তাদের কন্যা গ্রহণ করবে না। কারণ তারা আমার অনুসরণ থেকে আমার পুত্রদের বিমুখ করে দিবে– যাতে তারা অন্য উপাস্যের উপাসনা করে। –[ইস্তিস্না : ৭-৩-৪]

তাফসীরে মাযহারীতে বলা হয়েছে যে, জবাই করার ব্যাপারে ও বিবাহের ব্যাপারে পার্থক্য এই যে, জবাই করা জন্তু উভয় পক্ষ থেকেই হালাল। আহলে কিতাবদের জবাই করা জন্তু মুসলমানদের জন্য হালাল এবং মুসলমানদের জবাই করা জন্তু আহলে কিতাবদের জন্য হালাল, কিন্তু মহিলাদের বিবাহের ব্যাপারটি এরূপ নয়। আহলে কিতাবদের মহিলাকে বিবাহ করা মুসলমানদের জন্য হালাল বটে, কিন্তু আহলে কিতাবদের সাথে মুসলমান মহিলাদের বিবাহ হালাল নয়।

আরেকটি বিষয় এই যে, যদি কোনো মুসলমান কখনো ধর্মত্যাগী হয়ে ইহুদি অথবা খ্রিস্টান হয়ে যায়, তবে সে আহলে কিতাবদের অন্তর্ভুক্ত থাকবে না; বরং সে হবে ধর্মত্যাগী। তার জবাই করা জন্তু সর্বসম্মতিক্রমে হারাম। এমনিভাবে যে মুসলমান ইসলামের কোনো একটি জরুরি ও অকাট্য বিষয় অস্বীকার করার কারণে ধর্মত্যাগী বলে সাব্যস্ত হয়, সে কুরআন ও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি বিশ্বাসের দাবি করলেও ধর্মত্যাগী এবং তার জবাই করা জন্তু হালাল নয়। অবশ্য অন্য কোনো ধর্মাবলম্বী যদি স্বীয় ধর্ম পরিত্যাগ করে ইহুদি অথবা খ্রিস্টান হয়ে যায়, তবে সে আহলে কিতাবদের অন্তর্ভুক্ত হবে এবং তার জবাই করা জন্তু হালাল বলে গণ্য হবে।

শব্দের বিশ্লেষণ :

أُهِلَّ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ فعل ماضى مجهول বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْإِهْلَالُ মূলবর্ণ (ه . ل . ل) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– তাকে ডাকা হলো।

اَلْمُنْخَنِقَةُ : সীগাহ واحد مؤنث বহছ اسم فاعل বাব اِنْفِعَالٌ মাসদার اَلْإِنْخِنَاقُ মূলবর্ণ (خ . ن . ق) জিনস صحيح অর্থ– যাকে গলা টিপে হত্যা করা হয়েছে।

اَلْمُتَرَدِّيَةُ : সীগাহ واحد مؤنث বহছ اسم مفعول বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْوَقْذُ মূলবর্ণ (و . ق . د) জিনস مثال واوى অর্থ– যে উঁচু স্থান হতে পড়ে নিহত হয়েছে।

اَلنَّطِيحَةُ : সীগাহ واحد مؤنث বহছ صفت مشبهة বাব فَتَحَ মাসদার اَلنَّطْحُ মূলবর্ণ (ن . ط . ح) জিনস صحيح অর্থ– যে শিংয়ের আঘাতে নিহত হয়েছে।

اَلْجَوَارِحُ : শব্দটি বহুবচন, একবচন جَارِحَةٌ অর্থ– শিকারি পশু, আঘাতকারী।

مُتَّخِذِىْ : শব্দটি বহুবচন, একবচন مُتَّخِذٌ অর্থ– যারা গ্রহণ করে।

www.almodina.com

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَوٰةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ۚ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَٰكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (٦)

অনুবাদ : (৬) হে ঈমানদারগণ! যখন তোমরা নামাজে দাঁড়াতে উদ্যত হও, তখন নিজেদের মুখমণ্ডলসমূহ ধৌত কর এবং নিজেদের হাতসমূহকেও কনুইসহ এবং নিজেদের মস্তকসমূহ মাসেহ কর এবং নিজেদের পাসমূহকে টাখনুসহ [ধৌত কর]। আর যদি তোমরা জানাবাতের অবস্থায় থাক, তবে সমস্ত শরীর পাক কর, আর যদি তোমরা পীড়িত হও, অথবা সফরে থাক, অথবা তোমাদের মধ্য হতে কেউ ইস্তেঞ্জা হতে আসে অথবা তোমরা স্ত্রী-সহবাস করে থাক, অনন্তর তোমরা পানি না পাও, তবে তোমরা পাক মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করে নিবে, অর্থাৎ উক্ত পাক মাটি দ্বারা নিজেদের মুখমণ্ডল এবং নিজেদের হস্তসমূহ মাসেহ করে নিবে, আল্লাহর ইচ্ছা তা নয় যে, তোমাদের উপর কোনো অসুবিধা চাপিয়ে দেন; বরং তাঁর ইচ্ছা তাই যে, তোমাদেরকে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন রাখেন এবং তোমাদের প্রতি স্বীয় নিয়ামত পূর্ণ করেন, যেন তোমরা শোকরগুজারী কর।

শাব্দিক অনুবাদ

(৬) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا হে ঈমানদারগণ! إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ যখন তোমরা নামাজে দাঁড়াতে উদ্যত হও فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ তখন নিজেদের মুখমণ্ডলসমূহ ধৌত কর وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ এবং নিজেদের হাতসমূহকেও কনুইসহ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ এবং নিজেদের মস্তকসমূহ মাসেহ কর وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ এবং নিজেদের পাসমূহকে টাখনুসহ [ধৌত কর] وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا আর যদি তোমরা জানাবাতের অবস্থায় থাক فَاطَّهَّرُوا তবে সমস্ত শরীর পাক কর وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ আর যদি তোমরা পীড়িত হও أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ অথবা সফরে থাক أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ অথবা তোমাদের মধ্য হতে কেউ ইস্তেঞ্জা হতে আসে أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ অথবা তোমরা স্ত্রী-সহবাস করে থাক فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً অনন্তর তোমরা পানি না পাও فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا তবে তোমরা পাক মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করে নিবে فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ অর্থাৎ উক্ত পাক মাটি দ্বারা নিজেদের মুখমণ্ডল মাসেহ করে নিবে وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ এবং নিজেদের হস্তসমূহ مَا يُرِيدُ اللَّهُ আল্লাহর ইচ্ছা তা নয় যে لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ তোমাদের উপর কোনো অসুবিধা চাপিয়ে দেন وَلَٰكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ বরং তাঁর ইচ্ছা তাই যে, তোমাদেরকে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন রাখেন وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ এবং তোমাদের প্রতি স্বীয় নিয়ামত পূর্ণ করেন لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ যেন তোমরা শোকরগুজারী কর

وَاذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَمِيْثَاقَهُ الَّذِيْ وَاثَقَكُمْ بِهٖٓ ۙ اِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا ؗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ (٧)

অনুবাদ : (৭) আর তোমরা তোমাদের প্রতি বর্ষিত আল্লাহর অনুগ্রহকে স্মরণ কর এবং তাঁর সেই অঙ্গীকারকেও [স্মরণ কর] যে অঙ্গীকার তিনি তোমাদের থেকে গ্রহণ করেছেন, যখন তোমরা বলেছিলে– আমরা শ্রবণ করলাম এবং মেনে নিলাম, আর আল্লাহকে ভয় কর, নিশ্চয় আল্লাহ অন্তর্নিহিত কথাগুলোরও পূর্ণ খবর রাখেন।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ؗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا ؕ اِعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ؗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ (٨)

(৮) হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে বিধানসমূহ পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠাকারী এবং ন্যায়ের সাথে সাক্ষ্য প্রদানকারী হও, এবং কোনো বিশেষ সম্প্রদায়ের শত্রুতা যেন তোমাদেরকে তার প্রতি উদ্যত না করে যে, তোমরা ন্যায়বিচার না কর, ন্যায়বিচার কর। তা আল্লাহ-ভীতির অধিকতর নিকটবর্তী, আর আল্লাহ তা'আলাকে ভয় কর, নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের সমস্ত কৃতকর্ম সম্বন্ধে পূর্ণ অবগত আছেন।

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّاَجْرٌ عَظِيْمٌ (٩)

(৯) আল্লাহ তা'আলা এরূপ লোকদেরকে, যারা ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করেছে, প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, তাদের জন্য ক্ষমা ও মহান পুরস্কার রয়েছে।

শাব্দিক অনুবাদ :

(৭) وَاذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ আর তোমরা তোমাদের প্রতি বর্ষিত আল্লাহর অনুগ্রহকে স্মরণ কর وَمِيْثَاقَهُ الَّذِيْ وَاثَقَكُمْ بِهٖ এবং তাঁর সেই অঙ্গীকারকেও যে অঙ্গীকার তিনি তোমাদের থেকে গ্রহণ করেছেন اِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا যখন তোমরা বলেছিলে– আমরা শ্রবণ করলাম এবং মেনে নিলাম وَاتَّقُوا اللّٰهَ আর আল্লাহকে ভয় কর اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ নিশ্চয় আল্লাহ অন্তর্নিহিত কথাগুলোরও পূর্ণ খবর রাখেন।

(৮) يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا হে ঈমানদারগণ! كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে বিধানসমূহ পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠাকারী شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ এবং ন্যায়ের সাথে সাক্ষ্য প্রদানকারী হও وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ এবং কোনো বিশেষ সম্প্রদায়ের শত্রুতা যেন তোমাদেরকে তার প্রতি উদ্যত না করে যে عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا তোমরা ন্যায়বিচার না কর اِعْدِلُوْا ন্যায়বিচার কর هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى তা আল্লাহ-ভীতির অধিকতর নিকটবর্তী وَاتَّقُوا اللّٰهَ আর আল্লাহ তা'আলাকে ভয় কর اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের সমস্ত কৃতকর্ম সম্বন্ধে পূর্ণ অবগত আছেন।

(৯) وَعَدَ اللّٰهُ আল্লাহ তা'আলা এরূপ লোকদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا যারা ঈমান এনেছে وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ এবং নেক কাজ করেছে لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ তাদের জন্য ক্ষমা وَّاَجْرٌ عَظِيْمٌ ও মহান পুরস্কার রয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قوله يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ الخ -٦ **আয়াতের শানে নুযূল :** রাসূল ﷺ-এর জন্য নিত্য দিনের কাজে শিথিলতা আরোপ স্বরূপ আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়েছে। কারণ রাসূল ﷺ যে কোনো কাজই করতেন তা অজু করে আদায় করতেন। এমনকি তিনি কারো সাথে কথা বলতেন না এবং সালামের জবাব দিতেন না অজু

করা ব্যতীত। সুতরাং আল্লাহ্ তা'আলা আলোচ্য আয়াত দ্বারা জানিয়ে দিলেন যে, অজু শুধুমাত্র নামাজের জন্য শর্ত, তাছাড়া অন্য কোনো কাজের জন্য নয়। সে সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়েছে। –[কুরতুবী : ৭৯/৬, বাহরে মুহীত : ৪৪৯/৩]

৮- قوله يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ الخ আয়াতের শানে নুযূল : ইবনে জারীর আব্দুল্লাহ বিন কাছীরের উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, আলোচ্য আয়াত খায়বারের ইহুদিদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। রাসূল ﷺ তাদের নিকট হত্যার বিকল্প রক্তঋণ বা দিয়ত সম্পর্কে আলোচনা করতে যান। তখন তারা তাঁকে হত্যা করার পরিকল্পনা গ্রহণ করল, সে পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। –[ফাতহুল কাদীর : ২০/২]

৮ নং আয়াতের বিষয়বস্তু প্রায় এসব শব্দেই সূরা নিসায়ও বর্ণিত হয়েছে। পার্থক্য এতটুকু যে, সেখানে كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ বলা হয়েছিল এবং এখানে كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ বলা হয়েছে। এ দুটি আয়াতে শব্দ আগে পিছে করার একটি সূক্ষ্ম কারণ 'বাহরে মুহীত' কিতাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এর সারমর্ম এই :

স্বভাবত : দুটি কারণই মানুষকে ন্যায় ও সুবিচারে বাধা-প্রদান এবং অন্যায় ও অবিচারে প্ররোচিত করে। এক. নিজের অথবা বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনের প্রতি পক্ষপাতিত্ব। দুই. কোনো ব্যক্তির প্রতি শত্রুতা ও মনোমালিন্য। সূরা নিসার আয়াতে প্রথমোক্ত কারণের উপর ভিত্তি করে সুবিচারের আদেশ দেওয়া হয়েছে এবং সূরা মায়িদার আলোচ্য আয়াতে শেষোক্ত কারণ হিসেবে বক্তব্য রাখা হয়েছে।

এ কারণেই সূরা নিসার পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে–

وَلَوْ عَلٰٓى اَنْفُسِكُمْ اَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ অর্থাৎ, ন্যায়বিচারে অধিষ্ঠিত থাক, যদিও তা স্বয়ং তোমাদের অথবা তোমাদের পিতামাতা ও আত্মীয় স্বজনের বিরুদ্ধে যায়। সূরা মায়িদার আলোচ্য আয়াতে উল্লিখিত বাক্যের পর বলা হয়েছে وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا অর্থাৎ, কোনো সম্প্রদায়ের শত্রুতা যেন তোমাদেরকে ন্যায়বিচারে পশ্চাদপদ হতে উদ্বুদ্ধ না করে।

অতএব, সূরা নিসার আয়াতের সারমর্ম এই যে, ন্যায় ও সুবিচারের ক্ষেত্রে নিজের এবং পি[তামা]তা ও আত্মীয়-স্বজনেরও পরওয়া করো না। যদি ন্যায়বিচার তাদের বিরুদ্ধে যায়, তবে তাতেই কায়েম থাক। সূরা মায়িদার আয়াতের সারমর্ম এই যে, ন্যায় ও সুবিচারের ক্ষেত্রে কোনো শত্রুর শত্রুতার কারণে পশ্চাদপদ হওয়া উচিত নয় যে, শত্রুর ক্ষতি সাধনের উদ্দেশ্যে সুবিচারের পরিবর্তে অবিচার শুরু করবে।

এ কারণেই সূরা নিসার আয়াতে قِسْط অর্থাৎ, 'ইনসাফ' কে অগ্রে উল্লেখ করে বলা হয়েছে– كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ এবং সূরা মায়িদার আয়াতে لِلّٰه কে অগ্রে উল্লেখ করে বলা হয়েছে كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ অবশ্য উভয় আয়াত পরিণামের দিক দিয়ে একই উদ্দেশ্য প্রকাশ করে। কেননা যে ব্যক্তি সুবিচারের জন্য দণ্ডায়মান হবে, সে আল্লাহর জন্য দণ্ডায়মান হবে এবং সে সুবিচারই করবে। কিন্তু নিজের আত্মীয়-স্বজনের প্রতি লক্ষ্য রাখার ক্ষেত্রে এরূপ ধারণা হতে পারে যে, এসব সম্পর্কের প্রতি লক্ষ্য রাখাও তো আল্লাহর জন্যই। তাই এখানে قِسْط শব্দটি অগ্রে উল্লেখ করে ইঙ্গিত করা হচ্ছে যে, সুবিচারের বিপক্ষে কারো প্রতি লক্ষ্য রাখা আল্লাহর জন্য হতে পারে না। সূরা মায়িদায় শত্রুদের সাথে ন্যায়বিচারের নির্দেশ দিতে গিয়ে لِلّٰه শব্দটি অগ্রে এনে মানব স্বভাবকে ভাবাবেগের কবল থেকে দূরে রাখা হয়েছে। অর্থাৎ, তোমরা আল্লাহর জন্য দণ্ডায়মান হয়েছ। এর অনিবার্য ফলশ্রুতি হিসেবে শত্রুদের সাথেও ন্যায়বিচার কর।

মোটকথা এই যে, সূরা নিসা ও সূরা মায়িদার উভয় আয়াতে দুটি বিষয়ের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এক. শত্রু মিত্র নির্বিশেষে সবার ব্যাপারে ন্যায় ও সুবিচারে অটল থাক। আত্মীয়তার প্রতি লক্ষ্য করে অথবা কারো শত্রুতা পরবশ হয়ে এতে দুর্বলতা প্রদর্শন করা উচিত নয়। দুই. সত্য সাক্ষ্য এবং সত্য কথা প্রকাশ করতে পিছপা হবে না। যাতে বিচারকবর্গ সত্য ও বিশুদ্ধ রায় দিতে অসুবিধার সম্মুখীন হয়।

সত্য সাক্ষ্য দিতে ত্রুটি না করার প্রতি কুরআন পাক অনেক আয়াতে বিভিন্ন ভঙ্গিতে জোর দিয়েছে। এক আয়াতে অত্যন্ত খোলাখুলিভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে : وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَّكْتُمْهَا فَاِنَّهٗٓ اٰثِمٌ قَلْبُهٗ

অর্থাৎ, সাক্ষ্য গোপন করো না। যে সাক্ষ্য গোপন করে, তার অন্তর পাপী।

এতে প্রমাণিত হয় যে, সত্য সাক্ষ্য দেওয়া অপরিহার্য কর্তব্য এবং সাক্ষ্য গোপন করা কঠোর গুনাহ।

www.almodina.com

কিন্তু যে বিষয়টি মানুষকে সত্য সাক্ষ্য দিতে বাধাদান করে, কুরআন পাক তার প্রতিও লক্ষ্য রেখেছে। বিষয়টি এই যে, সাক্ষীকে বার বার আদালতে হাজিরা দিতে হয় এবং অনর্থক নানা ধরনের হয়রানিরও সম্মুখীন হতে হয়। ফলে সাধারণ লোক সাক্ষীর তালিকাভুক্ত হওয়াকে সাক্ষাৎ বিপদ বলে মনে করে। নিজের কাজ কারবার তো নষ্ট হয়ই: তদুপরি অর্থহীন যাতনাও ভোগ করতে হয়।

এ কারণেই কুরআন পাক সত্য সাক্ষ্য দেওয়াকে অপরিহার্য কর্তব্য সাব্যস্ত করার সাথে সাথে এ কথাও ঘোষণা করেছে যে, وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ; অর্থাৎ মোকদ্দামার বিবরণ লিপিবদ্ধকারী ও সাক্ষ্যদাতার কোনো ক্ষতি করা যাবে না।

আজকালকার আদালত ও মোকদ্দামাসমূহের খোঁজ নিলে দেখা যাবে যে, অকুস্থলের সত্য সাক্ষ্য খুব কমই পাওয়া যায়। সাক্ষীদের তালিকাভুক্ত হওয়ার ভয়ে জ্ঞানী ও ভদ্র ব্যক্তিরা কোথাও দুর্ঘটনার আঁচ পেলে দ্রুত সেখান থেকে পলায়ন করে। ফলে অনেক ক্ষেত্রেই বানোয়াট সাক্ষীর দ্বারা মামলা দাঁড় করানো হয়। এর ফল তাই দাঁড়াতে পারে, যা আজকাল আমরা দিবারাত্র প্রত্যক্ষ করে থাকি। শতকরা দশ পাঁচটি মকদ্দমারও ন্যায় ও সুবিচারভিত্তিক রায় হতে পারে না। এ ব্যাপারে আদালতকে দোষ দেওয়া যায় না। কারণ তারা প্রাপ্ত সাক্ষ্যের ভিত্তিতেই রায় দিতে বাধ্য।

সাধারণতঃ এ মারাত্মক ভুলটির প্রতি অনেকেরই দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় না। যদি সাক্ষীদের সাথে ভদ্র ব্যবহার করা হতো এবং তাদেরকে বার বার পেরেশান করা না হতো, তবে কুরআনি শিক্ষা অনুযায়ী কোনো সত্যবাদী লোক সাক্ষ্যদান থেকে বিরত থাকতো না। কিন্তু বাস্তবে হচ্ছে এই যে, যে পুলিশ মকদ্দমার প্রাথমিক তদন্ত করে, সে-ই বার বার ডেকে সাক্ষীকে এমনভাবে পেরেশান করে দেয় যে, সে মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে কোনো মকদ্দমার সাক্ষী না হওয়ার জন্য ছেলেদেরকেও অসিয়ত করে যেতে বাধ্য হয়। এর পর যদি মকদ্দমা আদালতে পৌছে, তবে তারিখের পর তারিখ পড়তে থাকে। প্রতি তারিখেই নিরাপরাধ সাক্ষীকে হাজিরা দেওয়ার সাজা ভোগ করতে হয়। ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের উত্তরাধিকাররূপে আইনের এ দীর্ঘসূত্রিতা আমাদের আদলাতসমূহকে নোংরা করে রেখেছে। হেজায ও অন্যান্য কতিপয় দেশে প্রচলিত প্রাচীন সাদা-সিধা বিচার পদ্ধতিতে একদিকে যেমন মকদ্দমার প্রাচুর্য নেই, অন্যদিকে তেমনি সাক্ষীদের পক্ষে সাক্ষ্যদানও কষ্টকর নয়।

মোটকথা এই যে, সাক্ষ্যদান পদ্ধতি ও বিচার পদ্ধতিকে কুরআনি শিক্ষা অনুযায়ী গড়ে তোলা হলে এর বরকত আজও দেখা যেতে পারে। কুরআন একদিকে ঘটনা সম্পর্কে জ্ঞাত লোকদের উপর সত্য সাক্ষ্যদান অপরিহার্য সাব্যস্ত করেছে এবং অপরদিকে সাক্ষীদেরকে অকারণে উত্যক্ত না করতে এবং যথাসম্ভব কম সময়ে বয়ান নিয়ে ছেড়ে দিতে নির্দেশ জারি করেছে।

পরীক্ষার নম্বর, সনদ-সার্টিফিকেট ও নির্বাচনের ভোট দান সবই সাক্ষ্যের অন্তর্ভুক্ত : পরিশেষে এখানে আরো একটি বিষয় জানা জরুরি। তা এই যে, আজকাল শাহাদাত তথা সাক্ষ্যদানের যে অর্থ সর্বসাধারণের মধ্যে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে, তা শুধু মামলা মকদ্দমায় কোনো বিচারকের সামনে সাক্ষ্য দেওয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু কুরআন ও সুন্নাহর পরিভাষায় 'শাহাদাত' শব্দটি আরো ব্যাপকতর অর্থে ব্যবহৃত হয়। উদাহরণতঃ যদি ডাক্তার কোনো রোগীকে সার্টিফিকেট দেয় যে, সে কর্তব্য পালনের যোগ্য নয় কিংবা চাকুরি করার যোগ্য নয়, তবে এটিও একটি শাহাদাত। এতে বাস্তব অবস্থার খেলাফ যদি কিছু লেখা হয়, তবে তা মিথ্যা সাক্ষ্য হয়ে কবিরা গুনাহ হবে।

এমনিভাবে পরীক্ষার্থীদের লিখিত খাতায় নম্বর দেওয়াও একটি শাহাদাত। যদি ইচ্ছাপূর্বক কিংবা শৈথিল্যভরে কম বা বেশি নম্বর দেওয়া হয়, তবে তাও মিথ্যা সাক্ষ্যের অন্তর্ভুক্ত হারাম ও কঠোর পাপ বলে গণ্য হবে।

উত্তীর্ণ ছাত্রদের মধ্যে সনদ ও সার্টিফিকেট বিতরণের অর্থ এ বিষয়ে সাক্ষ্য দেওয়া যে, তারা সংশ্লিষ্ট কাজের পূর্ণ যোগ্যতা অর্জন করেছে। যদি সনদধারী ব্যক্তি বাস্তবে এরূপ না হয়, তবে সার্টিফিকেট ও সনদে স্বাক্ষরদাতা সবাই মিথ্যা সাক্ষ্যদানের অপরাধে অপরাধী হয়ে যাবে।

এমনিভাবে আইন সভা, কাউন্সিল ইত্যাদির নির্বাচনে ভোট দেওয়াও এক প্রকার সাক্ষ্যদান। এতে ভোটদাতার পক্ষ থেকে সাক্ষ্য দেওয়া হয় যে, আমার মতে এ ব্যক্তি ব্যক্তিগত যোগ্যতা, সততা ও বিশ্বস্ততার দিক দিয়ে জাতির প্রতিনিধি হওয়ার যোগ্য।

এখন চিন্তা করুন, আমাদের প্রতিনিধিদের মধ্যে কয়জন এমন আছেন, যাদের বেলায় এ সাক্ষ্য সত্য ও বিশুদ্ধ হতে পারে? দুর্ভাগ্যের বিষয়, আমাদের জনগণ নির্বাচনকে একটি হার-জিতের খেলা মনে করে রেখেছে। এ কারণে কখনো পয়সার বিনিময়ে ভোটাধিকার বিক্রয় করা হয়, আবার কখনো চাপের মুখে ভোটাধিকার প্রয়োগ করা হয়। আবার কখনো সাময়িক বন্ধুত্ব এবং সস্তা অঙ্গীকারের ভরসায় একে ব্যবহার করা হয়।

www.almodina.com

অন্যের কথা কি বলব, লেখাপড়া জানা ধার্মিক মুসলমানও অযোগ্য প্রার্থীকে ভোট দিতে গিয়ে কখনো চিন্তা করেন না যে, সে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়ে আল্লাহর অভিশাপ ও শাস্তির উপযুক্ত হয়ে যাচ্ছে।

কুরআনের দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রতিনিধি নির্বাচনের জন্য ভোট দেওয়ার দ্বিতীয় একটি দিক রয়েছে যে, যাকে শাফায়াত বা সুপারিশ বলা হয়। ভোটদাতা ব্যক্তি যেন সুপারিশ করে যে, অমুক প্রার্থীকে প্রতিনিধিত্ব দান করা হোক। কুরআনের ভাষায় এ সম্পর্কিত নির্দেশ পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে। কুরআনের ভাষায় বলা হয়েছে :

مَنْ يَّشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَّكُنْ لَّهٗ نَصِيْبٌ مِّنْهَا وَمَنْ يَّشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَّكُنْ لَّهٗ كِفْلٌ مِّنْهَا

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি উত্তম ও সত্য সুপারিশ করবে, যার জন্য সুপারিশ করে, তাকে তার পুণ্য থেকে অংশ দেওয়া হবে এবং যে ব্যক্তি মন্দ ও মিথ্যা সুপারিশ করবে, সে তার মন্দ কর্মের অংশ পাবে।

এর ফলশ্রুতি এই যে, এ প্রার্থী নির্বাচিত হয়ে তার কর্মজীবনে যেসব ভ্রান্ত ও অবৈধ কাজ করবে, তার পাপ ভোটদাতাও বহন করবে।

শরিয়তের দৃষ্টিতে ভোটের তৃতীয় দিক হচ্ছে ওকালতির দিক। অর্থাৎ, ভোটদাতা প্রার্থীকে নিজ প্রতিনিধিত্বের জন্য উকিল নিযুক্ত করে। কিন্তু এ ওকালতি যদি ভোট দাতার ব্যক্তিগত অধিকার সম্পর্কে হতো এবং এর লাভ-লোকসান কেবল মাত্র সে-ই পেত, তবে এর জন্য সে নিজেই দায়ি হতো, কিন্তু এখানে ব্যাপারটি তেমন নয়। কেননা এ ওকালতি এমনসব অধিকারের সাথে সম্পৃক্ত যাতে তার সাথে সমগ্র জাতিও শরিক। কাজেই কোনো অযোগ্য ও অধর্মপরায়ণ ব্যক্তিকে ভোট দেওয়া, মিথ্যা সাক্ষ্যদান, মন্দ সুপারিশ এবং অবৈধ ওকালতির অন্তর্ভুক্ত এবং এর মারাত্মক ফলাফলও ভোটদাতার আমলনামায় লিপিবদ্ধ হবে।

তাই ভোটদানের পূর্বে প্রার্থী সংশ্লিষ্ট কাজের যোগ্যতা রাখে কিনা এবং সে সৎ ও ধর্মভীরু কিনা, তা যাচাই করে দেখা প্রত্যেকটি মুসলমান ভোটারের অবশ্য কর্তব্য। শৈথিল্য ও ঔদাসীন্যবশতঃ অকারণে বিরাট পাপের ভাগী হওয়া উচিত নয়।

শব্দের বিশ্লেষণ :

اِطَّهَّرُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব تَفَعُّلٌ মাসদার اَلتَّطَهُّرُ মূলবর্ণ (ط . ه . ر) জিনস صحيح অর্থ– তোমরা বেশি পবিত্রতা অবলম্বন কর।

سَفَرٌ : শব্দটি একবচন, বহুবচন اَسْفَارٌ অর্থ– ভ্রমণ, দূরের পথ অতিক্রম করা।

اَطَعْنَا : সীগাহ جمع متكلم বহছ فعل ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْإِطَاعَةُ মূলবর্ণ (ط . و . ع) জিনস اجوف واوى অর্থ– আমরা আদেশ মানলাম।

اَلصُّدُوْرُ : শব্দটি বহুবচন, একবচন صَدْرٌ অর্থ– বক্ষসমূহ।

لَايَجْرِمَنَّ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ نهى غائب معروف با نون تاكيد ثقيلة বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْجَرْمُ মূলবর্ণ (ج . ر . م) জিনস صحيح অর্থ– তোমাদের যেন সীমালঙ্ঘন করতে প্ররোচিত না করে।

www.almodina.com

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَاۤ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ (١٠)

অনুবাদ : (১০) আর যারা কুফরি করেছে এবং আমার বিধানগুলোকে মিথ্যা বলেছে, এরূপ লোক জাহান্নামের অধিবাসী।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ هَمَّ قَوْمٌ اَنْ يَّبْسُطُوْۤا اِلَيْكُمْ اَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ اَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ (١١)

(১১) হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহকে স্মরণ কর, যা তোমাদের উপর বর্ষিত হয়েছে, যখন এক সম্প্রদায় এই চিন্তায় ছিল যে, তোমাদের দিকে হস্ত প্রসারিত করবে, কিন্তু আল্লাহ তাদের ক্ষমতা তোমাদের উপর চলতে দেননি, আর আল্লাহকে ভয় কর, আর মুমিনদেরকে আল্লাহরই উপর ভরসা রাখা উচিত।

وَلَقَدْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ بَنِيْۤ اِسْرَآءِيْلَ ۚ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيْبًا ؕ وَقَالَ اللّٰهُ اِنِّيْ مَعَكُمْ ؕ لَئِنْ اَقَمْتُمُ الصَّلٰوةَ وَاٰتَيْتُمُ الزَّكٰوةَ وَاٰمَنْتُمْ بِرُسُلِيْ وَعَزَّرْتُمُوْهُمْ وَاَقْرَضْتُمُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا لَّاُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَلَاُدْخِلَنَّكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۚ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ السَّبِيْلِ (١٢)

(১২) আর আল্লাহ বনী ইসরাঈলদের নিকট হতে অঙ্গীকার নিয়েছেন এবং আমি তাদের মধ্য হতে বারজন দলপতি নিযুক্ত করে দিয়েছি, এবং আল্লাহ এরূপ বলেছেন, আমি তোমাদের সঙ্গে রয়েছি, যদি তোমরা নামাজের পাবন্দি করতে থাক এবং জাকাত দিতে থাক এবং আমার সমস্ত রাসূলের প্রতি ঈমান আনতে থাক এবং তাঁদের সাহায্য করতে থাক এবং আল্লাহ তা'আলাকে উত্তমরূপে কর্জ দিতে থাক, তবে আমি নিশ্চয় তোমাদের গুনাহগুলো তোমাদের হতে মোচন করে দিব এবং অবশ্যই তোমাদেরকে দাখিল করব এমন উদ্যানসমূহে যার তলদেশে নহরসমূহ বইতে থাকবে, অনন্তর যে ব্যক্তি তার পরও কুফরি করবে, তবে সে নিশ্চয় সোজা পথ হতে দূরে যেয়ে পড়ল।

শাব্দিক অনুবাদ

(১০) وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا আর যারা কুফরি করেছে وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَاۤ এবং আমার বিধানগুলোকে মিথ্যা বলেছে اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ এরূপ লোক জাহান্নামের অধিবাসী।

(১১) يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا হে ঈমানদারগণ! اذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহকে স্মরণ কর, যা তোমাদের উপর বর্ষিত হয়েছে اِذْ هَمَّ قَوْمٌ যখন এক সম্প্রদায় এই চিন্তায় ছিল যে اَنْ يَّبْسُطُوْۤا اِلَيْكُمْ اَيْدِيَهُمْ তোমাদের দিকে হস্ত প্রসারিত করবে فَكَفَّ اَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ কিন্তু আল্লাহ তাদের ক্ষমতা তোমাদের উপর চলতে দেননি وَاتَّقُوا اللّٰهَ আর আল্লাহকে ভয় কর وَعَلَى اللّٰهِ আর আল্লাহরই উপর فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ মুমিনদেরকে ভরসা রাখা উচিত।

(১২) وَلَقَدْ اَخَذَ اللّٰهُ আর আল্লাহ অঙ্গীকার নিয়েছেন مِيْثَاقَ بَنِيْۤ اِسْرَآءِيْلَ বনী ইসরাঈলদের নিকট হতে وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ এবং আমি তাদের মধ্য হতে নিযুক্ত করে দিয়েছি اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيْبًا বারজন দলপতি وَقَالَ اللّٰهُ এবং আল্লাহ এরূপ বলেছেন اِنِّيْ مَعَكُمْ আমি তোমাদের সঙ্গে রয়েছি لَئِنْ اَقَمْتُمُ الصَّلٰوةَ যদি তোমরা নামাজের পাবন্দি করতে থাক وَاٰتَيْتُمُ الزَّكٰوةَ এবং জাকাত দিতে থাক وَاٰمَنْتُمْ بِرُسُلِيْ এবং আমার সমস্ত রাসূলের প্রতি ঈমান আনতে থাক وَعَزَّرْتُمُوْهُمْ এবং তাঁদের সাহায্য করতে থাক وَاَقْرَضْتُمُ اللّٰهَ এবং আল্লাহ তা'আলাকে দিতে থাক قَرْضًا حَسَنًا উত্তমরূপে কর্জ لَّاُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ তবে আমি নিশ্চয় তোমাদের গুনাহগুলো তোমাদের হতে মোচন করে দিব وَلَاُدْخِلَنَّكُمْ جَنّٰتٍ এবং অবশ্যই তোমাদেরকে দাখিল করব এমন উদ্যানসমূহে تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ যার তলদেশে নহরসমূহ বইতে থাকবে فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ مِنْكُمْ অনন্তর যে ব্যক্তি তার পরও কুফরি করবে فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ السَّبِيْلِ তবে সে নিশ্চয় সোজা পথ হতে দূরে যেয়ে পড়ল।

فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِّيْثَاقَهُمْ لَعَنّٰهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوْبَهُمْ قٰسِيَةً ۚ يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ عَنْ مَّوَاضِعِهٖ ۙ وَنَسُوْا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوْا بِهٖ ۚ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلٰى خَآئِنَةٍ مِّنْهُمْ اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ ۭ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ (١٣)

(১৩) বস্তুতঃ কেবল তাদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের দরুনই আমি তাদেরকে স্বীয় অনুগ্রহ হতে দূর করে দিলাম, আর আমি তাদের অন্তরকে কঠিন করে দিলাম, তারা কালাম [তাওরাত]-কে পরিবর্তন করে দেয় তার স্থানসমূহ হতে এবং যা কিছু নসিহত করা হয়েছিল তারা তন্মধ্য হতে এক বড় অংশকে হারিয়ে বসেছে, আর আগামীতেও [অবিরত] তাদের কৃত কোনো না কোনো খেয়ানতের সংবাদ আপনার নিকট আসতে থাকবে, তাদের অল্প কয়েকজন ব্যতীত, সুতরাং আপনি তাদেরকে ক্ষমা করতে থাকুন এবং তাদেরকে মার্জনা করতে থাকুন নিশ্চয় আল্লাহ সদাচারী লোকদেরকে ভালোবাসেন।

শাব্দিক অনুবাদ :

(১৩) فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِّيْثَاقَهُمْ বস্তুতঃ কেবল তাদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের দরুনই لَعَنّٰهُمْ আমি তাদেরকে স্বীয় অনুগ্রহ হতে দূর করে দিলাম وَجَعَلْنَا قُلُوْبَهُمْ قٰسِيَةً আর আমি তাদের অন্তরকে কঠিন করে দিলাম يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ عَنْ مَّوَاضِعِهٖ তারা কালাম [তাওরাত]-কে পরিবর্তন করে দেয় তার স্থানসমূহ হতে وَنَسُوْا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوْا بِهٖ এবং যা কিছু নসিহত করা হয়েছিল তারা তন্মধ্য হতে এক বড় অংশকে হারিয়ে বসেছে وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلٰى خَآئِنَةٍ مِّنْهُمْ আর আগামীতেও তাদের কৃত কোনো না কোনো খেয়ানতের সংবাদ আপনার নিকট আসতে থাকবে اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْهُمْ তাদের অল্প কয়েকজন ব্যতীত فَاعْفُ عَنْهُمْ সুতরাং আপনি তাদেরকে ক্ষমা করতে থাকুন وَاصْفَحْ এবং তাদেরকে মার্জনা করতে থাকুন اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ নিশ্চয় আল্লাহ সদাচারী লোকদেরকে ভালোবাসেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قوله يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ الخ -١١ **আয়াতের শানে নুযূল- ১ :** আব্দুর রাজ্জাক, আবদ বিন হুমাইদ, ইবনে জারীর, ইবনুল মুনযির দালায়েল গ্রন্থে জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ যাতুর রিকা অভিযানে সাহাবায়ে কেরাম থেকে বিচ্ছিন্ন এক জায়গায় ছায়াতলে বিশ্রাম গ্রহণ করেন। সে সময়ে গাছের মাঝে তাঁর তরবারিটি ঝুলিয়ে রাখেন। এ সুযোগে এক বেদুঈন এসে রাসূল ﷺ-এর তরবারিটি হাতে নিয়ে রাসূল ﷺ-এর দিকে এগিয়ে এসে বলল, এখন আপনাকে আমার হাত থেকে কে রক্ষা করবে? নবী করীম ﷺ বললেন, আল্লাহ! ফলে বেদুঈন তরবারি হাত থেকে রেখে দিল। তখন রাসূল ﷺ সাহাবায়ে কেরামকে এ বিষয়ে অবগত করলেন, সেও তার পাশে বসা ছিল। তবে তাকে কোনো প্রকার শাস্তি প্রদান করেননি। হাকেমও এ ধরনে হাদীস বর্ণনা করেছেন. তবে সে ব্যক্তির নাম উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, তার নাম ছিল গাওরাছ বিন হারেছ। পক্ষান্তরে নবী করীম ﷺ যখন বলেন, আমাকে রক্ষা করবেন আমার আল্লাহ, তখন তার হাত থেকে তরবারিটি পড়ে গেল। পরক্ষণেই রাসূল ﷺ তরবারিটি হাতে নিয়ে বললেন, এখন তোমাকে কে রক্ষা করবে আমার হাত থেকে এবার বল তো দেখি? সে বলে উঠল, আপনার ইচ্ছা। বর্ণনাকারী বলেন, এবার রাসূল ﷺ তাকে মুক্ত করে দিলেন। এমন মাধুর্যসুলভ ক্ষমা পরায়ণ আচরণ দেখে সে লোকটি শাহাদাতাইন পড়ে ঈমান গ্রহণ করে। সে অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

www.almodina.com

আয়াতের শানে নুযূল– ২ : আবূ নাঈম দালায়েল গ্রন্থে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণনা করেন, বনূ নাযীরের ইহুদি সম্প্রদায় রাসূল ﷺ ও তাঁর সাথে যাত্রী সাহাবাগণের উপর পাথর ফেলে দেবে বলে পরামর্শ করে। সুতরাং হযরত জিবরাঈল (আ.) এসে তাদের এহেন অসৎ উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবগত করে দিলেন। ফলে রাসূল ﷺ এবং তাঁর সাথীগণ সে স্থান ত্যাগ করেন। সে পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়েছে। –[ফাতহুল কাদীর-২০/২, বাহরে মুহীত-৪৬৫/৩, রূহুল মা'আনী-৮৫/৩/৬, কুরতুবী-১৯/৬, ইবনে কাছীর-৩২/২]

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ الخ : সূরা মায়েদার পূর্বোল্লিখিত সপ্তম আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদের কাছ থেকে একটি অঙ্গীকার নেওয়ার এবং তাদের তা মেনে নেওয়ার কথা উল্লেখ করেছিলেন : وَاذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَمِيْثَاقَهُ الَّذِيْ وَاثَقَكُمْ بِهٖۤ اِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا; এ অঙ্গীকারটি হচ্ছে আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য ও শরিয়তের বিধি-বিধান মেনে চলার অঙ্গীকার। এর পারিভাষিক শিরোনাম কালেমা لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ উচ্চারণকারী প্রতিটি মুসলমান এ অঙ্গীকারের অধীন। এর পরবর্তী আয়াতে অঙ্গীকারের কয়েকটি প্রধান দফা অর্থাৎ, শরিয়তের বিশেষ বিশেষ বিধান বর্ণিত হয়েছে। তাতে শত্রু-মিত্র নির্বিশেষে সবার জন্য ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা করার এবং ক্ষমতারোহণের পর শত্রুদের প্রতি প্রতিশোধের পরিবর্তে সুবিচার ও উদারতা প্রদর্শনের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। এ অঙ্গীকারটিও আল্লাহ তা'আলার একটি বড় নিয়ামত। এ কারণেই اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ বলে তার বর্ণনা শুরু করা হয়েছে।

আলোচ্য আয়াতটিকেও আবার اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ বাক্য দ্বারা শুরু করে বলা হয়েছে যে, মুসলমানরা উপরিউক্ত অঙ্গীকার পূর্ণ করার কারণে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ইহকাল ও পরকালে শক্তি, উন্নতি ও উচ্চ মর্যাদা দান করেছেন এবং তাদের বিরুদ্ধে শত্রুদের কলা কৌশলকে সফল হতে দেননি।

এ আয়াতে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, শত্রুরা বার বার রাসূলুল্লাহ ﷺ ও মুসলমানদেরকে হত্যা, লুণ্ঠন ও ধরাপৃষ্ঠ থেকে মুছে ফেলার যেসব পরিকল্পনা করে, সেগুলো আল্লাহ ব্যর্থ করে দেন। বলা হয়েছে যে, একটি সম্প্রদায় তোমাদের প্রতি হস্ত প্রসারিত করার চিন্তায় লিপ্ত ছিল, কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাদের হস্তকে প্রতিহত করে দিয়েছেন। ইসলামের ইতিহাসে সামগ্রিকভাবে কাফেরদের পরিকল্পনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হওয়ার অসংখ্য ঘটনা রয়েছে। কিন্তু তাফসীরবিদগণ এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে কিছু সংখ্যক বিশেষ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাও উল্লেখ করেছেন।

উদাহরণতঃ কোনো কোনো সাহাবী থেকে এ আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে বর্ণিত আছে যে, ইহুদি কা'ব ইবনে আশরাফ একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে স্বগৃহে দাওয়াত করে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করেছিল। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূলকে যথাসময়ে এ সংবাদ দিয়ে শত্রুর ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করে দেন। –[ইবনে কাছীর]

হযরত মুজাহিদ, ইকরিমা (রা.) প্রমুখ থেকে বর্ণিত আছে যে, একবার এক মকদ্দমার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ বনী নজিরের ইহুদিদের বস্তিতে গমন করেন। তারা তাঁকে একটি প্রাচীরের নিচে বসতে দিয়ে কথাবার্তায় ব্যপৃত রাখে। অপর দিকে আমর ইবনে জাহশ নামক এক দূরাত্মাকে নিয়োগ করা হয় প্রাচীরের পিছন দিক থেকে উপরে উঠে একটি বিরাট প্রস্তর খণ্ড তাঁর উপর গড়িয়ে দেওয়ার জন্য। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় পয়গম্বরকে তাদের সংকল্পের কথা জানিয়ে দেন এবং তিনি তৎক্ষণাত সেখান থেকে প্রস্থান করেন। –[ইবনে কাছীর]

এসব ঘটনায় কোনো বৈপরীত্য নেই। সবগুলোই আলোচ্য আয়াতের সাক্ষী হতে পারে। আয়াতে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও মুসলমানদের অদৃশ্য হেফাজতের কথা উল্লেখ করার পর বলা হয়েছে : وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ

এতে প্রথমতঃ বলা হয়েছে যে, আল্লাহর নিয়ামত লাভ করা একমাত্র রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বৈশিষ্ট্য নয়; বরং এ সাহায্য ও অদৃশ্য হেফাজতের আসল কারণ হচ্ছে তাকওয়া তথা আল্লাহর উপর নির্ভর করা। যে কোনো জাতি অথবা ব্যক্তি যে কোনো সময় যে কোনো স্থানে এ দুটি গুণ অবলম্বন করবে, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তারই এভাবে হেফাজত ও সংরক্ষণ করা হবে।

জনৈক কবি চমৎকার বলেছেন– فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو ☆ اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی

"বদরের পারিবেশ সৃষ্টি কর। ফেরেশতা এখনও তোমার সাহায্যার্থে আসমান থেকে কাতারে কাতারে অবতরণ করতে পারেন।"

আলোচ্য বাক্যটিকে পূর্ববর্তী আয়াত সমষ্টির সাথেও সংযুক্ত করা যায়, যাতে চরম শত্রুদের সাথেও সদ্ব্যবহারও সুবিচার করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তখন এদিকে ইঙ্গিত হবে যে, এহেন ঘোর শত্রুদের সাথে সদ্ব্যবহার ও উদারতার শিক্ষা বাহ্যতঃ একটি রাজনৈতিক ভ্রান্তি এবং শত্রুদেরকে দুঃসাহসী করে তোলার নামান্তর। তাই এ বাক্যে মুসলমানদেরকে হুশিয়ার করা হয়েছে যে, তোমরা যদি আল্লাহভীরু ও আল্লাহর উপর ভরসাকারী হও, তবে এ উদারতা ও সদ্ব্যবহার তোমাদের জন্য মোটেই ক্ষতিকর হবে না; বরং তা শত্রুদেরকে বিরুদ্ধাচরণে দুঃসাহসী করার পরিবর্তে তোমাদের প্রভাবাধীন ও ইসলামের নিকটবর্তী করার কারণ হবে। এছাড়া আল্লাহভীতিই মানুষকে অঙ্গীকার মেনে চলতে বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ দিকে থেকে বাধ্য করতে পারে। যেখানে আল্লাহভীতি নেই, সেখানে অঙ্গীকারের দশা তাই হয়, যা আজকাল সাধারণ মানুষের মধ্যে দেখা যায়। এ কারণে পূর্ববর্তী যে আয়াতে অঙ্গীকারের কথা বলা হয়েছিল, সেখানে আয়াতের শেষাংশে وَاتَّقُوا اللهَ (আল্লাহকে ভয় কর) বলা হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতে এ বাক্যটি আবার উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া সম্পূর্ণ আয়াতে এদিকেও ইশারা করা হয়েছে যে, মুসলমানদের বিজয় ও সাফল্য শুধু বাহ্যিক সমরোপকরণের উপর মোটেও নির্ভরশীল নয়; বরং তাদের আসল শক্তি তাকওয়া ও আল্লাহ ভীতির মধ্যেই নিহিত।

قوله : فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً الخ : আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, বনী ইসরাঈল দুর্ভাগ্যবশতঃ এসব সুস্পষ্ট নির্দেশের প্রতি কর্ণপাত করেনি এবং অঙ্গীকারের বিরুদ্ধাচরণ করে। ফলে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে বিভিন্ন আজাবে নিক্ষেপ করেন।

বনী ইসরাঈলের প্রতি কুকর্ম ও অবাধ্যতার ফলে দুই প্রকার আজাব নেমে আসে। এক. বাহ্যিক ও ইন্দ্রিয়গাহ্য আজাব। যেমন, রক্ত, ব্যাঙ ইত্যাদির বৃষ্টি বর্ষণ, প্রস্তর বর্ষণ, ভূমি উলটিয়ে দেওয়া ইত্যাদি। এগুলো কুরআনে পাকের অনেক আয়াতে বিভিন্ন স্থানে উল্লিখিত হয়েছে।

দুই. আত্মিক আজাব। অর্থাৎ, অবাধ্যতার ফলে তাদের অন্তর ও মস্তিষ্ক বিকৃত হয়ে যায়। তাতে চিন্তা-ভাবনা এবং বুঝার ক্ষমতাও বিলুপ্ত হয়। ফলে তারা পাপের পরিণামে আরো পাপে লিপ্ত হতে থাকে।

ইরশাদ হচ্ছে فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً "আমি বিশ্বাঘাতকতা ও অঙ্গীকার ভঙ্গ করার সাজা হিসেবে তাদেরকে স্বীয় রহমত থেকে দূরে সরিয়ে দিলাম এবং তাদের অন্তরকে কঠোর করে দিলাম।" ফলে এখন এতে কোনো কিছুর সংকুলনা রইল না। রহমত থেকে দূরে সরে পড়া এবং অন্তরের কঠোরতাকেই সূরা মুতাফফিফীনে 'মরিচা' শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়েছে। যথা : كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ "কুরআনি আয়াত ও উজ্জ্বল নির্দশনাবলিকে অস্বীকার করার কারণ এই যে, তাদের অন্তরে পাপের কারণে 'মরিচা' পড়ে গেছে।"

রাসূলুল্লাহ ﷺ এক হাদীসে বলেন :

মানুষ প্রথমে যখন কোনো পাপ কাজ করে, তখন তার অন্তরে একটি কালো দাগ পড়ে। এর অনিষ্ট সর্বদাই সে অনুভব করে, যেমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কাপড়ে কালো দাগ লেগে গেলে তা দৃষ্টিকে সব সময়ই কষ্ট দেয়। এরপর যদি সে সতর্ক হয়ে তওবা করে এবং ভবিষ্যতে পাপ না করে, তবে এ দাগ মিটিয়ে দেওয়া হয়। পক্ষান্তরে যদি সে সতর্ক না হয় এবং উপর্যুপরি পাপ কাজ করেই চলে, তবে প্রত্যেক গুনাহর কারণে একটি করে কালো দাগ বেড়ে যেতে থাকে। শেষ পর্যন্ত তার অন্তর কালো দাগে আচ্ছন্ন হয়ে যায়। তখন তার অন্তরের অবস্থা ঐ পাত্রের মতো হয়ে যায়, যা উপুড় করে রাখা হয় এবং কোনো জিনিস রাখতে তৎক্ষণাৎ বের হয়ে আসে। পরে পাত্রে কিছুই থাকে না। ফলে কোনো সৎ ও পুণ্যের বিষয় তার অন্তরে স্থান পায় না। সুতরাং তখন তার অন্তর لَا يَعْرِفُ مَعْرُوفًا وَلَا يُنْكِرُ مُنْكَرًا কোনো পুণ্য কাজকে পুণ্য এবং মন্দ কাজকে মন্দ মনে করে না; বরং ব্যাপার উল্টো হয়ে যায়। অর্থাৎ, দোষকে গুণ, পুণ্যকে পাপ এবং পাপকে ছওয়াব বলে মনে করতে থাকে এবং অবাধ্যতায় বেড়েই চলে। এটা হচ্ছে তার পাপের নগদ সাজা-যা সে ইহকালেই লাভ করে।

বনী ইসরাঈলরা অঙ্গীকার ভঙ্গের নগদ সাজা এই লাভ করেছিল যে, মুক্তির সর্ববৃহৎ উপায় আল্লাহর রহমত থেকে তারা দূরে পড়ে যায় এবং অন্তর এমন পাষাণ হয়ে যায় যে, আল্লাহর কালামকে তারা স্বস্থান থেকে ঘুরিয়ে দেয়, অর্থাৎ, আল্লাহর কালামে পরিবর্তন করে। কখনো শব্দে, কখনো অর্থে এবং কখনো তেলাওয়াতে পরিবর্তন করে। পবির্তনের এ প্রকারগুলো কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। আজকাল পাশ্চাত্যের কিছু সংখ্যক খ্রিস্টানও একথা কিছু কিছু স্বীকার করে। -[তাফসীরে উসমানী]

খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পরিক শত্রুতা : এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা খ্রিস্টানদের অঙ্গীকার ভঙ্গের সাজা বর্ণনা করে বলেছেন যে, তাদের পরস্পরের মধ্যে বিভেদ, বিদ্বেষ ও শত্রুতা সঞ্চারিত করে দেওয়া হয়েছে। যা কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে।

আজকালকার খ্রিস্টানদেরকে পরস্পর ঐক্যবদ্ধ দেখে আয়াতের সত্যতায় সন্দেহ সৃষ্টি হতে পারে। তখন উত্তর হবে এই যে, আয়াতে প্রকৃত খ্রিস্টানদের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। যারা ধর্ম ত্যাগ করে নাস্তিক হয়ে গেছে, তারা প্রকৃত পক্ষে খ্রিস্টানদের তালিকাভুক্ত নয় যদিও জাতিগতভাবে তারা নিজেদেরকে খ্রিস্টান নামেই অভিহিত করে। এমন খ্রিস্টানদের মধ্যে যদি ধর্মীয় বিদ্বেষ ও পারস্পরিক শত্রুতা না থাকে, তবে তা আলোচ্য আয়াতের পরিপন্থি নয়। কেননা ধর্মের ভিত্তিতেই বিভেদ ও বিদ্বেষ হতে পারত। যখন তাদের ধর্মই নাই, তখন বিভেদ কিসের। যারা ধর্মগত দিক দিয়ে খ্রিস্টান, আয়াতে তাদের কথাই বর্ণনা করা হয়েছে। এরূপ খ্রিস্টানদের মতভেদ সর্বজনবিদিত।

নায়যাভীর টীকায় তাইসীর গ্রন্থ থেকে উল্লেখ করা হয়েছে যে, খ্রিস্টানদের মধ্যে আসলে তিনটি সম্প্রদায় রয়েছে। এক. নাস্তুরিয়া। এরা হযরত ঈসা (আ.)-কে আল্লাহর পুত্র বলে। দুই. ইয়াকুবিয়া। এরা হযরত ঈসা (আ.)-কে আল্লাহর সাথে এক মনে করে। তিন. মালকাইয়া। এরা হযরত ঈসা (আ.)-কে তিন খোদার অন্যতম খোদা বলে বিশ্বাস করে।
যেখানে মৌলিক বিশ্বাসের ক্ষেত্রে এত বড় মতানৈক্য, সেখানে পারস্পরিক শত্রুতা অপরিহার্য।

শব্দের বিশ্লেষণ

قَسِيَةٌ : সীগাহ واحد مؤنث বহছ اسم فاعل বাব نَصَرَ মাসদার اَلْقَسْوَةُ মূলবর্ণ (ق ـ س ـ و) জিনস ناقص واوى
অর্থ– শক্ত, কঠিন, মজবুত।

لَاتَزَالُ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ نفى فعل مضارع معروف বাব سَمِعَ মাসদার اَلزَّيْلُ মূলবর্ণ (ز ـ ى ـ ل) জিনস اجوف يائى **অর্থ–** তুমি বিচ্যুত হবে না।

تَطَّلِعُ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ فعل مضارع معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِطِّلَاعُ মূলবর্ণ (ط ـ ل ـ ع) **জিনস** صحيح **অর্থ–** তুমি অবগত হবে।

اِصْفَحْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব فَتَحَ মাসদার اَلصَّفْحُ মূলবর্ণ (ص ـ ف ـ ح) জিনস صحيح **অর্থ–** তুমি ক্ষমা কর, তুমি উপেক্ষা কর।

www.almodina.com

وَمِنَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّا نَصٰرٰٓى اَخَذْنَا مِيْثَاقَهُمْ فَنَسُوْا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوْا بِهٖ ۠ فَاَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَآءَ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ ؕ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللّٰهُ بِمَا كَانُوْا يَصْنَعُوْنَ (١٤)

অনুবাদ : (১৪) আর যারা বলে, আমরা নাসারা, আমি তাদের হতেও ওয়াদা নিয়েছি, অনন্তর তাদেরকেও যা কিছু নসিহত করা হয়েছে তন্মধ্য হতেও তারা নিজেদের এক বড় অংশ হারিয়ে বসেছে, অতএব, আমি তাদের পরস্পরের মধ্যে হিংসা ও শত্রুতা সঞ্চার করে দিলাম, কিয়ামতের দিন পর্যন্ত এবং অচিরেই তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা তাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে জানিয়ে দিবেন।

يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيْرًا مِّمَّا كُنْتُمْ تُخْفُوْنَ مِنَ الْكِتٰبِ وَيَعْفُوْا عَنْ كَثِيْرٍ ؕ قَدْ جَآءَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ نُوْرٌ وَّكِتٰبٌ مُّبِيْنٌ (١٥)

(১৫) হে আহলে কিতাব! তোমাদের নিকট আমার এই রাসূল এসেছেন, তোমরা কিতাবের যে সমস্ত বিষয় গোপন কর– তিনি তন্মধ্য হতে বহু বিষয় তোমাদের সম্মুখে পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত করেন, আর বহু বিষয় [প্রকাশ করা] বর্জন করেন, তোমাদের নিকট আল্লাহর সন্নিধান হতে এক আলোকময় বস্তু এসেছে, এবং [তা] একটি স্পষ্ট কিতাব [কুরআন]

يَّهْدِيْ بِهِ اللّٰهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهٗ سُبُلَ السَّلٰمِ وَيُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ بِاِذْنِهٖ وَيَهْدِيْهِمْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ (١٦)

(১৬) তা দ্বারা আল্লাহ তা'আলা এরূপ ব্যক্তিদেরকে শান্তির পন্থাসমূহ বলে দেন যারা তাঁর সন্তুষ্টি অন্বেষণ করে এবং তাদেরকে নিজ তাওফীকে [ও করুণায় কুফরির] অন্ধকার হতে বের করে [ঈমানের] আলোর দিকে আনয়ন করেন এবং তাদেরক সরল [সঠিক] প..থ প্রতিষ্ঠিত রাখেন।

শাব্দিক অনুবাদ :

(১৪) وَمِنَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا **আর যারা বলে** اِنَّا نَصٰرٰٓى আমরা নাসারা اَخَذْنَا مِيْثَاقَهُمْ আমি তাদের হতেও ওয়াদা নিয়েছি فَنَسُوْا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوْا بِهٖ **অনন্তর তাদেরকেও যা কিছু নসিহত করা হয়েছে তন্মধ্য হতেও তারা নিজেদের এক বড় অংশ হারিয়ে বসেছে** فَاَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَآءَ অতএব, আমি তাদের পরস্পরের মধ্যে হিংসা ও শত্রুতা সঞ্চার করে দিলাম اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ কিয়ামতের দিন পর্যন্ত وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللّٰهُ এবং অচিরেই তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা জানিয়ে দিবেন بِمَا كَانُوْا يَصْنَعُوْنَ তাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে ।

(১৫) يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ হে আহলে কিতাব! قَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلُنَا তোমাদের নিকট আমার এই রাসূল এসেছেন يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيْرًا তিনি তন্মধ্য হতে বহু বিষয় তোমাদের সম্মুখে পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত করেন مِّمَّا كُنْتُمْ تُخْفُوْنَ مِنَ الْكِتٰبِ তোমরা কিতাবের যে সমস্ত বিষয় গোপন কর– وَيَعْفُوْا عَنْ كَثِيْرٍ আর বহু বিষয় [প্রকাশ করা] বর্জন করেন قَدْ جَآءَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ نُوْرٌ তোমাদের নিকট আল্লাহর সন্নিধান হতে এক আলোকময় বস্তু এসেছে وَّكِتٰبٌ مُّبِيْنٌ এবং [তা] একটি স্পষ্ট কিতাব [কুরআন]

(১৬) يَّهْدِيْ بِهِ اللّٰهُ তা দ্বারা আল্লাহ তা'আলা এরূপ ব্যক্তিদেরকে বলে দেন مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهٗ যারা তাঁর সন্তুষ্টি অন্বেষণ করে سُبُلَ السَّلٰمِ শান্তির পন্থাসমূহ وَيُخْرِجُهُمْ এবং তাদেরকে বের করে আনয়ন করেন مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ অন্ধকার হতে আলোর দিকে بِاِذْنِهٖ নিজ তাওফীকে وَيَهْدِيْهِمْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ এবং তাদেরক সরল পথে প্রতিষ্ঠিত রাখেন।

www.almodina.com

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ ؕ قُلْ فَمَنْ يَّمْلِكُ مِنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا اِنْ اَرَادَ اَنْ يُّهْلِكَ الْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَاُمَّهٗ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا ؕ وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ؕ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ (١٧)

অনুবাদ : (১৭) নিঃসন্দেহে তারা কাফের, যারা বলে আল্লাহ স্বয়ং মসীহ ইবনে মারইয়াম, আপনি জিজ্ঞাসা করুন, যদি তাই হয়, তা হলে বল তো, এরূপ কি কেউ আছে, যে আল্লাহ হতে তোমাদেরকে একটুও রক্ষা করতে পারে? যদি আল্লাহ তা'আলা মসীহ ইবনে মারইয়ামকে এবং তাঁর মাতাকে এবং ভূপৃষ্ঠে যারা আছে তাদের সকলকে ধ্বংস করতে ইচ্ছা করেন, আর আল্লাহ তা'আলারই প্রভুত্ব নির্দিষ্ট রয়েছে আসমানসমূহে ও জমিনে এবং এতদুভয়ের মধ্যস্থিত যাবতীয় বস্তুর উপর; এবং তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন, আর আল্লাহ সকল বস্তুর উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান।

শাব্দিক অনুবাদ

(১৭) لَقَدْ كَفَرَ নিঃসন্দেহে তারা কাফের الَّذِيْنَ قَالُوْٓا যারা বলে اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ আল্লাহ স্বয়ং মসীহ ইবনে মারইয়াম قُلْ আপনি জিজ্ঞাসা করুন فَمَنْ يَّمْلِكُ مِنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا যদি তাই হয়, তা হলে বল তো, এরূপ কি কেউ আছে, যে আল্লাহ হতে তোমাদেরকে একটুও রক্ষা করতে পারে? اِنْ اَرَادَ যদি আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করেন اَنْ يُّهْلِكَ ধ্বংস করতে الْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ মসীহ ইবনে মারইয়ামকে وَاُمَّهٗ এবং তাঁর মাতাকে وَمَنْ فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا এবং ভূপৃষ্ঠে যারা আছে তাদের সকলকে وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ আর আল্লাহ তা'আলারই প্রভুত্ব নির্দিষ্ট রয়েছে আসমানসমূহে ও জমিনে وَمَا بَيْنَهُمَا এবং এতদুভয়ের মধ্যস্থিত যাবতীয় বস্তুর উপর يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ এবং তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ আর আল্লাহ সকল বস্তুর উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قوله يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلُنَا الخ-১৫ **আয়াতের শানে নুযূল :** ইবনে জারীর হযরত ইকরিমার উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ-এর নিকট ইহুদিরা এসে রজম শাস্তি সম্পর্কে জানতে চায়। রাসূল ﷺ তখন বললেন, তোমাদের মাঝে প্রবীণ আলেম কে? তারা ইবনে সুরিয়ার প্রতি ইঙ্গিত করে, রাসূল ﷺ তখন তাকে যিনি হযরত মূসা (আ.)–এর প্রতি তাওরাত নাজিল করেন এবং যিনি তাদের থেকে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করণার্থে তাদের উপর তূর পর্বত উত্তোলন করেছিলেন, সেই আল্লাহর কসম দিলেন। ফলে সে বলল, আমাদের মাঝে রজম শাস্তি যখন বৃদ্ধি পেয়ে গেল, তখন থেকে রজম শাস্তির পরিবর্তে একশত বেত্রাঘাত এবং মাথা মুণ্ডিয়ে লজ্জা দেই। সুরাং রাসূল ﷺ রজম বিধানই কার্যকর করেন। সে পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়েছে। –[রূহুল মা'আনী : ৯৭/৩/৬]

قوله يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلُنَا الخ আলোচ্য আয়াতে খ্রিস্টানদের একটি উক্তির খণ্ডন করা হয়েছে– যা তাদের একদলের ধর্ম বিশ্বাসও ছিল। অর্থাৎ, হযরত মসীহ (আ.) হুবহু আল্লাহ তা'আলা (নাউযুবিল্লাহ)। কিন্তু যে যুক্তি দ্বারা বিষয়টির খণ্ডন করা হয়েছে, তাতে খ্রিস্টানদের সব দলের একত্ববাদ বিরোধী ভ্রান্ত বিশ্বাসের খণ্ডন হয়ে যায়, তা মসীহ (আ.)-এর খোদার সন্তান হওয়া সংক্রান্ত বিশ্বাসই হোক অথবা তিন খোদার অন্যতম খোদা হওয়ার বিশ্বাসই হোক।

www.almodina.com

এস্থলে হযরত মসীহ ও তাঁর জননীকে উল্লেখ করার মধ্যে দুটি রহস্য থাকতে পারে। এক. আল্লাহ তা'আলার সামনে মসীহ (আ.) -এর এ অক্ষমতা যে, তিনি নিজেকে রক্ষা করতে পারেন না এবং যে জননীর খেদমত ও হেফাজত তাঁর কাছে প্রাণের চেয়েও প্রিয়, সে জননীকেও রক্ষা করতে পারেন না। দুই. এতে ঐ সম্প্রদায়ের ধর্মবিশ্বাসও খন্ডন করা হয়েছে, যারা মারইয়ামকে তিন খোদার অন্যতম খোদা বলে বিশ্বাস করে।

এস্থলে হযরত মসীহ ও মারইয়ামের মৃত্যুকে ধরে নেওয়ার পর্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে। অথচ কুরআন অবতরণের সময় হযরত মারইয়ামের মৃত্যু ধরে নেওয়ার পর্যায়ে ছিল না; বরং বাস্তবেই মৃত্যু হয়ে গিয়েছিল। এর এক কারণ تَغْلِيْب অর্থাৎ আসলে হযরত মাসীহ (আ.) -এর মৃত্যুকে ধরে নেওয়ার পর্যায়ে বর্ণনা করাই উদ্দেশ্য ছিল। অতঃপর জননীর মৃত্যুকেও একই ভঙ্গিতে বর্ণনা করা হয়েছে- যদিও তাঁর মৃত্যু আগেই হয়ে গিয়েছিল। এ প্রসঙ্গে একথাও বলা যায় যে, আয়াতে বুঝানো হয়েছে যে, আমি মারইয়ামকে যেমন মৃত্যুদান করেছি, তেমনি হযরত মসীহ ও অন্যান্য সৃষ্টজীবের মৃত্যুও আমারই হাতে। يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ বাক্যে খ্রিস্টানদের এ ভ্রান্ত বিশ্বাসের কারণকেও খন্ডন করা হয়েছে। কেননা, হযরত মসীহকে খোদা মনে করার আসল কারণ তাদের মতে এই ছিল যে, তিনি জগতের সাধারণ নিয়মের বিপরীতে পিতা ছাড়া শুধুমাত্র মাতৃগর্ভ থেকে জন্মগ্রহণ করেছেন। তিনি মানুষ হলে নিয়মানুযায়ী পিতা-মাতা উভয়ের মাধ্যমে জন্মগ্রহণ করতেন।

আলোচ্য বাক্যে এর উত্তর দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা যাকে ইচ্ছা সৃষ্টি করার পূর্ণ ক্ষমতা রাখেন। যেমন, اِنَّ مَثَلَ عِيْسٰى عِنْدَ اللّٰهِ كَمَثَلِ اٰدَمَ আয়াতে এ সন্দেহই নিরসন করা হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার সাধারণ নিয়মের বাইরে হযরত মসীহ (আ.)-কে সৃষ্টি করা তার আল্লাহ হওয়ার প্রমাণ হতে পারে না।

লক্ষ্যণীয় যে, হযরত আদম (আ.)-কে আল্লাহ তা'আলা পিতা ও মাতা উভয়ের মাধ্যম ছাড়াই সৃষ্টি করেছিলেন। তিনি সবকিছুই করতে পারেন। তিনিই স্রষ্টা, প্রভু ও উপাসনার যোগ্য। অন্য কেউ তাঁর অংশীদার নয়।

শব্দের বিশ্লেষণ :

نَصٰرٰى : শব্দটি একবচন, বহুবচন نَصْرَانِىٌّ অর্থ- নাসারা, খ্রিস্টান লোক।

اَغْرَيْنَا : সীগাহ بحث فعل ماضى معروف বহছ নাقص يائى বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِغْرَاءُ মূলবর্ণ (غ ـ ر ـ ى) জিনসে مهموز لام অর্থ- আমরা ঢেলে দিয়েছি।

تُخْفُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ فعل مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِخْفَاءُ মূলবর্ণ (خ ـ ف ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ- তোমরা গোপন কর।

يَعْفُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ فعل مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْعَفْوُ মূলবর্ণ (ع ـ ف ـ و) জিনস ناقص واوى অর্থ- তারা ক্ষমা করে।

وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ وَالنَّصٰرٰى نَحْنُ اَبْنٰٓؤُا اللّٰهِ وَاَحِبَّآؤُهٗ ؕ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوْبِكُمْ ؕ بَلْ اَنْتُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ ؕ يَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ؗ وَاِلَيْهِ الْمَصِيْرُ (۱۸)

অনুবাদ : (১৮) আর ইহুদি ও নাসারারা দাবি করে যে, আমরা আল্লাহর পুত্র এবং তাঁর প্রিয়পাত্র, আপনি জিজ্ঞাসা করুন, আচ্ছা তবে তোমাদেরকে তোমাদের পাপের দরুন শাস্তি কেন প্রদান করবেন? বরং তোমরাও অন্যান্য সৃষ্টির ন্যায় সাধারণ মানুষ মাত্র, আল্লাহ্ তা'আলা যাকে ইচ্ছা মার্জনা করবেন আর যাকে ইচ্ছা শাস্তি দিবেন, আর আল্লাহরই প্রভুত্ব রয়েছে আসমানসমূহেও এবং জমিনেও এবং এতদুভয়ের মধ্যস্থিত সবকিছুতেও, আর আল্লাহর দিকে সকলকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে।

يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلٰى فَتْرَةٍ مِّنَ الرُّسُلِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَا جَآءَنَا مِنْۢ بَشِيْرٍ وَّلَا نَذِيْرٍ ؗ فَقَدْ جَآءَكُمْ بَشِيْرٌ وَّنَذِيْرٌ ؕ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَیْءٍ قَدِيْرٌ (۱۹)

(১৯) হে আহলে কিতাবগণ! তোমাদের নিকট আমার এই রাসূল [মুহাম্মদ ﷺ] এসে পৌছেছেন, যিনি তোমাদেরকে [হুকুম] স্পষ্টভাবে বলে দিচ্ছেন, এমন সময় যখন রাসূলদের [আগমনের] সূত্র [দীর্ঘকাল] বন্ধ ছিল, যেন তোমরা [কিয়ামত দিবসে] এরূপ বলে না বস যে, আমাদের নিকট কোনো সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শনকারী আগমন করেননি, [এখন তো] তোমাদের নিকট সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শনকারী এসেছেন, আর আল্লাহ্ সকল বস্তুর উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান।

শাব্দিক অনুবাদ

(১৮) وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ وَالنَّصٰرٰى আর ইহুদি ও নাসারারা দাবি করে যে نَحْنُ اَبْنٰٓؤُا اللّٰهِ وَاَحِبَّآؤُهٗ আমরা আল্লাহর পুত্র এবং তাঁর প্রিয়পাত্র قُلْ আপনি জিজ্ঞাসা করুন فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوْبِكُمْ আচ্ছা তবে তোমাদেরকে তোমাদের পাপের দরুন শাস্তি কেন প্রদান করবেন? بَلْ اَنْتُمْ بَشَرٌ বরং তোমরাও সাধারণ মানুষ মাত্র مِّمَّنْ خَلَقَ অন্যান্য সৃষ্টির ন্যায় يَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ আল্লাহ তা'আলা যাকে ইচ্ছা মার্জনা করবেন وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ আর যাকে ইচ্ছা শাস্তি দিবেন وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ আর আল্লাহরই প্রভুত্ব রয়েছে আসমানসমূহেও এবং জমিনেও وَمَا بَيْنَهُمَا এবং এতদুভয়ের মধ্যস্থিত সবকিছুতেও وَاِلَيْهِ الْمَصِيْرُ আর আল্লাহর দিকে সকলকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে।

(১৯) يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ হে আহলে কিতাবগণ! قَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلُنَا তোমাদের নিকট আমার এই রাসূল [মুহাম্মদ ﷺ] এসে পৌছেছেন يُبَيِّنُ لَكُمْ যিনি তোমাদেরকে স্পষ্টভাবে বলে দিচ্ছেন عَلٰى فَتْرَةٍ مِّنَ الرُّسُلِ এমন সময় যখন রাসূলদের [আগমনের] সূত্র [দীর্ঘকাল] বন্ধ ছিল। اَنْ تَقُوْلُوْا যেন তোমরা এরূপ বলে না বস যে مَا جَآءَنَا আমাদের নিকট আগমন করেননি مِنْۢ بَشِيْرٍ وَّلَا نَذِيْرٍ কোনো সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শনকারী فَقَدْ جَآءَكُمْ بَشِيْرٌ وَّنَذِيْرٌ তোমাদের নিকট সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শনকারী এসেছেন وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَیْءٍ قَدِيْرٌ আর আল্লাহ সকল বস্তুর উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান।

وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ يٰقَوْمِ اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ جَعَلَ فِيْكُمْ اَنْۢبِيَآءَ وَجَعَلَكُمْ مُّلُوْكًا ۖ وَّاٰتٰىكُمْ مَّا لَمْ يُؤْتِ اَحَدًا مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ (٢٠)

অনুবাদ : (২০) আর সেই সময়টিও উল্লেখযোগ্য, যখন মূসা স্বীয় সম্প্রদায়কে বললেন, হে আমার সম্প্রদায়! স্মরণ কর তোমাদের প্রতি আল্লাহর নিয়ামতকে, যখন তিনি তোমাদের মধ্যে বহু নবী সৃষ্টি করলেন এবং তোমাদেরকে রাজ্যাধিপতি করলেন এবং তোমাদেরকে এমন বস্তুসমূহ দান করলেন, যা বিশ্ববাসীদের মধ্যে কাউকেও দেননি।

يٰقَوْمِ ادْخُلُوا الْاَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِيْ كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوْا عَلٰٓى اَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوْا خٰسِرِيْنَ (٢١)

(২১) হে আমার সম্প্রদায়! এরূপ পুণ্যভূমিতে প্রবেশ কর যা আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য লিখে দিয়েছেন, আর পিছনের দিকে ফিরে যেয়ো না, তাহলে সম্পূর্ণরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

قَالُوْا يٰمُوْسٰٓى اِنَّ فِيْهَا قَوْمًا جَبَّارِيْنَ ۖ وَاِنَّا لَنْ نَّدْخُلَهَا حَتّٰى يَخْرُجُوْا مِنْهَا ۚ فَاِنْ يَّخْرُجُوْا مِنْهَا فَاِنَّا دٰخِلُوْنَ (٢٢)

(২২) তারা বলল, হে মূসা! সেখানে তো পরাক্রমশালী লোকগণ রয়েছে, অতএব, আমরা তো সেখানে কখনো পা রাখব না যতক্ষণ পর্যন্ত তারা সেখান হতে বের হয়ে না যায়, হ্যাঁ, যদি তারা সেখান হতে অন্য কোথাও চলে যায়, তবে নিশ্চয় আমরা যেতে প্রস্তুত আছি।

শাব্দিক অনুবাদ

(২০) وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ আর সেই সময়টিও উল্লেখযোগ্য, যখন মূসা স্বীয় সম্প্রদায়কে বললেন يٰقَوْمِ হে আমার সম্প্রদায়! اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ স্মরণ কর তোমাদের প্রতি আল্লাহর নিয়ামতকে اِذْ جَعَلَ فِيْكُمْ اَنْۢبِيَآءَ যখন তিনি তোমাদের মধ্যে বহু নবী সৃষ্টি করলেন وَجَعَلَكُمْ مُّلُوْكًا এবং তোমাদেরকে রাজ্যাধিপতি করলেন وَّاٰتٰىكُمْ এবং তোমাদেরকে এমন বস্তুসমূহ দান করলেন مَّا لَمْ يُؤْتِ اَحَدًا مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ যা বিশ্ববাসীদের মধ্যে কাউকেও দেননি।

(২১) يٰقَوْمِ হে আমার সম্প্রদায়! ادْخُلُوا প্রবেশ কর الْاَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ এরূপ পুণ্যভূমিতে الَّتِيْ كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ যা আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য লিখে দিয়েছেন। وَلَا تَرْتَدُّوْا আর যেয়ো না عَلٰٓى اَدْبَارِكُمْ পিছনের দিকে ফিরে। فَتَنْقَلِبُوْا خٰسِرِيْنَ তাহলে সম্পূর্ণরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

(২২) قَالُوْا তারা বলল يٰمُوْسٰٓى হে মূসা! اِنَّ فِيْهَا قَوْمًا جَبَّارِيْنَ সেখানে তো পরাক্রমশালী লোকগণ রয়েছে وَاِنَّا لَنْ نَّدْخُلَهَا অতএব, আমরা তো সেখানে কখনো পা রাখব না حَتّٰى يَخْرُجُوْا مِنْهَا যতক্ষণ পর্যন্ত তারা সেখান হতে বের হয়ে না যায় فَاِنْ يَّخْرُجُوْا مِنْهَا হ্যাঁ, যদি তারা সেখান হতে অন্য কোথাও চলে যায় فَاِنَّا دٰخِلُوْنَ তবে নিশ্চয় আমরা যেতে প্রস্তুত আছি।

www.almodina.com

قَالَ رَجُلٰنِ مِنَ الَّذِيْنَ يَخَافُوْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوْا عَلَيْهِمُ الْبَابَ ۚ فَاِذَا دَخَلْتُمُوْهُ فَاِنَّكُمْ غٰلِبُوْنَ ۚ۬ وَعَلَى اللّٰهِ فَتَوَكَّلُوْٓا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ (٢٣)

অনুবাদ : (২৩) সেই দুই ব্যক্তি যারা [আল্লাহকে] ভয়কারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল [এবং] যাদের প্রতি আল্লাহ তা'আলা অনুগ্রহ [-ও] করেছিলেন, বলল, তোমরা তাদের উপর [আক্রমণ করে নগরের] দ্বারদেশ পর্যন্ত যাও, অনন্তর যখনই তোমরা দ্বারদেশে পা রাখবে, তখনই জয় লাভ করবে, এবং আল্লাহ তা'আলার উপর নির্ভর কর যদি তোমরা ঈমানদার হও।

শাব্দিক অনুবাদ

(২৩) قَالَ رَجُلٰنِ সেই দুই ব্যক্তি বলল مِنَ الَّذِيْنَ يَخَافُوْنَ যারা [আল্লাহকে] ভয়কারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمَا যাদের প্রতি আল্লাহ তা'আলা অনুগ্রহ করেছিলেন ادْخُلُوْا عَلَيْهِمُ الْبَابَ তোমরা তাদের উপর [আক্রমণ করে নগরের] দ্বারদেশ পর্যন্ত যাও فَاِذَا دَخَلْتُمُوْهُ অনন্তর যখনই তোমরা দ্বারদেশে পা রাখবে فَاِنَّكُمْ غٰلِبُوْنَ তখনই জয় লাভ করবে وَعَلَى اللّٰهِ فَتَوَكَّلُوْٓا এবং আল্লাহ তা'আলার উপর নির্ভর কর اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ যদি তোমরা ঈমানদার হও।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

১৮- قوله وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ وَالنَّصٰرٰى نَحْنُ اَبْنٰٓؤُا اللّٰهِ وَاَحِبَّاۤؤُهٗ الخ **আয়াতের শানে নুযূল– ১ :** ইবনে জারীর ও বায়হাকী দালায়েল গ্রন্থে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, নোমান বিন আযাদ, বাহরী বিন আমর ও শাম বিন আদী রাসূল ﷺ-এর নিকট এসে রাসূল ﷺ-এর সাথে আলোচনা করে, রাসূল ﷺ ও তাদের সাথে আলোচনা করেন এবং তাদেরকে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেন এবং আল্লাহর শাস্তির ভীতি প্রদর্শন করেন। সে সময় তারা বলল, হে মুহাম্মদ! আমাদেরকে ভয় দেখাবেন না আল্লাহর কসম, আমরা আল্লাহর পুত্র ও বন্ধু-বান্ধবগণ। খ্রিস্টানরা যা বলে থাকে, সে পরিপ্রেক্ষিতে তাদের দাবির অসারতা প্রমাণ করে আল্লাহ তা'আলা উল্লিখিত আয়াত নাজিল করেন। –[ইবনে কাছীর : ৩৬/২, ফাতহুল কাদীর : ২৫/২, রূহুল মা'আনী : ১০০/৬, কুরতুবী : ১১৭/৬]

শানে নুযূল – ২ : হযরত মু'আয বিন জাবাল, সা'আদ বিন উবাদা ও উকবা বিন ওহাব প্রমুখ ইহুদিদেরকে লক্ষ্য করে বলেন, হে ইহুদি সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। প্রকৃত পক্ষে তোমরা তো নিশ্চিতভাবে জান, তিনি আল্লাহর রাসূল! তোমরা তো অবশ্য জান তিনি প্রেরিত হবার আগে তাঁর সম্পর্কে তোমরা আলোচনা করতে এবং আমাদের উদ্দেশ্যে তাঁর গুণাবলি ও পরিচিতি বর্ণনা করতে। তখন রাফে' বিন হারমালা এবং ওহাব বিন ইয়াহুযা বলল, আমরাতো তোমাদেরকে সে সম্পর্কে কিছুই বলিনি। আল্লাহ তা'আলাও হযরত মূসা (আ.)-এর পরে আর কোনো কিতাব অবতরণ করেননি। তাঁর পরবর্তীতে কোনো সুসংবাদ দানকারী ও সতর্ককারী কাউকে প্রেরণ করেননি। তখন আল্লাহ তা'আলা উক্ত আয়াত নাজিল করেন। –[কুরতুবী : ১৭৭/৬]

১৯- قوله يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ قَدْ جَاۤءَكُمْ رَسُوْلُنَا الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** ইবনে ইসহাক, ইবনে জারীর, ইবনুল মুনযির, ইবনে আবী হাতেম ও বায়হাকী দালায়েল গ্রন্থে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূল ﷺ ইহুদিদেরকে ইসলামের দাওয়াত প্রদান করেন। তিনি তাদেরকে ইসলাম গ্রহণ করার প্রতি উৎসাহিত করেন এবং ভয়ও দেখান। তবে তারা তা সম্পূর্ণরূপেই অস্বীকার করে। তখন মু'আয বিন জাবাল, সা'আদ বিন উবাদাহ ও উকবা বিন ওহাব (রা.) বললেন, হে ইহুদি সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। তোমরা তো নিশ্চিতভাবেই জান যে, তিনি হলেন আল্লাহ তা'আলার রাসূল। তিনি নবী হিসেবে প্রেরিত হবার আগে তোমরা তো তাঁর সম্পর্কে আলোচনা আমাদেরকে শুনিয়েছ। প্রতি উত্তরে রাফে' বিন হারমালা ও ওহাব বিন ইয়াহুযা বলল, আমরাতো তোমাদেরকে এমন বলিনি। হযরত মূসা (আ.)-

অবিকৃত অবস্থায় বিদ্যমান ছিল না। বিভিন্ন পরিবর্তনের ফলে তাতে মিথ্যা ও বানোয়াট কিচ্ছা-কাহিনী অনুপ্রবেশ করেছিল। কাজেই তা থাকা না থাকা সমান ছিল। ইবনে তাইমিয়া প্রমুখ আলেমের বর্ণনা অনুযায়ী তাওরাতের আসল কপি কারো কাছে কোনো অজ্ঞাত স্থানে বিদ্যমান থাকলেও তা এর পরিপন্থি নয়।

শেষ নবীর বিশেষ মর্যাদার প্রতি ইঙ্গিত : "আমার রাসূল মুহাম্মদ ﷺ দীর্ঘ বিরতির পর আগমন করেছেন।" আলোচ্য আয়াতে আহলে কিতাবদের সম্বোধন করে একথা বলার মধ্যে এদিকেও ইঙ্গিত রয়েছে যে, তোমাদের উচিত তাঁর আগমনকে আল্লাহপ্রদত্ত বিরাট দান ও বড় নিয়ামত মনে করা। কেননা পয়গম্বরের আগমন সুদীর্ঘকাল বন্ধ ছিল : এখন তোমাদের জন্য তা আবার খোলা হয়েছে।

দ্বিতীয় ইঙ্গিত এদিকেও রয়েছে যে, তাঁর আগমন এমন এক যুগে ও এমন স্থানে হয়েছে, যেখানে জ্ঞান ও ধর্মের কোনো আলো ছিল না। আল্লাহর সৃষ্ট মানব আল্লাহর সাথে পরিচয় হারিয়ে মূর্তিপূজায় মনোনিবেশ করেছিল। এমন জাহেলিয়াতের যুগে এহেন পথভ্রান্ত জাতির সংশোধন করা সহজ কাজ ছিল না। কিন্তু তাঁর সংসর্গের কল্যাণ ও নবুয়তের জ্যোতির পরশে অল্প দিনের মধ্যেই এ জাতি সমগ্র বিশ্বের জন্য জ্ঞান গরিমা, কর্ম প্রেরণা সচ্চরিত্রতা, লেন-দেন, সামাজিকতা ও জীবনের সকল ক্ষেত্রে অনুসরণযোগ্য হয়ে পড়ে। এতে করে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নবুয়ত ও তাঁর পয়গম্বরসুলভ শিক্ষা যে পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের চাইতে উত্তম ও উৎকৃষ্ট, তা প্রত্যক্ষভাবে প্রমাণিত হয়ে যায়। যে ডাক্তার কোনো চিকিৎসা থেকে নিরাশ রোগীর চিকিৎসা এমন জায়গায় করে, যেখানে ডাক্তারী যন্ত্রপাতি ও ঔষধপত্রও দুর্লভ, অতঃপর তাঁর সফল চিকিৎসায় মরণোম্মুখ রোগী শুধু আরোগ্যই লাভ করে না; বরং একজন বিচক্ষণ ও পারদর্শী চিকিৎসকও হয়ে যায়, এমন ডাক্তারের উৎকৃষ্টতায় কারো মনে কি কোনো সন্দেহ থাকতে পারে?

সুদীর্ঘ বিরতির পর যখন চারদিকে অন্ধকারই অন্ধকার বিরাজ করছিল, তখন তাঁর শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ চতুর্দিককে এমন আলোকোদ্ভাসিত করে তুলে যে, অতীত যুগে এর দৃষ্টান্ত কোথাও দৃষ্টিগোচর হয় না। অতএব, সব মু'জিযার একদিকে রেখে একা এ মু'জিযাটিই মানুষকে তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনে বাধ্য করতে পারে।

قوله وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يٰقَوْمِ الخ পূর্ববর্তী এক আয়াতে সে অঙ্গীকারের কথা বলা হয়েছে যা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলদের আনুগত্যের ব্যাপারে বনী ইসরাঈলদের কাছ থেকে নেওয়া হয়েছিল। এর সাথে সাথে তাদের সাধারণ প্রতিজ্ঞাভঙ্গকরণ, অঙ্গীকারের বিরুদ্ধাচরণ এবং তার শাস্তির কথা বর্ণিত হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে তাদের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের একটি বিশেষ ঘটনা উল্লিখিত হয়েছে।

ঘটনাটি এই যে, ফেরাউন ও তার সৈন্যবাহিনী যখন সমুদ্রে নিমজ্জিত হলো এবং হযরত মূসা (আ.) ও তাঁর সম্প্রদায় বনী ইসরাঈল ফেরাউনের দাসত্ব থেকে মুক্তিলাভ করে মিসরের আধিপত্য লাভ করল, তখন আল্লাহ তা'আলা সেই সঙ্গে তাদেরকে আরো কিছু নিয়ামত এবং তাদের পৈতৃক দেশ সিরিয়াকেও তাদের অধিকারে প্রত্যার্পণ করতে চাইলেন। সে মতে হযরত মূসা (আ.)-এর মাধ্যমে তাদেরকে জিহাদের উদ্দেশ্যে পবিত্র ভূমি সিরিয়ায় প্রবেশ করতে নির্দেশ দেওয়া হলো। সাথে সাথে তাদেরকে আগাম সুসংবাদও দেওয়া হলো যে, এ জিহাদের তারাই বিজয়ী হবে। কারণ আল্লাহ তা'আলা এ পবিত্র ভূমির আধিপত্য তাদের ভাগ্যে লিখে দিয়েছেন যা অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে। কিন্তু বনী ইসরাঈল প্রকৃতিগত হীনতার কারণে আল্লাহর বহু নিয়ামত তথা ফেরাউনের সাগরডুবি ও তাদের মিসর অধিকার ইত্যাদি স্বচক্ষে দেখেও এক্ষেত্রে অঙ্গীকার পালনের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করতে সক্ষম হলো না; তারা সিরিয়া জিহাদ সম্পর্কিত আল্লাহ তা'আলার এ নির্দেশের বিরুদ্ধে অন্যায় জেদ ধরে বসে রইল। ফলে আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর কঠোর শাস্তি নাজিল করলেন। পরিণতিতে তারা চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত একটি সীমাবদ্ধ এলাকায় অবরুদ্ধ ও বন্দী হয়ে রইল। বাহ্যতঃ তাদের চারপাশে কোনো বাধার প্রাচীর ছিল না এবং তাদের হাত, পা ও শিকল বাঁধা ছিল না; বরং তারা ছিল উন্মুক্ত প্রান্তরে। তারা স্বদেশে অর্থাৎ মিসর ফিরে যাবার জন্য প্রতিদিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত পথও চলত, কিন্তু তারা নিজেদেরকে সেখানেই দেখতে পেত, যেখান থেকে রওয়ানা হয়েছিল। ইত্যবসরে হযরত মূসা (আ.) ও হারুন (আ.)-এর ওফাত হয়ে যায় এবং বনী ইসরাঈল তীহ প্রান্তরেই উদভ্রান্তের মতো ঘুরাফেরা করতে থাকে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাদের হেদায়েতের জন্য অন্য একজন পয়গম্বর প্রেরণ করলেন।

www.almodina.com

এর পর আল্লাহ কোনো কিতাব অবতরণ করেননি এবং তার পরবর্তীতে কোনো সুসংবাদ দানকারী এবং সতর্ককারীরূপে কাউকে প্রেরণ করেননি। তাদের মিথ্যা দাবির জবাবে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[ফাতহুল কাদীর : ২৫/২, কুরতুবী : ১১/৬, বাহরে মুহীত : ৪৬৭/৩]

قوله عَلٰى فَتْرَةٍ مِّنَ الرُّسُلِ – فَتْرَتٌ এর শাব্দিক অর্থ মন্থর হওয়া, অনড় হওয়া এবং কোনো কাজকে বন্ধ করে দেওয়া আলোচ্য আয়াতে তাফসীরবিদগণ فَتْرَتٌ -এর শেষোক্ত অর্থই বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ, পয়গম্বরগণের আগমন পরম্পরা কিছুদিনের জন্য বন্ধ থাকা। হযরত ঈসা (আ.) -এর পর শেষনবী ﷺ-এর নবুয়ত লাভের সময় পর্যন্ত যে সুদীর্ঘকাল অতিবাহিত হয়েছে, তাই فَتْرَتٌ -এর জমানা।

فَتْرَتٌ –এর জমানা কতটুকু : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন : হযরত মূসা ও হযরত ঈসা (আ.)-এর মাঝখানে এক হাজার সাতশ বছরের ব্যবধান ছিল। এ সময়ের মধ্যে পয়গম্বরগণের আগমন একাধিক্রমে অব্যাহত ছিল। এতে কখনো বিরতি ঘটেনি। শুধু বনী ইসরাঈলের মধ্য থেকেই এক হাজার পয়গম্বর এ সময়ে প্রেরিত হয়েছিলেন। বনী ইসরাঈল ছাড়া অন্য গোত্র থেকেও অনেক পয়গম্বর আগমন করেছিলেন। অতঃপর হযরত ঈসা (আ.)-এর জন্ম ও রাসূলুল্লাহ ﷺ–এর নবুয়ত লাভের মাঝখানে পাঁচ শ বছরকাল পয়গম্বরগণের আগমন বন্ধ ছিল। এ সময়টিকে فَتْرَتٌ তথা বিরাতির সময় বলা হয়। এর আগে কখনো এত দীর্ঘ সময় পয়গম্বরগণের আগমন বন্ধ ছিল না। –[কুরতুবী]

হযরত মূসা ও ঈসা (আ.)-এর মাঝখানে কতটুকু সময় ছিল এবং হযরত ঈসা (আ.) ও শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর মাঝখানে কতটুকু সময় ছিল সে সম্পর্কে আরো বিভিন্ন রেওয়ায়েত বর্ণিত আছে। যাতে সময়ের পরিমাণ কম-বেশি বর্ণনা করা হয়েছে, কিন্তু এতে আসল উদ্দেশ্যে কোনো ব্যাঘাত সৃষ্টি হয় না।

ইমাম বুখারী হযরত সালমান ফারসীর রেওয়ায়েত ক্রমে বর্ণনা করেন : হযরত ঈসা (আ.) ও শেষনবী ﷺ-এর মাঝখানো সময় ছিল ছয়শ' বছর। এ সময়ের মধ্যে কোনো পয়গম্বর প্রেরিত হননি। বুখারী ও মুসলিমের বরাত দিয়ে মিশকাতে বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন اَنَا اَوْلَى النَّاسِ بِعِيْسٰى অর্থাৎ, আমি ঈসা (আ.)-এর সবচাইতে নিকটবর্তী। এর মর্ম হাদীসের শেষাংশে বলা হয়েছে لَيْسَ بَيْنَنَا نَبِيٌّ অর্থাৎ আমাদের মাঝখানে কোনো পয়গম্বর প্রেরিত হননি।

সূরা ইয়াসীনে যে তিন জন 'রাসূলের' কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তাঁরা প্রকৃতপক্ষে হযরত ঈসা (আ.)-এর কর্তৃক প্রেরিত দূত ছিলেন। আভিধানিক অর্থেই তাদেরকে 'রাসূল' বলা হয়েছে।

বিরতির সময়ে খালেদ ইবনে সিনান নবী ছিলেন বলে কেউ কেউ বর্ণনা করেন। এ সম্পর্কে তাফসীরে রূহুল মা'আনীতে শিহাবের বরাত দিয়ে বলা হয়েছে যে, তিনি নবী ছিলেন ঠিক; কিন্তু তাঁর নবুয়তকাল ছিল হযরত ঈসা (আ.)-এর পূর্বে-পরে নয়।

অন্তর্বর্তীকালের বিধান : আলোচ্য আয়াত থেকে বাহ্যতঃ বুঝা যায় যে, যদি কোনো সম্প্রদায়ের কাছে কোনো রাসূল, পয়গম্বর অথবা তাদের কোনো প্রতিনিধি আগমন না করে এবং পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের শরিয়তও তাদের কাছে সংরক্ষিত না থাকে, তবে তারা শিরক ছাড়া অন্য কোনো কুকর্ম ও গোমরাহীতে লিপ্ত হলে তা ক্ষমার যোগ্য বলে বিবেচিত হবে। তারা আজাবের যোগ্য হবে না। এ কারণেই অন্তবর্তীকালের লোকদের সম্পর্কে ফিকহবিদগণের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি হয়েছে যে, তারা ক্ষমাপ্রাপ্ত হবে কি না?

সাধারণ ফিকহবিদগণ বলেন : তারা ক্ষমাপ্রাপ্ত হবে বলেই আশা করা যায়। যদি তারা নিজেদের ঐ ধর্ম অনুসরণ করে, যা ভুলভ্রান্ত অবস্থায় হযরত ঈসা (আ.) অথবা হযরত মূসা (আ.)-এর সাথে সম্বন্ধযুক্ত হয়ে তাদের কাছে এসেছিল। তারা একত্ববাদের বিরুদ্ধাচরণ ও শিরকে লিপ্ত হলে একথা প্রযোজ্য হবে না। কেননা একত্ববাদ কোনো পয়গম্বরের পথ প্রদর্শনের অপেক্ষা রাখে না। সামান্য চিন্তা-ভাবনা করে নিজস্ব জ্ঞান-বুদ্ধি দ্বারাই মানুষ তা জেনে নিতে পারে।

একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর : এখানে প্রশ্ন দেখা দিতে পারে যে, আলোচ্য আয়াতে যেসব ইহুদি ও খ্রিস্টানকে সম্বোধন করা হয়েছে, অর্ন্তবর্তীকালে তাদের কাছে কোনো রাসূল আগমন না করলেও তাওরাত ও ইঞ্জীল তাদের মধ্যে বিদ্যমান ছিল। তাদের আলেম সম্প্রদায়ও ছিল। এমতাবস্থায় 'আমাদের কাছে কোনো সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শক পৌছেনি বলে তাদের ওজর পেশ করার কোনো যুক্তি ছিল কি? উত্তর এই যে, হযরত রাসূলে কারীম ﷺ-এর আমল পর্যন্ত তাওরাত ও ইঞ্জীল

এমনিভাবে চল্লিশ বছর অতিবাহিত হওয়ার পর বনী ইসরাঈলের অবশিষ্ট বংশধর তৎকালীন পয়গম্বরের নেতৃত্বে সিরিয়া ও বায়তুল মুকাদ্দাসের জন্য জিহাদের সংকল্প গ্রহণ করে এবং আল্লাহ তা'আলার ওয়াদা ও পূর্ণতা লাভ করে। এ হচ্ছে আয়াতে বর্ণিত ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ। এবার কুরআনের ভাষায় বিস্তারিত ঘটনা শুনুন :

হযরত মূসা (আ.) স্বীয় সম্প্রদায়কে বায়তুল মুকাদ্দাস ও সিরিয়া অভিযানের খোদায়ী নির্দেশ শোনাবার পূর্বে পয়গম্বরসুলভ বিচক্ষণতা ও উপদেশের মাধ্যমে বনী ইসরাঈলকে প্রদত্ত নিয়ামতসমূহ স্মরণ করিয়ে দিলেন। তিনি বলেন : اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ

"তোমাদের প্রতি আল্লাহর নিয়ামতকে স্মরণ কর। তিনি তোমাদের মধ্যে অনেক পয়গম্বর পাঠিয়েছেন, তোমাদেরকে রাজ্যের অধিপতি করেছেন এবং তোমাদেরকে এমন নিয়ামত দিয়েছেন যা বিশ্বজগতের কেউ পায়নি।

এতে তিনটি নিয়ামতের কথা বর্ণিত হয়েছে। একটি আধ্যাত্মিক নিয়ামত, অর্থাৎ, তাঁর সম্প্রদায়ে অব্যাহতভাবে বহু পয়গম্বর প্রেরণ। এর চাইতে বড় পারলৌকিক সম্মান আর কিছু হতে পারে না। তাফসীরে মাযহারীতে বর্ণিত আছে যে, বনী ইসরাঈলের মতো এত অধিক সংখ্যক পয়গম্বর অপর কোনো উম্মতে হয়নি।

হাদীসবিদ ইবনে আবী হাতেম আ'মাশের রেওয়ায়েত অনুযায়ী বর্ণনা করেন যে, বনী ইসরাঈলের শেষ পর্বে যা হযরত মূসা (আ.) থেকে শুরু করে হযরত ঈসা (আ.) পর্যন্ত শেষ হয়ে যায়, তাতেই এ সম্প্রদায়ের মধ্যে এক হাজার পয়গম্বর প্রেরিত হন। আয়াতে বর্ণিত দ্বিতীয় নিয়ামতটি হচ্ছে পার্থিব ও বাহ্যিক। অর্থাৎ, তাদেরকে রাজ্য দান। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, বনী ইসরাঈল সুদীর্ঘকাল ফেরাউন ও ফেরাউন বংশীয়দের ক্রীতদাসরূপে দিনরাত অসহনীয় নির্যাতনের শিকার হচ্ছিল। আজ আল্লাহ তা'আলা ফেরাউন ও তার বাহিনীকে নিশ্চিহ্ন করে বনী ইসরাঈলকে তার রাজ্যের অধিপতি করে দিয়েছেন। এখানে প্রণিধানযোগ্য যে, পয়গম্বরগণের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে : وَجَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ অর্থাৎ, তোমাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেককে পয়গম্বর করেছেন। এর অর্থ এই যে, সমগ্র জাতি পয়গম্বর ছিল না। বাস্তব সত্যও তাই। পয়গম্বর কয়েকজনই হন। অবশিষ্ট গোটা জাতি তাদের উম্মত ও অনুসারী হয়। কিন্তু এখানে জাগতিক রাজত্ব ও সাম্রাজ্যের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে বলা হয়েছে وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا; অর্থাৎ, তোমাদেরকে রাজ্যাধিপতি করে দিয়েছেন। এর বাহ্যিক অর্থ এই যে, তোমাদের সবাইকে রাজা করে দিয়েছেন। مُلُوكٌ শব্দটি مَلِكٌ -এর বহুবচন। সাধারণ পরিভাষায় এর অর্থ অধিপতি, বাদশাহ, রাজা। একথা সবাই জানে যে, গোটা জাতি যেমন নবী ও পয়গম্বর হয় না, তেমনি কোনো দেশে গোটা জাতি বাদশাহ বা রাজাও হয় না; বরং জাতির এক ব্যক্তি অথবা কয়েক ব্যক্তি শাসন কার্য পরিচালনা করে। অবশিষ্ট জাতি তাদের অধীনস্থ হয়ে থাকে। কিন্তু কুরআনের ভাষায় তাদের সবাইকে বাদশাহ বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

এর একটি কারণ বয়ানুল কুরআনে এক বুজুর্গের বরাত দিয়ে বলা হয়েছে যে, কোনো জাতির মধ্য থেকে কেউ বাদশাহ হলে সাধারণ পরিভাষায় তার রাজত্ব ও সাম্রাজ্যকে গোটা জাতির দিকে সম্বন্ধ করা হয়। উদাহরণতঃ ইসলামের মধ্য যুগের বাদশাহদের রাজত্বকে বনী উমাইয়া ও বনী আব্বাসের রাজত্ব; বলা হয়। এমনিভাবে ভারতবর্ষে গযনবী বংশের রাজত্ব, ঘৌরি বংশের রাজত্ব, মোঘল বংশের রাজত্ব অতঃপর ইংরেজদের রাজত্বকে সমগ্র জাতির দিকে সম্বন্ধযুক্ত করা হয়েছে। তাই যে জাতির একজন বাদশাহ হয়, সে জাতির সবাইকে বাদশাহ বলে দেওয়া হয়।

এই বিশেষ বাচনভঙ্গি অনুযায়ী কুরআন পাক সমগ্র বনী ইসরাঈলকে রাজ্যাধিপতি বলে দিয়েছে। এতে এদিকেও ইঙ্গিত থাকতে পারে যে, ইসলামি রাষ্ট্র প্রকৃতপক্ষে জনগণের রাষ্ট্র। জনগণই স্বীয় রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচন করার অধিকারী এবং জনগণই সম্মিলিত মত দ্বারা তাঁকে অপসারণও করতে পারে। তাই দেখার ক্ষেত্রে যদিও একজন রাষ্ট্রপ্রধান হন, কিন্তু রাষ্ট্রের প্রকৃত মালিক জনগণই।

তৃতীয় নিয়ামত বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ উভয় প্রকার নিয়ামতের সমষ্টি। বলা হয়েছে : وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ অর্থাৎ তোমাদেরকে এমন সব নিয়ামত দিয়েছেন, যা বিশ্বজগতের আর কাউকে দেননি। অভ্যন্তরীণ সম্মান, নবুয়ত এবং রেসালাত এর অন্তর্ভুক্ত। এ ছাড়া বাহিক রাজত্ব এবং অর্থ-সম্পদও এরই মধ্যে পরিগণিত। প্রশ্ন হতে পারে, কুরআনের উক্তি অনুযায়ী মুসলিম সম্প্রদায় অন্য সব উম্মতের চাইতে শ্রেষ্ঠ। কুরআনের উক্তি كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ বাক্য এবং [illegible] অসংখ্য হাদীসও এ বক্তব্য সমর্থন করে। উত্তর এই যে, আয়াতে বিশ্ব জগতের ঐসব লোককে

বুঝানো হয়েছে, যারা হযরত মূসা (আ.)-এর আমলে বিদ্যমান ছিল। তখন সমগ্র বিশ্বের কেউ ঐসব নিয়ামত পায়নি, যা বনী ইসরাঈল পেয়েছিল। পরবর্তী যুগের কোনো উম্মত যদি আরো বেশি নিয়ামত লাভ করে, তবে তা আয়াতের পরিপন্থি নয়।

আলোচ্য প্রথম আয়াতে বর্ণিত হযরত মূসা (আ.)-এর উক্তিটি ছিল ঐ নির্দেশ বর্ণনার ভূমিকা, যা পরবর্তী আয়াতে ব্যক্ত হয়েছে : يٰقَوْمِ ادْخُلُوا الْاَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِيْ كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ অর্থাৎ, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা সে পবিত্র ভূমিতে প্রবেশ কর, যা আল্লাহ তা'আলা তোমাদের ভাগ্যে লিখে রেখেছেন।

পবিত্র ভূমি বলে কোন ভূমি বুঝানো হয়েছে : এ প্রশ্নে তাফসীরবিদগণের মত বাহ্যতঃ ভিন্ন ভিন্ন। কারো মতে বায়তুল মুকাদ্দাস, কারো মতে কুদস শহর ও ইলিয়া এবং কেউ কেউ বলেন : আরিহা শহর– যা জর্দান নদী ও বায়তুল মুকাদ্দাসের মধ্যস্থলে বিশ্বের একটি প্রাচীনতম শহর যা পূর্বেও ছিল এবং এখনো আছে। হযরত মূসা (আ.)-এর আমলে এ শহরের অত্যাশ্চার্য জাঁক-জমক ও বিস্তৃতি ইতিহাসে বর্ণিত আছে।

কোনো কোনো রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে, এ শহরের এক হাজার ভিন্ন ভিন্ন অংশ ছিল। প্রতি অংশে এক হাজার করে বাগান ছিল। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে যে, পবিত্র ভূমি বলে দামেশক ও ফিলিস্তিনকে এবং কারো মতে জর্দানকে বুঝানো হয়েছে। হযরত কাতাদাহ (র.) বলেন, সমগ্র সিরিয়াই পবিত্র ভূমি। কা'ব আহবার (রা.) বলেন : আমি আল্লাহর কিতাবে সম্ভবতঃ তাওরাতে দেখেছি যে, সমগ্র সিরিয়ায় আল্লাহ তা'আলা বিশেষ ধন-ভাণ্ডার রয়েছে এবং এতে আল্লাহর অনেক প্রিয় বান্দা রয়েছেন। পয়গম্বরগণের জন্মস্থান ও বাসস্থান হওয়ার কারণে একে পবিত্র ভূমি বলা হয়।

এক রেওয়ায়েতে আছে, একদিন হযরত ইবরাহীম (আ.) লেবাননের পাহাড়ে আরোহণ করলে আল্লাহ তা'আলা বললেন : ইবরাহীম, এখান থেকে দৃষ্টিপাত কর। যে পর্যন্ত তোমার দৃষ্টি পৌঁছবে, আমি তার সবটুকু পবিত্র ভূমি করে দিলাম। ইবনে কাছীর ও মাযহারী তাফসীর গ্রন্থ থেকে এসব রেওয়ায়েত উল্লেখ করা হয়েছে। এসব উক্তির মধ্যে কোনো বৈপরীত্য নেই। সর্বশেষ রেওয়ায়েত অনুযায়ী সমগ্র সিরিয়াই পবিত্র ভূমি। তবে বর্ণনায় কেউ সিরিয়ার অংশবিশেষকে এবং কেউ সমগ্র সিরিয়াকে বর্ণনা করেছেন।

قَالُوْا يٰمُوْسٰى : এর আগে আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ.)-এর মাধ্যমে বনী ইসরাঈলকে আমালেকা সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে জিহাদ করে সিরিয়া দখল করতে বলেছিলেন। সাথে সাথে এ সুসংবাদও দিয়েছিলেন যে, সিরিয়ার ভূখণ্ড তাদের ভাগে লেখা হয়ে গেছে। কাজেই তোমাদের বিজয় সুনিশ্চিত।

উল্লিখিত আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, এ সত্ত্বেও বনী ইসরাঈল চিরাচরিত ঔদ্ধত্য ও বক্র স্বভাবের কারণে এ নির্দেশ পালনে স্বীকৃত হলো না; বরং হযরত মূসা (আ.)-কে বলল; হে মূসা! এ দেশে প্রবল পরাক্রান্ত জাতি বাস করে। যতদিন এ দেশ তাদের দখলে থাকবে, ততদিন আমরা সেখানে প্রবেশ করব না। যদি তারা অন্য কোথাও চলে যায়, তবে আমরা সেখানে যেতে পারি।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস, ইকরিমা, আলী বইনে আবী তালহা প্রমুখ তাফসীরবিদ থেকে বর্ণিত আছে যে, তখন সিরিয়া ও বায়তুল মুকাদ্দাস আমালেকা সম্প্রদায়ের দখলে ছিল। তারা ছিল আদ সম্প্রদায়ের একটি শাখা। দৈহিক দিক দিয়ে তারা অত্যন্ত সুঠাম, বলিষ্ট ও ভয়াবহ আকৃতিবিশিষ্ট ছিল। তাদেরই সাথে জিহাদ করে বায়তুল মুকাদ্দাস অধিকার করার নির্দেশ হযরত মূসা (আ.) ও তাঁর সম্প্রদায়কে দেওয়া হয়েছিল।

হযরত মূসা (আ.) আল্লাহর নির্দেশ পালনের জন্য বনী ইসরাঈলকে সঙ্গে নিয়ে সিরিয়া অভিমুখে রওয়ানা হলেন। উদ্দেশ্য ছিল বায়তুল মুকাদ্দাসে পৌঁছা। জর্দান নদী পার হয়ে বিশ্বের প্রাচীনতম শহর আরিহায় পৌঁছে শিবির স্থাপন করলেন। বনী ইসরাঈলের দেখা-শোনার জন্য বার জন সর্দার নির্বাচন করার কথা পূর্ববর্তী আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। হযরত মূসা (আ.) এই বার জন সর্দারকে শত্রুদের অবস্থা ও রণাঙ্গণের হাল-হাকিকত জেনে আসার জন্য পাঠান। বায়তুল মুকাদ্দাসের অদূরে শহরের বাইরে আমালেকা সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তির সাথে তাদের দেখা হয়। সে একাই বার জনকে গ্রেফতার করে বাদশার সামনে উপস্থিত করে বলল : এরা আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে এসেছে। শাহী দরবারে নানা পরামর্শের পর তাদেরকে মুক্ত করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো যাতে তারা স্বজাতির কাছে পৌঁছে প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে আমালেকা জাতির শৌর্য-বির্যের কাহিনী বর্ণনা করে। ফলে আক্রমণ তো দূরের কথা, ভীত হয়ে এদিকে মুখ করার সাহসও তারা হারিয়ে ফেলে।

www.almodina.com

এ স্থলে অধিকাংশ তাফসীর গ্রন্থে উল্লিখিত ঈসরাঈলী রেওয়ায়েতসমূহ নাতিদীর্ঘ কিচ্ছা-কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে এবং আমালেকা সম্প্রদায়ের উল্লিখিত ব্যক্তির নাম বলা হয়েছে আউজ ইবনে ওনুক। এসব রেওয়ায়েতে তার অদ্ভুত আকার-আকৃতি ও শক্তি সাহসকে এমন অতিরঞ্জিত করে বর্ণনা করা হয়েছে যে, তা সুস্থ বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে উদ্ধৃত করাও কঠিন।

ইবনে কাছীর বলেন : আউজ ইবনে ওনুকের যেসব কিচ্ছা এসব ইসরাঈলী রেওয়ায়েতে স্থান পেয়েছে, সেগুলো কোনো বুদ্ধিমানের কাছে গ্রহণীয় নয় এবং শরিয়তেও এগুলোর কোনো বৈধতা নেই– এ সবই মিথ্যা ও বানোয়াট। আসল ব্যাপার এতটুকু যে, আমালেকা সম্প্রদায় ছিল আ'দ সম্প্রদায়ের উত্তর পুরুষদের একটি অংশ। আদ সম্প্রদায়ের ভয়াবহ আকার-আকৃতির কথা স্বয়ং কুরআনে পাক বর্ণনা করেছে। তাদের বিশালাকৃতি ও শক্তি-সাহস প্রবাদবাক্যে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। ফলে তাদের এক ব্যক্তি বনী ইসরাঈলের বার ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিল।

মোটকথা, বনী ইসরাঈলের বারজন সর্দার আমালেকাদের কয়েদখানা থেকে মুক্ত হয়ে আরিহায় স্বজাতির কাছে ফিরে এল। তারা হযরত মূসা (আ.)-এর কাছে এ বিস্ময়কর জাতি ও তাদের অবিশ্বাস্য শৌর্যবীর্যের কাহিনী বর্ণনা করল। হযরত মূসা (আ.) এসব কাহিনী শুনে এতটুকুও ভীত হলেন না। কারণ আল্লাহ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে তাঁকে বিজয় ও সাফল্যের বাণী শুনিয়ে রেখেছিলেন।

হযরত মূসা (আ.) তো তাদের শৌর্যবীর্যের অবস্থা শুনে স্বস্থানে পাহাড়ের মতো দৃঢ়তা সহকারে জিহাদের প্রস্তুতিতে লেগে রইলেন। কিন্তু বনী ইসরাঈলকে নিয়েই সমস্যা। তারা যদি প্রতিপক্ষের অসাধারণ শক্তি-সাহসের কথা জেনে ফেলে, তবে নিশ্চিতই ভরাডুবি। তাই তিনি বারজন সর্দারকে আমালেকা সম্প্রদায়ের অবস্থা বনী ইসরাঈলের কাছে ব্যক্ত করতে নিষেধ করে দিলেন। কিন্তু তা হলো না। কারণ তারা প্রত্যেকেই গোপনে গোপনে বন্ধু-বান্ধবের কাছে তা ব্যক্ত করে দিল। শুধু ইউশা ইবনে নূন ও কালেব ইবনে ইউকেন্না নামক দুব্যক্তি হযরত মূসা (আ.)-এর নির্দেশ পালন করে তা কারো কাছে প্রকাশ করল না।

শব্দের বিশ্লেষণ :

اَلْمَصِيْرُ : সীগাহ واحد বহছ اسم ظرف مكان বাব ضَرَبَ মাসদার اَلصَّيْرُ মূলবর্ণ (ص . ى . ر) জিনস اجوف يائى অর্থ– প্রত্যাবর্তনের স্থান।

فَتْرَةٌ : শব্দটি একবচন, বহুবচন فَتَرَاتٌ অর্থ– বিচ্ছিন্নতা, ধীর হয়ে যাওয়া।

لَاتَرْتَدُّوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ نهى حاضر معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِرْتِدَادُ মূলবর্ণ (ر . د . د) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– তোমরা ফিরে যেয়ো না।

قَوْمٌ : শব্দটি একবচন, বহুবচন اَقْوَامٌ অর্থ– জাতি।

جَبَّارِيْنَ : শব্দটি جَبْرٌ থেকে مُبَالغة এর সীগাহ। অর্থ– অবাধ্য।

www.almodina.com

قَالُوا يٰمُوْسٰٓى اِنَّا لَنْ نَّدْخُلَهَآ اَبَدًا مَّا دَامُوْا فِيْهَا فَاذْهَبْ اَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَآ اِنَّا هٰهُنَا قٰعِدُوْنَ (٢٤)

অনুবাদ : (২৪) তারা বলল, হে মূসা! নিশ্চয় আমরা কখনো সেখানে পা রাখব না, যে পর্যন্ত তারা সেখানে বিদ্যমান থাকে, অতএব, আপনি এবং আপনার আল্লাহ চলে যান এবং উভয়ে যুদ্ধ করুন, আমরা তো এখান হতে নড়ব না।

قَالَ رَبِّ اِنِّيْ لَآ اَمْلِكُ اِلَّا نَفْسِيْ وَاَخِيْ فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفٰسِقِيْنَ (٢٥)

(২৫) মূসা আরজ করলেন, হে আমার পরওয়ারদেগার! আমি স্বীয় প্রাণ এবং নিজ ভ্রাতার উপর অবশ্য অধিকার রাখি, সুতরাং আপনি আমাদের উভয়ের এবং এই অবাধ্য সম্প্রদায়ের মধ্যে মীমাংসা করে দিন।

قَالَ فَاِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً ۚ يَتِيْهُوْنَ فِي الْاَرْضِ ۚ فَلَا تَاْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفٰسِقِيْنَ (٢٦)

(২৬) ইরশাদ হলো, [তবে মীমাংসা এই যে,] এই দেশ চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত তাদের হস্তগত হবে না, এরূপেই ভূপৃষ্ঠে মাথা কুটে ফিরতে থাকবে, সুতরাং আপনি এই অবাধ্য সম্প্রদায়ের জন্য [একটু] বিষণ্ন হবেন না।

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَاَ ابْنَيْ اٰدَمَ بِالْحَقِّ ۘ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ اَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْاٰخَرِ ؕ قَالَ لَاَقْتُلَنَّكَ ؕ قَالَ اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ (٢٧)

(২৭) আর আপনি আহলে কিতাবদেরকে আদমের পুত্রদ্বয়ের [-হাবীল ও কাবীলের] ঘটনা সঠিকভাবে পাঠ করে শুনিয়ে দিন। যখন উভয়েই এক একটি কুরবানি উপস্থিত করল এবং তন্মধ্য হতে একজনের [হাবীলের] তো কবুল হলো এবং অপর জনের কবুল হলো না, সেই অপরজন বলতে লাগল, আমি তোমাকে নিশ্চয় হত্যা করব, সে [প্রথম] জন বলল, আল্লাহ তা'আলা পরহেজগারদের আমলই কবুল করে থাকেন।

শাব্দিক অনুবাদ

(২৪) قَالُوا তারা বলল يٰمُوْسٰٓى হে মূসা! اِنَّا لَنْ نَّدْخُلَهَآ اَبَدًا নিশ্চয় আমরা কখনো সেখানে পা রাখব না مَّا دَامُوْا فِيْهَا যে পর্যন্ত তারা সেখানে বিদ্যমান থাকে فَاذْهَبْ اَنْتَ وَرَبُّكَ অতএব, আপনি এবং আপনার আল্লাহ চলে যান فَقَاتِلَآ এবং উভয়ে যুদ্ধ করুন اِنَّا هٰهُنَا قٰعِدُوْنَ আমরা তো এখান হতে নড়ব না।

(২৫) قَالَ মূসা আরজ করলেন رَبِّ হে আমার পরওয়ারদেগার! اِنِّيْ لَآ اَمْلِكُ اِلَّا نَفْسِيْ وَاَخِيْ আমি স্বীয় প্রাণ এবং নিজ ভ্রাতার উপর অবশ্য অধিকার রাখি فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفٰسِقِيْنَ সুতরাং আপনি আমাদের উভয়ের এবং এই অবাধ্য সম্প্রদায়ের মধ্যে মীমাংসা করে দিন।

(২৬) قَالَ ইরশাদ হলো فَاِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ [তবে মীমাংসা এই যে,] এই দেশ তাদের হস্তগত হবে না اَرْبَعِيْنَ سَنَةً চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত يَتِيْهُوْنَ فِي الْاَرْضِ এরূপেই ভূপৃষ্ঠে মাথা কুটে ফিরতে থাকবে فَلَا تَاْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِيْنَ সুতরাং আপনি এই অবাধ্য সম্প্রদায়ের জন্য বিষণ্ন হবেন না।

(২৭) وَاتْلُ عَلَيْهِمْ আর আপনি আহলে কিতাবদেরকে পাঠ করে শুনিয়ে দিন نَبَاَ ابْنَيْ اٰدَمَ আদমের পুত্রদ্বয়ের ঘটনা بِالْحَقِّ সঠিকভাবে اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا যখন উভয়েই এক একটি কুরবানি উপস্থিত করল فَتُقُبِّلَ مِنْ اَحَدِهِمَا এবং তন্মধ্য হতে একজনের তো কবুল হলো وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْاٰخَرِ এবং অপরজনের কবুল হলো না قَالَ সেই অপর জন বলতে লাগল لَاَقْتُلَنَّكَ আমি তোমাকে নিশ্চয় হত্যা করব قَالَ সে [প্রথম] জন বলল اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ আল্লাহ তা'আলা পরহেজগারদের আমলই কবুল করে থাকেন।

অনুবাদ : (২৮) তুমি যদি আমাকে হত্যা করার জন্য আমার প্রতি হস্ত প্রসারিত কর, তথাপি আমি তোমাকে হত্যা করার জন্য তোমার দিকে কখনো আমার হাত বাড়াব না, আমি তো বিশ্বপালক আল্লাহকে ভয় করি।	لَئِنْ بَسَطْتَ اِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِيْ مَآ اَنَا بِبَاسِطٍ يَّدِيَ اِلَيْكَ لِاَقْتُلَكَ ۚ اِنِّيْٓ اَخَافُ اللّٰهَ رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ (٢٨)
(২৯) আমার ইচ্ছা এই যে, [আমার দ্বারা কোনো পাপ না হোক,] তুমি আমার পাপ এবং তোমার পাপ সমস্তই নিজের মাথায় উঠিয়ে নাও, অনন্তর তুমি দোজখীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও, আর এরূপ শাস্তিই হয়ে থাকে অত্যাচারীদের।	اِنِّيْٓ اُرِيْدُ اَنْ تَبُوْٓءَ بِاِثْمِيْ وَاِثْمِكَ فَتَكُوْنَ مِنْ اَصْحٰبِ النَّارِ ۚ وَذٰلِكَ جَزٰٓؤُا الظّٰلِمِيْنَ (٢٩)
(৩০) অতঃপর তার প্রবৃত্তি তাকে স্বীয় ভ্রাতৃ-হত্যার প্রতি উদ্বুদ্ধ করে তুলল, অতএব, সে তাকে হত্যাই করে ফেলল, ফলে সে অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ল।	فَطَوَّعَتْ لَهٗ نَفْسُهٗ قَتْلَ اَخِيْهِ فَقَتَلَهٗ فَاَصْبَحَ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ (٣٠)
(৩১) অতঃপর একটি কাক প্রেরণ করলেন, সে মাটি খুঁড়তে লাগল, যেন সে তাকে [কাবীলকে] শিখিয়ে দেয় যে, স্বীয় ভ্রাতার লাশ কিভাবে ঢাকবে, সে বলতে লাগল, আফসোস, আমার অবস্থার প্রতি, আমি কি এই কাকের সমতুল্য হতে এবং স্বীয় ভ্রাতার লাশকে ঢেকে ফেলতে অক্ষম হয়ে গেলাম, ফলে সে অত্যন্ত লজ্জিত হলো।	فَبَعَثَ اللّٰهُ غُرَابًا يَّبْحَثُ فِي الْاَرْضِ لِيُرِيَهٗ كَيْفَ يُوَارِيْ سَوْءَةَ اَخِيْهِ ۚ قَالَ يٰوَيْلَتٰٓى اَعَجَزْتُ اَنْ اَكُوْنَ مِثْلَ هٰذَا الْغُرَابِ فَاُوَارِيَ سَوْءَةَ اَخِيْ ۚ فَاَصْبَحَ مِنَ النّٰدِمِيْنَ (٣١)

শাব্দিক অনুবাদ :

(২৮) لَئِنْ بَسَطْتَ তুমি যদি প্রসারিত কর اِلَيَّ يَدَكَ আমার প্রতি তোমার হস্ত لِتَقْتُلَنِيْ আমাকে হত্যা করার জন্য مَآ اَنَا بِبَاسِطٍ يَّدِيَ اِلَيْكَ لِاَقْتُلَكَ তথাপি আমি তোমাকে হত্যা করার জন্য তোমার দিকে কখনো আমার হাত বাড়াব না اِنِّيْٓ اَخَافُ اللّٰهَ رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ আমি তো বিশ্বপালক আল্লাহকে ভয় করি।

(২৯) اِنِّيْٓ اُرِيْدُ আমার ইচ্ছা এই যে اَنْ تَبُوْٓءَ بِاِثْمِيْ وَاِثْمِكَ তুমি আমার পাপ এবং তোমার পাপ সমস্তই নিজের মাথায় উঠিয়ে নাও فَتَكُوْنَ مِنْ اَصْحٰبِ النَّارِ অনন্তর তুমি দোজখীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও وَذٰلِكَ جَزٰٓؤُا الظّٰلِمِيْنَ আর এরূপ শাস্তিই হয়ে থাকে অত্যাচারীদের।

(৩০) فَطَوَّعَتْ لَهٗ نَفْسُهٗ অতঃপর তার প্রবৃত্তি তাকে উদ্বুদ্ধ করে তুলল قَتْلَ اَخِيْهِ স্বীয় ভ্রাতৃ-হত্যার প্রতি فَقَتَلَهٗ অতএব, সে তাকে হত্যাই করে ফেলল فَاَصْبَحَ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ফলে সে অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ল।

(৩১) فَبَعَثَ اللّٰهُ غُرَابًا অতঃপর একটি কাক প্রেরণ করলেন يَّبْحَثُ فِي الْاَرْضِ সে মাটি খুঁড়তে লাগল لِيُرِيَهٗ যেন সে তাকে শিখিয়ে দেয় যে كَيْفَ يُوَارِيْ سَوْءَةَ اَخِيْهِ স্বীয় ভ্রাতার লাশ কিভাবে ঢাকবে قَالَ يٰوَيْلَتٰٓى সে বলতে লাগল, আফসোস আমার অবস্থার প্রতি اَعَجَزْتُ আমি অক্ষম হয়ে গেলাম اَنْ اَكُوْنَ مِثْلَ هٰذَا الْغُرَابِ আমি কি এই কাকের সমতুল্য হতে فَاُوَارِيَ سَوْءَةَ اَخِيْ এবং স্বীয় ভ্রাতার লাশকে ঢেকে ফেলতে فَاَصْبَحَ مِنَ النّٰدِمِيْنَ ফলে সে অত্যন্ত লজ্জিত হলো।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قوله قَالُوا يٰمُوْسٰىٓ اِنَّا لَنْ نَّدْخُلَهَآ اَبَدًا مَّا دَامُوْا فِيْهَا الخ কিন্তু বনী ইসরাঈল যেখানে পয়গম্বরের কথার প্রতিই কর্ণপাত করল না, সেখানে তাদের উপদেশের আর মূল্য কি? তারা পূর্বের জওয়াবই আরও বিশ্রি ভঙ্গিতে পুনরাবৃত্তি করল: فَاذْهَبْ اَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَآ اِنَّا هٰهُنَا قٰعِدُوْنَ অর্থাৎ, আপনি ও আপনার আল্লাহ উভয়ে গিয়েই যুদ্ধ করুন। আমরা এখানেই বসে থাকব। বনী ইসরাঈল বিদ্রূপের ভঙ্গিতে একথা বললে, তা পরিষ্কার কুফর হতো এবং অতঃপর তাদের সাথে হযরত মূসা (আ.)-এর অবস্থান করা, তীহ প্রান্তরে দোয়া করা ইত্যাদি সম্ভবপর হতো না যা পরবর্তী আয়াতে বর্ণিত হচ্ছে।

এ কারণে তাফসীরবিদগণ উপরিউক্ত বাক্যের অর্থ এরূপ সাব্যস্ত করেছেন– আপনি যান এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করুন। আপনার আল্লাহই আপনার সাহায্য করবেন, আমরা সাহায্য করতে অক্ষম। এ অর্থের দিক দিয়ে বনী ইসরাঈলের জওয়াবটি কুফরের পরিধি অতিক্রম করে যায়– যদিও কথাটি অত্যন্ত বিশ্রি ও পীড়াদায়ক। এ কারণেই তাদের এ বাক্যটি প্রবাদ বাক্যের রূপ পরিগ্রহ করেছে।

বদরযুদ্ধে নিরস্ত্র ও ক্ষুধার্ত মুসলমানদের মোকাবিলায় এক হাজার সশস্ত্র জওয়ানের বাহিনী প্রস্তুত হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এ দৃশ্য দেখে আল্লাহর দরবারে দোয়া করতে লাগলেন। এতে সাহাবী হযরত মিকদাদ ইবনে আসওয়াদ (রা.) আরজ করলেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহর কসম, আমরা কস্মিনকালেও ঐ কথা বলব না, যা হযরত মূসা (আ.)-কে তাঁর স্বজাতি বলেছিল فَاذْهَبْ اَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَآ اِنَّا هٰهُنَا قٰعِدُوْنَ বরং আমরা আপনার ডানে, বামে, সামনে ও পিছনে থেকে শত্রুর পিছনে থেকে শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করব। আপনি নিশ্চিন্তে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করুন।

হাবিল ও কাবিলের কাহিনী : আলোচ্য আয়াতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ দিয়েছেন আপনি আহলে কিতাবদেরকে অথবা সমগ্র উম্মতকে আদম (আ.)-এর পুত্রদ্বয়ের কাহিনী সত্য সত্য বর্ণনা করে শুনিয়ে দিন।

কুরআন মাজীদে অভিনিবেশকারী মাত্রই জানে যে, কুরআন পাক কোনো কিচ্ছা-কাহিনী অথবা ইতিহাস গ্রন্থ নয় যে, তাতে কোনো ঘটনাকে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বর্ণনা করা হবে। এতদসত্ত্বেও অতীত ঘটনাবলি এবং বিগত জাতিসমূহের ইতিবৃত্তের মধ্যে অনেক শিক্ষা ও উপদেশ নিহিত রয়েছে। এগুলোই ইতিহাসের আসল প্রাণ। তন্মধ্যে অনেক অবস্থা ও ঘটনা এমনও রয়েছে, যেগুলোর উপর শরিয়তের বিভিন্ন বিধি-বিধান ভিত্তিশীল। এসব উপকারিতার পরিপ্রেক্ষিতে কুরআন পাকের সামগ্রিক রীতি এই যে, স্থানে স্থানে বিভিন্ন ঘটনা বর্ননা করে অধিকাংশ স্থানে পূর্ণ ঘটনা এক জায়গায় বর্ণনা করে না; বরং ঘটনার যে অংশের সাথে আলোচ্য বিষয়বস্তুর সম্পর্ক থাকে সে অংশটুকুই বর্ণনা করা হয়।

হযরত আদম (আ.)-এর পুত্রদ্বয়ের কাহিনীটিও এই বিজ্ঞ রীতির ভিত্তিতে বর্ণনা করা হচ্ছে। এতে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য অনেক শিক্ষা ও উপদেশ রয়েছে এবং প্রসঙ্গক্রমে শরিয়তের অনেক বিধি-বিধানের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

এখন প্রথমে আয়াতের শব্দাবলির ব্যাখ্যা এবং তৎপ্রসঙ্গে আসল কাহিনী শুনুন : অতঃপর সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান বর্ণনা করা হবে।

পূর্ববর্তী আয়াতে বনী ইসরাঈলের প্রতি জিহাদের নির্দেশ এবং তাতে তাদের কাপুরুষতা ও ভীরুতা বর্ণনা করা হয়েছিল। এর বিপরীতে আলোচ্য কাহিনীতে অন্যায় হত্যার অনিষ্ট ও ধ্বংসকারিতা বর্ণনা করে জাতিকে মিথ্যাচার শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, সত্যের সমর্থনে এবং মিথ্যাচার থেকে পিছনে হটা যেমন ভুল, তেমনি অন্যায় হত্যাকাণ্ডে এগিয়ে যাওয়া ইহকাল ও পরকালকে বরবাদ করার শামিল।

প্রথম আয়াতে بَنِىْ اٰدَمَ শব্দ উল্লিখিত হয়েছে। সেমতে প্রত্যেককেই اِبْنُ اٰدَمَ বা আদম সন্তান বালা যায়। কিন্তু সাধারণ তাফসীরবিদগণের মতে এখানে بَنِىْ اٰدَمَ বলে হযরত আদমের ঔরসজাত পুত্রদ্বয় হাবিল ও কাবিলকে বুঝানো হয়েছে।

ঐতিহাসিক রেওয়ায়েত বর্ণনা করার ক্ষেত্রে সাবধানতা ও সততা অপরিহার্য : তাদের কাহিনী বর্ণনা করার উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে : وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَاَ ابْنَىْ اٰدَمَ بِالْحَقِّ; অর্থাৎ, তাদেরকে হযরত আদম (আ.)-এর পুত্রদ্বয়ের কাহিনী বিশুদ্ধ

www.almodina.com

ও বাস্তব ঘটনা অনুযায়ী শুনিয়ে দিন। যাতে بِالْحَقِّ শব্দ দ্বারা ঐতিহাসিক ঘটনাবলি বর্ণনার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ, ঐতিহাসিক ঘটনাবলি বর্ণনায় খুবই সাবধানতা অবলম্বন করা প্রয়োজন এবং এতে কোনোরূপ মিথ্যা জালিয়াতি ও প্রতারণার মিশ্রণ না থাকা চাই এবং প্রকৃত ঘটনা পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত না হওয়া চাই। –[ইবনে কাছীর] কুরআন পাক শুধু এখানেই নয়; বরং অন্যান্য জায়গায়ও এ মূলনীতি অনুসরণ-অনুকরণ করার নির্দেশ দিয়েছে।

এছাড়া এ শব্দ দ্বারা কুরআন পাকের সম্বোধিত ব্যক্তিবর্গকে বুঝানো হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বাহ্যতঃ নিরক্ষর হওয়া সত্ত্বেও হাজারো বছর পূর্বেকার ঘটনাবলি যেভাবে বিশুদ্ধ ও সত্য সত্য বর্ণনা করেছেন, তার কারণ খোদায়ী ওহী ও নবুয়ত ছাড়া আর কি হতে পারে?

এ ভূমিকার পর কুরআন পাকে পুত্রদ্বয়ের ঘটনা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে : إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ
আভিধানিক দিক দিয়ে যে বস্তু কারো নৈকট্য লাভের উপায় হিসেবে ব্যবহৃত হয় তাকে 'কুরবান' বলা হয়। শরিয়তের পরিভাষায় কুরবান ঐ জন্তুকে বলে যাকে আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে জবাই করা হয়।

হযরত আদম (আ.)-এর পুত্রদ্বয়ের কুরবানির ঘটনাটি বিশুদ্ধ ও শক্তিশালী সনদসহ বর্ণিত হয়েছে। ইবনে কাছীর একে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সর্বস্তরের আলেমদের সর্বসম্মত উক্তি বলে আখ্যা দিয়েছেন।

ঘটনাটি এই : যখন আদম ও হাওয়া (আ.) পৃথিবীতে আগমন করেন এবং সন্তান প্রজনন ও বংশ বিস্তার আরম্ভ হয়, তখন প্রতি গর্ভ থেকে একটি পুত্র ও একটি কন্যা– এরূপ যমজ সন্তান জন্মগ্রহণ করত। তখন ভ্রাতা-ভাগিনী ছাড়া হযরত আদম (আ.)-এর আর কোনো সন্তান ছিল না। অথচ ভ্রাতা-ভগিনী পরস্পর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে না। তাই আল্লাহ তা'আলা উপস্থিত প্রয়োজনের খাতিরে হযরত আদম (আ.)-এর শরিয়তে বিশেষভাবে এ নির্দেশ জারি করেন যে, একই গর্ভ থেকে যে যমজ পুত্র ও কন্যা জন্মগ্রহণ করবে, তারা পরস্পর সহোদর ভ্রাতা-ভগিনী গণ্য হবে। তাদের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক হারাম হবে। কিন্তু পরবর্তী গর্ভ থেকে জন্মগ্রহণকারী পুত্রের জন্য প্রথম গর্ভ থেকে জন্মগ্রহণকারিণী কন্যা সহোদরা ভগিনী গণ্য হবে না। তাদের পরস্পর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া বৈধ হবে।

কিন্তু ঘটনাচক্রে কাবিলের সহজাত সহোদরা ভগিনীটি ছিল পরমাসুন্দরী এবং হাবিলের সহজাত কন্যাটি ছিল কুশ্রী ও কদাকার। বিবাহের সময় হলে নিয়মানুযায়ী হাবিলের সহজাত কুশ্রী ও কন্যা কাবিলের ভাগে পড়ল। এতে কাবিল অসন্তুষ্ট হয়ে হাবিলের শত্রু হয়ে গেল। সে জেদ ধরল যে, আমার সহজাত ভগিনীকেই আমার সঙ্গে বিবাহ দিতে হবে। হযরত আদম (আ.) তাঁর শরিয়তের আইনের পরিপ্রেক্ষিতে কাবিলের আব্দার প্রত্যাখ্যান করলেন। অতঃপর তিনি হাবিল ও কাবিলের মতভেদ দূর করার উদ্দেশ্যে বললেন : তোমরা উভয়েই আল্লাহর জন্য নিজ নিজ কুরবানি পেশ কর। যার কুরবানি পরিগৃহীত হবে, সেই কন্যার পানিগ্রহণ করবে। হযরত আদম (আ.)-এর নিশ্চিত বিশ্বাস যে, যে সত্য পথে আছে, তার কুরবানিই গৃহীত হবে।

তৎকালে কুরবানি গৃহীত হওয়ার একটি সুস্পষ্ট নিদর্শন ছিল এই যে, আকাশ থেকে একটি অগ্নিশিখা এসে কুরবানিকে ভস্মিভূত করে আবার অন্তর্হিত হয়ে যেত। যে কুরবানি অগ্নি ভস্মিভূত করত না, তাকে প্রত্যাখ্যাত মনে করা হতো।

হাবিল ভেড়া, দুম্বা ইত্যাদি পশু পালন করত। সে একটি উৎকৃষ্ট দুম্বা কুরবানি করল। কাবিল কৃষিকাজ করত। সে কিছু শস্য, গম ইতাদি কুরবানির জন্য পেশ করল। অতঃপর নিয়মানুযায়ী আকাশ থেকে অগ্নিশিখা অবতরণ করে হাবিলের কুরবানিটি ভস্মিভূত করে দিল এবং কাবিলের কুরবানি যেমন ছিল, তেমনি পড়ে রইল। এ অকৃতকার্যতায় কাবিলের দুঃখ ও ক্ষোভ বেড়ে গেল। সে আত্মসংবরণ করতে পারল না এবং প্রকাশ্যে ভাইকে বলে দিল : لَأَقْتُلَنَّكَ অর্থাৎ, অবশ্যই আমি তোমাকে হত্যা করব।

হাবিল তখন ক্রোধের জওয়াবে ক্রোধ প্রদর্শন না করে একটি মার্জিত ও নীতিগত বাক্য উচ্চারণ করল। এতে কাবিলের প্রতি তার সহানুভূতি ও শুভেচ্ছা ফুটে উঠেছিল। সে বলল : إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ
অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলার নিয়ম এই যে, তিনি আল্লাহ পরহেজগারে কর্মই গ্রহণ করেন। তুমি আল্লাহভীতি অবলম্বন করলে তোমার কুরবানি গৃহীত হতো। তুমি তা করনি, তাই কুরবানি প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। এতে আমাদের দোষ কি?

শব্দ বিশ্লেষণ

مَادَامُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ نفى فعل ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلدَّوَامُ মূলবর্ণ (د ـ و ـ م) জিনস اجوف واوى অর্থ– তারা একই অবস্থায় রয়েছে।

يَتِيْهُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ فعل مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلتِّيْهُ মূলবর্ণ (ت ـ ى ـ ه) জিনস اجوف يائى অর্থ– তারা উদ্ভ্রান্ত হয়ে বেড়াতে থাকবে।

لَا تَأْسَ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ نهى حاضر معروف বাব سَمِعَ মাসদার اَلْاَسٰى মূলবর্ণ (ا ـ س ـ ى) জিনস মুরাক্কাব مهموز فاء و ناقص يائى অর্থ– তুমি চিন্তিত হয়ো না।

اُتْلُ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلتِّلَاوَةُ মূলবর্ণ (ت ـ ل ـ و) জিনস ناقص واوى অর্থ– তুমি তেলাওয়াত কর।

تَبُوْءُ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ فعل مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْبَوْءُ মূলবর্ণ (ب ـ و ـ ا) জিনসে মুরাক্কাব اجوف واوى ও مهموز لام অর্থ– তুমি অর্জন করবে।

يُوَارِىْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ فعل مضارع معروف বাব مُفَاعَلَةٌ মাসদার اَلْمُوَارَاةُ মূলবর্ণ (ر ـ أ ـ ى) জিনস মুরাক্কাব, مهموز عين ও ناقص يائى অর্থ– সে লুকাবে।

سَوْاَةٌ : শব্দটি একবচন, বহুচন سَوْءَاتٌ অর্থ– লাশ।

www.almodina.com

مِنْ اَجْلِ ذٰلِكَ ۛ كَتَبْنَا عَلٰى بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اَنَّهٗ مَنْ قَتَلَ نَفْسًۢا بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِى الْاَرْضِ فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًا ؕ وَمَنْ اَحْيَاهَا فَكَاَنَّمَآ اَحْيَا النَّاسَ جَمِيْعًا ؕ وَلَقَدْ جَآءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنٰتِ ؗ ثُمَّ اِنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذٰلِكَ فِى الْاَرْضِ لَمُسْرِفُوْنَ (٣٢)

অনুবাদ : (৩২) এই জন্যই আমি বনী ইসরাঈলদের প্রতি এই নির্দেশ দিয়েছি যে, যে ব্যক্তি কোনো ব্যক্তিকে হত্যা করে অন্য প্রাণের বিনিময় ব্যতীত, কিংবা তা কর্তৃক ভূপৃষ্ঠে কোনো ফাসাদ বিস্তার ব্যতীত, তবে যেন সে সমস্ত মানুষকে হত্যা করে ফেলল, আর যে ব্যক্তি কোনো ব্যক্তিকে রক্ষা করে, তবে যেন সে সমস্ত মানুষকে রক্ষা করল, আর বনী ইসরাঈলদের প্রতি [এই বিধান প্রবর্তনের পর] আমার বহু নবীও স্পষ্ট প্রমাণসমূহ নিয়ে আগমন করেছিলেন, তবু এর পরেও তন্মধ্য হতে অনেকেই ভূপৃষ্ঠে সীমালঙ্ঘনকারীই রয়ে গেছে।

اِنَّمَا جَزٰٓؤُا الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَسْعَوْنَ فِى الْاَرْضِ فَسَادًا اَنْ يُّقَتَّلُوْٓا اَوْ يُصَلَّبُوْٓا اَوْ تُقَطَّعَ اَيْدِيْهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ اَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْاَرْضِ ؕ ذٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِى الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ (٣٣)

(৩৩) যারা আল্লাহ তা'আলার সাথে ও তাঁর রাসূলের সাথে সংগ্রাম করে, আর [এই সংগ্রামের অর্থ এই যে,] ভূপৃষ্ঠে অশান্তি সৃষ্টি করে বেড়ায়, তাদের শাস্তি তাই যে, তাদেরকে হত্যা করা হবে অথবা শূলে চড়ানো হবে, অথবা তাদের এক দিকের হাত ও অপর দিকের পা কেটে ফেলা হবে অথবা ভূপৃষ্ঠের উপর [স্বাধীনভাবে বিচরণ করা] হতে বের করে [কারাগারে পাঠিয়ে] দেওয়া হবে, তা তো ইহলোকে তাদের জন্য ভীষণ অপমান, আর পরকালেও তাদের ভীষণ শাস্তি হবে,

শাব্দিক অনুবাদ

(৩২) مِنْ اَجْلِ ذٰلِكَ এই জন্যই كَتَبْنَا عَلٰى بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ আমি বনী ইসরাঈলদের প্রতি এই নির্দেশ দিয়েছি যে اَنَّهٗ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا যে ব্যক্তি কোনো ব্যক্তিকে হত্যা করে بِغَيْرِ نَفْسٍ অন্য প্রাণের বিনিময় ব্যতীত اَوْ فَسَادٍ فِى الْاَرْضِ কিংবা তা কর্তৃক ভূপৃষ্ঠে কোনো ফাসাদ বিস্তার ব্যতীত فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًا তবে যেন সে সমস্ত মানুষকে হত্যা করে ফেলল وَمَنْ اَحْيَاهَا আর যে ব্যক্তি কোনো ব্যক্তিকে রক্ষা করে فَكَاَنَّمَآ اَحْيَا النَّاسَ جَمِيْعًا তবে যেন সে সমস্ত মানুষকে রক্ষা করল وَلَقَدْ جَآءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنٰتِ আর বনী ইসরাঈলদের প্রতি আমার বহু নবীও স্পষ্ট প্রমাণসমূহ নিয়ে আগমন করেছিলেন ثُمَّ اِنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ তন্মধ্য হতে অনেকেই بَعْدَ ذٰلِكَ তবু এর পরেও فِى الْاَرْضِ ভূপৃষ্ঠে لَمُسْرِفُوْنَ সীমালঙ্ঘনকারীই রয়ে গেছে।

(৩৩) اِنَّمَا جَزٰٓؤُا তাদের শাস্তি তাই যে الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ যারা আল্লাহ তা'আলার সাথে ও তাঁর রাসূলের সাথে সংগ্রাম করে وَيَسْعَوْنَ فِى الْاَرْضِ فَسَادًا আর ভূপৃষ্ঠে অশান্তি সৃষ্টি করে বেড়ায় اَنْ يُّقَتَّلُوْٓا তাদেরকে হত্যা করা হবে اَوْ يُصَلَّبُوْٓا অথবা শূলে চড়ানো হবে اَوْ تُقَطَّعَ اَيْدِيْهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ অথবা তাদের এক দিকের হাত ও অপর দিকের পা কেটে ফেলা হবে اَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْاَرْضِ অথবা ভূপৃষ্ঠের উপর হতে বের করে দেওয়া হবে ذٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِى الدُّنْيَا তা তো ইহলোকে তাদের জন্য ভীষণ অপমান وَلَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ আর পরকালেও তাদের ভীষণ শাস্তি হবে।

অনুবাদ	আয়াত
অনুবাদ : (৩৪) কিন্তু হ্যাঁ, যারা তওবা করে নেয়, তোমরা তাদেরকে গ্রেফতার করার পূর্বে, তবে জেনে রাখ যে, নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমা করবেন, অনুগ্রহ করবেন।	اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا مِنْ قَبْلِ اَنْ تَقْدِرُوْا عَلَيْهِمْ ۚ فَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ (٣٤)
(৩৫) হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় কর, এবং [আনুগত্য দ্বারা] তাঁর সান্নিধ্য অন্বেষণ কর এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করতে থাক, আশা যে, তোমরা [পূর্ণ] সফলকাম হবে।	يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَابْتَغُوْٓا اِلَيْهِ الْوَسِيْلَةَ وَجَاهِدُوْا فِيْ سَبِيْلِهٖ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ (٣٥)
(৩৬) নিশ্চয় যারা কাফের, যদি তাদের নিকট বিশ্বের সমস্ত দ্রব্যও থাকে এবং তার সাথে তৎপরিমাণ আরো হয়, যেন তারা তা প্রদান করে কিয়ামত দিবসের শাস্তি হতে মুক্ত হয়ে যায়, তবুও এই দ্রব্যসমূহ কখনো তাদের হতে কবুল করা হবে না, এবং তাদের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি হবে।	اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْ اَنَّ لَهُمْ مَّا فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا وَّمِثْلَهٗ مَعَهٗ لِيَفْتَدُوْا بِهٖ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيٰمَةِ مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ (٣٦)

শাব্দিক অনুবাদ

(৩৪) اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا কিন্তু হ্যাঁ, যারা তওবা করে নেয় مِنْ قَبْلِ اَنْ تَقْدِرُوْا عَلَيْهِمْ তোমরা তাদেরকে গ্রেফতার করার পূর্বে فَاعْلَمُوْٓا তবে জেনে রাখ যে اَنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমা করবেন, অনুগ্রহ করবেন।

(৩৫) يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا হে ঈমানদারগণ! اتَّقُوا اللّٰهَ আল্লাহকে ভয় কর وَابْتَغُوْٓا اِلَيْهِ الْوَسِيْلَةَ এবং তাঁর সান্নিধ্য অন্বেষণ কর وَجَاهِدُوْا فِيْ سَبِيْلِهٖ এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করতে থাক لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ আশা যে, তোমরা সফলকাম হবে।

(৩৬) اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا নিশ্চয় যারা কাফের لَوْ اَنَّ لَهُمْ مَّا فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا যদি তাদের নিকট বিশ্বের সমস্ত দ্রব্যও থাকে وَّمِثْلَهٗ مَعَهٗ এবং তার সাথে তৎপরিমাণ আরো হয় لِيَفْتَدُوْا بِهٖ যেন তারা তা প্রদান করে مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيٰمَةِ কিয়ামত দিবসের শাস্তি হতে মুক্ত হয়ে যায় مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ তবুও এই দ্রব্যসমূহ কখনো তাদের হতে কবুল করা হবে না وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ এবং তাদের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(৩৩) اِنَّمَا جَزٰٓؤُا الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَسْعَوْنَ فِي الْاَرْضِ فَسَادًا الخ **আয়াতের শানে নুযূল– ১ :** আলোচ্য আয়াতের শানে নুযূলের মাঝে মত পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। কারো মতে আলোচ্য আয়াত মুশরিকদের সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। আবূ দাঊদ ও নাসায়ীর বর্ণনা মতে, ইবনে মারদুভিয়া সা'আদ বিন আবী ওয়াক্কাসের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন যে, আলোচ্য আয়াত হারুরি গোত্র সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে হযরত আনাস (রা.)-এর বরাত দিয়ে বর্ণনা করেন যে, আলোচ্য আয়াত উকালবাসীদের সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। উকাল গোত্রের কিছু লোকজন রাসূল ﷺ-এর দরবারে এসে ইসলাম গ্রহণ করে। পরবর্তীতে তারা মদিনায় পেটের পীড়ায় আক্রান্ত হয়। তখন নবী করীম ﷺ তাদেরকে সদকার উটের নিকট এসে তার দুধ ও পেশাব পান করতে আদেশ করেন। দুধ ও পেশাব পান করে সুস্থতা অর্জন লাভ করার পর নবী করীম ﷺ-এর পক্ষ থেকে নিয়োগকৃত উটের রাখালকে হত্যা করে উটগুলো তাড়িয়ে নিতে লাগল। রাসূল ﷺ সে সম্পর্কে খবর জেনে তাদের পিছু পিছু অনুসন্ধানকারী পাঠালেন। অনুসন্দানকারী দল তাদেরকে গ্রেফতার নিয়ে আসেন। এর শাস্তি স্বরূপ রাসূল ﷺ তাদের হাত পা কেটে দিতে এবং চক্ষুকে উপড়িয়ে উত্তপ্ত বালুকাময় মরুভূমিতে ফেলে রাখতে নির্দেশ দেন। যাতে করে তারা এভাবে মৃত্যুবরণ করে। রাসূল ﷺ কর্তৃক এ নির্দেশ জারি করার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[ফাতহুল কাদীর : ৩৭/২, কুরতুবী ১৪১/৬, ইবনে কাছীর : ৪৯/২]

শানে নুযূল– ২ : হযরত ইবনে আব্বাস ও যাহহাক কর্তৃক বর্ণিত রয়েছে যে, আলোচ্য আয়াত আহলে কিতাবদের কারণে নাজিল হয়েছে। তাদের এবং রাসূল ﷺ-এর মাঝে সন্ধি ছিল। তারা সে সন্ধিকে ভঙ্গ করে, ডাকাতি করতে আরম্ভ করল এবং জমিনের বুকে ফ্যাসাদ সৃষ্টি করতে আরম্ভ করল। কিতাবীদের চুক্তি ভঙ্গ করার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়েছে। –[কুরতুবী : ১৪২/৬]

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ **আয়াতের শানে নুযূল :** রাসূল ﷺ উকল বাসীদের চক্ষুও উপড়ে ফেলেছিলেন কারণ তারাও রাখালদের চক্ষু উপড়ে ফেলেছিল। তাদের ছাড়া রাসূল ﷺ অন্য আর কারো চক্ষু উপড়ে ফেলেননি। ইবনে জারীর ওলীদ বিন মুসলিমের উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমি মুহাম্মদ বিন আজলানকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছিলেন যে, আলোচ্য আয়াত রাসূল ﷺ-এর উপর অবতীর্ণ হয়েছে আকৃতি বিকৃত করা সম্পর্কে নিন্দা জ্ঞাপন করে। রাসূল ﷺ কে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে আকৃতি বিকৃত করার শাস্তি সম্পর্কে জানিয়ে দেন যে, তাদের শাস্তি হলো হত্যা, শূলে চড়ানো যাবেনা। আবূ ওমরের নিকট এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলে তিনি নিন্দা প্রকাশ স্বরূপ আয়াত অবতীর্ণ হওয়াকে অস্বীকার করেন। তিনি বলেন যে, উকল গোত্রীয়দের সে শাস্তি ঠিকই ছিল। তবে তারা ছাড়া অন্যদের থেকে চক্ষু উপড়ে ফেলার শাস্তিকে রহিত করা হয়েছে। পরবর্তীতে অন্যদের শাস্তি বর্ণনা করার জন্য উক্ত আয়াত নাজিল করা হয়। –[রূহুল মা'আনী : ১২২/৩/৬]

কুরআনি আইনের অভিনব ও বৈপ্লবিক পদ্ধতি : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে হত্যাকাণ্ড এবং তার গুরুতর অপরাধের কথা বর্ণিত হয়েছিল। আলোচ্য আয়াত এবং পরবর্তী আয়াতসমূহে হত্যা, লুণ্ঠন, ডাকাতি ও চুরির শাস্তি বর্ণিত হয়েছে। ডাকাতি ও চুরির শাস্তির মাঝখানে আল্লাহভীতি ও ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। কুরআন পাকের এ পদ্ধতি অত্যন্ত সুক্ষ্মভাবে মানসিক বিপ্লব সৃষ্টি করে। মানব রচিত দণ্ডবিধির মতো কুরআন পাক শুধু অপরাধ ও শাস্তি বর্ণনা করেই ক্ষান্ত হয় না; বরং প্রত্যেক অপরাধ ও শাস্তির সাথে আল্লাহভীতি ও পরকাল কল্পনা উপস্থাপন করে মানুষের ধ্যান-ধারণাকে এমন এক জগতের দিকে ঘুরিয়ে দেয়, যার কল্পনা মানুষকে যাবতীয় অপরাধ ও গুনাহ থেকে পবিত্র করে দেয়। অভিজ্ঞতা দ্বারা প্রমাণিত রয়েছে যে, জনমনে আল্লাহ তা'আলা ও আখেরাতের ভয় সৃষ্টি করা ছাড়া জগতের কোনো আইন, পুলিশ ও সেনাবাহিনীই অপরাধ দমনের নিশ্চয়তা দিতে পারে না। কুরআন পাকের এই বিজ্ঞজনোচিত পদ্ধতিই জগতে অভূতপূর্ব বিপ্লব এনেছে এবং এমন লোকদের একটি সমাজ গঠন করেছে, যারা পবিত্রতায় ফেরেশতাদের চাইতেও উচ্চ মর্যাদার অধিকারী।

শরিয়তের শাস্তি তিন প্রকার : চুরি ও ডাকাতির শাস্তি এবং সংশ্লিষ্ট আয়াতের তাফসীর বর্ণনা করার পূর্বে এসব শাস্তি সম্পর্কে শরিয়তের পরিভাষায় কিছুটা ব্যাখ্যা আবশ্যক। কেননা এসব পরিভাষা সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে অনেক শিক্ষিত লোকের মনেও নানাবিধ প্রশ্ন দেখা দেয়। জগতের সাধারণ আইনে অপরাধ সম্পর্কিত সব শাস্তিকেই 'দণ্ডবিধি' নামে অভিহিত করা হয়। যেমন ভারতীয় দণ্ডবিধি', 'বাংলাদেশ দণ্ডবিধি' ইত্যাদি নামে যেসব গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে, তাতে সর্বপ্রকার অপরাধ ও সব ধরনের শাস্তিই বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু ইসলামি শরিয়ত এরূপ নয়। ইসলামি শরিয়তে অপরাধের শাস্তিকে তিন ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে: হুদূদ, কেছাছ ও তা'যীরাত। অর্থাৎ, দণ্ডবিধি। এগুলোর সংজ্ঞা ও অর্থ জানার পূর্বে প্রথমতঃ একথা জেনে নেওয়া জরুরি যে, যেসব অপরাধের দরুন অন্য মানুষের কষ্ট অথবা ক্ষতি হয়, তাতে সৃষ্টজীবের প্রতিও অন্যায় করা হয় এবং স্রষ্টারও নাফরমানি করা হয়। তাই এ জাতীয় অপরাধে 'হক্কুল্লাহ' (আল্লাহর হক) এবং 'হক্কুল আবদ' (বান্দার হক) উভয়টিই বিদ্যমান থাকে এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি উভয়ের কাছেই অপরাধী বলে বিবেচিত হয়।

কিন্তু কোনো কোনো অপরাধে বান্দার হক এবং কোনো কোনো অপরাধে আল্লাহর হক প্রবল থাকে এবং এ প্রাবল্যের উপর ভিত্তি করেই বিধি-বিধান রচিত হয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ একথা জানা জরুরি যে, ইসলামি শরিয়ত বিশেষ বিশেষ অপরাধ ছাড়া অবশিষ্ট অপরাধসমূহের শাস্তির কোনো পরিমাণ নির্ধারণ করেনি; বরং বিচারকের অভিমতের উপর ছেড়ে দিয়েছে। বিচারক স্থান, কাল ও পরিবেশ বিবেচনা করে অপরাধ দমনের জন্য যেরূপ ও যতটুকু শাস্তির প্রয়োজন মনে করবেন, ততটুকুই দিবেন। প্রত্যেক স্থান ও কালের ইসলামি সরকার যদি শরিয়তের রীতিনীতি বিবেচনা করে বিচারকদের ক্ষমতার উপর বিধি-নিষেধ আরোপ করে এবং অপরাধসমূহের শাস্তির কোনো পরিমাণ নির্ধারণ করে বিচারকদের তা মেনে চলতে বাধ্য করে, তবে তাও জায়েজ। বর্তমান শতাব্দীতেও তাই চলছে বর্তমানে প্রায় সব ইসলামি দেশে এ ব্যবস্থাই প্রচলিত রয়েছে।

এখন লক্ষ্য করা দরকার যে, যেসব অপরাধের কোনো শাস্তি কুরআন ও সুন্নাহ নির্ধারণ করেনি; বরং বিচারকদের অভিমতের উপর ন্যস্ত করেছে, সেসব শাস্তিকে শরিয়তের পরিভাষায় 'তা'যিরাত' তথা দণ্ড বলা হয়। পক্ষান্তরে যেসব অপরাধের শাস্তি কুরআন ও সুন্নাহ নির্ধাণ করে দিয়েছে, সেগুলো দু'রকম : এক. যেসব অপরাধে আল্লাহর হকের পরিমাণ প্রবল ধরা হয়েছে, সেগুলোর শাস্তিকে 'হদ' বলা হয়। আর 'হদ'-এর বহুবচন 'হুদূদ'। দুই. যেসব অপরাধে বান্দার হককে শরিয়তের বিচারে প্রবল ধরা হয়েছে, সেগুলোর শাস্তিকে বলা হয় 'কেছাছ'। কুরআন পাক হুদুদ ও কেছাছ পূর্ণ ব্যাখ্যা সহকারে নিজেই বর্ণনা করে দিয়েছে। আর দণ্ডনীয় অপরাধের বিবরণকে রাসূলের বর্ণনা ও সমকালীন বিচারকদের অভিমতের উপর ছেড়ে দিয়েছে।

সারকথা, কুরআন পাক যেসব অপরাধের শাস্তিকে আল্লাহর হক হিসেবে নির্ধারণ করে জারি করেছে, সেসব শাস্তিকে 'হুদূদ' বলা হয় এবং যেসব শাস্তিকে বান্দার হক হিসেবে জারি করেছে, সেগুলোকে 'কেছাছ' বলা হয়। পক্ষান্তরে যেসব অপরাধের শাস্তি নির্ধারণ করেনি, সে জাতীয় শাস্তিকে বলা হয় 'তা'যীর' তথা 'দণ্ড'। শাস্তির এ প্রকার তিনটির বিধান অনেক বিষয়েই বিভিন্ন। যারা নিজেদের পরিভাষার ভিত্তিতে প্রত্যেক অপরাধের শাস্তিকে দণ্ড বলে এবং শরিয়তের পরিভাষাগত পার্থক্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করে না, তারা শরিয়তের বিধি-বিধানে অনেক বিভ্রান্তির সম্মুখীন হয়।

দণ্ডগত শাস্তিকে অবস্থানুযায়ী লঘু থেকে লঘুতর, কঠোর থেকে কঠোরতর এবং ক্ষমাও করা যায়। এ ব্যাপারে বিচারকদের ক্ষমতা অত্যন্ত ব্যাপক। কিন্তু হুদূদের বেলায় কোনো সরকার, শাসনকর্তা অথবা বিচারকই সামান্যতম পরিবর্তন, লঘু অথবা কঠোর করার অধিকারী নয়। স্থান ও কালভেদেও এতে কোনো পার্থক্য হয় না এবং কোনো শাসক ও বিচারক তা ক্ষমাও করতে পারে না। শরিয়তের হুদুদ মাত্র পাঁচটি : ডাকাতি, চুরি, ব্যাভিচার ও ব্যাভিচারের অপবাদ– এ চারটি শাস্তি কুরআনে বর্ণিত রয়েছে। পঞ্চমটি মদ্যপানের হদ। এটি সাহাবায়ে কেরামের ইজমা তথা ঐকমত্য দ্বারা প্রমাণিত। এভাবে মোট পাঁচটি অপরাধের শাস্তি নির্ধারিত ও হুদূদরূপে চিহ্নিত হয়েছে। এসব শাস্তি যেমন কোনো শাসক ও বিচারক ক্ষমা করতে পারে না, তেমনি তওবা করলেও ক্ষমা হয়ে যায় না। তবে খাঁটি তওবা দ্বারা আখেরাতের গুনাহ মাফ হয়ে সেখানকার হিসাব-কিতাব থেকে অব্যাহতি লাভ হতে পারে। তন্মধ্যে শুধু ডাকাতির শাস্তির বেলায় একটি ব্যতিক্রম রয়েছে। ডাকাত যদি গ্রেফতারীর পূর্বে তওবা করে এবং তার আচার-আচরণের দ্বারাও তওবার বিষয়টি নিশ্চিত হয়ে যায়, তবে সে হদ থেকে রেহাই পাবে। কিন্তু গ্রেফতারীর পরবর্তী তওবা ধর্তব্য নয়। অন্যান্য হুদুদ তওবা দ্বারাও মাফ হয় না। এ তওবা গ্রেফতারীর পূর্বে হোক অথবা পরে। সব দণ্ডনীয় অপরাধের ক্ষেত্রে ন্যায়ের অনুকূলে সুপারিশ শ্রবণ করা যায়; কিন্তু হুদুদের বেলায় সুপারিশ করা এবং তা শ্রবণ করা দুই-ই নাজায়েজ। রাসূলুল্লাহ ﷺ এ ব্যাপারে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। হুদূদের শাস্তি সাধারণতঃ কঠোর। এগুলো প্রয়োগ করার আইনও নির্মম। অর্থাৎ, কোনো অবস্থাতেই তা পরিবর্তন ও লঘু করা যায় না এবং কেউ ক্ষমা করারও অধিকারী নয়। কিন্তু সাথে সাথে সামগ্রিক ব্যাপারে সমতা বিধানের উদ্দেশ্যে অপরাধ এবং অপরাধ প্রমাণের শর্তাবলিও অত্যন্ত কঠোর করা হয়েছে। নির্ধারিত শর্তাবলির মধ্য থেকে যদি কোনো একটি শর্তও অনুপস্থিত থাকে, তবে হদ অপ্রযোজ্য হয়ে যায়। অর্থাৎ, অপরাধ প্রমাণে সামান্যতম সন্দেহ পাওয়া গেলেও হদ প্রয়োগ করা যায় না। এ ব্যাপারে শরিয়তের স্বীকৃত আইন হচ্ছে اَلْحُدُوْدُ تَنْدَرِئُ بِالشُّبُهَاتِ অর্থাৎ, হুদুদ সামান্যতম সন্দেহের কারণেই অকেজো হয়ে পড়ে।

এ ক্ষেত্রে বুঝে নেওয়া উচিত যে, কোনো সন্দেহ অথবা কোনো শর্তের অনুপস্থিতির কারণে হদ অপ্রযোজ্য হয়ে পড়ার অর্থ এই নয় যে, অপরাধী অবাধ ছাড়পত্র পেয়ে যাবে যার ফলে তার অপরাধ প্রবণতা আরো বেড়ে যাবে; বরং বিচারক অবস্থার সাথে সঙ্গতি রেখে তাকে দণ্ডগত শাস্তি দিবেন। শরিয়তের দণ্ডগত শাস্তিসমূহ সাধারণতঃ দৈহিক ও আর্থিক। এগুলো দৃষ্টান্তমূলক হওয়ার কারণে অপরাধ দমনে খুবই কার্যকর। ধরুন, ব্যভিচার প্রমাণে মাত্র তিন জন সাক্ষী পাওয়া গেল এবং তারা সবাই নির্ভরযোগ্য ও মিথ্যার সন্দেহ থেকে মুক্ত। কিন্তু আইনানুযায়ী চতুর্থ সাক্ষী না থাকার কারণে হদ জারি করা যাবে না। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, অপরাধী অবাধ ছুটি অথবা বেকসুর খালাস পেয়ে যাবে; বরং বিচারক তাকে অন্য কোনো উপযুক্ত দণ্ড প্রদান করবেন, যা বেত্রাঘাতের আকারে হতে পারে।

তেমনিভাবে চুরি প্রমাণের জন্য নির্ধারিত শর্তসমূহে কোনো ত্রুটি অথবা সন্দেহ দেখা দেওয়ার কারণে চোরের হাত কেটে দেওয়া যাবে না বটে, কিন্তু এমতাবস্থায় সে সম্পূর্ণ মুক্তও হয়ে যাবে না; বরং তাকে অবস্থানুযায়ী অন্য দণ্ড দেওয়া হবে।

www.almodina.com

কেসাসের শাস্তিও হদ্দের মতো কুরআন পাকে নির্ধারিত অর্থাৎ প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ সংহার করা হবে এবং জখমের বিনিময়ে সমান জখম করা হবে। কিন্তু পার্থক্য এই যে, হদ্দকে আল্লাহর হক হিসেবে প্রয়োগ করা হয়। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ক্ষমা করলেও তা ক্ষমা হবে না এবং হদ অব্যবহার্য হবে না। উদাহরণতঃ যার অর্থ চুরি যায় সে ক্ষমা করলেও চোরের নির্ধারিত শাস্তি অপ্রযোজ্য হবে না। কিন্তু কেসাস এর বিপরীত। কেসাস বান্দার হক প্রবল হওয়ার কারণে হত্যা প্রমাণিত হওয়ার পর হত্যাকারীকে নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীর এখতিয়ারে ছেড়ে দেওয়া হয়। সে ইচ্ছা করলে কেসাস হিসেবে তাকে মৃত্যুদণ্ডও করতে পারে। জখমের কেসাসও তদ্রূপ। পূর্বেও বর্ণিত হয়েছে যে, হদ্দ ও কেসাস অপ্রযোজ্য হয়ে পড়ার অর্থ এই নয় যে, অপরাধী অবাধ ছুটি পেয়ে যাবে; বরং বিচারক দণ্ডমূলক শাস্তি যতটুকু উপযুক্ত মনে করবেন, দিতে পারবেন। কাজেই নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীরা হত্যাকারীকে ক্ষমা করে ছেড়ে দিলে হত্যাকারীদের সাহস বেড়ে যাবে কিংবা ব্যাপক হারে হত্যাকাণ্ড শুরু হয়ে যাবে— এরূপ আশঙ্কা করা ঠিক নয়। কেননা হত্যাকারীর প্রাণ সংহার করা ছিল নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীর প্রাপ্য, সে তা ক্ষমা করে দিয়েছে। কিন্তু অপরাপর লোকদের প্রাণরক্ষা করা সরকারের দায়িত্ব। সরকার এ দায়িত্ব পালনের জন্য হত্যাকারীকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড অথবা অন্য কোনো শাস্তি দিয়ে এ বিপদাশঙ্কা রোধ করতে পারে।

وَابْتَغُوْا اِلَيْهِ الْوَسِيْلَةَ অর্থাৎ আল্লাহর নৈকট্য অন্বেষণ কর। وَسِيْلَةٌ শব্দটি وَسْلٌ ধাতু থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ সংযোগ স্থাপন করা। এ শব্দটি س - ص উভয় বর্ণে প্রায় একই অর্থে আসে। পার্থক্য এতটুকু যে, وَصْلٌ-এর অর্থ যে কোনোরূপে সাক্ষাৎ করা ও সংযোগ করা এবং وَسْلٌ এর অর্থ আগ্রহ ও সম্প্রীতি সহকারে সাক্ষাৎ করা। -[ছেহাহ, জাওহারী, মুফরাদাতুল কুরআন] তাই وَصْلَةٌ ও وَصِيْلَةٌ ঐ বস্তুকে বলে, যা দুই বস্তুর মধ্যে মিলন ও সংযোগ স্থাপন করে— তা আগ্রহ ও সম্প্রীতির মাধ্যমেই হোক অথবা অন্য কোনো উপায়ে। পক্ষান্তরে وَسِيْلَةٌ ঐ বস্তুকে বলা হয়, যা একজনকে অপরজনের সাথে আগ্রহ ও সম্প্রীতি সহকারে সংযুক্ত করে দেয়। -[লিসানুল আরব, মুফরাদাতুল কুরআন] وَسِيْلَةٌ শব্দটির সম্পর্ক আল্লাহর সাথে হলে ঐ বস্তুকে বলা হবে, যা বান্দাকে আগ্রহ ও মহব্বত সহকারে আল্লাহর নিকটবর্তী করে দেয়। তাই পূর্ববর্তী মনীষী, সাহাবী ও তাবেয়ীগণের ইবাদত, নৈকট্য, ঈমান ও সৎকর্ম দ্বারা আয়াতে উল্লিখিত وَسِيْلَةٌ শব্দের তাফসীর করেছেন। হাকিমের বর্ণনা মতে হযরত হুযায়ফা (রা.) বলেন, 'ওসীলা' শব্দ দ্বারা নৈকট্য ও আনুগত্য বুঝানো হয়েছে। ইবনে জারীর হযরত আতা (র.), মুজাহিদ (র.) ও হাসান বসরী (রা.) থেকে এ অর্থই বর্ণনা করেছেন।

এ আয়াতের তাফসীরে হযরত কাতাদাহ (র.) বলেন, تَقَرَّبُوْا اِلَيْهِ بِطَاعَتِهِ وَالْعَمَلِ بِمَا يَرْضِيْهِ অর্থাৎ আল্লাহর নৈকট্য অর্জন কর তাঁর আনুগত্য ও সন্তুষ্টির কাজ করে। অতএব, আয়াতের সারব্যাখ্যা এই দাঁড়ায় যে, ঈমান ও সৎকর্মের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য অন্বেষণ কর।

মুসনাদে আহমদ গ্রন্থে বর্ণিত এক সহীহ হাদীসে রাসূল ﷺ বলেন : জান্নাতে একটি উচ্চ স্তরের নাম 'ওসিলা'। এর ঊর্ধ্বে কোনো স্তর নেই। তোমরা আল্লাহর কাছে দোয়া কর যেন তিনি এ স্তরটি আমাকে দান করেন।

মুসলিমের এক হাদীসে রাসূল ﷺ বলেন : যখন মুয়াজ্জিন আজান দেন, তখন মুয়াজ্জিন যা বলে, তোমরাও তাই বল। এরপর দরূদ পাঠ কর এবং আমার জন্য ওয়াসীলার দোয়া কর।

এসব হাদীস থেকে জানা যাচ্ছে যে, ওয়াসীলা জান্নাতের একটি স্তর, যা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য নির্দিষ্ট। আলোচ্য আয়াতে প্রত্যেক ঈমানদারকে ওয়াসীলা অন্বেষণের নির্দেশ বাহ্যতঃ এর পরিপন্থি। উত্তর এই যে, হেদায়েতের সর্বোচ্চ স্থান যেমন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য নির্দিষ্ট হওয়া সত্ত্বেও তার প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরগুলো সব মুমিনই প্রাপ্ত হবে, তেমনি ওয়াসীলার সর্বোচ্চ স্তর রাসূলুল্লাহ ﷺ লাভ করবেন এবং এর নিম্নের স্তরগুলো মুমিনরা প্রাপ্ত হবে।

হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানী (র.) তাঁর 'মাকতুবাত' গ্রন্থে এবং কাজী ছানাউল্লাহ পানিপথী (র.) তাফসীরে মাযহারীতে বর্ণনা করেন যে, ওয়াসীলা শব্দটিতে প্রেম ও আগ্রহের অর্থ সংযুক্ত থাকায় বুঝা যায় যে, ওয়াসীলার স্তরসমূহের উন্নতি আল্লাহ ও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মহব্বতের উপর নির্ভরশীল। আর মহব্বত সৃষ্টি হয় সুন্নতের অনুসরণের দ্বারা। কেননা কুরআন বলে : فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ (আমার অনুসরণ কর, তবেই আল্লাহ তোমাদেরকে মহব্বত করবেন)। তাই ইবাদত, লেন দেন, চরিত্র, সামাজিকতা তথা জীবনের সকল ক্ষেত্রে যে সুন্নতের যত বেশি অনুসরণ করবে, আল্লাহর মহব্বত সে ততবেশি অর্জন করতে পারবে এবং আল্লাহর প্রিয়জনে পরিণত হবে। মহব্বত যত বেশি বৃদ্ধি পাবে, নৈকট্যও ততবেশি অর্জিত হবে।

www.almodina.com

ওয়াসীলা শব্দের আভিধানিক ব্যাখ্যা এবং সাহাবী ও তাবেয়ীগণের তাফসীর থেকে জানা গেল যে, যে বস্তু আল্লাহর সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভের মাধ্যম হয়, তাই মানুষের জন্য আল্লাহর নিকটবর্তী হওয়ার ওয়াসীলা। ঈমান ও সৎকর্ম যেমন এর অন্তর্ভুক্ত তেমনি পয়গম্বর ও সৎকর্মীদের সংসর্গ এবং মহব্বতও এর অন্তর্ভুক্ত। কেননা এগুলোও আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভেরই উপায়। এ কারণেই তাঁদেরকে ওসীলা করে আল্লাহর দরবারে দোয়া করা জায়েজ। দুর্ভিক্ষের সময় হযরত ওমর (রা.) হযরত আব্বাস (রা.)-কে ওয়াসীলা করে বৃষ্টির জন্য দোয়া করেছিলেন এবং আল্লাহ তা'আলা সে দোয়া কবুল করেছিলেন। হাদীসে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বয়ং জনৈক অন্ধ সাহাবীকে এভাবে দোয়া করতে বলেছিলেন : اَللّٰهُمَّ اِنِّىْٓ اَسْئَلُكَ وَاَتَوَجَّهُ اِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ نَبِىِّ الرَّحْمَةِ অর্থাৎ, আল্লাহ! আমি রহমতের নবী মুহাম্মদের অসিলায় তোমার কাছে প্রার্থনা করছি। –[মানার]

শব্দ বিশ্লেষণ

يُصَلَّبُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ فعل مضارع مجهول বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلصَّلْبُ মূলবর্ণ (ص ـ ل ـ ب) জিনস صحيح অর্থ– তাদের শূলিবিদ্ধ করা হবে।

يُنْفَوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ فعل مضارع مجهول বাব ضَرَبَ মাসদার اَلنَّفْىُ মূলবর্ণ (ن ـ ف ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– তাদেরকে দেশান্তর করা হবে। তাদেরকে কয়েদ করা হবে।

اِبْتَغُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِبْتِغَاءُ মূলবর্ণ (ب ـ غ ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– তোমরা নৈকট্য অর্জন কর।

عَذَابٌ : শব্দটি একবচন, বহুবচন اَعْذِبَةٌ অর্থ– শাস্তি।

يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّخْرُجُوْا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِخٰرِجِيْنَ مِنْهَا ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيْمٌ (٣٧)

অনুবাদ : (৩৭) তারা তো কামনা করবে যে, দোজখ হতে বের হয়ে যায় অথচ তারা তা হতে কখনো বের হতে পারবে না বস্তুত তাদের শাস্তি চিরস্থায়ী হবে।

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْٓا اَيْدِيَهُمَا جَزَآءًۢ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ (٣٨)

(৩৮) আর যে পুরুষ চুরি করে এবং যে নারী চুরি করে, তবে তাদের উভয়ের [ডান] হাত কেটে ফেল, তাদের কৃতকর্মের বিনিময়ে আল্লাহর পক্ষ হতে শাস্তিস্বরূপ, আর আল্লাহ অতিশয় ক্ষমাশীল, মহা প্রজ্ঞাময়।

فَمَنْ تَابَ مِنْۢ بَعْدِ ظُلْمِهٖ وَاَصْلَحَ فَاِنَّ اللّٰهَ يَتُوْبُ عَلَيْهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ (٣٩)

(৩৯) অনন্তর যে ব্যক্তি এই সীমালঙ্ঘন [অর্থাৎ চুরি] করার পর তওবা করে নেয় এবং আমলকে সংশোধন করে নেয়, তবে নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তার প্রতি [অনুগ্রহের] দৃষ্টি করবেন, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা পরম ক্ষমাশীল, অতি দয়ালু।

اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ يُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ (٤٠)

(৪০) তুমি কি জান না যে, আল্লাহরই জন্য রয়েছে আধিপত্য আসমানসমূহের এবং জমিনের, তিনি যাকে ইচ্ছা শাস্তি প্রদান করেন এবং যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করে দেন, আর আল্লাহ তা'আলা সকল বিষয়ের উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান।

শাব্দিক অনুবাদ

(৩৭) يُرِيْدُوْنَ তারা তো কামনা করবে যে اَنْ يَّخْرُجُوْا مِنَ النَّارِ দোজখ হতে বের হয়ে যায় وَمَا هُمْ بِخٰرِجِيْنَ مِنْهَا অথচ তারা তা হতে কখনো বের হতে পারবে না وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيْمٌ বস্তুত তাদের শাস্তি চিরস্থায়ী হবে।

(৩৮) وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ আর যে পুরুষ চুরি করে এবং যে নারী চুরি করে فَاقْطَعُوْٓا اَيْدِيَهُمَا তবে তাদের উভয়ের হাত কেটে ফেল جَزَآءًۢ بِمَا كَسَبَا তাদের কৃতকর্মের বিনিময়ে نَكَالًا مِّنَ اللّٰهِ আল্লাহর পক্ষ হতে শাস্তিস্বরূপ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ আর আল্লাহ অতিশয় ক্ষমাশীল, মহা প্রজ্ঞাময়।

(৩৯) فَمَنْ تَابَ অনন্তর যে ব্যক্তি তওবা করে নেয় مِنْۢ بَعْدِ ظُلْمِهٖ এই সীমালঙ্ঘন করার পর وَاَصْلَحَ এবং আমলকে সংশোধন করে নেয় فَاِنَّ اللّٰهَ يَتُوْبُ عَلَيْهِ তবে নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তার প্রতি দৃষ্টি করবেন اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা পরম ক্ষমাশীল, অতি দয়ালু।

(৪০) اَلَمْ تَعْلَمْ তুমি কি জান না যে اَنَّ اللّٰهَ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ আল্লাহরই জন্য রয়েছে আধিপত্য আসমানসমূহের এবং জমিনের يُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ তিনি যাকে ইচ্ছা শাস্তি প্রদান করেন وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ এবং যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করে দেন وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ আর আল্লাহ তা'আলা সকল বিষয়ের উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান।

www.almodina.com

يَاَيُّهَا الرَّسُوْلُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِيْنَ يُسَارِعُوْنَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اٰمَنَّا بِاَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوْبُهُمْ ۛ وَمِنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا ۛ سَمّٰعُوْنَ لِلْكَذِبِ سَمّٰعُوْنَ لِقَوْمٍ اٰخَرِيْنَ ۙ لَمْ يَاْتُوْكَ ۭ يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ مِنْۢ بَعْدِ مَوَاضِعِهٖ ۚ يَقُوْلُوْنَ اِنْ اُوْتِيْتُمْ هٰذَا فَخُذُوْهُ وَاِنْ لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوْا ۭ وَمَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ فِتْنَتَهٗ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهٗ مِنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا ۭ اُولٰۗىِٕكَ الَّذِيْنَ لَمْ يُرِدِ اللّٰهُ اَنْ يُّطَهِّرَ قُلُوْبَهُمْ ۭ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ ۖ وَّلَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ (٤١)

অনুবাদ : (৪১) হে রাসূল! যারা দৌড়ে দৌড়ে কুফরিতে পতিত হয় [তাদের এই কর্ম] যেন আপনাকে চিন্তিত না করে, চাই তারা সেই সমস্ত লোকের মধ্য হতেই হোক যারা নিজেদের মুখেতো [মিছামিছি] বলে আমরা ঈমান এনেছি অথচ তাদের অন্তর বিশ্বাস করে নি, অথবা তারা সেই সমস্ত লোকের মধ্য হতেই হোক যারা ইহুদি, তারা অসত্য কথা শুনতে অভ্যস্ত, তারা আপনার কথাগুলো অন্য সম্প্রদায়ের জন্য কান পেতে শ্রবণ করে, সে সম্প্রদায়ের অবস্থা এরূপ যে, তারা আপনার নিকট আসেনি, [বরং অন্যকে পাঠিয়েছে] তারা কালমাকে তার স্বস্থান হতে পরিবর্তন করে থাকে, বলে, যদি তোমরা [তথায় যেয়ে] এই [বিকৃত] বিধান পাও, তবে তো তা কবুল করবে, আর যদি তোমরা এই [বিকৃত] বিধান না পাও, তবে বেঁচে থাকবে, আর যার অমঙ্গল [গোমরাহী] আল্লাহর মঞ্জুর হয়, বস্তুতঃ তার জন্য আল্লাহ তা'আলার সাথে তোমার কোনো জোর চলতে পারে না এরা এরূপ যে, তাদের অন্তরগুলো পবিত্র করা আল্লাহর অভিপ্রেত নয়, এদের জন্য ইহলোকে রয়েছে অপমান এবং পরলোকে [ও] এদের জন্য রয়েছে ভীষণ শাস্তি ।

শাব্দিক অনুবাদ

(৪১) يَاَيُّهَا الرَّسُوْلُ হে রাসূল! لَا يَحْزُنْكَ আপনাকে যেন চিন্তিত না করে [তাদের এই কর্ম] الَّذِيْنَ يُسَارِعُوْنَ فِي الْكُفْرِ যারা দৌড়ে দৌড়ে কুফরিতে পতিত হয়। مِنَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا চাই এরা সে সমস্ত লোকের মধ্য হতেই হোক যারা বলে اٰمَنَّا আমরা ঈমান এনেছি بِاَفْوَاهِهِمْ নিজেদের মুখে وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوْبُهُمْ অথচ তাদের অন্তর বিশ্বাস করে নি وَمِنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا অথবা এরা সে সমস্ত লোকের মধ্য হতেই হোক যারা ইহুদি سَمّٰعُوْنَ لِلْكَذِبِ এরা অসত্য কথা শুনতে অভ্যস্ত سَمّٰعُوْنَ لِقَوْمٍ اٰخَرِيْنَ এরা আপনার কথাগুলো অন্য সম্প্রদায়ের জন্য কান পেতে শ্রবণ করে لَمْ يَاْتُوْكَ যে সম্প্রদায়ের অবস্থা এরূপ যে, তারা আপনার নিকট আসেনি, يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ তারা কালমাকে পরিবর্তন করে থাকে مِنْۢ بَعْدِ مَوَاضِعِهٖ তার স্বস্থান হতে يَقُوْلُوْنَ বলে اِنْ اُوْتِيْتُمْ هٰذَا যদি তোমরা এই বিধান পাও فَخُذُوْهُ তবে তা কবুল করবে وَاِنْ لَّمْ تُؤْتَوْهُ আর যদি তোমরা এই [বিকৃত] বিধান না পাও। فَاحْذَرُوْا তবে বেঁচে থাকবে وَمَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ فِتْنَتَهٗ আর যার অমঙ্গল [গোমরাহী] আল্লাহর মঞ্জুর হয় فَلَنْ تَمْلِكَ لَهٗ مِنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا বস্তুতঃ তার জন্য আল্লাহ তা'আলার সাথে তোমার কোনো জোর চলতে পারে না اُولٰۗىِٕكَ الَّذِيْنَ এরা এরূপ যে لَمْ يُرِدِ اللّٰهُ আল্লাহর অভিপ্রেত নয় اَنْ يُّطَهِّرَ قُلُوْبَهُمْ তাদের অন্তরগুলো পবিত্র করা لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ এদের জন্য ইহলোকে রয়েছে অপমান وَّلَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ এবং পরলোকে এদের জন্য রয়েছে ভীষণ শাস্তি ।

www.almodina.com

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

৩৮. قوله وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** আলোচ্য আয়াত তু'মা বিন উবাইরিক সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। তু'মা বিন উবাইরিকের বিস্তারিত বিবরণ সূরায়ে নিসার ১০৫ নং আয়াত হতে ১১৬ নং আয়াতের আওতাধীন বর্ণিত হয়েছে। সেখানেই দেখে নেওয়া সমীচীন হবে। তবে মোদ্দাকথা হলো আলোচ্য আয়াতে ইসলামি দণ্ড বিধির মধ্যে কেউ চুরি করলে কি শাস্তি প্রদান করা হবে এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত কি বিধান রয়েছে যার দ্বারা সমাজের লোকেরা নিরাপদভাবে জীবন যাপন করতে পারবে, সে দণ্ডবিধি বর্ণনা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে নারী পুরুষ সকলই সমান শাস্তি যোগ্য। –[মা'আরেফুল নুযূল : ৩৮৯/১]

৩৯. قوله فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** ইবনে জারীর আব্দুল্লাহ বিন আমর (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, এক মহিলা গহনা চুরি করে, সুতরাং যাদের থেকে চুরি করেছে তারা রাসূল ﷺ-এর নিকট গিয়ে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! এ মহিলা আমাদের থেকে চুরি করেছে। রাসূল ﷺ বললেন, তার ডান হাত কেটে ফেল। তখন মহিলা বলল, আমার জন্য কি তওবা রয়েছে? রাসূল ﷺ বললেন, তুমি আজকের দিনে তেমনভাবে নিষ্পাপ যেমনভাবে তুমি তোমার মায়ের গর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হলে। তখন আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[ইবনে কাছীর : ৫৮/২, ফাতহুল কাদীর : ৪০/২]

৪১. قوله يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ الخ **আয়াতের শানে নুযূল– ১ :** আল্লামা কুরতুবী (র.) বলেন যে, আলোচ্য আয়াতের শানে নুযূলের মাঝে তিনটি মতামত রয়েছে। ১. আলোচ্য আয়াত বনূ নজির ও বনূ কুরাইযা দু'টি গোত্র সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। বনূ নজিরের লোকজন যখন বনূ কুরাইযাদের একজনকে হত্যা করে, তখন বনূ নজির বনূ কুরাইযাকে রক্তঋণ পরিশোধ করেছে। সুতরাং সে মকদ্দমা নিয়ে রাসূলে কারীম ﷺ-এর নিকট তারা হাজির হয়। রাসূল ﷺ কুরাইযা ও নাযীরদের মাঝে একই ধরনের ফয়সালা করে দিলেন। এ ফয়সালা তাদের নিকট অপছন্দনীয় হলো বিধায় তারা এ ফয়সালা গ্রহণ করেননি। সে সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে।

শানে নুযূল– ২ : কারো মতে দু'ইহুদিদের ব্যভিচার জেনা সংক্রান্ত বিষয়ে এবং রজম ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। যাকে বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, আবূ দাউদ গ্রন্থসমূহে হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রা.) হতে বর্ণনা করা হয়েছে। রাসূল ﷺ-এর নিকট যখন ইহুদিরা জেনার বিচার নিয়ে আসল, তখন রাসূল ﷺ তাদেরকে বললেন, তোমাদের মধ্য থেকে প্রবীণ দু'জন আলেম নিয়ে আস। সুতরাং তারা সুরীয়ার দুপুত্রকে নিয়ে এলো। রাসূল ﷺ তাদের কসম দিয়ে বললেন যে, তোমরা দু'জন তাওরাত কিতাবে এ সম্পর্কে কি বিধান পেয়েছ? তারা বলল, আমরা তাওরাতে যা পেয়েছি, তাহলো চারজন সাক্ষি যখন এই মর্মে সাক্ষ্য দিবে যে, তারা পুরুষের লিঙ্গকে মহিলার লিঙ্গে সুরমাদানীর মাঝে সুরমার সলাকার ন্যায় মিলিত অবস্থায় দেখতে পেয়েছে, তখন তাদের উভয় জনকে রজম শাস্তি প্রদান করা হবে। রাসূল ﷺ বললেন যে, তাদেরকে রজম শাস্তি প্রদান করতে তোমাদের বাধা কিসের? তারা বলল, আমাদের অভিজাত লোকেরা যখন এ অপকর্মে লিপ্ত হলো, তখন আমরা তাদেরকে হত্যা করতে লজ্জা বোধ করি। তখন রাসূল ﷺ সাক্ষীদেরকে ডাকলেন। সুতরাং তারা এসে সাক্ষী দিল যে, তারা পুরুষের লিঙ্গকে মহিলার লিঙ্গে সুরমাদানীর মধ্যে সলাকার ন্যায় মিলিতাবস্থায় দেখতে পেয়েছে। সাক্ষীগণের সাক্ষী দেওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে নবী করীম ﷺ তাদের উভয় জনকে রজম শাস্তি প্রদান করার নির্দেশ দেন। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

শানে নুযূল– ৩ : এক ইহুদিকে নবী করীম ﷺ-এর সামনে দিয়ে চেহারায় কালি লাগানো অবস্থায় এবং জুতা পেটা অবস্থায় নিয়ে যাওয়া হলো। রাসূল ﷺ তাদেরকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের কিতাবে ব্যভিচারীদের শাস্তি এরূপই পেয়েছ কি? তারা বলল, হ্যাঁ। তখন রাসূল ﷺ তাদের আলেমদের থেকে একজনকে ডেকে জিজ্ঞেস করেন, যে আল্লাহ হযরত মূসা (আ.)-এর প্রতি তাওরাত অবতরণ করেছেন, সে আল্লাহর শপথ দিয়ে বলছি, তোমাদের কিতাবে

জেনাকারীদের শাস্তি এরূপই কি পেয়েছ? সে বলল না। আপনি যদি আমাকে কসম না দিতেন, তাহলে আপনাকে এ সম্পর্কে তথ্য প্রদান করতাম না। আমরা তাদের ব্যাপারে রজমের শাস্তি পেয়েছি। তবে আমাদের অভিজাতদেরকে ধরতে পারলে তাদেরকে ছেড়ে দেই। আর নিম্ন শ্রেণির লোকদেরকে পেলে তাদের উপর হদ কায়েম করি। রাসূল ﷺ বললেন, আস আমরা একটি বিষয়ে একমত হয়ে উচ্চ ও নিম্নবর্ণ সমভাবে সকলের উপর এ বিধান প্রয়োগ করি। তাহলো রজমের স্থলে কালি লেপা ও জুতা পেটাই সবার উপর প্রয়োগ করি। সুতরাং রাসূল ﷺ বলেন : اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَوَّلُ مَنْ اَحْيَا اَمْرَكَ اِذَا اَمَاتُوْهُ "হে আল্লাহ! আমিই প্রথম ব্যক্তি, যে তোমার বিধানকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছি। তারা তাকে বিলুপ্ত করে দেওয়ার পর।" অতঃপর রাসূল ﷺ রজম শাস্তি প্রদান করার হুকুম দেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[কুরতুবী :১৬৮/৬, ইবনে কাছীর : ৬০/২]

قوله يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّخْرُجُوْا الخ এ সম্পর্কে প্রথমে দেখা দরকার যে, কুরআন পাক মাত্র চারটি অপরাধের শাস্তি স্বয়ং নির্দিষ্ট ও নির্ধারিত করেছে। শরিয়তের পরিভাষায় এগুলোকে 'হদ' বলা হয়। ডাকাতির শাস্তি ডান হাত বা বাম পা কর্তন করা, চুরির শাস্তি ডান হাত গিঠ থেকে কর্তন করা, ব্যভিচারের শাস্তি কোনা কোনো অবস্থায় একশ' বেত্রাঘাত এবং কোনো কোনো অবস্থায় প্রস্তর নিক্ষেপে হত্যা করা এবং ব্যভিচারের মিথ্যা অপবাদ আরোপের শাস্তি আশিটি বেত্রাঘাত। পঞ্চম 'হদ' মদ্যপানের শাস্তি সাহাবীদের ঐকমত্যে আশিটি বেত্রাঘাত নির্ধারিত হয়েছে। এ পাঁচটি ছাড়া সব অপরাধের সাজা বিচারকের বিবেচনাধীন; তিনি অপরাধ, অপরাধী এবং পরিবেশের প্রতি লক্ষ্য রেখে যেরূপ ও যতটুকু শাস্তি উপযুক্ত মনে করবেন, দিবেন। এ ব্যাপারে জ্ঞানী ও বুদ্ধিজীবিদের পরামর্শক্রমে শাস্তির সীমা নির্ধারণের বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করে বিচারকদেরকে তা মেনে চলতে বাধ্য করাও জায়েজ। যেমন, আজকাল এসেম্বলীর মাধ্যমে দণ্ডবিধি নির্ধারণ করা হয় এবং বিচারক ও জজগণ নির্ধারিত দণ্ডবিধির অধীনে মামলা-মকদ্দমায় রায় দেন। তবে কুরআন ও ইজমা দ্বারা নির্ধারিত উপরিউক্ত পাঁচটি অপরাধের শাস্তি পরিবর্তন করার ক্ষমতা কোনো ব্যক্তি, গোষ্ঠী অথবা এসেম্বলীর নেই। কিন্তু এ পাঁচটির ক্ষেত্রেও যদি শরিয়তের নির্ধারিত সাক্ষ্য-প্রমাণ দ্বারা অপরাধ প্রমাণিত না হয় কিংবা অপরাধ প্রমাণিত হওয়ার পর যেসব শর্তের অধীনে 'হদ' জারি করা হয়, সেগুলো পূরণ না হয়, তবে হদ জারি করা হবে না; বরং অন্য কোনো দণ্ড দেওয়া হবে। এতদসঙ্গে এ নীতিটিও স্বীকৃত যে, সন্দেহের সুযোগ অপরাধীরা ভোগ করতে পারবে। অপরাধ প্রমাণে কিংবা অপরাধের শর্তাবলির মধ্য থেকে কোনো একটিতে সন্দেহ দেখা দিলে হদ অব্যবহার্য হয়ে যায়। এক্ষেত্রে শুধু অপরাধ প্রমাণিত হলেই সাধারণ দণ্ড দেওয়া হবে।

এতে বুঝা গেল যে, উপরিউক্ত পাঁচটি অপরাধের মধ্যে অনেক অবস্থায় হদ প্রয়োগ করা যাবে না; বরং বিচারকের বিবেচনা অনুযায়ী সাধারণ দণ্ডই দেওয়া হবে। সাধারণ দণ্ড শরিয়ত নির্ধারণ করেনি। কাল ও পরিববেশ অনুযায়ী বিভিন্ন দেশে প্রচলিত সাধারণ আইনের অনুরূপ এগুলো পরিবর্তন ও কমবেশি করা যায়। কাজেই এগুলোর ব্যাপারে কারো আপত্তি করার অবকাশ নেই। এখন আলোচ্য বিষয় থেকে যাবে শুধু এ পাঁচটি অপরাধের শাস্তি এবং এগুলোর বিশেষ বিশেষ অবস্থা। উদাহরণত চুরিই ধরুন এবং দেখুন যে, ইসলামে হস্ত কর্তনের শাস্তি সব চুরির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়; বরং যে চুরির কারণে চোরের হাত কাটা হয়, তার একটা বিশেষ সংজ্ঞা আছে। এর ব্যাখ্যা পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, অন্যের মাল হেফাজতের জায়গা থেকে বিনানুমতিতে গোপনে নিয়ে যাওয়াকেই সংজ্ঞাদৃষ্টে ও সাধারণ পরিভাষায় চুরি বলা হয়।

আলোচ্য তিনটি আয়াত এবং তৎপরবর্তী কতিপয় আয়াত যেসব কারণ ও ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয় তার বিস্তারিত বিবরণ পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রাচীনকাল থেকেই ইহুদিরা কখনো স্বজন প্রীতির বশবর্তী হয়ে এবং কখনো নাম-যশ ও অর্থের লোভে ফতোয়া প্রার্থীদের মনমতো ফতোয়া তৈরি করে দিত। বিশেষতঃ অপরাধের শাস্তির ক্ষেত্রে এটিই ছিল তাদের সাধারণ প্রচলিত পদ্ধতি। কোনো বড়লোক অপরাধ করলে তারা তাওরাতের গুরুতর শাস্তি লঘু শাস্তিতে পরিবর্তন করে দিত। তাদের এ অবস্থাটিই আয়াতে এ বাক্যে প্রকাশ করা হয়েছে–

يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ مِنْۢ بَعْدِ مَوَاضِعِهٖ রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন মদিনায় হিজরত করলেন এবং ইসলামের অভূতপূর্ব জীবন ব্যবস্থা ইহুদিদের সামনে এল, তখন তারা একে একটি সুযোগ হিসেবে ব্যবহার করতে চাইল। ইসলামি জীবন ব্যবস্থায় একদিকে

www.almodina.com

যেমন অনেক নমনীয়তা ছিল, অন্যদিকে তেমনি অপরাধ দমনের জন্য একটি যুক্তিযুক্ত বিধি-ব্যবস্থাও ছিল। যেসব ইহুদি তাওরাতের কঠোর শাস্তিসমূহকে পরিবর্তন করে সহজ করে নিত, তারা এ জাতীয় মকদ্দমায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বিচারক নিযুক্ত করতে প্রয়াস পেত, যাতে একদিকে ইসলামের সহজ ও নরম বিধি বিধান দ্বারা উপকৃত হওয়া যায় এবং অন্যদিকে তাওরাত পরিবর্তন করার অপরাধ থেকেও অব্যাহতি পাওয়া যায়। কিন্তু এ ব্যাপারেও তারা একটি দুষ্কৃতির আশ্রয় নিত। তা এই যে, নিয়মিত বিচারক নিযুক্ত করার পূর্বে কোনো না কোনো পন্থায় মকদ্দমার রায় ফতোয়া হিসেবে জেনে নিতে চাইত। উদ্দেশ্য, এ রায় তাদের আকাঙ্ক্ষিত রায়ের অনুরূপ হলে বিচারক নিযুক্ত করবে, অন্যথা নয়। এ সম্পর্কে যেসব ঘটনা বর্ণিত হয়েছে, তাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ যথেষ্ট মর্মপীড়া অনুভব করেছিলেন। তাই আয়াতের প্রারম্ভেই তাঁকে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে যে, এতে আপনি দুঃখিত হবেন না। এর পরিণাম আপনার জন্য শুভই হবে।

শব্দ বিশ্লেষণ

سَمّٰعُوْنَ : শব্দটি سَمَّاعٌ এর বহুবচন, অর্থ– যে বা যারা কান লাগিয়ে শুনে, গোয়েন্দা।

يُحَرِّفُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّحْرِيْفُ মূলবর্ণ (ح . ر . ف) জিনস صحيح অর্থ– তারা পরিবর্তন করে দেয়।

يُطَهِّرُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّطْهِيْرُ মূলবর্ণ (ط . ه . ر) জিনস صحيح অর্থ– সে পবিত্র করে দেয়।

www.almodina.com

سَمّٰعُوْنَ لِلْكَذِبِ اَكّٰلُوْنَ لِلسُّحْتِ ۚ فَاِنْ جَآءُوْكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ اَوْ اَعْرِضْ عَنْهُمْ ۚ وَاِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَّضُرُّوْكَ شَيْـًٔا ۚ وَاِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ ۚ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ (٤٢)	অনুবাদ : (৪২) তারা অসত্য কথা শ্রবণ করতে অভ্যস্ত, হারাম বস্তু ভক্ষণ করতে অভ্যস্ত, অতএব, তারা যদি আপনার নিকট আসে, তবে চাই আপনি তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেন কিংবা তাদের হতে বিরত থাকেন, আর যদি আপনি তাদের হতে বিরতই থাকেন, তবে তাদের সাধ্য নেই যে, আপনার বিন্দুমাত্রও ক্ষতি করে, আর যদি আপনি মীমাংসা করেন, তবে তাদের মধ্যে ন্যায়তঃ মীমাংসা করবেন, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা ন্যায় বিচারকদেরকে ভালোবাসেন।
وَكَيْفَ يُحَكِّمُوْنَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرٰىةُ فِيْهَا حُكْمُ اللّٰهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ ۚ وَمَآ اُولٰٓئِكَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ (٤٣)	(৪৩) আর তারা আপনার দ্বারা কিরূপে মীমাংসা করছে? অথচ তাদের নিকট তাওরাত রয়েছে, যাতে আল্লাহর বিধান বিদ্যমান, অতঃপর তারা তার পর [আপনার মীমাংসা হতে] ফিরে যায়, আর তারা কখনো আস্থাবান নয়।
اِنَّآ اَنْزَلْنَا التَّوْرٰىةَ فِيْهَا هُدًى وَّنُوْرٌ ۚ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّوْنَ الَّذِيْنَ اَسْلَمُوْا لِلَّذِيْنَ هَادُوْا وَالرَّبّٰنِيُّوْنَ وَالْاَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوْا مِنْ كِتٰبِ اللّٰهِ وَكَانُوْا عَلَيْهِ شُهَدَآءَ ۚ	(৪৪) আমি তাওরাত নাজিল করেছিলাম যাতে [সুষ্ঠু আকায়েদের] হেদায়েত ছিল এবং [আনুষ্ঠানিক বিধানাবলির] আলো ছিল, নবীগণ যাঁরা আল্লাহ তা'আলার অনুগত ছিলেন, তাঁরা তদনুযায়ী ইহুদিদেরকে আদেশ করতেন আর আল্লাহওয়ালাগণও এবং আলেমগণও, এই নিমিত্ত যে, তাদেরকে এই কিতাবুল্লাহর সংরক্ষণের আদেশ দেওয়া হয়েছে, এবং তাঁরা তা স্বীকারও করেছেন,

শাব্দিক অনুবাদ

(৪২) سَمّٰعُوْنَ لِلْكَذِبِ তারা অসত্য কথা শ্রবণ করতে অভ্যস্ত اَكّٰلُوْنَ لِلسُّحْتِ হারাম বস্তু ভক্ষণ করতে অভ্যস্ত فَاِنْ جَآءُوْكَ অতএব, তারা যদি আপনার নিকট আসে فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ তবে চাই আপনি তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেন اَوْ اَعْرِضْ عَنْهُمْ কিংবা তাদের হতে বিরত থাকেন وَاِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ আর যদি আপনি তাদের হতে বিরতই থাকেন فَلَنْ يَّضُرُّوْكَ شَيْـًٔا তবে তাদের সাধ্য নেই যে, আপনার বিন্দুমাত্রও ক্ষতি করে وَاِنْ حَكَمْتَ আর যদি আপনি মীমাংসা করেন فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ তবে তাদের মধ্যে ন্যায়তঃ মীমাংসা করবেন اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা ন্যায় বিচারকরদেকে ভালোবাসেন।

(৪৩) وَكَيْفَ يُحَكِّمُوْنَكَ আর তারা আপনার দ্বারা কিরূপে মীমাংসা করছে? وَعِنْدَهُمُ التَّوْرٰىةُ অথচ তাদের নিকট তাওরাত রয়েছে فِيْهَا حُكْمُ اللّٰهِ যাতে আল্লাহর বিধান বিদ্যমান ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ অতঃপর তারা তার পর ফিরে যায় وَمَآ اُولٰٓئِكَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ আর তারা কখনো আস্থাবান নয়।

(৪৪) اِنَّآ اَنْزَلْنَا التَّوْرٰىةَ আমি তাওরাত নাজিল করেছিলাম فِيْهَا هُدًى وَّنُوْرٌ যাতে হেদায়েত ছিল এবং আলো ছিল يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّوْنَ নবীগণ তদনুযায়ী আদেশ করতেন। الَّذِيْنَ اَسْلَمُوْا যাঁরা আল্লাহ তা'আলার অনুগত ছিলেন। لِلَّذِيْنَ هَادُوْا তাঁরা ইহুদিদেরকে وَالرَّبّٰنِيُّوْنَ আর আল্লাহওয়ালাগণও وَالْاَحْبَارُ এবং আলেমগণও بِمَا اسْتُحْفِظُوْا مِنْ كِتٰبِ اللّٰهِ এই নিমিত্ত যে, তাদেরকে এই কিতাবুল্লাহর সংরক্ষণের আদেশ দেওয়া হয়েছে وَكَانُوْا عَلَيْهِ شُهَدَآءَ এবং তাঁরা তা স্বীকারও করেছেন

فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوا بِاٰيٰتِيْ ثَمَنًا قَلِيْلًا ؕ وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ (٤٤)

অনুবাদ : সুতরাং [হে ইহুদি আলেমগণ,] তোমরাও মানুষকে ভয় করো না, আর আমাকে ভয় কর, আর আমার বিধানসমূহের বিনিময়ে [পার্থিব] সামান্য বস্তু গ্রহণ করো না, আর যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার অবতারিত [বিধান] অনুযায়ী হুকুম না করে, [এবং ইচ্ছাকৃত মনগড়া বিষয়বস্তুকে ধর্মীয় বিধান বলে আদেশ করে,] তবে এমন লোক তো পূর্ণ কাফের।

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيْهَاۤ اَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ۙ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْاَنْفَ بِالْاَنْفِ وَالْاُذُنَ بِالْاُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ ۙ وَالْجُرُوْحَ قِصَاصٌ ؕ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهٖ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهٗ ؕ وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ (٤٥)

(৪৫) আর আমি তাদের প্রতি তাতে [অর্থাৎ তাওরাতে] তা ফরজ করেছিলাম যে, প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ এবং চক্ষুর বিনিময়ে চক্ষু, এবং নাকের বিনিময়ে নাক, এবং কানের বিনিময়ে কান এবং দাঁতের বিনিময়ে দাঁত, এবং [তদ্রূপ অন্যান্য] বিশেষ জখমেরও বিনিময় রয়েছে, অনন্তর যে ব্যক্তি তাকে ক্ষমা করে দেয় তবে তা তার জন্য [গুনাহর] কাফফারা হয়ে যাবে, আর যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার অবতারিত বিধান অনুযায়ী হুকুম না করে, তবে তো এমন লোক পূর্ণ জালেম।

শাব্দিক অনুবাদ

فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ সুতরাং তোমরাও মানুষকে ভয় করো না وَاخْشَوْنِ আর আমাকে ভয় কর وَلَا تَشْتَرُوا আর গ্রহণ করো না بِاٰيٰتِيْ আমার বিধানসমূহের বিনিময়ে ثَمَنًا قَلِيْلًا সামান্য বস্তু وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ আর যে ব্যক্তি হুকুম না করে بِمَاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ আল্লাহ তা'আলার অবতারিত [বিধান] অনুযায়ী فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ তবে এমন লোক তো পূর্ণ কাফের।

(৪৫) وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيْهَاۤ আর আমি তাদের প্রতি তাতে তা ফরজ করেছিলাম যে اَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ এবং চক্ষুর বিনিময়ে চক্ষু وَالْاَنْفَ بِالْاَنْفِ এবং নাকের বিনিময়ে নাক وَالْاُذُنَ بِالْاُذُنِ এবং কানের বিনিময়ে কান وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ এবং দাঁতের বিনিময়ে দাঁত وَالْجُرُوْحَ قِصَاصٌ এবং বিশেষ জখমেরও বিনিময় রয়েছে فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهٖ অনন্তর যে ব্যক্তি তাকে ক্ষমা করে দেয় فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهٗ তবে তা তার জন্য কাফফারা হয়ে যাবে وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ আর যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার অবতারিত বিধান অনুযায়ী হুকুম না করে فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ তবে তো এমন লোক পূর্ণ জালেম।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(৪২) قوله وَاِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ **আয়াতের শানে নুযূল :** নাসায়ী শরীফ প্রণেতা হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন : তিনি বলেন, বনূ কুরাইযা ও বনূ নজির দু'টি গোত্র ছিল। বনূ নজির বনূ কুরাইযা হতে অধিক মর্যাদার অধিকারী ছিল। সুতরাং বনূ কুরাইযার কেউ বনূ নজিরের কাউকে যদি হত্যা করত, তাহলে তার বিনিময় কেসাস তথা হত্যার বদলে হত্যা করা হতো। আর বনূ নজিরের কেউ যদি বনূ কুরাইযার কাউকে হত্যা করত, তাহলে ১০০ অসক (৬০ সা') খেজুর দিয়ত বা রক্তপণ হিসেবে প্রদান করা হতো। রাসূল ﷺ যখন নবী হিসেবে প্রেরিত হলেন, তখন বনূ নজিরের এক ব্যক্তি বনূ কুরাইযার এক ব্যক্তিকে হত্যা করল। ফলে তারা

দাবি করল যে, তাকে আমাদের হাতে অর্পন করে দাও, আমরা তাকে হত্যা করব। তখন তারা বলল, আমাদের মধ্যে এবং তোমাদের মধ্যে নবী বিদ্যমান রয়েছেন। এহেন পরিপ্রেক্ষিতে وَاِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ অংশটি নাজিল হয়েছে। –[কুরতুবী : ১৭৮/৬]

অতঃপর আয়াতে অবহিত করে দেওয়া হয়েছে যে, তারা আন্তরিকতার সাথে আপনাকে বিচারক নিযুক্ত করছে না। তাদের নিয়তে গোলমাল রয়েছে। পরবর্তী আয়াতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে ক্ষমতা দিয়ে বলা হয়েছে যে, আপনি ইচ্ছা করলে তাদের মকদ্দমায় ফয়সালা করুন, নতুবা নির্লিপ্ত থাকুন। আরো বলা হয়েছে যে, আপনি যদি নির্লিপ্ত থাকতে চান, তবে তারা আপনার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ اَوْ اَعْرِضْ عَنْهُمْ আয়াতের বিষয়বস্তুও তাই। পরের আয়াতে বলা হয়েছে যদি আপনি ফয়সালাই করতে চান, তবে ইনসাফ ও ন্যায়বিচার সহকারে ফয়সালা করুন। অর্থাৎ, নিজ শরিয়ত অনুযায়ী ফয়সালা করুন। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নবী হওয়ার পর পূর্ববর্তী সব শরিয়ত রহিত হয়ে গেছে। কুরআনে যেসব আইন বহাল রাখা হয়েছে, সেগুলো অবশ্য রহিত হয়নি। তাই পরবর্তী আয়াতে আল্লাহর আইনের বিরুদ্ধে অন্য কোনো আইন, প্রথা ও প্রচলনের অধীনে মকদ্দমার রায় প্রদান করাকে অন্যায়, পাপাচার ও কুফর বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

ইসলামি রাষ্ট্রের অমুসলিমদের মকদ্দমার বিধি : এখানে স্মর্তব্য যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর আদালতে মকদ্দমা দায়েরকারী ইহুদিরা, ইসলামে বিশ্বাসী ছিল না এবং মুসলমানদের অধীনস্থ জিম্মিও ছিল না। তবে তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে যে, ইচ্ছা করলে তাদের ব্যাপারে নির্লিপ্ত থাকুন এবং ইচ্ছা করলে তাদের মকদ্দমার শরিয়তানুযায়ী ফয়সালা করুন। কেননা তাদের ব্যাপারে ইসলামি রাষ্ট্রের কোনো দায়িত্ব ছিল না। তারা জিম্মি হলে এবং ইসলামি আদালতে মকদ্দমা দায়ের করলে তার ফয়সালা করা মুসলিম বিচারকের দায়িত্বে ফরজ হতো; নির্লিপ্ত থাকা জায়েজ হতো না। কেননা তাদের অধিকারের দেখাশুনা করা এবং অত্যাচার থেকে রক্ষা করা ইসলামি রাষ্ট্রের দায়িত্ব। এ ক্ষেত্রে মুসলমান ও জিম্মির মধ্যে কোনো তফাৎ নেই; তাই পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে যে, وَاَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَهُمْ অর্থাৎ তারা আপনার কাছে মকদ্দমা নিয়ে আসলে আপনি তার ফয়সালা শরিয়ত অনুযায়ী করে দিন।

এ আয়াতে ক্ষমতা দেওয়ার পরিবর্তে নির্দিষ্ট করে ফয়সালা করার আদেশ দেওয়া হয়েছে। ইমাম আবূ বকর জাসসাস (র.) আহকামুল কুরআন গ্রন্থে উভয় আয়াতের ব্যাখ্যা এভাবেই করেছেন যে, যে আয়াতে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে, তা ঐসব অমুসলিমদের সম্পর্কে, যারা আমাদের রাষ্ট্রের বাসিন্দা অথবা জিম্মি নয়; বরং নিজ দেশে বাস করে আমাদের সাথে কোনো চুক্তি করেছে মাত্র। যেমন, বনী কুরাইযা ও বনী নজিরের। আর দ্বিতীয় আয়াত ঐসব অমুসলিমদের সম্পর্কে, যারা জিম্মি এবং ইসলামি রাষ্ট্রের নাগরিক।

এখন প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, উভয় আয়াতে অমুসলিমদের মকদ্দমায় নিজ শরিয়তানুযায়ী ফয়সালা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং তাদের মনোবাঞ্ছার অনুসরণ করতে নিষেধ করা হয়েছে।

বলাবাহুল্য, এ নির্দেশ ঐসব মকদ্দমা সম্পর্কেই দেওয়া হয়েছে, যা আলোচ্য আয়াতসমূহের শানে নুযূলে বর্ণিত হয়েছে। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে হত্যার শাস্তি ও রক্ত-বিনিময়ের মকদ্দমা ও অপরটি হচ্ছে ব্যভিচার সংক্রান্ত মকদ্দমা। এ জাতীয় মকদ্দমার ক্ষেত্রে সারা বিশ্বে একই নিয়ম। অর্থাৎ সমগ্র দেশে একই আইন বলবৎ থাকে। একে সাধারণ আইন বলা হয়। সাধারন আইনে শ্রেণি অথবা ধর্মের কারণে কোনোরূপ পার্থক্য হয় না। উদাহরণত চুরির শাস্তি হস্ত কর্তন শুধু মুসলমানদের বেলায়ই প্রযোজ্য নয়; বরং দেশের যে কোনো বাসিন্দার বেলায় এ শাস্তিই প্রযোজ্য। এমনিভাবে হত্যা ও ব্যভিচারের শাস্তিও সবার বেলায় প্রযোজ্য। কিন্তু অমুসলিমদের ব্যক্তিগত ও ধর্মীয় ব্যাপারাদির ফয়সালাও যে ইসলামি আইন অনুযায়ী করতে হবে এমনটি জরুরি নয়।

স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ মদ্যপান ও শূকরের গোশত মুসলমানদের জন্য হারাম করে তার শাস্তিও নির্ধারিত করেছিলেন, কিন্তু অমুসলমানদেরকে এ ব্যাপারে স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। তিনি অমুসলমানদের বিবাহ-শাদী ইত্যাদি ব্যক্তিগত ব্যাপারে কখনো হস্তক্ষেপ করেননি। তাদের ধর্ম অনুযায়ী যে বিবাহ শুদ্ধ ছিল, তিনি তাই বহাল রেখেছিলেন।

হিজরের অগ্নি পূজারী এবং নাজরান ও ওয়াদিয়ে কুরার ইহুদি ও খ্রিস্টানরা ইসলামি রাষ্ট্রের জিম্মি ছিল। মহানবী ﷺ জানতেন যে, অগ্নি উপাসকদের ধর্মে মা ও ভাগিনীকেও বিয়ে করা হালাল। এমনিভাবে ইহুদি ও খ্রিস্টানদের ধর্মমতে ইদ্দত অতিবাহিত না করে এবং সাক্ষী ব্যতিরেকেও বিবাহ শুদ্ধ; কিন্তু তিনি কখনো তাদের ব্যক্তিগত বিষয়াদিতে হস্তক্ষেপ করেননি; বরং তাদের বিবাহ-শাদীর বৈধতা স্বীকার করে নিয়েছেন।

মোটকথা, ইসলামি রাষ্ট্রের অধিবাসী অমুসলিমদের ব্যক্তিগত ও ধর্মীয় বিষয়াদির মীমাংসা তাদেরই ধর্মমতের উপর ছেড়ে দেওয়া হবে। যদি এ সব ব্যাপারে মকদ্দমা উপস্থিত হয়, তবে তাদের ধর্মাবলম্বী বিচারক নিযুক্ত করে ফয়সালা করাতে হবে। তবে যদি তারা মুসলমান বিচারকের নিকট উপস্থিত হয়ে উভয় পক্ষ তাঁর রায় মেনে নিতে সম্মত হয়, তবে মুসলমান বিচারক ইসলামি আইন অনুযায়ী ফয়সালা করবেন। কেননা তখন তিনিই উভয় পক্ষের নিযুক্ত বিচারকরূপে গণ্য হবেন। وَاَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ আয়াতে নবী করীম ﷺ-কে ইসলামি আইন অনুযায়ী ফয়সালা করে দেওয়ার যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তার এক কারণ হয় এই যে, মকদ্দামাটিই সাধারণ আইনের– যাতে কোনো সম্প্রদায়ই আওতা বহির্ভূত নয়, অথবা এর কারণ এই যে, উভয় পক্ষ স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বিচারক স্বীকার করে ফয়সালার জন্য আসে, এমতাবস্থায় তাঁর ফয়সালা তাই হবে, যার প্রতি তাঁর ঈমান রয়েছে এবং যা তাঁর শরিয়তের নির্দেশ। মোটকথা, আলোচ্য প্রথম আয়াতে প্রথমে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে অতঃপর ইহুদিদের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করা হয়েছে। يٰٓاَيُّهَا الرَّسُوْلُ لَا يَحْزُنْكَ বাক্য থেকে আয়াতের শেষ পর্যন্ত এ বিষয়টিই বর্ণিত হয়েছে। এতে এ রহস্য উদঘাটন করা হয়েছে যে, মহানবী ﷺ-এর কাছে যে প্রতিনিধি দলটি আগমন করেছিল, তারা সবাই ছিল মুনাফিক। ইহুদিদের সাথে এদের গোপন যোগ-সাজশ রয়েছে এবং এরা তাদেরই প্রেরিত। এরপর প্রতিনিধিদলের কতিপয় বদভ্যাস বর্ণনা করে মুসলমানদের হুশিয়ার করা হয়েছে যে, এগুলো কাফেরসুলভ অভ্যাস। এগুলো থেকে আত্মরক্ষা করা উচিত।

ইহুদিদের একটি বদঅভ্যাস : سَمّٰعُوْنَ لِلْكَذِبِ অর্থাৎ তারা মিথ্যা ও ভ্রান্ত কথাবার্তা শোনাতে অভ্যস্ত। তারা আলেম বলে কথিত বিশ্বাসঘাতক ইহুদিদেরই অন্ধ অনুসারী। তাওরাতের নির্দেশাবলির প্রকাশ্য বিরুদ্ধাচরণ দেখা সত্ত্বেও তারা তাদেরই অনুসরণ করে এবং তাদের বর্ণিত মিথ্যা ও অমূলক কেচ্ছা-কাহিনীই শুনতে থাকে।

আলেমদের অনুসরণ করার বিধি : যারা তাওরাত পরিবর্তন করে এবং আল্লাহ ও রাসূলের নির্দেশাবলিতে মিথ্যা বিষয়বস্তু অন্তর্ভুক্ত করে, আয়াতে তাদেরকে লক্ষ্য করে যেমন শাস্তিবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে, তেমনি ঐসব লোককেও অপরাধী বলা হয়েছে যারা তাদেরকে অনুসরণযোগ্য সাব্যস্ত করে মিথ্যা ও ভ্রান্ত কথাবার্তা শোনায় অভ্যস্ত হয়ে গেছে। এতে মুসলমানদের জন্যও একটি মৌলিক নির্দেশ রয়েছে যে, আলেমদের কাছ থেকে ফতোয়া নেওয়ার পূর্বে তাদের যোগ্যতা সম্পর্কে খোঁজ-খবর নেওয়া দরকার। অজ্ঞ জনগণের ধর্ম-কর্ম করার একমাত্র পথ হচ্ছে আলেমদের ফতোয়া ও শিক্ষা অনুযায়ী কাজ করা। যেমন কোনো রুগ্ন ব্যক্তি ডাক্তার অথবা হাকীমের কাছে যাওয়ার পূর্বে পরিচিতদের কাছে খোঁজ নেওয়া যে, এ রোগের জন্য কোন ডাক্তার পারদর্শী, কোন হাকীম বেশি ভালো, তার কি কি ডিগ্রী আছে, তার চিকিৎসাধীন রোগীদের পরিণাম কি? যথাসম্ভব খোঁজ-খবর নেওয়ার পরও যদি সে কোনো ভ্রান্ত ডাক্তার অথবা হাকীমের ফাঁদে পড়ে যায়, তবে বিজ্ঞজনদের দৃষ্টিতে সে নিন্দার পাত্র নয়। কিন্তু যে ব্যক্তি কোনোরূপ খোঁজ-খবর না নিয়েই কোনো হাতুড়ে ডাক্তারের ফাঁদে পড়ে এবং পরিণামে অর্থ ও স্বাস্থ্য উভয়ই নষ্ট করে, বিজ্ঞজনদের মতে তার আত্মহত্যার জন্য সে নিজেই দায়ী হয়। জনগণের ধর্মকর্মের অবস্থাও তাই। যদি তারা এলাকার বিজ্ঞ ও অভিজ্ঞ লোকদের কাছ থেকে খোঁজ-খবর নিয়ে কোনো আলেমের অনুসরণ করে এবং তার ফতোয়া অনুযায়ী আমল করে, তবে তারা মানুষের কাছেও ক্ষমাযোগ্য হবে এবং আল্লাহর কাছেও। এ জাতীয় বিষয় সম্পর্কেই রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, فَاِنَّ اِثْمَهٗ عَلٰى مَنْ اَفْتٰى অর্থাৎ এমতাবস্থায় আলেম ও মুফতি ভুল করলে এবং কোনো মুসলমান তার ভুল ফতোয়া অনুযায়ী কাজ করলে, তার গুনাহ তার উপর নয়; বরং আলেম ও মুফতির উপরই বর্তাবে, যদি সে জেনেশুনে ভুল করে কিংবা সম্ভাব্য চিন্তা-ভাবনায় ত্রুটি করে অথবা প্রকৃতপক্ষে সে আলেম না হয়েও যদি জনগণকে ধোঁকা দিয়ে আলেমের পদ দখল করে বসে থাকে।

কিন্তু যদি কোনো ব্যক্তি প্রয়োজনীয় খোঁজ-খবর না নিয়ে শুধু নিজ মতে কোনো আলেমের অনুসরণ করে এবং তার উক্তি অনুযায়ী কাজ করে অথচ সংশ্লিষ্ট আলেম অনুসরণের যোগ্য না হয়, তবে এর গুনাহ একা তথাকথিত আলেম ব্যক্তিই বহন

করবে না; বরং অনুসরণকারীরাও সমান অপরাধী হবে। এমন লোকদের সম্পর্কেই কুরআন বলেছে سَمّٰعُوْنَ لِلْكَذِبِ অর্থাৎ তারা মিথ্যা কথা শোনায় অত্যন্ত অভ্যস্ত এবং স্বীয় অনুসৃতদের ইলম, আমল ও ধার্মিকতার খোঁজ-খবর না নিয়েই তাদের অনুসরণে লিপ্ত।

কুরআন পাক ইহুদিদের এ অবস্থা বর্ণনা করে মুসলমানদেরকে শুনিয়েছে যেন তারা এ দোষ থেকে আত্মরক্ষা করে। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, মুসলমানরা এ ব্যাপারে উদাসীন। এ উদাসীনতাই আজকাল মুসলমানদের চরম দূরবস্থার অন্যতম কারণ। অথচ তারা বৈষয়িক ব্যাপারাদিতে খুবই হুশিয়ার, কর্মচঞ্চল ও সুচতুর। অসুস্থ হলে অধিকতর যোগ্য ডাক্তার-বৈদ্য খোঁজ করে, মকদ্দমা হলে নামীদামি উকিল-ব্যারিষ্টার নিয়োগ করে এবং গৃহ নির্মাণ করতে হলে উৎকৃষ্টতর স্থপতি ও ইঞ্জিনিয়ারের শরণাপন্ন হয়। কিন্তু ধর্মের ব্যাপারে এতই উদার যে, কারো দাড়ি-কোর্তা দেখে এবং কিছু কথাবার্তা শুনেই তাকে অনুসরণযোগ্য আলেম, মুফতি ও পথপ্রদর্শক বলে নির্বাচন করে নেয়। সে নিয়মিত কোনো মাদরাসায় লেখাপড়া করেছে কি না, বিশেষজ্ঞদের সংসর্গে থেকে ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন করেছে কিনা, সাচ্চা বুজুর্গ ও আল্লাহ ভক্তদের সংসর্গে থেকে কিছু আত্মিক পবিত্রতা অর্জন করেছে কি না ইত্যাদি বিষয়ের খবর নেওয়ারও প্রয়োজন মনে করে না।

এর ফলশ্রুতি এই যে, মুসলমানদের মধ্যে যারা ধর্ম-কর্মে মনোযোগী, তাদের একটি বিরাট অংশ মূর্খ ওয়ায়েজ ও ব্যবসায়ী পীরের ফাঁদে পড়ে বিশুদ্ধ ধর্মপথ থেকে দূরে পড়ে যায়। তাদের ধর্মীয় জ্ঞান এমন কতিপয় কেচ্ছা-কাহিনীর মধ্যে সীমাবদ্ধ, যা রৈপিক কামনা-বাসনার পরিপন্থি নয়। তারা ধর্মপথে চলছে এবং বিরাট ইবাদত করছে বলে আত্মপ্রসাদ লাভ করে, কিন্তু কুরআনের ভাষায় তাদের স্বরূপ হচ্ছে এই : اَلَّذِيْنَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ يُحْسِنُوْنَ صُنْعًا

অর্থাৎ, তারা এমন, যাদের চেষ্টা-চরিত্র ও কাজ কর্ম পার্থিব জীবনেই লুপ্ত প্রায়, অথচ তারা মনে করছে যে, চমৎকার ধর্ম-কর্ম করে যাচ্ছে।

মোটকথা এই যে, কুরআন পাক سَمّٰعُوْنَ لِلْكَذِبِ বাক্যে মুনাফিক ইহুদিদের অবস্থা বর্ণনা করে একটি বিরাট মূলনীতি ব্যক্ত করেছে। অর্থাৎ মূর্খ জনগণের পক্ষে আলেমদের অনুসরণ করা অপরিহার্য বটে, কিন্তু যথার্থ খোঁজ-খবর না নিয়ে কোনো আলেমের অনুসরণ করা ঠিক নয় এবং অজ্ঞ লোকদের মুখে মিছামিছি কথা বার্তা শোনায় অভ্যস্ত হওয়া উচিত নয়।

ইহুদিদের দ্বিতীয় বদভ্যাস : উপরিউক্ত মুনাফিকদের দ্বিতীয় বদভ্যাস হচ্ছে سَمّٰعُوْنَ لِقَوْمٍ اٰخَرِيْنَ لَمْ يَاْتُوْكَ অর্থাৎ এরা বাহ্যতঃ আপনার কাছে একটি ধর্মীয় বিষয় জিজ্ঞেস করতে এসেছে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ধর্ম তাদের উদ্দেশ্য নয় এবং ধর্মীয় বিষয় জানার জন্যও আসেনি; বরং তারা এমন একটি ইহুদি সম্প্রদায়ের গুপ্তচর, যারা অহঙ্কারবশতঃ নিজে আপনার কাছে আসেনি। তাদের বাসনা অনুযায়ী এরা শুধু ব্যভিচারের শাস্তি সম্পর্কে আপনার মতবাদ জেনে তাদেরকে বলে দিতে চায়। এরপর মানা না মানা সম্পর্কে তারাই সিদ্ধান্ত নিবে। এতে মুসলমানদের জন্য হুশিয়ারি রয়েছে যে, আল্লাহ ও রাসূলের আদেশ জানা ও তা অনুসরণ করার নিয়তেই আলেমদের কাছে ফতোয়া জিজ্ঞেস করা কর্তব্য। নিজ প্রবৃত্তির অনুকূলে নির্দেশ অনুসন্ধান করার নিয়তে মুফতিদের কাছে ফতোয়া জিজ্ঞেস করা রিপু ও শয়তানের অনুসরণ বৈ কিছু নয়। এ থেকে বেঁচে থাকা কর্তব্য।

ইহুদদিের তৃতীয় বদভ্যাস ঐশী গ্রন্থের বিকৃতিসাধন : ইহুদিরা আল্লাহর কালামকে যথার্থ পরিবেশ থেকে সরিয়ে তার ভুল অর্থ করত এবং আল্লাহর নির্দেশকে বিকৃত করত। এ বিকৃতি ছিল দ্বিবিধঃ তাওরাতের ভাষায় কিছু হেরফের করা এবং ভাষা ঠিক রেখে তদস্থলে অযৌক্তিক ব্যাখ্যা ও পরিবর্তন করা। ইহুদিরা উভয় প্রকার বিকৃতিতেই অভ্যস্ত ছিল।

এতে মুসলমানদের জন্যও একটি হুশিয়ারি উচ্চারণ করা হয়েছে। কুরআন পাকের হেফাজতের দায়িত্ব আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং কুদরতি হাতে রেখেছেন। এতে শাব্দিক পরিবর্তনের দুঃসাহস কেউ করতে পারবে না। কেননা লিখিত গ্রন্থ ছাড়াও লাখো মানুষের মস্তিষ্কে সংরক্ষিত কালামে কেউ যের-যবরের পরিবর্তন করতেই ধরা পড়ে যায়। অর্থগত পরিবর্তন বাহ্যতঃ করা যায় এবং কেউ করেছেও। কিন্তু এর হেফাজতের জন্য আল্লাহ তা'আলার গৃহীত ব্যবস্থা এই যে, মুসলিম সম্প্রদায়ের কিয়ামত পর্যন্ত একটি সত্যপন্থি দল থাকবে, যারা হবে কুরআন ও সুন্নাহর বিশুদ্ধ অর্থের বাহক। তারা পরিবর্তনকারীদের রহস্য ফাঁস করে দিবে।

চতুর্থ বদভ্যাস উৎকোচ গ্রহণ : দ্বিতীয় আয়াতে তাদের আরো একটি বদভ্যাস বর্ণনা করে বলা হয়েছে أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ অর্থাৎ তারা سُحْت (সুহত) খাওয়ায় অভ্যস্ত। সুহতের শাব্দিক অর্থ কোনো বস্তুকে মূলোৎপাটিত করে ধ্বংস করে দেওয়া। এ অর্থেই কুরআনে বলা হয়েছে : فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ অর্থাৎ, তোমরা কুকর্ম থেকে বিরত না হলে আল্লাহ তা'আলা আজাব দ্বারা তোমাদের মূলোৎপাটন করে দিবেন। অর্থাৎ তোমাদের মূল শিকড় ধ্বংস করে দেওয়া হবে। আলোচ্য আয়াতে 'সুহত' বলে উৎকোচকে বুঝানো হয়েছে। হযরত আলী (রা.), ইবরাহীম নখয়ী (রা.), হাসান বসরী (র.), মুজাহিদ (রা.), কাতাদাহ (রা.) ও যাহহাক (রা.) প্রমুখ তাফসীরবিদগণ এ অর্থই বর্ণনা করেছেন।

উৎকোচ বা ঘুষকে সুহত বলার কারণ এই যে, এটি শুধু গ্রহিতাকেই ধ্বংস করে না; বরং সমগ্র দেশ ও জাতির মূলোৎপাটন করে এবং জননিরাপত্তা ধ্বংস করে। যে দেশে অথবা যে বিভাগে ঘুষ চালু হয়ে পড়ে, সেখানে আইনও নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। অথচ আইনের উপরই দেশ ও জাতির শান্তি নির্ভরশীল। আইন নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়লে কারো জান-মাল ও ইজ্জত-আবরু সংরক্ষিত থাকে না। তাই ইসলামে একে 'সুহত' আখ্যা দিয়ে কঠোরতর হারাম সাব্যস্ত করা হয়েছে। ঘুষের উৎসমুখ বন্ধ করার উদ্দেশ্যে পদস্থ কর্মচারী ও শাসকদেরকে প্রদত্ত উপঢৌকনকেও ছহীহ হাদীসে ঘুষ বলে আখ্যায়িত করে হারাম করে দেওয়া হয়েছে।

এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : আল্লাহ তা'আলা ঘুষদাতা ও ঘুষগ্রহীতার প্রতি অভিসম্পাত করেন এবং ঐ ব্যক্তির প্রতিও, যে উভয়ের মধ্যে দালালি বা মধ্যস্থতা করে। –[জাসসাস]

শরিয়তের পরিভাষায় ঘুষের সংজ্ঞা এই যে, যে কাজের পারিশ্রমিক গ্রহণ করা আইনতঃ জায়েজ নয় সে কাজের পারিশ্রমিক গ্রহণ করা। উদাহরণতঃ যে কাজ করা কোনো ব্যক্তির কর্তব্য কর্মের অন্তর্ভুক্ত, সে কাজের জন্য কোনো পক্ষ থেকে বিনিময় গ্রহণ করাই ঘুষ। সরকারি অফিসার ও ক্লার্ক চাকরির অধীনে স্বীয় কর্তব্য-কর্ম সম্পাদন করতে বাধ্য; সে যদি সংশ্লিষ্ট কোনো লোকের কাছ থেকে সে কাজের বিনিময়ে কিছু গ্রহণ করে, তবে তা ঘুষের অন্তর্ভুক্ত। কন্যাকে পাত্রস্থ করা পিতামাতার দায়িত্ব। তারা কারো কাছ থেকে এর বিনিময় গ্রহণ করতে পারে না। এখন কোনো পাত্রকে কন্যাদান করে তারা যদি কিছু গ্রহণ করে, তবে তাও ঘুষ। রোজা, নামাজ, হজ, তেলাওয়াতে কুরআন ইত্যাদি ইবাদতও মুসলমানদের দায়িত্ব। এ জন্য কারো কাছ থেকে বিনিময় নিলে তা ঘুষ হবে। অবশ্য পরবর্তী ফিকহবিদদের ফতোয়া অনুযায়ী কুরআন শিক্ষা দান করা ও নামাজের ইমামতি করা এ থেকে আলাদা।

কেউ যদি ঘুষের বিনিময়ে ন্যায়সঙ্গত কাজও করে দেয়, তবে সে গুনাহগার হবে এবং ঘুষের অর্থ গ্রহণ করাও তার পক্ষে হারাম হবে। পক্ষান্তরে যদি ঘুষ গ্রহণ করে কারো অন্যায় কাজ করে দেয়, সে উপরিউক্ত গুনাহ ছাড়াও অধিকার হরণ এবং খোদায়ী নির্দেশে বিকৃতি সাধনের কঠোর অপরাধে অপরাধী হয়ে যাবে। আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদেরকে এ থেকে রক্ষা করুন।

আলোচ্য প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে : إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ অর্থাৎ আমি তাওরাত গ্রন্থ অবতরণ করেছি, যাতে সত্যের প্রতি পথপ্রদর্শন এবং একটি বিশেষ জ্যোতি ছিল। এ বাক্যে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আজ যে তাওরাতের শরিয়তকে রহিত করা হচ্ছে, এতে করে তাওরাতের কোনোরূপ মর্যাদাহানি করা হচ্ছে না; বরং সময়ের পরিবর্তনের কারণে বিধি-বিধান পরিবর্তন করার তাগিদেই তা করা হচ্ছে। নতুবা তাওরাতও আমারই প্রেরিত গ্রন্থ। এতে বনী ইসরাঈলদের জন্য পথপ্রদর্শনের মূলনীতি রয়েছে এবং একটি বিশেষ জ্যোতিও রয়েছে, যা আধ্যাত্মিক পন্থায় তাদের অন্তরে প্রভাব বিস্তার করে।

এরপর বলা হয়েছে : يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ অর্থাৎ তাওরাত অবতরণের কারণ ছিল এই যে, যত দিন তার শরিয়তকে রহিত করা না হয়, ততদিন পর্যন্ত ভবিষ্যতে আগমনকারী পয়গম্বর, তাঁদের প্রতিনিধি আল্লাহ ওয়ালা ও আলেমগণ সবাই এ তাওরাত অনুযায়ী ফয়সালা করবেন এবং এ আইনকেই জগতে প্রবর্তন করবেন। এ বাক্যে পয়গম্বরদের প্রতিনিধিবর্গকে দুই ভাগে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথমভাগ رَبَّانِيُّون এবং দ্বিতীয়ভাগ أَحْبَار - رَبَّانِي শব্দটি رَبّ এর সাথে সম্বন্ধযুক্ত। এর অর্থ আল্লাহ ওয়ালা (আল্লাহভক্ত)। أَحْبَار শব্দটি حِبْر এর বহুবচন। ইহুদিদের বাকপদ্ধতিতে আলেমকে حِبْر বলা হতো। একথা সুস্পষ্ট যে, আল্লাহভক্ত ব্যক্তিমাত্রই আল্লাহর জরুরি বিধি-বিধান সম্পর্কে অবশ্যই

আলেমও হবে। কেননা ইলম ব্যতীত আমল হতে পারে না এবং আমল ব্যতীত কোনো ব্যক্তি আল্লাহভক্ত হতে পারে না। এমনিভাবে আল্লাহর কাছে সে ব্যক্তিই আলেম, যে ইলম অনুযায়ী আমলও করে। পক্ষান্তরে যে আলেম আল্লাহর বিধান সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া সত্ত্বেও জরুরি ফরজ ও ওয়াজিবের আমল করে না, তার প্রতি কেউ চোখ তুলেও তাকায় না। সে আল্লাহ ও রাসূলের দৃষ্টিতে মূর্খের চাইতেও অধম। অতএব, প্রত্যেক আল্লাহভক্তই আলেম এবং প্রত্যেক আলেমই আল্লাহভক্ত। কিন্তু আলোচ্য বাক্যে আল্লাহভক্ত আলেমকে প্রত্যক্ষভাবে উল্লেখ করে একথা ব্যক্ত করা হয়েছে যে, একটির জন্য অপরটি জরুরি হলেও যার মধ্যে যে দিক প্রবল, সে অনুযায়ী তার নাম রাখা হয়। যে ব্যক্তির মনোযোগ বেশির ভাগ ইবাদত, আমল ও জিকিরে নিবদ্ধ থাকে এবং যতটুকু দরকার ততটুকু ইলম হাসিল করে ক্ষান্ত হয় তাকে 'রাব্বানী' অর্থাৎ আল্লাহভক্ত বলা হয়। আধুনিক পরিভাষায় তাকে শায়খ, মুরশিদ, পীর ইত্যাদি নামেও অভিহিত করা হয়। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি শিক্ষাক্ষেত্রে পারদর্শিতা অর্জন করে জনগণকে শরিয়তের নির্দেশাবলি বর্ণনা করা ও শিক্ষা দেওয়ার কাজে বেশির ভাগ সময় নিয়োজিত থাকে এবং ফরজ, ওয়াজিব ও সুন্নতে মুয়াক্কাদা ছাড়া অন্যান্য নফল ইবাদতে বেশি সময় ব্যয় করে না তাকে حِبْر অথবা আলেম বলা হয়।

মোটকথা, এ বাক্যে শরিয়ত ও তরিকত এবং আলেম ও মাশায়েখের আসল একত্বও ব্যক্ত হয়েছে এবং কর্মপন্থা ও প্রধান বৃত্তির দিক দিয়ে তাদের পার্থক্যও ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এতে বুঝা গেল যে, আলেম ও সুফি দু'টি সম্প্রদায় বা দু'টি দল নয়; বরং উভয়ের জীবনের লক্ষ্যই আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য। তবে লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে তাদের কর্মপন্থা বাহ্যতঃ পৃথক বলে মনে হয়।

এরপর ইরশাদ হয়েছে : بِمَا اسْتُحْفِظُوْا مِنْ كِتٰبِ اللّٰهِ وَكَانُوْا عَلَيْهِ شُهَدَآءَ অর্থাৎ এসব পয়গম্বর ও তাঁদের উভয় শ্রেণির প্রতিনিধিবর্গ আলেম ও মাশায়েখ তওরাতের নির্দেশাবলি প্রয়োগ করতে এ কারণে বাধ্য ছিলেন যে, আল্লাহ তা'আলা তওরাতের হেফাজত তাঁদের দায়িত্বেই ন্যস্ত করেছিলন এবং তাঁরা এ দায়িত্ব পালনের ওয়াদা-অঙ্গীকারও করেছিলেন।

এ পর্যন্ত বর্ণিত হলো যে, তওরাত একটি ঐশী গ্রন্থ, পথ প্রদর্শক, জ্যোতি আর আম্বিয়া আলাইহিমুসসালাম ও তাদের সাচ্চা প্রতিনিধিবর্গ হচ্ছেন মাশায়েখ ও ওলামা যারা এর হেফাজত করেছেন। অতঃপর বর্তমান যুগের ইহুদিদেরকে তাদের বক্রতা ও বক্রতার আসল কারণ সম্পর্কে অবহিত করে বলা হয়েছে : তোমরা পূর্ববর্তীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে তওরাতের হেফাজত করার পরিবর্তে এর বিধি-বিধান পরিবর্তন করে দিয়েছ। তওরাতে সুস্পষ্ট ও বিস্তারিতভাবে শেষ নবী করীম ﷺ-এর আগমনের সংবাদ এবং ইহুদিদেরকে তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের নির্দেশ বর্ণিত হয়েছিল, কিন্তু তারা এ নির্দেশের বিরোধিতা করে এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের পরিবর্তে তাঁর বিরোধিতা শুরু করে দেয়। আয়াতে তাদের মারাত্মক ভ্রান্তির কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে : পার্থিব নাম যশ ও অর্থ লিপ্সাই তোমাদের এ বিরোধিতার কারণ। তোমরা রাসূলে কারীম ﷺ-কে সত্য নবী জেনেও তাঁর অনুসরণ করতে বিব্রত বোধ করছ। কারণ এখন তোমরা স্বীয় সম্প্রদায়ের অনুসরণীয় বলে গণ্য হও এবং ইহুদি জনগণ তোমাদের পিছনেই চলে। এমতাবস্থায় ইসলামে দীক্ষিত হয়ে গেলে তোমাদের সর্দারী নষ্ট হয়ে যাবে। এছাড়া বড়লোকদের কাছ থেকে মোটা অঙ্কের ঘুষ নিয়ে তাওরাতের নির্দেশ সহজ করে দেওয়াকে তারা পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছিল। এ সম্পর্কে হুঁশিয়ার করার জন্য বর্তমান যুগের ইহুদিদেরকে বলা হয়েছে : فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوْا بِاٰيٰتِيْ ثَمَنًا قَلِيْلًا অর্থাৎ তোমরা লোকদেরকে ভয় করো না যে, তারা তোমাদের অনুসরণ ত্যাগ করবে অথবা শত্রু হয়ে যাবে। তাছাড়া দুনিয়ার নিকৃষ্ট অর্থ কড়ি গ্রহণ করে তাদের জন্য আল্লাহর নির্দেশও পরিবর্তন করো না। এতে করে তোমাদের ইহকাল ও পরকাল উভয়টিই বরবাদ হয়ে যাবে। কেননা وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ অর্থাৎ যারা আল্লাহ প্রেরিত বিধানকে জরুরি মনে করে না এবং তদনুযায়ী ফয়সালা করে না; বরং এর বিরুদ্ধে ফয়সালা করে, তারা কাফের ও অবিশ্বাসী। এর শাস্তি জাহান্নামের চিরস্থায়ী আজাব।

এরপর দ্বিতীয় আয়াতে তাওরাতের বরাত দিয়ে কেসাসের বিধান বর্ণনা করে বলা হয়েছে।

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيْهَآ اَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْاَنْفَ بِالْاَنْفِ وَالْاُذُنَ بِالْاُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوْحَ قِصَاصٌ

অর্থাৎ আমি ইহুদিদের জন্য তাওরাতে এ বিধান অবতরণ করেছিলাম যে, প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ, চোখের বিনিময়ে চোখ, নাকের বিনিময়ে নাক, কানের বিনিময়ে কান, দাঁতের বিনিময়ে দাঁত এবং বিশেষ জখমেরও বিনিময় আছে।

www.almodina.com

বনূ কুরাইযা ও বনূ নজিরের একটি মকদ্দমা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ইজলাসে উত্থাপিত হয়েছিল। বনূ নজিরে গায়ের জোরে বনূ কুরাইযাকে বাধ্য করে রেখেছিল যে, বনূ নজিরের কোনো ব্যক্তি যদি তাদের কোনো ব্যক্তিকে হত্যা করে তবে প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ নেওয়া হবে এবং রক্ত-বিনিময়ও গ্রহণ করা হবে। পক্ষান্তরে যদি বনূ নজিরের কোনো ব্যক্তি বনূ কুরাইযার কোনো ব্যক্তিকে হত্যা করে, তবে শুধু কেছাছ নয়, রক্ত-বিনিময় দেওয়া হবে তাও বনূ নজিরের রক্ত বিনিময়ের অর্ধেক। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তাদের এ জাহেলিয়াতের মুখোশ উন্মোচন করে দিয়েছেন যে, স্বয়ং তাওরাতে কেসাস ও রক্ত-বিনিময়ের ক্ষেত্রে সমতার বিধান রয়েছে। তারা জেনেশুনে তার প্রতি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে এবং শুধু বাহানাবাজির জন্য নিজেদের মকদ্দমা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ইজলাসে উপস্থিত করে।

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে : وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ অর্থাৎ, যারা আল্লাহ প্রেরিত বিধান অনুযায়ী ফয়সালা করে না, তারা জালেম, খোদায়ী বিধানে অবিশ্বাসী এবং বিদ্রোহী। ৪৬নং আয়াতে প্রথমে হযরত ঈসা (আ.)-এর নবুয়তপ্রাপ্তি প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি পূর্ববর্তী গ্রন্থে তাওরাতের সত্যায়নের জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন। এরপর ইঞ্জিল সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, এটিও তাওরাতের মতোই হেদায়েত ও জ্যোতি।

শব্দ বিশ্লেষণ

اَكّٰلُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر سالم এটি اَكْلٌ মাসদার থেকে মুবালাগার সীগাহ, একবচন اَكَّالٌ অর্থ– বিরাট হারামখোর।

اَلْمُقْسِطِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِقْسَاطُ মূলবর্ণ (ق . س . ط) জিনস صحيح অর্থ– ন্যায়পরায়ণ বিচারকগণ।

يَتَوَلَّوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব تَفَعُّلٌ মাসদার اَلتَّوَلِّىْ মূলবর্ণ (و . ل ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ– তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়।

رَبّٰنِيُّوْنَ : শব্দটি বহুবচন, একবচন رَبَّانِىٌّ অর্থ– আল্লাহভক্ত দরবেশ।

اَلْاَحْبَارُ : শব্দটি বহুবচন, একবচন حِبْرٌ অর্থ– আলেমগণ।

www.almodina.com

وَقَفَّيْنَا عَلٰٓى اٰثَارِهِمْ بِعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرٰىةِ ۪ وَاٰتَيْنٰهُ الْاِنْجِيْلَ فِيْهِ هُدًى وَّنُوْرٌ ۙ وَّمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرٰىةِ وَهُدًى وَّمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِيْنَ (٤٦)

অনুবাদ : (৪৬) আর আমি তাঁদের পর ঈসা ইবনে মারাইয়ামকে এই অবস্থায় প্রেরণ করেছিলাম যে, তিনি তাঁর পূর্ববর্তী কিতাবের অর্থাৎ তাওরাতের সত্যতা সমর্থন করছিলেন, এবং আমি তাঁকে ইঞ্জিল প্রদান করেছি, যাতে হেদায়েত ছিল এবং আলো ছিল এবং তা স্বীয় পূর্ববর্তী কিতাব অর্থাৎ তাওরাতের সত্যতা সমর্থন করে এবং তা সম্পূর্ণরূপে মুত্তাকীদের জন্য হেদায়েত ও নসিহত ছিল।

وَلْيَحْكُمْ اَهْلُ الْاِنْجِيْلِ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فِيْهِ ۭ وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰۗىِٕكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ (٤٧)

(৪৭) আর আহলে ইঞ্জিলদের উচিত যে, যা কিছু আল্লাহ তাতে নাজিল করেছেন, তদনুযায়ী হুকুম প্রদান করে, আর যে ব্যক্তি আল্লাহর অবতারিত [বিধান] অনুযায়ী হুকুম প্রদান না করে, তবে তো এরূপ লোকই পূর্ণ নাফরমান।

وَاَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتٰبِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاۗءَهُمْ عَمَّا جَاۗءَكَ مِنَ الْحَقِّ ۭ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَّمِنْهَاجًا ۭ

(৪৮) আর আমি এই কিতাব [কুরআন]-কে আপনার প্রতি নাজিল করেছি, যা নিজেও সত্যতা গুণে বিভূষিত, এবং তার পূর্ববর্তী কিতাবসমূহেরও সত্যতা প্রমাণকারী [এবং] ঐ সমস্ত কিতাবের সংরক্ষকও, অতএব, আপনি তাদের পারস্পরিক বিষয়ে আল্লাহর অবতারিত এই কিতাব অনুযায়ী মীমাংসা করবেন, আর এই সত্য কিতাব যা আপনি প্রাপ্ত হয়েছেন, তা হতে বিরত থেকে তাদের প্রবৃত্তি অনুযায়ী কাজ করবেন না, তোমাদের প্রত্যেক [সম্প্রদায়]-এর জন্য আমি নির্দিষ্ট শরিয়ত এবং নির্দিষ্ট পন্থা নির্ধারণ করেছিলাম,

শাব্দিক অনুবাদ

(৪৬) وَقَفَّيْنَا আর আমি এই অবস্থায় প্রেরণ করেছিলাম যে عَلٰٓى اٰثَارِهِمْ তাঁদের পর بِعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ ঈসা ইবনে মারাইয়ামকে مُصَدِّقًا তিনি সমর্থন করছিলেন لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرٰىةِ তাঁর পূর্ববর্তী কিতাবের অর্থাৎ তাওরাতের সত্যতা, وَاٰتَيْنٰهُ الْاِنْجِيْلَ এবং আমি তাঁকে ইঞ্জিল প্রদান করেছি فِيْهِ هُدًى وَّنُوْرٌ যাতে হেদায়েত ছিল এবং আলো ছিল وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرٰىةِ এবং তা স্বীয় পূর্ববর্তী কিতাব অর্থাৎ তাওরাতের সত্যতা সমর্থন করে وَهُدًى وَّمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِيْنَ এবং তা সম্পূর্ণরূপে মুত্তাকীদের জন্য হেদায়েত ও নসিহত ছিল।

(৪৭) وَلْيَحْكُمْ اَهْلُ الْاِنْجِيْلِ আর আহলে ইঞ্জিলদের উচিত যে, তদনুযায়ী হুকুম প্রদান করে بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فِيْهِ যা কিছু আল্লাহ তাতে নাজিল করেছেন وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ আর যে ব্যক্তি আল্লাহর অবতারিত [বিধান] অনুযায়ী হুকুম প্রদান না করে فَاُولٰۗىِٕكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ তবে তো এরূপ লোকই পূর্ণ নাফরমান।

(৪৮) وَاَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الْكِتٰبَ আর আমি এই কিতাব [কুরআন]-কে আপনার প্রতি নাজিল করেছি بِالْحَقِّ যা নিজেও সত্যতা গুণে বিভূষিত مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتٰبِ এবং তার পূর্ববর্তী কিতাবসমূহেরও সত্যতা প্রমাণকারী وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ এবং ঐ সমস্ত কিতাবের সংরক্ষকও فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ অতএব, আপনি তাদের পারস্পরিক বিষয়ে আল্লাহর অবতারিত এই কিতাব অনুযায়ী মীমাংসা করবেন وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاۗءَهُمْ আর তাদের প্রবৃত্তি অনুযায়ী কাজ করবেন না عَمَّا جَاۗءَكَ مِنَ الْحَقِّ এই সত্য কিতাব যা আপনি প্রাপ্ত হয়েছেন তা হতে বিরত থেকে لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ তোমাদের প্রত্যেক [সম্প্রদায়]-এর জন্য আমি নির্ধারণ করেছিলাম شِرْعَةً وَّمِنْهَاجًا নির্দিষ্ট শরিয়ত এবং নির্দিষ্ট পন্থা

وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَجَعَلَكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّلٰكِنْ لِّيَبْلُوَكُمْ فِيْ مَآ اٰتٰىكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرٰتِ ۚ اِلَى اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيْعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ (٤٨)

অনুবাদ : আর যদি আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করতেন, তবে তোমাদের সকলকে একই উম্মত করে দিতেন: কিন্তু তদ্রূপ করেননি, এই নিমিত্ত যে, যে ধর্ম তোমাদেরকে প্রদান করেছেন তাতে তোমাদের সকলকে পরীক্ষা করে নেন, সুতরাং তোমরা হিতকর বিষয়সমূহের দিকে ধাবিত হও, তোমাদের সকলকে আল্লাহরই সমীপে প্রত্যাবর্তন করতে হবে, তখন তিনি তোমাদেরকে জানিয়ে দিবেন, যাতে তোমরা মতবিরোধ করছিলে।

وَاَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ اَنْ يَّفْتِنُوْكَ عَنْۢ بَعْضِ مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ اِلَيْكَ ۚ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ اَنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّصِيْبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوْبِهِمْ ۚ وَاِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ لَفٰسِقُوْنَ (٤٩)

(৪৯) আর আমি আদেশ দিচ্ছি যে, আপনি তাদের পারস্পরিক ব্যাপারে এই প্রেরিত কিতাব অনুযায়ী মীমাংসা করবেন এবং তাদের প্রবৃত্তি অনুযায়ী কাজ করবেন না, এবং তাদের থেকে অর্থাৎ এ বিষয়ে সতর্ক থাকবেন যেন তারা আপনাকে আল্লাহর প্রেরিত কোনো নির্দেশ হতে বিভ্রান্ত করতে না পারে, অন্তর যদি তারা পরাঙ্মুখ হয়, তবে দৃঢ় বিশ্বাস রাখুন, আল্লাহর অভিপ্রায় এটাই যে, এদেরকে এদের কোনো কোনো পাপের দরুন শাস্তি প্রদান করবেন, আর অনেক লোক তো নাফরমানই হয়ে থাকে।

اَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُوْنَ ۚ وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ (٥٠)

(৫০) তবে কি তারা অজ্ঞতা-যুগের মীমাংসা কামনা করে? আর মীমাংসা কার্যে আল্লাহর চেয়ে কে উত্তম হবে দৃঢ় বিশ্বাসীদের নিকট?

শাব্দিক অনুবাদ

وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ আর যদি আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করতেন لَجَعَلَكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً তবে তোমাদের সকলকে একই উম্মত করে দিতেন وَّلٰكِنْ কিন্তু তদ্রূপ করেননি, এই নিমিত্ত যে, لِّيَبْلُوَكُمْ তোমাদের সকলকে পরীক্ষা করে নেন فِيْ مَآ اٰتٰىكُمْ যে ধর্ম তোমাদেরকে প্রদান করেছেন তাতে فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرٰتِ সুতরাং তোমরা হিতকর বিষয়সমূহের দিকে ধাবিত হও اِلَى اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيْعًا তোমাদের সকলকে আল্লাহরই সমীপে প্রত্যাবর্তন করতে হবে فَيُنَبِّئُكُمْ তখন তিনি তোমাদেরকে জানিয়ে দিবেন بِمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ যাতে তোমরা মতবিরোধ করতেছিলে।

৪৯) وَاَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ আর আমি আদেশ দিচ্ছি যে, আপনি তাদের পারস্পরিক ব্যাপারে মীমাংসা করবেন بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ এই প্রেরিত কিতাব অনুযায়ী وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَهُمْ এবং তাদের প্রবৃত্তি অনুযায়ী কাজ করবেন না وَاحْذَرْهُمْ এবং তাদের থেকে অর্থাৎ এ বিষয়ে সতর্ক থাকবেন اَنْ يَّفْتِنُوْكَ যেন তারা আপনাকে বিভ্রান্ত করতে না পারে عَنْۢ بَعْضِ مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ اِلَيْكَ আল্লাহর প্রেরিত কোনো নির্দেশ হতে فَاِنْ تَوَلَّوْا অন্তর যদি তারা পরাঙ্মুখ হয় فَاعْلَمْ তবে দৃঢ় বিশ্বাস রাখুন اَنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ আল্লাহর অভিপ্রায় এটাই যে اَنْ يُّصِيْبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوْبِهِمْ এদেরকে এদের কোনো কোনো পাপের দরুন শাস্তি প্রদান করবেন وَاِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ لَفٰسِقُوْنَ আর অনেক লোক তো নাফরমানই হয়ে থাকে।

৫০) اَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُوْنَ তবে কি তারা অজ্ঞতা-যুগের মীমাংসা কামনা করে وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ حُكْمًا আর মীমাংসা কার্যে আল্লাহর চেয়ে কে উত্তম হবে لِّقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ দৃঢ় বিশ্বাসীদের নিকট?

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(৪৯) قوله وَاَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَهُمْ **আয়াতের শানে নুযূল :** ইবনে ইসহাক, ইবনে জারীর, ইবনে আবী হাতেম প্রমূখ হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, কা'আব বিন আসাদ, আব্দুল্লাহ বিন সুরিয়া, শাশ বিন কায়স পরস্পরে বলল, আমাদেরকে নিয়ে মুহাম্মদের নিকট চল। আমরা তাঁর ধর্মীয় ব্যাপারে বিভ্রান্ত করে দিব। সুতরাং তারা রাসূলের নিকট এসে বলল, হে মুহাম্মদ! আপনি তো জানেন ইহুদিদের মাঝে আমরা পণ্ডিত ও অভিজাত এবং তাদের নেতা। আমরা যদি আপনার অনুসরণ করি, তাহলে ইহুদিরাও আমাদের আনুগত্য করবে। আর আমাদের ও তাদের গোত্রের মাঝে একটি বিরোধ রয়েছে, আমরা আপনার নিকট তা নিয়ে আসব। আপনি তাদের বিপক্ষে আর আমাদের পক্ষে ফয়সালা দিবেন। আমরা আপনার প্রতি ঈমান আনব এবং আমরা আপনাকে সমর্থন করে নিব। রাসূল ﷺ তাতে অস্বীকার করলেন। তাদের বিভ্রান্তিকর এহেন কুটচাল সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা উক্ত আয়াত নাজিল করেন। –[ফাতহুল কাদীর : ৬৮/২, রূহুল মা'আনী : ১৫৫/৩/৬, কুরতুবী : ২০০/৬, ইবনে কাছীর : ৬৮/২, বাহরে মুহীত : ৫১৫/৩]

(৫০) قوله اَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُوْنَ وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ حُكْمًا **আয়াতের শানে নুযূল :** রূহুল মা'আনী প্রণেতা বর্ণনা করেন, বনূ নজিরের লোকজন কোনো এক হত্যা কাণ্ড বিষয়ের বিরোধ নিষ্পত্তি করার জন্য যখন রাসূল ﷺ-এর নিকট মকদ্দমা পেশ করল। যে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছিল বনূ নজির ও বনূ কুরাইযাদের মাঝে। তাদের মধ্য থেকে কারো দাবি ছিল যে, রাসূল ﷺ তাদের মাঝে জাহেলী যুগের রীতি অনুযায়ী মর্যাদানুপাতে ফয়সালা করুক। তখন রাসূল ﷺ বললেন, নিহত বদলা যোগ্য অপরাধ, তখন বনূ নজিরের লোকজন বলল, আমরা তো তা মানি না। রাসূল ﷺ–এর এ সিদ্ধান্ত না মানার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়েছে। –[রূহুল মা'আনী : ১৫৬/৩/৬]

৪৬ নং আয়াতে বলা হয়েছে যে, ইঞ্জিলের অধিকারীদের ইঞ্জিলে অবতীর্ণ আইন অনুযায়ী ফয়সালা করা উচিত। যারা এ আইনের বিরুদ্ধে ফয়সালা করে, তারা অবাধ্য ও উদ্ধত।

কুরআন, তাওরাত ও ইঞ্জিলের সংরক্ষক : ৪৭ ও ৪৮ নং আয়াতে নবী করীম ﷺ -কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে : "আমি আপনার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করেছি, যা পূর্ববর্তী গ্রন্থ তাওরাত ও ইঞ্জিলের সত্যায়ন করে এবং এদের সংরক্ষকও বটে"। কারণ যখন তাওরাতের অধিকারীরা তাওরাতে এবং ইঞ্জিলের উত্তরাধিকারীরা ইঞ্জিলে পরিবর্তন সাধন করে, তখন কুরআনই তাদের পরিবর্তনের মুখোশ উন্মোচন করে সংরক্ষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। তাওরাত ও ইঞ্জিলের প্রকৃত শিক্ষা আজও কুরআনের মাধ্যমেই পৃথিবীতে বিদ্যমান রয়েছে। অথচ এসব গ্রন্থের অধিকারী এবং অনুসরণের দাবিদাররা এদের রূপ এমনভাবে বিগড়িয়ে দিয়েছে যে, সত্য ও মিথ্যার পার্থক্যই অসম্ভব হয়ে পড়েছে। শেষাংশে মহানবী ﷺ-কে তাওরাত ও ইঞ্জিলের অনুরূপ নির্দেশ দিয়ে বলা হয়েছে: আপনার যাবতীয় নির্দেশ ও ফয়সালা আল্লাহ প্রেরিত নির্দেশ অনুযায়ী হতে হবে। যারা আপনার দ্বারা স্বীয় বৈষয়িক কামনা-বাসনা অনুযায়ী ফয়সালা করাতে চায়, তাদের ষড়যন্ত্র থেকে হুশিয়ার থাকবেন। এরূপ বলার একটি বিশেষ কারণ ছিল এই যে, ইহুদিদের কতিপয় আলেম মহানবী ﷺ-এর কাছে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করল, আপনি জানতেন, আমরা ইহুদিদের আলেম ও ধর্মীয় নেতা। আমরা মুসলমান হয়ে গেলে তারাও সবাই মুসলমান হয়ে যাবে। তবে আমাদের একটি শর্ত আছে। তা হলো এই যে, আপনার কওমের সাথে আমাদের একটি মকদ্দমা রয়েছে আমরা মকদ্দমাটি আপনার কাছে উত্থাপন করব। আপনি এর ফয়সালা আমাদের পক্ষে করে দিলে আমরা মুসলমান হয়ে যাব। আল্লাহ তা'আলা হুজুর ﷺ-কে এ বিষয়ে সতর্ক করে বলেছেন : আপনি এদের মুসলমান হওয়ার প্রেক্ষিতে ন্যায়, সুবিচার ও আল্লাহ প্রেরিত আইনের বিপক্ষে কোনো ফয়সালা দিবেন না এবং এরা মুসলমান হবে কি হবে না এ বিষয়ের প্রতি ভ্রুক্ষেপও করবেন না।

পয়গম্বরদের বিভিন্ন শরিয়তের আংশিক প্রভেদ ও তার তাৎপর্য : আলোচ্য আয়াতে একটি গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে। প্রশ্নটি এই যে, সব আম্বিয়া (আ.) যখন আল্লাহর পক্ষ থেকেই প্রেরিত এবং তাঁদের প্রতি অবতীর্ণ গ্রন্থ, সহীফা শরিয়তসমূহও যখন আল্লাহর পক্ষ থেকেই আগত, তখন এসব গ্রন্থে ও শরিয়তের মাধ্যে প্রভেদ কেন এবং পরবর্তী গ্রন্থ ও শরিয়ত পূর্ববর্তী গ্রন্থ ও শরিয়তকে রহিত করে দেয় কেন? এ প্রশ্নের উত্তর ও তাৎপর্য এ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে– لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَّمِنْهَاجًا ۚ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَجَعَلَكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّلٰكِنْ لِّيَبْلُوَكُمْ فِيْ مَآ اٰتٰىكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرٰتِ

অর্থাৎ আমি তোমাদের প্রত্যেক শ্রেণির জন্য একটি বিশেষ শরিয়ত ও বিশেষ কর্মপন্থা নির্ধারণ করেছি এবং মূলনীতি অভিন্ন ও সর্বসম্মত হওয়া সত্ত্বেও শাখাগত নির্দেশসমূহে কিছু প্রভেদ আছে। যদি আল্লাহ তোমাদের সবাইকে একই উম্মত, একই জাতি এবং সবার জন্য একই গ্রন্থ ও একই শরিয়ত নির্ধারণ করতে চাইতেন, তবে এরূপ করা তাঁর পক্ষে মোটেই কঠিন ছিল না। কিন্তু আল্লাহ তা পছন্দ করেননি। কারণ তাঁর উদ্দেশ্য ছিল মানুষকে পরীক্ষা করা। তিনি যাচাই করতে চান যে, কারা ইবাদতের স্বরূপ অবগত হয়ে নির্দেশ এলেই তা পালন করার জন্য সর্বদা কান পেতে রাখে, নতুন গ্রন্থ ও নতুন শরিয়ত এলে তার অনুসরণে লেগে যায়, পূর্ববর্তী গ্রন্থ ও শরিয়ত প্রিয় হলেও এবং পৈতৃক ধর্ম হয়ে যাওয়ার কারণে তা বর্জন করা কঠিন হলেও কারা সর্বদা উন্মুখভাবে আনুগত্যের জন্য প্রস্তুত থাকে। পক্ষান্তরে কারা এ সত্য বিস্মৃত হয়ে বিশেষ শরিয়তও বিশেষ গ্রন্থকেই সম্বল করে নেয় এবং পৈতৃক ধর্ম হিসেবে আঁকড়ে থাকে– এর বিপক্ষে আল্লাহর নির্দেশের প্রতিও কর্ণপাত করে না।

শরিয়তসমূহের বিভিন্নতার ক্ষেত্রে এটি একটি বিরাট রহস্য। এর মাধ্যমে প্রত্যেক যুগের ও প্রত্যেক স্তরের মানুষকে ইবাদত ও দাসত্বের এ স্বরূপ সম্পর্কে অবহিত করা হয় যে, প্রকৃতপক্ষে দাসত্ব, আনুগত্য ও অনুসরণকেই ইবাদত বলা হয়। এ দাসত্ব ও আনুগত্য, নামাজ, রোজা, হজ, জাকাত, জিকির ও তেলাওয়াতের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় এবং স্বতন্ত্র দৃষ্টিতে এগুলোর উদ্দেশ্যও নয়; বরং এগুলোর লক্ষ্য হচ্ছে আল্লাহর নির্দেশের আনুগত্য। এ কারণেই যে সময়ে নামাজ পড়তে নিষেধ করা হয়েছে সে সময়ে নামাজ পড়লে ছওয়াব তো দূরের কথা, উল্টো পাপের বোঝাই ভারি হয়। দুই ঈদসহ বছরের পাঁচ দিন রোজা রাখা নিষিদ্ধ। এসময়ে রোজা রাখা নিশ্চিত গুনাহ। ৯ই জিলহজ ছাড়া অন্য কোনো দিন কোনো মাসে আরাফাতের ময়দানে একত্রিত হয়ে দোয়া ও ইবাদত করা বিশেষভাবে কোনো ছওয়াবের কাজ নয়। অথচ ৯ই জিলহজ তারিখে এটি সর্ববৃহতৎ ইবাদত। অন্যান্য ইবাদতের অবস্থাও তাই। যতক্ষণ তা করার নির্দেশ ততক্ষণই তা ইবাদত এবং যখন যেখানে নিষেধ করা হয়, তখন সেখানে তা হারাম ও নাজায়েজ হয়ে যায়। অজ্ঞ জনসাধারণ এ সত্য সম্পর্কে অবহিত নয়। যেসব ইবাদত তাদের অভ্যাসে পরিণত হয়; বরং যেসব জাতীয় প্রথাকে তারা ইবাদত মনে করে পালন করতে থাকে, সেগুলোর বিরুদ্ধে আল্লাহ ও রাসূলের প্রকাশ্য নির্দেশের প্রতিও তারা কর্ণপাত করে না। এ ছিদ্রপথেই বিদ'আত ও মনগড়া আচার-অনুষ্ঠান ধর্মের অঙ্গীভূত হয়ে যায়। পূর্ববর্তী গ্রন্থ ও শরিয়তে পরিবর্তন হওয়ার কারণও ছিল তাই। আল্লহ তা'আলা বিভিন্ন পয়গম্বরের প্রতি বিভিন্ন গ্রন্থ ও শরিয়ত অবতরণ করে মানবজাতিকে শিক্ষা দিয়েছেন যে, কোনো একটি কাজ অথবা এক প্রকার ইবাদতকে উদ্দেশ্য করে নেওয়া ঠিক নয়; বরং বিশুদ্ধ অর্থে আল্লাহর অনুগত বান্দা হওয়া উচিত। আল্লাহ যখনই আগের কাজ বর্জন করার আদেশ দেন, তখনই তা বর্জন করা দরকার এবং যে কাজের নির্দেশ দেন, তখনই বিনা দ্বিধায় তা পালন করা কর্তব্য।

এ ছাড়া শরিয়তসমূহের বিভিন্নতার আর একটি বড় রহস্য এই যে, জগতের প্রত্যেক যুগের প্রত্যেক স্তরের মানুষের মনমেজাজ ও স্বভাব-প্রকৃতি বিভিন্ন। কালের পরিবর্তন মানবস্বভাবের উপর প্রভাব বিস্তার করে। যদি সবার জন্য শাখাগত বিধান এক করে দেওয়া হয়, তবে মানুষ গুরুতর পরিস্থিতির সম্মুখীন হবে। তাই খোদায়ী রহস্যের তাগিদে প্রত্যেক যুগ ও প্রত্যেক মানুষের ভাবাবেগের প্রতি লক্ষ্য রেখে শাখাগত বিধি-বিধান পরিবর্তন করে দেওয়া হয়েছে। এখানে 'নাসিখ' (রদকারী আদেশ) ও 'মানসুখ (রদকৃত আদেশ)-এর অর্থ এরূপ নয় যে, আদেশদাতা পূর্বের পরিস্থিতি সম্পর্কে জ্ঞাত ছিলেন না বলে একটি আদেশ জারি করার ফলে যখন নতুন পরিস্থিতি সামনে এলো, তখন অপর একটি আদেশ জারি করে একে রহিত করে দেন, অথবা পূর্বে অসাবধানতা ও ভ্রান্তিবশতঃ কোনো নির্দেশ জারি করেছিলেন, পরে হুঁশিয়ার হয়ে তা পরিবর্তন করে দিলেন; বরং শরিয়তসমূহে নাসিখ ও মানসুখের অবস্থা একজন বিজ্ঞ হাকিম ও ডাক্তারের ব্যবস্থাপত্রের মতো। ডাক্তার ব্যাপবস্থাপত্রে পর্যায়ক্রমে ঔষধ পরিবর্তন করে। তিনি পূর্ব থেকেই জানেন যে, তিন দিন এ ঔষধ প্রয়োগ করার পর রোগীর মধ্যে এরূপ অবস্থা দেখা দিবে, তখন অমুক ঔষধ সেবন করানো হবে। সুতরাং ডাক্তার যখন পূর্ববর্তী ব্যাবস্থাপত্র রহিত করে নতুন ব্যবস্থাপত্র দেন তখন এরূপ বলা ঠিক নয় যে, পূর্বের ব্যবস্থাপত্রটি ভুল ছিল বলেই রহিত করা হয়েছে; বরং আসল সত্য হচ্ছে এই যে, বিগত দিনগুলোতে সে ব্যবস্থাপত্রই নির্ভুল ও জরুরি ছিল এবং পরবর্তী পরিবর্তিত অবস্থায় পরিবর্তিত এ ব্যবস্থাপত্রই নির্ভুল ও জরুরি।

আলোচ্য আয়াতসমূহে বর্ণিত স্পষ্ট প্রাসঙ্গিক বিধানসমূহের সারসংক্ষেপ :

১. প্রাথমিক আয়াতসমূহের দ্বারা জানা যায় যে, ইহুদিদের দায়েরকৃত মকদ্দমায় মহানবী ﷺ যে ফয়সালা দিয়েছিলেন, তা তাওরাতের শরিয়তানুযায়ী ছিল। এতে প্রমাণিত হয় যে, বিগত শরিয়তসমূহের বিধি-বিধানকে যদি কুরআন অথবা ওহী রহিত না করে, তবে তা যথারীতি বহাল থাকে। যেমন ইহুদিদের মকদ্দমায় কেসাসের সমতা এবং ব্যভিচারের শাস্তিতে প্রস্তর বর্ষণে হত্যার নির্দেশ তাওরাতে ছিল এবং অতঃপর কুরআনও তা হুবহু বহাল রেখেছে।

২. দ্বিতীয় আয়াতে জখমের কেসাস সম্পর্কিত বিধান তাওরাতের বরাত দিয়ে বর্ণনা করা হয়েছে। ইসলামেও এ বিধান রাসূল ﷺ জারি করেছেন। এ কারণেই আলেমদের মতে বিগত শরিয়তসমূহের যেসব বিধান কুরআন রহিত করেনি, সেগুলো আমাদের শরিয়তেও প্রযোজ্য এবং অনুসরণীয়। এর ভিত্তিতেই আলোচ্য আয়াতসমূহে তাওরাতের অনুসারীদেরকে তাওরাত অনুযায়ী এবং ইঞ্জিলের অনুসারীদেরকে ইঞ্জিল অনুযায়ী ফয়সালা দেওয়ার ও আমল করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, অথচ এ গ্রন্থদ্বয় ও তার শরিয়ত মহানবী ﷺ–এর আগমনের সাথে সাথেই রহিত হয়ে গেছে। উদ্দেশ্য এই যে, তাওরাত ও ইঞ্জিলের যেসব বিধান কুরআন রহিত করেনি, সেগুলোর আজও অনুসরণ করা জরুরি।

৩. আল্লাহ প্রেরিত বিধি-বিধান সত্য নয়– এরূপ বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে এসব বিধানের বিরুদ্ধে ফয়সালা করা কুফর, কিন্তু সত্য বিশ্বাস করার পর যদি কার্যতঃ বিপরীত করা হয় তবে তা অন্যায় ও পাপ।

৪. ঘুষ গ্রহণ করা সর্বাবস্থায় হারাম। বিশেষতঃ আইন বিভাগে ঘুষ গ্রহণ করা অধিকতর হারাম।

৫. আলোচ্য আয়াত থেকে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, সব পয়গম্বর ও তাঁদের শরিয়ত মূনীতির ক্ষেত্রে এক ও অভিন্ন, কিন্তু তাদের আংশিক ও শাখাগত বিধি-বিধান বিভিন্ন এবং এ বিভিন্নতা বিরাট রহস্যের উপর নির্ভরশীল।

শব্দ বিশ্লেষণ

قَفَّيْنَا : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّقْفِيَةُ মূলবর্ণ (ق . ف . ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– আমরা পিছনে প্রেরণ করলাম।

مُهَيْمِنًا : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব فَعْلَلَةٌ মাসদার اَلْهَيْمَنَةُ মূলবর্ণ (ه . م . ن) জিনস صحيح অর্থ– সংরক্ষণকারী, রক্ষণাবেক্ষণকারী।

اِسْتَبِقُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِسْتِبَاقُ মূলবর্ণ (س . ب . ق) জিনস صحيح অর্থ– তোমরা দ্রুত অগ্রসর হও/ প্রতিযোগিতা কর।

يُوْقِنُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِيْقَانُ মূলবর্ণ (و . ق . ن) জিনস مثال واوى অর্থ– তারা বিশ্বাস করে।

www.almodina.com

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوا۟ ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَٰرَىٰٓ أَوْلِيَآءَ ۘ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُۥ مِنْهُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّٰلِمِينَ (٥١)

অনুবাদ : (৫১) হে ঈমানদারগণ! তোমরা ইহুদি ও নাসারাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তারা পরস্পর বন্ধু; আর যে ব্যক্তি তোমাদের মধ্য হতে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, নিশ্চয় সে তাদেরই মধ্যে গণ্য হবে, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা সে সমস্ত লোককে সুবুদ্ধি দান করেন না, যারা নিজেদের অনিষ্ট করছে।

فَتَرَى ٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَٰرِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰٓ أَن تُصِيبَنَا دَآئِرَةٌ ۚ فَعَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِىَ بِٱلْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِۦ فَيُصْبِحُوا۟ عَلَىٰ مَآ أَسَرُّوا۟ فِىٓ أَنفُسِهِمْ نَٰدِمِينَ (٥٢)

(৫২) এ কারণেই তোমরা এরূপ লোকদেরকে যাদের অন্তরে পীড়া রয়েছে দেখছ যে, তারা দৌড়ে দৌড়ে তাদের [কাফেরদের] মধ্যে প্রবেশ করছে, এবং বলে, আমাদের আশঙ্কাই হচ্ছে যে, আমাদের উপর কোনো বিপদ এসে পড়ে, অতএব, আশা যে, অচিরেই আল্লাহ তা'আলা [মুসলমানদের] পূর্ণ বিজয় প্রকাশ করবেন অথবা অন্য কোনো বিষয় বিশেষভাবে নিজ পক্ষ হতে [প্রকাশ করবেন] অনন্তর তারা নিজেদের অন্তরে লুক্কায়িত মনোভাবের কারণে লজ্জিত হবে।

وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَهَٰٓؤُلَآءِ ٱلَّذِينَ أَقْسَمُوا۟ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَٰنِهِمْ ۙ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ ۚ حَبِطَتْ أَعْمَٰلُهُمْ فَأَصْبَحُوا۟ خَٰسِرِينَ (٥٣)

(৫৩) আর মুসলমানগণ বলবে, আরে! এরাই নাকি তারা? যারা অতি দৃঢ়তা সহকারে আল্লাহর নামে শপথ করত যে, আমরা তোমাদের সঙ্গেই আছি, তাদের সমস্ত কর্ম [কৌশল]-ই ব্যর্থ হয়ে গেল, ফলে অকৃতকার্য রইল।

শাব্দিক অনুবাদ

(৫১) يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ هে ঈমানদারগণ! لَا تَتَّخِذُوا۟ ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَٰرَىٰٓ أَوْلِيَآءَ তোমরা ইহুদি ও নাসারাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ তারা পরস্পর বন্ধু وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ আর যে ব্যক্তি তোমাদের মধ্য হতে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে فَإِنَّهُۥ مِنْهُمْ নিশ্চয় সে তাদেরই মধ্যে গণ্য হবে إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّٰلِمِينَ নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা সে সমস্ত লোককে সুবুদ্ধি দান করেন না, যারা নিজেদের অনিষ্ট করছে।

(৫২) فَتَرَى এ কারণেই তোমরা এরূপ লোকদেরকে দেখছ যে ٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌ যাদের অন্তরে পীড়া রয়েছে يُسَٰرِعُونَ فِيهِمْ তারা দৌড়ে দৌড়ে তাদের মধ্যে প্রবেশ করছে يَقُولُونَ এবং বলে نَخْشَىٰٓ আমাদের আশঙ্কাই হচ্ছে যে أَن تُصِيبَنَا دَآئِرَةٌ আমাদের উপর কোনো বিপদ এসে পড়ে فَعَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِىَ بِٱلْفَتْحِ অতএব, আশা যে, অচিরেই আল্লাহ তা'আলা পূর্ণ বিজয় প্রকাশ করবেন أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِۦ অথবা অন্য কোনো বিষয় বিশেষভাবে নিজ পক্ষ হতে [প্রকাশ করতেন] فَيُصْبِحُوا۟ عَلَىٰ مَآ أَسَرُّوا۟ فِىٓ أَنفُسِهِمْ نَٰدِمِينَ অনন্তর তারা নিজেদের অন্তরে লুক্কায়িত মনোভাবের কারণে লজ্জিত হবে।

(৫৩) وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ আর মুসলমানগণ বলবে أَهَٰٓؤُلَآءِ এরাই নাকি তারা ٱلَّذِينَ أَقْسَمُوا۟ بِٱللَّهِ যারা আল্লাহর নামে শপথ করত যে جَهْدَ أَيْمَٰنِهِمْ অতি দৃঢ়তা সহকারে إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ আমরা তোমাদের সঙ্গেই আছি حَبِطَتْ أَعْمَٰلُهُمْ এদের সমস্ত কর্ম [কৌশল]-ই ব্যর্থ হয়ে গেল فَأَصْبَحُوا۟ خَٰسِرِينَ ফলে অকৃতকার্য রইল।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَنْ يَّرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهٖ فَسَوْفَ يَاْتِي اللّٰهُ بِقَوْمٍ يُّحِبُّهُمْ وَيُحِبُّوْنَهٗ ۙ اَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اَعِزَّةٍ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ۫ يُجَاهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا يَخَافُوْنَ لَوْمَةَ لَآئِمٍ ؕ ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ (٥٤)

অনুবাদ : (৫৪) হে ঈমানদারগণ! তোমাদের মধ্য হতে যে ব্যক্তি স্বীয় ধর্ম হতে ফিরে যায়, তবে [ইসলামের কোনো ক্ষতি নেই] কেননা আল্লাহ তা'আলা সত্বরই [তাদের স্থলে] এমন এক সম্প্রদায় সৃষ্টি করবেন, যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা ভালোবাসবেন এবং তারাও আল্লাহকে ভালোবাসবে, তারা মুসলমানদের প্রতি মেহেরবান থাকবে, কাফেরদের প্রতি কঠোর হবে, তারা জিহাদ করবে, আল্লাহর পথে, আর তারা কোনো নিন্দুকের নিন্দার পরোয়া করবে না, তা আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ যাকে ইচ্ছা প্রদান করেন, বস্তুত আল্লাহ তা'আলা সুপ্রশস্ত, মহাজ্ঞানী।

اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوا الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ رٰكِعُوْنَ (٥٥)

(৫৫) তোমাদের বন্ধু তো আল্লাহ ও তাঁর রাসূল এবং মুমিনগণ যারা নামাজের পাবন্দি করে, এবং জাকাত আদায় করে, এই অবস্থায় যে, তাদের মধ্যে বিনয় থাকে।

وَمَنْ يَّتَوَلَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فَاِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْغٰلِبُوْنَ (٥٦) ع ٨ ١٢

(৫৬) আর যে ব্যক্তি বন্ধুত্ব রাখবে আল্লাহর সাথে এবং তাঁর রাসূলের সাথে এবং ঈমানদারদের সাথে, তবে [তারা আল্লাহর দলভুক্ত হলো এবং] নিশ্চয় আল্লাহর দলই বিজয়ী।

শাব্দিক অনুবাদ

(৫৪) يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا হে ঈমানদারগণ! مَنْ يَّرْتَدَّ مِنْكُمْ তোমাদের মধ্য হতে যে ব্যক্তি ফিরে যায় عَنْ دِيْنِهٖ স্বীয় ধর্ম হতে فَسَوْفَ يَاْتِي اللّٰهُ بِقَوْمٍ তবে আল্লাহ তা'আলা সত্বরই এমন এক সম্প্রদায় সৃষ্টি করবেন يُّحِبُّهُمْ যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা ভালোবাসবেন وَيُحِبُّوْنَهٗ এবং তারাও আল্লাহকে ভালোবাসবে اَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ তারা মুসলমানদের প্রতি মেহেরবান থাকবে اَعِزَّةٍ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ কাফেরদের প্রতি কঠোর হবে يُجَاهِدُوْنَ তারা জিহাদ করবে فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ আল্লাহর পথে وَلَا يَخَافُوْنَ আর তারা কোনো পরোয়া করবে না لَوْمَةَ لَآئِمٍ নিন্দুকের নিন্দার ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ তা আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ যাকে ইচ্ছা প্রদান করেন وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ বস্তুত আল্লাহ তা'আলা সুপ্রশস্ত, মহাজ্ঞানী।

(৫৫) اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ তোমাদের বন্ধু তো আল্লাহ ও তাঁর রাসূল। وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا এবং মুমিনগণ الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ যারা নামাজের পাবন্দি করে وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ এবং জাকাত আদায় করে وَهُمْ رٰكِعُوْنَ এই অবস্থায় যে, তাদের মধ্যে বিনয় থাকে।

(৫৬) وَمَنْ يَّتَوَلَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ আর যে ব্যক্তি বন্ধুত্ব রাখবে আল্লাহর সাথে এবং তাঁর রাসূলের সাথে। وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا এবং ঈমানদারদের সাথে فَاِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْغٰلِبُوْنَ তবে নিশ্চয় আল্লাহর দলই বিজয়ী।

www.almodina.com

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(৫১) يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُوْدَ وَالنَّصٰرٰٓى اَوْلِيَآءَ الخ **আয়াতের শানে নুযূল– ১ :** ইবনে জারীর ইবনে আবী হাতেম সুদ্দীর মধ্যস্থতায় বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, এক শ্রেণির মানুষের উপর ওহুদের ঘটনাটি অত্যন্ত পীড়াদায়ক হলো এবং ভীতি গ্রস্থ হয়ে পড়ল যে, কাফেররা তাদের সন্ধান পেয়ে যাবে। তখন এক ব্যক্তি তার সঙ্গীকে বলল, আমি অমুক ইহুদিদের সাথে মিলে গিয়ে তার নিকট থেকে নিরাপত্তা গ্রহণ করব, আর আমি কি তার সাথে ইহুদি হয়ে যাব? আমার ভয় হয় ইহুদিরা আমাদের সন্ধান দিয়ে দিবে। অপরজন বলল, আমি কি সিরিয় অমুক খ্রিস্টানদের সাথে মিলে নিরাপত্তা গ্রহণ করব আর তার সাথে কি খ্রিস্টান হয়ে যাব। তারা দু'জন সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়েছে। –[রূহুল মা'আনী : ১৫৬/৩/৬, ইবনে কাছীর : ৭০/২]

শানে নুযূল– ২ : ইকরিমা বলেন, আলোচ্য আয়াত আবূ লুবাবা বিন আবুল মুনযির সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। রাসূল ﷺ তাকে যখন বনূ কুরাইযাদের নিকট প্রেরণ করলেন, তখন তারা তাকে জিজ্ঞেস করল, আমাদের সাথে কি আচরণ করা হবে? সে সময় তিনি হলকুমের দিকে হাত দ্বারা ইশারা দিয়ে জবাই এর প্রতি ইঙ্গিত করলেন। সে পরিপ্রেক্ষিতে উল্লিখিত আয়াত নাজিল হয়েছে। ইবনে জারীর বর্ণনা করেছেন যে, কারো মতে আব্দুল্লাহ বিন উবাই বিন সালুল সম্পর্কে উল্লিখিত আয়াত নাজিল হয়েছে। –[ইবনে কাছীর : ৭০/২]

শানে নুযূল– ৩ : ইবনে জারীর ও ইবনে আবী শায়বা আতিয়া বিন সা'আদের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, তিনি বলেন, বনী হারেছা বিন খাযরাজ হতে আবূ উবাদাহ বিন ছামেত রাসূল ﷺ-এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! ইহুদিদের মাঝে আমার অনেক বন্ধু-বান্ধব রয়েছে। আমি তাদের থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত। ইহুদিদের পরিবর্তে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে বন্ধুত্ব গড়ে নিলাম। আব্দুল্লাহ বিন উবাই তখন বলল, আমি বন্ধুদের প্রতি কালের পট পরিবর্তনে আশঙ্কা করি। সে পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত আয়াত নাজিল করা হয়েছে। –[রূহুল মা'আনী : ১৫৭/৬, কুরতুবী : ২০৪/৬]

(৫৪) يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَنْ يَّرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهٖ **আয়াতের শানে নুযূল– ১ :** হাসান, কাতাদাহ ও অন্যান্য তাফসীরকারকগণ বলেন, আলোচ্য আয়াত হযরত আবূ বকর (রা.) ও তাঁর সাথীবর্গ সম্পর্কে নাজিল হয়েছে।

শানে নুযূল– ২ : সুদ্দী (র.) বলেন, আনসারীদের সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে।

শানে নুযূল– ৩ : আবার কারো কারো মতে এ দ্বারা এমন সম্প্রদায়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, যারা তৎকালে উপস্থিত ছিল না। অর্থাৎ মুরতাদদের ব্যাপারে বলা হয়েছে। কেননা হযরত আবূ বকর (রা.) মুরতাদদের মোকাবিলায় যুদ্ধ করেছেন, যারা আয়াত নাজিল হওয়ার সময় ছিল না। আর তারা হলো ইয়ামানের কিন্দাহ ও আশজা' গোত্রের লোকজন।

শানে নুযূল– ৪ : হাকেম আবূ আব্দুল্লাহ মুস্তাদরাক গ্রন্থে বর্ণনা করেন, নবী করীম ﷺ হযরত আবূ মূসা আশআরীর প্রতি ইঙ্গিত করে বলেন, এরা হচ্ছে সেই সম্প্রদায়! যাদের ব্যাপারে এই আয়াত নাজিল হয়েছে। –[কুরতুবী : ২০৬/৬]

(৫৪) قوله وَلَا يَخَافُوْنَ لَوْمَةَ لَآئِمٍ **আয়াতের শানে নুযূল :** আয়াতের এ অংশ হযরত আবূ বকর, ওমর, উসমান ও আলী (রা.)-এর ইমামতের প্রমাণ বহন করে। কারণ তারা রাসূল ﷺ-এর জীবদ্দশায় আল্লাহর পথে জিহাদ করেছেন এবং তাঁর ইন্তেকালের পর মুরতাদদের মোকাবিলায় জিহাদ করেছেন। সুতরাং এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, এ সকল গুণ যার কাছে থাকে, তিনি আল্লাহর ওলী হবেন এবং জন সাধারণের ইমাম হবেন।

(৫৫) قوله اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوا الخ **আয়াতের শানে নুযূল– ১:** হাকেম ও ইবনে মারদুভিয়া হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, ইবনে সালাম ও তার গোত্রের কিছু লোকজন এসে রাসূল ﷺ-এর প্রতি ঈমান গ্রহণ করে বললল, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের বাড়ি তো অনেক দূরে। এই বৈঠক ভিন্ন কোনো বৈঠক করিনি আর আমাদের গোত্রের লোকজন আমাদেরকে যখন দেখবে আমরা আল্লাহ ও তদীয় রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছি এবং তাঁকে আমরা সমর্থন করেছি তখন ওরা আমাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে। আমাদের সাথে বসবেনা, কথা বলবে না, শাদি-বিবাহের সম্পর্কও গড়বে না। তা আমাদের মাঝে অত্যন্ত পীড়াদায়ক হবে। ফলে রাসূল ﷺ তাদেরকে বললেন, তোমাদের বন্ধুতো হলেন আল্লাহ ও তদীয় রাসূল। অতঃপর রাসূল ﷺ মসজিদে গেলেন। তখন সাহাবীগণ দাঁড়ানো ও রুকু অবস্থায় ইবাদতে রত ছিলেন, সে সময় একজন ভিক্ষুককে দেখলেন, রাসূল ﷺ তাকে জিজ্ঞেস করেন, তোমাকে

www.almodina.com

কেউ কিছু দিয়েছে কি? সে বলল, হ্যাঁ, একটি রৌপ্য আংটি দিয়েছে। এবার জিজ্ঞেস করলেন, তোমাকে কে দিয়েছে? সে ঐ দণ্ডায়মান ব্যক্তি বলে হযরত আলী (রা.)-এর প্রতি ইঙ্গিত করল। এসময় রাসূল ﷺ জিজ্ঞেস করলেন তোমাকে কোন অবস্থায় দিয়েছে? উত্তরে বলল, রুকূ' অবস্থায় দিয়েছে। মহানবী ﷺ একবার তাকবীর বলেন, এবং এ আয়াত তেলাওয়াত করেন। সুতরাং বুঝা গেল যে, হযরত আলী (রা.) -এর নামাজরত অবস্থায় দান করা সম্পর্কে উল্লিখিত আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। –[ইবনে কাছীর : ৭৩/২]

শানে নুযূল– ২ : ইবনে জারীর আতীয়া বিন সাআদের উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, আলোচ্য আয়াত উবাদাহ বিন সা'আদ সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। –[ফাতহুল কাদীর : ৫৩/২]

শানে নুযূল– ৩ : আবূ বকর নাক্কাশ (র.) বর্ণনা করেন, আলোচ্য আয়াত মুহাজির ও আনসারদের সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। আবার কারো মতে হযরত আলী (রা.) সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। –[রূহুল মা'আনী : ১৬৮/৩/৬]

প্রথম আয়াতে মুসলমানদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, তারা যেন ইহুদি ও খ্রিস্টানদের সাথে সামঞ্জস্য ও গভীর বন্ধুত্ব না করে। সাধারণ অমুসলিম এবং ইহুদি ও খ্রিস্টানদের রীতিও তাই। তারা গভীর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক শুধু স্বীয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই ইসীমাবদ্ধ রাখে; মুসলমানদের সাথে এরূপ সম্পর্ক স্থাপন করে না।

এরপর যদি কোনো মুসলমান এ নির্দেশ অমান্য করে কোনো ইহুদি অথবা খ্রিস্টানের সাথে গভীর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করে, তবে সে ইসলামের দৃষ্টিতে সে সম্প্রদায়েরই লোক বলে গণ্য হওয়ার যোগ্য।

তাফসীরবিদ ইবনে জারীর ইকরিমা (রা.)-এর বাচনিক বর্ণনা করেন : এ আয়াতটি একটি বিশেষ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে। ঘটনাটি এই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মদিনায় আগমনের পর পার্শ্ববর্তী ইহুদি ও খ্রিস্টানদের সাথে এই মর্মে চুক্তি স্বাক্ষর করেন যে, তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে নিজেরা যুদ্ধ করবে না; বরং মুসলমানদের সাথে কাঁধ মিলিয়ে আক্রমণকারীকে প্রতিহত করবে। এমনিভাবে মুসলমানরাও তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে না এবং কোনো বহিরাক্রমণকারীর সাহায্য করবে না; বরং আক্রমণকারীকে প্রতিহত করবে। কিছুদিন পর্যন্ত এ চুক্তি উভয় পক্ষেই বলবৎ থাকে, কিন্তু ইহুদিরা স্বভাবগত কুটিলতা ও ইসলাম বিদ্বেষের কারণে বেশিদিন এ চুক্তি মেনে চলতে পারল না এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে মক্কার মুশরিকদের সাথে ষড়যন্ত্র করে তাদেরকে স্বীয় দুর্গে আহ্বান জানিয়ে পত্র লিখল। রাসূলুল্লাহ ﷺ এ ষড়যন্ত্রের কথা জানতে পেরে তাদের বিরুদ্ধে একটি মুজাহিদ বাহিনী প্রেরণ করলেন। বনী কুরাইযার এসব ইহুদি একদিকে মুশরিকদের সাথে হাত মিলিয়ে সড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল এবং অপরদিকে মুসলমানদের দলে অনুপ্রবেশ করে অনেক মুসলমানের সাথে বন্ধুত্বের চুক্তি সম্পাদন করে রেখেছিল। এভাবে মুসলমানদের বিরুদ্ধে মুশরিকদের জন্য গুপ্তচর বৃত্তিতে লিপ্ত ছিল। এ কারণে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয় এবং মুসলমানদেরকে ইহুদি ও খ্রিস্টানদের সাথে গভীর বন্ধুত্ব স্থাপন করতে নিষেধ করে দেওয়া হয়, যাতে শত্রুরা মুসলমানদের বিশেষ সংবাদ সংগ্রহ করতে না পারে। তখন ওবাদা ইবনে ছামেত (রা.) প্রমুখ সাহাবী প্রকাশ্যভাবে তাদের সাথে চুক্তি বিলোপ ও অসহযোগের কথা ঘোষণা করেন। অপরপক্ষে কিছুসংখ্যক লোক, যারা কপট বিশ্বাসের অধীনে মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত ছিল কিংবা যারা তখনো ঈমানের দিক দিয়ে দুর্বল ছিল, তারা ইহুদি ও খ্রিস্টানদের সাথে সম্পর্কেচ্ছেদ করার মধ্যে সমূহ বিপদাশঙ্কা অনুভব করত। তারা চিন্তা করত, যদি মুশরিক ও ইহুদিদের চক্রান্ত সফল হয়ে যায় এবং মুসলমানরা পরাজিত হয়, তবে আমাদের প্রাণ রক্ষার একটা উপায় থাকা দরকার। কাজেই এদের সাথেও সম্পর্ক রাখা উচিত, যাতে তখন আমরা বিপদে না পড়ি। আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সুলুল একারণেই বলল, এদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করা আমার মতে বিপজ্জনক। তাই আমি তা করতে পারি না। এর পরিপ্রেক্ষিতে দ্বিতীয় আয়াতটি অবতীর্ণ হলো : فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ

অর্থাৎ অসহযোগের নির্দেশ শুনে যাদের অন্তরে কপটতাজনিত রোগ ছিল, তারা কাফের বন্ধুদের পানে দৌড়াদৌড়ি শুরু করে দিল এবং বলতে লাগল : এদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদের মধ্যে আমাদের জন্য বিপদাশঙ্কা রয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা এর উত্তরে বলেন : فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنْفُسِهِمْ نَادِمِينَ

অর্থাৎ এরা তো এ কল্পনাবিলাসে মত্ত যে, মুশরিক ও ইহুদিরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে জয়লাভ করবে, কিন্তু আল্লাহ তা'আলার সিদ্ধান্ত এই যে, এরূপ হবে না; বরং মক্কা বিজয় অতি সন্নিকটে অথবা মক্কা বিজয়ের পূর্বেই আল্লাহ তা'আলা মুনাফিকদের মুখোশ উন্মোচন করে তাদেরকে লাঞ্ছিত করবেন। তখন তারা মনের লুক্কায়িত চিন্তাধারার জন্য অনুতপ্ত হবে।

তৃতীয় আয়াতে এ বিষয়টি আরো পরিষ্কার করে বলা হয়েছে যে, যখন মুনাফিকদের মুখোশ উন্মোচিত হবে এবং তাদের বন্ধুত্বের দাবি ও শপথের স্বরূপ ফুটে উঠবে, তখন মুসলমানরা বিস্ময়াভিভূত হয়ে বলবে : এরাই কি আমাদের সাথে আল্লাহর নামে কঠোর শপথ করে বন্ধুত্বের দাবি করত? আজ এদের সব লোক দেখানো ধর্মীয় কার্যকলাপই বিনষ্ট হয়ে গেছে। আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলা মক্কা বিজয় ও মুনাফিকদের লাঞ্ছনার যে বর্ননা দিয়েছেন, তার বাস্তব চিত্র কিছুদিন পর সবাই প্রত্যক্ষ করেছিল।

চতুর্থ আয়াতে বলা হয়েছে যে, মুসলমানদের স্বার্থেই তাদেরকে অমুসলিমদের সাথে গভীর বন্ধুত্ব ও মেলামেশা করতে নিষেধ করা হয়েছে। নতুবা সত্যধর্ম ইসলামের হেফাজতের দায়িত্ব আল্লাহ নিজেই গ্রহণ করেছেন। কোনো ব্যক্তি কিংবা দলের বক্রতা ও অবাধ্যতা দূরের কথা, স্বয়ং মুসলমানদের কোনো ব্যক্তি কিংবা দল যদি সত্যি সত্যি ইসলাম ত্যাগ করে বসে এবং সম্পূর্ণ ধর্মত্যাগী হয়ে অমুসলিমদের সাথে হাত মিলায়, তবে এতেও ইসলামের কোনোই ক্ষতি হবে না–হতে পারে না। কারণ এর হেফাজতের দায়িত্ব সর্বশক্তিমান আল্লাহর। তিনি তৎক্ষণাৎ অন্য কোনো জাতিকে কর্মক্ষেত্রে অবতারণ করবেন, যারা ইসলামের হেফাজত ও প্রচারের কর্তব্য সম্পাদন করবে। আল্লাহ তা'আলার কাজ কোনো ব্যক্তি, বিরাট দল অথবা প্রতিষ্ঠানের উপর নির্ভরশীল নয়। তিনি যখন চান খড়-কুটাকেও কড়িকাঠের কাজে লাগাতে পারেন। অন্যথা কড়ি-কাঠও পচে গলে মাটি হতে থাকে।

এ আয়াতে যেখানে একথা বলা হয়েছে যে, মুসলমানরা ধর্মত্যাগী হয়ে গেলে আল্লাহ তা'আলা কোনো জাতির অভ্যুত্থান ঘটাবেন, সেখানে সেই পুণ্যাত্মা জাতির কিছু গুণাবলিও বর্ণনা করেছেন। যারা ধর্মের কাজ করে, এ গুণগুলোর প্রতি তাদের লক্ষ্য রাখা উচিত। কারণ এসব গুণের অধিকারীরা আল্লাহর দৃষ্টিতে প্রিয় ও মকবুল।

তাদের প্রথম গুণের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে : আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ভালোবাসবেন এবং তারা নিজেরাও আল্লাহ তা'আলাকে ভালোবাসবেন। এ গুণটি দুই অংশে বিভক্ত : (এক) আল্লাহর সাথে তাদের ভালোবাসা। একে কোনো না কোনো স্তরে মানুষের ইচ্ছাধীন মনে করা যায়। কারো সাথে কারো স্বভাবজাত ভালোবাসা না হলেও কমপক্ষে যৌক্তিক ভালোবাসাকে স্বীয় ইচ্ছাধীন রাখতে পারে। এছাড়া স্বভাবজাত ভালোবাসা যদিও ইচ্ছাধীন নয়, কিন্তু এর উপায়-উপকরণগুলো ইচ্ছাধীন। উদাহরণতঃ আল্লাহ তা'আলার মাহাত্ম্য, প্রতাপ, শক্তি-সামর্থ্য এবং মানুষের প্রতি তাঁর অসীম ক্ষমতা ও অগণিত নিয়ামতরাজির ধ্যান ও কল্পনা অবশ্যম্ভাবীরূপে মানুষের মনে আল্লাহর প্রতি স্বভাবজাত ভালোবাসা সৃষ্টি করে দেয়।

কিন্তু দ্বিতীয় অংশ অর্থাৎ, তাদের সাথে আল্লাহ তা'আলার ভালোবাসার ক্ষেত্রে বাহ্যত মানুষের ইচ্ছা ও কর্মের কোনো ভূমিকা নেই। যে বিষয়টি মানুষের ইচ্ছা ও সামর্থ্যের বাইরে, তা মানুষকে শুনানোরও কোনো বাহ্যিক সার্থকতা নেই।

কিন্তু কুরআন পাকের অন্যান্য আয়াতের পর্যালোচনা করলে বুঝা যায় যে, এ ভালোবাসার উপায়-উপকরণগুলোও মানুষের ইচ্ছাধীন। মানুষ যদি এসব উপায়কে কাজে লাগায়, তবে তাদের সাথে আল্লাহ তা'আলার ভালোবাসা অবশ্যম্ভাবী। এসব উপায় নিম্নোক্ত আয়াতে ব্যক্ত হয়েছে : قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِيْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ

অর্থাৎ, হে রাসুল! আপনি বলে দিন : যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাস, তবে আমাকে অনুসরণ কর। এর ফলশ্রুতিতে আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে ভালোবাসতে থাকবেন।

এ আয়াত থেকে জানা গেছে যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার ভালোবাসা লাভ করতে চায়, তার উচিত জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এবং প্রতিটি পদক্ষেপে রাসূল ﷺ-এর সুন্নত অনুসরণে অবিচল থাকা। এমন করলে আল্লাহ তা'আলা তাকে ভালোবাসবেন বলে ওয়াদা দিয়েছেন। এ আয়াত থেকে আরো জানা যায় যে, যে দল সুন্নতের অনুসরণ করে, শরিয়তের নির্দেশ পালনে ত্রুটি করে না এবং নিজেরা সুন্নত বিরোধী কাজ-কর্ম ও বিদ'আত প্রচার করে না, একমাত্র তারাই কুফর ও ধর্মত্যাগের মোকাবিলা করতে সক্ষম।

উপরিউক্ত জাতির দ্বিতীয় গুণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে– أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ অর্থাৎ তারা মুসলমানদের সামনে নম্র হবে এবং কোনো ব্যাপারে মতবিরোধ হলে সত্যপন্থি হওয়া সত্ত্বেও সহজে বশ হয়ে তারা ঝগড়া ত্যাগ করবে। এ অর্থেই রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : أَنَا زَعِيْمٌ بِبَيْتٍ فِيْ رَبَضِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَهُوَ مُحِقٌّ

অর্থাৎ আমি ঐ ব্যক্তিকে জান্নাতের মধ্যস্থলে বাসস্থান দেওয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করেছি, যে সত্যপন্থি হওয়া সত্ত্বেও ঝগড়া ত্যাগ করে।

www.almodina.com

মোটকথা, তারা মুসলমানদের সাথে স্বীয় অধিকার ও কাজ-কারবারের ব্যাপারে কোনোরূপ ঝগড়া-বিবাদ রাখবে না। বাক্যের দ্বিতীয় অংশে أَعِزَّةٍ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এটি عزيز-এর বহুবচন। এর অর্থ প্রবল, শক্তিশালী ও কঠোর। উদ্দেশ্য এই যে, তারা আল্লাহ ও তাঁর ধর্মের শত্রুদের মোকাবিলায় কঠোর ও পরাক্রান্ত। শত্রুরা তাদেরকে সহজে কাবু করতে পারে না।

উভয় বাক্য একত্রিত করলে সারমর্ম এই দাঁড়ায় যে, তারা হবে এমন একটি জাতি, যাদের ভালোবাসা ও শত্রুতা নিজ সত্ত্বা ও সত্ত্বাগত অধিকারের পরিবর্তে শুধু আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও ধর্মের খাতিরে নিবেদিত প্রাণ হবে। এ কারণেই তাদের বন্দুকের নল আল্লাহ ও রাসূলের অনুগতদের দিকে নয়; বরং তাঁর শত্রু ও অবাধ্যদের দিকে নিবদ্ধ থাকবে। সূরা ফাতহে উল্লিখিত أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ আয়াতের বিষয়বস্তুও তাই।

প্রথম গুণের সারমর্ম ছিল অধিকারসমূহে পূর্ণতা এবং দ্বিতীয় গুণের সারমর্ম ছিল বান্দার অধিকার ও কাজ-কারবারের সমতা। তাদের তৃতীয় গুণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ অর্থাৎ তারা সত্যধর্মের প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে জিহাদে প্রবৃত্ত হবে। এর সারমর্ম এই যে, কুফর ও ধর্মত্যাগের মোকাবিলা করার জন্য শুধু কতিপয় প্রচলিত ইবাদত এবং নম্র ও কঠোর হওয়াই যথেষ্ট নয়; বরং ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দীপনাও থাকতে হবে। এ উদ্দীপনাকে পূর্ণতা দানের জন্য চতুর্থ গুণ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ বাক্যে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ, ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত ও সমুন্নত করার চেষ্টায় তারা কোনো ভর্ৎসনাকারীর ভর্ৎসনারই পরওয়া করবে না।

চিন্তা করলে বুঝা যাবে, যে কোনো আন্দোলন পরিচালনার পথে দু'টি বিষয় অন্তরায় হয়ে থাকে। প্রথমতঃ বিরোধী শক্তির প্রবলতা এবং দ্বিতীয়তঃ আপন লোকদের ভর্ৎসনা ও তিরস্কার। অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, যারা আন্দোলন পরিচালনায় দৃঢ়সংকল্প হয়ে অগ্রসর হয়, তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিরোধী শক্তির কাছে নতি স্বীকার করে না– জেল-জুলুম, জখম, হত্যা ইত্যাদি সবকিছুই অম্লানবদনে সহ্য করে নেয়। কিন্তু আপন লোকদের ভর্ৎসনা-বিদ্রূপ ও নিন্দাবাদের মুখে বড় বড় কর্মবীরদেরও পদস্খলন ঘটে। সম্ভবতঃ এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা এখানে এর গুরুত্ব ফুটিয়ে তোলার উদ্দেশ্যে বলেছেন যে, তারা কারো ভর্ৎসনার পরওয়া না করে স্বীয় জিহাদ অব্যাহত রাখবে।

আয়াতের শেষাংশে একথাও বলা হয়েছে যে, এসব গুণ ও উত্তম অভ্যাসসমূহ আল্লাহ তা'আলারই দান। তিনিই যাকে ইচ্ছা এসব গুণ দ্বারা ভূষিত করেন। আল্লাহর অনুগ্রহ ছাড়া মানুষ শুধু চেষ্টাচরিত্রের মাধ্যমে এগুলো অর্জন করতে পারে না।

আয়াতের শব্দসমূহ বিশ্লেষণ করলে এ কথা সুস্পষ্ট হয়ে উঠে যে, মুসলমানদের মধ্য থেকে কিছু লোক ধর্মত্যাগী হয়ে গেলেও ইসলামের কোনো ক্ষতি হবে না; বরং ইসলাম হেফাজত ও সমর্থনের জন্য আল্লাহ তা'আলা একটি উচ্চস্তরের চরিত্র ও আমলের অধিকারী দলকে কর্মক্ষেত্রে অবতারণ করবেন।

তাফসীরবিদগণ বলেছেন : এ আয়াতটি প্রকৃতপক্ষে অনাগত গোলযোগকে প্রতিহতকারী দলের জন্য একটি সুসংবাদ। অনাগত গোলযোগ হচ্ছে ধর্মত্যাগের সে হিড়িক, যার কিছু কিছু জীবাণু নবুয়তের সর্বশেষ দিনগুলোতে পাখা বিস্তার করতে শুরু করেছিল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওফাতের পর তা ঘূর্ণির আকারে সমগ্র আরব উপত্যকায় ছড়িয়ে পড়েছিল। পক্ষান্তরে সুসংবাদ লাভের অধিকারী হচ্ছে সাহবায়ে কেরামের সে দল, যারা প্রথম খলিফা হযরত আবূ বকর (রা.)-এর ডাকে বজ্রকঠোর দৃঢ়তার সাথে ধর্মত্যাগের এ হিড়িককে স্তব্ধ করে দেন।

ঘটনাগুলো ছিল এই : সর্বপ্রথম মুসায়লামাতুল কাযযাব মহানবী ﷺ-এর সাথে নবুয়তে অংশীদারিত্বের দাবি করে। তার ধৃষ্টতা এত চরমে পৌঁছে যে, সে মহানবী ﷺ-এর দূতকে অপমান করে ফেরত পাঠিয়ে দেয়। সে দূতদেরকে হুমকি দিয়ে বলে : যদি দূতদেরকে হত্যা করা আন্তর্জাতিক আইনের পরিপন্থি না হতো, তবে আমি তোমাদেরকে হত্যা করতাম। মুসায়লামা স্বীয় দাবিতে মিথ্যাবাদি ছিল। হুজুর ﷺ তার বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করার পূর্বেই ইন্তেকাল করেন।

এমনিভাবে ইয়ামনে মুযজাজ গোত্রের সর্দার আসওয়াদ আ'নাসী নবুয়তের দাবি করে বসে। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে দমন করার জন্য ইয়ামনে নিযুক্ত গভর্নরকে নির্দেশ দেন। কিন্তু যে রাত্রে তাকে হত্যা করা হয়, তার আগের দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ ওফাত পান। রবিউল আউয়াল মাসের শেষ দিকে সাহাবায়ে কেরামের কাছে এ সংবাদ পৌঁছে। বনী আসাদ গোত্রেও এমনি ধরনের ঘটনা ঘটে। তাদের সর্দার তোলায়হা ইবনে খুওয়াইলেদ নবুয়ত দাবি করে বসে।

উপরিউক্ত তিনটি গোত্র হুজুরে আকরাম ﷺ-এর রোগ শয্যায় থাকা অবস্থায়ই ধর্মত্যাগী হয়ে যায়। অতঃপর তাঁর ওফাতের সংবাদ প্রচারিত হওয়ার সাথে সাথে সর্বত্র ধর্মত্যাগের হিড়িক পড়ে যায়। আরবের সাতটি গোত্র বিভিন্ন স্থানে ইসলাম ও ইসলামি রাষ্ট্রের আনুগত্য বর্জন করে। তারা প্রথম খলিফা হযরত আবূ বকর সিদ্দিক (রা.) কে ইসলামি আইন অনুযায়ী জাকাত প্রদান করতে অস্বীকার করে।

হুজুর ﷺ-এর ওফাতের পর দেশ ও জাতির দায়িত্ব প্রথম খলিফা হযরত আবূ বকর (রা.)-এর কাঁধে অর্পিত হয়। একদিকে তাঁরা ছিলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বিয়োগ ব্যাথায় মুহ্যমান: অপরদিকে ছিল গোলযোগ ও বিদ্রোহের হিড়িক। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ওফাতের পর আমার পিতা হযরত আবূ বকরের উপর যে বিপদের বোঝা পতিত হয়, তা কোনো পাহাড়ের উপর পতিত হলে পাহাড়ও চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যেত, কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাঁকে এমন দুর্জয় শক্তি, সাহস ও দৃঢ়তা দান করেন যে, তিনি অমিত বিক্রমে সমস্ত আপদ-বিপদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যান এবং সর্বশেষ সফলকাম হন।

এটা জানা কথা যে, শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমেও বিদ্রোহের মোকাবিলা করা যায়, কিন্তু তখনকার পরিস্থিতি এতই নাজুক ছিল যে, হযরত আবূ বকর (রা.) সাহাবায়ে কেরামের কাছে পরামর্শ চাইলে কেউ সে পরিস্থিতিতে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে মত দিলেন না। সাহাবায়ে কেরাম অন্তর্দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়ে পড়লে বহিঃশক্তি এ নবীন ইসলামি দেশটির উপর চড়াও হয়ে পড়তে পারে এমন আশঙ্কাও ছিল। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা স্বীয় সিদ্দীকের অন্তরকে এ জিহাদের জন্য পাথরের মতো মজবুত করে দিলেন। তিনি সাহাবায়ে কেরামের সামনে এমন এক মর্মভেদী ভাষণ দিলেন, যার ফলে এ জিহাদের অপরিহার্যতা সম্পর্কে কারো মনে কোনোরূপ দ্বিধা-দ্বন্দ্ব অবশিষ্ট রইল না। তিনি নিম্নোক্ত ভাষায় স্বীয় দৃঢ়তা ও অসম সাহসিকতা সবার সামনে তুলে ধরেন :

"যারা মুসলমান হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রদত্ত নির্দেশ ও ইসলামি আইনকে অস্বীকার করে, তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করা আমার কর্তব্য। যদি আমার বিপক্ষে সব জিন-মানব ও বিশ্বের যাবতীয় বৃক্ষ প্রস্তর একত্রিত করে আনা হয় এবং আমার সাথে কেউ না থাকে, তবুও আমি একা এ জিহাদ চালিয়ে যাব।"

একথা বলে তিনি ঘোড়ায় চড়ে এগিয়ে যেতে লাগলেন। তখন সাহাবায়ে কেরাম সামনে এগিয়ে এলেন এবং তাঁকে এক জায়গায় বসিয়ে অল্পক্ষণের মধ্যে বিভিন্ন রণাঙ্গনে বিভিন্ন বাহিনী প্রেরণের জন্য মানচিত্র তৈরি করে ফেললেন।

এ কারণেই হযরত আলী মুর্তাজা (রা.) হাসনা বসরী (র.), যাহহাক (র.) প্রমুখ তাফসীরবিদগণ বর্ণনা করেন যে, এ আয়াতটি হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) ও তাঁর সহকর্মীদের সম্পর্কেই অবতীর্ণ হয়েছে। আয়াতে যে জাতিকে আল্লাহর পক্ষ থেকে কর্মক্ষেত্রে আনার কথা বর্ণিত হয়েছে, তাঁরাই হলেন সর্বপ্রথম সে জাতি।

কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, অন্য কোনো দল আয়াতে কথিত জাতি হবে না: বরং অন্যদের বেলায়ও এ আয়াতটি প্রযোজ্য হতে পারে। যারা হযরত আবূ মূসা আশ'আরী (রা.) ও অন্যান্য সাহাবায়ে কেরামকে আয়াতের প্রতীক বলে আখ্যা দিয়েছেন, তাঁরাও এর বিরোধী নন; বরং নির্ভুল বক্তব্য এই যে, তাঁরা সবাই এবং কিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী যেসব মুসলমান কুরআনি নির্দেশ অনুযায়ী কুফর ও ধর্মত্যাগের মোকাবিলা করবে, তাঁরাও এ আয়াতের লক্ষ্যণভুক্ত। মোটকথা, সাহাবায়ে কেরামের একটি দল খলিফার নির্দেশে এ গোলযোগ দমনে তৈরি হয়ে গেলেন। হযরত খালেদ ইবনে ওয়ালীদ (রা.)-কে একটি বিরাট বাহিনীসহ মুসায়লামাকে দমন করার উদ্দেশ্যে ইয়ামামার দিকে প্রেরণ করা হলো। সেখানে মুসায়লামার দল যথেষ্ট শক্তি সঞ্চয় করে নিয়েছিল। তুমুল যুদ্ধের পর মুসায়লামা হযরত ওয়াহশী (রা.)-এর হাতে নিহত হলো এবং তার দল তওবা করে পুনরায় মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল। এমনিভাবে তোলায়হা ইবনে খুওয়াইলেদের মোকাবিলায়ও হযরত খালেদ (রা.) ই গমন করলেন। তোলায়হা পলায়ন করে দেশের বাইরে চলে যায়। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাকে পুনরায় ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য দান করেন এবং সে মুসলমান হয়ে ফিরে আসে।

সিদ্দীকী খেলাফতের প্রথম মাসে রবিউল আউয়ালের শেষ দিকে আসওয়াদ আ'নাসীর হত্যা ও তার গোত্রের বশ্যতা স্বীকারের সংবাদ মদিনায় পৌঁছে। এটিই ছিল সর্বপ্রথম বিজয়বার্তা, যা চরম সঙ্কটময় মুহূর্তে খলিফা লাভ করেছিলেন। এমনিভাবে অন্যান্য জাকাত অস্বীকারকারীদের মোকাবিলায় আল্লাহ তা'আলা প্রতিটি রণাঙ্গণে সাহাবায়ে কেরামকে প্রকাশ্য বিজয় দান করেন।

www.almodina.com

এভাবে তৃতীয় আয়াতের শেষভাগে উল্লিখিত فَاِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ (নিশ্চয় আল্লাহভক্তদের দলই বিজয়ী)। আল্লাহ তা'আলার এ উক্তির বাস্তব ব্যাখ্যা পৃথিবীবাসী স্বচক্ষে দেখতে পায়। ঐতিহাসিক বাস্তবতার আলোকে যখন একথা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত যে, মহানবী ﷺ-এর ওফাতের পর আরবে ধর্মত্যাগের হিড়িক পড়ে যায় এবং এর মোকাবিলার জন্য আল্লাহ তা'আলা যে জাতিকে কর্মক্ষেত্রে আনয়ন করেন তাঁরা হলেন, হযরত আবূ বকর (রা.) ও তাঁর সহকর্মী সাহাবায়ে কেরাম, তখন এ আয়াত থেকেই এ কথাও প্রমাণিত হয় যে, এ দলের যেসব গুণ কুরআন পাক বর্ণনা করেছে, তা সবই হযরত আবূ বকর رضي الله عنه ও তাঁর সহকর্মী সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে বিদ্যমান ছিল। অর্থাৎ–

- প্রথমতঃ আল্লাহ তা'আলা তাঁদেরকে ভালোবাসেন।
- দ্বিতীয়তঃ তাঁরা আল্লাহ তা'আলাকে ভালোবাসেন।
- তৃতীয়তঃ তাঁরা সবাই মুসলমানদের ব্যাপারে নম্র এবং কাফেরদের বেলায় কঠোর।
- চতুর্থতঃ তাঁদের জিহাদ নিশ্চিত রূপেই আল্লাহর পথে ছিল এবং এতে তাঁরা কোনো ভর্ৎসনাকারীর ভর্ৎসনার পরওয়া করেননি।

আয়াতের শেষভাগে এ পরম সত্যটি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে যে, এসব গুণ, এগুলো যথাসময়ে প্রয়োগ, এগুলোর মাধ্যমে ইসলামি জিহাদে সাফল্য অর্জন প্রভৃতি বিষয় শুধুমাত্র চেষ্টা-তদবীর, শক্তি অথবা দলের জোরে অর্জিত হয় না; বরং এ সবই আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ। তিনিই যাকে ইচ্ছা এই অনুগ্রহ দান করেন।

উপরিউক্ত চার আয়াতে মুসলমানদেরকে কাফেরদের সাথে গভীর বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করা হয়েছে। পঞ্চম আয়াতে প্রমাণিত সত্য হিসেবে বলা হয়েছে যে, মুসলমানদের গভীর বন্ধুত্ব ও বিশেষ বন্ধুত্ব যাদের সাথে স্থাপিত হতে পারে, তারা কারা? এ প্রসঙ্গে সর্বপ্রথম আল্লাহ তা'আলা ও অতঃপর তাঁর রাসূলের উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা প্রকৃতপক্ষে মুসলমানদের বন্ধু ও সাথী সর্বকালে ও সর্বাবস্থায় আল্লাহ তা'আলাই আছেন এবং তিনিই হতে পারেন। তাঁর সম্পর্ক ছাড়া যত সম্পর্ক ও বন্ধুত্ব আছে সবই ধ্বংসশীল। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সম্পর্কও প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তা'আলারই সম্পর্ক; পৃথক নয়। তৃতীয় পর্যায়ে মুসলমানদের সাথী ও আন্তরিক বন্ধু ঐসব মুসলমানকে সাব্যস্ত করা হয়েছে, যারা শুধু নামে নয়– সত্যিকার মুসলমান। তাঁদের গুণাবলি ও লক্ষণাদি বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে :

اَلَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ رٰكِعُوْنَ প্রথমতঃ তাঁরা পূর্ণ আদব ও শর্তাদিসহ নিয়মিত নামাজ পড়ে। দ্বিতীয়তঃ স্বীয় অর্থ-সম্পদ থেকে জাকাত প্রদান করে। তৃতীয়তঃ তারা বিনম্র ও বিনয়ী; স্বীয় সৎকর্মের জন্য গর্বিত নয়।

তৃতীয় বাক্য وَهُمْ رٰكِعُوْنَ এ رُكُوْعٌ শব্দের কয়েকটি অর্থ হতে পারে। তাই কোনো কোনো তাফসীরবিদ বলেন : এখানে রুকূ'-এর অর্থ পারিভাষিক রুকূ', যা নামাজের একটি রুকন। يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ এর পর وَهُمْ رٰكِعُوْنَ বাক্যটি ব্যবহার করার উদ্দেশ্যে মুসলমানদের নামাজকে অপরাপর সম্প্রদায়ের নামাজ থেকে ভিন্নরূপে প্রকাশ করা। কারণ, ইহুদি ও খ্রিস্টানরাও নামাজ পড়ে; কিন্তু তাদের নামাজে রুকূ' নেই। রুকূ' একমাত্র ইসলামি নামাজেরই স্বাতন্ত্র্যমূলক বৈশিষ্ট্য। –[মাযহারী]

কিন্তু অন্যান্য তাফসীরবিদ বলেন : এখানে রুকূ' শব্দ দ্বারা আভিধানিক অর্থই বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ নত হওয়া, বিনয় নম্রতা ও অক্ষমতা প্রকাশ করা। বাহরে মুহীত গ্রন্থে আবূ হাইয়্যান এবং কাশশাফ গ্রন্থে যমখশরী এ অর্থই গ্রহণ করেছেন। এছাড়া তাফসীরে মাযহারী এবং বয়ানুল কুরআনেও এ অর্থই নেওয়া হয়েছে। অতএব, বাক্যটির অর্থ হচ্ছে এই যে, তারা স্বীয় সৎকর্মের জন্য গর্ব করে না; বরং বিনয় ও নম্রতা তাদের স্বভাব।

কোনো কোনো রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে, এ বাক্যটি হযরত আলী (রা.)-এর বিশেষ একটি ঘটনা সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। একদিন হযরত আলী (রা.) নামাজ পড়ছিলেন। যখন তিনি রুকূ'তে গেলেন, তখন জনৈক ভিক্ষুক কিছু ভিক্ষা চাইল। তিনি রুকূ' অবস্থায়ই অঙ্গুলি থেকে আংটি বের করে ভিক্ষুকের দিকে নিক্ষেপ করে দিলেন। নামাজ শেষে ভিক্ষুকের প্রয়োজন মিটাবেন, এতটুকু দেরি করাও তিনি পছন্দ করেননি। তিনি সৎকাজে যে দ্রুততা প্রদর্শন করলেন, তা আল্লাহ তা'আলার খুব পছন্দ হয় এবং আলোচ্য বাক্যের মাধ্যমে তার মূল্য দেওয়া হয়।

এ রেওয়ায়েতের সনদ আলেম ও হাদীসবিদদের মতে সর্বসম্মত নয়। তবে রেওয়ায়েতটি বিশুদ্ধ সাব্যস্ত হলে এর সারমর্ম হবে এই যে, মুসলমানদের গভীর বন্ধুত্বের যোগ্য তারাই হবে, যারা নামাজ ও জাকাতের পাবন্দি করে। বস্তুতঃ তাদের মধ্যে বিশেষভাবে হযরত আলী (রা.) এ বন্ধুত্বের অধিক যোগ্য। এক হাদীসে রাসূল বলেন, مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ অর্থাৎ আমি যার বন্ধু আলীও তার বন্ধু।

হযরত আলী (রা.)-কে এ বিশেষ সম্মানে ভূষিত করার কারণ সম্ভবতঃ এই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর অন্তর্দৃষ্টিতে ভবিষ্যত গোলযোগের ঘটনাবলি ফুটে উঠেছিল যে, কিছু লোক হযরত আলী (রা.)-এর শত্রুতায় মেতে উঠবে এবং তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পতাকা উত্তোলন করবে। খারেজী সম্প্রদায়ের গোলযোগের দরুন পরবর্তীকালে তাই প্রকাশ পেয়েছে।

মোটকথা, আয়াতটি এ ঘটনা সম্পর্কে অবতীর্ণ হলেও আয়াতের ভাষা ব্যাপক; সাহাবায়ে কেরাম ও সব মুসলমানও এর অন্তর্ভুক্ত। বক্তব্যের দিক দিয়ে কোনো এক ব্যক্তির সাথে আয়াতের বিশেষত্ব নেই। এ কারণেই হযরত ইমাম বাকের (র.)-কে যখন কেউ জিজ্ঞেস করল : الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا আয়াতে কি হযরত আলী (রা.)-কে বুঝানো হয়েছে? তিনি উত্তরে বললেন : মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার দিক দিয়ে তিনি আয়াতের লক্ষ্যভুক্ত।

অতঃপর দ্বিতীয় আয়াতে যারা কুরআনের নির্দেশ পালন করে বিজাতির সাথে গভীর বন্ধুত্ব করা থেকে বিরত থাকে এবং শুধু আল্লাহ, রাসূল ও মুসলমানদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, তাদেরকে বিজয় ও বিশ্বজয়ী হওয়ার সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে–

وَمَنْ يَّتَوَلَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فَاِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْغٰلِبُوْنَ

এতে বলা হয়েছে যে, যেসব মুসলমান আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ পালন করে, তারা আল্লাহর দল। এরপর সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে যে, পরিণামে আল্লাহর দলই সবার উপর জয়ী হবে।

পরবর্তী ঘটনাবলি থেকে সবাই প্রত্যক্ষ করে নিয়েছে যে, সাহাবায়ে কেরাম (রা.) সবার উপর জয়ী হয়েছেন। যে শক্তিই এ পাহাড়ে মাথা ঠুকেছে, সে ই চুর্ণ–বিচুর্ণ হয়ে গেছে। প্রথম খলিফার বিরুদ্ধে আভ্যন্তরীণ গোলযোগ ও বিদ্রোহ মাথাচাড়া দিয়ে উঠলে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে সবার বিরুদ্ধে বিজয়ী করেন। হযরত ফারূকে আযম (রা.)-এর মোকাবিলায় বিশ্বের বৃহৎ শক্তিদ্বয় কায়সার ও কেসরা অবতীর্ণ হলে আল্লাহ তা'আলা তাদের নাম নিশানা পর্যন্ত মিটিয়ে দেন। তাঁদের পর খলিফা ও মুসলমানদের মধ্যে যতদিন আল্লাহর এসব নির্দেশ পালন অব্যাহত রয়েছে এবং মুসলমানরা বিজাতির সাথে মেলামেশা ও গভীর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনে বিরত রয়েছে, ততদিন তাদেরকে বিজয়ী বেশেই দেখা গেছে।

শব্দ বিশ্লেষণ

اَسَرُّوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفعَالٌ মাসদার اَلْاِسْرَارُ মূলবর্ণ (س . ر . ر) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– লুকানো, গোপন করা।

اَذِلَّةٍ শব্দটি বহুবচন, একবচন ذَلِيْلٌ অর্থ– মেহেরবান, দয়া।

اَعِزَّةٍ শব্দটি বহুবচন, একবচন عَزِيْزٌ অর্থ– শক্তিমান, ইজ্জত ওয়ালা।

يَتَوَلَّ সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব تَفَعُّلٌ মাসদার اَلتَّوَلِّىْ মূলবর্ণ (و . ل . ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ– যে কেউ বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে।

www.almodina.com

অনুবাদ	আয়াত
অনুবাদ : (৫৭) হে ঈমানদারগণ! যারা তোমাদের পূর্বে কিতাব প্রাপ্ত হয়েছে, যাদের অবস্থা এরূপ যে, তারা তোমাদের ধর্মকে হাসি ও তামাশার বস্তু করে রেখেছে, তাদেরকে এবং অন্যান্য কাফেরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না এবং আল্লাহ তা'আলাকে ভয় কর, যদি তোমরা ঈমানদার হয়ে থাক।	يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا دِيْنَكُمْ هُزُوًا وَّلَعِبًا مِّنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ اَوْلِيَآءَ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ (৫৭)
(৫৮) আর যখন তোমরা নামাজের জন্য [আজান দ্বারা] আহ্বান কর, তখন তারা তার [ঐ ইবাদতের] সাথে হাসি তামাশা করে, এটার কারণ এই যে, তারা এরূপ লোক যে, মোটেই জ্ঞান রাখে না।	وَاِذَا نَادَيْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ اتَّخَذُوْهَا هُزُوًا وَّلَعِبًا ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُوْنَ (৫৮)
(৫৯) আপনি বলে দিন, হে আহলে কিতাবগণ! তোমরা আমাদের মধ্যে কোন কাজটি দূষণীয় পাচ্ছ? এটা ব্যতীত যে, আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর প্রতি এবং ঐ কিতাবের প্রতি যা আমাদের নিকট প্রেরিত হয়েছে এবং ঐ কিতাবের প্রতি যা অতীতে প্রেরিত হয়েছে, অথচ তোমাদের অধিকাংশ লোক [উল্লিখিত কিতাবসমূহের প্রতি] ঈমান [এর গণ্ডি] হতে বহির্ভূত।	قُلْ يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ هَلْ تَنْقِمُوْنَ مِنَّاۤ اِلَّاۤ اَنْ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَمَاۤ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ ۙ وَاَنَّ اَكْثَرَكُمْ فٰسِقُوْنَ (৫৯)

শাব্দিক অনুবাদ

(৫৭) يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا হে ঈমানদারগণ! لَا تَتَّخِذُوْا তাদেরকে গ্রহণ করো না الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا যাদের অবস্থা এরূপ যে তারা করে রেখেছে دِيْنَكُمْ তোমাদের ধর্মকে هُزُوًا وَّلَعِبًا হাসি ও তামাশার বস্তু مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ যারা কিতাব প্রাপ্ত হয়েছে مِنْ قَبْلِكُمْ তোমাদের পূর্বে وَالْكُفَّارَ এবং অন্যান্য কাফেরদেরকে اَوْلِيَآءَ বন্ধুরূপে وَاتَّقُوا اللّٰهَ এবং আল্লাহ তা'আলাকে ভয় কর اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ যদি তোমরা ঈমানদার হয়ে থাক।

(৫৮) وَاِذَا نَادَيْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ আর যখন তোমরা নামাজের জন্য [আজান দ্বারা] আহ্বান কর اتَّخَذُوْهَا هُزُوًا وَّلَعِبًا তখন তারা তার সাথে হাসি তামাশা করে ذٰلِكَ এটার কারণ এই যে بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُوْنَ তারা এরূপ লোক যে, মোটেই জ্ঞান রাখে না।

(৫৯) قُلْ আপনি বলে দিন يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ হে আহলে কিতাবগণ! هَلْ تَنْقِمُوْنَ مِنَّاۤ তোমরা আমাদের মধ্যে কোন কাজটি দূষণীয় পাচ্ছ اِلَّاۤ اَنْ اٰمَنَّا এটা ব্যতীত যে, আমরা ঈমান এনেছি بِاللّٰهِ আল্লাহর প্রতি وَمَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْنَا এবং ঐ কিতাবের প্রতি যা আমাদের নিকট প্রেরিত হয়েছে وَمَاۤ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ এবং ঐ কিতাবের প্রতি যা অতীতে প্রেরিত হয়েছে وَاَنَّ اَكْثَرَكُمْ فٰسِقُوْنَ অথচ তোমাদের অধিকাংশ লোক ঈমান হতে বহির্ভূত।

قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّنْ ذٰلِكَ مَثُوْبَةً عِنْدَ اللّٰهِ ۚ مَنْ لَّعَنَهُ اللّٰهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيْرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوْتَ ۚ أُولٰٓئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَّأَضَلُّ عَنْ سَوَآءِ السَّبِيْلِ (٦٠)

অনুবাদ : (৬০) আপনি বলে দিন, আমি কি তোমাদের এরূপ পন্থা বলে দিব, যা প্রতিদান প্রাপ্তি হিসেবে তা হতেও [যাকে তোমরা মন্দ বলে জান] আল্লাহর নিকট অধিক নিকৃষ্ট, এটা ঐ সমস্ত লোকদের পন্থা, যাদেরকে আল্লাহ অভিসম্পাত করেছেন এবং যাদের প্রতি গজব নাজিল করেছেন এবং যাদেরকে বানর ও শূকর বানিয়ে দিয়েছেন, এবং তারা শয়তানের পূজা করেছে, এরূপ লোক [যাদের কথা বর্ণিত হলো পরকালে] বাসস্থান হিসেবেও [যা তারা প্রতিদান হিসেবে পাবে] খুবই মন্দ এবং [ইহকালেও] সরল পথ হতে বহুদূরে।

وَإِذَا جَآءُوْكُمْ قَالُوْٓا اٰمَنَّا وَقَدْ دَّخَلُوْا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوْا بِهٖ ۚ وَاللّٰهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوْا يَكْتُمُوْنَ (٦١)

(৬১) আর যখন এরা তোমাদের নিকট আগমন করে, তখন বলে আমরা ঈমান এনেছি, অথচ তারা কুফরই নিয়ে এসেছিল, এবং তারা কুফর নিয়ে চলে গেছে, এবং আল্লাহ তো খুব জানেন, যা তারা গোপন রাখে।

وَتَرٰى كَثِيْرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُوْنَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ ۚ لَبِئْسَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ (٦٢)

(৬২) আর আপনি তাদের মধ্যে এমন অনেক লোক দেখছেন, যারা দৌড়ে দৌড়ে পাপ এবং জুলুম এবং হারাম ভক্ষণে নিপতিত হচ্ছে, বাস্তবিকই তাদের এই কার্য মন্দ।

لَوْلَا يَنْهٰهُمُ الرَّبّٰنِيُّوْنَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ ۚ لَبِئْسَ مَا كَانُوْا يَصْنَعُوْنَ (٦٣)

(৬৩) তাদেরকে আল্লাহওয়ালাগণ এবং আলেমগণ পাপের কথা হতে এবং হারাম মাল ভক্ষণ করা হতে কেন নিষেধ করছে না? বাস্তবিকই তাদের এই অভ্যাস নিন্দনীয়।

শাব্দিক অনুবাদ

(৬০) قُلْ আপনি বলে দিন هَلْ أُنَبِّئُكُمْ আমি কি তোমাদের এরূপ পন্থা বলে দিব بِشَرٍّ مِّنْ ذٰلِكَ যা তা হতেও অধিক নিকৃষ্ট مَثُوْبَةً প্রতিদান প্রাপ্তি হিসেবে عِنْدَ اللّٰهِ আল্লাহর নিকট مَنْ لَّعَنَهُ اللّٰهُ এটা ঐ সমস্ত লোকদের পন্থা, যাদেরকে আল্লাহ অভিসম্পাত করেছেন وَغَضِبَ عَلَيْهِ এবং যাদের প্রতি গজব নাজিল করেছেন وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيْرَ এবং যাদেরকে বানর ও শূকর বানিয়ে দিয়েছেন وَعَبَدَ الطَّاغُوْتَ এবং তারা শয়তানের পূজা করেছে أُولٰٓئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا এরূপ লোক বাসস্থান হিসেবেও খুবই মন্দ وَّأَضَلُّ عَنْ سَوَآءِ السَّبِيْلِ এবং সরল পথ হতে বহুদূরে।

(৬১) وَإِذَا جَآءُوْكُمْ আর যখন এরা তোমাদের নিকট আগমন করে। قَالُوْٓا তখন বলে اٰمَنَّا আমরা ঈমান এনেছি وَقَدْ دَّخَلُوْا بِالْكُفْرِ অথচ তারা কুফর নিয়ে এসেছিল وَهُمْ قَدْ خَرَجُوْا بِهٖ এবং তারা কুফর নিয়ে চলে গেছে وَاللّٰهُ أَعْلَمُ এবং আল্লাহ তো খুব জানেন بِمَا كَانُوْا يَكْتُمُوْنَ যা তারা গোপন রাখে।

(৬২) وَتَرٰى كَثِيْرًا مِّنْهُمْ আর আপনি তাদের মধ্যে এমন অনেক লোক দেখছেন يُسَارِعُوْنَ যারা দৌড়ে দৌড়ে নিপতিত হচ্ছে فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ পাপ এবং জুলুমে وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ এবং হারাম ভক্ষণে لَبِئْسَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ বাস্তবিকই তাদের এই কার্য মন্দ।

(৬৩) لَوْلَا يَنْهٰهُمُ তাদেরকে কেউ নিষেধ করছে না الرَّبّٰنِيُّوْنَ আল্লাহওয়ালাগণ وَالْأَحْبَارُ এবং আলেমগণ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ পাপের কথা হতে وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ এবং হারাম মাল ভক্ষণ করা হতে কেন لَبِئْسَ مَا كَانُوْا يَصْنَعُوْنَ বাস্তবিকই তাদের এই অভ্যাস নিন্দনীয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(৫৭) يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا دِيْنَكُمْ هُزُوًا وَّلَعِبًا الخ **আয়াতের শানে নুযূল– ১ :** ইবনে ইসহাক, ইবনে জারীর, ইবনুল মুনযির, ইবনে আবী হাতেম ও আবূশ শায়খ প্রমুখ হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রেফাআহ বিন যায়েদ বিন আত্তাবুত ও সুওয়াইদ বিন হারেছ ইসলাম প্রকাশ করে মুনাফেকী করেছিল। মুসলমানরা তাদের সাথে বন্ধুত্বতার সুসম্পর্ক রেখেছিল। সুতরাং মুনাফিকদের সাথে বন্ধুত্ব রাখা নিষেধ করার পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত আয়াত নাজিল হয়েছে। –[ফাতহুল কাদীর : ৫৬/২, রূহুল মা'আনী : ১৭১/৩/৬]

শানে নুযূল– ২ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুসলমানরা নামাজ আদায় করার সময় যখন সেজদা করতেন, তখন ইহুদি ও মুশরিকরা তাদেরকে নিয়ে হাসি উল্লাস করত। সুতরাং মুসলমানদের নামাজ নিয়ে ইহুদি ও মুশরিকদের উল্লাস করার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। –[কুরতুবী : ২০৯/৬, রূহুল মা'আনী : ১৭১/৩/৬, ফাতহুল কাদীর : ৫৬/২]

(৫৮) وَاِذَا نَادَيْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ اتَّخَذُوْهَا هُزُوًا وَّلَعِبًا الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** আল্লামা কালবী (র.) বলেন, মুয়াজ্জিন যখন আজান দিতেন এবং নামাজে দাড়াতেন, রুকূ' ও সেজদা করতেন, তখন ইহুদিরা তাদেরকে নিয়ে হাসি উল্লাস করে আজান সম্পর্কে মন্তব্য করত যে, ওরা একটি নতুন প্রথা আবিষ্কার করেছে। অতীতে কোনো জাতির মাঝে এমন কিছু রীতি নীতির কথা শুনতে পাইনি। সে প্রেক্ষিতে উক্ত আয়াত নাজিল হয়। –[রূহুল মা'আনী : ১৭২/৩/৬, কুরতুবী : ২২১/৬]

(৫৯) قُلْ يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ هَلْ تَنْقِمُوْنَ مِنَّاۤ اِلَّاۤ اَنْ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** ইবনে ইসহাক, ইবনে জারীর, ইবনুল মুনযির, ইবনে আবী হাতেম ও আবুশ শায়খ প্রমুখ হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ-এর নিকট কয়েকজন ইহুদি এসে জানতে চায় যে, তারা রাসূলের মধ্য হতে কাদের প্রতি ঈমান রাখবে? রাসূল ﷺ বলেন, আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়ন কর, ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকূব (আ.) এবং নবীগণের প্রতি যা আল্লাহ তা'আলা অবতরণ করেছেন, তার প্রতি ঈমান আনবে। হযরত মূসা (আ.), ঈসা (আ.) কে এবং নবীগণের প্রতি তাদের রবের পক্ষ হতে যা প্রদান করা হয়েছে তার প্রতি ঈমান আনবে। প্রতি উত্তরে তারা বলল, আমরা তাদের মাঝে কোনো প্রকারের পার্থক্য করিনি; বরং আমরা সকলকে মান্য করি। পরক্ষণেই হযরত ঈসা (আ.)-এর কথা যখন আলোচনা করা হলো। তখন তাঁর নবুয়তকেই তারা অস্বীকার করে বলল, ঈসার প্রতি এবং ঈসার প্রতি যারা ঈমান রাখে তাদের হতে কারো প্রতি আমরা ঈমান আনব না। সুতরাং এ পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা উক্ত আয়াত নাজিল করেন। –[ফাতহুল কাদীর : ৫৬/২]

(৬০) قوله قُلْ يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ هَلْ تَنْقِمُوْنَ مِنَّاۤ اِلَّاۤ اَنْ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** ইবনে ইসহাক ও ইবনে জারীর প্রমুখ হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, ইহুদিদের থেকে কতিপয় ব্যক্তিবর্গ আবূ ইয়াসের বিন আখতাব, নাফে' বিন আবী নাফে', গাযী বিন আমর ও খালেদ ইযার বিন আবী ইযার নবী করীম ﷺ-এর নিকট এসে জানতে চায় যে, নবী করীম ﷺ রাসূলগণ হতে কাদের প্রতি বিশ্বাস রাখেন। তিনি বললেন, আমি আল্লাহ তা'আলার প্রতি বিশ্বাস রাখি, বিশ্বাস রাখি যা নাজিল করেছেন হযরত ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকূব (আ.) ও অন্যান্য নবীগণের প্রতি এবং যা নাজিল করেছেন আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ.), ঈসা (আ.) ও অন্যান্য নবীগণের প্রতি তার প্রতিও ঈমান রাখি। তাদের মধ্যে আমরা কোনো প্রকারের পার্থক্য করি না। আমরা সাবই তার অনুগামী। পরক্ষণে হযরত ঈসা এর কথা যখন আলোচনা করা হয়, তখন তারা তার নুবয়তকে অস্বীকার করে বলে, আমরা হযরত ঈসা (আ.)-এর প্রতি ঈমান রাখি না এবং যারা তার প্রতি ঈমান রাখে তাদের প্রতিও ঈমান আনয়ন করি না। তাবরানীর বর্ণনানুযায়ী, অতঃপর তারা বলল, তোমাদের ধর্ম অপেক্ষা অতি দূষণীয় আর অন্য কোনো ধর্ম সম্পর্কে আমরা জানি না। সুতরাং সে পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[রূহুল মা'আনী : ১৭৪/৩/৬, কুরতুবী : ২২১/৬]

(৬১) قوله وَاِذَا جَآءُوْكُمْ قَالُوْۤا اٰمَنَّا وَقَدْ دَّخَلُوْا بِالْكُفْرِ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** হযরত কাতাদাহ ও সুদ্দী (র.) বর্ণনা করেন, আলোচ্য আয়াত ইহুদিদের কতিপয় লোক সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। যারা রাসূল ﷺ -এর নিকট গমন করে মুনাফেকী

স্বরূপ তার প্রতি ঈমান গ্রহণ করেছে বলে প্রকাশ করত এবং যা কিছু নিয়ে এসেছেন তার প্রতি অকুণ্ঠ সন্তুষ্টির কথা মুখে বলত। সুতরাং রাসূল ﷺ এবং তাঁর সাথে উপস্থিত সাহাবায়ে কেরামকে লক্ষ্য করেই আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন : এরা যখনই আসবে এবং ইসলাম প্রকাশ করবে তখন তোমরা তাদের কথা বিশ্বাস করবে না। এদের এহেন আচরণের পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত আল্লাহ তা'আলা নাজিল করেন। –[রূহুল মা'আনী : ১৭৭/৩/৬]

قوله يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوا۟ ٱلَّذِينَ : ৫৭ নং আয়াতে তাকীদের জন্য রুকূ'র শুরুভাগে বর্ণিত নির্দেশের পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। অর্থাৎ, হে বিশ্ববাসী! তোমরা তাদেরকে সাথী অথবা ঘনিষ্ঠ বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না, যারা তোমাদের ধর্মকে উপহাস ও খেলা মনে করে। এরা দুই দলে বিভক্ত : (এক) আহলে কিতাব সম্প্রদায়, (দুই) সাধারণ কাফের ও মুশরিক সম্প্রদায়।

আবূ হাইয়ান বাহরে মুহীত গ্রন্থে বলেন : كفار শব্দে আহলে কিতাব সম্প্রদায়ও অন্তর্ভুক্ত ছিল। তবুও এখানে স্বতন্ত্রভাবে আহলে কিতাবদের উল্লেখ করার কারণ সম্ভবতঃ এই যে, আহলে কিতাবরা অন্যান্য কাফেরদের তুলনায় যদিও বাহ্যতঃ ইসলামের নিকটবর্তী, কিন্তু অভিজ্ঞতার আলোকে দেখা যায় যে, তাদের কমসংখ্যক লোকই ইসলাম গ্রহণ করেছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আমল ও তৎপরবর্তী আমলে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছে, তাদের সংখ্যা পর্যালোচনা করলে সাধারণ কাফেরদের সংখ্যাই বেশি দেখা যায়। আহলে কিতাবদের মধ্যে যারা মুসলমান হয়েছে, তাদের সংখ্যা অতি নগণ্য।

এর কারণ এই যে, আহলে কিতাবদের গর্ব ছিল যে, তারা আল্লাহ তা'আলার ধর্ম ও ঐশিগ্রন্থের অনুসারী। এ গর্ব ও অহঙ্কারই তাদেরকে সত্যধর্ম গ্রহণে বিরত রেখেছে। মুসলমানদের সাথে তারাই বেশির ভাগ ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেছে। এ দুষ্টামির একটি ঘটনা সপ্তম আয়াতে এভাবে বর্ণিত হয়েছে : وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ ٱتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا

অর্থাৎ, মুসলমানরা যখন নামাজের আজান দেয়, তখন তারা হাসি-তামাশা করে। তাফসীরে মাযহারীতে ইবনে আবী হাতেমের বরাত দিয়ে ঘটনাটি এভাবে বর্ণিত হয়েছে : মদিনায় জনৈক খ্রিস্টান বসবাস করত। সে আজানে যখন أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ ٱللَّهِ বাক্যটি শুনত, তখন বলত আল্লাহ মিথ্যাবাদীকে পুড়িয়ে ভস্মীভূত করুক।

পরিণামে তার এ বাক্যটিই তার গোটা পরিবার পুড়ে ভস্মীভূত হওয়ার কারণ হয়ে যায়। এক রাত্রে সে যখন ঘুমিয়েছিল, তার চাকর প্রয়োজন বশতঃ আগুন নিতে ঘরে প্রবেশ করল। আগুনের স্ফুলিঙ্গ উড়ে সবার অজ্ঞাতে কোনো একটি কাপড়ে গিয়ে পড়ল। এরপর সবাই যখন নিদ্রায় বিভোর, তখন আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল এবং সবাই পুড়ে কাবাব হয়ে গেল।

এ আয়াতের শেষ ভাগে বলা হয়েছে : ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ অর্থাৎ সত্যধর্মের সাথে ঠাট্টা-মস্কারা করার কারণ এছাড়া আর কিছুই নয় যে, তারা নির্বোধ।

তাফসীরে মাযহারীতে কাজী ছানাউল্লাহ (র.) বলেন : আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে নির্বোধ বলেছেন, অথচ সাংসারিক ব্যাপারে তাদের বুদ্ধিমত্তার জুড়ি নেই। এতে বুঝা যায় যে, একজন লোক এক ধরনের কাজে চতুর ও বুদ্ধিমান এবং অন্য ধরনের কাজে নির্বোধ ও বোকা হতে পারে। এ বোকা হওয়ার কারণ দ্বিবিধ– হয় সে বুদ্ধিকে কাজে লাগায় না, না হয় তার বুদ্ধি এ ব্যাপারে অচল। কুরআন পাক এ বিষয়বস্তুটি অন্য এক আয়াতে এভাবে বর্ণনা করেছে :

يَعْلَمُونَ ظَٰهِرًا مِّنَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ ٱلْءَاخِرَةِ هُمْ غَٰفِلُونَ

অর্থাৎ তারা পার্থিব জীবনে বাহ্যিক বিষয়গুলো খুব বুঝে, কিন্তু পরিণাম ও পরকাল সম্পর্কে উদাসীন।

قوله أَكْثَرُهُمْ فَٰسِقُونَ : বাক্যে আল্লাহ তা'আলা ইহুদি ও খ্রিস্টানদেরকে সম্বোধন করে সবার পরিবর্তে অধিকাংশকে ঈমান থেকে বিচ্যুত বলে অভিহিত করেছেন। এর কারণ এই যে, তাদের কিছুসংখ্যক লোক এমনও ছিল, যারা সর্বাবস্থায় ঈমানদার ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নবুয়ত প্রাপ্তির পূর্ব পর্যন্ত তারা ছিল তাওরাত ও ইঞ্জিলের নির্দেশাবলির অনুসারী এবং এতদুভয়ে বিশ্বাসী। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নবুয়ত প্রাপ্তি ও কুরআন অবতরণের পর তারা তাঁর প্রতিও বিশ্বাস স্থাপন করে এবং কুরআন অনুসারে কাজকর্ম সম্পাদন করতে থাকে।

প্রচারকার্যে সম্বোধিত ব্যক্তির রেয়াত করা : قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ বাক্যে উদাহরণের ভঙ্গিতে আল্লাহর অভিশাপ ও ক্রোধপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের যে অবস্থা বর্ণিত হয়েছে, তা প্রকৃতপক্ষে সম্বোধিত ব্যক্তিদেরই অবস্থা ছিল। কাজেই এ দোষ সরাসরি তাদের

www.almodina.com

উপর আরোপ করে 'তোমরা এরূপ' বললেও চলত। কিন্তু কুরআন এ বর্ণনাভঙ্গি পরিবর্তন করে বিষয়টিকে একটি উদাহরণের রূপ দিয়েছে। এতে পয়গম্বরসুলভ একটি প্রচারকার্যের বিশেষ পদ্ধতি ব্যক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ বর্ণনাভঙ্গি এরূপ হওয়া চাই, যা দ্বারা সম্বোধিত ব্যক্তির মনে উত্তেজনা সৃষ্টি না হয়।

ইহুদিদের চারিত্রিক বিপর্যয় : প্রথম আয়াতে অধিকাংশ ইহুদির চারিত্রিক বিপর্যয় ও কর্মগত ধ্বংসের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যাতে শ্রোতারা উপদেশ গ্রহণ করে এবং এসব কার্যকলাপ ও তার কারণ থেকে আত্মরক্ষা করে।

যদিও সাধারণভাবে ইহুদিদের অবস্থা তাই ছিল, তথাপি তাদের মধ্যে কিছু ভালো লোকও ছিল। কুরআন পাক তাদের ব্যতিক্রম প্রকাশ করার জন্য كَثِيرًا (অনেক) শব্দটি ব্যবহার করেছে। সীমালঙ্ঘন এবং হারাম ভক্ষণ اِثْم (পাপ) শব্দের অর্থেরই অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু উভয় প্রকার পাপের ধ্বংসকারিতা এবং সে কারণে শান্তি ও শৃঙ্খলা বিনষ্ট হওয়ার বিষয়কে ফুটিয়ে তোলার জন্য বিশেষভাবে এগুলোকে পৃথকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। –[বাহরে মুহীত]

তাফসীরে রূহুল মা'আনী প্রভৃতিতে বলা হয়েছে যে, তাদের সম্পর্কে 'দৌড়ে দৌড়ে পাপে পতিত হওয়ার' শিরোনাম ব্যবহার করে কুরআন পাক ইঙ্গিত করেছে যে, তারা এসব কু-অভ্যাসে অভ্যস্ত অপরাধী এবং এসব কুকর্ম মজ্জাগত হয়ে তাদের শিরা-উপশিরায় জড়িত হয়ে গেছে। এখন তারা ইচ্ছা না করলেও সেদিকেই চলে।

এতে বুঝা যায় যে, মানুষ সৎ কিংবা অসৎ যে কোনো কাজ উপর্যুপরি করতে থাকলে আস্তে আস্তে তা মজ্জাগত অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়। এরপর তা করতে তার কোনোরূপ কষ্ট ও দ্বিধা হয় না। ইহুদিরা কু-অভ্যাসে এ সীমায় পৌঁছে গিয়েছিল। এ বিষয়টি প্রকাশ করার জন্য বলা হয়েছে :

يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ [তারা দৌড়ে দৌড়ে গিয়ে পাপে পতিত হয়।] সৎকর্মে পয়গম্বর ও ওলীদের অবস্থাও তদ্রূপ। তাঁদের সম্পর্কে কুরআন বলেছে : يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ –অর্থাৎ তাঁরা দৌড়ে দৌড়ে পুণ্য কাজে আত্মনিয়োগ করে।

কর্ম সংশোধনের পদ্ধতি : সূফী-বুজুর্গ ও ওলী-আল্লাহগণ কর্ম সংশোধনে সবচাইতে অধিক যত্নবান। তাঁরা কুরআন পাকের এসব বাণী থেকেই এ মূলনীতি বেছে নিয়েছেন যে, মানুষ যেসব ভালো কিংবা মন্দ কাজ করে, আসলে সেগুলোর মূল উৎস হচ্ছে ঐসব গোপন কর্মক্ষমতা ও চরিত্র, যা মানুষের মজ্জায় পরিণত হয়। এ কারণেই মন্দ কর্ম ও অপরাধ দমন করার জন্য তাঁদের দৃষ্টি এসব সূক্ষ্ম গোপন বিষয়ের প্রতি নিবদ্ধ থাকে এবং তাঁরা এগুলো সংশোধন করে দেন। ফলে সব কাজ-কর্ম আপনা থেকেই সংশোধিত হয়ে যায়। উদাহরণতঃ কারো অন্তরে জাগতিক অর্থলিপ্সা প্রবল হলে সে এর ফলে ঘুষ গ্রহণ করে, সুদ খায় এবং সুযোগ পেলে চুরি, ডাকাতি পর্যন্ত করতে উদ্যত হয়। সূফী বুজুর্গরা এসব অপরাধের পৃথক পৃথক প্রতিকার না করে এমন ব্যবস্থাপত্র ব্যবহার করেন, যদ্দরুন এসব অপরাধের ভিত্তিই উৎপাটিত হয়ে যায়। অর্থাৎ তাঁরা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কল্পনায় একথা বদ্ধমূল করে দেন যে, এ জগৎ ক্ষণস্থায়ী এবং এর আরাম আয়েশ বিষাক্ত।

এমনিভাবে মনে করুন, কেউ অহংকারী কিংবা ক্রোধের হাতে পরাভূত। সে অন্যকে ঘৃণা ও অপমান করে এবং বন্ধু-বান্ধব ও প্রতিবেশিদের সাথে ঝগড়া-বিবাদ করে। সূফী বুজুর্গরা এমন লোকের ক্ষেত্রে পরকালের চিন্তা এবং আল্লাহর সামনে জবাবদিহির ব্যবস্থাপত্র প্রয়োগ করেন। ফলে উপরিউক্ত মন্দ অভ্যাস আপনা থেকেই খতম হয়ে যায়।

মোটকথা এ কুরআনি ইঙ্গিত থেকে বুঝা যায় যে, মানুষের মধ্যে এমনকিছু কর্মক্ষমতা রয়েছে, যা মজ্জায় পরিণত হয়ে যায়। এগুলো সৎ কর্মক্ষমতা হলে সৎকাজ আপনা-আপনি হতে থাকে। পক্ষান্তরে এগুলো মন্দ কর্মক্ষমতা হলে মন্দ কাজের দিকে মানুষ আপনা-আপনি ধাবিত হয়। কর্ম সংশোধনের নিমিত্ত এসব কর্মক্ষমতার সংশোধন অত্যাবশ্যক।

আলেমদের কাঁধে সর্বসাধারণের কাজ-কর্মের দায়িত্ব : দ্বিতীয় আয়াতে ইহুদি পীর-মাশায়েখ ও আলেমদেরকে কঠোরভাবে হুশিয়ার করা হয়েছে যে, তারা সাধারণ মানুষকে মন্দকাজ থেকে কেন বিরত রাখে না? কুরআন পাকে এক্ষেত্রে দু'টি শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে। একটি رَبَّانِيُّونَ -এর অর্থ আল্লাহভক্ত; অর্থাৎ, আমাদের পরিভাষায় যাকে দরবেশ, পীর কিংবা মাশায়েখ বলা হয়। দ্বিতীয় শব্দ اَحْبَارٌ ব্যবহার করা হয়েছে।

ইহুদিদের আলেমদেরকে 'আহবার' বলা হয়। এতে বুঝা যায় যে, 'সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ' এর মূল দায়িত্ব এ দু'শ্রেণির কাঁধেই অর্পিত। (এক) পীর ও মাশায়েখ এবং (দুই) আলেমবর্গ। কোনো কোনো তাফসীরবিদ বলেন : رَبَّانِيُّونَ বলে ঐসব আলেমকে বুঝানো হয়েছে, যারা সরকারের পক্ষ থেকে আদিষ্ট ও ক্ষমতাসীন এবং اَحْبَارٌ বলে সাধারণ আলেমবর্গকে বুঝানো হয়েছে। এমতাবস্থায় অপরাধ থেকে বিরত রাখার দায়িত্ব শাসককূল ও আলেমকূল উভয়ের কাঁধে ন্যস্ত হয়ে যায়। অন্যান্য কতিপয় আয়াতে এ বিষয়টি স্পষ্টরূপে বর্ণিতও হয়েছে।

www.almodina.com

আলেম ও পীর-মাশায়েখের প্রতি হুশিয়ারী : আয়াতের শেষভাগে বলা হয়েছে لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ –অর্থাৎ, 'সৎকাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ' করার কর্তব্যটি ত্যাগ করে এসব মাশায়েখ ও আলেম অত্যন্ত বদভ্যাসে লিপ্ত হয়েছে। জাতিকে ধ্বংসের দিকে যেতে দেখেও তারা বাধা দিচ্ছে না।

তাফসীরবিদ আলেমগণ বলেন, প্রথম আয়াতে সর্বসাধারণে দুষ্কর্ম বর্ণিত হয়েছিল। এর শেষে لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ বলা হয়েছে এবং দ্বিতীয় আয়তে মাশায়েখ ও আলেমদের ভ্রান্তি প্রকাশ করা হয়েছে। এর শেষে لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ বলা হয়েছে। কারণ এই যে, আরবি অভিধানের দিক দিয়ে ইচ্ছাকৃত কিংবা অনিচ্ছাকৃত সব কাজকেই فِعْل বলা হয়। عَمَل শব্দটি ঐ কাজকে বুঝাবার জন্য ব্যবহার করা হয়, যা ইচ্ছাকৃতভাবে করা হয় এবং صَنْع ও صَنْعَتْ শব্দ ঐ কাজের বেলায় প্রয়োগ করা হয়, যা ইচ্ছার সাথে সাথে বারবার অভ্যাস ও লক্ষ্য হিসেবে ঠিক করে করা হয়। তাই সর্বসাধারণের কুকর্মের পরিণতির ক্ষেত্রে শুধু عَمَل শব্দ ব্যবহার করে বলা হয়েছে لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ আর বিশিষ্ট মাশায়েখ ও আলেমদের ভ্রান্ত কাজের জন্য صَنْع শব্দ প্রয়োগে لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ বলা হয়েছে। এতে এদিকে ইঙ্গিত হতে পারে যে, ইহুদিদের মাশায়েখ ও আলেমরা জানত যে, তারা নিষেধ করলে সর্বসাধারণ শুনবে এবং বিরত থাকবে, কিন্তু তা সত্ত্বেও উপঢৌকনের লোভে কিংবা মানুষের বদ ধারণার ভয়ে তাদের মাশায়েখ ও আলেমদের মনে সত্য সমর্থন করার কোনো আবেদন জাগ্রত হতো না। এ নিস্পৃহতা সেসব দুষ্কর্মীর দুষ্কর্মের চাইতেও গুরুতর অপরাধ।

এর সারমর্ম এই যে, কোনো জাতি অপরাধ ও পাপে লিপ্ত হলে তাদের মাশায়েখ ও আলেমরা যদি অবস্থাদৃষ্টে বুঝতে পারে যে, তারা নিষেধ করলে জাতি অপরাধ থেকে বিরত হবে, তবে এমতাবস্থায় কোনো লোভ কিংবা ভয়ের কারণে অপরাধ ও পাপ থেকে বিরত না রাখলে মাশায়েখ ও আলেমদের অপরাধ প্রকৃত অপরাধীদের অপরাধের চাইতেও গুরুতর হবে। তাই হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন : মাশায়েখ ও আলেমদের জন্য সমগ্র কুরআনে এ আয়াতের চাইতে কঠোর হুঁশিয়ারি আর কোথাও নাই। তাফসীরবিদ যাহহাক বলেন : আমার মতে মাশায়েখ ও আলেমদের জন্য এ আয়াত সর্বাধিক ভয়াবহ। –[ইবনে জারীর ও ইবনে কাছীর]

কারণ এই যে, এ আয়াতদৃষ্টে তাদের অপরাধ সব চোর, ডাকাত ও দুষ্কর্মীদের অপরাধের চাইতেও কঠোর হয়ে যায়। –[নাউযুবিল্লাহ]। কিন্তু স্মরণ রাখা দরকার যে, অপরাধের এ তীব্রতা তখনই হবে, যখন মাশায়েখ ও আলেমরা অবস্থাদৃষ্টে অনুমান করতে পারবেন যে, তাদের নিষেধাজ্ঞা শ্রবণ করা হবে এবং মান্য করা হবে। পক্ষান্তরে যদি অবস্থাদৃষ্টে কিংবা অভিজ্ঞতার আলোকে প্রবল বিশ্বাস জন্মে যে, তাদের নিষেধাজ্ঞা শুনবে না; বরং উল্টো তাদেরকে নির্যাতন করা হবে, তবে তাঁরা দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পাবেন। কিন্তু উত্তম ও শ্রেষ্ঠ তরিকা তখনো এই যে, কেউ মানুক বা না মানুক, তারা স্বীয় কর্তব্য পালন করে যাবেন এবং এ ব্যাপারে কারো নির্যাতন বা তিরস্কারের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করবেন না। যেমন, কয়েক আয়াতপূর্বে আল্লাহ তা'আলার প্রিয় মুজাহিদদের গুণাবলির বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে। وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ অর্থাৎ, তারা আল্লাহর পথে এবং সত্য প্রকাশে কোনো তিরস্কারকারীর তিরস্কারের পরওয়া করে না।

মোটকথা, যে ক্ষেত্রে কথা শোনা ও মান্য করার সম্ভাবনা বেশি, সেখানে মাশায়েখ ও আলেম; বরং প্রত্যেক মুসলমানের অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে সাধ্যানুযায়ী পাপ কাজে বাধা দান করবে, হাতে হোক কিংবা মুখে অথবা কমপক্ষে অন্তর দ্বারা ঘৃণা করে মুখ ফিরিয়ে নিবে। পক্ষান্তরে যে ক্ষেত্রে প্রবল বিশ্বাস জন্মে যে, নিষেধাজ্ঞা শোনা হবে না অথবা নিষেধকারীর বিরুদ্ধে শত্রুতা মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে, সেখানে নিষেধ করা ও বাধা দান করা ফরজ নয়, তবে উত্তম ও শ্রেষ্ঠ অবশ্যই। 'সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ' সম্পর্কিত এ বিবরণ হাদীস থেকে সংগৃহীত হয়েছে। নিজে সৎকর্ম করা ও অসৎকর্ম থেকে বিরত থাকার সাথে সাথে অপরকেও সৎকর্মের প্রতি পথপ্রদর্শন করা এবং অসৎকর্ম থেকে বিরত রাখার দায়িত্ব সাধারণ মুসলমান এবং বিশেষ করে মাশায়েখ ও আলেমদের উপর ন্যস্ত করে ইসলাম জগতে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার স্বর্ণাক্ষরে লেখার যোগ্য একটি মূলনীতি স্থাপন করেছে। এটি যথাযথ বাস্তবায়িত হলে সমগ্র জাতি অনায়াসেই যাবতীয় দুর্নীতি থেকে পবিত্র হতে পারবে।

উম্মতের সংশোধনের পন্থা : ইসলামের প্রথম ও পরবর্তী সমগ্র শতাব্দীগুলোতে যতদিন এ মূলনীতি বাস্তবায়িত হয়েছে, ততদিন মুসলিম জাতি জ্ঞান-গরিমা, কর্ম ও চরিত্রের দিক দিয়ে সারা বিশ্বে সমুন্নত ও স্বতন্ত্র রয়েছে। পক্ষান্তরে যেদিন থেকে মুসলমানরা এ কর্তব্য পালনে বিমুখ হয়ে পড়েছে এবং অপরাধ দমনকে শুধু সরকার ও পুলিশ বাহিনীর দায়িত্ব মনে

www.almodina.com

করে নিজেরা হাত গুটিয়ে বসেছে, সেদিন থেকেই মুসলমানদের অবস্থা শোচনীয় আকার ধারণ করেছে। আজ পিতামাতা ও গোটা পরিবার ধার্মিক ও শরিয়তের অনুসারী; কিন্তু সন্তান-সন্ততি ও আত্মীয় স্বজনের অবস্থা এর বিপরীত। তাদের মতিগতি, চিন্তাধারা ও কর্মপন্থা ভিন্ন খাতে প্রবাহিত। এ কারণেই জাতির সামগ্রিক সংশোধনের নিমিত্ত কুরআন ও হাদীসে 'সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ' এর প্রতি জোর দেওয়া হয়েছে। কুরআন এ কর্তব্যটিকে উম্মতে মুহাম্মদীর বৈশিষ্ট্য আখ্যা দিয়েছে এবং এর বিরুদ্ধাচরণ করাকে কঠোর পাপ ও শাস্তির কারণ বলে সাব্যস্ত করেছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : কোনো জাতির মধ্যে যখন পাপ কাজ করা হয়, অথচ কোনো লোক তা নিষেধ করে না, তখন তাদের প্রতি আল্লাহর পক্ষ থেকে আজাব প্রেরণের সম্ভাবনা প্রবল হয়ে যায়। –[বাহরে মুহীত]

পাপ কাজে ঘৃণা প্রকাশ করার কারণে সতর্কবাণী : মালেক ইবনে দীনার (র.) বলেন, আল্লাহ তা'আলা এক জায়গায় ফেরেশতাদেরকে নির্দেশ দিলেন যে, অমুক বস্তি ধ্বংস করে দাও। ফেরেশতারা আরজ করলেন, এ বস্তিতে আপনার অমুক ইবাদতকারী বান্দাও রয়েছে। নির্দেশ এল, তাকেও আজাবের স্বাদ গ্রহণ করাও আমার অবাধ্যতাও পাপাচার দেখেও তার চেহারা কখেনো ক্রোধে বিবর্ণ হয়নি।

হযরত ইউশা' ইবনে নুন (আ.)-এর প্রতি ওহী আসে যে, আপনার জাতির এক লক্ষ লোককে আজাবের মাধ্যমে ধ্বংস করা হবে। তাদের মধ্যে চল্লিশ হাজার সৎ লোক এবং ষাট হাজার অসৎ লোক। ইউশা' (আ.) নিবেদন করলেন, হে রাব্বুল আলামীন! অসৎ লোকদেরকে ধ্বংস করার কারণ তো জানাই, কিন্তু সৎ লোকদেরকে কেন ধ্বংস করা হচ্ছে? উত্তর এল, এ সৎলোকগুলোও অসৎলোকদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখত। তাদের সাথে পানাহার ও হাসি তামাশায় যোগদান করত। আমার অবাধ্যতা ও পাপাচার দেখে কখনো তাদের চেহারায় বিতৃষ্ণার চিহ্নও ফুটে উঠেনি। –[বাহরে মুহীত]

শব্দ বিশ্লেষণ

نَادَيْتُمْ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ ماضى معروف বাব مُفَاعَلَةٌ মাসদার اَلْمُنَادَاةُ মূলবর্ণ (ن ـ د ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– তোমরা ডাকলে।

تَنْقِمُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلنَّقْمُ মূলবর্ণ (ن ـ ق ـ م) জিনস صحيح অর্থ– তোমরা শত্রুতা পোষণ করছ।

أُنَبِّئُ : সীগাহ واحد متكلم বহছ مضارع معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّنْبِيْهُ মূলবর্ণ (ن ـ ب ـ ء) জিনস مهموز لام অর্থ– আমি খবর দিব।

مَثُوْبَةً : শব্দটি একবচন, বহুবচন مَثَائِبُ অর্থ– বদলা, প্রতিশোধ।

قِرَدَةٌ : শব্দটি বহুবচন, একবচন قِرْدٌ অর্থ– বানর।

خَنَازِيْرُ : শব্দটি বহুবচন, একবচন خِنْزِيْرٌ অর্থ– শূকর, খিঞ্জির।

اَلرَّبَّانِيُّوْنَ : শব্দটি বহুবচন, একবচন رَبَّانِىٌّ অর্থ– আল্লাহওয়ালাগণ।

اَلْاَحْبَارُ : শব্দটি বহুবচন, একবচন حِبْرٌ অর্থ– আলেমগণ।

www.almodina.com

وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ يَدُ اللّٰهِ مَغْلُوْلَةٌ ۚ غُلَّتْ اَيْدِيْهِمْ وَلُعِنُوْا بِمَا قَالُوْا ۘ بَلْ يَدٰهُ مَبْسُوْطَتٰنِ ۙ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَآءُ ۚ وَلَيَزِيْدَنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ مَّآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَّكُفْرًا ۚ وَاَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَآءَ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ ۚ كُلَّمَآ اَوْقَدُوْا نَارًا لِّلْحَرْبِ اَطْفَاَهَا اللّٰهُ ۙ وَيَسْعَوْنَ فِى الْاَرْضِ فَسَادًا ۚ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ (٦٤)

অনুবাদ : (৬৪) আর ইহুদিরা বলল, আল্লাহর হাত বন্ধ হয়ে গেছে, তাদেরই হাত বন্ধ, এবং তাদের এই উক্তির দরুন তারা রহমত হতে বিদূরিত হয়েছে; বরং তাঁর [আল্লাহর] তো উভয় হাত উন্মুক্ত, যেরূপে ইচ্ছা ব্যয় করেন, আর যে বিষয় আপনার নিকট আপনার প্রতিপালকের পক্ষ হতে প্রেরিত হয়, তা তাদের মধ্যে অনেকের নাফরমানি ও কুফর বৃদ্ধির কারণ হয়, এবং আমি তাদের পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা এবং হিংসা নিক্ষেপ করেছি কিয়ামত পর্যন্ত, যখনই [মুসলমানদের বিরুদ্ধে] যুদ্ধাগ্নি প্রজ্বলিত করতে চায়, আল্লাহ তা নির্বাপিত করে দেন, এবং তারা ভূপৃষ্ঠে অশান্তি ছড়িয়ে বেড়ায়, আর আল্লাহ তা'আলা অশান্তি বিস্তারকারীদেরকে ভালোবাসেন না।

وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْكِتٰبِ اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَلَاَدْخَلْنٰهُمْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ (٦٥)

(৬৫) আর এই আহলে কিতাব [ইহুদি নাসারা]-গণ যদি ঈমান আনত এবং তাকওয়া অবলম্বন করত, তবে আমি অবশ্যই তাদের সমস্ত অন্যায় ক্ষমা করে দিতাম এবং অবশ্যই তাদেরকে শান্তির উদ্যানসমূহে দাখিল করতাম।

শাব্দিক অনুবাদ

(৬৪) وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ আর ইহুদিরা বলল يَدُ اللّٰهِ مَغْلُوْلَةٌ আল্লাহর হাত বন্ধ হয়ে গেছে غُلَّتْ اَيْدِيْهِمْ তাদেরই হাত বন্ধ وَلُعِنُوْا এবং তারা রহমত হতে বিদূরিত হয়েছে بِمَا قَالُوْا তাদের এই উক্তির দরুন بَلْ يَدٰهُ مَبْسُوْطَتٰنِ বরং তাঁর তো উভয় হাত উন্মুক্ত يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَآءُ যেরূপে ইচ্ছা ব্যয় করেন وَلَيَزِيْدَنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ আর তা তাদের মধ্যে অনেকের বৃদ্ধির কারণ হয় مَّآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ যে বিষয় আপনার নিকট আপনার প্রতিপালকের পক্ষ হতে প্রেরিত হয় طُغْيَانًا وَّكُفْرًا নাফরমানি ও কুফর وَاَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ এবং আমি তাদের পরস্পরের মধ্যে নিক্ষেপ করেছি الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَآءَ শত্রুতা এবং হিংসা اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ কিয়ামত পর্যন্ত كُلَّمَآ اَوْقَدُوْا نَارًا لِّلْحَرْبِ যখনই [মুসলমানদের বিরুদ্ধে] যুদ্ধাগ্নি প্রজ্বলিত করতে চায় اَطْفَاَهَا اللّٰهُ আল্লাহ তা নির্বাপিত করে দেন وَيَسْعَوْنَ فِى الْاَرْضِ فَسَادًا এবং তারা ভূপৃষ্ঠে অশান্তি ছড়িয়ে বেড়ায় وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ আর আল্লাহ তা'আলা অশান্তি বিস্তারকারীদেরকে ভালোবাসেন না।

(৬৫) وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْكِتٰبِ اٰمَنُوْا আর এই আহলে কিতাবগণ যদি ঈমান আনত وَاتَّقَوْا এবং তাকওয়া অবলম্বন করত لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ তবে আমি অবশ্যই তাদের সমস্ত অন্যায় ক্ষমা করে দিতাম وَلَاَدْخَلْنٰهُمْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ এবং অবশ্যই তাদেরকে শান্তির উদ্যানসমূহে দাখিল করতাম।

(৬৬) আর যদি তারা তাওরাত ও ইঞ্জিলের এবং যে কিতাব [অর্থাৎ কুরআন] তাদের রবের পক্ষ থেকে তাদের প্রতি প্রেরিত হয়েছে, তার যথারীতি আমলকারী হতো, তবে তারা উপর [অর্থাৎ আসমান] হতে এবং নিম্ন [অর্থাৎ জমিন] হতে প্রাচুর্যের সাথে ভক্ষণ করত তাদের একদল তো সরল পথের পথিক, আর এদের অধিকাংশ এরূপই যে, তাদের কার্যকলাপ অতি জঘন্য।	وَلَوْ اَنَّهُمْ اَقَامُوا التَّوْرٰىةَ وَالْاِنْجِيْلَ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِمْ مِّنْ رَّبِّهِمْ لَاَكَلُوْا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ اَرْجُلِهِمْ ؕ مِنْهُمْ اُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ ؕ وَكَثِيْرٌ مِّنْهُمْ سَآءَ مَا يَعْمَلُوْنَ (٦٦)
(৬৭) হে রাসূল! যা কিছু আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আপনার প্রতি নাজিল করা হয়েছে আপনি [মানুষকে] সবকিছুই পৌঁছে দিন, আর যদি এরূপ না করেন, তবে [যেন] আপনি আল্লাহর একটি পয়গামও পৌঁছাননি, আর আল্লাহ তা'আলা আপনাকে মানুষ [অর্থাৎ কাফের] হতে সংরক্ষিত রাখবেন, নিশ্চয় আল্লাহ এই কাফেরদেরকে পথ [অর্থাৎ আপনাকে হত্যা করার সুযোগ] দিবেন না।	يٰۤاَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ ؕ وَاِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهٗ ؕ وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ (٦٧)
(৬৮) আপনি বলে দিন, হে আহলে কিতাবগণ! তোমরা কোনো পথেই প্রতিষ্ঠিত নও, যে পর্যন্ত না তাওরাত ও ইঞ্জিল এবং যে কিতাব [অর্থাৎ কুরআন] তোমাদের নিকট তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে পাঠানো হয়েছে তারও পূর্ণ পাবন্দি করবে, আর অবশ্যই যা আপনার প্রতি আপনার রবের পক্ষ থেকে প্রেরণ করা হয়, তা তাদের মধ্যে অনেকেরই নাফরমানি ও কুফর বৃদ্ধির কারণ হয়ে যায়, অতএব, আপনি এই কাফেরদের জন্য মনঃক্ষুণ্ন হবেন না।	قُلْ يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ لَسْتُمْ عَلٰى شَيْءٍ حَتّٰى تُقِيْمُوا التَّوْرٰىةَ وَالْاِنْجِيْلَ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ ؕ وَلَيَزِيْدَنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ مَّآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَّكُفْرًا ۚ فَلَا تَاْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ (٦٨)

শাব্দিক অনুবাদ

(৬৬) وَلَوْ اَنَّهُمْ اَقَامُوا التَّوْرٰىةَ وَالْاِنْجِيْلَ আর যদি তারা তাওরাত ও ইঞ্জিলের যথারীতি আমলকারী হতো وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِمْ مِّنْ رَّبِّهِمْ এবং যে কিতাব তাদের রবের পক্ষ থেকে তাদের প্রতি প্রেরিত হয়েছে তার لَاَكَلُوْا তবে তারা প্রাচুর্যের সাথে ভক্ষণ করত مِنْ فَوْقِهِمْ উপর হতে وَمِنْ تَحْتِ اَرْجُلِهِمْ এবং নিম্ন হতে مِنْهُمْ اُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ তাদের একদল তো সরল পথের পথিক وَكَثِيْرٌ مِّنْهُمْ سَآءَ مَا يَعْمَلُوْنَ আর এদের অধিকাংশ এরূপই যে, তাদের কার্যকলাপ অতি জঘন্য।

(৬৭) يٰۤاَيُّهَا الرَّسُوْلُ হে রাসূল! بَلِّغْ আপনি সবকিছুই পৌঁছে দিন مَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ যা কিছু আপনার প্রতি নাজিল করা হয়েছে مِنْ رَّبِّكَ আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে وَاِنْ لَّمْ تَفْعَلْ আর যদি এরূপ না করেন فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهٗ তবে [যেন] আপনি আল্লাহর একটি পয়গামও পৌঁছাননি وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ আর আল্লাহ তা'আলা আপনাকে মানুষ হতে সংরক্ষিত রাখবেন اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ নিশ্চয় আল্লাহ এই কাফেরদেরকে পথ দিবেন না।

(৬৮) قُلْ আপনি বলে দিন يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ হে আহলে কিতাবগণ! لَسْتُمْ عَلٰى شَيْءٍ তোমরা কোনো পথেই প্রতিষ্ঠিত নও حَتّٰى تُقِيْمُوا التَّوْرٰىةَ وَالْاِنْجِيْلَ যে পর্যন্ত না তাওরাত ও ইঞ্জিলের পূর্ণ পাবন্দি করবে وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ এবং যে কিতাব তোমাদের নিকট তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে পাঠানো হয়েছে وَلَيَزِيْدَنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ আর তা অবশ্যই তাদের মধ্যে অনেকেরই বৃদ্ধির কারণ হয়ে যায় مَّآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ যা আপনার প্রতি আপনার রবের পক্ষ থেকে প্রেরণ করা হয় طُغْيَانًا وَّكُفْرًا নাফরমানি ও কুফর فَلَا تَاْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ অতএব, আপনি এই কাফেরদের জন্য মনঃক্ষুণ্ন হবেন না।

www.almodina.com

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(৬৪) قوله وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ يَدُ اللهِ مَغْلُوْلَةٌ غُلَّتْ اَيْدِيْهِمْ وَلُعِنُوْا بِمَا قَالُوْا الخ –**আয়াতের শানে নুযূল :** হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। ইকরিমা ও যাহহাক প্রমূখ বলেন, আল্লাহ তা'আলা ইহুদিদেরকে আর্থিকভাবে স্বচ্ছলতা ও সাবলম্বীতা দান করেছিলেন। পরবর্তীতে তারা যখন আল্লাহ তা'আলার রাসূলের হুকুম অমান্য করল, তখন আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে যে স্বচ্ছলতা দান করেছিলেন তা তিনি বন্ধ করে দিলেন। ফলে তাদের উন্নয়নের সকল উপায় উপকরণ নিঃশেষ হয়ে গেল। ইহুদি দলপতি ফিনহাস বিন আযূরা আল্লাহর পক্ষ হতে তাদের উপর আরোপিত দারিদ্রতা ও দূর্ভিক্ষতার কষাঘাতের কারণে বলেছিল আল্লাহ তা'আলার হাত রুদ্ধ হয়ে গিয়েছে। নরাধম ফিনহাসের এহেন জগণ্যতর মন্তব্যের জবাবে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর এক বর্ণনা মতে এ উক্তি ছিল নাব্বাদ্ধা বিন কায়েসের। –[রুহুল মা'আনী : ১৭৯/৩/৬, ফাতহুল কাদীর : ৫৮/২]

(৬৮) قوله يٰاَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ الخ –**আয়াতের শানে নুযূল– ১ :** আল্লামা মারদুভিয়া হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ একদা কোনো এক গাছ তলায় বিশ্রাম করতেছিলেন, সে মূহুর্তে হঠাৎ করে এক কাফের বেদীন এসে রাসূল ﷺ -এর তরবারি হাতে নিয়ে নবী (আ.)-কে বলল, আমার হাত থেকে আপনাকে কে রক্ষা করবে? রাসূল ﷺ বললেন, আল্লাহ! তখন বেদুঈনের হাত কেপে তার হাত থেকে তরবারিটি পড়ে গেল এবং তার মাথা দিয়ে গাছে আঘাত করে, ফলে তার দেমাগ বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ল। সে পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত আয়াত আল্লাহ তা'আলা নাজিল করেন।

শানে নুযূল– ২ : হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূল ﷺ -এর সাথে নজদের দিকে যুদ্ধে ছিলাম, তখন আমরা রাসূল ﷺ -কে এক পার্বত্যাঞ্চলে পেলাম, যেখানে বিশাল বিশাল বৃক্ষ বিদ্যমান রয়েছে। সে সময় রাসূল ﷺ তরবারিটি গাছের ডালে ঝুলিয়ে গাছের তলায় বিশ্রাম করতেছিলেন। তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বললেন, সেখানে আমার নিকট এক ব্যক্তি আসে, সে সময় আমি ঘুমে ছিলাম। এ সুযোগে সে তরবারিটি হাতে নেয়, তৎক্ষণাৎ আমিও জেগে গেলাম, সে মূহুর্তে লোকটি আমার মাথার নিকট দাঁড়ানো ছিল। তার হাতে কোষ মুক্ত তরবারি, সে আমাকে বলল, আমার হাত থেকে আপনাকে এবার কে রক্ষা করবে? আমি বললাম, আল্লাহ! অতঃপর দ্বিতীয়বার বলল, আমার হাত থেকে আপনাকে এবার কে রক্ষা করবে? আমি বললাম, আল্লাহ! তখন তরবারিটি উল্টা তার মাথায় পড়ে গেল, এতে করে সে বসে পড়ল। সে পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা উক্ত আয়াত নাজিল করেন। –[কুরতুবী : ২২৯/৬, ইবনে কাছীর : ৮১/২, ফাতহুল কাদীর : ৬১/২]

শানে নুযূল– ৩ : ইমাম মুসলিম (র.) হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূল ﷺ একদা মদিনার মুখদারে রাত্র যাপন করেন। তখন তিনি বলেন, আমার কোনো এক সাহাবী যদি আমাকে পাহারাদারি করত? হযরত আয়েশা (রা.) বলেন যে, ক্ষণিকের মাঝেই আমরা অস্ত্রের ঝনঝনানী আওয়াজ শুনতে পেলাম। সে সময় রাসূল ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, কে? তিনি উত্তর দিলেন আমি সা'আদ বিন আবী ওয়াক্কাস। রাসূল ﷺ পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, কে তোমাকে নিয়ে এসেছে? উত্তরে বলল, আমার অন্তরে রাসূল ﷺ সম্পর্কীয় ভয় সঞ্চারিত হয়েছে। সে জন্য আমি আল্লাহর রাসূলের পাহারা দিতে এসেছি। একথা শুনে রাসূল ﷺ তার জন্য দোয়া করে নির্বিঘ্নে ঘুমিয়ে পড়েন। সে পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়েছে। –[কুরতুবী : ২৩০/৬]

(৬৮) قوله قُلْ يٰاَهْلَ الْكِتٰبِ لَسْتُمْ عَلٰى شَيْءٍ حَتّٰى تُقِيْمُوا التَّوْرٰىةَ وَالْاِنْجِيْلَ الخ –**আয়াতের শানে নুযূল :** হযরত ইবনে ইসহাক, ইবনে জারীর, ইবনুল মুনযির, ইবনে আবী হাতেম ও আবুশ শায়েখ (র.) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, নাফে' বিন হারেছা, সালাম বিন মালিক বিন সাইফ ও রাফে' বিন হারমালা তারা সম্মিলিতভাবে বলল, হে মুহাম্মদ! আপনি তো ইবরাহিমী ধর্মে আছেন বলে দাবি করেছেন, আমাদের নিকটে তাওরাত রয়েছে তাতেও বিশ্বাস করেছেন বলে নাকি আপনি দাবি করেছেন? তা আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ বলে সাক্ষীও নাকি দিচ্ছেন? নবী করীম ﷺ বললেন, তা তো সত্য! তবে তোমরা তাতে সংযোজন করছ, তাকে অমান্য করছ, তাওরাতে যে বিষয়ে তোমাদের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করা হচ্ছে এবং যা কিছু মানুষের নিকট বলে দিতে নির্দেশ প্রাপ্ত হয়েছিলে, তাকেও অস্বীকার করলে। সুতরাং তোমাদের নব আবিষ্কার হতে বিরত থাকবে। তারা বলল, আমাদের নিকট যা রয়েছে সে সম্পর্কে আমরা

www.almodina.com

অঙ্গীকারাবদ্ধ। আমরা আপনার প্রতি ঈমান আনব না এবং আপনার অনুসরণও করব না। অতএব আল্লাহ তা'আলা তাদের সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ করেছেন। –[ফাতহুল কাদীর : ৬৪/২, রূহুল মা'আনী : ২০০/৩/৬, কুরতুবী : ২৩১/৬, বাহরে মুহীত : ৫৪০/৩]

ইহুদিদের একটি ধৃষ্টতার জওয়াব : وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ আয়াতে ইহুদিদের একটি গুরুতর অপরাধ ও জঘন্য উক্তি বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ, হতভাগারা বলতে শুরু করেছে যে, [নাউযুবিল্লাহ] আল্লাহ তা'আলা দরিদ্র হয়ে গেছেন।

ঘটনাটি ছিল এই যে, আল্লাহ তা'আলা মদিনার ইহুদিদেরকে বিত্তশালী ও স্বাচ্ছন্দ্যশীল করেছিলেন, কিন্তু যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ মদিনায় আগমন করেন এবং তাদের কাছে ইসলামের আহ্বান পৌছে, তখন পাষণ্ডরা সামাজিক মোড়লি ও কুপ্রথার মাধ্যমে প্রাপ্ত নযর-নিয়াযের খাতিরে এ আহ্বান থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বিরুদ্ধাচরণ করে। ফলে আল্লাহ তা'আলা শাস্তি হিসেবে তাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য হ্রাস করে দেন। ফলে তারা দরিদ্র হয়ে পড়ে। তখন মূর্খদের মুখ থেকে এ জাতীয় কথাবার্তা বের হতে থাকে যে, [নাউযুবিল্লাহ] আল্লাহর ধনভাণ্ডার ফুরিয়ে গেছে অথবা আল্লাহ তা'আলা কৃপণ হয়ে গেছেন। এর উত্তরে আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, হাত তো তাদেরই বাঁধা হবে এবং তাদের প্রতি অভিসম্পাত হবে, যার ফলে পরকালে আজাব এবং ইহকালে লাঞ্ছনা ও অবমাননা ভোগ করতে হবে। আল্লাহ তা'আলার হাত সব সময়ই উন্মুক্ত রয়েছে। তাঁর দান চিরকাল অব্যাহত রয়েছে এবং থাকবে। কিন্তু তিনি যেমন ধনবান ও বিত্তশালী, তেমনি সুবিজ্ঞও বটে। তিনি বিজ্ঞতা অনুযায়ী ব্যয় করেন, যাকে উপযুক্ত মনে করেন, বিত্তশালী করে দেন এবং যার ঘাড়ে উপযুক্ত মনে করে, অভাব-অনটন ও দারিদ্র চাপিয়ে দেন।

অতঃপর বলেছেন : এরা উদ্ধত জাতি। আপনার প্রতি অবতীর্ণ কুরআনি নির্দেশাবলির দ্বারা উপকৃত হওয়ার পরিবর্তে তাদের কুফর ও অবিশ্বাস আরো কঠোর হয়ে যায়। আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদেরকে তাদের অনিষ্ট থেকে বাঁচিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে তাদের বিভিন্ন দলের মধ্যে ঘোর মতানৈক্য সঞ্চারিত করে দিয়েছেন। ফলে মুসলমানদের বিরুদ্ধে তারা প্রকাশ্য যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে সাহসী হয় না এবং তাদের কোনো চক্রান্তও সফল হয় না। كُلَّمَا اَوْقَدُوْا نَارًا لِّلْحَرْبِ اَطْفَاَهَا اللّٰهُ বাক্যে প্রকাশ্য যুদ্ধে ব্যর্থতা এবং وَيَسْعَوْنَ فِي الْاَرْضِ فَسَادًا বাক্যে গোপন চক্রান্ত ব্যর্থতার কথাই বর্ণিত হয়েছে।

আল্লাহর নির্দেশাবলি পুরাপুরি পালনে ইহকালীন কল্যাণ : ৬৪তম আয়াতে বলা হয়েছে যে, ইহুদিরা তাওরাত ও ইঞ্জিলের নির্দেশাবলি এবং পয়গম্বরগণের বাণী দ্বারা কোনো উপকার লাভ করেনি এবং জাগতিক লোভ-লালসায় লিপ্ত হয়ে সবকিছু বিস্মৃত হয়ে বসেছে। ফলে দুনিয়াতেও এরা কপর্দকহীন হয়ে পড়েছে। যদি এখনও তারা বিশ্বাস ও আল্লাহভীতি অবলম্বন করে, তবে আমি তাদের বিগত সব গুনাহ্ মাফ কদের দিব এবং নিয়ামতপূর্ণ উদ্যান দান করব।

আল্লাহর নির্দেশাবলি পুরাপুরি পালন করার উপায় : وَلَوْ اَنَّهُمْ اَقَامُوا التَّوْرٰىةَ আয়াতে ঐ বিশ্বাস ও আল্লাহভীতির কিছু বিবরণ উল্লিখিত হয়েছে, যা দ্বারা জাগতিক কল্যাণ ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দানের ওয়াদা পূর্ববর্তী আয়াতে করা হয়েছিল। বিবরণ এই যে, ইহুদিরা তাওরাত, ইঞ্জিল এবং পরবর্তী সর্বশেষ গ্রন্থ কুরআনকে প্রতিষ্ঠিত করুক। এখানে عَمَلٌ তথা পালন করার পরিবর্তে اِقَامَتٌ তথা প্রতিষ্ঠিত করার কথা বলা হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, এসব গন্থের আমল পুরাপুরি ও বিশুদ্ধ তখনই হবে, যখন তাতে কোনো রকম ত্রুটি ও বাড়াবাড়ি না থাকবে। যেমন, কোনো স্তম্ভকে তখনই প্রতিষ্ঠিত বলা যায়, যখন তা কোনোদিকে ঝুঁকে থাকবে না; বরং সোজা দাঁড়ানো থাকবে।

এর সারমর্ম এই যে, যদি ইহুদিরা আজও তাওরাত, ইঞ্জিল ও কুরআন পাকের নির্দেশাবলির প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সেগুলো পুরাপুরি পালন করে ত্রুটি এবং মনগড়া বিষয়াদিকে ধর্ম বলে আখ্যা দিয়ে বাড়াবাড়ি না করে, তবে তারা পরকালের প্রতিশ্রুত নিয়ামতরাজির যোগ্য হবে এবং ইহকালেও তাদের সামনে রিজিকের দ্বার উন্মুক্ত করে দেওয়া হবে। ফলে উপর-নীচ সবদিক থেকে তাদের উপর রিজিক বর্ষিত হবে। 'উপর-নীচে'র বাহ্যিক অর্থ হচ্ছে তারা অনায়াসে ও অব্যাহতভাবে রিজিক প্রাপ্ত হবে। –[তাফসীরে কাবীর]

পূর্ববর্তী আয়াতে শুধু পরকালের নিয়ামতের ওয়াদা ছিল। আলোচ্য আয়াতে পার্থিব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ওয়াদাও বিস্তারিতভাবে করা হয়েছে। এর কারণ সম্ভবতঃ এই যে, ইহুদিদের কুকর্ম এবং তাওরাত ও ইঞ্জিলের নির্দেশাবলি পরিবর্তনের বড় কারণ ছিল তাদের সংসার প্রীতি ও অর্থলিপ্সা। এ মোহই তাদেরকে কুরআন ও রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রকাশ্য নিদর্শনাবলি দেখা সত্ত্বেও সেগুলো মেনে নিতে বাধা প্রদান করছিল। তাদের আশঙ্কা ছিল এই যে, তারা মুসলমান হয়ে গেলে তাদের মোড়লি

www.almodina.com

শেষ হয়ে যাবে এবং ধর্মীয় নেতা হওয়ার কারণে যেসব হাদিয়া ও উপঢৌকন পাওয়া যায়, তা বন্ধ হয়ে যাবে। আল্লাহ তা'আলা তাদের এ আশঙ্কা দূর করার জন্য ওয়াদাও করেছেন যে, তারা সাচ্চা ঈমানদার ও সৎকর্মী হয়ে গেলে তাদের জাগতিক অর্থ-সম্পদ ও আরাম-আয়েশ হ্রাস পাবে না; বরং আরো বেড়ে যাবে।

একটি সন্দেহের নিরসন : এ বিবরণ থেকে একথা জানা গেল যে, এই বিশেষ ওয়াদাটি ঐসব ইহুদির জন্য করা হয়েছে, যারা মহানবী ﷺ-এর আমলে বিদ্যমান ছিল। তারা এসব নির্দেশ মেনে নিলে ইহকালেও তাদেরকে সব রকম নিয়ামত ও শান্তি প্রদান করা হতো। সে মতে তখন যারা ঈমান ও সৎকর্ম অবলম্বন করেছে, তারা এসব নিয়ামত পুরোপুরিভাবেই লাভও করেছে। যেমন আবিসিনিয়ার সম্রাট নাজ্জাসী ও আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম প্রমুখ। এর অর্থ এই নয় যে, যে কেউ বিশ্বাস ও সৎকর্ম অবলম্বন করবে, সে-ই ইহকালে অবশ্যাম্ভবীরূপে অগাধ ধন-দৌলতের অধিকারী হবে এবং যে এরূপ না করবে, সে অবশ্যই অভাব-অনটনে পতিত হবে। কারণ এ স্থলে কোনো সমগ্রিক নীতি বর্ণনা করা উদ্দেশ্য নয়; বরং একটি বিশেষ দলের সাথে বিশেষ অবস্থায় ওয়াদা করা হয়েছে।

তবে সাধারণ নীতি হিসেবে ঈমান ও সৎকর্মের ফলস্বরূপ পবিত্র-জীবন প্রাপ্ত হওয়ার ওয়াদা রয়েছে। এটি অগাধ ধন-দৌলতের আকারেও হতে পারে কিংবা বাহ্যিক অভাব-অনটনের আকারেও। পয়গম্বর ও ওলীদের অবস্থাই এর প্রমাণ। তাঁরা সবাই অগাধ-ধন দৌলত প্রাপ্ত হননি, তবে পবিত্র-জীবন অবশ্যই প্রাপ্ত হয়েছেন।

আয়াতের শেষাংশে ইনসাফ প্রদর্শনার্থে একথাও বলা হয়েছে যে, ইহুদিদের যেসব বক্রতা ও কুকর্ম বর্ণনা করা হয়েছে, তা সব ইহুদির অবস্থা নয়; বরং مِنْهُمْ اُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ অর্থাৎ তাদের মধ্যে ক্ষুদ্র একটি দল সৎপথের অনুসারীও রয়েছে। তবে তাদের অধিকাংশই কুকর্মী। সৎপথের অনুসারী বলে তাদেরকে বুঝানো হয়েছে, যারা পূর্বে ইহুদি অথবা খ্রিস্টান ছিল, এরপর কুরআন ও রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে।

প্রচারকার্যের তাকিদ ও রাসূল ﷺ-এর প্রতি সান্ত্বনা : এ আয়াতদ্বয়ে এবং এর পূর্ববর্তী উপর্যুপরি দুই রুকূতে ইহুদি ও খ্রিস্টানদের বক্রতা, বিপথগামিতা, হঠকারিতা এবং ইসলাম বিরোধী ষড়যন্ত্র বর্ণিত হয়েছে। মানুষ হিসেবে এর একটা স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া এরূপ হওয়াও সম্ভবপর ছিল যে, এর ফলে মহানবী ﷺ নিরাশ হয়ে পড়তেন কিংবা বাধ্য হয়ে প্রচারকার্যে ভাটা দিতে পারতেন। আর এর দ্বিতীয় প্রতিক্রিয়া এরূপও হতে পারত যে, তিনি বিরোধিতা, শত্রুতা ও নির্যাতনের পরওয়া না করে প্রচারকার্যে ব্যাপৃত থাকতেন, ফলে তাঁকে শত্রুর পক্ষ থেকে নানা রকম কষ্ট ও বিপদাপদের সম্মুখীন হতে হত। তাই তৃতীয় আয়াতে এর দিকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জোরালো ভাষায় নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, আপনার প্রতি আল্লাহর পক্ষ থেকে যা কিছু অবতরণ করা হয়, তার সম্পূর্ণটিই বিনা দ্বিধায় মানুষের কাছে পৌঁছে দিন; কেউ মন্দ বলুক অথবা ভালো, বিরোধিতা করুক কিংবা গ্রহণ করুক। অপরদিকে তাঁকে এ সংবাদ দিয়ে আশ্বস্ত করা হয়েছে যে, প্রচারকার্যে কাফেররা আপনার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং আপনার দেখাশোনা করবেন।

আয়াতের وَاِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهٗ বাক্যটি প্রণিধানযোগ্য। এর উদ্দেশ্য এই যে, যদি আপনি আল্লাহ তা'আলার একটি নির্দেশও পৌঁছাতে বাকি রাখেন, তবে আপনি পয়গম্বরীর দায়িত্ব থেকে পরিত্রাণ পাবেন না। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ ﷺ আজীবন এ কর্তব্য পালনে পূর্ণ সাহসিকতা ও সর্বশক্তি নিয়োগ করেন।

বিদায় হজের সময় মহানবী ﷺ -এর একটি উপদেশ : বিদায় হজের প্রসিদ্ধ ভাষণটি একদিক দিয়ে ছিল ইসলামের আইন এবং অপরদিক দিয়ে দয়ার সাগর, পিতামাতার চেয়েও অধিক স্নেহশীল পয়গম্বরের অন্তিম উপদেশ। এ ভাষণে তিনি সাহাবায়ে কেরামের অভূতপূর্ব সমাবেশকে লক্ষ্য করে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ জারি করার পর প্রশ্ন করলেন, اَلَا هَلْ بَلَّغْتُ। শোন! আমি কি তোমাদের কাছে দীন পৌঁছে দিয়েছিলাম? সাহাবীগণ স্বীকার করলেন, জি হ্যাঁ, অবশ্যই পৌঁছে দিয়েছেন। এরপর বললেন, তোমরা এ বিষয়ে সাক্ষী থেক। তিনি আরো বললেন, فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ অর্থাৎ এ সমাবেশে যারা উপস্থিত আছ, তারা আমার কথাটি অনুপস্থিতদের কাছেও পৌঁছে দিবে। অনুপস্থিত বলে দুই শ্রেণির লোককে বুঝানো হয়েছে। এক. যারা তখন দুনিয়াতে বিদ্যমান ছিল কিন্তু সমাবেশে উপস্থিত ছিল না। দুই. যারা তখনো পর্যন্ত জন্মগ্রহণই করেনি। তাদের কাছে পয়গাম পৌছানোর পন্থাহলো, ধর্মীয় শিক্ষার প্রচার ও প্রসার। সাহাবী ও তাবেয়ীগণ এ কর্তব্য যথাযথ পালন করেছেন।

www.almodina.com

এর প্রভাবেই সাধারণ অবস্থায় সাহাবায়ে কেরাম রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বাণী ও হাদীসকে আল্লাহ তা'আলার একটি বিরাট আমানতের ন্যায় অনুভব করেছেন। তাঁরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পবিত্র মুখ নিঃসৃত প্রত্যেকটি কথাই উম্মতের কাছে পৌঁছে দিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন। যদি কোনো বিশেষ কারণ অথবা অক্ষমতার দরুন কেউ বিশেষ হাদীস অন্যের কাছে বর্ণনা না করতেন, তবে মৃত্যুর পূর্ব মূহুর্তে তা দু'চার জনকে অবশ্যই শুনিয়ে দিয়েছেন যাতে এ আমানতের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি লাভ করতে পারেন। সহীহ বুখারীতে হযরত মুয়ায (রা.)-এর একটি হাদীস সম্পর্কে এমনি ধরনের এক ঘটনা বর্ণিত রয়েছে। বলা হয়েছে : اُخْبِرَ بِهِ مُعَاذٌ عِنْدَ مَوْتِهِ تَأَثُّمًا অর্থাৎ, এ আমানত না পৌঁছানোর কারণে গুনাহগার হওয়ার ভয়ে হযরত মুয়ায (রা.) হাদীসটি মৃত্যুর সময় বর্ণনা করেছেন।

وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ আয়াতের এ দ্বিতীয় বাক্যে সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে, যে যত বিরোধিতাই করুক, শত্রুরা আপনার কেশাগ্রও স্পর্শ করতে পারবে না।

হাদীসে বলা হয়েছে : এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে কয়েকজন সাহাবী দেহরক্ষী হিসাবে সাধারণভাবে মহানবী ﷺ -এর সাথে থাকতেন এবং গৃহে ও প্রবাসে তাঁকে প্রহরা দিতেন। এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর তিনি সবাইকে বিদায় করে দেন। কারণ এ দায়িত্ব আল্লাহ তা'আলা স্বহস্তে গ্রহণ করেন।

হযরত হাসান (রা.) বর্ণিত এক হাদীসে মহানবী ﷺ বলেন : প্রচারকার্যের নির্দেশ প্রাপ্তির পর আমার মনে বেশ ভীতির সঞ্চার হয়েছিল। কারণ, চারদিক থেকে হয়তো সবাই আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে এবং বিরোধিতা করবে। অতঃপর যখন এ আয়াত অবতীর্ণ হলো, তখন ভয়-ভীতি দূর হয়ে অন্তর প্রশান্ত হয়ে যায়। –[তাফসীরে কবীর]

এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর প্রচারকার্যে কেউ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বিন্দুমাত্রও ক্ষতি করতে সক্ষম হয়নি। অবশ্য যুদ্ধ ও জিহাদে সাময়িকভাবে কোনোরূপ কষ্ট পাওয়া এর পরিপন্থি নয়।

আহলে কিতাবদের প্রতি শরিয়ত অনুসরণের নির্দেশ : প্রথম আয়াতে আহলে কিতাব ইহুদি ও খ্রিস্টানদেরকে শরিয়ত অনুসরণের নির্দেশ দান প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, যদি তোমরা শরিয়তের নির্দেশাবলি পালন না কর, তবে তোমরা কিছুই নও। উদ্দেশ্য এই যে, ইসলামি শরিয়ত অনুসরণ না করলে তোমাদের যাবতীয় সাধুতা ও ক্রিয়াকর্ম পণ্ডশ্রম মাত্র। আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে একটি সৃষ্টিগত মর্যাদা দান করেছেন। অর্থাৎ তোমরা পয়গম্বরদের বংশধর। দ্বিতীয়তঃ তাওরাত ও ইঞ্জিলের শিক্ষাগত মর্যাদাও তোমাদের আয়ত্তাধীন; তোমাদের মধ্যে অনেক সাধু ব্যক্তিও রয়েছে। তারা আধ্যাত্মিক পথে পরিশ্রম ও সাধনা করে। কিন্তু এসব বিষয়ের মূল্য আল্লাহ তা'আলার কাছে তখনই হবে, যখন তোমরা ইসলামি শরিয়তের অনুসরণ করবে। এছাড়া কোনো সম্পর্কই কাজে আসবে না এবং শিক্ষাগত যোগ্যতা, পরিশ্রম ও সাধ্য-সাধনার কোনোটিতেই তোমাদের মুক্তি আসবে না।

এ আয়াত থেকে মুসলমানরাও নির্দেশ লাভ করেছে যে, শরিয়তের পুরোপুরি অনুসরণ ব্যতীত সাধুতা আধ্যাত্মিকতা, চেষ্টা-সাধনা অর্ন্তদৃষ্টিলাভ, ইলহাম ইত্যাদি দ্বারা মুক্তি লাভ করা যাবে না।

এ আয়াতে শরিয়ত অনুসরণের জন্য তিনটি বিষয় মেনে চলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রথম তাওরাত। দ্বিতীয়– ইঞ্জিল–, যা ইহুদি ও খ্রিস্টানদের কাছে পূর্বেই অবতীর্ণ হয়েছে এবং তৃতীয় وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ অর্থাৎ আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে যা প্রেরিত হয়েছে।

সাহাবা ও তাবেয়ী তাফসীরবিদগণ এ বিষয়ে একমত যে, এর মর্ম কুরআন পাক, যা খ্রিস্টান ও ইহুদি সম্প্রদায়সহ সব উম্মতের জন্যই রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মাধ্যমে প্রেরিত হয়েছে। তাই আয়াতের অর্থ হবে এই যে, যে পর্যন্ত তাওরাত, ইঞ্জিল ও কুরআনের আনীত বিধি-বিধানগুলো বিশুদ্ধভাবে ও পূর্ণরূপে পালন না করবে, সে পর্যন্ত তোমাদের বংশগত ও শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং মর্যাদা আল্লাহর কাছে গ্রহণীয় হবে না।

এখানে প্রণিধানযোগ্য যে, আয়াতে তাওরাত ও ইঞ্জিলের মতো কুরআনেরও সংক্ষিপ্ত নাম ব্যবহার না করে একটি দীর্ঘ বাক্য وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ ব্যবহার করা হয়েছে। এর তাৎপর্য এই যে, এতে কতিপয় হাদীসের বিষয়বস্তুর দিকে ইঙ্গিত রয়েছে। এসব হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : আমাকে যেমন জ্ঞান-বিজ্ঞানের আধার কুরআন দেওয়া হয়েছে, তেমনি অন্যান্য তত্ত্বকথা সম্পর্কেও অবহিত করা হয়েছে। ভবিষ্যতে এমন হবে যে, কোনো তৃপ্ত ও আরামপ্রিয় ব্যক্তি বলাবলি করবে যে, তোমাদের জন্য কুরআনই যথেষ্ট। এতে যা হালাল করা হয়েছে তাকেই হালাল মনে কর এবং এতে যা হারাম করা হয়েছে তাকে হারাম মনে কর। অথচ বাস্তব সত্য এই যে, আল্লাহর রাসূল যা হারাম করেছেন, তাও আল্লাহর হারাম করা বস্তুর মতোই হারাম।' –[আবূ দাউ, ইবনে মাজাহ, দারেমী]

শরিয়তের বিধান তিন প্রকার : স্বয়ং কুরআনও এ বিষয়ে সাক্ষ্য দেয় وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُّوحٰى অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজের পক্ষ থেকে কোনো কথা বলেন না। তিনি যা কিছু বলেন, সবই আল্লাহর পক্ষ থেকে বলেন। যেসব ক্ষেত্রে তিনি কোনো কথা স্বীয় ইজতিহাদ ও কিয়াসের মাধ্যমে বলেন এবং অতঃপর ওহীর মাধ্যমে তার বিরুদ্ধে নির্দেশ অবতীর্ণ না হয়, পরিণামে সে ইজতিহাদও ওহীর মর্যাদা প্রাপ্ত হয়।

সারকথা এই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যেসব বিধান উম্মতকে দিয়েছেন, সেগুলো তিন প্রকার : এক. যেসব বিধান কুরআন সুস্পষ্টভাবে উল্লিখিত রয়েছে।: দুই. যেসব বিধান কুরআনে সুস্পষ্টভাবে নেই; বরং পৃথক ওহীর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে এবং তিন. যেসব বিধান তিনি স্বয়ং ইজতিহাদ ও কিয়াসের মাধ্যমে দিয়েছেন এবং এর বিরুদ্ধে ওহীর মাধ্যমে কোনো নির্দেশ অবতীর্ণ হয়নি।

আলোচ্য আয়াতে দ্বিতীয় প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, এতে ইহুদি ও খ্রিস্টানদেরকে তাওরাত, ইঞ্জিল ও কুরআন তিনটি গ্রন্থের নির্দেশাবলি পালন করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অথচ এগুলোর একটি অপরটিকে রহিত করে দিয়েছে। ইঞ্জিল তাওরাতের কতক বিধানকে এবং কুরআন তাওরাত ও ইঞ্জিলের অনেক বিধানকে রহিত করেছে। এমতাবস্থায় তিনটি সমষ্টিকে পালন করা কিরূপে সম্ভবপর হবে?

এর জওয়াব সুস্পষ্ট। অর্থাৎ পরবর্তীকালে আগমনকারী গ্রন্থ পূর্ববর্তী গ্রন্থের যেসব বিধানকে পরিবর্তন করেছে, সেসব পরিবর্তিত বিধান পালন করাই উভয় গ্রন্থ পালন করার নামান্তর। রহিত বিধান পালন করা উভয় গ্রন্থের উদ্দেশ্যেরই পরিপন্থি।

মহানবী (সা.)-এর প্রতি একটি সান্ত্বনা : উপসংহারে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সান্ত্বনার জন্য বলা হয়েছে। আহলে কিতাবদের অনেকেই আমার দেওয়া সুযোগ-সুবিধা ও অনুগ্রহের দ্বারা উপকৃত হবে না; বরং তাদের কুফর ও ঔদ্ধত্য আরো বেড়ে যাবে। অতএব আপনি এতে দুঃখিত হবেন না এবং তাদের প্রতি অনুকম্পাশীলও হবেন না।

শব্দ বিশ্লেষণ

مَغْلُوْلَةٌ : সীগাহ واحد مؤنث বহছ اسم مفعول বাব نَصَرَ মাসদার اَلْغَلُّ মূলবর্ণ (غ . ل . ل) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– বন্দী করা।

اَوْقَدُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِيْقَادُ মূলবর্ণ (و . ق . د) জিনস مثال واوى অর্থ– তারা ইন্ধন যোগাল।

اَطْفَاَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِطْفَاءُ মূলবর্ণ (ط . ف . ى) জিনসে ناقص يائى অর্থ– সে নিভিয়ে দিল।

لَيَزِيْدَنَّ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ فعل مضارع معروف در تاكيد با نون تاكيد ثقيله বাব لام ضَرَبَ মাসদার اَلزِّيَادَةُ মূলবর্ণ (ز . ى . د) জিনস اجوف يائى অর্থ– অবশ্যই বেশি করে দিবেন।

لَا تَأْسَ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ نهى حاضر معروف বাব سَمِعَ মাসদার اَلْاَسٰى মূলবর্ণ (ا . س . ى) জিনস মুরাক্কাব مهموز فاء এবং ناقص يائى অর্থ– তুমি চিন্তিত হয়ো না।

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئُونَ وَالنَّصَارَىٰ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (٦٩)	**অনুবাদ :** (৬৯) এটা সুনিশ্চিত যে, মুসলমান ও ইহুদি ও সাবেঈন এবং নাসারাদের মধ্যে যে ব্যক্তি বিশ্বাস রাখে আল্লাহর প্রতি এবং কিয়ামত দিবসের প্রতি এবং সৎকার্য করে, তবে এরূপ লোকদের জন্য [শেষ দিবসে] না কোনো প্রকার ভয় থাকবে আর না তারা চিন্তান্বিত হবে।
لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا ۖ كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنْفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ (٧٠)	(৭০) আমি বনী ইসরাঈল হতে অঙ্গীকার নিয়েছি এবং তাদের নিকট বহু পয়গম্বর প্রেরণ করেছি, যখনই তাদের নিকট কোনো নবী আগমন করতেন এমন কোনো বিধান নিয়ে যা তাদের মনঃপূত হতো না, তখনই তারা কতিপয়কে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করত এবং কতিপয়কে হত্যাই করে ফেলত।
وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِنْهُمْ ۚ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ (٧١)	(৭১) আর তারা এই ধারণাই করেছিল যে, কোনো শাস্তিই হবে না, এতে আরো অন্ধও বধির [-দের ন্যায়] হয়ে গেল, অতঃপর [দীর্ঘকাল পর] আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতি [করুণার] দৃষ্টি করলেন, তবুও তারা অন্ধ ও বধিরই হয়ে রইল তাদের অনেকে, বস্তুতঃ আল্লাহ তা'আলা তাদের [এই] কার্যকলাপ খুব প্রত্যক্ষ করেন।

শাব্দিক অনুবাদ

(৬৯) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا এটা সুনিশ্চিত যে, মুসলমান وَالَّذِينَ هَادُوا ও ইহুদি وَالصَّابِئُونَ ও সাবেঈন وَالنَّصَارَىٰ এবং নাসারাদের মধ্যে مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ যে ব্যক্তি বিশ্বাস রাখে আল্লাহর প্রতি وَالْيَوْمِ الْآخِرِ এবং কিয়ামত দিবসের প্রতি وَعَمِلَ صَالِحًا এবং সৎকার্য করে فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ তবে এরূপ লোকদের জন্য না কোনো প্রকার ভয় থাকবে وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ আর না তারা চিন্তান্বিত হবে।

(৭০) لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ আমি বনী ইসরাঈল হতে অঙ্গীকার নিয়েছি وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا এবং তাদের নিকট বহু পয়গম্বর প্রেরণ করেছি كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ যখনই তাদের নিকট কোনো নবী আগমন করতেন بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنْفُسُهُمْ এমন কোনো বিধান নিয়ে যা তাদের মনঃপূত হতো না। فَرِيقًا كَذَّبُوا তখনই তারা কতিপয়কে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করত وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ এবং কতিপয়কে হত্যাই করে ফেলত।

(৭১) وَحَسِبُوا। আর তারা এই ধারণাই করেছিল যে أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ কোনো শাস্তিই হবে না। فَعَمُوا وَصَمُّوا। তাতে আরো অন্ধও বধির হয়ে গেল ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতি [করুণার] দৃষ্টি করলেন। ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا। তবুও তারা অন্ধ ও বধিরই হয়ে রইল كَثِيرٌ مِنْهُمْ তাদের অনেকে وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ বস্তুতঃ আল্লাহ তা'আলা তাদের [এই] কার্যকলাপ খুব প্রত্যক্ষ করেন।

www.almodina.com

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ ؕ وَقَالَ الْمَسِيْحُ يٰبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اعْبُدُوا اللّٰهَ رَبِّيْ وَرَبَّكُمْ ؕ اِنَّهٗ مَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَاْوٰىهُ النَّارُ ؕ وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ (٧٢)	অনুবাদ : (৭২) নিশ্চয় তারা কাফের হয়েছে, যারা বলেছে যে, আল্লাহ তিনি তো মসীহ ইবনে মারইয়াম, অথচ মসীহ নিজেই বলেছেন যে, হে বনী ইসরাঈল! তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর, যিনি আমারও প্রতিপালক এবং তোমাদেরও প্রতিপালক, নিশ্চয় যে ব্যক্তি আল্লাহর অংশী স্থির করবে, তবে তার জন্য আল্লাহ তা'আলা বেহেশতকে হারাম করে দিবেন এবং তার বাসস্থান হবে দোজখ, এবং এরূপ জালেমদের কোনো সাহায্যকারী হবে না।
لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ ثَالِثُ ثَلٰثَةٍ وَمَا مِنْ اِلٰهٍ اِلَّآ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ؕ وَاِنْ لَّمْ يَنْتَهُوْا عَمَّا يَقُوْلُوْنَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ (٧٣)	(৭৩) নিঃসন্দেহে তারাও কাফের যারা বলে, আল্লাহ তা'আলা তিনের [অর্থাৎ তিন মা'বূদের] এক, অথচ এক মা'বূদ ভিন্ন অন্য কোনোই [হক] মা'বূদ নেই, আর যদি এরা স্বীয় উক্তিসমূহ হতে নিবৃত্ত না হয়, তবে তাদের মধ্যে যারা কাফের থাকবে তাদের উপর যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি পতিত হবে।
اَفَلَا يَتُوْبُوْنَ اِلَى اللّٰهِ وَيَسْتَغْفِرُوْنَهٗ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ (٧٤)	(৭৪) অতঃপরও কি তারা আল্লাহ তা'আলার সমীপে তওবা করে না এবং তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে না? অথচ আল্লাহ তা'আলা অতিশয় ক্ষমাশীল, পরম করুণাময়।

শাব্দিক অনুবাদ

(৭২) لَقَدْ كَفَرَ নিশ্চয় তারা কাফের হয়েছে। الَّذِيْنَ قَالُوْٓا যারা বলেছে যে اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ আল্লাহ তিনি তো মসীহ ইবনে মারইয়াম وَقَالَ الْمَسِيْحُ; অথচ মসীহ নিজেই বলেছেন যে يٰبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ হে বনী ইসরাঈল! اعْبُدُوا اللّٰهَ তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর رَبِّيْ وَرَبَّكُمْ যিনি আমারও প্রতিপালক এবং তোমাদেরও প্রতিপালক اِنَّهٗ مَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ নিশ্চয় যে ব্যক্তি আল্লাহর অংশী স্থির করবে فَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ তবে তার জন্য আল্লাহ তা'আলা বেহেশতকে হারাম করে দিবেন وَمَاْوٰىهُ النَّارُ; এবং তার বাসস্থান হবে দোজখ وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ এবং এরূপ জালেমদের কোনো সাহায্যকারী হবে না।

(৭৩) لَقَدْ كَفَرَ নিঃসন্দেহে তারাও কাফের। الَّذِيْنَ قَالُوْٓا যারা বলে اِنَّ اللّٰهَ ثَالِثُ ثَلٰثَةٍ আল্লাহ তা'আলা তিনের এক وَمَا مِنْ اِلٰهٍ اِلَّآ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ অথচ এক মা'বূদ ভিন্ন অন্য কোনোই মা'বূদ নেই وَاِنْ لَّمْ يَنْتَهُوْا عَمَّا يَقُوْلُوْنَ আর যদিএরা স্বীয় উক্তিসমূহ হতে নিবৃত্ত না হয় لَيَمَسَّنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ তবে তাদের মধ্যে যারা কাফের থাকবে তাদের উপর যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি পতিত হবে।

(৭৪) اَفَلَا يَتُوْبُوْنَ اِلَى اللّٰهِ অতঃপরও কি তারা আল্লাহ তা'আলার সমীপে তওবা করে না وَيَسْتَغْفِرُوْنَهٗ এবং তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে না وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ; অথচ আল্লাহ তা'আলা অতিশয় ক্ষমাশীল, পরম করুণাময়।

www.almodina.com

مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ ۚ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ۖ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ ۖ كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ ۗ انْظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْآيَاتِ ثُمَّ انْظُرْ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ (٧٥)

অনুবাদ : (৭৫) মসীহ ইবনে মারইয়াম একজন রাসূল ব্যতীত আর কিছুই নন, তাঁর পূর্বে আরো বহু রাসূল গত হয়েছেন, তাঁর মাতা একজন ওলী খাতুন ছিলেন, তাঁরা উভয়ে অন্ন ভক্ষণ করতেন, লক্ষ্য করুন! আমি কিরূপে প্রমাণসমূহ তাদের নিকট বর্ণনা করছি, অতঃপর লক্ষ্য করুন! তারা উল্টা কোন দিকে যাচ্ছে।

শাব্দিক অনুবাদ

(৭৫) مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ মসীহ ইবনে মারইয়াম একজন রাসূল ব্যতীত আর কিছুই নন قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ তাঁর পূর্বে আরো বহু রাসূল গত হয়েছেন وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ তাঁর মাতা একজন ওলী খাতুন ছিলেন كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ তাঁরা উভয়ে অন্ন ভক্ষণ করতেন انْظُرْ লক্ষ্য করুন! كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْآيَاتِ আমি কিরূপে প্রমাণসমূহ তাদের নিকট বর্ণনা করছি ثُمَّ انْظُرْ অতঃপর লক্ষ্য করুন! أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ তারা উল্টা কোন দিকে যাচ্ছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

চারটি সম্প্রদায়ের প্রতি পরকালে মুক্তির ওয়াদা : দ্বিতীয় আয়াতে আল্লাহ তা'আলা চারটি সম্প্রদায়কে ঈমান ও সৎকর্মের প্রতি আহ্বান জানিয়ে সে জন্য পরকালে মুক্তির ওয়াদা করেছেন। তন্মধ্যে প্রথম সম্প্রদায় হচ্ছে الَّذِينَ آمَنُوا অর্থাৎ মুসলমান। দ্বিতীয়তঃ وَالَّذِينَ هَادُوا অর্থাৎ ইহুদি, তৃতীয়ত : صَابِئُونَ এবং চতুর্থতঃ نَصَارَىٰ এদের মধ্যে তিনটি জাতি– মুসলমান, ইহুদি ও খ্রিস্টান সর্বজন পরিচিত এবং পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে বিদ্যমান। সাবিয়ূন অথবা ছাবেয়ী নামে আজকাল পৃথিবীতে কোনো প্রসিদ্ধ জাতি নাই। এ কারণেই এদের চিহ্নিতকরণের ব্যাপারে আলেমদের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়।

তাফসীরবিদ ইবনে কাছীর হযরত কাতাদার বরাত দিয়ে উল্লেখ করেছেন যে, সাবিয়ূন হলো তারাই যারা ফেরেশতাদের ইবাদত করে, কেবলার উল্টো দিকে নামাজ পড়ে এবং দাউদ (আ.)-এর প্রতি অবতীর্ণ ঐশী গ্রন্থ যাবূর পাঠ করে।

কুরআন পাকের এ বর্ণনাভঙ্গি থেকে বাহ্যতঃ এর সমর্থন পাওয়া যায়। কেননা কুরআন মাজীদে চারটি ঐশী গ্রন্থের উল্লেখ রয়েছে : কুরআন, ইঞ্জিল, যাবূর ও তাওরাত। আয়াতে এ গ্রন্থ চতুষ্টয়ের অনুসারীদের কথাই উল্লেখ করা হয়েছে।

আল্লাহ তা'আলার কাছে সাফল্য সৎকর্মের উপর নির্ভরশীল : উভয় আয়াতের মোটামুটি বিষয়বস্তু এই যে, আমার দরবারে কারো বংশগত ও জাতিগত বৈশিষ্ট্যের কোনো মূল্য নেই। যে ব্যক্তি পূর্ণ আনুগত্য, বিশ্বাস ও সৎকর্ম অবলম্বন করবে, সে পূর্বে যাই থাক, আমার কাছে প্রিয় বলে গহণ্য হবে এবং তার কাজকর্ম গৃহীত হবে। একথা সুস্পষ্ট যে, কুরআন অবতরণের পর পূর্ণ আনুগত্য মুসলমান হওয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কারণ, পূর্ববর্তী গ্রন্থ তাওরাত এবং ইঞ্জিলেও এরই নির্দেশ রয়েছে। কুরআন পাক শুধুমাত্র এ উদ্দেশ্যেই অবতীর্ণ হয়েছে। এ কারণেই কুরআন অবতরণ ও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নবুয়ত প্রাপ্তির পর কুরআন ও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা ছাড়া তাওরাত ইঞ্জিল ও যাবূরের অনুসরণ বিশুদ্ধ হতে পারে না। অতএব আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, এসব সম্প্রদায়ের মধ্যে যারা মুসলমান হবে, তারাই পরকালে মুক্তি ও ছওয়াবের অধিকারী হবে। এতে এ ধারণাও খণ্ডন করা হয়েছে যে, এরা কুফর ও পাপের পথে থেকে এ যাবৎ ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে যেসব হীন চক্রান্ত করেছে, মুসলমান হওয়ার পর এদের পরিণাম কি হবে? আয়াতদৃষ্টে বুঝা যাচ্ছে যে, অতীত সব গুনাহ ও ভুল ক্রটি ক্ষমা করা হবে এবং পরকালে তারা শঙ্কিত ও দুঃখিত হবে না।

বিষয়বস্তুর প্রতি লক্ষ্য করলে বাহ্যতঃ বুঝা যায় যে, এখানে মুসলমানদের উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। কেননা আয়াতে যে স্তরের ঈমান ও আনুগত্য কামনা করা হয়েছে, তারা পূর্ব থেকেই সে স্তরে বিরাজমান। এ স্তরের প্রতি যাদেরকে ডাকা উদ্দেশ্য, আয়াতে শুধু তাদের উল্লেখ করাই প্রয়োজন ছিল। কিন্তু তাদের সাথে মুসলমানদের যুক্ত করার ফলে একটি বিশেষ ভাষালঙ্কার সৃষ্টি হয়েছে। একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা বিষয়টি বুঝা যাবে। কোনো শাসনকর্তা অথবা বাদশাহ এরূপ স্থলে বলে

থাকেন: আমাদের আইন সবার বেলায় প্রযোজ্য, অনুগত হোক কিংবা বিরোধী, যে-ই আনুগত্য করবে, সে-ই অনুগ্রহ ও পুরস্কারের যোগ্য হবে। এখন সবারই জানা যে, অনুগতরা তো আনুগত্য করছেই, যে বিরোধী আসলে তাকে শোনানোই উদ্দেশ্য। কিন্তু এখানে অনুগতকে উল্লেখ করার তাৎপর্য এই যে, অনুগতদের প্রতি আমাদের যে কৃপাদৃষ্টি, তা কোনো বংশগত ও জাতিগত বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে নয়; বরং তাদের আনুগত্যের উপরই নির্ভরশীল। যদি বিরুদ্ধবাদী ব্যক্তিও আনুগত্য অবলম্বন করে, তবে সেও এ কৃপা ও অনুগ্রহের অধিকারী হবে।

উপরিউক্ত চার সম্প্রদায়কে সম্বোধন করে যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তার তিনটি অংশ আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস, কিয়ামতের প্রতি বিশ্বাস এবং সৎকর্ম।

রেসালতে বিশ্বাস স্থাপন ব্যতীত মুক্তি নেই : এ আয়াতে ঈমান ও বিশ্বাস সম্বন্ধীয় সব বিষয়ের বিবরণ পেশ করা লক্ষ্য নয়। ইসলামের কয়েকটি মৌলিক বিশ্বাস উল্লেখ করে সব বিশ্বাসের প্রতি ইঙ্গিত করা এবং তৎপ্রতি আহবান জানানোই এখানে উদ্দেশ্য। নতুবা যে আয়াতেই ঈমানের উল্লেখ করা হবে, সেখানেই ঈমানের আদ্যোপান্ত বিবরণ উল্লেখ করতে হবে। অথচ এমনটি অপরিহার্য হতে পারে না। তাই এক্ষেত্রেও রাসূল অথবা রেসালাতের প্রতি বিশ্বাসের কথা সুস্পষ্টরূপে উল্লিখিত না হওয়ায় কোনো সামান্যতম জ্ঞান-বুদ্ধি ও বিচার শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষেও কোনোরূপ সন্দেহ করার অবকাশ ছিল না। বিশেষ করে যখন সমগ্র কুরআন ও তার শত শত আয়াত রেসালাতের প্রতি বিশ্বাসের স্পষ্টোক্তিতে পরিপূর্ণ রয়েছে। এসব আয়াতে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, রাসূল ও রাসূলের বাণীর প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন ব্যতীত মুক্তি নেই এবং বিশ্বাস ছাড়া কোনো ঈমান ও সৎকর্মই গ্রহণীয় নয়। কিন্তু একটি ধর্মদ্রোহী দল কোনো না কোনো উপায়ে নিজেদের ভ্রান্ত মতবাদ কুরআনের অন্তর্ভুক্ত করতে সচেষ্ট। আলোচ্য আয়াতে পরিষ্কারভাবে রেসালাত উল্লিখিত না হওয়ায় তারা একটি নতুন মতবাদ খাড়া করেছে, যা কুরআন ও হাদীসের অসংখ্য স্পষ্টোক্তির সম্পূর্ণ বিপরীত। তা এই যে, প্রত্যেক বিজ্ঞ লোক তা ইহুদি, খ্রিস্টান এমন কি মূর্তিপূজারী পৌত্তলিক থাকা অবস্থায়ও যদি শুধু আল্লাহ ও কিয়ামতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম সম্পাদন করে, তবে পরকালে মুক্তির অধিকারী হতে পারে– পারলৌকিক মুক্তির জন্য ইসলাম গ্রহণ করা কোনো জরুরি বিষয় নয়। –[নাউযুবিল্লাহ]

আল্লাহ তা'আলা যাদেরকে কুরআন পাঠের শক্তি এবং কুরআনের প্রতি বিশুদ্ধ ঈমান দান করেছেন, তাদের পক্ষে কুরআনি স্পষ্টোক্তি দ্বারা এ বিভ্রান্তি দূর করা খুব বেশি বিদ্যা-বুদ্ধির মুখাপেক্ষি নয়। যারা কুরআনের অনুবাদ জানে তারাও এ কাল্পনিক ভ্রান্তি অনায়াসে বুঝতে পারে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : "আজ যদি হযরত মূসা (আ.) জীবিত থাকতেন, তবে আমার অনুসরণ ছাড়া তাঁর গতি ছিল না।" অতএব প্রত্যেক ধর্মাবলম্বী নিজ নিজ ধর্ম পালন করে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করেই এবং মুসলমান না হয়েই পরকালে মুক্তি পাবে এবং এরূপ বলা কুরআনের উপরিউক্ত আয়াতসমূহের প্রকাশ্য বিরুদ্ধাচরণ নয় কি?

বনী ইসরাঈলদের অঙ্গীকার ভঙ্গ : كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنْفُسُهُمْ অর্থাৎ বনী ইসরাঈলের কাছে তাদের রাসূল যখন কোনো নির্দেশ নিয়ে আসতেন যা তাদের রুচিবিরুদ্ধ হতো, তখন অঙ্গীকার ভঙ্গ করে তারা আল্লাহর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করতে শুরু করত এবং পয়গম্বরদের মধ্যে কারো প্রতি মিথ্যারোপ করত এবং কাউকে হত্যা করত এটি ছিল আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস ও সৎকর্মের ক্ষেত্রে তাদের অবস্থা। এখন পরকালের প্রতি বিশ্বাসের অবস্থা এ দ্বারা অনুমান করা যায় যে, এতসব নির্মম অত্যাচার ও বিদ্রোহীসুলভ অপরাধে লিপ্ত হয়েও তারা সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকত। ভাবখানা এই যে, এসব কুকর্মের কোনো সাজাই ভোগ করতে হবে না এবং নির্যাতন ও বিদ্রোহের অশুভ পরিণতি কখনো সামনে আসবে না। এহেন ধারণার বশবর্তী হয়ে তারা খোদায়ী নিদর্শন ও হুঁশিয়ারি থেকে সম্পূর্ণ অন্ধ ও বধির হয়ে যায় এবং যা গর্হিত তাই করতে থাকে। এমনকি কতক পয়গম্বরকে তারা হত্যা করে এবং কতককে বন্দী করে। অবশেষে আল্লাহ তা'আলা বাদশাহ বখতে নছরকে তাদের উপর চাপিয়ে দেন। অতঃপর দীর্ঘদিন অতীত হলে জনৈক পারস্য সম্রাট তাদেরকে বখতে নছরের লাঞ্ছনা ও অবমাননার কবল থেকে উদ্ধার করে বাবেল থেকে বায়তুল মোকাদ্দাসে আনেন। তখন তারা তওবা করে এবং অবস্থা সংশোধনে মনোনিবেশ করে। আল্লাহ তা'আলা তাদের সে তওবা কবুল করেন। কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতেই তারা আবার দুষ্কৃতিতে মেতে উঠে এবং অন্ধ ও বধির হয়ে হযরত জাকারিয়া ও হযরত ইয়াহইয়া (আ.)-কে হত্যা করার দুঃসাহস প্রদর্শন করে। তারা হযরত ঈসা (আ.)-কেও হত্যা করতে উদ্যত হয়। –[ফাওয়ায়েদে ওসমানী]

قوله اِنَّ اللّٰهَ ثَالِثُ ثَلٰثَةٍ الخ অর্থাৎ হযরত মসীহ, রূহুল কুদুস ও আল্লাহ কিংবা মসীহ, মরিয়ম ও আল্লাহ, সবাই আল্লাহ (নাউযুবিল্লাহ)। তাদের মধ্যে একজন অংশীদার হলেন আল্লাহ। এরপর তাঁরা তিন জনই এক এবং একজনই তিন। এ হচ্ছে খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের সাধারণ ধর্মবিশ্বাস। এ যুক্তিবিরোধী ধর্মবিশ্বাসকে তারা জটিল ও দ্ব্যার্থবোধক ভাষায় ব্যক্ত করে। অতঃপর বিষয়টি যখন কারো বোধগম্য হয় না, তখন একে 'বুদ্ধি বহির্ভূত সত্য' বলে আখ্যা দিয়ে ক্ষান্ত হয়। –[ফাওয়ায়েদে ওসমানী]

মসীহ (আ.)-এর উপাস্যতা খণ্ডন : قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ অর্থাৎ, অন্যান্য পয়গম্বর যেমন পৃথিবীতে আগমন করার পর কিছুদিন অবস্থান করে এখান থেকে লোকান্তরিত হয়ে গেছেন এবং স্থায়িত্ব লাভ করতে পারেননি যা উপাস্য হওয়ার লক্ষণ, এমনিভাবে হযরত মসীহ (আ.) যিনি তাঁদের মতোই একজন মানুষ স্থায়িত্ব ও অমরত্ব লাভ করতে পারেননি। কাজেই তিনি উপাস্য হতে পারেন না।

চিন্তা করলে বুঝা যাবে, যে ব্যক্তি পানাহারের মুখাপেক্ষি, সে পৃথিবীর সব কিছুরই মুখাপেক্ষী। মাটি, বাতাস, পানি, সূর্য এবং জীবজন্তু থেকে সে পরাঙ্মুখ হতে পারে না। খাদ্যশস্য উদরে পৌঁছা এবং হজম হওয়া পর্যন্ত চিন্তা করুন, প্রত্যক্ষ্য ও পরোক্ষভাবে কতকিছু প্রয়োজন। এরপর খাওয়ার যে প্রতিক্রিয়া দেখা দিবে, তা কতদূর পর্যন্ত পৌঁছবে। পরমুখাপেক্ষিতার এ দীর্ঘ পরম্পরার প্রতি লক্ষ্য রেখে আমরা মসীহ ও মরিয়মের উপাস্যতা খণ্ডনকল্পে যুক্তির আকারে এরূপ বলতে পারি: মসীহ ও মরিয়ম পানাহারের প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র থেকে মুক্ত ছিলেন না। এ বিষয়টি চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা ও লোকপরম্পরা দ্বারা প্রমাণিত। যে ব্যক্তি পানাহার থেকে মুক্ত নয়, সে পৃথিবীর কোনো বস্তু থেকেই নিষ্কৃতি লাভ করতে পারে না। এখন আপনিই বলুন, যে সত্তা মানব-মণ্ডলীর মতো স্বীয় অস্তিত্ব রক্ষার্থে বস্তুজগত থেকে পরাঙ্মুখ নয়, সে কিভাবে আল্লাহ হতে পারে? এ শক্তিশালী ও সুস্পষ্ট যুক্তিটি জ্ঞানী ও মূর্খ সবাই সমভাবে বুঝতে পারে। অর্থাৎ পানাহার করা উপাস্য হওয়ার পরিপন্থি– যদিও পানাহার না করাও উপাস্য হওয়ার প্রমাণ নয়। নতুবা সব ফেরেশতা আল্লাহ হয়ে যাবে।(نَعُوْذُ بِاللّٰهِ) –[ফাওয়ায়েদে ওসমানী]

হযরত মরিয়ম পয়গম্বর ছিলেন কি ওলী : হযরত মরিয়মের পয়গম্বর ও ওলী হওয়ার ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। আলোচ্য আয়াতে প্রশংসার স্থলে صِدِّيْقَةٌ শব্দ ব্যবহৃত হওয়ায় বাহ্যতঃ বুঝা যায় যে, তিনি ওলী ছিলেন– নবী নয়। কারণ প্রশংসার স্থলে সাধারণতঃ উচ্চপদই উল্লেখ করা হয়। নবুয়ত প্রাপ্ত হয়ে থাকলে এখানে نَبِيَّةٌ বলা হতো। অথচ বলা হয়েছে صِدِّيْقَةٌ এটি ওলীত্বের একটি স্তর। –[রূহুল মা'আনী, সংক্ষিপ্ত]

আলেমদের সুচিন্তিত অভিমত এই যে, মহিলারা কখনো নবুয়ত লাভ করেনি। এ পদ সর্বদা পুরুষদের জন্যই সংরক্ষিত রয়েছে। وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالًا نُّوْحِيْٓ اِلَيْهِمْ مِّنْ اَهْلِ الْقُرٰى অর্থাৎ মহানবী ﷺ-এর পূর্বে পুরুষদের কাছেই ওহী প্রেরিত হয়েছে। –[সূরা ইউসুফ]

শব্দ বিশ্লেষণ

لَا تَهْوٰى : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ نفى فعل مضارع معروف বাব سَمِعَ মাসদার اَلْهَوٰى মূলবর্ণ (ه ـ و ـ ى) জিনস لفيف مقرون অর্থ– সে চায় না।

عَمُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব سَمِعَ মাসদার اَلْعَمٰى মূলবর্ণ (ع ـ م ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– তারা অন্ধ হলো।

صَمُّوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব سَمِعَ মাসদার اَلصَّمَمُ মূলবর্ণ (ص ـ م ـ م) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– তারা বধির হলো।

صِدِّيْقَةٌ : সীগাহ واحد مؤنث বহছ اسم مبالغة বাব نَصَرَ মাসদার اَلصِّدْقُ মূলবর্ণ (ص ـ د ـ ق) জিনস صحيح অর্থ– বড় সত্যবাদী।

www.almodina.com

অনুবাদ	আয়াত
অনুবাদ : (৭৬) আপনি বলুন, তোমরা কি আল্লাহ ব্যতীত এমন বস্তুর ইবাদত কর, যা না তোমাদের কোনো অপকার করার ক্ষমতা রাখে আর না কোনো উপকার করার, অথচ আল্লাহই সব শুনেন, সব জানেন।	قُلْ اَتَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَّلَا نَفْعًا ؕ وَاللّٰهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ (٧٦)
(৭৭) আপনি বলে দিন, হে আহলে কিতাব! তোমরা নিজেদের ধর্মে অন্যায়ভাবে সীমালঙ্ঘন করো না এবং ঐ সমস্ত লোকের [ভিত্তিহীন] কল্পনার উপর চলো না, যারা অতীতে নিজেরাও ভ্রান্তিতে পতিত হয়েছে এবং আরো বহু লোককে ভ্রান্তিতে নিক্ষেপ করেছে, বস্তুতঃ তারা সরল পথ হতে দূরে সরে পড়েছিল।	قُلْ يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ لَا تَغْلُوْا فِيْ دِيْنِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوْۤا اَهْوَآءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوْا مِنْ قَبْلُ وَاَضَلُّوْا كَثِيْرًا وَّضَلُّوْا عَنْ سَوَآءِ السَّبِيْلِ (٧٧)
(৭৮) বনী ইসরাঈলদের মধ্যে যারা কাফের ছিল তাদের উপর লা'নত করা হয়েছিল দাউদ এবং ঈসা ইবনে মারইয়ামের মুখে, এই লা'নত এ কারণে করা হয়েছিল যে, তারা আদেশের বিরোধিতা করেছে এবং সীমার বাইরে চলে গেছে।	لُعِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْۢ بَنِيْۤ اِسْرَآءِيْلَ عَلٰى لِسَانِ دَاوٗدَ وَعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ ؕ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ (٧٨)
(৭৯) যে অন্যায় কাজ তারা করেছিল তা হতে তারা নিবৃত্ত হচ্ছিল না, বাস্তবিকই তাদের কাজগুলো ছিল অত্যন্ত গর্হিত।	كَانُوْا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُّنْكَرٍ فَعَلُوْهُ ؕ لَبِئْسَ مَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ (٧٩)

শাব্দিক অনুবাদ

(৭৬) قُلْ আপনি বলুন اَتَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ তোমরা কি আল্লাহ ব্যতীত এমন বস্তুর ইবাদত কর مَا لَا يَمْلِكُ যা না ক্ষমতা রাখে لَكُمْ ضَرًّا وَّلَا نَفْعًا তোমাদের কোনো অপকার করার আর না কোনো উপকার করার وَاللّٰهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ অথচ আল্লাহই সব শুনেন, সব জানেন।

(৭৭) قُلْ আপনি বলে দিন يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ হে আহলে কিতাব! لَا تَغْلُوْا فِيْ دِيْنِكُمْ তোমরা নিজেদের ধর্মে সীমালঙ্ঘন করো না غَيْرَ الْحَقِّ অন্যায়ভাবে وَلَا تَتَّبِعُوْۤا اَهْوَآءَ قَوْمٍ এবং ঐ সমস্ত লোকের [ভিত্তিহীন] কল্পনার উপর চলো না قَدْ ضَلُّوْا مِنْ قَبْلُ যারা অতীতে নিজেরাও ভ্রান্তিতে পতিত হয়েছে وَاَضَلُّوْا كَثِيْرًا এবং আরো বহু লোককে ভ্রান্তিতে নিক্ষেপ করেছে وَضَلُّوْا عَنْ سَوَآءِ السَّبِيْلِ বস্তুতঃ তারা সরল পথ হতে দূরে সরে পড়েছিল।

(৭৮) لُعِنَ তাদের উপর লা'নত করা হয়েছিল الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْۢ بَنِيْۤ اِسْرَآءِيْلَ বনী ইসরাঈলদের মধ্যে যারা কাফের ছিল عَلٰى لِسَانِ دَاوٗدَ وَعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ দাউদ এবং ঈসা ইবনে মারইয়ামের মুখে ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ এই লা'নত এ কারণে করা হয়েছিল যে, তারা আদেশের বিরোধিতা করেছে এবং সীমার বাইরে চলে গেছে।

(৭৯) كَانُوْا لَا يَتَنَاهَوْنَ তা হতে তারা নিবৃত্ত হচ্ছিল না عَنْ مُّنْكَرٍ فَعَلُوْهُ যে অন্যায় কাজ তারা করেছিল لَبِئْسَ مَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ বাস্তবিকই তাদের কাজগুলো ছিল অত্যন্ত গর্হিত।

تَرٰى كَثِيْرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ؕ لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ اَنْفُسُهُمْ اَنْ سَخِطَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَفِى الْعَذَابِ هُمْ خٰلِدُوْنَ (٨٠)

অনুবাদ : (৮০) আপনি এদের [ইহুদিদের] মধ্যে অনেক লোককে দেখবেন যে, বন্ধুত্ব করছে কাফেরদের সাথে, যে কাজ তারা ভবিষ্যতে [শাস্তি ভোগ] -এর জন্য করছে, তা নিঃসন্দেহে মন্দ, যেহেতু আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছেন, ফলতঃ তারা আজাবে চিরকাল থাকবে।

وَلَوْ كَانُوْا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالنَّبِيِّ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوْهُمْ اَوْلِيَآءَ وَلٰكِنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ فٰسِقُوْنَ (٨١)

(৮১) আর যদি এরা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনত এবং নবী [মূসা] -এর প্রতি এবং ঐ কিতাবের [অর্থাৎ তাওরাতের] প্রতি যা তাঁর নিকট প্রেরিত হয়েছিল। তবে তাদেরকে [অর্থাৎ মুশরিকদেরকে] কখনো বন্ধুরূপে গ্রহণ করত না, কিন্তু তাদের অধিকাংশ লোকই নাফরমান।

لَتَجِدَنَّ اَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا الْيَهُوْدَ وَالَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا ۚ وَلَتَجِدَنَّ اَقْرَبَهُمْ مَّوَدَّةً لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّا نَصٰرٰى ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيْسِيْنَ وَرُهْبَانًا وَّاَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ (٨٢)

(৮২) আপনি মানবমণ্ডলীর মধ্যে মুসলমানদের সাথে অধিক শত্রুতা পোষণকারী পাবেন এই ইহুদি ও মুশরিকদেরকে, আর তন্মধ্যে মুসলমানদের সাথে বন্ধুত্ব রাখার অধিকতর নিকটবর্তী ঐ সমস্ত লোককে পাবেন, যারা নিজেদেরকে নাসারা বলে, এটা এ কারণে যে, তাদের মধ্যে বহু জ্ঞান পিপাসু আলেম এবং বহু সংসার বিরাগী দরবেশ রয়েছে, আর এই কারণে যে,এরা অহংকারী নয়।

শাব্দিক অনুবাদ

(৮০) تَرٰى كَثِيْرًا مِّنْهُمْ আপনি এদের [ইহুদিদের] মধ্যে অনেক লোককে দেখবেন যে يَتَوَلَّوْنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا বন্ধুত্ব করছে কাফেরদের সাথে لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ اَنْفُسُهُمْ যে কাজ তারা ভবিষ্যতে [শাস্তি ভোগ] -এর জন্য করছে, তা নিঃসন্দেহে মন্দ اَنْ سَخِطَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ যেহেতু আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছেন وَفِى الْعَذَابِ هُمْ خٰلِدُوْنَ ফলতঃ এরা আজাবে চিরকাল থাকবে।

(৮১) وَلَوْ كَانُوْا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ আর যদি এরা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনত وَالنَّبِيِّ এবং নবী [মূসা] -এর প্রতি وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِ এবং ঐ কিতাবের প্রতি যা তাঁর নিকট প্রেরিত হয়েছিল مَا اتَّخَذُوْهُمْ اَوْلِيَآءَ তবে তাদেরকে [অর্থাৎ মুশরিকদেরকে] কখনো বন্ধুরূপে গ্রহণ করত না وَلٰكِنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ فٰسِقُوْنَ কিন্তু তাদের অধিকাংশ লোকই নাফরমান।

(৮২) لَتَجِدَنَّ আপনি পাবেন اَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً মানবমণ্ডলীর মধ্যে অধিক শত্রুতা পোষণকারী। لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا মুসলমানদের সাথে। الْيَهُوْدَ وَالَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا এই ইহুদি ও মুশরিকদেরকে وَلَتَجِدَنَّ اَقْرَبَهُمْ আর তন্মধ্যে অধিকতর নিকটবর্তী ঐ সমস্ত লোককে পাবেন। مَوَدَّةً لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا মুসলমানদের সাথে বন্ধুত্ব রাখার الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّا نَصٰرٰى যারা নিজেদেরকে নাসারা বলে ذٰلِكَ بِاَنَّ مِنْهُمْ এটা এ কারণে যে, তাদের মধ্যে রয়েছে قِسِّيْسِيْنَ বহু জ্ঞান পিপাসু আলেম وَرُهْبَانًا এবং বহু সংসার বিরাগী দরবেশ وَّاَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ আর এই কারণে যে, এরা অহংকারী নয়।

www.almodina.com

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(৮২) لَتَجِدَنَّ اَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا الْيَهُوْدَ وَالَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا الخ **-আয়াতের শানে নুযূল -১ :** আলোচ্য আয়াত নাজ্জাশী ও তাঁর সাথীদের সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। ঘটনা প্রবাহ হলো নিম্নরূপ, মুসলমানরা সর্বপ্রথম যখন আবিসিনিয়ার দিকে হিজরত করে গেলেন মুশরিকদের ভয়ে, তখন তারা কতকজন ছিলেন। অতঃপর রাসূল ﷺ মদিনায় হিজরত করেন। সে সময় মক্কাবাসীরা রাসূল ﷺ পর্যন্ত আর পৌঁছতে সক্ষম হলো না। পারস্পরিক যুদ্ধ তাদের সামনে বাধা হয়ে দাঁড়াল। পরবর্তীতে বদর সংঘটিত হলে সেখানে কাফের নেতারা নিহত হলো, তৎকালে কাফের কুরাইশরা একে অপরকে বলল যে, হাবশার আবিসিনিয়ায় তোমাদের প্রভাব রয়েছে। সুতরাং নাজ্জাশীর নিকট উপঢৌকনসহ দুজন বিচক্ষণ ব্যক্তি প্রেরণ কর। তাহলে তাদের নিকট যে সকল মুসলমানরা রয়েছে, তাদেরকে তোমাদের হাতে তারা তুলে দিবে। তাহলে বদর যুদ্ধে তোমাদের থেকে যারা নিহত হয়েছে, তাদের প্রতিশোধ হিসেবে তাদেরকে হত্যা করবে। সে সিদ্ধান্ত মোতাবেক কুরাইশ কাফেররা আমর বিন আস ও আব্দুল্লাহ বিন আবী রাবীয়াহকে উপঢৌকনসহ আবিসিনিয়ায় পাঠাল; সুতরাং রাসূল ﷺ ও এ বিষয়টি শুনতে পেয়ে আমর বিন উমাইয়্যা জামিরীকে একটি পত্র দিয়ে নাজ্জাশীর নিকট পাঠালেন। তিনি রাসূল ﷺ -এর পত্র পাঠ করে, জাফর বিন আবী তালিব ও অন্যান্য মুহাজিরগণকে ডেকে আনলেন, ডেকে আনলেন খ্রিস্ট যাজক পাদ্রী ও পোপদেরকে এবং সবাইকে ডেকে এনে জমায়েত করেন। অতঃপর জাফরকে তাদের সামনে কুরআন তেলাওয়াত করতে বলেন। সুতরাং তিনি সূরায়ে মারইয়াম তেলাওয়াত করেন। ফলে তারা সকলেই কুরআন শ্রবণ করে অশ্রুসিক্ত হয়ে যায়। তখন তাদের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

শানে নুযূল– ২ : বায়হাকী ইবনে ইসহাকের উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ -এর নিকট বিশজন খ্রিস্টান আসে। সে সময় রাসূল (সা.) মক্কা অথবা তার নিকটতম কোনো স্থানে ছিলেন। তখন তারা রাসূল ﷺ -কে মসজিদে পেয়ে বিভিন্ন বিষয়ে কথোপকথন করল এবং যা কিছু জানার ছিল জেনে নিল। অতঃপর রাসূল ﷺ তাদেরকে আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদের দাওয়াত দেন এবং তাদের নিকট কুরআন তেলাওয়াত করেন। কুরআন তেলাওয়াত শুনে তাদের চক্ষুগুলো অশ্রুসিক্ত হয়ে পড়ে। পরবর্তীতে তারা রাসূল ﷺ-এর ডাকে সাড়া দিয়ে রাসূলের প্রতি ঈমান আনে ও তাঁকে সমর্থন করে এবং তাদের কিতাবে রাসূল ﷺ সম্পর্কে যে সকল গুনাবলি রয়েছে তাকে তারা স্বীকার করে। তারা এখান থেকে যখন উঠে দাঁড়াল, তখনই আবূ জাহেল কুরাইশের লোকজনসহ তাদের পিছু লেগে গেল এবং বলতে লাগল, আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে ধ্বংস করুক, তোমরা সাধারণ একজন মানুষের কথায় নিজেদের ধর্মকে ধ্বংস করে দিলে? সে যা বলছে তাতেই তোমরা বিশ্বাস করে বসলে? তোমাদের অপেক্ষা বড় নির্বোধ আর কাউকে পাইনি। তারা বলল, তোমাদের প্রতি সালাম। তোমাদেরকে আমরা বলছি না। আমাদের আমল আমাদের জন্য এবং তোমাদের আমল তোমাদের জন্য। আমরা নিজেদেরকে ভালো বলছি না। তারা নাজরানের খ্রিস্টান ছিল বলে কথিত রয়েছে। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা উক্ত আয়াত অবতীর্ণ করেছেন বলে অভিমত রয়েছে।

শানে নুযূল– ৩ : জাফর ও তার সঙ্গী-সাথীগণ সত্তর জন মানুষসহ রাসূল ﷺ -এর দরবারে উপস্থিত হয়। তাদের পরনে ছিল পশমী পোষাক। তাদের মধ্যে ৬২ জন ছিল আবিসিনিয় অধিবাসী এবং ৮ জন ছিল সিরিয় অধিবাসী। তারা ছিল ১. বুহাইরা রাহেব, ২. ইদরীস, ৩. আশরাফ, ৪. আবরাহা, ৫. ছুমামাহ, ৬. কুছাম, ৭. দুরীদ ও ৮. আইমন। সুতরাং তাদের সামনে রাসূল ﷺ সূরা ইয়াসিন পাঠ করেন। তারা কুরআন শুনতে পেয়ে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন এবং ঈমান গ্রহণ করে হযরত ঈসা (আ.)-এর প্রতি যা নাজিল হয়েছিল তা সে কিতাবেরই অনুরূপ বলে মন্তব্য ও করলেন। অতঃপর তাদের সম্পর্কেই আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

শানে নুযূল– ৪ : হযরত কাতাদাহ (রা.) বলেন, উক্ত আয়াত আহলে কিতাবদের এক শ্রেণির লোকজন সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। হযরত ঈসা (আ.) যে শরিয়ত নিয়ে এসেছিলেন সে শরিয়তের প্রতি যাদের ছিল অগাধ বিশ্বাস। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা যখন হযরত মুহাম্মদ ﷺ-কে নবী হিসেবে প্রেরণ করেন, তখন তারা তাঁর প্রতি ঈমান আনয়ন করেন। তাদের প্রশংসা করেই আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[কুরতুবী : ২৩৯-৪০/৬, ফাতহুল কাদীর : ৬৮-৬৯/২, বাহরে মুহীত : ৫/৪, ইবনে কাছীর : ৭৮৭-৮৮/২]

www.almodina.com

বনী ইসরাঈলদের কুটিলতার আরেকটি দিক : قُلْ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ لَا تَغْلُوْا فِيْ دِيْنِكُمْ পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে বনী ইসরাঈলের ঔদ্ধত্য ও তাদের অত্যাচার উৎপীড়ন বর্ণনা করা হয়েছিল যে, আল্লাহ তা'আলা প্রেরিত রাসূল যারা তাদের অক্ষয় জীবনের বার্তা ও তাদের ইহকাল ও পরকাল সংশোধনের কার্যবিধি নিয়ে আগমন করেছিলেন, তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের পরিবর্তে তারা তাদের সাথে দুর্ব্যবহার করে فَرِيْقًا كَذَّبُوْا وَفَرِيْقًا يَقْتُلُوْنَ অর্থাৎ কতক পয়গম্বরকে তারা মিথ্যারোপ করে এবং কতককে হত্যা করে ফেলে।

আলোচ্য আয়াতসমূহে এসব বনী ইসরাঈলেরই কুটিলতার আরেকটি দিক ব্যক্ত করা হয়েছে যে, মূর্খরা যেমন ঔদ্ধত্য ও অবাধ্যতার এক প্রান্তে থেকে আল্লাহর পয়গম্বরদের প্রতি মিথ্যারোপ করেছে এবং কতককে হত্যা করেছে, তেমনি এরাই বক্রতার অপর প্রান্তে পৌঁছে পয়গম্বরদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনে বাড়াবাড়ি করে তাদেরকে আল্লাহতে পরিণত করে দিয়েছে। لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ অর্থাৎ যে সব বনী ইসরাঈল বলে যে, আল্লাহ তো ঈসা ইবনে মারইয়ামেরই নাম, তারা কাফের হয়ে গেছে।

এখানে এ উক্তিটি শুধু খ্রিস্টানদের বলে বর্ণিত হয়েছে। অন্যত্র একই ধরনের বাড়াবাড়ি ও পথভ্রষ্টতা ইহুদিদের ব্যাপারেও বর্ণনা করা হয়েছে وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ عُزَيْرُنِ ابْنُ اللّٰهِ وَقَالَتِ النَّصٰرَى الْمَسِيْحُ ابْنُ اللّٰهِ

অর্থাৎ ইহুদিরা বলে যে, হযরত ওযায়ের আল্লাহর পুত্র এবং খ্রিস্টানরা বলে যে, মসীহ আল্লাহর পুত্র।

غُلُوٌّ শব্দের অর্থ সীমা অতিক্রম করা। ধর্মের সীমা অতিক্রম করার অর্থ এই যে, বিশ্বাস ও কর্মের ক্ষেত্রে ধর্ম যে সীমা নির্ধারণ করেছে, তা লঙ্ঘন করা।

উদাহরণতঃ পয়গম্বরদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের সীমা এই যে, আল্লাহর সৃষ্টজীবের মধ্যে তাঁদেরকে সর্বোত্তম মনে করতে হবে। এ সীমা অতিক্রম করে তাদেরকে আল্লাহ কিংবা আল্লাহর পুত্র বলে দেওয়া হচ্ছে বিশ্বাসগত সীমালঙ্ঘন।

বনী ইসরাঈলের বাড়াবাড়ি : পয়গম্বরগণের প্রতি মিথ্যারোপ করা এবং হত্যা করতেও কুণ্ঠিত না হওয়া, অথবা তাঁদেরকে স্বয়ং আল্লাহ কিংবা আল্লাহর পুত্র বলে দেওয়া, বনী ইসরাঈলের এ পরস্পর বিরোধী দু'টি কাজই হচ্ছে মূর্খতপ্রসূত বাড়াবাড়ি। আরবের প্রসিদ্ধ প্রবচন হচ্ছে اَلْجَاهِلُ اِمَّا مُفْرِطٌ اَوْ مُفَرِّطٌ অর্থাৎ মূর্খ ব্যক্তি কখনো মিতাচার ও মধ্যপন্থা অবলম্বন করতে পারে না। সে হয় বাড়াবাড়িতে লিপ্ত হয়, না হয় সীমালঙ্ঘনে। এ বাড়াবাড়ি ও সীমালঙ্ঘন বনী ইসরাঈলের দু'টি ভিন্ন দলের পক্ষ থেকে হয়ে থাকতে পারে এবং এমনও হতে পারে যে, একদল লোকই দু'টি ভিন্নমুখি কর্ম বিভিন্ন পয়গম্বরদের সাথে করেছে। অর্থাৎ কারো কারো প্রতি মিথ্যারোপ করে হত্যা করেছে এবং কাউকে আল্লাহর সমতুল্য করে দিয়েছে।

আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছার পথ : এটা বাস্তব সত্য যে, সমগ্র দুনিয়া-জাহানের স্রষ্টা ও পালনকর্তা একমাত্র আল্লাহ তা'আলা। সমগ্র বিশ্বে তাঁরই রাজত্ব এবং তাঁরই নির্দেশ চালু। তাঁরই অনুগত্য করা প্রতিটি মানবের অপরিহার্য কর্তব্য। কিন্তু বেচারী মাটির মানুষ মৃত্তিকাজনিত তমসা ও অধোগতির দ্বারা পরিবেষ্টিত রয়েছে। সে আল্লাহ তা'আলার পবিত্র সত্তা এবং তাঁর বিধান ও নির্দেশাবলি শত চেষ্টা করেও জানতে পারে না। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় কৃপায় তার জন্য দুটি মাধ্যম নির্ধারণ করে দিয়েছেন। এ মাধ্যমদ্বয়ের দ্বারা সে আল্লাহ তা'আলার পছন্দ-অপছন্দ এবং আদিষ্ট ও নিষিদ্ধ বিষয়সমূহের জ্ঞান লাভ করতে পারে। তন্মধ্যে একটি মাধ্যম হচ্ছে ঐশী গ্রন্থ, যা মানুষের জন্য আইন ও নির্দেশনামা বিশেষ। দ্বিতীয় মাধ্যম হচ্ছে মানুষের মধ্য থেকেই মনোনীত আল্লাহ তা'আলার প্রিয় বান্দা। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে স্বীয় পছন্দ ও অপছন্দের বাস্তব নমুনা এবং স্বীয় গ্রন্থের বাস্তব ব্যাখ্যাদাতা রূপে পাঠিয়েছেন। ধর্মীয় পরিভাষায় তাঁদেরকে রাসূল কিংবা নবী বলা হয়। কেননা অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দেয় যে, কোনো গ্রন্থ তা যতই সর্ব বিষয় সমম্বিত ও বিস্তারিত হোক না কেন, মানুষের সংশোধন ও শিক্ষা-দীক্ষার জন্য যথেষ্ট হয় না; বরং স্বভাবগতভাবেই মানুষের প্রশিক্ষক ও সংস্কারক একমাত্র মানুষই হতে পারে। তাই আল্লাহ তা'আলা সংশোধন ও শিক্ষা-দীক্ষার জন্য দু'টি উপায় রেখেছেন, আল্লাহর গ্রন্থ এবং আল্লাহর প্রিয় বান্দার জামাত। পয়গম্বরগণ, তাঁদের উত্তরসূরি আলেম ও মাশায়েখ এঁরা সবাই এ মানব মণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহর প্রিয় এসব মানুষের সম্মানের হ্রাস-বৃদ্ধির ব্যাপারে প্রাচীনকাল থেকেই বিশ্ববাসী বাড়াবাড়ির ভুলে লিপ্ত রয়েছে। ধর্মের ক্ষেত্রে যেসব দল-উপদল সৃষ্টি হয়েছে, সে সবই এ ভুলের ফসল। কোথাও তাদেরকে সীমা ডিঙ্গিয়ে ব্যক্তিপূজার স্তরে পৌঁছিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং কোথাও সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে حَسْبُنَا كِتَابُ اللّٰهِ বাক্যটিতে ভুল অর্থ পরিয়ে দেওয়া হয়েছে। একদিকে

রাসূলকে বরং পীরদেরকেও 'আলেমুল গায়েব' এবং আল্লাহর বৈশিষ্ট্যের অধিকারী মনে করে নেওয়া হয়েছে এবং পীরপূজা ও কবরপূজা আরম্ভ হয়েছে। অপরদিকে আল্লাহর রাসূলকে শুধুমাত্র একজন পত্র বাহকের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। আলোচ্য আয়াতসমূহে পয়গম্বরদের অবমাননাকারীদেরকে যেমন কাফের বলা হয়েছে, তেমনি তাঁদেরকে সীমা ছাড়িয়ে আল্লাহর সমতুল্য আখ্যাদানকারীদেরকেও কাফের সাব্যস্ত করা হয়েছে। لَا تَغْلُوْا فِيْ دِيْنِكُمْ আয়াতখানি এ বিষয়বস্তুরই ভূমিকা। এতে ফুটে উঠেছে যে, ধর্ম প্রকৃতপক্ষে কতগুলো সীমা ও প্রতিবন্ধককেই বলা হয়। এ সীমার ভিতরে ত্রুটি করা যেমন অপরাধ, তেমনি এ সীমাকে ডিঙ্গিয়ে যাওয়াও অন্যায়। রাসূল ও তাঁদের উত্তরসূরিদের কথা অমান্য করা এবং তাঁদের অবমাননা করা যেমন মহাপাপ, তেমনি তাদেরকে আল্লাহ তা'আলার বিশেষ গুণাবলির অধিকারী মনে করা আরো গুরুতর অপরাধ।

শিক্ষাগত তথ্যানুসন্ধান ও চুলচেরা বিশ্লেষণ বাড়াবাড়ি নয় : আলোচ্য আয়াতে لَا تَغْلُوْا فِيْ دِيْنِكُمْ বলার সাথে সাথে غَيْرَ الْحَقِّ বলা হয়েছে। এর অর্থ এই যে, অন্যায় বাড়াবাড়ি করো না। সূক্ষ্মদর্শী তাফসীরবিদদের মতে এ শব্দটি তাকিদ অর্থাৎ বিষয়বস্তুকে জোরদার করার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। কেননা ধর্মে বাড়াবাড়ি সর্বাবস্থায়ই অন্যায়। এটা ন্যায় হওয়ার কোনো সম্ভাবনাই নেই। আল্লামা যমখশরী প্রমূখ তাফসীরবিদগণ, এ স্থলে বাড়াবাড়িকে দুই ভাগে বিভক্ত করেছেন। একটি অন্যায় ও অসত্য, যা আলোচ্য আয়াতে নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং অপরটি ন্যায় ও বৈধ। এর দৃষ্টান্ত হিসেবে তাঁরা শিক্ষাগত তথ্যানুসন্ধান ও চুলচেরা বিচার-বিশ্লেষণকে উপস্থিত করেছেন। ধর্মীয় বিশ্বাস সম্পর্কিত মাসআলায় মুসলিম দার্শনিকগণ এবং ফিকহ সংক্রান্ত মাসআলায় ফিকহবিদগণ এরূপ তথ্যানুসন্ধান করেছেন। উপরিউক্ত তাফসীরবিদগণের মতে এগুলোও বাড়াবাড়ি; তবে ন্যায় ও বৈধ। সাধারণ তাফসীরবিদগণের মতে এগুলো আদৌ বাড়াবাড়ি নয়। কুরআন ও সুন্নাহর মাসআলায় যতটুকু তথ্যানুসন্ধান ও চুলচেরা বিচার-বিশ্লেষণ রাসূলে কারীম ﷺ, সাহাবী ও তাবেয়ীগণ থেকে প্রমাণিত রয়েছে, ততটুকু বাড়াবাড়ি নয় এবং যা বাড়াবাড়ির সীমা পর্যন্ত পৌঁছে যায়, তা এ ক্ষেত্রেও নিন্দনীয়।

বনী ইসরাঈলকে মধ্যবর্তী পথ অবলম্বনের নির্দেশ : আলোচ্য আয়াতের শেষভাগে বর্তমানকালের বনী ইসরাঈলদেরকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে– وَلَا تَتَّبِعُوْٓا اَهْوَآءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوْا مِنْ قَبْلُ وَاَضَلُّوْا كَثِيْرًا অর্থাৎ ঐ সম্প্রদায়ের অনুসরণ করো না, যারা তোমাদের পূর্বে নিজেরা পথভ্রষ্ট হয়েছিল এবং অপরকেও পথভ্রষ্ট করেছিল। অতঃপর তাদের পথভ্রষ্টতার স্বরূপ ও কারণ বর্ণনা করে বলা হয়েছে : وَّضَلُّوْا عَنْ سَوَآءِ السَّبِيْلِ

অর্থাৎ তারা সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছিল, যা ছিল বাড়াবাড়ি ও ত্রুটির মাঝখানে মধ্যবর্তী পথ। এভাবে এ আয়াতে বাড়াবাড়ি ও ত্রুটি যে, একটি মারাত্মক ভ্রান্তি, তা এবং সরল পথে কায়েম থাকার কথাও বর্ণিত হয়েছে।

বনী ইসরাঈলের কু-পরিণাম : দ্বিতীয় আয়াতে বাড়াবাড়ি ও ত্রুটিজনিত পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত বনী ইসরাঈলের কু-পরিণাম বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে, তাদের উপর আল্লাহর অভিসম্পাত বর্ষিত হয়েছে– প্রথমতঃ হযরত দাউদ (আ.)-এর মুখে, যার ফলে তাদের আকার-আকৃতি বিকৃত হয়ে শূকরে পরিণত হয়। অতঃপর হযরত ঈসা (আ.)-এর বাচনিক এ অভিসম্পাত তাদের ঘাড়ে ছওয়ার হয়। এর জাগতিক প্রতিক্রিয়া এই হয় যে, তারা বিকৃত হয়ে বানরে পরিণত হয়। কোনো কোনো তাফসীরবিদ বলেছেন যে, এ স্থলে স্থানোপযোগিতার কারণে মাত্র দুজন পয়গম্বরের বাচনিক তাদের উপর অভিসম্পাত বর্ষিত হওয়ার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু বাস্তরেব তাদের উপর অভিসম্পাত বর্ষিত হওয়ার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে তাদের উপর অভিসম্পাতের সূচনা হযরত মূসা (আ.) থেকে হয়েছিল এবং তা সমাপ্ত হয়েছে শেষ নবী মুহাম্মদ ﷺ -এর বাচনিক। এভাবে উপর্যুপরি চারজন পয়গম্বরের বাচনিক তাদের উপর অভিসম্পাত বর্ষিত হয়েছে, যারা পয়গম্বরদের বিরুদ্ধাচরণ করেছিল কিংবা তাঁদেরকে সীমা ডিঙ্গিয়ে আল্লাহ তা'আলার গুণাবলিতে অংশীদার করেছিল।

সর্বশেষ দোয়াতে কাফেরদের সাথে গভীর বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করা হয়েছে এবং এর মারাত্মক পরিণতি বর্ণিত হয়েছে। এতে এদিকেও ইঙ্গিত হতে পারে যে, বনী ইসরাঈলের সব বক্রতা ও পথভ্রষ্টতা তাদের ভ্রান্ত পরিবেশ ও কাফেরদের সাথে আন্তরিক বন্ধুত্বেরই ফলশ্রুতি ছিল, যা তাদেরকে ধ্বংসের গহ্বরে নিক্ষেপ করেছিল।

কতিপয় আহলে কিতাবের সত্যানুরাগ : আলোচ্য আয়াতসমূহে মুসলমানদের সাথে শত্রুতা ও বন্ধুত্বের মাপকাঠিতে ঐসব আহলে কিতাবের কথা আলোচনা করা হয়েছে, যারা সত্যানুরাগ ও আল্লাহভীরুতার কারণে মুসলমানদের প্রতি হিংসা ও শত্রুতা পোষণ করত না। কিন্তু ইহুদিদের মধ্যে এ জাতীয় লোকের সংখ্যা ছিল নেহায়েতই নগণ্য। উদাহরণতঃ আব্দুল্লাহ

ইবনে সালাম প্রমুখ। খ্রিস্টানদের মধ্যে তুলনামূলকভাবে এরূপ লোকের সংখ্যা ছিল বেশি। বিশেষতঃ মহানবী ﷺ -এর যুগে আবিসিনিয়ার সম্রাট নাজ্জাশী এবং উচ্চপদস্থ কর্মচারী ও জনগণের মধ্যে এরূপ লোকের সংখ্যা ছিল প্রচুর। এ কারণেই মক্কার নবদীক্ষিত মুসলমানরা কুরাইশদের অত্যাচারে অতিষ্ট হয়ে গেলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে আবিসিনিয়ায় হিজরত করার পরামর্শ দেন এবং বলেন, আমি শুনেছি আবিসিনিয়ার সম্রাট কারো প্রতি জুলুম করেন না এবং কাউকে জুলুম করতে দেন না। তাই মুসলমানরা কিছুদিনের জন্য সেখানে চলে যেতে পারে।

পরামর্শ অনুযায়ী প্রথমবার এগার জনের একটি দল আবিসিনিয়ায় চলে যায়। তাদের মধ্যে হযরত উসমান গনী (রা.) এবং তাঁর স্ত্রীয় নবী-দুহিতা হযরত রুকাইয়া (রা.)-ও ছিলেন। এরপর হযরত জা'ফর ইবনে আবী তালেবের নেতৃত্বে একটি বিরাট কাফেলা আবিসিনিয়ায় গিয়ে পৌঁছে এ কাফেলায় পুরুষ ছিলেন ৮২ জন। আবিসিনিয়ার অধিবাসীরা তাদেরকে সাদর সম্ভাষণ জানায় এবং তারা তথায় সুখে-শান্তিতে বসবাস করতে থাকেন।

কিন্তু মুসলমানরা অন্য কোনো দেশে গিয়ে শান্তিতে জীবন যাপন করবে, মক্কার ক্রোধান্ধ কাফেরকুলের তাও সহ্য হলো না। তারা প্রচুর উপঢৌকনসহ একটি প্রতিনিধি দল আবেসিনিয়ার সম্রাটের দরবারে পাঠিয়ে দিল এবং মুসলমানদেরকে দেশ থেকে বের করে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করল। কিন্তু সম্রাট প্রকৃত অবস্থা তদন্ত করলেন এবং জা'ফর ইবনে আবূ তালেব (রা.) ও তাঁর সঙ্গীদের কাছ থেকে ইসলাম ও রাসূলুল্লাহ ﷺ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য অবগত হলেন। এসব তথ্য ও ইসলামি শিক্ষাকে তিনি হযরত ঈসা (আ.) ও ইঞ্জিলের ভবিষ্যদ্বাণীর সম্পূর্ণ অনুরূপ পেলেন। বলাবাহুল্য, ভবিষ্যদ্বাণীতে মহানবী ﷺ -এর আবির্ভাব, তাঁর শিক্ষার সংক্ষিপ্ত চিত্র, তাঁর ও তাঁর সহচরবর্গের দৈহিক আকার আকৃতি ইত্যাদিও বর্ণিত হয়েছিল এতে প্রভাবান্বিত হয়ে সম্রাট কুরাইশী প্রতিনিধি দলের সব উপঢৌকন ফেরত দিলেন এবং তাদেরকে পরিষ্কার বলে দিলেন যে, আমি এমন লোকদেরকে কখনো দেশ থেকে বহিষ্কারের আদেশ দিতে পারি না।

জা'ফর ইবনে আবী তালেবের বক্তৃতার প্রভাব : হযরত জা'ফর ইবনে আবী তালেব নাজ্জাশীর দরবারে ইসলাম ও ইসলামি শিক্ষার একটি সংক্ষিপ্ত ও সর্বাঙ্গ সুন্দর চিত্র ফুটিয়ে তুলেছিলেন। এছাড়া সেখানে তাঁদের বসবাসের ফলেও সম্রাট, রাজকর্মচারী ও জনগণের অন্তরে ইসলামের প্রতি অগাধ ভালোবাসা সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ মদিনায় হিজরত করার পর যখন সাহাবীদের নিয়ে নিরাপদে কালাতিপাত করতে থাকেন। তখন আবিসিনিয়ার মুহাজিরগণ মদিনায় যাওয়ার সংকল্প করেন। এ সময় ইসলামের সৌন্দর্যে মুগ্ধ সম্রাট নাজ্জাশী তাঁদের সাথে প্রধান প্রধান খ্রিস্টান আলেম ও মাশায়েখের একটি প্রতিনিধি দল মহানবী ﷺ -এর দরবারে পাঠিয়ে দিলেন। সত্তর জনের এ প্রতিনিধিদলে বাষট্টি জন আবিসিনিয় ও আট জন সিরিয় আলেম ও মাশায়েখ ছিলেন।

নবীর দরবারে শাহী প্রতিনিধি দলের উপস্থিতি : প্রতিনিধিদলটি সংসারত্যাগী দরবেশুলভ পোশাক পরিহিত হয়ে দরবারে উপস্থি হলে মহানবী ﷺ তাদেরকে সূরা ইয়াসিন পাঠ করে শুনালেন। কুরআন পাঠ শুনে তাদের চোখ থেকে অবিরাম অশ্রু ঝরছিল। তারা শ্রদ্ধাপ্লুত কণ্ঠে বললেন : এ কালাম হযরত ঈসা (আ.)-এর প্রতি অবতীর্ণ কালামের সাথে কতই না গভীর সামঞ্জস্যপূর্ণ। অতঃপর প্রতিনিধিদলের সবাই মুসলমান হয়ে গেলেন।

তাদের প্রত্যাবর্তনের পর সম্রাট নাজ্জাশীও ইসলাম গ্রহণের কথা ঘোষণা করলেন এবং একখানা চিঠি লিখে স্বীয় পুত্রের নেতৃত্বে অপর একটি প্রতিনিধি দল মদিনায় পাঠালেন। কিন্তু ঘটনাচক্রে জাহাজ ডুবির ফলে তারা সবাই প্রাণত্যাগ করল। মোটকথা, আবিসিনিয়ার সম্রাট, রাজ কর্মচারী ও জনগণ ইসলাম ও মুসলমানদের সাথে শুধু ভদ্র ও সৌজন্যমূলক ব্যবহার করেই ক্ষান্ত হয়নি; বরং পরিশেষে তারা নিজেরাও মুসলমান হয়ে যান।

তাফসীরবিদগণের মতে উল্লিখিত আয়াতসমূহ তাঁদের সম্পর্কেই অবতীর্ণ হয়েছে।

وَلَتَجِدَنَّ اَقْرَبَهُمْ مَّوَدَّةً لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّا نَصٰرٰى এবং পরবর্তী আয়াতে আল্লাহর ভয়ে তাদের ক্রন্দন করা এবং সত্যকে গ্রহণ করার কথা বর্ণিত হয়েছে। তাফসীরবিদগণ এ বিষয়েও একমত যে, যদিও আলোচ্য আয়াতসমূহ সম্রাট নাজ্জাশী ও তাঁর প্রেরিত প্রতিনিধিদল সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে তা সত্ত্বেও ভাষার ব্যাপকতার দরুন অন্যান্য ন্যায়পরায়ণ ও সত্যনিষ্ঠ খ্রিস্টানদের বেলায়ও এ আয়াত প্রযোজ্য। অর্থাৎ যারা ইসলাম পূর্বকালে ইঞ্জিলের অনুসারী ছিল এবং ইসলামোত্তর কালে ইসলামের অনুসারী হয়ে গেছে।

www.almodina.com

ইহুদিদের মধ্যেও এ ধরনের কয়েকজন ছিলেন যারা পূর্বে তাওরাতের অনুসরণ করতেন এবং ইসলাম আসার পর ইসলামে দীক্ষিত হয়েছেন। কিন্তু তাদের সংখ্যা জাতিসমূহের আলোচনায় অনুল্লেখযোগ্য পরিমাণে কম ছিল। অবশিষ্ট ইহুদিদের অবস্থা সবারই জ্ঞাত ছিল যে, তারা মুসলমানদের শত্রুতা ও মূলোৎপাটনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করত। তাই আয়াতের শুরুভাগে ইহুদিদের আলোচনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে : لَتَجِدَنَّ اَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا الْيَهُوْدَ অর্থাৎ মুসলমানদের প্রতি শত্রুতায় ইহুদিরাই সর্বাধিক কঠোর।

মোটকথা, এ আয়াতে খ্রিস্টানদের একটি বিশেষ দলের গুণকীর্তন করা হয়েছে, যারা ছিল আল্লাহভীরু ও সত্য প্রিয়। নাজ্জাশী ও তাঁর পরিষদবর্গও এ দলের অন্তর্ভুক্ত। অন্যান্য যেসব খ্রিস্টান এসব গুণের বাহক ছিল কিংবা ভবিষ্যতে হবে, তারাও এ দলেরই অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু আয়াতের অর্থ এই নয় এবং হতেও পারে না যে, খ্রিস্টান জাতি যতই পথভ্রষ্ট হোক না কেন এবং ইসলামের বিরুদ্ধে যতই কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করুক না কেন সর্বাবস্থায়ই তাদেরকে মুসলমানদের বন্ধু ও হিতৈষী বলে মনে করতে হবে এবং মুসলমানরা তাদের প্রতি বন্ধুত্বের হাত প্রসারিত করবে। কেননা এমন অর্থ করাও নির্জলা ভুল এবং ঘটনাবলির পরিপন্থি। তাই ইমাম আবূ বকর জাসসাস আহকামুল কুরআনে বলেন : কিছু সংখ্যক অজ্ঞ লোকের ধারণা এই যে, এসব আয়াতে সর্বাবস্থায় খ্রিস্টানদের প্রশংসা কীর্তন করা হয়েছে এবং তারা সর্বোতভাবে ইহুদিদের চাইতে উত্তম। এটি নিরেট মূর্খতা। কারণ সাধারণভাবে উভয় সম্প্রদায়ের ধর্মীয় বিশ্বাস যাচাই করলে দেখা যায়, খ্রিস্টানদের মুশরিক হওয়াই অধিক সুস্পষ্ট। মুসলমানদের সাথে কাজ কারবার পরীক্ষা করলে দেখা যায়, বর্তমান কালের সাধারণ খ্রিস্টানরাও ইসলাম বিদ্বেষে ইহুদিদের চাইতে পিছিয়ে নেই। তবে এ কথা সত্য যে, এক সময় খ্রিস্টানদের মধ্যে আল্লাহভীরু ও সত্যপ্রিয় লোকদের প্রাচুর্য ছিল। ফলে তারা ইসলাম গ্রহণে সমর্থ হয়েছে। আলোচ্য আয়াত উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা পার্থক্য ফুটিয়ে তোলার জন্যই অবতীর্ণ হয়েছে। স্বয়ং এ আয়াতের শেষভাগে কুরআন এ সত্য বর্ণনা করে বলেছে : ذٰلِكَ بِاَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيْسِيْنَ وَرُهْبَانًا وَّاَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ অর্থাৎ, এসব আয়াতে খ্রিস্টানদের প্রশংসা করার কারণ এই যে, তাদের মধ্যে আলেম, সংসারত্যাগী ও আল্লাহভীরু ব্যক্তিবর্গ রয়েছে এবং তাদের মধ্যে অহংকার নেই যে, অন্যের কথা শুনতে সম্মত হবে না। এতে বুঝা গেল যে, ইহুদিদের অবস্থা এমন ছিল না। তারা আল্লাহভীরু ও সত্যপ্রিয় ছিল না। তাদের আলেমরাও সংসারত্যাগের পরিবর্তে স্বীয় জ্ঞান-বুদ্ধিকে শুধু জীবিকা-উপার্জনে নিয়োজিত করেছিল এবং সংসারের প্রতি এমন মোহবিষ্ট ছিল যে, সত্যাসত্য ও হালাল-হারামের প্রতিও ভ্রুক্ষেপ করত না।

সত্যানুরাগী আলেম ও মাশায়েখই জাতির প্রাণকেন্দ্র : আলোচ্য আয়াত থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জানা গেল যে, সত্যানুরাগী আলেম ও মাশায়েখই জাতির আসল প্রাণকেন্দ্র। তাদের অস্তিত্বের মধ্যেই সমগ্র জাতির জীবন নিহিত। যতদিন কোনো জাতির মধ্যে এমন আলেম ও মাশায়েখ বিদ্যমান থাকেন, যারা পার্থিব লোভ-লাসার বশবর্তী নয় এবং যারা আল্লাহভীরু, ততদিন সে জাতি অব্যাহতভাবে কল্যাণ ও বরকত লাভ করতে থাকে।

শব্দ বিশ্লেষণ

لَا تَغْلُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ نهى حاضر معروف বাব نَصَر মাসদার اَلْغُلُوّ মূলবর্ণ (غ . ل . و) জিনস ناقص واوى অর্থ– তোমরা বাড়াবাড়ি কর না।

يَعْتَدُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِعْتِدَاءُ মূলবর্ণ (ع . د . و) জিনস ناقص واوى অর্থ– তারা সীমলঙ্ঘন করেছে,

يَتَوَلَّوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব تَفَعُّلٌ মাসদার اَلتَّوَلِّىْ মূলবর্ণ (و . ل . ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ– তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়।

قِسِّيْسِيْنَ : শব্দটি বহুবচন, একবচন قِسِّيْسٌ অর্থ– খ্রিস্টান আলেমগণ।

رُهْبَانًا : শব্দটি বহুবচন, একবচন رَاهِبٌ অর্থ– ধর্মীয়গুরু, দরবেশ।

www.almodina.com

৭ম পারা

وَاِذَا سَمِعُوْا مَآ اُنْزِلَ اِلَى الرَّسُوْلِ تَرٰٓى اَعْيُنَهُمْ تَفِيْضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوْا مِنَ الْحَقِّ ۚ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَآ اٰمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشّٰهِدِيْنَ (٨٣)

অনুবাদ : (৮৩) আর যখন তারা তা শ্রবণ করে, যা রাসূলের প্রতি নাজিল হয়েছে, তখন আপনি তাদের চোখে অশ্রু বইতে দেখবেন এ কারণে যে, তারা সত্যকে উপলব্ধি করতে পেরেছে, তারা এরূপ বলে যে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা মুসলমান হলাম, অতএব, আমাদেরকেও ঐসব লোকের সাথে লিপিবদ্ধ করে নিন যারা [মুহাম্মদ ﷺ ও কুরআন সত্য হওয়া] স্বীকার করে।

وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَمَا جَآءَنَا مِنَ الْحَقِّ ۙ وَنَطْمَعُ اَنْ يُّدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصّٰلِحِيْنَ (٨٤)

(৮৪) আর আমাদের এমন কি ওজর আছে যে, আমরা ঈমান আনব না আল্লাহ তা'আলার প্রতি এবং সেই সত্যের প্রতি যা আমাদের নিকট পৌঁছেছে? অথচ এই আশা রাখব যে, আমাদের পরওয়ারদেগার নেকারদের সাথে আমাদেরকে শামিল করবেন।

فَاَثَابَهُمُ اللّٰهُ بِمَا قَالُوْا جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۗ وَذٰلِكَ جَزَآءُ الْمُحْسِنِيْنَ (٨٥)

(৮৫) ফলতঃ তাদের এই উক্তি [ও বিশ্বাস] -এর বিনিময়ে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে এমন উদ্যানসমূহ প্রদান করবেন, যার তলদেশে নহরসমূহ বইতে থাকবে, তারা তাতে অনন্তকাল অবস্থান করবে, আর এটাই নেককারদের বিনিময়।

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَآ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ (٨٦)

(৮৬) আর যারা কাফের রয়েছে এবং আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলে, তারা হবে জাহান্নামের অধিবাসী।

শাব্দিক অনুবাদ

(৮৩) وَاِذَا سَمِعُوْا আর যখন তারা তা শ্রবণ করে مَآ اُنْزِلَ اِلَى الرَّسُوْلِ যা রাসূলের প্রতি নাজিল হয়েছে تَرٰٓى اَعْيُنَهُمْ তখন আপনি তাদের চোখে দেখবেন تَفِيْضُ مِنَ الدَّمْعِ অশ্রু বইতে مِمَّا عَرَفُوْا مِنَ الْحَقِّ এ কারণে যে, তারা সত্যকে উপলব্ধি করতে পেরেছে يَقُوْلُوْنَ তারা এরূপ বলে যে رَبَّنَآ اٰمَنَّا হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা মুসলমান হলাম فَاكْتُبْنَا مَعَ الشّٰهِدِيْنَ অতএব, আমাদেরকেও ঐসব লোকের সাথে লিপিবদ্ধ করে নিন যারা স্বীকার করে।

(৮৪) وَمَا لَنَا আর আমাদের এমন কি ওজর আছে যে لَا نُؤْمِنُ بِاللّٰهِ আমরা ঈমান আনব না আল্লাহ তা'আলার প্রতি وَمَا جَآءَنَا مِنَ الْحَقِّ এবং সেই সত্যের প্রতি যা আমাদের নিকট পৌঁছেছে? وَنَطْمَعُ অথচ এই আশা রাখব যে اَنْ يُّدْخِلَنَا رَبُّنَا আমাদের পরওয়ারদেগার আমাদেরকে শামিল করবেন مَعَ الْقَوْمِ الصّٰلِحِيْنَ নেকারদের সাথে।

(৮৫) فَاَثَابَهُمُ اللّٰهُ بِمَا قَالُوْا ফলতঃ তাদের এই উক্তি [ও বিশ্বাস] -এর বিনিময়ে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে প্রদান করবেন جَنّٰتٍ এমন উদ্যানসমূহ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ যার তলদেশে নহরসমূহ বইতে থাকবে خٰلِدِيْنَ فِيْهَا তারা তাতে অনন্তকাল অবস্থান করবে وَذٰلِكَ جَزَآءُ الْمُحْسِنِيْنَ আর এটাই নেককারদের বিনিময়।

(৮৬) وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا আর যারা কাফের রয়েছে وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَآ এবং আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলে اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ তারা হবে জাহান্নামের অধিবাসী।

www.almodina.com

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُحَرِّمُوْا طَيِّبٰتِ مَآ اَحَلَّ اللّٰهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوْا ۗ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ (٨٧)

অনুবাদ : (৮৭) হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ যে সমস্ত বস্তু তোমাদের জন্য হালাল করেছেন, তন্মধ্যে সুস্বাদু বস্তুগুলোকে হারাম করো না এবং সীমালজ্ঘন করো না, নিঃসন্দেহে আল্লাহ সীমালজ্ঘনকারীদেরকে পছন্দ করেন না।

وَكُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ حَلٰلًا طَيِّبًا ۖ وَّاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْٓ اَنْتُمْ بِهٖ مُؤْمِنُوْنَ (٨٨)

(৮৮) আর আল্লাহ তা'আলা যা তোমাদেরকে দান করেছেন তন্মধ্য হতে হালাল রুচিকর বস্তুগুলো ভক্ষণ কর, এবং আল্লাহ তা'আলাকে ভয় কর, যার প্রতি তোমরা ঈমান রাখ।

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِيْٓ اَيْمَانِكُمْ وَلٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُّمُ الْاَيْمَانَ ۚ فَكَفَّارَتُهٗٓ اِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسٰكِيْنَ مِنْ اَوْسَطِ مَا تُطْعِمُوْنَ اَهْلِيْكُمْ اَوْ كِسْوَتُهُمْ اَوْ تَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ ۭ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ ۭ ذٰلِكَ كَفَّارَةُ اَيْمَانِكُمْ اِذَا حَلَفْتُمْ ۭ وَاحْفَظُوْٓا اَيْمَانَكُمْ ۭ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ (٨٩)

(৮৯) আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের কসমসমূহের মধ্যে অর্থহীন কসমের জন্য পাকড়াও করবেন না কিন্তু পাকড়াও করবেন তাতে, যে কসমসমূহকে তোমরা [ভবিষ্যতে বিষয়ের প্রতি] দৃঢ় কর, সুতরাং তার [অর্থাৎ শপথ ভঙ্গের] কাফ্‌ফারা দশ জন অভাবগ্রস্তকে খাদ্য প্রদান করা মধ্যম ধরনের, যা নিজ পরিবারের লোকদেরকে ভক্ষণ করিয়ে থাক, কিংবা তাদেরকে পরিধেয় বস্ত্র দান করা [মধ্যম ধরনের] কিংবা একটি গোলাম বা বাদী আজাদ করা, আর যে ব্যক্তি সমর্থ না হয়, তবে [একাধারে] তিন দিনের রোজা, এটা তোমাদের কসমসমূহের কাফ্‌ফারা যখন তোমরা কসম কর [অতঃপর ভঙ্গ কর] এবং নিজেদের কসমসমূহের প্রতি লক্ষ্য রেখ, এরূপেই আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য স্বীয় বিধানসমূহ বর্ণনা করেন, যেন তোমরা শোকর কর।

শাব্দিক অনুবাদ

(৮৭) يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا হে ঈমানদারগণ! لَا تُحَرِّمُوْا তোমরা হারাম করো না طَيِّبٰتِ সুস্বাদু বস্তুগুলোকে مَآ اَحَلَّ اللّٰهُ لَكُمْ আল্লাহ যে সমস্ত বস্তু তোমাদের জন্য হালাল করেছেন وَلَا تَعْتَدُوْا এবং সীমালজ্ঘন করো না اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ নিঃসন্দেহে আল্লাহ সীমালজ্ঘনকারীদেরকে পছন্দ করেন না।

(৮৮) وَكُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ حَلٰلًا طَيِّبًا আর আল্লাহ তা'আলা যা তোমাদেরকে দান করেছেন তন্মধ্য হতে হালাল রুচিকর বস্তুগুলো ভক্ষণ কর وَاتَّقُوا اللّٰهَ এবং আল্লাহ তা'আলাকে ভয় কর الَّذِيْٓ اَنْتُمْ بِهٖ مُؤْمِنُوْنَ যার প্রতি তোমরা ঈমান রাখ।

(৮৯) لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ আল্লাহ তোমাদেরকে পাকড়াও করবেন না بِاللَّغْوِ فِيْٓ اَيْمَانِكُمْ তোমাদের কসমসমূহের মধ্যে অর্থহীন কসমের জন্য وَلٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ কিন্তু পাকড়াও করবেন তাতে بِمَا عَقَّدْتُّمُ الْاَيْمَانَ যে কসমসমূহকে তোমরা দৃঢ় কর فَكَفَّارَتُهٗ সুতরাং তার কাফ্‌ফারা اِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسٰكِيْنَ দশ জন অভাবগ্রস্তকে খাদ্য প্রদান করা مِنْ اَوْسَطِ مَا تُطْعِمُوْنَ اَهْلِيْكُمْ মধ্যম ধরনের, যা নিজ পরিবারের লোকদেরকে ভক্ষণ করিয়ে থাক اَوْ كِسْوَتُهُمْ কিংবা তাদেরকে পরিধেয় বস্ত্র দান করা اَوْ تَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ কিংবা একটি গোলাম বা বাদী আজাদ করা فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ আর যে ব্যক্তি সমর্থ না হয় فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ তবে [একাধারে] তিন দিনের রোজা ذٰلِكَ كَفَّارَةُ اَيْمَانِكُمْ এটা তোমাদের কসমসমূহের কাফ্‌ফারা اِذَا حَلَفْتُمْ যখন তোমরা কসম কর وَاحْفَظُوْٓا اَيْمَانَكُمْ এবং নিজেদের কসমসমূহের প্রতি লক্ষ্য রেখ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ এরূপেই আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য স্বীয় বিধানসমূহ বর্ণনা করেন لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ যেন তোমরা শোকর কর।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(৮৩) وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** ইবনে জারীর ও ইবনে আবী হাতেম সুদ্দী হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন– নাজ্জাশী বাদশাহ রাসূল ﷺ -এর নিকট ১২ জন লোক প্রেরণ করেন। তন্মধ্যে ৭জন ছিল খ্রিস্টান ধর্মজাযক; আর ৫ জন ছিল পাদ্রী (ইহুদি ধর্মগুরু)। তারা রাসূল ﷺ–কে প্রত্যক্ষ করে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন সুতরাং তারা যখন রাসূল ﷺ–এর সাথে সাক্ষাৎ করে, তখন রাসূল ﷺ তাদের সামনে কুরআন তেলাওয়াত করেন। তারা আল্লাহ যা অবতরণ করেছেন, তার প্রতি লক্ষ্য করে অশ্রু সজল হয়ে ঈমান গ্রহণ করে। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[ফাতহুল কাদীর : ৬৯/২]

(৮৭) يَٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَٰتِ مَآ أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** ইমাম তিরমিযী, ইবনে জারীর, ইবনে আবী হাতেম, কামেল নামক গ্রন্থে ইবনে আদী, তাবারানী ও হযরত ইবনে মারদুভিয়া প্রমুখ হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)–এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম ﷺ–এর দরবারে এক লোক এসে আরজ করল, হে আল্লাহর রাসূল! আমি যখন গোশ্‌ত আহার করি। তখন মহিলাদের জন্য অচেতন হয়ে পড়ি এবং প্রবৃত্তি আমাকে আক্রান্ত করে। ফলে আমি আমার জান্য গোশতকে হারাম করে দিলাম। সুতরাং কোনো হালাল বা বৈধ বস্তু নিজের জন্য হারাম বা অবৈধ করার নিষেধাজ্ঞাসহ আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়েছে।

শানে নুযূল– ২ : ইবনে জারীর, ইবনে আবী হাতেম, হযরত ইবনে মারদুভিয়া, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে অপর এক রেওয়ায়েতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন– সাহাবাগণের এক জামাত সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। ঘটনা প্রবাহ হলো, তারা বলেছিলেন যে, আমরা আমাদের পুরুষাঙ্গগুলো কেটে ফেলব। জাগতিক কাম-প্রবৃত্তি ছেড়ে দিব, রাতব্যাপী জাগ্রত থাকব, যেরূপভাবে রাহেবরা করে থাকে। এ সংবাদ রাসূল ﷺ–এর নিকট পৌঁছল। সুতরাং রাসূল ﷺ তাদেরকে ডেকে এনে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন, তারা তা অস্বীকার করেন। তখন রাসূল ﷺ বললেন, পক্ষান্তরে আমি তো রোজা রাখি, ইফতার করি, নামাজ আদায় করি, নিদ্রা যেয়ে থাকি, স্ত্রীদের সাথে মিলন করি। সুতরাং যে আমার সুন্নতকে আঁকড়ে ধরবে সে আমার দলভুক্ত, আর আমার সুন্নতকে যারা আঁকড়ে ধরবে না, তারা আমার দলভুক্ত নয়। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে।

শানে নুযূল– ৩ : ইবনে জারীর ও ইবনে আবী হাতেম যায়েদ বিন আসলামের উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা পরিবারে একজন অতিথি হয়েছিলেন, সে সময় তিনি ছিলেন রাসূল ﷺ–এর দরবারে। তিনি ফিরে এসে দেখতে পেলেন যে, তার পরিবারের লোকজন তাদের মেহমানকে তার অপেক্ষা করে খাবার খাওয়াননি। এমন অবস্থা দেখে তিনি তার স্ত্রীকে বললেন, আমার কারণে আমার মেহমানকে তোমরা অনাহারে রাখলে! কাজেই এ খাবার গ্রহণ করা আমার জন্য হারাম। তার স্ত্রী বললেন, তাহলে তাতো আমার জন্যও হারাম। অতঃপর মেহমান শুনতে পেয়ে বললেন, তা আমার জন্যও হারাম। সুতরাং তিনি যখন পরিস্থিতি এমন এলোমেলো দেখতে পেলেন, তখন সে খাদ্যের উপর হাত রেখে বললেন, আল্লাহর নাম নিয়ে খাবার খেতে আরম্ভ কর। অতঃপর তিনি রাসূল ﷺ–এর নিকট গিয়ে এ বিষয়ে রাসূল ﷺ–কে অবগত করলেন। রাসূল ﷺ তা শুনে বললেন যে, قَدْ أَصَبْتَ তুমি তো ঠিকই করেছ। সে অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। –[ফাতহুল কাদীর : ৭০/২, ইবনে কাছীর : ৮৯/২, বাহরে মুহীত : ১০/৪]

শানে নুযূল– ৪ : সুদ্দী হতে একাধিক তাফসীরবিদ বর্ণনা করেছেন যে, রাসূল ﷺ একদা লোকজনের উপস্থিতিতে উপদেশ করে চলে গেলেন, সে সময় ভীতি প্রদর্শন ছাড়া আর অন্য কোনো বিষয়ে কিছু বলেননি। অতঃপর ১০ জন সাহাবী যাদের মধ্যে হযরত আলী বিন আবী তালেব (রা.), উসমান বিন মাযউন (রা.)ও ছিলেন। তারা বলছিলেন যে, আমরা যদি আমল না করি, তাহলে আমাদের কি হকটিই বা আদায় হলো। খ্রিস্টানরা নিজেদের জন্য কতিপয় প্রিয়তম বস্তুকে হারাম করেছে। কাজেই আমরাও আমাদের জন্য কতিপয় প্রিয়তম বস্তুকে হারাম করে নিব। সুতরাং কেউ গোশত ও চর্বি খাওয়া এবং কেউ দিনে আহার করাকে নিলেন। কেউ নিদ্রা যাওয়া হারাম করে নিলেন। কেউ স্ত্রীকে হারাম করে নিলেন। যারা স্ত্রীকে হারাম করেছিলেন, তাদের মধ্যে উসমান বিন মাযউন (রা.) ছিলেন একজন। ফলে তিনি তাঁর স্ত্রীর নিকটেও যেতেন না। সুতরাং তার স্ত্রী হাওলা হযরত আয়েশা (রা.)-এর নিকট আসেন। তখন হযরত আয়েশা (রা.) এবং অন্যান্য

উম্মাহাতুল মুমিনীনগণ তাকে জিজ্ঞেস করলেন, কি হলো তোমার হে হাওলা! তোমরা রং বিকৃত-মাথার চুলও আচড়ে পরিপাটি করছ না, সুগন্ধিও ব্যবহার করনি? হাওলা বলল, চুল আচড়ে ও সুগন্ধি ব্যাবহার করেই বা কি করব? আমার স্বামী আমার উপর আরোহণ করছে না এবং এমনকি কাপড়ও উল্টায়নি। তাঁর কথা শুনে তারা হাসতে লাগলেন, রাসূল ﷺ ঘরে এসে দেখলেন তাঁরা হাসছেন। বিধায় জিজ্ঞাসা করলেন, কিসে তোমাদেরকে এমনভাবে হাসালো। হযরত আয়েশা (রা.) বললেন, আমি তাঁর ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেছিলাম, সে বলে যে, আমার স্বামী আমার কাপড়ও উল্টায়নি। রাসূল ﷺ তৎক্ষণাৎ তার স্বামীকে ডেকে আনার জন্য পাঠালেন। অতঃপর রাসূল ﷺ তাকে জিজ্ঞেস করেন, উসমান! তোমার কি হলো? তিনি বললেন, আমি একাগ্রতা অর্জন করে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য তা বর্জন করে দিয়েছি এবং পুরা ঘটনার বর্ণনাও দিলেন। উসমান নিজেকে অকর্মণ্য করে দিতে চেয়েছিলেন। রাসূল ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি কসম খেয়েছ? নতুবা তোমার স্ত্রীর সাথে মিলন কর। তখন তিনি বললেন, আমি রোজা রেখেছি, হে আল্লাহর রাসূল! রাসূল ﷺ বললেন, তুমি ইফতার কর। ফলে তিনি ইফতার করে তাঁর স্ত্রীর নিকট গেলেন। অতঃপর হাওলা হযরত আয়েশা (রা.)–এর নিকট চুল আঁচড়ে সুরমা দিয়ে এবং সুগন্ধি ব্যবহার করে আসলেন, ফলে হযরত আয়েশা (রা.) হেসে জিজ্ঞেস করলেন। হাওলা! তোমার কি অবস্থা? তিনি বলেন, গতকাল স্বামী তার নিকট এসেছিল। অতএব রাসূল ﷺ বললেন, কি হলো তাদের, তারা স্ত্রী, খাদ্য ও নিদ্রা হারাম করে দিল। জেনে রেখ! আমি অবশ্যই নিদ্রা যাই, নামাজ পড়ি, ইফতার করি, রোজা রাখি, স্ত্রী মিলনও করে থাকি। আমাকে যারা উপক্ষো করবে, তারা আমার দলভুক্ত নয়। সে ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। –[ইবনে কাছীর : ৯০২/]

(৮৯) لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِيْٓ اَيْمَانِكُمْ وَلٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** ইবনে জারীর হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُحَرِّمُوْا طَيِّبٰتِ مَآ اَحَلَّ اللّٰهُ আয়াত যখন নাজিল হয়, তখন যারা নিজেদের জন্য স্ত্রী ও গোশতকে হারাম করেছিলেন, তারা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা যারা শপথ গ্রহণ করেছি সে সম্পর্কে আমরা কি করব? সে জিজ্ঞাসার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[ফাতহুল কাদীর : ৭২/২, কুরতুবী : ২৪৭/৬]

শানে নুযূল– ২ : বর্ণিত রয়েছে যে, আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহাদের ঘরে কতকজন এতিম এবং একজন মেহমান ছিলেন। হযরত আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা (রা.) কোনো কাজের ব্যস্ততায় থাকার দরুন রাতের কিছু অংশ অতিক্রম হবার পর এসে জিজ্ঞেস করেন যে, তোমরা আমার মেহমানকে খাবার দিয়েছ কি? তারা বলল, আপনার অপেক্ষায় ছিলাম। সুতরাং তিনি বলে ফেলেন যে, وَاللّٰهِ, আজ রাতে আমি খাব না। অতঃপর এতিমেরা বলল, আমরাও খাব না। অবস্থার হ য ব র ল তা দেখে তিনি নিজে খেলেন, তারাও সকলে মিলে আহার করল। অতঃপর নবী করীম ﷺ–এর নিকট এসে তা জানালেন। রাসূল ﷺ বললেন, দয়াময় আল্লাহর অনুগত্য করবে। শয়তানের বিরোধিতা করবে। সে ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। –[কুরতুবী : ২৪৭/৬, রূহুল মা'আনী : ১০/৪/৭]

শানে নুযূল– ৩ : ইবনে মাজাহ হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, কোনো এক ব্যক্তি তার পরিবারের লোকজনকে সামর্থ্য অনুপাতে খাদ্য দান করেছে, অপর কোনো ব্যক্তি কার্পণ্যতার সাথে তার পরিবারের সদস্যকে খাদ্য দান করেছে। সে পরিপ্রেক্ষিতে مِنْ اَوْسَطِ مَا تُطْعِمُوْنَ اَهْلِيْكُمْ আয়াতাংশটি নাজিল হয়েছে। –[ফাতহুল কাদীর : ২৫৮/৬, ফাতহুল কাদীর : ৭৩/২, ইবনে কাছীর : ৯১/২]

সংসার ত্যাগ ইলাহী সীমার ভিতরে হলে বৈধ, নতুবা হারাম : উল্লিখিত আয়াতসমূহে বলা হয়েছে যে, সংসার ত্যাগ ও ভোগ-বিলাস ত্যাগ করা যদিও এক পর্যায়ে প্রশংসনীয়, কিন্তু এতেও আল্লাহর নির্ধারিত সীমা অতিক্রম করা নিন্দনীয় ও হারাম। এর বিবরণ নিম্নরূপ :

হালাল বস্তুকে হারাম সাব্যস্ত করার তিনটি স্তর : কোনো হালাল বস্তুকে হারাম করে নেওয়ার তিনটি স্তর রয়েছে : **এক.** বিশ্বাসগতভাবে হারাম মনে করে নেওয়া, **দুই.** উক্তির মাধ্যমে কোনো বস্তুকে নিজের জন্য হারাম মনে করে নেওয়া। উদাহরণতঃ এরূপ প্রতিজ্ঞা করা যে, ঠাণ্ডা পানি পান করব না কিংবা অমুক হালাল খাদ্য খাবে না অথবা অমুক জায়েজ কাজ করবে না এবং **তিন.** বিশ্বাস ও উক্তি কিছুই নয় কিন্তু কার্যতঃ কোনো হালাল বস্তুকে চিরতরে বর্জন করার সংকল্প করে নেওয়া।

প্রথমবাস্থায় যদি ঐ বস্তু অকাট্য প্রমাণের মাধ্যমে হালাল হয়ে থাকে, তবে তাকে হারাম বলে যে লোক বিশ্বাস করবে সে আল্লাহর আইনের প্রকাশ্য বিরুদ্ধাচরণের কারণে কাফের হয়ে যাবে।

www.almodina.com

দ্বিতীয় অবস্থায় যদি কসমের শব্দ যোগে হালাল বস্তুটিকে নিজের উপর হারাম করে থাকে, তবে কসম শুদ্ধ হবে। কসমের শব্দ অনেক, যা ফিকহ্ গ্রন্থে বিস্তারিত উল্লিখিত রয়েছে। উদাহরণতঃ কেউ এরূপ বলে যে, আমি আল্লাহর কসম খেয়ে বলছি, অমুক বস্তু খাব না কিংবা অমুক কাজ করব না অথবা এরূপ বলে যে, আমি অমুক বস্তু কিংবা অমুক কাজকে নিজের উপর হারাম করেছি। বিনা প্রয়োজনে এরূপ কসম খাওয়া গুনাহ। কিন্তু এরূপ কসম ভঙ্গ করলে তার কাফফারা দেওয়া জরুরি। কাফফারার বিবরণ পরে বর্ণিত হবে।

তৃতীয় অবস্থায় অর্থাৎ বিশ্বাস ও উক্তি দ্বারা কোনো হালালকে হারাম না করে কার্যতঃ হারামের মতো ব্যবহার করলে যদি এরূপ বর্জনকে ছওয়াবের কাজ মনে করে, তবে তা বিদ'আত এবং বৈরাগ্য বা সংসার ত্যাগ। এরূপ বৈরাগ্য যে মহাপাপ তা কুরআনের স্পষ্ট আয়াতে বর্ণিত আছে। এর বিরুদ্ধাচারণ করা ওয়াজিব এবং এরূপ বিধি নিষেধে অটল থাকা গুনাহ। তবে এরূপ বিধি নিষেধ ছওয়াবের নিয়তে না হয়ে অন্য কোনো কারণে যথা, কোনো দৈহিক কিংবা আত্মিক অসুস্থতার কারণে কোনো বিশেষ বস্তুকে স্থায়ীভাবে বর্জন করলে তাতে গুনাহ নেই। কোনো কোনো সুফী বুজুর্গ হালাল বস্তু স্থায়ীভাবে বর্জন করেছেন বলে যেসব ঘটনা বর্ণিত আছে, তা এমনি ধরনের বর্জনের অন্তর্ভুক্ত। তাঁরা এসব বস্তুকে স্বীয় নফসের জন্য ক্ষতিকর মনে করেছেন কিংবা কোনো বুজুর্গ ক্ষতিকর বলেছেন। তাই প্রতিকারার্থে তা বর্জন করেছেন। এতে কোনো দোষ নেই।

আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে : وَلَا تَعْتَدُوْا اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ; অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক নির্ধারিত সীমা অতিক্রম কর না। কেননা আল্লাহ তা'আলা সীমাতিক্রমকারীদেরকে পছন্দ করেন না।

সীমা অতিক্রম করার অর্থ এই যে, কোনো হালাল বস্তুকে বিনা ওজরে ছওয়াব মনে করে বর্জন করা। অজ্ঞ ব্যক্তি একে তাকওয়া তথা আল্লাহভীরুতা মনে করে। অথচ আল্লাহর কাছে এটা সীমাতিক্রম ও অবৈধ। তাই দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে : وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْٓ اَنْتُمْ بِهٖ مُؤْمِنُوْنَ; অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যে পবিত্র ও হালাল বস্তু তোমাদেরকে দিয়েছেন, তা খাও এবং আল্লাহকে ভয় কর, যার প্রতি তোমাদের বিশ্বাস রয়েছে।

এ আয়াতে পরিষ্কার বলা হয়েছে যে, হালাল ও পবিত্র বস্তুকে ছওয়াব মনে করে বর্জন করা তাকওয়া নয়; বরং আল্লাহর নিয়ামত মনে করে ব্যবহার করা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার মধ্যেই তাকওয়াই নিহিত। হাঁ, কোনো দৈহিক ও আত্মিক রোগের প্রতিকারার্থে কোনো বস্তু বর্জন করলে তা এর অন্তর্ভুক্ত নয়।

শপথের কয়েকটি প্রকার ও তার বিধান : আলোচ্য আয়াতে শপথের কয়েকটি প্রকার বর্ণিত হয়েছে। তন্মধ্যে কয়েকটি সূরা বাকারায়ও বর্ণিত হয়েছে। সবগুলোর সারকথা এই যে, যদি অতীত ঘটনা সম্পর্কে ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা শপথ করা হয়, তবে ফিকহবিদদের পরিভাষায় এরূপ শপথকে 'ইয়ামীনে গামূস' বলা হয়। উদাহরণতঃ কেউ একটি কাজ করে ফেলল এবং সে জানে যে, এ কাজটি সে করেছে। এরপর সে জেনেশুনে শপথ করে যে, সে কাজটি করেনি। মিথ্যা শপথ কবিরা গুনাহ এবং ইহকাল ও পরকালে শাস্তির কারণ। কিন্তু এর জন্য কোনোরূপ কাফফারা ওয়াজিব হয় না। তবে তওবা ও ইস্তেগফার করা জরুরি। এ কারণেই একে পরিভাষায় 'ইয়ামীনে গামূস' বলা হয়। কেননা গামূসের অর্থ, যে ডুবিয়ে দেয়। এ শপথ গুনাহ ও শাস্তিতে ডুবিয়ে দেয়।

দ্বিতীয় প্রকার এই যে, নিজ ধারণায় সত্য মনে করে কোনো অতীত ঘটনা সম্পর্কে শপথ করা; কিন্তু বাস্তবে তা অসত্য হওয়া। উদাহরণতঃ কোনো সূত্রে জানা গেল যে, অমুক ব্যক্তি এসে গেছে। এর উপর নির্ভর করে কেউ শপথ করল যে, অমুক ব্যক্তি এসে গেছে। এর পর দেখা গেল যে, এটা বাস্তবের বিপরীত। এরূপ শপথকে 'ইয়ামীনে লগভ' বলা হয়। এরূপ শপথে গুনাহ নেই এবং কাফফারাও দিতে হয় না।

তৃতীয় প্রকার এই যে, ভবিষ্যতে কোনো কাজ করা বা না করার শপথ করা। এরূপ শপথকে 'ইয়ামীনে মুনআকিদা' বলা হয়। এ শপথ ভঙ্গ করলে কাফফারা ওয়াজিব হয়। তবে কোনো কোনো অবস্থায় গুনাহ হয়, কিন্তু কোনো কোনো অবস্থায় গুনাহ হয় না।

এস্থলে কুরআনে পাকের উল্লিখিত আয়াতে 'লগভ' বলে বাহ্যতঃ এমন শপথকেই বুঝানো হয়েছে যাতে কাফফারা নেই; গুনাহ হোক বা না হোক। কেননা এর বিপরীতে عَقَّدْتُّمُ الْاَيْمَانَ উল্লিখিত হয়েছে। এতে বুঝা গেল যে, এখানে পাকড়াও করার অর্থ জাগতিকভাবে পাকড়াও, যা কাফফারা আকারে হয়।

সূরা বাকারার আয়াতে বলা হয়েছে : لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِيْٓ اَيْمَانِكُمْ وَلٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوْبُكُمْ

এখানে لغو বলে ঐ শপথকে বুঝানো হয়েছে, যা ইচ্ছা ব্যতিরেকেই মুখ থেকে বের হয়ে পড়ে কিংবা নিজ ধারণায় সত্য মনে করে শপথ করে, কিন্তু বাস্তবে তা অসত্য হয়। এর বিপরীতে ঐ শপথ উল্লেখ করা হয়েছে। যাতে ইচ্ছাপূর্বক মিথ্যা বলা হয়। একে 'ইয়ামীনে গামূস' বলা হয়। অতএব এ আয়াতের সারমর্ম এই যে, ইয়ামীনে লগভে গুনাহ নেই। 'ইয়ামীনে গামূসে' গুনাহ আছে, যাতে ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা বলা হয়। সূরা বাকারায় পারলৌকিক গুনাহ বর্ণিত হয়েছে এবং সূরা মায়েদার আলোচ্য আয়াতে জাগতিক নির্দেশ অর্থাৎ, কাফফারা বর্ণিত হয়েছে। এর সারমর্ম এই যে, ইয়ামীনে লগভের জন্য আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে পাকড়াও করেন না অর্থাৎ কাফফারা ওয়াজিব করেন না; বরং কাফফারা শুধু ঐ শপথের জন্যই ওয়াজিব করেন না যা ভবিষ্যতে কোনো কাজ করা না করার সম্পর্কে করা হয় এবং অতঃপর তা ভঙ্গ করা হয়। এরপর কাফফারার বিস্তারিত বিবরণ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে :

فَكَفَّارَتُهٗٓ اِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسٰكِيْنَ مِنْ اَوْسَطِ مَا تُطْعِمُوْنَ اَهْلِيْكُمْ اَوْ كِسْوَتُهُمْ اَوْ تَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ

অর্থাৎ তিনটি কাজের মধ্য থেকে স্বেচ্ছায় যে কোনো একটি কাজ করতে হবে। এক. দশ জন দরিদ্রকে মধ্যমশ্রেণির খাদ্য সকাল-বিকাল দু'বেলা খাওয়াতে হবে। দুই. কিংবা দশ জন দরিদ্রকে 'সতর ঢাকা' পরিমাণ পোশাক-পরিচ্ছেদ দিতে হবে। উদাহরণতঃ একটি পাজামা অথবা একটি লুঙ্গি অথবা একটি লম্বা কোর্তা। তিন. কিংবা কোনো গোলাম মুক্ত করতে হবে।

এরপর বলা হয়েছে : فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ অর্থাৎ কোনো শপথ ভঙ্গকারী ব্যক্তি যদি এ আর্থিক কাফফারা দিতে সমর্থ না হয়, তবে তার জন্য কাফফারা এই যে, সে তিন দিন রোজা রাখবে। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে এখানে উপর্যুপরি তিন দিন রোজা রাখার নির্দেশ রয়েছে। তাই ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও অন্যান্য কয়েকজন ইমামের মতে শপথের কাফফারা হিসেবে যে রোজা রাখা হবে, তা উপর্যুপরি হওয়া জরুরি।

আলোচ্য আয়াতে শপথের কাফফারা প্রসঙ্গে প্রথমে اِطْعَامُ শব্দ বলা হয়েছে। আরবি ভাষায় এর অর্থ যেমন খাদ্য খাওয়ানো হয়, তেমনি কাউকে খাদ্য দান করাও হয়। তাই ফিকহবিদগণ আলোচ্য আয়াতের উদ্দেশ্যে এরূপ সাব্যস্ত করেছেন যে, দাতা ইচ্ছা করলে দশ জন দরিদ্রকে ভোজনও করিয়ে দিতে পারে এবং ইচ্ছা করলে খাদ্য তার মালিকানায় দিয়ে দিতে পারে। কিন্তু ভোজন করালে তা মধ্যম শ্রেণির খাদ্য হতে হবে, যা সে নিজগৃহে খেতে অভ্যস্ত। দশজন দরিদ্রকে দু'বেলা পেট ভরে খাওয়াতে হবে। পক্ষান্তরে খাদ্য দান করলে প্রত্যেক দরিদ্রকে একজনের ফেতরা পরিমাণ দিতে হবে। অর্থাৎ পৌনে দু'সের গম অথবা তার মূল্য। মোটকথা, উপরিউক্ত তিনটি কাজের মধ্যে যে কোনো একটি করতে হবে। কিন্তু রোজা রাখা তখনই যথেষ্ট হতে পারে, যখন তিনটির মধ্যে যে কোনো একটিরও সামর্থ্য না থাকবে।

শব্দ বিশ্লেষণ

تَفِيْضُ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْفَيْضُ মূলবর্ণ (ف . ى . ض) জিনস اجوف يائى অর্থ– সে বয়ে চলে।

اَثَابَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِثَابَةُ মূলবর্ণ (ث . و . ب) জিনসে اجوف واوى অর্থ– সে বিনিময় দিল।

لَا يُؤَاخِذُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব مُفَاعَلَةٌ মাসদার اَلْمُؤَاخَذَةُ মূলবর্ণ (ا . خ . ذ) জিনস مهموز فاء অর্থ– সে গ্রেফতার করেছে।

عَقَّدْتُّمْ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ ماضى معروف বাব تَفْعِيْلٌ মাসদার اَلتَّعْقِيْدُ মূলবর্ণ (ع . ق . د) জিনস صحيح অর্থ– তোমরা বাঁধলে।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ (٩٠)

অনুবাদ : (৯০) হে ঈমানদারগণ! নিশ্চয় মদ এবং জুয়া এবং মূর্তি ইত্যাদি এবং লটারীর তীর এ সমস্ত বিষয়, শয়তানি কাজ ব্যতীত আর কিছুই নয়, অতএব, তা হতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক থাক, যেন তোমাদের কল্যাণ হয়।

اِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُّوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَآءَ فِى الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَعَنِ الصَّلٰوةِ ۚ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّنْتَهُوْنَ (٩١)

(৯১) শয়তান তো এরূপই চায় যে, মদ এবং জুয়া দ্বারা তোমাদের পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা ও হিংসা সৃষ্টি করে এবং আল্লাহ তা'আলার স্মরণ হতে ও নামাজ হতে তোমাদেরকে বিরত রাখে, সুতরাং এখনো কি তোমরা ফিরে আসবে?

وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاحْذَرُوْا ۚ فَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوْۤا اَنَّمَا عَلٰى رَسُوْلِنَا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ (٩٢)

(৯২) আর তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করতে থাক এবং রাসূলের আনুগত্য করতে থাক এবং সতর্ক থাক, আর যদি বিমুখ থাক, তবে জেনে রাখ যে আমার রাসূলের দায়িত্ব ছিল শুধু স্পষ্টভাবে [আদেশ] পৌছে দেওয়া।

لَيْسَ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جُنَاحٌ فِيْمَا طَعِمُوْۤا اِذَا مَا اتَّقَوْا وَّاٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَّاٰمَنُوْا ثُمَّ اتَّقَوْا وَّاَحْسَنُوْا ؕ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ (٩٣)

(৯৩) যারা ঈমান রাখে এবং নেককাজ করে, এরূপ লোকদের উপর তাতে কোনো গুনাহ নেই যা তারা পানাহার করেছে, যখন তারা পরহেজ করে এবং ঈমান রাখে ও নেককাজ করে, পুনঃ পরহেজ করতে থাকে এবং ঈমান রাখে পুনঃ পরহেজ করতে থাকে, এবং খুব নেককাজ করতে থাকে, বস্তুতঃ আল্লাহ তা'আলা এরূপ নেককারদেরকে ভালোবাসেন।

শাব্দিক অনুবাদ

(৯০) يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا হে ঈমানদারগণ! اِنَّمَا الْخَمْرُ নিশ্চয় মদ وَالْمَيْسِرُ এবং জুয়া وَالْاَنْصَابُ এবং মূর্তি ইত্যাদি وَالْاَزْلَامُ এবং লটারীর তীর رِجْسٌ এ সমস্ত গর্হিত বিষয় مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ শয়তানি কাজ ব্যতীত আর কিছুই নয় فَاجْتَنِبُوْهُ অতএব, তা হতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক থাক لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ যেন তোমাদের কল্যাণ হয়।

(৯১) اِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ শয়তান তো এরূপই চায় যে اَنْ يُّوْقِعَ بَيْنَكُمُ তোমাদের পরস্পরের মধ্যে সৃষ্টি করে الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَآءَ শত্রুতা ও হিংসা فِى الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ মদ এবং জুয়া দ্বারা وَيَصُدَّكُمْ এবং তোমাদেরকে বিরত রাখে عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ আল্লাহ তা'আলার স্মরণ হতে وَعَنِ الصَّلٰوةِ ও নামাজ হতে فَهَلْ اَنْتُمْ مُّنْتَهُوْنَ সুতরাং এখনো কি তোমরা ফিরে আসবে?

(৯২) وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ আর তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করতে থাক وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ এবং রাসূলের আনুগত্য করতে থাক وَاحْذَرُوْا এবং সতর্ক থাক فَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ আর যদি বিমুখ থাক فَاعْلَمُوْۤا তবে জেনে রাখ যে اَنَّمَا عَلٰى رَسُوْلِنَا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ আমার রাসূলের দায়িত্ব ছিল শুধু স্পষ্টভাবে [আদেশ] পৌছে দেওয়া।

(৯৩) لَيْسَ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا এরূপ লোকদের উপর নেই যারা ঈমান রাখে وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ এবং নেককাজ করে جُنَاحٌ তাতে কোনো গুনাহ فِيْمَا طَعِمُوْۤا যা তারা পানাহার করেছে اِذَا مَا اتَّقَوْا যখন তারা পরহেজ করে وَّاٰمَنُوْا এবং ঈমান রাখে وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ও নেককাজ করে ثُمَّ اتَّقَوْا পুনঃ পরহেজ করতে থাকে وَّاٰمَنُوْا এবং ঈমান রাখে ثُمَّ اتَّقَوْا থাকে পুনঃ পরহেজ করতে থাকে وَّاَحْسَنُوْا এবং খুব নেককাজ করতে থাকে وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ বস্তুতঃ আল্লাহ তা'আলা এরূপ নেককারদেরকে ভালোবাসেন।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللّٰهُ بِشَىْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُهٗۤ اَيْدِيْكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللّٰهُ مَنْ يَّخَافُهٗ بِالْغَيْبِ ۚ فَمَنِ اعْتَدٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهٗ عَذَابٌ اَلِيْمٌ (٩٤)

অনুবাদ : (৯৪) হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ তোমাদেরকে কতক শিকারের দ্বারা পরীক্ষা করবেন, যেগুলো পর্যন্ত তোমাদের হাত এবং তোমাদের বল্লম পৌছতে পারবে, এই উদ্দেশ্যে যে, আল্লাহ তা'আলা জেনে নেন, কে তাঁকে না দেখে ভয় করে, সুতরাং যে ব্যক্তি এর পরও সীমালজ্ঘন করবে, তার জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَاَنْتُمْ حُرُمٌ ۗ وَمَنْ قَتَلَهٗ مِنْكُمْ مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهٖ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ هَدْيًاۢ بٰلِغَ الْكَعْبَةِ اَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسٰكِيْنَ اَوْ عَدْلُ ذٰلِكَ صِيَامًا لِّيَذُوْقَ وَبَالَ اَمْرِهٖ ؕ عَفَا اللّٰهُ عَمَّا سَلَفَ ؕ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللّٰهُ مِنْهُ ؕ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ ذُو انْتِقَامٍ (٩٥)

(৯৫) হে ঈমানদারগণ! বন্য শিকারকে হত্যা করো না যখন তোমরা ইহরামের অবস্থায় থাক, আর যে ব্যক্তি তোমাদের মধ্য হতে ইচ্ছাপূর্বক তাকে হত্যা করবে, তবে তার উপর বিনিময় ওয়াজিব হবে, যা [মূল্যের দিক দিয়ে] সেই জানোয়ারের সমতুল্য হয় যাকে সে হত্যা করেছে, যার [আনুমানিক মূল্যের] মীমাংসা তোমাদের মধ্য হতে দু'জন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি করে দিবে, [অতঃপর নিরূপিত মূল্য দ্বারা] সেই বিনিময় চাই নির্দিষ্ট চতুষ্পদ জন্তুই হোক, এই শর্তে যে, নিয়াজস্বরূপ কা'বা ঘর পর্যন্ত পৌছে দিবে, অথবা কাফফারা [স্বরূপ নিরূপিত মূল্যের সমপরিমাণ খাদ্য দ্রব্য] মিসকিনদের মধ্যে বিতরণ করে দিবে, অথবা এর সমপরিমাণ রোজা রাখবে, যেন নিজ কৃতকর্মের পরিণামের স্বাদ গ্রহণ করে, অতীত [ত্রুটি] আল্লাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন , আর যে ব্যক্তি পুনরায় এরূপ কর্মই করবে, তবে আল্লাহ তা'আলা সেই ব্যক্তি হতে [তার] প্রতিশোধ নিবেন, আর আল্লাহ পরাক্রান্ত, প্রতিশোধ গ্রহণে সক্ষম।

শাব্দিক অনুবাদ

(৯৫) يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا হে ঈমানদারগণ! لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ বন্য শিকারকে হত্যা করো না وَاَنْتُمْ حُرُمٌ যখন তোমরা ইহরামের অবস্থায় থাক وَمَنْ قَتَلَهٗ مِنْكُمْ আর যে ব্যক্তি তোমাদের মধ্য হতে তাকে হত্যা করবে مُّتَعَمِّدًا ইচ্ছাপূর্বক فَجَزَآءٌ তবে তার উপর বিনিময় ওয়াজিব হবে مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ যা সেই জানোয়ারের সমতুল্য হয় যাকে সে হত্যা করেছে يَحْكُمُ بِهٖ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ যার মীমাংসা তোমাদের মধ্য হতে দু'জন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি করে দিবে هَدْيًا সেই বিনিময় চাই নির্দিষ্ট চতুষ্পদ জন্তুই হোক بٰلِغَ الْكَعْبَةِ এই শর্তে যে, নিয়াজস্বরূপ কা'বা ঘর পর্যন্ত পৌছে দিবে اَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسٰكِيْنَ অথবা কাফফারা মিসকিনদের মধ্যে বিতরণ করে দিবে اَوْ عَدْلُ ذٰلِكَ صِيَامًا অথবা এর সমপরিমাণ রোজা রাখবে لِّيَذُوْقَ وَبَالَ اَمْرِهٖ যেন নিজ কৃতকর্মের পরিণামের স্বাদ গ্রহণ করে, عَفَا اللّٰهُ عَمَّا سَلَفَ অতীত [ত্রুটি] আল্লাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন وَمَنْ عَادَ আর যে ব্যক্তি পুনরায় এরূপ কর্মই করবে فَيَنْتَقِمُ اللّٰهُ مِنْهُ তবে আল্লাহ তা'আলা সেই ব্যক্তি হতে প্রতিশোধ নিবেন وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ আর আল্লাহ পরাক্রান্ত ذُو انْتِقَامٍ প্রতিশোধ গ্রহণে সক্ষম।

(৯৪) يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا হে ঈমানদারগণ! لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللّٰهُ بِشَىْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ আল্লাহ তোমাদেরকে কতক শিকারের দ্বারা পরীক্ষা করবেন تَنَالُهٗۤ যেগুলো পৌছতে পারবে اَيْدِيْكُمْ وَرِمَاحُكُمْ তোমাদের হাত এবং তোমাদের বল্লম পর্যন্ত لِيَعْلَمَ اللّٰهُ এই উদ্দেশ্যে যে, আল্লাহ তা'আলা জেনে নেন مَنْ يَّخَافُهٗ بِالْغَيْبِ কে তাঁকে না দেখে ভয় করে فَمَنِ اعْتَدٰى بَعْدَ ذٰلِكَ সুতরাং যে ব্যক্তি এর পরও সীমালজ্ঘন করবে فَلَهٗ عَذَابٌ اَلِيْمٌ তার জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে।

www.almodina.com

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(৯১) قوله يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْآ اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** ইবনে জারীর, ইবনে আবী হাতেম ইবনে মারদুভীয়াও বায়হাকী, হযরত ইবনে ওমর (রা.)–এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, মদ সংক্রান্ত বিষয়ে পবিত্র কুরআনে তিনটি আয়াত নাজিল হয়েছে। সর্বপ্রথম يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। তখন সাহাবীগণকে জানানো হলো যে, মদ হরাম করা হচ্ছে। তখন কারো পক্ষ হতে আবেদন করা হলো যে, হে আল্লাহর রাসূল! তা দ্বারা উপকৃত হবার সুযোগ আমাদেরকে দান করুন। সুতরাং তা আর আমলে আনা হলো না। অতঃপর لَا تَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سُكٰرٰى নাজিল হয়। তখন সাহাবীগণকে জানানো হলো যে, মদ হারাম হতে যাচ্ছে। তারা আবেদন করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা নামাজের নিকটতম সময়ে মদ পান করব না। সুতরাং তখনও বাস্তবায়িত হলো না। অতঃপর يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْآ اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ الخ নাজিল হয়। সে সময় রাসূল ﷺ বলে দিলেন যে, মদ হারাম করে দেওয়া হয়েছে। সে পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে।

ইবনে জারীর, ইবনুল মুনযির, ইবনে আবী হাতেম, নাহহাস তাঁর নাসেখ গ্রন্থে, আবুশ শায়খ ও ইবনে মারদুভিয়া সা'আদ বিন আবী ওয়াক্কাসের উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, মদ হারাম হবার বিধানকে আমাকে উপলক্ষ করে নাজিল হয়েছে। ঘটনা প্রবাহ হলো যে, আনসারী একজন সাহাবী খাদ্য প্রস্তুত করে খাওয়ার জন্য মানুষকে দাওয়াত দেন। সুতরাং মানুষেরা এসে দাওয়াত খেয়ে মদ্য পান করে মাতাল হয়ে পরস্পরে গর্ব করতে থাকে। অতএব আনসারীরা বলতে লাগল যে, আনসারীরা মুহাজির অপেক্ষা উত্তম। কুরাইশরা বলতে ছিল যে, কুরাইশরা উত্তম। অতঃপর কোনো একজন লোক আমার উটের লাগাম ধরে আমার নাকে আঘাত করে। সুতরাং আমি নবী করীম ﷺ–এর নিকট এসে এ সম্পর্কে আলোচনা করলাম। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে।

আবদ বিন হুমাইদ, নাসায়ী, ইবনে জারীর ও ইবনুল মুনযির হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)–এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন– আনসারী দু'টি গোত্র উপলক্ষে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। তারা মদপান করে যখন মাতাল হয়ে যায়, তখন তারা একে অপরের সাথে খেলাধুলা করতে থাকে। তারা যখন সুস্থ হয়ে যায় তখন তাদের চেহারায় দাড়িতে ও মাথায় আঘাত দেখতে পায়। সুতরাং তারা জিজ্ঞেস করল, আমার সাথে অমুক ভাই এমন আচরণ করল! অথচ তাদের পরস্পরের মাঝে ছিল ভ্রাতৃত্ব বন্ধন, তাদের অন্তরে কোনো প্রকারের বিদ্বেষ ছিল না। আল্লাহর কসম! আমার প্রতি যদি ক্ষমাশীল ও অনুগ্রহশীল হতো, তাহলে আমার সাথে এমন ব্যবহার করতো না। অবশেষে তাদের অন্তরে বিদ্বেষের বীজ বপন হলো। এর পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[ফাতহুল কাদীর : ৭৫/২, ইবনে কাছীর : ৯৪/২-৯৭/২, কুরতুবী : ২৬৮/৬-২৭২/৬, বাহরে মুহীত : ১৫/৪]

(৯৩) قوله لَيْسَ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جُنَاحٌ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** হযরত ইবনে আব্বাস, বারা ও আনাস (রা.) বলেন, মদ হারাম হওয়া সম্পর্কীয় আয়াত যখন নাজিল হয়, তখন কতিপয় সাহাবী রাসূল ﷺ–এর দরবারে উপস্থিত হয়ে বললেন, আমাদের মাঝে যারা মদ্যপান করা ও জুয়া খেলার উৎস আয় ভোগ করে মারা গিয়েছে, তাদের কি অবস্থা হবে? সুতরাং সাহাবায়ে কেরামের এ আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়েছে। –[বাহরে মুহীত : ১৮/৪, রূহুল মা'আনী :১৮/৪/৭]

শানে নুযূল– ২ : আহমদ, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, মদ তিন বার হারাম করা হয়েছে। এবং হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর হাদীসের ন্যায় হাদীসও বর্ণনা করা হয়েছে। উপস্থিত সাহাবীগণ বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! অনেক মানুষ আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে শাহাদাত বরণ করেছেন, আবার কেউ অসুস্থ হয়ে নিজ বিছানায় পড়ে ইন্তেকাল করেছেন, তারা মদ ও জুয়া খেলার অর্জিত অর্থও ভোগ করছিলেন। অথচ আল্লাহ তা'আলা উভয়টিকে অপবিত্র ও শয়তানের কাজ বলে ঘোষণা দিয়েছেন। তখন আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[ফাতহুল কাদীর : ৭৫/২, কুরতুবী : ২৭৩/৬, ইবনে কাছীর : ৯৪/২]

www.almodina.com

(৯৪) قوله يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللّٰهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** ইবনে আবী হাতেম ও মুকাতিল হতে বর্ণিত রয়েছে যে, আলোচ্য আয়াত হুদায়বিয়ার সন্ধির সনে অবতীর্ণ হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা শিকারি জন্তু দ্বারা তাঁদেরকে পরীক্ষা করেন। তাঁরা ছিলেন এহরাম বাঁধা আর বন্য প্রাণীরা তারা সাওয়ারী থাকার অবস্থায়ই তাদেরকে ঘিরে ফেলে। তারা ইচ্ছা করলে হাতে ধরে অথবা বর্ম দ্বারা গা দিয়েই শিকার করতে পারতেন। এহরাম বাঁধা অবস্থায় শিকার করা তো হারাম তবে শিকারী জন্তু এভাবে ঘিরে ফেলার অবস্থায় নিজ হস্ত সংযত রাখার হুকুম দেওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ করেন। –[রূহুল মা'আনী : ২১/৪/৭, বাহরে মুহীত : ১৯/৪]

শানে নুযূল– ২ : কারো কারো মতে আলোচ্য আয়াত হুদায়বিয়ার সন্ধির সনে নাজিল হয়েছে। ঘটনা প্রবাহ হলো, নবী করীম ﷺ–এর সাথে কেউ এহরাম বেঁধে ছিলেন আবার কেউ এহরাম বাঁধেননি। সুতরাং শিকারি জন্তু যখন ভিড় জমালো, তখন তাদের অবস্থা ও কার্যকলাপের মাঝে কিছুটা পার্থক্যতা দেখা দিল এবং বিধানাবলি সম্পর্কেও সন্দেহ সংশয় দেখা দিল। সুতরাং অবস্থার প্রেক্ষাপট ও কাজের বর্ণনা দিয়ে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[কুরতুবী :২৭৯/৬]

(৯৫) قوله يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَاَنْتُمْ حُرُمٌ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** বর্ণিত আছে, হুদায়বিয়া অঞ্চলে থাকাকালে আশে পাশে ছিল জংলি গাধা। হযরত আবূ ইয়াসার (রা.) গাধাগুলোর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে বর্শা দ্বারা আঘাত করে একটি শিকার করে ফেললেন। ফলে তাকে জিজ্ঞেস করা হলো যে, তুমি এটিকে কেন হত্যা করে ফেললে? অথচ তুমি তো ইহরাম রেখেছ? তখন তিনি রাসূল ﷺ–এর নিকট এসে সে বিষয়ে জানতে চান। তখন আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[রূহুল মা'আনী : ২৩/৪/৭]

মানুষের কল্যাণের জন্যই বস্তুজগতের সৃষ্টি : আলোচ্য আয়াতসমূহে একথা বলা উদ্দেশ্য যে, রাব্বুল আলামীন সমগ্র বিশ্বকে মানুষের উপকারার্থেই সৃষ্টি করেছেন। তিনি প্রত্যেক বস্তুকে মানুষের বিশেষ বিশেষ কাজে নিয়োজিত করেছেন এবং মানুষকে সমগ্র বিশ্বের সেবার যোগ্য করেছেন। তবে তিনি মানুষের প্রতি শুধু একটি বিধি-নিষেধ আরোপ করেছেন। তা এই যে, আমর সৃষ্টবস্তু দ্বারা উপকৃত হওয়ার যে সীমা আমি নির্ধারণ করে দিয়েছি, তা লঙ্ঘন করবেনা। যেসব বস্তু তোমাদের জন্য হালাল ও পবিত্র করেছি, সেগুলো থেকে বিরত থাকা ধৃষ্টতা ও অকৃতজ্ঞতা এবং যেসব বস্তুর বিশেষ ব্যবহারকে হারাম করেছি, তার বিরুদ্ধাচরণ করা অবাধ্যতা ও বিদ্রোহ। দাসের কর্তব্য প্রভুর নির্দেশ অনুযায়ী তার সৃষ্টবস্তুকে ব্যবহার করা? এরই নাম দাসত্ব।

প্রথম আয়াতে মদ, জুয়া, মূর্তি এবং ভাগ্য পরীক্ষার শর এই চারটি বস্তুকে হারাম বলা হয়েছে। এ বিষয়বস্তুরই একটি আয়াত প্রায় একই ধরনের শব্দ সহযোগে সূরা বাকারায়ও উল্লিখিত হয়েছে।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ

এতে উপরিউক্ত চার বস্তুকে رِجْسٌ বলা হয়েছে। আরবি ভাষায় رِجْسٌ এমন নোংরা বস্তুকে বলা হয়। যার প্রতি মানুষের মনে ঘৃণা জন্মে। এ চারটি বস্তুও এমন যে, সামান্য সুস্থ বিবেক বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তির মনেই এগুলোর প্রতি আপনা-আপনিই ঘৃণা জন্মে।

'আযলাম'–এর ব্যাখ্যা : এ চার বস্তুর মধ্যে اَزْلَامٌ অন্যতম। এটি زَلَمٌ–এর বহুবচন। আযলাম এমন শরকে বলা হয়, যা দ্বারা আরবে ভাগ্যনির্ধারণী জুয়া খেলার প্রথা প্রচলিত ছিল। দশ ব্যক্তি শরিক হয়ে একটি উট জবাই করত। অতঃপর মাংস সমান দশ ভাগে ভাগ করার পরিবর্তে তা দ্বারা জুয়া খেলা হতো। দশটি শরের সাতটিতে বিভিন্ন অংশের চিহ্ন অঙ্কিত থাকত। কোনোটিতে এক এবং কোনোটিতে দুই বা তিন অংশ অঙ্কিত থাকত। অবশিষ্ট তিনটি শর অংশবিহীন সাদা থাকত। এ শরগুলোকে তূনের মধ্যে রেখে খুব নাড়াচাড়া করে নিয়ে একে অংশীদারের জন্য একটি শর বের করা হতো। যত অংশবিশিষ্ট শর যার নামে বের হতো, সে তত অংশের অধিকারী হতো এবং যার নামে অংশবিহীন শর হতো, সে বঞ্চিত হতো। আজকাল এ ধরনের অনেক লটারী বাজারে প্রচলিত আছে। এগুলোও জুয়া এবং হারাম।

লটারীর জায়েজ প্রকার : এক প্রকার লটারী জায়েজ এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে প্রমাণিত আছে। তা এই যে, অধিকার সবার সমান এবং অংশও সমান বণ্টন করা হয়েছে। এখন কার অংশ কোনটি, তা লটারীর মাধ্যমে নির্দিষ্ট করা যায়।

www.almodina.com

উদাহরণতঃ একটি গৃহ চারজন অংশীদারের মধ্যে বণ্টন করতে হবে। এখন মূলের দিক দিয়ে গৃহটিকে সমান চার ভাগে ভাগ করতে হবে। অতঃপর কে কোন ভাগ নিবে, তা যদি পারস্পরিক সম্মতিক্রমে নির্দিষ্ট করা সম্ভব না হয়, তবে লটারীর মাধ্যমে যার নামে যে অংশ আসে, তা তাকে দেওয়াও জায়েজ। অথবা মনে করুন, কোনো একটি বস্তুর প্রার্থী এক হাজার জন এবং সবার অধিকারও সমান। কিন্তু যে বস্তুটি ভাগ করতে হবে। তা সর্বমোট একশটি। এ ক্ষেত্রেও লটারীযোগে মীমাংসা করা যায়।

মাসআলা : হেরেমের সীমার ভিতরে ইহরাম অবস্থায় যেসব শিকার হারাম, তা খাদ্য জাতীয় অর্থাৎ হালাল জন্তু হোক কিংবা অখাদ্য অর্থাৎ হারাম বস্তু হোক সবই হারাম।

* বন্য জন্তুকে শিকার বলা হয়, যেগুলোর প্রকৃতিগতভাবে মানুষের কাছে থাকে না। সুতরাং যেসব বস্তু সৃষ্টিগতভাবে গৃহপালিত, যেমন ভেড়া, ছাগল, গরু, উট এগুলো জবাই করা এবং খাওয়া জায়েজ।

শব্দ বিশ্লেষণ

اَلْخَمْرُ : শব্দটি একবচন, বহুবচন خُمُوْرٌ অর্থ– মদ, শরাব।

اَلْمَيْسَرُ : শব্দটি একবচন, এর বহুবচন আসে না। অর্থ– জুয়া।

اَلْاَنْصَابُ : শব্দটি বহুবচন, একবচন نُصُبٌ অর্থ– মূর্তি কিংবা অন্য কিছু।

اَلْاَزْلَامُ : শব্দটি বহুবচন, একবচন زَلَمٌ অর্থ– লটারীর তীর, জুয়া।

رِجْسٌ : শব্দটি একবচন, বহুবচন اَرْجَاسٌ অর্থ– নাপাকী, বিপদ, অপরিষ্কার।

مُنْتَهُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِنْتِهَاءُ মূলবর্ণ (ن ـ ه ـ ى) জিনস ناقص يائى
অর্থ– বিরত থাকে যারা, থেকে থাকে যারা।

اَلنَّعَمُ : শব্দটি একবচন, বহুবচন اَنْعَامٌ অর্থ– চতুষ্পদ জন্তু।

هَدْيًا : শব্দটি একবচন, বহুবচন هَدَايَا অর্থ– কুরবানির জন্তু।

كَفَّارَةٌ : শব্দটি একবচন, বহুবচন كَفَّارَاتٌ অর্থ– গুনাহের কাফফারা।

www.almodina.com

অনুবাদ	আয়াত
অনুবাদ : (৯৬) তোমাদের জন্য সামুদ্রিক শিকার ধরা ও তা খাওয়া হালাল করা হয়েছে উপভোগের জন্য তোমাদের এবং মুসাফিরদের, আর স্থলচর শিকার ধরা তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে যতক্ষণ ইহরাম অবস্থায় থাক, আর আল্লাহকে ভয় কর, যাঁর সমীপে একত্রিত করা হবে।	أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ۖ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (٩٦)
(৯৭) মহা সম্মানিত গৃহ কা'বাকে আল্লাহ মানুষের কল্যাণ সুদৃঢ় থাকার উপায় নির্ধারণ করে দিয়েছেন এবং সম্মানিত মাসকেও এবং হেরেমে কুরবানির জন্তুকেও এবং সেই জীবকেও যাদের গলায় নিদর্শন আছে, তা এই জন্য যে, দৃঢ় বিশ্বাস রাখ যে, নিশ্চয় আল্লাহ আসমানসমূহ ও জমিনস্থিত সমস্ত বস্তুরই খবর রাখেন, আর নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা সর্ববিষয়ে পূর্ণ জ্ঞাত	جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِّلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلَائِدَ ۚ ذَٰلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (٩٧)
(৯৮) তোমরা জেনে রাখ, আল্লাহ কঠোর শাস্তিও প্রদানকারী এবং আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, করুণাময়ও।	اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (٩٨)
(৯৯) রাসূলের দায়িত্ব শুধু পৌছে দেওয়া মাত্র, আর আল্লাহ তা'আলা সমস্তই জানেন, যা কিছু তোমরা প্রকাশ কর এবং যা কিছু তোমরা গোপন রাখ।	مَّا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ (٩٩)

শাব্দিক অনুবাদ

(৯৬) أُحِلَّ لَكُمْ তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ সামুদ্রিক শিকার ধরা ও তা খাওয়া مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ উপভোগের জন্য তোমাদের এবং মুসাফিরদের وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ আর তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে صَيْدُ الْبَرِّ স্থলচর শিকার ধরা مَا دُمْتُمْ حُرُمًا যতক্ষণ ইহরাম অবস্থায় থাক وَاتَّقُوا اللَّهَ আর আল্লাহকে ভয় কর الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ যাঁর সমীপে একত্রিত করা হবে।

(৯৭) جَعَلَ اللَّهُ আল্লাহ নির্ধারণ করে দিয়েছেন الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ মহা সম্মানিত গৃহ কা'বাকে قِيَامًا لِّلنَّاسِ মানুষের কল্যাণ সুদৃঢ় থাকার উপায় وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ এবং সম্মানিত মাসকেও وَالْهَدْيَ এবং হেরেমে কুরবানির জন্তুকেও وَالْقَلَائِدَ এবং সেই জীবকেও যাদের গলায় নিদর্শন আছে ذَٰلِكَ তা এই জন্য যে لِتَعْلَمُوا দৃঢ় বিশ্বাস রাখ যে أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ নিশ্চয় আল্লাহ আসমানসমূহ ও জমিনস্থিত সমস্ত বস্তুরই খবর রাখেন وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ আর নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা সর্ববিষয়ে পূর্ণ জ্ঞাত

(৯৮) اعْلَمُوا তোমরা জেনে রাখ أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ আল্লাহ কঠোর শাস্তিও প্রদানকারী وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ এবং আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল رَّحِيمٌ করুণাময়ও।

(৯৯) مَّا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ রাসূলের দায়িত্ব শুধু পৌছে দেওয়া মাত্র وَاللَّهُ يَعْلَمُ আর আল্লাহ তা'আলা সমস্তই জানেন مَا تُبْدُونَ যা কিছু তোমরা প্রকাশ কর وَمَا تَكْتُمُونَ এবং যা কিছু তোমরা গোপন রাখ

www.almodina.com

অনুবাদ	আয়াত
অনুবাদ : (১০০) আপনি বলে দিন, অপবিত্র এবং পবিত্র সমান নয়, যদিও অপবিত্রের আধিক্য তোমাকে আশ্চর্যান্বিত করে, অতএব, হে জ্ঞানীগণ! আল্লাহকে ভয় করতে থাক যেন তোমরা [পূর্ণ] সফলকাম হও।	قُلْ لَّا يَسْتَوِى الْخَبِيْثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ اَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيْثِ ۚ فَاتَّقُوا اللّٰهَ يٰۤاُولِى الْاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ (١٠٠)
(১০১) হে ঈমানদারগণ! এমন সব বিষয় সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করো না যদি তা তোমাদের নিকট প্রকাশ করে দেওয়া হয়, তবে তোমাদের বিরক্তির কারণ হবে, আর যদি তোমরা কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার সময় উক্ত বিষয়সমূহ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা কর, তবে তোমাদের জন্য প্রকাশ করে দেওয়া হবে, অতীতের জিজ্ঞাসাবাদ আল্লাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন, বস্তুতঃ আল্লাহ মহা ক্ষমাশীল, অতিশয় সহিষ্ণু।	يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَسْـَٔلُوْا عَنْ اَشْيَآءَ اِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ ۚ وَاِنْ تَسْـَٔلُوْا عَنْهَا حِيْنَ يُنَزَّلُ الْقُرْاٰنُ تُبْدَ لَكُمْ ؕ عَفَا اللّٰهُ عَنْهَا ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ (١٠١)
(১০২) এরূপ বিষয় তোমাদের পূর্বে অন্যান্য লোকেরাও জিজ্ঞাসা করেছে, অতঃপর সে সমস্ত বিষয়ের হক তারা আদায় করেনি।	قَدْ سَاَلَهَا قَوْمٌ مِّنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ اَصْبَحُوْا بِهَا كٰفِرِيْنَ (١٠٢)
(১০৩) আল্লাহ না বাহীরার প্রচলন করেছেন এবং না সায়েবার এবং না অসিলার এবং না হামীর, কিন্তু যারা কাফের, তারা আল্লাহ তা'আলার প্রতি মিথ্যারোপ করে, আর অধিকাংশ কাফের [ধর্ম] জ্ঞান রাখেন না।	مَا جَعَلَ اللّٰهُ مِنْۢ بَحِيْرَةٍ وَّلَا سَآئِبَةٍ وَّلَا وَصِيْلَةٍ وَّلَا حَامٍ ۙ وَّلٰكِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ ؕ وَاَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ (١٠٣)

শাব্দিক অনুবাদ

(১০০) قُلْ আপনি বলে দিন لَا يَسْتَوِى الْخَبِيْثُ وَالطَّيِّبُ অপবিত্র এবং পবিত্র সমান নয় وَلَوْ اَعْجَبَكَ যদিও তোমাকে আশ্চর্যান্বিত করে كَثْرَةُ الْخَبِيْثِ অপবিত্রের আধিক্য فَاتَّقُوا اللّٰهَ অতএব, আল্লাহকে ভয় করতে থাক يٰۤاُولِى الْاَلْبَابِ হে জ্ঞানীগণ! لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ যেন তোমরা [পূর্ণ] সফলকাম হও।

(১০১) يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا হে ঈমানদারগণ! لَا تَسْـَٔلُوْا عَنْ اَشْيَآءَ এমন সব বিষয় সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করো না اِنْ تُبْدَ لَكُمْ যদি তোমরা তা তোমাদের নিকট প্রকাশ করে দেওয়া হয় تَسُؤْكُمْ তবে তোমাদের বিরক্তির কারণ হবে وَاِنْ تَسْـَٔلُوْا عَنْهَا আর যদি উক্ত বিষয়সমূহ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা কর حِيْنَ يُنَزَّلُ الْقُرْاٰنُ কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার সময় تُبْدَ لَكُمْ তবে তোমাদের জন্য প্রকাশ করে দেওয়া হবে عَفَا اللّٰهُ عَنْهَا অতীতের জিজ্ঞাসাবাদ আল্লাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ বস্তুতঃ আল্লাহ মহা ক্ষমাশীল حَلِيْمٌ অতিশয় সহিষ্ণু।

(১০২) قَدْ سَاَلَهَا قَوْمٌ এরূপ বিষয় অন্যান্য লোকেরাও জিজ্ঞাসা করেছে مِّنْ قَبْلِكُمْ তোমাদের পূর্বে ثُمَّ اَصْبَحُوْا بِهَا كٰفِرِيْنَ অতঃপর সে সমস্ত বিষয়ের হক তারা আদায় করেনি।

(১০৩) مَا جَعَلَ اللّٰهُ مِنْۢ بَحِيْرَةٍ আল্লাহ না বাহীরার প্রচলন করেছেন وَّلَا سَآئِبَةٍ এবং না সায়েবার وَّلَا وَصِيْلَةٍ এবং না অসিলার وَّلَا حَامٍ এবং না হামীর وَّلٰكِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا কিন্তু যারা কাফের يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ তারা আল্লাহ তা'আলার প্রতি মিথ্যারোপ করে وَاَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ আর অধিকাংশ কাফের [ধর্ম] জ্ঞান রাখেন না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(৯৬) أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** আল্লামা কালবী (র.) বলেন, মুদালাজ গোত্রের লোকেরা উপকূলীয় অঞ্চলে বসবাস করত। তারা রাসূল ﷺ কে শুষ্কমাছ সম্পর্কে জানতে চেয়ে জিজ্ঞেস করেছিল যে, যে সকল মাছ থেকে পানি শুকিয়ে যায় সে সকল মাছ সম্পর্কে বিধান রয়েছে? সে আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। –[বাহরে মুহীত : ২৫/৪]

(১০০) قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ الخ **আয়াতের শানে নুযূল– ১ :** হযরত জাবের (রা.) বর্ণনা করেন, আলোচ্য আয়াত এক মদ ব্যবসায়ী সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। সে ব্যক্তি রাসূল ﷺ কে লক্ষ্য করে বলেছিল, হে আল্লাহর রাসূল! মদ তো আমার একটি ব্যবসা ছিল, তা বেচাকেনা করে কিছু ধন সম্পদও অর্জন করেছি। সুতরাং এই সম্পদ থেকে যদি আল্লাহর পথে ব্যয় করি তাহলে কি আমার উপকারে আসবে? তখন নবী করীম ﷺ বলেন, আল্লাহ তা'আলা উত্তম মাল ছাড়া গ্রহণ করেন না তা-ই নিশ্চিত। রাসূল ﷺ-এর এ বাণীর সমর্থনে আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়েছে। –[বাহরে মুহীত : ৩০/৪]

শানে নুযূল– ২ : অপর এক বর্ণনা মতে এক লোকের জিজ্ঞাসার জবাবে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়। সে ব্যক্তি বলেছিল, হে আল্লাহর রাসূল! মদ ছিল আমার পেশা। তা বিক্রি করে কিছু ধন সম্পদও জমায়েত করেছি। সে মাল যদি আল্লাহর আনুগত্যতায় ব্যয় করি, তাহলে তা কি আমার উপকারে আসবে? রাসূল ﷺ বললেন, তুমি যদি এ মাল হজ পালন করতে অথবা জিহাদের পথে ব্যয় কর, তা একটি মাছির পাখার সম উপকারও পাবে না। কারণ আল্লাহ তা'আলা পূতঃ পবিত্র মাল ব্যতীত কবুল করেন না। রাসূল ﷺ কে জিজ্ঞেস করা এবং এর জবাবের পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়েছে। –[রূহুল মা'আনী : ৩৭/৪/৭]

(১০১) قوله يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** তিরমিযী ও দারাকুতনী হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا আয়াত যখন নাজিল হয়, তখন সাহাবায়ে কেরাম বলেছিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! তা কি প্রতি বৎসরই? রাসূল ﷺ নীরব থাকেন। অতঃপর তারা আবারও বললেন, তা কি প্রতি বৎসরই? রাসূল ﷺ বললেন, না! পরক্ষণে তিনি বলেন, আমি যদি হ্যাঁ বলতাম, তাহলে তা প্রতি বৎসরই ওয়াজিব হয়ে যেত। তখন আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[কুরতুবী : ৩০৭/৬, রূহুল মা'আনী : ৩৯/৪/৭, ফাতহুল কাদীর : ৮৩/২, ইবনে কাছীর : ১০৭/২]

শানে নুযূল– ২ : ইমাম বুখারী (র.) হযরত আনাস বিন মালিক (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূল ﷺ একদা এমন ভাষণ দেন, যে ধরনের ভাষণ আমি কখনো শুনতে পাইনি। তিনি ভাষণকালে বলেন। এ মজলিসে আমি যা জানতেছি, তোমরা যদি তা জানতে, তাহলে তোমরা নিতান্তই কম হাসতে এবং অধিক পরিমাণে কাঁদতে। রাবী বলেন, অতঃপর সাহাবায়ে কেরাম-এর চেহারা আবৃত্ত করে ফেলে। অতঃপর এক ব্যক্তি বলল, আমার পিতা কে? রাসূল ﷺ বললেন, অমুক। তখন আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়। –[ইবনে কাছীর : ১০৬/২, বাহরে মুহীত : ৩৪/৪]

- যেসব জন্তু দলিলের ভিত্তিতে ব্যতিক্রমধর্মী, সেগুলোকে ধরা এবং বধ করা হালাল। যেমন, সামুদ্রিক জন্তু শিকার দলিল এই : أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ (তোমাদের জন্য সমুদ্রের শিকার হালাল করা হয়েছে।) কিছুসংখ্যক স্থলভাগের জন্তু, যেমন, কাক, চিল, বাঘ, সাপ, বিচ্ছু, পাগলা কুকুর প্রভৃতি বধ করা হালাল। এমনিভাবে যে হিংস্র জন্তু নিজে আক্রমণ করে, সেটিকে বধ করাও হালাল। হাদীসে এগুলোর ব্যতিক্রম উল্লিখিত হয়েছে।
- যে হালাল জন্তু ইহরাম ছাড়া অবস্থায় এবং হেরেমের বাইরে শিকার করা হয়, ইহরামওয়ালা ব্যক্তির পক্ষে তা খাওয়া জায়েজ। যদি সে জন্তুকে শিকার করা ও বধ করার কাজে সে নিজে সহায়ক কিংবা পরামর্শদাতা কিংবা জন্তুর প্রতি ইঙ্গিতকারী না হয়। হাদীসে তাই বলা হয়েছে এবং আয়াতের لَا تَقْتُلُوا শব্দেও এদিকে ইঙ্গিত রয়েছে। কেননা আয়াতে لَا تَقْتُلُوا [বধ করো না।] বলা হয়েছে– لَا تَأْكُلُوا (খেয়ো না) বলা হয়নি।
- হেরেমের এলাকায় প্রাপ্ত শিকারকে জেনেশুনে বধ করলে যেমন বিনিময় ওয়াজিব হয়, তেমনিভাবে ভুলক্রমে বা অজান্তে বধ করলেও বিনিময় ওয়াজিব। –[রূহুল মা'আনী]

www.almodina.com

- প্রথমবার বধ করলে যেমন বিনিময় ওয়াজিব, এমনিভাবে দ্বিতীয়-তৃতীয়বার বধ করলেও বিনিময় ওয়াজিব।
- বিনিময়ের সারমর্ম এই যে, যে সময়ে এবং যে স্থানে জন্তুকে বধ করা হয়, উত্তম এই যে, দু'জন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি দ্বারা (একজন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি দ্বারাও জায়েজ) জন্তুর মূল্য অনুমান করাতে হবে। যদি নিহত জন্তু খাবার অযোগ্য (অর্থাৎ হারাম) হয়, তবে এর মূল্য একটি ছাগলের মূল্যের চাইতে বেশি ওয়াজিব হবে না। আর যদি জন্তুটি খাবারযোগ্য (অর্থাৎ হালাল) হয়, তবে যে পরিমাণ মূল্য অনুমান করা হবে, তাই ওয়াজিব হবে। উভয় অবস্থায় পরবর্তীতে তিনটি কাজের মধ্য থেকে সে যেকোনো একটি করতে পারে। হয় এ মূল্যের দ্বারা কুরবানির শর্তানুযায়ী কোনো জন্তু ক্রয় করে হেরেমের সীমানার ভিতরে তা জবাই করে মাংস ফকিরদের মধ্যে বণ্টন করে দিবে, না হয় এর মূল্যের সমপরিমাণ খাদ্যশস্য ফেতরার শর্তানুযায়ী প্রতি মিসকিনকে অর্ধ সা' হিসেবে দান করে দিবে এবং না হয় সে খাদ্যশস্য অর্ধ সা' হিসেবে যত জনকে দেওয়া যেত তত সংখ্যক রোজা রাখবে। খাদ্যশস্য বণ্টন এবং রোজা রাখা হেরেমের ভিতরে হওয়া শর্ত নয়। যদি অনুমানকৃত মূল্য অর্ধ সা' থেকেও কম হয়, তবে ইচ্ছা করলে তা একজন ফকিরকে দিয়ে দিতে পারবে কিংবা ইচ্ছা করলে একটি রোজা রাখতে পাবে। এমনিভাবে প্রতি মিসকিনকে অর্ধ সা' হিসেবে দেওয়ার পর যদি অর্ধ সা' থেকে কম অবশিষ্ট থাকে, তবুও ইচ্ছা করলে তা এক মিসকিনকে দিয়ে দিবে কিংবা ইচ্ছা করলে একটি রোজা রাখবে। আমাদের দেশে প্রচলিত ওজন অনুযায়ী অর্ধ সা' পৌনে দুই সেরের সমান।
- উল্লিখিত অনুমানে যতজন মিসকিনের অংশ সাব্যস্ত হয়, যদি তাদেরকে দু'বেলা পেট ভরে আহার করিয়ে দেয়, তবে তাও জায়েজ।
- যদি এ মূল্য দিয়ে জবাই করার জন্য জন্তু ক্রয় করার পর কিছু টাকা উদ্বৃত্ত হয়, তবে উদ্বৃত্ত টাকা দিয়ে ইচ্ছা করলে অন্য জন্তু ক্রয় করতে পারবে কিংবা খাদ্যশস্য ক্রয় করতে পারবে কিংবা খাদ্যশস্যের হিসেবে রোজা রাখতে পারবে। জন্তু বধ যেমন বিনিময় ওয়াজিব হয়, তেমনিভাবে জন্তুকে আহত করলেও অনুমান করাতে হবে যে, এ আঘাতের ফলে জন্তুটির কতটুকু মূল্য হ্রাস পেয়েছে। অতঃপর হ্রাসপ্রাপ্ত মূল্য দিয়ে পূর্বোক্ত তিনটি কাজের যে কোনো একটি কাজ করা জায়েজ হবে।
- এহরাম বাঁধা ব্যক্তির পক্ষে যে জন্তু শিকার করা হারাম সেই জন্তুকে জবাই করাও হারাম। তার জবাইকৃত জীবটি মৃত বলে গণ্য হবে। لَا تَقْتُلُوْا বাক্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, ইহরাম বাঁধা ব্যক্তির পক্ষে জবাই করা বধ করারই অনুরূপ।
- যদি কোনো অনাবাদী জায়গায় জন্তু বধ করা হয়, তবে নিকটতম জনবসতির বাজার দর হিসেবে মূল্য অনুমান করতে হবে।
- শিকার কাজের জন্য ইঙ্গিত-ইশারা করা, বলে দেওয়া এবং সাহায্য করাও শিকার করার মতোই হারাম।

শান্তির চারটি উপায় : প্রথম আয়াতে আল্লাহ তা'আলা চারটি বস্তুকে মানুষের প্রতিষ্ঠা, স্থায়িত্ব ও শান্তির কারণ বলে উল্লেখ করেছেন।

প্রথমতঃ কা'বা। আরবি ভাষায় কা'বা চতুষ্কোণবিশিষ্ট গৃহকে বলা হয়। আরবে খাছ আম গোত্রের নির্মিত অপর একটি গৃহও এ নামে খ্যাত ছিল। সে গৃহকে কা'বা এমানিয়্যাহ' বলা হতো। তাই বায়তুল্লাহকে সে কা'বা থেকে স্বতন্ত্র করে বুঝাবার জন্য কা'বা শব্দের সাথে اَلْبَيْتَ الْحَرَامَ শব্দ যোগ করা হয়েছে।

قِيَامٌ ও قِوَامٌ শব্দটি اِسْمِ مَصْدَرْ এর অর্থ ঐ সব বস্তু, যার উপর কোনো বস্তুর স্থায়িত্ব নির্ভরশীল। তাই قِيٰمًا لِّلنَّاسِ -এর অর্থ হবে এই যে, কা'বা ও তৎসম্পর্কিত বস্তুসমূহ মানুষের প্রতিষ্ঠা ও স্থায়িত্বের কারণ এবং উপায়।

نَاسِ শব্দের অর্থ সাধারণ মানুষ। এক্ষেত্রে স্থানের ইঙ্গিতে বিশেষভাবে মক্কার লোকজন কিংবা আরববাসী কিংবা সমগ্র বিশ্বের মানুষকেও বুঝা যেতে পারে। বাহ্যত সমগ্র বিশ্বের মানুষই এর অন্তর্ভুক্ত। তবে মক্কা ও আরববাসীদের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। কাজেই আয়াতের মর্ম এই যে, আলাহ তা'আল কা'বা তথা বায়তুল্লাহকে এবং পরবর্তীতে উল্লিখিত আরো কতিপয় বস্তুকে সমগ্র বিশ্ব-মানবের জন্য শান্তি ও স্থিতিশীলতার উপায় করে দিয়েছেন। যতদিন পর্যন্ত জগতের প্রতিটি দেশ ও অঞ্চলের মানুষ বায়তুল্লাহর দিকে মুখ করে নামাজ আদায় করতে থাকবে এবং হজ্বব্রত পালন করতে থাকবে, অর্থাৎ যাদের উপর হজ ফরজ, তারা হজ করতে থাকবে, ততদিন পর্যন্ত সমগ্র বিশ্ব প্রতিষ্ঠিত ও সংরক্ষিত থাকবে। পক্ষান্তরে যদি এক বছরকালও কেউ হজ্বব্রত পালন না করে কিংবা বায়তুল্লাহর দিকে মুখ করে কেউ নামাজ আদায় না করে, তবে সমগ্র বিশ্বে ব্যাপক আজাব নেমে আসবে।

www.almodina.com

কা'বা সমগ্র বিশ্বের স্তম্ভ : এ বিষয়বস্তুটি তাফসীরবিদ হযরত আতা (র.) এভাবে বর্ণনা করেছেন : لَوْ تَرَكُوهُ عَامًا وَاحِدًا لَمْ يُنْظَرُوا وَلَمْ يُؤَخَّرُوا (بحر محيط) এতে বুঝা গেল যে, তাৎপর্যগত ভাবে খানায়ে কা'বা বিশ্বের স্তম্ভ। যতদিন এর দিকে মুখ করা হবে এবং হজ পালিত হতে থাকবে, ততদিনই জগত প্রতিষ্ঠিত থাকবে। যদি কোনো সময় বায়তুল্লাহর এ সম্মান বিলুপ্ত হয়ে যায়, তবে বিশ্বকেও বিলীন করে দেওয়া হবে। বিশ্বের ব্যবস্থাপনা ও বায়তুল্লাহর মাঝে যে যোগসূত্র রয়েছে তার স্বরূপ জানা জরুরি নয়। যেমন, চুম্বক লোহা এবং বিশেষ প্রকারের আঠা ও খড়-কুটোর পারস্পরিক সম্পর্কের স্বরূপ কেউ জানে না। কিন্তু এটি এমন একটি বাস্তব সত্য, যা চোখেই দেখা যায় কেউ একে অস্বীকার করতে পারে না। বায়তুল্লাহর ও বিশ্ব-ব্যবস্থাপনায় পারস্পরিক সম্পর্কের স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করা মানুষের সাধ্যাতীত। বিশ্ব-স্রষ্টার বর্ণনার মাধ্যমেই তা জানা যায়। বায়তুল্লাহর সমগ্র বিশ্বের স্থায়িত্বের কারণ হওয়া এটি তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়। বাহ্যিক দৃষ্টি তা অনুভব করতে পারে না, কিন্তু আরব ও মক্কাবাসীদের জন্য এটি যে শান্তি ও নিরাপত্তার কারণ, তা দীর্ঘ অভিজ্ঞতা ও চাক্ষুষ জ্ঞান দ্বারা প্রমাণিত।

বায়তুল্লাহর অস্তিত্ব বিশ্ব-শান্তির কারণ : সাধারণতঃ বিশ্বে রাষ্ট্রীয় আইন প্রয়োগের মাধ্যমে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা হয়। এসব কারণে ডাকাত চোর, হত্যা ও লুণ্ঠনকারীরা দুঃসাহস করতে পারে না। কিন্তু জাহেলিয়াত যুগের আরবে কোনো নিয়মতান্ত্রিক রাষ্ট্র কিংবা জন-নিরাপত্তার জন্য কোনো নিয়মিত আইনও প্রচলিত ছিল না। গোত্রীয় কাঠামোতেই রাজনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত ছিল। এক গোত্র অন্য গোত্রের জান-মাল ও মান-সম্ভ্রমের উপর যখন ইচ্ছা আক্রমণ করতে পারত। কাজেই কোনো গোত্রের পক্ষে কখনো শান্তি ও নিরাপত্তার সুযোগ ছিল না। আল্লাহ তা'আলার স্বীয় পরিপূর্ণ কুদরতের বলে মক্কার বায়তুল্লাহকে রাষ্ট্রের স্থলাভিষিক্ত করে শান্তির উপায় করে দেন। রাষ্ট্রীয় আইনের বিরুদ্ধাচরণ করার মতো ধৃষ্টতা যেমন, কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তি করতে পারে না, বায়তুল্লাহ শরীফের মর্যাদা ক্ষুণ্ন করার সাহসও তেমনিভাবে কেউ করতে পারত না। আল্লাহ তা'আলা জাহেলিয়াত যুগে বায়তুল্লাহ শরীফের সম্মান ও মাহাত্ম্য সাধারণ মানুষের অন্তরে এমনভাবে সংস্থাপিত করে দেন যে, তারা এর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য যাবতীয় ভাবাবেগ ও প্রবৃত্তিকে বর্জন করতেও কুণ্ঠিত হতো না।

সে যুগের আরবদের রণোন্মাদনা ও গোত্রগত বিদ্বেষ সারা বিশ্বে প্রবাদবাক্যের মতো খ্যাত ছিল। আল্লাহ তাদের অন্তরে বায়তুল্লাহ ও তার আনুষঙ্গিক বস্তুসামগ্রীর সম্মান ও মাহাত্ম্য এমনভাবে বদ্ধমূল করে দিয়েছিলেন যে, প্রাণের ঘোরতর শত্রু কিংবা কঠোরতম অপরাধীও যদি একবার হেরেম শরীফের সীমানায় আশ্রয় নিতে পারত, তবে তার সাত খুন মাফ হয়ে যেত। তারা তীব্র দুঃখ ও ক্রোধ সত্ত্বেও তাকে কিছুই বলত না। হেরেমের অভ্যন্তরে পিতৃহন্তাকে চোখের সামনে দেখেও তারা চক্ষু নত করে চলে যেত।

এমনিভাবে যে ব্যক্তি হজ ও ওমরার নিয়তে বাড়ি থেকে বের হতো কিংবা যে জন্তু হেরেম শরীফে কুরবানির জন্য আনা হতো, তার প্রতিও আরবরা সম্মান প্রদর্শন করত এবং কোনো অতি মন্দ ব্যক্তিও এর ক্ষতি করত না। হজ ও ওমরার কোনো লক্ষণ কিংবা কণ্ঠাভরণ বাধা অবস্থায় কোনো প্রাণের শত্রুকেও তারা কিছুই বলত না।

ষষ্ঠ হিজরিতে রাসূলুল্লাহ ﷺ একদল সাহাবায়ে কেরামকে সাথে করে ওমরার ইহরাম বেঁধে বায়তুল্লাহর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। হেরেম শরীফের সীমানার সন্নিকটে হুদায়বিয়া নামক স্থানে তিনি যাত্রাবিরতি করেন এবং হযরত হযরত উসমান (রা)–কে কয়েকজন সঙ্গীসহ মক্কায় পাঠিয়ে দেন, যাতে তাঁরা মক্কার সর্দারদেরকে বলে দেন যে, মুসলমানরা যুদ্ধের নিয়তে নয়– ওমরা আদায় করার জন্য এসেছেন। কাজেই তাদের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা উচিত হবে না।

মোটকথা, জাহেলিয়াত যুগে আল্লাহ তা'আলা আরবদের মনে হারাম শরীফের সম্মান প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। ফলে শান্তি ও নিরাপত্তা অব্যাহত ছিল; এ সম্মানের ফলশ্রুতিতে শুধু হারাম শরীফের ভিতরে যাতায়াতকারী লোকজন এবং বিশেষ চিহ্ন পরিহিত অবস্থায় হজ ও ওমরার জন্য আগমনকারীরা নিরাপদ হয়ে যেত বটে, কিন্তু বর্হিবিশ্বের লোকজন এ দ্বারা কোনো উপকার, শান্তি ও নিরাপত্তা অর্জন করতে পারত না। কিন্তু আরবে যেভাবে বায়তুল্লাহ ও হেরেম শরীফের সম্মান ব্যাপকভাবে প্রতিপালিত হতো, তেমনিভাবে হজের মাসগুলোর প্রতিও বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করা হতো। আরবরা এ মাসগুলোকে 'আশহুরে হুরুম' বা সম্মানিত মাস বলত। কেউ কেউ এগুলোর সাথে রজব মাসকেও অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছিল। এসব মাসে হেরেমের বাইরে যুদ্ধ-বিগ্রহ করাকেও আরবরা হারাম মনে করত এবং এ থেকে সযত্নে বেঁচে থাকত।

www.almodina.com

এ কারণে কুরআন পাক মানুষের স্থায়িত্বের উপায় হিসেবে কা'বার সাথে আরো তিনটি বস্তুর উল্লেখ করেছে; প্রথমতঃ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ অর্থাৎ, সম্মান ও মহত্ত্বের মাস। এখানে شَهْر শব্দটি একবচনে ব্যবহৃত হওয়া সাধারণ তাফসীরবিদগণ বলেছেন যে, এখানে شَهْر حَرَامٌ বলে জিলহজ মাসকে বুঝানো হয়েছে। এ মাসেই হজের ক্রিয়াকর্ম সম্পন্ন হয়। আবার কেউ কেউ বলেছেন যে, শব্দটি একবচন হলেও অর্থের দিক দিয়ে جِنْس হওয়ার কারণে অন্যান্য সম্মানিত মাসও এর অন্তর্ভুক্ত।

দ্বিতীয় বস্তু হচ্ছে هَدْى হারাম শরীফে যে জন্তুকে কুরবানি করা হয়, তাকে هَدْى বলা হয়। যে ব্যক্তির সাথে এরূপ জন্তু থাকত, সে নির্বিবাদে পথ চলতে পারত; তাকে কেউ কিছু বলত না। এভাবে কুরবানির জন্তুও ছিল শান্তি ও নিরাপত্তার অন্যতম উপায়।

তৃতীয় বস্তু قَلَائِدْ এটি قِلَادَةٌ শব্দের বহুবচন। এর অর্থ, গলার হার। জাহেলিয়াত যুগের আরবের প্রথা প্রচলিত ছিল যে, কেউ হজের উদ্দেশ্যে বের হলে চিহ্নস্বরূপ গলায় একটি হার পরে নিত– যাতে একে দেখে সবাই বুঝতে পারে যে, লোকটি হজ করতে যাচ্ছে, ফলে কেউ যেন তাকে কোনো কষ্ট না দেয়। কুরবানির জন্তুর গলায়ও এ ধরনের হার পরিয়ে দেওয়া হতো। এসব হারকেও قَلَائِدْ বলা হয়। এ কারণে قَلَائِدْ ও শান্তি প্রতিষ্ঠার অন্যতম উপায় হয়ে যায়।

চিন্তা করলে বুঝা যাবে যে, সম্মানিত মাসসমূহ, কুরবানির জন্তু এবং গলার হার এ তিনটি বস্তুই বায়তুল্লাহর সাথে সম্পর্কযুক্ত। এদের সম্মানও বায়তুল্লাহর সম্মানেরই একেকটি অংশ। সারকথা এই যে বায়তুল্লাহ ও তৎসম্পর্কিত বস্তুসমূহকে আল্লাহ তা'আলা সমগ্র বিশ্বমানবের জন্য সাধারণভাবে এবং আরব ও মক্কাবাসীদের জন্য বিশেষভাবে স্থায়িত্বের উপায় করে দিয়েছেন।

قِيٰمًا لِّلنَّاسِ এর ব্যাখ্যায় কোনো কোনো তাফসীরবিদ বলেছেন, এর অর্থ এই যে, বায়তুল্লাহ ও হেরেমকে সবার জন্য শান্তির আবাসস্থল করা হয়েছে। কেউ বলেছেন, এর অর্থ হচ্ছে মক্কাবাসীদের জন্য রুজি রোজগারের সুবিধা দান। কেননা এখানে কোনো কিছু উৎপন্ন হয় না। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা সারা বিশ্বের জিনিসপত্র এখানে পৌঁছিয়ে দেন।

কেউ বলেন, মক্কাবাসীরা যেহেতু কা'বা গৃহের খাদেম ও সংরক্ষক বলে পরিচিত ছিল, তাই তাদেরকে আল্লাহভক্ত মনে করে সর্বদা মানুষ তাদের সম্মান করত। قِيٰمًا لِّلنَّاسِ বাক্যে তাদের এ বিশেষ সম্মানকেই বুঝানো হয়েছে।

ইমাম আব্দুল্লাহ রাযী (র.) বলেন, এসব উক্তির মধ্যে কোনোরূপ বৈপরীত্য নেই। এসবগুলোই উপরিউক্ত বাক্যের উদ্দেশ্য হতে পারে। কেননা আল্লাহ তা'আলা বায়তুল্লাহকে সব মানুষের স্থায়িত্ব, ইহকাল ও পরকালের মঙ্গল ও সাফল্যের উপায় করেছেন এবং আরব ও মক্কাবাসীদেরকে বিশেষভাবে এর বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ মঙ্গল ও বরকত দ্বারা ভূষিত করেছেন।

আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে : ذٰلِكَ لِتَعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَاَنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ

অর্থাৎ আমি বায়তুল্লাহ ও তৎসম্পর্কিত বস্তুসমূহকে মানুষের জন্য স্থায়িত্ব, শান্তি ও নিরাপত্তার উপায় করেছি। আরববাসীরা বিশেষভাবে এ বিষয়টি প্রত্যক্ষ করে। এটা এজন্য বলা হয়েছে যাতে সবাই জেনে নেয় যে, আল্লাহ তা'আলা ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডলের যাবতীয় বিষয় যথাযথভাবে জানেন এবং তিনিই এর ব্যবস্থাপনা পরিচালনা করতে পারেন।

দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে : اِعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ وَاَنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

অর্থাৎ জেনো, আল্লাহ তা'আলা কঠোর শাস্তিদাতা এবং আল্লাহ তা'আলা অত্যন্ত ক্ষমাশীল, করুণাময়। এতে বলা হয়েছে যে, হালাল ও হারামের যেসব বিধান দেওয়া হয়েছে, তা অত্যন্ত উপযোগী। এগুলো পালন করার মাধ্যে তোমাদের মঙ্গল নিহিত। পক্ষান্তরে এগুলোর বিরুদ্ধাচরণ করা কঠোর শাস্তির কারণ। সাথে সাথে একথাও বলে দেওয়া হয়েছে যে, মানবীয় ভুলভ্রান্তি ও ঔদাসীন্যের কারণে কোনো গুনাহ হয়ে গেলে আল্লাহ তা'আলা তৎক্ষণাৎ শাস্তি দেন না; বরং তওবাকারী-অনুতপ্ত লোকদের জন্য ক্ষমার দ্বারও উন্মুক্ত রাখেন।

তৃতীয় আয়াতে বলা হয়েছে : مَا عَلَى الرَّسُوْلِ اِلَّا الْبَلٰغُ ۚ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ وَمَا تَكْتُمُوْنَ

অর্থাৎ আমার রাসূলের দায়িত্ব এতটুকুই যে, তিনি আমার নির্দেশাবলি মানুষের কাছে পৌঁছে দিবেন। এরপর তা মানা না মানার লাভ ও ক্ষতি তারাই ভোগ করবে; তারা না মানলে আমার রাসূলের কোনোই ক্ষতি নেই। এ কথাও জেনো যে, আল্লাহ তা'আলাকে ধোঁকা দেওয়া যাবে না। তিনি তোমাদের প্রকাশ্য ও গোপন সব কাজ সম্পর্কে ওয়াকিফহাল।

চতুর্থ আয়াতে বলা হয়েছে : قُلْ لَّا يَسْتَوِي الْخَبِيْثُ وَالطَّيِّبُ

আরবি ভাষায় خَبِيْثٌ ও طَيِّبٌ দু'টি বিপরীত শব্দ। প্রত্যেক উৎকৃষ্ট বস্তুকে طَيِّبٌ এবং প্রত্যেক নিকৃষ্ট বস্তুকে خَبِيْثٌ বলা হয়। আয়াতে অধিকাংশ তাফসীরবিদদের মতে خَبِيْثٌ শব্দ দ্বারা হারাম ও অপবিত্র এবং طَيِّبٌ শব্দ দ্বারা হালাল ও পবিত্র বস্তুকে বুঝানো হয়েছে। অতএব, আয়াতের অর্থ এই যে, আল্লাহ তা'আলার দৃষ্টিতে বরং প্রত্যেক সুস্থ বুদ্ধি সম্পন্ন লোকের দৃষ্টিতেও পবিত্র ও অপবিত্র এবং হালাল ও হারাম সমান হতে পারে না।

এক্ষেত্রে خَبِيْثٌ ও طَيِّبٌ শব্দ দু'টি স্বীয় ব্যাপকতার দিক দিয়ে হালাল ও হারাম অর্থ– সম্পদ, উত্তম ও অধম মানুষ এবং ভালো ও মন্দ কাজকর্ম ও চরিত্রকে অন্তর্ভুক্ত করেছে। আয়াতের সুস্পষ্ট অর্থ এই যে, কোনো সুস্থ বিবেকবানের দৃষ্টিতে সৎ ও অসৎ এবং ভালো ও মন্দ সমান নয়। এ স্বাভাবিক নিয়ম অনুযায়ী আল্লাহ তা'আলার কাছে হালাল ও হারাম কিংবা পবিত্র ও অপবিত্র বস্তু সমান নয়। এমনভিাবে ভালো ও মন্দ কাজ-কর্ম ও চরিত্র এবং সৎ ও অসৎ লোকও সমান নয়।

অতঃপর বলা হয়েছে : وَلَوْ اَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيْثِ অর্থাৎ যদিও মাঝে মাঝে মন্দ ও অনুৎকৃষ্ট বস্তুর প্রাচুর্য দর্শকদেরকে বিস্মিত করে দেয় এবং আশ-পাশে মন্দ ও অপবিত্র বস্তুর ব্যাপক প্রসারের কারণে সেগুলোকেই ভালো মনে করতে থাকে, কিন্তু আসলে এটি মানুষের অবচেতন মনের একটি রোগ এবং অনুভূতির ক্রটি বিশেষ।

অনাবশ্যক প্রশ্ন করা নিষিদ্ধ : আলোচ্য আয়াতসমূহে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, কিছু সংখ্যক লোক ইলাহী বিধি-বিধানে অনাবশ্যক চুলচেড়া ঘাঁটাঘাঁটি করতে আগ্রহী হয়ে থাকে এবং যেসব বিধান দেওয়া হয়নি, সেগুলো নিয়ে বিনা প্রয়োজনে প্রশ্নের উপর প্রশ্ন তুলতে থাকে। আয়াতে তাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, তারা যেন এরূপ প্রশ্ন না করে, যার ফলশ্রুতিতে তারা কষ্টে নিপতিত হবে কিংবা গোপন রহস্য ফাঁস হওয়ার কারণে অপমানিত ও লাঞ্ছিত হবে।

মহানবী ﷺ-এর পর নবুয়ত ও ওহী আগমনের সমাপ্তি : এ আয়াতে একটি প্রাসঙ্গিক বাক্যে বলা হয়েছে : وَاِنْ تَسْئَلُوْا عَنْهَا حِيْنَ يُنَزَّلُ الْقُرْاٰنُ تُبْدَ لَكُمْ অর্থাৎ কুরআন অবতরণকালে যদি তোমরা এরূপ প্রশ্ন কর, তবে ওহীর মাধ্যমে উত্তর এসে যাবে। এতে 'কুরআন অবতরণকালে' বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, কুরআন অবতরণ সমাপ্ত হলে নবুয়ত ও ওহীর আগমনও বন্ধ করে দেওয়া হবে।

নবুয়তের আগমন খতম হয়ে যাওয়া ও ওহীর আগমন বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর এ ধরনের প্রশ্নের ফলে যদিও নতুন কোনো বিধান আসবে না এবং যা ফরজ নয়, তা ফরজ হবে না কিংবা ওহীর মাধ্যমে কারো গোপন তথ্য ফাঁস হয়ে যাবে না, তথাপি অনাবশ্যক প্রশ্ন তৈরি করে সেগুলোর তথ্যানুসন্ধানে ব্যাপৃত হওয়া কিংবা অপ্রয়োজনীয় বিষয় নিয়ে প্রশ্ন করা নবুয়ত বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরও নিন্দনীয় ও নিষিদ্ধই থাকবে। কেননা এতে করে নিজের ও অপরের সময় নষ্ট করা হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : مِنْ حُسْنِ اِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيْهِ অর্থাৎ মুসলমান হওয়ার একটি সৌন্দর্য এই যে, মুসলমান ব্যক্তি অনর্থক বিষয়াদি পরিত্যাগ করে। আজকাল অনেক মুসলমান অনর্থক বিয়াদির তথ্যানুসন্ধানে ব্যাপৃত থাকে । হযরত মূসা (আ.)-এর মায়ের নাম কি ছিল, হযরত নূহ (আ.)-এর নৌকার দৈর্ঘ্য প্রস্থ কি ছিল, ইত্যাকার প্রশ্নের কোনো সম্পর্ক মানুষের কর্মের সাথে নেই। উপরিউক্ত হাদীস থেকে জানা গেল যে, এ জাতীয় প্রশ্ন করা নিন্দনীয়, বিশেষ করে যখন এ কথাও জানা যায় যে, এরূপ প্রশ্নকারীরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে জরুরি ও গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় মাসআলা সম্পর্কেই অজ্ঞ থাকে। অনর্থক কাজে ব্যাপৃত হওয়ার ফলে মানুষ জরুরি কাজ থেকে বঞ্চিত থাকে। অতীতে ফিকহবিদ আলেমগণ মাসআলা-মাসায়েলের অনেক কাল্পনিক দিক বের করে এবং বিভিন্ন প্রশ্ন তৈরি করে শরিয়তের বিধান বর্ণনা করেছেন। পরবর্তী ঘটনাবলি থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য এগুলো জরুরি ছিল। তাই এসব প্রশ্ন অনর্থক ও অনাবশ্যক ছিল না। ইসলামের অন্যতম শিক্ষা এই যে, কোনো দীনি কিংবা জাগতিক উপকার লক্ষ্য না হলে যে কোনো জ্ঞানানুশীলন, কর্ম অথবা কথায় ব্যাপৃত হওয়া উচিত নয়।

বহিরা, সায়েবা ইত্যাদির সংজ্ঞা : 'বহিরা' 'সায়েবা' 'ওছিলা' 'হামী' প্রভৃতি সবই জাহেলিয়াত যুগের কুপ্রথা ও কুসংস্কারের সাথে সম্পর্কযুক্ত বিষয়। এগুলোর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তাফসীরবিদদের মধ্যে বিস্তর মতভেদ রয়েছে। তবে আলোচ্য শব্দগুলোর মধ্যে প্রত্যেকটি বিভিন্ন প্রকারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হওয়া সম্ভবপর। আমরা সহীহ বুখারী থেকে সা'ঈদ ইবনে মুসাইয়্যেবের ব্যাখ্যা উদ্ধৃতি করছি।

'বহিরা' এমন জন্তুকে বলা হয় যার দুধ প্রতিমার নামে উৎসর্গ করা হতো এবং কেউ নিজের কাজে ব্যবহার করত না।

'সায়েবা' ঐ জন্তু, যাকে প্রতিমার নামে আমাদের দেশে ষাঁড়ের নামে ছেড়ে দেওয়া হতো।

www.almodina.com

'হামী' পুরুষ উট, যে বিশেষ সংখ্যক রমণ ক্রিয়া সমাপ্ত করে। এরূপ উটকেও প্রতিমার নামে ছেড়ে দেওয়া হতো। 'ওছিলা' যে উষ্ট্রী উপর্যুপরি মাদী বাচ্চা প্রসব করে। জাহিলি যুগে এরূপ উষ্ট্রীকেও প্রতিমার নামে ছেড়ে দেওয়া হতো। এসব শিরকের নিদর্শনাবলি তো ছিলই; তদুপরি যে জন্তুর মাংস, দুধ ইত্যাদি দ্বারা উপকৃত হওয়া আল্লাহর আইনে বৈধ, নিজেদের পক্ষ থেকে শর্তাদি আরোপ করে সে জন্তুকে হালাল ও হারাম করার অধিকার তারা কোথায় পেল? মনে হয়, তারা শরিয়ত প্রণেতার পদে নিজেরাই আসীন হয়ে গিয়েছিল। আরো অবিচার এই যে নিজেদের এসব মুশরিকসুলভ কুপ্রথাকে তারা আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি ও নৈকট্যের উপায় বলে মনে করত। এর উত্তরে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা কখনো এসব প্রথা নির্ধারণ করেননি; বরং তাদের বড়রা আল্লাহর প্রতি এর অপবাদ আরোপ করেছে এবং অধিকাংশ নির্বোধ জনগণ একে গ্রহণ করে নিয়েছে। মোটকথা, এখানে হুঁশিয়ার করা হয়েছে যে, অনর্থক প্রশ্ন করে শরিয়তের বিধানে সংকীর্ণতা ও কঠোরতা সৃষ্টি করা যেমন অপরাধ, তেমনি শরিয়ত প্রণেতার নির্দেশ ছাড়া স্বীয় অভিমত ও প্রবৃত্তি দ্বারা হালাল-হারাম নির্ধারণ করা আরো বড় অপরাধ।

শাব্দিক অনুবাদ

دُمْتُمْ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلدَّوَامُ মূলবর্ণ (د ـ و ـ م) জিনস اجوف واوى অর্থ– তোমরা ছিলে।

تُبْدَ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ مضارع مجهول বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِبْدَاءُ মূলবর্ণ (ب ـ د ـ ء) জিনস ناقص واوى অর্থ– তাকে প্রকাশ করে দেওয়া হবে।

تَسُؤْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلسَّوْءُ মূলবর্ণ (س ـ و ـ ء) জিনস মুরাক্কাব اجوف واوى و مهموز لام অর্থ– তা খারাপ লাগে।

بَحِيْرَةٌ : শব্দটি একবচন, বহুবচন بَحَائِرُ অর্থ– দেবতার নামে সম্পর্কিত, কেউ পান করে না। কানকাটা জন্তু।

سَائِبَةٌ : শব্দটি একবচন, বহুবচন سَوَائِبُ অর্থ– যে উটনীকে দশটি মাদী বাচ্চা পাওয়ার পর দেবতার নামে উৎসর্গ করা হতো।

وَصِيْلَةٌ : শব্দটি একবচন, বহুবচন وَصَائِلُ অর্থ– যে মিলিয়ে নেয়। যে উটনী পর পর দুটি মাদী বাচ্চা প্রসব করে।

حَامٍ : শব্দটি একবচন, বহুবচন حَوَامِىْ অর্থ– যে উট দশটি বাচ্চা প্রজনন দেওয়ার পর অক্ষম হয়ে গেছে। যাকে দেবতার নামে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। এর উপর বোঝা বহন বা আরোহণ করা হয় না।

www.almodina.com

وَاِذَا قِيۡلَ لَهُمۡ تَعَالَوۡا اِلٰى مَاۤ اَنۡزَلَ اللّٰهُ وَاِلَى الرَّسُوۡلِ قَالُوۡا حَسۡبُنَا مَا وَجَدۡنَا عَلَيۡهِ اٰبَآءَنَا ؕ اَوَلَوۡ كَانَ اٰبَآؤُهُمۡ لَا يَعۡلَمُوۡنَ شَيۡـًٔا وَّلَا يَهۡتَدُوۡنَ (١٠٤)

অনুবাদ : (১০৪) আর যখন তাদেরকে বলা হয় যে, আস আল্লাহর অবতারিত বিধানসমূহের দিকে এবং তাঁর রাসূলের দিকে, তখন তারা বলে, আমাদের জন্য তাই যথেষ্ট যাতে নিজেদের পূর্বপুরুষদেরকে পেয়েছি [তা তাদের জন্য যথেষ্ট হবে?] যদিও তাদের পূর্বপুরুষগণ না কোনো জ্ঞান রাখত, আর না হেদায়েতপ্রাপ্ত ছিল।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا عَلَيۡكُمۡ اَنۡفُسَكُمۡ ۚ لَا يَضُرُّكُمۡ مَّنۡ ضَلَّ اِذَا اهۡتَدَيۡتُمۡ ؕ اِلَى اللّٰهِ مَرۡجِعُكُمۡ جَمِيۡعًا فَيُنَبِّئُكُمۡ بِمَا كُنۡتُمۡ تَعۡمَلُوۡنَ (١٠٥)

(১০৫) হে ঈমানদারগণ! নিজেদের [সংশোধন করার] চিন্তা কর, যখন তোমরা [দীনের] পথে চলছ, অতঃপর যে পথভ্রষ্ট হয় তাতে তোমাদের কোনো ক্ষতি নেই, আল্লাহরই সমীপে তোমাদের সকলকে প্রত্যাবর্তিত হতে হবে, অতঃপর তিনি তোমাদেরকে জানিয়ে দিবেন, যা কিছু তোমরা করছিলে।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا شَهَادَةُ بَيۡنِكُمۡ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الۡمَوۡتُ حِيۡنَ الۡوَصِيَّةِ اثۡنٰنِ ذَوَا عَدۡلٍ مِّنۡكُمۡ اَوۡ اٰخَرٰنِ مِنۡ غَيۡرِكُمۡ اِنۡ اَنۡتُمۡ ضَرَبۡتُمۡ فِى الۡاَرۡضِ

(১০৬) হে ঈমানদারগণ! তোমাদের পরস্পরের [বিষয়াদির] মধ্যে দুই জন লোক ওছী থাকা সঙ্গত যখন তোমাদের মধ্যে কারোও মৃত্যু আসন্ন হয় [অর্থাৎ] অসিয়ত করার সময়, [এবং] এই দুই ব্যক্তি এরূপ যে, দীনদার এবং তোমাদের মধ্য হতে হতে অথবা ভিন্ন সম্প্রদ্রায় হতে দু'জন হবে যদি তোমরা সফরে থাক,

শাব্দিক অনুবাদ

(১০৪) وَاِذَا قِيۡلَ لَهُمۡ আর যখন তাদেরকে বলা হয় যে تَعَالَوۡا আস اِلٰى مَاۤ اَنۡزَلَ اللّٰهُ আল্লাহর অবতারিত বিধানসমূহের দিকে وَاِلَى الرَّسُوۡلِ এবং তাঁর রাসূলের দিকে قَالُوۡا তখন তারা বলে حَسۡبُنَا مَا وَجَدۡنَا عَلَيۡهِ اٰبَآءَنَا আমাদের জন্য তাই যথেষ্ট যাতে নিজেদের পূর্বপুরুষদেরকে পেয়েছি اَوَلَوۡ كَانَ اٰبَآؤُهُمۡ যদিও তাদের পূর্বপুরুষগণ لَا يَعۡلَمُوۡنَ شَيۡـًٔا وَّلَا يَهۡتَدُوۡنَ না কোনো জ্ঞান রাখত, আর না হেদায়েতপ্রাপ্ত ছিল।

(১০৫) يٰۤاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا হে ঈমানদারগণ! عَلَيۡكُمۡ اَنۡفُسَكُمۡ নিজেদের [সংশোধন করার] চিন্তা কর لَا يَضُرُّكُمۡ مَّنۡ ضَلَّ অতঃপর যে পথভ্রষ্ট হয় তাতে তোমাদের কোনো ক্ষতি নেই اِذَا اهۡتَدَيۡتُمۡ যখন তোমরা [দীনের] পথে চলছ اِلَى اللّٰهِ مَرۡجِعُكُمۡ جَمِيۡعًا আল্লাহরই সমীপে তোমাদের সকলকে প্রত্যাবর্তিত হতে হবে فَيُنَبِّئُكُمۡ অতঃপর তিনি তোমাদেরকে জানিয়ে দিবেন بِمَا كُنۡتُمۡ تَعۡمَلُوۡنَ যা কিছু তোমরা করছিলে।

(১০৬) يٰۤاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا হে ঈমানদারগণ! شَهَادَةُ بَيۡنِكُمۡ তোমাদের পরস্পরের মধ্যে দুই জন লোক ওছী থাকা সঙ্গত اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الۡمَوۡتُ যখন তোমাদের মধ্যে কারোও মৃত্যু আসন্ন হয় حِيۡنَ الۡوَصِيَّةِ অসিয়ত করার সময় اثۡنٰنِ ذَوَا عَدۡلٍ مِّنۡكُمۡ এই দুই ব্যক্তি এরূপ যে দীনদার এবং তোমাদের মধ্য হতে হবে اَوۡ اٰخَرٰنِ مِنۡ غَيۡرِكُمۡ অথবা ভিন্ন সম্প্রদ্রায় হতে দু'জন হবে اِنۡ اَنۡتُمۡ ضَرَبۡتُمۡ فِى الۡاَرۡضِ যদি তোমরা সফরে থাক

فَاَصَابَتْكُمْ مُّصِيْبَةُ الْمَوْتِ ؕ تَحْبِسُوْنَهُمَا مِنْۢ بَعْدِ الصَّلٰوةِ فَيُقْسِمٰنِ بِاللّٰهِ اِنِ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِيْ بِهٖ ثَمَنًا وَّلَوْ كَانَ ذَا قُرْبٰى ۙ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللّٰهِ اِنَّاۤ اِذًا لَّمِنَ الْاٰثِمِيْنَ (١٠٦)	**অনুবাদ :** অতঃপর মৃত্যুর ঘটনা তোমাদের উপর উপস্থিত হয়, যদি তোমাদের সন্দেহ হয়, তবে ওছীদ্বয়কে নামাজের [জামাতের] পর রুখে নাও, অতঃপর তারা উভয়ে আল্লাহর নামে শপথ করবে যে, আমরা এই শপথের বিনিময়ে কোনো স্বার্থ ভোগ করব না, যদি কোনো আত্মীয়ও হয়, আর আল্লাহর বিধানকে আমরা গোপন করব না, [যদি এরূপ করি, তবে] এমতাস্থায় আমরা ভীষণ পাপী হবো।
فَاِنْ عُثِرَ عَلٰۤى اَنَّهُمَا اسْتَحَقَّاۤ اِثْمًا فَاٰخَرٰنِ يَقُوْمٰنِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِيْنَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْاَوْلَيٰنِ فَيُقْسِمٰنِ بِاللّٰهِ لَشَهَادَتُنَاۤ اَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَاۤ ۖ اِنَّاۤ اِذًا لَّمِنَ الظّٰلِمِيْنَ (١٠٧)	(১০৭) অতঃপর যদি জানা যায় যে, ওছীদ্বয় কোনো পাপে জড়িত হয়েছে, তবে যাদের বিরুদ্ধে পাপে জড়িত হয়েছিল তাদের মধ্য হতে [মৃতের] সর্বাপেক্ষা নিকটতম অপর দুই ব্যক্তি সেই স্থানে দাঁড়াবে যেখানে ওছীদ্বয় দাঁড়িয়েছিল, অতঃপর উভয়ে [এরূপে] আল্লাহর নামে শপথ করবে যে, নিশ্চয় আমাদের এই শপথ তাদের শপথ অপেক্ষা অধিক সত্য এবং আমরা কিছুমাত্র ব্যতিক্রম করিনি, [যদি করি, তবে] এমতাবস্থায় জালেমদের অন্তর্ভুক্ত হব।
ذٰلِكَ اَدْنٰۤى اَنْ يَّاْتُوْا بِالشَّهَادَةِ عَلٰى وَجْهِهَاۤ اَوْ يَخَافُوْۤا اَنْ تُرَدَّ اَيْمَانٌۢ بَعْدَ اَيْمَانِهِمْ ؕ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاسْمَعُوْا ؕ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ (١٠٨)	(১০৮) এটাই এ বিষয়ের অতীব সহজ পন্থা যে, তারা ঘটনা যথাযথভাবে প্রকাশ করে দেয়, অথবা এর ভয় করে যে, তাদের শপথ গ্রহণ করার পর [পুনঃ] শপথগুলোকে ফিরানো হবে, আর আল্লাহ তা'আলাকে ভয় কর এবং [বিধানসমূহ] শ্রবণ কর, আর আল্লাহ ফাসেকদেরকে পথ দেখাবেন না।

১৪ع

শাব্দিক অনুবাদ

فَاَصَابَتْكُمْ مُّصِيْبَةُ الْمَوْتِ অতঃপর মৃত্যুর ঘটনা তোমাদের উপর উপস্থিত হয় تَحْبِسُوْنَهُمَا তবে ওছীদ্বয়কে রুখে নাও مِنْۢ بَعْدِ الصَّلٰوةِ নামাজের পর فَيُقْسِمٰنِ بِاللّٰهِ অতঃপর তারা উভয়ে আল্লাহর নামে শপথ করবে যে اِنِ ارْتَبْتُمْ যদি তোমাদের সন্দেহ হয় لَا نَشْتَرِيْ بِهٖ ثَمَنًا আমরা এই শপথের বিনিময়ে কোনো স্বার্থ ভোগ করব না وَّلَوْ كَانَ ذَا قُرْبٰى যদি কোনো আত্মীয়ও হয় وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللّٰهِ আর আল্লাহর বিধানকে আমরা গোপন করব না اِنَّاۤ اِذًا لَّمِنَ الْاٰثِمِيْنَ এমতাস্থায় আমরা ভীষণ পাপী হবো।

(১০৭) فَاِنْ عُثِرَ অতঃপর যদি জানা যায় যে عَلٰۤى اَنَّهُمَا اسْتَحَقَّاۤ اِثْمًا ওছীদ্বয় কোনো পাপে জড়িত হয়েছে فَاٰخَرٰنِ يَقُوْمٰنِ مَقَامَهُمَا অপর দুই ব্যক্তি সেই স্থানে দাঁড়াবে যেখানে ওছীদ্বয় দাঁড়িয়েছিল مِنَ الَّذِيْنَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْاَوْلَيٰنِ যাদের বিরুদ্ধে পাপে জড়িত হয়েছিল তাদের মধ্য হতে [মৃতের] সর্বাপেক্ষা নিকটতম فَيُقْسِمٰنِ بِاللّٰهِ অতঃপর উভয়ে আল্লাহর নামে শপথ করবে যে لَشَهَادَتُنَاۤ اَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا নিশ্চয় আমাদের এই শপথ তাদের শপথ অপেক্ষা অধিক সত্য وَمَا اعْتَدَيْنَاۤ এবং আমরা কিছুমাত্র ব্যতিক্রম করিনি اِنَّاۤ اِذًا لَّمِنَ الظّٰلِمِيْنَ [যদি করি, তবে] এমতাবস্থায় জালেমদের অন্তর্ভুক্ত হব।

(১০৮) ذٰلِكَ اَدْنٰۤى এটাই এ বিষয়ের অতীব সহজ পন্থা যে اَنْ يَّاْتُوْا بِالشَّهَادَةِ عَلٰى وَجْهِهَاۤ তারা ঘটনা যথাযথভাবে প্রকাশ করে দেয় اَوْ يَخَافُوْۤا অথবা এর ভয় করে যে, اَنْ تُرَدَّ اَيْمَانٌۢ بَعْدَ اَيْمَانِهِمْ তাদের শপথ গ্রহণ করার পর [পুনঃ] শপথগুলোকে ফিরানো হবে وَاتَّقُوا اللّٰهَ আর আল্লাহ তা'আলাকে ভয় কর وَاسْمَعُوْا এবং [বিধানসমূহ] শ্রবণ কর وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ আর আল্লাহ ফাসেকদেরকে পথ দেখাবেন না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শানে নুযূল : জাহিলিয়াত যুগে যেসব কুপ্রথা প্রচলিত ছিল, তন্মোধ্যে পিতৃপুরুষদের পদাঙ্ক অনুসরণ করা ছিল অন্যতম। এ কুপ্রথাই তাদেরকে কুকর্মে লিপ্ত ও সৎকর্ম থেকে বঞ্চিত করে রেখেছিল। তাফসীর দুররে মনসূরে ইবনে আবী হাতেমের বরাত দিয়ে বর্ণিত রয়েছে যে, কোনো ভাগ্যবান ব্যক্তি যদি সত্যোপলব্ধির ফলে মুসলমান হয়ে যেত, তবে তাকে এমনভাবে ধিক্কার দেওয়া হতো যে, তুই আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে বেওকুফ সাব্যস্ত করেছিস। তাদের রীতিনীতি ত্যাগ করে অন্য তরিকা অবলম্বন করেছিস। তাদের এ অন্ধ বিশ্বাসের পরিপ্রেক্ষিতেই এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়–

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا -

অর্থাৎ, যখন তাদেরকে বলা হতো যে, তোমরা আল্লাহর অবতীর্ণ সত্য বিধানাবলি ও রাসূলের দিকে এসো, যা সর্বাদিক দিয়ে উপযোগী এবং তোমাদের মঙ্গল ও সাফল্যের রক্ষাকবচ, তখন তারা এছাড়া কোনো উত্তর দিতো না যে, আমরা বাপদাদাদেরকে যে তরিকায় পেয়েছি, আমাদের জন্য তা-ই যথেষ্ট।

(১০৫) قوله يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** আবূ সালেহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, মক্কায় মুনাফিক সম্প্রদায় রাসূল ﷺ–এর প্রতি আশ্চর্য বোধ করে বলছিল, মুহাম্মদ ধারণা করছে যে, আল্লাহ তাঁকে সকল মানুষের মোকাবিলায় মুসলমান না হওয়া পর্যন্ত হত্যা পরিচালনা করার জন্য প্রেরণ করেছেন। অথচ তিনি অগ্নিপূজারীকে বহিষ্কার ও আহলে কিতাব হতে জিযিয়া কর গ্রহণ করেছেন। ইসলাম গ্রহণ করার জন্য তাদেরকে বাধ্য করেননি কেন? মুসলমানদের নিকট তা অত্যন্ত পীড়াদায়ক বলে মনে হলো। সেই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[বাহরে মুহীত : ৪১/৪]

(১০৬) قوله يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ الخ **আয়াতের শানে নুযূল–১ :** বুখারী ও দারাকুতনীর বর্ণনা মতে আলোচ্য আয়াত তামীম দারী ও আদী বিন বাদ্দা দু'খ্রিস্টান সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। তারা হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, তামীমে দারী ও আদী বিন বাদ্দা মক্কা গেল। তাদের সাথে বনী সাহাম গোত্রে এক যুবকও বের হলো। অতঃপর সে এমন একটি অঞ্চলে মারা গেল, যেখানে মুসলমান কেউ ছিলনা। সুতরাং সে তাদেরকে অসিয়ত করল, তারা তার অসিয়ত অনুযায়ী তার পরিবারের লোকজনের নিকট তার ত্যাজ্য সম্পদ সোপর্দ করল কিন্তু তার খাঁটি স্বর্ণ রৌপ্য দ্বারা তৈরি পেয়ালাটি তারা রেখে দিল। হযরত রাসূল ﷺ–এর নিকট এ নালিশ যাওয়ার পর রাসূল ﷺ তাদের দু'জন থেকে শপথ গ্রহণ করে জিজ্ঞেস করেন। তারা তাতে অস্বীকার করল। পরবর্তীতে সে পেয়ালাটি মক্কায় পাওয়া গেল। তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হলে তারা উত্তরে বলল যে, আমরা আদী ও তামীম থেকে তা খরিদ করেছি। সুতরাং সাহামীর ওয়ারিশ দু'জন এসে শপথ করে বলল যে, এ পেয়ালাটি সাহামীর। তারা আরও বললেন যে, তাদের সাক্ষী অপেক্ষা আমাদের সাক্ষী অতি নির্ভরযোগ্য। আমরা সীমালঙ্ঘন করি না। অতএব তারা এ পেয়ালাটি নিয়ে আসে। তাদের এ ঘটনা সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়েছে। –[কুরতুবী : ৩২১/৬, ফাতহুল কাদীর : ৮৯/২]

শানে নুযূল– ২ : নাক্কাশ বলেন, আলোচ্য আয়াত বুদাইল বিন আবী মারযাম, আস বিন ওয়ায়েল আস সাহামীর দাস সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। তিনি আবেসিনিয়ার উদ্দেশ্যে সমুদ্র পথে বের হন। তাঁর সাথে ছিল লাঘম ও আদী নামক দু'জন খ্রিস্টান। জাহাজে থাকাকালেই তিনি ইন্তেকাল করেন। সুতরাং তারা তাকে সমুদ্রে ফেলে দিল। আর তিনি একটি অসিয়ত নামা লিখে তার মালের মাঝে রেখে দিয়ে তাদেরকে বললেন, আমার এ মাল আমার পরিবারের লোকজনের নিকট পৌঁছে দিবে। বুদাইল মারা যাবার পর পরই তারা দু'জনে তার মাল নিজেদের মালিকানায় নিয়ে যায়। সে মালের মধ্যে তাদের নিকট অতি পছন্দনীয় বস্তু স্বর্ণ রৌপ্য দ্বারা নির্মিত একটি পাত্র ছিল, তারা সে পাত্রটি নিয়ে নেয়। পরবর্তীতে বুদাইলের প্রেরিত মালের সাথে মৃত্যুকালীন লিখিত সে পত্র পেয়ে বুদাইলের পরিবারের লোকজন তাদেরকে এ পাত্রটির কথা জিজ্ঞেস করলে তারা তার ওয়ারিশদের নিকট স্বীকার করেনি। কিন্তু বুদাইলের ওয়ারিশগণ রাসূল ﷺ–এর নিকট এ বিষয়ে মকদ্দমা নিয়ে যায়। সে পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। –[কুরতুবী : ৩২২/৬, বাহরে মুহীত : ৪৩/৩]

(১০৭) قوله فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** মুফাসসিরগণ (র.) বর্ণনা করেছেন যে, পূর্ববর্তী আয়াত অর্থাৎ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ الخ যখন নাজিল হয়েছে, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আদী ও তামীমকে

www.almodina.com

ডেকে এনে মিম্বরের নিকট তাদের হাতে শপথ বাক্য গ্রহণ করেন। তাদের দায়িত্বে অর্পিত বস্তুসামগ্রী হতে তারা কোনো বস্তুতে কোনো ধরনের খিয়ানত করেনি বলে শপথ বাক্য পাঠ করে। তাদের এভাবে শপথ করার কারণে রাসূল ﷺ তাদেরকে ছেড়ে দিলেন। তাছাড়া আর অন্য কোনো বিধান আরোপ করেননি। পরবর্তীতে স্বর্ণের সে পাত্রটি কোনো স্বর্ণকারের নিকট অর্পণ করার কারণে বুদাইলের ওয়ারিশগণ পুনরায় রাসূল ﷺ–এর নেকট বিষয়টি উত্থাপন করেন, সুতরাং পুনর্বার তাদেরকে রাসূল ﷺ–এর খেদমতে উপস্থিত হতে হয়েছে। সে পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। –[মা'আরিফুল নুযূল : ৪২৭/১]

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا اِلٰى مَاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَاِلَى الرَّسُوْلِ قَالُوْا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ اٰبَآءَنَا

অর্থাৎ যখন তাদেরকে বলা হতো যে, তোমরা আল্লাহর অবতীর্ণ সত্য বিধানাবলি ও রাসূলের দিকে এসো, যা সর্বদিক দিয়ে উপযোগী এবং তোমাদের মঙ্গল ও সাফল্যের রক্ষাকবচ, তখন তারা এছাড়া কোনো উত্তর দিত না যে, আমরা বাপ-দাদাদেরকে যে তরিকায় পেয়েছি, আমাদের জন্য তাই যথেষ্ট।

এ শয়তানি যুক্তিই লক্ষ লক্ষ মানুষকে সাধারণ জ্ঞানবুদ্ধির অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও পথভ্রষ্ট করেছে। কুরআন পাক এর উত্তরে বলে اَوَلَوْ كَانَ اٰبَآؤُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ شَيْئًا চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রই বুঝতে পারে যে, কুরআন পাকের এ বাক্যটি কোনো ব্যক্তি অথবা দলের অনুসরণ করার ব্যাপারে একটি বিশুদ্ধ মূলনীতি ব্যক্ত করেছে। ফলে অন্ধরা দৃষ্টিশক্তি লাভ করেছে এবং মূর্খও গাফেলদের জন্য সত্য প্রকাশের পথ খুলে গেছে, মূলনীতিটি এই যে, অজ্ঞরা জ্ঞানবানদের অনভিজ্ঞারা অভিজ্ঞদের এবং মূর্খরা জ্ঞানীদের অনুসরণ করবে একথা স্বতঃসিদ্ধ, কিন্তু জ্ঞান-বুদ্ধি ও হেদায়েতের মাপকাঠি পরিত্যাগ করে বাপ-দাদা কিংবা ভাই বন্ধুদের অনুসরণকে নীতি হিসেবে গ্রহণ করা কিছুতেই যুক্তিযুক্ত হতে পারে না। অনুসৃত ব্যক্তি নিজে কোথায় যাচ্ছে এবং অনুসারীদেরকেই বা কোথায় নিয়ে যাবে একথা না জেনে তার পদাঙ্ক অনুসরণে লেগে যাওয়া মূর্খতা ছাড়া আর কিছুই নয়।

এমনিভাবে কিছুসংখ্যক লোক বেশি মানুষের সমাগমকেই অনুসরণের মাপকাঠি মনে করে। যার কাছে মানুষের ভিড় দেখে তারা তারই অনুসরণে লেগে যায়। এটিও একটি অযৌক্তিক কাজ। কেননা জগতে সব সময়ই বেকুব, নির্বোধ ও কুকর্মীদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা রয়েছে। তাই মানুষের ভিড়ই সত্যাসত্য ও ভালো মন্দ চিহ্নিত করার মাপকাঠি হতে পারে না।

অযোগ্য ব্যক্তির অনুসরণ করা ধ্বংস ডেকে আনার শামিল : কুরআন পাকের এ বাক্যের সুস্পষ্ট শিক্ষা এই যে, বাপ-দাদা, ভাই-বেরাদর ইত্যাদি কেউ অনুসৃত হওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়; বরং প্রতিটি মানুষের পক্ষে সর্বপ্রথম স্বীয় জীবনের লক্ষ্য ও জীবনযাত্রার গতিপথ নির্ধারণ করা জরুরি। এরপর তা অর্জনের জন্য দেখা দরকার যে, এমন ব্যক্তি কে, যার এ লক্ষ্য অর্জনের পথ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান রয়েছে এবং এ পথে নিজেও চলেছেন। এমন ব্যক্তি পাওয়া গেলে তার অনুসরণ অবশ্যই মনযিলে মাকসূদে পৌঁছাতে পারে। মুজতাহিদ ইমামদের অনুসরণের তাৎপর্যও তাই। তাঁরা দীন সম্পর্কে যেমন সম্যক অবগত, তেমনি নিজেরাও এ পথেই চলেন। তাই অজ্ঞ ব্যক্তি তাদের অনুসরণ করে ধর্মের লক্ষ্য অর্থাৎ আল্লাহ ও রাসূলের নির্দেশ পালন করতে পারে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি নিজেই বিপথগামী, যার মনজিলে মাকসূদ জানা নেই কিংবা জেনেশুনে বিপরীত দিকে ধাবমান, তার পিছনে চলা জ্ঞানী মাত্রের দৃষ্টিতেই নিজ প্রচেষ্টা ও কর্মকে বিনষ্ট করার শামিল; বরং ধ্বংস ডেকে আনার নামান্তর। দুঃখের বিষয়, বর্তমান জ্ঞান-গরিমা ও আধুনিকতার যুগেও শিক্ষিত ও জ্ঞানী ব্যক্তিরা এ সত্যের প্রতি চরম উপেক্ষা প্রদর্শন করছে। বর্তমান ধ্বংস ও বিপর্যয়ের প্রধান কারণই হচ্ছে অযোগ্য ও ভ্রান্ত নেতাদের অনুসরণ।

অনুসরণের মাপকাঠি : কুরআন পাকের এ বাক্য দু'টি বিষয়কে অনুসরণের যুক্তিযুক্ত ও সুস্পষ্ট মাপকাঠি সাব্যস্ত করেছে; একটি عِلْم ও অপরটি اِهْتِدَاء এখানে عِلْم এর অর্থ– মানজিলে মাকসূদ ও মানজিলে মাকসূদ পর্যন্ত পৌঁছার পথ সম্পর্কিত জ্ঞান এবং اِهْتِدَاء –এর অর্থ এ লক্ষ্যের পথে চলা, অর্থাৎ বিশুদ্ধ জ্ঞান ও সরল কর্ম।

সারকথা এই যে, অনুসরণ করার জন্য যে ব্যক্তিকে নির্বাচন করবে প্রথমে দেখে নিবে যে, অভিষ্ট লক্ষ্য ও লক্ষ্যের পথ সম্পর্কে সে অবগত কি না। এরপর দেখবে, সে নিজেও সে পথেই চলছে কি না এবং তার কর্ম তার জ্ঞানের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কি না।

মোটকথা, কাউকে অনুসৃতব্য সাব্যস্ত করার জন্য তাকে বিশুদ্ধ জ্ঞান ও সরল কর্মের কষ্টিপাথরে যাচাই করা জরুরি। শুধু বাপ-দাদা হওয়া কিংবা অনেক মানুষের নেতা হওয়া অথবা ধনাঢ্য হওয়া কিংবা রাষ্ট্রের অধিপতি হওয়া ইত্যাদি কোনোটিই অনুসরণের মাপকাঠি হওয়ার যোগ্য নয়।

কারো সমালোচনা করার কার্যকরী পন্থা : কুরআন পাক আলোচ্য আয়াতে বাপ-দাদার অনুসরণে অভ্যস্ত লোকদের বিভ্রান্তি ব্যক্ত করার সাথে সাথে অন্যের সমালোচনা ও তার বিভ্রান্তি প্রকাশ করার একটি কার্যকরী পন্থাও শিক্ষা দিয়েছে। এ পন্থায় সমালোচনা করলে সমালোচিত ব্যক্তি ব্যাথিত কিংবা উত্তেজিত হয় না। কেননা পৈতৃক কর্ম অনুসরণকারীদের জওয়াবে কুরআন পাক এ কথা বলেনি যে, তোমাদের বাপ-দাদা মূর্খ ও পথভ্রষ্ট; বরং বিষয়টিকে প্রশ্নের আকারে বলেছে : বাপ-দাদার অনুসরণ তখনো কি যুক্তিযুক্ত হতে পারে, যখন বাপ-দাদার মধ্যে না থাকে জ্ঞান এবং না থাকে সৎকর্ম?

যারা মানুষের সংশোধন চিন্তা করে তাদের জন্য একটি সান্ত্বনা : দ্বিতীয় আয়াতে মানুষের সংশোধন চিন্তায় সবকিছু বিসর্জনকারী মুসলমানদেরকে সান্ত্বনা দিয়ে বলা হয়েছে: সত্যপ্রচার ও শিক্ষায় তোমাদের সাধ্যমতো চেষ্টা এবং যথাযথ হিতকাঙ্ক্ষার পরও যদি কেও পথভ্রষ্টাতায়ই ডুবে থাকে, তবে এর জন্য মোটেই চিন্তিত হয়ো না। এমতাবস্থায় অন্যের পথভ্রষ্টতার কারণে তোদের কোনোই ক্ষতি হবে না। বলা হয়েছে : يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ অর্থাৎ হে মুসলমানগণ! তোমরা নিজেও চিন্তা কর। তোমরা যখন সঠিক পথে চলছ, তখন যে বিপথগামী, তার কারণে তোমাদের কোনোই ক্ষতি নেই।

এ আয়াতের বাহ্যিক শব্দের দ্বারা বুঝা যায় যে, প্রতিটি মানুষের পক্ষে নিজের ও নিজের কর্ম সংশোধনের চিন্তা করাই যথেষ্ট। অন্যরা যা ইচ্ছা করুক। সেদিকে ভ্রুক্ষেপ করার প্রয়োজন নেই। অথচ এ বিষয়টি কুরআন পাকের বহু আয়াতের পরিপন্থি। সেসব আয়াতে 'সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে বারণ' করাকে ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য এবং মুসলিম সম্প্রদায়ের একটি স্বতন্ত্রমূলক বৈশিষ্ট্য সাব্যস্ত করা হয়েছে। এ কারণেই আয়াতটি অবতীর্ণ হলে কিছু লোকের মনে প্রশ্ন দেখা দেয়। তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ–এর সামনে প্রশ্ন রাখেন এবং তিনি উত্তরে বলেন যে, আয়াতটি 'সৎকাজে আদেশ দান' এর পরিপন্থি নয়। তোমরা যদি 'সৎকাজে আদশে দান' পরিত্যাগ কর, তবে অপরাধীদের সাথে তোমাদেরকেও পাকড়াও করা হবে। এজন্যই তাফসীরে বাহরে মুহীতে হযরত সায়ীদ ইবনে জুবায়ের থেকে এ আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে বর্ণিত রয়েছে, তোমরা স্বীয় কর্তব্য পালন করতে থাক। জিহাদ এবং 'সৎকাজে আদেশ' দানও এ কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত। এগুলো করার পরও যদি কেউ পথভ্রষ্ট থেকে যায়, তবে তাতে তোমাদের কোনো ক্ষতি নেই। কুরআনের إِذَا اهْتَدَيْتُمْ শব্দে চিন্তা করলে এ তাফসীরের যথাযর্থতা ফুটে উঠে। কেননা এর অর্থ এই যে, যখন তোমরা সঠিক পথে চলতে থাকবে, তখন অন্যের পথভ্রষ্টতা তোমাদের জন্য ক্ষতিকর নয়। এখন এ কথা সুস্পষ্ট যে, যে ব্যক্তি 'সৎকাজে আদেশ দান' এর কর্তব্যটি বর্জন করে, সে সঠিক পথে চলমান নয়।

তাফসীরে দুররে মানসূরে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)-এর একটি ঘটনা বর্ণিত রয়েছে। তাঁকে কোনো এক ব্যক্তি বলল যে, অমুক অমুক ব্যক্তির মধ্যে ঘোর বিবাদ-বিসম্বাদ রয়েছে। তারা একে অপরকে মুশরিক বলে অভিহিত করে। হযরত ইবনে ওমর (রা.) বললেন, তুমি কি মনে কর যে, আমি তাদের সাথে যুদ্ধ করতে তোমাকে আদেশ করব? কখনই নয়। যাও, তাদেরকে নম্রতার সাথে বুঝাও। যদি মানে উত্তম, নতুবা তাদের চিন্তা ছেড়ে নিজের চিন্তা কর। অতঃপর এ উক্তির প্রমাণ হিসেবে তিনি আলোচ্য আয়াতটি তেলাওয়াত করলেন।

পাপ দমন সম্পর্কে হযরত আবূ বকর (রা.)-এর একটি ভাষণ : আয়াতের বাহ্যিক শব্দাবলি থেকে বাহ্যদৃষ্টিতে যে প্রশ্ন দেখা দেয়, তার পরিপ্রেক্ষিতে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) এক ভাষণে বললেন, তোমরা আয়াতটি পাঠ করে একে অস্থানে প্রয়োগ করছ এবং বলছ যে, 'সৎকাজে আদশ দান' এর প্রয়োজন নেই। জেনে রাখ, আমি নিজে রাসূলুল্লাহ ﷺ–এর মুখে শুনেছি : যারা কোনো পাপ কাজ হতে দেখেও (সাধ্যানুযায়ী) তা দমন করতে চেষ্টা করে না, আল্লাহ তা'আলা সত্বরই হয় তো তাদেরকেও অপরাধীদের অন্তর্ভুক্ত করে আজাবে নিক্ষেপ করবেন।

এ হাদীসটি তিরমিযী ও ইবনে মাজায় বর্ণিত রয়েছে। আবূ দাউদের ভাষায় হাদীসটি এরূপ : "যারা কোনো অত্যাচারীকে অত্যাচার করতে দেখেও (সাধ্যানুযায়ী) বাধা দেয় না, আল্লাহ তা'আলা তাদের সবাইকে একযোগে আজাবে নিক্ষেপ

www.almodina.com

مَعْرُوْف ও مُنْكَرْ-এর অর্থ : পূর্বোক্ত আলোচনা থেকে এ কথা জানা গেল যে, مُنْكَرْ অর্থাৎ অবৈধ কার্যাবলি দমন করা কিংবা কমপক্ষে ঘৃণা প্রকাশ করা প্রত্যেক মুসলমানের অবশ্য কর্তব্য। এখন জানা দরকার যে, مَعْرُوْف ও مُنْكَرْ কাকে বলে?

مَعْرُوْف শব্দটি مَعْرِفَةٌ এবং مُنْكَرْ শব্দটি اِنْكَارٌ থেকে উদ্ভূত। مَعْرُوْف বলা হয় কোনো বস্তুকে চিন্তা-ভাবনার মাধ্যমে বোঝা ও চেনা। এর বিপরীতে اِنْكَارٌ বলে, না বুঝে ও না চেনা দুটি শব্দই বিপরীতমুখী। কুরআন পাকের এক জায়গায় বলা হয়েছে– يَعْرِفُوْنَ نِعْمَةَ اللّٰهِ ثُمَّ يُنْكِرُوْنَهَا অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলার শক্তি ও সামর্থ্যের বিকাশ দেখে তাঁর নিয়ামতসমূহকে চেনে, এরপর একগুঁয়েমিবশত সেগুলো এমনভাবে অস্বীকার করে, যেন এগুলোকে চেনেই না। এতে বোঝা গেল যে, আভিধানিক দিক مَعْرُوْف-এর অর্থ পরিচিত বস্তু এবং مُنْكَرْ এর অর্থ অপরিচতি বস্তু। এ অর্থের সাথে সঙ্গতি রেখে ইমাম রাগেব ইস্পাহানী 'মুফরাদাতুল-কুরআন' গ্রন্থে শরিয়তের পরিভাষায় مَعْرُوْف ও مُنْكَرْ-এর অর্থ বর্ণনা করেছেন– مَعْرُوْف ঐ কর্মকে বলা হয় যার উত্তম হওয়া যুক্তি কিংবা শরিয়তের মাধ্যমে জানা যায়। আর مُنْكَرْ এমন কাজকে বলা হয় যা যুক্তি ও শরিয়তের দৃষ্টিতে অপরিচিত অর্থাৎ, মন্দ মনে করা হয়। তাই اَمْرٌ بِالْمَعْرُوْفِ অর্থ হচ্ছে– সৎ কাজে আদেশ দান এবং نَهْىٌ عَنِ الْمُنْكَرِ অর্থ– অসৎ কাজে নিষেধ করা।

মুজতাহিদ ইমামদের বিভিন্ন উক্তিতে কোনো শরিয়তগত مُنْكَرْ নেই :

কিন্তু এতে গোনাহ বা ছওয়াব কিংবা মন্যকরণ ও অমান্যকরণ না বলে مَعْرُوْف ও مُنْكَرْ শব্দ ব্যবহার করার মধ্যে সম্ভবত এদিকে ইঙ্গিত করাই উদ্দেশ্য যে, যেসব সূক্ষ্ম ও ইজতিহাদী মাস'আলায় কুরআন ও সুন্নাহর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা কিংবা অস্পষ্টতার কারণে ফিকহবিদগণ বিভিন্ন মত ব্যক্তি করেছেন, সেগুলো এর আওতাভুক্ত নয়। মুজতাহিদ ইমামদের ইজতিহাদ আলিম সমাজে স্বীকৃত। তারা যদি কোনো মাস'আলা ভিন্নমুখী দুটি মত ব্যক্ত করেন, তবে উভয়ের মধ্যে কোনোটিকেই শরিয়তগত مُنْكَرْ বলা যায় না। বরং উভয় মতই مَعْرُوْف-এর অন্তর্ভুক্ত। এরূপ মাস'আলার যে ব্যক্তি একটি মতকে প্রবল মনে করে, অপরটিকে গোনাহ হিসেবে অগ্রাহ্য করার অধিকারও তার নেই। এ কারণেই সাহাবী ও তাবেয়ীদের মধ্যে অনেক ইজতিহাদী মতবিরোধ ও পরস্পর বিরোধী মতামত থাকা সত্ত্বেও কোথাও একথা বর্ণিত নেই যে, তাঁরা একে অরকে ফাসিক কিংবা গুনাহগার বলেছেন। বাহাস-বিতর্ক, কথা কাটাকাটি ইত্যাদি সবই হতো এবং প্রত্যেকেই নিজ নিজ মতের সপক্ষে যুক্তি-প্রমাণ বর্ণনা করতেন, কিন্তু এ মতবিরোধের কারণে একজন অপরজনকে গুনাহগার মনে করতেন না।

সারকথা এই যে, ইজতিহাদী মতবিরোধের ক্ষেত্রে প্রত্যেক জ্ঞানী ব্যক্তি যে মতকে প্রবল মনে করেন তাই গ্রহণ করতে পারেন, কিন্তু ভিন্নমতকে مُنْكَرْ মনে করে অগ্রাহ্য করার অধিকার কারোও নেই। এতে বুঝা গেল, আজকাল ইজতিহাদী মাস'আলা সম্পর্কে কোনো কোনো মহল থেকে যেসব দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও ঘৃণা-বিদ্বেষ সৃষ্টিকারী বক্তৃতা ও প্রবন্ধ রচনা করা হয়, সেগুলো 'সৎ কাজে আদেশ দান' ও 'অসৎ কাজে নিষেধকরণের' অন্তর্ভুক্ত নয়, নিছক অজ্ঞতা ও মূর্খতার কারণেই এসব মাসআলাকে রণক্ষেত্রে পরিণত করা হয়।

মাসআলা : মরণোন্মুখ ব্যক্তি যার হাতে মাল সোপর্দ করে অন্য কাউকে দিতে বলে যায়, তাকে ওসী বলা হয়। ওসী একজন বা একাধিক ব্যক্তিও হতে পারে।

- সফরে হোক কিংবা স্বগৃহে অবস্থানকালে মুসলমান ও ধর্মপরায়ণ ওসী নিয়োগ করা উত্তম; জরুরি নয়।
- মকদ্দমার যে পক্ষ অতিরিক্ত বিষয় প্রমাণ করতে সচেষ্ট হয়, সে বাদী এবং অপর পক্ষ বিবাদী।
- প্রথমে বাদীর কাছ থেকে সাক্ষী তলব করা হয়। যদি সে শরিয়তের বিধি মোতাবেক রায় দেওয়া হয়। পক্ষান্তরে সাক্ষী উপস্থিত করতে না পারলে বিবাদীর কাছ থেকে কসম নেওয়া হয় এবং তার পক্ষে মকদ্দমার রায় দেওয়া হয়। যদি বিবাদী কসম খেতে অস্বীকার করে, তবে বাদীর পক্ষেই মকদ্দমার রায় দেওয়া হয়।
- আলোচ্য আয়াতে অনুরূপ কাল কিংবা স্থান-দ্বারা কসমকে কঠোর করা বিচারকের অভিমতের উপর নির্ভাশীল– জরুরি নয়। এ আয়াত দ্বারাও জরুরি হওয়া প্রমাণিত হয় না। অন্যান্য আয়াত ও হাদীস থেকেও জরুরি না হওয়া প্রমাণিত হয়।

- বিবাদী নিজের কোনো কাজ সম্পর্কে কসম খেলে ভাষা এরূপ হয়– 'আমি এ কাজ সম্পর্কে জানি না।'
- যদি উত্তরাধিকারের মকদ্দমার ওয়ারিশ বিবাদী হয়, তবে শরিয়তের আইনানুযায়ী যারা উত্তরাধিকার, তাদেরকেই কসম খেতে হবে তা একজন হোক কিংবা একাধিক। যারা উত্তরাধিকারী নয়, তারা কসম খাবে না।–[বয়ানুল কুরআন]

কাফেরের ব্যাপারে কাফেরের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ : يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ شَهَٰدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيَّةِ ٱثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ ءَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ এ আয়াতে মুসলমানদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, তোমাদের মধ্যে কারো মৃত্যু উপস্থিত হলে দু'ব্যক্তিকে ওসী নিযুক্ত কর। তারা তোমাদের মধ্যে থেকেই হবে এবং ধর্মপরায়ণ হবে। যদি স্বজাতীয় লোক না থাকে, তবে বিজাতি অর্থাৎ কাফেরদের মধ্য থেকে নিযুক্ত কর।

এ আয়াত থেকে ইমাম আবূ হানীফা (র.) এ মাসআলা উদ্ভাবন করেছেন যে, কাফেরদের ব্যাপারে কাফেরদের সাক্ষ্য বৈধ। কেননা আয়াতে কাফেরদের সাক্ষ্য মুসলমানদের ব্যাপারে বৈধ সাব্যস্ত করা হয়েছে। أَوْ ءَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ থেকে তা সুস্পষ্ট। অতএব, কাফেররে ব্যাপারে কাফেরের সাক্ষ্য আরো উত্তমরূপে বৈধ হবে। কিন্তু পরে يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَٱكْتُبُوهُ আয়াতে মুসলমানদের ব্যাপারে কাফেরদের সাক্ষ্যের বৈধতা রহিত হয়ে গেছে। কিন্তু কাফেরদের ব্যাপারে কাফেরদের সাক্ষ্যের বৈধতা পূর্বাবস্থায়ই বহাল রয়েছে। –[কুরতুবী, আহকামুল কুরআন]

ইমাম সাহেবের মতের সমর্থন এ হাদীস দ্বারাও হয়। জনৈক ইহুদি ব্যভিচারে লিপ্ত হলে জনগণ তার মুখে চুনকালি মাখিয়ে মহানবী (সা.)-এর দরবারে উপস্থিত করে। তিনি তার দূরবস্থার কারণ জিজ্ঞেস করলে তারা বলল, সে ব্যভিচার করেছে। তিনি সাক্ষীদের সাক্ষ্য গ্রহণ করে অপরাধীকে প্রস্তর বর্ষণে হত্যা করার নির্দেশ দিলেন– –[জাসসাস]

প্রাপক খাতককে কয়েদ করাতে পারে : تَحْبِسُونَهُمَا আয়াত থেকে একটি মূলনীতি জানা যায় যে, যার জিম্মায় অপরের কোনো প্রাপ্য ওয়াজিব রয়েছে, তাকে পাওনাদার ব্যক্তি পাওনার দায়ে প্রয়োজন বোধে কয়েদ করাতে পারে। –[কুরতুবী]

قوله مِنْ بَعْدِ الصَّلٰوةِ : এখানে صلوة বলে আছরের নামাজ বুঝানো হয়েছে। এ সময়টি নির্ধারণ করার কারণ এই যে, আহলে কিতাব এ সময়ের প্রতি অত্যন্ত সম্মান প্রদর্শন করত। এ সময়ে মিথ্যা বলা তাদের মতে নিষিদ্ধ ছিল। এতে বুঝা যায় যে, কোনো বিশেষ সময় কিংবা স্থানের শর্ত যোগ করে কসমকে কঠোর করা জায়েজ। –[কুরতুবী]

শব্দ বিশ্লেষণ

ارْتَبْتُمْ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ ماضى معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِرْتِيَابُ মূলবর্ণ (ر . ي . ب) জিনস اجوف يائى অর্থ– তোমরা সন্দেহ করেছ।

عُثِرَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى مجهول বাব نَصَرَ মাসদার اَلْعُثُوْرُ মূলবর্ণ (ع . ث . ر) জিনস صحيح অর্থ– তাকে খবর দেওয়া হয়েছে।

اسْتَحَقَّا : সীগাহ تثنية مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِسْتِحْقَاقُ মূলবর্ণ (ح . ق . ق) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– তারা যোগ্য হলো।

يَوْمَ يَجْمَعُ اللّٰهُ الرُّسُلَ فَيَقُوْلُ مَاذَآ اُجِبْتُمْ ۖ قَالُوْا لَا عِلْمَ لَنَا ۖ اِنَّكَ اَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ (١٠٩)

অনুবাদ : (১০৯) যেদিন আল্লাহ সমস্ত রাসূলকে সমবেত করবেন অতঃপর বলবেন যে, তোমরা [উম্মতগণ হতে] কি উত্তর পেয়েছিলে? তাঁরা বলবেন, [তাদের অন্তরের কথা] আমাদের কিছুই জানা নেই, নিশ্চয় আপনি সমস্ত গোপনীয় বিষয় সম্পূর্ণ জ্ঞাত।

اِذْ قَالَ اللّٰهُ يٰعِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِيْ عَلَيْكَ وَعَلٰى وَالِدَتِكَ ۘ اِذْ اَيَّدْتُّكَ بِرُوْحِ الْقُدُسِ ۙ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا ۚ وَاِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرٰىةَ وَالْاِنْجِيْلَ ۚ وَاِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّيْنِ كَهَيْـَٔةِ الطَّيْرِ بِاِذْنِيْ فَتَنْفُخُ فِيْهَا فَتَكُوْنُ طَيْرًاۢ بِاِذْنِيْ وَتُبْرِئُ الْاَكْمَهَ وَالْاَبْرَصَ بِاِذْنِيْ ۚ وَاِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتٰى بِاِذْنِيْ ۚ وَاِذْ كَفَفْتُ بَنِيْۤ اِسْرَآءِيْلَ عَنْكَ اِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ اِنْ هٰذَآ اِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ (١١٠)

(১১০) যখন আল্লাহ বলবেন, হে ঈসা ইবনে মারইয়াম! আমার অনুগ্রহ স্মরণ কর, যা তোমার এবং তোমার জননীর উপর [প্রদত্ত] হয়েছে। যখন আমি তোমাকে রূহুল কুদুস দ্বারা সাহায্য করেছি, [এবং] তুমি মানুষের সাথে কথা বলতে, [জননীর] কোলে এবং প্রৌঢ় বয়সেও, আর যখন আমি তোমাকে কিতাবসমূহ এবং জ্ঞানের কথা ও তাওরাত এবং ইঞ্জিল শিক্ষা দিয়েছি, আর যখন তুমি মাটি দ্বারা পাখির আকৃতি সদৃশ এক আকৃতি প্রস্তুত করেছ আমার আদেশে, অতঃপর তুমি তাতে ফুৎকার দিতে, যদ্দরুন তা পক্ষী হয়ে যেত আমার আদেশে, আর তুমি নিরাময় করে দিতে জন্মান্ধকে এবং কুষ্ঠ রোগীকে আমার আদেশে, আর যখন তুমি মৃতদেরকে বের করে দাঁড় করাতে আমার আদেশে, আর যখন আমি বনী ইসরাঈলকে তোমা [-কে হত্যা করা] হতে নিবৃত্ত রেখেছি, যখন তুমি তাদের নিকট [স্বীয় নবুয়তের] প্রমাণাদি নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলে, অতঃপর তাদের মধ্যে যারা কাফের ছিল তারা বলেছে যে, এটা [মু'জিযাসমূহ] স্পষ্ট জাদু ভিন্ন আর কিছুই নয়।

শাব্দিক অনুবাদ

(১০৯) يَوْمَ يَجْمَعُ اللّٰهُ الرُّسُلَ যেদিন আল্লাহ সমস্ত রাসূলকে সমবেত করবেন فَيَقُوْلُ অতঃপর বলবেন যে مَاذَآ اُجِبْتُمْ তোমরা [উম্মতগণ হতে] কি উত্তর পেয়েছিলে قَالُوْا তাঁরা বলবেন لَا عِلْمَ لَنَا আমাদের কিছুই জানা নেই اِنَّكَ اَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ নিশ্চয় আপনি সমস্ত গোপনীয় বিষয় সম্পূর্ণ জ্ঞাত।

(১১০) اِذْ قَالَ اللّٰهُ যখন আল্লাহ বলবেন يٰعِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ হে ঈসা ইবনে মারইয়াম! اذْكُرْ نِعْمَتِيْ আমার অনুগ্রহ স্মরণ কর عَلَيْكَ وَعَلٰى وَالِدَتِكَ যা তোমার এবং তোমার জননীর উপর [প্রদত্ত] হয়েছে اِذْ اَيَّدْتُّكَ بِرُوْحِ الْقُدُسِ যখন আমি তোমাকে রূহুল কুদুস দ্বারা সাহায্য করেছি تُكَلِّمُ النَّاسَ তুমি মানুষের সাথে কথা বলতে فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا কোলে এবং প্রৌঢ় বয়সেও وَاِذْ عَلَّمْتُكَ আর যখন আমি তোমাকে শিক্ষা দিয়েছি الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ কিতাবসমূহ এবং জ্ঞানের কথা وَالتَّوْرٰىةَ وَالْاِنْجِيْلَ ও তাওরাত এবং ইঞ্জিল وَاِذْ تَخْلُقُ আর যখন তুমি প্রস্তুত করছিলে مِنَ الطِّيْنِ মাটি দ্বারা كَهَيْـَٔةِ الطَّيْرِ পাখির আকৃতি সদৃশ এক আকৃতি بِاِذْنِيْ আমার আদেশে فَتَنْفُخُ فِيْهَا অতঃপর তুমি তাতে ফুৎকার দিতে فَتَكُوْنُ طَيْرًاۢ بِاِذْنِيْ যদ্দরুন তা পক্ষী হয়ে যেত আমার আদেশে وَتُبْرِئُ الْاَكْمَهَ আর তুমি নিরাময় করে দিতে জন্মান্ধকে وَالْاَبْرَصَ এবং কুষ্ঠ রোগীকে بِاِذْنِيْ আমার আদেশে وَاِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتٰى আর যখন তুমি মৃতদেরকে বের করে দাঁড় করাতে بِاِذْنِيْ আমার আদেশে وَاِذْ كَفَفْتُ আর যখন আমি নিবৃত্ত রেখেছি بَنِيْۤ اِسْرَآءِيْلَ عَنْكَ বনী ইসরাঈলকে তোমা [-কে হত্যা করা] হতে اِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ যখন তুমি তাদের নিকট প্রমাণাদি নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলে فَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ অতঃপর তাদের মধ্যে যারা কাফের ছিল তারা বলেছে যে اِنْ هٰذَآ اِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ এটা স্পষ্ট জাদু ভিন্ন আর কিছুই নয়।

www.almodina.com

وَاِذْ اَوْحَيْتُ اِلَى الْحَوَارِيّٖنَ اَنْ اٰمِنُوْا بِيْ وَبِرَسُوْلِيْ ۚ قَالُوْۤا اٰمَنَّا وَاشْهَدْ بِاَنَّنَا مُسْلِمُوْنَ (١١١)	অনুবাদ : (১১১) আর যখন আমি হাওয়ারীদেরকে আদেশ করলাম, আমার প্রতি এবং আমার রাসূলের প্রতি ঈমান আন, তারা বলল– আমরা ঈমান আনলাম, এবং আপনি সাক্ষ্য থাকুন যে, আমরা পূর্ণ অনুগত।
اِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ يٰعِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيْعُ رَبُّكَ اَنْ يُّنَزِّلَ عَلَيْنَا مَآئِدَةً مِّنَ السَّمَآءِ ؕ قَالَ اتَّقُوا اللّٰهَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ (١١٢)	(১১২) সেই সময়টুকু স্মরণীয় যখন হাওয়ারীরা বলল, হে ঈসা ইবনে মারইয়াম! আপনার প্রতিপালক কি এরূপ করতে পারেন যে, আমাদের জন্য আসমান হতে কিছু খাদ্য প্রেরণ করেন, ঈসা (আ.) বললেন, আল্লাহকে ভয় কর যদি তোমরা ঈমানদার হয়ে থাক।
قَالُوْا نُرِيْدُ اَنْ نَّاْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَئِنَّ قُلُوْبُنَا وَنَعْلَمَ اَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُوْنَ عَلَيْهَا مِنَ الشّٰهِدِيْنَ (١١٣)	(১১৩) তারা বলল, আমাদের উদ্দেশ্য এই যে, আমরা তা হতে আহার করি এবং আমাদের অন্তরসমূহ সম্পূর্ণ প্রশান্ত হয়ে যায় এবং আমাদের এই বিশ্বাস আরো সুদৃঢ় হয় যে, আপনি আমাদের নিকট সত্য বলেছেন, এবং আমরা তার প্রতি সাক্ষ্য প্রদানকারীদের অন্তর্ভুক্ত হই।

শাব্দিক অনুবাদ

(১১১) وَاِذْ اَوْحَيْتُ اِلَى الْحَوَارِيّٖنَ আর যখন আমি হাওয়ারীদেরকে আদেশ করলাম اَنْ اٰمِنُوْا بِيْ وَبِرَسُوْلِيْ আমার প্রতি এবং আমার রাসূলের প্রতি ঈমান আন। قَالُوْۤا তারা বলল– اٰمَنَّا আমরা ঈমান আনলাম وَاشْهَدْ بِاَنَّنَا مُسْلِمُوْنَ এবং আপনি সাক্ষ্য থাকুন যে, আমরা পূর্ণ অনুগত।

(১১২) اِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ সেই সময়টুকু স্মরণীয় যখন হাওয়ারীরা বলল يٰعِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ হে ঈসা ইবনে মারইয়াম! هَلْ يَسْتَطِيْعُ رَبُّكَ আপনার প্রতিপালক কি এরূপ করতে পারেন যে اَنْ يُّنَزِّلَ عَلَيْنَا مَآئِدَةً مِّنَ السَّمَآءِ আমাদের জন্য আসমান হতে কিছু খাদ্য প্রেরণ করেন قَالَ ঈসা (আ.) বললেন اتَّقُوا اللّٰهَ আল্লাহকে ভয় কর اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ যদি তোমরা ঈমানদার হয়ে থাক।

(১১৩) قَالُوْا তারা বলল نُرِيْدُ আমাদের উদ্দেশ্য এই যে اَنْ نَّاْكُلَ مِنْهَا আমরা তা হতে আহার করি وَتَطْمَئِنَّ قُلُوْبُنَا এবং আমাদের অন্তরসমূহ সম্পূর্ণ প্রশান্ত হয়ে যায় وَنَعْلَمَ এবং আমাদের এই বিশ্বাস আরো সুদৃঢ় হয় যে اَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا আপনি আমাদের নিকট সত্য বলেছেন وَنَكُوْنَ عَلَيْهَا مِنَ الشّٰهِدِيْنَ এবং আমরা তার প্রতি সাক্ষ্য প্রদানকারীদের অন্তর্ভুক্ত হই।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

কিয়ামতে পয়গম্বরগণকে সর্বপ্রথম প্রশ্ন করা হবে : يَوْمَ يَجْمَعُ اللّٰهُ الرُّسُلَ কিয়ামতে পৃথিবীর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত জন্মগ্রহণকারী সব মানুষ একটি উন্মুক্ত মাঠে উপস্থিত হবে। যে কোনো অঞ্চলের, যে কোনো দেশের এবং যে কোনো সময়ের মানুষই হোক না কেন, সবাই সে সুবিশাল ময়দানের উপস্থিত হবে এবং সবার কাছ থেকে তাদের সারা জীবনের কাজকর্মের হিসাব নেওয়া হবে। কিন্তু আয়াতে বিশেষভাবে নবী-রাসূলগণের কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, يَوْمَ يَجْمَعُ اللّٰهُ الرُّسُلَ অর্থাৎ, ঐ দিনটি বাস্তবিকই স্মরণীয়, যেদিন আল্লাহ তা'আলা সব পয়গম্বরকে হিসাবের জন্য একত্রিত করবেন উদ্দেশ্য এই যে, একত্রিত সবাইকে করা হবে, কিন্তু সর্বপ্রথম প্রশ্ন নবী-রাসূলগণকেই করা হবে যাতে সমগ্র সৃষ্টজগত দেখতে

পায় যে, আজ হিসাব ও প্রশ্ন থেকে কেউ বাদ পড়বে না। পয়গম্বরগণকে যে প্রশ্ন করা হবে, তা এই مَاذَآ اُجِبْتُمْ অর্থাৎ তোমরা যখন নিজ নিজ উম্মতকে আল্লাহ ও তাঁর সত্য ধর্মের দিকে আহবান করেছিলে, তখন তারা তোমাদেরকে কি উত্তর দিয়েছিল? তারা তোমাদের বর্ণিত নির্দেশাবলি পালন করেছিল, না অস্বীকার ও বিরোধিতা করেছিল?

এ প্রশ্নটি যদিও আম্বিয়া (আ.)-কে করা হবে, কিন্তু প্রকৃত উদ্দেশ্য হবে তাঁদের উম্মতকে শুনানো। অর্থাৎ, উম্মতরা যেসব সৎকর্ম ও কুকর্ম করেছে, তার সাক্ষ্য সর্বপ্রথম তাদের পয়গম্বরদের কাছ থেকে নেওয়া হবে। উম্মতের জন্যও মূহুর্তটি হবে অত্যন্ত নাজুক। কারণ তারা এ হৃদয়বিদারক পরিস্থিতিতে যখন নিজেদের নবী-রাসূলগণের সুপারিশ আশা করবে, তখনই স্বয়ং নবী-রাসূলগণের কাছে তাদের সম্পর্কে এ প্রশ্ন করা হবে। এটা স্বতঃসিদ্ধ কথা যে, আম্বিয়াগণ কোনো ভ্রান্ত ও বাস্তব বিরোধী কথা বলতে পারবেন না। তাই গুনাহগার ও অপরাধীরা আশঙ্কা করবে যে, যখন স্বয়ং নবীগণই আমাদের অপরাধসমূহের সাক্ষ্যদাতা তখন আর কে আমাদের সুপারিশ ও সাহায্য করবে?

এ প্রশ্নের উত্তরে তাঁরা বললেবন : قَالُوْا لَا عِلْمَ لَنَآ اِنَّكَ اَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ অর্থাৎ তাদের ঈমান ও কাজকর্ম সম্পর্কে আমাদের জনা নেই। আপনিই স্বয়ং যাবতীয় অদৃশ্য বিষয়ে মহাজ্ঞানী।

একটি সন্দেহের নিরসন : এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে যে, প্রত্যেক পয়গম্বরের ওফাতের পর তাঁর যে উম্মত জন্মগ্রহণ করে, তাদের সম্পর্কে পয়গম্বরগণের এ উত্তর নির্ভুল ও সুস্পষ্ট। কেননা অদৃশ্য বিষয় আল্লাহ ছাড়া কারো জানা নেই। কিন্তু বিরাট সংখ্যক উম্মত এমনও তো রয়েছে, যারা স্বয়ং পয়গম্বরগণের অক্লান্ত চেষ্টায় তাঁদের হাতেই মুসলমান হয় এবং তাঁদের সমানেই বর্ণিত নির্দেশাবলি পালন করে। এমনিভাবে যেসব কাফের পয়গম্বরগণের আদেশের বিরোধিতা ও তাঁদের সাথে শত্রুতা করে, তাদের সম্পর্কে একথা বলা কিভাবে নির্ভুল হতে পারে যে, তাদের ঈমান ও কাজকর্ম সম্পর্কে আমাদের জানা নেই? তাফসীরে বাহরে মুহীতে ইমাম আবূ আব্দুল্লাহ রাযী (র.)–এর উত্তরে বলেন : এখানে পৃথক পৃথক দু'টি বিষয় রয়েছে : **এক.** ইলম, যার অর্থ পূর্ণ বিশ্বাস, **দুই.** প্রবল ধারণা। একজন মানুষ অন্য একজন মানুষের সামনে থাকা সত্ত্বেও তার ঈমান ও কাজকর্ম সম্পর্কে প্রবল ধারণার ভিত্তিতেই সাক্ষ্য দিতে পারে, পূর্ণ বিশ্বাসের ভিত্তিতে নয়। কেননা অন্তরের ভেদ ও সত্যিকার ঈমান সম্পর্কে কেউ ওহী ব্যতীত নিশ্চিতভাবে জানতে পারে না। কারণ, ঈমানের সম্পর্ক হলো অন্তরের সাথে। প্রত্যেক উম্মতেই কপট বিশ্বাসী মুনাফিকদেরও একটি দল ছিল। তারা বাহ্যতঃ ঈমানও আনত এবং নির্দেশাবলিও পালন করত, কিন্তু তাদের অন্তরে ঈমান ছিল না এবং নির্দেশাবলি অনুসরণের আন্তরিক কোনো প্রেরণাও ছিল না। তাদের মধ্যে যা কিছু ছিল, সবই ছিল লোক দেখানো। তবে বাহ্যিক ক্রিয়াকর্মের উপরই জাগতিক বিচার নির্ভরশীল। যে ব্যক্তি নিজেকে মুসলমান বলে দাবি করে। খোদায়ী নির্দেশাবলি অনুসরণ করে এবং ইসলাম ও ঈমান বিরোধী কোনো কথা ও কর্মে জড়িত হয় না; নবী রাসূলগণ তাকে 'ঈমানদার ও সৎকর্মী' বলতে বাধ্য ছিলেন; সে অন্তরে খাঁটি ঈমানদার কিংবা মুনাফিক যাই হোক। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : نَحْنُ نَحْكُمُ بِالظَّوَاهِرِ وَاللّٰهُ مُتَوَلِّي السَّرَائِرِ অর্থাৎ আমরা তো বাহ্যিক কাজকর্ম দেখে বিচার করি। অন্তর্নিহিত গোপন ভেদের মালিক হচ্ছেন আল্লাহ তা'আলা।

এ বিধান অনুযায়ী দুনিয়াতে আম্বিয়া (আ.) ও তাঁদের উত্তরাধিকারী আলেম সমাজ বাহ্যিক কাজকর্মের ভিত্তিতে কারো ঈমানদার সৎকর্মী হওয়ার ব্যাপারে সাক্ষ্য দিতে পারতেন। কিন্তু আজ সে দুনিয়া ও দুনিয়ার রীতি-নীতি শেষ হয়ে গেছে। আজ হাশরের ময়দান। এখানে চুলচেরা তথ্য উদঘাটিত হবে এবং প্রত্যেক বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ উদঘাটন হবে। অপরাধীদের বিরুদ্ধে প্রথমে অন্যদের সাক্ষ্য নেওয়া হবে। যদি অপরাধী এতে নিশ্চিত না হয় এবং স্বীয় অপরাধ স্বীকার না করে, তবে বিশেষ ধরনের সরকারি সাক্ষী উপস্থিত করা হবে। অপরাধীদের মুখে ও জিহ্বায় সীল মেরে দেওয়া হবে এবং তাদের হস্ত, পদ ও চামড়ার সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে। এরা প্রত্যেক কাজের পূর্ণ স্বরূপ তুলে ধরবে– ।

اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلٰٓى اَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَآ اَيْدِيْهِمْ وَتَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ

অর্থাৎ অদ্য আমি তাদের মুখে সীল মেরে দিব। তাদের হাত আমার সাথে কথা বলবে এবং তাদের পদযুগল তাদের ক্রিয়া-কর্ম সম্পর্কে সাক্ষ্য দিবে। তখন মানুষ জানতে পারবে যে, তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও ছিল রাব্বুল আলামীনের গুপ্ত পুলিশ। এদের বর্ণনার পর অস্বীকার করার কোনো উপায় থাকবে না।

মোটকথা, পরজগতে শুধু ধারণা ও অনুমানের ভিত্তিতে কোনো কিছুর বিচার করা হবে না; বরং অকাট্য জ্ঞান ও দৃঢ় বিশ্বাসের ভিত্তিতেই সবকিছুর বিচার হবে। পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, কারো ঈমান ও কর্মের সত্যিকার ও নিশ্চিত জ্ঞান আল্লাহ ছাড়া কারো নেই। তাই হাশরের ময়দানের যখন নবী রাসূলগণকে প্রশ্ন করা হবে مَاذَآ اُجِبْتُمْ তখন তাঁরা এ প্রশ্নের

উদ্দেশ্য বুঝে ফেলবেন যে, এ প্রশ্ন ইহজগতে হচ্ছে না যে, ধারণা ও অনুমানের ভিত্তিতে জওয়াব দিলেই চলবে; বরং এ প্রশ্ন হচ্ছে হাশরের ময়াদানে, যেখানে দৃঢ় বিশ্বাস ছাড়া কোনো কিছু বলা যাবে না। তাই তাঁদের এ উত্তর যথার্থ ও সঙ্গত যে, এ সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানি না।

একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর পয়গম্বরগণের চূড়ান্ত দয়ার্দ্রতা প্রকাশ : এখানে প্রশ্ন হচ্ছে যে, উম্মতের গ্রহণ করা ও গ্রহণ না করা এবং আনুগত্য ও অবাধ্যতার যেসব ঘটনা তাঁদের সামনে সংঘটিত হয়েছে, এগুলো সম্পর্কে প্রবল ধারণাপ্রসূত জ্ঞান তাঁরা অর্জন করেছিলেন, উপরিউক্ত প্রশ্নের উত্তরে অন্ততঃ তা বর্ণনা করা উচিত ছিল। এ জ্ঞানটি নিশ্চিত কি না, শুধু এ বিষয়টিই আল্লাহর জ্ঞানে সমর্পণ করলে চলত। কিন্তু এখানে নবী-রাসূলগণ নিজস্ব জ্ঞান ও সংঘটিত ঘটনাবলি একেবারেই উল্লেখ করেননি। সবকিছু আল্লাহর জ্ঞানের উপর সমর্পণ করে তাঁরা চুপ হয়ে গেলেন।

এর তাৎপর্য এই যে, নবী-রাসূলগণ নিজ নিজ উম্মত ও সাধারণ সৃষ্টির প্রতি অত্যন্ত দয়াশীল। তাঁদের সম্পর্কে এমন কোনো কথাই উচ্চারণ করতে তাঁরা অনিচ্ছুক, যার ফলে তাঁরা বিপদের সম্মুখীন হয়। তবে নিরুপায় হলে অবশ্যই বলতে হতো। এখানে অকাট্য জ্ঞান না থাকার অজুহাত ছিল। এ অজুহাতকে কাজে লাগিয়ে মুখে উম্মতের বিরুদ্ধে কিছু থেকে আত্মরক্ষা করতে পারতেন এবং সেমতে তাঁরা তাই করে আত্মরক্ষা করেছেন।

হাশরের পাঁচটি বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন : সারকথা এই যে, আলোচ্য আয়াতে কিয়ামতের ভয়াবহ দৃশ্যের একটি ঝলক সম্মুখে উপস্থাপিত করা হয়েছে। হিসাব-নিকাশের কাঠগড়ায় আল্লাহ তা'আলার সর্বাধিক ঘনিষ্ঠ ও প্রিয় রাসূলগণ কম্পিত বদনে উপস্থিত হবেন। সুতরাং অন্যদের যে কি অবস্থা হবে, তা সহজেই অনুমেয়। তাই এখন থেকেই সে ভয়াবহ দিনের চিন্তা করা উচিত এবং জীবনকে এ হিসাব-নিকাশ প্রস্তুতিতে নিয়োজিত করা কর্তব্য।

তিরমিযীর এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

لَاتَزُوْلُ قَدَمَا ابْنِ اٰدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتّٰى يُسْئَلَ عَنْ خَمْسٍ عَنْ عُمْرِهٖ فِيْمَا اَفْنَاهُ وَعَنْ شَبَابِهٖ فِيْمَا اَبْلَاهُ وَعَنْ مَالِهٖ مِنْ اَيْنَ اِكْتَسَبَهٗ وَاَيْنَ اَنْفَقَهٗ وَمَاذَا عَمِلَ بِمَا عَلِمَ

"হাশরের ময়দানে কোনো ব্যক্তির পদযুগল ততক্ষণ পর্যন্ত সামনে অগ্রসর হতে পাবে না, যতক্ষণ না তার কাছ থেকে পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর নেওয়া হয়। প্রথম এই যে, সে জীবনের সুদীর্ঘ ও প্রচুর সংখ্যক দিবারাত্রকে কি কাজে ব্যয় করেছে? দ্বিতীয় এই যে, বিশেষভাবে কর্মক্ষম যৌবনকালকে সে কিভাবে অতিবাহতি করেছে? তৃতীয় এই যে, সে অর্থকড়ি কোন (হালল কিংবা হরাম) পথে উপার্জন করেছে? চতুর্থ এই যে, অর্থকড়িকে সে কোন (জায়েজ কিংবা নাজায়েজ) কাজে ব্যয় করেছে? পঞ্চম এই যে, নিজ ইলম অনুযায়ী সে কি আমল করেছে?

আল্লাহ তা'আলা চূড়ান্ত অনুগ্রহ ও দয়াবশতঃ এ পরীক্ষার প্রশ্নপত্র পূর্বেই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মাধ্যমে উম্মতের কাছে প্রকাশ করে দিয়েছেন। এখন এসব প্রশ্নের সমাধান শিক্ষা করাই উম্মতের কাজ। পরীক্ষার পূর্বে প্রশ্নপত্র প্রকাশ করে দেওয়ার পরও যদি কেউ ফেল করে, তবে এর চাইতে দুর্ভাগ্য আর কি হতে পারে?

হযরত ঈসা (আ.)-এর সাথে বিশেষ প্রশ্নোত্তর : প্রথম আয়াতে সমগ্র পয়গম্বরগণের অবস্থা ও তাঁদের সাথে প্রশ্নোত্তর বর্ণিত হয়েছে। দ্বিতীয় আয়াতে এবং এর পরবর্তী নয় আয়াতে [সূরার শেষ পর্যন্ত] বিশেষভাবে বনী ইসরাঈলের শেষ পয়গম্বর হযরত ঈসা (আ.)-এর সাথে আলোচনা ও তাঁর প্রতি বিশেষ অনুগ্রহের কিছু বিবরণ দেওয়া হয়েছে। হাশরে তাঁকে একটি বিশেষ প্রশ্ন ও তার উত্তর পরবর্তী আয়াতসমূহে উল্লিখিত হয়েছে।

এ প্রশ্নোত্তরের সারমর্ম ও বনী ইসরাঈল তথা সমগ্র মানব জাতির সামনে কিয়ামতের ভয়াবহ দৃশ্য তুলে ধরা। এ ময়দানে রুহুল্লাহ ও কালিমাতুল্লাহ অর্থাৎ, হযরত ঈসা (আ.)-কেও প্রশ্ন করা হবে যে, তোমার উম্মত তোমাকে আল্লাহর অংশীদার সাব্যস্ত করেছে। হযরত ঈসা (আ.) স্বীয় সম্মান, মাহাত্ম্য, নিষ্পাপতা ও নবুয়ত সত্ত্বেও অস্থির হয়ে আল্লাহর দরবারে সাফাই পেশ করবেন। একবার নয়, বার বার বিভিন্ন ভঙ্গিতে প্রকাশ করবেন যে, তিনি উম্মতকে এ শিক্ষা দেননি। প্রথমে বলবেন : سُبْحَانَكَ مَا يَكُوْنُ لِيْ اَنْ اَقُوْلَ مَا لَيْسَ لِيْ بِحَقٍّ

অর্থাৎ আপনি পবিত্র, আমার কি সাধ্য ছিল যে, আমি এমন কথা বলব, যা বলার অধিকার আমার নেই?

স্বীয় সাফাইয়ের দ্বিতীয় ভঙ্গি এই যে, তিনি স্বয়ং আল্লাহ তা'আলাকে সাক্ষী করে বলবেন, যদি আমি এরূপ বলতাম, তবে অবশ্যই আপনার তা জানা থাকত। কেননা আপনি তো আমার অন্তরের গোপন রহস্য সম্পর্কেও অবগত। কথা ও কর্মেরই কেন, আপনি তো 'আল্লামুল গুয়ূব' যাবতীয় অদৃশ্য বিষয়ের মহাজ্ঞানী।

এ দীর্ঘ ভূমিকার পর হযরত ঈসা (আ.) প্রশ্নের উত্তর দিবেন।

হযরত ঈসা (আ.)-এর উত্তর : আমি তাদেরকে ঐ শিক্ষাই দিয়েছি, যার নির্দেশ আপনি দিয়েছিলেন, أَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ رَبِّيْ وَرَبَّكُمْ অর্থাৎ আল্লাহর দাসত্ব অবলম্বন কর, যিনি আমার ও তোমাদের সকলের পালনকর্তা। এ শিক্ষার পর আমি যত দিন তাদের মধ্যে ছিলাম, ততদিন আমি তাদের কথাবার্তা ও ক্রিয়াকর্মের সাক্ষী ছিলাম, (তখন পর্যন্ত তাদের কেউ এরূপ কথা বলত না) এরপর আপনি যখন আমাকে উঠিয়ে নেন, তখন তারা আপনার দেখাশোনার মধ্যেই ছিল। আপনিই তাদের কথাবার্তা ও ক্রিয়াকর্ম সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত।

হযরত ঈসা (আ.)-এর প্রতি কতিপয় বিশেষ অনুগ্রহের বর্ণনা : আলোচ্য আয়াতসমূহে হযরত ঈসা (আ.)-এর সাথে যে প্রশ্নোত্তরের কথা বর্ণিত হয়েছে, তার পূর্বে ঐসব অনুগ্রহের বিষয়ও উল্লিখিত হয়েছে, যা বিশেষভাবে হযরত ঈসা (আ.)-কে মু'জিযা আকারে দেওয়া হয়। এতে একদিকে বিশেষ অনুগ্রহ ও অপরদিকে জবাবদিহির দৃশ্যের অবতারণা করে বনী ইসরাঈলের জাতিদ্বয়কে হুঁশিয়ার করা হয়েছে, যাদের এক জাতি তাঁকে অপমানিত করে এবং নানা অপবাদ আরোপ করে কষ্ট দেয় এবং অন্য জাতি 'খোদা' কিংবা 'খোদার পুত্র' আখ্যা দেয়। অনুগ্রহ উল্লেখ করে প্রথম জাতিকে এবং প্রশ্নোত্তর উল্লেখ করে শেষোক্ত জাতিকে হুঁশিয়ার করা হয়েছে। এখানে যেসব অনুগ্রহ কয়েকটি আয়াতে বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে, তন্মধ্যে একটি বাক্য খুবই প্রণিধানযোগ্য। এতে বলা হয়েছে : تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا অর্থাৎ হযরত ঈসা (আ.)-কে দেওয়া একটি বিশেষ মু'জিযা এই যে, তিনি মানুষের সাথে শিশু অবস্থায়ও কথা বলেন এবং পরিণত বয়সেও কথা বলেন। এখানে প্রথমোক্ত বিষয়টি যে, মু'জিযা ও বিশেষ অনুগ্রহ, তা বলাই বাহুল্য। জন্মগ্রহণের প্রথম দিকে শিশু কথা বলতে পারে না। কোনো শিশু মায়ের কোলে কিংবা দোলনায় কথাবার্তা বললে, তা তার বিশেষ স্বাতন্ত্র্যরূপে গণ্য হবে। পরিণত বয়সে কথা বলা, যা আয়াতে বর্ণিত হয়েছে, কোনো উল্লেখযোগ্য বিষয় নয়। প্রত্যেক মানুষই এ বয়সে কথা বলে থাকে। কিন্তু হযরত ঈসা (আ.)-এর বিশেষ অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করলে বুঝা যাবে যে, এটিও একটি মু'জিযা। কেননা পরিণতি বয়সে পৌঁছার পূর্বেই হযরত ঈসা (আ.)-কে ইহজগত থেকে উঠিয় নেওয়া হয়েছে। এখন এ জগতের মানুষের সাথে পরিণত বয়সে কথা বলা তখনই হতে পারে, যখন দ্বিতীয়বার তিনি এ জগতের পদার্পণ করবেন। মুসলমানদের সর্বসম্মত বিশ্বাস তাই এবং কুরাআন ও সুন্নাহর বর্ণনা থেকেও এ কথাই প্রমাণিত। অতএব বুঝা গেল যে, হযরত ঈসা (আ.)-এর শিশু অবস্থায় কথা বলা যেমন মু'জিযা, তেমনি পরিণত বয়সে কথা বলাও একটি মু'জিযা। কারণ তিনি পুনর্বার পৃথিবীতে পদার্পণ করবেন।

মু'জিযা দাবি করা মুমিনের পক্ষে অনুচিত : قَالَ اتَّقُوا اللّٰهَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ যখন হাওয়ারীরা হযরত ঈসা (আ.)-এর কাছে আকাশ থেকে খাদ্যাধার অবতারণ দাবি করল, তখন তিনি উত্তরে বলনে, যদি তোমরা ঈমানদার হও, তবে আল্লাহকে ভয় কর। এতে বুঝা যায় যে, ঈমানদার বান্দার পক্ষে এ ধরনের ফরমায়েশ করে আল্লাহকে পরীক্ষা করা কিংবা তাঁর কাছে অলৌকিক বিষয় দাবি করা একান্ত অনুচিত; বরং ঈমানদার বান্দার পক্ষে আল্লাহর নির্ধারিত পথে রুজি ইত্যাদি অন্বেষণ করাই কর্তব্য।

শব্দ বিশ্লেষণ

أَيَّدْتُّ : সীগাহ واحد متكلم বহছ ماضى معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّائِيْدُ মূলবর্ণ (أ . ى . د) জিনস মুরাক্কাব مهموز فاء و اجوف يائى অর্থ– আমি সাহায্য করলাম।

اَلْمَهْدُ : শব্দটি একবচন, বহুবচন مُهُوْدٌ অর্থ- কোল।

كَهْلٌ : শব্দটি একবচন, বহুবচন كُهُوْلٌ অর্থ– পূর্ণ বয়স, মধ্য বয়স। ৩২-৩৫ বছর বয়সের লোক।

تُبْرِئُ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِبْرَاءُ মূলবর্ণ (ب . ر . ء) জিনস مهموز لام অর্থ– তুমি নিরাময় করে দিতে।

اَكْمَهَ : সীগাহ واحد مذكر বহছ صفات مشبه বাব سَمِعَ মাসদার اَلْكَمَهُ মূলবর্ণ (ك . م . ه) জিনস صحيح অর্থ– জন্মান্ধ।

اَلْاَبْرَصَ : সীগাহ واحد مذكر বহছ صفات مشبه বাব سَمِعَ মাসদার اَلْبَرَصُ মূলবর্ণ (ب . ر . ص) জিনস صحيح অর্থ– কুষ্ঠরোগী।

مَائِدَةٌ : শব্দটি একবচন, বহুবচনে مَائِدَاتٌ অর্থ– খাওয়ার জিনিস।

www.almodina.com

قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللّٰهُمَّ رَبَّنَآ اَنْزِلْ عَلَيْنَا مَآئِدَةً مِّنَ السَّمَآءِ تَكُوْنُ لَنَا عِيْدًا لِّاَوَّلِنَا وَاٰخِرِنَا وَاٰيَةً مِّنْكَ ۚ وَارْزُقْنَا وَاَنْتَ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ (١١٤)

অনুবাদ : (১১৪) ঈসা ইবনে মারইয়াম দোয়া করলেন, হে আল্লাহ! হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের প্রতি আসমান হতে খাদ্য অবতীর্ণ করুন, যেন তা আমাদের জন্য অর্থাৎ আমাদের মধ্যে যারা প্রথমে [বর্তমানে আছে] এবং যারা পরে সকলের জন্য একটা আনন্দের বিষয় হয় এবং আপনার পক্ষ হতে এক নিদর্শন হয়ে থাকে, আর আমাদেরকে [খাদ্য] প্রদান করুন, বস্তুতঃ আপনি তো সর্বোত্তম প্রদানকারী।

قَالَ اللّٰهُ اِنِّيْ مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ ۚ فَمَنْ يَّكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَاِنِّيْٓ اُعَذِّبُهٗ عَذَابًا لَّآ اُعَذِّبُهٗٓ اَحَدًا مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ (١١٥)

(১১৫) আল্লাহ তা'আলা বললেন, আমি এই খাদ্য তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ করব, অনন্তর তোমাদের মধ্যে যে তার পর অকৃতজ্ঞ হবে, আমি তাকে এমন শাস্তি দিব যে, বিশ্ববাসীদের মধ্যে ঐ শাস্তি আর কাউকেও দিব না।

وَاِذْ قَالَ اللّٰهُ يٰعِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ ءَاَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُوْنِيْ وَاُمِّيَ اِلٰهَيْنِ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۗ قَالَ سُبْحٰنَكَ مَا يَكُوْنُ لِيْٓ اَنْ اَقُوْلَ مَا لَيْسَ لِيْ ۗ بِحَقٍّ ۗ اِنْ كُنْتُ قُلْتُهٗ فَقَدْ عَلِمْتَهٗ ۗ تَعْلَمُ مَا فِيْ نَفْسِيْ وَلَآ اَعْلَمُ مَا فِيْ نَفْسِكَ ۗ اِنَّكَ اَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ (١١٦)

(১১৬) আর যখন আল্লাহ বলবেন, হে ঈসা ইবনে মারইয়াম! তুমি কি তাদেরকে বলেছিলে যে, আল্লাহ ছাড়াও আমাকে এবং আমার মাতাকে মা'বূদ নির্ধারণ করে নাও, ঈসা নিবেদন করবেন, আমি তো আপনাকে পবিত্র মনে করি, আমার পক্ষে কোনো মতেই শোভনীয় ছিল না যে, আমি এমন কথা বলি যা বলার আমার কোনোই অধিকার নেই, যদি আমি বলে থাকি, তাহলে অবশ্যই আপনার জানা থাকবে, আপনি তো আমার অন্তরস্থিত কথাও জানেন, পক্ষান্তরে আপনার জ্ঞানে যা কিছু রয়েছে, আমি তা জানি না, সমস্ত গায়েবের বিষয় আপনিই জ্ঞাত।

শাব্দিক অনুবাদ

(১১৪) قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ ঈসা ইবনে মারইয়াম দোয়া করলেন اللّٰهُمَّ হে আল্লাহ! رَبَّنَآ হে আমাদের প্রতিপালক! اَنْزِلْ عَلَيْنَا مَآئِدَةً مِّنَ السَّمَآءِ আমাদের প্রতি আসমান হতে খাদ্য অবতীর্ণ করুন تَكُوْنُ لَنَا عِيْدًا যেন তা আমাদের জন্য একটা আনন্দের বিষয় হয় لِّاَوَّلِنَا وَاٰخِرِنَا অর্থাৎ আমাদের মধ্যে যারা প্রথমে [বর্তমানে আছে] এবং যারা পরে সকলের জন্য وَاٰيَةً مِّنْكَ এবং আপনার পক্ষ হতে এক নিদর্শন হয়ে থাকে وَارْزُقْنَا আর আমাদেরকে [খাদ্য] প্রদান করুন وَاَنْتَ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ বস্তুতঃ আপনি তো সর্বোত্তম প্রদানকারী।

(১১৫) قَالَ اللّٰهُ আল্লাহ তা'আলা বললেন اِنِّيْ مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ আমি এই খাদ্য তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ করব فَمَنْ يَّكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ অনন্তর তোমাদের মধ্যে যে তার পর অকৃতজ্ঞ হবে فَاِنِّيْٓ اُعَذِّبُهٗ عَذَابًا আমি তাকে এমন শাস্তি দিব যে لَّآ اُعَذِّبُهٗٓ اَحَدًا مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ বিশ্ববাসীদের মধ্যে ঐ শাস্তি আর কাউকেও দিব না।

(১১৬) وَاِذْ قَالَ اللّٰهُ আর যখন আল্লাহ বলবেন يٰعِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ হে ঈসা ইবনে মারইয়াম! ءَاَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ তুমি কি তাদেরকে বলেছিলে যে اتَّخِذُوْنِيْ وَاُمِّيَ اِلٰهَيْنِ আমাকে এবং আমার মাতাকে মা'বূদ নির্ধারণ করে নাও مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ আল্লাহ ছাড়াও قَالَ ঈসা নিবেদন করবেন سُبْحٰنَكَ আমি তো আপনাকে পবিত্র মনে করি مَا يَكُوْنُ لِيْٓ اَنْ اَقُوْلَ আমার পক্ষে কোনো মতেই শোভনীয় ছিল না যে مَا لَيْسَ لِيْ بِحَقٍّ আমি এমন কথা বলি যা বলার আমার কোনোই অধিকার নেই اِنْ كُنْتُ قُلْتُهٗ যদি আমি বলে থাকি فَقَدْ عَلِمْتَهٗ তা হলে অবশ্যই আপনার জানা থাকবে تَعْلَمُ مَا فِيْ نَفْسِيْ আপনি তো আমার অন্তরস্থিত কথাও জানেন وَلَآ اَعْلَمُ مَا فِيْ نَفْسِكَ পক্ষান্তরে আপনার জ্ঞানে যা কিছু রয়েছে, আমি তা জানি না اِنَّكَ اَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ সমস্ত গায়েবের বিষয় আপনিই জ্ঞাত।

www.almodina.com

مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَآ أَمَرْتَنِي بِهٖٓ أَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ ۚ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا مَّا دُمْتُ فِيْهِمْ ۚ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيْبَ عَلَيْهِمْ ۚ وَأَنْتَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ (١١٧)

অনুবাদ : (১১৭) আমি তো তাদেরকে কিছুই বলিনি তা ব্যতীত, যা আপনি আমাকে বলতে আদেশ করেছেন যে, তোমরা আল্লাহর বন্দেগি কর, যিনি আমারও পরওয়ারদেগার তোমাদেরও পরওয়ারদেগার, আমি তাদের সম্বন্ধে জ্ঞাত ছিলাম, যতক্ষণ তাদের মধ্যে ছিলাম, অনন্তর যখন আপনি আমাকে উঠিয়ে নিয়েছেন, তখন আপনিই তাদের সম্বন্ধে অবগত রয়েছেন, আর আপনি সর্ববিষয়ে পূর্ণ খবর রাখেন।

إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ ۚ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ (١١٨)

(১১৮) আপনি যদি তাদেরকে শাস্তি প্রদান করেন, তবে তারা তো আপনার বান্দা, আর যদি তাদেরকে ক্ষমা করে দেন, তবে আপনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

قَالَ اللّٰهُ هٰذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصّٰدِقِيْنَ صِدْقُهُمْ ۚ لَهُمْ جَنّٰتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ أَبَدًا ۚ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ ۚ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ (١١٩)

(১১৯) আল্লাহ বলবেন, তা সেই দিন যে, যারা সত্যবাদী ছিল তাদের সত্যবাদিতা তাদের কাজে আসবে, তারা উদ্যান প্রাপ্ত হবে, যার তলদেশে নহরসমূহ বইতে থাকবে, যেখানে তারা অনন্তকাল থাকবে, আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন, এবং তারা আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে, তাই হচ্ছে মহা সফলতা।

لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيْهِنَّ ۚ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ (١٢٠)

(১২০) আল্লাহরই জন্য রয়েছে বাদশাহী আসমানসমূহের ও জমিনের এবং ঐ সকল বস্তুর যা তাতে বিদ্যমান রয়েছে, আর তিনি সকল বিষয়ে পূর্ণ ক্ষমতাবান।

শাব্দিক অনুবাদ.

(১১৭) مَا قُلْتُ لَهُمْ আমি তো তাদেরকে কিছুই বলিনি তা ব্যতীত إِلَّا مَآ أَمَرْتَنِي بِهٖ যা আপনি আমাকে বলতে আদেশ করেছেন أَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ যে তোমরা আল্লাহর বন্দেগি কর رَبِّي وَرَبَّكُمْ যিনি আমারও পরওয়ারদেগার তোমাদেরও পরওয়ারদেগার। وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا আমি তাদের সম্বন্ধে জ্ঞাত ছিলাম مَّا دُمْتُ فِيْهِمْ যতক্ষণ তাদের মধ্যে ছিলাম فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي অনন্তর যখন আপনি আমাকে উঠিয়ে নিয়েছেন كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيْبَ عَلَيْهِمْ তখন আপনিই তাদের সম্বন্ধে অবগত রয়েছেন وَأَنْتَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ আর আপনি সর্ববিষয়ে পূর্ণ খবর রাখেন।

(১১৮) إِنْ تُعَذِّبْهُمْ আপনি যদি তাদেরকে শাস্তি প্রদান করেন فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ তবে তারা তো আপনার বান্দা وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ আর যদি তাদেরকে ক্ষমা করে দেন فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ তবে আপনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

(১১৯) قَالَ اللّٰهُ আল্লাহ বলবেন هٰذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصّٰدِقِيْنَ صِدْقُهُمْ তা সেই দিন যে, যারা সত্যবাদী ছিল তাদের সত্যবাদিতা তাদের কাজে আসবে لَهُمْ جَنّٰتٌ তারা উদ্যান প্রাপ্ত হবে تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهٰرُ যার তলদেশে নহরসমূহ বইতে থাকবে خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ أَبَدًا যেখানে তারা অনন্তকাল থাকবে رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন وَرَضُوْا عَنْهُ এবং তারা আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ তাই হচ্ছে মহা সফলতা।

(১২০) لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ আল্লাহরই জন্য রয়েছে বাদশাহী আসমানসমূহের ও জমিনের وَمَا فِيْهِنَّ এবং ঐ সকল বস্তুর যা তাতে বিদ্যমান রয়েছে وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ আর তিনি সকল বিষয়ে পূর্ণ ক্ষমতাবান।

www.almodina.com

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

নিয়ামত অসাধারণ বড় হলে অকৃতজ্ঞতার শাস্তিও বড় হয় : فَاِنِّیْٓ اُعَذِّبُهٗ عَذَابًا لَّآ اُعَذِّبُهٗٓ اَحَدًا مِّنَ الْعٰلَمِیْنَ এ আয়াত থেকে জানা গেল যে, নিয়ামত অসাধারণ ও অনন্য হলে তার কৃতজ্ঞতার তাকিদও অসাধারণ হওয়া দরকার এবং অকৃতজ্ঞতার শাস্তিও অসাধারণ হওয়া স্বাভাবিক।

মায়েদা তথা খাদ্যাধার আকাশ থেকে অবতীর্ণ হয়েছিল কি না, এ সম্পর্কে তাফসীরবিদগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। সাধারণ তাফসীরবিদগণ থেকে বর্ণিত হয়েছিল। তিরমিযীর হাদীসে হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসার (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, খাদ্যাধার আকাশ থেকে নাজিল হয়েছিল এবং তাতে রুটি ও গোশত ছিল। এ হাদীসে আরো বলা হয়েছে যে, তারা (অর্থাৎ তাদের কিছু সংখ্যক) বিশ্বাসভঙ্গে লিপ্ত হয়েছিল এবং পরবর্তী দিনের জন্য সঞ্চয় করে রেখেছিল। ফলে তারা বানর ও শূকরে রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছিল। (نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ غَضَبِ اللّٰهِ)

এ হাদীস থেকে আরো জানা যায় যে, তারা তা ভক্ষণও করেছিল। আয়াতে نَأْكُلَ শব্দে এ তথ্যও বিবৃত হয়েছে। তবে পরবর্তী সময়ের জন্য সঞ্চয় করে রাখা নিষিদ্ধ ছিল। –[বয়ানুল কুরআন]

وَاِذْ قَالَ اللّٰهُ یٰعِیْسٰی আল্লাহ তা'আলা সবকিছু জানেন। সুতরাং অজানাকে জানার জন্য হযরত ঈসা (আ.)–কে প্রশ্ন করা হয়নি; বরং এর উদ্দেশ্য খ্রিস্টান জাতিকে তিরস্কার করা ও ধিক্কার দেওয়া যে, যাকে তোমরা উপাস্য মনে করছ সে স্বয়ং তোমাদের বিশ্বাসের বিপরীতে স্বীয় দাসত্ব স্বীকার করছে এবং তোমাদের অপবাদ থেকে সে মুক্ত। –[ইবনে কাছীর]

فَلَمَّا تَوَفَّیْتَنِیْ كُنْتَ اَنْتَ الرَّقِیْبَ عَلَیْهِمْ : হযরত ঈসা (আ.)–এর মৃত্যু অথবা আকাশে উত্থিত করা ইত্যাদি বিষয়ে সূরা আলে-ইমরানের اِنِّیْ مُتَوَفِّیْكَ وَرَافِعُكَ আয়াতে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। সেখানে দেখে নেওয়া দরকার। فَلَمَّا تَوَفَّیْتَنِیْ বাক্যটিকে হযরত ঈসা (আ.)–এর মৃত্যুর দলিল ও আকাশে উত্থিত হওয়ার বিষয়টিকে অস্বীকার করার প্রমাণ হিসেবে উপস্থিত করা ঠিক নয়। কেননা এ কথোপকথন কিয়ামতের দিন হবে। তখন আকাশ থেকে অবতরণের পর তাঁর সত্যিকার মৃত্যু হবে অতীত বিষয়। ইবনে কাছীর হযরত আবূ মূসা আশআরী (রা.) -এর রেওয়ায়েতে ক্রমে এক হাদীস বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, কিয়ামতের দিন নবী-রাসূলগণকে ও তাঁদের উম্মতকে ডাকা হবে। অতঃপর হযরত ঈসা (আ.)–কে ডাকা হবে। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে স্বীয় নিয়ামতের কথা স্মরণ করাবেন এবং নিকটে এনে বলবেন : হে মরিয়ম তনয় ঈসা, اُذْكُرْ نِعْمَتِیْ عَلَیْكَ وَعَلٰی وَالِدَتِكَ তোমার প্রতি ও তোমার মাতার প্রতি আমি যে সমস্ত নিয়ামত দান করেছিলাম তা স্মরণ কর। অবশেষে বলবেন : وَاِذْ قَالَ اللّٰهُ یٰعِیْسَی ابْنَ مَرْیَمَ ءَاَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُوْنِیْ وَاُمِّیَ اِلٰهَیْنِ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ হে ঈসা! তুমি কি লোকদেরকে এমন কথা বলেছ যে, আমাকে ও আমার মাতাকে আল্লাহ ছাড়া উপাস্যরূপে গ্রহণ কর?

ঈসা বলবেন : পরওয়ারদেগার! আমি এরূপ বলিনি। এরপর খ্রিস্টানদেরকে প্রশ্ন করা হবে। তারা বলবে : হ্যাঁ, তিনি আমাদেরকে এ নির্দেশই দিয়েছিলেন। এরপর খ্রিস্টানদেরকে দোজখের দিকে হাঁকিয়ে দেওয়া হবে।

اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ অর্থাৎ আপনি বান্দাদের প্রতি জুলুম ও অন্যায় কঠোরতা করতে পারেন না। তাই তাদেরকে শাস্তি দিলে তা ন্যায়বিচার ও বিজ্ঞতা-ভিত্তিকই হবে। অগত্যা যদি ক্ষমা করে দেন, তবে এ ক্ষমাও অক্ষমতাপ্রসূত হবে না। কেননা আপনি মহাপরাক্রান্ত ও প্রবল। তাই কোনো অপরাধী আপনার শক্তির নাগালের বাইরে যেতে পারবে না। যেহেতু আপনি সুবিজ্ঞ , তাই এটাও সম্ভব নয় যে, অপরাধীকে বিনা বিচারেই ছেড়ে দিবেন। মোটকথা, অপরাধীদের ব্যাপারে আপনি যে রায়ই দিবেন, তাই সম্পূর্ণ বিজ্ঞজনোচিত ও সক্ষমতাসুলভ হবে। হযরত ঈসা (আ.) হাশরের ময়দানে এসব কথা বলবেন। সেখানে কাফেরদের পক্ষে কোনোরূপ সুপারিশ, দয়া ভিক্ষা ইত্যাদি চলবে না। তাই তিনি عَزِیْزٌ حَكِیْمٌ এর পরিবর্তে غَفُوْرٌ رَّحِیْمٌ ইত্যাদি গুণবাচক শব্দ অবলম্বন করেননি। এর বিপরীতে হযরত ইবরাহীম (আ.) দুনিয়াতে পরওয়ারদেগারের দরবারে আরজ করেছিলেন : رَبِّ اِنَّهُنَّ اَضْلَلْنَ كَثِیْرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِیْ فَاِنَّهٗ مِنِّیْ وَمَنْ عَصَانِیْ فَاِنَّكَ غَفُوْرٌ رَّحِیْمٌ হে পরওয়ারদেগার! এ মূর্তিগুলো অনেক মানুষকে পথভ্রষ্ট করেছে। তাদের মধ্যে যে আমার অনুসরণ করে, সে আমার লোক এবং যে আমার অবাধ্যতা করে, তুমি অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু। অর্থাৎ, এখনও সময় আছে; তুমি স্বীয় রহমতে ভবিষ্যতে তাদেরকে তওবা ও সত্যের প্রতি প্রত্যাবর্তনের শক্তি দান করে অতীত গুনাহ ক্ষমা করতে পার। –[ফাওয়ায়েদে উসমানী]

ইবনে কাছীর হযরত আবূ যর (রা.)-এর বাচনিক বর্ণনা করেন যে, মহানবী ﷺ একবার সারা রাত্রি إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ আয়াতখানিই পাঠ করতে থাকেন। ভোর হলে আমি আরজ করলাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি এ আয়াতটিই পাঠ করতে করতে ভোর করেছেন। এ আয়াত দ্বারাই রুকূ' করেছেন এবং এ আয়াত দ্বারা সেজদা করেছেন। তিনি বললেন : আমি পরওয়ারদেগারে কাছে নিজের জন্য শাফায়াতের আবেদন করেছি। আবেদন মঞ্জুর হয়েছে। অতি সত্বরই আমি তা লাভ করব। আমি এমন এক ব্যক্তির জন্য শাফায়াত করতে পারব, যে আল্লাহ তা'আলার সাথে কোনো অংশীদার করেনি।

অন্য এক হাদীসে বলা হয়েছে : মহানবী ﷺ উপরিউক্ত আয়াত পাঠ করে আকাশের দিকে হস্ত প্রসারিত করেন এবং বলেন اَللّٰهُمَّ اُمَّتِىْ অর্থাৎ হে পাক পরওয়ারদেগার! আমার উম্মতের প্রতি করুণার দৃষ্টি দাও। অতঃপর তিনি কাঁদতে থাকেন। আল্লাহ তা'আলা জিবরাঈলের মাধ্যমে এভাবে কাঁদার কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি জিবরাঈলকে উপরিউক্ত উক্তি শুনিয়ে দেন। আল্লাহ তা'আলা জিবরাঈলকে বলেছেন : তা হলে যাও এবং (হযরত) মুহাম্মদ ﷺ কে বলে দাও যে, আমি অতিসত্ত্বর আপনার উম্মতের ব্যাপারে আপনাকে সন্তুষ্ট করব- অসন্তুষ্ট করব না।

قَالَ اللّٰهُ هٰذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصّٰدِقِيْنَ صِدْقُهُمْ সাধারণভাবে বাস্তবসম্মত উক্তিকে 'সিদক' তথা সত্য এবং বাস্তব বিরুদ্ধ উক্তিকে 'কিযব' তথা মিথ্যা মনে করা হয়। কিন্তু কুরআন-সুন্নাহ, থেকে জানা যায় যে, সত্য ও মিথ্যা শুধু উক্তিই নয়, কর্মও হতে পারে। নিম্নোক্ত হাদীসে বাস্তব বিরোধী কর্মকেও মিথ্যা বলা হয়েছে :

مَنْ تَحَلّٰى بِمَا لَمْ يُعْطَ كَانَ كَلَابِسِ ثَوْبَىْ زُوْرٍ অর্থাৎ, কেউ যদি এমন অলঙ্কারে সজ্জিত হয়, যা তাকে দেওয়া হয়নি, অর্থাৎ, এমন কোনো গুণ বা কর্ম দাবি করে, যা তার মধ্যে নেই, তবে সে যেন মিথ্যার বস্ত্র পরিধান করে।'

অন্য এক হাদীসে প্রকাশ্য ও গোপনে উত্তমরূপে নামাজ আদায়কারীকে সত্য বান্দা বলা হয়েছে :

اِنَّ الْعَبْدَ اِذَا صَلّٰى فِى الْعَلَانِيَةِ فَاَحْسَنَ وَصَلّٰى فِى السِّرِّ فَاَحْسَنَ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى هٰذَا عَبْدِىْ حَقًّا

অর্থাৎ যে ব্যক্তি জনসমক্ষে উত্তমরূপে নামাজ পড়ে এবং নির্জনতায়ও এমনিভাবে নামাজ পড়ে, তার সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন : সে আমার সত্যিকার বান্দা। -[মিশকাত]

رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ অর্থাৎ আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও আল্লাহর প্রতি। এক হাদীসে বলা হয়েছে জান্নাত পাওয়ার পর আল্লাহ তা'আলা বলবেন, বড় নিয়ামত এই যে, আমি তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট; এখন থেকে কখনও তেমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হবো না। وَذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ অর্থাৎ এটিই মহান। সফলতা স্রষ্টা ও পরম প্রভুর সন্তুষ্টি অর্জিত হয়ে গেলে এর চাইতে বৃহত্তর সফলতা আর কি হতে পারে?

শব্দ বিশ্লেষণ

اَلْغُيُوْبُ : শব্দটি একবচন, বহুবচন غَيْبٌ অর্থ- অদৃশ্য জ্ঞান।

تَوَفَّيْتَ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ ماضى معروف বাব تَفَعُّلٌ মাসদার اَلتَّوَفِّىْ মূলবর্ণ (و . ف . ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ- আপনি উঠিয়ে নিয়েছেন।

اَلرَّقِيْبُ : সীগাহ واحد مذكر বহছ صفت مشبهة বাব نَصَرَ মাসদার اَلرَّقَابَةُ মূলবর্ণ (ر . ق . ب) জিনস صحيح অর্থ- হেফাজতকারী।

سُوْرَةُ الْاَنْعَامِ

সূরাতুল আন'আম

মদীনায় অবতীর্ণ : আয়াত– ১২০, রুকূ'– ১৬

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময়, দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

অনুবাদ	আয়াত
অনুবাদ : (১) সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই জন্য, যিনি আসমানসমূহ ও জমিনকে সৃষ্টি করেছেন এবং আঁধার ও আলোকে বানিয়েছেন, তবুও কাফেররা [ইবাদতে] নিজ পরওয়ারদেগারের সমতুল্য [অন্যকে] সাব্যস্ত করে।	اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمٰتِ وَالنُّوْرَ ۖ ثُمَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُوْنَ (١)
(২) তিনি এমন যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন মৃত্তিকা হতে অতঃপর নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, [মৃত্যুর জন্য] এক সময় এবং আরো একটি নির্দিষ্ট সময় [অর্থাৎ পুনরুত্থান হওয়ার সময়] খাছ আল্লাহর নিকট রয়েছে, তথাপিও তোমরা সন্দেহ কর।	هُوَ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ طِيْنٍ ثُمَّ قَضٰىٓ اَجَلًا ۖ وَاَجَلٌ مُّسَمًّى عِنْدَهٗ ثُمَّ اَنْتُمْ تَمْتَرُوْنَ (٢)
(৩) আর তিনিই বরহক মা'বূদ আসমানেও এবং জমিনেও তিনি তোমাদের গোপনীয় অবস্থাকেও জানেন এবং তোমাদের প্রকাশ্য অবস্থাকেও জানেন, আর তোমরা যা কিছু অর্জন কর, তাও জানেন।	وَهُوَ اللّٰهُ فِي السَّمٰوٰتِ وَفِي الْاَرْضِ ۖ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُوْنَ (٣)

শাব্দিক অনুবাদ

(১) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই জন্য اَلَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ যিনি আসমানসমূহ ও জমিনকে সৃষ্টি করেছেন وَجَعَلَ الظُّلُمٰتِ وَالنُّوْرَ এবং আঁধার ও আলোকে বানিয়েছেন ثُمَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُوْنَ তবুও কাফেররা [ইবাদতে] নিজ পরওয়ারদেগারের সমতুল্য [অন্যকে] সাব্যস্ত করে।

(২) هُوَ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ তিনি এমন যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন مِّنْ طِيْنٍ মৃত্তিকা হতে ثُمَّ قَضٰىٓ اَجَلًا অতঃপর নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, [মৃত্যুর জন্য] এক সময় وَاَجَلٌ مُّسَمًّى عِنْدَهٗ এবং আরো একটি নির্দিষ্ট সময় [অর্থাৎ পুনরুত্থান হওয়ার সময়] খাছ আল্লাহর নিকট রয়েছে ثُمَّ اَنْتُمْ تَمْتَرُوْنَ তথাপিও তোমরা সন্দেহ কর।

(৩) وَهُوَ اللّٰهُ আর তিনিই বরহক মা'বূদ فِي السَّمٰوٰتِ وَفِي الْاَرْضِ আসমানেও এবং জমিনেও يَعْلَمُ سِرَّكُمْ তিনি তোমাদের গোপনীয় অবস্থাকেও জানেন وَجَهْرَكُمْ এবং তোমাদের প্রকাশ্য অবস্থাকেও জানেন وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُوْنَ আর তোমরা যা কিছু অর্জন কর তাও জানেন।

وَمَا تَأْتِيهِمْ مِّنْ اٰيَةٍ مِّنْ اٰيٰتِ رَبِّهِمْ اِلَّا كَانُوْا عَنْهَا مُعْرِضِيْنَ (٤)	অনুবাদ : (৪) আর তাদের নিকট তাদের প্রতিপালকের নিদর্শনসমূহ হতে যে কোনো নির্দশনই আসে তারা তা হতে বিমুখই থাকে।
فَقَدْ كَذَّبُوْا بِالْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ ۭ فَسَوْفَ يَاْتِيْهِمْ اَنْۢبٰۗؤُا مَا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ (٥)	(৫) অনন্তর তারা এই সত্য কিতাবকেও মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে, যখন তা তাদের নিকট পৌঁছেছে, সুতরাং তার সংবাদ সত্বরই তাদের নিকট পৌঁছবে, যার সাথে তারা উপহাস করছিল।
اَلَمْ يَرَوْا كَمْ اَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنْ قَرْنٍ مَّكَّنّٰهُمْ فِي الْاَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَّكُمْ وَاَرْسَلْنَا السَّمَآءَ عَلَيْهِمْ مِّدْرَارًا ۠ وَّجَعَلْنَا الْاَنْهٰرَ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهِمْ فَاَهْلَكْنٰهُمْ بِذُنُوْبِهِمْ وَاَنْشَاْنَا مِنْۢ بَعْدِهِمْ قَرْنًا اٰخَرِيْنَ (٦)	(৬) তারা কি দেখেনি যে, আমি তাদের পূর্বে কত সম্প্রদায়কে ধ্বংস করে দিয়েছি? যাদেরকে আমি পৃথিবীতে এমন শক্তি দান করেছিলাম, যে শক্তি তোমাদেরকে প্রদান করিনি, এবং আমি তাদের উপর প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণ করেছি এবং আমি তাদের [ক্ষেত ও বাগানসমূহের] পাদদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত করেছি, অনন্তর আমি তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছি তাদের পাপের দরুন এবং তাদের পরে সৃষ্টি করেছি অন্য সম্প্রদায়কে।
وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتٰبًا فِيْ قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوْهُ بِاَيْدِيْهِمْ لَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِنْ هٰذَآ اِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ (٧)	(৭) আর যদি আমি কাগজে লিখিত কোনো কিতাব আপনার প্রতি নাজিল করতাম অতঃপর তারা তাকে নিজ হস্ত দ্বারা স্পর্শ করত, তথাপিও এসব কাফেররা তাই বলত যে, তা স্পষ্ট জাদু ভিন্ন আর কিছুই নয়।

শাব্দিক অনুবাদ

(৪) وَمَا تَأْتِيهِمْ مِّنْ اٰيَةٍ مِّنْ اٰيٰتِ رَبِّهِمْ আর তাদের নিকট তাদের প্রতিপালকের নিদর্শনসমূহ হতে যে কোনো নির্দশনই আসে اِلَّا كَانُوْا عَنْهَا مُعْرِضِيْنَ তারা তা হতে বিমুখই থাকে।

(৫) فَقَدْ كَذَّبُوْا بِالْحَقِّ অনন্তর তারা এই সত্য কিতাবকেও মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে لَمَّا جَآءَهُمْ যখন তা তাদের নিকট পৌঁছেছে فَسَوْفَ يَاْتِيْهِمْ اَنْۢبٰۗؤُا সুতরাং তার সংবাদ সত্বরই তাদের নিকট পৌঁছবে مَا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ যার সাথে তারা উপহাস করছিল।

(৬) اَلَمْ يَرَوْا তারা কি দেখেনি যে كَمْ اَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنْ قَرْنٍ আমি তাদের পূর্বে কত সম্প্রদায়কে ধ্বংস করে দিয়েছি? مَّكَّنّٰهُمْ فِي الْاَرْضِ যাদেরকে আমি পৃথিবীতে এমন শক্তি দান করেছিলাম مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَّكُمْ যে শক্তি তোমাদেরকে প্রদান করিনি। وَاَرْسَلْنَا السَّمَآءَ عَلَيْهِمْ مِّدْرَارًا এবং আমি তাদের উপর প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণ করেছি وَّجَعَلْنَا الْاَنْهٰرَ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهِمْ এবং আমি তাদের [ক্ষেত ও বাগানসমূহের] পাদদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত করেছি فَاَهْلَكْنٰهُمْ অনন্তর আমি তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছি بِذُنُوْبِهِمْ তাদের পাপের দরুন وَاَنْشَاْنَا مِنْۢ بَعْدِهِمْ قَرْنًا اٰخَرِيْنَ এবং তাদের পরে সৃষ্টি করেছি অন্য সম্প্রদায়কে।

(৭) وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ আর যদি আমি আপনার প্রতি নাজিল করতাম كِتٰبًا فِيْ قِرْطَاسٍ কাগজে লিখিত কোনো কিতাব فَلَمَسُوْهُ بِاَيْدِيْهِمْ অতঃপর তারা তাকে নিজ হস্ত দ্বারা স্পর্শ করত لَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا তথাপিও এসব কাফেররা তাই বলত যে اِنْ هٰذَآ اِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ তা স্পষ্ট জাদু ভিন্ন আর কিছুই নয়।

অনুবাদ : (৮) আর তারা এরূপ [-ও] বলে যে, তাঁর নিকট কোনো ফেরেশতা কেন প্রেরণ করা হয়নি? আর যদি আমি কোনো ফেরেশতা প্রেরণ করতাম, তবে সমস্ত বিষয়েরই সমাপ্তি ঘটত, অতঃপর তাদেরকে একটু অবকাশও দেওয়া হতো না।	وَقَالُوْا لَوْلَآ اُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ ؕ وَلَوْ اَنْزَلْنَا مَلَكًا لَّقُضِيَ الْاَمْرُ ثُمَّ لَا يُنْظَرُوْنَ (٨)

শাব্দিক অনুবাদ

(৮) وَقَالُوْا আর তারা এরূপ [-ও] বলে যে لَوْلَآ اُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ তাঁর নিকট কোনো ফেরেশতা কেন প্রেরণ করা হয়নি وَلَوْ اَنْزَلْنَا مَلَكًا আর যদি আমি কোনো ফেরেশতা প্রেরণ করতাম لَّقُضِيَ الْاَمْرُ তবে সমস্ত বিষয়েরই সমাপ্তি ঘটত ثُمَّ لَا يُنْظَرُوْنَ অতঃপর তাদেরকে একটু অবকাশও দেওয়া হতো না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

যোগসূত্র : সূরা আল মায়িদাহ-এর শেষাংশ ও এ সূরার প্রথমাংশের মধ্যে যোগসূত্র এই যে, উভয় স্থলেই শিরকের খণ্ডন ও একত্ববাদের প্রমাণের আলোচনা করা হয়েছে। আর সমষ্টিগতভাবে উভয় সূরার মধ্যে যোগসূত্র এই যে, উভয় সূরার মধ্যেই শরিয়তের বিধানাবলির আলোচনা করা হয়েছে। অবশ্য এতটুকু প্রভেদ রয়েছে যে, সূরা আল-মায়িদাহ- এ শরিয়তের মূলনীতির অন্যায় তার শাখা-বিধানসমূহও প্রচুর পরিমাণে বর্ণিত হয়েছে, গণনায় তার সংখ্যা বিশ পর্যন্ত উঠেছে। আর এ সূরার মধ্যে প্রায় সমগ্র সূরায় ব্যাপকভাবে শরিয়তের মূলনীতির বর্ণনাই অধিক হয়েছে, শাখা-বিধান খুবই কম। গণনায় আনুমানিক উল্লিখিত সংখ্যার তৃতীয়াংশ অথবা চতুর্থাংশের (অর্থাৎ ৫,৭ -এর) অধিক হবে না।

নামকরণ : اَنْعَامٌ (আন'আম) শব্দটি আরবি ভাষায় চতুষ্পদ ও গবাদি পশু তথা উট, গাভী, ভেড়া ও ছাগল ইত্যাদি-এর নর ও মাদী বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়। অত্র সূরায় ষোড়শ ও সপ্তদশ রুকূ'তে গৃহপালিত চতুষ্পদ জন্তু হালাল ও হারাম হওয়া সম্পর্কে আরবদের অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন ধারণার প্রতিবাদ করা হয়েছে। এটার প্রতি লক্ষ্য রেখেই এ সূরাটির নামকরণ করা হয়েছে। সূরা 'আল আন'আম' বা 'গৃহপালিত পশু'। এ কথার দ্বারা এটা বুঝানো উদ্দেশ্য নয় যে, অত্র সূরায় শুধু আন'আম সম্পর্কেই আলোচনা করা হয়েছে; বরং অনেক বিষয়ই আলোচিত হয়েছে, কিন্তু আন'আমের আলোচনাটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ ছিল তাই সূরাটির নামকরণ 'আল আন'আম' হওয়া যথার্থ হয়েছে।

বিষয়বস্তু : সূরা আল আন'আম মক্কা মুয়াযযমায় অবতীর্ণ হয়েছে। এতে ১৬৫ টি আয়াত ও ২০টি রুকূ' রয়েছে। এ সূরার সার হলো কয়েকটি বিষয়। যথা– একত্ববাদের প্রমাণ, প্রেরিতত্বের প্রমাণ, তাওহীদ ও রিসালাতের পোষকতার জন্য কতিপয় আম্বিয়ায়ে কেরামের ঘটনাবলি বর্ণনা, কুরআনের প্রমাণ, হাশরের দিন পুনরুত্থানের প্রমাণ, এ সমস্ত বিষয়ের অবিশ্বাসকারীদের শত্রুতামূলক আচরণ ও উক্তি, সেই অবিশ্বাসীদের প্রতি শাস্তির ভীতি প্রদর্শন, সেই ভীতি প্রদর্শনসমসূহের পোষকতার জন্য প্রাচীন কালের কতিপয় কাফের সম্প্রদায়ের প্রান্তির বর্ণনা, ঐ সমস্ত অবিশ্বাসকারীদের সাথে কথোপকথন ও বিতর্ক, তাদের কুপ্রথা ও বদ-অভ্যাসসমূহের নিন্দাবাদ, এদের সাথে আচরণে মধ্যম পন্থা বজায় রাখার শিক্ষা প্রদান , যেন তাবলীগেও শৈথিল্য না হয় এবং কঠোরতা করতে গিয়ে শরিয়তের সীমাও লজ্ঘিত না হয়; মেলামেশা করতে গিয়ে তোষামোদ না হয়, তাদের মন রক্ষা করতে কিংবা হেদায়েত করবার চিন্তায় অতিশয্য না হয়, তাদের মূর্খতামূলক প্রথাসমূহের মোকাবিলায় কতিপয় ইসলামিক মহান চরিত্রের বর্ণনা ইত্যাদি। এ সমস্ত কথোপকথন মুশরিকদের সাথেই হয়েছে, মাত্র দুই তিন স্থানে নবুয়ত ও কুরআনের মাসআলা কিংবা বস্তুসমূহের হালাল ও হারাম হওয়ার আলোচনার সামঞ্জস্যের দরুন প্রাসঙ্গিকভাবে আহলে কিতাব, বিশেষ করে ইহুদিদের দুষ্কৃতির আলোচনা হয়েছে।

অবতীর্ণের সময়কাল : এ সূরাটি অবতীর্ণ হওয়ার সময়কাল প্রসঙ্গে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, সূরা আল আন'আম মক্কা মুয়াযযমায় একরাত্রে অবতীর্ণ হয়েছে। তখন তার চতুর্দিকে ৭০ হাজার ফেরেশতা ঘিরে ছিলেন এবং তারা তাসবীহ পাঠ করছিলেন। হযরত ইবনে ওমর (রা.) এ সম্পর্কে বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন, সূরা আল আন'আম একত্রে নাজিল হয়েছে। হযরত আসমা বিনতে ইয়াযীদ (রা.) বলেন, এ সূরাটি যখন রাসূলে কারীম ﷺ-এর

উপর নাজিল হয়েছে তখন তিনি একটি উষ্ট্রীর পিঠে আরোহী অবস্থায় ছিলেন; আর আমি সে উষ্ট্রীর লাগাম ধরে দাঁড়িয়ে ছিলাম। এমতাবস্থায় সওয়ারির দুর্বহ ওজনের কারণে উষ্ট্রীর অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হয়ে গিয়েছিল। মনে হচ্ছিল তাঁর মেরুদণ্ড এই বুঝি ভেঙ্গে যাবে। মোটকথা, এ সূরার বিষয়বস্তু প্রসঙ্গে চিন্তা ভাবনা করলে এ কথা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, সূরাটি সম্ভবত নবী করীম ﷺ–এর মক্কী জীবনের শেষভাগে নাজিল করা হয়েছে।

(১) قوله اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** ইবনে আবী হাতেম হযরত আলী (রা.)–এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে. আলোচ্য আয়াত আহলে কিতাবের সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। ইবনে আবী হাতেম ও আবুশ্ শায়খ মুজাহিদের উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, আলোচ্য আয়াত যিন্দীকদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। তাদের আকিদাহ ও বিশ্বাস হলো আল্লাহ তা'আলা আঁধার, বিচ্ছু এবং অকল্যাণকর কোনো বস্তুকে সৃষ্টিকারী নন। আলো, শুভ ও কল্যাণকর সকল বস্তু তিনি সৃষ্টি করেন, তাদের এ ভ্রান্ত আকিদার জবাবে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ করেন। –[ফতহুল কাদীর ৯৯/২]

(৭) وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتٰبًا فِیْ قِرْطَاسٍ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** কালবী হতে বর্ণিত। নযর বিন হারিছ, আব্দুল্লাহ বিন আবী উমাইয়্যা ও নাওফাল বিন খুওয়াইলিদ সম্পর্কে উল্লিখিত আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। তারা রাসূল ﷺ–কে যখন বলল যে, যতক্ষণ না আল্লাহর পক্ষ হতে কিতাবের সাথে চার জন ফেরেশতা এসে এ সাক্ষী দিবে যে, এ কিতাব আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে এসেছে এবং আপনি আল্লাহর রাসূল, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা ঈমান গ্রহণ করবনা। তাদের এহেন উদ্ভট ও বিভ্রান্তকর দাবির পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা উল্লিখিত আয়াত নাজিল করেছেন। –[রূহুল মা'আনী ৯৫/৪/৭]

(৯) وَقَالُوْا لَوْلَا اُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** ইবনুল মুনযির ও ইবনে আবী হাতেম মুহাম্মদ বিন ইসহাকের উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ নিজ কওম তথা গোত্রীয় লোকজনকে ইসলামের দাওয়াত জানালেন এবং তাদের সাথে কথোপকথন করলেন। তখন যুম'আ বিন মুত্তালিব, নযর বিন হারিছ বিন কেলাদাহ, আব্দাহ বিন আব্দে ইয়াগূছ, উবাই বিন খলফ বিন ওহাব এবং আস বিন ওয়ায়েল বিন হিশাম রাসূল ﷺ–কে লক্ষ্য করে বলল, হে মুহাম্মদ! আপনার সাথে কোন ফেরেশতা থেকে? আপনার পক্ষ হতে মানুষকে বলে দিবে যে, আপনি আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত রাসূল। মানুষ আপনার সাথে যদি ফেরেশতা দেখতে পায় তাহলেই আমরা ঈমান আনতে পারি। সে পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। –[ফাতহুল কাদীর ১০২/২, বাহরে মুহীত ৮২/৪, কুরতুবী ৩৬২/৬, দুররে মানছূর ৫/৩, রূহুল মা'আনী ৯৬/৪/৭]

আবূ ইসহাক ইসফারায়িনী (র.) বলেন : এ সূরাটিতে তাওহীদের সমস্ত মূলনীতি ও পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে। এ সূরাটিকে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ বাক্য দ্বারা আরম্ভ করা হয়েছে। এতে খবর দেওয়া হয়েছে যে, সর্ববিধ প্রশংসা আল্লাহর জন্য। এ খবরের উদ্দেশ্য মানুষকে প্রশংসা শিক্ষা দেওয়া এবং এ বিশেষ পদ্ধতির শিক্ষাদানের মধ্যে এদিকেও ইঙ্গিত রয়েছে যে, তিনি কারো হামদ বা প্রশংসার মুখাপেক্ষী নন। কেউ প্রশংসা করুক বা না করুক, তিনি স্বীয় ওজুদ বা সত্তার পরাকাষ্ঠার দিক দিয়ে নিজেই প্রশংসনীয়। এ বাক্যের পর নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল এবং অন্ধকার ও আলো সৃষ্টি করার কথা উল্লেখ করে তাঁর প্রশংসনীয় হওয়ার প্রমাণও ব্যক্ত করা হয়েছে যে, যে সত্তা এহেন মহান শক্তি-সামর্থ্য ও বিজ্ঞতার বাহক, তিনিই হামদ ও প্রশংসার যোগ্য হতে পারেন।

এ আয়াতে سَمَاوَاتٌ শব্দটিকে বহুবচন এবং اَرْضٌ শব্দটিকে একবচনে উল্লেখ করা হয়েছে, যদিও অন্য এক আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সপ্ত আকাশ আকার-আকৃতি ও অন্যান্য অবস্থার দিক দিয়ে একটি অপরটি থেকে অনেক স্বতন্ত্র, কিন্তু সপ্ত পৃথিবী পরস্পর সমআকৃতি বিশিষ্ট; তাই এগুলোকে গণ্য করা হয়েছে। –[মাযহারী]

এমনিভাবে ظُلُمَاتٌ শব্দটিকে বহুবচন এবং نُوْرٌ শব্দটিকে একবচনে উল্লেখ করার মাঝে ইঙ্গিত রয়েছে যে, نُوْرٌ বলে বিশুদ্ধ সরল পথ ব্যক্ত করা হয়েছে এবং তা মাত্র একটিই। আর ظُلُمَاتٌ বলে ভ্রান্ত পথ ব্যক্ত করা হয়েছে, যা অসংখ্য। –[মাযহারী ও বাহরে মুহীত]

এখানে এ বিষয়টিও প্রণিধানযোগ্য যে, নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল নির্মাণ করাকে خَلَقَ শব্দ দ্বারা এবং অন্ধকার ও আলোর উদ্ভব করাকে جَعَلَ শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, অন্ধকার ও আলো নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের মতো স্বতন্ত্র ও স্বনির্ভর বস্তু নয়; বরং পরনির্ভর আনুষাঙ্গিক ও গুণবাচক বিষয়। অন্ধকারকে আলোর পূর্বে উল্লেখ করার কারণ

www.almodina.com

সম্ভবতঃ এই যে, এ জগতে অন্ধকার হলো আসল এবং আলো বিশেষ বিশেষ বস্তুর সাথে জড়িত। সেসব বস্তু সামনে থাকলে আলোর উদ্ভব হয়, না থাকলে সবকিছু অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে যায়।

আলোচ্য আয়াতের উদ্দেশ্য একত্ববাদের স্বরূপ ও সুস্পষ্ট প্রমাণ বর্ণনা করে জগতের ঐসব জাতিকে হুশিয়ার করা, যারা মূলত একত্ববাদে বিশ্বাসী নয় কিংবা বিশ্বাসী হওয়া সত্ত্বেও একত্ববাদের তাৎপর্যকে পরিত্যাগ করে বসেছে।

অগ্নি উপাসকদের মতে জগতের স্রষ্টা দু'জন ইয়াযদান ও আহরামান। তারা ইয়াযদানকে মঙ্গলের স্রষ্টা এবং আহরামানকে অমঙ্গলের স্রষ্টা বলে বিশ্বাস করে। এ দুটিকেই তারা অন্ধকার ও আলো বলে ব্যক্ত করে।

ভারতের পৌত্তলিকদের মতে তেত্রিশ কোটি দেবতা খোদার অংশীদার। আর্য সমাজ একত্ববাদে বিশ্বাসী হওয়া সত্ত্বেও আত্মা ও মূল পদার্থকে অনাদি এবং খোদার শক্তি-সামর্থ্য ও সৃষ্টি থেকে মুক্ত সাব্যস্ত করে একত্ববাদের মূল স্বরূপ থেকে সরে দাঁড়িয়েছে। এমনিভাবে খ্রিস্টানরা আল্লাহ তা'আলার অংশীদার সাব্যস্ত করেছে। এরপর একত্ববাদের বিশ্বাসকে টিকিয়ে রাখার জন্য তারা 'একে তিন' এবং 'তিনে এক'–এর অযৌক্তিক মতবাদের আশ্রয় নিয়েছে। আরবের মুশরিকরা তো ইলাহী বন্টনে চূড়ান্ত বদান্যতার পরিচয় দিয়েছে। প্রতিটি পাহাড়ের প্রতিটি বড় পাথরও তাদের মতে মানবজাতির উপাস্য হতে পারত। মোটকথা, যে মানবকে আল্লাহ তা'আলা 'আশরাফুল মাখলুকাত' তথা সৃষ্টির সেরা করেছিলেন, তারা যখন পথভ্রষ্ট হলো, তখন চন্দ্র, সূর্য, তারকারাজি, আকাশ, পানি, বৃক্ষলতা, এমনকি, পোকা-মাকড়কেও সেজদার যোগ্য উপাস্য রুজিদাতা ও বিপদ বিদূরণকারী সাব্যস্ত করে নিল।

কুরআন পাক আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলাকে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের স্রষ্টা এবং অন্ধকার ও আলোর উদ্ভাবক বলে উপরিউক্ত সব ভ্রান্ত বিশ্বাসের মূলোৎপাটন করেছে। কেননা অন্ধকার ও আলো, নভোমণ্ডল এবং এতে উৎপন্ন যাবতীয় বস্তু আল্লাহ তা'আলার সৃষ্ট। অতএব এগুলোকে কেমন করে আল্লাহ তা'আলার অংশীদার করা যায়?

প্রথম আয়াতে বৃহৎ জগৎ অর্থাৎ সমগ্র বিশ্বের বৃহত্তর বস্তুগুলোকে আল্লাহ তা'আলার সৃষ্ট ও মুখাপেক্ষী বলে মানুষকে নির্ভুল একত্ববাদ শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। অতঃপর দ্বিতীয় আয়াতে মানুষকে বলা হয়েছে যে, তোমার অস্তিত্ব স্বয়ং একটি ক্ষুদ্র জগৎ বিশেষ। যদি এরই সূচনা, পরিণতি ও বাসস্থানের প্রতি লক্ষ্য করা হয়, তবে একত্ববাদ একটা বাস্তব সত্য হয়ে সামনে ফুটে উঠবে। এ আয়াতে বলা হয়েছে : هُوَ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ طِيْنٍ ثُمَّ قَضٰى اَجَلًا অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলাই সে সত্তা যিনি তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃজন করেছেন। আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আ.)-কে একটি বিশেষ পরিমাণ মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন। সমগ্র পৃথিবীর অংশ এতে অন্তর্ভুক্ত ছিল। এ কারণেই আদম-সন্তানরা বর্ণ, আকার এবং চরিত্র ও অভ্যাসে বিভিন্ন। কেউ কৃষ্ণবর্ণ, কেউ শ্বেতবর্ণ, কেউ লালবর্ণ, কেউ কঠোর, কেউ নম্র, কেউ পবিত্র-স্বভাব বিশিষ্ট এবং কেউ অপবিত্র-স্বভাবের হয়ে থাকে। –[মাযহারী]

এই হচ্ছে মানব সৃষ্টির সূচনা। এরপর পরিণতির দুটি মনজিল উল্লেখ করা হয়েছে। একটি মানবের ব্যক্তিগত পরিণতি, যাকে মৃত্যু বলা হয়। অপরটি সমগ্র মানবগোষ্ঠীর ও তার উপকারে নিয়োজিত সৃষ্টজগত– সবার সমষ্টির পরিণতি, যাকে কিয়ামত বলা হয়। মানবের ব্যক্তিগতক পরিণতি বুঝাবার জন্য বলা হয়েছে : ثُمَّ قَضٰى اَجَلًا অর্থাৎ মানব সৃষ্টির পর আল্লাহ তা'আলা তার স্থায়িত্ব ও আয়ুষ্কালের জন্য একটি মেয়াদ নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন। এ মেয়াদের শেষ প্রান্তে পৌঁছার নাম মৃত্যু। এ মেয়াদ মানবের জানা না থাকলেও আল্লাহর ফেরেশতারা জানেন; বরং এ দিক দিয়ে মানুষও মৃত্যু সম্পর্কে অবগত। কেননা সে সর্বদা, সর্বত্র আশ-পাশে আদম-সন্তানদেরকে মৃত্যুবরণ করতে দেখে।

এরপর সমগ্র বিশ্বের পরিণতি অর্থাৎ কিয়ামতের উল্লেখ করে বলা হয়েছে : وَاَجَلٌ مُّسَمًّى عِنْدَهٗ অর্থাৎ আরো একটি মেয়াদ নির্দিষ্ট আছে, যা একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই জানেন। এ মেয়াদের পূর্ণ জ্ঞান ফেরেশতাদের নেই এবং মানুষেরও নেই। সারকথা এই যে, প্রথম আয়াতে বৃহৎ জগৎ অর্থাৎ গোটা বিশ্বের অবস্থা সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তা আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক সৃষ্ট ও নির্মিত। দ্বিতীয় আয়াতে এমনিভাবে ক্ষুদ্র জগৎ অর্থাৎ মানুষ যে আল্লাহর সৃষ্টজীব, তা বর্ণিত হয়েছে। এরপর মানুষকে শৈথিল্য থেকে জাগ্রত করার জন্য বলা হয়েছে যে, প্রত্যেক মানুষের একটি বিশেষ আয়ুষ্কাল রয়েছে, যার পর তার মৃত্যু অবধারিত প্রতিটি মানুষ এ বিষয়টি সর্বক্ষণ নিজের আশ-পাশে প্রত্যক্ষ করে।

وَاَجَلٌ مُّسَمًّى عِنْدَهٗ বাক্যে এ নির্দেশ রয়েছে যে, মানুষের ব্যক্তিগত। মৃত্যুকে যুক্তি ও প্রমাণ হিসেবে দাঁড় করিয়ে সমগ্র বিশ্বের ব্যাপক মৃত্যু অর্থাৎ কিয়ামতকে সপ্রমাণ করা একটা মনস্তাত্ত্বিক ও স্বাভাবিক বিষয়। তাই কেয়ামতের আগমনে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। এ কারণে আয়াতের শেষভাগে উপযুক্ততা প্রকাশার্থে বলা হয়েছে : ثُمَّ اَنْتُمْ تَمْتَرُوْنَ অর্থাৎ এহেন সুস্পষ্ট যুক্তি-প্রমাণ সত্ত্বেও তোমরা কিয়ামত সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ কর : এটা অনুচিত

তৃতীয় আয়াতে প্রথম দু আয়াতে বর্ণিত বিষয়বস্তুর ফলাফল বর্ণিত হয়েছে। তাই এই যে, আল্লাহ তা'আলাই এমন এক সত্তা যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে ইবাদত ও আনুগত্যের যোগ্য এবং তিনিই তোমাদের প্রতিটি প্রকাশ্য ও গোপন অবস্থা এবং প্রতিটি উক্তি ও কর্ম সম্পর্কে পুরোপুরি পরিজ্ঞাত।

চতুর্থ আয়াতে অমনোযোগী মানুষের হঠকারিতা ও সত্য বিরোধী জেদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে : وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদের সুস্পষ্ট যুক্তি-প্রমাণ ও নিদর্শন সত্ত্বেও অবিশ্বাসীরাও এ কর্মপন্থা অবলম্বন করে রেখেছে যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের হেদায়েতের জন্য যে কোনো নিদর্শন প্রেরণ করা হয়, তারা তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়– এ সম্পর্কে মোটেই চিন্তা-ভাবনা করে না।

পঞ্চম আয়াতে কতিপয় ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করে এ অমনোযোগিতার আরো বিবরণ দেওয়া হয়েছে, فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ অর্থাৎ সত্য যখন তাদের সামনে প্রতিভাত হলো, তখন তারা সত্যকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করল। এখানে 'সত্যের' অর্থ কুরআন হতে পারে এবং নবী করীম ﷺ–এর পবিত্র ব্যক্তিত্বও হতে পারে।

কেননা মহানবী ﷺ আজীবন আরব গোত্রসমূহের মধ্যেই অবস্থান করেন। তাঁর শৈশব থেকে যৌবন এবং যৌবন থেকে বার্ধক্য তাদের সামনে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তারা একথাও পুরোপুরিভাবেই জানত যে, মহানবী ﷺ কোনো মানুষের কাছে এক অক্ষরও শিক্ষালাভ করেননি। এমন কি নিজ হাতে নিজের নামও লিখতে পারতেন না। সারা আরবে তিনি উম্মি (নিরক্ষর) উপাধিতে খ্যাত ছিলেন। চল্লিশ বছর পূর্ণ হয়ে যেতেই অকস্মাৎ তাঁর মুখ দিয়ে নিগুঢ়তত্ত্ব, আধ্যাত্মবিদ্যা এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের এমন স্রোতধারা প্রবাহিত হতে লাগল, যা জগতের পারদর্শী দার্শনিকদেরকেও বিস্ময়াভিভূত করে দেয়। তিনি নিজের আনীত কালামের মোকাবিলা করার জন্য আরবের স্বনামখ্যাত প্রাঞ্জলভাষী কবি-সাহিত্যিক ও অলঙ্কারবিদদেরকে চ্যালেঞ্জ দিলেন। তারা মহানবী ﷺ-কে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য স্বীয় জান-মাল, মান-সম্ভ্রম, সন্তান-সন্ততি ও পরিবার-পরিজন বিসর্জন দিতে সর্বদা প্রস্তুত থাকত, কিন্তু এ চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে কুরআনের একটি আয়াতের অনুরূপ বাক্য রচনা করার সাহস তাদের কারো হলো না।

এভাবে নবী করীম ﷺ এবং কুরআনের অস্তিত্ব ছিল সত্যের এক বিরাট নির্দশন। এছাড়া মহানবী ﷺ–এর মাধ্যমে হাজারো মু'জিযা ও খোলাখুলি নিদর্শন প্রকাশ পায়, যে কোনো সুস্থ বিবেকসম্পন্ন মানুষ যা অস্বীকার করতে পারত না। কিন্তু কাফেররা এসব নিদর্শনকে সম্পূর্ণ মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিল। তাই আয়াতে বলা হয়েছে : فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ

আয়াতের শেষে তাদের অস্বীকৃতি ও মিথ্যারোপের অশুভ পরিণতির দিকে ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে : فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ অর্থাৎ আজ তো এসব অপরিণামদর্শী লোকেরা রাসূলুল্লাহ ﷺ–এর মু'জিযা, তাঁর আনীত হেদায়েত, কিয়ামত ও পরকাল সবকিছু নিয়েই হাস্যোপহাস করছে, কিন্তু সে সময় দূরে নয়, যখন এগুলোর স্বরূপ তাদের দৃষ্টিতে প্রতিভাত হবে। কিয়ামত প্রতিষ্ঠিত হবে। ঈমান ও আমলের হিসাব দিতে হবে এবং প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজ কৃতকর্মের প্রতিদান ও শাস্তি পাবে। তখন এগুলোকে বিশ্বাস ও স্বীকার করলেও কোনো উপকার হবে না। কেননা সেটা কর্ম জগৎ নয়– প্রতিদান দিবস। আল্লাহ তা'আলা এখনো চিন্তা ভাবনার সুযোগ দিয়েছেন। এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করে খোদায়ী নিদর্শনাবলিতে বিশ্বাস স্থাপন করলেই ইহকাল ও পরকালের কল্যাণ সাধিত হবে।

قوله أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم الخ : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে যারা খোদায়ী বিধান ও পয়গম্বরগণের শিক্ষা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিত কিংবা বিরোধিতা করত, তাদের প্রতি কঠোর শাস্তিবাণী উচ্চারিত হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে এসব অবিশ্বাসীর দৃষ্টি পরিপার্শ্বিক অবস্থা ও প্রাচীনকালের ঐতিহাসিক ঘটনাবলির প্রতি আকৃষ্ট করে তাদেরকে শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণের সুযোগ দেওয়া হয়েছে। নিঃসন্দেহে বিশ্ব-ইতিহাস একটি শিক্ষাগ্রন্থ। জ্ঞানচক্ষু মেলে নিরীক্ষণ করলে এটি হাজারো উপদেশের চাইতে অধিক কার্যকারী উপদেশ। 'জগৎ একটি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ এবং কাল উৎকৃষ্ট শিক্ষক" –জনৈক দার্শনিকের এ উক্তি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এ কারণেই কুরআন পাকের একটি বিরাট বিষয়বস্তু হচ্ছে কাহিনী ও ইতিহাস। কিন্তু সাধারণভাবে অমনোযোগী মানুষেরা জগতের ইতিহাসকেও একটি চিত্তবিনোদনের সামগ্রীর চাইতে অধিক গুরুত্ব দেয়নি; বরং উপদেশ ও জ্ঞানের এ উৎকৃষ্ট বিষয়টিকেও তারা অমনোযোগিতা ও গুনাহের উপায় হিসেবে গ্রহণ করেছে।পূর্ববর্তী কিচ্ছা-কাহিনীকে হয় শুধু ঘুমের পূর্বে ঘুমের ঔষধের স্থলে ব্যবহার করা হয়; না হয় অবসর সময়ে চিত্তবিনোদনের উপায় হিসেবে গ্রহণ করা হয়।

www.almodina.com

সম্ভবতঃ এ কারণেই কুরআন পাক শিক্ষা ও উপদেশের জন্য বিশ্ব-ইতিহাসকে বেছে নিয়েছে। তবে কুরআনের বর্ণনাভঙ্গি বিশ্বের সাধারণ ঐতিহাসিক গ্রন্থের মতো নয়, তাতে কাহিনী ও ইতিহাস রচনাই মূল লক্ষ্য হয়ে থাকে। তাই কুরআন ঐতিহাসিক ঘটনাবলিকে ধারাবাহিক কাহিনীর আকারে বর্ণনা করেনি; বরং কাহিনীর যতটুকু অংশ যে ব্যাপারে ও যে অবস্থার সাথে সম্পর্কযুক্ত, সে ব্যাপারে ততটুকু অংশই উল্লেখ করেছে। অতঃপর অন্যত্র এ কাহিনীর অন্য অংশ বিষয়বস্তুর সাথে সমাঞ্জস্যের কারণ বর্ণনা করা হয়েছে। এতে এ সত্যের দিকে ইঙ্গিত হতে পারে যে, কোনো কাহিনী কখনো স্বয়ং উদ্দেশ্য হয় না; বরং প্রত্যেক ঘটনা বর্ণনা করার লক্ষ্য হচ্ছে তা থেকে কোনো কার্যকর ফল বের করা। এ কারণে এ ঘটনার যতটুকু অংশ এ লক্ষ্যের জন্য জরুরি, ততটুকু পাঠ কর এবং সামনে এগিয়ে যাও। স্বীয় অবস্থা পর্যালোচনা কর এবং অতীত ঘটনাবলি থেকে শিক্ষা অর্জন করে আত্মসংশোধনে ব্রতী হও।

আলোচ্য প্রথম আয়াতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রত্যক্ষ সম্বোধিত মক্কাবাসীদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তারা কি পূর্ববর্তী জাতিসমূহের অবস্থা দেখেনি? দেখলে তা থেকে তারা শিক্ষা ও উপদেশ অর্জন করতে পারত। এখানে 'দেখা'র অর্থ তাদের অবস্থা সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করা। কেননা সে জাতিগুলো তখন তাদের সামনে ছিল না। এরপর পূর্ববর্তী জাতিসমূহের ধ্বংস ও বিপর্যয় উল্লেখ করে বলা হয়েছে : كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ – অর্থাৎ তাদের পূর্বে অনেক সম্প্রদায়কে আমি ধ্বংস করে দিয়েছি।

قَرْنٌ শব্দের অর্থ সমসাময়িক লোকসমাজ এবং সুদীর্ঘকাল। দশ বছর থেকে একশ' বছর পর্যন্ত সময়কাল অর্থেও এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়। কিন্তু قَرْنٌ শব্দের অর্থ যে এক শতাব্দী, কোনো কোনো ঘটনা ও হাদীস থেকে এর সমর্থন পাওয়া যায়। এক হাদীসে আছে; মহানবী ﷺ আব্দুল্লাহ ইবনে বিশর মায়োনীকে বলেছিলেন : তুমি এক 'কারন' পর্যন্ত জীবিত থাকবে। পরে দেখা গেল যে, তিনি পূর্ণ একশ' বছর জীবিত ছিলেন। মহানবী ﷺ জনৈক বালককে দোয়া দেন যে, তুমি এক 'কারন' জীবিত থেক। বালকটি পূর্ণ একশ' বছর জীবিত ছিল। خَيْرُ الْقُرُوْنِ قَرْنِيْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ এ হাদীসের অর্থ করতে গিয়ে অধিকাংশ আলেম এক 'কারন' বলতে এক শতাব্দী স্থির করেছেন।

এ আয়াতে অতীত জাতিসমূহ সম্পর্কে প্রথমে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে পৃথিবীতে এমন বিভূতি, শক্তি ও জীবন ধারণের সাজ-সরঞ্জাম দান করেছিলেন, যা পরবর্তী লোকদের ভাগ্যে জুটেনি। কিন্তু তারাই যখন পয়গম্বরগণের প্রতি মিথ্যারোপ করল এবং আল্লাহর নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ করল, তখন প্রভূত জাঁকজমক, প্রতাপ-প্রতিপত্তি ও অর্থ-সম্পদ তাদেরকে আল্লাহর আজাব থেকে রক্ষা করতে পারল না। তারা পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। আজ মক্কাবাসীদেরকে সম্বোধন করা হচ্ছে। আদ ও সামূদ গোত্রের মতো শক্তিবল তাদের নেই এবং সিরিয়া ও ইয়েমেনেবাসীদের অনুরূপ স্বাচ্ছন্দ্যশীলও তারা নয়। এসব অতীত জাতিসমূহের ঘটনাবলি থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা এবং নিজেদের ক্রিয়াকর্মের পর্যালোচনা করে দেখা তাদের উচিত। বিরুদ্ধাচরণ করলে তাদের পরিণতি কি হবে, তাও ভেবে দেখা দরকার।

আয়াতের শেষভাগে বলা হয়েছে : وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِيْنَ –অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার শক্তি-সামর্থ্য শুধু প্রবল প্রতাপান্বিত, অসাধারণ জাঁকজমক ও সাম্রাজ্যের অধিপতি এবং জনবহুল ও মহাপরাক্রান্ত জাতিসমূহকে চোখের পলকে অন্য জাতি সৃষ্টি করে সেখানে বসিয়ে দিয়েছে। ফলে কেউ বুঝতেই পারল না যে, এখান থেকে লোকজন হ্রাস পেয়েছে।

قوله وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِيْ قِرْطَاسٍ الخ : আয়াতটি একটি বিশেষ ঘটনা সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। একদিন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আবী উমাইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে একটি হঠকারিতাপূর্ণ দাবি পেশ করে বসল। সে বলল, আমি আপনার প্রতি ততক্ষণ পর্যন্ত বিশ্বাস স্থাপন করতে পারি না, যে পর্যন্ত না আপনাকে আকাশে আরোহণ করে সেখান থেকে একটি গ্রন্থ নিয়ে আসতে দেখব। গ্রন্থে আমার নাম উল্লেখ করে এ আদেশ লিপিবদ্ধ থাকতে হবে: হে আব্দুল্লাহ! রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর। সে আরো বলল : আপনি এগুলোর করে দেখালেও আমার মুসলমান হওয়ার সম্ভাবনা ক্ষীণ।

আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এতসব কথায় পরও লোকটি মুসলমান হয়েছিল। শুধু তাই নয়, ইসলামের গাজী হয়ে তায়েফ যুদ্ধে শাহাদাতও বরণ করেছিলেন।

জাতির এহেন অন্যায়, হঠকারিতাপূর্ণ দাবি-দাওয়া এবং উপহাসের ভঙ্গিতে কথাবার্তা পিতামাতার চাইতে অধিক স্নেহশীল রাসূলে কারীম ﷺ-এর অন্তরকে কতটুকু ব্যথিত করেছিল, তার সঠিক অনুমান আমরা করতে পারি না। শুধু ঐ ব্যক্তি হয়তো তা অনুভব করতে পারে, যে জাতির মঙ্গল ও কল্যাণ চিন্তাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মতো জীবনে লক্ষ্য হিসেবে বেছে নিয়েছে।

قوله وَقَالُوْا لَوْلَآ اُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ الخ : আয়াত অবতরণেরও একটি ঘটনা রয়েছে। পূর্বোল্লিখিত আব্দুল্লাহ ইবনে আবী উমাইয়া, নযর ইবনে হারেস এবং নওফল ইবনে খালেদ একবার একত্রিত হয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে উপস্থিত হয় এবং বলে: আমরা আপনার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করব যদি আপনি আকাশ থেকে একটি গ্রন্থ নিয়ে আসেন। গ্রন্থের সাথে চারজন ফেরেশতা এসে সাক্ষ্য দিবে যে, এ গ্রন্থ আল্লাহর পক্ষ থেকেই এসেছে এবং আপনি আল্লাহর রাসূল।

আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে এর এক উত্তর এই যে, গাফেলরা এসব দাবি দাওয়া করে মৃত্যু ও ধ্বংসকেই ডেকে আনছে। কেননা আল্লাহর আইন এই যে, কোনো জাতি কোনো পয়গম্বরের কাছে যখন বিশেষ কোনো মু'জিযা দাবি করে এবং আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তাদের দাবি পূরণ করে দেওয়া হয়, তখন ইসলাম গ্রহণে সামান্য দেরিও সহ্য করা হয় না। ব্যাপক আজাবের মাধ্যমে তাদেরকে ধ্বংস করে দেওয়া হয়। মক্কাবাসীরাও এ দাবি সদুদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে করছিল না যে, তা মেনে নেওয়ার আশা করা যেত। তাই বলা হয়েছে : وَلَوْ اَنْزَلْنَا مَلَكًا لَّقُضِيَ الْاَمْرُ ثُمَّ لَا يُنْظَرُوْنَ অর্থাৎ আমি যদি তাদের চাহিদা মতো মু'জিযা দেখানোর জন্য ফেরেশতা পাঠিয়ে দেই তবে মু'জিযা দেখার পরও বিরুদ্ধাচরণ করলে আল্লাহর পক্ষ থেকে ধ্বংসের নির্দেশ জারি হয়ে যাবে। এরপর তাদেরকে বিন্দুমাত্রও অবকাশ দেওয়া হবে না। কাজেই তাদের বুঝে নেওয়া উচিত যে, তাদের চাওয়া মু'জিযা প্রকাশ না করলে তাদেরই মঙ্গল।

এরই দ্বিতীয় উত্তর চতুর্থ আয়াতে অন্যভাবে দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে– এরা ফেরেশতা অবতারণের দাবি করে অদ্ভুত বোকামির পরিচয় দিচ্ছে। কেননা ফেরেশতা যদি আসল আকার-আকৃতিতে সামনে আসে, তবে ভয়ে মানুষের অন্তরাত্মা কাঠ হয়ে যাবে। এমনকি, আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে তৎক্ষণাৎ প্রাণবায়ু বের হয়ে যাবার আশঙ্কাও রয়েছে।

পক্ষান্তরে যদি মানবাকৃতি ধারণ করে ফেশেতা সামনে আসে, যেমন জিবরাঈল বহুবার মহানবী ﷺ-এর কাছে এসেছেন, তবে তারা তাঁকে একজন মানুষই মনে করবে এবং তাদের আপত্তি পূর্বাবস্থায়ই বহাল থাকবে।

এসব হঠকারিতাপূর্ণ কথাবার্তার উত্তর দেওয়ার পর পঞ্চম আয়াতে নবী করীম ﷺ-এর সান্ত্বনার জন্য বলা হয়েছে: স্বজাতির পক্ষ থেকে আপনি যে উপহাস, ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও যাতনা ভোগ করছেন, তা শুধু আপনারই বৈশিষ্ট্য নয়, আপনার পূর্বেও সব পয়গম্বরকে এমনি হৃদয়বিদারক ও প্রাণঘাতি ঘটনাবলির সম্মুখীন হতে হয়েছে। কিন্তু তারা সাহস হারাননি। পরিণামে বিদ্রূপকারী জাতিকে সে আজাবই পাকড়াও করেছে, যাকে নিয়ে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত।

মোটকথা এই যে, আল্লাহর বিধানাবলি প্রচার করারই আপনার কাজ। এ দায়িত্ব পালন করে আপনি দায়মুক্ত হয়ে যান। কেউ তা গ্রহণ করল কিনা? তা দেখাশোনা করা আপনার দায়িত্বে নয়। তাই এতে মশগুল হয়ে আপনি অন্তরকে ব্যথিত করবেন না।

শব্দ বিশ্লেষণ

قُضِيَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْقَضَاءُ মূলবর্ণ (ق ـ ض ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– সে নির্দেশ দিল, সতর্ক করল।

تَمْتَرُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِمْتِرَاءُ মূলবর্ণ (م ـ ر ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– তোমরা সন্দেহ করছ।

اَنْشَأْنَا : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِنْشَاءُ মূলবর্ণ (ن ـ ش ـ ء) জিনস মুরাক্কাব مهموز لام অর্থ– আমরা সৃষ্টি করেছি।

قِرْطَاسٍ : শব্দটি একবচন, বহুবচনে قَرَاطِيْسُ অর্থ– কাগজ।

لَمَسُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَللَّمْسُ মূলবর্ণ (ل ـ م ـ س) জিনস صحيح অর্থ– তারা স্পর্শ করে নেয়।

وَلَوْ جَعَلْنٰهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنٰهُ رَجُلًا وَّلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَّا يَلْبِسُوْنَ (٩)

অনুবাদ : (৯) আর যদি আমি তাঁকে মনোনীত করতাম কোনো ফেরেশতা, তবে আমি তাকে [আকৃতিতে] মানুষই বানাতাম এবং তারা তার পরেও সেই সংশয়েই থাকত, যে সংশয়ে বর্তমানে রয়েছে।

وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِيْنَ سَخِرُوْا مِنْهُمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ (١٠)

(১০) আর বাস্তবিকই আপনার পূর্বে যে সকল নবী অতীত হয়েছেন, তাঁদের সঙ্গেও বিদ্রূপ করা হয়েছে, অনন্তর যারা তাঁদের সাথে বিদ্রূপ করেছিল তাদেরকে ঐ আজাব পরিবেষ্টিত করে নিল, যার প্রতি তারা বিদ্রূপ করত।

قُلْ سِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ ثُمَّ انْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ (١١)

(১১) আপনি বলুন, পৃথিবীতে একটু ভ্রমণ কর, অতঃপর প্রত্যক্ষ কর, মিথ্যা আরোপকারীদের কি পরিণাম হয়েছে।

قُلْ لِّمَنْ مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ قُلْ لِّلّٰهِ ؕ كَتَبَ عَلٰى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ؕ لَيَجْمَعَنَّكُمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لَا رَيْبَ فِيْهِ ؕ اَلَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ (١٢)

(১২) আপনি বলুন, যা কিছু আসমানসমূহে ও জমিনে রয়েছে, এ সমস্তের স্বত্ব কার? আপনি বলে দিন, সব কিছুরই স্বত্ব [একমাত্র] আল্লাহর, এবং আল্লাহ অনুগ্রহ করাকে নিজের জন্য কর্তব্য করে নিয়েছেন, আল্লাহ তোমাদেরকে কিয়ামত দিবসে একত্র করবেন, এতে কোনো সন্দেহ নেই, যারা নিজেদেরকে বিনষ্ট করেছে, অতএব, তারা ঈমান আনবে না।

শাব্দিক অনুবাদ

(৯) وَلَوْ جَعَلْنٰهُ مَلَكًا আর যদি আমি তাঁকে মনোনীত করতাম কোনো ফেরেশতা لَّجَعَلْنٰهُ رَجُلًا তবে আমি তাকে [আকৃতিতে] মানুষই বানাতাম وَّلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَّا يَلْبِسُوْنَ এবং তারা তার পরেও সেই সংশয়েই থাকত, যে সংশয়ে বর্তমানে রয়েছে।

(১০) وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ আর বাস্তবিকই আপনার পূর্বে যে সকল নবী অতীত হয়েছেন, তাঁদের সঙ্গেও বিদ্রূপ করা হয়েছে فَحَاقَ بِالَّذِيْنَ سَخِرُوْا مِنْهُمْ অনন্তর যারা তাঁদের সাথে বিদ্রূপ করেছিল তাদেরকে ঐ আজাব পরিবেষ্টিত করে নিল مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ যার প্রতি তারা বিদ্রূপ করত।

(১১) قُلْ আপনি বলুন سِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ পৃথিবীতে একটু ভ্রমণ কর ثُمَّ انْظُرُوْا অতঃপর প্রত্যক্ষ কর كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ মিথ্যা আরোপকারীদের কি পরিণাম হয়েছে।

(১২) قُلْ আপনি বলুন لِّمَنْ مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ যা কিছু আসমানসমূহে ও জমিনে রয়েছে, এ সমস্তের স্বত্ব কার? قُلْ لِّلّٰهِ আপনি বলে দিন, সব কিছুরই স্বত্ব [একমাত্র] আল্লাহর كَتَبَ عَلٰى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ এবং আল্লাহ অনুগ্রহ করাকে নিজের জন্য কর্তব্য করে নিয়েছেন لَيَجْمَعَنَّكُمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ আল্লাহ তোমাদেরকে কিয়ামত দিবসে একত্র করবেন لَا رَيْبَ فِيْهِ এতে কোনো সন্দেহ নেই اَلَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ যারা নিজেদেরকে বিনষ্ট করেছে فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ অতএব, তারা ঈমান আনবে না।

www.almodina.com

وَلَهٗ مَا سَكَنَ فِی الَّیۡلِ وَالنَّهَارِ ؕ وَهُوَ السَّمِیۡعُ الۡعَلِیۡمُ (١٣)	অনুবাদ : (১৩) আর সবকিছুই আল্লাহর স্বত্বে রয়েছে যা কিছু রাত্রিতে ও দিবাভাগে অবস্থিত এবং তিনিই অতি শ্রবণকারী, মহা জ্ঞাতা।
قُلۡ اَغَیۡرَ اللّٰهِ اَتَّخِذُ وَلِیًّا فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالۡاَرۡضِ وَهُوَ یُطۡعِمُ وَلَا یُطۡعَمُ ؕ قُلۡ اِنِّیۡۤ اُمِرۡتُ اَنۡ اَكُوۡنَ اَوَّلَ مَنۡ اَسۡلَمَ وَلَا تَكُوۡنَنَّ مِنَ الۡمُشۡرِكِیۡنَ (١٤)	(১৪) আপনি বলে দিন, আমি কি সেই আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকেও মা'বূদ সাব্যস্ত করব? যিনি আসমানসমূহ ও জমিনের সৃষ্টিকর্তা এবং তিনি [সকলকে] আহার দান করেন, আর তাঁকে কেউ আহার প্রদান করে না। আপনি বলে দিন, আমাকে এই আদেশ দেওয়া হয়েছে যে, আমি সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করি এবং [আরো বলা হয়েছে] আপনি কখনো মুশরিকদের দলভুক্ত হবেন না।
قُلۡ اِنِّیۡۤ اَخَافُ اِنۡ عَصَیۡتُ رَبِّیۡ عَذَابَ یَوۡمٍ عَظِیۡمٍ (١٥)	(১৫) আপনি বলে দিন যে, আমি যদি আমার প্রতিপালকের আদেশ অমান্য করি, তবে এক মহা দিবসের শাস্তির ভয় করি।
مَنۡ یُّصۡرَفۡ عَنۡهُ یَوۡمَئِذٍ فَقَدۡ رَحِمَهٗ ؕ وَذٰلِكَ الۡفَوۡزُ الۡمُبِیۡنُ (١٦)	(১৬) সেদিন যে ব্যক্তি হতে ঐ আজাব সরিয়ে নেওয়াও হবে, তবে তো তার প্রতি আল্লাহ তা'আলা অশেষ করুণা করলেন, আর তাই স্পষ্ট সফলতা।

শাব্দিক অনুবাদ

(১৩) وَلَهٗ مَا سَكَنَ فِی الَّیۡلِ وَالنَّهَارِ আর সবকিছুই আল্লাহর স্বত্বে রয়েছে যা কিছু রাত্রিতে ও দিবাভাগে অবস্থিত وَهُوَ السَّمِیۡعُ এবং তিনিই অতি শ্রবণকারী, الۡعَلِیۡمُ মহা জ্ঞাতা।

(১৪) قُلۡ আপনি বলে দিন اَغَیۡرَ اللّٰهِ اَتَّخِذُ وَلِیًّا আমি কি সেই আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকেও মা'বূদ সাব্যস্ত করব فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالۡاَرۡضِ যিনি আসমানসমূহ ও জমিনের সৃষ্টিকর্তা وَهُوَ یُطۡعِمُ এবং তিনি [সকলকে] আহার দান করেন وَلَا یُطۡعَمُ আর তাঁকে কেউ আহার প্রদান করে না قُلۡ আপনি বলে দিন اِنِّیۡۤ اُمِرۡتُ আমাকে এই আদেশ দেওয়া হয়েছে যে اَنۡ اَكُوۡنَ اَوَّلَ مَنۡ اَسۡلَمَ আমি সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করি এবং وَلَا تَكُوۡنَنَّ مِنَ الۡمُشۡرِكِیۡنَ আপনি কখনো মুশরিকদের দলভুক্ত হবেন না।

(১৫) قُلۡ আপনি বলে দিন যে اِنِّیۡۤ اَخَافُ আমি ভয় করি اِنۡ عَصَیۡتُ رَبِّیۡ যদি আমার প্রতিপালকের আদেশ অমান্য করি عَذَابَ یَوۡمٍ عَظِیۡمٍ এক মহা দিবসের শাস্তির।

(১৬) مَنۡ یُّصۡرَفۡ عَنۡهُ یَوۡمَئِذٍ সেদিন যে ব্যক্তি হতে ঐ আজাব সরিয়ে নেওয়াও হবে فَقَدۡ رَحِمَهٗ তবে তো তার প্রতি আল্লাহ তা'আলা অশেষ করুণা করলেন وَذٰلِكَ الۡفَوۡزُ الۡمُبِیۡنُ আর তাই স্পষ্ট সফলতা।

অনুবাদ	আয়াত
অনুবাদ : (১৭) আর যদি আল্লাহ তা'আলা তোমাকে কোনো কষ্ট দেন, তবে তিনি ব্যতীত আর কেউ তা বিদূরিত করতে পারবেন না, আর যদি তোমার কোনো কল্যাণ করেন, তবে [কেউ প্রতিরোধ করতে পারবে না] তিনি সর্ববিষয়ে পূর্ণ ক্ষমতাবান।	وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهٗٓ إِلَّا هُوَ ۚ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ (١٧)
(১৮) আর আল্লাহই স্বীয় বান্দাদের উপর ক্ষমতাবান, পরাক্রান্ত, ও তিনিই প্রজ্ঞাময়, পূর্ণ অবহিত।	وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهٖ ۚ وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْخَبِيْرُ (١٨)

শাব্দিক অনুবাদ

(১৭) وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ আর যদি আল্লাহ তা'আলা তোমাকে কোনো কষ্ট দেন فَلَا كَاشِفَ لَهٗٓ إِلَّا هُوَ তবে তিনি ব্যতীত আর কেউ তা বিদূরিত করতে পারবেন না وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ আর যদি তোমার কোনো কল্যাণ করে فَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ তবে [কেউ প্রতিরোধ করতে পারবে না] তিনি সর্ববিষয়ে পূর্ণ ক্ষমতাবান।

(১৮) وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهٖ আর আল্লাহই স্বীয় বান্দাদের উপর ক্ষমতাবান, পরাক্রান্ত وَهُوَ الْحَكِيْمُ ও তিনিই প্রজ্ঞাময়, الْخَبِيْرُ পূর্ণ অবহিত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(১০) وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِيْنَ سَخِرُوْا مِنْهُمْ الخ **আয়াতের শানে নুযূল : ইবনে মুনযির ও ইবনে আবী হাতেম** মুহাম্মদ বিন ইসাহাকের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন যে, তিনি বলেন, আলোচ্য আয়াত ওলীদ বিন মুগীরাহ উমায়্যা বিন খালফ ও আবূ জাহেল বিন হেশাম সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। বিস্তারিত বিবরণ হচ্ছে যে,

مَرَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْمَا بَلَغَنِيْ بِالْوَلِيْدِ بْنِ الْمُغِيْرَةِ وَأُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ وَأَبِيْ جَهْلِ بْنِ هِشَامٍ فَهَمَزُوْهُ وَاسْتَهْزَءُوْا بِهٖ فَغَاظَهٗ ذٰلِكَ ـ فَأَنْزَلَ اللّٰهُ الْآيَةَ

আমি জানতে পেরেছি যে, একদা রাসূল ﷺ, ওলীদ বিন মুগীরাহ, উমাইয়্যা বিন খালফ ও আবূ জাহেলের পার্শ্ব দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন এ নরাধমেরা রাসূল ﷺ -কে লক্ষ্য করে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতে লাগল : তা রাসূল ﷺ-এর মাঝে ক্রোধের সঞ্চার করল, সে পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[ফাতহুল কাদীর ১০২, দুররে মানছুর ৫/৩]

(১৩) وَلَهٗ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ۚ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ الاية **আয়াতের শানে নুযূল :** একদা মক্কায় কাফের সম্প্রদায় হযরত রাসূলে মাকবূল ﷺ-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে আরজ করল যে, আপনি নিজের স্বার্থে যা কিছু ছল-চাতুরী ও নবুয়তের দাবি করে চলেছেন একমাত্র কারণ হচ্ছে আপনার জাগতিক জীবনের জীবন পাথেয় বা আর্থিক সঙ্কট। এ ছাড়া আর অন্য কোনো কারণই হতে পারে না। সুতরাং আমরা আপনার জন্য আমাদের সম্পদ হতে উল্লেখযোগ্য একটি অংশ এনে দিচ্ছি, যা দ্বারা আপনি ধন সম্পদের মালিক বলে পরিচিত হয়ে যাবেন। আর আপিন যে নেতৃত্ব পাবার প্রত্যাশী তাও অনায়াসেই এসে যাবে। সে পরিস্থিতিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। –[কুরতুবী ৩৬৫/৬, মা'আরিফু নুযূল ৪৩০/১]

(১৪) قُلْ أَغَيْرَ اللّٰهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** মক্কাবাসীরা রাসূল ﷺ-কে লক্ষ্য করে বলল, হে মুহাম্মদ! তুমি তোমার কওমের ধর্মকে ছেড়ে দিলে । আর আমরা জানতে পারলাম তুমি এ কাজটি করেছ দারিদ্রতার

তাড়নায়। সুতরাং তুমি তোমার সে পথ থেকে ফিরে আস। তাহলে আমরা তোমার জন্য মাল জমা করে দিচ্ছি। ফলে তুমি আমাদের মাঝে একজন ধনাঢ্য ব্যক্তিতে পরিণত হয়ে যাবে। মক্কাবাসীদের মাল সম্পদ প্রদান করার প্রলোভন দেখিয়ে বিভ্রান্ত করার এহেন চক্রান্ত করার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়। –[রূহুল মা'আনী-১০৯/৪/৭]

মক্কার মুশরিকরা যখন রাসূল ﷺ–কে মূর্তি পূজা তথা তাদের পৈত্রিক ধর্মের দিকে আহ্বান জানাল তখন আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[কুরতুবী-৩৬৫/৬]

قوله قُلْ لِمَنْ مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ : আয়াতে কাফেরদেরকে প্রশ্ন করা হয়েছে : নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল এবং এতদুভয়ে যা আছে, তার মালিক কে? অতঃপর আল্লাহ নিজেই রাসূলুল্লাহ ﷺ–এর বাচনিক উত্তর দিয়েছেন? সবার মালিক আল্লাহ। কাফেরদের উত্তরের অপেক্ষা করার পরিবর্তে নিজেই উত্তর দেওয়ার কারণ এই যে, এ উত্তর কাফেরদের কাছেও স্বীকৃত। তারা যদিও শিরক ও পৌত্তলিকতায় লিপ্ত ছিল, তথাপি ভূমণ্ডল, নভোমণ্ডল ও সবকিছুর মালিক আল্লাহ তা'আলাকেই মানত।

قوله لَيَجْمَعَنَّكُمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ : বাক্যে اِلٰى শব্দটি فِيْ অর্থে ব্যবহার হয়েছে। তাতে মর্ম দাঁড়িয়েছে এই যে, আল্লাহ তা'আলা আদি-অন্ত সব মানুষকে কিয়ামতের দিন সমবেত করবেন কিংবা এখানে কবরে একত্র করা বুঝানো হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, কিয়ামত পর্যন্ত সব মানুষকে কবরে একত্র করতে থাকবেন এবং কিয়ামতের দিন সবাইকে জীবিত করবেন। –[কুরতুবী]

قوله كَتَبَ عَلٰى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ : সহীহ মুসলিমে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যখন আল্লাহ তা'আলা যাবতীয় বস্তুনিচয় সৃষ্টি করেন, তখন একটি ওয়াদাপত্র লিপিবদ্ধ করেন। এটি আল্লাহ তা'আলার কাছেই রয়েছে। এতে লিখিত আছে : اِنَّ رَحْمَتِيْ سَبَقَتْ عَلٰى غَضَبِيْ অর্থাৎ আমার অনুগ্রহ আমার ক্রোধের উপর প্রবল থাকবে। –[কুরতুবী]

قوله اَلَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ এতে ইঙ্গিত আছে যে, আয়াতের শুরুতে বর্ণিত আল্লাহ তা'আলার ব্যাপক অনুগ্রহ থেকে যদি কাফের ও মুশরিকরা বঞ্চিত হয়, তবে স্বীয় কৃতকর্মের কারণেই হবে। কারণ তারা অনুগ্রহ লাভের উপায় অর্থাৎ ঈমান অবলম্বন করেনি। –[কুরতুবী]

قوله وَلَهٗ مَا سَكَنَ فِي الَّيْلِ وَالنَّهَارِ : এখানে سُكُوْن অর্থ اِسْتِقْرَارْ অবস্থান করা : অর্থাৎ পৃথিবীর দিবারাত্রিতে যা কিছু অবস্থিত আছে, তা সবই আল্লাহর। অথবা এর অর্থ سُكُوْن وَ حَرَكَتْ এর সমষ্টি। অর্থাৎ مَا سَكَنَ وَمَا تَحَرَّكَ (স্থাবর ও অস্থাবর) আয়াতে শুধু سُكُوْن উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা এর বিপরীত حَرَكَتْ আপনা-আপনিই বুঝা যায়।

قوله قُلْ اِنِّيْٓ اَخَافُ اِنْ عَصَيْتُ رَبِّيْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলার অপার শক্তি-সামর্থ্য উল্লেখ করে তৎপ্রতি বিশ্বাস স্থাপন করার এবং শিরক থেকে বেঁচে থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহের প্রথম আয়াতে এ নির্দেশ অমান্য করার শাস্তি এক বিশেষ ভঙ্গিতে বর্ণনা করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ–কে আদেশ দেওয়া হয়েছে যে, আপনি বলে দিন: মনে কর, যদি আমিও স্বীয় প্রতিপালকের নির্দেশ অমান্য করি, তবে আমারও কিয়ামতের শাস্তির ভয় রয়েছে। এটা জানা কথা যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ নিষ্পাপ। তাঁর দ্বারা অবাধ্যতা হতেই পারে না। কিন্তু তাঁর দিকে সম্বন্ধ করে উম্মতকে একথা বলা উদ্দেশ্য যে, এ নির্দেশের বিরোধিতা করলে যখন নবীগণের সর্দারকেও ক্ষমা করা যায় না, তখন অন্যদের কি অবস্থা হবে?

এরপর বলা হয়েছে : مَنْ يُّصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهٗ অর্থাৎ হাশর দিবসের শাস্তি অত্যন্ত লোমহর্ষক ও কঠোর হবে। কারও উপর থেকে এ শাস্তি সরে গেলে মনে করতে হবে যে, তার প্রতি আল্লাহর অশেষ করুণা হয়েছে : وَذٰلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِيْنُ অর্থাৎ এটিই বৃহৎ ও প্রকাশ্য সফলতা। এখানে সফলতার অর্থ জান্নাতে প্রবেশ। এতে বুঝা গেল যে, শাস্তি থেকে মুক্তি ও জান্নাতে প্রবেশ ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

দ্বিতীয় আয়াতে ইসলামের একটি মৌলিক বিশ্বাস বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ প্রতিটি লাভ-ক্ষতির মালিক প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তা'আলা। সত্যিকারভাবে কোনো ব্যক্তি কারো সামান্য উপকারও করতে পারে না। ক্ষতিও করতে পারে না। আমরা বাহ্যতঃ একজনকে অপরজন দ্বারা উপকৃত কিংবা ক্ষতিগ্রস্ত হতে দেখি। এটি নিছক একটি বাহ্যিক আকার। সত্যের সামনে একটি পর্দার চাইতে বেশি এর কোনো গুরুত্ব নেই।

www.almodina.com

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ইমাম বগভী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন। একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ উটে সওয়ার হয়ে আমাকে পিছনে বসিয়ে নিলেন। কিছু দূর চলার পর আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, হে বৎস! আমি আরজ করলাম: আদেশ করুন, আমি হাজির আছি। তিনি বললে, 'তুমি আল্লাহকে স্মরণ রাখলে সর্বাবস্থায় তাঁকে সামনে দেখতে পাবে। তুমি শান্তি ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের সময় আল্লাহকে স্মরণ রাখলে, বিপদের সময় তিনি তোমাকে স্মরণ রাখবেন। কোনো কিছু যাচনা করতে হলে তুমি আল্লাহর কাছেই যাচনা কর এবং সাহায্য চাইতে হলে আল্লাহর কাছেই সাহায্য চাও। জগতে যা কিছু হবে, ভাগ্যের লেখনী তা লিখে ফেলেছে। তোমার অংশে নেই– তোমার এমন কোনো উপকার করতে সমগ্র সৃষ্টজীব সম্মিলিতভাবে চেষ্টা করলেও তারা কখনো তা করতে পারবে না। পক্ষান্তরে যদি তারা সবাই মিলে তোমার এমন কোনো ক্ষতি করতে চায়, যা তোমার ভাগ্যে নেই, তবে কখনই তারা তা করতে সক্ষম হবে না। যদি তুমি বিশ্বাস সহকারে ধৈর্যধারণ করতে পার তবে অবশ্যই তা করো। সক্ষম না হলে ধৈর্য ধর। কেননা স্বভাব-বিরুদ্ধ কাজে ধৈর্য ধরার মধ্যে অনেক মঙ্গল রয়েছে। মনে রাখবে, আল্লাহর সাহায্য ধৈর্যের সাথে জড়িত– কষ্টের সাথে সুখ এবং অভাবের সাথে স্বাচ্ছন্দ্য জড়িত।' –[তিরমিযী, মুসনাদে আহমদ]

পরিতাপের বিষয়, কুরআন পাকের এ সুস্পষ্ট ঘোষণা এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ–এর আজীবনের শিক্ষা সত্ত্বেও মুসলমানরা এ ব্যাপারে পথভ্রান্ত। তারা আল্লাহ তা'আলার সব ক্ষমতা সৃষ্টজীবের মধ্যে বণ্টন করে দিয়েছে। আজ এমন মুসলমানের সংখ্যা নগণ্য, যারা বিপদের সময় আল্লাহ তা'আলাকে স্মরণ করে না; বরং তারা তাঁর কাছে দোয়া করার পরিবর্তে বিভিন্ন নামের দোহাই দেয় এবং তাদেরই সাহায্য কামনা করে। তারা আল্লাহ তা'আলার প্রতি লক্ষ্য করে না। পয়গম্বর ও ওলীদের অসিলায় দোয়া করা ভিন্ন কথা, এটা জায়েজ। স্বয়ং নবী করীম ﷺ -এর শিক্ষায় এর প্রমাণ রয়েছে। কিন্তু সরাসরি কোনো সৃষ্টজীবকে অভাব পূরণের জন্য ডাকা এ কুরআনি নির্দেশের পরিপন্থি ও প্রকাশ্য বিদ্রোহ ঘোষণার নামান্তর। আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদেরকে সরল পথে কায়েম রাখুন।

আয়াতের শেষে বলেছেন : وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهٖ ۚ وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْخَبِيْرُ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলাই সবার উপর পরাক্রান্ত ও শক্তিমান এবং সবাই তাঁর ক্ষমতাধীন ও মুখাপেক্ষী। এ কারণেই দুনিয়ার জীবনে অনেক যোগ্যতা সম্পন্ন মহত্তম ব্যক্তিগণও সব কাজে সাফল্য অর্জন করতে পারে না এবং তার সব মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয় না, তিনি নৈকট্যশীল রাসূলই হোন কিংবা রাজাধিরাজ।

শব্দ বিশ্লেষণ

حَاقَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْحَيْقُ মূলবর্ণ (ح . ى . ق) জিনস اجوف يائى অর্থ– সে ঘিরে রাখল।

سِيْرُوْا : সীগাহ جمع مذكرحاضر বহছ امر حاضر معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلسَّيْرُ মূলবর্ণ (س . ى . ر) জিনস اجوف يائى অর্থ– তোমরা ভ্রমণ কর।

عَصَيْتُ : সীগাহ واحد متكلم বহছ ماضى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْعِصْيَانُ মূলবর্ণ (ع . ص . ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– আমি আদেশ অমান্য করেছি।

ضُرٌّ : শব্দটি একবচন, বহুবচন اِضْرَارٌ অর্থ– কষ্ট, দুঃখ।

قَدِيْرٌ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব كَرُمَ মাসদার اَلْقَدْرُ মূলবর্ণ (ق . د . ر) জিনস صحيح অর্থ– শক্তিশালী, ক্ষমতাবান।

www.almodina.com

قُلْ اَيُّ شَيْءٍ اَكْبَرُ شَهَادَةً ط قُلِ اللّٰهُ قف شَهِيْدٌۢ بَيْنِيْ وَبَيْنَكُمْ قف وَاُوْحِيَ اِلَيَّ هٰذَا الْقُرْاٰنُ لِاُنْذِرَكُمْ بِهٖ وَمَنْۢ بَلَغَ ط اَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُوْنَ اَنَّ مَعَ اللّٰهِ اٰلِهَةً اُخْرٰى ط قُلْ لَّآ اَشْهَدُ ج قُلْ اِنَّمَا هُوَ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ وَّاِنَّنِيْ بَرِيْٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ (١٩)

অনুবাদ : (১৯) আপনি জিজ্ঞাসা করুন, সাক্ষ্যরূপে কোন বস্তু সর্বাধিক শ্রেষ্ঠ? আপনি বলুন, আমার এবং তোমাদের মধ্যে আল্লাহই সাক্ষী আছেন, এবং আমার নিকট এই কুরআন ওহীরূপে প্রেরিত হয়েছে যেন আমি এই কুরআন দ্বারা তোমাদেরকে এবং যাদের নিকট এই কুরআন পৌছবে, সকলকে ভয় প্রদর্শন করি, তোমরা সত্যই কি এই সাক্ষ্যই দিবে যে, আল্লাহর সাথে অন্য আরো মা'বূদ রয়েছে? আপনি বলে দিন, আমি তো সাক্ষ্য দিচ্ছি না, আপনি বলে দিন, তিনিই তো একক মা'বূদ, আর নিশ্চয় আমি তোমাদের শরিক সাব্যস্ত করা হতে পবিত্র।

اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَعْرِفُوْنَهٗ كَمَا يَعْرِفُوْنَ اَبْنَآءَهُمْ م اَلَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ (٢٠)

(২০) যাদেরকে আমি কিতাব প্রদান করেছি তারা রাসূলকে চিনে, যেরূপে নিজেদের পুত্রদেরকে চিনে, যারা নিজেদেরকে বিনষ্ট করে ফেলেছে, সুতরাং তারা ঈমান আনবে না।

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِاٰيٰتِهٖ ط اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الظّٰلِمُوْنَ (٢١)

(২১) আর সে ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক জালেম কে হবে, যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে কিংবা আল্লাহর আয়াতগুলোকে মিথ্যা বলে সাব্যস্ত করে? তা সুনিশ্চিত যে, এরূপ জালেমরা নাজাত পাবে না।

শাব্দিক অনুবাদ

(১৯) قُلْ আপনি জিজ্ঞাসা করুন اَيُّ شَيْءٍ اَكْبَرُ شَهَادَةً সাক্ষ্যরূপে কোন বস্তু সর্বাধিক শ্রেষ্ঠ قُلِ اللّٰهُ আপনি বলুন شَهِيْدٌۢ بَيْنِيْ وَبَيْنَكُمْ আমার এবং তোমাদের মধ্যে আল্লাহই সাক্ষী আছেন وَاُوْحِيَ اِلَيَّ هٰذَا الْقُرْاٰنُ এবং আমার নিকট এই কুরআন ওহীরূপে প্রেরিত হয়েছে لِاُنْذِرَكُمْ بِهٖ وَمَنْۢ بَلَغَ যেন আমি এই কুরআন দ্বারা তোমাদেরকে এবং যাদের নিকট এই কুরআন পৌছবে, সকলকে ভয় প্রদর্শন করি اَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُوْنَ তোমরা সত্যই কি এই সাক্ষ্যই দিবে যে اَنَّ مَعَ اللّٰهِ اٰلِهَةً اُخْرٰى আল্লাহর সাথে অন্য আরো মা'বূদ রয়েছে قُلْ لَّآ اَشْهَدُ আপনি বলে দিন, আমি তো সাক্ষ্য দিচ্ছি না قُلْ আপনি বলে দিন اِنَّمَا هُوَ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ তিনিই তো একক মা'বূদ وَّاِنَّنِيْ بَرِيْٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ আর নিশ্চয় আমি তোমাদের শরিক সাব্যস্ত করা হতে পবিত্র।

(২০) اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ যাদেরকে আমি কিতাব প্রদান করেছি يَعْرِفُوْنَهٗ তারা রাসূলকে চিনে كَمَا يَعْرِفُوْنَ اَبْنَآءَهُمْ যেরূপে নিজেদের পুত্রদেরকে চিনে اَلَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ যারা নিজেদেরকে বিনষ্ট করে ফেলেছে فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ সুতরাং তারা ঈমান আনবে না।

(২১) وَمَنْ اَظْلَمُ আর সে ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক জালেম কে হবে مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে اَوْ كَذَّبَ بِاٰيٰتِهٖ কিংবা আল্লাহর আয়াতগুলোকে মিথ্যা বলে সাব্যস্ত করে اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الظّٰلِمُوْنَ তা সুনিশ্চিত যে, এরূপ জালেমরা নাজাত পাবে না।

www.almodina.com

وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ (٢٢)

অনুবাদ : (২২) আর সেই সময়টুকুও স্মরণীয় যেদিন আমি সমস্ত সৃষ্টিকে একত্র করব, অতঃপর আমি মুশরিকদেরকে বলব- তোমাদের সেই শরিকরা কোথায় গেল যাদের মা'বূদ হওয়ার দাবি করতে?

ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ (٢٣)

(২৩) অতঃপর তাদের শিরকের পরিণাম তা ব্যতীত আর কিছুই হবে না যে, তারা এরূপ বলবে, আমাদের প্রতিপালক আল্লাহর কসম! আমরা মুশরিক ছিলাম না।

انْظُرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ (٢٤)

(২৪) একটু দেখ তো! তারা নিজেদের আত্মার উপর কিরূপে মিথ্যা বলল, আর তারা যে সমস্ত বস্তুকে মিছামিছি রচনা করত তা সমস্তই অদৃশ্য হয়ে গেল।

وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ ۚ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا ۚ

(২৫) আর তাদের মধ্যে কতিপয় এমনও আছে যে, [আপনি কুরআন তেলাওয়াতকালে] আপনার দিকে কর্ণপাত করে, আর আমি তা [অর্থাৎ কুরআন] হৃদয়ঙ্গম করা হতে তাদের অন্তরসমূহের উপর পর্দা ফেলে রেখেছি এবং তাদের কর্ণসমূহে ছিপি দিয়ে রেখেছি,

শাব্দিক অনুবাদ

(২২) وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا আর সেই সময়টুকুও স্মরণীয় যেদিন আমি সমস্ত সৃষ্টিকে একত্র করব ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا অতঃপর আমি মুশরিকদেরকে বলব- أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمْ তোমাদের সেই শরিকরা কোথায় গেল الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ যাদের মা'বূদ হওয়ার দাবি করতে?

(২৩) ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا অতঃপর তাদের শিরকের পরিণাম তা ব্যতীত আর কিছুই হবে না যে أَنْ قَالُوا তারা এরূপ বলবে وَاللَّهِ رَبِّنَا; আমাদের প্রতিপালক আল্লাহর কসম مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ আমরা মুশরিক ছিলাম না।

(২৪) انْظُرْ একটু দেখ তো! كَيْفَ كَذَبُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ তারা নিজেদের আত্মার উপর কিরূপে মিথ্যা বলল وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا; يَفْتَرُونَ আর তারা যে সমস্ত বস্তুকে মিছামিছি রচনা করত তা সমস্তই অদৃশ্য হয়ে গেল।

(২৫) وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ; আর তাদের মধ্যে কতিপয় এমনও আছে যে, আপনার দিকে কর্ণপাত করে وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً আর আমি তাদের অন্তরসমূহের উপর পর্দা ফেলে রেখেছি أَنْ يَفْقَهُوهُ; তা [অর্থাৎ কুরআন] হৃদয়ঙ্গম করা হতে وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا; এবং তাদের কর্ণসমূহে ছিপি দিয়ে রেখেছি وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ

অনুবাদ	আয়াত
অনুবাদ : আর যদি সমস্ত প্রমাণাদি [-ও] প্রত্যক্ষ করে নেয়, তবুও তারা তাতে ঈমান আনবে না; এমনকি যখন তারা আপনার নিকট উপস্থিত হয়, তখন আপনার সাথে অনর্থক ঝগড়া করে, এই কাফেররা বলে যে, তা তো প্রাচীনদের ভিত্তিহীন কাহিনী ব্যতীত আর কিছুই নয়।	وَإِنْ يَّرَوْا كُلَّ اٰيَةٍ لَّا يُؤْمِنُوْا بِهَا ۭ حَتّٰٓى إِذَا جَآءُوْكَ يُجَادِلُوْنَكَ يَقُوْلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا إِنْ هٰذَآ إِلَّآ أَسَاطِيْرُ الْأَوَّلِيْنَ (٢٥)
(২৬) আর তারা তা হতে অন্যকেও বিরত রাখে এবং নিজেরাও দূরে থাকে, বস্তুতঃ তারা নিজেদেরকে ধ্বংস করছে, অথচ কোনো খবর রাখে না।	وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْئَوْنَ عَنْهُ ۚ وَإِنْ يُّهْلِكُوْنَ إِلَّآ أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُوْنَ (٢٦)

শাব্দিক অনুবাদ

আর যদি সমস্ত প্রমাণাদি [-ও] প্রত্যক্ষ করে নেয় لَا يُؤْمِنُوْا بِهَا তবুও তারা তাতে ঈমান আনবে না حَتّٰى إِذَا جَآءُوْكَ এমনকি যখন তারা আপনার নিকট উপস্থিত হয় يُجَادِلُوْنَكَ তখন আপনার সাথে অনর্থক ঝগড়া করে يَقُوْلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا এই কাফেররা বলে যে إِنْ هٰذَآ إِلَّآ أَسَاطِيْرُ الْأَوَّلِيْنَ তা তো প্রাচীনদের ভিত্তিহীন কাহিনী ব্যতীত আর কিছুই নয়।

(২৬) وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ আর তারা তা হতে অন্যকেও বিরত রাখে وَيَنْئَوْنَ عَنْهُ এবং নিজেরাও দূরে থাকে وَإِنْ يُّهْلِكُوْنَ إِلَّآ أَنْفُسَهُمْ বস্তুতঃ তারা নিজেদেরকে ধ্বংস করছে وَمَا يَشْعُرُوْنَ অথচ কোনো খবর রাখে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(২০) قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللّٰهُ شَهِيْدٌۢ بَيْنِيْ وَبَيْنَكُمْ الخ **আয়াতের শানে নুযূল– ১ :** ইবনে ইসহাক, ইবনে জারীর, ইবনুল মুনযির, ইবনে আবী হাতেম ও আবুশ শায়খ প্রমুখ হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)–এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, নাম্মাম বিন যায়েদ, কার্দাম বিন কা'আব ও বাহরী বিন আমর প্রমুখ বলল, হে মুহাম্মদ! আল্লাহ তা'আলার সাথে অন্য কাউকে মা'বূদ হিসেবে শরিক নির্ধারণ করা সম্পর্কে আপনি কেমন মনে করেন? রাসূল ﷺ বললেন, আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কোনো ইলাহ ও উপাস্য নেই। এ দাওয়াত নিয়েই আমি প্রেরিত হয়েছি এবং লোকজনকে এ দাওয়াত-ই জানাচ্ছি। সুতরাং এ পরিপ্রেক্ষিতেই আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[ফাতহুল কাদীর ১০৬/২, রূহুল মা'আনী ১১৭/৪/৭]

শানে নুযূল– ২ : আল্লামা কালবী বর্ণনা করেন যে, মক্কার কাফেররা হযরত রাসূলে আকরাম ﷺ–কে জিজ্ঞেস করল, হে মুহাম্মদ! আল্লাহ তা'আলা তোমাকে ছাড়া রাসূল বানাবার জন্যে অন্য আর কাউকে কি পাননি? তুমি যা বলছ, তাকে সমর্থনকারী হিসেবে তো আমরা আর কাউকে দেখতে পাচ্ছিনা। তোমার সম্পর্কে আমরা খ্রিস্টান ও ইহুদিদের জিজ্ঞেস করেছি। তারা বলল যে, তাদের নিকটও তোমার সম্পর্কে কোনো ভবিষ্যদ্বাণী নেই। সুতরাং তুমি আমাদেরকে দেখিয়ে দাও যে, তুমি আল্লাহর রাসূল বলে কে সাক্ষ্য দিচ্ছে? সুতরাং এ বিভ্রান্তিকর অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য ১নং আয়াত নাজিল করেন। দ্বিতীয় শানে নুযূলটি দ্বিতীয় আয়াতের সাথে সম্পর্কযুক্ত। এ মতামত প্রকাশ করেছেন রূহুল মা'আনী। –[রূহুল মা'আনী ১১৭/৪/৭, কুরতুবী ৩৬৭/৬, দুররে মানছূর ৭/৩, বাহরে মুহীত ৯৪/৪]

(২১) وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِاٰيٰتِهٖ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** ইবনে আবী হাতেম ইকরিমার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, বনী আব্দুদ্দারের নযর নামী এক ব্যক্তি বলেছে, কিয়ামত যখন হবে, তখন লাত ও উযযা আমার জন্য সুপারিশ করবে। তার এ দাবি মিথ্যা ও অবাস্তব ছিল। সে বর্ণনা দেওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[ফাতহুল কাদীর ১০৬/২ দুররে মানছূর ৮/৩]

www.almodina.com

(২৫) وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّسْتَمِعُ اِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلٰى قُلُوْبِهِمْ اَكِنَّةً الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** আবূ সালেহ কর্তৃক হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উদ্ধৃতিতে বর্ণিত রয়েছে যে, তিনি বলেন, আবূ সুফিয়ান বিন হারব, ওয়ালিদ বিন মুগীরা, নযর বিন হারিছ, রবী'আর দুপুত্র উতবা ও শায়বা এবং উমাইয়া ও উবাই বিন খালফ একদা রাসূল ﷺ-এর কুরআন তেলাওয়াত শুনছিল, তখন তারা সকলে নযরকে জিজ্ঞেস করল যে, হে আবূ কতীলাহ! মুহাম্মদ কি বলছে? তখন সে বলল, কা'বা গৃহের স্রষ্টার কসম! মুহাম্মদ কি বলছে তা আমি জানিনা। তবে তার দুটি ঠোট নড়তে দেখতে পাচ্ছি। সে যেন কি বলছে। পক্ষান্তরে সে যা বলছে তাহলো পূর্ববর্তী ঘটনা প্রবাহ। আমি যেরূপভাবে তোমাদের নিকট পূর্বেকার ঘটনাবলি বর্ণনা করি। প্রকৃত পক্ষে নযর বিন হারিছ পূর্বযুগীয় সম্পর্কে একজন কৌতুককারী লোক ছিল। সে কুরাইশের সামনে কৌতুক করত আর কুরাইশরা তার কৌতুক নিয়ে আনন্দ উপভোগ করত। নযর বিন হারিছে এহেন মন্তব্য করার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[রূহুল মা'আনী ১২৫/৪৭ বাহরে মুহীত ১০১/৪]

(২৬) قوله وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْئَوْنَ عَنْهُ الخ **আয়াতের শানে নুযূল– ১ :** ইবনে আবী হাতেম, সাঈদ বিন হেলাল হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আলোচ্য আয়াত রাসূল ﷺ-এর চাচাদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। তারা ছিলেন দশজন তারা রাসূল ﷺ-এর সাথে বাহ্যিকভাবে এবং গোপনীয় ভাবে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অত্যন্ত কঠোর ছিলেন। সে পরিপ্রেক্ষিতে আলোোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে।

শানে নুযূল– ২ : আলোচ্য আয়াত খাজা আবূ তালিব সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। মুকাতিল হতে বর্ণিত। একদা রাসূল ﷺ আবূ তালিবের নিকট ছিলেন, রাসূল ﷺ তখন তাকে ইসলাম গ্রহণ করার দাওয়াত জানান। সে মুহূর্তে কুরাইশ নেতৃবর্গ আবূ তালিবের নিকট হতে বের হয়ে তারা রাসূল ﷺ-এর ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে জমায়েত হয়। ফলে আবূ তালেব কাব্যের ভাষায় বলেন,

وَاللّٰهِ لَنْ يَصِلُوْا اِلَيْكَ بِجَمْعِهِمْ ۞ حَتّٰى أُوَسَّدَ فِى التُّرَابِ دَفِيْنًا
فَاصْدَعْ بِاَمْرِكَ مَا عَلَيْكَ غَضَاضَةٌ ۞ وَاَبْشِرْ وَ قَرَّ بِذَالِكَ مِنْكَ عُيُوْنًا
وَدَعَوْتَنِىْ وَزَعَمْتَ أَنَّكَ نَاصِحٌ ۞ وَلَقَدْ صَدَقْتَ وَكُنْتَ اَمِيْنًا
وَعَرَضْتَ دِيْنًا لَا مَحَالَةَ اَنَّهُ ۞ مِنْ خَيْرِ أَدْيَانِ فِى الْبَرِيَّةِ دِيْنًا
لَوْ لَا الْمَلَامَةُ اَوْ حَذَارِ مَسَبَّةٍ ۞ لَوَجَدْتَنِىْ سَمْحًا بِذَاكَ مُبِيْنًا

অর্থাৎ ; আল্লাহর শপথ তারা দলে বলে তোমার প্রতি কখনো আঘাত হানতে পারবেনা, যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি মাটির নিচে শায়িত হব। তোমার দীন প্রচারের কাজ তুমি করে যাও, তোমার কোনো ব্যর্থতা নেই, আর সু-সংবাদ দিচ্ছি তোমাকে যে তোমার এ ধর্ম দ্বারা অনেক চক্ষুই শান্ত হবে।

তুমি আমাকে দাওয়াত দিয়েছ, আমি এতে ধারণা করেছি যে, তুমি হলে হিতৈষী। তুমি হলে সত্যবাদী। তদুপরি তুমি হলে বিশ্বাসী। তুমি যে ধর্ম নিয়ে এসেছ অবশ্য তা অন্যান্য সকলের ধর্ম অপেক্ষা অতি শ্রেষ্ট ধর্ম।

যদি সমালোচনা ও গালা-গালির ভয় না হতো. তাহলে তুমি অবশ্যই এ ধর্মের প্রকাশ্য প্রচারকারী আমাকে পেয়ে যেতে। এ পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াত নাজিল হয়েছে। –[রূহুল মা'আনী ১২৭/৪/৭ বাহরে মুহীত ১০৩/৪]

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) ও হাসান প্রমুখ হতে বর্ণিত যে, আলোচ্য আয়াত খাজা আবূ তালিবের সাথেই সম্পৃক্ততা রয়েছে। খাজা আবূ তালিব হযরত রাসূলে আকদাস ﷺ-কে কাফেরদের দেওয়া দুঃখ কষ্ট কে প্রতিহত করতেন এবং নিজে ঈমান গ্রহণ করা হতে দূরে থাকতেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) ও ঐতিহাসিকদের মতে রাসূল ﷺ একদা কা'বা গৃহ পানে বের হলেন এবং সেখানে তিনি নামাজ আদায় করার ইচ্ছা করেন। সুতরাং তিনি যখন নামজ আরম্ভ করেন, তখন আবূ জাহেল বলল, তার প্রতি আল্লাহর অভিসম্পাত, এ লোকটির কাছে গিয়ে তার নামাজ নষ্ট করতে পারে এমন কে আছে: তখন ইবনে যিবা'রী দাড়িয়ে গোবর ও রক্ত নিয়ে রাসূল ﷺ-এর চেহারা মুবারকে মাখিয়ে দেয়। ফলে রাসূল ﷺ নামাজ ছেড়ে তাঁর চাচা আবূ তালেবের নিকট এসে বললেন, হে আমার চাচা! আমার সাথে কি আচরণ করা হচ্ছে আপনি কি তা দেখেন না? আবূ তালেব জিজ্ঞেস করলেন, তোমার সাথে এমন আচরণ কে করল? রাসূল ﷺ বললেন, আব্দুল্লাহ বিন যিবা'রী। তৎক্ষণাৎ আবূ তালেব কাঁধে তরবারি ঝুলিয়ে তার গোত্রের লোকজনের নিকট যান। তারা আবূ তালিব আসছে দেখতে পেয়ে, তাদের বৈঠক হতে উঠতে লাগল। আবূ তালেব বললেন, কেউ যদি উঠে তাকে তরবারির দ্বারা হত্যা করে দেব। অতএব, তারা নিজেদের

জায়গায় বসে পড়ল। তিনি নিকটে চলে এসে বললেন, হে ভ্রাতুষ্পুত্র! তোমার সাথে এমন আচরণ কে করল? রাসূল ﷺ বললেন, আব্দুল্লাহ বিন যিবা'রী এবার আবূ তালিব গোবর ও রক্ত নিয়ে তার চেহারা, দাড়ি ও কাপড়ে মাখিয়ে দিলেন। আর তাদের এ আচরণকে অত্যন্ত মন্দ বললেন। রাসূল ﷺ-এর সাথে কুরাইশদের এ আচরণের পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। –[কুরতুবী-৩৭২/৬]

মুশরিকদের ব্যর্থতার অবস্থা : পূর্ববর্তী আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছিল যে, অত্যাচারী ও কাফেররা সফলতা পাবে না। আলোচ্য আয়াতসমূহে এর বিবরণ ও ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। প্রথম ও দ্বিতীয় আয়াতে একটি সর্ববৃহৎ পরীক্ষার কথা বর্ণিত হয়েছে যা হাশরের ময়দানে রাব্বুল আলামীনের সামনে অনুষ্ঠিত হবে। বলা হয়েছে : وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا অর্থাৎ ঐ দিনটিও স্মরণযোগ্য, যেদিন আমি সবাইকে অর্থাৎ মুশরিক ও তাদের তৈরি করা উপাস্যসমূহকে একত্রিত করব। ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ অর্থাৎ অতঃপর আমি তাদেরকে প্রশ্ন করব যে, তোমরা যেসব উপাস্যকে আমার অংশীদার, স্বীয় অভাব পূরণকারী ও বিপদ বিদূরণকারী মনে করতে, আজ তারা কোথায়? তারা তোমাদের সাহায্য করে না কেন?

এখানে ثُمَّ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, যা বিলম্ব ও দেরির অর্থে ব্যবহৃত হয়। এতে বুঝা যায় যে, হাশরের মাঠে একত্রিত হওয়ার সাথে সাথে প্রশ্নোত্তর অনুষ্ঠান আরম্ভ হবে না; বরং সবাই দীর্ঘকাল পর্যন্ত হতবাক ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকবে। অনেক কাল পর হিসাব-কিতাব ও জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হবে।

এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, তখন তোমাদের কি অবস্থা হবে, যখন আল্লাহ তা'আলা হাশরের ময়দানে তোমাদেরকে এমনভাবে একত্রিত করবেন, যেমন তীলসমূহকে তূণীরে একত্রিত করা হয়। পঞ্চাশ হাজার বছর তোমরা এমনিভাবে থাকবে। অন্য এক হাদীসে আছে, কিয়ামতের দিন এক হাজার বছর পর্যন্ত সবাই অন্ধকারে থাকবে। পরস্পর কথাবার্তাও বলতে পারবে না। –[মুস্তাদরাক, বায়হাকী]

উপরিউক্ত দুই হাদীসে পঞ্চাশ হাজার ও এক হাজারের যে পার্থক্য, তা কুরআনে পাকের দুই আয়াতেও উল্লিখিত আছে। এক আয়াত বলা হয়েছে : كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ অর্থাৎ ঐ দিনের পরিমাণ পঞ্চাশ হাজার বছর হবে। অন্য আয়াতে বলা হয়েছে : إِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ অর্থাৎ একদিন তোমরা প্রতিপালকের কাছে এক হাজার বছরের মতো হবে। এ পার্থক্যের কারণ এই যে, এ দিনটি তীব্র কষ্ট ও কঠোর শ্রমের দিক দিয়ে দীর্ঘ হবে। কষ্ট ও শ্রমের স্তর বিভিন্ন রূপ হবে। তাই কারো কাছে এ দিন পঞ্চাশ হাজার বছরের এবং কারো কাছে এক হাজার বছরের সমান বলে মনে হবে।

সারকথা, এ মহাপরীক্ষা কেন্দ্রে প্রথমতঃ দীর্ঘকাল পর্যন্ত পরীক্ষা শুরুই হবে না। এমনকি সবাই বাসনা করতে থাকবে যে, কোনোরূপ পরীক্ষা ও হিসাব-কিতাব হয়ে যাক-পরিণতি যাই হোক, এ অনিশ্চয়তার কষ্ট তো দূর হবে। এ দীর্ঘ অবস্থানের প্রতি ইঙ্গিত করার জন্য ثُمَّ শব্দ প্রয়োগ করে ثُمَّ نَقُولُ বলা হয়েছে। এমনিভাবে পরবর্তী আয়াতে মুশরিকদের পক্ষ থেকে যে উত্তর বর্ণিত হয়েছে, তাতেও ثُمَّ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এতে বুঝা যায় যে, তারাও দীর্ঘ বিরতির পর যথেষ্ট চিন্তা-ভাবনা ও বিচারবিশ্লেষণ করে এ উত্তর দিবে : وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ অর্থাৎ আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কসম! আমরা মুশরিক ছিলাম না। এ আয়াতে তাদের উত্তরকে فِتْنَة শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে। এ শব্দটি পরীক্ষার অর্থেও ব্যবহৃত হয় এবং কারো প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ার অর্থেও ব্যবহৃত হয়। এখানে উভয় অর্থই সম্ভবপর। প্রথম অর্থে তাদের পরীক্ষার উত্তরকেই পরীক্ষা বলা হয়েছে। এবং দ্বিতীয় অর্থে উদ্দেশ্যে এই যে, এরা পৃথিবীতে এসব মূর্তি ও স্বহস্ত নির্মিত উপাস্যদের প্রতি আসক্ত ছিল, স্বীয় অর্থ-সম্পদ এদের জন্যই উৎসর্গ করত। কিন্তু আজ সব ভালোবাসা ও আসক্তি নিঃশেষ হয়ে গেছে এবং এ ছাড়া তাদের মুখে কোনো উত্তর যোগাচ্ছে না। কাজেই তাদের থেকে নির্লিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন হওয়ারই দাবি করে বসল।

তাদের উত্তরে একটি বিস্ময়কর বিষয় এই যে, কিয়ামতের ভয়াবহ ও লোমহর্ষক দৃশ্যাবলি এবং রাব্বুল আলামীনের শক্তি-সামর্থ্যের অভাবনীয় ঘটনাবলি দেখার পর তারা কোন সাহসে রাব্বুল আলামীনের সামনে দাঁড়িয়ে এমন নির্জলা মিথ্যা বলতে পারল! তাও এমন বলিষ্ঠ চিত্তে যে, আল্লাহর মহান সত্তার কসম খেয়ে বলছে যে, আমরা মুশরিক ছিলাম না। অধিকাংশ তাফসীরবিদ এর উত্তরে বলেন : তাদের এ উত্তর বিবেক-বুদ্ধি ও পরিণামদর্শিতার উপর ভিত্তিশীল নয়; বরং ভয়ের আতিশয্যে হতবুদ্ধিতার আবেশে মুখে যা এসেছে, তাই বলেছে। কিন্তু হাশরের সাধারণ ঘটনাবলি ও অবস্থা চিন্তা করলে এ কথাও বলা যায় যে, আল্লাহ তা'আলা তাদের পূর্ণ অবস্থা দৃষ্টির সামনে আনার জন্য তাদেরকে এ শক্তিও দিয়েছেন, যেন তারা পৃথিবীর মতো অবাধ ও মুক্ত পরিবেশে যা ইচ্ছা বলুক– যাতে কুফর ও শিরকের সাথে সাথে তাদের এ দোষটিও হাশরবাসীদের জানা হয়ে যায় যে, তারা মিথ্যা ভাষণে অদ্বিতীয় পটু, এহেন ভয়াবহ পরিস্থিতিতেও তারা মিথ্যা বলতে দ্বিধা করে না। কুরআনে পাকের অপর এক আয়াতে فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ বলে এরই প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। বাক্যটির অর্থ এই যে, এরা মুসলমানদের সামনে যেমন মিথ্যা কসম খায়, তেমনি স্বয়ং রাব্বুল আলামীনের সামনেও মিথ্যা কসম খেতে দ্বিধা করবে না।

হাশরে ময়দানে যখন তারা কসম খেয়ে নিজ নিজ শিরকি ও কুফরি অস্বীকার করবে, তখন সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলা তাদের মুখে মোহর এঁটে তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও হস্তপদকে নির্দেশ দিবেন যে, তোমরা সাক্ষ্য দাও, তারা কি করতো! তখন প্রমাণিত হবে যে, আমাদের হস্ত-পদ, চক্ষু কর্ণ– এরা সবাই ছিল আল্লাহ তা'আলার গুপ্ত পুলিশ। তারা সব কাজকর্ম একটি একটি করে সামনে তুলে ধরবে। এ সম্পর্কেই সূরা ইয়াসীনে বলা হয়েছে : اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلٰٓى اَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَآ اَيْدِيْهِمْ وَتَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ
অর্থাৎ, অদ্য আমি তাদের মুখে মোহর এঁটে দিব, তাদের হাত আমার সাথে কথা বলবে এবং তাদের পদযুগল তাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে সাক্ষ্য দিবে।

এহেন ক্ষমতা প্রত্যক্ষ করার পর আর কেউ কোনো তথ্য গোপন ও মিথ্যা ভাষণে দুঃসাহসী হবে না।

অন্য আয়াতে বলা হয়েছে : وَلَا يَكْتُمُوْنَ اللّٰهَ حَدِيْثًا অর্থাৎ ঐদিন তারা আল্লাহর কাছ থেকে কোনো কথা গোপন করতে পারবে না। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর মতে এর অর্থ এই যে, প্রথম প্রথম তারা খুব মিথ্যা বলবে এবং মিথ্যা কসম খাবে, কিন্তু স্বয়ং তাদের হস্তপদ যখন তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে, তখন কেউ ভুল কথা বলতে সাহসী হবে না।

মাহ বিচারপতি আদালতে সম্পূর্ণ মুক্ত পরিবেশে আত্মপক্ষ সমর্থনের পূর্ণ সুযোগ দেওয়া হবে। পৃথিবীতে যেভাবে সে মিথ্যা বলত, তখনও তার মিথ্যা বলার এ ক্ষমতা ছিনিয়ে নেওয়া হবে না। কেননা সর্বশক্তিমান আল্লাহ তার মিথ্যা আবরণ স্বয়ং তার হস্তপদের সাক্ষ্য দ্বারা উন্মোচিত করে দিবেন।

মৃত্যুর পর কবরে মুনকার নকীর ফেরেশতাদ্বয়ের সামনে প্রথম পরীক্ষা হবে। একে ভর্তি পরীক্ষা বলা যেতে পারে। এ পরীক্ষা সম্পর্কে হাদীসে বলা হয়েছে : মুনকার নাকীর যখন কাফেরকে জিজ্ঞেস করবে مَنْ رَّبُّكَ وَمَا دِيْنُكَ অর্থাৎ তোমার প্রতিপালক কে এবং তোমার দীন কি? কাফের বলবে هَاهْ هَاهْ لَا اَدْرِيْ অর্থাৎ হায়, হায়। আমি কিছুই জানি না। এর বিপরীতে মুমিন বলবে, رَبِّيَ اللّٰهُ وَدِيْنِيَ الْاِسْلَامُ [আমার প্রতিপালক আল্লাহ, এবং আমার দীন ইসলাম] এতে বুঝা যায় যে, এ পরীক্ষায় কেউ মিথ্যা বলার ধৃষ্টতা দেখাতে পারবে না। নতুবা কাফের ও মুমিনের ন্যায় উত্তর দিতে পারত। কারণ এই যে, এখানে পরীক্ষক হচ্ছেন ফেরেশতা। তারা অদৃশ্য বিষয়ে জ্ঞাত নয় এবং তারা হস্তপদের সাক্ষ্যও গ্রহণ করতে অক্ষম। এখানে মিথ্যা বলার ক্ষমতা মানুষকে দেওয়া হলে ফেরেশতা তার উত্তর অনুযায়ীই কাজ করত। ফলে পরীক্ষার উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যেত। হাশরের পরীক্ষা এরূপ নয়। সেখানে প্রশ্ন ও উত্তর সরাসরি সর্বজ্ঞ, সর্বজ্ঞাত ও সর্বশক্তিমানের সাথে হবে। সেখানে কেউ মিথ্যা বললেও তা কার্যকরী হবে না।

তাফসীরে 'বাহরে মুহীত' ও 'মাযহারী'তে কোনো কোনো তাফসীরবিদের এ উক্তিও বর্ণিত আছে যে, যারা মিথ্যা কসম খেয়ে স্বীয় শিরককে অস্বীকার করবে, তারা হলো সেসব লোক, যারা কোনো সৃষ্টজীবকে খোলাখুলি আল্লাহর কিংবা আল্লাহর প্রতিনিধি না বলেও আল্লাহর সব ক্ষমতা সৃষ্টজীবে বণ্টন করে দিয়েছিল। সৃষ্টজীবের কাছেই প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র যাচনা করত, তাদের নামে নৈবেদ্য প্রদান করত এবং তাদের কাছেই স্বাস্থ্য, রুজি-রোজগার, সন্তান-সন্ততি ও অন্যান্য যাবতীয় মনোবাঞ্ছা প্রার্থনা করত। তারা নিজেদেরকে মুশরিক মনে করত না। তাই হাশরের ময়দানেও কসম খেয়ে বলবে যে, তারা মুশরিক ছিল না। কিন্তু কসম খাওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ তা'আলা তাদের লাঞ্ছিত করবেন।

আলোচ্য আয়াতে দ্বিতীয় প্রশ্ন এই যে, কুরআনের কোনো কোনো আয়াতের দ্বারা জানা যায় যে, আল্লাহ তা'আলা কাফের ও গুনাহগারদের সাথে কথা বলবেন না। অথচ আলোচ্য আয়াত থেকে পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে যে, তাদেরকে সম্বোধন করে তিনি কথা বলবেন।

উত্তর এই যে, এ সম্বোধন ও কথাবার্তা সম্মান প্রদান ও প্রার্থনা শ্রবণ হিসেবে হবে না। হুমকি প্রদর্শন ও শাসানির জন্যও সম্বোধন হবে না, উক্ত আয়াতের অর্থ তা নয়। এ কথাও বলা যায় যে, আলোচ্য আয়াতে যে সম্বোধন রয়েছে, তা হবে ফেরেশতাদের মধ্যস্থতায়। পক্ষান্তরে যে আয়াতে সম্বোধন ও কথাবার্তা হবে না বলে বলা হয়েছে, সেখানে প্রত্যক্ষ কথাবার্তা বুঝানো হয়েছে।

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে : اُنْظُرْ كَيْفَ كَذَبُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ
–এতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলা হয়েছে যে, দেখুন, তারা নিজেদের বিপক্ষে কেমন মিথ্যা বলেছে; আল্লাহর বিরুদ্ধে যাদেরকে তারা মিছামিছি শরিক তৈরি করেছিল, আজ তারা সবাই উধাও হয়ে গেছে। নিজেদের বিরুদ্ধে মিথ্যা বলার অর্থ এই যে, এ মিথ্যার শাস্তি তাদের উপরই পতিত হবে। মনগড়া তৈরি করার অর্থ এই যে, দুনিয়াতে তাদেরকে আল্লাহর অংশীদার করার ব্যাপারটি ছিল মিছামিছি (শরিক) ও মনগড়া। আজ বাস্তব সত্য সামনে এসে যাওয়ায় এ মিথ্যা অকেজো হয়ে গেছে। মনগড়া তৈরির অর্থ মিথ্যা কসমও হতে পারে, যা হাশরের ময়দানে উচ্চারণ করবে।

অতঃপর হস্তপদ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাক্ষ্য দ্বারা সে মিথ্যা ধরা পড়ে যাবে। কোনো কোনো তাফসীরবিদ বলেছেন : মনগড়া তৈরি করা বলে মুশরিকদের ঐসব অপব্যাখ্যা বুঝানো হয়েছে, যা তারা দুনিয়াতে মিথ্যা উপাস্যদের সম্পর্কে বর্ণনা করত। উদাহরণতঃ তারা বলত مَا نَعْبُدُ هُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُوْنَا اِلَى اللّٰهِ زُلْفٰى অর্থাৎ আমরা উপাস্য মনে করে মূর্তির উপাসনা করি না; বরং উপাসনা করার কারণ এই যে, তারা আল্লাহর কাছে সুপারিশ করে আমাদেরকে তাঁর নিকটবর্তী করে দিবে। হাশরে তাদের এ মনগড়া ব্যাখ্যা এমনভাবে মিথ্যা প্রমাণিত হবে যে, তাদের মহাবিপদের সময় কেউ তাদের সুপারিশ করবে না।

উভয় আয়াতে বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য যে, হাশরের ভয়াবহ ময়দানে মুশরিকদেরকে যা ইচ্ছা, বলার স্বাধীনতা দানের মধ্যে সম্ভবতঃ ইঙ্গিত রয়েছে যে, মিথ্যা বলার অভ্যাস একটি দুষ্ট অভ্যাস যা পরিত্যাগ করা অতি কঠিন। সুতরাং যারা দুনিয়াতে মিথ্যা কসম খেত, তারা এখানেও তা থেকে বিরত থাকতে পারেনি। ফলে সমগ্র সৃষ্টজগতের সামনে তারা লাঞ্ছিত হয়েছে। এ কারণেই কুরআনের স্থানে স্থানে মিথ্যাবাদীর প্রতি অভিসম্পাত বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: মিথ্যা থেকে বেঁচে থাক। কেননা মিথ্যা পাপাচারের দোসর। মিথ্যা ও পাচার উভয়ই জাহান্নামে যাবে। –[ইবনে হাব্বান]

রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে জিজ্ঞেস করা হয়: যে কাজের দরুন মানুষ দোজখে যাবে, তা কি? তিনি বললেন, সে কাজ হচ্ছে মিথ্যা। –[মুসনাদে আহমদ]

মিরাজ রজনীতে রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রত্যক্ষ করেছিলেন যে, এক ব্যক্তির চোয়াল চিরে দেওয়া হচ্ছে। সে আবার পূর্বাবস্থায় ফিরে আসছে। অতঃপর আবার চিরে দেওয়া হচ্ছে। তার সাথে এ কার্যধারা কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। তিনি হযরত জিবরাঈল (আ.)-কে জিজ্ঞেস করলেন : এ ব্যক্তি কে? হযরত জিবরাঈল বললেন . এ হলো মিথ্যাবাদী।

মুসনাদের আহমদের এক হাদীসে বর্ণিত রয়েছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : মিথ্যা সম্পূর্ণরূপে বর্জন না করা পর্যন্ত কেউ পূর্ণ মুমিন হতে পারে না। এমনকি, হাসি-ঠাট্টা ছলেও মিথ্যা না বলা উচিত।

বায়হাকীতেও সহীহ সনদ সহকারে বর্ণিত আছে, মুসলমানের মধ্যে অন্য কু–অভ্যাস থাকতে পারে; কিন্তু আত্মসাৎ ও মিথ্যা থাকতে পারে না। অন্য এক হাদীসে আছে, মিথ্যা মানুষের রিজিক কমিয়ে দেয়।

قوله وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ যাহ্হাক, কাতাদাহ, মুহাম্মদ ইবনে হানাফিয়া (র.) প্রমুখ তাফসীরবিদগণের মতে এ আয়াত মক্কার কাফেরদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। তারা কুরআন শুনতে ও অনুসরণ করতে লোকদের বারণ করত এবং নিজেরাও তা থেকে দূরে সরে থাকত। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে আরো বর্ণিত আছে যে, এ আয়াত মহানবী ﷺ–এর চাচা আবূ তালেব ও আরো কয়েকজন চাচা সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে, যাঁরা তাঁকে সমর্থন করতেন এবং কাফেরদের উৎপীড়ন থেকে তাঁকে রক্ষা করতেন, কিন্তু কুরআনে বিশ্বাস স্থাপন করতেন না। এমতাবস্থায় عَنْهُ শব্দের সর্বনামটির অর্থ কুরআনের পরিবর্তে নবী করীম ﷺ হবেন। –[মাযহারী]

শব্দ বিশ্লেষণ

- اُوْحِيَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى مجهول বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِيْحَاءُ মূলবর্ণ (و ـ ح ـ ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ– অবতীর্ণ হয়েছে, প্রেরিত হয়েছে।
- بَرِيْئٌ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব سَمِعَ মাসদার اَلْبَرَاءَةُ মূলবর্ণ (ب ـ ر ـ ء) জিনস مهموز لام অর্থ– মুক্ত, পবিত্র।
- كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى استمرارى معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِفْتِرَاءُ মূলবর্ণ (ف ـ ر ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– তারা মিথ্যা রচনা করত।
- قُلُوْبٌ : শব্দটি বহুবচন, একবচন قَلْبٌ অর্থ– অন্তর।
- اَكِنَّةً : শব্দটি বহুবচন, একবচন كِنَانٌ অর্থ– পর্দা, আবরণ।
- يَفْقَهُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব سَمِعَ মাসদার اَلْفِقْهُ মূলবর্ণ (ف ـ ق ـ ه) জিনস صحيح অর্থ– তারা উপলব্ধি করে।

অনুবাদ	আয়াত
অনুবাদ : (২৭) আর যদি আপনি সেই সময় প্রত্যক্ষ করেন, যখন তাদেরকে দোজখের সন্নিকটে দাঁড় করানো হবে, তখন বলবে, হায় কতই না উত্তম হতো যদি আমাদেরকে পুনরায় পাঠানো হতো, আর যদি এরূপ হয়ে যায়, তবে আমরা স্বীয় প্রতিপালকের নিদর্শনসমূহকে অসত্য বলব না এবং আমরা ঈমানওয়ালাদের দলভুক্ত হয়ে যাব।	وَلَوْ تَرٰىٓ اِذْ وُقِفُوْا عَلَى النَّارِ فَقَالُوْا يٰلَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِاٰيٰتِ رَبِّنَا وَنَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ (٢٧)
(২৮) বরং যা তারা এর পূর্বে গোপন করত তা [আজ] তাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়েছে, আর যদি তাদেরকে পুনরায় পাঠানো হয়, তবুও তারা সেই কাজই করবে যা করতে নিষেধ করা হয়েছিল, আর নিশ্চয় তারা সম্পূর্ণ মিথ্যাবাদী।	بَلْ بَدَا لَهُمْ مَّا كَانُوْا يُخْفُوْنَ مِنْ قَبْلُ ؕ وَلَوْ رُدُّوْا لَعَادُوْا لِمَا نُهُوْا عَنْهُ وَاِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ (٢٨)
(২৯) আর তারা বলে, জীবন তো আর কোথাও নয় শুধু বর্তমান জীবনই এবং আমরা পুনর্জীবিত হব না।	وَقَالُوْٓا اِنْ هِيَ اِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوْثِيْنَ (٢٩)
(৩০) আর যদি আপনি সেই সময় প্রত্যক্ষ করেন, যখন তাদেরকে তাদের রবের সম্মুখে দাঁড় করানো হবে, আল্লাহ বলবেন, তা কি বাস্তব বিষয় নয়? তারা বলবে, শপথ আমাদের পরওয়ারদেগারের, নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা বলবেন, তবে এখন নিজেদের কুফরের বিনিময়ে শাস্তির স্বাদ গ্রহণ কর।	وَلَوْ تَرٰىٓ اِذْ وُقِفُوْا عَلٰى رَبِّهِمْ ؕ قَالَ اَلَيْسَ هٰذَا بِالْحَقِّ ؕ قَالُوْا بَلٰى وَرَبِّنَا ؕ قَالَ فَذُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ (٣٠)

শাব্দিক অনুবাদ

(২৭) وَلَوْ تَرٰى আর যদি আপনি সেই সময় প্রত্যক্ষ করেন اِذْ وُقِفُوْا عَلَى النَّارِ যখন তাদেরকে দোজখের সন্নিকটে দাঁড় করানো হবে فَقَالُوْا তখন বলবে يٰلَيْتَنَا نُرَدُّ হায় কতই না উত্তম হতো যদি আমাদেরকে পুনরায় পাঠানো হতো وَلَا نُكَذِّبَ بِاٰيٰتِ رَبِّنَا আর যদি এরূপ হয়ে যায়, তবে আমরা স্বীয় প্রতিপালকের নিদর্শনসমূহকে অসত্য বলব না وَنَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ এবং আমরা ঈমানওয়ালাদের দলভুক্ত হয়ে যাব।

(২৮) بَلْ بَدَا لَهُمْ বরং তা [আজ] তাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়েছে مَا كَانُوْا يُخْفُوْنَ مِنْ قَبْلُ যা তারা এর পূর্বে গোপন করত وَلَوْ رُدُّوْا আর যদি তাদেরকে পুনরায় পাঠানো হয় لَعَادُوْا لِمَا نُهُوْا عَنْهُ তবুও তারা সেই কাজই করবে যা করতে নিষেধ করা হয়েছিল وَاِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ আর নিশ্চয় তারা সম্পূর্ণ মিথ্যাবাদী।

(২৯) وَقَالُوْا আর তারা বলে اِنْ هِيَ اِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا জীবন তো আর কোথাও নয় শুধু বর্তমান জীবই وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوْثِيْنَ এবং আমরা পুনর্জীবিত হব না।

(৩০) وَلَوْ تَرٰى আর যদি আপনি সেই সময় প্রত্যক্ষ করেন اِذْ وُقِفُوْا عَلٰى رَبِّهِمْ যখন তাদেরকে তাদের রবের সম্মুখে দাঁড় করানো হবে قَالَ আল্লাহ বলবেন اَلَيْسَ هٰذَا بِالْحَقِّ তা কি বাস্তব বিষয় নয়? قَالُوْا তারা বলবে بَلٰى وَرَبِّنَا শপথ আমাদের পরওয়ারদেগারের নিঃসন্দেহে قَالَ আল্লাহ তা'আলা বলবেন فَذُوْقُوا الْعَذَابَ তবে এখন শাস্তির স্বাদ গ্রহণ কর بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ নিজেদের কুফরের বিনিময়ে।

قَدْ خَسِرَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِلِقَآءِ اللّٰهِ ؕ حَتّٰۤى اِذَا جَآءَتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوْا يٰحَسْرَتَنَا عَلٰى مَا فَرَّطْنَا فِيْهَا ۙ وَهُمْ يَحْمِلُوْنَ اَوْزَارَهُمْ عَلٰى ظُهُوْرِهِمْ ؕ اَلَا سَآءَ مَا يَزِرُوْنَ (٣١)

অনুবাদ : (৩১) নিঃসন্দেহে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে যারা আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ হওয়াকে অসত্য বলেছে, এমন কি যখন সেই নির্দিষ্ট সময় তাদের প্রতি অকস্মাৎ এসে পৌঁছবে, বলবে, হায়! আফসোস আমাদের ক্রটির উপর যা এ সম্বন্ধে ঘটেছে, আর তাদের অবস্থা এই হবে যে, তারা নিজেদের [গুনাহর] বোঝা নিজেদের কটিদেশে বহন করবে, উত্তমরূপে শুনে নাও, মন্দ হবে ঐ বস্তু যা তারা বহন করবে।

وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَاۤ اِلَّا لَعِبٌ وَّلَهْوٌ ؕ وَلَلدَّارُ الْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ (٣٢)

(৩২) আর পার্থিব জীবন তো খেল ও তামাশা ব্যতীত কিছুই নয়, আর মুত্তাকীদের জন্য পরকালের বাসস্থানই উত্তম; তোমরা কি ভেবে দেখ না?

قَدْ نَعْلَمُ اِنَّهٗ لَيَحْزُنُكَ الَّذِيْ يَقُوْلُوْنَ فَاِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُوْنَكَ وَلٰكِنَّ الظّٰلِمِيْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ يَجْحَدُوْنَ (٣٣)

(৩৩) আমি অবশ্যই জানি যে, তাদের উক্তিসমূহ আপনাকে ব্যথিত করে, বস্তুতঃ তারা তো আপনাকে মিথ্যাবাদী বলছে না; বরং এই জালেমরা তো আল্লাহর আয়াতসমূহকে অস্বীকার করছে।

শাব্দিক অনুবাদ

(৩১) قَدْ خَسِرَ নিঃসন্দেহে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِلِقَآءِ اللّٰهِ যারা আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ হওয়াকে অসত্য বলছে حَتّٰۤى اِذَا جَآءَتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً এমন কি যখন সেই নির্দিষ্ট সময় তাদের প্রতি অকস্মাৎ এসে পৌঁছবে। قَالُوْا বলবে يٰحَسْرَتَنَا عَلٰى مَا فَرَّطْنَا فِيْهَا হায়! আফসোস আমাদের ক্রটির উপর যা এ সম্বন্ধে ঘটেছে وَهُمْ يَحْمِلُوْنَ اَوْزَارَهُمْ আর তাদের অবস্থা এই হবে যে তারা নিজেদের [গুনাহর] বোঝা বহন করবে عَلٰى ظُهُوْرِهِمْ নিজেদের কটিদেশে اَلَا سَآءَ مَا يَزِرُوْنَ উত্তমরূপে শুনে নাও, মন্দ হবে ঐ বস্তু যা তারা বহন করবে।

(৩২) وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَاۤ اِلَّا لَعِبٌ وَّلَهْوٌ আর পার্থিব জীবন তো খেল ও তামাশা ব্যতীত কিছুই নয় وَلَلدَّارُ الْاٰخِرَةُ خَيْرٌ আর পরকালের বাসস্থানই উত্তম لِّلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ মুত্তাকীদের জন্য اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ তোমরা কি ভেবে দেখ না?

(৩৩) قَدْ نَعْلَمُ আমি অবশ্যই জানি যে اِنَّهٗ لَيَحْزُنُكَ الَّذِيْ يَقُوْلُوْنَ তাদের উক্তিসমূহ আপনাকে ব্যথিত করে فَاِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُوْنَكَ বস্তুতঃ তারা তো আপনাকে মিথ্যাবাদী বলছে না وَلٰكِنَّ الظّٰلِمِيْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ يَجْحَدُوْنَ বরং এই জালেমরা তো আল্লাহর আয়াতসমূহকে অস্বীকার করছে।

وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوْا عَلٰى مَا كُذِّبُوْا وَاُوْذُوْا حَتّٰى اَتٰهُمْ نَصْرُنَا ۚ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِ اللّٰهِ ۚ وَلَقَدْ جَآءَكَ مِنْ نَّبَاِى الْمُرْسَلِيْنَ (٣٤)

অনুবাদ : (৩৪) এবং বহু পয়গম্ব যাঁরা আপনার পূর্বে অতীত হয়েছেন, তাঁদেরকেও মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করা হয়েছিল, তবুও তাঁরা সবরই করেছিলেন, তাঁদেরকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করা ও তাঁদেরকে যাতনা দেওয়ার প্রতি যে পর্যন্ত না তাঁদের নিকট আমার সাহায্য পৌছেছিল, বস্তুতঃ আল্লাহর বাণীসমূহের কোনো পরিবর্তনকারী নেই, আর আপনার নিকট পয়গম্বরগণের কতিপয় ইতিবৃত্ত পৌছেছে।

শাব্দিক অনুবাদ

(৩৪) وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ এবং বহু পয়গম্ব যাঁরা আপনার পূর্বে অতীত হয়েছেন, তাঁদেরকেও মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করা হয়েছিল। فَصَبَرُوْا তবুও তাঁরা সবরই করেছিলেন। عَلٰى مَا كُذِّبُوْا وَاُوْذُوْا তাঁদেরকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করা ও তাঁদেরকে যাতনা দেওয়ার প্রতি حَتّٰى اَتٰهُمْ نَصْرُنَا যে পর্যন্ত না তাঁদের নিকট আমার সাহায্য পৌছেছিল وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِ اللّٰهِ বস্তুতঃ আল্লাহর বাণীসমূহের কোনো পরিবর্তনকারী নেই وَلَقَدْ جَآءَكَ مِنْ نَّبَاِى الْمُرْسَلِيْنَ আর আপনার নিকট পয়গম্বরগণের কতিপয় ইতিবৃত্ত পৌছেছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(৩৩) قوله قَدْ نَعْلَمُ اِنَّهٗ لَيَحْزُنُكَ الَّذِىْ يَقُوْلُوْنَ الخ **আয়াতের শানে নুযূল– ১ :** হযরত কাতাদাহ (রা.) হতে বর্ণিত রয়েছে, সুদ্দী কর্তৃক একটি বর্ণনাও তার সমর্থনে রয়েছে যে, আখনাস বিন শুরাইক এবং আবূ জাহেল একদা এক সাথে মিলিত হয়। সে সময়ে আখনাস আবূ জাহলকে বলল, হে আবুল হেকাম! মুহাম্মদ সম্পর্কে কিছু তথ্য আমাকে দান কর। লোকটা কি মিথ্যুক না সত্যবাদী? তুমি আমার সাথে যা বলবে তা শুনে নিব, এখন আমি ভিন্ন অন্য কোনো লোক নেই। তখন আবূ জাহল বলল, আল্লাহর শপথ, মুহাম্মদ ﷺ একজন সত্যবাদী, মুহাম্মদ কখনো মিথ্যা কথা বলেননি। তাদের গোপনীয় এ আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে।

শানে নুযূল– ২ : ওয়াহেদী বর্ণনা করেন যে, হারেছ বিন আমের বিন নওফেল বিন আবদে মনাফ বিন কুসাই বিন কেলাব লোক সমাজে নবী আলাইহিস সালামকে মিথ্যাবাদী বলে প্রচার করত। তবে তার পরিবারের লোকজনের সাথে যখন নিবৃত্তে মিলিত হতো, তখন বলতো মুহাম্মদ মিথ্যুক নন। তিনি মিথ্যুক নন বলেই আমি মনে প্রাণে বিশ্বাস করি। তখন হারেছ বিন আমরের এহেন কপটতাপূর্ণ আচরণের প্রেক্ষাপটে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে।

শানে নুযূল– ৩ : তিরমিযী ও হাকেম হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণনা করেন যে, আবূ জাহল নবী করীম ﷺ-কে বলত, আমরা তো আপনাকে মিথ্যাবাদী বলি না। আপনি আমাদের নিকট সত্যবাদী। তবে আপনি যে দীন নিয়ে এসেছেন তাকে সত্য হিসেবে মেনে নিতে পারি না। তখন আবূ জাহলের এহেন কপটতাপূর্ণ আচরণের প্রেক্ষাপটে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। –[রূহুল মা'আনী ১৩৬/৪/৭, ফাতহুল কাদীর ১১৩/২, বাহরে মুহীত ১১৪/৪, কুরতুবী ৩৮১/৬]

قوله وَلَوْ تَرٰى اِذْ وُقِفُوْا عَلَى النَّارِ فَقَالُوْا يٰلَيْتَنَا الخ ইসলামের তিনটি মূলনীতি রয়েছে : ১. একত্ববাদ, ২. রিসালাত ও ৩. আখেরাতে বিশ্বাস। অবশিষ্ট সব বিশ্বাস এ তিনটিরই অধীন। এ তিন মূলনীতি মানুষকে স্বীয় স্বরূপ ও জীবনের লক্ষ্যের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয় এবং জীবনে বিপ্লব সৃষ্টি করে তাকে এক সরল ও স্বচ্ছ পথে দাঁড় করিয়ে দেয়। এগুলোর মধ্যে পরকাল ও পরকালের প্রতিদান ও শাস্তির বিশ্বাস কার্যতঃ এমন একটি বৈপ্লবিক বিশ্বাস, যা মানুষের প্রত্যেক কাজের গতি বিশেষ একটি দিকে ঘুরিয়ে দেয়। এ কারণেই কুরআনে পাকের সব বিষয়বস্তু এ তিনটির মধ্যে চক্রাকারে আবর্তিত হয়। আলোচ্য আয়াতসমূহে বিশেষভাবে পরকালের প্রশ্ন ও উত্তর, কঠোর শাস্তি অশেষ ছওয়াব এবং ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার স্বরূপ বর্ণিত হয়েছে।

প্রথম আয়াতে অবিশ্বাসী, অপরাধীদের অবস্থার বর্ণনা করে বলা হয়েছে : পরকালে যখনন তাদেরকে দোজখের কিনারায় দাঁড় করানো হবে এবং তারা কল্পনাতীত ভয়াবহ শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে, তখন তারা আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করে বলবে, আফসোস! আমাদেরকে পুনরায় দুনিয়াতে প্রেরণ করা হলে আমরা পালনকর্তার প্রেরিত নিদর্শনাবলি ও নির্দেশাবলিকে মিথ্যারোপ করতাম না; বরং এগুলো বিশ্বাস করে মুমিনদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেতাম।

দ্বিতীয় আয়াতে সর্বজ্ঞ, সর্বজ্ঞাত, মহাবিচারপতি তাদের বিহবল আকাঙ্ক্ষার রহস্য উন্মোচন করে বলেছেন, এরা চিরকাল মিথ্যায় অভ্যস্ত ছিল। এ আকাঙ্ক্ষায়ও এরা মিথ্যাবাদী। আসল ব্যাপার এই যে, পয়গম্বরগণের মাধ্যমে যেসব বাস্তব সত্য তাদের সামনে তুলে ধরা হয়েছিল এবং তারা তা জানা ও চেনা সত্ত্বেও শুধু হঠকারিতা কিংবা লোভ-লালসার বশবর্তী হয়ে এসব সত্যকে পর্দায় আবৃত রাখার চেষ্টা করত। আজ সেগুলো একটি একটি করে তাদের সামনে উপস্থিত হয়ে গেছে, আল্লাহ পাকের একচ্ছত্র অধিকার ও ও শক্তি সামর্থ্য চোখে দেখেছে, পয়গম্বর গণের সত্যতা অবলোকন করেছে, পরকালে পুনর্জীবিত হওয়া যা সর্ব সময়ই তারা অস্বীকার করত, নির্মম সত্য হয়ে সামনে এসেছে, প্রতিদান ও শাস্তি প্রকাশ হতে দেখেছে এবং দোজখও দেখেছে। কাজেই বিরোধিতা করার কোনো ছুতা তাদের হাতে অবশিষ্ট রইল না। তাই এমনিতেই বলতে শুরু করেছে যে, আমরা দুনিয়াতে পুনর্বার প্রেরিত হলে ঈমানদার হয়ে ফিরতাম।

তাদের এ উক্তিকে মিথ্যা বলা পরিণতির দিক দিয়েও হতে পারে। অর্থাৎ তারা যে ওয়াদা করছে যে, আমরা দুনিয়াতে পুনঃ প্রেরিত হলে মিথ্যারোপ করব না, এর পরিণতি কিন্তু এরূপ হবে না; তারা দুনিয়াতে পৌঁছে আবারও মিথ্যারোপ করবে। এ মিথ্যা বলার এ অর্থও হতে পারে যে, তারা এখনও যা কিছু বলছে, তা সদিচ্ছায় বলছে না; বরং সাময়িক বিপদ টলানোর উদ্দেশ্যে, শাস্তির কবল থেকে বাঁচার জন্য বলছে– অন্তরে এখনও তাদের সদিচ্ছা নেই।

তৃতীয় আয়াতে বলা হয়েছে : إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا –এর عَطْف হয়েছে عَادُوْا –এর উপর। অর্থ এই যে, যদি তারা দুনিয়াতে পুনঃ প্রেরিত হয়, তবে সেখানে পৌঁছে একথাই বলবে যে, আমরা এ পার্থিব জীবন ছাড়া অন্য কোনো জীবন মানি না। এজীবনই একমাত্র জীবন। আমাদেরকে পুনরায় জীবিত করা হবে না।

এখানে একটি প্রশ্ন উঠে যে, যখন কিয়ামতে পুনরুজ্জীবিত হওয়াকে এবং হিসাব-নিকাশ, প্রতিদান ও শাস্তিকে একবার স্বচক্ষে দেখেছে, তখন দুনিয়াতে এসে পুনরায় তা অস্বীকার করা কিরূপে সম্ভবপর?

উত্তর এই যে, অস্বীকার করার জন্য বাস্তবে ঘটনাবলির বিশ্বাস না থাকা জরুরি নয়; বরং আজকাল যেমন অনেক কাফের ইসলামি সত্যসমূহ পূর্ণ বিশ্বাসী হওয়া সত্ত্বেও শুধু হঠকারিতা বশতঃ ইসলামকে অস্বীকার করে চলেছে, এমনিভাবে তারা দুনিয়াতে প্রত্যাবর্তনের পর কিয়ামত, পুনরুজ্জীবন ও পরকাল সম্পর্কে পূর্ণ বিশ্বাসী হওয়া সত্ত্বেও শুধু হঠকারিতার বশবর্তী হয়ে এগুলো অস্বীকারে প্রবৃত্ত হবে। কুরআন পাক বর্তমান জীবনে কোনো কোনো কাফের সম্পর্কে বলে :

وَجَحَدُوْا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا اَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَّعُلُوًّا অর্থাৎ তারা আমার নিদর্শনসমূহ অস্বীকার করছে কিন্তু তাদের অন্তরে এগুলোর সত্যতা সম্পর্কে পূর্ণ বিশ্বাস রয়েছে। যেমন, ইহুদিদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তারা শেষ নবী ﷺ –কে এমনভাবে চেনে, যেমন স্বীয় সন্তানদেরকে চেনে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা তাঁর বিরোধিতায় উঠে পড়ে লেগে আছে।

মোটকথা, জগৎস্রষ্টা স্বীয় আদি জ্ঞানের মাধ্যমে জানেন যে, তাদের এ বক্তব্য যে, দুনিয়াতে পুনঃ প্রেরিত হলে মুমিন হয়ে যাব, সম্পূর্ণ মিথ্যা ও প্রতারণামূলক। তাদের কথা অনুযায়ী পুনরায় জগৎ সৃষ্টি করে তাদেরকে সেখানে ছেড়ে দিলেও তারা আবার তাই করবে, যা প্রথম জীবনে করত।

তাফসীরে মাযহারীতে তাবারানীর বরাত দিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ –এর উক্তি বর্ণিত আছে যে, হিসাব-কিতাবের সময় আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আ.)–কে বিচার দণ্ডের কাছে দাঁড় করিয়ে বলবেন, সন্তানদের কাজকর্ম স্বচক্ষে পরিদর্শন কর। যার সৎকর্ম পাপকর্মের চাইতে এক রতি বেশি হয়, তাকে তুমি জান্নাতে পৌঁছাতে পার। আল্লাহ তা'আলা আরো বলবেন, আমি জাহান্নামের আজাবে ঐ ব্যক্তিকে প্রবিষ্ট করাব, যার সম্পর্কে জানি যে, দুনিয়াতে পুনঃ প্রেরিত হলেও পূর্বের মতোই কাজ করবে।

قوله وَهُمْ يَحْمِلُوْنَ اَوْزَارَهُمْ : হাদীসে আছে, কিয়ামতের দিন সৎ লোকদের কাজকর্ম তাদের বাহন হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে অসৎ লোকদের কাজকর্ম ভারি বোঝার আকারে তাদের মাথায় চাপিয়ে দেওয়া হবে।

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, কাফের ও পাপীরা হাশরের ময়দানের প্রাণরক্ষার্থে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে নানা ধরনের কথা-বার্তা বলবে। কখনো মিথ্যা কসম খাবে, কখনো দুনিয়ায় পুনঃ প্রেরিত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করবে। কিন্তু একথা কেউ বলবে না যে, আমরা এখন বিশ্বাস স্থাপন করেছি এবং একন সৎকাজ করব। কেননা এ সত্য স্বতঃসিদ্ধ হয়ে তাদের সামনে এসে যাবে যে, এজগৎ কর্মজগৎ নয় এবং বিশ্বাস স্থাপন ততক্ষণ পর্যন্তই শুদ্ধ, যতক্ষণ তা অদৃশ্যে বিশ্বাস স্থাপন হয়। দেখার পর সত্য জানা, তা দেখারই প্রতিক্রিয়া, আল্লাহ ও রাসূলকে সত্য জানা নয়। এতে বুঝা গেল যে, আল্লাহর সন্তুষ্টি, এর ফলাফল– অর্থাৎ চিরস্থায়ী আরাম আয়েশ, দুনিয়াতে শান্তিময় পবিত্র জীবন এবং পরকালে জান্নাত লাভ শুধুমাত্র পার্থিব জীবনের মাধ্যমেই অর্জিত হতে পারে। এর পূর্বে আত্মজগতে এগুলো অর্জন করা সম্ভব নয় এবং এর পরে পরকালেও এগুলো উপার্জন করা সম্ভবপর নয়।

এতে ফুটে উঠল যে, পার্থিব জীবন অনেক বড় নিয়ামত এবং অত্যন্ত মূল্যবান বিষয়: উপরিউক্ত সুমহান সওদা এ জীবনেই ক্রয় করা যায়। তাই ইসলামে আত্মহত্যা হারাম এবং মৃত্যুর জন্য দোয়া ও মৃত্যু কামনা করা নিষিদ্ধ। কারণ এতে আল্লাহ তা'আলার একটি বিরাট নিয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়।

সারকথা এই যে, দুনিয়াতে যে বস্তুটি প্রত্যেকেই প্রাপ্ত হয়েছে এবং যা সর্বাধিক মূল্যবান ও প্রিয়, তা হচ্ছে মানুষের জীবন। একাও সবার জানা যে, মানুষের জীবনের একটা সীমাবদ্ধ গণ্ডি রয়েছে কিন্তু জীবনের সঠিক সীমা কারো জানা নেই যে, তা সত্তর বছর হবে, না সত্তর ঘন্টা, না একটি শ্বাস ছাড়ারও সময় পাওয়া যাবেনা।

শব্দ বিশ্লেষণ

تَرٰى : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব فَتَحَ মাসদার اَلرُّؤْيَةُ মূলবর্ণ (ر. أ. ى) জিনস মুরাক্কাব مهموز عين এবং ناقص يائى অর্থ– তুমি দেখছ, তুমি দেখবে।

رُدُّوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى مجهول বাব نَصَرَ মাসদার اَلرَّدُّ মূলবর্ণ (ر . د . د) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– তারা পুনঃপ্রেরিত হয়েছে।

لَعَادُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْعَوْدَةُ মূলবর্ণ (ع . و . د) জিনস اجوف واوى অর্থ– অবশ্যই তারা ফিরবে।

نُهُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى مجهول বাব فَتَحَ মাসদার اَلنَّهْىُ মূলবর্ণ (ن . ه . ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– তাদেরকে নিষেধ করা হয়েছিল।

وُقِفُوْا সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى مجهول বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْوَقْفُ মূলবর্ণ (و . ق . ف) জিনস مثال واوى অর্থ– তাদেরকে দাঁড় করানো হবে।

ذُوْقُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلذَّوْقُ মূলবর্ণ (ذ . و . ق) জিনস اجوف واوى অর্থ– তোমরা স্বাদ নাও, স্বাদ গ্রহণ কর।

www.almodina.com

وَاِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ اِعْرَاضُهُمْ فَاِنِ اسْتَطَعْتَ اَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْاَرْضِ اَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَآءِ فَتَاْتِيَهُمْ بِاٰيَةٍ ؕ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدٰى فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْجٰهِلِيْنَ (٣٥)

অনুবাদ : (৩৫) আর যদি তাদের বিমুখতা আপনার নিকট অসহনীয় হয়, তবে যদি আপনার এরূপ ক্ষমতা থাকে জমিনে [প্রবেশ করার] কোনো সুড়ঙ্গ অথবা আসমানে [আরোহণ করার] কোনো সোপান অন্বেষণ করে নিতে অতঃপর [তার সাহায্যে গমনপূর্বক তথা হতে] কোনো মু'জিযা আনয়ন করতে পারেন, তবে আনয়ন করুন, আর যদি আল্লাহ ইচ্ছা করতেন, তবে তাদের সকলকে সরল পথে একত্র করে দিতেন, অতএব, আপনি নির্বোধ লোকদের দলভুক্ত হবেন না।

اِنَّمَا يَسْتَجِيْبُ الَّذِيْنَ يَسْمَعُوْنَ ؔ وَالْمَوْتٰى يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ ثُمَّ اِلَيْهِ يُرْجَعُوْنَ (٣٦)

(৩৬) তারাই কবুল করে যারা সত্যানুসন্ধানের জন্য শ্রবণ করে; আর মৃতদেরকে আল্লাহ [কিয়ামত দিবসে] জীবিত করে উঠাবেন, অনন্তর সকলেই আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে।

وَقَالُوْا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ اٰيَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ ؕ قُلْ اِنَّ اللّٰهَ قَادِرٌ عَلٰٓى اَنْ يُّنَزِّلَ اٰيَةً وَّلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ (٣٧)

(৩৭) আর এ সমস্ত লোক বলে যে, তাঁর প্রতি কোনো মু'জিযা কেন অবতরণ করা হয় না– তাঁর রবের পক্ষ থেকে? আপনি বলে দিন, নিশ্চয় এ বিষয়ে আল্লাহর পূর্ণ ক্ষমতা রয়েছে যে, তিনি মু'জিযা অবতীর্ণ করতে পারেন, কিন্তু তাদের অধিকাংশই বে-খবর।

وَمَا مِنْ دَآبَّةٍ فِي الْاَرْضِ وَلَا طٰٓئِرٍ يَّطِيْرُ بِجَنَاحَيْهِ اِلَّآ اُمَمٌ اَمْثَالُكُمْ ؕ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتٰبِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ اِلٰى رَبِّهِمْ يُحْشَرُوْنَ (٣٨)

(৩৮) আর যত প্রকার প্রাণী ভূপৃষ্ঠে বিচরণ করে এবং যত প্রকার পাখি স্বীয় ডানাদ্বয়ের সাহায্যে উড়ে তন্মধ্যে কোনো প্রকারই এরূপ নেই যারা [কিয়ামত দিবসে] তোমাদের ন্যায় [সমবেত] দল হবে না, আমি কিতাবে কোনো কিছুই ছাড়িনি, অতঃপর সকলকে স্বীয় পরওয়ারদেগারের সমীপে সমবেত করা হবে।

النصف
وقف غفران

শাব্দিক অনুবাদ

(৩৫) وَاِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ اِعْرَاضُهُمْ আর যদি তাদের বিমুখতা আপনার নিকট অসহনীয় হয় فَاِنِ اسْتَطَعْتَ তবে যদি আপনার এরূপ ক্ষমতা থাকে اَنْ تَبْتَغِيَ অন্বেষণ করে নিতে نَفَقًا فِي الْاَرْضِ জমিনে [প্রবেশ করার] কোনো সুড়ঙ্গ اَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَآءِ অথবা আসমানে [আরোহণ করার] কোনো সোপান فَتَاْتِيَهُمْ بِاٰيَةٍ অতঃপর [তার সাহায্যে গমনপূর্বক তথা হতে] কোনো মু'জিযা আনয়ন করতে পারেন, তবে আনয়ন করুন وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ আর যদি আল্লাহর ইচ্ছা করতেন لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدٰى তবে তাদের সকলকে সরল পথে একত্র করে দিতেন فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْجٰهِلِيْنَ অতএব, আপনি নির্বোধ লোকদের দলভুক্ত হবেন না।

(৩৬) اِنَّمَا يَسْتَجِيْبُ তারাই কবুল করে الَّذِيْنَ يَسْمَعُوْنَ যারা সত্যানুসন্ধানের জন্য শ্রবণ করে وَالْمَوْتٰى يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ আর মৃতদেরকে আল্লাহ [কিয়ামত দিবসে] জীবিত করে উঠাবেন ثُمَّ اِلَيْهِ يُرْجَعُوْنَ অনন্তর সকলেই আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে।

(৩৭) وَقَالُوْا আর এ সমস্ত লোক বলে যে لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ اٰيَةٌ তাঁর প্রতি কোনো মু'জিযা কেন অবতরণ করা হয় না– مِّنْ رَّبِّهٖ তাঁর রবের পক্ষ থেকে? قُلْ আপনি বলে দিন اِنَّ اللّٰهَ قَادِرٌ নিশ্চয় এ বিষয়ে আল্লাহর পূর্ণ ক্ষমতা রয়েছে যে عَلٰٓى اَنْ يُّنَزِّلَ اٰيَةً তিনি মু'জিযা অবতীর্ণ করতে পারেন وَّلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ কিন্তু তাদের অধিকাংশই বে-খবর।

(৩৮) وَمَا مِنْ دَآبَّةٍ فِي الْاَرْضِ আর যত প্রকার প্রাণী ভূপৃষ্ঠে বিচরণ করে وَلَا طٰٓئِرٍ يَّطِيْرُ بِجَنَاحَيْهِ এবং যত প্রকার পাখি স্বীয় ডানাদ্বয়ের সাহায্যে উড়ে তন্মধ্যে কোনো প্রকারই এরূপ নেই اِلَّآ اُمَمٌ اَمْثَالُكُمْ যারা [কিয়ামত দিবসে] তোমাদের ন্যায় [সমবেত] দল হবে না مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتٰبِ مِنْ شَيْءٍ আমি কিতাবে কোনো কিছুই ছাড়িনি ثُمَّ اِلٰى رَبِّهِمْ يُحْشَرُوْنَ অতঃপর সকলকে স্বীয় পরওয়ারদেগারের সমীপে সমবেত করা হবে।

وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا صُمٌّ وَّبُكْمٌ فِى الظُّلُمٰتِ ؕ مَنْ يَّشَاِ اللّٰهُ يُضْلِلْهُ ؕ وَمَنْ يَّشَاْ يَجْعَلْهُ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ (٣٩)

অনুবাদ : (৩৯) আর যারা আমার আয়াতগুলোকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে তারা তো বধির ও বোবা সাজছে। [এবং] নানাবিধ অন্ধকারে [লিপ্ত] আল্লাহ তা'আলা যাকে ইচ্ছা বিপথগামী করেন, এবং যাকে ইচ্ছা সরল পথে চালিত করেন।

قُلْ اَرَءَيْتَكُمْ اِنْ اَتٰىكُمْ عَذَابُ اللّٰهِ اَوْ اَتَتْكُمُ السَّاعَةُ اَغَيْرَ اللّٰهِ تَدْعُوْنَ ۚ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ (٤٠)

(৪০) আপনি বলুন, আচ্ছা বল তো! যদি তোমাদের উপর আল্লাহর কোনো আজাব এসে পৌছে, কিংবা তোমাদের উপর কিয়ামতই এসে পৌছে, তবে কি আল্লাহ ভিন্ন আর কাউকেও ডাকবে? যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

بَلْ اِيَّاهُ تَدْعُوْنَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُوْنَ اِلَيْهِ اِنْ شَآءَ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُوْنَ (٤١)

(৪১) বরং তাঁকেই ডাকতে থাক, অতএব, যে উদ্দেশ্যে তোমরা ডাক, যদি তিনি চান, তবে তা বিদূরিত করতেও পারেন, আর যেগুলোকে তোমরা শরিক সাব্যস্ত করছে সেগুলো ভুলে যাও।

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَآ اِلٰٓى اُمَمٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَاَخَذْنٰهُمْ بِالْبَاْسَآءِ وَالضَّرَّآءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُوْنَ (٤٢)

(৪২) আর আমি আপনার পূর্বে অন্যান্য উম্মতের নিকটও পয়গম্বর প্রেরণ করেছিলাম, অনন্তর আমি তাদেরকে অভাব-অনটন ও পীড়া দ্বারা ধৃত করেছিলাম, যেন বিনীত হয়ে পড়ে।

فَلَوْلَآ اِذْ جَآءَهُمْ بَاْسُنَا تَضَرَّعُوْا وَلٰكِنْ قَسَتْ قُلُوْبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ (٤٣)

(৪৩) সুতরাং যখন তাদের উপর আমার শাস্তি পৌছেছে, তখনো কেন বিনীত হলো না? বরং তাদের অন্তরগুলো কঠিনই রইল, আর শয়তান তাদের কর্মগুলোকে তাদের কল্পনাতে সুসজ্জিত করছিল।

শাব্দিক অনুবাদ

(৩৯) وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا আর যারা আমার আয়াতগুলোকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে صُمٌّ وَّبُكْمٌ তারা তো বধির ও বোবা সাজছে فِى الظُّلُمٰتِ [এবং] নানাবিধ অন্ধকারে [লিপ্ত] مَنْ يَّشَاِ اللّٰهُ يُضْلِلْهُ আল্লাহ তা'আলা যাকে ইচ্ছা বিপথগামী করেন وَمَنْ يَّشَاْ এবং যাকে ইচ্ছা يَجْعَلْهُ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ সরল পথে চালিত করেন।

(৪০) قُلْ আপনি বলুন اَرَءَيْتَكُمْ আচ্ছা বল তো! اِنْ اَتٰىكُمْ عَذَابُ اللّٰهِ যদি তোমাদের উপর আল্লাহর কোনো আজাব এসে পৌছে اَوْ اَتَتْكُمُ السَّاعَةُ কিংবা তোমাদের উপর কিয়ামতই এসে পৌছে اَغَيْرَ اللّٰهِ تَدْعُوْنَ তবে কি আল্লাহ ভিন্ন আর কাউকেও ডাকবে? اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

(৪১) بَلْ اِيَّاهُ تَدْعُوْنَ বরং তাঁকেই ডাকতে থাক فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُوْنَ اِلَيْهِ অতএব, যে উদ্দেশ্যে তোমরা ডাক তবে তা বিদূরিত করতেও পারেন اِنْ شَآءَ যদি তিনি চান وَتَنْسَوْنَ আর সেগুলো ভুলে যাও مَا تُشْرِكُوْنَ যেগুলোকে তোমরা শরিক সাব্যস্ত করছ।

(৪২) وَلَقَدْ اَرْسَلْنَآ اِلٰٓى اُمَمٍ مِّنْ قَبْلِكَ আর আমি আপনার পূর্বে অন্যান্য উম্মতের নিকটও পয়গম্বর প্রেরণ করেছিলাম فَاَخَذْنٰهُمْ অনন্তর আমি তাদেরকে ধৃত করেছিলাম بِالْبَاْسَآءِ وَالضَّرَّآءِ অভাব-অনটন ও পীড়া দ্বারা لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُوْنَ যেন বিনীত হয়ে পড়ে।

(৪৩) فَلَوْلَآ اِذْ جَآءَهُمْ بَاْسُنَا تَضَرَّعُوْا সুতরাং যখন তাদের উপর আমার শাস্তি পৌছেছে তখনো কেন বিনীত হলো না? وَلٰكِنْ قَسَتْ قُلُوْبُهُمْ বরং তাদের অন্তরগুলো কঠিনই রইল وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ আর শয়তান তাদের কল্পনাতে সুসজ্জিত করছিল مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ তাদের কর্মগুলোকে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(৩৫) وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** কোনো এক বর্ণনা মতে হারেছ বিন আমের বিন নওফেল বিন আবদে মানাফ কুরাইশদের সামনেই রাসূল ﷺ-এর নিকট এসে বলল, হে মুহাম্মদ! আল্লাহর পক্ষ হতে কোনো মু'জিযা নিয়ে আস। পূর্ববর্তী নবীগণ যে সমস্ত কাজ করে গেছেন আমি তো আপনাকে বিশ্বাস করেই যাচ্ছি। আল্লাহ তা'আলা তাদের সামনেই নিদর্শন প্রকাশ করতে নিষেধ করেন তাদের কৃত অপরাধের কারণে। সুতরাং তারা রাসূল ﷺ-এর নিকট হতে ফিরে গেল । এভাবে চলে যাওয়া রাসূল ﷺ-এর নিকট অত্যন্ত পীড়াদায়ক বলে মনে হলো। কারণ রাসূল ﷺ নিজ গোত্রবাসীর প্রতি অত্যন্ত প্রত্যাশী ছিলেন যে, তারা ঈমান গ্রহণ করুক, সে জন্য তারা যখন কোনো নিদর্শন কামনা করত, তখন আল্লাহ তা'আলা তা অবতরণ করবেন, তাই কামনা ছিল। যেহেতু তিনি তাদের ঈমান গ্রহণ করার প্রতি আগ্রহী ছিলেন। সে পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। –[রূহুল মা'আনী ১৩৮/৪/৭]

(৩৭) وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّنْ رَّبِّهِ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, আলোচ্য আয়াত কুরাইশ নেতৃবর্গ সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। তারা রাসূল ﷺ-এর প্রতি নিন্দা ও অবজ্ঞা প্রদর্শন করে রাসূলের নিকট মু'জিযা প্রকাশ করার দাবি করেছিল। অথচ রাসূল ﷺও তাদের নিকট অনেক মু'জিযাই নিয়ে এসেছিলেন। কুরাইশেরদের দাবি অনুসারে মু'জিযা প্রকাশ না হওয়ার রহস্য বর্ণনা সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়। –[বাহরে মুহীত ১২৪/৪]

(৪৩) وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَأَخَذْنٰهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** পূর্ববর্তী সকল জাতিসমূহের একটি স্বভাব ছিল, তারা নবীগণকে মিথ্যাবাদী বলে অভিযোগ আরোপ করত। তাদের অন্তঃকরণ ছিল অত্যন্ত কঠোর। তারা এতই ঔদ্ধত্য ছিল যে, যখন কোনো শাস্তি দ্বারা আক্রান্ত হতো, তখন তারাই আল্লাহর প্রতি বিনয়ী হতো না এবং সে শাস্তি থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য প্রার্থনা করত না। যে জাতির প্রতি আল্লাহ রাসূল প্রেরণ করেছেন, তারই অধিক বিমুখতা অবলম্বনকারী হয়ে যেত। সে পরিপ্রেক্ষিতে রাসূল ﷺ-কে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্যে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[বাহরে মুহীত ১৩৩/৪]

পূর্বে উল্লিখিত আয়াতসমূহের ৩৩ নং আয়াতে বলা হয়েছে : فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ অর্থাৎ কাফেররা প্রকৃতপক্ষে আপনার প্রতি মিথ্যারোপ করে না; বরং আল্লাহর নিদর্শনাবলির প্রতিই মিথ্যারোপ করে। সুদ্দীর বর্ণনা সূত্রে তাফসীরে মাযহারীতে এ সম্পর্কিত একটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে যে, একবার দু'জন কাফের সর্দার আখনাস ইবনে শুরাইক ও আবূ জাহলের মধ্যে সাক্ষাৎ হলে আখনাস আবূ জাহলকে জিজ্ঞেস করল, হে আবুল হিকাম! [আরবে আবূজাহল 'আবুল হিকাম' (জ্ঞানধর) নামে খ্যাত ছিল। ইসলাম যুগে কুফরি ও হঠকারিতার কারণে তাকে 'আবূ জাহল' (মূর্খতাধর) উপাধি দেওয়া হয়।] আমরা এখন একান্তে আছি। আমাদের কথাবার্তা কেউ শুনবে না; মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ সম্পর্কে তোমার সঠিক ধারণা কি? আমাকে সত্য সত্য বল? তাকে সত্যবাদী মনে কর? না, মিথ্যাবাদী?

আবূ জাহল আল্লাহর কসম খেয়ে বলল, নিঃসন্দেহে মুহাম্মদ সত্যবাদী। তিনি সারা জীবন মিথ্যা বলেননি। কিন্তু ব্যাপার এই যে, কুরাইশ গোত্রের একটি শাখা 'বনী কুসাই' এ সব গৌরব ও মহত্ত্বের সমাবেশ ঘটবে, অবশিষ্ট কুরাইশরা রিক্ত হস্ত থেকে যাবে– আমরা তা কিরূপে সহ্য করতে পারি? পতাকা বনী কুসাই-এর হাতে রয়েছে। হরম শরীফে হাজীদেরকে পানি পান করানোর গৌরবজনক কাজটিও তাদের দখলে। খানায়ে কা'বার প্রহরা ও চাবি তাদের করায়ত্ত। এখন যদি আমরা নবুয়তও তাদের ছেড়ে দেই, তবে অবশিষ্ট কুরাইশদের হাতে কি থাকবে?

নাজিয়া ইবনে কা'ব থেকে বর্ণিত অপর এক রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে যে, একবার আবূ জাহল স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলল : আপনি মিথ্যাবাদী– এরূপ কোনো ধারণা আমরা পোষণ করি না। তবে আমরা ঐ ধর্ম ও গ্রন্থকে অসত্য মনে করি, যা আপনি প্রাপ্ত হয়েছেন। –[মাযহারী]

এসব রেওয়ায়েতের ভিত্তিতে আলোচ্য আয়াতটিকে তার প্রকৃত অর্থেও নেওয়া যেতে পারে, কোনো রূপক অর্থ করার প্রয়োজন হয় না। অর্থাৎ কাফেররা আপনাকে নয়– আল্লাহর নিদর্শনাবলিকে মিথ্যা বলে। আয়াতের এ অর্থও হতে পারে যে, কাফেররা বাহ্যতঃ যদিও আপনাকে মিথ্যা বলার পরিণাম স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর নিদর্শনাবলিকে মিথ্যা বলা। যেমন, এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : যে ব্যক্তি আমাকে কষ্ট দেয়, সে যেন প্রকৃতপক্ষে আল্লাহকেই কষ্ট দেয়।

www.almodina.com

৩৮ নং আয়াতে وَمَا مِنْ دَآبَّةٍ বাক্য থেকে জানা যায় যে, কিয়ামতের দিন মানুষের সাথে সর্বপ্রকার জানোয়ারকেও জীবিত করা হবে। ইবনে জরীর, ইবনে আবী হাতেম ও বায়হাকী প্রমুখ হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর রেওয়ায়েতক্রমে বর্ণনা করেন যে, কিয়ামতের দিন সব প্রাণী চতুষ্পদ জন্তু এবং পক্ষীকুলকেও পুনরুজ্জীবিত করা হবে এবং আল্লাহ তা'আলা এমন সুবিচার করবেন যে, কোনো শিং বিশিষ্ট জন্তু কোনো শিংবিহীন জন্তুকে দুনিয়াতে আঘাত করে থাকলে এ দিনে তার প্রতিশোধ তার কাছ থেকে নেওয়া হবে। (এমনিভাবে অন্যান্য জন্তুর পারস্পরিক নির্যাতনের প্রতিশোধও নেওয়া হবে।) যখন তাদের পারস্পরিক অধিকার ও নির্যাতনের প্রতিশোধ নেওয়া সমাপ্ত হবে, তখন আদেশ হবে 'তোমরা সব মাটি হয়ে যাও।' সব জন্তু তৎক্ষণাৎ মাটির স্তূপে পরিণত হবে। এ সময়েই কাফেররা আক্ষেপ করে বলবে : يٰلَيْتَنِىْ كُنْتُ تُرٰبًا অর্থাৎ, আফসোস! আমিও যদি মাটি হয়ে যেতাম এবং জাহান্নামের শাস্তি থেকে বেঁচে যেতাম।

ইমাম বগভী হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর বাচনিক রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উক্তি বর্ণনা করেন যে, কিয়ামতের দিন সব পাওনাদারের পাওনা পরিশোধ করা হবে। এমন কি শিং বিহীন ছাগলের প্রতিশোধ শিং বিশিষ্ট ছাগলের কাছ থেকে নেওয়া হবে।

সৃষ্টজীবের পাওনার গুরুত্ব : সবাই জানে যে, জীব-জানোয়ারকে কোনো শরিয়ত ও বিধি-বিধান পালন করতে আদেশ দেওয়া হয়নি, এ আদেশ শুধু মানুষ ও জিনদের প্রতি। একথাও জানা যে, যারা আদিষ্ট নয় তাদের সাথে প্রতিদান ও শাস্তির ব্যবহার হতে পারে না। তাই আলেমগণ বলেন, হাশরে জীব-জানোয়ারের প্রতিশোধ তাদের আদিষ্ট হওয়ার কারণে নয়; বরং রাব্বুল আলামীনের চূড়ান্ত ইনসাফ ও সুবিচারের কারণে এক জন্তুর নির্যাতনের প্রতিশোধ অন্য জন্তুর কাছ থেকে নেওয়া হবে। তাদের অন্য কেনো কাজের হিসাব-নিকাশ হবে না। এতে বুঝা যায় যে, সৃষ্টজীবের পারস্পরিক পাওনা বা নির্যাতনের ব্যাপারটি এতই গুরুতর যে, আদিষ্ট নয়– এমন জন্তুদেরকেও তা থেকে মুক্ত রাখা হয়নি। কিন্তু দুঃখের বিষয়, অনেক ধার্মিক ও ইবাদতকারী ব্যক্তিও এর প্রতি উদাসীনতা প্রদান করেন।

قوله وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا اِلٰى اُمَمٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَاَخَذْنٰهُمْ الخ আলোচ্য আয়াতসমূহে একটি বিশেষ ভঙ্গিতে কুফর ও শিরক বাতিল করে একত্ববাদ সপ্রমাণ করা হয়েছে। পূর্বোক্ত আয়াতে মক্কার মুশরিকদেরকে প্রশ্ন করা হয়েছে : যদি আজ তোমাদের উপর কোনো বিপদ এসে পড়ে– উদাহরণত আল্লাহর আজাব যদি দুনিয়াতেই তোমাদেরকে পাকড়াও করে, কিংবা মৃত্যু অথবা কিয়ামতের ভয়াবহ হাঙ্গামা শুরু হয়ে যায়, তবে চিন্তা করে বল, তোমরা এ বিপদ দূর করার জন্য কাকে ডাকবে? কার কাছে বিপদমুক্তির আশা করবে? নাকি পাথরের এসব হস্তনির্মিত মূর্তি কিংবা অন্য কোনো সৃষ্টজীব, যাদেরকে তোমরা খোদার মর্যাদায় আসীন করে রেখেছ, তারা তখন তোমাদের কাজে আসবে কি? তোমরা তাদের কাছে ফরিয়াদ করবে? না শুধু আল্লাহ তা'আলাকেই আহবান করবে?

এর উত্তর যে কোনো সচেতন মানুষের পক্ষ থেকে এ ছাড়া কিছুই হতে পারে না, যা আল্লাহ তা'আলা তাদের পক্ষ থেকে উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ এ ব্যাপক বিপদমুহূর্তে কট্টর মুশরিকই সব মূর্তি ও হস্তনির্মিত উপাস্যদেরকে ভুলে যাবে এবং একমাত্র আল্লাহ তা'আলাকেই আহবান করবে। এখন ফলাফল সুস্পষ্ট যে, তোমাদের মূর্তি এবং উপাস্য, যাদেরকে তোমরা আল্লাহর আসনে আসীন করে রেখেছ এবং বিপদ বিদূরণকারী ও অভাব মোচনকারী মনে করছ, তারা যখন এ বিপদ মুহূর্তে তোমাদের কাজে আসবে না এবং তোমরা সাহায্যের জন্য তাদেরকে আহবান করতেও সাহসী হবে না, তখন তাদের ইবাদত কোন উপকারে আসবে।

এ বিষয়টি পূর্ববর্তী আয়াতের সারমর্ম। এসব আয়াতে কুফর, শিরক ও অবাধ্যতার শাস্তিস্বরূপ পার্থিব জীবনেও আজাব আসার সম্ভাব্যতা বর্ণিত হয়েছে। ধরে নেওয়া যাক, যদি এ জীবনে আজাব নাও আসে, তবে কিয়ামতের আগমন তো অবশ্যম্ভাবী। সেখানে মানুষের সব কাজকর্মের হিসাব নেওয়া হবে এবং প্রতিদান ও শাস্তির বিধান জারি হবে।

এখানে سَاعَةٌ শব্দের প্রসিদ্ধ অর্থ কিয়ামতও হতে পারে এবং 'কিয়ামত ছুগরা' (ছোট কিয়ামত)-ও হতে পারে। প্রত্যেক মানুষের মৃত্যুতেই এ কিয়ামত কায়েম হয়ে যায়। প্রবাদবাক্য আছে مَنْ مَاتَ فَقَدْ قَامَتْ قِيَامَتُهُ অর্থাৎ যার মৃত্যু হ[illegible] তার কিয়ামত সেদিনই হয়ে যায়। কেননা কিয়ামতের হিসাব-কিতাবের প্রাথমিক নমুনাও কবর ও বরযখে দেখা যাবে এ[illegible] প্রতিদান ও শাস্তির নমুনাও এখান থেকেই শুরু হয়ে যাবে।

www.almodina.com

সারকথা এই যে, অবাধ্যদেরকে এসব আয়াতে সতর্ক করা হয়েছে, তারা যেন নিশ্চিন্ত হয়ে না যায়। পার্থিব জীবনেও তারা আজাবে পতিত হতে পারে– যেমন, পূর্ববর্তী উম্মতরা হয়েছে। যদি তা না হয়, তবে মৃত্যু কিংবা কিয়ামত পরবর্তী হিসাব তো অবশ্যম্ভাবী।

কিন্তু যে মানব সীমাবদ্ধ জীবনের সীমাবদ্ধ অভিজ্ঞতার আলোতে সমগ্র বিশ্বকে বোঝার চেষ্টা করে, তারা এ জাতীয় বিষয়বস্তুতে বাহানাবাজির আশ্রয় নেয়। তারা পয়গম্বরদের ভয়ভীতি বিষয়বস্তুতে সতর্কবাণীকে কুসংস্কারপূর্ণ ধারণা আখ্যা দিয়ে গা বাঁচিয়ে যায়। বিশেষ করে যখন প্রায় সব যুগেই এমন অবস্থাও সামনে আসে যে, অনেক মানুষ আল্লাহ ও রাসূলের অবাধ্যতা সত্ত্বেও ধনেজনে সমৃদ্ধ হচ্ছে। অর্থ-সম্পদ, জাঁকজমক ও সম্মান-মর্যাদা সব কিছুই তাদের করায়ত্ত রয়েছে। একদিকে এ চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা এবং অপরদিকে পয়গম্বরদের ভীতি-প্রদর্শন যখন তারা উভয়টিকে মিলিয়ে দেখে, তখন বাহানাবাজ মন ও শয়তান তাদেরকে এ শিক্ষাই দেয় যে, পয়গম্বরগণের উক্তি একটি প্রতারণা ও কুসংস্কার প্রসূত ধারণা বৈ নয়।

এর উত্তরে আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলা পূর্ববর্তী উম্মতদের ঘটনাবলি এবং তাদের উপর প্রয়োগকৃত আইন বর্ণনা করেছেন। বলেছেন : وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا اِلٰى اُمَمٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَاَخَذْنٰهُمْ بِالْبَاْسَآءِ وَالضَّرَّآءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُوْنَ

অর্থাৎ আমি আপনার পূর্বেও অন্যান্য উম্মতের কাছে স্বীয় রাসূল প্রেরণ করেছি। দু'ভাবে তাদের পরীক্ষা নেওয়া হয়েছে। প্রথমে কিছু অভাব-অনটন ও কষ্টে ফেলে দেওয়া হয়েছে যে, কষ্টে ও বিপদে অস্থির হয়েও তারা আল্লাহর প্রতি মনোনিবেশ করে কি না। তারা যখন এ পরীক্ষায় ফেল করল এবং আল্লাহর দিকে ফিরে আসা ও অবাধ্যতা ত্যাগ করার পরিবর্তে তাতে আরো বেশি লিপ্ত হয়ে পড়ল, তখন তাদের দ্বিতীয় পরীক্ষা নেওয়া হলো। অর্থাৎ তাদের জন্য পার্থিব ভোগ-বিলাসের সব দ্বার খুলে দেওয়া হলো এবং পার্থিব জীবন সম্পর্কিত সবকিছুই তাদেরকে দান করা হলো। আশা ছিল যে, তারা এসব নিয়ামত দেখে নিয়ামতদাতাকে চিনবে এবং এভাবে তারা আল্লাহকে স্মরণ করবে। কিন্তু এ পরীক্ষায়ও তারা অকৃতকার্য হলো। নিয়ামতদাতাকে চেনা ও তাঁর কৃতজ্ঞ হওয়ার পরিবর্তে তারা ভোগ-বিলাসের মোহে এমন মত্ত হয়ে পড়ল যে, আল্লাহ ও রাসূলের বাণী ও শিক্ষা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে গেল। উভয় পরীক্ষায় অকৃতকার্য হওয়ার পর যখন তাদের ওজর-আপত্তির আর কোনো ছিদ্র অবশিষ্ট রইল না, তখন আল্লাহ তা'আলা অকস্মাৎ তাদেরকে আজাবের মাধ্যমে পাকড়াও করলেন এবং এমনভাবে নাস্তানবুদ করে দিলেন যে, বংশে বাতি জ্বালাবারও কেউ অবশিষ্ট রইল না। পূর্ববর্তী উম্মতদের উপর এ আজাব জলে স্থলে অন্তরীক্ষে বিভিন্ন পন্থায় এসেছে এবং গোটা জাতিকে মিসমার করে দিয়েছে। হযরত নূহ (আ.)-এর গোটা জাতিকে এমন প্লাবন ঘিরে ধরে, যা থেকে তারা পরর্বতের শৃঙ্গেও নিরাপদ থাকতে পারেনি। আদ জাতির উপর দিয়ে উপর্যুপরি আট দিন প্রবল ঝড়-ঝঞ্ঝা বয়ে যায়। ফলে তাদের একটি প্রাণীও বেঁচে থাকতে পারেনি। সামুদ জাতিকে একটি হৃদয়বিদারী আওয়াজের মাধ্যমে ধ্বংস করে দেওয়া হয়। হযরত লূত (আ.)-এর কওমের সম্পূর্ণ বস্তি উল্টে দেওয়া হয়, যা আজ পর্যন্ত জর্দান এলাকায় একটি অভূতপূর্ব জলাশয়ের আকারে বিদ্যামান। এ জলাশয়ে ব্যাঙ, মাছ ইত্যাদি জীব-জন্তুও জীবিত থাকতে পারে না। এ কারণেই একে 'বাহরে মাইয়েত' তা 'মৃত সাগর' নামেও অভিহিত করা হয় এবং 'বাহরে লূত' নামেও।

মোটকথা পূর্ববর্তী উম্মতদের অবাধ্যতার শাস্তি প্রায়ই বিভিন্ন প্রকার আজাবের আকারে অবতীর্ণ হয়েছে– যতে সমগ্র জাতি বরবাদ হয়ে গেছে। কোনো সময় তারা বাহ্যতঃ স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুবরণ করেছে এবং পরবর্তীতে তাদের নাম উচ্চারণকারীও কেউ অবশিষ্ট থাকেনি।

আলোচ্য আয়াতে আরো বলা হয়েছে যে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কোনো জাতির প্রতি অকস্মাৎ আজাব নাজিল করেন না; বরং প্রথমে হুশিয়ারির জন্য অল্প শাস্তি অবতারণ করেন। এতে ভাগ্যবান লোক অসাবধানতা পরিহার করে বিশুদ্ধ পথ অবলম্বন করার সুযোগ পায়। আরো জানা গেল যে, ইহকালে সাজা হিসেবে যে কষ্ট ও বিপদ আসে, তা সাজার আকারে হলেও প্রকৃত সাজা তা নয়; বরং অসাবধানতা থেকে সজাগ করাই তার উদ্দেশ্য। বলাবাহুল্য, একটি সাক্ষাৎ করুণা। অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে– وَلَنُذِيْقَنَّهُمْ مِّنَ الْعَذَابِ الْاَدْنٰى دُوْنَ الْعَذَابِ الْاَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ অর্থাৎ আমি তাদেরকে বড় আজাবের সাদ গ্রহণের পূর্বে একটি ছোট আজাবের স্বাদ গ্রহণ করাই যাতে তারা সত্যকে উপলব্ধি করে ভ্রান্তপথ থেকে ফিরে আসে।

এসব আয়াত দ্বারাই এ সন্দেহ দূর হয়ে যায় যে, ইহকাল প্রতিদান জগৎ নয়; বরং কর্মজগৎ। এখানে সৎ-অসৎ, ভালো-মন্দ একই পাল্লায় ওজন করা হয়; বরং অসৎ লোক সৎ লোকদের চেয়ে অধিক সুখে থাকে। অতএব, এ জগতে শাস্তি কার্যকর করার অর্থ কি? এ সন্দেহের উত্তর সুস্পষ্ট। অর্থাৎ আসল প্রতিদান ও শাস্তি কিয়ামতেই হবে। তাই কিয়ামতের অপর নাম 'ইয়াওমুদ্দীন'; প্রতিদান দিবস। কিন্তু আজাবের নমুনা হিসাবে কিছু কষ্ট এবং ছওয়াবের নমুনা হিসেবে কিছু সুখ করুণাবশতঃ ইহজগতে প্রেরণ করা হয়। কোনো কোনো সাধক বলেছেন যে, এ জগতের সব সুখ ও আরাম জান্নাতের সুখেরই নমুনা যাতে মানুষ জান্নাতের প্রতি আগ্রহী হয়। পক্ষান্তরে দুনিয়াতে যত কষ্ট, বিপদ ও দুঃখ রয়েছে, সব পরকালের শাস্তিরই নমুনা, যাতে মানুষ জাহান্নাম থেকে আত্মরক্ষায় সচেষ্ট হয়। বলাবহুল্য, নমুনা ব্যতীত কোনো কিছুর প্রতি আগ্রহও সৃষ্টি করা যায় না এবং কোনো কিছু থেকে ভীতি প্রদর্শনও করা যায় না।

আলোচ্য আয়াতের শেষ ভাগেও لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُوْنَ বাক্যে এ তাৎপর্যটিরই উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ আমি তাদেরকে দুনিয়াতে যে কষ্ট ও বিপদে জড়িত করেছি, এর উদ্দেশ্যে প্রকৃত পক্ষে শাস্তিদান নয়; বরং এ পরীক্ষায় ফেলে আমার দিকে আকৃষ্ট করাই ছিল উদ্দেশ্য, কারণ স্বাভাবিকভাবেই বিপদে আল্লাহর কথা স্মরণ হয়। এতে বুঝা গেল যে, দুনিয়াতে আজাব হিসেবেও যে কষ্ট ও বিপদ কোনো ব্যক্তি অথবা সম্প্রদায়ের উপর পতিত হয়, তাতেও একদিক দিয়ে আল্লাহর রহমতই কার্যরত থাকে।

শব্দ বিশ্লেষণ

دَابَّةٌ : শব্দটি একবচন, বহুবচন دَوَابٌّ অর্থ– বিচরণশীল।

طَائِرٌ : শব্দটি একবচন, বহুবচন طُيُوْرٌ অর্থ– পাখি, পাখা বিশিষ্ট প্রাণী।

يَطِيْرُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلطَّيْرُ মূলবর্ণ (ط . ي . ر) জিনস اجوف يائى অর্থ– সে উড়ে বেড়ায়।

جَنَاحَيْهِ : শব্দটি جَنَاحٌ শব্দের تثنية বহুবচন اَجْنُحٌ. اَجْنِحَةٌ অর্থ– ডানা, পাখা।

يَشَاءُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব فَتَحَ মাসদার اَلْمَشِيْئَةُ মূলবর্ণ (ش . ى . ء) জিনস মুরাক্কাব اجوف يائى ও مهموز لام অর্থ– সে ইচ্ছা করে।

অনুবাদ	আয়াত
অনুবাদ : (৪৪) অতঃপর যখন তারা ভুলে রইল, যে সম্বন্ধে তাদেরকে নসিহত করা হতো, তখন আমি তাদের প্রতি উন্মুক্ত করে দিলাম সকল বস্তুর দ্বার, এমন কি যখন তারা গর্বিত হয়ে পড়ল, তার দরুন, যা তারা প্রাপ্ত হয়েছিল, তখন তাদেরকে অসস্মাৎ ধৃত করলাম, অতঃপর তারা সম্পূর্ণ হতাশ হয়ে পড়ল।	فَلَمَّا نَسُوْا مَا ذُكِّرُوْا بِهٖ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ اَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ ط حَتّٰۤى اِذَا فَرِحُوْا بِمَاۤ اُوْتُوْۤا اَخَذْنٰهُمْ بَغْتَةً فَاِذَا هُمْ مُّبْلِسُوْنَ (٤٤)
(৪৫) অনন্তর জালেমদের মূল কর্তিত হলো, আর আল্লাহর শোকর যিনি সারা বিশ্বের প্রতিপালক।	فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ط وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ (٤٥)
(৪৬) আপনি বলুন, আচ্ছা বল তো যদি আল্লাহ তোমাদের শ্রবণশক্তি ও দর্শনশক্তিগুলো সম্পূর্ণরূপে নিয়ে নেন এবং তোমাদের অন্তরসমূহের উপর মহর করে দেন, তবে আল্লাহ ভিন্ন আর কোনো মা'বূদ আছে, যে এটা তোমাদেরকে পুনরায় দিবে? আপনি দেখুন! আমি কিরূপে প্রমাণসমূহকে বিভিন্ন ধরনে বর্ণনা করছি, তবুও তারা পরাঙ্মুখ হচ্ছে।	قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ اَخَذَ اللّٰهُ سَمْعَكُمْ وَاَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلٰى قُلُوْبِكُمْ مَّنْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَاْتِيْكُمْ بِهٖ ط اُنْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْاٰيٰتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُوْنَ (٤٦)
(৪৭) আপনি বলুন, আচ্ছা তা তো বল, যদি তোমাদের উপর আল্লাহর আজাব এসে পড়ে চাই আকস্মিকভাবে অথবা অবহিতভাবে, তবে অনাচারী ব্যতীত অন্য কাউকেও ধ্বংস করা হবে কি?	قُلْ اَرَءَيْتَكُمْ اِنْ اَتٰىكُمْ عَذَابُ اللّٰهِ بَغْتَةً اَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ اِلَّا الْقَوْمُ الظّٰلِمُوْنَ (٤٧)

শাব্দিক অনুবাদ

(৪৪) فَلَمَّا نَسُوْا অতঃপর যখন তারা ভুলে রইল مَا ذُكِّرُوْا بِهٖ যে সম্বন্ধে তাদেরকে নসিহত করা হতো فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ তখন আমি তাদের প্রতি উন্মুক্ত করে দিলাম اَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ সকল বস্তুর দ্বার। حَتّٰۤى اِذَا فَرِحُوْا এমন কি যখন তারা গর্বিত হয়ে পড়ল। بِمَاۤ اُوْتُوْۤا তার দরুন যা তারা প্রাপ্ত হয়েছিল اَخَذْنٰهُمْ بَغْتَةً তখন তাদেরকে অসস্মাৎ ধৃত করলাম। فَاِذَا هُمْ مُّبْلِسُوْنَ অতঃপর তারা সম্পূর্ণ হতাশ হয়ে পড়ল।

(৪৫) فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا অনন্তর জালেমদের মূল কর্তিত হলো وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ আর আল্লাহর শোকর যিনি সারা বিশ্বের প্রতিপালক।

(৪৬) قُلْ আপনি বলুন اَرَءَيْتُمْ আচ্ছা বল তো اِنْ اَخَذَ اللّٰهُ سَمْعَكُمْ وَاَبْصَارَكُمْ যদি আল্লাহ তোমাদের শ্রবণশক্তি ও দর্শনশক্তিগুলো সম্পূর্ণরূপে নিয়ে নেন وَخَتَمَ عَلٰى قُلُوْبِكُمْ এবং তোমাদের অন্তরসমূহের উপর মহর করে দেন مَّنْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ তবে আল্লাহ ভিন্ন আর কোন মা'বূদ আছে يَاْتِيْكُمْ بِهٖ যে এটা তোমাদেরকে পুনরায় দিবে اُنْظُرْ। আপনি দেখুন! كَيْفَ نُصَرِّفُ الْاٰيٰتِ আমি কিরূপে প্রমাণসমূহকে বিভিন্ন ধরনে বর্ণনা করছি ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُوْنَ তবুও তারা পরাঙ্মুখ হচ্ছে।

(৪৭) قُلْ আপনি বলুন اَرَءَيْتَكُمْ আচ্ছা তা তো বল اِنْ اَتٰىكُمْ عَذَابُ اللّٰهِ যদি তোমাদের উপর আল্লাহর আজাব এসে পড়ে بَغْتَةً চাই আকস্মিকভাবে اَوْ جَهْرَةً অথবা অবহিতভাবে هَلْ يُهْلَكُ اِلَّا الْقَوْمُ الظّٰلِمُوْنَ তবে অনাচারী ব্যতীত অন্য কাউকেও ধ্বংস করা হবে কি?

www.almodina.com

وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِيْنَ اِلَّا مُبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ ۚ فَمَنْ اٰمَنَ وَاَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ (٤٨)

অনুবাদ : (৪৮) আর আমি রাসূলদেরকে শুধু এই জন্যই প্রেরণ করি যে, তাঁরা সুসংবাদ দেন ও ভয় প্রদর্শন করেন, অনন্তর যে ব্যক্তি ঈমান আনবে, এবং সংশোধন করে নিবে, তবে তাদের কোনো ভয় নেই, এবং বিষণ্নও হবে না।

وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ (٤٩)

(৪৯) আর যারা আমার নিদর্শনগুলোকে অসত্য বলে, তাদেরকে আজাব স্পর্শ করে এই কারণে যে, তারা [ঈমানের] গণ্ডি হতে বের হয়ে যায়।

قُلْ لَّاۤ اَقُوْلُ لَكُمْ عِنْدِيْ خَزَآئِنُ اللّٰهِ وَلَاۤ اَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَاۤ اَقُوْلُ لَكُمْ اِنِّيْ مَلَكٌ ۚ اِنْ اَتَّبِعُ اِلَّا مَا يُوْحٰۤى اِلَيَّ ؕ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الْاَعْمٰى وَالْبَصِيْرُ ؕ اَفَلَا تَتَفَكَّرُوْنَ (٥٠)

(৫০) আপনি বলুন, আমি তোমাদেরকে একথা বলি না যে, আমার নিকট আল্লাহর খাজানা রয়েছে, আর না আমি সমস্ত গায়েব সম্বন্ধে অবগত আছি, আর না আমি তোমাদেরকে একথাও বলি যে, আমি ফেরেশতা, আমার নিকট যে ওহী আসে, আমি তো শুধু তারই অনুসরণ করি, আপনি বলুন, অন্ধ ও চক্ষুষ্মান কি সমতুল্য হতে পারে? তবুও কি ভেবে দেখ না?

وَاَنْذِرْ بِهِ الَّذِيْنَ يَخَافُوْنَ اَنْ يُّحْشَرُوْۤا اِلٰى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ وَلِيٌّ وَّلَا شَفِيْعٌ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ (٥١)

(৫১) আর কুরআন দ্বারা এরূপ লোকদেরকে ভয় দেখানো, যারা এর ভয় পোষণ করে যে, তাদেরকে স্বীয় প্রতিপালকের সমীপে এরূপ অবস্থায় সমবেত করা হবে যে, গায়রুল্লাহ হতে কেউই তাদের সাহায্যকারী হবে না এবং সুফারিশকারীও হবে না, এই আশায় যে, তারা ভীত হবে।

শাব্দিক অনুবাদ

(৪৮) وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِيْنَ اِلَّا مُبَشِّرِيْنَ আর আমি রাসূলদেরকে শুধু এই জন্যই প্রেরণ করি যে, তাঁরা সুসংবাদ দেন وَمُنْذِرِيْنَ ও ভয় প্রদর্শন করেন فَمَنْ اٰمَنَ অনন্তর যে ব্যক্তি ঈমান আনবে وَاَصْلَحَ এবং সংশোধন করে নিবে فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ তবে তাদের কোনো ভয় নেই وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ এবং বিষণ্নও হবে না।

(৪৯) وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا আর যারা আমার নিদর্শনগুলোকে অসত্য বলে يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ তাদেরকে আজাব স্পর্শ করে بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ এই কারণে যে, তারা [ঈমানের] গণ্ডি হতে বের হয়ে যায়।

(৫০) قُلْ আপনি বলুন لَّاۤ اَقُوْلُ لَكُمْ আমি তোমাদেরকে একথা বলি না যে عِنْدِيْ خَزَآئِنُ اللّٰهِ আমার নিকট আল্লাহর খাজানা রয়েছে وَلَاۤ اَعْلَمُ الْغَيْبَ আর না আমি সমস্ত গায়েব সম্বন্ধে অবগত আছি وَلَاۤ اَقُوْلُ لَكُمْ اِنِّيْ مَلَكٌ আর না আমি তোমাদেরকে একথাও বলি যে, আমি ফেরেশতা اِنْ اَتَّبِعُ اِلَّا مَا يُوْحٰۤى اِلَيَّ আমার নিকট যে ওহী আসে, আমি তো শুধু তারই অনুসরণ করি قُلْ আপনি বলুন هَلْ يَسْتَوِى الْاَعْمٰى وَالْبَصِيْرُ অন্ধ ও চক্ষুষ্মান কি সমতুল্য হতে পারে اَفَلَا تَتَفَكَّرُوْنَ তবুও কি ভেবে দেখ না?

(৫১) وَاَنْذِرْ بِهِ আর কুরআন দ্বারা এরূপ লোকদেরকে ভয় দেখানো الَّذِيْنَ يَخَافُوْنَ যারা এর ভয় পোষণ করে যে اَنْ يُّحْشَرُوْۤا اِلٰى رَبِّهِمْ তাদেরকে স্বীয় প্রতিপালকের সমীপে এরূপ অবস্থায় সমবেত করা হবে যে لَيْسَ لَهُمْ তাদের مِّنْ دُوْنِهٖ গায়রুল্লাহ হতে وَلِيٌّ সাহায্যকারী হবে না وَّلَا شَفِيْعٌ এবং সুফারিশকারীও হবে না لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ এই আশায় যে, তারা ভীত হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(৫০) قُلْ لَّآ اَقُوْلُ لَكُمْ عِنْدِيْ خَزَآئِنُ اللّٰهِ وَلَآ اَعْلَمُ الْغَيْبَ **আয়াতের শানে নুযূল :** একদা মক্কার লোকজন হযরত রাসূলে আকরাম ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলল যে, আল্লাহ যদি আপনার প্রতি বিশাল ধন ভাণ্ডার দান করতেন, তাহলে আপনি জাগতিক জীবন যাপনের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অভাবমুক্ত হয়ে যেতেন। কারণ আমরা তো আপনাকে অভাবী হিসাবে দেখতে পাচ্ছি। তা না হলে আল্লাহ আপনাকে বিশালাকার একটি বাগান দান করেন না কেন? যা দ্বারা আপনি পানাহার এবং বিলাসিতা ভোগ করতেন। ফলে আর ক্ষুধার্ত থাকতেন না। কারণ আমরা আপনাকে একজন ক্ষুধার্ত ব্যাক্তি হিসেবে দেখতে পাচ্ছি। সে পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[মা'আরিফুন নুযূল ৪৩৭/১]

এখানে ৪৪ নং আয়াতে বলা হয়েছে : فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ اَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ অর্থাৎ তাদের অবাধ্যতা যখন সীমাতিক্রম করতে থাকে, তখন তাদেরকে একটি বিপজ্জনক পরীক্ষার সম্মুখীন করা হয়। অর্থাৎ তাদের জন্য দুনিয়ার নিয়ামত, সুখ ও সাফল্যের দ্বার খুলে দেওয়া হয়।

এতে সাধারণ মানুষকে হুশিয়ার করা হয়েছে যে, দুনিয়াতে কোনো ব্যক্তি অথবা সম্প্রদায়ের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও সম্পদের প্রাচুর্য দেখে ধোঁকা খেয়ো না যে, তারাই বুঝি বিশুদ্ধ পথে আছে এবং সফল জীবন যাপন করছে। অনেক সময় আজাবে পতিত অবাধ্য জাতি সমূহেরও এরূপ অবস্থা হয়ে থাকে। তাদের ব্যাপারে আল্লাহর সিদ্ধান্ত এই যে, তাদেরকে অকস্মাৎ কঠোর আজাবের মাধ্যমে পাকড়াও করা হবে।

তাই রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন তোমরা দেখ যে, কোনো ব্যক্তির উপর নিয়ামত ও ধন-দৌলতের বৃষ্টি বর্ষিত হচ্ছে, অথচ সে গুনাহ ও অবাধ্যতায় অটল, তখন বুঝে নিবে, তাকে ঢিল দেওয়া হচ্ছে। অর্থাৎ তার এ ভোগ-বিলাস কঠোর আজাবে গ্রেফতার হওয়ারই পূর্বাভাস। –[ইবনে কাছীর]

তাফসীরবিদ ইবনে জারীর হযরত ওবাদা ইবনে সামেত (রা.) থেকে রেওয়ায়েত করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : "আল্লাহ তা'আলা যখন কোনো জাতিকে টিকিয়ে রাখতে ও উন্নত করতে চান, তখন তাদের মধ্যে দুটি গুণ সৃষ্টি করে দেন– **এক.** প্রত্যেক কাজে সমতা ও মধ্যবর্তিতা, **দুই.** সাধুতা ও পবিত্রতা। অর্থাৎ অসত্য বিষয় ব্যবহারে বিরত থাকা। পক্ষান্তরে আল্লাহ তা'আলা যখন কোনো জাতিকে ধ্বংস ও বরবাদ করতে চান, তাদের জন্য বিশ্বাসভঙ্গ ও আত্মসাতের দ্বার খুলে দেন। অর্থাৎ বিশ্বাস ভঙ্গ ও কুকর্ম সত্ত্বেও তারা দুনিয়াতে সফল বলে মনে হয়।"

৪৫ নং আয়াতে বলা হয়েছে : আল্লাহর ব্যাপক আজাব আসার ফলে অত্যাচারীদের বংশ নির্মূল হয়ে গেল। এরই পর পর বলা হয়েছে : وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, অপরাধী ও অত্যাচারীদের উপর আজাব নাজিল হওয়াও সারা বিশ্বের জন্য একটি নিয়ামত। এ জন্য আল্লাহ তা'আলার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত।

কিন্তু তা সত্ত্বেও কুরাইশ কাফেরদেরকে বাসনা অনুযায়ী অন্য রকম মু'জিযাসমূহের মধ্যে কোনো কোনোটি আল্লাহ তা'আলা প্রকাশ্যভাবে কার্যক্ষেত্রে দেখিয়ে দিয়েছেন। তারা চন্দ্রকে দ্বিখণ্ডিত করার দাবি করেছিল। চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত করার মু'জিযাটি শুধু কুরাইশরাই নয়, তৎকালীন বিশ্বের বহু লোক স্বচক্ষে দেখেছিল।

তাদের দাবি অনুযায়ী এমন বিরাট মু'জিযা প্রকাশিত হওয়া সত্ত্বেও তারা কুফর ও পথভ্রষ্টতায় এবং জেদ ও হঠকারিতায় পূর্ববৎ অটল থেকে যায় এবং আল্লাহ তা'আলার এ নিদর্শনকে اِنْ هٰذَآ اِلَّا سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ বলে উপেক্ষা করে। এসব বিষয় দেখা ও বুঝা সত্ত্বেও তারা প্রতিদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে নতুন নতুন মু'জিযা দাবি করত।

আলোচ্য আয়াতসমূহে এ ধরনের লোকদের প্রশ্ন ও দাবির উত্তর একটি বিশেষ ভঙ্গিতে দেওয়া হয়েছে।

কাফেররা বিভিন্ন সময়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে তিনটি দাবি করেছিল **এক.** যদি আপনি বাস্তবিকই আল্লাহর রাসূল হয়ে থাকেন, তবে মু'জিযার মাধ্যমে সারা পৃথিবীর ধনভাণ্ডার আমাদের জন্য একত্রিত করে দিন। **দুই.** যদি আপনি বাস্তবিকই সত্য রাসূল হয়ে থাকেন, তবে আমাদের ভবিষ্যৎ উপকারী ও ক্ষতিকর অবস্থা ও ঘটনাবলি ব্যক্ত করুন যাতে আমরা উপকারী বিষয়গুলো অর্জন করার এবং ক্ষতিকর বিষয়গুলো বর্জন করার ব্যবস্থা পূর্ব থেকেই করে নিতে পারি। **তিন.** আমরা বুঝতে অক্ষম যে, আমাদেরই স্বগোত্রের একজন লোক, যিনি আমাদের মতোই পিতামাতার মাধ্যমে জন্মগ্রহণ

করেছেন এবং পানাহারও বাজারে ঘুরাফেরা ইত্যাদি মানবিক গুণে আমাদের সম অংশীদার, তিনি কিরূপে আল্লাহর রাসূল হতে পারেন! সৃষ্টি ও গুণাবলিতে আমাদের থেকে স্বতন্ত্র কোনো ফেরেশতা হলে আমরা তাঁকে আল্লাহর রাসূল ও মানব জাতির নেতারূপে মেনে নিতাম।

উপরিউক্ত তিনটি দাবির উত্তরে বলা হয়েছে : قُلْ لَّآ اَقُوْلُ لَكُمْ عِنْدِيْ خَزَآئِنُ اللّٰهِ وَلَآ اَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَآ اَقُوْلُ لَكُمْ اِنِّيْ مَلَكٌ ۚ اِنْ اَتَّبِعُ اِلَّا مَا يُوْحٰٓى اِلَيَّ 'রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, তাদের বাজে প্রশ্নাদির উত্তরে আপনি বলে দিন : তোমরা আমার কাছে পৃথিবীর ধণভাণ্ডারও দাবি করছ, কিন্তু আমি কবে এ দাবি করলাম যে, অল্লাহ তা'আলার সব ধনভাণ্ডার আমার করায়ত্ত? তোমরা দাবি করেছ যে, আমি ভবিষ্যতের সব উপকারী ও ক্ষতিকর ঘটনা তোমাদেরকে বলে দেই, আমি এ কথাও কবে বললাম যে, আমি সব অদৃশ্য বিষয় জানি? তোমরা আমার মধ্যে ফেরেশতাসুলভ গুণাবলি দেখতে চাও, আমি কবে এ দাবি করলাম যে, আমি ফেরেশতা?

মোটকথা, আমি যে বিষয় দাবি করি, তার প্রমাণই আমার কাছে চাওয়া যেতে পারে। অর্থাৎ আমি আল্লাহর রাসূল। তাঁর প্রেরিত নির্দেশাবলি মানুষের কাছে পৌঁছাই এবং নিজেও তা অনুসরণ করি, অপরকেও অনুসরণে উদ্বুদ্ধ করি। এর জন্য একটি দুটি নয়– অসংখ্য সুস্পষ্ট প্রমাণও উপস্থিত করা হয়েছে।

রিসালাত দাবি করার জন্য আল্লাহ তা'আলা সব ধনভাণ্ডারের মালিক হওয়া আল্লাহ তা'আলারই মতো প্রত্যকে ছোট বড় অদৃশ্য বিষয়ে অবগত হওয়া এবং মানবিক গুণের উর্ধ্বে কোনো ফেরেশতা হওয়া মোটেই জরুরি নয়। রাসূলের কর্তব্য এতটুকুই যে, তিনি আল্লাহ প্রেরিত ঐশিবাণী অনুসরণ করবেন; নিজেও তদনুযায়ী কাজ করবেন এবং অপরকেও কাজ করতে আহবান করবেন।

এ নির্দেশনামা দ্বারা এক দিকে রিসালাতের প্রকৃত দায়িত্ব ফুটিয়ে তোলা হয়েছে এবং অপরদিকে রাসূল সর্ম্পকে মানুষের মনে যে ভ্রান্ত ধারণা বিরাজ করছিল, তাও দূর করা হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে মুসলমানদেরকেও পথ নির্দেশ করা হয়েছে যে, তারা যেন খ্রিস্টানদের মতো রাসূলকে আল্লাহ না মনে করে বসে। রাসূলের মাহাত্ম্য ও ভালোবাসার দাবিও তাই। এ ব্যাপারে ইহুদি ও খ্রিস্টানদের মতো বাড়াবাড়ি করা যাবে না। ইহুদিরা রাসূলদের সম্মান হানিতে বাড়াবাড়ি করে তাঁদেরকে হত্যা পর্যন্ত করেছে এবং খ্রিস্টানরা সম্মানদানে বাড়াবাড়ি করে তাঁদেরকে আল্লাহ বানিয়ে দিয়েছে।

আলোচ্য আয়াতের প্রথম বাক্যে বলা হয়েছে : আল্লাহর ধনভাণ্ডার আমার করায়ত্ত নয়। এ ধনভাণ্ডার দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে : সে সম্পর্কে তাফসীরবিদগণ অনেক জিনিসের নাম উল্লেখ করেছেন। কিন্তু কুরআন স্বয়ং ধনভাণ্ডার প্রসঙ্গে অন্যত্র বলেছে : وَاِنْ مِّنْ شَيْءٍ اِلَّا عِنْدَنَا خَزَآئِنُهٗ অর্থাৎ দুনিয়াতে এমন কোনো বস্তু নেই, যার ভাণ্ডার আমার কাছে নেই। এতে বুঝা যায়, ভাণ্ডার বলে দুনিয়ার সব বস্তুকেই বুঝানো হয়েছে, এতে কোনো বিশেষ বস্তুকে নির্দিষ্ট করা যায় না। অবশ্য তাফসীরবিদগণ যেসব নির্দিষ্ট বস্তুর কথা উল্লেখ করেছেন, তাও দৃষ্টান্ত স্বরূপই উল্লেখ করেছেন। খোদায়ী ভাণ্ডার পয়গম্বরকুল-শিরোমণি হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা ﷺ–এর হাতেও নেই, তখন উম্মতের কোনো ওলী অথবা বুজুর্গ সম্বন্ধে এরূপ ধারণা পোষণ করা যে, তিনি যা ইচ্ছা করেন, যাকে ইচ্ছা দিতে পারেন– সুস্পষ্ট মুর্খতা বৈ কিছু নয়।

শেষ বাক্যে বলা হয়েছে : وَلَآ اَقُوْلُ لَكُمْ اِنِّيْ مَلَكٌ অর্থাৎ আমি তোমাদেরকে বলি না যে, আমি ফেরেশতা, যে কারণে তোমরা আমার মানবিক গুণ দেখে রোসালাতে অস্বীকার করবে।

মধ্যবর্তী বাক্যে কথার ভঙ্গি পরিবর্তন করে لَآ اَقُوْلُ لَكُمْ اِنِّيْٓ اَعْلَمُ الْغَيْبَ বলার পরিবর্তে وَلَآ اَعْلَمُ الْغَيْبَ বলা হয়েছে। অর্থাৎ 'আমি তোমাদেরকে বলি না যে, আমি অদৃশ্য বিষয় জানি। একথা না বলে 'আমি অদৃশ্য বিষয় জানি না' বলা হয়েছে।

তাফসীরে বাহরে মুহীতে আবূ হাইয়্যান এরূপ বলার একটি সূক্ষ্ম কারণ বর্ণনা করেছেন। তা এই যে, আল্লাহর ভাণ্ডারের মালিক হওয়া না হওয়া এবং কোনো ব্যক্তির ফেরেশতা হওয়া না হওয়া এগুলো প্রত্যক্ষ বিষয়। কাফেররাও জানত যে, আল্লাহ তা'আলার সব ভাণ্ডার রাসূলের হাতে নেই এবং তিনি ফেরেশতাও নন। তারা শুধু হঠকারিতাবশতঃ এসব দাবি করত। কাজেই কাফেরদের এসব কথার উত্তরে একথা বলে দেওয়াই যথেষ্ট ছিল যে, আমি আল্লাহর ভাণ্ডারের মালিক হওয়া এবং ফেরেশতা হওয়ার দাবি কখনো করিনি।

www.almodina.com

৫১ নং আয়াতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, এ সুস্পষ্ট বর্ণনার পরও যদি তারা জেদ পরিহার না করে, তবে তাদের সাথে তর্ক-বিতর্ক বন্ধ করে আসল কাজে অর্থাৎ রেসালত প্রচারে আত্মনিয়োগ করুন। যারা কিয়ামতে আল্লাহর দরবারে উপস্থিত ও হিসাব-নিকাশে বিশ্বাস করে, তাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করুন। যেমন, মুসলমান কিংবা যারা কমপক্ষে এসব বিষয় অস্বীকার করে না, আর কিছু না হোক, কমপক্ষে তারা হিসাবের আশঙ্কা করে।

মোটকথা এই যে, কিয়ামত সম্পর্কে তিন প্রকার লোক রয়েছে, **এক.** কিয়ামতে নিশ্চিত বিশ্বাসী, **দুই.** অনিশ্চিত বিশ্বাসী এবং **তিন.** সম্পূর্ণ অবিশ্বাসী। এ তিন প্রকার লোককেই ভীতি প্রদর্শনের নির্দেশ নবী-রাসূলগণকে দেওয়া হয়েছে। কুরআনের অনেক আয়াত দ্বারা তা প্রমাণিত। কিন্তু প্রথমোক্ত দুই প্রকার লোক ভীতি প্রদর্শনে প্রভাবান্বিত হবে বলে বেশি আশা করা যায়। তাই আলোচ্য আয়াতে বিশেষভাবে তাদের দিকে মনোযোগ দানের নির্দেশ দিয়ে বলা হয়েছে :

وَاَنْذِرْ بِهِ الَّذِيْنَ يَخَافُوْنَ اَنْ يُّحْشَرُوْٓا اِلٰى رَبِّهِمْ অর্থাৎ যারা আল্লাহর কাছে একত্রিত হওয়ার আশঙ্কা করে, তাদেরকে কুরআন দ্বারা ভীতি প্রদর্শন করুন।

শব্দ বিশ্লেষণ

نَسُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব سَمِعَ মাসদার اَلنَّسْىُ، اَلنِّسْيَانُ মূলবর্ণ (ن ـ س ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– তারা ভুলে গেল।

مُبْلِسُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِبْلَاسُ মূলবর্ণ (ب ـ ل ـ س) জিনস صحيح অর্থ– নিরাশ হওয়া।

كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى استمرارى معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْفِسْقُ মূলবর্ণ (ف ـ س ـ ق) জিনস صحيح অর্থ– তারা নাফরমানি করেছিল।

وَلَا تَطْرُدِ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدٰوةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهٗ ؕ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ وَّمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِّنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُوْنَ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ (٥٢)

অনুবাদ : (৫২) আর তাদেরকে [আপনার মজলিস হতে] বের করবেন না, যারা প্রাতে ও সন্ধ্যায় স্বীয় রবের ইবাদত করে, শুধু তাঁরই সন্তুষ্টি কামনা করে, তাদের হিসাবের কিছুই আপনার দায়িত্বে নয়, এবং আপনার হিসাব একটুও তাদের দায়িত্বে নয়, যদ্দরুন, তাদেরকে বের করে দিবেন, অন্যথা আপনি অনচারীদের অন্তর্ভুক্ত হবেন।

وَكَذٰلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِّيَقُوْلُوْٓا اَهٰٓؤُلَآءِ مَنَّ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنْ بَيْنِنَا ؕ اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَعْلَمَ بِالشّٰكِرِيْنَ (٥٣)

(৫৩) আর এরূপে আমি এক [দল]-কে অপর [দল]-এর দ্বারা পরীক্ষার মধ্যে ফেলে রেখেছি, যেন তারা বলে–এরাই নাকি? আমাদের মধ্যে যাদের প্রতি আল্লাহ করুণা করেছেন, এটা নয় কি যে, আল্লাহ সত্য উপলব্ধিকারীদেরকে খুব জানেন?

وَاِذَا جَآءَكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِاٰيٰتِنَا فَقُلْ سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلٰى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ۙ اَنَّهٗ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوْٓءًۢا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْۢ بَعْدِهٖ وَاَصْلَحَ فَاَنَّهٗ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ (٥٤)

(৫৪) আর যখন ঐ সমস্ত লোক আপনার নিকট আসে– যারা আমার আয়াতসমূহের উপর ঈমান রাখে, তখন এরূপ বলে দেন যে, তোমাদের উপর শান্তি রয়েছে, তোমাদের প্রতিপালক অনুগ্রহ করাকে নিজের জিম্মায় নির্ধারিত করে নিয়েছেন, তোমাদের মধ্য হতে, যে ব্যক্তি অজ্ঞতাবশতঃ কোনো মন্দ কাজ করে বসে, অতঃপর সে তার পর তওবা করে নেয়, এবং সংশোধন করে নেয়, তবে আল্লাহর শান এই যে, তিনি অতি ক্ষমাশীল, পরম করুণাময়।

শাব্দিক অনুবাদ

(৫২) وَلَا تَطْرُدِ আর তাদেরকে [আপনার মজলিস হতে] বের করবেন না الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ যারা স্বীয় রবের ইবাদত করে بِالْغَدٰوةِ وَالْعَشِيِّ প্রাতে ও সন্ধ্যায় يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهٗ শুধু তাঁরই সন্তুষ্টি কামনা করে مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ তাদের হিসাবের কিছুই আপনার দায়িত্বে নয় وَّمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِّنْ شَيْءٍ এবং আপনার হিসাব একটুও তাদের দায়িত্বে নয় فَتَطْرُدَهُمْ যদ্দরুন, তাদেরকে বের করে দিবেন فَتَكُوْنَ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ অন্যথা আপনি অনচারীদের অন্তর্ভুক্ত হবেন।

(৫৩) وَكَذٰلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ আর এরূপে আমি এক [দল]-কে অপর [দল]-এর দ্বারা পরীক্ষার মধ্যে ফেলে রেখেছি لِّيَقُوْلُوْٓا যেন তারা বলে اَهٰٓؤُلَآءِ এরাই নাকি مَنَّ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنْ بَيْنِنَا আমাদের মধ্যে যাদের প্রতি আল্লাহ করুণা করেছেন اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَعْلَمَ بِالشّٰكِرِيْنَ এটা নয় কি যে, আল্লাহ সত্য উপলব্ধিকারীদেরকে খুব জানেন?

(৫৪) وَاِذَا جَآءَكَ আর যখন ঐসমস্ত লোক আপনার নিকট আসে– الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِاٰيٰتِنَا যারা আমার আয়াতসমূহের উপর ঈমান রাখে فَقُلْ তখন এরূপ বলে দেন যে سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ তোমাদের উপর শান্তি রয়েছে كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلٰى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ তোমাদের প্রতিপালক অনুগ্রহ করাকে নিজের জিম্মায় নির্ধারিত করে নিয়েছেন اَنَّهٗ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوْٓءًا তোমাদের মধ্য হতে যে ব্যক্তি কোনো মন্দ কাজ করে বসে بِجَهَالَةٍ অজ্ঞতাবশতঃ ثُمَّ تَابَ مِنْۢ بَعْدِهٖ অতঃপর সে তার পর তওবা করে নেয় وَاَصْلَحَ এবং সংশোধন করে নেয় فَاَنَّهٗ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ তবে আল্লাহর শান এই যে, তিনি অতি ক্ষমাশীল, পরম করুণাময়।

وَكَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ وَلِتَسْتَبِيْنَ سَبِيْلُ الْمُجْرِمِيْنَ (٥٥)

অনুবাদ : (৫৫) আর এরূপেই আমি আয়াতসমূহের বিস্তারিত বর্ণনা করে থাকি, আর যেন অপরাধীদের পন্থা প্রকাশ পায়।

قُلْ اِنِّیْ نُهِیْتُ اَنْ اَعْبُدَ الَّذِیْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ؕ قُلْ لَّاۤ اَتَّبِعُ اَهْوَآءَكُمْ ۙ قَدْ ضَلَلْتُ اِذًا وَّمَاۤ اَنَا مِنَ الْمُهْتَدِیْنَ (٥٦)

(৫৬) আপনি বলে দিন, আমাকে তা নিষেধ করা হয়েছে যে, তাদের ইবাদত করি তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে যাদের ইবাদত করছ, আপনি বলে দিন, আমি তোমাদের মনোবৃত্তিগুলো অনুসরণ করবন না, অন্যথা আমি তো বিপথগামী হয়ে যাব এবং হেদায়েত প্রাপ্তদের মধ্যে থাকব না।

قُلْ اِنِّیْ عَلٰی بَیِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّیْ وَكَذَّبْتُمْ بِهٖ ؕ مَا عِنْدِیْ مَا تَسْتَعْجِلُوْنَ بِهٖ ؕ اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ ؕ یَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَیْرُ الْفٰصِلِیْنَ (٥٧)

(৫৭) আপনি বলে দিন যে, আমার নিকট তো একটা প্রমাণ রয়েছে আমার রবের পক্ষ হতে অথচ তাকে অসত্য বলছ, তোমরা যে বিষয়ে তাকাযা করছ, তা আমার নিকট নেই, হুকুম কারো নয় আল্লাহ ব্যতীত, তিনি বাস্তব কথা বর্ণনা করেন, এবং তিনিই সর্বাপেক্ষা উত্তম মীমাংসাকারী।

قُلْ لَّوْ اَنَّ عِنْدِیْ مَا تَسْتَعْجِلُوْنَ بِهٖ لَقُضِیَ الْاَمْرُ بَیْنِیْ وَبَیْنَكُمْ ؕ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِالظّٰلِمِیْنَ (٥٨)

(৫৮) আপনি বলে দিন, যদি আমার নিকট সে বস্তু [আজাব] থাকত, তোমরা যার তাকাযা করছ, তবে আমার ও তোমাদের মধ্যকার বিষয়টি মীমাংসিত হয়ে যেত, আর আল্লাহ জালেমদেরকে খুব জানেন।

শাব্দিক অনুবাদ

(৫৫) وَكَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ আর এরূপেই আমি আয়াতসমূহের বিস্তারিত বর্ণনা করে থাকি وَلِتَسْتَبِيْنَ سَبِيْلُ الْمُجْرِمِيْنَ আর যেন অপরাধীদের পন্থা প্রকাশ পায়।

(৫৬) قُلْ আপনি বলে দিন اِنِّیْ نُهِیْتُ আমাকে তা নিষেধ করা হয়েছে যে اَنْ اَعْبُدَ তাদের ইবাদত করি الَّذِیْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে যাদের ইবাদত করছ قُلْ আপনি বলে দিন لَّاۤ اَتَّبِعُ اَهْوَآءَكُمْ আমি তোমাদের মনোবৃত্তিগুলো অনুসরণ করব না قَدْ ضَلَلْتُ اِذًا অন্যথা আমি তো বিপথগামী হয়ে যাব وَّمَاۤ اَنَا مِنَ الْمُهْتَدِیْنَ এবং হেদায়েত প্রাপ্তদের মধ্যে থাকব না।

(৫৭) قُلْ আপনি বলে দিন যে اِنِّیْ عَلٰی بَیِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّیْ আমার নিকট তো একটা প্রমাণ রয়েছে আমার রবের পক্ষ হতে وَكَذَّبْتُمْ بِهٖ অথচ তাকে অসত্য বলছ مَا عِنْدِیْ مَا تَسْتَعْجِلُوْنَ بِهٖ তোমরা যে বিষয়ে তাকাযা করছ, তা আমার নিকট নেই اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ হুকুম কারো নয় আল্লাহ ব্যতীত یَقُصُّ الْحَقَّ তিনি বাস্তব কথা বর্ণনা করেন وَهُوَ خَیْرُ الْفَاصِلِیْنَ এবং তিনিই সর্বাপেক্ষা উত্তম মীমাংসাকারী।

(৫৮) قُلْ আপনি বলে দিন لَّوْ اَنَّ عِنْدِیْ যদি আমার নিকট সে বস্তু [আজাব] থাকত مَا تَسْتَعْجِلُوْنَ بِهٖ তোমরা যার তাকাযা করছ لَقُضِیَ الْاَمْرُ بَیْنِیْ وَبَیْنَكُمْ তবে আমার ও তোমাদের মধ্যকার বিষয়টি মীমাংসিত হয়ে যেত وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِالظّٰلِمِیْنَ আর আল্লাহ জালেমদেরকে খুব জানেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(৫২) قوله وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ الخ **আয়াতের শানে নুযূল-১** : ইমাম আহমদ (রা.) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন যে, একদা কুরাইশ নেতৃবর্গ রাসূল ﷺ-এর নিকট দিয়ে যাচ্ছিল, সে সময় রাসূল ﷺ-এর নিকট হযরত খাব্বাব, সুহাইব, বিলাল ও আম্মার (রা.) বসা ছিলেন। তখন তারা বলল, হে মুহাম্মদ! তাদের নিয়েই তুমি সন্তুষ্ট চিত্তে থাকবে? তাদের এহেন উপহাসসুলভ আচরণ সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়েছে। -[ইবনে কাছীর-১৩৭/২]

শানে নুযূল- ২ : ইবনে জারীর, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করে বলেন, কুরাইশ নেতৃবর্গ একদা রাসূল ﷺ-এর নিকট দিয়ে অতিক্রম করে যাচ্ছিল। সে সময় রাসূল ﷺ-এর নিকট বসা ছিলেন হযরত সুহাইব, বিলাল, আম্মার, খাব্বাব ও অন্যান্য দারিদ্র মুসলমানরা। তখন তারা বলল, হে মুহাম্মদ! তুমি কি তোমার গোত্রের এ সকল দরিদ্র লোক নিয়েই আত্মতৃপ্তি পাবে? আমাদের মধ্য হতে এ সকল লোকের প্রতিই কি আল্লাহর অনুগ্রহ রয়েছে? আমরা কি এ সকল লোকের অনুকরণেই থাকব? তাদেরকে আপনি উঠিয়ে দিন, তাহলে আমরাও হয়তো আপনার অনুসরণ করব। সে প্রেক্ষিতে وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ...... بِالشَّاكِرِينَ পর্যন্ত নাজিল করা হয়। -[ইবনে কাছীর ১৩৭/২, রুহুল মা'আনী ১৫৮/৪/৭]

শানে নুযূল- ৩ : ইবনে আবী হাতেম হযরত খাব্বাব (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন যে, আকরা' বিন হাবেস তামিমী ও ওয়াইনা ইবনুল হামাল আল ফাযারী এসে রাসূল ﷺ-কে হযরত সুহাইব, বিলাল, আম্মার, খাব্বাব, ও অন্যান্য দরিদ্র মুমিনগণের সাথে বসা দেখতে পেল। তারা রাসূল ﷺ-এর পার্শ্বে তাদেরকে বসা দেখে তুচ্ছ দৃষ্টিতে তাকাল। অতঃপর তারা রাসূল ﷺ-এর সাথে পৃথকভাবে বসে বলল, আমাদের কামনা যে, আপনি আমাদের জন্য পৃথকভাবে বসার কোনো ব্যবস্থা করবেন। আরবের লোকেরা যাতে আমাদের মর্যাদা সম্পর্কে উপলব্ধি করতে পারে। কারণ আরবের প্রতিনিধিরা আপনার নিকট আসলে আমাদের লজ্জা বোধ হয় যে, তারা আমাদেরকে এ সকল নিম্ন বর্ণের লোকদের সাথে বসা দেখবে। সুতরাং আমরা যখন আপনার নিকট আসব, তখন আপনি তাদেরকে আমাদের মজলিস থেকে উঠিয়ে দিবেন। আমাদের কাজ যখন শেষ হয়ে যাবে, তখন আপনি তাদের সাথে বৈঠক করেন। তখন রাসূল ﷺ সম্মতি দান করে বললেন হ্যাঁ, যে প্রেক্ষিতে তারা বলল, তাহলে আমাদেরকে কোনো লিখা দিন। তখন রাসূল ﷺ হযরত আলী (রা.)-কে তা লিখে দেওয়ার জন্য ডাকলেন। সে সময় আমরা রাসূল ﷺ -এর পাশেই বসা ছিলাম। সেই মুহূর্তেই হযরত জিবরাইল আমীন অবতরণ করে পাঠ করেন- وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ الخ; -[ইবনে কাছীর ১৩৭/২, কুরতুবী-৩৯৫/৬, রুহুল মা'আনী -১৫৮/৪/৭, বাহরে মুহীত-১৩৮/৪]

আয়াতের শানে নুযূল- ৪ : আহমদ হযরত সা'আদ (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন আলোচ্য আয়াত আমি, ইবনে মাসউদ, সুহাইব, আম্মার, মিকদাদ ও বিলাল আমরা এ ছয়জন সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। তিনি বলেন, কুরাইশরা রাসূল ﷺ-কে বলেছিল, আমরা তাদের পশ্চাতে থাকাকে পছন্দ করিনা। সুতরাং তাদেরকে তাড়িয়ে দিন তখন আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। -[কুরতুবী ২৯৬/৬]

(৫৪) وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ الخ **আয়াতের শানে নুযূল** : আল্লাহ তা'আলা যে সকল সাহাবীগণকে রাসূল ﷺ-এর দরবার হতে তাড়িয়ে দিতে নিষেধ করেছেন, তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। অতঃপর রাসূল ﷺ যখন তাদেরকে দেখেন, তখন সর্বপ্রথম তিনি তাদেরকে সালাম প্রদান করে বলেন

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ جَعَلَ فِيْ أُمَّتِيْ مَنْ أَمَرَنِيْ أَنْ أَبْدَأَ هُمْ بِالسَّلَامِ -[কুরতুবী ৩৯৭/৬, বাহরে মুহীত ১৪৩/৪]

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন যে, আলোচ্য আয়াত হযরত আবূ বকর, ওমর, উসমান ও আলী (রা.) সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। ফুযাইল বিন আইয়াজ বলেন, মুসলমানদের একটি দল নবী করীম ﷺ-এর নিকট এসে বললেন, আমরা পাপ করেছি। সুতরাং আমাদের জন্য আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করুন এবং আপনি আমাদেরকে ক্ষমা করে দিন। -[কুরতুবী ৩৯৮/৬, বাহরে মুহীত ১৪৩/৪, রুহুল মা'আনী ১৯৪/৪/৭ ফাতহুল কাদীর ১২১/২]

(৫৭) قوله قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ الخ **আয়াতের শানে নুযূল** : আলোচ্য আয়াত নযর বিন হারিছ এবং মক্কার নেতৃস্থানীয় লোকজন সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। তারা বলত যে, তোমরা যে শাস্তির ভীতি প্রদর্শন করছ, সে শাস্তি উপস্থিত করে আমাদেরকে দেখাও। এর দ্বারা রাসূল ﷺ-কে বিদ্রূপ করাই ছিল তাদের মূল লক্ষ্য। সে পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়েছে। -[মা'আরিফুল নুযূল ৪৪১/১]

মান অপমানের ইসলামি মাপকাঠি : ইসলামের ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে পার্থক্য নেই : যারা মানুষ হওয়া সত্ত্বেও মনুষত্ব কাকে বলে তা জানে না; বরং মানুষকে জগতের বিভিন্ন জানোয়ারের মধ্যে এমন একটি সজ্ঞান জানোয়ার মনে করে, যে অন্য জানোয়ারদেরকে অধীনস্থ ও প্রভাবাধীন করে স্বীয় সেবাদাসে পরিণত করেছে, তাদের মতে জীবনের লক্ষ্য পানাহার, নিদ্রা-জাগরণ ও অন্যান্য জৈবিক অনুভূতিতে ব্যবহার করা ছাড়া আর কিই বা হতে পারে? জীবনের লক্ষ্য যখন শুধু তাই হয়, তখন জগতে ভালো মন্দ, ছোট-বড়, সম্মানিত ও অপমানিত, ভদ্র ও ইতর পরিচয়ের মাপকাঠি এ ছাড়া আর কি হতে পারে যে, যার কাছে পানাহার ও ভোগ্য বস্তুর প্রাচুর্য রয়েছে, সেই কৃতকর্মা, সম্ভ্রান্ত ও ভদ্র এবং যার কাছে এসব বস্তু স্বল্পমাত্রায় আছে সে অপমানিত, লাঞ্ছিত ও অকতৃকর্মা।

সত্য বলতে কি, এ বিশ্বাস ও মতবাদ অনুযায়ী ভদ্র ও সম্ভ্রান্ত হওয়ার জন্য সচ্চরিত্র ও সৎকর্মের কোনো প্রয়োজন নেই; বরং যে কর্ম ও চরিত্র এ জৈবিক লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক, তাই সৎকর্ম ও সচ্চরিত্র।

এ কারণেই নবী-রাসূলগণের এবং তাদের আনীত ধর্মের সর্বপ্রথম ও সর্বশেষ শিক্ষা ছিল এই যে, এ জীবনের পর আরেকটি চিরস্থায়ী ও অনন্ত জীবন রয়েছে, সে জীবনের সুখশান্তি যেমন পূর্ণ ও চিরস্থায়ী, তেমনি কষ্ট, শাস্তি ও চিরস্থায়ী। পার্থিব জীবন স্বয়ং লক্ষ্য নয়; বরং পর জীবনে যে যে বিষয় উপকারী, তা সংগ্রহে ব্যস্ত থাকাই ক্ষণস্থায়ী জীবনের আসল লক্ষ্য।

মানুষ ও জন্তু জানোয়ারের মধ্যে পার্থক্য এই যে, জন্তু-জানোয়ারকে পর জীবনের চিন্তা করতে হয় না, কিন্তু জ্ঞানী ও সচেতন ব্যক্তিদের মতে পরজীবনের সংশোধনই মানুষের সর্ববৃহৎ চিন্তা। এ বিশ্বাস ও মতবাদ অনুযায়ী ভদ্রতা ও নীচতা এবং সম্মান ও অপমানের মাপকাঠি অধিক পানহার কিংবা অধিক ধন-সম্পদ আহরণে হবে না; বরং সচ্চরিত্রতা ও সৎকর্মই হবে আভিজাত্যের এক মাত্র মাপকাঠি। পরকালের সম্মান এগুলোর উপরই নির্ভরশীল।

জগদ্বাসী যখনই নবী রাসূলগণের নির্দেশাবলি, শিক্ষা এবং পরকাল বিশ্বাসের প্রতি অমনোযোগী হয়েছে, তখনই তারা স্বাভাবিক ফলশ্রুতিও সামনে এসে গেছে– অর্থাৎ শুধু অন্ন ও উদরই মান-অপমান, ভদ্রতা ও নীচতার মাপকাঠি হিসেবে গণ্য হয়েছে। যারা এতে সফলকাম তারা ভদ্র ও সম্ভ্রান্ত বলে আখ্যায়িত হয়েছে এবং যারা এতে ব্যর্থ কিংবা অসম্পূর্ণ, তারা দরিদ্র, সম্মানহীন, নীচ ও লাঞ্ছিত বলে পরিগণিত রয়েছে।

তাই সর্বকালে শুধু পার্থিব জীবনের গোলক ধাঁধায় আবদ্ধ মানুষ বিত্তবানদের কে সম্ভ্রান্ত ও ভদ্র এবং দীন-দরিদ্র বিত্তহীনদেরকে সম্মানহীন ও নীচ বলে গণ্য করেছে। এ মাপকাঠির ভিত্তিতেই হযরত নূহ (আ.)-এর কওম বিশ্বাস স্থাপনকারী দরিদ্রদের নীচ বলে আখ্যা দিয়ে বলেছিল: আমরা এ নীচদের সাথে একত্রে বসতে পারি না। আপনি যদি আমাদেরকে কোনো পয়গাম শুনাতে চান, তবে দরিদ্র ও নিঃস্বদেরকে আগে দরবার থেকে বহিষ্কার করুন।

মহানবী ﷺ-এর আমলে আবারও এ প্রশ্নই দেখা দেয়। আলোচ্য আয়াতসমূহে এরই উত্তর বিশেষ নির্দেশসহ উল্লিখিত হয়েছে।

ইবনে কাছীর ইমাম ইবনে জারীরের রেওয়ায়েতক্রমে বর্ণনা করেন যে, ওতবা, শায়বা, ইবনে রবিয়া, মুতআম ইবনে আদী, হারেছ ইবনে নওফল প্রমুখ কতিপয় কুরাইশ সর্দার মহানবী ﷺ-এর চাচা আবূ তালেবের নিকট এসে বলল : আপনার ভ্রাতুষ্পুত্র মুহাম্মদ ﷺ-এর কথা মেনে নিতে আমাদের সামনে একটি বাধা এই যে, তার চার পাশে সর্বদা এমন সব লোকের ভিড় লেগে থাকে, যারা হয় আমাদের ক্রীতদাস ছিল, এরপর আমরা মুক্ত করে দিয়েছি, না হয় আমাদেরই দান-দক্ষিণায় যারা লালিত-পালিত হতো। এমন নিকৃষ্ট লোকদের উপস্থিতিতে আমরা তার মজলিসে যোগদান করতে পারি না। আপনি তাকে বলে দিন, যদি সে আমাদের আসার সময় তাদেরকে মজলিস থেকে সরিয়ে দেয়, তবে আমরা তার কথা নিয়ে বিবেচনা করতে সম্মত রয়েছি।

আবূ তালেব মহানবী ﷺ-কে বক্তব্য জানিয়ে দিলে হযরত ওমর (রা.) মত প্রকাশ করে বললেন, এতে অসুবিধা কি? আপনি কিছুদিন তাই করে দেখুন। এরা তো অপকট বন্ধুবর্গই। কুরাইশ সরদারের আগমনের সময় এরা না হয় সরেই যাবে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। এতে উল্লিখিত পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করতে কঠোর ভাষায় নিষেধ করা হয়েছে। আয়াত অবতরণের পর হযরত ফারূকে আজম (রা.)-কে 'আমার মত ভ্রান্ত ছিল' এই বলে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হয়।

যে দরিদ্রদের সম্পর্কে আয়াতে আলোচনা করা হয়েছে, তাঁরা ছিলেন হযরত বেলাল হাবশী (রা.), ছোহায়েব রূমী (রা.), আম্মার ইবনে ইয়াসির (রা.), আবূ হুযায়ফার মুক্ত ক্রীতদাস সালেম (রা.), উসায়েদের মুক্ত ক্রীতদাস ছবীহ (রা.), হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা.), মিকদাদ ইবনে আমর (রা.), মাসঊদ ইবনুল ক্বারী (রা.), যুশ শিমালাইন (রা.) প্রমুখ সাহাবায়ে কেরাম। তাঁদের সম্মান ও ভদ্রতার সনদ আল্লাহর তরফ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে।

কতিপয় নির্দেশ : উল্লিখিত আয়াত থেকে কতিপয় নির্দেশ বুঝা যায়– প্রথমতঃ কারো ছিন্নবস্ত্র কিংবা বাহ্যিক দুরবস্থা দেখে তাকে নিকৃষ্ট ও হীন মনে করার অধিকার কারো নেই। প্রায়ই এ ধরনের পোশাকে এমন লোকও থাকেন, যারা আল্লাহর কাছে অত্যন্ত সম্মানিত ও প্রিয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : অনেক দুর্দশাগ্রস্ত, ধূলি-ধূসরিত লোক বলে বসেন, 'এরূপ হবে" তবে আল্লাহ তা'আলা তাদের সে আবদার অবশ্যই পূর্ণ করেন।'

দ্বিতীয়তঃ শুধু পার্থিব ধন-দৌলতকে ভদ্রতা ও নীচতার মাপকাঠি মনে করা মানবতার সচ্চরিত্র ও সৎকর্ম। তৃতীয়তঃ কোনো জাতির সংস্কারক ও প্রচারকের জন্য ব্যাপক প্রচারকার্যও জরুরি। অর্থাৎ, পক্ষ-বিপক্ষ, মান্যকারী ও অমান্যকারী সবার কাছেই স্বীয় বক্তব্য প্রচার করতে হবে। কিন্তু যারা তার শিক্ষার সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে তা পালন করে চলবে, তাদের অধিকার অগ্রগণ্য। অন্যের কারণে তাদেরকে পিছনে ফেলা কিংবা উপেক্ষা করা জায়েজ নয়। উদাহরণতঃ অমুসলমানদের মধ্যে প্রচার কার্যের জন্য অজ্ঞ মুসলমানদের শিক্ষাদান ও সংশোধনকে পিছনে ফেলে দেওয়া উচিত নয়।

চতুর্থতঃ আল্লাহর নিয়ামত কৃতজ্ঞতার অনুপাতে বৃদ্ধি পায়। যে ব্যক্তি খোদায়ী নিয়ামতের আধিক্য কামনা করে, কথায় ও কাজে কৃতজ্ঞতা অবলম্বন করা তার পক্ষে অপরিহার্য।

এবার আয়াতসমূহের পূর্ণ ব্যাখ্যা দেখুন। প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে : وَاِذَا جَآءَكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِاٰيٰتِنَا فَقُلْ سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلٰى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ

অর্থাৎ আমার নিদর্শনাবলিতে বিশ্বাস করে, এমন লোক যখন আপনার কাছে আসে (এখানে اٰيٰت –এর অর্থ কুরআনের আয়াতও হতে পারে এবং আল্লাহ তা'আলার শক্তি ও কুদরতের সাধারণ নিদর্শনাবলিও হতে পারে।) তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, আপনি তাদেরকে سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ বলে সম্বোধন করুন। এখানে سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ –এর দ্বিবিধ অর্থ হতে পারে : **এক.** তাদেরকে আল্লাহ তা'আলার সালাম পৌঁছিয়ে দিন, যাতে তাদের প্রতি চূড়ান্ত সম্মান বুঝা যায়। এতে করে ঐসব দরিদ্র মুসলমানদের মনোবেদনার চমৎকার প্রতিকার হয়ে গেছে, যাদেরকে মজলিস থেকে হটিয়ে দেওয়ার প্রস্তাব কুরাইশ সর্দাররা করেছিল। **দুই.** আপনি তাদেরকে নিরাপত্তার সুসংবাদ শুনিয়ে দিন যে, তাদের ভুলত্রুটি হয়ে থাকলেও তা ক্ষমা করে দেওয়া হবে এবং তারা সর্বপ্রকার বিপদাপদ থেকে নিরাপদ থাকবে।

كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلٰى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ –বাক্যে এ অনুগ্রহের উপর আরো অনুগ্রহ ও নিয়ামত দানের ওয়াদা করে বলা হয়েছে যে, আপনি মুসলমানদেরকে বলে দিন : তোমাদের প্রতিপালক দয়া প্রদর্শনকে নিজ দায়িত্বে লিপিবদ্ধ করে নিয়েছেন। কাজেই খুব ভীত ও অস্থির হয়ো না। এ বাক্যে প্রথমতঃ رَبّ (প্রতিপালক) শব্দ ব্যবহার করে আয়াতের বিষয়বস্তুকে যুক্তিযুক্ত করে দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের প্রতিপালক। এখন জানা কথা যে, কোনো প্রতিপালক স্বীয় প্রতিপালিতদেরকে বিনষ্ট হতে দেন না। অতঃপর رَبّ শব্দটি যে দয়ার প্রতি ইঙ্গিত করেছিল, তা পরিষ্কারভাবেও উল্লেখ করা হয়েছে। তাও এমন ভঙ্গিতে যে, তোমাদের প্রতিপালক দয়া প্রদর্শনকে নিজ দায়িত্বে লিখে নিয়েছেন। কাজেই কোনো ভুল ও সৎ লোকের দ্বারাই যখন ওয়াদা খেলাফী হতে পারে না, তখন রাব্বুল আলামীনের দ্বারা তা কেমন করে হতে পারে? বিশেষ করে যখন ওয়াদাটি চুক্তির আকারে লিপিবদ্ধ করে নেওয়া হয়।

সহীহ বুখারী, মুসলিম ও মুসনাদে আহমদ গ্রন্থে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : যখন আল্লাহ তা'আলা সব কিছু সৃষ্টি করলেন এবং প্রত্যেকের ভাগ্যের ফয়সালা করলেন, তখন একটি কিতাব লিপিবদ্ধ করে নিজের কাছে আরশে রেখে দিলেন। তাতে লেখা আছে : اِنَّ رَحْمَتِىْ غَلَبَتْ عَلٰى غَضَبِىْ অর্থাৎ আমার দয়া আমার ক্রোধের উপর প্রবল হয়ে গেছে।

হযরত সালমান (রা.) বলেন : আমি তাওরাতে লিখিত দেখেছি, যখন আল্লাহ তা'আলা আসমান, জমিন ও এতদুভয়ের সবকিছু সৃষ্টি করলেন, তখন 'রহমত' (দয়া) গুণটিকে একশ' ভাগ করে একভাগ সমগ্র সৃষ্টজীবকে দান করলেন। মানুষ, জীবজন্তু ও অন্যান্য সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে দয়ার যেসব লক্ষণ দেখা যায়, তা ঐ এক ভাগেরই ক্রিয়া। পিতামাতা ও সন্তানদের মধ্যে, ভ্রাতা-ভগিনীর মধ্যে, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে, অন্যান্য আত্মীয়দের মধ্যে এবং প্রতিবেশী ও বন্ধু-বান্ধবের মধ্যে যে পারস্পরিক সহানুভূতি, ভালোবাসা ও দয়া পরিলক্ষিত হয়, তা ঐ একভাগ দয়ারই ফলশ্রুতি। অবশিষ্ট নিরানব্বই ভাগ দয়া আল্লাহ তা'আলা নিজের জন্য রেখেছেন। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে একে নবী করীম ﷺ-এর হাদীসরূপেও বর্ণনা করা হয়েছে। এতেই অনুমান করা যায় যে, সৃষ্টজীবের প্রতি আল্লাহ তা'আলার দয়া কিরূপ ও কতটুকু।

আর তিনি অত্যন্ত দয়ালু। অর্থাৎ ক্ষমা করেই ক্ষান্ত হবেন না; বরং নিয়ামতও দান করবেন।

www.almodina.com

আয়াতে 'অজ্ঞতা' শব্দ দ্বারা বাহ্যতঃ কেউ ধারণা করতে পারে যে, গুনাহ্ ক্ষমা করার ওয়াদা একমাত্র তখনই প্রযোজ্য হবে যখন অজ্ঞতাবশতঃ কোনো গুনাহ হয়ে যায়, জেনেশুনে গুনাহ করলে হয়তো এ ওয়াদা প্রযোজ্য নয়। কিন্তু বাস্তবে তা নয়। কেননা এস্থলে 'অজ্ঞতা' বলে অজ্ঞতার কাজ বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ এমন কাজ করে বসে, যার পরিণাম সম্পর্কে অজ্ঞ ও মূর্খ ব্যক্তির পক্ষেই কেবল তা করা সম্ভব। এর জন্য বাস্তবে অজ্ঞ হওয়া জরুরি নয়। স্বয়ং جهالت (অজ্ঞতা) শব্দেই এর সমর্থন পাওয়া যায়। এখানে جهل শব্দের পরিবর্তে جهالت-এর ব্যবহার সম্ভবতঃ এদিকে ইঙ্গিত করার জন্যই করা হয়েছে। কেননা جهل শব্দটি علم (জ্ঞান)-এর বিপরীত এবং جهالت শব্দটি وقار, حلم (সহনশীলতা ও গাম্ভীর্য)-এর বিপরীত। অর্থাৎ جهالت শব্দটি বাক পদ্ধতিতে কার্যগত অজ্ঞতার অর্থেই ব্যবহৃত হয়। চিন্তা করলে দেখা যায় যে, যখনই কোনো গুনাহ হয়ে যায়, তা কার্যগত অজ্ঞতার কারণেই হয়। তাই কোনো কোনো বুজুর্গ বলেন : যে ব্যক্তি আল্লাহ ও রাসূলের কোনো নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ করে, সে অজ্ঞ। এখানে কার্যগত অজ্ঞতাই বুঝানো হয়েছে। এর জন্য অজ্ঞান হওয়া জরুরি নয়। কেননা কুরআন পাক ও অসংখ্য সহীহ হাদীস থেকে জানা যায় যে, তওবা দ্বারা প্রত্যেক গুনাহ মাফ হয়ে যায়– অমনোযোগিতা ও অজ্ঞতাবশতঃ হোক কিংবা জেনেশুনে মানসিক দুর্মতি ও প্রবৃত্তির তাড়নাবশতই হোক।

এখানে বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য যে, আয়াতে দু'টি শর্তাধীনে গুনাহগারদের সম্পর্কে ক্ষমা ও রহমতের ওয়াদা করা হয়েছে। এক. তওবা অর্থাৎ গুনাহের জন্য অনুতপ্ত হওয়া। হাদীসে বলা হয়েছে : انما التوبة الندم অর্থাৎ অনুশোচনার নামই হলো তওবা।

দুই. ভবিষ্যতের জন্য আমল সংশোধন করা। কয়েকটি বিষয় এ আমল সংশোধনের অন্তর্ভুক্ত। ভবিষ্যতে এ পাপ কাজের নিকটবর্তী না হওয়ার সংকল্প করা ও সে বিষয়ে যত্নবান হওয়া এবং কৃত গুনাহর কারণে কারো অধিকার নষ্ট হয়ে থাকলে যথাসম্ভব তা পরিশোধ করা, তা আল্লাহর অধিকার হোক কিংবা বান্দার অধিকার। আল্লাহর অধিকার যেমন– নামাজ, রোজা, জাকাত, হজ ইত্যাদি ফরজ কর্মে ত্রুটি করা। আর বান্দার অধিকার– যেমন, কারো অর্থ সম্পদ অবৈধভাবে করায়ত্ত করা ও ভোগ করা, কারো ইজ্জত আবরু নষ্ট করা, কাউকে গালি গালাজের মাধ্যমে কিংবা অন্য কোনো প্রকারে কষ্ট দেওয়া ইত্যাদি।

তাই তওবার পূর্ণতার জন্য যেমন অতীত গুনাহর জন্য অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা, ভবিষ্যতের জন্য কর্ম-সংশোধন করা এবং গুনাহর নিকটবর্তী না হওয়া জরুরি, তেমনিভাবে যেসব নামাজ ও রোজা অমনোযোগিতাবশতঃ তরক করা হয়েছে, সেগুলোর কাজা করা, যে জাকাত দেওয়া হয়নি, তা এখন দিয়ে দেওয়া, হজ ফরজ হওয়া সত্ত্বেও হজ না করে থাকলে এখন তা আদায় করে নেওয়া নিজে করতে সক্ষম না হলে বদলী হজ করানো প্রভৃতি বিষয়ও অপরিহার্য। যদি জীবদ্দশায় বদলী হজ ও অন্যান্য কাজার পুরোপুরি সুযোগ না মিলে তবে অসিয়ত করা, যাতে ওয়ারিশ ব্যক্তিরা তার ফরজসমূহের ফিদিয়া (বিনিময়) ও বদলী হজের ব্যবস্থা করে। মোটকথা, কর্ম সংশোধনের জন্য শুধু ভবিষ্যৎ কর্ম সংশোধন করাই যথেষ্ট নয়, বিগত ফরজ ও ওয়াজিবসমূহ আদায় করাও জরুরি।

এমনিভাবে যদি কারো অর্থ সম্পদ অবৈধভাবে হস্তগত করে থাকে, তবে তা ফেরত দিতে হবে কিংবা তার কাছ থেকে ক্ষমা নিতে হবে। কাউকে হাতে কিংবা মুখে কষ্ট দিয়ে থাকলে তারও ক্ষমা নিতে হবে। যদি ক্ষমা নেওয়া সম্ভবপর না হয়– উদাহরণতঃ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি যদি মারা যায়, কিংবা তার ঠিকানা অজ্ঞাত হয়, তবে তার জন্য নিয়মিতভাবে আল্লাহ তা'আলার কাছে মাগফিরাতের দোয়া করতে থাকবে। এতে আশা করা যায়, সে সন্তুষ্ট হবে এবং ঋণী ব্যক্তি ঋণ থেকে অব্যাহতি পাবে।

শব্দ বিশ্লেষণ

لَا تَطْرُدْ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ نهى حاضر معروف বাব نَصَرَ মাসদার الطَّرْد মূলবর্ণ (ط . ر . د) জিনস صحيح অর্থ– তুমি বিতাড়িত করো না, তুমি বের করো না।

لِتَسْتَبِيْنَ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ مضارع معروف বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِسْتِبَانَةُ মূলবর্ণ (ب . ى . ن) জিনস اجوف يائى অর্থ– যেন সে স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়।

نُهِيْتُ : সীগাহ واحد متكلم বহছ ماضى مجهول বাব فتح মাসদার اَلنَّهْى মূলবর্ণ (ن . ه . ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– আমাকে নিষেধ করা হয়েছে।

اَهْوَاءٌ : শব্দটি বহুবচন, একবচন هَوًى অর্থ– কুপ্রবৃত্তি, কামনা, বাসনা।

অনুবাদ	আয়াত
অনুবাদ : (৫৯) আর আল্লাহরই নিকট আছে সমস্ত গুপ্ত বস্তুর ভাণ্ডার, আল্লাহ ভিন্ন অপর কেউই তা অবগত নয়, এবং তিনি সমস্তই অবগত আছেন যা কিছু স্থলে এবং সমুদ্রে রয়েছে, এবং তার জ্ঞাতসার ব্যতীত কোনো পাতা ঝরে না, আর কোনো বীজ জমিনের অন্ধকার অংশে পতিত হয় না এবং কোনো আর্দ্র এবং শুষ্ক বস্তুও পতিত হয় না, কিন্তু এই সমস্তই উজ্জ্বল কিতাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে।	وَعِنْدَهٗ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَآ اِلَّا هُوَ ؕ وَيَعْلَمُ مَا فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ؕ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَّرَقَةٍ اِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِىْ ظُلُمٰتِ الْاَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَّلَا يَابِسٍ اِلَّا فِىْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ (٥٩)
(৬০) আর তিনি এমন যে, রাত্রিকালে তোমাদের রূহকে এক প্রকার কব্য [অকেজো] করে দেন এবং তোমরা দিবসে যা কিছু কর তাও তিনি জানেন, অতঃপর দিবাভাগে তোমাদেরকে জাগ্রত করেন, যেন নির্দিষ্ট সীমাকাল পূর্ণ হয়ে যায়, অতঃপর তাঁরই দিকে তোমাদেরকে ফিরতে হবে, তৎপর জানিয়ে দিবেন, যা কিছু তোমরা করছিলে।	وَهُوَ الَّذِىْ يَتَوَفّٰىكُمْ بِالَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيْهِ لِيُقْضٰٓى اَجَلٌ مُّسَمًّى ۚ ثُمَّ اِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ (٦٠)
(৬১) আর তিনিই বান্দাদের উপর ক্ষমতাবান, পরাক্রান্ত এবং তোমাদের প্রতি রক্ষকদেরকে পাঠান, ঐ পর্যন্ত যখন তোমাদের কারো মৃত্যু উপস্থিত হয়, [তখন] আমার প্রেরিত [অপর ফেরেশতা]-গণ তার রূহ কব্য করে এবং তারা একটুও ত্রুটি করে না।	وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهٖ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً ؕ حَتّٰٓى اِذَا جَآءَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُوْنَ (٦١)

শাব্দিক অনুবাদ

(৫৯) وَعِنْدَهٗ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ আর আল্লাহরই নিকট আছে সমস্ত গুপ্ত বস্তুর ভাণ্ডার لَا يَعْلَمُهَآ اِلَّا هُوَ আল্লাহ ভিন্ন অপর কেউই তা অবগত নয় وَيَعْلَمُ এবং তিনি সমস্তই অবগত আছেন مَا فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ যা কিছু স্থলে এবং সমুদ্রে রয়েছে وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَّرَقَةٍ এবং কোনো পাতা ঝরে না اِلَّا يَعْلَمُهَا তার জ্ঞাতসার ব্যতীত وَلَا حَبَّةٍ فِىْ ظُلُمٰتِ الْاَرْضِ আর কোনো বীজ জমিনের অন্ধকার অংশে পতিত হয় না وَلَا رَطْبٍ وَّلَا يَابِسٍ এবং কোনো আর্দ্র এবং শুষ্ক বস্তুও পতিত হয় না اِلَّا فِىْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ কিন্তু এই সমস্তই উজ্জ্বল কিতাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে।

(৬০) وَهُوَ الَّذِىْ يَتَوَفّٰىكُمْ আর তিনি এমন যে, তোমাদের রূহকে এক প্রকার কব্য [অকেজো] করে দেন بِالَّيْلِ রাত্রিকালে وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ এবং তোমরা দিবসে যা কিছু কর তাও তিনি জানেন ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيْهِ অতঃপর দিবাভাগে তোমাদেরকে জাগ্রত করেন لِيُقْضٰٓى اَجَلٌ مُّسَمًّى যেন নির্দিষ্ট সীমাকাল পূর্ণ হয়ে যায় ثُمَّ اِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ অতঃপর তাঁরই দিকে তোমাদেরকে ফিরতে হবে ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ তৎপর জানিয়ে দিবেন بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ যা কিছু তোমরা করছিলে।

(৬১) وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهٖ আর তিনিই বান্দাদের উপর ক্ষমতাবান, পরাক্রান্ত وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً এবং তোমাদের প্রতি রক্ষকদেরকে পাঠান حَتّٰٓى اِذَا جَآءَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ ঐ পর্যন্ত যখন তোমাদের কারো মৃত্যু উপস্থিত হয় تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا আমার প্রেরিত [অপর ফেরেশতা]-গণ তার রূহ কব্য করে وَهُمْ لَا يُفَرِّطُوْنَ এবং তারা একটুও ত্রুটি করে না।

অনুবাদ	আয়াত
অনুবাদ : (৬২) অতঃপর সকলেই মালিকে বরহক সমীপে নীত হবে, ভালোরূপে শুনে নাও, মীমাংসার অধিকার কেবল আল্লাহরই। এবং তিনি সত্বরই হিসাব নিবেন।	ثُمَّ رُدُّوْٓا اِلَى اللّٰهِ مَوْلٰىهُمُ الْحَقِّ ؕ اَلَا لَهُ الْحُكْمُ ۟ وَهُوَ اَسْرَعُ الْحٰسِبِيْنَ (٦٢)
(৬৩) আপনি বলুন, সে ব্যক্তি কে? যিনি তোমাদেরকে স্থলভাগের ও সমুদ্রের অন্ধকার হতে এরূপ অবস্থায় মুক্তি প্রদান করেন, যখন তোমরা তাঁকে মিনতি সহকারে ও চুপি চুপি ডাকতে থাক, যদি আপনি আমাদেরকে তা হতে মুক্তি প্রদান করেন, তবে নিশ্চয় আমরা সত্য উপলব্ধিকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব।	قُلْ مَنْ يُّنَجِّيْكُمْ مِّنْ ظُلُمٰتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُوْنَهٗ تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً ۚ لَئِنْ اَنْجٰنَا مِنْ هٰذِهٖ لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الشّٰكِرِيْنَ (٦٣)
(৬৪) আপনি বলে দিন, আল্লাহই তোমাদেরকে তা হতে মুক্তি প্রদান করেন এবং সমস্ত দুঃখ হতেও, তথাপিও তোমরা শিরক করতে থাক।	قُلِ اللّٰهُ يُنَجِّيْكُمْ مِّنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ اَنْتُمْ تُشْرِكُوْنَ (٦٤)
(৬৫) আপনি বলে দিন, তাতেও তিনিই ক্ষমতাবান যে, তোমাদের প্রতি কোনো আজাব তোমাদের ঊর্ধ্বদেশ হতে প্রেরণ করেন কিংবা তোমাদের পদতলস্থ [জমিন] হতে কিংবা তোমাদেরকে দলে দলে বিচ্ছিন্ন করে সকলকে যুদ্ধোন্মাদ করে দেন এবং তোমাদের এককে অপরের যুদ্ধের স্বাদ গ্রহণ করান আপনি দেখুন তো! আমি কিরূপে প্রমাণসমূহকে বিভিন্ন ধরনের বর্ণনা করছি, হয়তো তারা বুঝে নিবে।	قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلٰٓى اَنْ يَّبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ اَوْ مِنْ تَحْتِ اَرْجُلِكُمْ اَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَّيُذِيْقَ بَعْضَكُمْ بَاْسَ بَعْضٍ ؕ اُنْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُوْنَ (٦٥)

শাব্দিক অনুবাদ

(৬২) ثُمَّ رُدُّوْٓا অতঃপর সকলেই নীত হবে اِلَى اللّٰهِ مَوْلٰىهُمُ الْحَقِّ মালিকে বরহক সমীপে اَلَا لَهُ الْحُكْمُ ভালোরূপে শুনে নাও মীমাংসার অধিকার কেবল আল্লাহরই وَهُوَ اَسْرَعُ الْحٰسِبِيْنَ এবং তিনি সত্বরই হিসাব নিবেন।

(৬৩) قُلْ আপনি বলুন مَنْ يُّنَجِّيْكُمْ সে ব্যক্তি কে? যিনি তোমাদেরকে এরূপ অবস্থায় মুক্তি প্রদান করেন مِّنْ ظُلُمٰتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ স্থলভাগের ও সমুদ্রের অন্ধকার হতে تَدْعُوْنَهٗ تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً যখন তোমরা তাঁকে মিনতি সহকারে ও চুপি চুপি ডাকতে থাক لَئِنْ اَنْجٰنَا مِنْ هٰذِهٖ যদি আপনি আমাদেরকে তা হতে মুক্তি প্রদান করেন لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الشّٰكِرِيْنَ তবে নিশ্চয় আমরা সত্য উপলব্ধিকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব।

(৬৪) قُلِ আপনি বলে দিন اللّٰهُ يُنَجِّيْكُمْ مِّنْهَا আল্লাহই তোমাদেরকে তা হতে মুক্তি প্রদান করেন وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ এবং সমস্ত দুঃখ হতেও ثُمَّ اَنْتُمْ تُشْرِكُوْنَ তথাপিও তোমরা শিরক করতে থাক।

(৬৫) قُلْ আপনি বলে দিন هُوَ الْقَادِرُ তাতেও তিনিই ক্ষমতাবান যে عَلٰٓى اَنْ يَّبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا তোমাদের প্রতি কোনো আজাব প্রেরণ করেন مِّنْ فَوْقِكُمْ তোমাদের ঊর্ধ্বদেশ হতে اَوْ مِنْ تَحْتِ اَرْجُلِكُمْ কিংবা তোমাদের পদতলস্থ [জমিন] হতে اَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا কিংবা তোমাদেরকে দলে দলে বিচ্ছিন্ন করে সকলকে যুদ্ধোন্মাদ করে দেন وَّيُذِيْقَ بَعْضَكُمْ بَاْسَ بَعْضٍ এবং তোমাদের এককে অপরের যুদ্ধের স্বাদ গ্রহণ করান اُنْظُرْ আপনি দেখুন তো! كَيْفَ نُصَرِّفُ الْاٰيٰتِ আমি কিরূপে প্রমাণসমূহকে বিভিন্ন ধরনের বর্ণনা করছি لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُوْنَ হয়তো তারা বুঝে নিবে।

www.almodina.com

অনুবাদ : (৬৬) আর আপনার কওম তাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করছে, অথচ তা বরহক, আপনি বলে দিন, আমি তোমাদের উপর উকিলরূপে নিযুক্ত হইনি।	وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ ۚ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ (٦٦)
(৬৭) প্রত্যেক সংবাদ সংঘটিত হওয়ার একটা [নির্দিষ্ট] সময় আছে এবং অচিরেই তোমরা জানতে পারবে।	لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ ۚ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ (٦٧)

শাব্দিক অনুবাদ

(৬৬) وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ আর আপনার কওম তাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করছে وَهُوَ الْحَقُّ অথচ তা বরহক قُلْ আপনি বলে দিন لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ আমি তোমাদের উপর উকিলরূপে নিযুক্ত হইনি।

(৬৭) لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ প্রত্যেক সংবাদ সংঘটিত হওয়ার একটা [নির্দিষ্ট] সময় আছে وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ এবং অচিরেই তোমরা জানতে পারবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(৬৫) قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** হযরত যায়েদ ইবনে আসলাম (রা.) বলেন, যখন উপরিউক্ত আয়াত অবতীর্ণ হলো তখন নবী করীম ﷺ সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-কে সম্বোধন করে ইরশাদ করলেন, আমার মৃত্যুর পর তোমরা সবাই কাফের হয়ে যেয়ো না এবং পরস্পর মারামারি হানাহানি আরম্ভ করে দিও না। সাহাবায়ে কেরাম (রা.) আরজ করলেন, আমরা তাওহীদ ও রিসালাতে বিশ্বাসী হওয়া সত্ত্বেও এরূপ হয়ে যাব। অনেকে বললেন, এটা কখনো হতে পারে না যে, আমরা পরস্পর মারামারি হানাহানি করব। অথচ আমরা মুসলমান। তখন এ আয়াত অবতীর্ণ হয়।

গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার অমোঘ ব্যবস্থাপত্র : সারা বিশ্বে যত ধর্মমত প্রচলিত রয়েছে, তন্মধ্যে ইসলামের স্বাতন্ত্র্যমূলক বৈশিষ্ট্য ও প্রধান স্তম্ভ হচ্ছে একত্ববাদের বিশ্বাস। বলা বাহুল্য শুধু আল্লাহর সত্তাকে এক ও অদ্বিতীয় জানার নামই একত্ববাদ নয়; বরং পূর্ণত্বের যত গুণ আছে সবগুলোতেই তাঁকে একক ও অদ্বিতীয় মনে করা এবং তাঁকে ছাড়া কোনো সৃষ্ট বস্তুকে এসব গুণে অংশীদার ও সমতুল্য মনে না করাকে একত্ববাদ বলা হয়।

আল্লাহ তা'আলার গুণাবলি হচ্ছে জীবন, জ্ঞান, শক্তি-সামর্থ্য, শ্রবণ, দর্শন, বাসনা, ইচ্ছা, সৃষ্টি, অন্নদান ইত্যাদি। তিনি এসব গুণে এমন পরিপূর্ণ যে, কোনো সৃষ্টজীব কোনো গুণে তাঁর সমতুল্য হতে পারে না। এসব গুণের মধ্যমেও দু'টি গুণ সব চেয়ে বিখ্যাত। (এক) জ্ঞান এবং (দুই) শক্তি-সামর্থ্য। তাঁর জ্ঞান বিদ্যমান, অবিদ্যমান, প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য, ছোট বড়, অণু-পরমাণু। সবকিছুতে পরিব্যাপ্ত এবং তাঁর শক্তি-সামর্থ্যও সবকিছুতেই পরিবেষ্টিত। উল্লিখিত দু'আয়াতে এ দু'টি গুণই বর্ণিত হয়েছে। এ দু'টি গুণ এমন যে, যে ব্যক্তি এগুলোর প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করে এবং চিন্তায় উপস্থিত রাখে, তার পক্ষে গুনাহ ও অপরাধ করা কিছুতেই সম্ভবপর নয়। বলাবাহুল্য, কথায়, কাজে, উঠায়-বসায় এমনকি প্রতি পদক্ষেপে যদি কারো চিন্তায় একথা উপস্থাপিত থাকে যে, একজন সর্বজ্ঞানী ও সর্বশক্তিমান তাকে দেখছেন এবং তার প্রকাশ্য, অপ্রকাশ্য এবং মনের ইচ্ছা ও কল্পনা পর্যন্ত জানেন তবে এ উপস্থিতি কখনো তাকে সর্ব শক্তিমানের অবাধ্যতার দিকে পা বাড়াতে দিবে না। তাই আলোচ্য আয়াত দু'টি মানুষকে পূর্ণ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য তার ক্রিয়াকর্ম ও চরিত্র সংশোধন করা ও সংশোধিত রাখার একটি অমোঘ ব্যবস্থাপত্র বললে অত্যুক্তি হবে না।

প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে : وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ এখানে مَفَاتِحُ শব্দটি বহুবচন। এর একবচন مَفْتَحٌ ও مِفْتَحٌ উভয়টিই হতে পারে। مَفْتَحٌ-এর অর্থ ভাণ্ডার এবং مِفْتَحٌ অর্থ চাবি। আয়াতে উভয় অর্থ হওয়ার অবকাশ আছে। তাই কোনো কোনো তাফসীরবিদ ও অনুবাদক مَفَاتِحُ এর অনুবাদ করেছেন, ভাণ্ডার, আবার কেউ কেউ অনুবাদ করেছেন চাবি। উভয় অনুবাদ সারকথা এক। কেননা 'চাবির মালিক হলেও 'ভাণ্ডারের মালিক' বুঝানো হয়েছে।

www.almodina.com

কুরআনের পরিভাষায় অদৃশ্যের জ্ঞান ও অসীম ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর : غَيْبٌ শব্দ দ্বারা এমন বস্তু বুঝানো হয়, যা অস্তিত্ব লাভ করেছে, কিন্তু আল্লাহ তা'আলা কাউকে সে বিষয়ে অবগত হতে দেননি। –[মাযহারী]

প্রথম প্রকারের দৃষ্টান্ত ঐসব অবস্থা ও ঘটনা, যা কিয়ামতের সাথে সম্পর্কযুক্ত কিংবা সৃষ্ট জগতের ভবিষ্যৎ ঘটনাবলির সাথে সম্পর্কযুক্ত। উদাহরণতঃ কে কখন ও কোথায় জন্মগ্রহণ করবে, কতবার পা ফেলবে কোথায় মরবে, কোথায় সমাধিস্থ হবে এবং কে কতটুকু রিজিক পাবে, কখন পাবে, বৃষ্টি কখন, কোথায় কি পরিমাণ হবে।

দ্বিতীয় প্রকারের দৃষ্টান্ত ঐ ভ্রূণ, যা স্ত্রীলোকের গর্ভাশয়ে অস্তিত্ব লাভ করেছে, কিন্তু কারো জানা নেই যে, পুত্র না কন্যা, সুশ্রী না কুশ্রী, সৎস্বভাব না বদস্বভাব। এমনি ধরনে আরো যেসব বস্তু অস্তিত্ব লাভ করা সত্ত্বেও সৃষ্ট জীবের জ্ঞান ও দৃষ্টি থেকে উহ্য রয়েছে।

وَعِنْدَهٗ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ এর অর্থ এই দাঁড়াল যে, অদৃশ্য বিষয়ের ভাণ্ডার আল্লাহরই কাছে রয়েছে। কাছে থাকার অর্থ মালিকানায় ও করায়ত্ত থাকা। উদ্দেশ্য এই যে, অদৃশ্য বিষয়ের ভাণ্ডারসমূহের জ্ঞান তাঁর করায়ত্ত এবং সেগুলোকে অস্তিত্ব দান করা অর্থাৎ কখন কতটুকু অস্তিত্ব লাভ করবে– তাও তাঁর সামর্থ্যের অন্তর্গত। কুরআন পাকের অন্য আয়াতে বলা হয়েছে : وَاِنْ مِّنْ شَيْءٍ اِلَّا عِنْدَنَا خَزَآئِنُهٗ وَمَا نُنَزِّلُهٗۤ اِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُوْمٍ অর্থাৎ প্রত্যেক বস্তুর ভাণ্ডার আমার কাছে রয়েছে। কিন্তু আমি প্রত্যেক বস্তু একটি বিশেষ পরিমাণে অবতীর্ণ করি।

মোটকথা এই যে, এ বাক্য দ্বারা আল্লাহ তা'আলার নজিরবিহীন জ্ঞানগত পরাকাষ্ঠাও প্রমাণিত হয়েছে এবং সামর্থ্যগত পরাকাষ্ঠাও। আরও প্রমাণিত হয়েছে যে, এ জ্ঞান ও সামর্থ্য একমাত্র আল্লাহ তা'আলার বৈশিষ্ট্য। এ গুণ অন্য কেউ অর্জন করতে পারে না। আরবি ব্যাকরণের নিয়মানুযায়ী عِنْدَهٗ শব্দটি অগ্রে উল্লেখ করে এ বৈশিষ্ট্যের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। পরবর্তী বাক্যে এ ইঙ্গিতকে সুস্পষ্ট উক্তিতে রূপান্তরিত করে পুরোপুরি হৃদয়ঙ্গম করানোর জন্য বলা হয়েছে : لَا يَعْلَمُهَاۤ اِلَّا هُوَ অর্থাৎ অদৃশ্য বিষয়ের এসব ভাণ্ডার সম্পর্কে আল্লাহ ছাড়া কেউ অবহিত নয়।

তাই এ বাক্য দ্বারা দু'টি বিষয় প্রমাণিত হয়েছে : **এক.** আল্লাহ তা'আলার পরিব্যাপ্ত জ্ঞানের মাধ্যমে সব অদৃশ্য বিষয়ে জ্ঞাত হওয়া ও পরিপূর্ণ শক্তি-সামর্থ্যের মাধ্যমে সব অদৃশ্য বিষয়ের উপর সামর্থ্যবান হওয়া এবং **দুই.** তাঁকে ছাড়া অন্য কোনো সৃষ্ট বস্তুর এরূপ জ্ঞান ও সামর্থ্য অর্জিত না হওয়া।

কুরআনের পরিভাষায় غَيْبٌ শব্দের অর্থ পূর্বে তাফসীরে মাযহারীর বরাত দিয়ে বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ যেসব বিষয় এখন পর্যন্ত অস্তিত্ব লাভ করেনি কিংবা অস্তিত্ব লাভ করলেও কোনো সৃষ্টজীব সে সম্পর্কে জ্ঞাত হতে পারেনি। এ অর্থের প্রতি লক্ষ্য রাখলে অদৃশ্য বিষয়ের প্রশ্নের জনসাধারাণের মনে বাহ্যতদৃষ্টিতে যেসব প্রশ্ন দেখা দেয়, তা আপনা-আপনিই দূর হয়ে যাবে।

কিন্তু غَيْبٌ শব্দটি দ্বারা মানুষ সাধারণত আভিধানিক অর্থ বুঝে। ফলে যে বস্তু আমাদের জ্ঞান ও দৃষ্টির অন্তরালে, তাকেও সাধারণ মানুষ غَيْبٌ বলে দেয়, যদিও অন্যদের কাছে সে সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের উপকরণাদি বিদ্যমান থাকে। এর ফলে নানাবিধ প্রশ্ন মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। উদাহরণত : জ্যোতির্বিদ্যা, ভবিষ্যৎকথন বিদ্যা, গণনাবিদ্যা কিংবা হস্ত-রেখা বিদ্যা দ্বারা ভবিষ্যৎ ঘটনাবলির জ্ঞান অর্জন করা হয় অথবা 'কাশফ ও ইলহাম' (আল্লাহর প্রকাশিত সত্য স্বর্গীয় প্রেরণা) দ্বারা কেউ কেউ ভবিষ্যৎ ঘটনাবলি জেনে ফেলে অথবা মৌসুমী বায়ুর গতি-প্রকৃতি দেখে আবহাওয়া বিশেষজ্ঞরা ঝড়-বৃষ্টি সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করে এবং তা অনেকাংশে সত্যেও পরিণত হয়– এসব বিষয় জনসাধারণের দৃষ্টিতে 'ইলমে গায়ব' তথা অদৃশ্য বিষয়কে জ্ঞান। তাই আলোচ্য আয়াত সম্পর্কে প্রশ্ন দেখা দেয় যে, কুরআন পাক 'ইলমে গায়ব' কে আল্লাহ তা'আলার বৈশিষ্ট্য বলেছে, অথচ চাক্ষুষ দেখা যায় যে, অন্যরাও তা অর্জন করতে পারে।

উত্তর এই যে, আল্লাহ তা'আলা 'কাশফ ও ইলহামের' মাধ্যমে যদি বান্দাকে কোনো ভবিষ্যৎ ঘটনা বলে দেন, তবে কুরআনের পরিভাষায় তাকে 'ইলমে গায়েব' বলা যায় না। এমনিভাবে উপকরণ ও যন্ত্রাদির মাধ্যমে যে জ্ঞান অর্জন করা হয়, তাও কুরআনি পরিভাষা অনুযায়ী 'ইলমে গায়েব' নয়, যেমন আবহাওয়া বিভাগের খবর কিংবা নাড়ি দেখে রোগীর শারীরিক অবস্থা বলে দেওয়া। কারণ আবহাওয়ার বিভাগ কিংবা কোনো হাকিম-ডাক্তার এসব খবর দেওয়ার সুযোগ তখনই পায়, যখন এসব ঘটনার উকপরণ সৃষ্টি হয়ে প্রকাশ পায়। তবে ব্যাপকভাবে প্রকাশ পায় না। যন্ত্রপাতির মাধ্যমে বিশেষজ্ঞদের দৃষ্টিতে প্রকাশ পায় কিন্তু জনসাধারণ অজ্ঞ থাকে। এরপর উপকরণ যখন শক্তিশালী হয়ে যায়, তখন সবার

দৃষ্টিতেই ব্যাপকভাবে প্রকাশ পায়। এ কারণেই আবহাওয়া বিভাগ একমাস দুমাস পর যে বৃষ্টি হবে, তার খবর আজ দিতে পারে না। কেননা এখনো পর্যন্ত এ বৃষ্টির উপকরণ সৃষ্টি হয়ে প্রকাশ পায়নি। এমনিভাবে কোনো হাকিম-ডাক্তার আজ নাড়ি দেখে বৎসর-দু বছর পূর্বে কিংবা পরে সেবনকৃত ঔষধ কিংবা পথ্যের সন্ধান দিতে পারে না। কারণ স্বভাবতঃ এর কোনো ক্রিয়া নাড়িতে থাকে না।

মোটকথা চিহ্ন ও লক্ষণাদি দেখেই এসব বিষয়ের অস্তিত্বের খবর দেওয়া হয়। লক্ষণাদি ও উপকরণ প্রকাশ পাওয়ার পর আর সেগুলো অদৃশ্য বিষয় থাকে না; বরং প্রত্যক্ষ বিষয়ে পরিণত হয়। তবে সূক্ষ্ম হওয়ার কারণে ব্যাপকভাবে প্রত্যক্ষ করা যায় না; শক্তিশালী হয়ে উঠার পরই সবার চোখে ফুটে উঠে।

এতদ্ব্যতীত উপরিউক্ত উপায়ে যে জ্ঞান অর্জিত হয়, তা সবকিছু সত্ত্বেও অনুমানের অতিরিক্ত কিছু নয়। ইলম বলা হয় নিশ্চিত জ্ঞানকে, তা এগুলোর কোনোটির মাধ্যমেই অর্জিত হয় না। তাই এসব খবর ভ্রান্ত হওয়ার ঘটনাও বিরল নয়।

জ্যোতির্বিজ্ঞানে যেসব বিষয় হিসাবের সাথে সম্পর্কযুক্ত তা জানা ইলম বটে, কিন্তু 'গায়েব' নয়। যেমন হিসাব করে কেউ বলে দেয় যে, আজ পাঁচটা একচল্লিশ মিনিটে সূর্যোদয় হবে কিংবা অমুক মাসের অমুক তারিখে চন্দ্রগ্রহণ অথবা সূর্যগ্রহণ হবে। বলাবাহুল্য, একটি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর গতি হিসাব করে সময় নির্দিষ্ট করা এমনই যেমন আমরা কোনো রেলগাড়ি কিংবা উড়োজাহাজের স্টেশনের কিংবা বিমান বন্দরে পৌছার খবর দিয়ে দেই। এছাড়া জ্যোতির্বিজ্ঞানের মাধ্যমে খবর জানার যে দাবি করা হয়, তা প্রতারণা বৈ কিছুই নয়। একশটি মিথ্যার ভিতর থেকে একটি সত্য বেরিয়ে আসা আদৌ পাণ্ডিত্য নয়।

গর্ভস্থ ভ্রূণ পুত্র না কন্যা, এ সম্পর্কেও বিশেষজ্ঞরা মন্তব্য করতে ছাড়ে না। কিন্তু অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দেয় যে, এটিও নিছক অনুমান ছাড়া কিছু নয়। শতকরা দু'চার ক্ষেত্রে নির্ভুল হয়ে যাওয়া স্বাভাবিক ব্যাপার। কোনো জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই।

এক্সরে মেশিন আবিষ্কৃত হওয়ার পর অনেকেই মনে করেছিল, এবার এর মাধ্যমে গর্ভস্থ সন্তান পুত্র কি কন্যা জানা যাবে। কিন্তু প্রমাণিত হয়ে গেছে যে, এক্ষেত্রে এক্সরে যন্ত্রপাতিও ব্যর্থ।

মোটকথা কুরআনের পরিভাষায় যাকে 'গায়ব' বা অদৃশ্য বলা হয়, তা আল্লাহ ছাড়া কারো জানা নেই। পক্ষান্তরে উপকরণ ও যন্ত্রপাতির মাধ্যমে মানুষ স্বভাবতঃ যেসব বিষয়ের জ্ঞান অর্জন করে, তা প্রকৃত পক্ষে 'গায়ব' নয়; যদিও ব্যাপকভাবে প্রকাশ না পাওয়ার দরুন তাকে 'গায়ব' বলেই অভিহিত করা হয়।

আল্লাহর জ্ঞান ও অপার শক্তির কয়েকটি নমুনা : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলার জ্ঞান ও শক্তির পরাকাষ্ঠা এবং নজিরবিহীন বিস্তৃতি বর্ণিত হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে এতদুভয়ের কয়েকটি চিহ্ন ও নমুনা বর্ণিত হচ্ছে।

প্রথম আয়াতে ظُلُمَاتٌ শব্দটি ظُلْمَةٌ –এর বহুবচন। অর্থ– অন্ধকার।

ظُلُمٰتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ -এর অর্থ স্থল ও সমুদ্রের অন্ধকারসমূহ। অন্ধকারের অনেক প্রকার রয়েছে : রাত্রির অন্ধকার, মেঘমালার অন্ধকার, ধূলাবালির অন্ধকার, সমুদ্রের ঢেউয়ের অন্ধকার ইত্যাদি সব প্রকার বুঝাবার জন্য ظُلُمٰتٌ শব্দটি বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে।

নিদ্রা ও বিশ্রাম গ্রহণের জন্য অন্ধকারও মানুষের জন্য একটি নিয়ামত। কিন্তু সাধারণ অবস্থায় মানুষের কাজকর্ম আলো দ্বারাই সম্পন্ন হয় এবং অন্ধকার সব কাজকর্ম থেকে অকেজো করা ছাড়াও মানুষের অগণিত দুঃখ ও বিপদাপদের কারণ হয়ে যায়। তাই আরবদের বাক-পদ্ধতিতে ظُلْمَةٌ শব্দটি দুঃখ ও বিপদাপদের অর্থেও ব্যবহৃত হয়। আলোচ্য আয়াতেও সাধারণ তাফসীরবিদগণ এ অর্থই বর্ণনা করেছেন।

আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদেরকে হুঁশিয়ার ও তাদের ভ্রান্ত কর্ম সম্পর্কে সতর্ক করার জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে নির্দেশ দিয়েছিলেন : আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন, স্থল ও সামুদ্রিক ভ্রমণে যখনই তোমরা বিপদের সম্মুখীন হও এবং সব আরাধ্য দেব-দেবিকে ভুলে গিয়ে একমাত্র আল্লাহকে আহ্বান কর, কখনও প্রকাশ্যে বিনীতভাবে এবং কখনো মনে মনে স্বীকার কর যে, এ বিপদ থেকে আল্লাহ ছাড়া কেউ উদ্ধার করতে পারবে না, এর সাথে সাথে তোমরা এরূপ ওয়াদাও কর যে, আল্লাহ তা'আলা যদি আমাদেরকে এ বিপদ থেকে উদ্ধার করেন, তবে আমরা তাঁর কৃতজ্ঞতা অবলম্বন করব, তাঁকেই কার্যনির্বাহী মনে করব, তাঁর সাথে কাউকে অংশীদার করব না। কেননা বিপদেই যখন

www.almodina.com

কাজে আসে না, তখন তাদের পূজাপাট আমরা কেন করব? তাই আপনি জিজ্ঞেস করুন যে, এমতাবস্থায় কে তোমাদেরকে বিপদ ও ধ্বংসের কবল থেকে রক্ষা করে? উত্তর নির্দিষ্ট ও জানা। কেননা তারা এ স্বতঃসিদ্ধতা অস্বীকার করতে পারে না যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো দেব-দেবি এ অবস্থায় তাদের কাজে আসেনি। তাই দ্বিতীয় আয়াতে আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আদেশ দিয়েছেন যে, আপনিই বলে দিন : একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই তোমাদেরকে এ বিপদ থেকে মুক্তি দিবেন; বরং অন্যান্য সব কষ্ট-বিপদ থেকে তিনি উদ্ধার করবেন। কিন্তু এসব সুস্পষ্ট নির্দেশন সত্ত্বেও যখন তোমরা বিপদ থেকে মুক্ত হয়ে যাও, তখন আবার শিরকে লিপ্ত হয়ে পড় এবং দেব-দেবির পূজা-পার্বণ শুরু করে দাও। এটা কেমন বিশ্বাসঘাতকতা ও মারাত্মক মূর্খতা।

আলোচ্য আয়াতদ্বয়ে কয়েকটি বিষয় বর্ণিত হয়েছে : **এক.** আল্লাহ তা'আলা অপার শক্তি-সামর্থ্য; অর্থাৎ প্রত্যেক মানুষকে বিপদাপদ থেকে মুক্তি দিতে তিনি পুরোপুরি সামর্থ্য। **দুই.** সর্বপ্রকার বিপদাপদ, কষ্ট ও অস্থিরতা দূর করা একমাত্র আল্লাহ তা'আলারই করায়ত্ত এবং **তিন.** একথা বাস্তব সত্য ও স্বতঃসিদ্ধ যে, আজীবন দেব-দেবির পূজাকারীরাও যখন বিপদে পতিত হয়, তখন একমাত্র আল্লাহ তা'আলাকেই আহবান করে এবং তাঁর প্রতিই মনোনিবেশ করে।

শিক্ষণীয় : মুশরিকদের এ কর্মপন্থা বিশ্বাঘাতকতার দিক দিয়ে যত বড় অপরাধই হোক, কিন্তু বিপদে পড়ে একমাত্র আল্লাহর প্রতি মনোনিবেশ করা ও সত্যকে স্বীকার করা মুসলমানদের জন্য একটি শিক্ষার চাবুক বিশেষ। আমরা মুসলমান আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী হওয়া সত্ত্বেও বিপদের সময়ও তাঁকে স্মরণ করি না; বরং আমাদের সব ধ্যান বস্তুনিষ্ঠ সাজ-সরঞ্জামের প্রতি নিবদ্ধ থাকে। আমরা যদিও মূর্তি ও দেব-দেবিকে স্বীয় কার্যনির্বাহী মনে করি না, কিন্তু বস্তুনিষ্ঠ সাজ-সরঞ্জাম উপকরণ ও যন্ত্রাপাতিও আমাদের কাছে দেব-দেবির চাইতে কম নয়। এদের চিন্তায় আমরা এমনভাবে ডুবে আছি যে, আল্লাহ ও আল্লাহর অপার মহিমার প্রতি মনোযোগ দেওয়ার অবসর আমাদের নেই।

বিপদাপদের আসল প্রতিকার : আমরা প্রত্যেক অসুখে শুধু ডাক্তার ও ঔষধকে এবং প্রত্যেক ঝড়-তুফান বন্যায় শুধু বস্তুনিষ্ঠ সাজ-সরঞ্জামকে কার্যনির্বাহী মনে করে এমন মত্ত হয়ে পড়ি যে, স্রষ্টার কথা চিন্তাই করি না। অথচ কুরআন পাক বার বার সুস্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা করেছে যে, পার্থিব বিপদাপদ সাধারণতঃ মানুষের কুকর্মের ফল এবং পারলৌকিক শাস্তির একটা অতি সাধারণ নমুনা। এসব বিপদাপদ মুসলমানদের জন্য এক প্রকার রহমত। কারণ বিপদাপদ দিয়েই অমনোযোগী মানুষকে সতর্ক করা হয়, যাতে তারা এখনো স্বীয় কুকর্ম থেকে বিরত থাকতে যত্নবান হয় এবং পরকালের কঠোর বিপদ থেকে নিরাপদ থাকে। এ বিষয়বস্তুটি বুঝানোর জন্যই কুরআন পাক বলে : وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

অর্থাৎ আমি তাদেরকে পৃথিবীতে সামান্য শাস্তি আস্বাদন করাই পরকালের বড় শাস্তির পূর্বে- যাতে তারা অমনোযোগিতা ও মন্দকাজ থেকে ফিরে আসে। অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে : وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ

অর্থাৎ তোমাদেরকে যে বিপদাপদ স্পর্শ করে, তা তোমাদের কুকর্মের প্রতিফল। আল্লাহ তা'আলা অনেক কুকর্ম ক্ষমা করে দেন। –[শূরা]

এ আয়াতের বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : ঐ সত্তার কসম! যাঁর হাতে আমার প্রাণ– কারো গায়ে কোনো কাষ্ঠখণ্ডের সামান্য আঁচড় লাগলে কিংবা কারো কোথাও পদস্খলন ঘটলে কিংবা কারো রোগ-ব্যাথা দেখা দিলে তা সবই কোনো না কোনো গুনাহের প্রতিফল মনে করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা অনেক গুনাহ ক্ষমাও করে দেন।

আল্লামা বায়যাভী (র.) বলেন, এর অর্থ এই যে, অপরাধী ও গুনাহগাররা যেসব রোগ-ব্যাধি ও বিপদাপদের সম্মুখীন হয়, তা সবই গুনাহের ফল। কিন্তু নিষ্পাপ ও পাপমুক্তদেরকে রোগ-ব্যাধি ও বিপদাপদের সম্মুখীন করার উদ্দেশ্য তাদের ধৈর্য ও দৃঢ়তার পরীক্ষা নেওয়া এবং জান্নাতে তাদেরকে উচ্চস্তর মর্যাদা দান করা হয়ে থাকে।

এ থেকে আরো জানা যায় যে, সব বিপদাপদ, অস্থিরতা, দুর্ঘটনা ও সঙ্কটের আসল ও সত্যিকার প্রতিকার হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার দিকে প্রত্যাবর্তন করা, অতীত গুনাহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে ভবিষ্যতে তা থেকে বিরত থাকতে দৃঢ়সংকল্প বদ্ধ হওয়া এবং বিপদ মুক্তির জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করা।

এর অর্থ এই নয় যে, বস্তুনিষ্ঠ সাজ-সরঞ্জাম, ঔষধ পত্র, চিকিৎসা এবং বিপদমুক্তির জন্য বস্তুগত কলা-কৌশল অনর্থক; বরং উদ্দেশ্য এই যে, প্রকৃত কার্যনির্বাহী আল্লাহ তা'আলাকেই মনে করতে হবে এবং বস্তুগত সাজ-সরঞ্জামকেও তাঁরই নিয়ামত মনে করে ব্যবহার করতে হবে। কেননা সব সাজ-সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি তাঁরই সৃজিত এবং তাঁরই প্রদত্ত নিয়ামত। এগুলো তাঁরই নির্দেশ ও ইচ্ছার অনুগামী হয়ে মানুষের সেবা করে।

www.almodina.com

মোটকথা এই যে, বিপদ মুহূর্তে মুশরিকরা আল্লাহকেই স্মরণ করে এ ঘটনা থেকে মুসলমানদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। সব বিপদাপদ ও কষ্ট দূর করার জন্য বস্তুনিষ্ঠ সাজ-সরঞ্জাম ও কলা-কৌশলের চাইতে আল্লাহ তা'আলার দিকে প্রত্যাবর্তন করাই মুমিনের কাজ। নতুবা এর পরিণতি যা হচ্ছে তাই হবে। অর্থাৎ সব কলাকৌশল সামগ্রিক হিসাব উল্টো দিকে যাচ্ছে। বন্যা প্রতিরোধ ও তার ক্ষয়ক্ষতির কবল থেকে আত্মরক্ষার সব কৌশলই অবলম্বন করা হচ্ছে, কিন্তু বন্যা আসে এবং বার বার আসে। রোগ-ব্যাধির চিকিৎসার নতুন নতুন ফন্দি-ফিকির করা হচ্ছে, কিন্তু রোগ-ব্যাধি রোজ রোজ বৃদ্ধি পাচ্ছে। দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি রোধ করার জন্য সর্ব প্রকার চেষ্টা চলছে এবং বাহ্যতঃ তা কার্যকারীও মনে হচ্ছে। কিন্তু সামগ্রিক দিক দিয়ে এ পাগলা ঘোড়া ছুটেই চলছে। চুরি, ডাকাতি, অপহরণ, ঘুষ, চোরা কারবার প্রভৃতি দমন করার জন্য সব সরকারই বস্তুনিষ্ঠ কলা-কৌশল ব্যবহার করছে, কিন্তু হিসাব করলে দেখা যাবে যে, প্রত্যহ এসব অপরাধের মাত্রা বেড়েই চলছে। আফসোস! আজ ব্যক্তিগত ও বাহ্যতঃ লাভ-লোকসানের উর্ধ্বে উঠে অবস্থা পর্যালোচনা করলে প্রমাণিত হবে যে, সামগ্রিক দিক দিয়ে আমাদের বস্তুগত কলা-কৌশল ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে; বরং এগুলো আমাদের বিপদকে আরো বাড়িয়ে তুলেছে। এর পর কুরআন বর্ণিত প্রতিকারের প্রতি দৃষ্টিপাত করা দরকার যে, বিপদাপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার একমাত্র পথ হচ্ছে স্রষ্টার দিকে প্রত্যাবর্তন করা এবং বস্তুগত কলা-কৌশলকেও তাঁর প্রদত্ত নিয়মমাত হিসেবে ব্যবহার করা। এছাড়া নিরাপত্তার আর কোনো বিকল্পপথ নেই।

قوله قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا الخ পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলার সুবিস্তৃত জ্ঞান ও নজিরবিহীন শক্তি-সামর্থ্য উল্লেখ করে বলা হয়েছিল যে, প্রত্যেক মানুষের বিপদাপদ তিনিই দূর করতে পারেন এবং বিপদ মুহূর্তে যে তাঁকে আহবান করে, সে তাঁর সাহায্য স্বচক্ষে দেখতে পায়। কেননা সমগ্র সৃষ্টজগতের উপর তাঁর শক্তি-সামর্থ্য কামেল ও পরিপূর্ণ এবং সৃষ্টজীবের প্রতি তাঁর দয়াও অসাধারণ। তাঁকে ছাড়া অন্য কারো এরূপ শক্তি-সামর্থ্য নেই এবং সমগ্র সৃষ্টজীবের প্রতিও দয়া-মমতা নেই।

উল্লিখিত আয়াতসমূহে পরিপূর্ণ শক্তি-সামর্থ্যের অপর পিঠ বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যে কোনো আজাব ও যে কোনো বিপদ দূর করতে যেমন সক্ষম, তেমনিভাবে তিনি যখন কোনো ব্যক্তি অথবা সম্প্রদায়কে অবাধ্যতার শাস্তি দিতে চান, তখন যে কোনো শাস্তি দেওয়া এবং কোনো সাহায্যকারীও প্রয়োজন হয় না। এ বিষয়বস্তুটিই এভাবে বর্ণিত হয়েছে–

هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা এ বিষয়েও শক্তিমান যে, তোমাদের প্রতি উপর দিক থেকে কিংবা পদতল থেকে কোনো শাস্তি পাঠিয়ে দিবেন কিংবা তোমাদেরকে বিভিন্ন দলে উপদলে বিভক্ত করে পরস্পরের মুখোমুখি করে দিবেন এবং একক অপরের হাতে শাস্তি দিয়ে ধ্বংস করে দিবেন।

আল্লাহর শাস্তির তিনটি প্রকার : এখানে তিন প্রকার শাস্তি বর্ণিত হয়েছে : এক. যা উপর দিক থেকে আসে, দুই. যা নিচের দিক থেকে আসে এবং তিন. যা নিজেদের মধ্যে মতানৈক্যের আকারে সৃষ্টি হয়। عذابا শব্দটিকে تنوين সহ نكره উল্লেখ করে ব্যাকরণের দিক দিয়ে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এ তিন প্রকারের মধ্যেও বিভিন্ন প্রকার হতে পারে।

তাফসীরবিদগণ বলেন : উপর দিক থেকে আজাব আসার দৃষ্টান্ত বিগত উম্মতসমূহের মধ্যে অনেক রয়েছে। যেমন হযরত নূহ (আ.)-এর সম্প্রদায়ের উপর প্লাবনাকারে বৃষ্টি বর্ষিত হয়েছিল, আ'দ জাতির উপর ঝড়ঝাঞ্ঝা চড়াও হয়েছিল, হযরত লূত (আ.)-এর সম্প্রদায়ের উপর প্রস্তর বর্ষিত হয়েছিল এবং বনী ইসরাঈলের উপর রক্ত, ব্যাঙ ইত্যাদি বর্ষণ করা হয়েছিল। আবরাহার হস্তীবাহিনী যখন মক্কার উপর চড়াও হয়, তখন পক্ষীকুল দ্বারা তাদের উপর কঙ্কর বর্ষণ করা হয়। ফলে সবাই চর্বিত ভূষির ন্যায় হয়ে যায়।

এমনিভাবে বিগত উম্মতসমূহের মধ্যে নিচের দিক থেকে আজাব আসারও বিভিন্ন প্রকার অতিবাহিত হয়েছে। হযরত নূহ (আ.)-এর সম্প্রদায়ের প্রতি উপরের আজাব বৃষ্টির আকারে এবং নিচের আজাব ভূতল থেকে পানি স্ফীত হয়ে প্রকাশ পেয়েছিল। তারা একই সময়ে উভয় প্রকার আজাবে পতিত হয়েছিল। ফেরাউনের সম্প্রদায়কে পদতলের আজাবে গ্রেফতার করা হয়েছিল। কারণ স্বীয় ধন-ভাণ্ডারসহ এ আজাবে পতিত হয়ে মৃত্তিকার অভ্যন্তরে প্রোথিত হয়েছিল।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.), মুজাহিদ প্রমুখ তাফসীরবিদগণ বলেন : উপরের আজাবের অর্থ অত্যাচারী বাদশাহ ও নির্দয় শাসকবর্গ এবং নিচের আজাবের অর্থ নিজ চাকর, নোকর ও অধীন কর্মচারীদের বিশ্বাসঘাতকতা, কর্তব্যে অবহেলাকারী ও আত্মসাৎকারী হওয়া।

রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কতিপয় উক্তি থেকেও উপরিউক্ত তাফসীরের সমর্থন পাওয়া যায়। মিশকাত শরীফে এ উক্তি বর্ণিত রয়েছে : كَمَا تَكُوْنُوْنَ يُؤَمَّرُ عَلَيْكُمْ অর্থাৎ তোমাদের কাজকর্ম যেমন ভালো কিংবা মন্দ হবে, তেমনি শাসকবর্গ তোমাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হবে। তোমরা সৎ ও আল্লাহর বাধ্য হলে তোমাদের শাসকবর্গও দয়ালু ও সুবিচারক হবে। পক্ষান্তরে তোমরা কুকর্মী হলে তোমাদের শাসকবর্গও নিষ্ঠুর ও অত্যাচারী হবে। প্রসিদ্ধ উক্তি اَعْمَالُكُمْ -এর অর্থ তাই।

মিশকাতে উল্লিখিত এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন :

–আল্লাহ বলেন, আমি আল্লাহ। আমাকে ছাড়া অন্য কোনো উপাস্য নেই। আমি সব বাদশহারও প্রভু। সব অন্তর আমার করায়ত্ত। আমার বান্দারা যখন আমার আনুগত্য করে, তখন আমি বাদশাহ ও শাসকদের অন্তরে তাদের প্রতি স্নেহ সৃষ্টি করে দেই। পক্ষান্তরে আমার বান্দারা যখন আমার অবাধ্যতা করে, তখন আমি শাসকদের অন্তরকে তাদের প্রতি কঠোর করে দেই। তারা তাদেরকে সব রকম নির্যাতন করে। তাই শাসকবর্গকে মন্দ বলে নিজের সময় নষ্ট করো না; বরং আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন ও স্বীয় কাজ কর্ম সংশোধন কর– যাতে আমি তোমাদের সব কাজ ঠিক করে দেই।

এমনিভাবে আবূ দাঊদ ও নাসায়ীতে হযরত আয়েয (রা.) বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন :

যখন আল্লাহ তা'আলা কোনো প্রশাসক বা শাসনকর্তার মঙ্গল চান, তখন তাকে উত্তম সহকারী দান করেন, যাতে প্রশাসক কোনো ভুল করে ফেললে সে স্মরণ করিয়ে দেয় এবং সঠিক কাজ করলে সে তার সাহায্য করে। পক্ষান্তরে যখন কোনো প্রশাসক বা শাসনকর্তার জন্য অমঙ্গল অবধারিত হয়, তখন মন্দ লোকদেরকে তার পরামর্শদাতা ও অধীন করে দেওয়া হয়।

এসব হাদীস ও আলোচ্য আয়াতের উল্লিখিত তাফসীরের সারমর্ম এই যে, জনগণ শাসকবর্গের হাতে যেসব কষ্ট ও বিপদাপদ ভোগ করে, তা উপর দিককার আজাব এবং এসব কষ্ট অধীনস্থ কর্মচারীদের দ্বারা ভোগ করতে হয়, সেগুলো নিচের দিককার আজাব। এগুলো কোনো আকস্মিক দুর্ঘটনা নয়; বরং আল্লাহর আইন অনুসারে মানুষের কৃতকর্মের শাস্তি। হযরত সুফিয়ান ছাওরী (র.) বলেন : যখন আমি কোনো গুনাহ করে ফেলি, তখন এর ক্রিয়া স্বীয় চাকর, আরোহণের ঘোড়া ও বোঝা বহনের গাধার মেযাজেও অনুভব করি। এরা সবাই আমার অবাধ্যতা করতে থাকে।

আয়াতে বর্ণিত তৃতীয় প্রকার আজাব হচ্ছে : اَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا অর্থাৎ তোমরা বিভিন্ন দল-উপদলে বিভক্ত হয়ে পরস্পরে মুখোমুখি হয়ে যাবে এবং একদল অন্য দলের জন্য আজাব হয়ে যাবে। এতে يَلْبِسَكُمْ শব্দটি لَبْسٌ ধাতু থেকে উদ্ভূত। এর আসল অর্থ গোপন করা, আবৃত করা। এ অর্থেই لِبَاسٌ ঐ কাপড়কে বলে, যা মানুষের দেহকে আবৃত করে এবং এ কারণেই اِلْتِبَاسٌ সন্দেহ ও অস্পষ্টতা অর্থে ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ যেখানে কোনো বাক্যে উদ্দিষ্ট অর্থ আবৃত ও অস্পষ্ট হয়।

شِيَعٌ শব্দটি شِيْعَةٌ –এর বহুবচন। এর অর্থ অনুযায়ী ও অনুগামী। কুরআনে বলা হয়েছে : وَاِنَّ مِنْ شِيْعَتِهٖ لَاِبْرٰهِيْمَ অর্থাৎ হযরত নূহ (আ.)–এর অনুসারী হলেন হযরত ইবরাহীম (আ.)। সাধারণে প্রচলিত ভাষা ও বাক-পদ্ধতিতে شِيْعَةٌ শব্দটি এমন দলকে বলা হয়, যারা কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যে একত্রিত হয় এবং এ উদ্দেশ্যে একে অন্যের সহায়ক হয়। অধুনা প্রচলিত ভাষায় এর স্বতঃস্ফূর্ত অনুবাদ হচ্ছে দল বা পার্টি।

তাই আয়াতের অনুবাদ এরূপ হবে : এক প্রকার আজাব এই যে, জাতি বিভিন্ন দল-উপদলে বিভিক্ত হয়ে পরস্পরে মুখোমুখি হয়ে যাবে। এ কারণেই আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ মুসলমানদেরকে সম্বোধন করে বললেন : اَلَا لَا تَرْجِعُوْا بَعْدِيْ كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ

অর্থাৎ তোমরা আমার পরে পুনরায় কাফের হয়ে যেয়ো না যে, একে অন্যের গর্দান মারতে শুরু করবে।–[মাযহারী]

হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা.) বলেন : একবার আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ–এর সাথে চলতে চলতে মসজিদে প্রবেশ করে দু'রাকাত নামাজ পড়লাম। অনেকক্ষণ দোয়া করার পর তিনি বললেন, আমি পালনকর্তার কাছে তিনিটি বিষয় প্রার্থনা করেছি : **এক.** আমার উম্মতকে যেন নিমজ্জিত করে ধ্বংস করা না হয়। আল্লাহ তা'আলা এ দোয়া কবুল করেছেন। **দুই.** আমার উম্মতকে যেন দুর্ভিক্ষ ও ক্ষুধা দ্বারা ধ্বংস করা না হয়, আল্লাহ তা'আলা এ দোয়াও কবুল করেছেন। **তিন.** আমার উম্মত যেন পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-কলহে ধ্বংস না হয়। আমাকে শেষ পর্যন্ত এরূপ দোয়া করতে নিষেধ করা হয়েছে।–[মাযহারী]

www.almodina.com

এ বিষয়বস্তু সম্পর্কিত অন্য একটি হাদীস হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত রয়েছে। এতে তিনিটি দোয়ার মধ্যে একটি এই যে, আমার উম্মতের উপর এমন শত্রুকে চাপিয়ে দিবেন না, যে সবাইকে ধ্বংস ও বরবাদ করে দেয়। এ দোয়া কবুল হয়েছে। অপর দোয়া এই যে, তারা যেন পরস্পরে মারমুখী না হয়ে পড়ে। এরূপ দোয়া করতে নিষেধ করা হয়েছে।

এসব হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, উম্মতে মুহাম্মদীর উপর বিগত উম্মতদের ন্যায় আকাশ কিংবা ভূতল থেকে কোনো ব্যাপক আজাব আগমন করবে না; কিন্তু একটি আজাব দুনিয়াতে তাদের উপরও আসতে থাকবে। এ আজাব হচ্ছে পারস্পরিক যুদ্ধ-বিগ্রহ এবং দলীয় সংঘর্ষ। এ জন্যই রাসূলুল্লাহ ﷺ অত্যন্ত জোর সহকারে উম্মতকে বিভিন্ন দলে উপদলে বিভক্ত হয়ে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব কলহ ও যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত হতে নিষেধ করেছেন। তিনি প্রতি ক্ষেত্রেই হুঁশিয়ার করেছেন যে, দুনিয়াতে যদি তোমাদের উপর আল্লাহর শাস্তি নেমে আসে, তবে তা পারস্পরিক যুদ্ধ-বিগ্রহের মাধ্যমেই আসবে।

সূরা হুদের এক আয়াতে এ বিষয় বস্তুটি আরো স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে : وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَّحِمَ رَبُّكَ অর্থাৎ তারা সর্বদা পরস্পরে মতবিরোধই করতে থাকবে, তবে যাদের প্রতি আল্লাহর রহমত রয়েছে, তারা এর ব্যতিক্রম।

এতে বুঝা যায় যে, যারা পরস্পরে (শরিয়তসম্মত কারণ ছাড়া) মতবিরোধ করে, তারা আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত কিংবা দূরবর্তী।

এক আয়াতে বলা হয়েছে : وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَّلَا تَفَرَّقُوا অর্থাৎ তোমরা আল্লাহর রজ্জুকে দলবদ্ধভাবে শক্ত করে ধারণ কর এবং বিভক্ত হয়ে পড়ো না। অন্য এক আয়াতে আছে : وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا অর্থাৎ যারা বিভক্ত হয়ে পড়েছে এবং মতবিরোধ করেছে, তোমরা তাদের মতো হয়ো না।

শব্দ বিশ্লেষণ

يَتَوَفّٰكُمْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব تَفَعُّل মাসদার اَلتَّوَفِّيْ মূলবর্ণ (و . ف . ى) জিনস لفيف مفروق
অর্থ– তিনি তোমাদের মৃত্যু ঘটান।

رُدُّوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى مجهول বাব نَصَرَ মাসদার اَلرَّدُّ মূলবর্ণ (ر . د . د) জিনস مضاعف ثلاثى
অর্থ– তারা প্রত্যাবর্তিত হয়।

مَوْلٰهُمْ : শব্দটি একবচন, বহুবচন مَوَالِىْ অর্থ– প্রতিপালক, প্রভু।

اَسْرَعُ : সীগাহ واحد مذكر, বহছ اسم تفضيل বাব كَرُمَ মাসদার اَلسُّرْعَةُ মূলবর্ণ (س . ر . ع) জিনস صحيح অর্থ– সর্বাপেক্ষা তৎপর, বেজায় দ্রুত।

مُسْتَقَرٌّ : সীগাহ واحد مذكر, বহছ اسم ظرف বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِسْتِقْرَارُ মূলবর্ণ (ق . ر . ر) জিনস مضاعف ثلاثى
অর্থ– সংঘটিত হওয়ার সময়।

www.almodina.com

وَاِذَا رَاَيْتَ الَّذِيْنَ يَخُوْضُوْنَ فِيْۤ اٰيٰتِنَا فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتّٰى يَخُوْضُوْا فِيْ حَدِيْثٍ غَيْرِهٖ ؕ وَاِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطٰنُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرٰى مَعَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ (٦٨)

অনুবাদ : (৬৮) আর যখন তুমি তাদেরকে দেখতে পাও যারা আমার আয়াতে দোষান্বেষণ করে, তখন তাদের থেকে দূরে থাক, যে পর্যন্ত তারা অন্য আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়, আর যদি শয়তান তোমাকে ভুলিয়ে দেয়, তবে স্মরণ হওয়ার পর পুনরায় এমন অনাচারীদের সঙ্গে বসো না।

وَمَا عَلَى الَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ وَّلٰكِنْ ذِكْرٰى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ (٦٩)

(৬৯) আর যারা মুত্তাকী তাদের উপর তাদের হিসাবের কোনো প্রতিক্রিয়া হবে না, কিন্তু যাদের দায়িত্ব হলো সদুপদেশ দেওয়া, হয়তো তারাও সংযমী হবে।

وَذَرِ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا دِيْنَهُمْ لَعِبًا وَّلَهْوًا وَّغَرَّتْهُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهٖۤ اَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌۢ بِمَا كَسَبَتْ ۖ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلِيٌّ وَّلَا شَفِيْعٌ ۚ وَاِنْ تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَّا يُؤْخَذْ مِنْهَا ؕ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اُبْسِلُوْا بِمَا كَسَبُوْا ۚ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيْمٍ وَّعَذَابٌ اَلِيْمٌۢ بِمَا كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ (٧٠)

(৭০) আর এরূপ লোকদের হতে সম্পূর্ণ দূরে থাক, যারা নিজেদের ধর্মকে খেল ও তামাশা বানিয়ে রেখেছে, অথচ পার্থিব জীবনই তাদেরকে ধোঁকায় ফেলে রেখেছে, আর এই কুরআন দ্বারা উপদেশও প্রদান করতে থাক, যেন কেউ স্বীয় কৃতকর্মের দরুন [আজাবে] এমনিভাবে জড়িত হয়ে না পড়ে যে, না কোনো গায়রুল্লাহ তার সাহায্যকারী হবে আর না সুপারিশকারী হবে, আর অবস্থা এরূপ হবে– যদি সে বিশ্বের সকল বিনিময়ও প্রদান করে তথাপি তার নিকট হতে তা গ্রহণ করা হবে না, তারা এরূপ যে, স্বীয় কৃতকর্মের দরুন [আজাবে] লিপ্ত হয়ে পড়েছে, তাদের পান করার জন্য অতি উত্তপ্ত পানি থাকবে ও যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি হবে, স্বীয় কুফরের দরুন।

ع ٨

শাব্দিক অনুবাদ

(৬৮) وَاِذَا رَاَيْتَ আর যখন তুমি তাদেরকে দেখত পাও الَّذِيْنَ يَخُوْضُوْنَ فِيْۤ اٰيٰتِنَا যারা আমার আয়াতে দোষান্বেষণ করে فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ তখন তাদের থেকে দূরে থাক حَتّٰى يَخُوْضُوْا فِيْ حَدِيْثٍ غَيْرِهٖ যে পর্যন্ত তারা অন্য আলোচনায় প্রবৃত্ত হয় وَاِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطٰنُ আর যদি শয়তান তোমাকে ভুলিয়ে দেয় فَلَا تَقْعُدْ তবে বসো না بَعْدَ الذِّكْرٰى স্মরণ হওয়ার পর مَعَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ পুনরায় এমন অনাচারীদের সঙ্গে।

(৬৯) وَمَا عَلَى الَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ আর যারা মুত্তাকী তাদের উপর হবে না مِنْ حِسَابِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ তাদের হিসাবের কোনো প্রতিক্রিয়া وَّلٰكِنْ ذِكْرٰى কিন্তু যাদের দায়িত্ব হলো সদুপদেশ দেওয়া لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ হয়তো তারাও সংযমী হবে।

(৭০) وَذَرِ আর এরূপ লোকদের হতে সম্পূর্ণ দূরে থাক الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا যারা বানিয়ে রেখেছে دِيْنَهُمْ নিজেদের ধর্মকে لَعِبًا وَّلَهْوًا খেল ও তামাশা وَّغَرَّتْهُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا অথচ পার্থিব জীবনই তাদেরকে ধোঁকায় ফেলে রেখেছে وَذَكِّرْ بِهٖ আর এই কুরআন দ্বারা উপদেশও প্রদান করতে থাক اَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ যেন কেউ এমনিভাবে জড়িত হয়ে না পড়ে যে بِمَا كَسَبَتْ স্বীয় কৃতকর্মের দরুন [আজাবে] لَيْسَ لَهَا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلِيٌّ না কোনো গায়রুল্লাহ তার সাহায্যকারী হবে وَّلَا شَفِيْعٌ আর না সুফারিশকারী হবে وَاِنْ تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ আর অবস্থা এরূপ হবে– যদি সে বিশ্বের সকল বিনিময়ও প্রদান করে لَّا يُؤْخَذْ مِنْهَا তথাপি. তার নিকট হতে তা গ্রহণ করা হবে না اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اُبْسِلُوْا بِمَا كَسَبُوْا তারা এরূপ যে, স্বীয় কৃতকর্মের দরুন [আজাবে] লিপ্ত হয়ে পড়েছে لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيْمٍ তাদের পান করার জন্য অতি উত্তপ্ত পানি থাকবে وَّعَذَابٌ اَلِيْمٌ ও যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি হবে بِمَا كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ স্বীয় কুফরের দরুন।

قُلْ اَنَدْعُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلٰۤى اَعْقَابِنَا بَعْدَ اِذْ هَدٰىنَا اللّٰهُ كَالَّذِى اسْتَهْوَتْهُ الشَّيٰطِيْنُ فِى الْاَرْضِ حَيْرَانَ ۪ لَهٗۤ اَصْحٰبٌ يَّدْعُوْنَهٗۤ اِلَى الْهُدَى ائْتِنَا ؕ قُلْ اِنَّ هُدَى اللّٰهِ هُوَ الْهُدٰى ؕ وَاُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ (٧١)

অনুবাদ : (৭১) আপনি বলে দিন, আমি কি আল্লাহকে ছেড়ে এমন বস্তুর ইবাদত করব- যে আমাদের উপকার করতে পারে না এবং আমাদের অপকারও করতে পারে না, আর আমরা কি বিপরীত দিকে ফিরে যাব, আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে হেদায়েত করার পর? ঐ ব্যক্তির ন্যায় শয়তানরা যাকে প্রান্তরে পথহারা করে দেয়, আর সে দিশেহারা অবস্থায় ঘুরতে থাকে, [অথচ] তার কতিপয় সঙ্গীও ছিল যারা সঠিক পথের দিকে আহ্বান করতেছে যে, আমাদের দিকে আস, আপনি বলে দিন নিশ্চয় প্রকৃত সরল পথ শুধু আল্লাহরই পথ, আর আমরা আদিষ্ট হয়েছি যে, আমরা বিশ্বপালকের পূর্ণ অনুগত হই

وَاَنْ اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاتَّقُوْهُ ؕ وَهُوَ الَّذِىْۤ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ (٧٢)

(৭২) আর তাও যে, নামাজের পাবন্দি কর, এবং তাঁকে ভয় কর, আর তিনিই [আল্লাহ] যাঁর সমীপে তোমাদের সকলকে একত্র করা হবে।

وَهُوَ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ ؕ وَيَوْمَ يَقُوْلُ كُنْ فَيَكُوْنُ ؕ قَوْلُهُ الْحَقُّ ؕ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِى الصُّوْرِ ؕ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ؕ وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْخَبِيْرُ (٧٣)

(৭৩) আর তিনিই [সেই আল্লাহ] যিনি আসমানসমূহ এবং জমিনকে উপকারার্থে সৃষ্টি করেছেন, আর যেদিন আল্লাহ এতটুকু বলবেন যে, হয়ে যাও। তাঁর কথা সত্য যেদিন শিঙ্গায় ফুঁৎকার করা হবে, সেদিন তাঁরই আধিপত্য হবে তিনি অদৃশ্য বিষয়ে এবং প্রত্যক্ষ বিষয়ে জ্ঞাত, তিনিই প্রজ্ঞাময় সর্বজ্ঞ।

শাব্দিক অনুবাদ

(৭১) قُلْ আপনি বলে দিন اَنَدْعُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ আমি কি আল্লাহকে ছেড়ে এমন বস্তুর ইবাদত করব- مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا যে আমাদের উপকার করতে পারে না এবং আমাদের অপকারও করতে পারে না وَنُرَدُّ عَلٰۤى اَعْقَابِنَا আর আমরা কি বিপরীত দিকে ফিরে যাব بَعْدَ اِذْ هَدٰىنَا اللّٰهُ আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে হেদায়েত করার পর كَالَّذِى اسْتَهْوَتْهُ الشَّيٰطِيْنُ ঐ ব্যক্তির ন্যায় শয়তানরা যাকে প্রান্তরে পথহারা করে দেয় فِى الْاَرْضِ حَيْرَانَ আর সে দিশেহারা অবস্থায় ঘুরতে থাকে لَهٗۤ اَصْحٰبٌ [অথচ] তার কতিপয় সঙ্গীও ছিল يَّدْعُوْنَهٗۤ যারা আহ্বান করছে যে اِلَى الْهُدَى সঠিক পথের দিকে ائْتِنَا আমাদের দিকে আস قُلْ আপনি বলে দিন اِنَّ هُدَى اللّٰهِ هُوَ الْهُدٰى নিশ্চয় প্রকৃত সরল পথ শুধু আল্লাহরই পথ وَاُمِرْنَا আর আমরা আদিষ্ট হয়েছি যে لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ আমরা বিশ্বপালকের পূর্ণ অনুগত হই।

(৭২) وَاَنْ اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ আর তাও যে, নামাজের পাবন্দি কর وَاتَّقُوْهُ এবং তাঁকে ভয় কর وَهُوَ الَّذِىْۤ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ আর তিনিই [আল্লাহ] যাঁর সমীপে তোমাদের সকলকে একত্র করা হবে।

(৭৩) وَهُوَ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ আর তিনিই [সেই আল্লাহ] যিনি আসমানসমূহ এবং জমিনকে সৃষ্টি করেছেন بِالْحَقِّ উপকারার্থে وَيَوْمَ يَقُوْلُ আর যেদিন আল্লাহ এতটুকু বলবেন যে كُنْ হয়ে যাও فَيَكُوْنُ অমনি তা হয়ে যাবে। قَوْلُهُ الْحَقُّ তাঁর বাণী সত্যিই وَلَهُ الْمُلْكُ সর্বময় কর্তৃত্ব একমাত্র তাঁরই হবে يَوْمَ يُنْفَخُ فِى الصُّوْرِ আর যে দিন সিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া হবে عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ এবং তিনি গোপন ও প্রকাশ্য বিষয়সমূহ পরিজ্ঞাত وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْخَبِيْرُ এবং তিনিই অতীব প্রজ্ঞাময় সর্ববিদিত

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(৬৮) وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِيْنَ يَخُوْضُوْنَ فِيْ اٰيٰتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ الخ **আয়াতের শানে নুযূল– ১ :** ইবনে জারীর, ইবনে মুনযির ও আবুশ শায়খ প্রমুখ ইবনে জুরাইজ হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, মুশরিকরা রাসূল ﷺ-এর নিকট বসে রাসূল ﷺ যা বলেন, তা শুনতে আগ্রহ প্রকাশ করত। অতঃপর যখন তারা কিছু শুনে নিত, তখন তা নিয়ে বিদ্রূপ করত, সে সকল প্রবৃত্তি পূজারীদের সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়েছে। –[দুররে মানসূর ২১/৩]

শানে নুযূল– ২ : আবুশ শায়খ হযরত সাঈদ বিন জুবাইর (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন যে, তিনি বলেছেন, মুসলমানরা যখন হিজরত করে মদিনায় চলে যান, তখন মক্কার মুশরিকদের ন্যায় মুনাফিকরাও তাদের সাথে বসত এবং যখন কুরআন থেকে কিছু শুনত তা নিয়ে তারা বিদ্রূপ ও উপহাস করত। সে পরিপ্রেক্ষিতে আবারও আলোচ্য আয়াত নাজিল হয় –[দুররে মানসূর ২১/৩]

(৭১) قوله قُلْ اَنَدْعُوْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا الخ **আয়াতের শানে নুযূল– ১ :** ইবনে জারীর, ইবনে হাতেম ও আবুশ শায়খ প্রমুখ আল্লামা সুদ্দী (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে , মুশরিকরা মুমিনদেরকে বলতো যে, তোমরা আমাদের পথ ও পদাঙ্ক অনুসরণ কর। মুহাম্মদের ধর্ম ছেড়ে দাও। মুশরিকদের এ প্ররোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

শানে নুযূল– ২ : কারো মতে আলোচ্য আয়াত হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-এর পুত্র আব্দুর রহমান তাঁকে মূর্তি পূজা করার দিকে আহ্বান করেছিলেন। সে পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়। –[রূহুল মা'আনী–১৮৮/৪/৭]

বাতেল পন্থিদের সংস্পর্শ থেকে দূরে থাকার নির্দেশ : উল্লিখিত আয়াতসমূহে মুসলমানদেরকে একটি গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, যে কাজ নিজে করা গুনাহ, সেই কাজ যারা করে, তাদের মজলিসে যোগদান করাও গুনাহ। এ থেকে বেঁচে থাকা উচিত। এর বিবরণ এরূপ :

প্রথম আয়াতে يَخُوْضُوْنَ শব্দটি خَوْضٌ থেকে উদ্ভূত। এর আসল অর্থ– পানিতে অবতরণ করা ও পানিতে চলা। বাজে অনর্থক কাজে প্রবেশ করাকেও خَوْضٌ বলা হয়। কুরআন পাকে এ শব্দটি সাধারণতঃ এ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। وَكُنَّا نَخُوْضُ مَعَ الْخَائِضِيْنَ এবং فِيْ خَوْضِهِمْ يَلْعَبُوْنَ ইত্যাদি আয়াত এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়।

তাই خَوْضٌ فِى الْاٰيَاتِ–এর অনুবাদ এ স্থলে 'দোষান্বেষণ' (অর্থাৎ দোষ খোঁজাখুঁজি) কিংবা 'কলহ' করা হয়েছে। অর্থাৎ, আপনি যখন তাদেরকে দেখেন, যারা আল্লাহ তা'আলার নিদর্শনাবলিতে শুধু ক্রীড়া-কৌতুক ও ঠাট্টা-বিদ্রূপের জন্য প্রবেশ করে এবং–দোষান্বেষণ করে, তখন আপনি তাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন।

এ আয়াতে প্রত্যেক সম্বোধনযোগ্য ব্যক্তিকে সম্বোধন করা হয়েছে। নবী করীম ﷺ ও এর অন্তর্ভুক্ত আছেন এবং উম্মতের ব্যক্তিবর্গও। প্রকৃতপক্ষে রাসূলুল্লাহ ﷺ–কে সম্বোধন করাও সাধারণ মুসলমানদেরকে শুনানোর জন্য। নতুবা তিনি এর আগেও কখনো এরূপ মজলিসে যোগদান করেননি। কাজেই কোনো নিষেধাজ্ঞার প্রয়োজন ছিল না। অতঃপর মিথ্যাপন্থিদের মজলিস থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া কয়েক প্রকারে হতে পারে : **এক.** মজলিস ত্যাগ করা, **দুই.** সেখানে থেকেও অন্য কাজে প্রবৃত্ত হওয়া– তাদের দিকে ভ্রুক্ষেপ না করা। কিন্তু আয়াতের শেষে যা বলা হয়েছে তাতে, প্রথম প্রকারই বুঝানো হয়েছে, অর্থাৎ মজলিসে বসা যাবে না, সেখান থেকে উঠে যেতে হবে।

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে : যদি শয়তান তোমাকে বিস্মৃত করিয়ে দেয় অর্থাৎ ভুলক্রমে তাদের মজলিসে যোগদান করে ফেল– নিষেধাজ্ঞা স্মরণ না থাকার কারণে হোক কিংবা তারা যে স্বীয় মজলিসে আল্লাহর আয়াত ও রাসূলের বিপক্ষে আলোচনা করে, তা তোমার স্মরণ ছিল না, তাই যোগদান করেছ। উভয় অবস্থাতে যখনই স্মরণ হয় তখনই মজলিস ত্যাগ করা উচিত। স্মরণ হওয়ার পর সেখানে বসে থাকা গুনাহ। অন্য এক আয়াতেও এ বিষয়বস্তু বর্ণিত হয়েছে এবং শেষ ভাগে বলা হয়েছে যে, যদি তুমি সেখানে বসে থাক, তবে তুমিও তাদের মধ্যে গণ্য হবে।

ইমাম রাযী (র.) তাফসীরে কাবীরে বলেন : এ আয়াতের আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে গুনাহর মজলিস ও মজলিসের লোকদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া। এর উত্তম পন্থা হচ্ছে মজলিস ত্যাগ করে চলে যাওয়া। কিন্তু মজলিস ত্যাগ করার মধ্যে যদি জান, মাল কিংবা ইজ্জতের ক্ষতির আশঙ্কা থাকে, তবে সর্বসাধারণের পক্ষে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার অন্য পন্থা অবলম্বন করাও জায়েজ। উদাহরণতঃ অন্য কাজে ব্যাপৃত হওয়া এবং তাদের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করা। কিন্তু বিশিষ্ট লোক ধর্মীয় ক্ষেত্রে যাদের অনুকরণ করা হয়– তাদের পক্ষে সর্বাবস্থায় সেখান থেকে উঠে যাওয়াই সমীচীন।

এরপর বলা হয়েছে : وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ অর্থাৎ যদি শয়তান তোমাকে বিস্মৃত করিয়ে দেয়। এখানে সাধারণ মুসলমানের প্রতি সম্বোধন হয়ে থাকলে তাতে কোনো আপত্তির বিষয় নেই। কেননা ভুল করা ও বিস্মৃত হওয়া প্রত্যেক মানুষের মুদ্রাদোষ। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি যদি সম্বোধন হয়ে থাকে, তবে প্রশ্ন দেখা দেয় যে, আল্লাহর রাসূলও যদি ভুল করেন এবং বিস্মৃত হন, তবে তাঁর শিক্ষার প্রতি আস্থা কিরূপে থাকতে পারে?

উত্তর এই যে, বিশেষ কোনো রহস্য ও উপযোগিতার অধীনে নবীগণও (আ.) ভুল করতে পারেন, কিন্তু আল্লাহর পক্ষ থেকে অনতিবিলম্বে ওহীর মাধ্যমে তাঁদের ভুল সংশোধন করে দেওয়া হতো। ফলে তাঁরা ভুলের উপর কায়েম থাকতেন না; তাই পরিণামে তাঁদের শিক্ষা ভুলভ্রান্তি ও বিস্মৃতির সন্দেহ থেকে মুক্ত হয়ে যায়।

মোটকথা আয়াতের এ বাক্য থেকে জানা গেল যে, কেউ ভুলক্রমে কোনো ভ্রান্ত কাজে জড়িত হয়ে পড়লে তা মাফ করা হবে। এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ অর্থাৎ আমার উম্মতকে ভুলভ্রান্তি ও বিস্মৃতির গুনাহ এবং যে কাজ অপরে জোরজবরদস্তির সাথে করায়, সেই কাজের গুনাহ থেকে অব্যাহতি দান করা হয়েছে।

ইমাম জাসসাস আহকামুল কুরআনে বলেন : 'আলোচ্য আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, যে মজলিসে আল্লাহ, আল্লাহর রাসূল কিংবা শরিয়তের বিপক্ষে কথাবার্তা হয় এবং তা বন্ধ করা, করানো কিংবা কমপক্ষে সত্য প্রকাশ করার সাধ্য না থাকে, তবে এরূপ মজলিসে যোগদান করলে এবং হক কথা প্রকাশ করলে তাতে কোনো দোষ নেই।" আয়াতের শেষে বলা হয়েছে : স্মরণ হওয়ার পর অত্যাচারী সম্প্রদায়ের সাথে উপবেশন করো না। এ থেকে ইমাম জাসসাস মাসআলা চয়ন করেছেন যে, এরূপ অত্যাচারী, অধার্মিক ও উদ্ধত লোকদের মজলিসে যোগদান করা সর্বাবস্থায় গুনাহ, তারা তখন কোনো অবৈধ আলোচনায় লিপ্ত হোক বা না হোক। কারণ বাজে আলোচনা শুরু করতে তাদের দেরি লাগে না। কেননা আয়াতে সর্বাবস্থায় জালেমদের সাথে বসতে নিষেধ করা হয়েছে। তারা তখনো জুলুমে ব্যাপৃত থাকবে এরূপ কোনো শর্ত আয়াতে নেই।

কুরআন পাকের অন্য আয়াতেও এ বিষয়টি পরিষ্কারভাবে বর্ণিত হয়েছে : وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ অর্থাৎ অত্যাচারীদের সাথে মেলামেশা ও উঠাবসা করো না। নতুবা তোমাদেরকেও জাহান্নামের অগ্নি স্পর্শ করবে।

আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হলে সাহাবায়ে কেরাম (রা.) আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যদি সর্বাবস্থায় তাদের মজলিসে যাওয়ার নিষেধাজ্ঞা বহাল থাকে, তবে আমরা মসজিদে হারামে নামাজ ও তওয়াফ থেকেও বঞ্চিত হয়ে যাব। কেননা তারা সর্বদাই সেখানে বসে থাকে। এটি মক্কাবিজয়ের পূর্ববর্তী ঘটনা এবং ছিদ্রান্বেষণ ও কুভাষণ ছাড়া তাদের আর কোনো কাজ নেই। এই পরিপ্রেক্ষিতে পরবর্তী দ্বিতীয় আয়াত অবতীর্ণ হয় : وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَٰكِنْ ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ অর্থাৎ যারা সংযমী, তারা নিজের কাজে মসজিদে হারামে গেলে দুষ্ট লোকদের কুকর্মের কোনো দায়-দায়িত্ব তাদের উপর বর্তাবে না। তবে তাদের কর্তব্য শুধু হক কথা বলে দেওয়া। সম্ভবতঃ দুষ্টেরা এতে উপদেশ গ্রহণ করে বিশুদ্ধ পথ অনুসরণ করবে।

তৃতীয় আয়াতেও প্রায় একই বিষয়বস্তুর উপর আরো জোর দিয়ে বলা হয়েছে : وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا এখানে ذر শব্দটি وذر থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ অসন্তুষ্ট হয়ে কোনো কিছু পরিত্যাগ করা। আয়াতের অর্থ এই : আপনি তাদেরকে পরিত্যাগ করুন, যারা স্বীয় ধর্মকে ক্রীড়া কৌতুক করে রেখেছে। এর দুটি অর্থ হতে পারে। এক. তাদের জন্য সত্য ধর্ম ইসলাম প্রেরিত হয়েছে; কিন্তু একে তারা ক্রীড়া ও কৌতুকের বস্তুতে পরিণত করেছে এবং একে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে। দুই. তারা আসল ধর্ম পরিত্যাগ করে ক্রীড়া ও কৌতুককেই ধর্ম হিসেবে গ্রহণ করেছে। উভয় অর্থেরই সারমর্ম প্রায় এক।

এরপর বলা হয়েছে : وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا অর্থাৎ দুনিয়াতে ক্ষণস্থায়ী জীবন তাদেরকে ধোঁকায় ফেলে রেখেছে। এটিই তাদের ব্যাধির আসল কারণ। অর্থাৎ তাদের যাবতীয় লম্ফঝম্ফ ও ঔদ্ধত্যের আসল কারণই হচ্ছে এই যে, তারা ইহকালের ক্ষণস্থায়ী জীবন দ্বারা প্রলোভিত এবং পরকাল বিস্মৃত। পরকাল ও কিয়ামতের বিশ্বাস থাকলে তারা কখনো এসব কাজ করত না।

এ আয়াতে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাধারণ মুসলমানদেরকে দুটি নির্দেশ দেওয়া হয়েছে: এক. উল্লিখিত বাক্যে বর্ণিত লোকদের কাছ থেকে দূরে সরে থাকা এবং মুখ ফিরিয়ে নেওয়াই যথেষ্ট নয়; বরং ধনাত্মকভাবে তাদেরকে কুরআন দ্বারা উপদেশ দান করা এবং আল্লাহ তা'আলার আজাবের ভয় প্রদর্শন করাও জরুরি।

আয়াতের শেষে আজাবের বিবরণ দিয়ে বলা হয়েছে যে, তাদের এ অবস্থা অব্যাহত থাকলে তারা স্বয়ং কুকর্মের জালে আবদ্ধ হয়ে যাবে। আয়াতে أَنْ تُبْسَلَ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর অর্থ আবদ্ধ হয়ে যাওয়া এবং জড়িত হয়ে পড়া।

কোনো ভুল কিংবা কারো প্রতি অত্যাচার করে বসলে তার সম্ভাব্য শাস্তির কবল থেকে আত্মরক্ষার জন্য মানুষ দুনিয়াতে তিন প্রকার উপায় অবলম্বন করতে অভ্যস্ত। স্বীয় দলবল ব্যবহার করে অত্যাচারের প্রতিশোধ থেকে রেহাই পাওয়ার চেষ্টা করে। এতে ব্যর্থ হলে প্রভাবশালীদের সুপারিশ কাজে লাগায়। এতেও উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হলে শাস্তির কবল থেকে আত্মরক্ষার জন্য অর্থ-সম্পদ ব্যয় করার চেষ্টা করে।

আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াতে বলেছেন যে, আল্লাহ অপরাধীকে যখন শাস্তি দিবেন, তখন সে শাস্তির কবল থেকে উদ্ধার করার জন্য কোনো আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধব এগিয়ে আসবে না, আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কারো সুপারিশ কার্যকর হবে না এবং কোনো অর্থ-সম্পদ গ্রহণ করা হবে না। যদি কেউ সারা বিশ্বের অর্থ-সম্পদের অধিকারী হয় এবং শাস্তির কবল থেকে আত্মরক্ষার জন্য তা বিনিময় স্বরূপ দিতে চায়, তবুও এ বিনিময় গ্রহণ করা হবে না।

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে : أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا ۖ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ

অর্থাৎ এরা ঐসব লোক, যাদেরকে কুকর্মের শাস্তিতে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাদেরকে জাহান্নামের ফুটন্ত পানি পান করার জন্য দেওয়া হবে। অন্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, এ পানি তাদের নাড়িভূঁড়িকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে দিবে। এ পানি ছাড়াও অন্যান্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি হবে, তাদের কুফর ও অবিশ্বাসের কারণে।

এ শেষ আয়াত দ্বারা আরো জানা গেল যে, যারা পরকালের প্রতি অমনোযোগী হয়ে শুধু পার্থিব জীবন নিয়ে মগ্ন, তাদের সংসর্গও অপরের জন্য মারাত্মক। তাদের সংসর্গে উঠা-বসাকারীরাও পরিণামে তাদের অনুরূপ আজাবে পতিত হবে।

উল্লিখিত আয়াত তিনটির সারমর্ম মুসলমানদেরকে অশুভ পরিবেশ ও খারাপ সংসর্গ থেকে বাঁচিয়ে রাখা। এটি যে কোনো মানুষের জন্যেই বিষতুল্য। কুরআন ও হাদীসের অসংখ্য উক্তি ছাড়াও চাক্ষুস অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দেয় যে, অসৎ সমাজ ও মন্দ পরিবেশই মানুষকে কুকর্ম ও অপরাধে লিপ্ত করে। এ পরিবেশে জড়িয়ে পড়ার পর মানুষ প্রথমত বিবেক ও মনের বিরুদ্ধে কুকর্মে লিপ্ত হয়। এরপর আস্তে আস্তে কুকর্ম যখন অভ্যাসে পরিণত হয়, তখন মন্দের অনুভূতিও লোপ পায়; বরং মন্দকে ভালো এবং ভালোকে মন্দ মনে করতে থাকে। যেমন, এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : যখন কোনো ব্যক্তি প্রথমবার গুনাহ করে, তখন তার মানসপটে একটি কালো দাগ পড়ে। সাদা কাপড়ে কালো দাগ যেমন প্রত্যেকের কাছেই অপ্রীতিকর ঠেকে, তেমনি সে-ও গুনাহের কারণে অন্তরে অস্বস্তি অনুভব করে। কিন্তু যখন অব্যাহতভাবে দ্বিতীয় ও তৃতীয় গুনাহ করে চলে এবং অতীত গুনাহের জন্য তওবা করে না, তখন একের পর এক কালো দাগ পড়তে থাকে, এমনকি নুরোজ্জ্বল মানসপট সম্পূর্ণ কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে। এর ফলশ্রুতিতে ভালো মন্দের পার্থক্য থাকে না। কুরআন পাকে ران শব্দ দ্বারা এ অবস্থাকে ব্যক্ত করা হয়েছে : كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ অর্থাৎ কুকর্মের কারণ তাদের অন্তরে মরচে পড়ে গেছে। ফলে ভালো মন্দ পার্থক্য করার যোগ্যতাই লোপ পেয়েছে।

চিন্তা করলে বুঝা যায়, অধিকাংশ ভ্রান্ত পরিবেশ ও অসৎ সঙ্গই মানুষকে এ অবস্থায় পৌঁছায়। نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْهُمْ এ কারণেই অভিভাকদের কর্তব্য ছেলেদেরকে এ ধরনের পরিবেশ থেকে বাঁচিয়ে রাখতে আপ্রাণ চেষ্টা করা।

পরবর্তী তিন আয়াতেও শিরকের খণ্ডন এবং একত্ববাদ ও পরকাল সপ্রমাণের বিষয়বস্তু বর্ণিত হয়েছে, যা অনুবাদ থেকেই বুঝা যায়।

শব্দ বিশ্লেষণ

يَخُوْضُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْخَوْضُ মূলবর্ণ (خ . و . ض) জিনস اجوف واوى অর্থ– তারা আলোচনা মগ্ন না হয়, তারা প্রবৃত্ত না হয়।

لَاتَقْعُدْ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ نهى حاضر معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْقُعُوْدُ মূলবর্ণ (ق . ع . د) জিনস صحيح অর্থ– তুমি উপবিষ্ট হয়ো না। তুমি বসো না।

ذَرِ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব سَمِعَ মাসদার اَلْوَذْرُ মূলবর্ণ (و . ذ . ر) জিনস مثال واوى অর্থ– তুমি পরিত্যাগ কর।

تُبْسَلَ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ مضارع مجهول বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِبْسَالُ মূলবর্ণ (ب . س . ل) জিনস صحيح অর্থ– কেউ যেন (আজাবে) গ্রেফতার না হয়ে যায়।

شَرَابٌ : শব্দটি একবচন, বহুবচনে اَشْرِبَةٌ অর্থ– পানীয়, শরবত।

حَمِيْمٌ : সীগাহ واحد مذكر বহছ صفت مشبهة বাব نَصَرَ মাসদার اَلْحَمُّ মূলবর্ণ (ح . م . م) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– উত্তপ্ত পানি, গরম পানি, অত্যুষ্ণ পানীয়, ঘাম।

نُرَدُّ : সীগাহ جمع متكلم বহছ مضارع مجهول বাব نَصَرَ মাসদার اَلرَّدُّ মূলবর্ণ (ر . د . د) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– আমরা ফিরে যাব, আমরা পূর্বাবস্থায় ফিরে যাব।

حَيْرَانَ : শব্দটি একবচন, বহুবচন حَيَارٰى অর্থ– দিশেহারা, হয়রান।

অনুবাদ	আয়াত
অনুবাদ : (৭৪) আর সেই সময়টুকুও স্মরণীয় যখন ইবরাহীম স্বীয় পিতা আযরকে বললেন, তুমি কি মূর্তিগুলোকে মা'বূদ সাব্যস্ত করছ? নিশ্চয় আমি তোমাকে ও তোমার গোটা সম্প্রদায়কে স্পষ্ট ভ্রান্তির মধ্যে দেখছি।	وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً ۖ إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (٧٤)
(৭৫) আর আমি এরূপেই ইবরাহীমকে আসমানসমূহ ও জমিনের সৃষ্টিসমূহ প্রদর্শন করেছি, যেন তিনি আরেফ হন, আর যেন পূর্ণ প্রত্যয়শীলদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যান।	وَكَذَٰلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ (٧٥)
(৭৬) অতঃপর যখন রাত্রের অন্ধকার তাঁকে আচ্ছন্ন করে ফেলল, তখন তিনি একটি তারকা দেখতে পেলেন, বললেন, [তোমাদের মতে] তা আমার প্রতিপালক, অনন্তর যখন তা অস্তমিত হলো, তখন তিনি বললেন, আমি অস্তগামীদেরকে ভালোবাসি না।	فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا ۖ قَالَ هَٰذَا رَبِّي ۖ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ (٧٦)
(৭৭) অতঃপর যখন দেখলেন চন্দ্রকে দীপ্যমান, তখন বললেন, তা আমার প্রতিপালক, অনন্তর যখন তা অস্তমিত হলো, তখন তিনি বললেন, যদি আমাকে আমার প্রতিপালক পথপ্রদর্শন করতে না থাকেন, তাহলে আমিও পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।	فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي ۖ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِنْ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ (٧٧)

শাব্দিক অনুবাদ

(৭৪) وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ আর সেই সময়টুকুও স্মরণীয় যখন ইবরাহীম স্বীয় পিতা আযরকে বললেন أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً তুমি কি মূর্তিগুলোকে মা'বূদ সাব্যস্ত করছ? إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ নিশ্চয় আমি তোমাকে ও তোমার গোটা সম্প্রদায়কে দেখছি فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ স্পষ্ট ভ্রান্তির মধ্যে।

(৭৫) وَكَذَٰلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ আর আমি এরূপেই ইবরাহীমকে প্রদর্শন করেছি مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ আসমানসমূহ ও জমিনের সৃষ্টিসমূহ যেন তিনি আরেফ হন وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ আর যেন পূর্ণ প্রত্যয়শীলদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যান।

(৭৬) فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ অতঃপর যখন রাত্রের অন্ধকার তাঁকে আচ্ছন্ন করে ফেলল رَأَىٰ كَوْكَبًا তখন তিনি একটি তারকা দেখতে পেলেন قَالَ বললেন هَٰذَا رَبِّي এটা আমার প্রতিপালক فَلَمَّا أَفَلَ অনন্তর যখন তা অস্তমিত হলো قَالَ তখন তিনি বললেন لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ আমি অস্তগামীদেরকে ভালোবাসি না।

(৭৭) فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا অতঃপর যখন দেখলেন চন্দ্রকে দীপ্যমান قَالَ هَٰذَا رَبِّي তখন বললেন, তা আমার প্রতিপালক فَلَمَّا أَفَلَ অনন্তর যখন তা অস্তমিত হলো قَالَ তখন তিনি বললেন لَئِنْ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي যদি আমাকে আমার প্রতিপালক পথপ্রদর্শন করতে না থাকেন لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ তাহলে আমিও পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব।

www.almodina.com

فَلَمَّا رَاَ الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هٰذَا رَبِّىْ هٰذَآ اَكْبَرُ ۚ فَلَمَّآ اَفَلَتْ قَالَ يٰقَوْمِ اِنِّىْ بَرِىْٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ (٧٨)

অনুবাদ : (৭৮) অতঃপর যখন সূর্যকে দেখলেন প্রদীপ্ত অবস্থায়, বললেন, এটা আমার প্রতিপালক, এটা সর্বাপেক্ষা বৃহৎ অনন্তর যখন এটা অস্তমিত হলো, তিনি বললেন, হে আমার সম্প্রদায়! নিশ্চয় আমি তোমাদের অংশীবাদের প্রতি অসন্তুষ্ট।

اِنِّىْ وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِىْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ حَنِيْفًا وَّمَآ اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ (٧٩)

(৭৯) আমি একাগ্রতার সাথে স্বীয় মুখমণ্ডল তাঁর দিকে ফিরাচ্ছি, যিনি আসমানসমূহ ও জমিনকে সৃষ্টি করেছেন, এবং আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই।

وَحَآجَّهٗ قَوْمُهٗ ؕ قَالَ اَتُحَآجُّوْٓنِّىْ فِى اللّٰهِ وَقَدْ هَدٰىنِ ؕ وَلَآ اَخَافُ مَا تُشْرِكُوْنَ بِهٖٓ اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ رَبِّىْ شَيْـًٔا ؕ وَسِعَ رَبِّىْ كُلَّ شَىْءٍ عِلْمًا ؕ اَفَلَا تَتَذَكَّرُوْنَ (٨٠)

(৮০) আর তার সম্প্রদায় তাঁর সাথে তর্ক জুড়ে দিল, তিনি বললেন, তোমরা কি আল্লাহ সম্বন্ধে আমার সাথে তর্ক করছ? অথচ তিনি আমাকে পথ দেখিয়েছেন, আর তোমরা আল্লাহর সাথে যেগুলোকে শরিক স্থির করছ, আমি সেগুলোকে ভয় করি না, হ্যাঁ, তবে যদি আমার প্রতিপালকই কোনো কিছু ইচ্ছা করেন, আমার পরওয়ারদেগার প্রত্যেক বস্তুকে স্বীয় জ্ঞানের মধ্যে বেষ্টন করে আছেন তবুও কি তোমরা খেয়াল কর না?

وَكَيْفَ اَخَافُ مَآ اَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُوْنَ اَنَّكُمْ اَشْرَكْتُمْ بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهٖ عَلَيْكُمْ سُلْطٰنًا ؕ فَاَىُّ الْفَرِيْقَيْنِ اَحَقُّ بِالْاَمْنِ ۚ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ (٨١)

(৮১) আর আমি এগুলোকে ভয় করব, যেগুলোকে তোমরা শরিক সাব্যস্ত করেছ, অথচ এ বিষয়ে কোনো ভয় করছ না যে, আল্লাহর সাথে এমন বস্তুকে শরিক করেছ যেগুলো সম্বন্ধে তিনি তোমাদের প্রতি কোনো প্রমাণ অবতারণ করেননি। সুতরাং এতদুভয় দলের মধ্যে নিরাপত্তার অধিকতর হকদার কারা? যদি তোমরা খবর রাখ।

শাব্দিক অনুবাদ

(৭৮) فَلَمَّا رَاَى الشَّمْسَ بَازِغَةً অতঃপর যখন সূর্যকে দেখলেন প্রদীপ্ত অবস্থায় قَالَ বললেন هٰذَا رَبِّىْ এটা আমার প্রতিপালক هٰذَآ اَكْبَرُ এটা সর্বাপেক্ষা বৃহৎ فَلَمَّآ اَفَلَتْ অনন্তর যখন এটা অস্তমিত হলো قَالَ তিনি বললেন يٰقَوْمِ হে আমার সম্প্রদায়! اِنِّىْ بَرِىْٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ নিশ্চয় আমি তোমাদের অংশীবাদের প্রতি অসন্তুষ্ট।

(৭৯) اِنِّىْ وَجَّهْتُ وَجْهِىَ আমি স্বীয় মুখমণ্ডল তাঁর দিকে ফিরাচ্ছি لِلَّذِىْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ যিনি আসমানসমূহ ও জমিনকে সৃষ্টি করেছেন حَنِيْفًا একাগ্রতার সাথে وَّمَآ اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ এবং আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই।

(৮০) وَحَآجَّهٗ قَوْمُهٗ আর তার সম্প্রদায় তাঁর সাথে তর্ক জুড়ে দিল قَالَ তিনি বললেন اَتُحَآجُّوْٓنِّىْ فِى اللّٰهِ তোমরা কি আল্লাহ সম্বন্ধে আমার সাথে তর্ক জুড়ে দিচ্ছ? وَقَدْ هَدٰىنِ অথচ তিনি আমাকে পথ দেখিয়েছেন وَلَآ اَخَافُ আর আমি সেগুলোকে ভয় করি না مَا تُشْرِكُوْنَ بِهٖ তোমরা আল্লাহর সাথে যেগুলোকে শরিক স্থির করছ اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ رَبِّىْ شَيْـًٔا হ্যাঁ, তবে যদি আমার প্রতিপালকই কোনো কিছু ইচ্ছা করেন وَسِعَ رَبِّىْ كُلَّ شَىْءٍ عِلْمًا আমার পরওয়ারদেগার প্রত্যেক বস্তুকে স্বীয় জ্ঞানের মধ্যে বেষ্টন করে আছেন اَفَلَا تَتَذَكَّرُوْنَ তবুও কি তোমরা খেয়াল কর না?

(৮১) وَكَيْفَ اَخَافُ আর আমি এগুলোকে ভয় করব مَآ اَشْرَكْتُمْ যেগুলোকে তোমরা শরিক সাব্যস্ত করেছ وَلَا تَخَافُوْنَ অথচ এ বিষয়ে কোনো ভয় করছ না যে اَنَّكُمْ اَشْرَكْتُمْ بِاللّٰهِ আল্লাহর সাথে এমন বস্তুকে শরিক করেছ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهٖ عَلَيْكُمْ سُلْطٰنًا যেগুলো সম্বন্ধে তিনি তোমাদের প্রতি কোনো প্রমাণ অবতারণ করেননি فَاَىُّ الْفَرِيْقَيْنِ اَحَقُّ بِالْاَمْنِ সুতরাং এতদুভয় দলের মধ্যে নিরাপত্তার অধিকতর হকদার কারা? اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ যদি তোমরা খবর রাখ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قوله وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ الخ : পূর্ববর্তী আয়াতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পক্ষ থেকে মুশরিকদেরকে সম্বোধন এবং প্রতিমাপূজা ছেড়ে আল্লাহর আরাধনার আহবান বর্ণিত হয়েছিল।

আলোচ্য আয়াতসমূহে একটি বিশেষ ভঙ্গিতে এ আহ্বানকেই সমর্থন দান করা হয়েছে। এ ভঙ্গি স্বভাবগতভাবেই আরবদের মনে প্রভাব বিস্তার করতে পারে। হযরত ইবরাহীম (আ.) ছিলেন সমগ্র আরবের পিতামহ। তাই গোটা আরব তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শনে সর্বদা একমত ছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর একটি তর্কযুদ্ধ উল্লেখ করা হয়েছে, যা তিনি প্রতিমাপূজা ও তারকা-পূজার বিপক্ষে স্বীয় সম্প্রদায়ের সাথে করেছিলেন এবং সবাইকে একত্ববাদের শিক্ষা দান করেছিলেন।

প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে যে, হযরত ইবরাহীম (আ.) তদীয় পিতা আযরকে বললেন : তুমি স্বহস্তে নির্মিত প্রতিমাকে স্বীয় উপাস্য স্থির করেছ। আমি তোমাকে এবং তোমার গোটা সম্প্রদায়কে পথ ভ্রষ্টতায় পতিত দেখতে পাচ্ছি।

হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর পিতার নাম 'আযর' বলেই প্রসিদ্ধ। অধিকাংশ ইতিহাসবিদ তার নাম 'তারেখ' উল্লেখ করেছেন। তাদের মতে 'আযর' তার উপাধি। ইমাম রাযী এবং কিছু সংখ্যক পূর্ববর্তী আলেম বলেন যে, হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর পিতার নাম 'তারেখ' এবং চাচার নাম 'আযর' ছিল। তাঁর চাচা আযর নমরূদের মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করার পর মুশরিক হয়ে যায়। চাচাকে পিতা বলা আরবি বাকপদ্ধতিতে সাধারণভাবে প্রচলিত রীতি। এ রীতি অনুযায়ী আয়াতে আযরকে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর পিতা বলা হয়েছে। যারকানী 'মাওয়াহেব' গ্রন্থের টীকায় এর পক্ষে কয়েকটি সাক্ষ্য-প্রমাণও বর্ণনা করেছেন।

বিশ্বাস ও কর্ম সংশোধনের আহবান : আযর হযরত ইবরাহীম (আ.)–এর পিতা হোক কিংবা চাচা– সর্বাবস্থায় বংশগত দিক দিয়ে একজন সম্মানিত ব্যক্তি ছিল। হযরত ইবরাহীম (আ.) সর্বপ্রথম নিজ গৃহ থেকে সত্য প্রচারের কাজ শুরু করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ–কেও অনুরূপ নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল : وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ; অর্থাৎ নিকট আত্মীয়দেরকে শাস্তির ভয় প্রদর্শন করুন। সেমতে তিনি সর্বপ্রথম সাফা পর্বতে আরোহণপূর্বক সত্য প্রচারের জন্য পরিবারের সদস্যদেরকে একত্রিত করেন।

তাফসীরে বাহরে মুহীতে বলা হয়েছে : এতে বুঝা যায় যে, পরিবারের কোনো সম্মানিত ব্যক্তি যদি ভ্রান্ত পথে থাকে তবে তাকে বিশুদ্ধ পথে আহবান করা সম্মানের পরিপন্থি নয়; বরং সহানুভূতি ও শুভেচ্ছার দাবি তাই। আরো জানা গেল যে, সত্যপ্রচার ও সংশোধনের কাজ নিকট আত্মীয়দের থেকে শুরু করা পয়গম্বরগণের সুন্নত।

দ্বিজাতি তত্ত্ব : এ ছাড়া আয়াতে হযরত ইবরাহীম (আ.) স্বীয় পরিবার ও সম্প্রদায়কে নিজের দিকে সম্বন্ধ করার পরিবর্তে পিতাকে বললেন : তোমার সম্প্রদায় পথভ্রষ্টতায় পতিত রয়েছে। মুশরিক স্বজনদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করে হযরত ইবরাহীম (আ.) আল্লাহর পথে যে মহান ত্যাগ স্বীকার করেন, এ উক্তিতে সেদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। তিনি স্বীয় কর্মের মাধ্যমে বলে দিলেন যে, ইসলামের সম্পর্ক দ্বারাই মুসলিম জাতীয়তা প্রতিষ্ঠিত হয়। বংশগত ও দেশগত জাতীয়তা যদি মুসলিম জাতীয়তার পরিপন্থি হয়, তবে মুসলিম জাতীয়তার বিপরীতে সব জাতীয়তাই বর্জনীয়।

কুরআন পাক হযরত ইবরাহীম (আ.)–এর এ ঘটনা উল্লেখ করে ভবিষ্যৎ উম্মতকে নির্দেশ দিয়েছে, যেন তারা তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে।

বলা হয়েছে : قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ

অর্থাৎ হযরত ইবরাহীম (আ.) ও তাঁর সঙ্গীরা যা করেছিলেন, তা উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য উত্তম আদর্শ ও অনুকরণযোগ্য। তাঁরা স্বীয় বংশগত ও দেশগত স্বজনদেরকে পরিষ্কার বলে দিয়েছিলেন যে, আমরা তোমাদের ও তোমাদের ভ্রান্ত উপাস্যদের থেকে মুক্ত। আমাদের ও তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক প্রতিহিংসা ও শত্রুতার প্রাচীর ততদিন খাড়া থাকবে, যতদিন তোমরা এক আল্লাহর ইবাদতে সমবেত না হও।

বলাবাহুল্য এ দ্বিজাতি তত্ত্বই এ যুগের একটি স্বতন্ত্র মুসলিম রাষ্ট্রের জন্ম দিয়েছে। হযরত ইবরাহীম (আ.) সর্বপ্রথম এ মতবাদ ঘোষণা করেন। উম্মতে মুহাম্মদী ও অন্যান্য সব উম্মত নির্দেশানুযায়ী এ পন্থাই অবলম্বন করেছে এবং

www.almodina.com

মুসলমানদের মধ্যে ব্যাপকভাবে এ জাতীয়তা জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। বিদায় হজের সফরে রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি কাফেরের সাক্ষাৎ পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন : তোমরা কোন জাতীয় লোক? উত্তর হলো نَحْنُ قَوْمٌ مُسْلِمُوْنَ অর্থাৎ আমরা মুসলমান জাতি।–[বুখারী]

এতে ঐ সত্যিকার ও কালজয়ী জাতীয়তার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, যা দুনিয়া থেকে শুরু করে পরকাল পর্যন্ত চালু থাকবে। হযরত ইবরাহীম (আ.) এখানে পিতাকে সম্বোধন করার সময় স্বজনদেরকে পিতার যুক্ত করে স্বীয় অসন্তুষ্টি ব্যক্ত করেছেন; কিন্তু সেখানে জাতিকে নিজের দিকে সমৃদ্ধ করে বলেছেন : يٰقَوْمِ اِنِّيْ بَرِيْٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ অর্থাৎ হে আমার কওম! আমি তোমাদের শিরক থেকে মুক্ত। এতে এদিকে ইঙ্গিত রয়েছে যে, যদিও বংশ ও দেশ হিসেবে তোমরা আমার জাতি, কিন্তু তোমাদের মুশরিকসুলভ ক্রিয়াকর্ম আমাকে তোমাদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করতে বাধ্য করছে।

হযরত ইবরাহীম (আ.)–এর স্বজন ও তদীয় পিতা দ্বিবিধ শিরকে লিপ্ত ছিল। তারা প্রতিমা পূজাও করত এবং নক্ষত্র পূজাও। এ কারণেই হযরত ইবরাহীম (আ.) এ দু'টি প্রশ্নেই পিতা ও স্বজাতির সাথে তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ হন।

প্রথম আয়াতে উল্লিখিত হয়েছে যে, প্রতিমা পূজা পথভ্রষ্টতা পরবর্তী আয়াতসমূহে বর্ণিত হয়েছে যে, প্রতিমা পূজা পথভ্রষ্টতা পরবর্তী আয়াতসমূহে বর্ণিত হয়েছে যে, তারকাপুঞ্জ আরাধনার যোগ্য নয়। মাঝখানে এক আয়াতে ভূমিকাস্বরূপ আল্লাহ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর বিশেষ মর্যাদা ও সুউচ্চ জ্ঞান-গরিমা উল্লেখ করে বলেছেন :

وَكَذٰلِكَ نُرِيْٓ اِبْرٰهِيْمَ مَلَكُوْتَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلِيَكُوْنَ مِنَ الْمُوْقِنِيْنَ

অর্থাৎ আমি ইবরাহীমকে নভোমণ্ডল ও ভুমণ্ডলের সৃষ্টবস্তুসমূহ প্রদর্শন করেছি, যাতে সেসব বিষয়ের স্বরূপ সুস্পষ্টভাবে জেনে নেয় এবং তার বিশ্বাস পূর্ণতা লাভ করে। এর ফলশ্রুতিই পরবর্তী আয়াতসমূহে একটি অভিনব বিতর্কের আকারে বর্ণিত হয়েছে।

প্রচারকার্যে প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতা প্রয়োগ করা পয়গম্বরগণের সুন্নত : فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ الَّيْلُ رَاٰ كَوْكَبًا ۚ قَالَ هٰذَا رَبِّيْ অর্থাৎ এক রাত্রিতে যখন অন্ধকার সমাচ্ছন্ন হলো এবং একটি নক্ষত্রের উপর দৃষ্টি পড়ল, তখন স্বজাতিকে শুনিয়ে বললেন : এ নক্ষত্র আমার প্রতিপালক। উদ্দেশ্য এই যে, তোমাদের ধারণা ও বিশ্বাস অনুযায়ী এটিই আমার ও তোমাদের প্রতিপালক। এখন অল্পক্ষণের মধ্যেই এর স্বরূপ দেখে নিবে। কিছুক্ষণ পর নক্ষত্রটি অস্তমিত হয়ে গেলে হযরত ইবরাহীম (আ.) জাতিকে জব্দ করার চমৎকার সুযোগ পেলেন। তিনি বললেন– لَآ اُحِبُّ الْاٰفِلِيْنَ – اٰفِلِيْنَ শব্দটি اُفُوْل থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ–অস্ত যাওয়া। উদ্দেশ্য এই যে, আমি অস্তগামী বস্তুসমূহকে ভালোবাসি না। যে বস্তু আল্লাহ কিংবা উপাস্য হবে, তার সর্বাধিক ভালোবাসার পাত্র হওয়া উচিত।

এরপর অন্য কোনো রাত্রিকে চাঁদকে ঝলমল করতে দেখে পুনরায় জাতিকে শুনিয়ে পূর্বোক্ত পন্থা অবলম্বন করলেন এবং বললেন : (তোমাদের বিশ্বাস অনুযায়ী) এটি আমার পালনকর্তা। কিন্তু এর স্বরূপও কিছুক্ষণের মধ্যেই ফুটে উঠবে। সেমতে চন্দ্র যখন অস্তাচলে ডুবে গেল, তখন বললেন : যদি আমার পালনকর্তা আমাকে পথপ্রদর্শন না করতে থাকতেন, তবে আমিও তোমাদের মতো পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেতাম এবং চাঁদকেই স্বীয় পালনকর্তা ও উপাস্য মনে করে বসতাম। কিন্তু এর উদয়াস্তের পরিবর্তনশীল অবস্থা আমাকে সতর্ক করেছে যে, এ নক্ষত্রটিও আরাধনার যোগ্য নয়।

এ আয়াতে এদিকেও ইঙ্গিত আছে যে, আমার পালনকর্তা অন্য কোনো শক্তি, যার পক্ষ থেকে আমাকে সর্বক্ষণ পথপ্রদর্শন করা হয়।

এরপর একদিন সূর্য উদিত হতে দেখে পুনরায় জাতিকে শুনিয়ে ঐভাবেই বললেন : (তোমাদের ধারণা অনুযায়ী) এটি আমার প্রতিপালক এবং বৃহত্তম। কিন্তু এ বৃহত্তমের স্বরূপও অতি সত্বর দৃষ্টিগোচর হয়ে যাবে। সে মতে যথাসময়ে সূর্যও অন্ধকারে মুখ লুকালে জাতির সামনে সর্বশেষ প্রমাণ সম্পন্ন করার পর প্রকৃত স্বরূপ তুলে ধরলেন এবং বললেন :

يٰقَوْمِ اِنِّيْ بَرِيْٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ অর্থাৎ হে আমার জাতি! আমি তোমাদের এসব মুশরিকসুলভ ধারণা থেকে মুক্ত। তোমরা আল্লাহ তা'আলার সৃষ্ট বস্তুকেই আল্লাহর অংশীদার স্থির করেছ।

অতঃপর এ স্বরূপ উদঘাটন করলেন যে, আমার ও তোমাদের পালনকর্তা এসব সৃষ্টবস্তুর মধ্যে কোনোটিই হতে পারে না। এরা স্বীয় অস্তিত্ব রক্ষার্থে অন্যের মুখাপেক্ষী এবং প্রতি মুহূর্তে উত্থান-পতন, উদয়-অস্ত ইত্যাদি পরিবর্তনের আবর্তে নিপতিত; বরং সেই সত্তা আমাদের সবার পালনকর্তা, যিনি নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যে সৃষ্ট সবকিছুকে সৃষ্টি করেছেন। তাই আমি স্বীয় আনন তোমাদের স্বনির্মিত প্রতিমা এবং পরিবর্তন ও প্রভাবের আবর্তে নিপতিত নক্ষত্রপুঞ্জ থেকে হটিয়ে 'আল্লাহ ওয়াহদাহু লা শারীকের' দিকে করে নিয়েছি এবং আমি তোমাদের ন্যায় অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত নই।

www.almodina.com

এ বিতর্কে হযরত ইবরাহীম (আ.) পয়গম্বরসুলভ প্রজ্ঞা ও উপদেশ প্রয়োগ করে প্রথমবারেই তাদের নক্ষত্র পূজাকে ভ্রান্ত ও পথভ্রষ্টতা বলে আখ্যা দেননি; বরং এমন এক পন্থা অবলম্বন করলেন, যাতে প্রত্যেক সচেতন মানুষের মন ও মস্তিষ্ক প্রভাবান্বিত হয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই সত্যকে উপলব্ধি করে ফেলে। তবে মূর্তিপূজার বিরুদ্ধে বলতে গিয়ে প্রথমবারেই কঠোর হয়ে যান এবং স্বীয় পিতা ও জাতির পথভ্রষ্ট হওয়ার বিষয়টি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় প্রকাশ করে দেন। কেননা মূর্তিপূজা যে একটি অযৌক্তিক পথভ্রষ্টতা, তা সম্পূর্ণ স্পষ্ট ও সুবিদিত। এর বিপরীতে নক্ষত্র পূজার ভ্রান্তি ও পথভ্রষ্টতা এতটা সুস্পষ্ট ছিল না।

নক্ষত্র পূজার বিরুদ্ধে হযরত ইবরাহীম (আ.)–এর বর্ণিত যুক্তি প্রমাণের সারমর্ম এই যে, যে বস্তু পরিবর্তনশীল, যার অবস্থা নিয়তই পরিবর্তিত হতে থাকে এবং স্বীয় গতিশীলতায় অন্য শক্তির অধীন, সে কিছুতেই পালনকর্তা হওয়ার যোগ্য নয়। এ যুক্তি প্রমাণে নক্ষত্রের উদয়, অস্ত এবং মধ্যবর্তী সব অবস্থাও উল্লেখ করে বলা যেত যে, নক্ষত্র স্বীয় গতি-প্রকৃতিতে স্বাধীন নয়– অন্য কারো নির্দেশ অনুকরণ করে একটি বিশেষ পথে বিচরণ করে। কিন্তু হযরত ইবরাহীম (আ.) এসব অবস্থার মধ্য থেকে শুধু নক্ষত্র-পুঞ্জের অস্তমিত হওয়াকে এখানে উল্লেখ করেছেন। কেননা এগুলোর অস্তমিত হওয়ার বিষয়টি জনসাধারণের দৃষ্টিতে সেগুলোর এক প্রকার পতনরূপে গণ্য হয়। যে যুক্তি-প্রমাণ জনগণের মনে সাড়া জাগাতে পারে, পয়গম্বরগণ সাধারণত সে যুক্তি-প্রমাণই অবলম্বন করেন। তাঁরা দার্শনিকসুলভ তাত্ত্বিক আলোচনার পিছনে বেশি পড়েন না; বরং সাধারণ জ্ঞানবুদ্ধির মাপকাঠিতেই সম্বোধন করেন। তাই নক্ষত্রপুঞ্জের অসহায়ত্ব ও শক্তিহীনতা প্রমাণ করার জন্য অস্তমিত হওয়ার বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। নতুবা এ উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য উদয় এবং তৎপরবর্তী অস্তমিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সব পরিবর্তনকেও প্রমাণ হিসেবে উল্লেখ করা যেত।

প্রচারকদের জন্য কয়েকটি নির্দেশ : হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর বিতর্ক-পদ্ধতি থেকে ওলামা ও ইসলাম প্রচারকদের জন্য কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ অর্জিত হয়। প্রথম এই যে, প্রচার ও সংশোধনের কাজে সর্বক্ষেত্রে কঠোরতা সমীচীন নয় এবং সর্বক্ষেত্রে নম্রতাও সমীচীন নয়; বরং প্রত্যেকটির একটি বিশেষ ক্ষেত্র ও সীমা রয়েছে। প্রতিমা-পূজার ব্যাপারে হযরত ইবরাহীম (আ.) কঠোর ভাষা ব্যবহার করেছেন। কেননা এর ভ্রষ্টতা প্রত্যক্ষ বিষয়। কিন্তু নক্ষত্র পূজার ক্ষেত্র এরূপ কঠোর ভাষা প্রয়োগ করেননি; বরং বিশেষ দূরদর্শিতার সাথে আসল স্বরূপ জাতির সামনে তুলে ধরেছেন। কেননা নক্ষত্র-পুঞ্জের ক্ষমতাহীনতা স্বহস্ত-নির্মিত প্রতিমাদের ক্ষমতাহীনতার মতো সুস্পষ্ট নয়। এতে বুঝা গেল যে, জনসাধারণ যদি এমন কোনো ভ্রান্ত কাজে লিপ্ত হয়, যার ভ্রান্তি ও ভ্রষ্টতা সাধারণ দৃষ্টিতে সুস্পষ্ট নয়, তবে আলেম ও প্রচারকের উচিত, কঠোরতার পরিবর্তে তাদের সন্দেহ ভঞ্জনের পন্থা অবলম্বন করা।

দ্বিতীয় নির্দেশ এই যে, সত্য প্রকাশের বেলায় এখানে হযরত ইবরাহীম (আ.) জাতিকে একথা বলেননি যে, তোমরা এরূপ কর; বরং নিজের অবস্থা ব্যক্ত করেছেন যে, আমি এসব উদয় ও অস্তের আবর্তে নিপতিত বস্তুকে উপাস্য স্থির করতে পারি না। তাই আমি স্বীয় আনন এমন সত্তার দিকে করে নিয়েছি; যিনি এসব বস্তুর সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা। উদ্দেশ্য তাই ছিল যে, তোমাদেরও এরূপ করা দরকার। কিন্তু বিজ্ঞজনোচিত ভঙ্গিতে তিনি স্পষ্ট সম্বোধনে বিরত থাকেন– যাতে তারা জিদের বশবর্তী না হয়ে পড়ে। এতে বুঝা যায় যে, যেভাবে ইচ্ছা সত্যকথা বলে দেওয়াই সংস্কারক ও প্রচারকের দায়িত্ব নয়; বরং কার্যকারী ভঙ্গিতে বলা জরুরি।

শব্দ বিশ্লেষণ

جَنَّ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব نصر মাসদার اَلْجَنُّ মূলবর্ণ– (ج . ن . ن) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– সে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে।

بَازِغَةٌ : সীগাহ واحد مذكر, বহছ اسم فاعل বাব نَصَرَ মাসদার اَلْبَزْغُ মূলবর্ণ (ب . ز . غ) জিনস صحيح অর্থ– চকচকে, দীপ্তিমানরূপে।

اَتُحَاجُّوْنِّىْ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব مُفاعلة মাসদার اَلْمُحَاجَّةُ মূলবর্ণ (ح . ج . ج) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– তোমরা তর্কবিতর্কে লিপ্ত হবে।

الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ يَلْبِسُوْٓا اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ اُولٰٓئِكَ لَهُمُ الْاَمْنُ وَهُمْ مُّهْتَدُوْنَ (٨٢)

অনুবাদ : (৮২) যারা ঈমান এনেছে, এবং নিজেদের ঈমানকে শিরকের সাথে মিশ্রিত করে না, এমন লোকদের জন্যই নিরাপত্তা রয়েছে এবং এরাই সঠিক পথের যাত্রী ।

وَتِلْكَ حُجَّتُنَآ اٰتَيْنٰهَآ اِبْرٰهِيْمَ عَلٰى قَوْمِهٖ ؕ نَرْفَعُ دَرَجٰتٍ مَّنْ نَّشَآءُ ؕ اِنَّ رَبَّكَ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ (٨٣)

(৮৩) আর এটা আমার [প্রদত্ত] প্রমাণ ছিল, এটা আমি ইবরাহীমকে তাঁর স্বগোত্রের মোকাবিলায় দিয়েছিলাম, আমি যাকে ইচ্ছা বিবিধ মর্যাদায় সমুন্নত করি, নিশ্চয় আপনার রব প্রজ্ঞাময়, মহাজ্ঞানী ।

وَوَهَبْنَا لَهٗٓ اِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ ؕ كُلًّا هَدَيْنَا ۚ وَنُوْحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهٖ دَاوٗدَ وَسُلَيْمٰنَ وَاَيُّوْبَ وَيُوْسُفَ وَمُوْسٰى وَهٰرُوْنَ ؕ وَكَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ (٨٤)

(৮৪) আর আমি তাঁকে দান করেছি ইসহাক ও ইয়াকূব এবং আমি প্রত্যেককে হেদায়েত করেছি, এবং [ইবরাহীমের] পূর্বে আমি নূহকে হেদায়েত করেছিলাম, এবং তাঁর সন্তানগণের মধ্য হতে দাউদকে এবং সুলায়মানকে এবং আইয়ূবকে এবং ইউসূফকে এবং মূসাকে এবং হারূনকেও । আর এরূপে আমি নেককারদেরকে বিনিময় প্রদান করে থাকি ।

وَزَكَرِيَّا وَيَحْيٰى وَعِيْسٰى وَاِلْيَاسَ ؕ كُلٌّ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ (٨٥)

(৮৫) আরো যাকারিয়াকে এবং ইয়াহইয়াকে এবং ঈসাকে এবং ইলিয়াসকে [হেদায়েত করেছি] সকলেই ছালেহীনদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন ।

وَاِسْمٰعِيْلَ وَالْيَسَعَ وَيُوْنُسَ وَلُوْطًا ؕ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعٰلَمِيْنَ (٨٦)

(৮৬) আরো ইসমাঈলকে এবং আলইয়াসা'কে এবং ইউনুসকে এবং লূতকে [হেদায়েত করেছি] আর আমি প্রত্যেককে মর্যাদা দান করেছি বিশ্ববাসীর উপর ।

শাব্দিক অনুবাদ

(৮২) الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا যারা ঈমান এনেছে وَلَمْ يَلْبِسُوْٓا اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ এবং নিজেদের ঈমানকে শিরকের সাথে মিশ্রিত করে না اُولٰٓئِكَ لَهُمُ الْاَمْنُ এমন লোকদের জন্যই নিরাপত্তা রয়েছে وَهُمْ مُّهْتَدُوْنَ এবং এরাই সঠিক পথের যাত্রী ।

(৮৩) وَتِلْكَ حُجَّتُنَآ আর এটা আমার [প্রদত্ত] প্রমাণ ছিল اٰتَيْنٰهَآ اِبْرٰهِيْمَ এটা আমি ইবরাহীমকে দিয়েছিলাম عَلٰى قَوْمِهٖ তাঁর স্বগোত্রের মোকাবিলায় نَرْفَعُ دَرَجٰتٍ مَّنْ نَّشَآءُ আমি যাকে ইচ্ছা বিবিধ মর্যাদায় সমুন্নত করি اِنَّ رَبَّكَ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ নিশ্চয় আপনার রব প্রজ্ঞাময়, মহাজ্ঞানী ।

(৮৪) وَوَهَبْنَا لَهٗٓ اِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ আর আমি তাঁকে দান করেছি ইসহাক ও ইয়াকূব كُلًّا هَدَيْنَا এবং আমি প্রত্যেককে হেদায়েত করেছি وَنُوْحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ এবং [ইবরাহীমের] পূর্বে আমি নূহকে হেদায়েত করেছিলাম وَمِنْ ذُرِّيَّتِهٖ এবং তাঁর সন্তানগণের মধ্য হতে دَاوٗدَ وَسُلَيْمٰنَ দাউদকে এবং সুলায়মানকে وَاَيُّوْبَ وَيُوْسُفَ এবং আইয়ূবকে এবং ইউসূফকে وَمُوْسٰى وَهٰرُوْنَ এবং মূসাকে এবং হারূনকেও وَكَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ আর এরূপে আমি নেককারদেরকে বিনিময় প্রদান করে থাকি ।

(৮৫) وَزَكَرِيَّا وَيَحْيٰى وَعِيْسٰى وَاِلْيَاسَ আরো যাকারিয়াকে এবং ইয়াহইয়াকে এবং ঈসাকে এবং ইলিয়াসকে [হেদায়েত করেছি] كُلٌّ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ সকলেই ছালেহীনদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন ।

(৮৬) وَاِسْمٰعِيْلَ وَالْيَسَعَ وَيُوْنُسَ وَلُوْطًا আরো ইসমাঈলকে এবং আলইয়াসা'কে এবং ইউনুসকে এবং লূতকে [হেদায়েত করেছি] وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعٰلَمِيْنَ আর আমি প্রত্যেককে মর্যাদা দান করেছি বিশ্ববাসীর উপর ।

www.almodina.com

অনুবাদ	আয়াত
অনুবাদ : (৮৭) আরো তাঁদের পিতৃবর্গের কতিপয় এবং সন্ততিবর্গের কতিপয় এবং ভ্রাতৃবর্গের কতিপয়কেও, আর আমি তাঁদেরকে মকবুল করেছি এবং আমি তাঁদেরকে সরল পথ প্রদর্শন করেছি।	وَمِنْ اٰبَآئِهِمْ وَذُرِّيّٰتِهِمْ وَاِخْوَانِهِمْ ۚ وَاجْتَبَيْنٰهُمْ وَهَدَيْنٰهُمْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ (٨٧)
(৮৮) আল্লাহর হেদায়েত তা এটাই [অর্থাৎ এই ধর্ম], নিজ বান্দাগণের মধ্য হতে যাকে ইচ্ছা তার হেদায়েত করেন, আর যদি ধরে নেওয়া হয় যে, তাঁরাও শিরক করতেন, তবে তাঁরা যে আমল করতেন, তা তাদের হতে সমস্তই পণ্ড হয়ে যেত।	ذٰلِكَ هُدَى اللّٰهِ يَهْدِيْ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ ۚ وَلَوْ اَشْرَكُوْا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ (٨٨)
(৮৯) তাঁরা এমন ছিলেন যে, আমি তাঁদেরকে কিতাব এবং হিকমত এবং নবুয়ত দান করেছিলাম, সুতরাং যদি তারা আপনার নবুয়তকেও অস্বীকার করে, তবে আমি এর জন্য এমন বহু লোক নির্ধারণ করে দিয়েছি, যারা এর প্রত্যাখ্যানকারী নয়।	اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ۚ فَاِنْ يَّكْفُرْ بِهَا هٰٓؤُلَآءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوْا بِهَا بِكٰفِرِيْنَ (٨٩)
(৯০) এরা এরূপ ছিলেন, যাঁদেরকে আল্লাহ তা'আলা হেদায়েত করেছেন, সুতরাং আপনিও তাঁদেরই পথ অনুসরণ করুন, আপনি বলে দিন, আমি তার জন্য তোমাদের নিকট কোনো বিনিময় চাই না, এটা তো শুধু বিশ্ববাসীদের জন্য একটি উপদেশ মাত্র।	اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ هَدَى اللّٰهُ فَبِهُدٰىهُمُ اقْتَدِهْ ۚ قُلْ لَّآ اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا ۚ اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٰى لِلْعٰلَمِيْنَ (٩٠)

শাব্দিক অনুবাদ

(৮৭) وَمِنْ اٰبَآئِهِمْ আরো তাঁদের পিতৃবর্গের কতিপয় وَذُرِّيّٰتِهِمْ وَاِخْوَانِهِمْ এবং সন্ততিবর্গের কতিপয় এবং ভ্রাতৃবর্গের কতিপয়কেও وَاجْتَبَيْنٰهُمْ আর আমি তাঁদেরকে মকবুল করেছি وَهَدَيْنٰهُمْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ এবং আমি তাঁদেরকে সরল পথ প্রদর্শন করেছি।

(৮৮) ذٰلِكَ هُدَى اللّٰهِ আল্লাহর হেদায়েত তা এটাই [অর্থাৎ এই ধর্ম] يَهْدِيْ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ নিজ বান্দাগণের মধ্য হতে যাকে ইচ্ছা তার হেদায়েত করেন। وَلَوْ اَشْرَكُوْا আর যদি ধরে নেওয়া হয় যে, তাঁরাও শিরক করতেন لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ তবে তাঁরা যে আমল করতেন, তা তাদের হতে সমস্তই পণ্ড হয়ে যেত।

(৮৯) اُولٰٓئِكَ তাঁরা এমন ছিলেন যে اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ আমি তাঁদেরকে কিতাব এবং হিকমত এবং নবুয়ত দান করেছিলাম فَاِنْ يَّكْفُرْ بِهَا هٰٓؤُلَآءِ সুতরাং যদি তারা আপনার নবুয়তকেও অস্বীকার করে فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا তবে আমি এর জন্য এমন বহু লোক নির্ধারণ করে দিয়েছি لَّيْسُوْا بِهَا بِكٰفِرِيْنَ যারা এর প্রত্যাখ্যানকারী নয়।

(৯০) اُولٰٓئِكَ এরা এরূপ ছিলেন الَّذِيْنَ هَدَى اللّٰهُ যাঁদেরকে আল্লাহ তা'আলা হেদায়েত করেছেন فَبِهُدٰىهُمُ اقْتَدِهْ সুতরাং আপনিও তাঁদেরই পথ অনুসরণ করুন قُلْ আপনি বলে দিন لَّآ اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا আমি তার জন্য তোমাদের নিকট কোনো বিনিময় চাই না [illegible] এটা তো শুধু বিশ্ববাসীদের জন্য একটি

www.almodina.com

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

আলোচ্য আয়াতসমূহের প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে : শাস্তির কবল থেকে নিরাপদ ও নিশ্চিত তারাই হতে পারে, যারা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, অতঃপর বিশ্বাসের সাথে কোনোরূপ জুলুমকে মিশ্রিত না করে। হাদীসে আছে, এ আয়াত নাজিল হলে সাহাবায়ে কেরাম চমকে উঠেন এবং আরজ করেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের মধ্যে এমন কে আছে, যে পাপের মাধ্যমে নিজের উপর কোনো জুলুম করেনি? এ আয়াতে শাস্তির কবল থেকে নিরাপদ হওয়ার জন্য বিশ্বাসের সাথে জুলুমকে মিশ্রিত না করার শর্ত বর্ণিত হয়েছে। এমতাবস্থায় আমাদের মুক্তির উপায় কি? মহানবী ﷺ উত্তরে বললেন, তোমরা আয়াতের প্রকৃত অর্থ বুঝতে সক্ষম হওনি। আয়াতে 'জুলুম' বলে শিরককে বুঝানো হয়েছে। দেখ অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন : إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ (নিশ্চিত শিরক বিরাট জুলুম) কাজেই আয়াতের অর্থ এই যে, যে ব্যক্তি বিশ্বাস স্থাপন করে, অতঃপর আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলিতে কাউকে অংশীদার স্থির না করে, সে শাস্তির কবল থেকে নিরাপদ ও সুপথ প্রাপ্ত।

মোটকথা এই যে, যারা প্রতিমা, প্রস্তর, বৃক্ষ, নক্ষত্র, সমুদ্র ইত্যাদির পূজা করে তারা নির্বুদ্ধিতাবশতঃ এগুলোকে ক্ষমতাশালী মনে করে এবং ধারণা করে, এরা হয়তো কোনো ক্ষতি করে ফেলবে– এ কারণে এদের আরাধনা ত্যাগ করতে ভয় পায়। হযরত ইবরাহীম (আ.) তাদের নিগূঢ় কথা বলে দিলেন যে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের ভালোমন্দ সবকিছু করার ব্যাপারে সর্বশক্তিমান। তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করলে বিপদ হবে– অথচ এ ভয় তো তোমরা কর না। পক্ষান্তরে যাদের জ্ঞানও নেই, শক্তিও নেই– তাদের পক্ষ থেকে বিপদের ভয় কর– এটা নির্বুদ্ধিতা নয় তো কি? একমাত্র আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করা উচিত। যে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, তার কোনো বিপদাশঙ্কা নেই।

এ আয়াতে وَلَمْ يَلْبِسُوٓا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ বলা হয়েছে। এতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ব্যাখ্যা অনুযায়ী জুলুমের অর্থ শিরক– সাধারণ গুনাহ নয়। কিন্তু ظُلْمٌ শব্দটি نَكِرَةٌ ব্যবহার করায় আরবি ব্যাকরণ অনুযায়ী এর অর্থ ব্যাপক হয়ে গেছে। অর্থাৎ যাবতীয় শিরকই এর অন্তর্ভুক্ত। يَلْبِسُوْا শব্দটি لَبْس থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ পরিধান করা কিংবা মিশ্রিত করা। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, যে ব্যক্তি স্বীয় বিশ্বাসের সাথে কোনো প্রকার শিরক মিশ্রিত করে; অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলাকে তাঁর যাবতীয় গুণসহ স্বীকার করা সত্ত্বেও অন্যকেও কোনো কোনো ঐশী গুণের বাহক মনে করে, সে ঈমান থেকে খারিজ।

এ আয়াত দ্বারা বুঝা গেল যে, খোলাখুলিভাবে মুশরিক ও মূর্তিপূজারী হয়ে যাওয়াই শুধু শিরক নয়; বরং সে ব্যক্তিও মুশরিক, যে কোনো প্রতিমার পূজা করে না এবং ইসলামের কালিমা উচ্চারণ করে; কিন্তু কোনো ফেরেশতা কিংবা রাসূল কিংবা ওলীকে খোদার কোনো কোনো বিশেষ গুণে অংশীদার মনে করে। সুতরাং জনসাধারণের মধ্যে যারা ওলীদেরকে এবং তাদের মাযারকে 'মনোবাঞ্ছাপূরণকারী' বলে বিশ্বাস করে এবং কার্যতঃ মনে করে যে, ইলাহী ক্ষমতা যেন তাদেরকে হস্তান্তর করা হয়েছে, আয়াতে তাদের প্রতি কঠোর হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করা হয়েছে। نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْهُ

আয়াতে উল্লিখিত সতের জন পয়গম্বরের তালিকায় একজন অর্থাৎ হযরত নূহ (আ.) হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর পূর্বপুরুষ। অবশিষ্ট সবাই তাঁর সন্তান-সন্ততি। বলা হয়েছে : وَمِنْ ذُرِّيَّتِهٖ دَاوٗدَ وَسُلَيْمٰنَ –এ আয়াতে হযরত ঈসা (আ.) সম্পর্কে প্রশ্ন হতে পারে যে, তিনি পিতা ছাড়া জন্মগ্রহণ করার কারণে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর কন্যা পক্ষের সন্তান; অর্থাৎ পৌত্র নয়– দৌহিত্র। অতএব, তাঁকে বংশধর কিরূপে বলা যায়? অধিকাংশ আলেম ও ফিকহবিদ এর উত্তরে বলেছেন যে, ذُرِّيَّةٌ শব্দটি পৌত্র ও দৌহিত্র সবাইকে অন্তর্ভুক্ত করে। এ প্রমাণের ভিত্তিতেই তারা বলেন যে, হযরত হোসাইন (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বংশধর।

দ্বিতীয় আপত্তি হযরত লূত (আ.) সম্পর্কে দেখা দেয় যে, তিনি হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর সন্তানভুক্ত নন; বরং তিনি ভ্রাতুষ্পুত্র। এর উত্তরও সুস্পষ্ট যে, সাধারণ পরিভাষায় পিতৃব্যকে পিতা এবং ভ্রাতুষ্পুত্রকে পুত্র বলা সুবিদিত।

আলোচ্য আয়াতসমূহে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর প্রতি ইলাহী অবদানসমূহ বর্ণনা করে এ আইন ব্যক্ত করা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে প্রিয়বস্তু বিসর্জন দেয়, আল্লাহ তা'আলা তাকে দুনিয়াতেও তদপেক্ষা উত্তম বস্তু দান করেন। অপরদিকে মক্কার মুশরিকদেরকে এসব অবস্থা শুনিয়ে বলা হয়েছে যে, দেখ, তোমাদের মান্যবর হযরত ইবরাহীম (আ.)

www.almodina.com

ও তাঁর সমগ্র পবিার এ কথাই বলে এসেছেন যে, আরাধনার যোগ্য একমাত্র আল্লাহ তা'আলার সত্তা। তাঁর সাথে অন্যকে আরাধনায় শরিক করা কিংবা তাঁর বিশেষ গুণে তাঁর সমতুল্য মনে করা কুফর ও পথভ্রষ্টতা। অতএব তোমরা যদি মুহাম্মদ ﷺ-এর আদেশ অমান্য কর, তবে তোমরা আপন স্বীকৃত বিষয় অনুযায়ীও অভিযুক্ত।

অষ্টম আয়াতে এ বিষয়বস্তুই বর্ণিত হয়েছে। পরিশেষে মহানবী ﷺ-কে সান্ত্বনা দিয়ে বলা হয়েছে : فَإِنْ يَّكْفُرْ بِهَا هٰٓؤُلَآءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوْا بِهَا بِكٰفِرِيْنَ অর্থাৎ আপনার কিছু সংখ্যক সম্বোধিত ব্যক্তি যদি আপনার কথা অমান্য করে এবং পূর্ববর্তী সব পয়গম্বরের নির্দেশ বর্ননা করা সত্ত্বেও অস্বীকারই করতে থাকে, তবে আপনি দুঃখিত হবেন না। কেননা আপনার নবুয়ত স্বীকার করার জন্য আমি একটি বিরাট জাতি স্থির করে রেখেছি। তারা অবিশ্বাস করবে না। মহানবী ﷺ-এর আমলে বিদ্যমান মুহাজির ও আনসার এবং কিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী সব মুসলমান এ 'বিরাট জাতির' অন্তর্ভুক্ত। এ আয়াত তাঁদের সবার জন্য গর্বের সামগ্রী। কেননা এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা প্রশংসার স্থলে তাদের উল্লেখ করেছেন اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنَا مَعَهُمْ وَاحْشُرْنَا فِيْ زُمْرَتِهِمْ

শব্দ বিশ্লেষণ

لَا تَتَذَكَّرُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ نفى مضارع معروف বাব تَفَعُّلٌ মাসদার اَلتَّذَكُّرُ মূলবর্ণ (ذ . ك . ر) জিনস صحيح অর্থ– তোমরা চিন্তা করছ না, তোমরা অনুধাবন করবে না।

مُهْتَدِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم مفعول বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِهْتِدَاءُ মূলবর্ণ (ه . د . ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– হেদায়েতপ্রাপ্ত।

اٰتَيْنَا সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِيْتَاءُ মূলবর্ণ (ا . ت . ى) জিনস মুরাক্কাব ناقص يائى ও مهموز لام অর্থ– আমি দিয়েছি।

نَشَآءُ সীগাহ جمع متكلم বহছ مضارع معروف বাব فَتَحَ মাসদার اَلْمَشِيْئَةُ মূলবর্ণ (ش . ى . ء) জিনস মুরাক্কাব مهموز لام ও اجوف يائى অর্থ– আমি ইচ্ছা করি।

نَجْزِىْ : সীগাহ جمع متكلم বহছ مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْجَزَاءُ মূলবর্ণ (ج . ز . ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– আমি প্রতিদান দিয়ে থাকি।

اِجْتَبَيْنَا : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِجْتِبَاءُ মূলবর্ণ (ج . ب . ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– আমি মনোনীত করেছি।

اِقْتَدِهْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِقْتِدَاءُ মূলবর্ণ (ق . د . و) জিনস ناقص واوى অর্থ– আপনি অনুসরণ করুন।

وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖٓ اِذْ قَالُوْا مَآ اَ
نْزَلَ اللّٰهُ عَلٰى بَشَرٍ مِّنْ شَيْءٍ ؕ قُلْ مَنْ اَ
نْزَلَ الْكِتٰبَ الَّذِيْ جَآءَ بِهٖ مُوْسٰى نُوْرًا
وَّهُدًى لِّلنَّاسِ تَجْعَلُوْنَهٗ قَرَاطِيْسَ
تُبْدُوْنَهَا وَتُخْفُوْنَ كَثِيْرًا ۚ وَعُلِّمْتُمْ مَّا لَمْ
تَعْلَمُوْٓا اَنْتُمْ وَلَآ اٰبَآؤُكُمْ ؕ قُلِ اللّٰهُ ۙ ثُمَّ
ذَرْهُمْ فِيْ خَوْضِهِمْ يَلْعَبُوْنَ (٩١)

অনুবাদ : (৯১) আর তারা আল্লাহ তা'আলার মর্যাদা সেরূপভাবে উপলব্ধি করেনি, যেরূপে উপলব্ধি করা কর্তব্য ছিল, যখন তারা এরূপ বলে ফেলল যে, আল্লাহ কোনো মানুষের প্রতি কোনো বস্তুই নাজিল করেননি। আপনি বলুন, সেই কিতাবটি কে নাজিল করেছে? যা মূসা আনয়ন করেছেন, যার অবস্থা এই যে, তা নূর এবং মানুষের জন্য পথপ্রদর্শক, যাকে তোমরা বিভিন্ন পত্রে রেখেছ তা [-র কিছু] প্রকাশ করে থাক, এবং অনেক বিষয় গোপন কর, এবং তোমাদেরকে এমন অনেক বিষয় শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, যা তোমরাও জানতে না এবং তোমাদের পূর্ব-পুরুষরাও না, আপনি বলে দিন, আল্লাহ নাজিল করেছেন অতঃপর তাদেরকে তাদের নিজ নিজ অনর্থক কর্মে লিপ্ত থাকতে দিন।

وَهٰذَا كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ مُبٰرَكٌ مُّصَدِّقُ الَّذِيْ
بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنْذِرَ اُمَّ الْقُرٰى وَمَنْ حَوْلَهَا
ؕ وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ
وَهُمْ عَلٰى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ (٩٢)

(৯২) আর এটাও এমনই কিতাব যা আমি নাজিল করেছি, যা অতিশয় বরকতবিশিষ্ট [এবং] স্বীয় পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের সত্যতা প্রমাণকারী, আর এই জন্য যে, আপনি ভয় প্রদর্শন করেন মক্কাবাসী ও তৎপার্শ্ববর্তী লোকদেরকে, আর যারা আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস রাখে তারাই তার প্রতি ঈমান আনে এবং তারা নিজেদের নামাজে নিরবচ্ছিন্নতা রক্ষা করে।

শাব্দিক অনুবাদ

(৯১) وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖ আর তারা আল্লাহ তা'আলার মর্যাদা সেরূপভাবে উপলব্ধি করেনি, যেরূপে উপলব্ধি করা কর্তব্য ছিল। اِذْ قَالُوْا যখন তার এরূপ বলে ফেলল যে مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ عَلٰى بَشَرٍ مِّنْ شَيْءٍ আল্লাহ কোনো মানুষের প্রতি কোনো বস্তুই নাজিল করেননি قُلْ আপনি বলুন مَنْ اَنْزَلَ الْكِتٰبَ সেই কিতাবটি কে নাজিল করেছে الَّذِيْ جَآءَ بِهٖ مُوْسٰى যা মূসা আনয়ন করেছেন نُوْرًا وَّهُدًى لِّلنَّاسِ যার অবস্থা এই যে, তা নূর এবং মানুষের জন্য পথপ্রদর্শক تَجْعَلُوْنَهٗ قَرَاطِيْسَ যাকে তোমরা বিভিন্ন পত্রে রেখেছ تُبْدُوْنَهَا তা [-র কিছু] প্রকাশ করে থাক। وَتُخْفُوْنَ كَثِيْرًا এবং অনেক বিষয় গোপন কর وَعُلِّمْتُمْ এবং তোমাদেরকে এমন অনেক বিষয় শিক্ষা দেওয়া হয়েছে مَّا لَمْ تَعْلَمُوْٓا اَنْتُمْ যা তোমরাও জানতে না وَلَآ اٰبَآؤُكُمْ এবং তোমাদের পূর্ব-পুরুষরাও না قُلِ اللّٰهُ আপনি বলে দিন, আল্লাহ নাজিল করেছেন ثُمَّ ذَرْهُمْ فِيْ خَوْضِهِمْ يَلْعَبُوْنَ অতঃপর তাদেরকে তাদের নিজ নিজ অনর্থক কর্মে লিপ্ত থাকতে দিন।

(৯২) وَهٰذَا كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ আর এটাও এমনই কিতাব যা আমি নাজিল করেছি مُبٰرَكٌ যা অতিশয় বরকতবিশিষ্ট [এবং] مُّصَدِّقُ الَّذِيْ بَيْنَ يَدَيْهِ স্বীয় পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের সত্যতা প্রমাণকারী وَلِتُنْذِرَ اُمَّ الْقُرٰى وَمَنْ حَوْلَهَا আর এই জন্য যে, আপনি ভয় প্রদর্শন করেন মক্কাবাসী ও তৎপার্শ্ববর্তী লোকদেরকে وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ আর যারা আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস রাখে يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ তারাই তার প্রতি ঈমান আনে وَهُمْ عَلٰى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ এবং তারা নিজেদের নামাজে নিরবচ্ছিন্নতা রক্ষা করে।

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ ۗ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمُ ۖ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ (٩٣)

অনুবাদ : (৯৩) আর সেই ব্যক্তি অপেক্ষা জালেম কে হবে, যে আল্লাহর প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে? অথবা এরূপ বলে যে, আমার নিকট ওহী আসে, অথচ তার নিকট কোনো বিষয়েই ওহী আসেনি, আর যে ব্যক্তি এরূপ বলে যে, যেরূপ আল্লাহ্ নাজিল করেছেন, তদ্রূপ কালাম আমিও আনয়ন করি, আর যদি আপনি সেই সময়ে দেখেন যখন এই জালেমরা মৃত্যু-যন্ত্রণায় [অভিভূত] হবে এবং ফেরেশতাগণ স্বীয় হস্ত প্রসারিত করতে থাকবে, [এবং বলবে] নিজেদের প্রাণগুলো বের কর, আজ তোমাদেরকে অবমাননাকর শাস্তি দেওয়া হবে, এ কারণে যে, তোমরা আল্লাহর প্রতি অসত্য বলতে এবং তোমরা আল্লাহর আয়াতসমূহ [কবুল করা] হতে অহংকার করতে।

وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ ۖ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ ۚ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ (٩٤)

(৯৪) আর তোমরা আল্লাহর নিকট একক একক ভাবে এসেছ, যেভাবে আমি প্রথমবার তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছিলাম, আর যা কিছু আমি তোমাদেরকে দিয়েছিলাম তা নিজেদের পশ্চাতেই ছেড়ে এসেছ, আর আমি তো তোমাদের সঙ্গে তোমাদের সেই সুপারিশকারীদেরকে দেখছি না যাদের সম্বন্ধে তোমরা দাবি করতে যে, তারা তোমাদের কাজেকর্মে [আমার] শরিক, বাস্তবিকই তোমাদের পরস্পরের সম্পর্ক তো বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে এবং তোমাদের সে সমস্ত দাবি তোমাদের থেকে ব্যর্থ হয়ে গেছে।

শাব্দিক অনুবাদ

(৯৩) وَمَنْ أَظْلَمُ আর সেই ব্যক্তি অপেক্ষা জালেম কে হবে مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا যে আল্লাহর প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে? أَوْ قَالَ অথবা এরূপ বলে যে أُوحِيَ إِلَيَّ আমার নিকট ওহী আসে وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ অথচ তার নিকট কোনো বিষয়েই ওহী আসেনি وَمَنْ قَالَ আর যে ব্যক্তি এরূপ বলে যে سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ যেরূপ আল্লাহ্ নাজিল করেছেন, তদ্রূপ কালাম আমিও আনয়ন করি وَلَوْ تَرَىٰ আর যদি আপনি সেই সময়ে দেখেন إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ যখন এই জালেমরা মৃত্যু-যন্ত্রণায় [অভিভূত] হবে وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ এবং ফেরেশতাগণ স্বীয় হস্ত প্রসারিত করতে থাকবে أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمُ [এবং বলবে] নিজেদের প্রাণগুলো বের কর الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ আজ তোমাদেরকে অবমাননাকর শাস্তি দেওয়া হবে بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ এ কারণে যে, তোমরা আল্লাহর প্রতি অসত্য বলতে وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ এবং তোমরা আল্লাহর আয়াতসমূহ [কবুল করা] হতে অহংকার করতে।

(৯৪) وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ আর তোমরা আল্লাহর নিকট একক একক ভাবে এসেছ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ যেভাবে আমি প্রথমবার তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছিলাম وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ আর যা কিছু আমি তোমাদেরকে দিয়েছিলাম তা وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ নিজেদের পশ্চাতেই ছেড়ে এসেছ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ আর আমি তো তোমাদের সঙ্গে দেখছি না তোমাদের সেই شُفَعَاءَكُمُ সুপারিশকারীদেরকে الَّذِينَ زَعَمْتُمْ যাদের সম্বন্ধে তোমরা দাবি করতে যে أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ তারা তোমাদের কাজেকর্মে [আমার] শরিক لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ বাস্তবিকই তোমাদের পরস্পরের সম্পর্ক তো বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ এবং তোমাদের সে সমস্ত দাবি তোমাদের থেকে ব্যর্থ হয়ে গেছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(৯১) قوله وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖٓ اِذْ قَالُوْا مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ عَلٰى بَشَرٍ مِّنْ شَيْءٍ الخ **আয়াতের শানে নুযূল– ১ :** ইবনে জারীর, ইবনুল মুনযির, ইবনে আবী হাতেম, আবুশ শায়খ ও ইবনে মারদুভিয়া প্রমুখ হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) -এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনাা করেন, তিনি বলেন– কাফের গোষ্ঠী আল্লাহ তা'আলার কুদরতের প্রতি বিশ্বাসী ছিল না। আল্লাহ তা'আলা সর্বময় ক্ষমতাবান বলে যারা বিশ্বাস রাখে, প্রকৃত পক্ষে তারাই আল্লাহ তা'আলার যথার্থ মর্যাদা প্রদান করেছে। যারা এরূপ বিশ্বাস করেনি, তারা আল্লাহকে যথার্থ মর্যাদা প্রদান করেনি, যে কারণে তারা বলত যে, আল্লাহ কোনো মানুষের প্রতি কোনো কিছুই অবতরণ করেননি। ইহুদিরা বলেছিল যে, হে মুহাম্মদ! তোমার প্রতি কি আল্লাহ কিতাব অবতীর্ণ করেছেন? তিনি বলেন, হ্যাঁ। তারা তখন বলেছিল, আল্লাহর শপথ! আসমান হতে আল্লাহ তা'আলা কোনো কিতাব নাজিল করেননি। সে সময় আল্লাহ তা'আলা কাফের ও ইহুদিদের এ ভ্রান্ত আকিদা-বিশ্বাসের জবাব দেওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[ফাতহুল কাদীর ১৪১. দুররে মানছুর ২৯/৩]

শানে নুযূল– ২ : ইবনে জারীর, ইবনুল মুনযির ও ইবনে আবী হাতেম প্রমুখ সাঈদ বিন জুবাইরের উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, ইহুদিদের মধ্যে মালেক বিন সাইফ একদা সে রাসূলুল্লাহ ﷺ–এর সাথে বিতর্ক করে। তখন সে পরিপ্রেক্ষিতে রাসূল ﷺ তাকে জিজ্ঞেস করলেন যে, যিনি হযরত মূসা (আ.)-এর প্রতি তাওরাত নাজিল করেছেন, তাঁর কসম দিয়ে বলছি, তুমি কি তাওরাতে পেয়েছ যে, মুসলমানের প্রতি আল্লাহ ক্রুদ্ধ? ফলে সে আরো ক্রোধান্বিত হয়ে বলল, আল্লাহর শপথ আল্লাহ কোনো মানুষের প্রতি কিছুই নাজিল করেননি। সুতরাং তার সাথীরা বলল, হযরত মূসা (আ.)–এর প্রতিও কি কোনো কিছু নাজিল করেননি। মালিক বিন সাইফ ইহুদির ভিত্তিহীন মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। [ফাতহুল কাদীর ১৪১/২, বাহরে মুহীত ১৮০/৪, দুররে মানছুর ২৯/৩, রূহুল মা'আনী ২১৯/৪/৭]

(৯৩) قوله وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا الخ **আয়াতের শানে নুযূল– ১ :** হাকিম মুসতাদরাক গ্রন্থে সুরাহ বিন সা'আদের উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, আব্দুল্লাহ বিন সুরাহ সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে।

শানে নুযূল– ২ : আব্দ বিন হুমাইদ, ইবনুল মুনযির, ইবনে জুরাইজের উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, আলোচ্য আয়াত নবুয়তের মিথ্যা দাবিদার মুসাইলামাতুল কাযযাব সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। –[রূহুল মা'আনী ২২২/৪/৭, দুররে মানছূর ৩/৩, ফাতহুল কাদীর ১৪১/৩]

শানে নুযূল– ৩ : আব্দ বিন হুমাইদ ইকরিমার বরাত দিয়ে বলেন وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا فَالْعَاصِفَاتِ عَصْفًا আয়াতের বিপরীতে বনী আবুদ্দার গোত্রের নযর وَالطَّاحِنَاتِ طَحْنًا وَالْعَاجِنَاتِ عَجْنًا قَوْلًا كَثِيْرًا গঠন করে ওহী আসার দাবি করে। তার আরবি ছন্দ গঠন করে এহেন ধৃষ্টতাপূর্ণ আচরণের জবাব দেওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[দুররে মানছূর ৩০/৩, ফাতহুল কাদীর ১৪১/২, রূহুল মা'আনী ২২২/৪/৭]

(৯৪) قوله وَلَقَدْ جِئْتُمُوْنَا فُرَادٰى كَمَا خَلَقْنٰكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** ইবনে জারীর, ইবনুল মুনযির, ইবনে আবী হাতেম ও আবুশ শায়খ প্রমুখ হযরত ইকরিমার (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন– নজর বিন হারেছ বলল, খুব শীঘ্রই লাত ও উযা আমার জন্য সুপারিশ করবে। তার এ দাবি ভ্রান্ত ও অলীক। সে পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। –[ফাতহুল কাদীর ১৪২/২]

হযরত ইবরাহীম (আ.) আল্লাহর জন্য স্বজাতি ও স্বগোত্র পরিত্যাগ করার বিনিময়ে আম্বিয়া (আ.)-এর একটি বিরাট দল লাভ করেন, যাদের অধিকাংশই ছিলেন তাঁর সন্তান-সন্ততি। তিনি ইরাক ও সিরিয়া পরিত্যাগ করার বিনিময়ে আল্লাহর ঘর, নিরাপদ শহর, উম্মুল কুরা অর্থাৎ মক্কা লাভ করেন। তাঁর জাতি তাঁকে লাঞ্ছিত করতে চাইলে এর বিনিময়ে তিনি সমগ্র বিশ্ব এবং কিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী মানব জাতির ইমাম ও নেতা রূপে প্রেরিত হন। বিশ্বের বিভিন্ন জাতি ও ধর্মাবলম্বী পারস্পরিক মতবিরোধ সত্ত্বেও তাঁর প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শনে একমত।

এ ক্ষেত্রে সতের জন পয়গম্বরের নাম উল্লেখ করা হয়েছিল। তাঁদের অধিকাংশই হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর সন্তান-সন্ততি ও বংশধর। তাঁদের সম্পর্কে বলা হয়েছিল যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁদেরকে ধর্মের খেদমতের জন্য মনোনীত করেছেন এবং সৎপথ প্রদর্শন করেছেন।

www.almodina.com

আলোচ্য আয়াতসমূহের প্রথম আয়াতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সম্বোধন করে মক্কাবাসীদেরকে শুনানো হয়েছে যে, কোনো জাতির পূর্ব-পুরুষরা শুধু পিতৃপুরুষ হওয়ার কারণেই অনুসরণীয় হতে পারে না যে, তাদের প্রত্যেকটি কথা ও কাজকে অনুসরণযোগ্য মনে করতে হবে। আরবদের সাধারণ ধারণা তাই ছিল। অনুসরণের ক্ষেত্রে প্রথমে দেখতে হবে যে, যার অনুসরণ করা হবে, সে নিজেও বিশুদ্ধ পথে আছে কি না। তাই আম্বিয়া (আ.)-এর একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ অর্থাৎ এঁরাই এমন লোক, যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা সৎপথ প্রদর্শন করেছেন। এরপর বলেছেন فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ অর্থাৎ আপনিও তাদের হেদায়েত ও কর্মপন্থা অনুসরণ করুন।

এতে দুটি নির্দেশ রয়েছে : এক. আরববাসী ও সমগ্র উম্মতকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, পৈতৃক অনুসরণের কুসংস্কার পরিত্যাগ কর এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে সুপথপ্রাপ্ত মহাপুরুষদের পদাঙ্ক অনুসরণ কর।

দুই. রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, আপনিও পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের পন্থা অবলম্বন করুন।

এখানে প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, আম্বিয়া (আ.)-এর শরিয়তসমূহে শাখাগত ও আংশিক বিভিন্নতা পূর্বেও ছিল এবং ইসলামেও তাঁদের থেকে ভিন্ন অনেক বিধি-বিধান অবতীর্ণ হয়েছে। এমতাবস্থায় মহানবী ﷺ-কে পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের পথ অনুসরণের নির্দেশ দানের অর্থ কি? দ্বিতীয় আয়াত এবং বিভিন্ন হাদীসের পরিপ্রেক্ষিতে এর উত্তর এই যে, এখানে সব শাখাগত ও আংশিক বিধি-বিধানে পূর্ববর্তী পয়গম্বরদের পথ অনুসরণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়নি; বরং ধর্মের মূলনীতি একত্ববাদ, রেসালাত ও পরকালে তাদের পথ অনুসরণ করা উদ্দেশ্য। এগুলো কোনো পয়গম্বরের শরিয়তেই পরিবর্তিত হয়নি। হযরত আদম (আ.) থেকে শুরু করে শেষনবী ﷺ পর্যন্ত একই বিশ্বাস এবং একই পথ অব্যাহত রয়েছে। যেসব শাখাগত বিধানে পরিবর্তন করা হয়নি, সেগুলোতেও অভিন্ন কর্মপন্থা রয়েছে এবং যেসব বিধানের ক্ষেত্রে অবস্থার পরিবর্তনের কারণে ভিন্ন নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তা পালিত হয়েছে।

এ কারণেই রাসূলুল্লাহ ﷺ ওহীর মাধ্যমে বিশেষ নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত শাখাগত ব্যাপারেও পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের কর্মপন্থা অনুসরণ করতেন। –[মাযহারী ইত্যাদি]

এরপর মহানবী ﷺ-কে বিশেষভাবে একটি ঘোষণা করতে বলা হয়েছে যে, যা পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণও করেছেন। ঘোষণাটি এই : قُلْ لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْعَالَمِينَ অর্থাৎ আমি তোমাদের জীবনকে পরিপাটি করার জন্য যেসব নির্দেশ দিয়ে যাচ্ছি, তজ্জন্য তোমাদের কাছে কোনো ফিস বা পারিশ্রমিক চাই না। তোমরা এসব নির্দেশ মেনে নিলে আমার কোনো লাভ নেই এবং না মানলে তাতেও কোনো ক্ষতি নেই। এটি হচ্ছে সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য উপদেশ ও শুভেচ্ছার বার্তা। শিক্ষা ও প্রচার কার্যের জন্য কোনোরূপ পারিশ্রমিক গ্রহণ না করা সব যুগে সব পয়গম্বরের অভিন্ন রীতি ছিল। প্রচারকার্য কার্যকরী হওয়ার ব্যাপারে এর প্রভাব অনস্বীকার্য।

দ্বিতীয় আয়াতে ঐসব লোকের জওয়াব দেওয়া হয়েছে, যারা বলেছিল, আল্লাহ তা'আলা কোনো মানুষের প্রতি কখনো কোনো গ্রন্থ অবতীর্ণই করেননি। গ্রন্থ ও রাসূলদের ব্যাপারটি মূলতঃ ভিত্তিহীন।

ইবনে কাছীরের বর্ণনা অনুযায়ী এটি মূর্তিপূজারীদের উক্তি হলে ব্যাপার সুস্পষ্ট কেননা তারা কোনো গ্রন্থ ও নবীর প্রবক্তা কোনো কালে ছিল না। অন্যান্য তাফসীরকারের মতে এটি ইহুদিদের উক্তি। আয়াতের বর্ননা-পরম্পরা বাহ্যতঃ এরই সমর্থন করে। এমতাবস্থায় তাদের এ উক্তি ছিল ক্রোধ ও বিরক্তির বহিঃপ্রকাশ, যা স্বয়ং তাদেরও ধর্মের পরিপন্থি ছিল। ইমাম বগভী (র.)-এর এক রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি এ উক্তি করেছিল, ইহুদিরা তার বিরুদ্ধে ক্ষেপে গিয়ে তাকে ধর্মীয় পদ থেকে অপসারিত করেছিল।

এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলেছেন : যারা এমন বাজে কথা বলেছে, তারা যথোপযুক্তভাবে আল্লাহ তা'আলাকে চিনেনি। নতুবা এরূপ ধৃষ্টতাপূর্ণ উক্তি তাদের মুখ থেকে বেরই হতো না। যারা সর্বাবস্থায় ঐশীগ্রন্থকে অস্বীকার করে, আপনি তাদেরকে বলে দিন : আল্লাহ তা'আলা কোনো মানুষের কাছে যদি গ্রন্থ প্রেরণ না-ই করে থাকেন, তবে যে তাওরাত তোমরা স্বীকার কর এবং যার কারণে তোমরা জাতির 'হর্তা কর্তা' হয়ে বসে আছ, সে তাওরাত কে অবতীর্ণ করেছে? আরো বলে দিন : তোমরা এমন বক্রগামী যে, তোমরা যে তাওরাতকে ঐশীগ্রন্থ বলে স্বীকার কর, তার সাথেও তোমাদের ব্যবহার সহজ-সরল নয়। তোমরা একে বাঁধাই করা গ্রন্থের আকারে না রেখে বিচ্ছিন্ন পত্রে লিপিবদ্ধ করে রেখেছ, যাতে যখনই মন চায়, তখনই মাঝখান থেকে কোনো পাতা উধাও করে দিয়ে তার বিষয়বস্তু অস্বীকার করতে পার। তাওরাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পরিচয় ও গুণাবলি সম্পর্কিত কিছু আয়াত ছিল। ইহুদিরা সেগুলো তাওরাত থেকে উধাও করে দিয়েছিল। আয়াতের শেষে تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ বাক্যের উদ্দেশ্য তাই। قَرَاطِيسَ শব্দটি قِرْطَاسٌ-এর বহুবচন। এর অর্থ কাগজের পাতা।

www.almodina.com

এরপর তাদেরকেই সম্বোধন করে বলা হয়েছে : وَعُلِّمْتُمْ مَّا لَمْ تَعْلَمُوْٓا اَنْتُمْ وَلَآ اٰبَآؤُكُمْ অর্থাৎ কুরআনের মাধ্যমে তোমাদেরকে তাওরাত ও ইঞ্জীলের চাইতেও অধিক জ্ঞান দান করা হয়েছে, যা ইতঃপূর্বে তোমরাও জানতে না এবং তোমাদের বাপ-দাদাদেরও জানা ছিল না।

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে : قُلِ اللّٰهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِيْ خَوْضِهِمْ يَلْعَبُوْنَ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা কোনো গ্রন্থ অবতীর্ণ না করে থাকলে তাওরাত কে অবতীর্ণ করেছে? এ প্রশ্নের উত্তর তারা কি দিবে; আপনিই বলে দিন : আল্লাহ্ তা'আলাই অবতীর্ণ করেছেন। যখন তাদের বিরুদ্ধে যুক্তি পূর্ণ হয়ে গেছে, তখন আপনার কাজও শেষ হয়ে গেছে। এখন তারা যে ক্রীড়া-কৌতুকে ডুবে আছে তাতেই তাদেরকে থাকতে দিন।

তাদের প্রতি আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ গ্রন্থসমূহের ব্যাপারে তাদের বিরুদ্ধে যুক্তি পূর্ণ করার পর তৃতীয় আয়াতে বলা হয়েছে : وَهٰذَا كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ مُبٰرَكٌ مُّصَدِّقُ الَّذِيْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنْذِرَ اُمَّ الْقُرٰى وَمَنْ حَوْلَهَا

অর্থাৎ তাওরাত আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ- একথা যেমন তারাও স্বীকার করে, তেমনিভাবে এ কুরআনও আমি অবতীর্ণ করেছি। কুরআনের সত্যতার জন্য তাদের পক্ষে এ সাক্ষ্যই যথেষ্ট যে, কুরআন, তাওরাত ও ইঞ্জীল অবতীর্ণ সব বিষয়বস্তুর সত্যায়ন করে। তাওরাত ও ইঞ্জিলের পর এ গ্রন্থ অবতীর্ণ করার প্রয়োজন এ জন্য দেখা দেয় যে, এ গ্রন্থদ্বয় বনী ইসরাঈলের জন্য অবতীর্ণ হয়েছিল। তাদের অপর শাখা বনী ইসরাঈল যারা আরব নামে খ্যাত এবং উম্মুল কুরা অর্থাৎ মক্কা ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় বসবাস করে, তাদের পথ প্রদর্শনের নিমিত্ত কোনো বিশেষ পয়গম্বর ও গ্রন্থ এ যাবত অবতীর্ণ হয়নি। তাই এ কুরআন বিশেষভাবে তাদের জন্য এবং সাধারণভাবে সমগ্র বিশ্বের জন্য অবতীর্ণ করা হয়েছে। মক্কা মুয়াজ্জামাকে কুরআন পাক 'উম্মুল কুরা' বলেছে। অর্থাৎ বস্তিসমূহের মূল। এর কারণ এই যে, ঐতিহাসিক বর্ণনা অনুযায়ী এখান থেকেই পৃথিবী সৃষ্টির সূচনা হয়েছিল। এছাড়া এ স্থানটি সারা বিশ্বের কেবলা এবং মুখ ফেরানের কেন্দ্রবিন্দু। -[মাযহারী]

উম্মুল কুরার পর وَمَنْ حَوْلَهَا বলা হয়েছে। অর্থাৎ মক্কার পার্শ্ববর্তী এলাকা। পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণের সমগ্র বিশ্ব এর অন্তর্ভুক্ত।

আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে : وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ وَهُمْ عَلٰى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ

অর্থাৎ যারা পরকালে বিশ্বাস করে, তারা কুরআনের প্রতিও বিশ্বাস স্থাপন করে এবং নামাজ সংরক্ষণ করে। এতে ইহুদি ও মুশরিকদের একটি অভিন্ন রোগ সম্পর্কে হুশিয়ার করা হয়েছে। অর্থাৎ যা ইচ্ছা মেনে নেওয়া এবং যা ইচ্ছা প্রত্যাখ্যান করা এর বিরুদ্ধে রণক্ষেত্র তৈরি করা- এটি পরকালে বিশ্বাসহীনতা রোগেরই প্রতিক্রিয়া। যে ব্যক্তি পরকালে বিশ্বাস করে, খোদাভীতি অবশ্যই তাকে যুক্তি-প্রমাণে চিন্তা ভাবনা করতে এবং পৈতৃক প্রথার পরওয়া না করে সত্যকে গ্রহণ করে নিতে উদ্বুদ্ধ করবে।

চিন্তা করলে দেখা যায়, পরকালের চিন্তা না থাকাই সর্বরোগের মূল কারণ। কুফর ও শিরকসহ যাবতীয় পাপও এরই ফলশ্রুতি। পরকালে বিশ্বাসী ব্যক্তির দ্বারা যদি কোনো সময় ভুল ও পাপ হয়েও যায়, তাতে তার অন্তরাত্মা কেঁপে উঠে এবং অবশেষে তওবা করে পাপ থেকে বেঁচে থাকতে কৃতসংকল্প হয়। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ ভীতি এবং পরকালভীতিই মানুষকে মানুষ করে এবং অপরাধ থেকে বিরত রাখে। এ কারণেই কুরআন পাকের কোনো সূরা; বরং কোনো রুকূ' এমন নেই যে, পরকাল চিন্তার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়নি।

শব্দ বিশ্লেষণ

ذَرْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব سَمِعَ মাসদার اَلْوَذْرُ মূলবর্ণ (و . ذ . ر) জিনস مثال واوى অর্থ- আপনি থাকতে দিন, আপনি ছেড়ে দিন।

تُجْزَوْنَ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع مجهول বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْجَزَاءُ মূলবর্ণ (ج . ز . ى) জিনস ناقص واوى অর্থ- তোমাদেরকে প্রদান করা হবে।

خَوَّلْنٰكُمْ : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব تَفْعِيْلٌ মাসদার اَلتَّخْوِيْلُ মূলবর্ণ (خ . و . ل) জিনস اجوف واوى অর্থ- আমি দিয়েছি, আমি দান করেছি।

كُنْتُمْ تَزْعُمُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ ماضى استمرارى معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلزَّعْمُ মূলবর্ণ (ز . ع . م) জিনস صحيح অর্থ- তোমরা দাবি করেছিলে/ ধারণা করেছিলে।

অনুবাদ	আয়াত
অনুবাদ : (৯৫) নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা বীজ ও আঁটিগুলোকে বিদীর্ণকারী, তিনি নির্জীব হতে সজীবকে বের করে থাকেন, এবং তিনি সজীব হতে নির্জীবকে বের করেন, তিনিই আল্লাহ, সুতরাং তোমরা কোথায় বিপরীত দিকে চলেছ?	إِنَّ اللّٰهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوٰى ۖ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ۚ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ فَأَنّٰى تُؤْفَكُوْنَ (٩٥)
(৯৬) তিনি প্রভাতের বিকাশকারী, আর তিনি রাত্রিকে বিশ্রামকাল এবং সূর্য ও চন্দ্র [-এর গতি] -কে হিসাব নিরূপক বানিয়েছেন, এটা সেই সত্তার নির্ধারিত বিষয় যিনি ক্ষমতাবান, মহাজ্ঞানী।	فَالِقُ الْإِصْبَاحِ ۚ وَجَعَلَ الَّيْلَ سَكَنًا وَّالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ۚ ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ (٩٦)
(৯৭) আর তিনি এমন যে, যিনি তোমাদের জন্য নক্ষত্ররাজিকে সৃষ্টি করেছেন, যেন তোমরা তাদের সাহায্যে অন্ধকারে পথের সন্ধান পেতে পার, স্থলভাগেও এবং সমুদ্রেও; নিশ্চয় আমি প্রমাণসমূহ খুব বিশদভাবে বর্ণনা করে দিয়েছি, ঐ সকল লোকের জন্য যারা জ্ঞান রাখে।	وَهُوَ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ النُّجُوْمَ لِتَهْتَدُوْا بِهَا فِيْ ظُلُمٰتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ۗ قَدْ فَصَّلْنَا الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ (٩٧)
(৯৮) আর তিনি এমন যে, যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি [আদম] হতে সৃজন করেছেন, অনন্তর একটি স্থান অধিক দিন [মাতৃগর্ভে] আর একটি স্থান অল্প দিন [পিতৃঔরসে] থাকার জন্য রয়েছে, নিশ্চয় আমি প্রমাণসমূহ বিশদরূপে বর্ণনা করেছি ঐ সকল লোকের জন্য যারা বুঝে।	وَهُوَ الَّذِيْٓ اَنْشَاَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَّمُسْتَوْدَعٌ ۗ قَدْ فَصَّلْنَا الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّفْقَهُوْنَ (٩٨)

শাব্দিক অনুবাদ

(৯৫) إِنَّ اللّٰهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوٰى নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা বীজ ও আঁটিগুলোকে বিদীর্ণকারী يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ তিনি নির্জীব হতে সজীবকে বের করে থাকেন وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ এবং তিনি সজীব হতে নির্জীবকে বের করেন ذٰلِكُمُ اللّٰهُ তিনিই আল্লাহ فَأَنّٰى تُؤْفَكُوْنَ সুতরাং তোমরা কোথায় বিপরীত দিকে চলেছ?

(৯৬) فَالِقُ الْإِصْبَاحِ তিনি প্রভাতের বিকাশকারী وَجَعَلَ الَّيْلَ سَكَنًا আর তিনি রাত্রিকে বিশ্রামকাল وَّالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا এবং সূর্য ও চন্দ্র [-এর গতি] -কে হিসাব নিরূপক বানিয়েছেন ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ এটা সেই সত্তার নির্ধারিত বিষয় যিনি ক্ষমতাবান, মহাজ্ঞানী।

(৯৭) وَهُوَ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ النُّجُوْمَ আর তিনি এমন যে, যিনি তোমাদের জন্য নক্ষত্ররাজিকে সৃষ্টি করেছেন لِتَهْتَدُوْا بِهَا যেন তোমরা তাদের সাহায্যে পথের সন্ধান পেতে পার فِيْ ظُلُمٰتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ অন্ধকারে স্থলভাগেও এবং সমুদ্রেও قَدْ فَصَّلْنَا الْاٰيٰتِ নিশ্চয় আমি প্রমাণসমূহ খুব বিশদভাবে বর্ণনা করে দিয়েছি لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ঐ সকল লোকের জন্য যারা জ্ঞান রাখে।

(৯৮) وَهُوَ الَّذِيْٓ اَنْشَاَكُمْ আর তিনি এমন যে, যিনি তোমাদেরকে সৃজন করেছেন مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ এক ব্যক্তি [আদম] হতে فَمُسْتَقَرٌّ وَّمُسْتَوْدَعٌ অনন্তর একটি স্থান অধিক দিন [মাতৃগর্ভে] আর একটি স্থান অল্প দিন [পিতৃঔরসে] থাকার জন্য রয়েছে قَدْ فَصَّلْنَا الْاٰيٰتِ নিশ্চয় আমি প্রমাণসমূহ বিশদরূপে বর্ণনা করেছি لِقَوْمٍ يَّفْقَهُوْنَ ঐ সকল

وَهُوَ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً ۚ فَاَخْرَجْنَا بِهٖ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَاَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُّخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُّتَرَاكِبًا ۚ وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَّجَنّٰتٍ مِّنْ اَعْنَابٍ وَّالزَّيْتُوْنَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَّغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ؕ اُنْظُرُوْٓا اِلٰى ثَمَرِهٖٓ اِذَآ اَثْمَرَ وَيَنْعِهٖ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكُمْ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ (٩٩)

অনুবাদ : (৯৯) আর তিনি এমন যে, যিনি আকাশ হতে পানি বর্ষণ করেছেন, অনন্তর আমি তা দ্বারা সর্বপ্রকার উদ্ভিদ উদ্‌গত করেছি, অতঃপর আমি তা হতে সবুজ গাছগুলো বের করেছি, যা হতে আমি একে অন্যের উপর সংস্থাপিত দানা বের করি এবং খেজুর বৃক্ষ হতে অর্থাৎ তার মাথি হতে, ছড়া [বের] হয় যা নিম্ন দিকে ঝুলে পড়ে এবং আঙ্গুরের উদ্যানসমূহ এবং যাইতুন ও আনার [বৃক্ষ উৎপন্ন করেছি] যা [রং ও আকারে কতক] একে অন্যের সদৃশ এবং [কতক] অসাদৃশ্য, প্রত্যেক বৃক্ষের ফলের প্রতি তো লক্ষ্য কর, যখন তা ফলবান হয়, আর তা পাকার সময় [-ও] লক্ষ্য কর, এই সমুদয়ের মধ্যে প্রমাণসমূহ রয়েছে, ঐ সকল লোকের জন্য যারা ঈমান রাখে।

وَجَعَلُوْا لِلّٰهِ شُرَكَآءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوْا لَهٗ بَنِيْنَ وَبَنٰتٍۢ بِغَيْرِ عِلْمٍ ؕ سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يَصِفُوْنَ (١٠٠)

(১০০) আর [মুশরিক] লোকেরা শয়তানদেরকে আল্লাহর শরিক স্থির করে রেখেছে, অথচ তাদেরকে তিনি সৃষ্টি করেছেন, আর তারা আল্লাহর জন্য পুত্র ও কন্যাগণ প্রমাণ ব্যতিরেকে কল্পনা করে রেখেছে, তিনি এ সমস্ত উক্তি হতে পবিত্র ও বহু উর্ধ্বে, যা তারা বর্ণনা করেছে।

بَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ اَنّٰى يَكُوْنُ لَهٗ وَلَدٌ وَّلَمْ تَكُنْ لَّهٗ صَاحِبَةٌ ؕ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ (١٠١)

(১০১) তিনি আকাশসমূহ এবং জমিনের সৃষ্টিকর্তা, আল্লাহর সন্তান হবে কি করে? অথচ তাঁর তো কোনো বিবি নেই, এবং তিনি প্রত্যেক বস্তুকে সৃষ্টি করেছেন, এবং তিনি প্রত্যেক বস্তুকে জানেন।

১২ ع ১৮

শাব্দিক অনুবাদ

(৯৯) وَهُوَ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً আর তিনি এমন যে, যিনি আকাশ হতে পানি বর্ষণ করেছেন فَاَخْرَجْنَا بِهٖ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ অনন্তর আমি তা দ্বারা সর্বপ্রকার উদ্ভিদ উদ্‌গত করেছি فَاَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا অতঃপর আমি তা হতে সবুজ গাছগুলো বের করেছি نُّخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُّتَرَاكِبًا যা হতে আমি একে অন্যের উপর সংস্থাপিত দানা বের করি وَمِنَ النَّخْلِ এবং খেজুর বৃক্ষ হতে مِنْ طَلْعِهَا অর্থাৎ তার মাথি হতে قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ ছড়া [বের] হয় যা নিম্ন দিকে ঝুলে পড়ে وَجَنّٰتٍ مِّنْ اَعْنَابٍ এবং আঙ্গুরের উদ্যানসমূহ وَالزَّيْتُوْنَ وَالرُّمَّانَ এবং যাইতুন ও আনার [বৃক্ষ উৎপন্ন করেছি] مُشْتَبِهًا যা [রং ও আকারে কতক] একে অন্যের সদৃশ وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ এবং [কতক] অসাদৃশ্য اُنْظُرُوْٓا اِلٰى ثَمَرِهٖٓ প্রত্যেক বৃক্ষের ফলের প্রতি তো লক্ষ্য কর اِذَآ اَثْمَرَ وَيَنْعِهٖ যখন তা ফলবান হয়, আর তা পাকার সময় [-ও] লক্ষ্য কর اِنَّ فِيْ ذٰلِكُمْ لَاٰيٰتٍ এই সমুদয়ের মধ্যে প্রমাণসমূহ রয়েছে, لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ঐ সকল লোকের জন্য যারা ঈমান রাখে।

(১০০) وَجَعَلُوْا لِلّٰهِ شُرَكَآءَ الْجِنَّ আর [মুশরিক] লোকেরা শয়তানদেরকে আল্লাহর শরিক স্থির করে রেখেছে وَخَلَقَهُمْ অথচ তাদেরকে তিনি সৃষ্টি করেছেন وَخَرَقُوْا لَهٗ আর তারা আল্লাহর জন্য কল্পনা করে রেখেছে بَنِيْنَ وَبَنٰتٍ পুত্র ও কন্যাগণ بِغَيْرِ عِلْمٍ প্রমাণ ব্যতিরেকে سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يَصِفُوْنَ তিনি এ সমস্ত উক্তি হতে পবিত্র ও বহু উর্ধ্বে, যা তারা বর্ণনা করছে।

(১০১) بَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ তিনি আকাশসমূহ এবং জমিনের সৃষ্টিকর্তা اَنّٰى يَكُوْنُ لَهٗ وَلَدٌ আল্লাহর সন্তান হবে কি করে? وَلَمْ تَكُنْ لَّهٗ صَاحِبَةٌ অথচ তাঁর তো কোনো বিবি নেই وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ এবং তিনি প্রত্যেক বস্তুকে সৃষ্টি করেছে وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ এবং তিনি প্রত্যেক বস্তুকে জানেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(১০০) قوله وَجَعَلُوا لِلّٰهِ شُرَكَآءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوْا لَهٗ بَنِيْنَ وَبَنٰتٍۭ بِغَيْرِ عِلْمٍ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** কালবী বলেন, আলোচ্য আয়াত যিন্দীকদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। তাদের আকিদা ও দাবি ছিল, আল্লাহ তা'আলা মানুষ ও প্রাণী জগতের সৃষ্টিকর্তা। আর ইবলিস হলো সাপ, বিচ্ছু, ও হিংস্র প্রাণীর সৃষ্টিকর্তা। তাদের শিরকি আকিদা ও বিশ্বাসের জবাবেই আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়েছে। –[বাহরে মুহীত ১৯৫/৪]

৯৫-৯৮ এই চার আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মানুষের এ রোগের প্রতিকারার্থে স্বীয় বিস্তৃত জ্ঞান ও মহান শক্তির কয়েকটি নমুনা এবং মানুষের প্রতি নিয়ামতও অনুগ্রহরাজি উল্লেখ করেছেন। এতে সামান্য চিন্তা করলেই প্রত্যেক সুস্থ স্বভাব ব্যক্তি স্রষ্টার মাহাত্ম্য ও তাঁর অপরিসীম শক্তি-সামর্থ্য স্বীকার না করে থাকতে পারবে না। তখন সে মুক্ত কণ্ঠে ঘোষণা করবে যে, এ বিরাট কীর্তি আল্লাহ তা'আলা ছাড়া আর কারো হতে পারে না। বলা হয়েছে : اِنَّ اللّٰهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوٰى অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা বীজ ও আঁটি অঙ্কুরণকারী। এতে খোদায়ী শক্তি-সামর্থ্যের এক বিস্ময়কর ঘটনা বিধৃত হয়েছে। শুষ্ক বীজ ও শুষ্ক আঁটি ফাঁক করে তার ভিতর থেকে শ্যামল ও সতেজ বৃক্ষ বের করে দেওয়া একমাত্র জগত স্রষ্টারই কাজ– এতে কোনো মানুষের চেষ্টা ও কর্মের কোনো প্রভাব নেই। আল্লাহর শক্তির বলে বীজ ও আঁটির ভিতর থেকে যে নাজুক অঙ্কুর গজিয়ে উঠে, তার পথ থেকে সকল প্রতিবন্ধকতা ও ক্ষতিকর বস্তুকে দূরে সরিয়ে দেওয়াই কৃষকের সকল চেষ্টার মূল বিষয়। লাঙ্গল চষে মাটি নরম করা, সার দেওয়া, পানি দেওয়া ইত্যাদি কর্মের ফল এর চাইতে বেশি কিছু নয় যে, অঙ্কুরের পথে কোনোরূপ প্রতিবন্ধকতা না থাকে। এ ব্যাপারে আসল কাজ হচ্ছে বীজ ও আঁটি ফেটে বৃক্ষের অঙ্কুরোদ্গম হওয়া, অতঃপর তাতে রং-বেরঙের রকমারি পাতা গজানো এবং এমন ফল-ফুলে সুশোভিত হওয়া যে, মানুষের বুদ্ধি ও মস্তিষ্ক তার একটি পাতা ও পাপড়ি তৈরি করতেও অক্ষম হয়ে যায়। এটা জানা কথা যে, এতে মানব কর্মের কোনো প্রভাব নেই। তাই কুরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে : اَفَرَاَيْتُمْ مَّا تَحْرُثُوْنَ ءَاَنْتُمْ تَزْرَعُوْنَهٗۤ اَمْ نَحْنُ الزّٰرِعُوْنَ

অর্থাৎ তোমরা কি ঐ বীজগুলোকে দেখ না যা তোমরা মাটিতে ফেলে দাও? এগুলো থেকে তোমরা ফসল উৎপাদন কর না আমি করি?

দ্বিতীয় বাক্যে বলা হয়েছে : يُخْرِجُ الْحَىَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَىِّ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলাই মৃত বস্তু থেকে জীবিত বস্তু সৃষ্টি করেন। মৃত বস্তু যেমন, বীর্য ও ডিম এগুলো থেকে মানুষ ও জন্তু-জানোয়ারের সৃষ্টি হয়, এমনিভাবে তিনি জীবিত বস্তু থেকে মৃত বস্তু বের করে দেন– যেমন, বীর্য ও ডিম জীবিত বস্তু থেকে বের হয়।

এরপর বলেছেন : ذٰلِكُمُ اللّٰهُ فَاَنّٰى تُؤْفَكُوْنَ অর্থাৎ এগুলো সবই এক আল্লাহর কাজ। অতঃপর একথা জেনে শুনে তোমরা কোন দিকে বিভ্রান্ত হয়ে ঘোরাফেরা করছ? তোমরা স্বহস্তে নির্মিত প্রতিমাকে বিপদ-বিদূরণকারী ও অভাব পূরণকারী উপাস্য বলতে শুরু করেছ।

দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে : فَالِقُ الْاِصْبَاحِ – فَالِقُ শব্দের অর্থ ফাঁককারী এবং اِصْبَاحٌ শব্দের অর্থ এখানে প্রভাতকাল। فَالِقُ الْاِصْبَاحِ –এর প্রভাতের ফাঁককারী; অর্থাৎ গভীর অন্ধকারের চাদর ফাঁক করে প্রভাতের উন্মেষকারী। এটিও এমন একটি কাজ, যাতে নিজ, মানব ও সমগ্র সৃষ্ট জীবের শক্তিই ব্যর্থ। প্রতিটি চক্ষুষ্মান ব্যক্তি একথা বুঝতে বাধ্য যে, রাত্রির অন্ধকারের পর প্রভাতরশ্মির উদ্ভাবক জিন, মানব, ফেরেশতা অথবা অন্য কোনো সৃষ্টজীব হতে পারে না; বরং এটি বিশ্বস্রষ্টা আল্লাহ তা'আলারই কাজ।

সৌর ও চান্দ্র হিসাব : বলা হয়েছে : وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا – حُسْبَانًا একটি ধাতু। এর অর্থ হিসাব করা, গণনা করা। অর্থাৎ আল্লাহতা'আলা সূর্য ও চন্দ্রের উদয়, অস্ত এবং এদের গতিকে একটি বিশেষ হিসাবের অধীনে রেখেছেন। এর ফলে মানুষ বৎসর, মাস, দিন, ঘণ্টা এমনকি, মিনিট ও সেকেণ্ডের হিসাবও অতি সহজে করতে পারে।

আল্লাহ তা'আলা অপার শক্তিই এসব উজ্জ্বল মহাগোলক ও এদের গতি-বিধিকে অটল অনড় নিয়মের অধীন করে দিয়েছে। হাজার হাজার বছরেও এদের গতি-বিধিকে এক মিনিট বা এক সেকেণ্ডের পার্থক্য হয় না। এদের কলকজা মেরামতের জন্য কোনো ওয়ার্কশপের প্রয়োজন হয় না এবং যন্ত্রাংশের ক্ষয়প্রাপ্তি ও পরিবর্তনের আবশ্যকতাও দেখা দেয় না। এ উজ্জ্বল গোলকদ্বয় নিজ নিজ কক্ষপথে নির্দিষ্ট গতিতে বিচরণ করছে : لَا الشَّمْسُ يَنْۢبَغِىْ لَهَاۤ اَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا الَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ

পরিতাপের বিষয়, প্রকৃতির এ অটল ও অপরিবর্তনীয় ব্যবস্থা থেকেই মানুষ প্রতারিত হয়েছে। তারা এগুলোকেই স্বয়ংসম্পূর্ণ; বরং উপাস্য ও উদ্দিষ্ট মনে করে বসেছে। যদি এ ব্যবস্থা মাঝে মাঝে অচল হয়ে যেত এবং কলকব্জা মেরামতের জন্য কয়েক দিন বা কয়েক ঘণ্টার বিরতি দেখা যেত, তবে মানুষ বুঝতে পারত যে, এসব মেশিন আপনা আপনি চলে না; বরং এগুলোর পরিচালক ও নির্মাতা আছে। ঐশীগ্রন্থ, পয়গম্বর ও রাসূলগণ এ সত্য উদঘাটন করার জন্যই প্রেরিত হন।

কুরআন পাকের এ বাক্য আরো ইঙ্গিত করেছে যে, বছর ও মাসের সৌর ও চান্দ্র উভয় প্রকার হিসাবই হতে পারে এবং উভয়টি আল্লাহ তা'আলার নিয়ামত। এটা ভিন্ন কথা যে, সাধারণ অশিক্ষিত লোকদের সুবিধার্থে এবং তাদেরকে হিসাব-কিতাবের জটিলতা থেকে দূরে রাখার জন্য ইসলামি বিধি বিধানের চান্দ্র বৎসর ব্যবহার করা হয়েছে। যেহেতু ইসলামি তারিখ এবং ইসলামি বিধান পুরোপুরিভাবে চান্দ্র হিসাবের উপর নির্ভরশীল, তাই এ হিসাবকে স্থায়ী ও প্রতিষ্ঠিত রাখা সকল মুসলমানের অবশ্যই কর্তব্য। প্রয়োজনবশতঃ সৌর ও অন্যান্য হিসাবও ব্যবহার করা যেতে পারে, তাতে কোনো পাপ হবে না। কিন্তু চান্দ্র হিসাবকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা এবং বিলোপ করে দেওয়া পাপের কারণ। এতে রমজান কিংবা জিলহজ ও মহররম কবে হবে তা অজ্ঞাত হয়ে যাবে।

আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে : ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ অর্থাৎ এ বিস্ময়কর অটল ব্যবস্থা যাতে কখনো এক মিনিট ও এক সেকেণ্ড এদিক-ওদিক হয় না– একমাত্র আল্লাহ তা'আলারই অপরিসীম শক্তির কারসাজি, যিনি পরাক্রান্ত ও শক্তিমান এবং সব ব্যাপারে জ্ঞানী।

তৃতীয় আয়াতে বলা হয়েছে : وَهُوَ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ النُّجُوْمَ لِتَهْتَدُوْا بِهَا فِيْ ظُلُمٰتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ

অর্থাৎ সূর্য ও চন্দ্র ছাড়া অন্যান্য নক্ষত্রও আল্লাহ তা'আলার অপরিসীম শক্তির বহিঃপ্রকাশ। এগুলো সৃষ্টি করার পিছনে যে হাজারো রহস্য রয়েছে তন্মধ্যে একটি এই যে, জল ও স্থলপথে ভ্রমণ করার সময় রাত্রির অন্ধকারে যখন দিক নির্ণয় করা কঠিন হয়ে পড়ে, তখন মানুষ এসব নক্ষত্রের সাহায্যে পথ ঠিক করতে পারে। অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দেয়, আজ বৈজ্ঞানকি কলকব্জার যুগেও মানুষ নক্ষত্রপুঞ্জের পথ প্রদর্শনের প্রতি অমুখাপেক্ষী নয়।

এ আয়াতেও মানুষকে হুশিয়ার করা হয়েছে যে, এসব নক্ষত্রও কোনো একজন নির্মাতা ও নিয়ন্ত্রকের নিয়ন্ত্রণাধীন বিচরণ করছে। এরা স্বীয় অস্তিত্ব, স্থায়িত্ব ও কর্মে স্বয়ং-সম্পূর্ণ নয়। যারা শুধু এদের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বসে আছে এবং নির্মাতার প্রতি দৃষ্টিপাত করে না, তারা অত্যন্ত সংকীর্ণমনা এবং আত্মপ্রবঞ্চিত।

এরপর বলেছেন : قَدْ فَصَّلْنَا الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ অর্থাৎ আমি শক্তির প্রমাণাদি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করে দিয়েছি বিজ্ঞজনদের জন্য। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, যারা এসব সুস্পষ্ট নিদর্শন দেখেও আল্লাহকে চিনে না, তারা বে-খবর ও অচেতন।

চতুর্থ আয়াতে বলা হয়েছে : وَهُوَ الَّذِيْٓ اَنْشَاَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَّمُسْتَوْدَعٌ – مُسْتَقَرٌّ শব্দটি قَرَارٌ থেকে উদ্ভুত। কোনো বস্তুর অবস্থান স্থলকে مُسْتَقَرٌّ বলা হয়। مُسْتَوْدَعٌ শব্দটি وَدِيْعَتٌ থেকে উদ্ভুত। এর অর্থ কারো কাছে কোনো বস্তু অস্থায়ীভাবে কয়েক দিন রাখা হয়।

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলাই সে পবিত্র সত্তা যিনি মানুষকে এক সত্তা থেকে অর্থাৎ হযরত আদম (আ.) থেকে সৃষ্টি করেছেন। এরপর তার জন্য একটি দীর্ঘকালীন এবং একটি স্বল্পকালীন অবস্থান স্থল নির্ধারণ করে দিয়েছেন।

কুরআন পাকের ভাষা এরূপ হলেও এর ব্যাখ্যায় বহুবিধ সম্ভাবনা রয়েছে। এ কারণেই এ সম্পর্কে তাফসীরকারদের বিভিন্ন উক্তি রয়েছে। কেউ বলেছেন। مُسْتَقَرٌّ ও مُسْتَوْدَعٌ যথাক্রমে মাতৃগর্ভ ও দুনিয়া। আবার কেউ বলেছেন : কবর ও পরলোক। এছাড়া আরো বিভিন্ন উক্তি আছে এবং কুরআনের ভাষায় সবগুলোরই অবকাশ রয়েছে। কাজী সানাউল্লাহ পানিপথী (র.) তাফসীরে মাযহারীতে বলেছেন : مُسْتَقَرٌّ হচ্ছে পরলোকের বেহেশত ও দোজখ। আর মানুষের জন্ম থেকে শুরু করে পরকাল অবধি সবগুলোর স্তর। তা মাতৃগর্ভই হোক কিংবা পৃথিবীতে বসবাসের জায়গাই হোক কিংবা কবর ও বরজখই হোক– সবগুলোই হচ্ছে مُسْتَوْدَعٌ অর্থাৎ সাময়িক অবস্থান স্থল। কুরআন পাকের এক আয়াত দ্বারাও এ উক্তির অগ্রগণ্যতা বুঝা যায়। আয়াতে বলা হয়েছে : لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ অর্থাৎ তোমরা সর্বদা এক স্তর থেকে অন্য স্তরে আরোহণ করতে থাকবে। এর সারমর্ম এই যে, পরকালের পূর্বে মানুষ সমগ্র জীবনে একজন মুসাফিরসদৃশ। বাহ্যিক স্থিরতা ও অবস্থিতির সময়ও প্রকৃতপক্ষে সে জীবন-সফরের বিভিন্ন মনজিল অতিক্রম করতে থাকে।

www.almodina.com

قوله وَهُوَ الَّذِيْ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ الخ আলোচ্য আয়াতসমূহের বিষয়বস্তুতে অভিনব শ্রেণিবিন্যাস নির্দেশিত হয়েছে। এখানে তিন প্রকার সৃষ্ট জগতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে : এক. উর্ধ্বজগত। দুই. অধঃজগত এবং তিন. শূন্যজগত। অর্থাৎ ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডলের মধ্যবর্তী শূন্যজগতে সৃষ্ট বস্তুসমূহ। প্রথমে অধঃজগতের বস্তুসমূহ সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। কারণ এগুলো আমাদের অধিক নিকটবর্তী। অতঃপর এগুলোর বর্ণনাকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে : এক. মাটি থেকে উৎপন্ন উদ্ভিদ, বৃক্ষ ও বাগানের বর্ণনা এবং দুই. মানব ও জীবজন্তুর বর্ণনা। প্রথমোক্তটি প্রথমে বর্ণিত হয়েছে। কেননা এটি অপরটির তুলনায় অধিক স্পষ্ট এবং অপরটি যেহেতু আত্মার উপর নির্ভরশীল, তাই কিছুটা সূক্ষ্ম। সে মতে বীর্যের বিভিন্ন স্তর ও অবস্থা চিকিৎসকদের অনুভূতির সাথে বিশেষভাবে সম্পর্কশীল। এর বিপরীতে উদ্ভিদের বৃদ্ধি ও ফলে-ফুলে সমৃদ্ধ হওয়ার ব্যাপারটি সাধারণভাবে প্রত্যক্ষ। এরপর শূন্যজগতের উল্লেখ করা হয়েছে : অর্থাৎ সকাল ও বিকাল। অতঃপর অধঃজগতের সৃষ্ট বস্তু বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্ররাজি। অতঃপর অধঃজগতের বস্তুসমূহ অধিক প্রত্যক্ষ হওয়ার কারণে এগুলোর পূর্ণ বর্ণনা দ্বারা আলোচনা সমাপ্ত করা হয়েছে। তবে পূর্বে এগুলো সংক্ষিপ্তাকারে উল্লিখিত হয়েছিল। এবার বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু বিস্তারিত বর্ণনার শ্রেণিবিন্যাসে সংক্ষিপ্ত বর্ণনার শ্রেণিবিন্যাসের বিপরীত করা হয়েছে। অর্থাৎ প্রাণীদের বর্ণনা অগ্রে এবং উদ্ভিদের বর্ণনা পরে। সম্ভবতঃ এর কারণ এই যে, এই বিস্তারিত বর্ণনায় নিয়ামত প্রকাশের ভঙ্গি অবলম্বন হয়েছে। তাই مُنْعَمٌ عَلَيْهِ যাদের কে নিয়ামত প্রদান হয়েছে, তারা উদ্দিষ্ট হওয়ার কারণে তাদেরকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। উদ্ভিদের মধ্যে পূর্বোক্ত শ্রেণিবিন্যাস বহাল রয়েছে। অর্থাৎ শস্যের অবস্থা, বীজ ও আঁটির বর্ণনা আগে এনে এবং একে উদ্ভিদের অনুগামী করে মাঝখানে বৃষ্টির প্রসঙ্গ টানা হয়েছে। এতে আরো একটি সূক্ষ্ম কারণ থাকতে পারে। তা এই যে, সূচনার দিক থেকে বৃষ্টি উর্ধ্বজগতের, পরিণতির দিক দিয়ে অধঃজগতের এবং দূরত্ব অতিক্রমের দিক দিয়ে শূন্যজগতের বস্তু।

শব্দ বিশ্লেষণ

تُؤْفَكُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع مجهول বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْاِفْكُ মূলবর্ণ (ا . ف . ك) জিনস مهموز فاء অর্থ– তোমরা বিপরীত দিকে চলছ।

لِتَهْتَدُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِهْتِدَاءُ মূলবর্ণ (ه . د . ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– যেন তোমরা পথ পাও।

مُسْتَقَرٌّ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم مفعول ও اسم ظرف বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِسْتِقْرَارُ মূলবর্ণ (ق . ر . ر) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– ঠিকানা, অবস্থানস্থল, বসবাসের জায়গা।

مُسْتَوْدَعٌ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم مفعول ও اسم ظرف বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِسْتِيْدَاعُ মূলবর্ণ (و . د . ع) জিনস مثال واوى অর্থ–আমানত রাখা হয় যে স্থানে।

مُتَرَاكِبًا : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব تَفَاعُلٌ মাসদার اَلتَّرَاكُبُ মূলবর্ণ (ر . ك . ب) জিনস صحيح অর্থ– একে অপরের উপর সংস্থাপিত দানা।

طَلْعٌ : শব্দটি একবচন, বহুবচন اَطْلَاعٌ অর্থ– খেজুর গাছের শিষ, কোরক।

قِنْوَانٌ শব্দটি বহুবচন, একবচন قِنْوٌ অর্থ– কাদি, ছড়া, খেজুরের কাদি।

دَانِيَةٌ সীগাহ واحد مؤنث বহছ اسم فاعل বাব نَصَرَ মাসদার اَلدُّنُوُّ মূলবর্ণ (د . ن . و) জিনস ناقص واوى অর্থ– ঝুলন্ত, যা নুয়ে থাকে।

يَنْعٌ শব্দটি বাব فَتَحَ ও ضَرَبَ এর মাসদার। অর্থ– পেকে যাওয়া।

অনুবাদ	আয়াত
অনুবাদ : (১০২) ইনিই আল্লাহ, তোমাদের রব, তিনি ভিন্ন কেউ ইবাদতের যোগ্য নয়, তিনি প্রত্যেক বস্তুর স্রষ্টা, অতএব, তাঁর ইবাদত কর, বস্তুতঃ তিনি সকল বিষয়ের কার্য সম্পাদক।	ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ ۚ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوْهُ ۚ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ وَّكِيْلٌ (١٠٢)
(১০৩) তাঁকে তো কারো দৃষ্টি পরিবেষ্টন করতে পারে না, এবং তিনি সকল দৃষ্টিকেই পরিবেষ্টন করে আছেন, এবং তিনিই অতি সূক্ষ্মদর্শী, সর্বজ্ঞ।	لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ ز وَهُوَ يُدْرِكُ الْاَبْصَارَ ۚ وَهُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ (١٠٣)
(১০৪) [বলে দিন] নিশ্চয়, তোমাদের নিকট তোমাদের রবের পক্ষ হতে সত্য দর্শনের উপায়সমূহ পৌঁছেছে, সুতরাং যে [সত্যকে] দেখে নিবে, সে নিজের উপকার করবে, আর যে অন্ধ থাকবে সে নিজেরই অনিষ্ট করবে, এবং আমি তোমাদের পর্যবেক্ষক নই।	قَدْ جَآءَكُمْ بَصَآئِرُ مِنْ رَّبِّكُمْ ۚ فَمَنْ اَبْصَرَ فَلِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا ؕ وَمَآ اَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيْظٍ (١٠٤)
(১০৫) আর আমি এরূপ প্রমাণসমূহকে বিভিন্ন দিক দিয়ে বর্ণনা করি, যেন আপনি সকলকে পৌঁছে দিন, আর যেন, তারা [বিদ্বেষাপন্ন হয়ে] এরূপ বলে যে, আপনি কারো নিকট পড়ে নিয়েছেন, এবং যেন আমি তাকে জ্ঞানীদের জন্য স্পষ্টরূপে প্রকাশ করে দেই।	وَكَذٰلِكَ نُصَرِّفُ الْاٰيٰتِ وَلِيَقُوْلُوْا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهٗ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ (١٠٥)
(১০৬) আপনি স্বয়ং ঐ পথের অনুসরণ করতে থাকুন যে সম্বন্ধে আপনার প্রতিপালকের পক্ষ হতে আপনার নিকট ওহী এসেছে, আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত কেউ ইবাদতের যোগ্য নয়, আর মুশরিকদের প্রতি লক্ষ্য করবেন না।	اِتَّبِعْ مَآ اُوْحِيَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ ۚ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ وَاَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ (١٠٦)

শাব্দিক অনুবাদ

(১০২) ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ ইনিই আল্লাহ, তোমাদের রব لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ তিনি ভিন্ন কেউ ইবাদতের যোগ্য নয় خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ তিনি প্রত্যেক বস্তুর স্রষ্টা فَاعْبُدُوْهُ অতএব, তাঁর ইবাদত কর وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ وَّكِيْلٌ বস্তুতঃ তিনি সকল বিষয়ের কার্য সম্পাদক।

(১০৩) لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ তাঁকে তো কারো দৃষ্টি পরিবেষ্টন করতে পারে না وَهُوَ يُدْرِكُ الْاَبْصَارَ এবং তিনি সকল দৃষ্টিকেই পরিবেষ্টন করে আছেন وَهُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ এবং তিনিই অতি সূক্ষ্মদর্শী, সর্বজ্ঞ।

(১০৪) قَدْ جَآءَكُمْ নিশ্চয়, তোমাদের নিকট পৌঁছেছে بَصَآئِرُ সত্য দর্শনের উপায়সমূহ مِنْ رَّبِّكُمْ তোমাদের রবের পক্ষ হতে فَمَنْ اَبْصَرَ فَلِنَفْسِهٖ সুতরাং যে [সত্যকে] দেখে নিবে, সে নিজের উপকার করবে وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا আর যে অন্ধ থাকবে সে নিজেরই অনিষ্ট করবে وَمَآ اَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيْظٍ এবং আমি তোমাদের পর্যবেক্ষক নই।

(১০৫) وَكَذٰلِكَ نُصَرِّفُ الْاٰيٰتِ আর আমি এরূপ প্রমাণসমূহকে বিভিন্ন দিক দিয়ে বর্ণনা করি وَلِيَقُوْلُوْا دَرَسْتَ যেন আপনি সকলকে পৌঁছে দিন وَلِنُبَيِّنَهٗ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ আর যেন, তারা [বিদ্বেষাপন্ন হয়ে] এরূপ বলে যে, আপনি কারো নিকট পড়ে নিয়েছেন, এবং যেন আমি তাকে জ্ঞানীদের জন্য স্পষ্টরূপে প্রকাশ করে দেই।

(১০৬) اِتَّبِعْ আপনি স্বয়ং ঐ পথের অনুসরণ করতে থাকুন مَآ اُوْحِيَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ যে সম্বন্ধে আপনার প্রতিপালকের পক্ষ হতে আপনার নিকট ওহী এসেছে لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত কেউ ইবাদতের যোগ্য নয় وَاَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ আর মুশরিকদের প্রতি লক্ষ্য করবেন না।

www.almodina.com

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا ۗ وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ۖ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلٍ (١٠٧)

অনুবাদ : (১০৭) আর যদি আল্লাহর অভিপ্রেত হতো, তবে তারা শিরক করত না, আর আমি আপনাকে এদের পর্যবেক্ষক করিনি, এবং আপনি তাদের উপর ক্ষমতাপ্রাপ্তও নন।

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ كَذَٰلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِم مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (١٠٨)

(১০৮) আর এরা আল্লাহ ব্যতীত যাদের ইবাদত করে, তাদেরকে গালি দিও না, কেননা তা হলে এরা মূর্খতাবশতঃ সীমালজ্ঘনপূর্বক আল্লাহর শানে বে-আদবী করবে, আমি এরূপেই প্রত্যেক উম্মতের নিকট তাদের কার্যকলাপকে সুশোভিত করে রেখেছি, অতঃপর স্বীয় প্রতিপালকের নিকটই তাদেরকে যেতে হবে, তখন তিনি তাদেরকে জানিয়ে দিবেন, যা কিছুই তারা করত।

وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَّيُؤْمِنُنَّ بِهَا ۚ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ ۖ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ (١٠٩)

(১০৯) আর তারা (কাফেররা) শপথসমূহে খুব দৃঢ়তার সাথে আল্লাহ তা'আলার নামে শপথ করল যে, যদি তাদের নিকট কোনো নিদর্শন উপস্থিত হয় তবে তারা অবশ্যই তার প্রতি ঈমান আনবে; আপনি বলে দিন নিদর্শনগুলো সমস্তই আল্লাহর অধিকারে এবং তোমাদের তার কি খবর যে, এই নিদর্শনগুলো যখন উপস্থিত হবে তখনও তারা ঈমান আনবে না।

وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ (١١٠)

(১১০) আর আমিও তাদের অন্তরসমূহকে এবং চক্ষুসমূহকে ফিরিয়ে দিব যেরূপভাবে তারা তৎপ্রতি প্রথমবার ঈমান আনয়ন করেনি, এবং আমি তাদেরকে এদের অবাধ্যতার মধ্যে দিশেহারা অবস্থায় থাকতে দিব।

শাব্দিক অনুবাদ

(১০৭) وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ আর যদি আল্লাহর অভিপ্রেত হতো مَا أَشْرَكُوا তবে তারা শিরক করত না وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا আর আমি আপনাকে এদের পর্যবেক্ষক করিনি وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلٍ এবং আপনি তাদের উপর ক্ষমতাপ্রাপ্তও নন।

(১০৮) وَلَا تَسُبُّوا আর তাদেরকে গালি দিও না الَّذِينَ يَدْعُونَ এরা যাদের ইবাদত করে مِن دُونِ اللَّهِ আল্লাহ ব্যতীত فَيَسُبُّوا اللَّهَ কেননা তাহলে এরা আল্লাহর শানে বে-আদবী করবে عَدْوًا সীমালজ্ঘনপূর্বক بِغَيْرِ عِلْمٍ মূর্খতাবশতঃ كَذَٰلِكَ আমি এরূপেই زَيَّنَّا সুশোভিত করে রেখেছি لِكُلِّ أُمَّةٍ প্রত্যেক উম্মতের নিকট عَمَلَهُمْ তাদের কার্যকলাপকে ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِم مَّرْجِعُهُمْ অতঃপর স্বীয় প্রতিপালকের নিকটই তাদেরকে যেতে হবে فَيُنَبِّئُهُم তখন তিনি তাদেরকে জানিয়ে দিবেন بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ যা কিছুই তারা করত।

(১০৯) وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ আর তারা (কাফেররা) শপথসমূহে খুব দৃঢ়তার সাথে আল্লাহ তা'আলার নামে শপথ করল যে لَئِن جَاءَتْهُمْ آيَةٌ যদি তাদের নিকট কোনো নিদর্শন উপস্থিত হয় لَّيُؤْمِنُنَّ بِهَا তবে তারা অবশ্যই তার প্রতি ঈমান আনবে قُلْ আপনি বলে দিন إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ নিদর্শনগুলো সমস্তই আল্লাহর অধিকারে وَمَا يُشْعِرُكُمْ এবং তোমাদের তার কি খবর যে أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ এই নিদর্শনগুলো যখন উপস্থিত হবে তখনও তারা ঈমান আনবে না।

(১১০) وَنُقَلِّبُ আর আমিও ফিরিয়ে দিব أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ তাদের অন্তরসমূহকে এবং চক্ষুসমূহকে كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ যেরূপভাবে তারা তৎপ্রতি প্রথমবার ঈমান আনয়ন করেনি وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ এবং আমি তাদেরকে এদের অবাধ্যতার মধ্যে দিশেহারা অবস্থায় থাকতে দিব।

www.almodina.com

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(১০৮) وَلَا تَسُبُّوا الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَيَسُبُّوا اللّٰهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** আব্দুর রাজ্জাক কাতাদার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন যে, মুসলমানরা কাফেরদের উপাস্য, প্রতিমাও মূর্তিগুলোকে ভর্ৎসনা ও মন্দাচারী করত। ফলে কাফেররাও অজ্ঞতা বশতঃ শত্রুতামূলকভাবে সরাসরি আল্লাহ তা'আলকে ভর্ৎসনা ও মন্দাচারী করত। সুতরাং বাতেল মা'বুদকে গালি দিয়ে প্রকৃত মা'বুদ আল্লাহকে গালি না দেওয়ানোর পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[ইবনে কাছীর ১৬৭/২, বাহরে মুহীত ২০১/৪, রূহুল মা'আনী ২৫২/৪/৭]

(১০৯) وَاَقْسَمُوا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَآءَتْهُمْ اٰيَةٌ لَّيُؤْمِنُنَّ بِهَا الخ **আয়াতের শানে নুযূল– ১ :** হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন যে, আলোচ্য আয়াত কুরাইশদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে।

শানে নুযূল– ২ : ইবনে জারীর, মুহাম্মদ বিন কা'আব আল কুরাযীর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ কুরাইশদের সাথে কোনো বিষয় নিয়ে আলোচনায় ছিলেন। এরই মধ্যে তারা রাসূল ﷺ-কে বলল, হে মুহাম্মদ! এ বিষয়ে আমাদেরকে অবহিত করেন যে, হযরত মূসা (আ.)-এর সাথে কি এমন কোনো লাঠি ছিল, যা দ্বারা তিনি পাথরকে আঘাত করতেন? হযরত ঈসা (আ.) কি মৃতকে জীবিত করতে পারতেন? ছামূদ গোত্রের জন্য কি কোনো উটনী ছিল? আমাদের নিকটও এধরনের কোনো নিদর্শন নিয়ে আসুন, তাহলে আমরাও আপনাকে বিশ্বাস ও সমর্থন করব। তখন রাসূল ﷺ বললেন, কোনো বস্তুকে তোমাদের সামনে প্রকাশ করতে কামনা কর? তারা বলল, সাফা পর্বতকে স্বর্ণে পরিণত করে দাও। রাসূল ﷺ বললেন, আমি যদি এমন করি , তাহলে কি তোমরা আমাকে বিশ্বাস করবে? ওরা বলল, হ্যাঁ, আল্লাহর শপথ আপনি যদি এমন করতে সক্ষম হন, অবশ্যই আমরা আপনার অনুসরণ করব। সুতরাং রাসূল ﷺ দোয়া করার লক্ষ্যে দাঁড়ালেন। তৎক্ষণাতই হযরত জিবরাঈল আমীন তাঁকে বললেন, আপনি যদি চান তাহলে সকালেই স্বর্ণে পরিণত হয়ে যাবে। যে সময় যদি তারা ঈমান না আনে, তবে আমি তাদেরকে কঠোর শাস্তি প্রদান করব। ইচ্ছা করলে আপনি তাদেরকে নিজ অবস্থায় রেখে দিন। যাতে তারা তওবা করে নেয়। রাসূল ﷺ বললেন, তারা ক্ষমা চেয়ে নিবে। রাসূল ﷺ-এর নিকট কুরাইশদের মু'জিযা চাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[ইবনে কাছীর ১৬৮/২, ফাতহুল কাদীর ১৫৪/২, রূহুল মা'আনী ২৫৩/৪/৭]

قوله لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْاَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ : আলোচ্য প্রথম আয়াতে اَبْصَارٌ শব্দটি بَصَرٌ-এর বহুবচন। এর অর্থ দৃষ্টি এবং দৃষ্টিশক্তি; ادراك শব্দের অর্থ পাওয়া, ধরা, বেষ্টন করা। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) এ স্থলে اِدْرَاكٌ শব্দের অর্থ বেষ্টন করা বর্ণনা করেছেন। –[বাহরে মুহীত]

এতে আয়াতের অর্থ হয় এই যে, নিজ, মানব, ফেরেশতা ও যাবতীয় জীব-জন্তুর দৃষ্টি একত্রিত হয়েও আল্লাহর সত্তাকে বেষ্টন করে দেখতে পারে না। পক্ষান্তরে আল্লাহ তা'আলা সমগ্র সৃষ্টজীবের দৃষ্টিকে পূর্ণরূপে দেখেন। এ সংক্ষিপ্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলার দুটি বিশেষ গুণ বর্ণিত হয়েছে। **এক.** সমগ্র সৃষ্ট জগতে কারো দৃষ্টি এমনকি সবার দৃষ্টি একত্রিত হয়েও তাঁর সত্তাকে বেষ্টন করতে পারে না।

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.)-এর এক রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : এ যাবত পৃথিবীতে যত মানুষ, জিন, ফেরেশতা ও শয়তান জন্মগ্রহণ করেছে এবং ভবিষ্যতে যত জন্মগ্রহণ করবে, তারা সবাই যদি এক কাতারে দাঁড়িয়ে যায়, তবে সবার সম্মিলিত দৃষ্টি দ্বারাও আল্লাহ তা'আলার সত্তাকে পুরোপুরি বেষ্টন করা সম্ভবপর নয়। –[মাযহারী]

এ বিশেষ গুণটি একমাত্র আল্লাহ তা'আলারই হতে পারে। নতুবা আল্লাহর দৃষ্টিকে এত শক্তি দিয়েছেন যে, ক্ষুদ্রতম জীবের ক্ষুদ্রতম চক্ষু পৃথিবীর বৃহত্তম মণ্ডলকে দেখতে পারে এবং চতুর্দিক বেষ্টন করে দেখতে পারে। সূর্য ও চন্দ্র কি বিরাট গ্রহ। এদের বিপরীতে পৃথিবী ও সমগ্র বিশ্ব কিছুই নয়। কিন্তু প্রত্যেক মানুষ; বরং ক্ষুদ্রতম জন্তুর চক্ষু এসব গ্রহকে চতুর্দিক বেষ্টন করে দেখতে পারে।

সত্যি বলতে কি, দৃষ্টি মানুষের একটি ইন্দ্রিয়বিশেষ। এর দ্বারা শুধু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়সমূহেরই জ্ঞান লাভ করা যায়। আল্লারহ পবিত্র সত্তা বুদ্ধি ও ধারণার বেষ্টনীরও উর্ধ্বে। দৃষ্টিশক্তি দ্বারা তাঁর জ্ঞান কিরূপে অর্জিত হতে পারে?

স্রষ্টার দর্শন সম্পর্কিত আলোচনা : মানুষ আল্লাহ তা'আলাকে দেখতে পারে কিনা? এ সম্পর্কে আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের বিশ্বাস এই যে, এ জগতে এটা সম্ভবপর নয়। এ কারণেই হযরত মূসা (আ.) যখন رَبِّ أَرِنِي (হে পরওয়ারদেগার! আমাকে দেখা দাও) বলে আল্লাহকে দেখতে চেয়েছিলেন, তখন উত্তরে বলা হয়েছিল : لَن تَرَانِي (তুমি কস্মিনকালেও আমাকে দেখতে পারবে না।) হযরত মূসা যখন এ উত্তর পেয়েছিলেন, তখন অন্য কোনো জিন ও মানুষের সাধ্য কি। তবে পরকালে মুমিনরা আল্লাহ তা'আলার সাক্ষাৎ লাভ করবে। একথা সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। স্বয়ং কুরআন পাকে বলা হয়েছে : وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ কিয়ামতের দিন অনেক মুখমণ্ডল সজীব ও প্রফুল্ল হবে। তারা স্বীয় পালনকর্তাকে দেখতে থাকবে।

তবে কাফের ও অবিশ্বাসীরা সেদিনও সাজা হিসেবে আল্লাহকে দেখার গৌরব থেকে বঞ্চিত থাকবে। কুরআনের এক আয়াতে বলা হয়েছে : كَلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ অর্থাৎ কাফেররা সেদিন স্বীয় পালনকর্তার সাক্ষাৎ থেকে বঞ্চিত থাকবে।

পরকালে বিভিন্ন স্থানে আল্লাহ তা'আলার সাক্ষাৎ ঘটবে– হাশরে অবস্থানকালেও এবং জান্নাতে পৌছার পরও। জান্নাতীদের জন্য আল্লাহর সাক্ষাতই হবে সর্ববৃহৎ নিয়ামত।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : জান্নাতিরা জান্নাতে প্রবেশ করার পর আল্লাহ বলবেন, তোমরা যেসব নিয়ামত প্রাপ্ত হয়েছ, এগুলোর চাইতে বৃহৎ আরো কোনো নিয়ামতের প্রয়োজন হলে বল, আমি তাও দিব। জান্নাতিরা নিবেদন করবে : ইয়া আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে দোজখ থেকে মুক্তি দিয়েছেন এবং জান্নাতে স্থান দিয়েছেন। এর বেশি আমরা আর কি চাইব। তখন মধ্যবর্তী পর্দা সরিয়ে নেওয়া হবে এবং সবার সাথে আল্লাহর সাক্ষাৎ হবে। এটিই হবে জান্নাতের সর্বশ্রেষ্ঠ নিয়ামত। এ হাদীসটি সহীহ মুসলিমে হযরত সোহাইব (রা.) থেকে বর্ণিত আছে।

বুখারীর এক হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক চন্দ্রালোকিত রাত্রে সাহাবীদের সমভিব্যাহারে উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি চাঁদের দিকে দৃষ্টিপাত করে বললেন, (পরকালে) তোমরা স্বীয় প্রতিপালককে এ চাঁদের ন্যায় চাক্ষুষ দেখতে পাবে।

তিরমিযী ও মুসনাদে আহমদের এক হাদীসে হযরত ইবনে ওমর (রা.)–এর রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ তা'আলা যাদেরকে জান্নাতে বিশেষ মর্যাদা দান করবেন, তাঁদেরকে প্রতিদিন সকাল-বিকাল সাক্ষাৎ দান করবেন।

মোটকথা, এ জগতে কেউ আল্লাহর সাক্ষাৎ লাভ করতে পারবে না এবং পরকালে সব জান্নাতি এ নিয়ামত লাভ করবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ মি'রাজের রাত্রে যে সাক্ষাৎ লাভ করেছেন, তাও প্রকৃতপক্ষে পরকালেরই সাক্ষাৎ শায়খ মুহিউদ্দীন ইবনে আরাবী (র.) বলেন, আকাশসমূহের মধ্যে সীমাবদ্ধ স্থানকেই জগত বা দুনিয়া বলা হয়। আকাশের উপর পরকালের স্থান। সেখানে পৌছে যে সাক্ষাৎ হয়েছে, তাকে পার্থিব সাক্ষাৎ বলা যায় না।

এখন প্রশ্ন থাকে যে, لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ আয়াত দ্বারা জানা গেল যে, মানুষ আল্লাহ তা'আলাকে দেখতেই পাবে না। এমতাবস্থায় কিয়ামতে কিরূপে দেখবে? এর উত্তর এই যে, 'আল্লাহকে দেখা মানুষের পক্ষে অসম্ভব।' আয়াতের অর্থ এটা নয়; বরং অর্থ এই যে, মানুষের দৃষ্টি তাঁর সত্তাকে চতুর্দিক বেষ্টন করে দেখতে পারে না। কারণ তাঁর সত্তা অসীম এবং মানুষের দৃষ্টি সসীম।

কিয়ামতের দেখাও চতুর্দিক বেষ্টন করে হবে না। দুনিয়াতে এরূপ দর্শন সহ্য করার মতো শক্তি মানুষের চোখে নেই। তাই দুনিয়াতে কোনো অবস্থাতেই দেখা যেতে পারে না। পরকালে এ শক্তি সৃষ্টি হবে এবং দেখা ও সাক্ষাৎ হতে পারবে। কিন্তু দৃষ্টিতে আল্লাহর সত্তাকে চতুর্দিক থেকে বেষ্টন করে দেখা তখনো হতে পারবে না।

আয়াতে বর্ণিত আল্লাহর দ্বিতীয় গুণ এই যে, তাঁর দৃষ্টি সমগ্র সৃষ্টজগতকে পরিবেষ্টনকারী। জগতের অণু-কণা পরিমাণ বস্তুও তাঁর দৃষ্টির অন্তরালে নয়। সর্বাবস্থায় এ জ্ঞান এবং জ্ঞানগত পরিবেষ্টনও আল্লাহ তা'আলারই বৈশিষ্ট্য। তাঁকে ছাড়া কোনো সৃষ্টজগত ও তার অণু-পরমাণুর এরূপ জ্ঞান লাভ কখনো হয়নি এবং হতে পারেও না। কেননা এটা আল্লাহ তা'আলারই বিশেষ গুণ।

এরপর ইরশাদ হয়েছে : وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ; আরবি অভিধানে لَطِيفٌ শব্দটি দু'অর্থে ব্যবহৃত হয়: এক. দয়ালু, দুই. সূক্ষ্ম বস্তু যা ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে অনুভব করা কিংবা জানা যায় না।

www.almodina.com

خَبِيْرٌ শব্দের অর্থ যে খবর রাখে। বাক্যের অর্থ এই যে, আল্লাহ সূক্ষ্ম তাই ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে তাঁকে অনুভব করা যায় না এবং তিনি খবর রাখেন। তাই সমগ্র সৃষ্টজগতের কণা পরিমাণ বস্তুও তাঁর জ্ঞান ও খবরের বাইরে নয়। এখানে لَطِيْفٌ শব্দের অর্থ দয়ালু নেওয়া হলে আলোচ্য বাক্যে এদিকে ইঙ্গিত হবে যে, তিনি যদিও আমাদের প্রত্যেক কণা ও কাজের খবর রাখেন এবং এজন্য আমাদের গুনাহর কারণে আমাদেরকে পাকড়াও করতে পারেন, কিন্তু যেহেতু তিনি দয়ালুও, তাই সব গুনাহর কারণেই পাকড়াও করেন না।

দ্বিতীয় আয়াতের بَصَائِرُ শব্দটি بَصِيْرَةٌ –এর বহুবচন। এর অর্থ বুদ্ধি ও জ্ঞান। অর্থাৎ যে শক্তি দ্বারা মানুষ অতিন্দ্রিয় বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে। আয়াতে بَصَائِرُ বলে ঐসব যুক্তি-প্রমাণ ও উপায়াদিকে বুঝানো হয়েছে, যেগুলো দ্বারা মানুষ সত্য ও বাস্তব রূপকে জানতে পারে। আয়াতের অর্থ এই যে, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে সত্য দর্শনের উপায়-উপকরণ পৌঁছে গেছে। অর্থাৎ কুরআন, রাসূল ﷺ ও বিভিন্ন মু'জিযা আগমন করেছে এবং তোমরা রাসূলের চরিত্র, কাজ-কর্ম ও শিক্ষা প্রত্যক্ষ করেছ। এগুলোই হচ্ছে সত্য দর্শনের উপায়।

অতএব, যে ব্যক্তি এসব উপায় ব্যবহার রে চক্ষুষ্মান হয়ে যায়, সে নিজেরই উপকার সাধন করে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি এসব উপায় পরিত্যাগ করে সত্য সম্পর্কে অন্ধ হয়ে থাকে, সে নিজেরই ক্ষতিসাধন করে।

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে : আমি তোমাদের সংরক্ষক নই। অর্থাৎ মানুষকে জবরদস্তিমূলকভাবে অশোভনীয় কাজ থেকে বিরত রাখা রাসূলুল্লাহ ﷺ –এর দায়িত্ব নয়, যেমনটি সংরক্ষকের দায়িত্ব হয়ে থাকে। রাসূলের একমাত্র দায়িত্ব হচ্ছে আল্লাহর নির্দেশাবলি পৌঁছে দেওয়া ও বুঝিয়ে দেওয়া। এরপর স্বেচ্ছায় সেগুলো অনুসরণ করা না করা মানুষের দায়িত্ব।

এরপর বলা হয়েছে : وَلِيَقُوْلُوْا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ –এর মর্ম এই যে, হেদায়েতের সব সাজ-সরঞ্জাম, মু'জিযা, অনুপম প্রমাণাদি- যেমন, কুরআন– একজন নিরক্ষরের মুখ দিয়ে এমন জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সত্য প্রাকশ করা, যা ব্যক্ত করতে জগতের সব দার্শনিক পর্যন্ত অক্ষম এবং এমন অলঙ্কারপূর্ণ কালাম উচ্চারিত হওয়া, যার সমতুল্য কালাম রচনা করার জন্য কিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী সমস্ত জিন ও মানবকে চ্যালেঞ্জ করার পরও সারা বিশ্ব অক্ষমতা প্রকাশ করেছে– সত্য দর্শনের এসব সরঞ্জাম দেখে যে কোনো হটকারী অবিশ্বাসীরও রাসূলুল্লাহ ﷺ –এর পদতলে লুটিয়ে পড়া উচিত ছিল, কিন্তু যাদের অন্তরে বক্রতা বিদ্যমান ছিল, তারা বলতে থাকে دَرَسْتَ অর্থাৎ এসব জ্ঞান-বিজ্ঞান আপনি কারো কাছ থেকে অধ্যয়ন করে নিয়েছেন।

সাথে সাথেই বলা হয়েছে : وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ –এর সারমর্ম এই যে, সঠিক বুদ্ধিমান ও সুস্থ জ্ঞানীদের জন্য এ বর্ণনা উপকারী প্রমাণিত হয়েছে। মোটকথা এই যে, হেদায়েতের সরঞ্জাম সবার সামনেই রাখা হয়েছে। কিন্তু কুটিল ব্যক্তিরা এর দ্বারা উপকৃত হয়নি। পক্ষান্তরে সুস্থ জ্ঞানী মনীষীরা এর মাধ্যমে বিশ্বের পথপ্রদর্শক হয়ে গেছেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ –কে বলা হয়েছে : কে মানে আর কে মানে না– আপনি তা দেখবেন না। আপনি স্বয়ং ঐ পথ অনুসরণ করুন, যা অনুসরণ করার জন্য পালনকর্তার পক্ষ থেকে আপনার প্রতি প্রত্যাদেশ আগমন করেছে। এর প্রধান বিষয় হচ্ছে এ বিশ্বাস যে, আল্লাহ ছাড়া উপাসনার যোগ্য আর কেউ নেই। এ প্রত্যাদেশ প্রচারের নির্দেশও রয়েছে। এর উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে মুশরিকদের জন্য পরিতাপ করবেন না যে, তারা কেন গ্রহণ করল না।

এর কারণ এই ব্যক্ত করা হয়েছে যে, আল্লাহ যদি সৃষ্টিগতভাবে ইচ্ছা করতেন যে, সবাই মুসলমান হয়ে যাক, তবে কেউ শিরক করতে পারত না। কিন্তু তাদের দুষ্কৃতির কারণ তিনি ইচ্ছা করেননি; বরং তাদেরকে শাস্তি দিতেই চেয়েছেন। তাই শাস্তির সরঞ্জামও সরবরাহ করে দিয়েছেন। এমতাবস্থায় আপনি তাদেরকে কিরূপে মুসলমান করতে পারেন? আপনি এ ব্যাপারে মাথা ঘামাবেন কেন, আমি আপনাকে তাদের সংরক্ষক নিযুক্ত করিনি এবং আপনি এসব কাজকর্মের জন্য তাদেরকে শাস্তি দেওয়ার জন্য আমার পক্ষ থেকে ক্ষমতাপ্রাপ্তও নন। কাজেই তাদের কাজ-কর্মের ব্যাপারে আপনার উদ্বিগ্ন না হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

আলোচ্য ১০৮ নং আয়াতটি একটি বিশেষ ঘটনা সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। এতে একটি গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক মাসআলা নির্দেশিত হয়েছে যে, যে কাজ করা বৈধ নয়, সে কাজের কারণ ও উপায় হওয়াও বৈধ নয়।

ইবনে জারীরের বর্ণনা অনুযায়ী আয়াতের শানে নুযূল এই : রাসূলুল্লাহ ﷺ –এর পিতৃব্য আবূ তালেব যখন অন্তিম রোগে শয্যাশায়ী ছিলেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ –এর শত্রুতায়, নির্যাতনে এবং তাঁকে হত্যার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত মুশরিক সর্দাররা

মহাফাঁপরে পড়ে যায়। তারা পরস্পর বলাবলি করতে থাকে : আবূ তালেবের মৃত্যু আমাদের জন্য কঠিন সমস্যা হয়ে দাঁড়াবে। তার মৃত্যুর পর আমরা যদি মুহাম্মদকে হত্যা করি, তবে এটা আমাদের আত্মসম্মান ও গৌরবের পরিপন্থি হবে। লোকে বলবে : আবূ তালেব জীবিত থাকতে তো তার কেশাগ্রও স্পর্শ করতে পারেনি, এখন একা পেয়ে তাকে হত্যা করেছে। কাজেই এখনও সময় আছে, চল আমরা সকলে মিলে স্বয়ং আবূ তালেবের সাথেই চূড়ান্ত কথাবার্তা বলে নেই।

প্রায় প্রতিটি শিক্ষিত মুসলমান জানে যে, আবূ তালেব মুসলমান না হলেও ভ্রাতুষ্পুত্রের প্রতি তাঁর অগাধ মহব্বত ছিল। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর শত্রুদের মোকাবিলায় সব সময় ঢাল হয়ে থাকতেন।

কতিপয় কুরাইশ সর্দারের পরামর্শক্রমে আবূ তালেবের কাছে যাওয়ার জন্য একটি প্রতিনিধিদল গঠন করা হলো। আবূ সুফিয়ান, আবূ জাহল, আমর ইবনে আস প্রমুখ সর্দার এ প্রতিনিধিদলের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সাক্ষাতের সময় নির্ধারণের জন্য মুত্তালিব নামক এক ব্যক্তিকে দায়িত্ব অর্পণ করা হলো। সে আবূ তালেবের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে প্রতিনিধি দলকে সেখানে পৌঁছিয়ে দিল।

তারা আবূ তালেবকে বলল : আপনি আমাদের মান্যবর এবং সর্দার। আপনি জানেন, আপনার ভ্রাতুষ্পুত্র মুহাম্মদ আমাদেরকে এবং আমাদের উপাস্যদেরকে ভীষণ কষ্টে ফেলে রেখেছেন। আমাদের অনুরোধ এই যে, তিনি যদি আমাদের উপাস্যদেরকে মন্দ না বলেন, তবে আমরা তাঁর সাথে সন্ধি স্থাপন করব। তিনি যেভাবে ইচ্ছা নিজ ধর্ম পালন করবেন, যাকে ইচ্ছা, উপাস্য করবেন; আমরা কিছুই বলব না।

আবূ তালেব রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে কাছে ডেকে বললেন : এরা সমাজের সর্দার, আপনার কাছে এসেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রতিনিধিদলকে সম্বোধন করে বললেন : আপানারা কি চান? তারা বলল : আমাদের বাসনা, আপনি আমাদেরকে এবং আমাদের উপাস্যদেরকে মন্দ বলা থেকে বিরত থাকুন। আমরাও আপনাকে এবং আপনার উপাস্যকে মন্দ বলব না। এভাবে পারস্পরিক বিরোধের অবসান হবে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : আচ্ছা, যদি আমি আপনাদের কথা মেনে নেই, তবে আপনারা কি এমন একটি বাক্য উচ্চারণ করতে সম্মত হবেন, যা উচ্চারণ করলে আপনারা সমগ্র আরবের প্রভু হয়ে যাবেন এবং অনারবরাও আপনাদের অনুগত ও করদাতায় পরিণত হয়ে যাবে?

আবূ জাহল উচ্ছ্বাসিত হয়ে বলল : এরূপ বাক্য একটি নয়, আমরা দশটি উচ্চারণ করতে সম্মত। বলুন বাক্যটি কি? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'। একথা শুনতেই তারা উত্তেজিত হয়ে উঠল। আবূ তালেবও রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বললেন : ভ্রাতুষ্পুত্র, এ কালিমা ছাড়া অন্য কোনো কথা বলুন। কেননা আপনার সম্প্রদায় এ কালিমা শুনে ঘাবড়ে গেছে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : চাচাজান! আমি এ কালিমা ছাড়া অন্য কোনো কালিমা বলতে পারি না। যদি তারা আকাশ থেকে সূর্যকে নিয়ে আসে এবং আমার হাতে রেখে দেয়, তবুও আমি এ কালিমা ছাড়া অন্য কিছু বলব না। এভাবে তিনি কুরাইশ সর্দারদেরকে নিরাশ করে দিলেন।

এতে তারা অসন্তুষ্ট হয়ে বলতে লাগল : হয় আপনি আমাদের উপাস্য প্রতিমাদেরকে মন্দ বলা থেকে বিরত হবেন, না হয় আমরা আপনাকেও গালি দিব এবং ঐ সত্তাকেও, আপনি নিজেকে যার রাসূল বলে দাবি করেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। وَلَا تَسُبُّوا الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَيَسُبُّوا اللّٰهَ عَدْوًاۢ بِغَيْرِ عِلْمٍ

অর্থাৎ আপনি ঐ প্রতিমাদেরকে মন্দ বলবেন না, যাদেরকে তারা উপাস্য বানিয়ে রেখেছে। তাহলে তারা আল্লাহকে মন্দ বলা শুরু করবে পথভ্রষ্টতা ও অজ্ঞতার কারণে।

এখানে لَا تَسُبُّوْا শব্দটি سَبٌّ ধাতু থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ গালি দেওয়া। রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বভাবগত চরিত্রের কারণে শৈশবকালেও কোনো মানুষকে; বরং কোনো জন্তুকেও কখনো গালি দেননি। সম্ভবতঃ কোনো সাহাবীর মুখ থেকে এমন কোনো কঠোর বাক্য বের হয়ে থাকতে পারে, যাকে মুশরিকরা গালি মনে করে নিয়েছে। কুরাইশ সর্দাররা এ ঘটনাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে রেখে ঘোষণা করেছে যে, আপনি আমাদের প্রতিমাদেরকেও গালি-গালাজ করা থেকে বিরত না হলে আমরা আপনার আল্লাহকেও গালি-গালাজ করব।

www.almodina.com

এতে কুরআনের এ নির্দেশ অবতীর্ণ হয়েছে। এতে মুশরিকদের মিথ্যা উপাস্যদের সম্পর্কে কোনো কঠোর বাক্য বলতে মুসলমানদেরকে নিষেধ করা হয়েছে। এখানে বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য যে, এর পূর্ববর্তী আয়াতে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ–কে সম্বোধন করা হচ্ছিল : যেমন বলা হয়েছে–

اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلٍ

এসব বাক্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ–কে সম্বোধন করা হয়েছিল যে, আপনি এমন করুন কিংবা এমন করবেন না। অতঃপর এ আয়াতে সম্বোধনকে রাসূলুল্লাহ থেকে ঘুরিয়ে সাধারণ মুসলমানদের দিকে করে দিয়ে। لَا تَسُبُّوا বলা হয়েছে। এতে এ দিকে ইঙ্গিত রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তো কখনো কাউকে গালি দেননি। কাজেই সরাসরি তাঁকে সম্বোধন করা হয়েছে। ফলে সব সাহাবায়ে কেরামও এ ব্যাপারে সাবধান হয়ে যান। –[বাহরে মুহীত]

এখন প্রশ্ন হয় যে, কুরআন পাকের অনেক আয়াতে কঠোর ভাষায় প্রতিমাদের কথা আলোচনা করা হয়েছে যে, এসব আয়াত রহিত নয়। অদ্যাবধি এগুলো তেলাওয়াত করা হয়।

উত্তর এই যে, কুরআনের আয়াতে যেখানে কঠোর ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে, সেখানে বিতর্ক হিসেবে কোনো সত্যকে ফুটিয়ে তোলার জন্য তা বলা হয়েছে। এরূপ ক্ষেত্রে কারো মনে কষ্ট দেওয়া উদ্দেশ্য নয় এবং কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তি এ সিদ্ধান্তে উপনীতি হতে পারে না যে, এতে প্রতিমাদেরকে মন্দ বলা কিংবা মুশরিকদের সাথে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করা হয়েছে। এ সুস্পষ্ট পার্থক্যটি প্রত্যেক ভাষার বিশেষ বাক-পদ্ধতি সম্পর্কে অভিজ্ঞ ব্যক্তি সহজেই বুঝতে পারে যে, কখনো কোনো বিষয়ের তথ্য উদঘাটনের উদ্দেশ্যে কোনো ব্যক্তির দোষ-ত্রুটি আলোচনা করা হয়; যেমন সাধারণতঃ আদালতসমূহে এরূপ হয়ে থাকে। আদালতের সামনে প্রদত্ত এ ধরনের বিবৃতিকে জগতের কেউ এরূপ বলে না যে, অমুক অমুককে গালি দিয়েছে। এমনিভাবে ডাক্তার ও হাকীমদের সামনে মানুষের অনেক দোষ বর্ণিত হয়। এগুলোই অন্যত্র ও অন্যভাবে বর্ণিত হলে গালি মনে করা হবে। কিন্তু চিকিৎসার উদ্দেশ্যে এগুলো বর্ণনা করাকে কেউ গালি মনে করে না।

এমনিভাবে কুরআন পাক স্থানে স্থানে প্রতিমাদের অচেতন, অজ্ঞান, শক্তিহীন ও অসহায় হওয়ার কথা এমনভাবে ব্যক্ত করেছে, যাতে বুদ্ধিমান ব্যক্তিমাত্রই তাদের প্রকৃত স্বরূপ বুঝে নিতে পারে এবং যারা বুঝতে পারে না; তাদের ভ্রান্তি ও অদূরদর্শিতাও ফুটে উঠে। বলা হয়েছে : ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ অর্থাৎ প্রতিমা ও প্রতিমার উপাসক উভয়ই দুর্বল। অন্যত্র বলা হয়েছে : إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ অর্থাৎ তোমরা এবং তোমাদের উপাস্য প্রতিমারা–সবই জাহান্নামের ইন্ধন। এখানেও কাউকে মন্দ বলা উদ্দেশ্য নয়– পথভ্রষ্টতা ও ভ্রান্তির কুপরিণাম ব্যক্ত করাই লক্ষ্য। ফিকহবিদগণ বর্ণনা করেছেন যে, কেউ এ আয়াতটি মুশরিকদের সাথে ব্যঙ্গ করার উদ্দেশ্য পাঠ করলে এ পাঠও নিষিদ্ধ গালির অন্তর্ভুক্ত এবং না-জায়েজ হবে। যেমন, মাকরূহ স্থানসমূহে কুরআন তেলাওয়াত যে না-জায়েজ, তা সবাই জানে।–[রূহুল মা'আনী]

মোটকথা রাসূলুল্লাহ ﷺ–এর মুখে এবং কুরআন পাকে পূর্বে এরূপ কোনো বাক্য উচ্চারিত হয়নি যাকে গালি বলা যায় এবং ভবিষ্যতেও উচ্চারিত হওয়ার আশঙ্কা ছিল না। তবে মুসলমানদের পক্ষ থেকে এরূপ হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। তাই আলোচ্য আয়াতে তা নিষেধ করা হয়েছে।

এ ঘটনা সম্পর্কিত কুরআনি নির্দেশ একটি বিরাট জ্ঞানের দ্বার উন্মুক্ত কর দিয়েছে এবং কতিপয় মৌলিক বিধান থেকে বের হয়ে এসেছে।

কোনো পাপের কারণ হওয়াও পাপ : উদাহরণতঃ একটি মূলনীতি এই বের হয়েছে যে, যে কাজ নিজ সত্তার দিক দিয়ে বৈধ; বরং কোনো না কোনো স্তরে প্রশংসনীয়ও, সে কাজ করলে যদি কোনো ফ্যাসাদ অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে কিংবা তার ফলশ্রুতিতে মানুষ গুনাহে লিপ্ত হয়ে পড়ে, তবে সে কাজও নিষিদ্ধ হয়ে যায়। কেননা মিথ্যা উপাস্য অর্থাৎ প্রতিমাদেরকে মন্দ বলা কমপক্ষে বৈধ অবশ্যই এবং ঈমানি মর্যদাবোধের দিক দিয়ে দেখলে সম্ভবতঃ নিজ সত্তায় ছওয়াব ও প্রশংসনীয়ও বটে, কিন্তু এর ফলশ্রুতিতে আশঙ্কা দেখা দেয় যে, প্রতিমাপূজারীরা আল্লাহ তা'আলাকে মন্দ বলবে। অতএব, যে ব্যক্তি প্রতিমাদরেকে মন্দ বলবে, সে এ মন্দের কারণ হয়ে যাবে। তাই এ বৈধ কাজটিও নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

হাদীসে এর আরো একটি দৃষ্টান্ত বর্ণিত হয়েছে। একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত আয়েশা (রা.)–কে বললেন : জাহেলিয়াত যুগে এক দুর্ঘটনায় কা'বাগৃহ বিধ্বস্ত হয়ে গেলে কুরাইশরা তার পুনঃনির্মাণ করে। এ পুনঃনির্মাণে কয়েকটি

www.almodina.com

বিষয় প্রাচীন ইবরাহীম ভিত্তির খেলাফ হয়ে গেছে। প্রথমতঃ কা'বার যে অংশকে 'হাতীম' বলা হয়, তাও কা'বাগৃহের অংশবিশেষ ছিল। কিন্তু পুনঃনির্মাণে অর্থাভাবের কারণে সে অংশ বাদ দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ কা'বা গৃহের পূর্ব ও পশ্চিম দিকে দু'টি দরজা ছিল। একটি প্রবেশের এবং অপরটি প্রস্থানের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। জাহেলিয়াত যুগের নির্মাতারা পশ্চিম দরজা বন্ধ করে একটি মাত্র দরজা রেখেছে। এটিও ভূপৃষ্ঠ থেকে উঁচে স্থাপন করেছে যাতে কেউ তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কা'বা গৃহে প্রবেশ করতে না পারে। রাসূলুল্লাহ ﷺ আরো বললেন : আমার আন্তরিক বাসনা এই যে, কা'বা গৃহের বর্তমান নির্মাণ ভেঙ্গে দিয়ে সম্পূর্ণরূপে হযরত ইবরহীম (আ.)–এর নির্মাণের অনুরূপ করে দেই। কিন্তু আশঙ্কা এই যে, তোমার সম্প্রদায় অর্থাৎ আরব জাতি নতুন নতুন মুসলমান হয়েছে। কা'বা গৃহ বিধ্বস্ত করলে তাদের মনে বিরূপ সন্দেহ দেখা দিতে পারে। তাই আমি আমার বাসনা মুলতবি রেখেছি।

এটা জানা কথা যে, কা'বা গৃহকে ইবরাহীমি ভিত্তির অনুরূপ নির্মাণ করা একটি ইবাদত ও ছওয়াবের কাজ ছিল। কিন্তু জনগণের অজ্ঞতার কারণে এতে আশঙ্কা আঁচ করে রাসূলুল্লাহ ﷺ এ পরিকল্পনা ত্যাগ করেন। এ ঘটনা থেকেও এ মূলনীতিই জানা গেল যে, কোনো বৈধ ছওয়াবের কাজও যদি কোনো অনিষ্ট অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে তবে সে বৈধ কাজও নিষিদ্ধ হয়ে যায়।

কিন্তু এতে রূহুল মা'আনী গ্রন্থে আবূ মনসূর কর্তৃক একটি আপত্তির বিষয় উল্লেখ রয়েছে। তা এই যে, আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদের উপর জিহাদ ও কাফের নিধন ফরজ করেছেন। অথচ কাফের নিধনের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হলো এই যে, কোনো মুসলমান কোনো কাফেরকে হত্যা করলে কাফেররাও মুসলমানদেরকে হত্যা করবে। অথচ মুসলমানকে হত্যা করা হারাম। এখানে জিহাদ মুসলমান হত্যার কারণ হয়েছে। অতএব, উপরিউক্ত মূলনীতি অনুযায়ী জিহাদও নিষিদ্ধ হওয়া উচিত। এমনিভাবে আমাদের প্রচারকার্য, কুরআন তেলাওয়াত, আজান ও নামাজের প্রতি অনেক কাফের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করে। অতএব, আমরা কি তাদের এ ভ্রান্ত কর্মের দরুন নিজ ইবাদত থেকেও হাত গুটিয়ে নিব?

এর জওয়াবও স্বয়ং আবূ মনসূর থেকে বর্ণিত আছে যে, একটি জরুরি শর্তের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শনের ফলে এ প্রশ্নের জন্ম হয়েছে। শর্তটি এই যে, ফ্যাসাদ অবশ্যম্ভাবী হওয়ার কারণে যে বৈধ কাজটি নিষিদ্ধ করা হয়, তা ইসলামের উদ্দিষ্ট ও জরুরি কর্মসমূহের অন্তর্ভুক্ত না হওয়া চাই। যেমন মিথ্যা উপাস্যদেরকে মন্দ বলা। এর সাথে ইসলামের কোনো উদ্দেশ্য সম্পর্কযুক্ত নয়। এমনিভাবে কা'বা গৃহের নির্মাণকে ইবরাহীমি ভিত্তির অনুরূপ করার উপরও ইসলামের কোনো উদ্দেশ্য নির্ভরশীল নয়। তাই এগুলো পরিত্যক্ত হয়েছে। পক্ষান্তরে যে কাজ স্বয়ং ইসলামের উদ্দেশ্য কিংবা কোনো ইসলামি উদ্দেশ্য যার উপর নির্ভরশীল, যদি বিধর্মীদের ভ্রান্ত আচরণের কারণে তাতে কোনো অনিষ্টও দেখা দেয়, তবুও এ জাতীয় উদ্দেশ্যকে কোনো অবস্থাতেই পরিত্যাগ করা হবে না; বরং এরূপ কাজ স্বস্থানে অব্যাহত রেখে যতদূর সম্ভব অনিষ্টের পথ বন্ধ করার চেষ্টা করা হবে।

এ কারণেই একবার হযরত হাসান বসরী ও মুহাম্মদ ইবনে সিরীন (র.) উভয়েই এক জানাযার নামাজে যোগদানের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। নিকটে পৌঁছে দেখলেন, সেখানে পুরুষদের সাথে সাথে মহিলাদেরও সমাবেশ হয়েছে। এ অবস্থা দেখে মুহাম্মদ ইবনে সিরীন (র.) সেখান থেকেই ফিরে গেলেন। কিন্তু হাসান বসরী (র.) বললেন, জনসাধারণের ভ্রান্ত কর্মপন্থার কারণে আমরা জরুরি কাজ কিরূপে ত্যাগ করতে পারি? জানাযার নামাজ ফরজ। উপস্থিত অনিষ্টের কারণে তা ত্যাগ করা যায় না। তবে অনিষ্ট দূরীকরণের জন্য যথাসম্ভব চেষ্টা করা হবে।

এ ঘটনাটিও রূহুল মা'আনীতে বর্ণিত রয়েছে। তাই আলোচ্য আয়াত থেকে উদ্ভূত মূলনীতির সারমর্ম এই যে, যে কাজ নিজ সত্তায় বৈধ বরং ফ্যাসাদ বা অনিষ্ট অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে, তবে তা বর্জন করা ওয়াজিব। পক্ষান্তরে কাজটি শরিয়তের উদ্দেশ্যাবলির অন্তর্ভুক্ত হলে অনিষ্ট অবশ্যাম্ভাবী হওয়ার কারণেও তা বর্জন করা যাবে না।

এ মূলনীতি অনুসরণ করে ফিকহবিদগণ হাজারো বিধান ব্যক্ত করেছেন। তাঁরা বলেছেন : পিতা যদি অবাধ্য পুত্র সম্পর্কে একথা জানেন যে, তাকে কোনো কাজ করতে বললে অস্বীকার করবে এবং বিরুদ্ধাচরণ করবে যদ্দরুন তার কঠোর গুনাহগার হওয়া অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়বে, তবে পিতার উচিত আদেশের ভঙ্গিতে কাজটি করতে বা না করতে বলার পরিবর্তে উপদেশের ভঙ্গিতে এভাবে বলবেন, অমুক কাজটি করলে খুবই ভালো হতো। এভাবে অস্বীকার অথবা বিরুদ্ধাচরণ করলেও একটি নতুন অবাধ্যতার গুনাহ পত্রের উপর বর্তাবে না। –[খোলাছাতুল ফতোয়া]

www.almodina.com

এমনিভাবে কাউকে উপদেশ দানের ক্ষেত্রেও যদি লক্ষণাদি দৃষ্টে জানা যায় যে, সে উপদেশ গ্রহণ করার পরিবর্তে কোনো কুকাণ্ড করে বসবে, যদ্দরুন আরো অধিকতর গুনাহে লিপ্ত হয়ে পড়বে, তবে তাকে উপদেশ প্রদান না করাই উত্তম। ইমাম বুখারী (র.) স্বীয় হাদীস গ্রন্থে এ বিষয়ে একটি স্বতন্ত্র অধ্যায় রেখেছেন।

بَابُ مَنْ تَرَكَ بَعْضَ الْاِخْتِيَارِ مَخَافَةَ اَنْ يَقْصُرَ فَهْمُ بَعْضِ النَّاسِ فَيَقَعُوْا فِىْ اَشَدَّ مِنْهُ

অর্থাৎ মাঝে মাঝে বৈধ; বরং উত্তম কাজও এজন্য পরিত্যাগ করা হয় যে, তাতে স্বল্পবুদ্ধি জনগণের কোনো ভুল বুঝাবুঝিতে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। তবে শর্ত এই যে, কাজটি ইসলামি উদ্দেশ্যসমূহের অন্তর্ভুক্ত না হওয়া চাই।

কিন্তু যে কাজ ইসলামি উদ্দেশ্যসমূহের অন্তর্ভুক্ত– ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নতে মোয়াক্কাদাহ অথবা অন্য কোনো প্রকার ইসলামি বৈশিষ্ট্য হবে তা করলে যদিও কিছু স্বল্পজ্ঞানী লোক ভুল বুঝাবুঝিতে লিপ্ত হয়, তবু এ কাজ কখনো ত্যাগ করা যাবে না; বরং অন্য পন্থায় তাদের ভুল বুঝাবুঝিরও ভ্রান্তি দূর করার চেষ্টা করা হবে। ইসলামের প্রাথমিক যুগের ঘটনাবলি সাক্ষ্য দেয় যে, নামাজ, কুরআন তেলাওয়াত ও ইসলাম প্রচারের কারণে কাফেররা উত্তেজিত হয়ে উঠত, কিন্তু এ কারণে এসব ইসলামি বৈশিষ্ট্য কখনো ত্যাগ করা হয়নি। স্বয়ং আলোচ্য আয়াতের শানে নুযূলে বর্ণিত আবূ জাহল প্রমুখের ঘটনার সারমর্ম তাই ছিল যে, কুরাইশ সর্দাররা তাওহীদ প্রচার ত্যাগ করার শর্তে সন্ধি স্থাপন করতে চেয়েছিল। কিন্তু উত্তরে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন যে, তারা যদি চন্দ্র ও সূর্য এনে আমার হাতে রেখে দেয়, তবুও আমি তাওহীদ প্রচার ত্যাগ করতে পারি না।

তাই এ মাসআলাটি এভাবে সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে, যে কাজ ইসলামি উদ্দেশ্যাবলির অন্তর্ভুক্ত, যদি তা করলে কিছু লোক ভুল বুঝাবুঝির শিকার হয়, তবুও তা কখনো ত্যাগ করা যাবে না। অবশ্য যে কাজ ইসলামি উদ্দেশ্যাবলির অন্তর্ভুক্ত নয়;বরং যা ত্যাগ করলে কোনো ধর্মীয় উদ্দেশ্য ব্যাহত হয় না, এ ধরনের কাজ অপরের ভুল বুঝাবুঝি অথবা ভ্রান্তির আশঙ্কার কারণে পরিত্যাগ করা উচিত।

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে উল্লেখ করা হয়েছিল যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুস্পষ্ট মু'জিযা ও আল্লাহ তা'আলার উজ্জ্বল নিদর্শনসমূহ দেখা সত্ত্বেও হঠকারী লোকের সেগুলো দ্বারা উপকৃত হয়নি এবং স্বীয় অস্বীকার ও জেদে অটল রয়েছে। পরবর্তী আয়াতসমূহে বলা হয়েছে যে, তারা স্বীয় জেদ ও নতুন সংস্করণ রচনা করে রাসূলুল্লাহ ﷺ–এর কাছে বিশেষ বিশেষ ধরনের মু'জিযা দাবি করেছে। যেমন ইবনে জারীরের বর্ণনা অনুযায়ী কুরাইশ সর্দাররা দাবি উত্থাপন করেছে যে, আপনি যদি সাফা পাহাড়টি স্বর্ণে পরিণত হওয়ার মু'জিযা আমাদেরকে দেখাতে পারেন। তবে আমরা আপনার নবুয়ত মেনে নিব এবং মুসলমান হয়ে যাব।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আচ্ছা, শপথ কর, যদি এ মু'জিযা প্রকাশ পায়, তবে তোমরা মুসলমান হয়ে যাবে। তারা শপথ করল। তিনি আল্লাহর কাছে দোয়া করার জন্য দাঁড়ালেন যে, এ পাহাড়কে স্বর্ণে পরিণত করে দিন। তৎক্ষণাৎ হযরত জিবরাঈল (আ.) প্রত্যাদেশ নিয়ে এলেন কিন্তু আল্লাহর আইনানুযায়ী এর পরিণাম হবে এই যে, এরপরও বিশ্বাস স্থাপন না করলে ব্যাপক আজাব নাজিল করে সবাইকে ধ্বংস করে দেওয়া হবে। বিগত সম্প্রদায়সমূহের বেলায়ও তাই হয়েছে। তারা বিশেষ কোনো মু'জিযা দাবি করার পর তা দেখানো হয়েছে। এরপরও যখন তারা বিশ্বাস স্থাপন করেনি, তখন তাদের উপর আল্লাহর গজব ও আজাব নাজিল হয়েছে। দয়ার সাগর রাসূলুল্লাহ ﷺ কাফেরদের অভ্যাস ও হঠকারিতা সম্পর্কে জ্ঞাত ছিলেন। তাই দয়াপরবশ হয়ে বললেন : এখন আমিও মু'জিযার দোয়া করি না। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয় : وَاَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ এতে কাফেরদের উক্তি বর্ণনা করা হয়েছে যে, তারা প্রার্থিত মু'জিযা প্রকাশিত হলে মুসলমান হওয়ার জন্য শপথ করল। এর পরবর্তী اِنَّمَا الْاٰيٰتُ عِنْدَ اللّٰهِ আয়াতে তাদের উক্তির জওয়াব দেওয়া হয়েছে যে, মু'জিযা ও নিদর্শন সবই আল্লাহর ইচ্ছাধীন। যেসব মু'জিযা ইতঃপূর্বে প্রকাশিত হয়েছে, সেগুলোও তাঁর পক্ষ থেকেই ছিল এবং যেসব মু'জিযা দাবি করা হচ্ছে, এগুলো প্রকাশ করতেও তিনি পূর্ণরূপে সক্ষম। কিন্তু বিবেক ও ইনসাফের দিক দিয়ে তাদের এরূপ দাবি করার কোনো অধিকার নেই। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ রেসালাতের দাবিদার এবং এ দাবির পক্ষে অনেক যুক্তি-প্রমাণ ও সাক্ষ্য মু'জিযা আকারে উপস্থিত করেছেন। এখন এসব যুক্তি-প্রমাণ ও সাক্ষ্য খণ্ডন করার এবং ভ্রান্ত প্রমাণিত করার অধিকার প্রতিপক্ষের আছে। কিন্তু এসব সাক্ষ্য খণ্ডন না করে অন্য সাক্ষ্য দাবি করার

www.almodina.com

সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। যেমন, আদালতে কোনো বিবাদী বাদীর উপস্থিত করার সাক্ষীদের অযোগ্যতা প্রমাণ না করেই দাবি করে বসে যে, আমি এসব সাক্ষীর সাক্ষ্য মানি না। অমুক নির্দিষ্ট ব্যক্তি সাক্ষ্য দিলে তা মেনে নিব। বাদির এ উদ্ভট দাবির প্রতি কোনো আদালতই কর্ণপাত করবে না।

এমনিভাবে নবুয়ত ও রেসালতের পক্ষে অসংখ্য নিদর্শন ও মু'জিযা প্রকাশিত হওয়ার পর এগুলো খণ্ডন না করা পর্যন্ত তাদর এরূপ বলার অধিকার নেই যে, আমরা তো অমুক ধরনের মু'জিযা দেখেই বিশ্বাস স্থাপন করব।

এরপর শেষ অবধি আয়াতসমূহে মুসলমানদেরকে সম্বোধন করে আদেশ করা হয়েছে যে, নিজে সত্য ধর্মে কায়েম থাকা এবং অপরের কাছে তা শুদ্ধরূপে পৌছে দেওয়াই হচ্ছে তোমাদের দায়িত্ব। এরপরও যদি তারা হঠকারিতা করে, তবে তাদের চিন্তায় মাথা ঘামানো উচিত নয়। কেননা জোর-জবরদস্তি করে কাউকে মুসলমান করা উদ্দেশ্য নয়। যদি তা উদ্দেশ্য হতো, তবে তা করতে আল্লাহর চাইতে শক্তিশালী কে? তিনি নিজেই সবাইকে মুসলমান করে দিতেন। এসব আয়াতে মুসলমানদেরকে সান্ত্বনা দান করার জন্য আরও বলা হয়েছে যে, আমি যদি প্রার্থিত মু'জিযাসমূহ সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ করে দেই, তবুও তারা বিশ্বাস স্থাপন করবে না। কেননা তাদের অস্বীকৃতি কোনো ভুল বুঝাবুঝি ও অজ্ঞতার কারণে নয়; বরং জেদ ও হঠকারিতার কারণে। কোনো মু'জিযা দ্বারা এর প্রতিকার হবার নয়।

শব্দ বিশ্লেষণ

شَيْئٌ : শব্দটি একবচন, বহুবচন اَشْيَاءُ অর্থ– জিনিস, বস্তু, দ্রব্য।

يُدْرِكُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِدْرَاكُ মূলবর্ণ (د. ر. ك) জিনস صحيح অর্থ– সে বেষ্টন করতে পারে, সে অনুধাবন করতে পারে।

بَصَآئِرُ : শব্দটি বহুবচন, একবচন بَصِيْرَةٌ অর্থ– স্পষ্ট প্রমাণ, নিদর্শনসমূহ।

لَاتَسُبُّوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ نهى حاضر معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلسَّبُّ মূলবর্ণ (س . ب . ب) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– তোমরা গালি দিও না।

يُنَبِّئُهُمْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّنْبِئَةُ মূলবর্ণ (ن . ب . ء) জিনস مهموز لام অর্থ– তিনি অবহিত করবেন, তিনি জানিয়ে দিবেন।

www.almodina.com

৮ম পারা

وَلَوْ اَنَّنَا نَزَّلْنَآ اِلَيْهِمُ الْمَلٰٓئِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتٰى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَّا كَانُوْا لِيُؤْمِنُوْٓا اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُوْنَ (١١١)

অনুবাদ : (১১১) আর যদি আমি ফেরেশতাগণকে তাদের নিকট পাঠাতাম এবং মৃতগণ তাদের সাথে কথা বলত এবং আমি সমস্ত বস্তুকে তাদের নিকট তাদের চোখের সম্মুখে একত্র করে দিতাম, তবুও তারা কখনো ঈমান আনত না, অবশ্য যদি আল্লাহই চান, তবে ভিন্ন কথা, কিন্তু তাদের অধিকাংশ লোকই মূর্খোচিত কথা বলে।

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيٰطِيْنَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ يُوْحِيْ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوْرًا ؕ وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوْهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُوْنَ (١١٢)

(১১২) আর এমনিভাবে আমি প্রত্যেক নবীর শত্রু বহু শয়তান সৃষ্টি করেছি, কতক মানুষ, কতক জিন, যাদের কতিপয় অপর কতিপয়কে মনভুলানো বাক্য দ্বারা কুমন্ত্রণা দিত প্রতারণার উদ্দেশ্যে, আর যদি আল্লাহ ইচ্ছা করতেন, তবে তারা এরূপ কাজ করত না, অতএব, তাদেরকে এবং তারা যে মিথ্যা রটনা করছে, তা [-র চিন্তা] ছেড়ে দিন।

وَلِتَصْغٰٓى اِلَيْهِ اَفْئِدَةُ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوْا مَا هُمْ مُّقْتَرِفُوْنَ (١١٣)

(১১৩) আর যেন এটার [কুমন্ত্রণার] প্রতি তাদের অন্তরগুলো আকৃষ্ট হয়ে পড়ে যারা আখেরাতের প্রতি ঈমান রাখে না, আর যেন তারা তাকে পছন্দ করে নেয় এবং যেন লিপ্ত হয়ে পড়ে ঐ সকল কাজে যাতে তারা লিপ্ত ছিল।

শাব্দিক অনুবাদ

(১১১) وَلَوْ اَنَّنَا نَزَّلْنَآ اِلَيْهِمُ الْمَلٰٓئِكَةَ আর যদি আমি ফেরেশতাগণকে তাদের নিকট পাঠাতাম وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتٰى এবং মৃতগণ তাদের সাথে কথা বলত وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا এবং আমি সমস্ত বস্তুকে তাদের নিকট তাদের চোখের সম্মুখে একত্র করে দিতাম مَّا كَانُوْا لِيُؤْمِنُوْٓا তবুও তারা কখনো ঈমান আনত না اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ অবশ্য যদি আল্লাহই চান, তবে ভিন্ন কথা وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُوْنَ কিন্তু তাদের অধিকাংশ লোকই মূর্খোচিত কথা বলে।

(১১২) وَكَذٰلِكَ আর এমনিভাবে جَعَلْنَا আমি সৃষ্টি করেছি لِكُلِّ نَبِيٍّ প্রত্যেক নবীর عَدُوًّا শত্রু شَيٰطِيْنَ বহু শয়তান الْاِنْسِ وَالْجِنِّ কতক মানুষ, কতক জিন يُوْحِيْ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ যাদের কতিপয় অপর কতিপয়কে কুমন্ত্রণা দিত زُخْرُفَ الْقَوْلِ মনভুলানো বাক্য দ্বারা غُرُوْرًا প্রতারণার উদ্দেশ্যে وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ আর যদি আল্লাহ ইচ্ছা করতেন مَا فَعَلُوْهُ তবে তারা এরূপ কাজ করত না فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُوْنَ অতএব, তাদেরকে এবং তারা যে মিথ্যা রটনা করছে, তা [-র চিন্তা] ছেড়ে দিন।

(১১৩) وَلِتَصْغٰٓى اِلَيْهِ اَفْئِدَةُ আর যেন এটার [কুমন্ত্রণার] প্রতি তাদের অন্তরগুলো আকৃষ্ট হয়ে পড়ে الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ যারা আখেরাতের প্রতি ঈমান রাখে না وَلِيَرْضَوْهُ আর যেন তারা তাকে পছন্দ করে নেয় وَلِيَقْتَرِفُوْا এবং যেন লিপ্ত হয়ে পড়ে ঐ সকল কাজে مَا هُمْ مُّقْتَرِفُوْنَ যাতে তারা লিপ্ত ছিল।

www.almodina.com

অনুবাদ	আয়াত
অনুবাদ : (১১৪) [আপনি বলুন] তবে কি আল্লাহ ভিন্ন অন্য কোনো মীমাংসাকারীকে অনুসন্ধান করব? অথচ তিনি এমন যে, তোমাদের নিকট একটি পূর্ণাঙ্গ কিতাব নাজিল করেছেন, যার বিষয়সমূহ বিশদরূপে বর্ণিত হয়েছে, আর যাদেরকে আমি কিতাব দান করেছি তারা এ কথাটি নিশ্চিতরূপে জানে যে, তা আপনার রবের পক্ষ হতে বাস্তবানুসারে প্রেরিত হয়েছে, অতএব, আপনি সন্দেহকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না।	أَفَغَيْرَ اللّٰهِ أَبْتَغِيْ حَكَمًا وَّهُوَ الَّذِيْٓ أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتٰبَ مُفَصَّلًا ؕ وَالَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَعْلَمُوْنَ أَنَّهٗ مُنَزَّلٌ مِّنْ رَّبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِيْنَ (١١٤)
(১১৫) আর আপনার রবের বাণী বাস্তবতা ও মধ্য পন্থার দিক দিয়ে পরিপূর্ণ, তাঁর বাণীর কোনো পরিবর্তনকারী নেই, এবং তিনি খুব শুনেন, খুব জানেন।	وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَّعَدْلًا ؕ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِهٖ ۚ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ (١١٥)
(১১৬) আর দুনিয়ার অধিকাংশ লোক এমন যে, যদি আপনি তাদের অনুসরণ করেন, তবে তারা আপনাকে আল্লাহর পথ হতে বিপথগামী করে দিবে, তারা কেবল অমূলক ধারণার অনুসরণ করে এবং সম্পূর্ণ কাল্পনিক কথা বলে।	وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوْكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ إِنْ يَّتَّبِعُوْنَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُوْنَ (١١٦)
(১১৭) নিশ্চয় আপনার রব তাদেরকে উত্তমরূপে জানেন, যারা তাঁর পথ হতে বিপথগামী হয়ে যায়, এবং তিনি তাদেরকেও উত্তমরূপে জানেন যারা তাঁর পথে চলে।	إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَّضِلُّ عَنْ سَبِيْلِهٖ ۚ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ (١١٧)
(১১৮) অতএব, যে জীবের উপর [জবাই কালে] আল্লাহর নাম উচ্চারিত হয়, তা হতে খাও, যদি তোমরা তাঁর নিদর্শনাবলির প্রতি ঈমান রাখ।	فَكُلُوْا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِاٰيٰتِهٖ مُؤْمِنِيْنَ (١١٨)

শাব্দিক অনুবাদ

(১১৪) أَفَغَيْرَ اللّٰهِ أَبْتَغِيْ حَكَمًا [আপনি বলুন] তবে কি আল্লাহ ভিন্ন অন্য কোনো মীমাংসাকারীকে অনুসন্ধান করব? وَهُوَ الَّذِيْٓ أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتٰبَ অথচ তিনি এমন যে, তোমাদের নিকট একটি পূর্ণাঙ্গ কিতাব নাজিল করেছেন مُفَصَّلًا যার বিষয়সমূহ বিশদরূপে বর্ণিত হয়েছে وَالَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ আর যাদেরকে আমি কিতাব দান করেছি يَعْلَمُوْنَ তারা এ কথাটি নিশ্চিতরূপে জানে যে أَنَّهٗ مُنَزَّلٌ مِّنْ رَّبِّكَ তা আপনার রবের পক্ষ হতে প্রেরিত হয়েছে بِالْحَقِّ বাস্তবানুসারে فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِيْنَ অতএব, আপনি সন্দেহকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না।

(১১৫) وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ আর আপনার রবের বাণী পরিপূর্ণ صِدْقًا وَّعَدْلًا বাস্তবতা ও মধ্য পন্থার দিক দিয়ে لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِهٖ তাঁর বাণীর কোনো পরিবর্তনকারী নেই وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ এবং তিনি খুব শুনেন, খুব জানেন।

(১১৬) وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ আর দুনিয়ার অধিকাংশ লোক এমন যে, যদি আপনি তাদের অনুসরণ করেন يُضِلُّوْكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ তবে তারা আপনাকে আল্লাহর পথ হতে বিপথগামী করে দিবে إِنْ يَّتَّبِعُوْنَ إِلَّا الظَّنَّ তারা কেবল অমূলক ধারণার অনুসরণ করে وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُوْنَ এবং সম্পূর্ণ কাল্পনিক কথা বলে।

(১১৭) إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ নিশ্চয় আপনার রব তাদেরকে উত্তমরূপে জানেন مَنْ يَّضِلُّ عَنْ سَبِيْلِهٖ যারা তাঁর পথ হতে বিপথগামী হয়ে যায় وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ এবং তিনি তাদেরকেও উত্তমরূপে জানেন যারা তাঁর পথে চলে।

(১১৮) فَكُلُوْا অতএব, তা হতে খাও مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ যে জীবের উপর [জবাই কালে] আল্লাহর নাম উচ্চারিত হয় إِنْ كُنْتُمْ بِاٰيٰتِهٖ مُؤْمِنِيْنَ যদি তোমরা তাঁর নিদর্শনাবলির প্রতি ঈমান রাখ।

www.almodina.com

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(১১১) قوله وَلَوْ اَنَّنَا نَزَّلْنَاۤ اِلَيْهِمُ الْمَلٰٓئِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتٰى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** মক্কার কতিপয় মুশরিক অলীক প্রশ্নাবলি উত্থাপন করেছিল, সে পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়েছে। ঘটনা প্রবাহ হচ্ছে যে, মক্কার মুশরিকদের একটি দল হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাই ওয়া সাল্লামের নিকট এসে বিদ্রূপাত্মকভাবে বলতে লাগল যে আমাদের যে সকল লোক দুনিয়া হতে চলে গেছে, তাদের ব্যাপারে আপনার নিকট আমাদের দাবি হচ্ছে যে, তাদেরকে জীবিত করে আনুন। আর তারা যেন আমাদেরকে আপনার আনীত বিধানের ব্যাপারে সমর্থন করে যান। যাতে আপনারা যা বলছেন তা সত্য না মিথ্যা সে সম্পর্কে জানতে পারি। অথবা ফেরেশতাদের একটি জামাত হাজির করে দেন, তাহলে তারা আপনার আল্লাহর রাসূল হবার সত্যতা সম্পর্কে সাক্ষ্য দিবে। না হয় আপনি আল্লাহ ও ফেরেশতাগণের সমন্বিত একটি জামাত এনে হাজির করুন, তাহলে তারা আপনি যে আল্লাহর প্রেরিত রাসূল সে কথা বলে দেবে। সে সময়ই মুশরিকদের এ দাবির অসারতা ও অযৌক্তিকতার জবাব দিয়ে চলমান পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হেয়েছে। –[মাআরেফুন নুযূল-৪৫০/১]

(১১৪) قوله اَفَغَيْرَ اللّٰهِ اَبْتَغِيْ حَكَمًا وَّهُوَ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ اِلَيْكُمُ الْكِتٰبَ مُفَصَّلًا الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** কুরাইশের মুশরিকরা একদা রাসূল ﷺ-কে বলল, আমাদের অনুপাতে ও তোমাদের মধ্যে ইহুদি পণ্ডিত পাদ্রীকে বিচারক নির্ধারণ করুন। আপনার ইচ্ছানুপাতে খ্রিস্টান পণ্ডিত পোপকে নির্ধারিত করে দিন। তাহলে তিনি আমাদেরকে তাদের কিতাবে আপনার সম্পর্কে যা রয়েছে সে অনুপাতে সংবাদ দিবেন। তখন সে পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। –[বাহরে মুহীত ২১১/৪]

(১১৬) قوله وَاِنْ تُطِعْ اَكْثَرَ مَنْ فِي الْاَرْضِ يُضِلُّوْكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** বর্ণিত আছে রাসূল ﷺ ও মুশরিকদের মাঝে জবাই করার জন্তু সম্পর্কীয় একটি বাদানুবাদের প্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। তাদের অভিযোগ ছিল। যে তোমরা যেগুলো হত্যা কর সেগুলো আহার কর, কিন্তু আল্লাহ তা'আলা যে গুলোকে হত্যা করেন সেগুলোকে তোমরা আহার করা থেকে বিরত থাক। সে পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[বাহরে মুহীত ২১৩/৪]

(১১৮) قوله فَكُلُوْا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ اِنْ كُنْتُمْ بِاٰيٰتِهٖ مُؤْمِنِيْنَ الاية **আয়াতের শানে নুযূল– ১ :** আল্লামা ওয়াহেদী (রা.) বর্ণনা করেন যে, একদা মুশরিকরা রাসূল ﷺ কে বলল যে, বকরিটি মারা গেল তাকে কে হত্যা করল? রাসূল ﷺ বললেন, আল্লাহ তা'আলা। তখন তারা বলল, পক্ষান্তরে যেগুলোকে তুমি হত্যা কর বা তোমার কোনো সহচর হত্যা করল, যাকে চিল ও কুকুর হত্যা করেছে। সেগুলো হালাল এবং যেগুলো আল্লাহ হত্যা করেছেন সেগুলোকে হারাম বলে ধারণা করছ। মুশরিকদের বিভ্রান্তিকর ও বিব্রতকর এ অভিযোগ উত্থাপন করার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

শানে নুযূল– ২ : ইকরিমা বলেন, মৃত জন্তু হারাম হবার বিধান যখন নাজিল হলো, তখন পারস্যের অগ্নি পূজারীরা কুরাইশ মুশরিকদের নিকট পত্র লিখল। আইয়ামে জাহেলিয়াতে মক্কার মুশরিক ও পারস্যের অগ্নি পূজারীরা ছিল একে অপরের বন্ধু এবং পারস্পরিকভাবে ছিল সন্ধিবদ্ধ এই মর্মে যে, মুহাম্মদ ﷺ ও তাঁর সঙ্গীদের ধারণা মতে তারা আল্লাহর হুকুমকে মান্য করে চলে তদুপরি তাদের বিশ্বাস তাদের হাতে যে সকল জন্তু মারে সেগুলো তাদের জন্য হালাল, পক্ষান্তরে আল্লাহ যেগুলোকে মারেন সেগুলো তাদের জন্য হারাম। এ মন্তব্য দ্বারা কোনো কোনো মুসলমানের অন্তরে এক প্রকারের সন্দেহ ও সংশয়ের দানা বেঁধে উঠে। মুমিনদের অন্তর হতে সে সন্দেহ ও সংশয় নিরসনের জন্য আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

শানে নুযূল– ৩ : ইমাম আবূ দাউদ ও তিরমিযী হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)–এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, এক জামাত ইহুদিরা নবী করীম ﷺ–এর নিকট এসে বলল, আমরা যে সকল জন্তুকে হত্যা করি

সেগুলো আমরা খাব আর যে সকল জন্তুকে আল্লাহ হত্যা করবেন সেগুলোকে কি আমরা খাব না? তাদের সন্দেহ ও সংশয়ের পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াতে নাজিল করেন। –[রূহুল মা'আনী ১৩, ফাতহুল কাদীর ১৫৭/২, কুরতুবী ৬৫/৭]

قوله وَلَوْ اَنَّنَا نَزَّلْنَآ আয়াতে এ বিষয়বস্তুই বর্ণিত হয়েছে যে, যদি আমি তাদের প্রার্থিত মু'জিযাসমূহ দেখিয়ে দেই; বরং এর চাইতেও বেশি ফেরেশতাদের সাথে তাদের সাক্ষাৎ এবং মৃতদের সাথে বাক্যালাপ করিয়ে দেই, তবুও তারা মানবে না। পরবর্তী দুই আয়াতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে যে, এরা যদি আপনার সাথে শত্রুতা করে, তবে তা মোটেই আশ্চর্যের বিষয় নয়। পূর্ববর্তী সব পয়গম্বরেরও অব্যাহতভাবে শত্রু ছিল। অতএব, আপনি এতে মনঃক্ষুণ্ন হবেন না।

قوله اَفَغَيْرَ اللّٰهِ اَبْتَغِيْ حَكَمًا অর্থাৎ তোমরা কি চাও যে, আল্লাহ তা'আলার এ ফয়সালার পর আমি অন্য কোনো ফয়সালাকারী অনুসন্ধান করি? না, তা হতে পারে না। এরপর কুরআন পাকের এমন কতিপয় বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হয়েছে, যেগুলো স্বয়ং কুরআনের সত্যতা এবং আল্লাহর কালাম হওয়ারই প্রমাণ। উদাহরণ স্বরূপ বলা হয়েছে: وَهُوَ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ اِلَيْكُمُ الْكِتٰبَ مُفَصَّلًا এ আয়াতে কুরআন পাকের চারটি বিশেষ পূর্ণতার কথা বর্ণিত হয়েছে: (এক) কুরআন আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ। (দুই) এটি একটি স্বয়ং-সম্পূর্ণ ও আলৌকিক গ্রন্থ-এর মোকাবিলা করতে সারা বিশ্ব অক্ষম। (তিন) যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক বিষয়বস্তু এতে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। (চার) পূর্ববর্তী আহলে কিতাব ইহুদি ও খ্রিস্টানরাও নিশ্চিতভাবে জানে যে, কুরআন আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ সত্য কালাম। এরপর তাদের মধ্যে যারা সত্যভাষী ছিল, তারা একথা প্রকাশও করেছে। পক্ষান্তরে যারা হঠকারী, তারা বিশ্বাস সত্ত্বেও তা প্রকাশ করেনি।

কুরআন পাকের এ চারটি পূর্ণতা বর্ণনা করার পর রাসূল ﷺ-কে সম্বোধন করা হয়েছে: فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِيْنَ অর্থাৎ "এসব সুস্পষ্ট প্রমাণের পর আপনি সংশয়কারীদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না।" এটা জানা কথা যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কোনো সময়ই সংশয়কারী ছিলেন না, থাকতে পারেন না, যেমন স্বয়ং তিনি বলেন: আমি কোনো সময় সন্দেহ করিনি এবং প্রশ্ন করিনি–[ইবনে কাছীর]। এতে বুঝা গেল যে, এখানে রাসূলুল্লাহ ﷺ–কে সম্বোধন করা হলেও প্রকৃতপক্ষে অন্যান্য লোকদের শোনানোই এর উদ্দেশ্য। এছাড়া বিষয়টিকে জোরদার করার উদ্দেশ্যে সরাসরি তাঁকে সম্বোধন করা হয়েছে। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ –কেই যখন এরূপ বলা হয়েছে। এগুলোও কুরআন পাক যে আল্লাহর কালাম, এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ। বলা হয়েছে وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَّعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِهٖ

অর্থাৎ আপনার পালনকর্তার কালাম সত্যতা, ইনসাফ ও সমতার দিক দিয়ে সম্পূর্ণ। তাঁর কালামের কোনো পরিবর্তনকারী নেই।

وَتَمَّتْ শব্দে সম্পূর্ণ হওয়া বর্ণিত হয়েছে এবং كَلِمَتُ رَبِّكَ বলে কুরআনকে বুঝানো হয়েছে। –[বাহরে মুহীত]। কুরআনের গোটা বিষয়বস্তু দু'প্রকার (এক) যাতে বিশ্ব ইতিহাসের শিক্ষণীয় ঘটনাবলি, অবস্থা, সৎকাজের জন্য পুরস্কারের ওয়াদা এবং অসৎ কাজের জন্য শাস্তির ভীতি প্রদর্শন বর্ণিত হয়েছে এবং (দুই) যাতে মানব জাতির কল্যাণ ও সাফল্যের বিধান বর্ণিত হয়েছে। কুরআন পাকের এ দুই প্রকার বিষয়বস্তু সম্পর্কে صِدْقًا وَّعَدْلًا দুই অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। صِدْق –এর সম্পর্ক প্রথম প্রকারের সাথে, অর্থাৎ কুরআন যেসব ঘটনা অবস্থা ওয়াদা ও ভীতি বর্ণিত হয়েছে, সেগুলো সবই সত্য ও নির্ভুল। এগুলোতে কোনোরূপ ভ্রান্তির সম্ভাবনা নেই। عَدْل -এর সম্পর্ক দ্বিতীয় প্রকার অর্থাৎ বিধানের সাথে। উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ তা'আলার সব বিধান عَدْل তথা ন্যায়বিচার ভিত্তিক। عَدْل শব্দের দু'টি অর্থ: **(এক)** ইনসাফ, যাতে কারও প্রতি অবিচার ও অধিকার হরণ করা হয় না। **(দুই)** সমতা ও সুষমতা । অর্থাৎ আল্লাহর বিধান সম্পূর্ণরূপে মানবিক প্রবৃত্তির অনুসারীও নয় এবং এমনও নয় যে, মানবিক প্রেরণা ও স্বভাবগত ধারণক্ষমতা তা সহ্য করতে পারে না। অতএব আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, খোদায়ী বিধান সুবিচার ও সমতার উপর ভিত্তিশীল। এতে কারও প্রতি অবিচার নেই এবং এমন কোনো কঠোরতাও নেই যা মানুষ সহ্য করত পারে না। অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে: لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا অর্থাৎ

আল্লাহ তা'আলা ক্ষমতা ও সামর্থ্যের বাইরে কারো প্রতি কোনো বাধ্যবাধকতা আরোপ করেননি। আলোচ্য আয়াতে تَمَّتْ শব্দ ব্যবহার করে আরও বলা হয়েছে যে, কুরআনে শুধু صِدْق ও عَدْل বিদ্যামনই নয়; বরং কুরআন এসব গুণে সব দিক দিয়ে পূর্ণ ও স্বয়ং সম্পূর্ণ।

কুরআন পাকের যাবতীয় বিধান বিশ্বের সকল জাতি, কিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী বংশধর এবং পরিবর্তনশীল অবস্থার জন্য সুবিচার ও সমতাভিত্তিক। এ কথাটি একমাত্র আল্লাহ রচিত বিধানের মধ্যেই থাকা সম্ভবপর হতে পারে। জগতের কোনো আইনসত্তা কর্তমান ও ভবিষ্যত সকল অবস্থা পুরোপুরি অনুমান করে তদনুযায়ী কোনো আইন রচনা করতে পারে না। প্রত্যেক দেশ ও জাতি নিজ দেশ ও জাতির শুধু বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই আইন রচনা করে। এসব আইনের মধ্যেও অনেক বিষয় অভিজ্ঞতার পর সুবিচার ও সমতা পরিপন্থি দেখা গেলে সেগুলো পরিবর্তন করতে হয়। ভবিষ্যৎ অবস্থার প্রতি পুরোপুরি লক্ষ্য রেখে প্রত্যেক জাতি, প্রত্যেক দেশ ও প্রত্যেক অবস্থার জন্য সুবিচার ও সমতাভিত্তিক আইন রচনা করার বিষয়টি মানুষের চিন্তা-কল্পনারও অনেক উর্ধ্বে। এটা একমাত্র আল্লাাহ তা'আলার কালামেই সম্ভবপর। তাই কুরআন পাকের এ পঞ্চম অবস্থাটি [অর্থাৎ কুরআন বর্ণিত অতীত ও ভবিষ্যতের ঘটনাবলি, পুরস্কারের ওয়াদা ও শাস্তির ভীতি প্রদর্শন সবই সত্য, এসব ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই। কুরআনে বর্ণিত যাবতীয় বিধান সমগ্র বিশ্ব ও কিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী বংশধরদের জন্য সুবিচার ও সমতাভিত্তিক, এগুলোতে কারও প্রতি অবিচার নেই এবং সমতা ও মধ্যবর্তিতার চুল পরিমাণ লঙ্ঘন নেই।] কুরআন যে আল্লাাহর কালাম তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

কুরআনের ষষ্ঠ অবস্থা এই যে, لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِهٖ অর্থাৎ আল্লাহর কালামের কোনো পরিবর্তনকারী নেই। পরিবর্তনের এক প্রকার হচ্ছে যে, এতে কোনো ভুল প্রমাণিত করার কারণে পরিবর্তন করা এবং দ্বিতীয় প্রকার হচ্ছে জবরদস্তি মূলকভাবে পরিবর্তন করা। আল্লাহর কালাম এ সকল প্রকার পরিবর্তনের উর্ধ্বে। আল্লাহ স্বয়ং ওয়াদা করেছেন: اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ অর্থাৎ আমিই কুরআন অবতীর্ণ করেছি এবং এর সংরক্ষক। এমতাবস্থায় কার সাধ্য আছে যে, এ রক্ষাহব্যুহ ভেদ করে একে পরিবর্তন করে? কুরআনের উপর দিয়ে চৌদ্দশত বছর অতিবাহিত হয়ে গেছে। প্রতি শতাব্দী ও প্রতি যুগে এর শত্রুদের সংখ্যাও এর অনুসারীদের তুলনায় বেশি ছিল। কিন্তু এর একটি যের ও যবর পরিবর্তন সম্ভবপর ছিলনা। তা এই যে, স্বয়ং অল্লাহ তা'আলা কুরআনের রহিত করে পরিবর্তন করাতে পারতেন। এ কারণেই হযরত আব্দুল্লাহ'ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন: এ আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, রাসুলুল্লাহ ﷺ সর্বশেষ পয়গাম্বর এবং কুরআনের অন্যান্য আয়াতে এ বিষয়বস্তুটি আরও সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে।

وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ অর্থাৎ তারা যেসব কথাবার্তা বলছে আল্লাহ সব শোনেন এবং সবার অবস্থা জানেন তিনি প্রত্যেকের কার্যের প্রতিফল দেবেন।

তৃতীয় আয়াতে আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে অবহিত করেছেন যে, পৃথিবীর অধিবাসীদের অধিকাংশই পথভ্রষ্ট। আপনি এতে ভীত হবেন না এবং তাদের কথায় কর্ণপাত করবেন না। কুরআনে একাধিক জায়গায় এ বিষয়টি বর্ণনা করেছে। এক জায়াগায় বলা হয়েছে: وَمَآ اَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِيْنَ উদ্দেশ্য এই যে, সংখ্যাধিক্যের ভীতি স্বভাবতই মানুষের মধ্যে প্রতিফলিত হয়। ফলে মানুষ তাদের আনুগত্য করতে থাকে কাজেই রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলা হয়েছে:

পৃথিবীতে অধিকাংশ লোক এমন রয়েছে যে, আপনি যদি তাদের নির্দেশ মান্য করেন, তবে তারা আপনাকে বিপথগামী করে দেবে। কেননা তারা বিশ্বাস ও মতবাদে শুধু মাত্র কল্পনা ও কুসংস্কারের পেছেনে চলে এবং বিধি বিধানে একমাত্র ভিত্তিহীন অনুমান দ্বারা চালিত হয়।

মোটকথা, আপনি তাদের সংখ্যধিক্যে ভীত হয়ে তাদের সাথে একাত্মতার কথা চিন্তাও করবেন না। কারণ এরা সবাই নীতিহীন ও বিপথগামী।

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে: যারা আল্লাহর পথ ছেড়ে বিপথগামী হয়ে যায় এবং যারা আল্লাহর পথে চলে, নিশ্চয় আপনার পালনকর্তা তাদের সবাইকে জানেন। অতএব, তিনি বিপথগামীদেরকে যেমন শাস্তি দেবেন, তিমনি সরল পথের অনুসারীদেরকেও পুরস্কৃত করবেন।

مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ এ বাক্যে ইচ্ছাধীন জবাই ও নিরূপায় অবস্থায় জবাই–উভয় প্রকারে জবাইকেই বুঝানো হয়েছে। নিরূপায় অবস্থার জবাই হচ্ছে তীর, বাজপক্ষী, কুকুরের শিকার করা জন্তু। এগুলো ছাড়ার সময় বিসমিল্লাহ পাঠ করলে এদের শিকার করা জন্তু জীবিত না পাওয়া গেলেও ইচ্ছাধীনভাবে জবাই করা জন্তু বলেই মনে করতে হবে। অবশ্য জীবিত পাওয়া গেলে ইচ্ছাধীনভাবে জবাই করতে হবে। জবাই করার সময় আল্লাহর নাম উচ্চরণও দুই প্রকারে হতে পারে। (এক) সত্যিকার উচ্চারণ এবং (দুই) অসত্যিকার ও নির্দেশগত উচ্চারণ। যেমন মুসলমান ব্যক্তি কর্তৃক ভুলক্রমে আল্লাহর নাম উচ্চারণ না করে জবাই করা। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে ভুলক্রমে আল্লাহর নাম উচ্চারণ না করলেও তা উপরিউক্ত বাক্যের অন্তর্ভুক্ত হবে এবং হালাল হবে। তবে ইচ্ছাকৃতভাবে না করলে হারাম হবে।

শব্দ বিশ্লেষণ

زُخْرُفٌ : শব্দটি একবচন। বহুবচন- زَخَارِفُ অর্থ– চাকচিক্যময়, মনভুলানো, চমকপ্রদ, সাজ, ভূষণ, শোভা।

مُقْتَرِفُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِقْتِرَافُ মূলবর্ণ (ق . ر . ف) জিনস صحيح অর্থ– পাপ করা, অন্যায় করা, কামাই করা, সম্পাদন করা।

لَاتَكُوْنَنَّ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ نهى حاضر معروف بانون ثقيله বাব نَصَرَ মাসদার اَلْكَوْنُ মূলবর্ণ (ك . و . ن) জিনস اجوف واوى অর্থ– অবশ্যই তুমি হয়ো না, তুমি হবে না।

يَخْرُصُوْنَ : সীগাহ جمع مذكرغائب বহছ مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْخَرْصُ মূলবর্ণ (خ . ر . ص) জিনস صحيح অর্থ– তারা অনুমানভিত্তিক কথা বলে, তারা কাল্পনিক কথাবার্তা বলে, তারা মিথ্যা কথাবার্তা বলে।

مُهْتَدِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِهْتِدَاءُ মূলবর্ণ (ه . د . ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– হোদায়েতপ্রাপ্ত, সুপথপ্রাপ্ত।

كُلُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْاَكْلُ মূলবর্ণ (ا . ك . ل) জিনস مهموز فاء অর্থ– তোমরা আহার কর, তোমরা ভক্ষণ কর, তোমরা খাও।

www.almodina.com

অনুবাদ : (১১৯) আর যে জীবের উপর আল্লাহর নাম উচ্চারিত হয়েছে তা হতে না খাওয়ার তোমাদের কি কারণ থাকতে পারে? অথচ আল্লাহ ঐ সকল জীবের বিস্তারিত বর্ণনা করে দিয়েছেন, যেগুলো তোমাদের জন্য হারাম করেছেন, কিন্তু তাও তোমাদের একান্ত প্রয়োজন হলে হালাল, আর তা সুনিশ্চিত যে, অনেকে স্বীয় ভ্রান্ত ধারণা অনুসারে বিভ্রান্ত করতে থাকে প্রমাণ ব্যতিরেকে, এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে খুব জানেন।	وَمَا لَكُمْ اَلَّا تَاْكُلُوْا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ اِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ اِلَيْهِ ؕ وَاِنَّ كَثِيْرًا لَّيُضِلُّوْنَ بِاَهْوَآئِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ؕ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِيْنَ (١١٩)
(১২০) আর তোমরা বর্জন কর প্রকাশ্য পাপও এবং অপ্রকাশ্য পাপও নিঃসন্দেহে যারা গুনাহ করছে, তারা স্বীয় কৃতকর্মের শাস্তি সত্বরই প্রাপ্ত হবে।	وَذَرُوْا ظَاهِرَ الْاِثْمِ وَبَاطِنَهٗ ؕ اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْسِبُوْنَ الْاِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوْا يَقْتَرِفُوْنَ (١٢٠)
(১২১) আর এমন জীব হতে ভক্ষণ করো না যার উপর আল্লাহর নাম উচ্চারিত হয়নি, এবং নিঃসন্দেহে তা গুনাহের কাজ, আর নিশ্চয় শয়তানরা স্বীয় বন্ধুদেরকে শিক্ষা দিচ্ছে, যেন তারা তোমাদের সাথে [অযথা] বিতর্ক করে, আর যদি তোমরা তাদের অনুসরণ করতে থাক, তবে নিশ্চয় মুশরিক হয়ে যাবে।	وَلَا تَاْكُلُوْا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَاِنَّهٗ لَفِسْقٌ ؕ وَاِنَّ الشَّيٰطِيْنَ لَيُوْحُوْنَ اِلٰٓى اَوْلِيٰٓئِهِمْ لِيُجَادِلُوْكُمْ ۚ وَاِنْ اَطَعْتُمُوْهُمْ اِنَّكُمْ لَمُشْرِكُوْنَ (١٢١)

শাব্দিক অনুবাদ

(১১৯) وَمَا لَكُمْ আর তোমাদের কি কারণ থাকতে পারে? اَلَّا تَاْكُلُوْا তা হতে না খাওয়ার مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ যে জীবের উপর আল্লাহর নাম উচ্চারিত হয়েছে وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ অথচ আল্লাহ ঐ সকল জীবের বিস্তারিত বর্ণনা করে দিয়েছেন مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ যেগুলো তোমাদের জন্য হারাম করেছেন اِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ اِلَيْهِ কিন্তু তাও তোমাদের একান্ত প্রয়োজন হলে হালাল وَاِنَّ كَثِيْرًا আর তা সুনিশ্চিত যে لَّيُضِلُّوْنَ বিভ্রান্ত করতে থাকে بِاَهْوَآئِهِمْ অনেকে স্বীয় ভ্রান্ত ধারণা অনুসারে بِغَيْرِ عِلْمٍ প্রমাণ ব্যতিরেকে اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِيْنَ এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে খুব জানেন।

(১২০) وَذَرُوْا আর তোমরা বর্জন কর ظَاهِرَ الْاِثْمِ وَبَاطِنَهٗ প্রকাশ্য পাপও এবং অপ্রকাশ্য পাপও اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْسِبُوْنَ الْاِثْمَ নিঃসন্দেহে যারা গুনাহ করছে سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوْا يَقْتَرِفُوْنَ তারা স্বীয় কৃতকর্মের শাস্তি সত্বরই প্রাপ্ত হবে।

(১২১) وَلَا تَاْكُلُوْا আর এমন জীব হতে ভক্ষণ করো না مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ যার উপর আল্লাহর নাম উচ্চারিত হয়নি وَاِنَّهٗ لَفِسْقٌ এবং নিঃসন্দেহে তা গুনাহের কাজ وَاِنَّ الشَّيٰطِيْنَ আর নিশ্চয় শয়তানরা لَيُوْحُوْنَ اِلٰٓى اَوْلِيٰٓئِهِمْ স্বীয় বন্ধুদেরকে শিক্ষা দিচ্ছে لِيُجَادِلُوْكُمْ যেন তারা তোমাদের সাথে [অযথা] বিতর্ক করে وَاِنْ اَطَعْتُمُوْهُمْ আর যদি তোমরা তাদের অনুসরণ করতে থাক اِنَّكُمْ لَمُشْرِكُوْنَ তবে নিশ্চয় মুশরিক হয়ে যাবে।

www.almodina.com

অনুবাদ	আয়াত
অনুবাদ : (১২২) এমন ব্যক্তি, যে পূর্বে মৃত [অর্থাৎ গোমরাহ] ছিল, অতঃপর আমি তাকে জীবিত [অর্থাৎ মুসলমান] করেছি, এবং তাকে এমন এক নূর [ঈমান] দিয়েছি, যা নিয়ে সে মানুষের মধ্যে চলাফেরা করে, এমন ব্যক্তি কি সেই ব্যক্তির ন্যায় হতে পারে যার অবস্থা এই যে, সে অন্ধকারপুঞ্জে রয়েছে [এবং] তা হতে বের হতে পারছে না, এরূপে কাফেরদের নিকট নিজেদের কার্যকলাপ সুশোভন বোধ হয়।	اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَاَحْيَيْنٰهُ وَجَعَلْنَا لَهٗ نُوْرًا يَّمْشِىْ بِهٖ فِى النَّاسِ كَمَنْ مَّثَلُهٗ فِى الظُّلُمٰتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا ؕ كَذٰلِكَ زُيِّنَ لِلْكٰفِرِيْنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ (١٢٢)
(১২৩) আর এরূপে আমি প্রত্যেক জনপদে তথাকার নেতৃস্থানীয় লোকদেরকে [প্রথমতঃ] পাপে লিপ্ত করেছি, যেন তারা তথায় শঠতা করতে থাকে, বস্তুতঃ তারা নিজেদের সঙ্গেই শঠতা করছে, অথচ তারা মোটেই অনুভব করছে না।	وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا فِىْ كُلِّ قَرْيَةٍ اَكٰبِرَ مُجْرِمِيْهَا لِيَمْكُرُوْا فِيْهَا ؕ وَمَا يَمْكُرُوْنَ اِلَّا بِاَنْفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُوْنَ (١٢٣)
(১২৪) আর যখন তাদের নিকট কোনো আয়াত সমাগত হয়, তখন এরূপ বলে, আমরা কিছুতেই ঈমান আনব না যে পর্যন্ত আমাদেরকেও তেমনি বস্তু [ওহী] না দেওয়া হয় যা আল্লাহর রাসূলগণকে দেওয়া হয়। সেই যোগ্য পাত্রকে তো আল্লাহই উত্তমরূপে জানেন যেখানে তিনি স্বীয় পয়গাম প্রেরণ করেন, অচিরেই এ সমস্ত লোক যারা এর অপরাধ করেছে, আল্লাহর নিকটে পৌঁছে অপমানিত হবে এবং কঠিন শাস্তি [-ও হবে] তাদের শঠতার বিনিময়ে।	وَاِذَا جَآءَتْهُمْ اٰيَةٌ قَالُوْا لَنْ نُّؤْمِنَ حَتّٰى نُؤْتٰى مِثْلَ مَآ اُوْتِىَ رُسُلُ اللّٰهِ ؔۘ اَللّٰهُ اَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهٗ ؕ سَيُصِيْبُ الَّذِيْنَ اَجْرَمُوْا صَغَارٌ عِنْدَ اللّٰهِ وَعَذَابٌ شَدِيْدٌۢ بِمَا كَانُوْا يَمْكُرُوْنَ (١٢٤)

শাব্দিক অনুবাদ

(১২২) اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا এমন ব্যক্তি, যে পূর্বে মৃত [অর্থাৎ গোমরাহ] ছিল فَاَحْيَيْنٰهُ অতঃপর আমি তাকে জীবিত [অর্থাৎ মুসলমান] করেছি وَجَعَلْنَا لَهٗ نُوْرًا এবং তাকে এমন এক নূর [ঈমান] দিয়েছি يَّمْشِىْ بِهٖ فِى النَّاسِ যা নিয়ে সে মানুষের মধ্যে চলাফেরা করে كَمَنْ مَّثَلُهٗ فِى الظُّلُمٰتِ এমন ব্যক্তি কি সেই ব্যক্তির ন্যায় হতে পারে যার অবস্থা এই যে, সে অন্ধকারপুঞ্জে রয়েছে لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا তা হতে বের হতে পারছে না كَذٰلِكَ এরূপে زُيِّنَ لِلْكٰفِرِيْنَ কাফেরদের নিকট সুশোভন বোধ হয় مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ নিজেদের কার্যকলাপ ।

(১২৩) وَكَذٰلِكَ আর এরূপে جَعَلْنَا فِىْ كُلِّ قَرْيَةٍ আমি প্রত্যেক জনপদে লিপ্ত করেছি اَكٰبِرَ مُجْرِمِيْهَا তথাকার নেতৃস্থানীয় লোকদেরকে [প্রথমতঃ] পাপে لِيَمْكُرُوْا فِيْهَا যেন তারা তথায় শঠতা করতে থাকে وَمَا يَمْكُرُوْنَ اِلَّا بِاَنْفُسِهِمْ বস্তুতঃ তারা নিজেদের সঙ্গেই শঠতা করছে وَمَا يَشْعُرُوْنَ অথচ তারা মোটেই অনুভব করছে না ।

(১২৪) وَاِذَا جَآءَتْهُمْ اٰيَةٌ আর যখন তাদের নিকট কোনো আয়াত সমাগত হয় قَالُوْا তখন এরূপ বলে لَنْ نُّؤْمِنَ আমরা কিছুতেই ঈমান আনব না حَتّٰى نُؤْتٰى যে পর্যন্ত আমাদেরকেও তেমনি বস্তু [ওহী] না দেওয়া হয় مِثْلَ مَآ اُوْتِىَ رُسُلُ اللّٰهِ যা আল্লাহর রাসূলগণকে দেওয়া হয় اَللّٰهُ اَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهٗ সেই যোগ্য পাত্রকে তো আল্লাহই উত্তমরূপে জানেন যেখানে তিনি স্বীয় পয়গাম প্রেরণ করেন سَيُصِيْبُ الَّذِيْنَ اَجْرَمُوْا অচিরেই এ সমস্ত লোক যারা এর অপরাধ করেছে صَغَارٌ عِنْدَ اللّٰهِ আল্লাহর নিকটে পৌঁছে অপমানিত হবে وَعَذَابٌ شَدِيْدٌ এবং কঠিন শাস্তি [-ও হবে] بِمَا كَانُوْا يَمْكُرُوْنَ তাদের শঠতার বিনিময়ে ।

www.almodina.com

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(১১৯) وَمَا لَكُمْ اَلَّا تَاْكُلُوْا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** ইমাম আবূ মানসূর (র.)-এর মতানুসারে উক্ত আয়াতের শানে নুযূল হলো এক শ্রেণির মুসলমানেরা পবিত্র ও উন্নত বস্তুসমূহকে দরবেশি ও পরহেজগারী স্বরূপ আহার করা থেকে বিরত থাকত। তাদের এহেন ধারণা সঠিক নয়, সে সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। -[রুহুর মাআনী ১৪/৪/৮]

(১২১) وَلَا تَاْكُلُوْا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ وَاِنَّهٗ لَفِسْقٌ الخ **আয়াতের শানে নুযূল- ১ :** ইমাম আবূ দাউদ হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে. তিনি বলেন একদা নবী করীম ﷺ-এর নিকট ইহুদিরা এসে বলল, আমরা নিজ হাতে যে জন্তুকে হত্যা করি সেগুলো আহার করি আল্লাহ যে জন্তুকে হত্যা করেন অর্থাৎ মৃত সেগুলোকে কি আমরা আহার করব না? তাদের ভ্রান্ত যুক্তির জবাবে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। -[কুরতুবী ৬৭/৭, ইবনে কাছীর ১৭৫/২]

শানে নুযূল-২ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, وَلَا تَاْكُلُوْا আয়াত যখন নাজিল হয় তখন পারস্য থেকে কুরাইশের নামে এই অভিযোগ দিয়ে দূত প্রেরণ করে যে, তারা মুহাম্মদের সাথে বাদানুবাদ করছে যে, তোমার নিজ হাতে ছুরি দ্বারা যে জন্তু জবাই করছ, তা হলো হালাল, আর আল্লাহর সোনালী ছুরি অর্থাৎ মৃত্যু দ্বারা যে জন্তু জবাই করেছেন তা হলো হারাম। পারসিকদের প্রেরিত এ কুটচালের তথ্য প্রকাশ করার প্রেক্ষিতে وَاِنَّ الشَّيٰطِيْنَ لَيُوْحُوْنَ اِلٰٓى اَوْلِيٰٓئِهِمْ لِيُجَادِلُوْكُمْ وَاِنْ اَطَعْتُمُوْهُمْ اِنَّكُمْ لَمُشْرِكُوْنَ আয়াতাংশ নাজিল করা হয়েছে। -[ইবনে কাছীর ১৭৫/২]

(১২২) اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَاَحْيَيْنٰهُ وَجَعَلْنَا لَهٗ نُوْرًا يَّمْشِيْ بِهٖ فِي النَّاسِ الخ **আয়াতের শানে নুযূল- ১ :** আবুশ শায়খ হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণনা করেন যে, আলোচ্য আয়াত হযরত ওমর বিন খাত্তাব (রা.) ও আবূ জাহল সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। এখানে জীবন দান দ্বারা ঈমান ও হেদায়ত দান এবং মৃত্যু দ্বারা ভ্রষ্টতা ও অবাধ্যতাকে বুঝানো হয়েছে।

শানে নুযূল- ২ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতেই অপর এক বর্ণনা অনুসারে আলোচ্য আয়াত হযরত হামযা (রা.) এবং আবূ জাহল সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে।

শানে নুযূল- ৩ : ইকরিমা হতে বর্ণিত আলোচ্য আয়াত আম্মার বিন ইয়াসির ও আবূ জাহল সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। -[রুহুল মা'আনী ১৯/৪/৮, বাহরে মুহীত ২১৬/৪]

শানে নুযূল- ৪ : ইবনুল মুনযির ও ইবনে আবী হাতেম, হযরত যায়েদ বিন আসলামের উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে. তিনি বলেন, আলোচ্য আয়াত হযরত ওমর বিন খাত্তাব (রা.) ও আবূ জাহল বিন হিশাম সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। তারা উভয়জনই ভ্রষ্টতার মৃত্যুতে ছিল। অতঃপর আল্লাহ ওমরকে ইসলাম দ্বারা জীবন দান করেছেন এবং সম্মান দান করেছেন। তাদের এ অবস্থার বর্ণনা দিয়ে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। -[ফাতহুল কাদীর ১৬০/২]

(১২৩) وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا فِيْ كُلِّ قَرْيَةٍ اَكٰبِرَ مُجْرِمِيْهَا لِيَمْكُرُوْا فِيْهَا الخ **আয়াতের শানে নুযূল- :** ইমামে তাফসীর আল্লামা হযরত ইকরিমা (র.) বলেন, আলোচ্য আয়াত কুরআন ও রাসূল ﷺ-কে নিয়ে যারা বিদ্রূপ করত, তাদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। -[বাহরে মুহীত ২১৬/৪, ফাতহুল কাদীর ১৬০/২]

(১২৪) وَاِذَا جَآءَتْهُمْ اٰيَةٌ قَالُوْا لَنْ نُّؤْمِنَ حَتّٰى نُؤْتٰى مِثْلَ مَآ اُوْتِيَ رُسُلُ اللهِ الخ **আয়াতের শানে নুযূল- ১ :** তাফসীরবিদ মুকাতিল বলেন, আলোচ্য আয়াত আবূ জাহল সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে এ মর্মে যে, সে বলেছিল যে, বনূ আব্দে মনাফের মর্যাদা অর্জনের ক্ষেত্রে আমরা হলাম প্রধান অন্তরায় বা প্রতিবন্ধক থাকব, যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা আমাদের ঘোড়ার ন্যায় আটকা পড়ব। তারা বলল, অমুক নাকি আমাদের মধ্য থেকে নবী, তার নিকট ওহী আসার দাবি করছে। আল্লাহর কসম আমি কখনো তা মেনে নেবনা এবং তার অনুসরণও করব না যে পর্যন্ত না আমার নিকট কোনো ওহী আসবে। সেই প্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়।

শানে নুযূল- ২ : আবার কারো মতে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে ওলীদ বিন মুগীরা সম্পর্কে। একদা ওলীদ বিন মুগীরা রাসূল ﷺ-কে লক্ষ্য করে বলল, নবুয়ত যদি সত্যিই কোনো মর্যাদার বিষয় হতো, তাহলে আমিই তার জন্য

তোমার অপেক্ষা অধিক যোগ্য ছিলাম, কারণ আমি বয়সে তোমার অপেক্ষা বড়, ধন, সম্পদ এবং সন্তান সন্ততিও তোমার অপেক্ষা আমার বেশি রয়েছে। সুতরাং তার জন্য আমি উপযুক্ত ব্যক্তি ছিলাম। ওলীদ বিন মুগীরা নবীগণের সমতার দাবি করার পরিপ্রেক্ষিতে এ নরাধমের জবাবে আল্লাহ তা'আলা উক্ত আয়াত নাজিল করেন। –[রূহুল মা'আনী ২১/৪/৮, কুরতুবী ৭১/৭, বাহরে মুহীত ২১৮/৭]

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে প্রথমে উল্লিখিত হয়েছিল যে, ইসলামের শত্রুরা রাসূলুল্লাহ ﷺ কুরআন পাকের খোলাখুলি মু'জিযা দেখা সত্ত্বেও জেদ ও হঠকারিতার বশতঃ নতুন নতুন মু'জিযা দাবি করে। অতঃপর কুরআন ব্যক্ত করেছে যে, যদি তারা বাস্তবিকই সত্যান্বেষী হতো, তবে এ যাবত যেসব মু'জিযা প্রকাশিত হয়েছিল, সেগুলো তাদেরকে সৎপথ প্রদর্শনের জন্য পর্যাপ্তের চেয়েও বেশি ছিল। অতঃপর সেসব মু'জিযা বর্ণিত হয়েছে।

আলোচ্য আয়াতে রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং কুরআনে বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীদের কিছু অবস্থা, চিন্তাধারা, উভয়ের সু ও কুপরিণামের বর্ণনা, মুমিন ও কাফের এবং ঈমান ওকুফরের স্বরূপ উদাহরণের মাধ্যমে বুঝানো হয়েছে। মুমিন ও কাফেরের দৃষ্টান্ত জীবিত ও মৃত দ্বারা এবং ঈমান ও কুফরের দৃষ্টান্ত আলো ও অন্ধকার দ্বারা দেওয়া হয়েছে। এগুলো কুরআন বর্ণিত দৃষ্টান্ত। এগুলোতে কবিত্ব নেই- আছে সত্যের উদঘাটন।

মুমিন জীবিত, আর কাফের মৃত : এ দৃষ্টান্তে মুমিনকে জীবিত এবং কাফেরকে মৃত বলা হয়েছে। এর কারণ এই যে, মানুষ , জীব-জন্তু, উদ্ভিদ ইত্যাদির মধ্যে জীবনের প্রকার ও রূপরেখা যদিও ভিন্ন ভিন্ন কিন্তু বিষয়টি কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তি অস্বীকার করতে পারো না যে, এদের মধ্যে প্রত্যেকের জীবনই কোনো বিশেষ লক্ষ্য অর্জনের নিমিত্ত। প্রকৃতি প্রত্যেকের মধ্যে সে লক্ষ্যার্জনের যোগ্যতা ও পারদর্শিতা নিহিত রেখেছে। أَعْطٰى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدٰى -কুরআনের এ বাক্যে এ বিষয়টিই বর্ণিত হয়েছে যে আল্লাহ তা'আলা বিশ্ব জাহানের প্রত্যেক বস্তু সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে অভীষ্ট লক্ষ্য পর্যন্ত পৌছানোর জন্য পূর্ণরূপে পথ প্রদর্শন করেছেন। এ পথপ্রদর্শন অনুযায়ী প্রত্যেক সৃষ্টজীব নিজ নিজ কর্তব্য সম্পর্কে পুরোপুরি সচেতন হয়ে তা পালন করে যাচ্ছে। কর্তব্য পালনই তাদের প্রত্যেকের জীবনের প্রমাণ। এদের মধ্যে যে বস্তু যখন যে অবস্থায় স্বীয় কর্তব্য পালন ত্যাগ করে, তখন সে জীবিত নয়– মৃত। পানি যদি স্বীয় কর্তব্য পিপাসা নিবারণ ও ময়লা নিষ্কাশন ইত্যাদি ছেড়ে দেয়, তবে তাকে পানি বলা যায় না। আগুন জ্বালানো পোড়ানো ছেড়ে দিলে আগুন থাকবে না। বৃক্ষ ও ঘাস উৎপন্ন হওয়া বেড়ে উঠা অতঃপর ফলে-ফুলে সমৃদ্ধ হওয়া ত্যাগ করলে বৃক্ষও উদ্ভিদ থাকবে না। কেননা সে স্বীয় জীবনের লক্ষ্যকে ত্যাগ করেছে। ফলে সে নিষ্প্রাণ মৃতের মতো হয়ে গেছে।

সমগ্র সৃষ্ট জগতের বিস্তারিত পর্যালোচনা করার পর সামান্য জ্ঞান-বুদ্ধি ও চেতনা সম্পন্ন ব্যক্তিও এ ব্যাপারে চিন্তা করতে বাধ্য হবে যে, মানুষের জীবনের লক্ষ্য ও কর্তব্য কি? সে যদি স্বীয় জীবনের লক্ষ্য অর্জনে ব্রতী হয়, তবে সে জীবিত বলে অভিহিত হওয়ার যোগ্য। নতুবা তার স্বরূপ একটি মৃতদেহের চেয়ে বেশি কিছু নয়।

এখন দেখতে হবে, মানুষের জীবনের লক্ষ্য ও কর্তব্য কি? উল্লিখিত নীতি অনুযায়ী একথা সুনির্দিষ্ট যে, সে যদি জীবনের লক্ষ্য ও কর্তব্য পালন করে যায়, তবে সে জীবিত, নতুবা মৃত বলে আখ্যায়িত হওয়ার যোগ্য। যেসব জ্ঞানপাপী পণ্ডিত মানুষকে জগতের একটি স্বউদগত ঘাস কিংবা একটি চালাক ধরনের জন্তু বলে সাব্যস্ত করেছে, যাদের মতে মানুষ ও গাধার মধ্যে কোনো স্বাতন্ত্র্য নেই এবং যারা মানবিক প্রবৃত্তি চরিতার্থ করা, পানাহার, নিদ্রা জাগরণ এবং অবশেষে মরে যাওয়াকেই মানব জীবনের লক্ষ্য হিসাবে স্থির করেছে, তারা প্রকৃত জ্ঞানীদের কাছে সম্বোধনের যোগ্যও নয়। বিশ্বের প্রত্যেক ধর্ম ও চিন্তাধারার সাথে সম্পর্কশীল মনীষীবৃন্দ সৃষ্টির আদিকাল থেকে অদ্যাবধি এ বিষয়ে একমত যে, মানুষ সৃষ্টির সেরা, আশরাফুল মাখলুকাত। এটা জানা কথা যে, যা জীবনের লক্ষ্য সেরা ও উত্তম হওয়ার দিক দিয়ে স্বতন্ত্র মর্যাদার অধিকারী, তাকেই সেরা ও উত্তম বলা যেতে পারে। প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তি একথাও জানে যে, পানাহার, নিদ্রা-জাগরণ, বসবাস ও পরিধানের ব্যাপারে অন্যান্য জীব-জন্তুর চেয়ে মানুষের বিশেষ কোনো স্বাতন্ত্র্য নেই; বরং অনেক জীবজন্তু মানুষের চেয়ে উত্তম ও বেশি পানাহার করে, মানুষের চেয়ে ভালো প্রাকৃতিক পোশাকে পরিবৃত এবং মানুষের চেয়ে উৎকৃষ্ট আলো-বাতাসে বসবাস করে। নিজের লাভ-লোকসান চেনার ব্যাপারেও প্রত্যেক জন্তু বরং প্রত্যেক উদ্ভিদ বেশ সচেতন। উপকারী বস্তু অর্জন এবং ক্ষতিকর বস্তু থেকে আত্মরক্ষার যথেষ্ট যোগ্যতা তারা রাখে। এমনি ভাবে অপরের উপকার সাধনের ব্যাপারে তো সকল জীবজন্তু উদ্ভিদ বাহ্যতঃ মানুষের চাইতেও অগ্রে। তাদের মাংস, চামড়া অস্থি, রগ, এবং বৃক্ষের শিকড় থেকে নিয়ে শাখা-প্রশাখা ও পত্র-পল্লব পর্যন্ত প্রতিটি বস্তু সৃষ্ট জীবের জন্য উপকারী। পক্ষান্তরে মানুষের মাংস, চামড়া, লোম, অস্থি, রগ, ইত্যাদি কোনো কাজেই আসে না।

www.almodina.com

এখন দেখতে হবে, এমতাবস্থায় মানুষ কিসের ভিত্তিতে সৃষ্টির সেরা পদে অভিষিক্ত হয়েছে? সত্যোপলব্ধির মনজিল এবার কাছেই এসে গেছে। সামান্য চিন্তা করলেই বোঝা যাবে যে, উপরিক্ত বস্তু সমূহের বুদ্ধি ও চেতনার দৌড় উপস্থিত জীবনের সাময়িক লাভ-লোকসান পর্যন্তই সীমাবদ্ধ। এ জীবনেই এগুলো অপরের জন্য উপকারি বলে দেখা যায়। পার্থিব জীবনের পূর্বে কি ছিল এবং পরে কি হবে- এ ক্ষেত্রে জড় পদার্থ ও উদ্ভিদের তো কথাই নেই, কোনো বৃহত্তম হুশিয়ার জন্তুর জ্ঞান চেতনাও কাজ করে না এবং এক্ষেত্রে এগুলোর মধ্যে কোনো বস্তুই কারও উপকারে আসে না। ব্যস, এক্ষেত্রেই সৃষ্টির সেরা মানুষকে কাজ করতে হবে এবং এর দ্বারাই অন্যান্য সৃষ্টজীব থেকে তার স্বাতন্ত্র্য পরিস্ফুট হতে পারে।

জানা গেল যে, মানুষের জীবনের লক্ষ্য হচ্ছে সমগ্র বিশ্বের আদি-অন্তকে সামনে রেখে সবার পরিণাম চিন্তা করে এটা নির্ধারণ করা যে, সামগ্রিক দিক দিয়ে কোন বস্তু উপকারী এবং কোন বস্তু ক্ষতিকর ও কষ্টদায়ক। অতঃপর এ জ্ঞানের আলোতে নিজের জন্য উপকারী বস্তু সমূহ অর্জন করা এবং ক্ষতিকর বস্তু সমূহ থেকে বেঁচে থাকা। অপরকেও এসব উপকারী বস্তু সমূহের প্রতি আহ্বান করা এবং ক্ষতিকর বস্তু সমূহ থেকে বাঁচিয়ে রাখতে সচেষ্ট হওয়া, যাতে চিরস্থায়ী সুখ, আরাম ও শান্তির জীবন অর্জিত হয়। যখন মানব জীবনের লক্ষ্য এবং মানবিক পূর্ণতার এ আদর্শগত উপকার নিজেকে অর্জন করতে হবে এবং অপরকে পৌছাতে হবে, তখন কুরআনের এ দৃষ্টান্ত বাস্তব রূপ ধারণ করে ফুটে উঠবে যে, ঐ ব্যক্তিই জীবিত যে, আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং বিশ্বের আদি-অন্ত ও এর সামগ্রিক লাভ লোকসানকে খোদায়ী প্রত্যাদেশের আলোকে যাচাই করে। কেননা নিছক মানবিক জ্ঞান বুদ্ধি কখনও এ কাজ করেনি এবং করত পারেও না। বিশ্বের বড় বড় পণ্ডিত ও দার্শনিক অবশেষে একথা স্বীকার করেছেন।

ঈমান আলো এবং কুফর অন্ধকার : ঈমানকে আলো এবং কুফরকে অন্ধকার বলা হয়েছে। চিন্তা করলে বুঝা যায়, এ দৃষ্টান্তটি মোটেই কাল্পনিক নয়। বাস্তব সত্যেরই বর্ণনা। আরোও অন্ধকারের আসল উদ্দেশ্য সম্পর্কে চিন্তা করলে দৃষ্টান্তের স্বরূপ ফুটে উঠবে আলোর উদ্দেশ্য হচ্ছে নিকট ও দূরের বস্তু সমূহ দেখা, যার ফলে ক্ষতিকর বস্তুসমূহ বেঁচে থাকা এবং উপকারী বস্তু সমূহকে অবলম্বন করার সুযোগ পাওয়া যায়।

এখন ঈমানকে দেখুন। সেটি একটি নূর, যার আলো সমগ্র আকাশ, ভূপৃষ্ঠ এবং এগুলোর বাইরের সব বস্তুতে প্রতিফলিত। একবার এ আলোই গোটা বিশ্বের পরিণাম এবং সব কিছুর বিশুদ্ধ ফলাফল দেখাতে পারে। যার কাছে এ নূর থাকে, সে নিজেও সব ক্ষতিকর বস্তু থেকে বাঁচতে পারে এবং অপরকেও বাঁচাতে পারে। পক্ষান্তরে যার কাছে এ আলো নেই, সে নিজে অন্ধকারে নিমজ্জিত। সামগ্রিক বিশ্বকে এবং গোটা জীবনের দিক দিয়ে কোন বস্তু উপকারী এবং কোন বস্তু অপকারী সে তা বাছাই করতে পারে না। শুধু হাতের কাছের বস্তু সমূহকে অনুমান করে কিছু চিনতে পারে। ইহকালীন জীবনই হচ্ছে তাদের কাছের পরিবেশ। কাফের ব্যক্তি পার্থিব ও ক্ষণস্থায়ী এ জীবন এবং এর লাভ-লোকসান চিনে নেয়। কিন্তু পরবর্তী চিরস্থায়ী জীবনের কোনো খবরই সে রাখেনা। এ জীবনের লাভ-লোকসানের কোনো অনুভূতিও তার নেই? কুরআন পাক এ বিষয়টি বুঝাবার জন্যই বলেছে: يَعْلَمُوْنَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْاٰخِرَةِ هُمْ غٰفِلُوْنَ অর্থাৎ তারা বহ্যিক পার্থিব জীবন এবং এর লাভ-লোকসান যৎসামান্য বোঝে, কিন্তু পরকাল সম্পর্কে এরা একেবারেই গাফেল।

অন্য এক আয়াতে পূর্ববর্তী কাফের সম্প্রদায়সমূহের কথা উল্লেখ করার পর কুরআন বলে: وَكَانُوْا مُسْتَبْصِرِيْنَ অর্থাৎ পরকালের ব্যাপারে এমন তীব্র গাফেল ব্যক্তিরা এ জগতে বোকা ও নির্বোধ ছিল না, বরং তারা ছিল উর্বর মস্তিষ্ক প্রগতি বাদী। কিন্তু এ বাহ্যিক চিন্তার ঔজ্জ্বল্য শুধু জগতের ক্ষণস্থায়ী জীবনের পরিপাটিতেই কাজে লাগাতে পারত। পরকালের চিরস্থায়ী জীবনে এর কোনো প্রভাব ছিল না।

এ বিবরণ শোনার পর আলোচ্য আয়াতটি পুনরায় পাঠ করুন: اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَاَحْيَيْنٰهُ وَجَعَلْنَا لَهٗ نُوْرًا يَّمْشِيْ بِهٖ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَّثَلُهٗ فِي الظُّلُمٰتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا উদ্দেশ্য এই যে, যে ব্যক্তি পূর্বে মৃত অর্থাৎ কাফের ছিল, অতঃপর আমি তাকে জীবিত করেছি অর্থাৎ মুসলমান করেছি এবং তাকে এমন একটি নূর অর্থাৎ ঈমান দিয়েছি, যা নিয়ে সে মানুষের মধ্যে চলাফেরা করে, সে কি ঐ ব্যক্তির সমতূল্য হতে পারে, যার অবস্থা এই যে, সে এমন অন্ধকারসমূহে পতিত। সে নিজেই নিজের লাভ-লোকসান চিনে না, অপরকে কি উপকার করবে।

ঈমানের আলোর উপকার অন্যরাও পায় : এ আয়াতে نُوْرًا يَّمْشِيْ بِهٖ فِي النَّاسِ বলে এ কথাও ব্যক্ত করা হয়েছে যে, ঈমানের আলো শুধু মসজিদ, খানকা, নির্জন প্রকোষ্ঠ কিংবা হুজরার মধ্যেই একে নিয়ে জনসমাবেশে চলাফেরা করে এবং সর্বত্র এর দ্বারা নিজেও উপকৃত হয় এবং অপরকেও উপকার পৌছায়। আলো কোনো অন্ধকারের কাছে পরাভূত হয় না। একটি

মিটিমিটি প্রদীপ ও অন্ধকারে নতি স্বীকার করে না, তবে প্রদীপের আলো দূর পর্যন্ত পৌঁছে না। কিরণ প্রখর হলে দূর পর্যন্ত পৌঁছে এবং নিস্তেজ হলে অল্প স্থান আলোকিত করে। কিন্তু সর্বাবস্থায়ই সে অন্ধকার ভেদ করে। অন্ধকার তাকে ভেদ করতে পারে না। অন্ধকার যে আলোকে ভেদ করে, সে আলোই নয়। এমনিভাবে যে ঈমান কুফরের কাছে পরাভূত হয়ে যায়, তা ঈমানই নয়। ঈমানের নূর মানব জীবনের সর্বক্ষেত্রে, সর্বাবস্থায় ও সর্বযুগে মানুষের সাথে থাকে।

এমনিভাবে এ দৃষ্টান্তে আরও একটি ইঙ্গিত রয়েছে যে, আলোর উপকারিতা প্রত্যেক মানুষ ও জীব-জন্তু ইচ্ছায় ও অনিচ্ছায় সর্বাবস্থায় কিছু না কিছু ভোগ করে। মনে করুন, আলোর মালিক চায় না যে, অন্য কেউ এ আলোর দ্বারা উপকৃত হোক এবং অপর ব্যক্তিও উপকার লাভের ইচ্ছা করেনি, কিন্তু কারো সাথে আলো থাকলে অনিচ্ছায় ও স্বাভাবিকভাবে সবাই তা দ্বারা উপকৃত হবে। এমনিভাবে মুমিনের ঈমান দ্বারা অন্যরাও কিছু না কিছু উপকার লাভ করে, সে অনুভব করুক বা না করুক। আয়াতের শেষে বলা হয়েছে : كَذٰلِكَ زُيِّنَ لِلْكٰفِرِيْنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ অর্থাৎ এসব স্পষ্ট ও খোলাখুলি প্রমাণ সত্ত্বেও কাফেরদের কুফরে অটল থাকার কারণ এই যে, প্রত্যেকেই নিজ ধারণায় একটা না একটা বাতিক পোষণ করে। শয়তান ও মানবিক প্রবৃত্তি তাদের মন্দ কাজকেই তাদের দৃষ্টিতে সুশোভিত করে রেখেছে। এটা মারাত্মক বিভ্রান্তি। (না'উযুবিল্লাহি মিনহু)।

قوله وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا فِيْ كُلِّ قَرْيَةٍ الخ : পূর্ববর্তী আয়াতের শেষভাগে বলা হয়েছিল যে, এ জগত একটি পরীক্ষাকেন্দ্র। এখানে সৎকর্মের সাথে যেমন কিছু পরিশ্রম. কষ্ট ও বাধা-বিপত্তি রয়েছে, তেমনি মন্দ কর্মের সাথে ক্ষণস্থায়ী আনন্দ এবং কামনা-বাসনার ধোঁকা সংযুক্ত রয়েছে। এ ধোঁকা অপরিণামদর্শী মানুষের দৃষ্টিতে তাদের মন্দ কাজকেই সুশোভিত করে রাখে। জগতের অনেক চতুর ব্যক্তিও এ ধোঁকায় লিপ্ত হয়ে পড়ে।

আলোচ্য আয়াতসমূহের প্রথমটিতে বর্ণিত হয়েছে যে, এটাও এ পরীক্ষারই এক পিঠ যে, পৃথিবীর আদিকাল থেকে প্রত্যেক জনপদের সর্দার ও ধনী ব্যক্তিরাই বাস্তব সত্য ও পরিণামফল থেকে উদাসীন হয়ে ক্ষণস্থায়ী আনন্দে বিভোর হয়ে অপরাধ করে থাকে এবং জনসাধারণ বড় লোকদের পিছনে চলা এবং তাদের অনুকরণ করাকেই সৌভাগ্য ও সাফল্য গণ্য করে। আম্বিয়া (আ.) ও তাঁদের নায়েব আলেম ও মাশায়েখগণ তাদেরকে মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখতে এবং পরিণামের প্রতি আকৃষ্ট করতে চাইলে বড় লোকেরা তাঁদের বিরুদ্ধে নানারকম চক্রান্ত করে। এসব চক্রান্ত বাহ্যতঃ পয়গম্বর আলেম ও মাশায়েখদের বিরুদ্ধে হলেও পরিণামের দিক দিয়ে এগুলোর শাস্তি স্বয়ং তাদের দিকেই প্রত্যাবর্তন করে এবং প্রায় সময় দুনিয়াতে তা প্রকাশ পায়।

এতে মুসলমানদেরকে হুশিয়ার করা হয়েছে যাতে তারা বড় লোক ও ধনীদের পদাঙ্ক অনুসরণ না করে, যেন তাদের পিছনে চলার অভ্যাস না করে, যেন পরিণাম দর্শিতা অবলম্বন করে এবং ভালো-মন্দ যেন নিজেই চিনে নেয়।

এছাড়া আয়াতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে যে, কুরাইশ সর্দারদের বিরুদ্ধাচরণে আপনি মনক্ষুণ্ন হবেন না। এটা নতুন ঘটনা নয়। পূর্ববর্তী পয়গম্বরদেরকেও এধরনের লোকের সাথে পালা পড়েছে। পরিণামে এরা অপমানিত ও লাঞ্ছিত হয়েছে এবং আল্লাহর বাণী সমুন্নত হয়েছে।

ইমাম বগভী (র.) বর্ণনা করেন যে, কুরাইশ প্রধান আবূ জাহল একবার বলল যে, আবদে মনাফ গোত্রের (অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর গোত্রের) সাথে আমরা প্রতি ক্ষেত্রেই প্রতিযোগিতা করেছি এবং কখনও পিছনে পড়িনি। কিন্তু এখন তারা বলে: তোমরা ভদ্রতা ও শ্রেষ্ঠত্বে আমাদের সমতুল্য হতে পারবে না। আমাদের পরিবারে একজন নবী আগমন করেছেন। তাঁর কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহী আসে। আবূ জাহল বলল : আল্লাহর কসম, আমরা কোনোদিনই তাদের অনুসরণ করব না, যে পর্যন্ত না আমাদের কাছে তাদের অনুরূপ ওহী আসে। আয়াতের وَاِذَا جَآءَتْهُمْ اٰيَةٌ قَالُوْا لَنْ نُّؤْمِنَ حَتّٰى نُؤْتٰى مِثْلَ مَاۤ اُوْتِيَ رُسُلُ اللّٰهِ বাক্যের অর্থ তাই।

নবুয়ত সাধনালব্ধ বিষয় নয়; বরং আল্লাহ প্রদত্ত একটি মহান পদ : কুরআন পাক এ উক্তি বর্ণনা করার পর জওয়াবে বলেছে– اَللّٰهُ اَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهٗ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলাই জানেন, হেদায়েত কাকে দান করতে হবে। উদ্দেশ্য এই যে, এ নির্বোধ মনে করে রেখেছে যে, নবুয়ত বংশগত সম্ভ্রান্ততা কিংবা গোত্রীয় সর্দারী ও ধনাঢ্যতার মাধ্যমে অর্জন করা যায়। অথচ নবুয়ত হচ্ছে আল্লাহর প্রতিনিধিত্বের একটি পদ। এটা অর্জন করা মানুষের ক্ষমতা বহির্ভূত। হাজারো গুণ অর্জন করার পরেও কেউ স্বেচ্ছায় অথবা গুণের জোরে রেসালত অর্জন করতে পারে না। এটা খাঁটি আল্লাহর দান। তিনি যাকে

ইচ্ছা দান করেন। এতে প্রমাণিত হয় যে, রেসালাত ও নবুয়ত উপার্জন করার বস্তু নয় যে, জ্ঞানগত ও কর্মগত গুণাবলি অথবা সাধনা ইত্যাদি দ্বরা অর্জন করা যাবে। আল্লাহর বন্ধুত্বের সুউচ্চ শিখর আরোহণ করেও কেউ নবুয়ত লাভ করতে পারে না বরং আল্লাহর এ খাঁটি অনুগ্রহ আল্লাহর জ্ঞান ও রহস্য অনুযায়ী বিশেষ বিশেষ বান্দাকে দান করা হয়। তবে এটা জরুরি যে, আল্লাহ যাকে এ পদমর্যাদা দিতে ইচ্ছা করেন তাকে প্রথম থেকেই এর জন্য উপযোগী করে গড়ে তোলা হয়, তাঁর চরিত্র ও কাজকর্ম বিশেষভাবে গঠন করা হয়।

আয়াতে বলা হয়েছে:

سَيُصِيْبُ الَّذِيْنَ اَجْرَمُوْا صَغَارٌ عِنْدَ اللّٰهِ وَعَذَابٌ شَدِيْدٌ بِمَا كَانُوْا يَمْكُرُوْنَ এখানে صَغَارٌ শব্দটি একটি ধাতু। এর অর্থ, অপমান ও লাঞ্ছনা। এ বাক্যের অর্থ এই যে, সত্যের যেসব শত্রু আজ স্বগোত্রে সর্দার ও বড় লোক খেতাবে ভূষিত, অতিসত্বর তাদের বড়ত্ব ও সম্মান ধুলায় লুণ্ঠিত হবে। আল্লাহর কাছে তারা তীব্র অপমান ও লাঞ্ছনা ভোগ করবে এবং কঠোর শাস্তিতে পতিত হবে।

'আল্লাহর কাছে' -এর অর্থ এই যে, কিয়ামতের দিন যখন তারা আল্লাহর সামনে উপস্থিত হবে, তখন অপমানিত ও লাঞ্ছিত অবস্থায় উপস্থিত হবে। অতঃপর তাদেরকে কঠোর শাস্তি দেওয়া হবে। দ্বিতীয় অর্থ এটাও হতে পারে যে, বর্তমানে বাহ্যত তারা সর্দার ও সম্মানিত হলেও আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদেরকে তীব্র অপমান ও লাঞ্ছনা স্পর্শ করবে। এমনটি দুনিয়াতেও হতে পারে এবং পরকালেও ; যেমন, পয়গাম্বরদের শত্রুদের ব্যাপারে জগতের ইতিহাসে এরূপ হতে দেখা গেছে। অর্থাৎ তাঁদের শত্রুরা পরিণামে দুনিয়াতেও লাঞ্ছিত হয়েছে। আমাদের প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর বড় বড় শত্রু, যারা নিজেরা সম্মানি বলে খুব আস্ফালন করত, তারা একে একে হয় ইসলাম গ্রহণ করে নিয়েছে, না হয় অপমানিত ও লাঞ্ছিত অবস্থায় ধ্বংস হয়ে গেছে। আবূ জাহল, আবূ লাহাব প্রমুখ কোরাইশ সর্দারদের শোচনীয় অবস্থা বিশ্ববাসীর চোখের সামনে ফুটে উঠেছে। মক্কা বিজয়ের ঘটনা তাদের সবার কোমর ভেঙ্গে দেয়।

শব্দ বিশ্লেষণ

اُضْطُرِرْتُمْ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ ماضى مجهول বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِضْطِرَارُ মূলবর্ণ (ض . ر . ر) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ- তোমরা নিরুপায় হয়েছ, তোমরা বাধ্য হয়েছ।

ذَرُوْا সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব سَمِعَ মাসদার اَلْوَذْرُ মূলবর্ণ (و . ذ . ر) জিনস مثال واوى অর্থ- তোমরা বর্জন কর, তোমরা পরিত্যাগ কর, তোমরা ছেড়ে দাও।

لَيُوْحُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِيْحَاءُ মূলবর্ণ (و . ح . ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ- তারা প্ররোচনা দেয়, তারা প্রত্যাদেশ করে, তারা শিক্ষা দিচ্ছে, তারা কুমন্ত্রণা দিচ্ছে।

زُيِّنَ সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى مجهول বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّزْيِيْنُ মূলবর্ণ (ز . ى . ن) জিনস اجوف يائى অর্থ- তাকে সুশোভিত করা হয়েছে, তাকে শোভন করে দেওয়া হয়েছে।

اَكٰبِرَ সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم تفضيل বাব كَرُمَ। মাসদার كِبَارَةٌ. كِبْرٌ মূলবর্ণ (ك . ب . ر) জিনস صحيح অর্থ- বড়, মহৎ, বয়স্ক, প্রবীণ।

www.almodina.com

অনুবাদ : (১২৫) অতএব, আল্লাহ যাকে হেদায়েত করতে ইচ্ছা করেন, তার অন্তরকে ইসলামের জন্য উন্মুক্ত করে দেন, এবং যাকে বিপথে রাখতে চান, তার অন্তরকে সঙ্কীর্ণ করে দেন, অতি সঙ্কীর্ণ যেমন কেউ আসমানে আরোহণ করছে, এভাবেই আল্লাহ লা'নত করে থাকেন, তাদেরকে যারা ঈমান আনয়ন করে না।

فَمَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ اَنْ يَّهْدِيَهٗ يَشْرَحْ صَدْرَهٗ لِلْاِسْلَامِ ۚ وَمَنْ يُّرِدْ اَنْ يُّضِلَّهٗ يَجْعَلْ صَدْرَهٗ ضَيِّقًا حَرَجًا كَاَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِى السَّمَآءِ ؕ كَذٰلِكَ يَجْعَلُ اللّٰهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ (١٢٥)

(১২৬) আর এটাই তোমার প্রতিপালকের [প্রদর্শিত] সরল পথ, আমি উপদেশ গ্রহণকারীদের জন্য এই আয়াতগুলোকে স্পষ্টরূপে বর্ণনা করে দিয়েছি।

وَهٰذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيْمًا ؕ قَدْ فَصَّلْنَا الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّذَّكَّرُوْنَ (١٢٦)

(১২৭) তাদের জন্য তাদের প্রতিপালকের নিকট রয়েছে, দারুসসালাম [জান্নাত] এবং আল্লাহ তা'আলা তাদের সাথে ভালোবাসা রাখেন তাদের আমলের দরুন।

لَهُمْ دَارُ السَّلٰمِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ (١٢٧)

(১২৮) আর যেদিন আল্লাহ সমস্ত সৃষ্ট জীবকে একত্রে সমবেত করবেন [এবং তিরস্কার করে বলবেন] হে জিন সম্প্রদায়! তোমরা মানব [-কে পথভ্রষ্ট করা]-এর মধ্যে প্রচুর অংশগ্রহণ করেছ, আর যে সমস্ত মানুষ তাদের সাথে সংস্রব রাখত তারা বলবে, হে আমাদের পরওয়ারদেগার! আমাদের মধ্যে একে অপর হতে উপকার প্রাপ্ত হয়েছি

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيْعًا ۚ يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِّنَ الْاِنْسِ ۚ وَقَالَ اَوْلِيٰٓؤُهُمْ مِّنَ الْاِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ

শাব্দিক অনুবাদ

(১২৫) فَمَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ اَنْ يَّهْدِيَهٗ অতএব, আল্লাহ যাকে হেদায়েত করতে ইচ্ছা করেন يَشْرَحْ صَدْرَهٗ لِلْاِسْلَامِ তার অন্তরকে ইসলামের জন্য উন্মুক্ত করে দেন وَمَنْ يُّرِدْ اَنْ يُّضِلَّهٗ এবং যাকে বিপথে রাখতে চান يَجْعَلْ صَدْرَهٗ ضَيِّقًا حَرَجًا তার অন্তরকে সঙ্কীর্ণ করে দেন, অতি সঙ্কীর্ণ كَاَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِى السَّمَآءِ যেমন কেউ আসমানে আরোহণ করছে كَذٰلِكَ এভাবেই يَجْعَلُ اللّٰهُ الرِّجْسَ আল্লাহ লা'নত করে থাকেন عَلَى الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ তাদেরকে যারা ঈমান আনয়ন করে না।

(১২৬) وَهٰذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيْمًا আর এটাই তোমার প্রতিপালকের [প্রদর্শিত] সরল পথ قَدْ فَصَّلْنَا الْاٰيٰتِ আমি এই আয়াতগুলোকে স্পষ্টরূপে বর্ণনা করে দিয়েছি لِقَوْمٍ يَّذَّكَّرُوْنَ উপদেশ গ্রহণকারীদের জন্য।

(১২৭) لَهُمْ دَارُ السَّلٰمِ তাদের জন্য রয়েছে, দারুসসালাম [জান্নাত] عِنْدَ رَبِّهِمْ তাদের প্রতিপালকের নিকট وَهُوَ وَلِيُّهُمْ এবং আল্লাহ তা'আলা তাদের সাথে ভালোবাসা রাখেন بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ তাদের আমলের দরুন।

(১২৮) وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيْعًا আর যেদিন আল্লাহ সমস্ত সৃষ্ট জীবকে একত্রে সমবেত করবেন [এবং তিরস্কার করে বলবেন] يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ হে জিন সম্প্রদায়! قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِّنَ الْاِنْسِ তোমরা মানব [-কে পথভ্রষ্ট করা]-এর মধ্যে প্রচুর অংশগ্রহণ করেছ وَقَالَ اَوْلِيٰٓؤُهُمْ مِّنَ الْاِنْسِ আর যে সমস্ত মানুষ তাদের সাথে সংস্রব রাখত তারা বলবে رَبَّنَا হে আমাদের পরওয়ারদেগার! اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ আমাদের মধ্যে একে অপর হতে উপকার প্রাপ্ত হয়েছি

অনুবাদ : এবং আমরা নিজেদের সেই নির্দিষ্ট সীমাকাল [কিয়ামত] পর্যন্ত পৌছেছি, যা আপনি আমাদের জন্য নির্ধারিত করেছেন, আল্লাহ বলবেন, তোমাদের সকলেরই ঠিকানা দোজখ– যাতে তোমরা চিরকাল থাকবে, হ্যাঁ, যদি আল্লাহর অভিপ্রায় হয়, তবে স্বতন্ত্র কথা, নিশ্চয় আপনার প্রতিপালক অতীব প্রজ্ঞাময়, মহাজ্ঞানী।	وَبَلَغْنَآ اَجَلَنَا الَّذِیْٓ اَجَّلْتَ لَنَا ؕ قَالَ النَّارُ مَثْوٰىكُمْ خٰلِدِیْنَ فِیْهَآ اِلَّا مَا شَآءَ اللّٰهُ ؕ اِنَّ رَبَّكَ حَكِیْمٌ عَلِیْمٌ (١٢٨)
(১২৯) আর এভাবেই আমি [দোজখে] কাফেরদের কতিপয়কে কতিপয়ের নিকটে রাখব তাদের কার্যকলাপের দরুন।	وَكَذٰلِكَ نُوَلِّیْ بَعْضَ الظّٰلِمِیْنَ بَعْضًۢا بِمَا كَانُوْا یَكْسِبُوْنَ (١٢٩)
(১৩০) হে জিন ও মানব সম্প্রদায়! তোমাদের নিকট কি তোমাদের মধ্য হতে রাসূলগণ আসেননি, যাঁরা তোমাদের নিকট আমার বিধানসমূহ বর্ণনা করতেন এবং তোমাদের আজকের এই দিনের সংবাদ প্রদান করতেন? তারা সকলে বলবে, আমরা নিজেদের [অপরাধ] স্বীকার করছি, আর তাদেরকে পার্থিব জীবন ভ্রমে ফেলে রেখেছে, আর তারা স্বীকারোক্তিকারী হবে যে, তারা কাফের ছিল।	یٰمَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اَلَمْ یَاْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ یَقُصُّوْنَ عَلَیْكُمْ اٰیٰتِیْ وَیُنْذِرُوْنَكُمْ لِقَآءَ یَوْمِكُمْ هٰذَا ؕ قَالُوْا شَهِدْنَا عَلٰۤی اَنْفُسِنَا وَغَرَّتْهُمُ الْحَیٰوةُ الدُّنْیَا وَشَهِدُوْا عَلٰۤی اَنْفُسِهِمْ اَنَّهُمْ كَانُوْا كٰفِرِیْنَ (١٣٠)

শাব্দিক অনুবাদ

وَبَلَغْنَآ اَجَلَنَا الَّذِیْٓ اَجَّلْتَ لَنَا এবং আমরা নিজেদের সেই নির্দিষ্ট সীমাকাল [কিয়ামত] পর্যন্ত পৌছেছি, যা আপনি আমাদের জন্য নির্ধারিত করেছেন قَالَ আল্লাহ বলবেন النَّارُ مَثْوٰىكُمْ তোমাদের সকলেরই ঠিকানা দোজখ– خٰلِدِیْنَ فِیْهَآ যাতে তোমরা চিরকাল থাকবে اِلَّا مَا شَآءَ اللّٰهُ হ্যাঁ, যদি আল্লাহর অভিপ্রায় হয়, তবে স্বতন্ত্র কথা اِنَّ رَبَّكَ حَكِیْمٌ عَلِیْمٌ নিশ্চয় আপনার প্রতিপালক অতীব প্রজ্ঞাময়, মহাজ্ঞানী।

(১২৯) وَكَذٰلِكَ আর এভাবেই نُوَلِّیْ আমি [দোজখে] রাখব بَعْضَ الظّٰلِمِیْنَ بَعْضًا কাফেরদের কতিপয়কে কতিপয়ের নিকটে بِمَا كَانُوْا یَكْسِبُوْنَ তাদের কার্যকলাপের দরুন।

(১৩০) یٰمَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ হে জিন ও মানব সম্প্রদায়! اَلَمْ یَاْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ তোমাদের নিকট কি তোমাদের মধ্য হতে রাসূলগণ আসেননি یَقُصُّوْنَ عَلَیْكُمْ اٰیٰتِیْ যাঁরা তোমাদের নিকট আমার বিধানসমূহ বর্ণনা করতেন وَیُنْذِرُوْنَكُمْ لِقَآءَ یَوْمِكُمْ هٰذَا এবং তোমাদের আজকের এই দিনের সংবাদ প্রদান করতেন? قَالُوْا তারা সকলে বলবে شَهِدْنَا عَلٰۤی اَنْفُسِنَا আমরা নিজেদের [অপরাধ] স্বীকার করছি وَغَرَّتْهُمُ الْحَیٰوةُ الدُّنْیَا আর তাদেরকে পার্থিব জীবন ভ্রমে ফেলে রেখেছে وَشَهِدُوْا عَلٰۤی اَنْفُسِهِمْ আর তারা স্বীকারোক্তিকারী হবে যে اَنَّهُمْ كَانُوْا كٰفِرِیْنَ তারা কাফের ছিল।

www.almodina.com

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(১২৫) فَمَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ اَنْ يَّهْدِيَهٗ يَشْرَحْ صَدْرَهٗ لِلْاِسْلَامِ الخ আয়াতের শানে নুযূল : ইমামে তাফসীর মুকাতিল (র.) বলেন, যে, আলোচ্য আয়াত হযরত রাসূলে আকরাম ﷺ এবং আবূ জাহল সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। –[বাহরে মুহীত ২১৯/৪]

ধর্ম সম্পর্কে বক্ষ উন্মুক্তকরণ এবং এর লক্ষণাদি : বলা হয়েছে : فَمَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ اَنْ يَّهْدِيَهٗ يَشْرَحْ صَدْرَهٗ لِلْاِسْلَامِ অর্থাৎ যাকে আল্লাহ তা'আলা হেদায়েত দিতে চান, তার বক্ষ ইসলামের জন্য উন্মুক্ত করে দেন।

হাকেম মুস্তাদরাক গ্রন্থে এবং বায়হাকী শোআবুল ঈমান গ্রন্থে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)–এর বাচনিক বর্ননা করেন যে, এ আয়াত অবতীর্ণ হলে সাহাবায়ে কোরাম (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ–কে شَرْحِ صَدْر অর্থাৎ বক্ষ উন্মুক্ত করণের তফসীর জিজ্ঞেস করেন। তিনি বললেন: আল্লাহ তা'আলা মুমিনের অন্তরে একটি আলো সৃষ্টি করে দেন। ফলে তার অন্তর সত্যকে নিরীক্ষণ করা, হৃদয়ঙ্গম করা এবং গ্রহণ করার জন্য উন্মুক্ত হয়ে যায়। [সত্যকে সহজে গ্রহণ করতে শুরু করে এবং অসত্যকে ঘৃণা করতে থাকে।] সাহাবায়ে কোরাম আরজ করলেন : এরূপ ব্যক্তিকে চেনার মতো কোনো লক্ষণ আছে কি? তিনি বরলেন: হ্যাঁ, লক্ষণ এই যে, এরূপ ব্যক্তির সমগ্র আশা আকাঙ্ক্ষা পরকাল ও পরকালের নিয়ামতের সাথ যুক্ত হয়ে যায়। সে পার্থিব অন্যায় কামনা-বাসনা এবং ধ্বংসশীল আনন্দ-উল্লাস থেকে বিরত থাকে এবং মৃত্যু আসার পূর্বেই মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হতে থাকে।

অতঃপর বলা হয়েছে وَمَنْ يُّرِدْ اَنْ يُّضِلَّهٗ يَجْعَلْ صَدْرَهٗ ضَيِّقًا حَرَجًا كَاَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِى السَّمَآءِ অর্থাৎ যাকে আল্লাহ তা'আলা পথভ্রষ্টতায় রাখতে চান, তার অন্তর সংকীর্ণ এবং অত্যধিক সংকীর্ণ করে দেন। সত্যকে গ্রহণ করা এবং তদনুযায়ী কাজ করা তার কাছে এমন কঠিন মনে হয়, যেমন কারও আকাশে আরোহণ করা।

তফসীরবিদ কালবী বলেন; তার অন্তর সংকীর্ণ হওয়ার অর্থ এই যে, তাতে সত্য ও সৎকর্মের জন্য কোনো পথ থাকে না। হযরত ফারূকে আযম (রা.) থেকেও এ বিষয়বস্তু বর্ণিত আছে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন : আল্লাহর জিকির থেকে তার মন বিমুখ থাকে এবং কুফর ও শিরকের কথাবার্তা নিবিষ্ট হয়।

সাহাবায়ে কেরাম ধর্মের ব্যাপারে উন্মুক্তবক্ষ ছিলেন : আল্লাহ তা'আলা সাহাবায়ে কেরামকে স্বীয় রাসূলের সংসর্গ এবং প্রত্যক্ষ শিষ্যত্বের জন্য মনোনীত করেছিলেন। ইসলামি বিধি বিধানে তারা খুব কমই সন্দেহ ও সংশয়ের সম্মুখীন হতেন। তাঁরা সারা জীবনে যেসব প্রশ্ন রাসূলুল্লাহ ﷺ–এর কাছে উত্থাপন করেন, সেগুলো গুণাগুণ কয়েকটি মাত্র। কারণ এই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ–এর সংসর্গের কল্যাণে আল্লাহর মাহাত্ম্য ও ভালোবাসা তাঁদের অন্তরে সুগভীর রেখাপাত করেছিল। ফলে তাঁরা شَرْحِ صَدْر তথা বক্ষ উন্মুক্তকরণের স্তরে উন্নীত হয়েছিলেন। তাঁদের অন্তর আপনা থেকেই সত্য ও মিথ্যার মানদণ্ডে পরিণত হয়েছিল। তাঁরা সত্যকে অতি সহজে কালবিলম্ব না করে গ্রহণ করে নিতেন এবং অসত্য তাঁদের অন্তরে পথ খুঁজে পেত না। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ–এর যুগ থেকে যতই দূরত্ব বাড়তে থাকে, সন্দেহ ও সংশয় ততই অন্তরে রাস্তা পেতে থাকে এবং বিশ্বাসের ক্ষেত্রে মতবিরোধ দেখা দিতে থাকে।

সন্দেহ দূর করার প্রকৃত পন্থা : আজ সমগ্র বিশ্ব এসব সন্দেহ ও সংশয়ের আবর্তে নিপতিত। তারা তর্ক-বিতর্কের মাধ্যমে এর মীমাংসা করতে সচেষ্ট। অথচ এটা এর নির্ভুল পথ নয়।

সাহাবায়ে কেরাম ও পূর্ববর্তী মনীষীবৃন্দ যে পথ ধরেছিলেন, সেটাই ছিল যথার্থ পথ। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার পরিপূর্ণ শক্তি ও নিয়ামত কল্পনায় উপস্থিত করে অন্তরে তাঁর মাহাত্ম্য ও ভালোবাসা সৃষ্টি করলে সন্দেহ সংশয় আপনা থেকেই দূর হয়ে যায়। এ কারণেই কুরআন পাক রাসূলুল্লাহ ﷺ–কে এ দোয়া করার আদেশ দিয়েছে : رَبِّ اشْرَحْ لِىْ صَدْرِىْ অর্থা' হে আমার পালনকর্তা, আমার বক্ষকে উন্মুক্ত করে দাও।

আয়াতের শেষে বলা হয় : كَذٰلِكَ يَجْعَلُ اللّٰهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা এমনিভাবে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে না, তাদের প্রতি ধিক্কার দেন। তাদের অন্তরে শত্য আসন পায় না এবং তারা প্রত্যেক মন্দ ও অপকর্মে সোল্লাসে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

আলোচ্য ১২৬ নং আয়াতে রাসূলুল্লাহ ﷺ–কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে- وَهٰذَا صِرَاطُ رَبِّكَ অর্থাৎ এটা আপনার পালনকর্তার সরল পথ। এখানে هٰذَا (এটা) শব্দ দ্বারা হযরত ইবনে মাসউদ (রা.)–এর মতে কুরআনের দিকে এবং হযরত

ইবনে আব্বাস (রা.)-এর মতে ইসলামের দিকে ইশারা করা হয়েছে। -[রূহুল মাআনী]। উদ্দেশ্য এই যে, আপনাকে প্রদত্ত কুরআন কিংবা ইসলাম আপনার পালনকর্তার পথ। অর্থাৎ এমন পথ , যা আপনার পালনকর্তা স্বীয় প্রজ্ঞার মাধ্যমে স্থির করেছেন এবং মনোনীত করেছেন। এখানে পথকে পালনর্তার দিকে সম্পৃক্ত করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, কুরআন ও ইসলামের যে কর্মব্যবস্থা রাসূলুল্লাহ ﷺ কে দেওয়া হয়েছে, তা পালন করা আল্লাহ তা'আলার উপকারের জন্য নয়; বরং পালনকারীদের উপকারের জন্য পালনকর্তার দাবির ভিত্তিতে দেওয়া হয়েছে। এর মাধ্যমে মানুষকে এমন এমন শিক্ষাই দান করা উদ্দেশ্য যা তাদের চিরস্থায়ী সাফল্য ও কল্যাণের নিশ্চয়তা বিধান করে।

এখানে رَبِّ শব্দকে রাসূল ﷺ –এর দিকে সম্বন্ধ করে তাঁর প্রতি এমন এক বিশেষ অনুগ্রহ ও কৃপা প্রকাশ করা হয়েছে যার বসাম্বাদন বিশেষ ব্যক্তিরাই অনুভব করতে পারেন। কেননা পালনকর্তা ও উপাস্যের সাথে কোনো বান্দার সামান্যতম সম্বন্ধ অর্জিত হয়ে যাওয়া ও তার জন্য পরম গৌরবের বিষয়। তদুপরি পরম পালনকর্তা নিজেকে বান্দার দিকে সম্বন্ধ করে বলেন। এরপর مُسْتَقِيْمًا শব্দ দ্বারা বর্ণিত হয়েছে যে, কুরআনের এ পথই হলো সরল পথ। এখানেও مُسْتَقِيْمًا -কে صِرَاط-এর বিশেষণ হিসেবে উল্লেখ না করে অবস্থা হিসেবে উল্লেখ করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, বিশ্ব পালকের স্থিরীকৃত পথ মুস্তাকীম ও সরল হওয়া ছাড়া আর কিছু হওয়ার সম্ভাবনাই নেই। –[রূহুল মা'আনী, বাহরে মুহীত]

এরপর قَدْ فَصَّلْنَا الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّذَّكَّرُوْنَ -অর্থাৎ আমি উপদেশ গ্রহণকারীদের জন্য আয়াত সমূহকে পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করেছি। বলা হয়েছে : এখানে فَصَّلْنَا শব্দটি تَفْصِيْل থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ কোনো বিষয়বস্তুকে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করে এক এক অধ্যায়কে পৃথক পৃথক করে বিশেষভাবে বর্ননা করা। এভাবে গোটা বিষয়বস্তু হৃদয়ঙ্গম হয়ে যায়। অতএব, تَفْصِيْل -এর সারমর্ম হচ্ছে বিস্তারিত ও বিশদভাবে বর্ণনা করা। উদ্দেশ্য এই যে, আমি মৌলিক বিষয়গুলোকে পরিস্কার ও বিশদভাবে বর্ণনা করেছি, এতে কোনো সংক্ষিপ্ততা বা অস্পষ্টতা রাখিনি। এতে لِقَوْمٍ يَّذَّكَّرُوْنَ বলে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, কোরআনের বক্তব্য পুরোপুরি সুস্পষ্ট ও পরিস্কার হলেও , তা দ্বারা একমাত্র তারাই উপকৃত হয়েছে, যারা উপদেশ গ্রহণের অভিপ্রায় কুরআনরে উপর চিন্তা ভাবনা করে, জেদ, হঠকারিতা এবং পৈতৃক প্রথার নিশ্চল অনুসরণের প্রাচীর যাদের সামনে অন্তরায় সৃষ্টি করে না।

لَهُمْ دَارُ السَّلٰمِ عِنْدَ رَبِّهِمْ –অর্থাৎ উপরিউক্ত ব্যক্তি, যারা মুক্ত মনে উপদেশ গ্রহণের অভিপ্রায়ে কুআনের পয়গাম নিয়ে চিন্তা ভাবনা করে এবং এর অবশ্যম্ভাবী পরিণতি স্বরূপ কুরআনি নির্দেশ মেনে চলে, তাদের জন্য তাদের পালনকর্তার কাছে 'দারুস-সালাম' –এর পুরস্কার সংরক্ষিত রয়েছে। এখানে 'দার' শব্দের অর্থ গৃহ এবং 'সালাম' -শব্দের অর্থ যাবতীয় বিপদাপদ থেকে নিরাপত্তা। কাজেই 'দারুস-সালাম' এমন গৃহকে বলা যায়, যেখানে কষ্ট-শ্রম, দুঃখ বিষাদ, বিপদাপদ ইত্যাদির সমাগম নেই। নিঃসন্দেহে এটা জান্নাতই হতে পারে।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন ; সালাম আল্লাহ তা'আলার একটি নাম। দারুস-সালামের অর্থ আল্লাহর গৃহ। আল্লাহর গৃহে বলতে শান্তি ও নিরাপত্তার স্থান বোঝায়। অতএব, সার অর্থ আবারও তাই হয় যে, এমন গৃহ যাতে শান্তি, সুখ, নিরাপত্তা ও প্রশান্তি বিদ্যমান। জান্নাতকে দারুস-সালাম বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, একমাত্র জান্নাতই এমন জায়গা, যেখানে মানুষ সর্বপ্রকার কষ্ট, উৎকণ্ঠা, উপদ্রব ও স্বভাব বিরুদ্ধ বস্তু থেকে পূর্ণরূপে ও স্থায়ী ভাবে নিরাপদ থাকে। এরূপ নিরাপত্তা জগতে কোনো রাজাধিরাজ এবং নবী-রাসূলও কখনও লাভ করেন না। কেননা ধ্বংসশীল জগত এরূপ পরিপূর্ণ ও স্থায়ী শান্তির জায়গাই নয়।

আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, এসব সৌভাগ্যশালীর জন্য তাদের প্রতিপালকের কাছে দারুস-সালাম রয়েছে। 'প্রতিপালকের কাছে' এর এক অর্থ এই যে, এ দারুস-সালাম ইহজগতে নগদ পাওয়া যায় না, কেয়ামতের দিন যখন তারা স্বীয় প্রতিপালকের কাছে যাবে, তখনই তা পাবে! দ্বিতীয় অর্থ এই যে, দারুস-সালাম ওয়াদা ভ্রান্ত হতে পারে না। প্রতি পালক নিজেই এর জামিন। তাঁর কাছে তা সংরক্ষিত রয়েছে। এতে এদিকও ইঙ্গিত রয়েছে যে, এ দারুস-সালামের নিয়ামত ও আরাম আজ কেউ কল্পনাও করতে পারে না। যে প্রতিপালকের কাছে এ ভাণ্ডার সংরক্ষিত আছে, তিনিই তা জানেন।

দ্বিতীয় অর্থের দিকে দিয়ে দারুস-সালাম লাভ করা কিয়ামত ও পরকালের উপর নির্ভরশীল মনে হয় না। বরং পালনকর্তা যাকে ইচ্ছা, এ জগতেও সর্বপ্রকার বিপদাপদ থেকে নিরাপত্তা দিয়ে দারুস-সালাম (শান্তির আবাস) দান করতে পারেন।

দুনিয়ার কোনো বিপদাপদই তাকে স্পর্শ করে না। যেমন, পূর্ববর্তী পয়গম্বর ও ওলীগণের মধ্যে এর নজির দেখতে পাওয়া যায়। আবার পরকালের নিয়ামত তার সামনে উপস্থিত করে তাঁর দৃষ্টিকে এমন সত্যদর্শী করে দেওয়া হয় যে, দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী বিপদাপদ তাঁর দৃষ্টিতে নিতান্ত নগণ্য বলে প্রতিভাত হতে থাকে। বিপদের পাহাড়ও তাকে বিন্দুমাত্র বিচলিত করতে পারে না।

এ আয়াতে সৎলোকের জন্য যে দারুস-সালামের কথা বলা হয়েছে, তা পরকালে তো নিশ্চিত ও অবধারিত, পরন্তু দুনিয়াতেও তাদেরকে দারুস-সালামের সুখ ও আনন্দ দেওয়া যেতে পারে।

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে : وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ অর্থাৎ তাদের সৎকর্মের কারণে আল্লাহ তা'আলা তাদের অভিভাবক, পৃষ্ঠপোষক ও সাহায্যকারী হয়ে যান। তাদের সব মুশকিল আসান হয়ে যায়।

তৃতীয় আয়াতে হাশরের ময়দানে সব জিন ও মানবকে একত্রিত করার পর উভয় দলের সাথে একটি প্রশ্ন ও উত্তর বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা শয়তান জিনদেরকে সম্বোধন করে তাদের অপরাধ ব্যক্ত করবেন এবং বলবেন : তোমরা মানব জাতিকে পথভ্রষ্ট করার কাজে বিরাট অংশ নিয়েছ। এর উত্তরে জিনরা কি বলবে, কুরআন তা উল্লেখ করেনি। তবে এটা বোঝা যায় যে, মহাজ্ঞানী ও সর্বজ্ঞ আল্লাহর সামনে স্বীকারোক্তি করা ছাড়া গতি নেই। কিন্তু তাদের স্বীকারোক্তি উল্লেখ না করার মধ্যেই ইঙ্গিত রয়েছে যে, এ প্রশ্ন শোনে তারা এমন হতবাক হয়ে যাবে যে, উত্তর দেওয়ার জন্য মুখই খুলতে পারবে না। –[রূহুল মা'আনী]

এরপর শয়তান মানব অর্থাৎ দুনিয়াতে যারা শয়তানদের অনুগামী ছিল, নিজেরাও পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং অপরকেও পথভ্রষ্ট করেছে, তাদের পক্ষ থেকে আল্লাহর দরবারে একটি উত্তর বর্ণনা করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে উপরিউক্ত প্রশ্ন যদিও তাদের কে করা হয়নি : কিন্তু প্রসঙ্গক্রমে তাদেরকেও যেন সম্বোধন করা হয়েছিল। কেননা তারাও শয়তান জিনদের কাজ অর্থাৎ পথভ্রষ্টতাই প্রচার করেছিল। এ প্রাসঙ্গিক সম্বোধনের কারণে তারা উত্তর দিয়েছে। কিন্তু বাহ্যত : বোঝা যায় যে, মানবরূপী শয়তানদেরকেও প্রশ্ন করা হয়ে থাকবে। তা স্পষ্টত এখানে উল্লেখ করা না হলেও সূরা ইয়াসীনের এক আয়াতে উল্লিখিত হয়েছে : أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ অর্থাৎ হে আদম সন্তানরা! আমি কি তোমাদেরকে পয়গম্বরদের মাধ্যমে বলিনি যে, শয়তানদের অনুসরণ করো না?

এতে বোঝা যায়, এ সময়ে মানুষ শয়তানদেরকেও প্রশ্ন করা হবে। তারা উত্তরে স্বীকার করবে যে, নিঃসন্দেহে আমরা শয়তানদের কথা মান্য করার অপরাধ করেছি। তারা আরও বলবে: হ্যাঁ, জিন শয়তানরা আমাদের সাথে এবং আমরা তাদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রেখে পরস্পর পরস্পরের দ্বারা ফল লাভ করেছি। মানুষ শয়তানরা তাদের কাছ থেকে এ ফল লাভ করেছে যে, দুনিয়ার ভোগবিলাস আহরণের উপায়াদি শিক্ষা করেছে এবং কোথাও কোথাও জিন শয়তানদের দোহাই দিয়ে কিংবা অন্য পন্থায় তাদের কাছ থেকে সাহায্যও লাভ করেছে, যেমন মূর্তিপূজারী হিন্দুদেরর মধ্যে বরং ক্ষেত্র বিশেষে অনেক মূর্খ মুসলমানের মধ্যে এ পন্থা প্রচলিত আছে, যা দ্বারা শয়তান ও জিনদের কাছ থেকে কোনো কোনো কাজে সাহায্য নেওয়া যায়। জিন শয়তানরা মানুষদের কাছ থেকে যে ফল লাভ করেছে, তা এই যে, তাদের কথা অনুসরণ করা হয়েছে এবং তার মানুষকে অনুগামী করতে সক্ষম হয়েছে। এমন কি, তারা মৃত্যু ও পরকালকে ভুলে গিয়েছে। এই মুহূর্তে তারা স্বীকার করবে যে, শয়তানের বিপথগামী করার কারণে আমরা যে মৃত্যুও পরকালকে ভুলে গিয়েছিলাম, এখন তা সামনে এসে গেছে। এ স্বীকারোক্তির পর আল্লাহ তা'আলা বলবেন ;

النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ অর্থাৎ তোমরা উভয় দলের অপরাধের শাস্তি এই যে, তোমাদের বাসস্থান হবে অগ্নি, যাতে সদা-সর্বদা থাকবে। তবে আল্লাহ কাউকে তা থেকে বের করতে চাইলে তা ভিন্ন কথা। কুরআনের অন্যান্য আয়াত সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ তা'আলাও তা চাইবেন না। তাই আনন্তকালই সেখানে থাকতে হবে।

قوله وَكَذَٰلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ الخ আয়াতে نُوَلِّي শব্দটির আভিধানিক দিক দিয়ে দু'টি অর্থ হতে পারে। (এক) পরস্পরকে যুক্ত করে দেওয়া ও নিকটবর্তী করে দেওয়া এবং (দুই) শাসক হিসেবে চালিয়ে দেওয়া। তফসীরবিদ সাহাবী ও তাবেয়ীগণের কাছ থেকে উভয় প্রকার অর্থই বর্ণিত আছে।

হাশরে কর্ম ও চরিত্রের ভিত্তিতে দল বিভক্ত হবে–– জাগতিক সম্পর্কের ভিত্তিতে নয় : হযরত সায়ীদ ইবনে জোবায়ের কাতাদাহ (রা.) প্রমুখ তাফসীরবিদ প্রথমোক্ত অর্থে আয়াতের উদ্দেশ্য এরূপ ব্যক্ত করেছেন যে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ

www.almodina.com

তা'আলার কাছে মানুষের দল বিভিন্ন বংশ , দেশ ভাষা, কিংবা বর্ণ ও ভাষার ভিত্তিতে হবে না; বরং কর্ম ও চরিত্রের ভিত্তিতে হবে। আল্লাহর আনুগত্যশীল মুসলমান যেখানেই থাকবে, সে মুসলমানদের সাথি হবে এবং অবাধ্য কাফের যেখানেই থাকবে সে কাফেরদের সাথি হবে, তাদের বংশ, দেশ, ভাষা, বর্ণ ও জীবনযাপন পদ্ধতিতে যতই দূরত্ব ও পার্থক্যই থেকে থাকুক না কেন।

এরপর মুসলমানদের মধ্যেও সৎ ও ধার্মিকেরা ধার্মিকদের সাথে থাকবে এবং পাপী ও কুকর্মীদেরকে কুকর্মীদের সাথে যুক্ত করে দেওয়া হবে। সূরা তাকভীরে বলা হয়েছে : وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ অর্থাৎ মানব কুলের যুগল ও দল তৈরি করে দেওয়া হবে। এর উদ্দেশ্যও তাই যে, কর্ম ও চরিত্রের দিক দিয়ে হাশরবাসীরা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে যাবে।

হযরত ওমর ফারুক (রা.) এ আয়াতের তাফসীরে বলেন ; সৎ কিংবা অসৎ এক ধরনের আমলকারীদেরকে একত্রিত করে দেওয়া হবে। সৎলোকেরা সৎলোকদের সাথে জান্নাতে এবং অসৎলোকেরা অসৎ লোকদের সাথে জাহান্নামে পৌঁছবে।

আলোচ্য আয়াতের সার বিষয়বস্তু এই যে, আল্লাহ তা'আলা কতক জালেমকে অন্য জালেমদের সাথে যুক্ত করে একদলে পরিণত করে দিবেন– বংশগত ও দেশগতভাবে তাদের মধ্যে যতই দূরত্ব থাক না কেন।

অন্য এক আয়াতে একথাও স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, পার্থিব ও আনুষ্ঠানিক ঐক্য প্রতিষ্ঠিত রয়েছে, হাশরের মাঠে তা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে যাবে। বলা হয়েছে : وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ –অর্থাৎ যেদিন কিয়ামত কায়েম হবে, সেদিন পরস্পরে ঐক্যবদ্ধ ও ঐকমত্য পোষণকারী ব্যক্তিরা পৃথক হয়ে যাবে।

দুনিয়ার সঙ্ঘবদ্ধ কাজ-কারবারে কর্ম ও চরিত্রের প্রভাব : পার্থিব আত্মীয়তা, সম্পর্ক ও আনুষ্ঠানিক সংগঠনসমূহ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া কিয়ামতের দিন তো সুস্পষ্টভাবে সবারই দৃষ্টিগোচর হবে, দুনিয়াতেও এর সামান্য নমুনা সর্বত্র পরিলক্ষিত হয়। এখানে সৎলোকের সম্পর্ক সৎ লোকদের সাথেই স্থাপিত হয় এবং তাদেরই দল ও সমাজের সাথে জড়িত থাকে। ফলে তার সামনে সৎকর্মের বিভিন্ন পথ খুলতে থাকে এবং তার সংকল্প দৃঢ় হতে থাকে। এমনিভাবে অসৎ ব্যক্তির সম্পর্ক তার মতো অসৎ ব্যক্তিদের সাথেই স্থাপিত হয়। সে তাদের মধ্যে উঠাবসা করে। তাদের সংসর্গে তার অসৎকর্ম ও অসচ্চরিত্রতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং তার সামনে সৎকর্মের দ্বার রুদ্ধ হতে থাকে। এটা তোর মন্দ-কর্মের নগদ সাজা, যা এ দুনিয়াতেই সে পায়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : আল্লাহ তা'আলা কোনো বাদশাহ ও শাসনকর্তার প্রতি প্রসন্ন হলে তাকে সৎ মন্ত্রী ও সৎ কর্মচারী দান করেন, ফলে তার রাজ্যের সব কাজকর্ম ঠিকঠাক ও উন্নত হয়ে যায়। পক্ষান্তরে আল্লাহ তা'আলা কারও প্রতি অপ্রসন্ন হলে সে অসৎ সহকর্মী ও অসৎ কর্মচারী পায়। সে কোনো ভালো কাজ করার ইচ্ছা করলেও কুলিয়ে উঠতে পারে না।

এক জালেম অপর জালেমের হাতে শাস্তি ভোগ করে : আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা نُوَلِّي শব্দের প্রথমোক্ত অর্থের দিক বর্ণিত হলো। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যোবায়ের, ইবনে যায়েদ (রা.), মালেক ইবনে দিনার (র.) প্রমুখ তফসীরবিদ থেকে দ্বিতীয় অর্থের দিক দিয়ে আয়াতের তাফসীর এরূপ বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ তা'আলা একজন জালেমকে অপর জালেমের হাতে শাস্তি দেন।

এ বিষয়বস্তুও যথাস্থানে সঠিক ও নির্ভুল এবং কুরআন হাদীসের অন্যান্য বক্তব্যের সাথে সঙ্গতিশীল। এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : كَمَا تَكُونُونَ كَذٰلِكَ يُؤَمَّرُ عَلَيْكُمْ অর্থাৎ তোমরা যেমন হবে তোমাদের উপর তেমনি শাসনকর্তা নিযুক্ত হবে। তোমরা জালেম ও পাপাচারী হলে তোমাদের শাসকবর্গও জালেম ও পাপাচারীই হবে। পক্ষান্তরে তোমরা সাধু ও সৎকর্মী হলে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের শাসনকর্তারূপে সাধু, দয়ালু ও সুবিচারক লোকদের মনোনীত করবেন।

ইবনে কাছীর হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদের বাচনিক রাসূলুল্লাহ ﷺ–এর এ উক্তি বর্ণনা করেছেন : مَنْ اَعَانَ ظَالِمًا سَلَّطَهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ অর্থাৎ যে ব্যক্তি কোনো অত্যাচারীর অত্যাচারে তাকে সাহায্য করে, আল্লাহ তা'আলা তাকে শাস্তি দেওয়ার জন্য এ জালেমকেই তার উপর চাপিয়ে দেন। তার হাতেই তাকে শাস্তি দেন।

দ্বিতীয় আয়াতে একটি প্রশ্ন ও উত্তর বর্ণিত হয়েছে। এ প্রশ্নটি হাশরের ময়দানে জিন ও মানবকে করা হবে। প্রশ্নটি এই যে, তোমরা কি কারণে কুফর ও আল্লাহর অবাধ্যতায় লিপ্ত হলে? তোমাদের কাছে কি আমার পয়গম্বর পৌঁছেনি? সে তো তোমাদের মধ্য থেকেই ছিল এবং আমার আয়াতসমূহ তোমাদেরকে পাঠ করে শোনাত , আজকের দিনের উপস্থিতি এবং

হিসাব কিতাবের ভয় প্রদর্শন করত। এর উত্তরে তাদের সবার পক্ষ থেকে পয়গম্বরদের আগমন, আল্লাহর বাণী পৌছানো এবং এতদসত্ত্বেও কুফরে লিপ্ত হওয়ার স্বীকারোক্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এ ভ্রান্ত কর্মের কোনো কারণ ও হেতু তাদের পক্ষ থেকে বর্ণনা করা হয়নি; বরং আল্লাহ নিজেই এর কারণ বর্ণনা করেছেন যে, وَغَرَّتْهُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا অর্থাৎ তাদেরকে পার্থিব জীবন ও ভোগ বিলাস ধোঁকায় ফেলে দিয়েছে। ফলে তারা একেই সবকিছু মনে করে বসেছে, অথচ এটা প্রকৃত পক্ষে কিছুই নয়।

আলোচ্য আয়াতে প্রথমত: প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, অন্য কতিপয় আয়াতে বলা হয়েছে, হাশরের ময়দানে মুশরিকদেরকে কুফর ও শিরক সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তারা মুখ মুছে অস্বীকার করবে এবং পালনকর্তার দরবারে কসম খেয়ে মিথ্যা বলবে : وَاللّٰهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِيْنَ –অর্থাৎ আমাদের পালনকর্তার কসম, আমরা কখনও মুশরিক ছিলাম না। অথচ এ আয়াত থেকে জানা যাচ্ছে যে, তারা অনুতাপ সহকারে স্বীয় কুফর ও শিরক স্বীকার করে নিবে। অতএব আয়াতদ্বয়ের মধ্যে বাহ্যত পরস্পর বিরোধিতা দেখা দেয়। কিন্তু অন্যান্য আয়াতে এভাবে এর ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, প্রথমে যখন তাদের কে প্রশ্ন করা হবে, তখন তারা অস্বীকার করবে। সে মতে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় কুদরত বলে তাদের মুখ বন্ধ করে দিবেন। হাত, পা ও অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সাক্ষ্য নিবেন। আল্লাহর কুদরতে সেগুলো বাকশক্তি প্রাপ্ত হবে। সেগুলো পরিষ্কারভাবে তাদের কুকর্মের ইতিবৃত্ত বর্ণনা করে দিবেন। তখন জিন ও মানব জানতে পারবে যে, তাদের হাত, পা, কান , জিহ্বা সবই ছিল আল্লাহর গুপ্ত প্রহরী, যারা সব কাজ কারবার ও অবস্থার অভ্রান্ত রিপোর্ট প্রদান করেছে। এমতাবস্থায় তাদের আর অস্বীকার করার জো থাকবে না। তখন তারা সবাই পরিষ্কার ভাষায় অপরাধ স্বীকার করে নিবে।

জিনদের মধ্যেও কি পয়গম্বর প্রেরিত হন? দ্বিতীয় প্রণিধানযোগ্য বিষয় এখানে এই যে, আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা জিন ও মানব উভয় সম্প্রদায়কে সম্বোধন করে বলেছেন : তোমাদের মধ্য থেকে আমার পয়গম্বর কি তোমাদের কাছে পৌছেনি? এতে বুঝা যায় যে, মানব জাতির পয়গম্বররূপে যেমন মানব প্রেরিত হয়েছে, তেমনি জিন জাতির পয়গম্বর রূপে জিন প্রেরিত হয়েছে।

এ ব্যাপারে হাদীস ও তাফসীরবিদগণের উক্তি বিভিন্নরূপ। কেউ কেউ বলেন: রাসূল ও নবী একমাত্র মানবই হয়েছে। জিন জাতির মধ্যে কোনো ব্যক্তি প্রত্যক্ষভাবে রাসূল হয়নি; বরং মানব রাসূলের বাণী স্বজাতির কাছে পৌছানোর জন্য জিনদের মধ্য থেকে কিছু লোক নিযুক্ত করা হয়েছে । তারা প্রকৃতপক্ষে মানব রাসূলগণের দূত ও বার্তবাহক ছিল। অপ্রকৃতভাবে তাদেরকেও রাসূল বলে দেওয়া হয়। যেসব তফসীরবিদ একথা বলেন, তাদের প্রমাণ ঐ সব আয়াত যেগুলোতে জিনদের এ জাতীয় উক্তি বর্ণিত হয়েছে যে, তারা নবীর বাণী অথবা কুরআন শ্রবণ করে স্বজাতির কছে পৌছিয়েছে। উদাহরণত : وَلَّوْا إِلٰى قَوْمِهِمْ مُّنْذِرِيْنَ এবং সূরা জিনের আয়াত فَقَالُوْٓا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْاٰنًا عَجَبًا يَّهْدِيْٓ إِلَى الرُّشْدِ فَاٰمَنَّا بِهٖ ইত্যাদি।

কিন্তু আয়াতের বাহ্যিক অর্থের দিক দিক দিয়ে একদল আলেম এ বিষয়েরও প্রবক্তা যে, শেষনবী ﷺ –এর পূর্বে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের রাসূল সে সম্প্রদায় থেকেই প্রেরিত হতেন। মানব সম্প্রদায়ের বিভিন্ন স্তরে মানব রাসূল এবং জিন জাতির বিভিন্ন স্তরে জিন রাসূলই আগমন করতেন। শেষনবী ﷺ–এর বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি সমগ্র বিশ্বের মানব ও জিনদের একমাত্র রাসূল হিসেবে প্রেরিত হয়েছেন, তাও কোনো এক বিশেষ কালের জন্য নয়; বরং কিয়ামত অবধি সমস্ত জিন ও মানব তাঁর উম্মত এবং তিনিই সবার রাসূল।

হিন্দুদের অবতারও সাধারণতঃ জিন, তাদের মধ্যে কোনো রাসূল ও নবী হওয়ার সম্ভাবনা : কালবী, মুজাহিদ (র.) প্রমুখ তাফসীরবিদ এ উক্তিই গ্রহণ করেছেন। কাযী ছানাউল্লাহ পনিপতী (র.) তাফসীরে মাযহারীতে এ উক্তি গ্রহণ করে বলেছেন; এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, হযরত আদম (আ.)–এর পূর্বে জিনদের রাসূল জিনদের মধ্য থেকেই আবির্ভূত হতো যখন একথা প্রমাণিত যে, পৃথিবীতে মানব আগমনের হাজার হাজার বছর পূর্বে জিন জাতি বসবাস করত এবং তারাও মানবজাতির মতো বিধি- বিধান পালন করতে আদিষ্ট ছিল, তখন শরিয়ত ও যুক্তির দিক দিয়ে তাদের মধ্যে আল্লাহর বিধান পৌছানোর জন্য পয়গম্বর হওয়া অপরিহার্য ।

কাযী ছানাউল্লাহ (র.) আরও বলেন : ভারতবর্ষের হিন্দুরা তাদের ধর্মগ্রন্থ বেদের ইতিহাস হাজার হাজার বছরের পুরানো বলে বর্ণনা করে এবং তাদের অনুসৃত অবতারদেরকে সে যুগেরই লোক বলে উল্লেখ করে। এটা অসম্ভব নয় যে, তারা এ

www.almodina.com

জিন জাতিরই পয়গম্বর ছিলেন এবং তাদেরই আনীত নির্দেশাবলি পুস্তকাকারে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। হিন্দু সম্প্রদায়ের অবতারদের যেসব চিত্র ও মূর্তি মন্দিরসমূহে রাখা হয়, সেগুলোর দেহাকৃতিও অনেকটা এমনি ধরনের, কারও অনেকগুলো মুখমণ্ডল, কারও অনেক হাত, পা, কারও হাতীর মতো শুঁড়, এগুলো সাধারণ মানবাকৃতি থেকে ভিন্ন। জিনদের পক্ষে এহেন আকৃতি ধারণ করা মোটেই অসম্ভব নয়। তাই এটা সম্ভব যে, তাদের অবতার জিন জাতির রাসূল কিংবা তাদের প্রতিনিধি ছিলেন এবং তাদের ধর্মগ্রন্থও তাদের নির্দেশাবলির সমষ্টি ছিল। এরপর আস্তে আস্তে অন্যান্য ধর্মগ্রন্থের ন্যায় একেও পরিবর্তিত করে তাতে শিরক ও মূর্তিপূজা ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে।

যদি আসল ধর্মগ্রন্থ এবং জিন জাতির বিশুদ্ধ নির্দেশাবলিও বিদ্যমান থাকত, তবুও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আবির্ভাবও রেসালতের পর তাও রহিত হয়ে যেত, বিকৃত ও পরিবর্তিত ধর্মগ্রন্থের তো কথাই নেই।

শব্দ বিশ্লেষণ

يُرِدْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব إِفْعَالٌ মাসদার اَلْإِرَادَةُ মূলবর্ণ (ر . و . د) জিনস اجوف واوى অর্থ– তিনি চান, তিনি ইচ্ছা করেন।

يَذَّكَّرُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفَّعُّلٌ মাসদার اَلْإِذَّكُّرُ মূলবর্ণ (ذ . ك . ر) জিনস صحيح অর্থ– তারা উপদেশ গ্রহণ করছে।

اَجَّلْتَ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ ماضى معروف বাব تَفْعِيْلٌ মাসদার اَلتَّأْجِيْلُ মূলবর্ণ (ا . ج . ل) জিনস مهموز فاء অর্থ– তুমি নির্ধারণ করেছ।

مَثْوَاكُمْ : সীগাহ واحد বহছ اسم ظرف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلثَّوَاءُ،اَلثَّوِىُّ، مَثْوًى মূলবর্ণ (ث . و . ى) জিনস لفيف مقرون অর্থ– বাসস্থান, ঠিকানা।

غَرَّتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْغُرُوْرُ মূলবর্ণ (غ . ر . ر) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– সে প্রতারিত করেছে।

অনুবাদ	আয়াত
অনুবাদ : (১৩১) এটা [রাসূলদের প্রেরণ] এই জন্য যে, আপনার প্রতিপালক কোনো জনপদের অধিবাসীকে কুফরির কারণে এমন অবস্থায় ধ্বংস করেন না যে, উক্ত অধিবাসীরা বে-খবর থাকে।	ذٰلِكَ اَنْ لَّمْ يَكُنْ رَّبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرٰى بِظُلْمٍ وَّاَهْلُهَا غٰفِلُوْنَ (١٣١)
(১৩২) আর প্রত্যেকের জন্য তাদের আমল অনুসারে শ্রেণি হবে, আর আপনার রব তাদের কার্যকলাপ সম্বন্ধে বে-খবর নন।	وَلِكُلٍّ دَرَجٰتٌ مِّمَّا عَمِلُوْا ؕ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُوْنَ (١٣٢)
(১৩৩) আর আপনার প্রতিপালক সম্পূর্ণ বেনিয়াজ, দয়াশীল, যদি তিনি ইচ্ছা করেন, তবে তোমাদের সকলকে অকস্মাৎ পৃথিবী হতে অপসারিত করতে পারেন এবং তোমাদের পরে যাকে ইচ্ছা তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করতে পারেন, যেমন তোমাদেরকে অন্য এক কওমের বংশ হতে সৃষ্টি করেছেন।	وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ ؕ اِنْ يَّشَاْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْۢ بَعْدِكُمْ مَّا يَشَآءُ كَمَآ اَنْشَاَكُمْ مِّنْ ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ اٰخَرِيْنَ (١٣٣)
(১৩৪) তোমাদের সাথে যে বিষয়ের ওয়াদা করা হচ্ছে তা অবশ্যই আগমনকারী বস্তু এবং তোমরা [আল্লাহকে] অক্ষম করতে পারবে না।	اِنَّ مَا تُوْعَدُوْنَ لَاٰتٍ ۙ وَّمَآ اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ (١٣٤)
(১৩৫) আপনি বলে দিন, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা নিজ অবস্থায় আমল করতে থাক আমিও আমল করছি, অতঃপর সত্বরই জানতে পারবে যে, ইহজগতের কর্মফল কার জন্য কল্যাণকর হবে, এটা নিশ্চিত যে, হক নষ্টকারীরা কখনো সফলকাম হবে না।	قُلْ يٰقَوْمِ اعْمَلُوْا عَلٰى مَكَانَتِكُمْ اِنِّيْ عَامِلٌ ۚ فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۙ مَنْ تَكُوْنُ لَهٗ عَاقِبَةُ الدَّارِ ؕ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الظّٰلِمُوْنَ (١٣٥)

শাব্দিক অনুবাদ

(১৩১) ذٰلِكَ এটা এই জন্য যে اَنْ لَّمْ يَكُنْ رَّبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرٰى আপনার প্রতিপালক কোনো জনপদের অধিবাসীকে এমন অবস্থায় ধ্বংস করেন না যে بِظُلْمٍ কুফরির কারণে وَّاَهْلُهَا غٰفِلُوْنَ উক্ত অধিবাসীরা বে-খবর থাকে।

(১৩২) وَلِكُلٍّ دَرَجٰتٌ আর প্রত্যেকের জন্য শ্রেণি হবে। مِّمَّا عَمِلُوْا তাদের আমল অনুসারে وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ আর আপনার রব বে-খবর নন عَمَّا يَعْمَلُوْنَ তাদের কার্যকলাপ সম্বন্ধে ।

(১৩৩) وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ আর আপনার প্রতিপালক সম্পূর্ণ বেনিয়াজ, দয়াশীল اِنْ يَّشَاْ যদি তিনি ইচ্ছা করেন يُذْهِبْكُمْ তবে তোমাদের সকলকে অকস্মাৎ পৃথিবী হতে অপসারিত করতে পারেন وَيَسْتَخْلِفْ مِنْۢ بَعْدِكُمْ مَّا يَشَآءُ এবং তোমাদের পরে যাকে ইচ্ছা তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করতে পারেন كَمَآ اَنْشَاَكُمْ مِّنْ ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ اٰخَرِيْنَ যেমন তোমাদেরকে অন্য এক কওমের বংশ হতে সৃষ্টি করেছেন।

(১৩৪) اِنَّ مَا تُوْعَدُوْنَ তোমাদের সাথে যে বিষয়ের ওয়াদা করা হচ্ছে لَاٰتٍ তা অবশ্যই আগমনকারী বস্তু وَّمَآ اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ এবং তোমরা [আল্লাহকে] অক্ষম করতে পারবে না।

(১৩৫) قُلْ আপনি বলে দিন يٰقَوْمِ হে আমার সম্প্রদায়! اعْمَلُوْا عَلٰى مَكَانَتِكُمْ তোমরা নিজ অবস্থায় আমল করতে থাক اِنِّيْ عَامِلٌ আমিও আমল করছি فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ অতঃপর সত্বরই জানতে পারবে যে مَنْ تَكُوْنُ لَهٗ عَاقِبَةُ الدَّارِ ইহজগতের কর্মফল কার জন্য কল্যাণকর হবে اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الظّٰلِمُوْنَ এটা নিশ্চিত যে, হক নষ্টকারীরা কখনো সফলকাম হবে না।

www.almodina.com

وَجَعَلُوْا لِلّٰهِ مِمَّا ذَرَاَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْاَنْعَامِ نَصِيْبًا فَقَالُوْا هٰذَا لِلّٰهِ بِزَعْمِهِمْ وَهٰذَا لِشُرَكَآئِنَا ۚ فَمَا كَانَ لِشُرَكَآئِهِمْ فَلَا يَصِلُ اِلَى اللّٰهِ ۚ وَمَا كَانَ لِلّٰهِ فَهُوَ يَصِلُ اِلٰى شُرَكَآئِهِمْ ۗ سَآءَ مَا يَحْكُمُوْنَ (١٣٦)

অনুবাদ : (১৩৬) আর আল্লাহ তা'আলা যে সব শস্য ও পশু সৃষ্টি করেছেন তারা [মুশরিকরা] তার কিছু অংশ আল্লাহর ওয়াস্তে নির্দিষ্ট করে এবং নিজেদের ধারণা মতে বলে, তা তো আল্লাহর, আর তা আমাদের দেবতাদের, অনন্তর যে অংশ তাদের দেবতাদের হয়, তা তো আল্লাহর দিকে পৌছে না, আর যে অংশ আল্লাহর [নামে] হয় তা তাদের দেবতাদের দিকে পৌছে যায়, তারা কতই না মন্দ ব্যবস্থা করে রেখেছে।

وَكَذٰلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيْرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ قَتْلَ اَوْلَادِهِمْ شُرَكَآؤُهُمْ لِيُرْدُوْهُمْ وَلِيَلْبِسُوْا عَلَيْهِمْ دِيْنَهُمْ ۗ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَا فَعَلُوْهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُوْنَ (١٣٧)

(১৩৭) আর এরূপে বহু মুশকিরদের দৃষ্টিতে তাদের দেবতাগণ তাদের সন্তান হত্যাকে সুশোভন করে রেখেছে, যেন তারা তাদেরকে বিনষ্ট করে দেয় এবং তাদের রীতি-নীতিকে গোলমেলে করে দেয়, আর যদি আল্লাহ চাইতেন, তবে এরা এরূপ করত না, সুতরাং আপনি তাদেরকে এবং তাদের ভ্রান্ত উক্তিগুলোকে ছেড়ে দিন।

শাব্দিক অনুবাদ

(১৩৬) وَجَعَلُوْا لِلّٰهِ আর তারা [মুশরিকরা] আল্লাহর ওয়াস্তে নির্দিষ্ট করে مِمَّا ذَرَاَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْاَنْعَامِ আল্লাহ তা'আলা যে সব শস্য ও পশু সৃষ্টি করেছেন نَصِيْبًا তার কিছু অংশ فَقَالُوْا هٰذَا لِلّٰهِ بِزَعْمِهِمْ এবং নিজেদের ধারণা মতে বলে, তা তো আল্লাহর وَهٰذَا لِشُرَكَآئِنَا আর তা আমাদের দেবতাদের فَمَا كَانَ لِشُرَكَآئِهِمْ অনন্তর যে অংশ তাদের দেবতাদের হয় فَلَا يَصِلُ اِلَى اللّٰهِ তা তো আল্লাহর দিকে পৌছে না وَمَا كَانَ لِلّٰهِ আর যে অংশ আল্লাহর [নামে] হয় فَهُوَ يَصِلُ اِلٰى شُرَكَآئِهِمْ তা তাদের দেবতাদের দিকে পৌছে যায় سَآءَ مَا يَحْكُمُوْنَ তারা কতই না মন্দ ব্যবস্থা করে রেখেছে।

(১৩৭) وَكَذٰلِكَ আর এরূপে زَيَّنَ সুশোভন করে রেখেছে لِكَثِيْرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ বহু মুশকিরদের দৃষ্টিতে قَتْلَ اَوْلَادِهِمْ তাদের সন্তান হত্যাকে شُرَكَآؤُهُمْ তাদের দেবতাগণ لِيُرْدُوْهُمْ যেন তারা তাদেরকে বিনষ্ট করে দেয় وَلِيَلْبِسُوْا عَلَيْهِمْ دِيْنَهُمْ এবং তাদের রীতি-নীতিকে গোলমেলে করে দেয় وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ আর যদি আল্লাহ চাইতেন مَا فَعَلُوْهُ তবে এরা এরূপ করত না فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُوْنَ সুতরাং আপনি তাদেরকে এবং তাদের ভ্রান্ত উক্তিগুলোকে ছেড়ে দিন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

১৩১ নং আয়াতে বলা হয়েছে যে, মানব ও জিনদের মধ্যে রাসূল প্রেরণ করা আল্লাহ তা'আলার ন্যায়বিচার ও অনুগ্রহের প্রতীক। তিনি কোনো জাতির প্রতি এমনিতেই শাস্তি প্রেরণ করেন না, যে পর্যন্ত না তাদেরকে পূর্বাহ্নে পয়গম্বরদের মধ্যেমে জাগ্রত করা হয় এবং হেদায়েতের আলো প্রেরণ করা হয়।

১৩২ নং আয়াতের মর্ম সুস্পষ্ট যে, আল্লাহ তা'আলার কাছে মানব ও জিন জাতির প্রত্যেক স্তরের লোকদের পদমর্যাদা নির্ধারিত রয়েছে। এসব পদমর্যাদা তাদের কাজকর্মের ভিত্তিতেই নির্ধারণ করা হয়েছে। তাদের প্রত্যেকের প্রতিদান ও শাস্তি এসব কর্মের মাপ অনুযায়ী হবে।

قوله وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ الخ পূর্ববর্তী আয়াতে বলা হয়েছিল যে, জিন ও মানব জাতির প্রত্যেক সম্প্রদায়ের নিকট রাসূল ও হেদায়েত প্রেরণ করা আল্লাহ তা'আলার চিরন্তন রীতি। পয়গম্বরদের মাধ্যমে তাদেরকে পূর্ণভাবে সতর্ক না করা পর্যন্ত কুফর, শিরক ও অবাধ্যতার কারণে কখনও শাস্তি দেওয়া হয়নি।

www.almodina.com

আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, পয়গম্বর ও আসমানি কিতাবসমূহের অব্যাহত ধারা এ জন্য ছিল না যে, বিশ্ব পালনকর্তা আমাদের ইবাদত ও আনুগত্যের মুখাপেক্ষী কিংবা তাঁর কোনো কাজ আমাদের আনুগত্যের উপর নির্ভরশীল নয়, তিনি সম্পূর্ণ অমুখাপেক্ষী ও অভাবমুক্ত । তবে পরিপূর্ণ অস্তিত্ব ও স্থায়িত্ব দান করা এবং বিশ্ববাসীর বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সব প্রয়োজন অযাচিতভাবে মিটানোর কারণও তাঁর এ দয়াগুণে। নতুবা মানুষ তথা গোটা সৃষ্টি নিজের প্রয়োজনাদি নিজে সমাধা করার যোগ্য হওয়া তো দূরের কথা, সে স্বীয় প্রয়োজনাদি চাওয়ার রীতি-নীতিও জানে না। বিশেষত অস্তিত্বের যে নিয়ামত দান করা হয়েছে, তা যে চাওয়া ছাড়াই পাওয়া গেছে, তা দিবালোকের মতো স্পষ্ট। কোনো মানুষ কোথাও নিজের সৃষ্টির জন্য দোয়া করেনি এবং অস্তিত্ব লাভের পূর্বে দোয়া করা কল্পনাও করা যায় না। এমনিভাবে অন্তর এবং যেসব অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সমন্বয়ে মানুষের সৃষ্টি হাত, পা, মন-মস্তিষ্ক প্রভৃতি এগুলো কোনো মানব চেয়েছিল কি?

আল্লাহ কারও মুখাপেক্ষী নন- জগত-সৃষ্টি শুধু তাঁর অনুগ্রহের ফল : মোটকথা, আলোচ্য আয়াতে وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ শব্দ দ্বারা বিশ্বপালকের অমুখাপেক্ষিতা বর্ণনা করার সাথেই ذُو الرَّحْمَةِ যোগ করে বলা হয়েছে যে, তিনি করুণাময়ও বটে।

আল্লাহ যে কোনো মানুষকে অমুখাপেক্ষী করেননি তার তাৎপর্য : অমুখাপেক্ষিতা আল্লাহ পাকেরই বিশেষ গুণ। নতুবা মানুষ অপরের প্রতি অমুখাপেক্ষী হয়ে গেলে সে অপরের লাভ লোকসান ও সুখ দুঃখের প্রতি মোটেই ভ্রূক্ষেপ করত না; বরং অপরের প্রতি অত্যাচার ও উৎপীড়ন করতে উদ্যত হতো। কুরআন পাকের এক আয়াতে বলা হয়েছে : إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَىٰ أَن رَّآهُ اسْتَغْنَىٰ অর্থাৎ মানুষ যখন নিজেকে অমুখাপেক্ষী দেখতে পায়, তখন অবাধ্যতা ও ঔদ্ধত্যে মেতে উঠে। তাই আল্লাহ তা'আলা মানুষকে এমন প্রয়োজনাদির শিকলে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে দিয়েছেন, যেগুলো অপরের সাহায্য ব্যতিরেকে পূর্ণ হতে পারে না। প্রবল প্রতাপান্বিত রাজা বাদশাও চাকর-চাকরানির মুখাপেক্ষী। বিত্তশালী ও মিল মালিক শ্রমিকদের মুখাপেক্ষী। প্রত্যুষে একজন শ্রমিক ও রিকসা চালক কিছু পয়সা উপার্জন করে অভাব অনটন দূর করার জন্য যেমন রোজগারের তালাশে বের হয়, ঠিক তেমনিভাবে বিত্তশালী ব্যক্তিও শ্রমিক, রিকসা ও যান বাহনের খোঁজে বের হয়। সর্বশক্তিমান আল্লাহ সবাইকে অভাব অনটনের এক শিকলে বেঁধে রেখেছেন। প্রত্যেকেই মুখাপেক্ষী। কারো প্রতি কারো অনুগ্রহ নেই। এরূপ না হলে কোনো ধনী ব্যক্তি কাউকে এক পয়সাও দিত না এবং কোনো শ্রমিক কারো সামান্য বোঝাও বহন করত না। এটা একমাত্র আল্লাহ পাকেরই বিশেষ গুণ যে, পুরোপুরি অমুখাপেক্ষিতা সত্ত্বেও তিনি দয়ালু, করুণাময়।

এরপর আরও বলা হয়েছে যে, তাঁর রহমত যেমন ব্যাপক ও পূর্ণ, তেমনি তাঁর শক্তি-সামর্থ্য প্রত্যেক বস্তু ও প্রত্যেক বিষয়ে পরিব্যাপ্ত। তিনি ইচ্ছা করলে মুহূর্তে সবাইকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারেন। সমগ্র সৃষ্ট জগত নিশ্চিহ্ন করে দিলেও তাঁর কুদরতের কারখানায় বিন্দুমাত্র পার্থক্য দেখা দেবে না। তিনি যদি ইচ্ছা করেন, তবে বর্তমান সৃষ্টজগৎকে ধ্বংস করে তদস্থলে অন্য সৃষ্টজগৎ এমনিভাবে এ মুহূর্তে উদ্ভব করে স্থাপন করতে পারেন। এর একটি নজির প্রতি যুগের মানুষের সামনেই রয়েছে। আজ কোটি কোটি মানুষ পৃথিবীর আনাচে-কানাচে বসবাস করছে এবং জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন কাজ কারবার চালিয়ে যাচ্ছে। যদি আজ থেকে একশ বছর পূর্বেকার অবস্থার দিকে তাকানো যায়, তবে দেখা যাবে কখনও এ পৃথিবী এমনিভাবে জমজমাট ছিল এবং সব কাজ কারবার এভাবেই চলত। কিন্তু তখন বর্তমান অধিবাসী ও কার্য পরিচালানাকারীদের কেউই ছিল না। অন্য এক জাতি ছিল, যারা আজ ভূগর্ভে চলে গেছে এবং যাদের নাম নিশানা পর্যন্ত পাওয়া যায় না। বর্তমান দুনিয়া সে জাতির বংশধর থেকেই সৃজিত হয়েছে। বলা হয়েছে : إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ كَمَا أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ

"আল্লাহ ইচ্ছা করলে, তোমাদের সবাইকে নিয়ে যেতে পারেন। নিয়ে যাওয়ার" অর্থ এমনভাবে ধ্বংস করে দেওয়া যেন নাম নিশানা পর্যন্ত অবশিষ্ট না থাকে। তাই এখানে ধ্বংস করা বা মেরে ফেলার কথা বলা হয়নি; বরং নিয়ে যাওয়া বলা হয়েছে। এতে পুরোপুরি ধ্বংস ও নাম-নিশানাহীন করে দেওয়ার প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে।"

এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলার অমুখাপেক্ষী হওয়া, করুণাময় হওয়া এবং সর্বশক্তির অধিকারী হওয়ার কথা উল্লেখ করার পর অবাধ্য ও নির্দেশ অমান্যকারীদেরকে হুঁশিয়ার করা হয়েছে যে,

إِنَّ مَا تُوعَدُونَ لَآتٍ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ অর্থৎ আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে যে শাস্তির ভয় প্রদর্শন করেছেন, তা অবশ্যই আগমন করবে এবং তোমরা সব একত্রিত হয়েও আল্লাহর সে আজাব প্রতিরোধ করতে পারবে না।

তৃতীয় আয়াতে পুনরায় তাদেরকে হুঁশিয়ার করার জন্য অন্য এক পন্থা অবলম্বন করে বলা হয়েছে : قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ

www.almodina.com

"হে রাসূল, আপনি মক্কাবাসীদেরকে বলে দিন : হে আমার সম্প্রদায়! যদি তোমরা আমার কথা না মান। তবে তোমাদের ইচ্ছা, না মান এবং স্বস্থানে স্বীয় বিশ্বাস ও হঠকারিতা অনুযায়ী কাজ করতে থাক। আমিও স্বীয় বিশ্বাস অনুযায়ী কাজ করতে থাকব। এতে আমার কোনো ক্ষতি নেই। কিন্তু অচিরেই তোমরা জানতে পারবে যে, কে পরকালের মুক্তি ও সফলতা অর্জন করে। মনে রেখ, জালেম অর্থাৎ অধিকার আত্মসাৎকারী কখনও সফল হয় না।"

পরবর্তী ১৩৬ নং আয়াতে মুশরিকদের একটি বিশেষ পথভ্রষ্টতা ব্যক্ত করা হয়েছে। আরবদের অভ্যাস ছিল যে, শস্যক্ষেত্র, বাগান এবং ব্যবসা বাণিজ্য থেকে যা কিছু আমদানি হতো, তার এক অংশ আল্লাহর জন্য এবং এক অংশ উপাস্য দেব দেবীর নামে পৃথক করে রাখত। আল্লাহর নামের অংশ থেকে গরিব মিসকিনকে দান করা হতো এবং দেব-দেবীর অংশ মন্দিরের পূজারী, সেবায়েত ও রক্ষকদের জন্য ব্যয় করত।

প্রথমত : এটাই কম অবিচার ছিল না যে, যাবতীয় বস্তু সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ এবং সমুদয় উৎপন্ন ফসলও তিনিই দান করেছেন, কিন্তু আল্লাহ প্রদত্ত বস্তুসমূহের মধ্যে প্রতিমাদেরকে অংশীদার করা হতো। তদুপরি তারা আরও অবিচার করত এই যে, কখনও উৎপাদন কম হলে তারা কমের ভাগটি আল্লাহর অংশ থেকে কেটে নিত, অথচ মুখে বলত : আল্লাহ তো সম্পদশালী, অভাবমুক্ত, তিনি আমাদের সম্পদের মুখাপেক্ষী নন। এরপর প্রতিমাদের অংশ এবং নিজেদের ব্যবহারের অংশ পুরোপুরি নিয়ে নিত। আবার কোনো সময় এমনও হতো যে, প্রতিমাদের কিংবা নিজেদের অংশ থেকে কোনো বস্তু আল্লাহর অংশে পড়ে গেলে তা হিসাব ঠিক করার জন্য সেখান থেকে তুলে নিত। পক্ষান্তরে যদি আল্লাহর অংশ থেকে কোনো বস্তু নিজেদের কিংবা প্রতিমাদের অংশে পড়ে যেত, তবে তা সেখানেই থাকতে দিত এবং বলত : আল্লাহ অভাবমুক্ত, তাঁর অংশ কম হলেও ক্ষতি নেই।

কুরআন পাক তাদের এ পথভ্রষ্টতার উল্লেখ করে বলেছে : سَآءَ مَا يَحْكُمُوْنَ অর্থাৎ তাদের এ বিচার পদ্ধতি অত্যন্ত বিশ্রী ও একদেশদর্শী। যে আল্লাহ তাদেরকে এবং তাদের সমুদয় বস্তু সামগ্রীকে সৃষ্টি করেছেন, প্রথমত তারা তাঁর সাথে অপরকে অংশীদার করেছে। তদুপরি তাঁর অংশও নানা ছলছুতায় অন্যদিকে পাচার করে দিয়েছে।

কাফেরদের প্রতি হুশিয়ারিতে মুসলমানদের জন্য শিক্ষা : এ হচ্ছে মুশরিকদের একটি পথভ্রষ্টতা ও ভ্রান্তির জন্য হুশিয়ারি। এতে ঐসব মুসলমানের জন্যও শিক্ষার চাবুক রয়েছে, যারা আল্লাহ প্রদত্ত জীবন ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পূর্ণ কার্যক্ষমতাকে বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করে বয়স ও সময়ের এক অংশ তারা আল্লাহর ইবাদতের জন্য নির্দিষ্ট করে। অথচ জীবনের সমস্ত সময় ও মুহূর্তকে তাঁরই ইবাদত ও আনুগত্যের জন্য ওয়াকফ করে মানবিক প্রয়োজনাদি মিটানোর জন্য তা থেকে কিছু সময় নিজের জন্য বের করে নেওয়াই সঙ্গত ছিল। সত্য বলতে কি এরপরও আল্লাহর যথার্থ কৃতজ্ঞতা আদায় হতো না। কিন্তু আমাদের অবস্থা এই যে, দিবা রাত্রির চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে যদি কিছু সময় আমরা আল্লাহর ইবাদতের জন্য নির্দিষ্ট করি, তবে কোনো প্রয়োজন দেখা দিলে কাজ কারবার ও আরাম আয়েশের সময় পুরোপুরি ঠিক রেখে তার সমস্ত জের নামাজ, তেলাওয়াত ও ইবাদতের জন্য নির্দিষ্ট সময়ের উপর ফেলে দেই। কোনো অতিরিক্ত কাজের সম্মুখীন হলে কিংবা অসুখবিসুখ হলে সর্বপ্রথম এর প্রভাব ইবাদতের নির্দিষ্ট সময়ের উপর পড়ে। এটা নিঃসন্দেহে অবিচার, অকৃতজ্ঞতা এবং অধিকার হরণ। আল্লাহ আমাদেরকে এবং সব মুসলমানকে এহেন গর্হিত কাজ থেকে বাঁচিয়ে রাখুন।

শব্দ বিশ্লেষণ

يَشَآءُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْمَشِيْئَةُ মূলবর্ণ (ش . ى . ء) জিনস মুরাক্কাব مهموز لام ও اجوف يائى অর্থ– তিনি ইচ্ছা করেন।

ذُرِّيَّةٌ : শব্দটি একবচন; বহুবচন ذراری ও ذریات অর্থ– সন্তান-সন্ততি।

تُوْعَدُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع مجهول বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْوَعْدُ মূলবর্ণ (و . ع . د) জিনস مثال واوى অর্থ– তোমাদের সাথে ওয়াদা করা হচ্ছে।

اٰتٍ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْإِيْتَاءُ মূলবর্ণ (ا . ت . ى) জিনস মুরাক্কাব مهموز فاء ও ناقص يائى অর্থ– আগমনকারী বস্তু।

مَكَانَةٌ : শব্দটি একবচন, বহুবচন مكانات অর্থ– স্থান, অবস্থান।

لِيُرْدُوْهُمْ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْإِرْدَاءُ মূলবর্ণ– (ر . د . ى) জিনস ناقص واوى অর্থ– যেন তারা বিনষ্ট করে দেয়।

وَقَالُوْا هٰذِهٖۤ اَنْعَامٌ وَّحَرْثٌ حِجْرٌ ۖ لَّا يَطْعَمُهَاۤ اِلَّا مَنْ نَّشَآءُ بِزَعْمِهِمْ وَاَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُوْرُهَا وَاَنْعَامٌ لَّا يَذْكُرُوْنَ اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهَا افْتِرَآءً عَلَيْهِ ؕ سَيَجْزِيْهِمْ بِمَا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ (١٣٨)

অনুবাদ : (১৩৮) আর তারা নিজেদের ধারণা মতে বলে যে, এই চতুষ্পদ জন্তু ও ক্ষেত্র, এটা কারো জন্য বৈধ নয়, তা কেউই ভক্ষণ করতে পারবেন না কিন্তু আমরা যাকে ইচ্ছা করি, আর কতগুলো পশু যাদের উপর আরোহণ বা বোঝা চাপানো হারাম করা হয়েছে, আর কতকগুলো পশু যাদের উপর তারা আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে না, [এ সব কথা] কেবল আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করার উদ্দেশ্যে [বলে] অচিরেই আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে তাদের মিথ্যা অপবাদের শাস্তি প্রদান করবেন।

وَقَالُوْا مَا فِيْ بُطُوْنِ هٰذِهِ الْاَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّذُكُوْرِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلٰۤى اَزْوَاجِنَا ۚ وَاِنْ يَّكُنْ مَّيْتَةً فَهُمْ فِيْهِ شُرَكَآءُ ؕ سَيَجْزِيْهِمْ وَصْفَهُمْ ؕ اِنَّهٗ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ (١٣٩)

(১৩৯) আর তারা বলে এই পশুগুলোর গর্ভে যা কিছু রয়েছে তা শুধু আমাদের পুরুষদের জন্য [বৈধ] এবং আমাদের নারীদের জন্য হারাম, আর যদি তা মৃত হয়, তবে তাতে সকলে সমান, অচিরেই আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে তাদের মিথ্যা উক্তিগুলোর শাস্তি দিবেন, নিশ্চয় তিনি প্রজ্ঞাময়, মহাজ্ঞানী।

قَدْ خَسِرَ الَّذِيْنَ قَتَلُوْۤا اَوْلَادَهُمْ سَفَهًۢا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّحَرَّمُوْا مَا رَزَقَهُمُ اللّٰهُ افْتِرَآءً عَلَى اللّٰهِ ؕ قَدْ ضَلُّوْا وَمَا كَانُوْا مُهْتَدِيْنَ (١٤٠)

(১৪০) বাস্তবিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তারা, যারা নিজেদের সন্তানদেরকে নিছক নির্বোধের ন্যায় প্রমাণ ব্যতিরেকে হত্যা করেছে, এবং যে সকল বস্তু আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে পানাহারের জন্য দিয়েছেন, তা হারাম করে নিয়েছে, কেবল আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে, নিশ্চয় এরা গোমরাহীতে পতিত হয়েছে এবং কখনো সুপথগামী হয়নি।

শাব্দিক অনুবাদ

(১৩৮) وَقَالُوْا আর তারা বলে هٰذِهٖۤ اَنْعَامٌ وَّحَرْثٌ এই চতুষ্পদ জন্তু ও ক্ষেত্র حِجْرٌ এটা কারো জন্য বৈধ নয় لَّا يَطْعَمُهَاۤ তা কেউই ভক্ষণ করতে পারবেন না اِلَّا مَنْ نَّشَآءُ কিন্তু আমরা যাকে ইচ্ছা করি بِزَعْمِهِمْ নিজেদের ধারণা মতে যে وَاَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُوْرُهَا আর কতগুলো পশু যাদের উপর আরোহণ বা বোঝা চাপানো হারাম করা হয়েছে وَاَنْعَامٌ আর কতকগুলো পশু لَّا يَذْكُرُوْنَ اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهَا যাদের উপর তারা আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে না افْتِرَآءً عَلَيْهِ [এ সব কথা] কেবল আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করার উদ্দেশ্যে [বলে] سَيَجْزِيْهِمْ بِمَا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ অচিরেই আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে তাদের মিথ্যা অপবাদের শাস্তি প্রদান করবেন।

(১৩৯) وَقَالُوْا আর তারা বলে مَا فِيْ بُطُوْنِ هٰذِهِ الْاَنْعَامِ এই পশুগুলোর গর্ভে যা কিছু রয়েছে خَالِصَةٌ لِّذُكُوْرِنَا তা শুধু আমাদের পুরুষদের জন্য [বৈধ] وَمُحَرَّمٌ عَلٰۤى اَزْوَاجِنَا এবং আমাদের নারীদের জন্য হারাম وَاِنْ يَّكُنْ مَّيْتَةً আর যদি তা মৃত হয় فَهُمْ فِيْهِ شُرَكَآءُ তবে তাতে সকলে সমান سَيَجْزِيْهِمْ وَصْفَهُمْ অচিরেই আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে তাদের মিথ্যা উক্তিগুলোর শাস্তি দিবেন اِنَّهٗ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ নিশ্চয় তিনি প্রজ্ঞাময়, মহাজ্ঞানী।

(১৪০) قَدْ خَسِرَ বাস্তবিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তারা الَّذِيْنَ قَتَلُوْۤا যারা হত্যা করেছে اَوْلَادَهُمْ নিজেদের সন্তানদেরকে سَفَهًۢا নিছক নির্বোধের ন্যায় بِغَيْرِ عِلْمٍ প্রমাণ ব্যতিরেকে وَحَرَّمُوْا এবং তা হারাম করে নিয়েছে مَا رَزَقَهُمُ اللّٰهُ যে সকল বস্তু আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে পানাহারের জন্য দিয়েছেন افْتِرَآءً عَلَى اللّٰهِ কেবল আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে قَدْ ضَلُّوْا নিশ্চয় এরা গোমরাহীতে পতিত হয়েছে وَمَا كَانُوْا مُهْتَدِيْنَ এবং কখনো সুপথগামী হয়নি।

অনুবাদ : (১৪১) আর তিনিই সেই সত্তা, যিনি বাগানসমূহ সৃষ্টি করেছেন, যেগুলো মাচায় তুলে দেওয়া হয় এবং তাও যেগুলো মাচায় তুলে দেওয়া হয় না, এবং খেজুর বৃক্ষ ও শস্যক্ষেত্র, যাতে বিভিন্ন প্রকারের খাদ্যবস্তু উৎপন্ন হয়, এবং যাইতুন ও ডালিম যা পরস্পর সাদৃশ্যও হয় এবং অসাদৃশ্যও হয়, এগুলোর ফল ভক্ষণ কর যখন তা ধরে, আর তার [নির্ধারিত] হক প্রদান কর তার কাটার দিনে এবং সীমালঙ্ঘন করো না নিশ্চয় তিনি সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে পছন্দ করেন না।	وَهُوَ الَّذِىٓ اَنْشَاَ جَنّٰتٍ مَّعْرُوْشٰتٍ وَّغَيْرَ مَعْرُوْشٰتٍ وَّالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا اُكُلُهٗ وَالزَّيْتُوْنَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَّغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ؕ كُلُوْا مِنْ ثَمَرِهٖٓ اِذَآ اَثْمَرَ وَاٰتُوْا حَقَّهٗ يَوْمَ حَصَادِهٖ ۖ وَلَا تُسْرِفُوْا ؕ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ (١٤١)
(১৪২) আর চতুষ্পদগুলোর মধ্যে উচ্চাকৃতি ও খর্বাকৃতির, যা কিছু আল্লাহ তোমাদেরকে প্রদান করেছেন, তা ভক্ষণ কর, আর শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না, নিঃসন্দেহে সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।	وَمِنَ الْاَنْعَامِ حَمُوْلَةً وَّفَرْشًا ؕ كُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ؕ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ (١٤٢)

শাব্দিক অনুবাদ

(১৪১) وَهُوَ الَّذِىٓ اَنْشَاَ جَنّٰتٍ আর তিনিই সেই সত্তা, যিনি বাগানসমূহ সৃষ্টি করেছেন مَّعْرُوْشٰتٍ যেগুলো মাচায় তুলে দেওয়া হয় وَّغَيْرَ مَعْرُوْشٰتٍ এবং তাও যেগুলো মাচায় তুলে দেওয়া হয় না وَّالنَّخْلَ এবং খেজুর বৃক্ষ وَالزَّرْعَ ও শস্যক্ষেত্র, مُخْتَلِفًا اُكُلُهٗ যাতে বিভিন্ন প্রকারের খাদ্যবস্তু উৎপন্ন হয় وَالزَّيْتُوْنَ وَالرُّمَّانَ এবং যাইতুন ও ডালিম مُتَشَابِهًا وَّغَيْرَ مُتَشَابِهٍ যা পরস্পর সাদৃশ্যও হয় এবং অসাদৃশ্যও হয় كُلُوْا مِنْ ثَمَرِهٖٓ এগুলোর ফল ভক্ষণ কর اِذَآ اَثْمَرَ যখন তা ধরে وَاٰتُوْا حَقَّهٗ আর তার [নির্ধারিত] হক প্রদান কর يَوْمَ حَصَادِهٖ তার কাটার দিনে। وَلَا تُسْرِفُوْا এবং সীমালঙ্ঘন করো না اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ নিশ্চয় তিনি সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে পছন্দ করেন না।

(১৪২) وَمِنَ الْاَنْعَامِ حَمُوْلَةً وَّفَرْشًا আর চতুষ্পদগুলোর মধ্যে উচ্চাকৃতি ও খর্বাকৃতির كُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ যা কিছু আল্লাহ তোমাদেরকে প্রদান করেছেন, তা ভক্ষণ কর وَلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ আর শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ নিঃসন্দেহে সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(১৪০) قوله قَدْ خَسِرَ الَّذِيْنَ قَتَلُوْٓا اَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** ইবনুল মুনযির ও আবুশ শায়খ তাফসীরবিদ ইকরিমার উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন। মুদ্বার এবং রবীআর যে সকল লোক দারিদ্রতার ভয়ে কন্যা সন্তানদেরকে হত্যা করেছে তাদেরকে জাগতিক ও পরকালীন শাস্তি অথবা পার্থিব কল্যাণ ও ধর্ম ধ্বংস করে নিজেকে শাস্তি যোগ্য করে তুলেছে, তাছাড়া যারা প্রাণীসমূহকে হারাম বলে ধার্য করেছে, তাদের ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেছেন। –[রূহুল মা'আনী ৩৭, ফাতহুল কাদীর ১৬৮/২]

(১৪১) قوله وَهُوَ الَّذِىٓ اَنْشَاَ جَنّٰتٍ مَّعْرُوْشٰتٍ وَّغَيْرَ مَعْرُوْشٰتٍ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** ইবনে জারীর ও ইবনে আবী হাতেম, ইবনে জুরাইজের উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন। যেমন তিনি বলেন, আলোচ্য আয়াত ছাবেত বিন কায়স বিন শম্মান সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। তার ছিল পাঁচশত খেজুর গাছের একটি বাগান। সে একদা বলল, আজ আমার নিকট যে ব্যক্তিই আসবে তাকে আমি বাগান থেকে খাওয়াব। ফলে সন্ধ্যা পর্যন্ত সে আগন্তুকদের খাবার দিয়েছে। অবশেষে তার বাগানে আর কোনো ফল থাকেনি। সে সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[রূহুল মা'আনী ৩৮, ইবনে কাছীর ১৮৬/২, বাহরে মুহীত ২৪০/৪]

www.almodina.com

قوله وَقَالُوا هٰذِهٖ اَنْعَامٌ وَّحَرْثٌ الخ পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে মুশরিকদের এ পথভ্রষ্টতা বর্ণিত হয়েছিল যে, জালেমরা আল্লাহ সৃজিত জন্তু-জানোয়ার এবং আল্লাহ প্রদত্ত নিয়ামতসমূহে স্বহস্তনির্মিত নিষ্প্রাণ অচেতন প্রতিমাদেরকে আল্লাহর অংশীদার স্থির করেছিল এবং যেসব বস্তু তারা সদকা-খয়রাতের জন্য পৃথক করত, সেগুলোতে এক অংশ আল্লাহর এবং এক অংশ প্রতিমাদের জন্য রাখত। অতঃপর আল্লাহর অংশকেও বিভিন্ন ছলছুতায় প্রতিমাদের অংশের মধ্যে পাচার করে দিত। এমনি ধরনের আরও অনেক মূর্খতাসুলভ কুপ্রথাকে তারা ধর্মীয় আইনের মর্যাদা দান করেছিল।

আলোচ্য আয়তসমূহের প্রথম আয়াতে আল্লাহ তা'আলা উদ্ভিদ ও বৃক্ষের বিভিন্ন প্রকার এবং তাদের উপকারিতা ও ফল সৃজনে স্বীয় শক্তি-সামর্থ্যের বিস্ময়কর পরাকাষ্ঠা বর্ণনা করেছেন। দ্বিতীয় আয়াতে এমনিভাবে জানোয়ার ও চতুষ্পদ জন্তুদের বিভিন্ন প্রকার সৃজনের কথা উল্লেখ করে মুশরিকদের পথভ্রষ্টতা সম্পর্কে হুশিয়ার করেছেন যে, এ কাণ্ডজ্ঞানহীন লোকেরা কেমন সর্বশক্তিমান, মহাজ্ঞানীও সর্বজ্ঞ আল্লাহর সাথে কেমন অজ্ঞ, অচেতন, নিষ্প্রাণ ও অসহায় বস্তুসমূহকে শরিক ও অংশীদার করে ফেলেছে।

অতঃপর তাদেরকে সরল পথ ও বিশুদ্ধ কর্মপন্থা নির্দেশ করেছেন যে, যখন এসব বস্তু সৃষ্টি করা ও তোমাদেরকে দান করার কাজে কোনো অংশীদার নেই, তখন ইবাদতে তাদেরকে অংশীদার করা একান্তই অকৃতজ্ঞতা ও জুলুম। যিনি এসব বস্তু সৃষ্টি করে তোমাদেরকে দান করেছেন এবং এমন অনুগত করে দিয়েছেন যে, তোমরা যেভাবে ইচ্ছা সেগুলোকে ব্যবহার করতে পার, এরপর সবগুলোকে তোমাদের জন্য হালাল করে দিয়েছেন, তোমাদের কর্তব্য এসব নিয়ামত দ্বারা উপকৃত হওয়ার সময় তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা স্মরণে রাখা এবং প্রকাশ করা শয়তানি ধ্যান ধারণা এবং মূর্খতাসুলভ প্রথাকে ধর্ম হিসেবে গ্রহণ করা উচিত নয়।

প্রথম আয়াতে اَنْشَأَ শব্দের অর্থ সৃষ্টি করেছেন এবং مَعْرُوْشٰتٍ শব্দটি عَرْشٌ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ উঠানো এবং উচ্চ করা। مَعْرُوْشٰتٍ বলে উদ্ভিদের ঐসব লতা বুঝানো হয়েছে, যেগুলোকে মাচার উপরে চড়ানো হয় না, কাণ্ডবিশিষ্ট বৃক্ষ হোক, যাদের লতাই হয়না, কিংবা লতাবিশিষ্ট হোক, কিন্তু সেগুলো মাটিতেই বিস্তৃত হয় এবং উপরে চড়ানো হয় না; যেমন তরমুজ, খরবুযা ইত্যাদি।

نَخْلٌ শব্দের অর্থ খর্জুর বৃক্ষ, زَرْعٌ সর্ব প্রকার শস্য, زَيْتُوْنٌ যায়তূন বৃক্ষকে বলা হয় এবং এর ফলকেও এবং رُمَّانٌ ডালিমকে বলা হয়।

এসব আয়াতে আল্লাহ তা'আলা প্রথমে বাগানে উৎপন্ন বৃক্ষসমূহের দুই প্রকার বর্ণনা করেছেন। এক, যেসব বৃক্ষের লতা উপরে চড়ানো নয় এবং দুই, যেসব বৃক্ষের লতা উপরে চাড়ানো হয় না। এতে আল্লাহর চূড়ান্ত রহস্য ও কুদরতের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে যে, একই মাটি, একই পানি এবং একই পরিবেশে কেবল বিভিন্ন প্রকার চারাগাছ সৃষ্টি করেছেন। এরপর এদের ফল তৈরি, সজীবতা এবং এদর মধ্যে নিহিত হাজারো বৈশিষ্ট্য ও প্রভাবের প্রতি লক্ষ্য রেখে কোনো বৃক্ষের প্রকৃতি এমন করেছেন যে, যতদিন লতা উপরে না চড়ানো হয়, ততদিন প্রথমত ফলই ধরে না- যদি ধরেও, তবে তা বাড়ে না এবং বাকি থাকে না; যেমন আঙ্গুর ইত্যাদি। পক্ষান্তরে কোনো বৃক্ষের প্রকৃতি এমন করেছেন, যেমন লতা উপরে চাড়াতে চাইলেও চড়ে না -চড়ালেও ফল দুর্বল হয়ে যায়। যেমন খরবুযা, তরমুজ ইত্যাদি। কোনো বৃক্ষকে মজবুত কাণ্ডের উপর দাঁড় করিয়ে এত উচ্চে নিয়ে গেছেন যে, মানুষের চেষ্টায় এত উচ্চে নিয়ে যাওয়া স্বভাবতঃ সম্ভবপর ছিল না। বিরাট রহস্যের অধীনে ফলের প্রকৃতির দিকে লক্ষ্য রেখে বৃক্ষসমূহ বিভিন্নভরূপে সৃষ্টি করা হয়েছে। কোনো কোনো ফল মাটিতেই বাড়ে এবং পরিপক্ব হয় এবং কোনো কোনো ফল মাটির সংস্পর্শে নষ্ট হয়ে যায়। কতক ফলের জন্য উচ্চ শাখায় ঝুলে অবিরাম তাজা বাতাস, সূর্যকিরণ এবং তারকার রশ্মি থেকে রং গ্রহণ করা জরুরি। সর্ব শক্তিমান প্রত্যেকের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। فَتَبَارَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ

এরপর বিশেষভাবে খর্জুর বৃক্ষ এবং শস্যের কথা উল্লেখ করেছেন। খর্জুর ফল সাধারণভাবে চিত্তবিনোদনের উদ্দেশ্যে খাওয়া হয়। প্রয়োজন হলে এ দ্বারা পূর্ণ খাদ্যের কাজও নেওয়া যায়। শস্যক্ষেত্রে উৎপন্ন শস্য থেকে সাধারণতঃ মানুষের খোরাক এবং জন্তু-জানোয়ারের খাদ্য সংগ্রহ করা হয়।

এ দু'টি বস্তু উল্লেখ করার পর বলা হয়েছে। مُخْتَلِفًا اُكُلُهٗ এখানে اُكُلُهٗ -এর সর্বনাম زَرْعٌ এবং نَخْلٌ উভয়ের দিকে যেতে পারে অর্থ এই যে, খেজুরের বিভিন্ন প্রকার এবং প্রত্যেক প্রকারের বিভিন্ন স্বাদ ও উপকারিতা আছেই। একই পানি,

www.almodina.com

বাতাস এবং একই মাটি থেকে উৎপন্ন ফলের মধ্যে এত বিরাট ব্যবধান এবং প্রত্যেক প্রকারের উপকারিতা ও বৈশিষ্ট্যের এমন বিস্ময়কর বিভিন্নতা স্বল্প জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিকেও একথা স্বীকার করতে বাধ্য করে যে, এদের সৃষ্টিকর্তা এমন এক অচিন্তনীয় সত্তা, যার জ্ঞান ও রহস্য মানুষ অনুমান করতেও সক্ষম নয়।

এরপর আরও দু'টি বস্তুর উল্লেখ করা হয়েছে: যায়তূন ও ডালিম। যায়তূন একাধারে ফল ও তরকারি হয়ে থাকে। এর তৈল সর্বাধিক পরিষ্কার, স্বচ্ছ এবং অসংখ্য গুণাগুণ ও বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয়ে থাকে। এটি হাজারো রোগের উত্তম প্রতিষেধক। এমনিভাবেই ডালিমেরও অনেক গুণাগুণ সবার জানা আছে। এ দুই প্রকার ফলন উল্লেখ করার পর বলা হয়েছে : مُتَشَابِهًا وَّغَيْرَ مُتَشَابِهٍ অর্থাৎ এদের প্রত্যেকটির কিছু ফল রং ও স্বাদের দিক দেয়ে সাদৃশ্যশীল হয় এবং কিছু ফলের রং, স্বাদ ও পরিমাণ একই রূপ হয় এবং ভিন্ন ভিন্নও হয়। যায়তূনের অবস্থাও তদ্রূপ।

এসব বৃক্ষ ও ফল সম্পর্কে উল্লেখ করার পর মানুষের প্রতি দু'টি নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রথম নির্দেশ মানুষের বাসনা ও প্রবৃত্তির দাবির পরিপূরক । বলা হয়েছে : كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ অর্থাৎ এসব বৃক্ষের ও শস্যক্ষেত্রের ফল তখন ভক্ষণ কর। যখন এগুলো ফলন্ত হয়। এতে ইঙ্গিত আছে যে, এসব বিভিন্ন প্রকার বৃক্ষ সৃষ্টি করে সৃষ্টিকর্তা নিজের কোনো প্রয়োজন মেটাতে চান না; বরং তোমাদেরই উপকারের জন্য এগুলো সৃষ্টি করেছেন। অতএব, তোমরা খাও এবং উপকৃত হও। إِذَا أَثْمَرَ বলে ইঙ্গিত করেছেন যে, বৃক্ষের ডাল থেকে ফল বের করা তোমাদের সাধ্যাতীত কাজ। কাজেই আল্লাহর নির্দেশে যখন ফল বের হয়ে আসে, তখনই তোমরা তা খেতে পার, পরিপক্ব হোক বা না হোক।

ক্ষেতের ওশর : দ্বিতীয় নির্দেশ এই দেওয়া হয়েছে : وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ শব্দের অর্থ আন অথবা আদায় কর ফসল কাটা কিংবা ফল নামানোর সময় কে حَصَادِهِ বলা হয়। শব্দের সর্বনাম পূর্বোল্লিখিত প্রত্যেকটি খাদ্য বস্তুর দিকে যেতে পারে। বাক্যের অর্থ এই যে, এমন বস্তু খাও, পান করা এবং ব্যবাহর কর; কিন্তু মনে রাখবে যে, ফসল কাটা কিংবা ফল নামানোর সময় এদের হকও আদায় করতে হবে। 'হক' বলে ফকির-মিসকিনকে দান করা বুঝানো হয়েছে : وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ অর্থাৎ সৎ লোকদের ধন-সম্পদে নির্দিষ্ট হক রয়েছে ফকির মিসকিনদের।

এখানে সাধারণ সদকা–খয়রাত বুঝানো হয়েছে না ক্ষেতের জাকাত ও ওশর বুঝানো হয়েছে, এসম্পর্কে তাফসীরবিদ সাহাবী ও তাবেয়ীগণের দু'রকম উক্তি রয়েছে। কেউ কেউ প্রথমোক্ত মত প্রকাশ করে প্রমাণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন যে, আয়াতটি মক্কায় অবতীর্ণ এবং জাকাত মদিনায় হিজরত করার দুই বছর পর ফরজ হয়েছে। তাই এখানে 'হক' -এর অর্থ ক্ষেতের জাকাত হতে পারে না। পক্ষান্তরে কেউ কেউ আয়াতটিকে মদিনায় অবতীর্ণ বলেছেন এবং حَقّ –এর অর্থ জাকাত ও ওশর নিয়েছেন।

তাফসীরবিদ ইবনে কাছীর স্বীয় তাফসীর গ্রন্থে এবং ইবনে আরাবী উন্দুলূসী 'আহকামুল-কুরআন' -এর সিদ্ধান্ত দিয়ে বলেছেন যে, আয়াত মক্কায় অবতীর্ণ হোক অথবা মদিনায়, উভয় অবস্থাতেই এ আয়াত থেকে শস্যক্ষেত্রের জাকাত অর্থাৎ ওশর অর্থ নেওয়া যেতে পারে। কেননা তাঁদের মতে জাকাতের নির্দেশ মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছিল। সূরা মুযযাম্মিলের আয়াতে জাকাতের নির্দেশ ব্যক্ত হয়েছে। এ সূরাটি সর্বসম্মতিক্রমে মক্কায় অবতীর্ণ। তবে জাকাতের পরিমাণ ও নেসাব নির্ধারণের নির্দেশ হিজরতের পর অবতীর্ণ হয়েছে। আলোচ্য আয়াত থেকে শুধু এতটুকু জানা যায় যে, ক্ষেতের উৎপন্ন ফসলের উপর আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে একটি হক আরোপ করা হয়েছে। এর পরিমাণ আয়াতে উল্লিখিত হয়নি। কাজেই পরিমাণের ব্যাপারে আয়াতটি সংক্ষিপ্ত। মক্কায় পরিমাণ নির্ধারণের প্রয়োজনও ছিল না। কেননা ক্ষেত ও বাগানের ফসল অনায়াসে লাভ করার ব্যাপারে তখন মুসলমানরা নিশ্চিত ছিলেন না। তাই পূর্ব থেকে সৎলোকদের মধ্যে যে নিয়ম প্রচলিত ছিল তাই অনুসৃত হতো। অর্থাৎ ফসল কাটা ও ফল নামানোর সময় যেসব গরিব ও মিসকিন সেখানে উপস্থিত থাকত, তাদেরকে কিছু দান করা হতো। কোনো বিশেষ পরিমাণ নির্ধারিত ছিল না। ইসলাম পূর্বকালে অন্যান্য উম্মতের মধ্যেও ফল ও ফসল এভাবে দান করার প্রথা কুরআন পাকের إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। হিজরতের দু'বছর পর রাসূলুল্লাহ ﷺ যেমন অন্যান্য ধন-সম্পদের জাকাতও নেসাবের পরিমাণ ওহীর নির্দেশক্রমে বর্ণনা করেন, তেমনিভাবে ফসলের জাকাতও বর্ণনা করেন। হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল, ইবনে ওমর ও জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) প্রমুখের রেওয়ায়েতক্রমে বিষয়টি সব হাদীসগ্রন্থে এভাবে বর্ণিত রয়েছে : مَا سَقَتِ السَّمَاءُ فَفِيهِ الْعُشْرُ وَمَا سُقِيَ بِالسَّانِيَةِ فَنِصْفُ الْعُشْرِ অর্থাৎ যেসব ক্ষেতে পানি সেচনের ব্যবস্থা নেই শুধু বৃষ্টির পানির উপর নির্ভর করতে হয়, সেসব ক্ষেতের উৎপন্ন ফসলের দশ ভাগের এক ভাগ জাকাত হিসেবে দান করা ওয়াজিব এবং যেসব ক্ষেত কূপের পানি দ্বারা সেচ করা হয়, সেগুলোর উৎপন্ন ফসলের বিশ ভাগের এক ভাগ ওয়াজিব।

www.almodina.com

ইসলামি শরিয়ত জাকাত আইনে সর্বত্র এ বিষয়টিকে মূলনীতি হিসাবে ব্যবহার করেছে। যে ফসলে পরিশ্রম ও ব্যয় কম, তার জাকাতের পরিমাণ বেশি এবং পরিশ্রম ও ব্যয় যে পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, জাকাতের পরিমাণও সে পরিমাণে হ্রাস পায়। উদাহরণত যদি কেউ কোনো লুক্কায়িত ধনভাণ্ডার পেয়ে বসে কিংবা সোনা-রূপা ইত্যাদির খনি আবিষ্কৃত হয়, তবে তার পাঁচ ভাগের এক ভাগ জাকাত হিসেবে দান করা ওয়াজিব। কেননা এখানে পরিশ্রম ও ব্যয় কম এবং উৎপাদন বেশি। এরপর বৃষ্টি বিধৌত ক্ষেতের নম্বর আসে। এতে পরিশ্রম ও ব্যয় অপেক্ষাকৃত কম। তাই এর জাকাত পাঁচ ভাগের একের অর্ধেক– অর্থাৎ দশ ভাগের একভাগ ধার্য করা হয়েছে। এরপর রয়েছে ঐক্ষেত, যা কূপ থেকে সেচের মধ্যমে কিংবা খালের পানি ক্রয় করে সিক্ত করা হয়। এতে পরিশ্রম ও খরচ বেড়ে যায়। ফলে এর জাকাত তারও অর্ধেক। অর্থাৎ বিশ ভাগের এক ভাগ ধার্য করা হয়েছে। এরপর আসে সাধারণ সোনা-রূপা ও পণ্য সামগ্রীর পালা। এগুলো অর্জন করতে পরিশ্রম ব্যয় অত্যধিক। এজন্য এগুলোর জাকাত তারও অর্ধেক অর্থাৎ চল্লিশ ভাগের এক ভাগ ধার্য করা হয়েছে।

উল্লিখিত আয়াত ও হাদীসে ক্ষেতের ফসলের জন্য কোনো নেসাব নির্ধারিত হয়নি। তাই ইমাম আবূ হানীফা ও আহমদ ইবনে হাম্বল (র.)-এর মাযহাব এই যে, ক্ষেতের ফসল কম হোক কিংবা বেশি, সর্বাবস্থায় তার জাকাত বের করা জরুরি। সূরা বাকারার যে আয়াতে ক্ষেতের জাকাত উল্লেখ করা হয়েছে, সেখানেও এর কোনো নেসাব বর্ণিত হয়নি। বলা হয়েছে :
أَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْأَرْضِ অর্থাৎ স্বীয় হালাল উপার্জন থেকে ব্যয় কর এবং ঐ ফসল থেকে, যা আমি তোমাদের জন্য ক্ষেত খামার থেকে উৎপন্ন করেছি।

রাসূলুল্লাহ ﷺ পণ্য-সামগ্রী ও চতুষ্পদ জন্তুর নেসাব বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন যে, রূপা সাড়ে বায়ান্ন তোলার কম হলে জাকাত নেই। ছাগল ১০০ এবং উট ৫-এর কম হলে জাকাত নেই। কিন্তু ক্ষেতের ফসল সম্পর্কে পূর্বোল্লেখিত হাদীসে কোনো নেসাব ব্যক্ত করা হয়নি। তাই প্রত্যেক ক্ষেতের ফসলের উপরই উৎপাদনের পরিমাণ অনুসারে দশ ভাগের এক ভাগ কিংবা বিশ ভাগের এক জাকাত দেওয়া ওয়াজিব।

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে : وَلَا تُسْرِفُوْا ۚ إِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ অর্থাৎ সীমাতিরিক্ত ব্যয় করো না। কেননা আল্লাহ তা'আলা অপব্যয়ীদেরকে পছন্দ করেন না। এখানে প্রশ্ন হয় যে, আল্লাহর পথে যদি কেউ সমস্ত ধন-সম্পদ; বরং জীবনও ব্যয় করে দেয়, তবে একে অপব্যয় বলা যায় না; বরং যথার্থ প্রাপ্য পরিশোধ হয়েছে এরূপ বলাও কঠিন। এমতাবস্থায় এখানে অপব্যয় করতে নিষেধ করার উদ্দেশ্য কি? উত্তর এই যে, বিশেষ কোনো ক্ষেত্রে অপব্যয়ের ফল স্বভাবত অন্যান্য ক্ষেত্রে ত্রুটিরূপে দেখা দেয় যে ব্যক্তি স্বীয় কামনা- বাসনা চরিতার্থ করতে মুক্ত হস্তে সীমাতিরিক্ত ব্যয় করে, সে সাধারণত অন্যের প্রাপ্য পরিশোধ করতে ত্রুটি করে। এখানে এরূপ ত্রুটি করতেই বারণ করা হয়েছে। অর্থাৎ যদি কেউ একই ক্ষেত্রে স্বীয় যথাসর্বস্ব লুটিয়ে দিয়ে রিক্তহস্ত হয়ে বসে, তবে পরিবার-পরিজন আত্মীয়-স্বজন বরং নিজের প্রাপ্য কিরূপে পরিশোধ করবে। তাই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহর পথে ব্যয়ও সুষম হওয়া চাই, যাতে সবার প্রাপ্য পরিশোধ করা সম্ভব হয়।

শব্দ বিশ্লেষণ

كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى استمرارى معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِفْتِرَاءُ মূলবর্ণ (ف . ر . ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– তারা মিথ্যা রচনা করছিল।

سَيَجْزِيْهِمْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْجَزَاءُ মূলবর্ণ (ج . ز . ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– অচিরেই তিনি শাস্তি দিবেন।

مَعْرُوْشٰتٍ : শব্দটি বহুবচন, একবচন معروشة অর্থ– মাচাযুক্ত, মাচার উপর রক্ষিত।

اَلرُّمَّانُ : শব্দটি বহুবচন; একবচন رمانة অর্থ– আনার, ডালিম, বেদানা।

مُتَشَابِهًا : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব تَفَاعُلٌ মাসদার اَلتَّشَابُهُ মূলবর্ণ (ش . ب . ه) জিনস صحيح অর্থ– সদৃশ, সাদৃশ্যশীল।

اٰتُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِيْتَاءُ মূলবর্ণ (ا . ت . ى) জিনসে মুরাক্কাব ناقص يائى ও مهموز فاء অর্থ– তোমরা দান কর।

www.almodina.com

ثَمٰنِيَةَ اَزْوَاجٍ ۚ مِنَ الضَّاْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ ۗ قُلْ ءٰٓالذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ اَمِ الْاُنْثَيَيْنِ اَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ اَرْحَامُ الْاُنْثَيَيْنِ ۖ نَبِّئُوْنِىْ بِعِلْمٍ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ (١٤٣)

অনুবাদ : (১৪৩) [তিনি সৃষ্টি করেছেন] আটটি নর ও মাদী, অর্থাৎ ভেড়া [ও দুম্বা]-এর মধ্যে দুই প্রকার, এবং বকরির মধ্যে দুই প্রকার, আপনি বলুন, আল্লাহ তা'আলা কি এতদুভয় নরকে হারাম বলেছেন, অথবা উভয় মাদীকে, অথবা তাকে যা উভয় মাদী গর্ভে ধারণ করে আছে? তোমরা আমাকে প্রমাণ সহকারে তো বল, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

وَمِنَ الْاِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ ۗ قُلْ ءٰٓالذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ اَمِ الْاُنْثَيَيْنِ اَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ اَرْحَامُ الْاُنْثَيَيْنِ ۖ اَمْ كُنْتُمْ شُهَدَآءَ اِذْ وَصّٰكُمُ اللّٰهُ بِهٰذَا ۚ فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا لِّيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ (١٤٤)

(১৪৪) আর উটের মধ্যে দুই প্রকার ও গরুর মধ্যে দুই প্রকার, [নর ও মাদী] আপনি বলুন, আল্লাহ কি এতদুভয় নরকে হারাম বলেছেন, অথবা উভয় মাদীকে? অথবা তাকে যা উভয় মাদী গর্ভে ধারণ করে আছে? তোমরা কি উপস্থিত ছিলে যখন আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে এর [অবৈধতা ও বৈধতার] আদেশ করেন? তবে তার চেয়ে অধিক জালেম আর কে হবে, যে ব্যক্তি বিনা প্রমাণে আল্লাহর প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে লোকদেরকে বিভ্রান্ত করার উদ্দেশ্যে, নিশ্চয় আল্লাহ পাক জালেমদেরকে পথ প্রদর্শন করবেন না।

রুকু ১৭

শাব্দিক অনুবাদ

(১৪৩) ثَمٰنِيَةَ اَزْوَاجٍ [তিনি সৃষ্টি করেছেন] আটটি নর ও মাদী مِنَ الضَّاْنِ اثْنَيْنِ অর্থাৎ ভেড়া [ও দুম্বা]-এর মধ্যে দুই প্রকার وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ এবং বকরির মধ্যে দুই প্রকার قُلْ আপনি বলুন الذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ আল্লাহ তা'আলা কি এতদুভয় নরকে হারাম বলেছেন اَمِ الْاُنْثَيَيْنِ অথবা উভয় মাদীকে اَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ اَرْحَامُ الْاُنْثَيَيْنِ অথবা তাকে যা উভয় মাদী গর্ভে ধারণ করে আছে? نَبِّئُوْنِىْ بِعِلْمٍ তোমরা আমাকে প্রমাণ সহকারে তো বল اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

(১৪৪) وَمِنَ الْاِبِلِ اثْنَيْنِ আর উটের মধ্যে দুই প্রকার وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ ও গরুর মধ্যে দুই প্রকার, [নর ও মাদী] قُلْ আপনি বলুন الذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ আল্লাহ কি এতদুভয় নরকে হারাম বলেছেন اَمِ الْاُنْثَيَيْنِ অথবা উভয় মাদীকে? اَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ اَرْحَامُ الْاُنْثَيَيْنِ অথবা তাকে যা উভয় মাদী গর্ভে ধারণ করে আছে? اَمْ كُنْتُمْ شُهَدَآءَ তোমরা কি উপস্থিত ছিলে اِذْ وَصّٰكُمُ اللّٰهُ بِهٰذَا যখন আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে এর [অবৈধতা ও বৈধতার] আদেশ করেন? فَمَنْ اَظْلَمُ তবে তার চেয়ে অধিক জালেম আর কে হবে مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে لِّيُضِلَّ النَّاسَ লোকদেরকে বিভ্রান্ত করার উদ্দেশ্যে بِغَيْرِ عِلْمٍ বিনা প্রমাণে اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ নিশ্চয় আল্লাহ পাক জালেমদেরকে পথ প্রদর্শন করবেন না।

অনুবাদ : (১৪৫) আপনি বলে দিন, যে সমস্ত আহকাম ওহীর মাধ্যমে আমার নিকট পৌছেছে, তাতে তো আমি কোনো হারাম খাদ্য দেখছি না কোনো ভক্ষণকারীর জন্য যে তা ভক্ষণ করে, কিন্তু মৃত [জীব] কিংবা প্রবহমান রক্ত কিংবা শূকরের মাংস [হারাম], কেননা শূকর সম্পূর্ণ নাপাক, অথবা যা শিরকের উপকরণ, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নামে যেগুলো উৎসর্গ করা হয়েছে [এগুলো সমস্তই হারাম] অনন্তর যে ব্যক্তি [ক্ষুধায়] অনন্যোপায় হয়ে পড়ে, এই শর্তে যে, সে স্বাদ গ্রহণেচ্ছুক না হয় এবং সীমা অতিক্রমকারীও না হয়, তবে অবশ্যই আপনার প্রতিপালক অতীব মার্জনাকারী, পরম দয়ালু।	قُلْ لَّآ اَجِدُ فِیْ مَآ اُوْحِیَ اِلَیَّ مُحَرَّمًا عَلٰی طَاعِمٍ یَّطْعَمُهٗۤ اِلَّاۤ اَنْ یَّكُوْنَ مَیْتَةً اَوْ دَمًا مَّسْفُوْحًا اَوْ لَحْمَ خِنْزِیْرٍ فَاِنَّهٗ رِجْسٌ اَوْ فِسْقًا اُهِلَّ لِغَیْرِ اللّٰهِ بِهٖ ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَیْرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ فَاِنَّ رَبَّكَ غَفُوْرٌ رَّحِیْمٌ (١٤٥)
(১৪৬) আর আমি ইহুদিদের জন্য সকল নখরবিশিষ্ট জীব হারাম করে দিয়েছিলাম এবং গরু ও ছাগল হতে তাদের জন্য উভয়ের চর্বি হারাম করেছিলাম, কিন্তু যা তাদের পিঠের উপর অথবা অন্ত্রের সাথে জড়িত অথবা হাড়ের সাথে মিলিত থাকে, তাদের দুষ্টামির দরুন তাদেরকে এই শাস্তি দিয়েছিলাম, আর আমি নিশ্চয় সত্যবাদী।	وَعَلَی الَّذِیْنَ هَادُوْا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِیْ ظُفُرٍ ۚ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَیْهِمْ شُحُوْمَهُمَاۤ اِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُوْرُهُمَاۤ اَوِ الْحَوَایَاۤ اَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ۚ ذٰلِكَ جَزَیْنٰهُمْ بِبَغْیِهِمْ ۚ وَاِنَّا لَصٰدِقُوْنَ (١٤٦)

শাব্দিক অনুবাদ

(১৪৫) قُلْ আপনি বলে দিন لَّآ اَجِدُ তাতে তো আমি দেখছি না فِیْ مَآ اُوْحِیَ اِلَیَّ যে সমস্ত আহকাম ওহীর মাধ্যমে আমার নিকট পৌছেছে مُحَرَّمًا কোনো হারাম খাদ্য عَلٰی طَاعِمٍ কোনো ভক্ষণকারীর জন্য یَّطْعَمُهٗۤ যে তা ভক্ষণ করে اِلَّاۤ اَنْ یَّكُوْنَ مَیْتَةً কিন্তু মৃত [জীব] اَوْ دَمًا مَّسْفُوْحًا কিংবা প্রবহমান রক্ত اَوْ لَحْمَ خِنْزِیْرٍ কিংবা শূকরের মাংস [হারাম] فَاِنَّهٗ رِجْسٌ কেননা শূকর সম্পূর্ণ নাপাক اَوْ فِسْقًا অথবা যা শিরকের উপকরণ اُهِلَّ لِغَیْرِ اللّٰهِ بِهٖ আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নামে যেগুলো উৎসর্গ করা হয়েছে [এগুলো সমস্তই হারাম] فَمَنِ اضْطُرَّ অনন্তর যে ব্যক্তি [ক্ষুধায়] অনন্যোপায় হয়ে পড়ে غَیْرَ بَاغٍ এই শর্তে যে, সে স্বাদ গ্রহণেচ্ছুক না হয় وَّلَا عَادٍ এবং সীমা অতিক্রমকারীও না হয় فَاِنَّ رَبَّكَ তবে অবশ্যই আপনার প্রতিপালক غَفُوْرٌ رَّحِیْمٌ অতীব মার্জনাকারী, পরম দয়ালু।

(১৪৬) وَعَلَی الَّذِیْنَ هَادُوْا আর ইহুদিদের জন্য حَرَّمْنَا আমি হারাম করে দিয়েছিলাম كُلَّ ذِیْ ظُفُرٍ সকল নখরবিশিষ্ট জীব وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ এবং গরু ও ছাগল হতে حَرَّمْنَا عَلَیْهِمْ شُحُوْمَهُمَاۤ তাদের জন্য উভয়ের চর্বি হারাম করেছিলাম اِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُوْرُهُمَاۤ কিন্তু যা তাদের পিঠের উপর اَوِ الْحَوَایَاۤ অথবা অন্ত্রের সাথে জড়িত اَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ অথবা হাড়ের সাথে মিলিত থাকে ذٰلِكَ جَزَیْنٰهُمْ بِبَغْیِهِمْ তাদের দুষ্টামির দরুন তাদেরকে এই শাস্তি দিয়েছিলাম وَاِنَّا لَصٰدِقُوْنَ আর আমি নিশ্চয় সত্যবাদী।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(১৪৪) قوله وَمِنَ الْاِبِلِ اثْنَیْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَیْنِ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** আখফাশ ও আলী বিন সুলায়মান বলেন, আলোচ্য আয়াত মালিক বিন আওফ ও তার সাথীদের সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। তারা বলত যে, এসকল চতুষ্পদ প্রাণীদের পেটে যে বাচ্চাই রয়েছে, তা একমাত্র আমাদের পুরুষদের জন্য বৈধ এবং মহিলাদের জন্য অবৈধ ও হারাম। সুতরাং আল্লাহ তাঁর নবী ও ঈমানদার বান্দাদেরকে সে সম্পর্কীয় বিধান অবহিত করার জন্য আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ করেন। -[কুরতুবী ১০০/৭]

(১৪৫) قوله قُلْ لَّآ اَجِدُ فِیْ مَآ اُوْحِیَ اِلَیَّ مُحَرَّمًا عَلٰی طَاعِمٍ یَّطْعَمُهٗۤ اِلَّاۤ اَنْ یَّكُوْنَ مَیْتَةً الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** আবদ বিন হুমাইদ ত্বাউসের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, জাহিলী যুগের মানুষেরা কতক বস্তুকে হারাম হিসেবে চিহ্নিত করত। আর কতক বস্তুকে হালাল হিসেবে নির্ধারণ করত। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা হালাল এবং হারামের বিধান বর্ণনা করেই আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। -[ফাতহুল কাদীর ১৭২/২]

قوله اِلَّآ اَنْ يَّكُوْنَ مَيْتَةً اَوْ دَمًا مَّسْفُوْحًا الخ -এর ব্যাখ্যা : আয়াতে চরটি বস্তুর সাথে হারাম হওয়া সংশ্লিষ্ট রয়েছে কিনা? সে সম্পর্কে বিভিন্ন অভিমত লক্ষ্য করা যায়। সুতরাং ইমাম মালেক (র.)-এর প্রকাশ্য মাযহাব এই যে, চারটি বস্তুর সাথেই হারাম হওয়া সংশ্লিষ্ট রয়েছে। তিনি এই আয়াতকে দলিল স্বরূপ পেশ করেছেন। কিন্তু অধিকাংশ ওলামাগণের অভিমত হলো আহার্য বস্তুর হারামকৃত বস্তু উপরিউক্ত চারটির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। কেননা ঐ চারটি কুরআন দ্বারা হারাম করা হয়েছে। সুতরাং আয়াতের অর্থ হলো, তোমরা যে সব বস্তু হারাম করেছ তার কোনোটিই এই পর্যন্ত আমার নিকট নাজিলকৃত বিধানে এ চারটি বস্তু ব্যতীত কিছুই পাইনি। এ আয়াত অবতীর্ণের সময় এ চারটি বস্তুই হারাম বস্তুই হারাম হওয়ার বিধান অবতীর্ণ হয়েছে, অন্যান্য হারামের বিধান এ আয়াত অবতীর্ণের পর জারি হয়েছে। সুতরাং সীমাবদ্ধতার আওতায় উক্ত আয়াতকে জড়িত করা কিছুতেই সমীচীন নয়।

قوله اُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهٖ **-এর মর্মার্থ** : যে সমস্ত জীব-জন্তুতে আল্লাহ ছাড়া অন্যের নাম উচ্চারিত হয়েছে, ঠাকুর দেবতাদের নামে নজর-মানতের জন্তু, তাদের সান্নিধ্য ও সন্তোষ লাভে যা উৎসর্গীত তা আল্লাহ তা'আলার নাম নিয়ে জবাই করা হোক না কেন নিঃসন্দেহে হারাম। তবে যদি কেউ গায়রুল্লাহর নামে মানত করার পর নিজের ভুল বুঝাতে পারে, সতর্ক হয়, তা পাপ মনে করে নিজের নিয়ত বদলিয়ে নেয়, সংশোধন করে, তওবা করে তা জবাই করে তবে তা হালাল হবে, তা খেতে কোনো দোষ নেই।

قوله غَيْرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ **-এর মর্মার্থ** : ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে সাধারণ মুসলমানদের স্বার্থের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ও বিরুদ্ধাচরণকারী بَاغِي আর চুরি ডাকাতি রাহাজানি ইত্যাদির দ্বারা মুসলমানদের সীমালঙ্ঘণকারী عَادِيْ -ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে যে ব্যক্তি মৃত খাওয়ার ব্যাপারে অপর (مُضْطَرٌ) -এর উপর নিজেকে প্রাধান্য দেওয়ায় যে অপর ব্যক্তি প্রাণ হারাল সে ব্যক্তি بَاغِيْ আর যে ব্যক্তি سَدَّ رَمَقٌ -এর সীমা অতিক্রম করে পেট ভরে খেল সেই ব্যক্তি عادي আয়াতে فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ দ্বারা আল্লাহ তা'আলা মানুষের জন্য আহার্য বস্তু না পাওয়া অবস্থায় জীবন রক্ষার্থে হারাম বস্তু ভক্ষণের অবকাশ দিয়েছেন। কিন্তু কি পরিমাণ আহার করা জায়েজ এ ব্যাপারে ফকীহগণ বিভিন্ন মতবাদ প্রকাশ করেছেন। ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে, জীবন রক্ষার্থে ক্ষুধা নিবারণের পরিমাণ হারাম বস্তু আহার করা জায়েজ। এটাই হলো আল্লাহভীরুতার নিদর্শন। ইমাম আহমদ ও মালেক (র.)-এর বলেন, এ অবস্থায় পরিতৃপ্তি হওয়া পরিমাণ হারাম বস্তু আহার করা জায়েজ।

মাসআলা : কোনো ব্যক্তি গুনাহের সংকল্প করে ভ্রমণে গেল। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, তার জন্য নিরুপায় অবস্থায়ও হারাম খাদ্য খাওয়া জয়েজ নয়। ইমাম আবূ হানীফা (র.)–এর মতে নিরুপায় অবস্থায় হলে তার জন্য মৃত প্রাণী খাওয়া জায়েজ।

قوله حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُوْمَهُمَا **-এর ব্যাখ্যা :** বনী ইসরাঈলের উপর দু'প্রকার চর্বি হারাম (১)পেটের চর্বি যাকে ثُرُوْبٌ বলে। (২) شَحْمُ الطَّيْتَيْنِ যা মুলতাসিক এবং মিলিত যে চর্বি। এটা ছাড়া পৃষ্ঠ দেশের চর্বি, নাড়িভুড়ির চর্বি ও হাড়ের সাথে মিশ্রিত চর্বি হারামের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।

শব্দ বিশ্লেষণ

اَلضَّأْنُ : শব্দটি একবচন; বহুবচন ضَائِنٌ অর্থ– মেষ, ভেড়া।

اَلْمَعْزُ : শব্দটি একবচন; বহুবচন مَاعِزٌ অর্থ– বকরি, ছাগল।

ذَكَرَيْنِ : শব্দটি দ্বিবচন,; একবচন ذَكَرٌ বহুবচন ذُكُوْرٌ অর্থ– নর, পুরুষ।

اِبِلٌ : শব্দটি একবচন; বহুবচন اَبِيْلٌ، اٰبَالٌ অর্থ– উট।

اَلْبَقَرُ : শব্দটি একবচন; বহুবচন بُقُوْرٌ، اَبْقَارٌ অর্থ– গরু, ষাড়, গবাদি পশু।

مَسْفُوْحًا : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم مفعول বাব فَتَحَ মাসদার اَلسَّفْحُ মূলবর্ণ (س . ف . ح) জিনস صحيح অর্থ– প্রবহমান, প্রবাহিত।

بَاغٍ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْبَغَاءُ মূলবর্ণ (ب . غ . ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– স্বাদ গ্রহণেচ্ছুক, কামনাকারী।

عَادٍ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব نَصَرَ মাসদার اَلْعُدْوَانُ মূলবর্ণ (ع . د . و) জিনস ناقص واوى অর্থ– সীমালঙ্ঘনকারী, সীমাতিক্রমকারী।

شُحُوْمٌ : শব্দটি বহুবচন; একবচন شَحْمٌ অর্থ– চর্বি, মেদ, তেল।

ظُهُوْرٌ : শব্দটি বহুবচন; একবচন ظَهْرٌ অর্থ– পিঠ, পৃষ্ঠ, বহিরভাগ।

اَلْحَوَايَا : শব্দটি বহুবচন; একবচন حَاوِيَاءُ ও حَاوِيَةٌ অর্থ– অন্তভূড়ি, নাড়িভূড়ি।

www.almodina.com

فَاِنْ كَذَّبُوْكَ فَقُلْ رَّبُّكُمْ ذُوْ رَحْمَةٍ وَّاسِعَةٍ ۚ وَلَا يُرَدُّ بَاْسُهٗ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِيْنَ (١٤٧)

অনুবাদ : (১৪৭) অতঃপর যদি তারা আপনাকে মিথ্যাবাদী বলে, তবে আপনি বলে দিন, তোমাদের প্রতিপালক সুপ্রশস্ত করুণাবান, এবং তাঁর শাস্তি অপরাধীদের থেকে টলবে না।

سَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا لَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَآ اَشْرَكْنَا وَلَآ اٰبَآؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ ۚ كَذٰلِكَ كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتّٰى ذَاقُوْا بَاْسَنَا ۚ قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوْهُ لَنَا ۚ اِنْ تَتَّبِعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ وَاِنْ اَنْتُمْ اِلَّا تَخْرُصُوْنَ (١٤٨)

(১৪৮) এই মুশরিকরা এরূপ বলতে উদ্যত যে, যদি আল্লাহর মঞ্জুর হতো, তবে আমরাও শিরক করতাম না এবং আমাদের পূর্ব পুরুষরাও না, আর আমরা কোনো বস্তুকে হারামও বলতে পারতাম না, এরূপেই তাদের পূর্ববর্তীরাও [রাসূলগণকে] মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করেছে, যে পর্যন্ত না তারা আমার আজাবের আস্বাদ গ্রহণ করেছে, আপনি বলুন, তোমাদের নিকট কোনো প্রমাণ আছে কি, যে তা আমাদের নিকট প্রকাশ করবে? তোমরা কেবল অলীক কল্পনার পিছনেই চলছ, এবং তোমরা সম্পূর্ণ অনুমানের উপরই বলছ।

قُلْ فَلِلّٰهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ ۚ فَلَوْ شَآءَ لَهَدٰىكُمْ اَجْمَعِيْنَ (١٤٩)

(১৪৯) আপনি বলুন, পূর্ণ যুক্তি-প্রমাণ কেবল আল্লাহরই রয়েছে, অনন্তর যদি তিনি চাইতেন, তবে তোমাদের সকলকে পথে আনয়ন করতেন।

শাব্দিক অনুবাদ

(১৪৭) فَاِنْ كَذَّبُوْكَ অতঃপর যদি তারা আপনাকে মিথ্যাবাদী বলে فَقُلْ তবে আপনি বলে দিন رَبُّكُمْ ذُوْ رَحْمَةٍ وَّاسِعَةٍ তোমাদের প্রতিপালক সুপ্রশস্ত করুণাবান وَلَا يُرَدُّ بَاْسُهٗ এবং তাঁর শাস্তি টলবে না عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِيْنَ অপরাধীদের থেকে।

(১৪৮) سَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا এই মুশরিকরা এরূপ বলতে উদ্যত যে لَوْ شَآءَ اللّٰهُ যদি আল্লাহর মঞ্জুর হতো مَآ اَشْرَكْنَا তবে আমরাও শিরক করতাম না وَلَآ اٰبَآؤُنَا এবং আমাদের পূর্ব পুরুষরাও না وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ আর আমরা কোনো বস্তুকে হারামও বলতে পারতাম না كَذٰلِكَ এরূপেই كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ তাদের পূর্ববর্তীরাও [রাসূলগণকে] মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করেছে حَتّٰى ذَاقُوْا بَاْسَنَا যে পর্যন্ত না তারা আমার আজাবের আস্বাদ গ্রহণ করেছে قُلْ আপনি বলুন هَلْ عِنْدَكُمْ مِّنْ عِلْمٍ তোমাদের নিকট কোনো প্রমাণ আছে কি فَتُخْرِجُوْهُ لَنَا যে তা আমাদের নিকট প্রকাশ করবে اِنْ تَتَّبِعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ তোমরা কেবল অলীক কল্পনার পিছনেই চলছ وَاِنْ اَنْتُمْ اِلَّا تَخْرُصُوْنَ এবং তোমরা সম্পূর্ণ অনুমানের উপরই বলছ।

(১৪৯) قُلْ আপনি বলুন فَلِلّٰهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ পূর্ণ যুক্তি-প্রমাণ কেবল আল্লাহরই রয়েছে فَلَوْ شَآءَ অনন্তর যদি তিনি চাইতেন لَهَدٰىكُمْ اَجْمَعِيْنَ তবে তোমাদের সকলকে পথে আনয়ন করতেন।

قُلْ هَلُمَّ شُهَدَآءَكُمُ الَّذِيْنَ يَشْهَدُوْنَ اَنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ هٰذَا ۚ فَاِنْ شَهِدُوْا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ ۚ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَالَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُوْنَ (١٥٠)

অনুবাদ : (১৫০) আপনি বলুন, নিজেদের সাক্ষীদেরকে আন যারা এর সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ তা'আলা এই বস্তুগুলোকে হারাম করেছেন, অনন্তর যদি তারা সাক্ষ্য প্রদানও করে, তবুও আপনি সেই সাক্ষ্য গ্রহণ করবেন না, এবং এরূপ লোকদের অমূলক ধারণার অনুসরণ করবেন না, যারা আমার আয়াতগুলোকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে, এবং যারা আখেরাতের প্রতি ঈমান রাখে না, আর তারা স্বীয় প্রতিপালকের সমকক্ষ অন্যকে সাব্যস্ত করে।

قُلْ تَعَالَوْا اَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ اَلَّا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْـًٔا وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ۚ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَوْلَادَكُمْ مِّنْ اِمْلَاقٍ ۭ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَاِيَّاهُمْ ۚ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ ۭ ذٰلِكُمْ وَصّٰىكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ (١٥١)

(১৫১) আপনি বলুন, আস, আমি তোমাদেরকে ঐ সকল বিষয়গুলো পড়ে শুনাই, যেগুলো তোমাদের রব তোমাদের জন্য হারাম করে দিয়েছেন, তা এই যে, আল্লাহ তা'আলার সাথে কোনো বস্তুকে শরিক স্থির করো না, আর পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করবে এবং নিজেদের সন্তানদেরকে দারিদ্র্যের কারণে হত্যা করো না, আমি এদেরকে এবং তোমাদের রিজিক দান করব, এবং লজ্জাহীনতার যত পন্থা আছে তার নিকটেও যেয়ো না, তা প্রকাশ্যই হোক আর গোপনই হোক, আর যাকে হত্যা করা আল্লাহ হারাম করেছেন, তাকে হত্যা করো না, কিন্তু হকভাবে [শরিয়তানুযায়ী] এ বিষয়ে তোমাদেরকে তাকীদী নির্দেশ দিয়েছেন, যেন তোমরা উপলব্ধি কর।

শাব্দিক অনুবাদ

(১৫০) قُلْ আপনি বলুন هَلُمَّ شُهَدَآءَكُمُ নিজেদের সাক্ষীদেরকে আন الَّذِيْنَ يَشْهَدُوْنَ যারা এর সাক্ষ্য দেয় যে اَنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ هٰذَا আল্লাহ তা'আলা এই বস্তুগুলোকে হারাম করেছেন فَاِنْ شَهِدُوْا অনন্তর যদি তারা সাক্ষ্য প্রদানও করে فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ তবুও আপনি সেই সাক্ষ্য গ্রহণ করবেন না وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَ এবং এরূপ লোকদের অমূলক ধারণার অনুসরণ করবেন না الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا যারা আমার আয়াতগুলোকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ এবং যারা আখেরাতের প্রতি ঈমান রাখে না وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُوْنَ আর তারা স্বীয় প্রতিপালকের সমকক্ষ অন্যেকে সাব্যস্ত করে।

(১৫১) قُلْ আপনি বলুন। تَعَالَوْا আস اَتْلُ আমি তোমাদেরকে ঐ সকল বিষয়গুলো পড়ে শুনাই مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ যেগুলো তোমাদের রব তোমাদের জন্য হারাম করে দিয়েছেন اَلَّا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْـًٔا তা এই যে, আল্লাহ তা'আলার সাথে কোনো বস্তুকে শরিক স্থির করো না وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا আর পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করবে। وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَوْلَادَكُمْ مِّنْ اِمْلَاقٍ এবং নিজেদের সন্তানদেরকে দারিদ্র্যের কারণে হত্যা করো না نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَاِيَّاهُمْ আমি এদেরকে এবং তোমাদের রিজিক দান করব وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ এবং লজ্জাহীনতার যত পন্থা আছে তার নিকটেও যেয়ো না مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ তা প্রকাশ্যই হোক আর গোপনই হোক وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ আর তাকে হত্যা করো না الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ যাকে হত্যা করা আল্লাহ হারাম করেছেন اِلَّا بِالْحَقِّ কিন্তু হকভাবে [শরিয়তানুযায়ী] ذٰلِكُمْ وَصّٰىكُمْ بِهٖ এ বিষয়ে তোমাদেরকে তাকীদী নির্দেশ দিয়েছেন لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ যেন তোমরা উপলব্ধি কর।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(১৫০) قوله قُلْ هَلُمَّ شُهَدَآءَكُمُ الَّذِيْنَ يَشْهَدُوْنَ اَنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ هٰذَا الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** আল্লামা নাক্কাশ বলেন, আলোচ্য আয়াত দাহরিয়া, যিন্দীক যারা রাসূলকে মিথ্যায় প্রতিপন্ন করত, তবে তারা পরজগতের জীবনের প্রতি বিশ্বাস রাখত। বলাবাহুল্য তারা মূর্তি পূজা করত এবং ইবাদতের ক্ষেত্রে আল্লাহর সাথে অন্যদেরকে অংশীদার নির্ধারণ করত। তাদের এহেন শিরকি আকিদা পোষণ করা সম্পর্কে আলোচ্য আয়াতাংশ নাজিল করা হয়েছে। –[বাহরে মুহীত ২৫০/৪]

www.almodina.com

قوله لَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَآ اَشْرَكْنَا **-এর ব্যাখ্যা :** আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করলে আমরা শিরক করতাম না। এ সমস্ত কাজ, কর্ম আচার আচরণ, উল্লিখিত বস্তু হারাম এবং নিষিদ্ধ বলেও ঘোষণা করতাম না। যখন আমরা তাঁরই রাজত্বে তাঁরই ক্ষমতাধীনে এ সমস্ত কাজ করে যাচ্ছি, শক্তি এবং ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তিনি যখন এতে বাধা দান করছেন না তখন স্বভাবতই বুঝা যায় যে, আমরা যা কিছু করছি, আমাদের আচার আচরণ সমস্তই তাঁর কাছে বৈধ এবং প্রিয়। এ উক্তি দ্বারা মুশরিকদের স্বীয় কৃতকর্ম এবং পাপাচারের বৈধতা, উত্তমতা এবং আল্লাহ প্রিয়তা যদি উদ্দেশ্য হয়, তথা সবই আল্লাহর মর্জি, আমরা নিরীহ অক্ষম মানুষ, আমরা কি করতে পারি? ভালো-মন্দ, পাপ পুণ্য সবই তাঁর হাতে, তার ইচ্ছায়ই আমরা এ সমস্ত আচরণ করছি।

অতএব নবী এবং রাসূল কেন আল্লাহর ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমাদের প্রতিবন্ধকতা করেন? কেন তারা আমাদেরকে আল্লাহর আজাবের ভয় দেখাচ্ছেন? এ কথাই যদি মুশরিকরা বলতে চায় তখন উত্তর হবে, তোমাদেরই কথা মতো যে আল্লাহর ইচ্ছায় তোমরা পাপাচার এবং শিরক করছ সে আল্লাহর ইচ্ছায় তাঁরই নির্দেশে পয়গম্বর ও রাসূল তোমাদেরকে বাধা দিচ্ছেন, সতর্ক করছেন, পরিণামের ভয় দেখাচ্ছেন এবং তাঁর ইচ্ছাই তোমাদের কৃতকর্মের শাস্তি দান করেন এবং করবেন। তোমাদের যুক্তির মূলে কোনো সত্যতা নেই, তোমরা নিছক ধারণা ও অনুমান করে এসব কথা বলছ।

قوله فَلَوْ شَآءَ لَهَدٰكُمْ اَجْمَعِيْنَ **-এর মর্মার্থ :** আল্লাহর ইচ্ছা ও সম্মতির মূলতত্ত্ব কি? যদি তোমাদের যুক্তি যথার্থই হয় তবে তো আল্লাহ তা'আলা তোমাদের সকলকে সুপথও প্রদান করতে পারতেন। আল্লাহর ইচ্ছার মূলতত্ত্ব হলো তোমাদের সত্য ও অসত্য হেদায়েত ও গোমরাহী এবং ভালো-মন্দ গ্রহণে যে পথই বেছে নিবে আল্লাহ সে পথেই তোমাদেরকে পরিচালিত করবেন। কিন্তু অসত্য গোমরাহী ও মন্দে আল্লাহর সম্মতি ও সন্তোষ থাকে না। সুতরাং তোমরা যে পথই গ্রহণ করো না কেন আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে বাধা দেবেন না। এটাই হলো আল্লাহর ইচ্ছা ও সন্তোষের মূলতত্ত্ব। স্মরণ রাখা অপরিহার্য যে, আল্লাহর দলিল প্রমাণ ও যুক্তিই হলো পূর্ণাঙ্গ ও নির্ভেজাল। অতএব সঠিক ও সত্য পথে চলতে ইচ্ছা হলে তোমরা নিজেদের ধারণা ও মনগড়া কথাবার্তা পরিহার করে আল্লাহর দলিল প্রমাণ ও যুক্তির কাছে মাথা নত কর এবং তা মেনে চল। আর এটাই হলো তোমাদের মুক্তির সঠিক পথ।

قوله فَاِنْ شَهِدُوْا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ **-এর মর্মার্থ :** আয়াতে কাফেরদেরকে সাক্ষী উপস্থিত করার জন্য আহবান জানিয়েছেন। আর মহানবী ﷺ-কে সতর্ক করে দিয়েছেন যে, তারা সাক্ষী দিলে আপনি তা গ্রহণ করবেন না। কারণ সাক্ষী হওয়ার জন্য চাক্ষুষ দর্শন বা অনুরূপ চাক্ষুষ দর্শনের জ্ঞান লাভ হয় এমন অবগতি থাকা অপরিহার্য। কিন্তু তাদের এসব কিছুই নেই। তারা সাক্ষ্য দিলে মিথ্যা সাক্ষী দিবে। সঠিক সাক্ষ্য পাবে কোথায়? সুতরাং আপনি তাদের সাক্ষ্য গহণ করবেন না এবং তাদের ধারণা, অনুমান ও মনগড়া কথার অনুসরণ করবেন না। কারণ যারা আল্লাহর আয়াতকে মিথ্যা জানে এবং পরকালের প্রতি ঈমান আনে না, আর আল্লাহর সাথে শরিক করে থাকে। অতএব এহেন লোকের সাক্ষ্য গ্রহণ করা এবং তাদের কথা মেনে চলা আপনার পক্ষে কিরূপে সম্ভব হতে পারে?

শব্দ বিশ্লেষণ

اَلْمُجْرِمِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِجْرَامُ মূলবর্ণ (ج . ر . م) জিনস صحيح অর্থ– অপরাধীরা।

ذَاقُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلذَّوْقُ মূলবর্ণ (ذ . و . ق) জিনস اجوف واوى অর্থ– তারা স্বাদ গ্রহণ করেছে।

تَخْرُصُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْخَرْصُ মূলবর্ণ (خ . ر . ص) জিনস صحيح অর্থ– তোমরা অনুমান করে কথা বলছ।

هَلُمَّ : এটি ইসমে ফে'ল اُحْضُرُوْا এর অর্থে ব্যবহৃত হয়। واحد . تثنية . جمع সবার জন্য ব্যবহৃত হয়। এখানে جمع অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থ– তোমরা উপস্থিত কর।

اَهْوَآءَ : শব্দটি বহুবচন, একবচনে هَوٰى অর্থ– প্রবৃত্তি, কামনা, বাসনা।

تَعَالَوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব تَفَاعُلٌ মাসদার اَلتَّعَالِىْ মূলবর্ণ (ع . ل . و) জিনস ناقص واوى অর্থ– তোমরা আস।

اَوْلَادَكُمْ শব্দটি বহুবচন, একবচন وَلَدٌ অর্থ– সন্তান।

لَا تَقْرَبُوْا সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ نهى حاضر معروف বাব سَمِعَ মাসদার اَلْقُرْبَانُ মূলবর্ণ (ق . ر . ب) জিনস صحيح অর্থ– তোমরা নিকটে যেয়ো না।

اَلْفَوَاحِشَ শব্দটি বহুবচন; একবচন فَاحِشَةٌ অর্থ– অশ্লীল কাজ, কুকর্ম, নির্লজ্জতা।

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۚ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۚ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۚ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (١٥٢)

অনুবাদ : (১৫২) এতিমের ধন-সম্পত্তির নিকটও যেও না, কিন্তু এরূপে যা উত্তম হয়– যে পর্যন্ত না তারা সাবালক হয়, আর পরিমাপ ও ওজন ঠিক ঠিকভাবে সম্পন্ন করবে, ন্যায়ের সাথে, আমি কোনো মানুষকে তার সাধ্যাতীত কষ্ট প্রদান করি না, আর যখন তোমরা [সাক্ষ্য বা মীমাংসার] কথা বল, তখন ন্যায়ের প্রতি লক্ষ্য রেখ, যদি সেই ব্যক্তি আত্মীয়ও হয়, আর আল্লাহর সাথে যে অঙ্গীকার কর তা পূর্ণ করবে, এই [সকল] বিষয়ে আল্লাহ পাক তোমাদের প্রতি তাকীদী নির্দেশ দিয়েছেন, যেন তোমরা স্মরণ রাখ।

وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ ۚ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (١٥٣)

(১৫৩) আর এটা [-ও বলুন] যে, এই ধর্ম আমার পথ- যা সোজা, অতএব, এই পথের অনুসরণ কর, এবং অন্য সব পথের অনুসরণ করো না, কেননা ঐ সকল পথ তোমাদেরকে আল্লাহর পথ হতে বিচ্ছিন্ন করে ফেলবে, এই সকল বিষয়ে তোমাদেরকে আল্লাহ তাকীদী নির্দেশ দিয়েছেন, যেন তোমরা মুত্তাকী হয়ে যাও।

ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ (١٥٤)

(১৫৪) অতঃপর আমি মূসাকে কিতাব দান করেছি, যাতে উত্তমরূপে আমলকারীদের প্রতি আমার নিয়ামত পূর্ণ হয় এবং সমস্ত বিধানের বিস্তারিত বর্ণনা হয় এবং পথপ্রদর্শক হয় এবং রহমত হয়, যেন তারা নিজ রবের সাথে সাক্ষাতের প্রতি বিশ্বাসী হয়।

শাব্দিক অনুবাদ

(১৫২) وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ এতিমের ধন-সম্পত্তির নিকটও যেও না إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ কিন্তু এরূপে যা উত্তম হয়– যে পর্যন্ত না তারা সাবালক হয় وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ আর পরিমাপ ও ওজন ঠিক ঠিকভাবে সম্পন্ন করবে بِالْقِسْطِ ন্যায়ের সাথে لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا আমি কোনো মানুষকে তার সাধ্যাতীত কষ্ট প্রদান করি না وَإِذَا قُلْتُمْ আর যখন তোমরা [সাক্ষ্য বা মীমাংসার] কথা বল فَاعْدِلُوا তখন ন্যায়ের প্রতি লক্ষ্য রেখ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ যদি সেই ব্যক্তি আত্মীয়ও হয় وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا আর আল্লাহর সাথে যে অঙ্গীকার কর তা পূর্ণ করবে ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ এই [সকল] বিষয়ে আল্লাহ পাক তোমাদের প্রতি তাকীদী নির্দেশ দিয়েছেন لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ যেন তোমরা স্মরণ রাখ।

(১৫৩) وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي আর এটা [-ও বলুন] যে, এই ধর্ম আমার পথ- مُسْتَقِيمًا যা সোজা فَاتَّبِعُوهُ অতএব, এই পথের অনুসরণ কর وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ এবং অন্য সব পথের অনুসরণ করো না فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ কেননা ঐ সকল পথ তোমাদেরকে আল্লাহর পথ হতে বিচ্ছিন্ন করে ফেলবে ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ এই সকল বিষয়ে তোমাদেরকে আল্লাহ তাকীদী নির্দেশ দিয়েছেন لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ যেন তোমরা মুত্তাকী হয়ে যাও।

(১৫৪) ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ অতঃপর আমি মূসাকে কিতাব দান করেছি تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ যাতে উত্তমরূপে আমলকারীদের প্রতি আমার নিয়ামত পূর্ণ হয় وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ এবং সমস্ত বিধানের বিস্তারিত বর্ণনা হয় وَهُدًى এবং পথপ্রদর্শক হয় وَرَحْمَةً এবং রহমত হয় لَعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ যেন তারা নিজ রবের সাথে সাক্ষাতের প্রতি বিশ্বাসী হয়।

وَهٰذَا كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ مُبٰرَكٌ فَاتَّبِعُوْهُ وَاتَّقُوْا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ (١٥٥)

অনুবাদ : (১৫৫) আর তা [কুরআন] একটি কিতাব, যা আমি নাজিল করেছি, অতি কল্যাণময়, অতএব, তার অনুসরণ কর এবং ভয় কর, যেন তোমাদের প্রতি রহমত হয়।

اَنْ تَقُوْلُوْٓا اِنَّمَآ اُنْزِلَ الْكِتٰبُ عَلٰى طَآئِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَاِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغٰفِلِيْنَ (١٥٦)

(১৫৬) তোমরা হয়তো বলতে পার যে, কিতাব তো শুধু আমাদের পূর্বে যে দুই সম্প্রদায় ছিল, তাদের প্রতি নাজিল হয়েছে, আর আমরা তো তার পঠন ও পাঠন হতে সম্পূর্ণ বে-খবর ছিলাম।

اَوْ تَقُوْلُوْا لَوْ اَنَّآ اُنْزِلَ عَلَيْنَا الْكِتٰبُ لَكُنَّآ اَهْدٰى مِنْهُمْ ۚ فَقَدْ جَآءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَّرَحْمَةٌ ۚ فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَصَدَفَ عَنْهَا ۗ سَنَجْزِى الَّذِيْنَ يَصْدِفُوْنَ عَنْ اٰيٰتِنَا سُوْٓءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوْا يَصْدِفُوْنَ (١٥٧)

(১৫৭) অথবা এরূপ বলতে পার যে, যদি আমাদের প্রতি কোনো কিতাব নাজিল হতো, তবে আমরা তাদের অপেক্ষাও অধিক সুপথে থাকতাম, অতএব, এখন তোমাদের নিকট তোমাদের রবের পক্ষ থেকে একটি সুস্পষ্ট কিতাব এবং হেদায়েতের উপকরণ ও রহমত সমাগত হয়েছে, সুতরাং সে ব্যক্তি হতে অধিক জালেম কে হবে, যে আল্লাহর আয়াতসমূহ মিথ্যা সাব্যস্ত করে এবং তা হতে [অন্যকেও] প্রতিরোধ করে? আমি শীঘ্রই তাদেরকে- যারা আমার আয়াতসমূহ হতে [অন্যকে] প্রতিরোধ করে, তাদের এই প্রতিরোধের কারণে কঠোর শাস্তি দিব।

শাব্দিক অনুবাদ

(১৫৫) وَهٰذَا كِتٰبٌ আর তা [কুরআন] একটি কিতাব اَنْزَلْنٰهُ যা আমি নাজিল করেছি مُبٰرَكٌ অতি কল্যাণময় فَاتَّبِعُوْهُ অতএব, তার অনুসরণ কর وَاتَّقُوْا এবং ভয় কর لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ যেন তোমাদের প্রতি রহমত হয়।

(১৫৬) اَنْ تَقُوْلُوْا তোমরা হয়তো বলতে পার যে اِنَّمَآ اُنْزِلَ الْكِتٰبُ কিতাব তো শুধু নাজিল হয়েছে عَلٰى طَآئِفَتَيْنِ যে দু সম্প্রদায় ছিল, তাদের প্রতি مِنْ قَبْلِنَا আমাদের পূর্বে وَاِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغٰفِلِيْنَ আর আমরা তো তার পঠন ও পাঠন হতে সম্পূর্ণ বে-খবর ছিলাম।

(১৫৭) اَوْ تَقُوْلُوْا অথব এরূপ বলতে পার যে لَوْ اَنَّآ اُنْزِلَ عَلَيْنَا الْكِتٰبُ যদি আমাদের প্রতি কোনো কিতাব নাজিল হতো لَكُنَّآ اَهْدٰى مِنْهُمْ তবে আমরা তাদের অপেক্ষাও অধিক সুপথে থাকতাম فَقَدْ جَآءَكُمْ অতএব এখন তোমাদের নিকট সমাগত হয়েছে بَيِّنَةٌ একটি সুস্পষ্ট কিতাব مِّنْ رَّبِّكُمْ তোমাদের রবের পক্ষ থেকে وَهُدًى এবং হেদায়েতের উপকরণ وَّرَحْمَةٌ ও রহমত فَمَنْ اَظْلَمُ সুতরাং সে ব্যক্তি হতে অধিক জালেম কে হবে مِمَّنْ كَذَّبَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ যে আল্লাহর আয়াতসমূহ মিথ্যা সাব্যস্ত করে وَصَدَفَ عَنْهَا এবং তা হতে [অন্যকেও] প্রতিরোধ করে سَنَجْزِى আমি শীঘ্রই তাদেরকে দিব- الَّذِيْنَ يَصْدِفُوْنَ عَنْ اٰيٰتِنَا যারা আমার আয়াতসমূহ হতে [অন্যকে] প্রতিরোধ করে سُوْٓءَ الْعَذَابِ কঠোর শাস্তি بِمَا كَانُوْا يَصْدِفُوْنَ তাদের এই প্রতিরোধের কারণে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

আলোচ্য আয়াতসমূহের পূর্বে প্রায় দু'তিন রুকূ'তে অব্যাহতভাবে এ বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে যে, গাফেল ও মূর্খ মানুষ ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডলের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ প্রেরিত আইন পরিত্যাগ করে পৈতৃক ও মনগড়া কুপ্রথাকে ধর্ম হিসেবে গ্রহণ করেছে। আল্লাহ তা'আলা যেসব বস্তু অবৈধ করেছিলেন, সেগুলোকে তারা বৈধ মনে করে ব্যবহার করতে শুরু করেছে। পক্ষান্তরে আল্লাহ কর্তৃক হালালকৃত অনেক বস্তুকে তারা নিজেদের জন্য হারাম করে নিয়েছে এবং কোনো কোনো বস্তুকে শুধু পুরুষদের জন্য হালাল স্ত্রীদের জন্য হারাম করেছে। আবার কোনো কোনো বস্তুকে স্ত্রীদের জন্য হালাল এবং পুরুষদের জন্য হারাম করেছে।

আলোচ্য তিন আয়াতে সেসব বস্তু সম্পর্কে বলা হয়েছে, যেগুলোকে আল্লাহ তা'আলা হারাম করেছেন। বিশদ বর্ণনায় নয়টি বস্তুর উল্লেখ হয়েছে। এরপর দশম নির্দেশ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে هٰذَا صِرَاطِيْ مُسْتَقِيْمًا فَاتَّبِعُوْهُ অর্থাৎ এ ধর্মই হচ্ছে আমার সরল পথ। এ পথের অনুসরণ কর। এতে রাসূলুল্লাহ ﷺ–এর আনীত ও বর্ণিত ধর্মের প্রতি ইঙ্গিত করে সমস্ত হালাল-হারাম, জায়েজ-নাজায়েজ, মাকরূহ ও মোস্তাহাব বিষয়কে এ ধর্মে ন্যস্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ ﷺ–এর ধর্ম যে বিষয়কে হালাল বলেছে, তাকে হালাল এবং যে বিষয়কে হারাম বলেছে তাকে হারাম মনে করবে– নিজের পক্ষ থেকে হালাল হারামের ফতোয়া জারি করবে না।

আলোচ্য আয়াতসমূহে যে দশটি বিষয় বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে সেগুলোর আসল লক্ষ্য হচ্ছে হারাম বিষয়সমূহ বর্ণনা করা। কাজেই সবগুলোকে নিষেধাজ্ঞার ভঙ্গিতে বর্ণনা করাই ছিল সঙ্গত, কিন্তু কুরআন পাক স্বীয় বিজ্ঞজনোচিত পদ্ধতি অনুসারে তন্মধ্যে কয়েকটি বিষয়কে ধনাত্মভাবে আদেশের ভঙ্গিতে বর্ণনা করেছে। তার উদ্দেশ্য এই যে এর বিপরীত কারা হারাম। (কাশশাফ) এর তাৎপর্য পরে জানা যাবে। আয়াতে বর্ণিত দশটি হারাম বিষয় হচ্ছে এই :

(১) আল্লাহ তা'আলার সাথে ইবাদত ও আনুগত্যে কাউকে অংশীদার স্থির করা, (২) পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার না করা, (৩) দারিদ্র্যের ভয়ে সন্তান হত্যা করা, (৪) অশ্লীল কাজ করা, (৫) কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা, (৬) এতিমের ধন-সম্পদ অবৈধভাবে আত্মসাৎ করা, (৭) ওজন ও মাপে কম দেওয়া, (৮) সাক্ষ্য, ফয়সালা অথবা অন্যান্য কথাবার্তায় অবিচার করা, (৯) আল্লাহর অঙ্গীকার পূর্ণ না করা এবং (১০) আল্লাহ তা'আলার সোজা-সরল পথ ছেড়ে অন্য পথ অবলম্বন করা।

আলোচ্য আয়াত সমূহের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য : তাওরাত বিশেষজ্ঞ কা'বে আহবার পূর্বে ইহুদি ছিলেন, অতঃপর মুসলমান হয়ে যান। তিনি বলেন : আল্লাহর কিতাব তাওরাত বিসমিল্লাহর পর কুরআন পাকের এসব আয়াত দ্বারাই শুরু হয়, যেগুলোতে দশটি হারাম বিষয় বর্ণিত হয়েছে। আরও বর্ণিত আছে যে, এ দশটি বাক্যই হযরত মূসা (আ.)-এর প্রতিও অবতীর্ণ হয়েছিল।

তাফসীরবিদ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, সূরা আলে ইমরানে মুহকাম আয়াতের বর্ণনায় এ আয়াতগুলোকেই বুঝানো হয়েছে। হযরত আদম (আ.) থেকে শুরু করে শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) পর্যন্ত সব পয়গম্বরের শরিয়তই এসব আয়াত সম্পর্কে একমত। কোনো ধর্ম ও শরিয়তে এগুলোর কোনোটিই মানসূখ বা রহিত হয়নি। –[তফসীরে বাহরে মুহীত]

এসব আয়াত রাসূলুল্লাহ ﷺ–এর অসিয়তনামা : তাফসীরে ইবনে কাছীরে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)–এর উক্তি বর্ণিত আছে যে, যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মোহরাঙ্কিত অসিয়তনামা দেখতে চায়, সে যেন এ আয়াগুলো পাঠ করে। এসব আয়াতে ঐ অসিয়ত বিদ্যমান, যা রাসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহর নির্দেশে উম্মতকে দিয়েছেন।

হাকেম হযরত ওবাদা ইবনে সামেত (রা.)-এর রেওয়ায়েতক্রমে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কে আছে যে আমার হাতে তিনটি আয়াতের আজ্ঞানুবর্তী হওয়ার শপথ করবে? অতঃপর তিনি আলোচ্য তিনটি আয়াত তেলাওয়াত করে বললেন : যে ব্যক্তি এ শপথ পূর্ণ করবে, তাকে পুরস্কৃত করা আল্লাহর দায়িত্ব।

এবার দশটি বিষয়ের বিস্তারিত বর্ণনা এবং আয়াতত্রয়ের তাফসীর লক্ষ্য করুন। আয়াতগুলোর সূচনা এভাবে করা হয়েছে : قُلْ تَعَالَوْا اَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ এতে تَعَالَوْا শব্দের অর্থ 'এসো'। আসলে উচ্চস্থানে দণ্ডায়মান হয়ে নিম্নের লোকদেরকে

www.almodina.com

নিজের কাছে ডাকা অর্থে এশব্দটি ব্যবহৃত হয়। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, এ দাওয়াত কবুল করার মধ্যেই তাদের জন্য শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রাধান্য বিদ্যমান। এখনে রাসূলুল্লাহ ﷺ–কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে যে, আপনি তাদেরকে বলুন : এসো, যাতে আমি তোমাদেরকে ঐসব বিষয়ে পাঠ করে শুনাতে পারি যেগুলো আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য হারাম করেছেন। এটা প্রত্যক্ষভাবে আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত বার্তা। এতে কারও কল্পনা, আন্দাজ ও অনুমানের কোনো প্রভাব নেই, যাতে তোমরা এসব বিষয় থেকে আত্মরক্ষা করতে যত্নবান হও এবং অনর্থক নিজের পক্ষ থেকে আল্লাহর হালালকৃত বিষয়সমূহকে হারাম না কর।

এ আয়াতে যদিও সরাসরি মক্কার মুশরিকদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে, কিন্তু বিষয়টি ব্যপক হওয়ার কারণে সমগ্র মানবজাতিই এর আওতাধীন মুমিন হোক কিংবা কাফের, আরব হোক কিংবা অনারব, উপস্থিত লোকজন হোক কিংবা অনাগত বংশধর। –[বাহরে মুহীত]

সর্বপ্রথম মহাপাপ শিরক, যা হারাম করা হয়েছে : এরূপ সযত্ন সম্বোধনের পর হারাম ও নিষিদ্ধ বিষয়সমূহের তালিকায় সর্বপ্রথম বলা হয়েছে : لَا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا অর্থাৎ সর্বপ্রথম কাজ এই যে, আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক ও অংশীদার করোনা। আরবের মুশরিকদের মতো দেব-দেবীদের বা মূর্তিকে খোদা মনে করো না। ইহুদি ও খ্রিস্টানদের মতো পয়গম্বরগণকে খোদা কিংবা খোদার পুত্র বলো না। অন্যদের মতো ফেরেশতাদেরকে আল্লাহর কন্যা বলে আখ্যা দিও না। মূর্খ জনগণের মতো পয়গম্বর ও ওলীগণকে জ্ঞান ও শক্তি সামর্থ্যে আল্লাহর সমতুল্য সাব্যস্ত করো না।

শিরকের সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ : তফসীরে মাযহারীতে বলা হয়েছে : এখানে شَيْئًا -এর অর্থ এরূপ হতে পারে যে, 'জলী' অর্থাৎ প্রকাশ্য শিরক ও প্রচ্ছন্ন শিরক। এ প্রকারদ্বয়ের মধ্য থেকে কোনোটিতেই লিপ্ত হয়ো না। প্রকাশ্য শিরকের অর্থ সবাই জানে যে, ইবাদত আনুগত্য অথবা অন্য কোনো বিশেষ গুণে অন্যকে আল্লাহ তা'আলার সমতুল্য অথবা তাঁর অংশীদার সাব্যস্ত করা। প্রচ্ছন্ন শিরক এই যে, নিজ কাজ কর্মে ধর্মীয় ও পার্থিব উদ্দেশ্যসমূহে এবং লাভ-লোকসানে আল্লাহ তা'আলাকে কার্যনির্বাহী মনে করা এবং যাবতীয় প্রচেষ্টা অন্যদের সাথেই জড়িত রাখা। এছাড়া লোক দেখানো ইবাদত করা, অন্যদেরকে দেখানোর জন্য নামাজ ইত্যাদি ঠিকমতো পড়া, নাম-যশ লাভের উদ্দেশ্যে দান-খয়রাত করা অথবা কার্যত লাভ-লোকসানের মালিক আল্লাহ ছাড়া অন্যকে সাব্যস্ত করা ইত্যাদিও প্রচ্ছন্ন শিরকের অন্তর্ভুক্ত।

মোটকথা, প্রকাশ্য প্রচ্ছন্ন উভয় প্রকার শিরক থেকেই বেঁচে থাকা দরকার। প্রতিমা ইত্যাদির পূজাপাট যেমন শিরকের অন্তর্ভুক্ত, তেমনি পয়গম্বর ও ওলীদেরকে জ্ঞান ও শক্তি-সামর্থ্য ইত্যাদি গুণে আল্লাহ তা'আলার সমতুল্য মনে করাও অন্যতম শিরক। আল্লাহ না করুন! যদি কারও বিশ্বাস এরূপ হয়, তবে তা প্রকাশ্য শিরক। আর বিশ্বাস এরূপ না হয়ে কাজ এরূপ করলে তা হবে প্রচ্ছন্ন শিরক। এ স্থলে সর্বপ্রথম শিরক থেকে আত্মরক্ষার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কারণ শিরকের অপরাধ সম্পর্কে কুরআন পাকের সিদ্ধান্ত এই যে, এর ক্ষমা নেই।

দ্বিতীয় গুনাহ পিতামাতার সাথে অসদ্ব্যবহার : বর্ণনা করা হয়েছে : وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا অর্থাৎ পিতা মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করা। উদ্দেশ্য এই যে, পিতা-মাতার অবাধ্যতা করো না। তাদেরকে কষ্ট দিও না। কিন্তু বিজ্ঞজনোচিত ভঙ্গি তে বলা হয়েছে যে, পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার কর। এতে এদিকে ইঙ্গিত করা উদ্দেশ্য যে, পিতা-মাতার অবাধ্যতা না করা এবং কষ্ট না দেওয়াই যাথেষ্ট নয়; বরং সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে তাদেরকে সন্তুষ্ট রাখা ফরজ। কুরআন পাকের অন্যত্র এ কথাটি এভাবে বর্ণিত হয়েছে: وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ

এ আয়াতে পিতামাতাকে কষ্ট দেওয়া শিরকের পর দ্বিতীয় পর্যায়ের অপরাধ সাব্যস্ত করা হয়েছে। যেমন অন্য এক আয়াতে তাদের আনুগত্য ও সুখ বিধানকে আল্লাহ তা'আলার ইবাদতের সাথে সংযুক্ত করে বলা হয়েছে :

وَقَضٰى رَبُّكَ اَنْ لَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا অর্থাৎ তোমার পালনকর্তা ফয়সালা করেছেন যে, তাঁকে ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করো না এবং পিতা মাতার সাথে সদ্ব্যবহার কর। অন্য এক জায়গায় বলা হয়েছে : اَنِ اشْكُرْ لِيْ وَلِوَالِدَيْكَ اِلَيَّ الْمَصِيْرُ অর্থাৎ আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা এবং পিতামাতার। অতঃপর আমার দিকেই প্রত্যাবর্তন করতে হবে। অর্থাৎ বিপরীত করলে শাস্তি পাবে।

বুখারী ও মুসলিমে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলেন, সর্বোত্তম কাজ কোনটি? তিনি উত্তরে বললেন : নামাজ মোস্তাহাব সময়ে পড়া। তিনি আবার প্রশ্ন করলেন : এরপর কোনটি উত্তম? উত্তর হলো : পিতামাতার সথে সদ্ব্যবহার। আবার প্রশ্ন হলো : এরপর কোনটি? উত্তর হলো : আল্লাহর পথে জিহাদ।

www.almodina.com

সহীহ মুসলিমে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)–এর বাচনিক বর্ণিত আছে। একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ তিনবার বললেন : رَغِمَ أَنْفُهُ، رَغِمَ أَنْفُهُ، رَغِمَ أَنْفُهُ অর্থাৎ সে লাঞ্ছিত হয়েছে। সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ! কে লাঞ্ছিত হয়েছে? তিনি বললেন : পিতামাতাকে বার্ধক্য অবস্থায় পেয়েও জান্নাতে প্রবেশ করতে পারে না।

তৃতীয় হারাম : সন্তান হত্যা : আয়াতে বর্ণিত তৃতীয় হারাম বিষয় হচ্ছে সন্তান হত্যা। এখানে পূর্বাপর সম্পর্ক এই যে, ইতিপূর্বে পিতা-মাতার হক বর্ণিত হয়েছে, যা সন্তানের কর্তব্য। এখন সন্তানের হক বর্ণিত হচ্ছে, যা পিতা মাতার কর্তব্য। জাহেলিয়াত যুগে সন্তানকে জীবন্ত পুঁতে ফেলা কিংবা হত্যা করার ব্যাপারটি ছিল সন্তানের সাথে অসদ্ব্যবহারের চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ আয়াতে তা নিষিদ্ধ করে বলা হয়েছে : وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَوْلَادَكُمْ مِّنْ اِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَاِيَّاهُمْ অর্থাৎ দারিদ্র্যের কারণে স্বীয় সন্তানদেরকে হত্যা করোনা। আমি তোমাদেরকে এবং তাদেরকে উভয়কেই জীবিকা দান করব।

জাহিলি যুগে এ নিকৃষ্টতম নির্দয় পাষণ্ডপ্রথা প্রচলিত ছিল যে, কন্যা সন্তান জন্ম গ্রহণ করলে কাউকে জামাতা করার লজ্জা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার উদ্দেশ্যে তাকে জীবন্ত পুঁতে ফেলা হতো। মাঝে মাঝে জীবিকা নির্বাহ কঠিন হবে মনে করে পাষণ্ডরা নিজ হাতে সন্তানদেরকে হত্যা করত। কুরআন পাক এ কুপ্রথা রহিত করে দিয়েছে। উল্লিখিত আয়াতে তাদের সেই মানসিক ব্যাধিরও প্রতিকার বর্ণিত হয়েছে, যে কারণে তারা এ ঘৃণ্য অপরাধে লিপ্ত হতো। সন্তানের পানাহারের সংস্থান কোথা থেকে হবে, এ ভাবনাই ছিল তাদের মানসিক রোগ। আল্লাহ তা'আলা আয়াতে ব্যক্ত করেছেন যে, পানাহার করানো এবং জীবিকা প্রদানের আসল দায়িত্ব তোমাদের নয়, এ কাজ সরাসরি আল্লাহ তা'আলার। তোমরা স্বয়ং জীবিকা ও পানাহারে তাঁর মুখাপেক্ষী। তিনি দিলে তোমরা সন্তানদেরকেও দিয়ে থাক। তিনি না দিলে তোমাদের কি সাধ্য যে, একটি গম অথবা চালের দানা নিজে সৃষ্টি করবে। শক্ত মাটির বুক চিরে বীজকে অঙ্কুরিত করা, অতঃপর তাকে বৃক্ষের আকার দান করা, অতঃপর ফুলে ফলে সমৃদ্ধ করা কার কাজ? পিতা-মাতা এ কাজ করতে পারে কি? এগুলো সর্বশক্তিমানের কুদরতের কারসাজি। এ কাজে মানুষের কোনো হাত নেই। সে শুধু মাটিকে নরম করতে এবং চারা গজালে পানি দিতে পারে। কিন্তু ফুল ফল সৃষ্টিতে তার বিন্দুমাত্রও হাত নেই। অতএব, পিতা-মাতার এ ধারণা অমূলক যে, তারা সন্তানদেরকে রিজিক দান করে; বরং আল্লাহ তা'আলার অদৃশ্য ভাণ্ডার থেকে পিতা মাতাও পায় এবং সন্তানরাও। তাই এখানে প্রথমে পিতামাতার উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, আমি তোমাদেরকেও রিজিক দেব এবং তাদেরকেও। এতে আরও ইঙ্গিত হতে পারে যে, তোমাদেরকে রিজিক এজন্য দেওয়া হয়, যাতে তোমরা সন্তানদেরকে পৌঁছে দাও। এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন إِنَّمَا تُنْصَرُوْنَ وَتُرْزَقُوْنَ بِضُعَفَائِكُمْ অর্থাৎ তোমাদের দুর্বল ও অক্ষম লোকদের কারণে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের সাহায্য করেন ও রিজিক দান করেন।

সূরা ইসরায়ও এ বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু সেখানে রিজিকের ব্যাপারে প্রথমে সন্তানের উল্লেখ করে বলা হয়েছে : نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَاِيَّاكُمْ অর্থাৎ আমি তাদেরকেও রিজিক দেব এবং তোমাদেরকেও। এতেও ইঙ্গিত রয়েছে যে, আমার কাছে রিজিকের প্রথম হকদার দুর্বল ও অক্ষম সন্তানরা। তাদের খাতিরেই তোমাদেরকেও দেওয়া হয়।

সন্তানের শিক্ষা ও চরিত্রগঠন না করা এবং ধর্মবিমুখতার জন্য স্বাধীন ছেড়ে দেওয়াও এক প্রকার সন্তান হত্যা : আয়াতে বর্ণিত সন্তান হত্যা যে অপরাধ ও কঠোর গোনাহ তা বাহ্যিক হত্যা ও মেরে ফেলার অর্থে তো সুস্পষ্টই। চিন্তা করলে বুঝা যায় যে, সন্তানকে শিক্ষা দীক্ষা না দেওয়া এবং তার চরিত্র গঠন না করা, যদ্দরুন সে আল্লাহ রাসূল ও পরকালের প্রতি উদাসীন হয়ে পড়ে এবং চরিত্রহীন ও নির্লজ্জ কাজে জড়িত হয়ে পড়ে, এটাও সন্তান হত্যার চাইতে কম মারাত্মক নয়। কুরআন পাকের ভাষায় সে ব্যক্তি মৃত, যে আল্লাহকে চিনে না এবং তাঁর আনুগত্য করে না। اَوَ مَنْ كَانَ مَيْتًا فَاَحْيَيْنٰهُ আয়াতে তাই বর্ণিত হয়েছে– যারা সন্তানদের কাজ কর্ম ও চরিত্র সংশোধনের প্রতি মনোযোগ দেয়না, তাদেরকে স্বাধীনভাবে ছেড়ে দেয় কিংবা এমন ভ্রান্ত শিক্ষা দেয় যার ফলে ইসলামি চরিত্র ধ্বংস হয়ে যায়, তারাও একদিক দিয়ে সন্তান হত্যার অপরাধে অপরাধী। বাহ্যিক হত্যার প্রভাবে তো শুধু ক্ষণস্থায়ী জাগতিক জীবন বিপর্যস্ত হয়। কিন্তু এ হত্যা মানুষের পরলৌকিক ও চিরস্থায়ী জীবনের মূলেও কুঠারাঘাত করে।

চতুর্থ হারাম নির্লজ্জ কাজ : আয়াতে বর্ণিত চতুর্থ হারাম বিষয় হচ্ছে নির্লজ্জ কাজ। এ সম্পর্কে বলা হয়েছে : وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ অর্থাৎ প্রকাশ্য হোক কিংবা গোপন, যে কোনো রকম অশ্লীলতার কাছেও যেয়ো না।

www.almodina.com

فَوَاحِشْ শব্দটি فَاحِشَةٌ -এর বহুবচন। فَاحِشَةٌ ও فَحْشَاءُ، فُحْشٌ সবগুলো ধাতু। এগুলোর অর্থ সাধারণত : অশ্লীলতা ও নির্লজ্জ হয়। কুরআন ও হাদীসের পরিভাষায় এসব শব্দের অর্থ হচ্ছে এমন সব কাজ, যার অনিষ্টতা ও খারাবি সুদূর প্রসারী। ইমাম রাগেব 'মুফরাদাতুল কুরআন' গ্রন্থে এবং ইবনে আসীর 'নেহায়াহ' গ্রন্থে এ অর্থই বর্ণনা করেছেন। কুরআনা পাকের বিভিন্ন জায়গায় এসব কাজের নিষেধাজ্ঞা বর্ণিত হয়েছে। এক আয়াতে বলা হয়েছে : وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ অনত্র বলা হয়েছে : حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ

যাবতীয় বড় গোনাহ فَحْشَاءُ ও فُحْشٌ -এর অর্থের অন্তর্ভুক্ত, তা উক্তি সম্পর্কিত হোক বিংবা কর্ম সম্পর্কিত, বাহ্যিক হোক কিংবা অভ্যন্তরীণ। এ ছাড়া আত্মিক ব্যভিচার ও নির্লজ্জতার যাবতীয় কাজও এর অন্তর্ভুক্ত। এ কারণেই সাধারণ ভাষায় এ শব্দটি ব্যভিচার অর্থে ব্যবহৃত হয়। কুরআনের আলোচ্য আয়াতে নির্লজ্জ কাজ সমূহের কাছে যেতেও নিষেধ করা হয়েছে। ব্যাপক অর্থ নেওয়া হলে যাবতীয় বদঅভ্যাস, মুখ, হাত, পা ও অন্তরের যাবতীয় গুনাহই এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। পক্ষান্তরে সাধারণের মধ্যে প্রচলিত অর্থ ব্যভিচার নেওয়া হলে আয়াতে ব্যভিচার ও তার ভূমিকা এবং কারণসমূহ বুঝানো হয়েছে।

এ আয়াতেই فَوَاحِشْ -এর ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে : مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ প্রথমোক্ত অর্থ অনুযায়ী বাহ্যিক فَوَاحِشْ –এর অর্থ হবে হাত, পা, ইত্যাদি দ্বারা সম্পন্ন গুনাহ এবং আভ্যন্তরীণ فَوَاحِشْ –এর অর্থ হবে অন্তর সম্পর্কিত গুনাহ যেমন হিংসা, পরশ্রীকাতরতা, অকৃতজ্ঞতা, অধৈর্য ইত্যাদি।

দ্বিতীয় অর্থ অনুযায়ী বাহ্যিক فَوَاحِشْ -এর অর্থ এমন ব্যভিচার যা প্রকাশ্যে করা হয়। আর আভ্যন্তরীণের অর্থ যে ব্যভিচার গোপনে করা হয়। ব্যভিচারের ভূমিকাও প্রকাশ্য ব্যভিচারের অন্তর্ভুক্ত। কু-নিয়তে পর নারীকে দেখা, হাতে স্পর্শ করা এবং তার সাথে প্রেমালাপ করা এরই অন্তর্ভুক্ত। পক্ষান্তরে ব্যভিচার সম্পর্কিত যাবতীয় চিন্তা ভাবনা, সংকল্প এবং গোপন কৌশল অবলম্বন আভ্যন্তরীণ ব্যভিচারের অন্তর্ভুক্ত।

কোনো কোনো তাফসীরবিদ বলেন : বাহ্যিক নির্লজ্জতার অর্থ সাধারণভাবে প্রচলিত অশ্লীল ও নির্লজ্জ কাজকর্ম এবং আভ্যন্তরীণ নির্লজ্জতার অর্থ আল্লাহ তা'আলার দৃষ্টিতে নির্লজ্জ কাজ-কর্ম, যদিও সাধারণভাবে মানুষ সেগুলোকে খারাপ মনে করে না কিংবা সেগুলো যে হারাম, তা সাধারণ মানুষ জানে না। উদাহরণতঃ স্ত্রীকে তিন তালাক দেওয়ার পরও তাকে স্ত্রী হিসেবে রেখে দেওয়া কিংবা হালাল নয় এরূপ মহিলাকে বিয়ে করা।

মোটকথা এ আয়াত নির্লজ্জতার প্রকৃত অর্থের দিক দিয়ে বহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ সমস্ত গুনাহকে এবং সাধারণের মধ্যে প্রসিদ্ধ অর্থের দিক দিয়ে ব্যভিচারের প্রকাশ্য ও গোপন সকল পন্থাকে অন্তর্ভুক্ত করে নেয়। এ সম্পর্কে নির্দেশ এই যে, এগুলোর কাছেও যেয়ো না। কাছে না যাওয়ার অর্থ এরূপ মজলিস ও স্থান থেকে বেঁচে থাকা যেখানে গেলে গুনাহে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে এবং এরূপ কাজ থেকেও বেঁচে থাক, যেখানে গেলে গুনাহে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে এবং এরূপ কাজ থেকেও বেচে থাক, যা দ্বারা এসব গোনাহের পথ খুলে যায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : مَنْ حَامَ حَوْلَ الْحِمَىٰ أَوْشَكَ أَنْ يَقَعَ فِيهِ অর্থাৎ যে লোক নিষিদ্ধ জায়গার আশপাশে ঘুরাফেরা করে, সে তাতে প্রবেশ করার কাছাকাছি হয়ে যায়।

পঞ্চম হারাম বিষয় অন্যায় হত্যা : এ সম্পর্কে বলা হয়েছে : وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যাকে হত্যা করা হারাম করেছেন, তাকে হত্যা করোনা, তবে ন্যায়ভাবে। ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ; তিনটি কারণ ছাড়া কোনো মুসলমানের খুন হালাল নয়।। **(এক)** বিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও ব্যভিচারে লিপ্ত হলে, **(দুই)** অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করলে তার কেসাস হিসেবে তাকে হত্যা করা যাবে এবং **(তিন)** সত্য ধর্ম ইসলাম ত্যাগ করে মুরতাদ হয়ে গেলে।

খলিফা হযরত ওসমান গনী (রা.) যখন বিদ্রোহীদের দ্বারা অবরুদ্ধ হন এবং বিদ্রোহীরা তাঁকে হত্যা করতে উদ্যত হয়, তখনও তিনি তাদেরকে এ হাদীস শুনিয়ে বলেছিলেন, আল্লাহর রহমতে আমি এ তিনটি কারণ থেকেই মুক্ত। মুসলমান হয়ে তো দূরের কথা, জাহেলিয়াত যুগেও আমি ব্যভিচারে লিপ্ত হইনি, আমি কোনো খুন করিনি, স্বীয় ধর্ম ইসলাম ত্যাগ করব এরূপ কল্পনাও আমার মনে কখনও জাগেনি। এমতাবস্থায় তোমরা আমাকে কি কারণে হত্যা করতে চাও?

বিনা করণে মুসলমানকে হত্যা করা যেমন হারাম, তেমনিভাবে এমন কোনো অমুসলমানকে হত্যা করাও হারাম, যে কোনো ইসলামি দেশের প্রচলিত আইন মান্য করে বসবাস করে কিংবা যার সাথে মুসলমানের চুক্তি থাকে।

www.almodina.com

তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ গ্রন্থে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণিত এক রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : যে ব্যক্তি কোনো জিম্মী অমুসলিমকে হত্যা করে, সে আল্লাহর অঙ্গীকার ভঙ্গ করে। যে আল্লাহর অঙ্গীকার ভঙ্গ করে, সে জান্নাতের গন্ধও পাবে না। অথচ জান্নাতের সুগন্ধি সত্তর বছরের দূরত্ব পর্যন্ত পৌছে। এই একটি আয়াতে দাশটির মধ্যে পাঁচটি হারাম বিষয়ের বর্ণনা দেওয়ার পর বলা হয়েছে: ذٰلِكُمْ وَصّٰكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ অর্থাৎ এসব বিষয়ে তোমাদেরকে আল্লাহ তা'আলা জোর নির্দেশ দিয়েছেন, যেন তোমরা বুঝ।

ষষ্ঠ হারাম এতিমের ধন-সম্পদ অবৈধভাবে ভক্ষণ করা : দ্বিতীয় আয়াতে এতিমদের ধন-সম্পদ অবৈধভাবে ভক্ষণ করা যে হারাম, সে সম্পর্কে বলা হয়েছে : وَلَا تَقْرَبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ اِلَّا بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ حَتّٰى يَبْلُغَ اَشُدَّهٗ অর্থাৎ এতিমের মালের কাছেও যেয়ো না। কিন্তু উত্তম পন্থায়, যে পর্যন্ত না সে বয়োঃপ্রাপ্ত হয়ে যায়। এখানে অপ্রাপ্ত বয়স্কএতিম শিশুদের অভিভাবককে সম্বোধন করে বলা হয়েছে, তারা যেন এতিমদের মালকে আগুন মনে করে এবং অবৈধভাবে তা খাওয়া ও নেওয়ার কাছেও না যায়। অন্য এক আয়াতে অনুরূপ ভাষায়ই বলা হয়েছে যে, যারা এতিমদের মাল অন্যায় ও অবৈধভাবে ভক্ষণ করে, তারা নিজেদের পেটে আগুন ভর্তি করে।

তবে এতিমের মাল সংরক্ষণ করা এবং স্বভাবত লোকসানের আশঙ্কা নেই এরূপ কারবারে নিয়োগ করে তা বৃদ্ধি করা উত্তম ও জরুরি পন্থা। এতিমদের অভিভাবকের এ পন্থা অবলম্বন করাই উচিত।

এরপর এতমিের মাল সংরক্ষণের সীমা বর্ণনা করা হয়েছে, حَتّٰى يَبْلُغَ اَشُدَّهٗ অর্থাৎ সে বয়োঃপ্রাপ্ত হয়ে গেলে অভিভাবকের দায়িত্ব শেষ হয়ে যায়। অতঃপর তার মাল তার কাছে সমর্পণ করতে হবে।

اَشُدَّ শব্দের প্রকৃত অর্থ শক্তি। আলেমগণের মতে বয়ঃপ্রাপ্ত হলেই এর সূচনা হয়। বালক-বালিকার মধ্যে বয়ঃপ্রাপ্তির লক্ষণ দেখা দিলে কিংবা বয়স পনের-ষোল বছর পূর্ণ হয়ে গেলে শরিয়তের মতে তাদেরকে বয়ঃপ্রাপ্ত বলা হবে।

তবে বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়ার পর দেখতে হবে, তার মধ্যে নিজের মালের রক্ষণা বেক্ষণ এবং শুদ্ধ খাতে ব্যয় করার যোগ্যতা হয়েছে কিনা। যোগ্যতা দেখলে বয়ঃপ্রাপ্তির সাথে সাথে তার ধন সম্পদ তার হাতে সমর্পণ করা হবে। অন্যথায় পঁচিশ বছর বয়স পর্যন্ত ধন-সম্পদ হেফাজত করার দায়িত্ব অভিভাবকদের। ইতোমধ্যে যখনই ধন সম্পদ সংরক্ষণ এবং কারবারের যোগ্যতা তার মধ্যে দেখা যাবে, তখনই তার ধন সম্পদ তার হাতে সমর্পণ করতে হবে। যদি পঁচিশ বছর বয়স পর্যন্তও তার মধ্যে এ যোগ্যতা সৃষ্টি না হয়, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র.)–এর মতে তার মাল তাকেই সমর্পণ করতে হবে যদি সে উম্মাদ না হয়। কোনো কোনো ইমামের মতে তখনও তার মাল তাকে দেওয়া হবে না; বরং শরিয়তের কাজি (বিচারক) তার মাল সংরক্ষণের জন্য কোনো দায়িত্বশীল ব্যক্তির হাতে সমর্পণ করবেন।

সপ্তম হারাম ওজন ও মাপে ত্রুটি করা: এ আয়াতে সপ্তম নির্দেশ ওজন ও মাপ ন্যায়ভাবে পূর্ণ করা সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে। 'ন্যায়ভাবে' বলার উদ্দেশ্য এই যে, যে ওজন করে দেবে, সে প্রতিপক্ষকে কম দেবে না এবং প্রতিপক্ষ নিজ প্রাপ্যের চাইতে বেশি নেবে না। –[রূহুল মা'আনী]

দ্রব্য আদান-প্রদানে ওজন ও মাপে কম-বেশি করাকে কুরআন কঠোর হারাম সাব্যস্ত করেছে। যারা এর বিরুদ্ধাচরণ করে, তাদের জন্য সূরা মুতাফফিফীনে কঠোর শাস্তিবাণী বর্ণিত হয়েছে।

তাফসীরবিদ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন : যারা ব্যবসা-বাণিজ্যে ওজন ও মাপের কাজ করে, তাদেরকে সম্বোধন করে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ওজন ও মাপ এমন একটি কাজ যে, এতে অন্যায় আচরণ করে তোমাদের পূর্বে অনেক উম্মত আল্লাহর আজাবে পতিত হয়ে ধ্বংস হয়ে গেছে। তোমরা এ ব্যাপারে পুরোপুরি সাবধানতা অবলম্বন কর। –[ইবনে কাছীর]

কর্মচারী ও শ্রমিকদের নির্ধারিত কর্তব্য কর্মে ত্রুটি করাও ওজন ও মাপে ত্রুটি করার অনুরূপ: ওজন ও মাপে ত্রুটি করাকে কুরআন পাকে تَطْفِيْف বলা হয়েছে। এটা শুধু ওজন করার সময় কমবেশি করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং অন্যের প্রাপ্যে ত্রুটি করাও تَطْفِيْف-এর অন্তর্ভুক্ত। ইমাম মালেক (র.) স্বীয় মুয়াত্তা গ্রন্থে হযরত ওমর (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তিকে নামাজের আরকানে ত্রুটি করতে দেখে তিনি বলেছিলেন: তুমি تَطْفِيْف করেছ, অর্থাৎ যথার্থ প্রাপ্য শোধ করনি। এ ঘটনা বর্ণনা করে ইমাম মালেক (র.) বলেন : لِكُلِّ شَيْءٍ وَفَاءٌ وَتَطْفِيْفٌ অর্থাৎ প্রাপ্য পুরোপুরি দেওয়া ও ত্রুটি করা প্রত্যেক বিষয়ের মধ্যেই হয় শুধু ওজন ও মাপের মধ্যেই তা সীমাবদ্ধ নয়।

www.almodina.com

এতে বুঝা যায় যে, ব্যক্তি কর্তব্যকর্ম পূর্ণ করে না, সময় চুরি করে কিংবা কাজে ত্রুটি করে, সে-ও উপরিক্ত আয়াতের অন্তর্ভুক্ত, সে কোনো মন্ত্রী হোক প্রশাসক হোক কিংবা সাধারণ কর্মচারী হোক অথবা ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্মে নিয়োজিত হোক না কেন।

এরপর বলা হয়েছে : لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا অর্থাৎ আমি কোনো ব্যক্তিকে তার সাধ্যাতিরিক্ত কাজের নির্দেশ দেই না। কোনো কোনো হাদীসে এর অর্থ এরূপ বর্ণিত হয়েছে যে, যে ব্যক্তি সাধ্য মতো পুরোপুরি ওজন করে, এতদসত্ত্বেও যদি অনিচ্ছাকৃতভাবে ওজনে কমবেশি হয়ে যায়, তবে তা মাফ। কেননা এটা তার শক্তি ও সাধ্যের বাইরে।

তাফসীরে মাযহারীতে বলা হয়েছে : এ বাক্য যোগ করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, প্রাপ্য পরিশোধের সময় কিছু বেশি দেওয়াই সতর্কতা, যাতে কমের সন্দেহ না থাকে। যেমন এরূপ স্থলেই রাসূলুল্লাহ ﷺ ওজনকারীকে নির্দেশ দিয়েছিলেন : زِنْ وَأَرْجِحْ অর্থাৎ ওজন কর এবং কিছু ঝুঁকিয়ে ওজন কর। –[আহমদ, আবূদাউদ, তিরমিযী]

রাসূলুল্লাহ ﷺ–এর সাধারণ অভ্যাস তাই ছিল। তিনি কারও প্রাপ্য পরিশোধ করার সময় প্রাপ্যের চাইতে বেশি দেওয়া পছন্দ করতেন।

অষ্টম নির্দেশ ন্যায় ও সুবিচারের বিপরীত করা হারাম : বলা হয়েছে : وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ অর্থাৎ তোমরা যখন কথা বলবে ন্যায় সঙ্গত কথা বলবে, যদি সে আত্মীয়ও হয়। এখানে বিশেষ কোনো কথার উল্লেখ নেই। তাই সাধারণ তফসীরবিদগণের মতে সব রকম কথাই এর অন্তর্ভুক্ত। কোনো ব্যাপারের সাক্ষ্য হোক কিংবা বিচারকের ফয়সালা হোক অথবা পারস্পরিক বিভিন্ন প্রকার কথা বার্তাই হোক, সব ক্ষেত্রে সর্বাবস্থায় ন্যায় ও সত্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে কথা বলতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মকদ্দমার সাক্ষ্যে কিংবা ফয়সালার ক্ষেত্রে ন্যায় ও সত্য কায়েম রাখার অর্থ এই যে, ঘটনা সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে যা জানা আছে নিজের পক্ষ থেকে কম বেশি না করে তা পরিষ্কার বলে দেওয়া অনুমান ও ধারণার ভিত্তিতে কোনো কথা না বলা এবং এতে কারও উপকার কিংবা কারও অপকারের ভ্রুক্ষেপ না করা। মকদ্দমার ফয়সালার সাক্ষীদেরকে শরিয়তের নীতি অনুযায়ী যাচাই করার পর তাদের সাক্ষ্য ও অন্যান্য সূত্র দ্বারা যা প্রমাণিত হয়, তাই ফয়সালা করা। সাক্ষ্য ও ফয়সালায় কারও বন্ধুত্বও ভালোবাসা এবং কারও শত্রুতা ও বিরোধিতা সত্য বলার পথে অন্তরায় না হওয়া উচিত। এ কারণেই আয়াতে وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ বাক্যটি যুক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ যার মকদ্দমায় সাক্ষ্য দিবে কিংবা ফয়সালা করবে, সে তোমার নিকটাত্মীয়ের হলেও ন্যায় ও সত্যকে কোনো অবস্থাতেই হাত ছাড়া করবে না।

মিথ্যা সাক্ষ্য ও অসত্য ফয়সালা প্রতিরোধ করাই এ আয়াতের উদ্দেশ্য। মিথ্যা সাক্ষ্য সম্পর্কে আবূ দাঊদ ও ইবনে মাজায় নিম্নোক্ত হাদীস বর্ণিত রয়েছে : মিথ্যা সাক্ষ্য শিরকের সমতুল্য।

নবম নির্দেশ : আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করা : বলা হয়েছে : وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার সাথে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ কর। এর অর্থ ঐ অঙ্গীকারও হতে পারে যা রূহের জগতে অবস্থান করার সময় প্রত্যেক মানুষের কাছ থেকে নেওয়া হয়েছে। তখন সব মানুষকে বলা হয়েছিল : أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ (আমি কি তোমাদের পালনকর্তা নই?) তখন সবাই সমস্বরে উত্তর দিয়েছিল : بَلَىٰ (অর্থাৎ নিঃসন্দেহে আপনি আমাদের পালনকর্তা) এ অঙ্গীকারের দাবি হলো এই যে, পালনকর্তার কোনো নির্দেশ অমান্য করা যাবে না। তিনি যে কাজের আদেশ দেন, তাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। তিনি যে কাজে নিষেধ করেন, তার কাছেও যাওয়া যাবে না এবং সন্দেহযুক্ত কাজ থেকেও বাঁচতে হবে। অঙ্গীকারের সারকথা এই যে, আল্লাহ তা'আলার পুরোপুরি আনুগত্য করতে হবে।

এছাড়া এর অর্থ কুরআনের বিভিন্ন স্থানে বর্ণিত তিনটি আয়াত এদের অন্তর্ভুক্ত, যেগুলোর তাফসীর করা হচ্ছে এবং যেগুলোতে দশটি নির্দেশ তাকিদ সহকারে উল্লেখ করা হয়েছে।

আলেমগণ বলেন : নযর, মান্নত ইত্যাদি পূর্ণ করাও এ অঙ্গীকারের অন্তর্ভুক্ত। এতে অমুক কাজ করব কিংবা করব না বলে মানুষ আল্লাহ তা'আলার সাথে অঙ্গীকার করে। কুরআন পাকের অন্য এক আয়াতেও একথা পরিষ্কার ভাষায় উল্লেখ করা হয়েছে يوفون بالنذر অর্থাৎ আল্লাহর সৎ বান্দারা স্বীয় মান্নত পূর্ণ করে।

মোটকথা, এ নবম নির্দেশটি গণনার দিক দিয়ে নবম হলেও স্বরূপের দিক দিয়ে শরিয়তের যাবতীয় আদেশ নিষেধের মধ্যে পরিব্যাপ্ত। এ আয়াতের শেষভাগে বলা হয়েছে : ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে এসব কাজের জোর নির্দেশ দিয়েছেন, যাতে তোমরা স্মরণ রাখ।

www.almodina.com

দশম নির্দেশ : وَاَنَّ هٰذَا صِرَاطِيْ مُسْتَقِيْمًا فَاتَّبِعُوْهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيْلِهٖ অর্থাৎ এ শরিয়তে মুহাম্মদী হলো আমার সরল পথ। অতএব, তোমরা এপথে চল এবং অন্য কোনো পথে চলো না। কেননা সেসব পথ তোমাদেরকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে। এখানে هٰذَا শব্দ দ্বারা দীনে ইসলাম অথবা কুরআনের প্রতি ইশারা করা হয়েছে। সূরা আন'আমের প্রতিও ইশারা হতে পারে। কেননা তাতেও ইসলামের যাবতীয় মূলনীতি, তৌহিদ, রেসালত এবং মূল বিধি বিধান ব্যক্ত হয়েছে। مُسْتَقِيْمٌ শব্দটি صِرَاطٌ-এর বিশেষণ। কিন্তু ব্যাকরণিক দিক দিয়ে একে حَالٌ তথা বর্তমান কাল বাচক উল্লেখ করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, সরল হওয়া ইসলামের একটি অপরিহার্য বিশেষণ। এরপর বলা হয়েছে : فَاتَّبِعُوْهُ অর্থাৎ ইসলামই যখন আমার পথ এবং এটাই যখন সরল পথ, তখন মনযিলে মাকসূদের (অভিষ্ট লক্ষ্যের) সোজা পথ হাতে এসে গেছে। তাই এ পথেই চল। এরপর বলা হয়েছে : وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيْلِهٖ

سُبُلٌ শব্দটি سَبِيْلٌ-এর বহুবচন, এর অর্থও পথ। উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ পর্যন্ত পৌছা এবং তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের আসল পথ তো একটিই, জগতে যদিও মানুষ নিজ নিজ ধারণা অনুযায়ী অনেক পথ করে রেখেছে। তোমরা সেসব পথে চলো না। কেননা সেগুলো বাস্তবে আল্লাহ পর্যন্ত পৌছে না। কাজেই যে এসব পথে চলবে সে আল্লাহ থেকে দূরেই সরে পড়বে।

তাফসীরে মাযহারীতে বলা হয়েছে : কুরআন পাক ও রাসূলুল্লাহ ﷺ কে প্রেরণ করার আসল উদ্দেশ্য এই যে, মানুষ নিজ নিজ ধ্যান ধারণা, ইচ্ছা ও পছন্দকে কুরআন ও সুন্নাহের ছাঁচে ঢেলে নিক এবং স্বীয় জীবনকে এরই অনুসারী করে নিক। কিন্তু বাস্তব হচ্ছে এই যে, মানুষ কুরআন ও সুন্নাহকে নিজ নিজ ধ্যান ধারণা ও পছন্দের ছাঁচে ঢেলে নিতে চাচ্ছে। কোনো আয়াত কিংবা হাদীসকে নিজের মতলব বা ধারণার বিপরীতে দেখলে তারা তার মনগড়া ব্যাখ্যা করে স্বীয় প্রবৃত্তির পক্ষে নিয়ে যায়। এখান থেকেই অন্যান্য বিদআত ও পথভ্রষ্টতার জন্ম। আয়াতে এসব পথ থেকে বেঁচে থাকতেই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

قوله وَاِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغٰفِلِيْنَ গাফেল থাকার কারণ এটা নয় যে, তওরাত ও ইঞ্জিল আরবি ভাষায় ছিল না, অনুবাদের মাধ্যমে বিষয়বস্তু জানা সম্ভাবপর ও বাস্তবসম্মত; বরং কারণ এই যে, আহলে কিতাবরা আরবদের শিক্ষা ও একত্ববাদের ব্যাপারে কখনও যত্নবান হয়নি। ঘটনাচক্রে কোনো বিষয়বস্তু পাঠ করাই হুঁশিয়ার হওয়ার ব্যাপারে ততটুকু কার্যকর নয়। তবে এতটুকু হুঁশিয়ারির কারণে একত্ববাদের জ্ঞান অনুসন্ধান ও তা নিয়ে চিন্তা ভাবনা করা ওয়াজিব হয়ে যায় এবং এ কারণেই একত্ববাদ বর্জন করার জন্য আরবদেরকে শাস্তি দেওয়া সম্ভবপর ছিল। এতে একথা জরুরি হয় না যে, তাহলে হযরত মূসা (আ.) ও ঈসা (আ.) এর নবুয়ত ব্যাপক ও সবার জন্য ছিল। এরূপ নয়; বরং এধরনের ব্যাপকতা আমাদের পয়গম্বর মুহাম্মদ ﷺ–এরই বৈশিষ্ট্য এবং তা মূলনীতি ও শাখা প্রশাখার উভয়ের সমষ্টির দিক দিয়ে। নতুবা মূল নীতিতে সকল পয়গাম্বরের অনুসরণই সব মানুষের জন্য জরুরি। সুতরাং এদিক দিয়ে আরবদেরকে শাস্তি দেওয়া অশুদ্ধ হতো না; কিন্তু আয়াতে বর্ণিত অজুহাতটি বাহ্যদৃষ্টিতে পেশ করা সম্ভবপর ছিল। এখন তারও অবকাশ রইল না এবং আল্লাহর যুক্তি পূর্ণ হয়ে গেল।

শব্দ বিশ্লেষণ

مَالٌ : শব্দটি একবচন; বহুবচন اَمْوَالٌ অর্থ– সম্পদ, মাল।

يَتِيْمٌ : শব্দটি একবচন; বহুবচন يَتَامٰى ও اَيْتَامٌ অর্থ– এতিম, অনাথ।

اَشُدَّهٗ : শব্দটি বহুবচন; একবচন شُدٌّ অর্থ– শক্তি, বল, তেজ।

قُرْبٰى : সীগাহ واحد مؤنث বহছ اسم تفضيل বাব كَرُمَ মাসদার اَلْقُرْبُ মূলবর্ণ (ق . ر . ب) জিনস صحيح অর্থ– নিকটাত্মীয়, ঘনিষ্ঠ।

اَوْفُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِيْفَاءُ মূলবর্ণ (و . ف . ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ– তোমরা পূর্ণ কর।

اَحْسَنَ : সীগাহ واحدمذكرغائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِحْسَانُ মূলবর্ণ (ح . س . ن) জিনস صحيح অর্থ– সে উত্তম কাজ করেছে, সে ভালো কাজ করেছে।

اَهْدٰى : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم تفضيل বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْهِدَايَةُ মূলবর্ণ (ه . د . ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– হেদায়েতপ্রাপ্ত, অধিক সুপথপ্রাপ্ত।

هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّآ اَنْ تَاْتِيَهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ اَوْ يَاْتِيَ رَبُّكَ اَوْ يَاْتِيَ بَعْضُ اٰيٰتِ رَبِّكَ ۗ يَوْمَ يَاْتِيْ بَعْضُ اٰيٰتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا اِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ اٰمَنَتْ مِنْ قَبْلُ اَوْ كَسَبَتْ فِيْٓ اِيْمَانِهَا خَيْرًا ۗ قُلِ انْتَظِرُوْٓا اِنَّا مُنْتَظِرُوْنَ (١٥٨)

অনুবাদ : (১৫৮) তারা কেবল এই প্রতীক্ষায় রয়েছে যে, তাদের নিকট ফেরেশতা পৌছবে অথবা আপনার রব আগমন করবেন অথবা আপনার রবের একটি বড় নিদর্শন আসবে, [শুনে রাখুন] যেদিন আপনার প্রতিপালকের বড় নিদর্শন এসে পৌছবে, [সেদিন] কোনো এরূপ ব্যক্তির ঈমান তার কাজে আসবে না, যে ব্যক্তি পূর্ব হতে ঈমানদার ছিল না, অথবা [ঈমানদার তো ছিল কিন্তু] সে স্বীয় ঈমানের মধ্যে কোনো সৎকাজ করেনি, আপনি বলে দিন, তোমরা প্রতীক্ষায় থাক, আমিও প্রতীক্ষায় রইলাম।

اِنَّ الَّذِيْنَ فَرَّقُوْا دِيْنَهُمْ وَكَانُوْا شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِيْ شَيْءٍ ۗ اِنَّمَآ اَمْرُهُمْ اِلَى اللّٰهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ (١٥٩)

(১৫৯) নিশ্চয় যারা নিজেদের ধর্মকে খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত করে ফেলেছে এবং দলে দলে বিভক্ত হয়েছে, তাদের সাথে আপনার কোনো সংস্রব নেই, তাদের বিষয়াদি আল্লাহ তা'আলার হাওয়ালায় রয়েছে, অতঃপর তিনি তাদেরকে তাদের কৃতকর্মগুলো জানিয়ে দিবেন।

مَنْ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهٗ عَشْرُ اَمْثَالِهَا ۚ وَمَنْ جَآءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزٰٓى اِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ (١٦٠)

(১৬০) যে ব্যক্তি নেক কাজ সম্পাদন করবে, সে তার দশ গুণ প্রাপ্ত হবে, আর যে ব্যক্তি মন্দ কাজ করবে, সুতরাং সে তার কর্ম পরিণামই শাস্তি প্রাপ্ত হবে, এবং তাদের প্রতি জুলুম করা হবে না।

শাব্দিক অনুবাদ

(১৫৮) هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّآ তারা কেবল এই প্রতীক্ষায় রয়েছে যে اَنْ تَاْتِيَهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ তাদের নিকট ফেরেশতা পৌছবে اَوْ يَاْتِيَ رَبُّكَ অথবা আপনার রব আগমন করবেন اَوْ يَاْتِيَ بَعْضُ اٰيٰتِ رَبِّكَ অথবা আপনার রবের একটি বড় নিদর্শন আসবে يَوْمَ يَاْتِيْ بَعْضُ اٰيٰتِ رَبِّكَ যেদিন আপনার প্রতিপালকের বড় নিদর্শন এসে পৌছবে لَا يَنْفَعُ نَفْسًا اِيْمَانُهَا [সেদিন] কোনো এরূপ ব্যক্তির ঈমান তার কাজে আসবে না لَمْ تَكُنْ اٰمَنَتْ مِنْ قَبْلُ যে ব্যক্তি পূর্ব হতে ঈমানদার ছিল না اَوْ كَسَبَتْ فِيْٓ اِيْمَانِهَا خَيْرًا অথবা [ঈমানদার তো ছিল কিন্তু] সে স্বীয় ঈমানের মধ্যে কোনো সৎকাজ করেনি قُلِ আপনি বলে দিন انْتَظِرُوْٓا তোমরা প্রতীক্ষায় থাক اِنَّا مُنْتَظِرُوْنَ আমিও প্রতীক্ষায় রইলাম।

(১৫৯) اِنَّ الَّذِيْنَ فَرَّقُوْا دِيْنَهُمْ নিশ্চয় যারা নিজেদের ধর্মকে খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত করে ফেলেছে وَكَانُوْا شِيَعًا এবং দলে দলে বিভক্ত হয়েছে لَسْتَ مِنْهُمْ فِيْ شَيْءٍ তাদের সাথে আপনার কোনো সংস্রব নেই اِنَّمَآ اَمْرُهُمْ اِلَى اللّٰهِ তাদের বিষয়াদি আল্লাহ তা'আলার হাওয়ালায় রয়েছে ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ অতঃপর তিনি তাদেরকে জানিয়ে দিবেন بِمَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ তাদের কৃতকর্মগুলো।

(১৬০) مَنْ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ যে ব্যক্তি নেক কাজ সম্পাদন করবে فَلَهٗ عَشْرُ اَمْثَالِهَا সে তার দশ গুণ প্রাপ্ত হবে وَمَنْ جَآءَ بِالسَّيِّئَةِ আর যে ব্যক্তি মন্দ কাজ করবে فَلَا يُجْزٰٓى اِلَّا مِثْلَهَا সুতরাং সে তার কর্ম পরিণামই শাস্তি প্রাপ্ত হবে وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ এবং তাদের প্রতি জুলুম করা হবে না।

(১৬১) قُلْ আপনি বলে দিন اِنَّنِيْ هَدٰىنِيْ رَبِّيْٓ আমার রব আমাকে পথ প্রদর্শন করেছেন اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ একটি সরল دِيْنًا قِيَمًا তা একটি সুদৃঢ় ধর্ম مِّلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ যা ইবরাহীমের তরিকা حَنِيْفًا যাতে একটুও বক্রতা নেই وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ এবং তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না।

قُلْ اِنَّنِىْ هَدٰىنِىْ رَبِّىْۤ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۚ دِيْنًا قِيَمًا مِّلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ حَنِيْفًا ۚ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ (١٦١)

অনুবাদ : (১৬১) আপনি বলে দিন, আমার রব আমাকে একটি সরল পথ প্রদর্শন করেছেন, তা একটি সুদৃঢ় ধর্ম যা ইবরাহীমের তরিকা যাতে একটুও বক্রতা নেই, এবং তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না।

قُلْ اِنَّ صَلَاتِىْ وَنُسُكِىْ وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِىْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ (١٦٢)

(১৬২) আপনি বলে দিন নিশ্চয় আমার নামাজ এবং আমার সকল ইবাদত এবং আমার জীবন এবং আমার মরণ এই সমুদয় একমাত্র আল্লাহরই জন্য, যিনি সমগ্র বিশ্বের অধিপতি।

لَا شَرِيْكَ لَهٗ ۚ وَبِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ (١٦٣)

(১৬৩) তাঁর কোনো শরিক নেই, এবং আমার প্রতি এরই আদেশ হয়েছে এবং আমি সমস্ত অনুগতদের মধ্যে প্রথম [অনুগত]।

قُلْ اَغَيْرَ اللّٰهِ اَبْغِىْ رَبًّا وَّهُوَ رَبُّ كُلِّ شَىْءٍ ۚ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ اِلَّا عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى ۚ ثُمَّ اِلٰى رَبِّكُمْ مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ (١٦٤)

(১৬৪) আপনি বলে দিন, আমি কি আল্লাহ ভিন্ন অপর কাউকেও প্রতিপালকরূপে অন্বেষণ করব? অথচ তিনি সকল বস্তুর মালিক, আর প্রত্যেক ব্যক্তিই যা কিছু করে, তা তারই উপর বর্তায়, এবং কেউ অন্য কারো [গুনাহর] বোঝা বহন করবে না, পরিশেষে তোমাদের সকলকে স্বীয় রবের সমীপে যেতে হবে, অনন্তর তিনি তোমাদেরকে জানিয়ে দিবেন, যে যে বিষয়ে তোমরা মতভেদ করছিলে।

وَهُوَ الَّذِىْ جَعَلَكُمْ خَلٰٓئِفَ الْاَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجٰتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِىْ مَاۤ اٰتٰىكُمْ ۚ اِنَّ رَبَّكَ سَرِيْعُ الْعِقَابِ ۖ وَاِنَّهٗ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ (١٦٥)

(১৬৫) আর তিনি এমন যিনি তোমাদেরকে ভূপৃষ্ঠে ক্ষমতাবান বানিয়েছেন এবং একের মর্যাদা অন্যের উপর বৃদ্ধি করেছেন, যেন তোমাদেরকে পরীক্ষা করে নেন, ঐ সকল বস্তুর মধ্যে যা তোমাদেরকে প্রদান করেছেন, নিশ্চয় আপনার রব ত্বরিত শাস্তি প্রদানকারী, আর নিঃসন্দেহে তিনি প্রকৃতপক্ষে অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।

শাব্দিক অনুবাদ

(১৬২) قُلْ আপনি বলে দিন اِنَّ صَلَاتِىْ নিশ্চয় আমার নামাজ وَنُسُكِىْ এবং আমার সকল ইবাদত وَمَحْيَاىَ এবং আমার জীবন وَمَمَاتِىْ এবং আমার মরণ لِلّٰهِ এই সমুদয় একমাত্র আল্লাহরই জন্য رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ যিনি সমগ্র বিশ্বের অধিপতি।

(১৬৩) لَا شَرِيْكَ لَهٗ তাঁর কোনো শরিক নেই وَبِذٰلِكَ اُمِرْتُ এবং আমার প্রতি এরই আদেশ হয়েছে وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ এবং আমি সমস্ত অনুগতদের মধ্যে প্রথম [অনুগত]।

(১৬৪) قُلْ আপনি বলে দিন اَغَيْرَ اللّٰهِ اَبْغِىْ رَبًّا আমি কি আল্লাহ ভিন্ন অপর কাউকেও প্রতিপালকরূপে অন্বেষণ করব? وَّهُوَ رَبُّ كُلِّ شَىْءٍ অথচ তিনি সকল বস্তুর মালিক وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ আর প্রত্যেক ব্যক্তিই যা কিছু করে তা তারই উপর বর্তায় وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى এবং কেউ অন্য কারো [গুনাহর] বোঝা বহন করবে না ثُمَّ اِلٰى رَبِّكُمْ مَّرْجِعُكُمْ পরিশেষে তোমাদের সকলকে স্বীয় রবের সমীপে যেতে হবে فَيُنَبِّئُكُمْ অনন্তর তিনি তোমাদেরকে জানিয়ে দিবেন بِمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ যে যে বিষয়ে তোমরা মতভেদ করছিলে।

(১৬৫) وَهُوَ الَّذِىْ جَعَلَكُمْ خَلٰٓئِفَ الْاَرْضِ আর তিনি এমন যিনি তোমাদেরকে ভূপৃষ্ঠে ক্ষমতাবান বানিয়েছেন وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجٰتٍ এবং একের মর্যাদা অন্যের উপর বৃদ্ধি করেছেন لِّيَبْلُوَكُمْ যেন তোমাদেরকে পরীক্ষা করে নেন, فِىْ مَاۤ اٰتٰىكُمْ ঐ সকল বস্তুর মধ্যে যা তোমাদেরকে প্রদান করেছেন اِنَّ رَبَّكَ নিশ্চয় আপনার রব سَرِيْعُ الْعِقَابِ ত্বরিত শাস্তি প্রদানকারী وَاِنَّهٗ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ আর নিঃসন্দেহে তিনি প্রকৃতপক্ষে অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।

www.almodina.com

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(১৬০) مَنْ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهٗ عَشْرُ اَمْثَالِهَا الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** হযরত আবূ সাঈদ খুদরী ও ইবনে ওমর (রা.) বর্ণনা করেন যে, উপরিউক্ত আয়াত সেই সকল বেদুইনদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে, যারা হিজরতের পর ঈমান গ্রহণ করেছে ; তাদের নেক আমলগুলো দশগুণ বৃদ্ধিলাভ করেছে। যারা হিজরত করে এসেছেন তাদের নেক আমল নয়শত গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে। সৎকাজ করা ও হিজরত করার প্রতি উৎসাহ দান করার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[বাহরে মুহীত ২৬১/২]

সূরা আনআমের অধিকাংশই মক্কাবাসী ও আরব মুশরিকদের বিশ্বাস ও ক্রিয়াকর্মের সংস্কার এবং তাদের সন্দেহ ও প্রশ্নের জওয়াবে অবতীর্ণ হয়েছে।

গোটা সূরায় এবং বিশেষভাবে পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে মক্কা ও আরবের অধিবাসীদের সামনে সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, তোমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ –এর মু'জিযা ও প্রমাণাদি দেখে নিয়েছ, তাঁর সম্পর্কে পূর্ববর্তী গ্রন্থ ও পয়গম্বরগণের ভবিষ্যদ্বাণীও শুনে নিয়েছ এবং একজন নিরক্ষরের মুখ থেকে কুরআনের সুস্পষ্ট আয়াত শোনার মু'জিযাটিও লক্ষ্য করেছ। এখন ন্যায় ও সত্যের সমুদয় পথ তোমাদের সামনে উন্মুক্ত হয়ে গেছে। অতএব, বিশ্বাস স্থাপনের জন্য আর কিসের অপেক্ষা?

এ বিষয়টি আলোচ্য আয়াতে অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী ভঙ্গিতে বলা হয়েছে : هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّآ اَنْ تَاْتِيَهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ اَوْ يَاْتِيَ رَبُّكَ اَوْ يَاْتِيَ بَعْضُ اٰيٰتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَاْتِيْ بَعْضُ اٰيٰتِ رَبِّكَ অর্থাৎ তারা কি বিশ্বাস স্থাপনের ব্যাপারে এ জন্য অপেক্ষা করছে যে, মৃত্যুর ফেরেশতা তাদের কাছে পৌঁছবে। না কি হাশরের ময়দানের জন্য অপেক্ষা করছে, যেখানে প্রতিদান ও শাস্তির ফয়সালা করার জন্য আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং আগমন করবেন অথবা কিয়ামতের কোনো একটি সর্বশেষ নিদর্শন দেখে নেওয়ার জন্য অপেক্ষা করছে? ফয়সালার জন্য কিয়ামতের ময়দানে পালনকর্তার উপস্থিতি কুরআন পাকের একাধিক আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।

কিয়ামতের ময়দানে আল্লাহ তা'আলা কিভাবে এবং কি অবস্থায় উপস্থিত হবেন, তা মানবজ্ঞান পুরোপুরি হৃদয়ঙ্গম করতে অক্ষম। তাই এ ধরনের আয়াত সম্পর্কে সাহাবায়ে কেরাম ও পূর্ববর্তী মনীষীবৃন্দের অভিমত এই যে, কুরআনে যা উল্লেখ করা হয়েছে, তাই বিশ্বাস করতে হবে। উদাহরণতঃ এ আয়াতে বিশ্বাস করতে হবে যে, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের ময়দানে প্রতিদান ও শাস্তির মীমাংসা করার জন্য উপস্থিত হবেন। তবে কি অবস্থায় উপস্থিত হবেন এবং কোনো দিকে অবস্থান করবেন এ আলোচনা অর্থহীন।

অতঃপর এ আয়াতে বলা হয়েছে يَوْمَ يَاْتِيْ بَعْضُ اٰيٰتِ رَبِّكَ الخ "যেদিন আপনার পালনকর্তার কোনো কোনো নিদর্শন এসে যাবে ....।"

এতে হুঁশিয়ার করা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলার কোনো কোনো নিদর্শন প্রকাশিত হওয়ার পর তওবার দরজা বন্ধ হয়ে যাবে। যে ব্যক্তি ইতঃপূর্বে বিশ্বাস স্থাপন করেনি, তখন বিশ্বাস স্থাপন করলে তা কবুল করা হবে না এবং যে ব্যক্তি পূর্বেই বিশ্বাস স্থাপন করেছে, কিন্তু কোনো সৎকর্ম করেনি, সে তখন তওবা করে ভবিষ্যতে সৎকর্ম করার ইচ্ছা করেন তার তওবাও কবুল করা হবে না। মোটকথা, কাফের স্বীয় কুফর থেকে এবং পাপাচারী স্বীয় পাপাচার থেকে যদি তখন তওবা করতে চায়, তবে তা কবুল হবে না।

কারণ বিশ্বাস স্থাপন ও তওবা যতক্ষণ মানুষের ইচ্ছাধীন থাকে, ততক্ষণই তা কবুল হতে পারে। আল্লাহর শাস্তি ও পরকালের স্বরূপ ফুটে উঠার পর প্রত্যেক মানুষ বিশ্বাস স্থাপন ও তওবা করতে আপনা থেকেই বাধ্য হবে। বলাবাহুল্য, এরূপ ঈমান ও তওবা গ্রহণযোগ্য নয়।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : যখন কিয়ামতের সর্বশেষ নিদর্শনটি প্রকাশিত হবে অর্থাৎ সূর্য পূর্বদিকের পরিবর্তে পশ্চিমদিক থেকে উদিত হবে, তখন এ নির্দশনটি দেখা মাত্রই সারা বিশ্বের মানুষ ঈমানের কালিমা পাঠ করতে শুরু করবে এবং সব আবাধ্য লোকও অনুগত হয়ে যাবে। কিন্তু তখনকার ঈমান ও তওবা গ্রহণীয় হবে না। –[বগভী]

এ আয়াত থেকে একথা জানা গেল যে, কিয়ামতের কোনো কোনো নিদর্শন প্রকাশিত হওয়ার পর তওবার দরজা বন্ধ হয়ে যাবে। তখন আর কোনো কাফের কিংবা ফাসেকের তওবা কবুল করা হবে না। কিন্তু এ নিদর্শন কোনটি কুরআন পাক তা পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করেনি।

সহীহ মুসলিমে এর বিস্তারিত বিবরণে হুযায়ফা ইবনে ওসায়েদ (রা.)–এর রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, একবার সাহাবায়ে কেরাম পরস্পর কিয়ামতের লক্ষণাদি সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ সেখানে উপস্থিত হয়ে বললেন : দশটি নির্দশন না দেখা পর্যন্ত কিয়ামত হবে না। (এক) পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয়, (দুই) বিশেষ এক প্রকার ধোঁয়া, (তিন) দাব্বাতুল আরদ, (চার) ইয়াজুয মাজুযের আবির্ভাব, (পাঁচ) হযরত ঈসা (আ.)–এর অবতরণ, (ছয়) দাজ্জালের অভ্যুদয়, (সাত, আট, নয়) প্রাচ্য, পাশ্চাত্য ও আরব উপদ্বীপ-এ তিন জায়গায় মাটি ধসে যাওয়া এবং (দশ) আদন থেকে একটি আগুন বেরিয়ে মানুষকে সামনের দিনে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া। মুসনাদে আহমদে হযরত ইবনে ওমর (রা.)–এর রেওয়ায়েতক্রমে বর্ণিত এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : এসব নিদর্শনের মধ্যে সর্ব প্রথম নিদর্শনটি হলো পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয় ও দাব্বতুল আরদ আবির্ভাব।

ইমাম কুরতুবী তাযকেরা গ্রন্থে এবং হাফেজ ইবনে হাজার বুখারীর টীকায় হযরত ইবনে ওমর (রা.)–এর রেওয়ায়েতক্রমে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, এ ঘটনার অর্থাৎ পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয়ের পর একশ বিশ বছর পর্যন্ত পৃথিবী বিদ্যমান থাকবে। –[রূহুল মা'আনী]

এ বিবরণ দৃষ্টে প্রশ্ন হয় যে, হযরত ঈসা (আ.)–এর অবতরণের পর সহীহ রেওয়ায়েত অনুযায়ী তিনি মানব জাতিকে ঈমানের দাওয়াত দিবেন এবং মানুষ ঈমান কবুল করবে। ফলে সমগ্র বিশ্বে ইসলামি শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে। যদি তখনকার ঈমান গ্রহণীয় না হয়, তবে এ দাওয়াত এবং মানুষের ইসলাম গ্রহণ অর্থহীন হয়ে যায় না কি?

তাফসীর রূহুল মা'আনীতে এর উত্তরে বলা হয়েছে যে, পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয়ের ঘটনা হযরত ঈসা (আ.)–এর অবতরণের অনেক পরে হবে। তওবার দরজা তখন থেকেই বন্ধ হবে, হযরত ঈসা (আ.)–এর অবতরণের সঙ্গে সঙ্গে নয়।

قوله إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا الخ : সূরা আল আনআমের অধিকাংশই মক্কার মুশরিকদেরকে সম্বোধন এবং তাদের প্রশ্ন ও উত্তরের সাথে সম্পর্কযুক্ত। এতে তাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, এখন আল্লাহ তা'আলার সোজা পথ একমাত্র কুরআন ও রাসূলুল্লাহ ﷺ–এর অনুসরণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। পূববর্তী পয়গম্বরগণের যুগে যেমন তাঁদের ও তাঁদের গ্রন্থ ও শরিয়তের অনুসরণের উপর মুক্তি নির্ভরশীল ছিল, তেমনি আজ শুধু রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর শরিয়তের নির্দেশ মেনে চলার মধ্যেই মুক্তি সীমাবদ্ধ। কাজেই তোমরা বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দাও এবং সোজা সরল পথ ছেড়ে এদিক ওদিক ভ্রান্তপথ অবলম্বন করো না। এসব পথ তোমাদেরকে আল্লাহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে।

আলোচ্য প্রথম আয়াতে মুশরিক, ইহুদি, খ্রিস্টান ও মুসলমান সবাইকে ব্যাপকভাবে সম্বোধন করা হয়েছে এবং তাদেরকে আল্লাহর সরল পথ পরিহার করার অশুভ পরিণতি সম্পর্কে হুঁশিয়ার করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ–কে বলা হয়েছে যে, এসব ভ্রান্ত পথের মধ্যে কিছু সরল পথের সম্পূর্ণ বিপরীতমুখীও রয়েছে। যেমন, মুশরিক ও আহলে কিতাবদের অনুসৃত পথ এবং কিছু বিপরীতমুখী নয়, কিন্তু সরল পথ থেকে বিচ্যুত করে ডানে বামে নিয়ে যায়। এগুলো হচ্ছে সন্দেহযুক্ত ও বিদআতের পথ। এগুলোও মানুষকে পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত করে দেয়।

বলা হয়েছে– إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ ۚ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ

"যারা ধর্মের মধ্যে বিভিন্ন পথ আবিষ্কার করেছে এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে, তাদের সথে আপনার কোনো সম্পর্ক নেই। তাদের কাজ আল্লাহ তা'আলার নিকট সমর্পিত। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাদের কাছে তাদের কৃতকর্মসমূহ বিবৃত করবেন।

আয়াতে উল্লিখিত ধর্মে বিভেদ সৃষ্টি করা এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হওয়ার অর্থ ধর্মের মূলনীতিসমূহের অনুসরণ ছেড়ে স্বীয় ধ্যান ধারণাও প্রভৃতি অনুযায়ী কিংবা শয়তানের ধোঁকা ও সন্দেহে লিপ্ত হয়ে ধর্মে কিছু নতুন বিষয় ঢুকিয়ে দেওয়া অথবা কিছু বিষয় তা থেকে বাদ দেওয়া।

ধর্মে বিদ'আত আবিষ্কার করার কারণে কঠোর শাস্তিবাণী : তাফসীরে মাযহারীতে বলা হয়েছে– কিছু লোক ধর্মের মূলনীতি বর্জন করে সে জায়গায় নিজের পক্ষ থেকে কিছু বিষয় ঢুকিয়ে দিয়েছিল। এ উম্মতের বেদআতীরাও নতুন ও ভিত্তিহীন বিষয়কে ধর্মের অন্তর্ভুক্ত করে থাকে। তারা সবাই আলোচ্য আয়াতের অন্তর্ভুক্ত। রাসূলুল্লাহ ﷺ এ বিষয়টি বর্ণনা করে বলেন : বনী ইসরাঈলরা যেসব অবস্থার সম্মুখীন হয়েছিল, আমার উম্মতেও সগুলোর সম্মুখীন হবে। তারা যেমন কুকর্মে লিপ্ত হয়েছিল, আমার উম্মতও তেমনি হবে। বনী ইসরাঈলরা ৭২ টি দলে বিভক্ত হয়েছিল আমার উম্মতে ৭৩ টি দল সৃষ্টি হবে। তন্মধ্যে একদল ছাড়া সবাই দোজখে যাবে। সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন : মুক্তি প্রাপ্ত দল কোনটি? উত্তর হলো যে দল আমার ও আমার সাহাবীদের পথ অনুসরণ করবে, তারাই মুক্তি পাবে। –[তিরমিযী, আবূ দাউদ]

তাবারানী নির্ভরযোগ্য সনদ সহকারে হযরত ফারুকে আজম (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি হযরত আয়েশা (রা.)-কে বলেছিলেন : এ আয়াতে বিদআতী, প্রবৃত্তির অনুসারী এবং নতুন পথের উদ্ভাবকদের কথা উল্লেখ রয়েছে। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকেও অনুরূপ উক্তি বর্ণিত আছে। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ ধর্মে নিজের পক্ষ থেকে নতুন নতুন পথ আবিষ্কার করতে কঠোর ভাষায় নিষেধ করেছেন।

ইমাম আহমদ, আবূ দাউদ, তিরমিযী প্রমুখ ইরবায ইবনে সারিয়া (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের মধ্যে যারা আমার পর জীবিত থাকবে, তারা বিস্তর মতানৈক্য দেখতে পাবে। তাই (আমি তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছি যে,) তোমরা আমার ও খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নতকে শক্তভাবে আঁকড়ে থেকো এবং তদনুযায়ী কাজ করে যেয়ো। নতুন নতুন পথ থেকে সযত্নে গা বাঁচিয়ে চলো। কেননা ধর্মে নতুন সৃষ্ট প্রত্যেক বিষয়ই বিদআত এবং প্রত্যেক বিদআতই পথভ্রষ্টতা।"

হযরত আয়েশা (রা.) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: ছয় ব্যক্তির প্রতি আমি অভিসম্পাত করি এবং আল্লাহ তা'আলাও তাদের প্রতি অভিসম্পাত করেন। (এক) যে ব্যক্তি নিজের পক্ষ থেকে আল্লাহর গ্রন্থে কোনো কিছু যোগ করে (তা শব্দই যোগ করুক কিংবা এমন কোনো অর্থ যোগ করুক যা সাহাবায়ে কেরামের তাফসীরের বিপরীত)। (দুই) যে ব্যক্তি তকদীরকে অস্বীকার করে। (তিন) যে ব্যক্তি জবরদস্তিমূলকভাবে মুসলমানদের নেতা হয়ে যায়, যাতে ঐ ব্যক্তিকে সম্মানিত করে, যাকে আল্লাহ লাঞ্ছিত করেছেন এবং ঐ ব্যক্তিকে লাঞ্ছিত করে, যাকে আল্লাহ সম্মান দান করেছেন। (চার) যে ব্যক্তি আল্লাহ কর্তৃক হারামকৃত বস্তুকে হালাল মনে করে, অর্থাৎ মক্কার হেরেমে খুন খারাবি করে কিংবা শিকার করে। (পাঁচ) যে ব্যক্তি আমার বংশধর ও সন্তান সন্ততির সম্মান হানি করে। (ছয়) যে ব্যক্তি আমার সুন্নত ত্যাগ করে।

দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে : مَنْ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهٗ عَشْرُ اَمْثَالِهَا وَمَنْ جَآءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزٰٓى اِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ পূর্ববর্তী আয়াতে বলা হয়েছিল যে, সরল পথ থেকে বিমুখ ব্যক্তিদেরকে আল্লাহ তা'আলাই কিয়ামতের দিন শাস্তি দিবেন।

এ আয়াতে পরকালের প্রতিদান ও শাস্তির একটি সহৃদয় বিধি বর্ণিত হয়েছে যে, যে ব্যক্তি একটি সৎকাজ করবে, তাকে দশগুণ প্রতিদান দেওয়া হবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি একটি গুনাহ করবে তাকে শুধু একটি গুনাহর সমান বদলা দেওয়া হবে। বুখারী, মুসলিম, নাসায়ী ও মুসনাদে আহমদে বর্ণিত এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : তোমাদের প্রতিপালক অত্যন্ত দয়ালু। যে ব্যক্তি কোনো সৎকাজের শুধু ইচ্ছা করে, তার জন্য একটি নেকি লেখা হয়। ইচ্ছাকে কার্যে পরিণত করুক বা না করুক। অতঃপর যখন সে সৎকাজটি সম্পাদন করে, তখন তার আমলনামায় দশটি নেকী লেখা হয়। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি কোনো পাপ কজের ইচ্ছা করে, অতঃপর তা কার্যে পরিণত না করে, তার আমলনামায়ও একটি নেকি লেখা হয়। অতঃপর যদি সে ইচ্ছাকে কার্যে পরিণত করে, তবে একটি গোনাহ লেখা হয়। কিংবা একেও মিটিয়ে দেওয়া হয়। এহেন দয়া ও অনুকম্পা সত্ত্বেও আল্লাহর দরবারে ঐ ব্যক্তিই ধ্বংস হতে পারে, যে ধ্বংস হতেই দৃঢ়সংকল্প। –[ইবনে কাছীর]

এক হাদীসে কুদসীতে হযরত আবূ বকর (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে ব্যক্তি একটি সৎকাজ করে, সে দশটি সৎকাজের ছওয়াব পায়; বরং আরও বেশি পায়। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি একটি গুনাহ করে সে তার শাস্তি এক গুনাহর সমপরিমাণ পায় কিংবা তাও আমি মাফ করে দিব। যে ব্যক্তি পৃথিবীভর্তি গোনাহ করার পর আমার কাছে এসে ক্ষমা প্রার্থনা করে আমি তার সাথে ততটুকু ক্ষমার ব্যবহার করব। "যে ব্যক্তি আমার দিকে অর্ধহাত অগ্রসর হয়, আমি তার দিকে একহাত অগ্রসর হই এবং যে ব্যক্তি আমার দিকে একহাত অগ্রসর হয় আমি তার দিকে বা' (অর্থাৎ দুই বাহু প্রসারিত) পরিমাণ অগ্রসর হই। যে ব্যক্তি আমার দিকে লাফিয়ে আসে, আমি তার দিকে দৌড়ে যাই।"

এসব হাদীস থেকে জানা যায়, আয়াতে যে সৎকাজের প্রতিদান দশগুণ দেওয়ার কথা বলা হয়েছে, তা সর্বনিম্ন পরিমাণ। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় কৃপায় আরও বেশি দিতে পারেন এবং দিবেন। অন্যান্য হাদীস দ্বারা সত্তর গুণ বা সাতশ'গুণ পর্যন্ত প্রমাণিত রয়েছে।

আলোচ্য আয়াতগুলো হচ্ছে সূরা আনআমের সর্বশেষ ছয় আয়াত। যারা সত্যধর্মে বাড়াবাড়ি ও কম বেশি করে একে ভিন্ন ধর্মে রূপান্তরিত করেছিল এবং নিজেরা বিভিন্ন দলে ও সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল, তাদের মোকাবিলায় প্রথম তিন আয়াতে সত্যধর্মের বিশুদ্ধ চিত্র, মৌলিক নীতি এবং কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ শাখাগত বিধান বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথম দু'আয়াতে মূলনীতি এবং তৃতীয় আয়াতে শাখাগত বিধান উল্লিখিত হয়েছে। উভয় ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে যে, আপনি তাদেরকে একথা বলে দিন যে, قُلْ اِنَّنِىْ هَدٰىنِىْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ আমাকে আমার পালনকর্তা একটি

সরল পথ বাতলে দিয়েছেন। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আমি তোমাদের মতো নিজ ধ্যান ধারণা বা পৈতৃক কুপ্রথার অনুসারী হয়ে এ পথ অবলম্বন করিনি, বরং আমার পালনকর্তাই আমাকে এ পথ বাতলে দিয়েছেন। (পালনকর্তা) শব্দের দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, বিশুদ্ধ পথ বলে দেওয়া তাঁর পালনকর্তার একটি দাবি। তোমরাও ইচ্ছা কর তবে হেদায়েতের আয়োজন তোমাদের জন্যও বিদ্যমান রয়েছে।

قوله دِينًا قِيَمًا مِّلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ : এখানে قِيَمًا শব্দটি قَيِّمٌ ধাতুর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এর অর্থ সুদৃঢ় অর্থাৎ এ দীন সুদৃঢ় যা আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত মজবুত ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত, কারও ব্যক্তি গত ধ্যান ধারণা নয়। এবং যাতে সন্দেহ হতে পারে এমন কোনো নতুন ধর্মও নয়; বরং এটিই ছিল পূর্ববর্তী সব পয়গম্বরের ধর্ম। এক্ষেত্রে বিশেষভাবে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর নাম উল্লেখ করার কারণ এই যে, জগতের প্রত্যেক ধর্মাবলম্বীই তাঁর মাহাত্ম্যে ও নেতৃত্বে বিশ্বাসী। বর্তমান সম্প্রাদয়সমূহের মধ্যে ইহুদি, খ্রিস্টান ও আরবের মুশরিকরা পরস্পর যতই ভিন্ন মতালম্বী হোক না কেন, হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর মাহাত্ম্যে ও নেতৃত্বে সবাই একমত। নেতৃত্বের এ মহান পদমর্যাদা আল্লাহ তা'আলা বিশেষভাবে হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে দান করেছেন। বলা হয়েছে : "আমি তোমাকে মানবজাতির নেতা রূপে বরণ করব।"

তাদের মধ্যে প্রতিটি সম্পদায়ই একথা প্রমাণ করতে সচেষ্ট থাকত যে, তারা ইবরাহীমী ধর্মেই অটল রয়েছে এবং তাদের ধর্মই মিল্লাতে ইবরাহীম। তাদের এ বিভ্রান্ত দূর করার উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে : হযরত ইবরাহীম (আ.) আল্লাহকে ছেড়ে অন্যের উপাসনা থেকে বেঁচে থাকতেন এবং শিরকের প্রতি ঘৃণা পোষণ করতেন। এটাই তাঁর সর্ববৃহৎ ও অক্ষয় কীর্তি। তোমাদের মধ্যে যখন ইহুদিরা হযরত ওযায়ের (আ.)-কে খ্রিস্টনারা হযরত ঈসা (আ.)-কে এবং আরবের মুশরিকরা হাজারো পাথরকে আল্লাহর অংশীদার করে নিয়েছে, তখন কারও একথা বলার অধিকার নেই যে, তারা ইবরাহীমী ধর্মের অনুসারী। অবশ্য বুক ফুলিয়ে একথা বলার অধিকার একমাত্র মুসলমানদেরই আছে। কারণ তারা যাবতীয় শিরক ও কুফরের প্রতি বীতশ্রদ্ধ।

قوله قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعٰلَمِينَ : এখানে نُسُكٌ শব্দের অর্থ কুরবানি। হজের ক্রিয়ার্মকেও نُسُكٌ বলা হয়। এ শব্দটি সাধারণ ইবাদত উপাসনার অর্থেও ব্যবহৃত হয়। তাই نَاسِكٌ শব্দটি عَابِدٌ (ইবাদতকারী) অর্থেও বলা হয়। আয়াতে এসব ক'টি অর্থই নেওয়া যেতে পারে। তাফসীরবিদ সাহাবী ও তাবেয়ীগণের কাছ থেকেও এসব তাফসীর বর্ণিত রয়েছে। তবে এখানে সাধারণ ইবাদত অর্থ নেওয়াই অধিক সঙ্গত মনে হয়। আয়াতের অর্থ এই যে, আমার নামাজ, আমার সমগ্র ইবাদত, আমার জীবন , আমার মরণ-সবই বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহর জন্য নিবেদিত।

এখানে ধর্মের শাখাগত কাজ কর্মের মধ্যে সর্ব প্রথম নামাজের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা এটি যাবতীয় সৎকর্মের প্রাণ ও ধর্মের স্তম্ভ। এরপর অন্যান্য সব কাজ ও ইবাদত সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে। অতঃপর সমগ্র জীবনের কাজকর্ম ও অবস্থা এবং সবশেষে মরণের কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, আমার এসব কিছুই একমাত্র বিশ্ব পালক আল্লাহর জন্য নিবেদিত যার কোনো শরিক নেই। এটিই হচ্ছে পূর্ণ বিশ্বাস ও পূর্ণ আন্তরিকাতর ফল। মানুষ জীবনের প্রতিটি কাজে ও প্রতিটি অবস্থায় একথা মনে রাখবে যে, আমার এবং সমগ্র বিশ্বের একজন পালনকর্তা আছেন, আমি তাঁর দাস এবং সর্বদা তাঁর দৃষ্টিতে রয়েছি।

আমার অন্তর, মস্তিষ্ক, চক্ষু, কর্ণ, হাত, পা, কলব ও পদক্ষেপ তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাওয়া উচিত নয়। মানুষ যদি অন্তরে ও মস্তিস্কে এ মোরাকাবা ও ধ্যানকে সদা সর্বদা উপস্থিত রাখে, তবে সে বিশুদ্ধ অর্থে পরিপূর্ণ মানুষে পরিণত হতে পারে এবং যাবতীয় পাপ ও অপরাধ থেকে নির্মল ও পুতঃপবিত্র জীবন যাপন করতে পারে।

অতঃপর বলা হয়েছে : وَبِذٰلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ "আমাকে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে এরূপ ঘোষণা করার এবং আন্তরিকতা অবলম্বন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।" আর আমি সর্বপ্রথম অনুগত মুসলমান। উদ্দেশ্য এই যে, এ উম্মতের মধ্যে সর্বপ্রথম মুসলমান আমি। কেননা প্রত্যেক উম্মতের প্রথম মুসলমান স্বয়ং ঐ পয়গম্বরই হন যার প্রতি ওহী অবতরণ করা হয়। প্রথম মুসলমান হওয়া দ্বারা এদিকেও ইঙ্গিত হতে পারে যে, সৃষ্ট জগতের মাঝে সর্বপ্রথম রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নূর সৃষ্টি করা হয়েছে। এরপর সমস্ত নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও অন্যান্য সৃষ্টজগত অস্তিত্ব লাভ করেছে। এক হাদীসে বলা হয়েছে: أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللّٰهُ نُوْرِيْ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা সর্বপ্রথম আমার নূর সৃষ্টি করেছেন। –[রূহুল মা'আনী]

www.almodina.com

একের পাপের বোঝা অন্যে বহন করতে পারে না: ১৬৪ নং আয়াতে মক্কার মুশরিক ওলীদ ইবনে মুগীরা প্রমুখের উত্তর দেওয়া হয়েছে। তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং সাধারণ মুসলমানদেরকে বলত : তোমরা আমাদের ধর্মে ফিরে এলে আমরা তোমাদের যাবতীয় পাপের বোঝা বহন করব। বলা হয়েছে: قُلْ اَغَيْرَ اللّٰهِ اَبْغِيْ رَبًّا وَّهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ অর্থাৎ আপনি তাদেরকে বলে দিন : তোমরা কি আমার কাছ থেকে এমন আশা কর যে, তোমাদের মতো আমিও আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো পালনকর্তা অনুসন্ধান করব? অথচ তিনিই সারা জাহান ও সমগ্র সৃষ্টজগতের পালনকর্তা। আমার কাছ থেকে এরূপ পথভ্রষ্টতার আশা করা বৃথা। আমাদের পাপের বোঝা বহন করার যে কথা তোমরা বলছ, তা একান্তই একটি নির্বুদ্ধিতা। যে ব্যক্তি পাপ করবে, তারই আমলনামায় তা লেখা হবে এবং সেই এর শাস্তি ভোগ করবে। তোমাদের এ কথার কারণে পাপ তোমাদের দিকে স্থানান্তরিত হতে পারে না। যদি মনে করা হয় যে, হিসাব ও আমলনামায় তো তাদের থাকবে, কিন্তু হাশরের ময়দানে এর যে শাস্তি নির্ধারিত হবে, তা আমরা ভাগ করে নিব, তবে এ ধারণাকেও পরবর্তী আয়াত নাকচ করে দিয়েছে। বলা হয়েছে : وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى অর্থাৎ কিয়ামতের দিন কেউ কারও পাপের বোঝা বহন করবে না।

এ আয়াত মুশরিকদের অর্থহীন উক্তির জবাব তো দিয়েছেই সাথে সাথে সাধারণ মুসলমানদেরকেও এ নীতি বলে দিয়েছে যে, কিয়ামতের আইন কানুন দুনিয়ার মতো নয়। দুনিয়াতে কেউ অপরাধ করে তার দায়িত্ব অপরের ঘাড়ে চাপাতে পারে, যখন অপর পক্ষ তাতে সম্মত হয়। কিন্তু খোদায়ী আদালতে এর কোনো অবকাশ নেই। সেখানে একজনের পাপের জন্য অন্যজনকে কিছুতেই পাকড়াও করা হবে না। এ আয়াতদৃষ্টেই রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ব্যভিচারের ফলে যে সন্তান জন্মগ্রহণ করে, তার উপর পিতামাতার অপরাধের কোনো প্রতিক্রিয়া হবে না। এ হাদীসটি হাকিম হযরত আয়েশার (রা.)-এর রেওয়ায়েতক্রমে বিশুদ্ধ সনদ সহকারে বর্ণনা করেছেন।

শব্দ বিশ্লেষণ

لَمْ تَكُنْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ نفى جحد بلم در فعل مستقبل معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْكَيْنُوْنَةُ মূলবর্ণ (ك . و . ن) জিনস اجوف واوى অর্থ– সে ছিল না।

دِيْنٌ : শব্দটি একবচন, বহুবচন اَدْيَانٌ অর্থ– দীন, ধর্ম, বিশ্বাস, প্রথা।

شِيَعًا : শব্দটি বহুবচন, একবচনে شِيْعَةٌ অর্থ– দল, সম্প্রদায়।

لَا يُجْزٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ نفى مضارع مجهول বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْجَزَاءُ মূলবর্ণ (ج . ز . ى) জিনস ناقص يائى অর্থ–সে শাস্তি প্রাপ্ত হবে না।

مِلَّةٌ : শব্দটি একবচন, বহুবচন مِلَلٌ অর্থ– মিল্লাত, জাতি, ধর্ম, দল।

لَا تَزِرُ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْوِزْرُ মূলবর্ণ (و . ز . ر) জিনস مثال واوى অর্থ– সে বহন করবে না।

خَلٰئِفَ : শব্দটি বহুবচন, একবচন خَلِيْفَةٌ অর্থ– খলিফা, ক্ষমতাবান, উত্তরাধিকারী, প্রতিনিধি।

يَبْلُوَكُمْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْبَلَاءُ মূলবর্ণ (ب . ل . و) জিনস ناقص واوى অর্থ– যেন তিনি তোমাদেরকে পরীক্ষা করেন।

سُوْرَةُ الْاَعْرَافِ

সূরাতুল আ'রাফ

মদীনায় অবতীর্ণ : আয়াত- ২০৬, রুকূ'- ২৪

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু

অনুবাদ	আয়াত
অনুবাদ : (১) আলিফ-লাম-মীম- সোয়াদ।	الٓمّٓصٓ (١)
(২) এটা একটি কিতাব, যা আপনার নিকট এজন্য নাজিল করা হয়েছে যে, আপনি এটার দ্বারা ভয় প্রদর্শন করেন, সুতরাং আপনার অন্তরে এতে [অর্থাৎ এই ধারণায় যে, যদি কেউ অমান্য করে, তবে] যেন মোটেই সংকীর্ণতা না আসে, এবং তা নসিহত মুমিনদের জন্য।	كِتٰبٌ اُنْزِلَ اِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِيْ صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنْذِرَ بِهٖ وَذِكْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ (٢)
(৩) তোমরা তার অনুসরণ কর, যা তোমাদের নিকট তোমাদের রবের পক্ষ থেকে এসেছে, এবং আল্লাহকে ছেড়ে অন্য অভিভাবকদের তাবেদারী করো না, তোমরা খুব অল্পই উপদেশ গ্রহণ করে থাক।	اِتَّبِعُوْا مَآ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ اَوْلِيَآءَ ؕ قَلِيْلًا مَّا تَذَكَّرُوْنَ (٣)
(৪) আর বহু জনপদকে আমি ধ্বংস করে দিয়েছি, এবং তাদের প্রতি আমার আজাব রাত্রিকালে পৌঁছেছিল, অথবা এমন অবস্থায় যে, তারা দ্বি-প্রহরে বিশ্রাম করছিল।	وَكَمْ مِّنْ قَرْيَةٍ اَهْلَكْنٰهَا فَجَآءَهَا بَاْسُنَا بَيَاتًا اَوْ هُمْ قَآئِلُوْنَ (٤)
(৫) অনন্তর যখন তাদের প্রতি আমার আজাব আসল, তখন তাদের মুখ হতে তা ব্যতীত আর কোনো কথাই বের হচ্ছিল না যে, বাস্তবিকই আমরা অনাচারী ছিলাম।	فَمَا كَانَ دَعْوٰىهُمْ اِذْ جَآءَهُمْ بَاْسُنَآ اِلَّآ اَنْ قَالُوْٓا اِنَّا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ (٥)

শাব্দিক অনুবাদ

(১) الٓمّٓصٓ আলিফ-লাম-মীম- সোয়াদ।

(২) كِتٰبٌ এটা একটি কিতাব اُنْزِلَ اِلَيْكَ যা আপনার নিকট এজন্য নাজিল করা হয়েছে যে فَلَا يَكُنْ فِيْ صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ সুতরাং আপনার অন্তরে এতে যেন মোটেই সংকীর্ণতা না আসে لِتُنْذِرَ بِهٖ আপনি এটার দ্বারা ভয় প্রদর্শন করেন وَذِكْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ এবং তা নসিহত মুমিনদের জন্য।

(৩) اِتَّبِعُوْا তোমরা তার অনুসরণ কর مَآ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ যা তোমাদের নিকট তোমাদের রবের পক্ষ থেকে এসেছে وَلَا تَتَّبِعُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ اَوْلِيَآءَ এবং আল্লাহকে ছেড়ে অন্য অভিভাবকদের তাবেদারী করো না قَلِيْلًا مَّا تَذَكَّرُوْنَ তোমরা খুব অল্পই উপদেশ গ্রহণ করে থাক।

(৪) وَكَمْ مِّنْ قَرْيَةٍ اَهْلَكْنٰهَا আর বহু জনপদকে আমি ধ্বংস করে দিয়েছি فَجَآءَهَا بَاْسُنَا بَيَاتًا এবং তাদের প্রতি আমার আজাব রাত্রিকালে পৌঁছেছিল اَوْ هُمْ قَآئِلُوْنَ অথবা এমন অবস্থায় যে, তারা দ্বি-প্রহরে বিশ্রাম করছিল।

আয়াত	অনুবাদ
فَلَنَسْـَٔلَنَّ الَّذِيْنَ اُرْسِلَ اِلَيْهِمْ وَلَنَسْـَٔلَنَّ الْمُرْسَلِيْنَ (٦)	**অনুবাদ :** (৬) অতঃপর আমি তাদেরকে অবশ্যই জিজ্ঞাসা করব, যাদের নিকট রাসূল পাঠানো হয়েছিল এবং আমি রাসূলদেরকে [-ও] নিশ্চয় জিজ্ঞাসা করব।
فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَّمَا كُنَّا غَآئِبِيْنَ (٧)	(৭) অনন্তর তাদের সম্মুখে আমি বর্ণনা করে দিব, যেহেতু আমি পূর্ণরূপে জ্ঞাত আছি, আর আমি তো বে-খবর ছিলাম না।
وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذِ ِالْحَقُّ ۚ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهٗ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ (٨)	(৮) আর সেই দিনকার [নেকী বদীর] ওজন বরহক, অনন্তর যার পাল্লা ভারি হবে, এরূপ লোকেরাই সফলকাম হবে।
وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهٗ فَاُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ بِمَا كَانُوْا بِاٰيٰتِنَا يَظْلِمُوْنَ (٩)	(৯) আর যার পাল্লা হালকা হবে, ফলতঃ তারা হচ্ছে সেই সকল লোক যারা নিজেদের ক্ষতি সাধন করেছে, এ কারণে যে, তারা আমার আয়াতসমূহের হক নষ্ট করত।
وَلَقَدْ مَكَّنّٰكُمْ فِى الْاَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيْهَا مَعَايِشَ ۗ قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ (١٠)	(১০) আর নিশ্চয় আমি তোমাদেরকে ভূপৃষ্ঠে থাকার জায়গা দিয়েছি এবং আমি তোমাদের জন্য তাতে জীবিকা নির্বাহের উপকরণগুলো সৃষ্টি করেছি, তোমরা খুব কম শোকর কর।
وَلَقَدْ خَلَقْنٰكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنٰكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ ۖ فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَ ۗ لَمْ يَكُنْ مِّنَ السّٰجِدِيْنَ (١١)	(১১) আর আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি, অতঃপর তোমাদের আকৃতি গঠন করেছি অতঃপর আমি ফেরেশতাদেরকে বললাম যে, আদমকে সেজদা কর, সুতরাং সকলেই সেজদা করল ইবলীস ব্যতীত, সে সেজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হলো না।

শাব্দিক অনুবাদ

(৫) فَمَا كَانَ دَعْوٰىهُمْ অনন্তর তখন তাদের মুখ হতে বের হচ্ছিল না اِذْ جَآءَهُمْ بَأْسُنَآ যখন তাদের প্রতি আমার আজাব আসল اِلَّآ اَنْ قَالُوْٓا তা ব্যতীত আর কোনো কথাই যে اِنَّا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ বাস্তবিকই আমরা অনাচারী ছিলাম।

(৬) فَلَنَسْـَٔلَنَّ অতঃপর আমি তাদেরকে অবশ্যই জিজ্ঞাসা করব الَّذِيْنَ اُرْسِلَ اِلَيْهِمْ যাদের নিকট রাসূল পাঠানো হয়েছিল وَلَنَسْـَٔلَنَّ الْمُرْسَلِيْنَ; এবং আমি রাসূলদেরকে [-ও] নিশ্চয় জিজ্ঞাসা করব।

(৭) فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ অনন্তর তাদের সম্মুখে আমি বর্ণনা করে দিব بِعِلْمٍ যেহেতু আমি পূর্ণরূপে জ্ঞাত আছি وَمَا كُنَّا غَآئِبِيْنَ আর আমি তো বে-খবর ছিলাম না।

(৮) وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذِ ِالْحَقُّ; আর সেই দিনকার [নেকী বদীর] ওজন বরহক فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهٗ অনন্তর যার পাল্লা ভারি হবে فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ এরূপ লোকেরাই সফলকাম হবে।

(৯) وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهٗ আর যার পাল্লা হালকা হবে فَاُولٰٓئِكَ ফলতঃ তারা হচ্ছে সেই সকল লোক الَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ যারা নিজেদের ক্ষতি সাধন করেছে بِمَا كَانُوْا بِاٰيٰتِنَا يَظْلِمُوْنَ এ কারণে যে, তারা আমার আয়াতসমূহের হক নষ্ট করত।

(১০) وَلَقَدْ مَكَّنّٰكُمْ فِى الْاَرْضِ; আর নিশ্চয় আমি তোমাদেরকে ভূপৃষ্ঠে থাকার জায়গা দিয়েছি وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيْهَا مَعَايِشَ এবং আমি তোমাদের জন্য তাতে জীবিকা নির্বাহের উপকরণগুলো সৃষ্টি করেছি قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ তোমরা খুব কম শোকর কর।

(১১) وَلَقَدْ خَلَقْنٰكُمْ; আর আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি ثُمَّ صَوَّرْنٰكُمْ অতঃপর তোমাদের আকৃতি গঠন করেছি ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ অতঃপর আমি ফেরেশতাদেরকে বললাম যে اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ আদমকে সেজদা কর فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَ সুতরাং সকলেই সেজদা করল ইবলীস ব্যতীত لَمْ يَكُنْ مِّنَ السّٰجِدِيْنَ সে সেজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হলো না।

www.almodina.com

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

যোগসূত্র : সূরা আল- আন'আম-এর শেষাংশ ও এ সূরার প্রথমাংশের মধ্যে যোগসূত্র হলো, পূর্ব সূরা শেষভাগে قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي الخ আয়াতে সত্য ধর্মের পরিচয় বর্ণিত হয়েছিল এবং অতঃপর هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ الخ আয়াতে ছওয়াব অর্জনের প্রতি উৎসাহ প্রদান ও আজাব হতে ভয় প্রদর্শন করা হয়েছিল। আর এ সূরার প্রারম্ভে كِتٰبٌ أُنْزِلَ إِلَيْكَ الخ আয়াতে সে সত্য ধর্ম প্রচারের আদেশ এবং فَلَنَسْئَلَنَّ الَّذِينَ الخ আয়াতে পরলোকের ব্যাপারসমূহ যথা– হিসাব ও আমল ওজন হওয়া এবং ছওয়াব ও আজাবের বর্ণনা রয়েছে। অতএব পূর্ব সূরার উল্লিখিত বিষয়বস্তু দুটি অত্র সূরার এ দুটি বিষয়বস্তুর সাথে খুবই সামঞ্জস্যশীল।

নামকরণ : أَعْرَافٌ (আ'রাফ) শব্দটি عُرْفٌ ('উরফুন) শব্দের বহুবচন। অর্থ হচ্ছে– উর্ধ্ব বা উচ্চ স্থান, প্রাচীরের উপরিভাগ, টিলা ভূমি, ভূমি হতে অপেক্ষাকৃত উঁচু প্রতিটি বস্তুকেই أَعْرَافٌ বলা হয়। তাছাড়া জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যবর্তী স্থানকেও أَعْرَافٌ বলা হয়। যেহেতু এ স্থান হতে একে অপরকে তথা পরস্পরকে চিনতে পারবে, তাই এ স্থানকে أَعْرَافٌ নামে অভিহিত করা হয়। সাথে সাথে এ সূরার পঞ্চম রুকূ'-এর ৪৬ তম আয়াতে 'আসহাবুল আ'রাফ বা আ'রাফবাসীদের প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। সেখানে থেকে এ সূরার নামকরণ করা হয়েছে 'আল-আ'রাফ' বলে।

বিষয়বস্তু : সূরা আল-আ'রাফ মক্কা মুয়ায্যামায় অবতীর্ণ হয়েছে। এতে ২০৬ টি আয়াত ও ২৪ টি রুকূ' রয়েছে। এটি কুরআন মাজীদের একটি বৃহত্তম সূরা। এ সূরার বিষয়বস্তু হলো, সমগ্র সূরা আ'রাফের প্রতি লক্ষ্য করলে জানা যায় যে, এ সূরার অধিকাংশ বিষয়বস্তুই পরকাল ও রিসালাতের সাথে সম্পৃক্ত। প্রথম আয়াত كِتٰبٌ أُنْزِلَ নবুয়তের এবং ষষ্ঠ আয়াত فَلَنَسْئَلَنَّ পরকালের সত্যতা সম্পর্কিত। চতুর্থ রুকূ'র অর্ধেক থেকে ষষ্ঠ রুকূ'র শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ পরকালের আলোচনা রয়েছে। অতঃপর অষ্টম রুকূ' থেকে একুশতম রুকূ' পর্যন্ত আম্বিয়া (আ.) ও তাঁদের উম্মতের ব্যাপারাদি বর্ণিত হয়েছে। এগুলো সবই রিসালাতের সাথে সম্পর্কিত। এসব কাহিনীতে রিসালাত অবিশ্বাসীদের শাস্তির কথাও বর্ণনা করা হয়েছে, যাতে বর্তমান অবিশ্বাসীরা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। বাইশতম রুকূ'র অর্ধেক থেকে তেইশতম রুকূ'র শেষ পর্যন্ত পরকাল সম্পর্কিত বিষয়ের পুনরালোচনা করা হয়েছে। শুধু সপ্তম ও বাইশতম রুকূ'র শুরুতে এবং সর্বশেষ চব্বিশতম রুকূ'র বেশিরভাগ অংশে তাওহীদ সম্পর্কে বিশেষ আলোচনা করা হয়েছে। এ সূরার খুব কম অংশই এমন আছে যাতে স্থানাপোযোগী শাখাগত বিধিবিধান আলোচিত হয়েছে।

অবতীর্ণের সময়কাল ও কারণ : এ সূরাটি রাসূলে কারীম ﷺ-এর মক্কী জীবনের শেষ দিকে অবতীর্ণ হয়েছে। রাসূলে কারীম ﷺ-এর ইসলাম প্রচারের কারণে কুরাইশদের শত্রুতা, বিরুদ্ধতা ও জুলুম নিষ্পেষণের মাত্রা চরম সীমায় পৌঁছে যায় এবং এ নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে কিছু মুসলমান হাবশায় হিজরত করেন। এ সময় রাসূলে কারীম ﷺ-এর সহযোগিতা করার মতো তাঁর চাচা আবূ তালেব ও হযরত খাদীজাতুল কুবরা (রা.) জীবিত ছিলেন না। এজন্য সকল আশ্রয় ও সহযোগিতা হতে বঞ্চিত হয়ে কঠিন প্রতিবন্ধকতা উপেক্ষা করেও রাসূলে কারীম ﷺ তাবলীগ ও রিসালাতের দায়িত্ব পালন করছিলেন। যার প্রভাবে মক্কা ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকার বহু লোক ইসলামে দীক্ষিত হতে লাগল। এটা দেখে সমগ্র আরবজাতি সমষ্টিগতভাবে ইসলামের দাওয়াত প্রত্যাহার ও অস্বীকার করার জন্য সংকল্প করেছিল। যখনই কোনো ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করতো, তখনই এ সময় শুধুমাত্র মদিনায় বসবাসকারী আওস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয়ের কিছুসংখ্যক লোক বিনা বাধায় ইসলাম কবুল করেছিলেন। মদিনায় বসবাসকারী এ অল্প সংখ্যক লোকের ইসলামে দীক্ষিত হওয়াটাই ইসলাম প্রসার লাভের বিরাট উজ্জ্বল সম্ভাবনা ছিল, তা তখন মক্কাবাসীরা বুঝতে পারেনি। বস্তুত এটার ফল ও পরিণতি হলো যে, গোটা জাহান ইসলামের ছায়াতলে এসে যায়। এমনি মুহূর্তে সূরা আল আ'রাফ অবতীর্ণ হলো।

قوله فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ প্রথম আয়াতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে : এ কুরআন আল্লাহর গ্রন্থ, যা আপনার কাছে প্রেরিত হয়েছে। এর কারণে আপনার অন্তরে কোনো সংকোচ থাকা উচিত নয়। অন্তরের সংকোচ অর্থ হলো কুরআন পাক ও এর নির্দেশাবলি প্রচারের ক্ষেত্রে কারও ভয়ভীতি অন্তরায় না হওয়া উচিত যে, মানুষ এর প্রতি মিথ্যারোপ করবে এবং আপনাকে কষ্ট দেবে। –[মাযহারী]

www.almodina.com

এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, যিনি আপনার প্রতি এ গ্রন্থ নাজিল করেছেন, তিনি আপনার সাহায্য এবং হেফাজতেরও ব্যবস্থা করেছেন। কাজেই আপনি মনকে সংকুচিত করবেন কেন? কারো কারো মতে এখানে অন্তরের সংকোচনের অর্থ এই যে, কুরআন ও ইসলামি বিধি বিধান শুনেও যদি কেউ ইসলাম গ্রহণ না করে, তবে রাসূলুল্লাহ ﷺ দয়ার কারণে মর্মাহত হতেন। একেই মানসিক সংকোচ বলে ব্যক্ত করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে : আপনার কর্তব্য শুধু দীনের প্রচার করা। এটা করার পর কে মুসলমান হলো আর কে হলো না এ দায়িত্ব আপনার নয়। অতএব, আপনি অহেতুক মর্মাহত হবেন কেন?

فَلَنَسْئَلَنَّ الَّذِيْنَ اُرْسِلَ اِلَيْهِمْ وَلَنَسْئَلَنَّ الْمُرْسَلِيْنَ অর্থাৎ কিয়ামতের দিন সর্বসাধারণকে জিজ্ঞেস করা হবে যে, আমি তোমাদের কাছে রাসূল ও গ্রন্থসমূহ প্রেরণ করেছিলাম, তোমরা তাদের সাথে কিরূপ ব্যবহার করেছিলে? পয়গম্বরগণকে জিজ্ঞেস করা হবে : যেসব বার্তা ও বিধান দিয়ে আমি আপনাদেরকে প্রেরণ করেছিলাম, সেগুলো আপনারা নিজ নিজ উম্মতের কাছে পৌছিয়েছেন কি না? –[মাযহারী]

সহীহ মুসলিমে হযরত জাবের (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বিদায় হজের ভাষণে উপস্থিত জনতাকে প্রশ্ন করেছিলেন : কিয়ামতের দিন আমার সম্পর্কে তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে যে, আমি আল্লাহর পয়গাম পৌছিয়েছি কি না। তখন তোমরা উত্তরে কি বলবে? সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন : আমরা বলব, আপনি আল্লাহর পয়গাম আমাদের কাছে পৌছে দিয়েছেন এবং আল্লাহ প্রদত্ত দায়িত্ব যথাযথ পালন করেছেন। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, اَللّٰهُمَّ اشْهَدْ। অর্থাৎ হে আল্লাহ আপনি সাক্ষী থাকুন।

মুসনাদে আহমদে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা আমাকে জিজ্ঞেস করবেন, আমি তাঁর পয়গাম বান্দাদের কাছে পৌছিয়েছি কি না। আমি উত্তরে বলব পৌছিয়েছি। কাজেই এখানে তোমরা এ বিষয়ে সচেষ্ট হও যে, যারা এখন উপস্থিত রয়েছে, তারা যেন অনুপস্থিতদের কাছে আমার পয়গাম পৌছিয়ে দেয়। –[মাযহারী]

অনুপস্থিতদের অর্থ যারা সে যুগে বর্তমান ছিল, কিন্তু মজলিসে উপস্থিত ছিল না। এবং সেসব বংশধর যারা পরবর্তীকালে জন্মগ্রহণ করবে। তাদের কাছে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পৌছানোর অর্থ এই যে, প্রতি যুগের মানুষ তাদের পরবর্তী বংশধরদের কাছে পৌছানোর ধারা অব্যাহত রাখবে। যাতে কিয়ামত পর্যন্ত জন্মগ্রহণকারী সব মানুষের কাছে এ পয়াগাম পৌছে যায়।

এ আয়াতে বলা হয়েছে : وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذِ الْحَقُّ; (সেদিন যে ভালো-মন্দ কাজ-কর্মের ওজন হবে তা সত্য সঠিকভাবেই হবে) এতে কোনোরূপ সন্দেহের অবকাশ নেই। এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এতে মানুষ ধোঁকায় পড়তে পারে যে, সব বস্তু ভারি, সেগুলোর ওজন ও পরিমাপ হতে পারে। মানুষের ভালো মন্দ কাজকর্ম কোনো জড়পদার্থ নয় যে, এগুলোকে ওজন করা যেতে পারে। এমতাবস্থায় কাজকর্মের ওজন কিরূপে করা হবে? উত্তর এই যে, প্রথমত পরম প্রভু আল্লাহ সর্বশক্তিমান। তিনি সব কিছুই করতে পারেন। অতএব, আমরা যা ওজন করতে পারি না আল্লাহ তা'আলাও তা ওজন করতে পারবেন না, এমনটা কল্পনা করা যায় না। দ্বিতীয়তঃ আজকাল জগতে ওজন করার নতুন নতুন যন্ত্র আবিষ্কার হয়েছে যাতে দাঁড়িপাল্লা, স্কেলকাঁটা ইত্যাদির কোনো প্রয়োজন নেই। এসব নবাবিষ্কৃত যন্ত্রের সাহায্যে আজকাল এমন বস্তুও ওজন করা যায়, যা ইতঃপূর্বে ওজন করার কল্পনাও কারো যেত না। আজকাল বাতাসের চাপ এবং বৈদ্যুতিক প্রবাহও ওজন করা যায়, এমনকি শীত-গ্রীষ্ম পর্যন্ত ওজন করা হয়। এগুলোর মিটারই এদের দাঁড়িপাল্লা। যদি আল্লাহ তা'আলা স্বীয় অসীম শক্তির বলে মানুষের কাজর্ম ওজন করে নেন, তবে এতে বিস্ময়ের কিছুই নেই।

আমলের ওজন সম্পর্কে একটি সন্দেহ ও তার উত্তর : আমলের ওজন সম্পর্কে হাদীস সমূহের বিশদ বর্ণনায় একটি প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, একাধিক হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী হাশরের দাঁড়িপাল্লায় কালেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'র ওজন হবে সবচাইতে বেশি। এ কালিমা যে পাল্লায় থাকবে, তা সর্বাধিক ভারি হবে।

তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, ইবনে হাব্বান, বায়হাকী ও হাকেম প্রমুখ আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : হাশরের ময়দানে আমার উম্মতের এক ব্যক্তিকে তার নিরানব্বইটি আমলনামাসহ সকলের সামনে উপস্থিত করা হবে। প্রত্যেকটি আমলনামা তার দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত দীর্ঘ হবে। আর সবগুলো আমলনামই অসৎকাজ এবং গোনাহে পরিপূর্ণ হবে। তাকে জিজ্ঞেস করা হবে এসব আমলনামায় যা কিছু লেখা রয়েছে, তার সবই ঠিক, না কি আমলনামা লেখক ফেরেশতা তোমার প্রতি কোনো অবিচার করেছে এবং অবাস্তব কোনো কথাও লিখে দিয়েছে? সে স্বীকার

www.almodina.com

করে বলবে : আয় পরওয়ারদেগার এতে যা কিছু আছে, সবই ঠিক। সে মনে মনে অস্থির হবে যে, এখন মুক্তির উপায় কি? তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন। আজ কারও প্রতি অবিচার হবে না। এসব পাপের মোকবিলায় তোমার 'আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহূ ওয়া রাসূলুহু' লেখা হয়েছে। লোকটি বলবে: ইয়া রব, এত বিরাট পাপপূর্ণ আমলনামার মোকাবিলায় এ ছোট পাতাটির কি মূল্য? তখন আল্লাহ বলবেন, তোমার প্রতি অবিচার করা হবে না। অতঃপর এক পাল্লায় পাপে পরিপূর্ণ আমলনামাগুলো রাখা হবে এবং অপর পাল্লায় ঈমানের কালেমা সম্বলিত পাতাটি রাখা হবে। এতে কালেমার পাল্লা ভারি হবে এবং পাপের পাল্লা হালকা হবে। এ ঘটনা বর্ণনা করার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : আল্লাহর নামের তুলনায় কোনো বস্তুই ভারি হতে পারে না। –[মাযহারী]

মুসনাদ, বাযযার ও মুস্তাদরাক হাকেমে উদ্ধৃত হযরত ইবনে ওমর (রা.) এক রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : হযরত নূহ (আ.)-এর ওফাত নিকটবর্তী হলে তিনি তাঁর পুত্রদেরকে সমবেত করে বললেন : আমি তোমাদেরকে কালেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র অসিয়ত করছি। কেননা যদি সাত আসমান ও জমিন এক পাল্লায় এবং কালিমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' অপর পাল্লায় রাখা হয়, তবে কালেমার পাল্লাই ভারি হবে। এ সম্পর্কিত অনেক হাদীস হযরত আবূ সায়ীদ খুদরী, ইবনে আব্বাস ও আবূ দারদা (রা.) থেকে নির্ভরযোগ্য সনদসহ হাদীস গ্রন্থসমূহে বর্ণিত রয়েছে। –[মাযহারী]

এসব হাদীস থেকে জানা যায় যে, মুমিনের পাল্লা সব সময়ই ভারি হবে, সে যত পাপই করুক। কিন্তু কুরআনের অন্যান্য আয়াত এবং অনেক হাদীসের দ্বারা প্রমাণিত আছে যে, মুসলমানের নেকী ও পাপকর্মসমূহেরও ওজন করা হবে। কারও নেকীর পাল্লা ভারি হবে এবং কারও পাপের পাল্লা ভারি হবে। যার নেকীর পল্লা ভারি হবে, সে মুক্তি পাবে এবং যার পাপের পাল্লা ভারি হবে, সে শাস্তি ভোগ করবে।

উদাহরণত: কুরআন পাকের এক আয়াতে আছে : وَنَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيٰمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَاِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ اَتَيْنَا بِهَا وَكَفٰى بِنَا حٰسِبِيْنَ অর্থাৎ আমি কিয়ামতের দিন ইনসাফের পাল্লা স্থাপন করব। কাজেই কারও প্রতি বিন্দুমাত্র অবিচার হবে না। যদি একটি রাঈদানা পরিমাণও ভালোমন্দ কাজ কেউ করে, তবে সবই সে পাল্লায় রাখা হবে। আমিই হিসাবের জন্য যথেষ্ট। সূরা কারিয়ায় বলা হয়েছেঃ فَاَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهٗ فَهُوَ فِيْ عِيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ وَاَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهٗ فَاُمُّهٗ هَاوِيَةٌ অর্থাৎ যার নেকীর পাল্লা ভারি হবে, সে সুখ স্বাচ্ছন্দ্যে থাকবে এবং যার নেকীর পাল্লা হালকা হবে, তার স্থান হবে দোজখে।

এসব আয়াতের তাফসীরে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন : যে মুমিনের নেকীর পাল্লা ভারি হবে, সে স্বীয় আমলসহ জান্নাতে এবং যার পাপের পাল্লা ভারি হবে, সে স্বীয় পাপকর্মসহ জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। –[মাযহারী]

আবূ দাউদে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর রেওয়ায়েতক্রমে বর্ণিত রয়েছে যে, যদি কোনো বান্দার ফরজ কাজসমূহে কোনো ত্রুটি পাওয়া যায়, তবে রাব্বুল আলামীন বলবেন, দেখ, তার নফল কাজ আছে কি না। নফল কাজ থাকলে ফরজের ত্রুটি নফল দ্বারা পূরণ করা হবে।

আমলের ওজন কিভাবে হবে : হযরত আবূ হুরায়ারা (রা.) রেওয়ায়েতক্রমে বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : কিয়ামতের দিন কিছু মোটা লোক আসবে। তাদের মূল্য আল্লাহর কাছে মশার পাখার সমানও হবে না। এ কথার সমর্থনে তিনি কুরআন পাকের এ আয়াত পাঠ করলেন : فَلَا نُقِيْمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَزْنًا –অর্থাৎ কিয়ামতের দিন আমি তাদের কোনো ওজন স্থির করবো না। –[মাযহারী]

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর প্রশংসায় বর্ণিত এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : তাঁর পা দু'টি বাহ্যতঃ যতই সরু হোক, কিন্তু যার হাতে আমার প্রাণ সেই সত্তার কসম! কিয়ামতের দাঁড়িপাল্লায় তাঁর ওজন পর্বতের চেয়েও হবে। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) -এর যে হাদীস দ্বারা ইমাম বুখারী (র.) স্বীয় গ্রন্থের সমাপ্তি টেনেছেন তাতে বলা হয়েছে দু'টি বাক্য উচ্চারণের দিক থেকে খুবই হালকা; কিন্তু দাঁড়িপাল্লায় অত্যন্ত ভারি এবং আল্লাহর কাছে অধিক প্রিয়। বাক্য দু'টি এই: سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলতেন : 'সোবহানাল্লাহ' বললে আমলের দাঁড়িপাল্লার অর্ধেক ভরে যায় আর 'আলহামদু লিল্লাহ' বললে বাকি অর্ধেক পূর্ণ হয়ে যায়।

আবূ দাউদ, তিরমিযী ও ইবনে হাব্বান বিশুদ্ধ সনদে হযরত আবুদ্দারদা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমলের ওজনের বেলায় কোনো আমলই সচ্চরিত্রতায় সমান ভারি হবে না।

হযরত আবূ যর গিফারী (রা.)-কে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছিলেন : তোমাকে দু'টি কাজের কথা বলছি এগুলো কর। মানুষের জন্য মোটেই কঠিন নয়, কিন্তু ওজনের দিক দিয়ে এগুলো খুবই ভারি হবে। (এক) সচ্চরিত্রতা এবং (দুই) অধিক মৌনতা, অর্থাৎ বিনা প্রয়োজনে কথা না বলা।

ইমাম আহমদ কিতাবুয যুহদে হযরত হাযেম (রা.)-এর রেওয়ায়েতক্রমে বর্ণনা করেছেন যে, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে হযরত জিবারাঈল (আ.) আগমন করলেন। তখন এক ব্যক্তি আল্লাহর ভয়ে কাঁদছিলেন। হযরত জিবরাঈল (আ.) বললেন, মানুষের সব আমালেরই ওজন হবে, কিন্তু আল্লাহ ও পরকালের ভয়ে কাঁদা এমন একটি আমল, যার কোনো ওজন হবে না; বরং এর এক ফোঁটা অশ্রুও জাহান্নামের বৃহত্তম আগুন নির্বাপিত করে দিবে। –[মাযহারী]

এক হাদীসে আছে হাশরের ময়দানে একটি লোক উপস্থিত হয়ে যখন আমলনামায় সৎকর্ম কম দেখবে, তখন খুবই অস্থির হয়ে পড়বে। তখন হঠাৎ একটি বস্তু মেঘের মতো উঠে আসবে এবং তার আমলনামার পাল্লায় এসে পড়বে। তাকে বলা হবে দুনিয়াতে তুমি মানুষকে মাসআলা বলতে এবং শিক্ষা দিতে। এ হচ্ছে তোমার সেই আমলের ফল। তোমার এ শিক্ষা এগিয়ে এসেছে এবং যারা এ শিক্ষা অনুয়ায়ী আমল করেছে, তাদের সবার আমলও তোমার অংশে রাখা হয়েছে। –[মাযহারী]

তাবারানী হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বাচনিক বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : যে, ব্যক্তি জানাজার সাথে কবরস্থান পর্যন্ত যায়, তার আমলের ওজনে দু'টি কীরাত রেখে দেওয়া হবে। অন্য এক রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে, এই কিরাতের ওজন হবে ওহুদ পাহাড়ের সমান।

তাবারানী হযরত জাবের (রা.)-এর বাচনিক বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মানুষের আমলের দাঁড়ি পাল্লায় সর্বপ্রথম যে আমল রাখা হবে, তা হবে তার পরিবার পরিজনের ভরণ পোষণের ব্যয়রূপী সৎকর্ম।

ইমাম যাহাবী (র.) হযরত ইমরান ইবনে হাসীন (রা.)–এর বাচনিক বর্ণনা করেছেন, যে কালি দ্বারা দীনি ইলম ও বিধান সংক্রান্ত বিষয় লেখা হয় তা এবং শহীদদের রক্ত কিয়ামতের দিন ওজন করা হবে। তখন ওজনের ক্ষেত্রে আলেমদের কালি শহীদের রক্তের চেয়েও ভারি হবে।

কিয়ামতে আমলের ওজন সম্পর্কে এ ধরনের বহু হাদীস রয়েছে। এখানে কয়েকটি এজন্য উল্লেখ করা হলো যে, এগুলো দ্বারা বিশেষ আমলের শ্রেষ্ঠত্ব ও মূল্য অনুমান করা যায়।

মোটকথা মানুষের যাবতীয় প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র আল্লাহ তা'আলার কৃতজ্ঞতা স্বীকার করাই মানুষের কর্তব্য। কিন্তু মানুষ গাফেল হয়ে স্রষ্টার অনুগ্রহরাজি বিস্মৃত হয়ে যায় এবং পার্থিব দ্রব্য সামগ্রীর মধ্যেই নিজেকে হারিয়ে ফেলে। তাই আয়াতের শেষে অভিযোগের সূরে বলা হয়েছে : قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ অর্থাৎ তোমরা খুব কম লোকই কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর।

শব্দ বিশ্লেষণ

فَلَا يَكُنْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ نهى غائب معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْكَيْنُوْنَةُ মূলবর্ণ (ك . و . ن) জিনস اجوف واوى অর্থ– যেন না হয়।

لَنَقُصَّنَّ : সীগাহ جمع متكلم বহছ لام تاكيد بانون تاكيد ثقيلة در فعل مستقبل معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْقَصَصُ মূলবর্ণ (ق . ص . ص) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– আমি অবশ্যাই অবশ্যাই বর্ণনা করব।

ثَقُلَتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى معروف বাব كَرُمَ মাসদার اَلثِّقَلُ মূলবর্ণ (ث . ق . ل) জিনস صحيح অর্থ– ভারি হয়েছে।

خَفَّتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْخُفُّ মূলবর্ণ (خ . ف . ف) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– সে হালকা হবে।

مَعَايِشَ শব্দটি বহুবচন, একবচন مَعِيْشَةٌ অর্থ– জীবিকা, জীবন যাপনের সামগ্রী।

www.almodina.com

অনুবাদ	আরবি
অনুবাদ : (১২) আল্লাহ তা'আলা বললেন, তুমি যে সেজদা করলে না, কিসে তোমাকে তা হতে বিরত রাখল, যখন আমি তোমাকে আদেশ করেছি, সে বলতে লাগল, আমি তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ, আপনি আমাকে আগুন দ্বারা সৃষ্টি করেছেন, আর তাকে কাদা মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন।	قَالَ مَا مَنَعَكَ اَلَّا تَسْجُدَ اِذْ اَمَرْتُكَ ۖ قَالَ اَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ ۚ خَلَقْتَنِيْ مِنْ نَّارٍ وَّخَلَقْتَهٗ مِنْ طِيْنٍ (١٢)
(১৩) আল্লাহ বললেন, তুমি আসমান হতে নেমে যাও, তোমার অহংকার করার কোনোই অধিকার নেই আসমানে থেকে, অতএব, বের হয়ে যাও, নিশ্চয় তুমি হীনতমদের মধ্যে গণ্য হচ্ছো।	قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُوْنُ لَكَ اَنْ تَتَكَبَّرَ فِيْهَا فَاخْرُجْ اِنَّكَ مِنَ الصّٰغِرِيْنَ (١٣)
(১৪) সে বলতে লাগল, আমাকে অবকাশ প্রদান করুন, কিয়ামত দিবস পর্যন্ত।	قَالَ اَنْظِرْنِيْۤ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ (١٤)
(১৫) আল্লাহ বললেন, তোমাকে অবকাশ দেওয়া হলো।	قَالَ اِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِيْنَ (١٥)
(১৬) সে বলল, যেহেতু আপনি আমাকে গোমরাহ করলেন, আমি শপথ করছি যে, আমি তাদের [ক্ষতির] জন্য আপনার সরল পথে বসব।	قَالَ فَبِمَاۤ اَغْوَيْتَنِيْ لَاَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيْمَ (١٦)
(১৭) অতঃপর তাদের উপর আক্রমণ চালাবো, তাদের সম্মুখ হতেও এবং তাদের পশ্চাৎ দিক হতেও এবং তাদের ডান দিক হতেও এবং তাদের বাম দিক হতেও, আর আপনি তাদের অধিকাংশকে শোকরগুজার পাবেন না।	ثُمَّ لَاٰتِيَنَّهُمْ مِّنْ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ اَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَآئِلِهِمْ ۖ وَلَا تَجِدُ اَكْثَرَهُمْ شٰكِرِيْنَ (١٧)

শাব্দিক অনুবাদ

(১২) قَالَ আল্লাহ তা'আলা বললেন مَا مَنَعَكَ কিসে তোমাকে তা হতে বিরত রাখল اَلَّا تَسْجُدَ তুমি যে সেজদা করলে না اِذْ اَمَرْتُكَ যখন আমি তোমাকে আদেশ করেছি قَالَ সে বলতে লাগল اَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ আমি তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ خَلَقْتَنِيْ مِنْ نَّارٍ আপনি আমাকে আগুন দ্বারা সৃষ্টি করেছেন وَّخَلَقْتَهٗ مِنْ طِيْنٍ আর তাকে কাদা মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন।

(১৩) قَالَ আল্লাহ বললেন فَاهْبِطْ مِنْهَا তুমি আসমান হতে নেমে যাও فَمَا يَكُوْنُ لَكَ তোমার কোনোই অধিকার নেই اَنْ تَتَكَبَّرَ فِيْهَا আসমানে থেকে অহংকার করার فَاخْرُجْ অতএব, বের হয়ে যাও اِنَّكَ مِنَ الصّٰغِرِيْنَ নিশ্চয় তুমি হীনতমদের মধ্যে গণ্য হচ্ছো।

(১৪) قَالَ সে বলতে লাগল اَنْظِرْنِيْۤ আমাকে অবকাশ প্রদান করুন اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ কিয়ামত দিবস পর্যন্ত।

(১৫) قَالَ আল্লাহ বললেন اِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِيْنَ তোমাকে অবকাশ দেওয়া হলো।

(১৬) قَالَ সে বলল فَبِمَاۤ اَغْوَيْتَنِيْ যেহেতু আপনি আমাকে গোমরাহ করলেন لَاَقْعُدَنَّ لَهُمْ আমি শপথ করছি যে, আমি তাদের [ক্ষতির] জন্য বসব صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيْمَ আপনার সরল পথে।

(১৭) ثُمَّ لَاٰتِيَنَّهُمْ অতঃপর তাদের উপর আক্রমণ চালাবো مِّنْ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ তাদের সম্মুখ হতেও وَمِنْ خَلْفِهِمْ এবং তাদের পশ্চাৎ দিক হতেও وَعَنْ اَيْمَانِهِمْ এবং তাদের ডান দিক হতেও وَعَنْ شَمَآئِلِهِمْ এবং তাদের বাম দিক হতেও وَلَا تَجِدُ اَكْثَرَهُمْ شَاكِرِيْنَ আর আপনি তাদের অধিকাংশকে শোকরগুজার পাবেন না।

www.almodina.com

অনুবাদ	আয়াত
অনুবাদ : (১৮) আল্লাহ বললেন, এখান হতে বের হয়ে যাও লাঞ্ছিত ও ধিকৃত হয়ে, এদের মধ্যে যে ব্যক্তি তোমার অনুসরণ করবে, আমি অবশ্যই তোমাদের দ্বারা জাহান্নাম পূর্ণ করবো।	قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُوْمًا مَّدْحُوْرًا ۖ لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَاَمْلَـَٔنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ اَجْمَعِيْنَ (١٨)
(১৯) আর আমি আদেশ করলাম, হে আদম! তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে বাস কর, অনন্তর যে স্থান হতে ইচ্ছা উভয়ে ভক্ষণ কর, আর এই বৃক্ষটির নিকটে যেয়োনা– এরূপ না হয় যে, তোমরা ঐ লোকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়, যারা অসঙ্গত কাজ করে।	وَيٰۤاٰدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُوْنَا مِنَ الظّٰلِمِيْنَ (١٩)
(২০) অতঃপর শয়তান তাদের উভয়ের অন্তরে প্ররোচনার সঞ্চার করল যেন তাদের দেহের আবৃতাঙ্গগুলো যা পরস্পর হতে গোপন ছিল, উভয়ের সমক্ষে প্রকাশ করে দেয়, আর বলতে লাগল, তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের উভয়কে এই বৃক্ষটি হতে অন্য কোনো কারণে নিষেধ করেননি, কিন্তু শুধু এজন্য যে, তোমরা ফেরেশতা হয়ে যাবে, অথবা অনন্ত জীবনধারণকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে।	فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطٰنُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وٗرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْاٰتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهٰىكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ اِلَّاۤ اَنْ تَكُوْنَا مَلَكَيْنِ اَوْ تَكُوْنَا مِنَ الْخٰلِدِيْنَ (٢٠)
(২১) আর সে তাদের উভয়ের সম্মুখে শপথ করে বলল যে, বিশ্বাস করুন, আমি আপনাদের উভয়ের হিতকামী।	وَقَاسَمَهُمَاۤ اِنِّيْ لَكُمَا لَمِنَ النّٰصِحِيْنَ (٢١)

শাব্দিক অনুবাদ

(১৮) قَالَ আল্লাহ বললেন اخْرُجْ مِنْهَا এখান হতে বের হয়ে যাও مَذْءُوْمًا مَّدْحُوْرًا লাঞ্ছিত ও ধিকৃত হয়ে لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ এদের মধ্যে যে ব্যক্তি তোমার অনুসরণ করবে لَاَمْلَـَٔنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ اَجْمَعِيْنَ আমি অবশ্যই তোমাদের দ্বারা জাহান্নাম পূর্ণ করবো।

(১৯) وَيٰۤاٰدَمُ হে আদম! اسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ আর আমি আদেশ করলাম, তুমি ও তোমার স্ত্রী বাস কর الْجَنَّةَ জান্নাতে فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا অনন্তর যে স্থান হতে ইচ্ছা উভয়ে ভক্ষণ কর وَلَا تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ আর এই বৃক্ষটির নিকটে যেয়োনা– فَتَكُوْنَا مِنَ الظّٰلِمِيْنَ এরূপ না হয় যে, তোমরা ঐ লোকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়, যারা অসঙ্গত কাজ করে।

(২০) فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطٰنُ অতঃপর শয়তান তাদের উভয়ের অন্তরে প্ররোচনার সঞ্চার করল لِيُبْدِيَ لَهُمَا যেন তাদের দেহের আবৃতাঙ্গগুলো مَا وٗرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْاٰتِهِمَا যা পরস্পর হতে গোপন ছিল, উভয়ের সমক্ষে প্রকাশ করে দেয় وَقَالَ; আর বলতে লাগল مَا نَهٰىكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের উভয়কে এই বৃক্ষটি হতে অন্য কোনো কারণে নিষেধ করেননি اِلَّاۤ اَنْ تَكُوْنَا مَلَكَيْنِ কিন্তু শুধু এইজন্য যে, তোমরা ফেরেশতা হয়ে যাবে اَوْ تَكُوْنَا مِنَ الْخٰلِدِيْنَ অথবা অনন্ত জীবনধারণকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

(২১) وَقَاسَمَهُمَاۤ আর সে তাদের উভয়ের সম্মুখে শপথ করে বলল যে, বিশ্বাস করুন اِنِّيْ لَكُمَا لَمِنَ النّٰصِحِيْنَ আমি আপনাদের উভয়ের হিতকামী।

فَدَلّٰهُمَا بِغُرُوْرٍ ۚ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْاٰتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفٰنِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَّرَقِ الْجَنَّةِ ؕ وَنَادٰىهُمَا رَبُّهُمَآ اَلَمْ اَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَاَقُلْ لَّكُمَآ اِنَّ الشَّيْطٰنَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ (٢٢)

অনুবাদ : (২২) অনন্তর তাঁদের উভয়কে ধোঁকা দিয়ে নিচে নিয়ে আসল, তৎপর যেমনি উভয়ে বৃক্ষটির আস্বাদ গ্রহণ করল, [তৎক্ষণাৎ] উভয়ের আবৃতাঙ্গ পরস্পরের সম্মুখে প্রকাশ হয়ে পড়ল, এবং উভয়েই বেহেশতের পত্রগুলো নিজেদের উপর সংযুক্ত করতে লাগলেন, এবং তাদের রব তাদেরকে আহ্বান করে বললেন, আমি কি তোমাদের উভয়কে এই বৃক্ষ [ভক্ষণ করা] হতে নিষেধ করেছিলাম না এবং এটা কি বলেছিলাম না যে, শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য দুশমন?

শাব্দিক অনুবাদ

(২২) فَدَلّٰهُمَا بِغُرُوْرٍ অনন্তর তাঁদের উভয়কে ধোঁকা দিয়ে নিচে নিয়ে আসল فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ তৎপর যেমনি উভয়ে বৃক্ষটির আস্বাদ গ্রহণ করল بَدَتْ لَهُمَا سَوْاٰتُهُمَا [তৎক্ষণাৎ] উভয়ের আবৃতাঙ্গ পরস্পরের সম্মুখে প্রকাশ হয়ে পড়ল وَطَفِقَا يَخْصِفٰنِ এবং উভয়েই সংযুক্ত করতে লাগলেন عَلَيْهِمَا নিজেদের উপর مِنْ وَّرَقِ الْجَنَّةِ বেহেশতের পত্রগুলো وَنَادٰىهُمَا رَبُّهُمَآ এবং তাদের রব তাদেরকে আহ্বান করে বললেন اَلَمْ اَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ আমি কি তোমাদের উভয়কে এই বৃক্ষ [ভক্ষণ করা] হতে নিষেধ করেছিলাম না وَاَقُلْ لَّكُمَآ এবং এটা কি বলেছিলাম না যে اِنَّ الشَّيْطٰنَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য দুশমন?

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

এখানে উল্লিখিত হযরত আদম (আ.) ও শয়তানের এ ঘটনা সূরা বাকারার চতুর্থ রুকূ'তেও বর্ণিত হয়েছে। এ সম্পর্কিত আরও অনেক জ্ঞাতব্য বিষয়ের আলোচনা সেখানে করা হয়েছে। এখানে আরও কতিপয় জ্ঞতব্য বিষয় নিয়ে আালোচনা হচ্ছে।

কিয়ামত পর্যন্ত জীবিত থাকা সম্পর্কে ইবলীসের দোয়া কবুল হয়েছে কি না? কবুল হয়ে থাকলে দু'টি পরস্পর বিরোধী আয়াতের ভাষার সামঞ্জস্য বিধান : ইবলিস ঠিক ক্রোধ ও গজবের মুহূর্তে আল্লাহ তা'আলার কাছে একটি অভিনব প্রার্থনা করে বলেছিল। আমাকে হাশরের দিন পর্যন্ত জীবন দান করুন। আলোচ্য আয়াতে এর উত্তরে শুধু এতটুকুই বলা হয়েছে ; اِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِيْنَ অর্থাৎ তোকে অবকাশ দেওয়া হলো। দোয়া ও প্রশ্নের ইঙ্গিতে এ থেকে বুঝে নেওয়া যায় যে, এ অবকাশ হাশর পর্যন্ত সময়ের জন্যই দেওয়া হয়েছে। কারণ সে এ প্রার্থনাই করেছিল। কিন্তু এ আয়াতে স্পষ্টভাবে এ কথা বলা হয়নি যে, এখানে উল্লিখিত অবকাশ ইবলিসের আবদার অনুযায়ী হাশর পর্যন্ত দেওয়া হয়েছে, না কি অন্য কোনো মেয়াদ পর্যন্ত। কিন্তু অন্য আয়াতে এ স্থলে اِلٰى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُوْمِ শব্দাবলিও ব্যবহৃত হয়েছে। এ থেকে বাহ্যত বুঝা যায় যে, ইবলিসের প্রার্থিত অবকাশ কিয়ামত পর্যন্ত দেওয়া হয়নি; বরং একটি বিশেষ মেয়াদ পর্যন্ত দেওয়া হয়েছে, যা আল্লাহর জন্য সংরক্ষিত। অতএব সারকথা এই যে, ইবলিসের এ দোয়া কবুল হলেও আংশিক কবুল হয়ে থাকবে। অর্থাৎ কিয়ামত পর্যন্ত অবকাশ দানের পরিবর্তে একটি বিশেষ মেয়াদ পর্যন্ত অবকাশ দেওয়া হয়েছে।

মোটকথা, শয়তান ঐ সময় পর্যন্ত অবকাশ প্রার্থনা করেছিল যখন দ্বিতীয়বার শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া পর্যন্ত সব মৃতকে জীবিত করা হবে। একেই পুনরুত্থান দিবস বলা হয়। এ দোয়া হুবহু কবুল হলে যে সময় একমাত্র আল্লাহকে ছাড়া অন্য কেউ জীবিত থাকবে না এবং كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَّيَبْقٰى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلٰلِ وَالْاِكْرَامِ -এর বহিঃপ্রকাশ ঘটবে, এ দোয়ার কারণে ইবলিস

www.almodina.com

তখনও জীবিত থাকতো। এ কারণেই তার পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত অবকাশ দানের একই দোয়াকে পরিবর্তন করে প্রথমবার শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া পর্যন্ত কবুল করা হয়েছে। এর ফলে যেসময় সমগ্র বিশ্ব মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়বে, তখন ইবলিসও মৃত্যুমুখে পতিত হবে। অতঃপর সবাই যখন পুনারয় জীবিত হবে, তখন সেও জীবিত হবে।

কাফেরের দোয়াও কবুল হতে পারে কি : وَمَا دُعَاءُ الْكٰفِرِيْنَ اِلَّا فِيْ ضَلٰلٍ -এ আয়াত থেকে বাহ্যত বুঝা যায় যে, কাফেরের দোয়া কবুল হয় না; কিন্তু ইবলিসের এ ঘটনাও আলোচ্য আয়াত থেকে সুস্পষ্টভাবে উপরিউক্ত প্রশ্ন দেখা দেয় । উত্তর এই যে, দুনিয়াতে কাফেরের দোয়াও কবুল হতে পারে, ফলে ইবলিসের মতো মহা কাফেরের দোয়াও কবুল হয়ে গেছে। কিন্তু পরকালে কাফেরের দোয়া কবুল হবে না। উল্লিখিত আয়াতে وَمَا دُعَاءُ الْكٰفِرِيْنَ اِلَّا فِيْ ضَلٰلٍ পরকালের সাথে সম্পর্কযুক্ত। দুনিয়ার সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই।

আল্লাহর সামনে এমন নির্ভীকভাবে কথা বলার দুঃসাহস ইবলিসের কিরূপে হলো : রাব্বুল ইজ্জত আল্লাহর মহান দরবারে তাঁর মাহাত্ম্য ও প্রতাপের কারণে রাসূল কিংবা ফেরেশতাদেরও নিঃশ্বাস ফেলার সাধ্য ছিল না। ইবলিসের এরূপ দুঃসাহস কিরূপে হলো? আলেমগণ বলেন, এটাও আল্লাহ তা'আলার চূড়ান্ত গজবের বহিঃপ্রকাশ। আল্লাহর রহমত থেকে বিতাড়িত হওয়ার কারণে ইবলিসের সামনে একটি পর্দা অন্তরায় হয়ে যায়। এ পর্দা তার সামনে আল্লাহর তা'আলার মাহাত্ম্য ও প্রতাপকে ঢেকে দেয় এবং তার মধ্যে নির্লজ্জতা প্রবল করে দেয়। -[বয়ানুল কুরআন : সংক্ষেপিত]

মানুষের উপর শয়তানের হামলা চতুর্দিকে সীমাবদ্ধ নয়– আরও ব্যাপক : আলোচ্য আয়াতে ইবলিস আদম সন্তানদের উপর আক্রমণ করার জন্য চারটি দিক বর্ণনা করেছে অগ্র, পশ্চাৎ, ডান ও বাম। এখানে প্রকৃতপক্ষে কোনো সীমাবদ্ধতা উদ্দেশ্য নয়; বরং এর অর্থ হলো প্রত্যেক দিক ও প্রত্যেক কোণ থেকে । তাই উপর কিংবা নিচের দিক থেকে পথভ্রষ্ট করার সম্ভাবনা এর পরিপন্থি নয়। এভাবে হাদীসের এ বর্ণনাও এর পরিপন্থি নয় যে, শয়তান মানবদেহে প্রবেশ করে রক্তবাহী রগের মাধ্যমে সমগ্র দেহে হস্তক্ষেপ করে।

শব্দ বিশ্লেষণ

اِهْبِطْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْهُبُوْطُ মূলবর্ণ (ه . ب . ط) জিনস صحيح অর্থ– তুমি নেমে যাও।

اَيْمَانٌ : শব্দটি বহুবচন; একবচন يَمِيْنٌ অর্থ– ডান দিক, ডান হাত, ডান পার্শ্ব।

شَمَائِلُ : শব্দটি বহুবচন; একবচন شِمَالٌ অর্থ– বাম দিক, বাঁ দিক।

مَذْءُوْمًا : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم مفعول বাব سَمِعَ মাসদার اَلذَّمُّ اَلْمَذَمَّةُ মূলবর্ণ (ذ - م - م) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– তিরস্কৃত, লাঞ্ছিত।

مَدْحُوْرًا : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم مفعول বাব فَتَحَ মাসদার اَلدُّحُرُ মূলবর্ণ (د . ح . ر) জিনস صحيح অর্থ– অপমানিত, লাঞ্ছিত।

وُرِىَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى مجهول বাব مُفَاعَلَةٌ মাসদার اَلْمُوَارَةُ মূলবর্ণ (و . ر . ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ– যা গোপন রাখা হয়েছিল।

سَوْاٰت : শব্দটি বহুবচন; একবচন سوأة অর্থ– লজ্জাস্থান, লজ্জা।

ذَاقَا : সীগাহ تثنية مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلذَّوْقُ মূলবর্ণ (ذ . و . ق) জিনস اجوف واوى অর্থ– তারা উভয়ে স্বাদ আস্বাদন করল।

অনুবাদ : (২৩) উভয়ে বলল, হে আমাদের রব! আমরা নিজেদের বড়ই ক্ষতি করেছি, আর যদি আমাদেরকে ক্ষমা না করেন, এবং আমাদের প্রতি অনুগ্রহ না করেন, তবে অবশ্যই নেহায়েত ক্ষতি হবে।	قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَآ اَنْفُسَنَا ﷺ وَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ (٢٣)
(২৪) আল্লাহ বললেন, তোমরা নীচে যাও এমন অবস্থায় যে, তোমরা একে অপরের শত্রু থাকবে, এবং তোমাদের জন্য পৃথিবীতে বাসস্থান আছে এবং কেটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত ফল ভোগ আছে।	قَالَ اهْبِطُوْا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۚ وَلَكُمْ فِي الْاَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَّمَتَاعٌ اِلٰى حِيْنٍ (٢٤)
(২৫) [আরো] বললেন, সেখানেই তোমরা জীবন যাপন করবে এবং সেখানেই মরবে এবং তথা হতে বের করা হবে।	قَالَ فِيْهَا تَحْيَوْنَ وَفِيْهَا تَمُوْتُوْنَ وَمِنْهَا تُخْرَجُوْنَ (٢٥)
(২৬) হে বনী আদম! আমি তোমাদের জন্য পোশাক সৃষ্টি করেছি, যা তোমাদের দেহের আবৃতাঙ্গকেও আবৃত করে এবং সৌন্দর্যের উপকরণও হয়, আর পরহেজগারীর লেবাস, এটা ওটা হতে উত্তম; এটা আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত, যেন তারা স্মরণ রাখে।	يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُّوَارِيْ سَوْاٰتِكُمْ وَرِيْشًا ۚ وَلِبَاسُ التَّقْوٰى ۙ ذٰلِكَ خَيْرٌ ۚ ذٰلِكَ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ (٢٦)
(২৭) হে বনী আদম! শয়তান যেন তোমাদেরকে কোনো মন্দ কাজে লিপ্ত না করে, যেমন সে তোমাদের পিতা-মাতাকে জান্নাত হতে বহিষ্কৃত করেছিল, এমন অবস্থায় যে, তাদের পোশাকও তাদের দেহচ্যুত করিয়েছিল, যেন উভয়কেই উভয়ের আবৃতাঙ্গ দৃষ্টিগোচর হয়,	يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطٰنُ كَمَآ اَخْرَجَ اَبَوَيْكُمْ مِّنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْاٰتِهِمَا ۭ

রুকু ২

শাব্দিক অনুবাদ

(২৩) قَالَا উভয়ে বলল رَبَّنَا হে আমাদের রব! ظَلَمْنَآ اَنْفُسَنَا আমরা নিজেদের বড়ই ক্ষতি করেছি وَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا আর যদি আমাদেরকে ক্ষমা না করেন وَتَرْحَمْنَا এবং আমাদের প্রতি অনুগ্রহ না করেন لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ তবে অবশ্যই নেহায়েত ক্ষতি হবে।

(২৪) قَالَ আল্লাহ বললেন। اهْبِطُوْا তোমরা নীচে যাও بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ এমন অবস্থায় যে, তোমরা একে অপরের শত্রু থাকবে وَلَكُمْ এবং তোমাদের জন্য فِي الْاَرْضِ পৃথিবীতে مُسْتَقَرٌّ অবস্থান আছে وَّمَتَاعٌ এবং ফল ভোগ আছে اِلٰى حِيْنٍ একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত।

(২৫) قَالَ [আরো] বললেন فِيْهَا تَحْيَوْنَ সেখানেই তোমরা জীবন যাপন করবে وَفِيْهَا تَمُوْتُوْنَ এবং সেখানেই মরবে وَمِنْهَا تُخْرَجُوْنَ এবং তথা হতে বের করা হবে।

(২৬) হে বনী আদম! قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا আমি তোমাদের জন্য পোশাক সৃষ্টি করেছি يُّوَارِيْ سَوْاٰتِكُمْ যা তোমাদের দেহের আবৃতাঙ্গকেও আবৃত করে وَرِيْشًا এবং সৌন্দর্যের উপকরণও হয় وَلِبَاسُ التَّقْوٰى আর পরহেজগারীর লেবাস ذٰلِكَ خَيْرٌ এটা ওটা হতে উত্তম ذٰلِكَ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ এটা আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ যেন তারা স্মরণ রাখে।

(২৭) يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ হে বনী আদম! لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطٰنُ শয়তান যেন তোমাদেরকে কোনো মন্দ কাজে লিপ্ত না করে كَمَآ اَخْرَجَ اَبَوَيْكُمْ যেমন সে তোমাদের পিতা-মাতাকে বহিষ্কৃত করিয়েছিল مِّنَ الْجَنَّةِ জান্নাত হতে يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا এমন অবস্থায় যে, তাদের পোশাকও তাদের দেহচ্যুত করিয়েছিল لِيُرِيَهُمَا سَوْاٰتِهِمَا যেন উভয়কেই উভয়ের আবৃতাঙ্গ দৃষ্টিগোচর হয়

www.almodina.com

إِنَّهُ يَرٰىكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ ۚ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيٰطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ (٢٧)

অনুবাদ : সে এবং তার দল-বল তোমাদেরকে এমনভাবে দর্শন করে যে, তোমরা তাদেরকে দর্শন কর না, আমি শয়তানদেরকে ঐ সকল লোকের সহচর হতে দেই, যারা ঈমান আনে না।

وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللّٰهُ أَمَرَنَا بِهَا ۗ قُلْ إِنَّ اللّٰهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ ۖ أَتَقُولُونَ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (٢٨)

(২৮) আর যখন তারা কোনো নির্লজ্জতার কাজ করে, তখন বলে যে, আমরা আমাদের পিতৃ-পুরুষদেরকে এই অবস্থার উপর পেয়েছি, আর আল্লাহও আমাদেরকে তাই আদেশ করেছেন, আপনি বলে দিন, আল্লাহ নির্লজ্জতা শিক্ষা দেন না, তোমরা কি আল্লাহর প্রতি এমন অপবাদ আরোপ করছ, যার প্রমাণ তোমাদের নিকট নেই?

قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ ۖ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۚ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ (٢٩)

(২৯) বলে দিন, আমার রব আদেশ করেছেন ন্যায়বিচারের এবং তার যে, প্রত্যেক সেজদার সময় স্বীয় মুখমণ্ডল সোজা রেখ, আর আল্লাহর ইবাদত এরূপে কর, যেন ঐ ইবাদত শুধু আল্লাহরই উদ্দেশ্যে হয়, আল্লাহ তোমাদেরকে প্রথমে যেরূপে সৃষ্টি করেছেন, সেরূপেই তোমরা পুনরায় [কিয়ামত দিবসে] সৃষ্ট হবে।

فَرِيقًا هَدٰى وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلٰلَةُ ۗ إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيٰطِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ (٣٠)

(৩০) কতিপয় লোককে তো আল্লাহ হেদায়েত করেছেন এবং কতিপয়ের প্রতি [গোমরাহী] সাব্যস্ত হয়েছে, তারা শয়তানদেরকে সহচর করে নিয়েছে, আল্লাহ তা'আলাকে ছেড়ে, অথচ ধারণা রাখে যে, তারা সুপথে রয়েছে।

শাব্দিক অনুবাদ

إِنَّهُ يَرٰىكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ সে এবং তার দল-বল তোমাদেরকে এমনভাবে দর্শন করে যে مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ তোমরা তাদেরকে দর্শন কর না إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيٰطِينَ أَوْلِيَاءَ আমি শয়তানদেরকে সহচর হতে দেই لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ঐ সকল লোকের যারা ঈমান আনে না।

(২৮) وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً আর যখন তারা কোনো নির্লজ্জতার কাজ করে قَالُوا তখন বলে যে وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا আমরা আমাদের পিতৃ-পুরুষদেরকে এই অবস্থার উপর পেয়েছি وَاللّٰهُ أَمَرَنَا بِهَا আর আল্লাহও আমাদেরকে তাই আদেশ করেছেন قُلْ আপনি বলে দিন إِنَّ اللّٰهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ আল্লাহ নির্লজ্জতা শিক্ষা দেন না أَتَقُولُونَ عَلَى اللّٰهِ তোমরা কি আল্লাহর প্রতি এমন অপবাদ আরোপ করছ مَا لَا تَعْلَمُونَ যার প্রমাণ তোমাদের নিকট নেই?

(২৯) قُلْ বলে দিন أَمَرَ رَبِّي আমার রব আদেশ করেছেন بِالْقِسْطِ ন্যায়বিচারের وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ এবং এটার যে, স্বীয় মুখমণ্ডল সোজা রেখ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ প্রত্যেক সেজদার সময় وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ আর আল্লাহর ইবাদত এরূপে কর, যেন ঐ ইবাদত শুধু আল্লাহরই উদ্দেশ্যে হয় كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ আল্লাহ তোমাদেরকে প্রথমে যেরূপে সৃষ্টি করেছেন, সেরূপেই তোমরা পুনরায় [কিয়ামত দিবসে] সৃষ্ট হবে।

(৩০) فَرِيقًا هَدٰى কতিপয় লোককে তো আল্লাহ হেদায়েত করেছেন وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلٰلَةُ এবং কতিপয়ের প্রতি [গোমরাহী] সাব্যস্ত হয়েছে إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيٰطِينَ أَوْلِيَاءَ তারা শয়তানদেরকে সহচর করে নিয়েছে مِنْ دُونِ اللّٰهِ আল্লাহ তা'আলাকে ছেড়ে وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ অথচ ধারণা রাখে যে, مُهْتَدُونَ তারা সুপথে রয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(২৬) قوله يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُّوَارِيْ سَوْاٰتِكُمْ وَرِيْشًا الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত রয়েছে যে, আহলে আরব উলঙ্গ হয়ে কা'বা গৃহ তওয়াফ করত। কারণ তাদের কথা ছিল যে, আমরা যে সকল কাপড় পরিধান করে আল্লাহ তা'আলার নাফরমানি করেছি, সে কাপড়গুলো পরেই আল্লাহর পবিত্র গৃহ তওয়াফ করবনা। সুতরাং নির্লজ্জভাবে কা'বা তওয়াফ করা এবং পোষাকের তাৎপর্যতা বর্ণনা করার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়েছে। –[রূহুল মা'আনী]

(২৮) قوله وَاِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً قَالُوْا وَجَدْنَا عَلَيْهَآ اٰبَآءَنَا وَاللّٰهُ اَمَرَنَا بِهَا الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** ইসলামের পূর্বে জাহিলিয়া যুগে শয়তান মানুষকে যেসব লজ্জাজনক ও অর্থহীন কুপ্রথায় লিপ্ত করেছিল, তন্মধ্যে একটি ছিল এই যে, কুরাইশদের ছাড়া কোনো ব্যক্তি নিজ বস্ত্র পরিহিত অবস্থায় কা'বা শরীফ তওয়াফ করতে পারত না। তাকে হয় কোনো কুরাইশির নিকট হতে কাপড় ধার করতে হতো , না হয় উলঙ্গ অবস্থায় তওয়াফ করতে হতো। এটা জানা কথা যে, আরবের সব মানুষকে বস্ত্র দেওয়া কুরাইশদের পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। তাই পুরুষ মহিলা অধিকাংশ লোক উলঙ্গ অবস্থায় তওয়াফ করত। মহিলারা সাধারণত রাতের অন্ধকারে তওয়াফ করতো। তারা এই শয়তানি কাজের কারণ এ বর্ণনা করতো যে, যেসব পোশাক পরে আমরা পাপ কাজ করি, সেগুলো পরিধান করে আল্লাহ তা'আলার ঘর প্রদক্ষিণ করা বেআদবি। এ জ্ঞান পাপীরা এ কথা বুঝত না যে, উলঙ্গ হয়ে তওয়াফ করা আরো বেশি বেআদবি কাজ। হেরেম শরীফের সেবক হওয়ার সুবাদে কুরাইশ গোত্র এ উলঙ্গতা আইনের ব্যতিক্রম ছিল। আলোচ্য আয়াত এ নির্লজ্জ প্রথা ও তার অনিষ্ট বর্ণনা করার জন্য অবতীর্ণ হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, তারা যখন কোনো অশ্লীল কাজ করতো তখন কেউ নিষেধ করলে তারা উত্তরে বলতো, আমাদের বাপ দাদা ও মুরব্বিরা তাই করে এসেছেন। তাদের তরিকা ত্যাগ করা লজ্জার কথা। তারা আরো বলতো, আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে এ নির্দেশ দিয়েছেন।

আদম (আ.) ও ইবলিসের যে ঘটনা আলোচ্য আায়াতসমূহে বর্ণিত হয়েছে, হুবহু এ ঘটনাই সূরা বাকারার চতুর্থ রুকূ'তে বিশদ বর্ণনাসহ উল্লিখিত হয়েছে। এ সম্পর্কে সম্ভাব্য সব প্রশ্ন ও সন্দেহের বিস্তারিত উত্তর পূর্ণ ব্যাখ্যা ও জ্ঞাতব্য বিষয়াদিসহ সূরা বাকারার তাফসীরে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। প্রয়োজন হলে সেখানে দেখে নেওয়া যেতে পারে।

ইতঃপূর্বে পূর্ণ এক রুকূ'তে হযরত আদম (আ.) ও অভিশপ্ত শয়তানের ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছিল। এতে শয়তানি প্ররোচনার প্রথম পরিণতিতে হযরত আদম ও হাওয়া (আ.)-এর জান্নাতি পোশাক খুলে গিয়েছিল এবং তাঁরা উলঙ্গ হয়ে পড়েছিলেন। ফলে তাঁরা বৃক্ষপত্র দ্বারা গুপ্তাঙ্গ ঢাকতে শুরু করেছিলেন।

২৬নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা সমস্ত আদম সন্তানকে সম্বোধন করে বলেছেন– তোমাদের পোশাক আল্লাহ তা'আলার একটি মহান নিয়ামত। একে যথার্থ মূল্য দাও। এখানে মুসলমানদেরকে সম্বোধন করা হয়নি সমস্ত বনী আদমকে করা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, গুপ্তাঙ্গ আচ্ছাদন ও পোশাক মানব জাতির একটি সহজাত প্রবৃত্তি ও প্রয়োজন। জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সবাই এ নিয়ম পালন করে। অতঃপর এর বিশদ বিবরণে তিন প্রকার পোশাকের উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রথম, لِبَاسًا يُّوَارِيْ سَوْاٰتِكُمْ وَرِيْشًا -এখানে يُوَارِيْ শব্দটি مُوَارَاةٌ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ আবৃত করা। سَوْاٰتٌ শব্দটি سَوْءَةٌ -এর বহুবচন। এর অর্থ মানুষের ঐসব অঙ্গ, যেগুলো খোলা রাখাকে মানুষ স্বভাবতই খারাপ ও লজ্জাকর মনে করে উদ্দেশ্য এই যে, আমি তোমাদের মঙ্গলার্থে এমন একটি পোশাক সৃষ্টি করেছি, যা দ্বারা তোমরা গুপ্তাঙ্গ আবৃত করতে পার।

এরপর বলা হয়েছে : وَرِيْشًا সাজ-সজ্জার জন্য মানুষ যে পোশাক পরিধান করে, তাকে رِيْش বলা হয়। অর্থ এই যে, গুপ্তাঙ্গ আবৃত করার জন্য তো সংক্ষিপ্ত পোশাকই যথেষ্ট হয়; কিন্তু আমি তোমাদেরকে আরও পোশাক দিয়েছি, যাতে তোমরা তা দ্বারা সাজ সজ্জা করে বাহ্যিক দেহাবয়বকে সুশোভিত করেত পার।

পোশাকের দ্বিবিধ উপকারিতা ; আয়াতে পোশাকের দু'টি উপকারিতা বর্ণিত হয়েছে। (এক) গুপ্তাঙ্গ আচ্ছাদিত করা এবং (দুই) শীত গ্রীষ্ম থেকে আত্মরক্ষা এবং অঙ্গ সজ্জা। এথম উপকারিতাটি অগ্রে বর্ণনা করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, গুপ্তাঙ্গ আবৃত করা পোশাকের আসল লক্ষ্য। এটাই সাধারণ জন্তু জানোয়ার থেকে মানুষের স্বাতন্ত্র্য। জন্তু জানোয়ারের পোশাক

সৃষ্টিগতভাবে তাদের দেহের অঙ্গ। এ পোশাকের কাজ শুধু শীত গ্রীষ্ম থেকে আত্মরক্ষা নয় অঙ্গ সজ্জাও বটে। গুপ্তাঙ্গ আচ্ছাদনেও এর তেমন কোনো ভূমিকা নেই। তবে তাদের দেহে গুপ্তাঙ্গ এমনভাবে স্থাপিত হয়েছে, যাতে সম্পূর্ণ খোলা না থাকে। কোথাও লেজ দ্বারা আবৃত করা হয়েছে এবং কোথাও অন্যভাবে।

আদম, হাওয়া এবং তাঁদের সাথে শয়তানি প্ররোচনায় ঘটনা বর্ণনা করার পর পোশাকের কথা উল্লেখ করায় এদিকে ইঙ্গিত রয়েছে যে, উলঙ্গ হওয়া এবং গুপ্তাঙ্গ অপরের সামনে খোলা চূড়ান্ত হীনতা ও নির্লজ্জতার লক্ষণ এবং নানা প্রকার অনিষ্টের ভূমিকা বিশেষ।

মানুষের উপর শয়তানের প্রথম হামলা : মানুষের বিরুদ্ধে শয়তানের সর্বপ্রথম আক্রামণের ফলে তার পোশাক খসে পড়েছিল। আজও শয়তান তার শিষ্যবর্গের মাধ্যমে মানুষকে পথভ্রষ্ট করার ইচ্ছায় সভ্যতার নামে সর্বপ্রথম তাকে উলঙ্গ বা বা অর্ধ উলঙ্গ করে পথে নামিয়ে দেয়। শয়তানের তথাকথিত প্রগতি নারীকে লজ্জা শরম থেকে বঞ্চিত করে সাধারণ্যে অর্ধ উলঙ্গ অবস্থায় নিয়ে আসা ছাড়া অর্জিতই হয় না।

ঈমানের পর সর্বপ্রথম ফরজ গুপ্তাঙ্গ আবৃত করা : শয়তান মানুষের এ দুর্বলতা আঁচ করে সর্বপ্রথম হামলা গুপ্তাঙ্গ আচ্ছাদনের উপর করেছে। তাই মানুষের সর্বপ্রকার মঙ্গল বিধানকারী শরিয়ত গুপ্তাঙ্গ আচ্ছাদনের প্রতি এতটুকু গুরুত্ব আরোপ করেছে যে, ঈমানের পর সর্বপ্রথম ফরজ গুপ্তাঙ্গ আবৃত করাকেই স্থির করেছে। নামাজ, রোজা ইত্যাদি সবই এরপর।

হযরত ফারুকে আযম (র.) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ; নুতুন পোশাক পরিধান করার সময় আগে দোয়া পাঠ করা উচিত : দোয়াটি হলো– اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ كَسَانِىْ مَا اُوَارِىْ بِهٖ عَوْرَتِىْ وَاَتَجَمَّلُ بِهٖ فِىْ حَيَاتِىْ অর্থাৎ "সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর যিনি আমাকে পোশাক দিয়েছেন। এ পোশাক দ্বারা আমি গুপ্ত অঙ্গ আবৃত করি এবং সাজ সজ্জা করি।"

নতুন পোশাক তৈরির সময় পুরাতন পোশাক দান করে দেওয়ার ছওয়াব : তিনি আরও বলেন : যে ব্যক্তি নতুন পোশাক পরার পর পুরাতন পোশাক ফকির-মিসকিনকে দান করে দেয়, সে জীবনে ও মরণে সর্বাবস্থায় আল্লাহর আশ্রয়ে চলে আসে। –[ইবনে কাছীর]

এ হাদীসেও মানুষকে পোশাক পরিধানের সময় ঐ দু'টি উপকারিতাই স্মরণ করানো হয়েছে, যার জন্য আল্লাহ তা'আলা পোশাক সৃষ্টি করেছেন।

পোশাকের তৃতীয় প্রকার : গুপ্ত অঙ্গ আবৃতকরণ এবং আরাম ও সাজ সজ্জার জন্য দু'প্রকার পোশাক বর্ণনা করার পর কুরআন পাক তৃতীয় এক প্রকার পোশাকের কথা উল্লেখ করে বলেছে : وَلِبَاسُ التَّقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌ কোনো কোনো কেরাতে যবর দিয়ে لِبَاسَ التَّقْوٰى পড়া হয়েছে। এমতাবস্থায় اَنْزَلْنَا -এর مفعول হয়ে অর্থ হবে এই যে, আমি একটি তৃতীয় পোশাক অর্থাৎ তাকওয়ার পোশাক অবতীর্ণ করেছি। প্রসিদ্ধ কেরাত অনুযায়ী অর্থ এই যে, এ দু'প্রকার পোশাক তো সবাই জানে। তৃতীয় একটি পোশাক হচ্ছে তাকওয়ার পোশাক। এটি সর্বোত্তম পোশাক। হযরত ইবনে আব্বাস ও ওরওয়া ইবনে যুবায়ের (রা.)-এর তফসীর অনুযায়ী তাকওয়ার পোশাক বলে সৎকর্ম ও আল্লাহভীতিকে বুঝানো হয়েছে। –[রূহুল মা'আনী]

উদ্দেশ্য এই যে, বাহ্যিক পোশাক যেমন মানুষের গুপ্ত অঙ্গের জন্য আবরণ এবং শীত গ্রীষ্ম থেকে আত্মরক্ষা ও সাজ সজ্জার উপায় হয়, তেমনি সৎকর্ম ও আল্লাহ ভীরুতারও একটি অন্তরগত পোশাক রয়েছে। এটি মানুষের চারিত্রিক দোষ ও দুর্বলতার আবরণ এবং স্থায়ী কষ্ট ও বিপদাপদ থেকে মুক্তি লাভের উপায়। এ কারণেই এটি সর্বোত্তম পোশাক।

বাহ্যিক পোশাকেরও আসল উদ্দেশ্য তাকওয়া অর্জন করা : وَلِبَاسُ التَّقْوٰى শব্দ থেকে এদিকেও ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, বাহ্যিক পোশাক দ্বারা গুপ্ত অঙ্গ আবৃত করা ও সাজ সজ্জা করার আসল উদ্দেশ্য তাকওয়া ও আল্লাহভীতি। এ আল্লাহভীতি পোশাকের মধ্যেও এভাবে প্রকাশ পাওয়া উচিত যেন গুপ্তাঙ্গ সমূহ পুরোপুরি আবৃত হয়। পোশাক শরীরে এমন আঁটসাটও না হওয়া চাই, যাতে এসব অঙ্গ উলঙ্গের মতো দৃষ্টিগোচর হয়। পোশাকে অহঙ্কারেরও গার্বের ভঙ্গিও না থাকা চাই; বরং নম্রতার চিহ্ন পরিদৃষ্ট হওয়া চাই। প্রয়োজনাতিরিক্ত অপব্যয় না হওয়া চাই, মহিলাদের জন্য পুরুষদের এবং পুরুষদের জন্য মহিলাদের পোশাক না হওয়া চাই, যা আল্লাহ তা'আলার অপছন্দনীয়। অধিকন্তু পোশাক বিজাতির অনুকরণও না হওয়া চাই, যা স্বাজাতির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার পরিচায়ক।

www.almodina.com

এতদসঙ্গে পোশাকের আসল উদ্দেশ্য চরিত্র ও কর্মের সংশোধনও হওয়া চাই আয়াতের শেষে বলা হয়েছে : ذٰلِكَ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ অর্থাৎ মানুষকে এ তিন প্রকার পেশাক দান করা আল্লাহ তা'আলার শক্তির নিদর্শনসমূহের অন্যতম- যাতে মানুষ এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে।

দ্বিতীয় আয়াতে পুনরায় সব মানব সন্তানকে সম্বোধন করে হুঁশিয়ার করা হয়েছে যে, প্রত্যেক কাজে শয়তান থেকে বেঁচে থাক। সে যেন আবার তোমাদেরকে ফ্যাসাদে ফেলে না দেয়, যেমন তোমাদের পিতা-মাতা আদম ও হাওয়াকে জান্নাত থেকে বের করিয়েছে এবং তাদের পাশাক খুলে উলঙ্গ করার কারণ হয়েছে। সে তোমাদের পুরাতন শত্রু। সর্বদা তার শত্রুতার প্রতি লক্ষ্য রাখ।

ইসলামের পূর্বে জাহেলিয়াত যুগে শয়তান মানুষকে যেসব লজ্জাজনক ও অর্থহীন কুপ্রথায় লিপ্ত করেছিল, তন্মধ্যে একটি ছিল এই যে, কুরাইশদের ছাড়া কোনো ব্যক্তি নিজ বস্ত্র পরিহিত অবস্থায় কা'বা গৃহের তওয়াফ করতে পারত না। তাকে হয় কোনো কুরাইশির কাছ থেকে বস্ত্র ধার করতে হতো , না হয় উলঙ্গ অবস্থায় তওয়াফ করতে হতো।

এটা জানা কথা যে, আরবের সব মানুষকে বস্ত্র দেওয়া কুরাইশদের পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। তাই পুরুষ মহিলা অধিকাংশ লোক উলঙ্গ অবস্থায় তওয়াফ করত। মহিলারা সাধারণত ; রাতের অন্ধাকারে তওয়াফ করত। তারা এ শয়তানি কাজের কারণ এই বর্ণনা করত যে, যেসব পোশাক পরে আমরা পাপ কাজ করি , সেগুলো পরিধান করে আল্লাহর ঘর প্রদক্ষিণ করা বেআদবি ।(এ জ্ঞানপাপীরা এ বিষয়টি বুঝত না যে, উলঙ্গ হয়ে তওয়াফ করা আরও বেশি বেআদবির কাজ। হেরেমের সেবক হওয়ার সুবাদে শুধু কুরাইশ গোত্র এ উলঙ্গতা আইনের ব্যতিক্রম ছিল)।

আলোচ্য ২৮ নং আয়াত এ নির্লজ্জ প্রথা ও তার অনিষ্ট বর্ণনা করার জন্য অবতীর্ণ হয়েছে। এতে বলা হয়েছে : তারা যখন কোনো অশ্লীল কাজ করত, তখন কেউ নিষেধ করলে তারা উত্তরে বলত; আমাদের বাপ দাদা ও মুরুব্বিরা তাই করে এসেছেন। তাদের তরিকা ত্যাগ করা লজ্জার কথা। তারা আরও বলত আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে এ নির্দেশই দিয়েছেন।

অধিকাংশ তাফসীরবিদের মতে আয়াতে অশ্লীল কাজ বলে উলঙ্গ অবস্থায় তওয়াফকেই বুঝানো হয়েছে। فَحْشَاءُ ও فَاحِشَةٌ ও فُحْشٌ এমন প্রত্যেক মন্দ কাজকে বলা হয়, যা চুড়ান্ত পর্যায়ের মন্দ এবং যুক্তি বুদ্ধি ও সুস্থ বিবেকের কাছে পূর্ণমাত্রায় সুস্পষ্ট। –[মাযহারী]

এ স্তরে ভালো ও মন্দের যুক্তিগত ব্যাপার হওয়া সবার কাছে স্বীকৃত। –[রূহুল মা'আনী]

তারা এ বাজে প্রথার বৈধতা পতিপন্ন করার জন্য দু'টি প্রমাণ উপস্থিত করেছে। **এক.** বাপ দাদার অনসুসরণ, অর্থাৎ বাপ দাদার তরিকা কায়েম রাখার মধ্যেই মঙ্গল নিহিত। এর উত্তর দিবালোকের মতো সুস্পষ্ট। মূর্খ বাপদাদার অনুসরণ করার মধ্যে কোনো যৌক্তিকতা নেই। সামান্য জ্ঞান ও চেতনাসম্পন্ন ব্যক্তিও একথা বুঝতে পারে যে, কোনো তরিকার বিশুদ্ধতার জন্য যথেষ্ট হয়, তবে দুনিয়াতে বিভিন্নর লোকের বাপ দাদার বিভিন্ন ও পরস্পর বিরোধী তরিকা ছিল। এ যুক্তির ফলে জগতের সব ভ্রান্ত তরিকাও বৈধ ও বিশুদ্ধ প্রমাণিত হয়ে যায়। মোটকথা, মূর্খদের এ প্রমাণ ভ্রুক্ষেপযোগ্য ছিল না বলেই কুরআনে কারীম এখানে উত্তর দেওয়া জরুরি মনে করেনি। তবে অন্যান্য আয়াতে এরও উত্তর দিয়ে বলা হয়েছে যে, বাপদাদার কোনো মূর্খতামসুলভ কাজ করলেও কি তা অনুসরণযোগ্য হতে পারে?

উলঙ্গ অবস্থায় তওয়াফ করার বৈধতার প্রশ্নে তাদের দ্বিতীয় প্রমাণ এই যে, আল্লাহ তা'আলাই আমাদেরকে এ নির্দেশ দিয়েছেন। এটা সর্বৈব মিথ্যা এবং আল্লাহ তা'আলার প্রতি ভ্রান্তি আরোপ। এর উত্তরে রাসূলুল্লাহ ﷺ–কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে : قُلْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَاْمُرُ بِالْفَحْشَاۤءِ অর্থাৎ আপনি বলে দিন : আল্লাহ তা'আলা কখনও অশ্লীল কাজের নির্দেশ দেন না। কেননা এরূপ নির্দেশ দেওয়া খোদায়ী প্রজ্ঞা ও শানের পরিপন্থি। অতঃপর তাদের এ মিথ্যা অপবাদ ও ভ্রান্ত ধারণা পূর্ণরূপে প্রকাশ করার জন্য তাদেরকে হুশিয়ার করে বলা হয়েছে : اَتَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ অর্থাৎ তোমরা কি আল্লাহর প্রতি এমন বিষয় আরোপ কর, যার জ্ঞান তোমাদের কাছে নেই? জানা কথা যে, না জেনে না শুনে কোনো ব্যক্তির প্রতি কোনো কিছুর সম্বন্ধ করে দেওয়া চরম ধৃষ্টতা ও আন্যায়। অতএব, আল্লাহর প্রতি এমন ভ্রান্ত সম্বন্ধ করা কত বড় অপরাধ ও অন্যায় হবে! মুজতাহিদগণ কুরআনের আয়াত থেকে ইজতিহাদের মাধ্যমে যে সব বিধান উদ্ভাবন করেন, সেগুলো এর অন্তর্ভুক্ত নয়। কেননা তাঁরা প্রমাণের ভিত্তিতেই এসব বিধান উদ্ভাবন করেন।

www.almodina.com

২৯ নং আয়াতে বরা হয়েছে : قُلْ اَمَرَ رَبِّيْ بِالْقِسْطِ অর্থাৎ যেসব মূর্খ উলঙ্গ তওয়াফ বৈধ করার ভ্রান্ত সম্বন্ধ আল্লাহর দিকে করে, আপনি তাদের বলে দিন: আল্লাহ তা'আলা সর্বদা قِسْط -এর নির্দেশ দেন। قِسْط -এর আসল অর্থ ন্যায়বিচার ও সমতা। এখানে ঐ কাজকে বুঝানো হয়েছে, যাতে কোনোরূপ ক্রটিও নেই এবং নির্দিষ্ট সীমালঙ্ঘনও নেই। অর্থাৎ স্বল্পতা ও বাহুল্য থেকে মুক্ত। শরিয়তের সব বিধি বিধানের অবস্থা তাই। এজন্য قِسْط শব্দের অর্থে যাবতীয় ইবাদত, আনুগত্য ও শরিয়তের সাধারণ বিধি বিধান অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। –[রূহুল মা'আনী]

এ আয়াতে ন্যায়বিচার ও সমতার নির্দেশ বর্ণনা করার পর তাদের পথভ্রষ্টতার উপযোগী দুটি বিধান বিশেষভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এক. وَاَقِيْمُوْا وُجُوْهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ এবং দুই. وَادْعُوْهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ প্রথম বিধানটি মানুষের বাহ্যিক কাজ কর্মের সাথে সম্পর্কযুক্ত। অধিকাংশ তাফসীরবিদের মতে প্রথম বিধানে مَسْجِد শব্দটি সেজদা ও ইবাদতের অর্থে বর্ণিত হয়েছে। অর্থ এই যে, প্রত্যেক ইবাদত ও নামাজের সময় স্বীয় মুখমণ্ডল সোজা রাখা। এর এক উদ্দেশ্য এই হতে পারে যে, নামাজের সময় মুখমণ্ডল সোজা কেবলার দিকে রাখতে যত্নবান হও এবং দ্বিতীয় উদ্দেশ্য এও হতে পারে যে, প্রত্যেক কথায়, কাজে এবং কর্মে স্বীয় আননকে প্রতিপালকের নির্দেশের অনুসারী রাখ এবং সতর্ক থাক যে, এদিক সেদিক যেন না হয়। এ অর্থের দিক দিয়ে এ বিধানটি বিশেষভাবে নামাজের জন্য হবে না; বরং যাবতীয় ইবাদত ও লেনদেনকেও পরিব্যাপ্ত করবে। দ্বিতীয় বিধানে অর্থ এই যে, আল্লাহ তা'আলাকে এমনভাবে ডাক, যেন ইবাদত খাঁটিভাবে তাঁরই হয়; এতে যেন অন্য কারও অংশীদারিত্ব না থাকে, এমন কি, গোপন শিরক অর্থাৎ লোক দেখানো ও নাম যশের উদ্দেশ্য থেকেও পবিত্র হওয়া চাই।

এ বিধান দু'টি পাশাপাশি উল্লেখ করার মধ্যে এদিকেও ইঙ্গিত থাকতে পারে যে, বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ উভয় অবস্থাকে শরিয়তের বিধান অনুযায়ী সংশোধন করা অবশ্য কর্তব্য। আন্তরিকতা ব্যতীত শুধু বাহ্যিক শরিয়ত অনুযায়ী সংশোধন করা এবং অন্তরকেও আল্লাহর জন্য খাঁটি রাখা একান্ত জরুরি। এতে তাদের ভ্রান্তি ফুটে উঠেছে, যারা শরিয়ত ও তরীকতকে ভিন্ন ভিন্ন পন্থা মনে করে। তাদের ধারণা এই যে, তরীকত অনুযায়ী অন্তর সংশোধন করে নেওয়াই যথেষ্ট, তাতে শরিয়তের বিরুদ্ধাচরণ হলেও কোনো দোষ নেই। বলাবহুল্য এটা সুস্পষ্ট পথভ্রষ্টতা।

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে ; كَمَا بَدَاَكُمْ تَعُوْدُوْنَ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যেভাবে তোমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলেন, তেমনিভাবে কিয়ামতের দিন পুনর্বার তোমাদেরকে সৃষ্টি করে দণ্ডায়মান করবেন। তাঁর অসীম শক্তির পক্ষে এটা কোনো কঠিন কাজ নয়; বরং খুব সহজ। সম্ভবত; এ সহজ হওয়ার দিকে ইঙ্গিত করার জন্য يُعِيْدُكُمْ -এর পরিবর্তে تَعُوْدُوْنَ বলেছেন। অর্থাৎ পুনর্বার সৃষ্টি করার জন্য বিশষ কোনো কর্মতৎপরতার প্রচেষ্টার প্রয়োজন নেই। –[রূহুল মা'আনী]

এ বাক্যটি এখান আনার আরও একটি উপকারিতা এই যে, এর ফলে শরিয়তের বিধানাবলিতে পূর্ণরূপে কায়েম থাকা মানুষের জন্য সহজ হয়ে যাবে। কেননা পরকাল ও কিয়ামত এবং তথায় ভালোমন্দ কর্মের প্রতিদান ও শাস্তির কল্পনাই মানুষের জন্য প্রত্যেক কঠিনকে সহজ এবং কষ্টকে সুখে রূপান্তরিত করতে পারে। অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দেয় যে মানুষের মধ্যে এ ভীতি জাগ্রত না হওয়া পর্যন্ত কোনো ওয়াজ ও উপদেশ তাকে সোজা করতে পারে না এবং কোনো আইনেও তাকে আপরাধ থেকে ফিরিয়ে রাখতে পারে না।

৩০ নং আয়াতে বলা হয়েছে : একদল লোককে তো আল্লাহ তা'আলা হেদায়েত দান করেছেন এবং একদলের জন্য পথভ্রষ্টতা অবধারিত হয়ে গেছে। কেননা তারা আল্লাহকে ছেড়ে শয়তানদেরকে সহচর করেছে, অথচ তাদের ধারণা এই যে, তারা সঠিক পথে রয়েছে।

উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহর হেদায়েত যদিও সবার জন্য ছিল কিন্তু তারা এ থেকে মুখ ফিরিয়ে শয়তানদের অনুসরণ করেছে এবং জুলুমের উপর জুলুম এই হয়েছে যে, তারা স্বীয় অসুস্থ অবস্থাকেই সুস্থতা এবং পথভ্রষ্টতাকেই হেদায়েত মনে করে নিয়েছে।

এ আয়াত থেকে জানা গেল যে, শরিয়তের বিধি বিধান সম্পর্কে মূর্খতা ও অজ্ঞতা কোনো ওজর নয়। যদি কেউ ভ্রান্ত পথকে বিশুদ্ধ মনে করে পূর্ণ আন্তরিকতা সহকারে তা অবলম্বন করে তবে সে আল্লাহর কাছে ক্ষমাযোগ্য নয়। কেননা

www.almodina.com

আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেককে চেতনা, ইন্দ্রিয় এবং জ্ঞান ও বুদ্ধি এ জন্যই দিয়েছেন, যাতে সে তা দ্বারা আসল ও মেকী এবং অশুদ্ধ ও শুদ্ধকে চিনে নেয়। অতঃপর তাকে এ জ্ঞানবুদ্ধির উপরই ছেড়ে দেননি, পয়গম্বর প্রেরণ করেছেন এবং গ্রন্থ নাজিল করেছেন। এসবের মাধ্যমে শুদ্ধ ও ভ্রান্ত এবং সত্য ও মিথ্যাকে পুরোপুরিভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। যদি কারও মনে সন্দেহ লাগে যে, যে ব্যক্তি বাস্তবে নিজেকে সত্য মনে করে যদিও সে ভ্রান্ত হয়, তাতে তার দোষ কি? সে ক্ষমার্হ হওয়া উচিত। কারণ সে নিজের ভ্রান্তি সম্পর্কে জ্ঞাতই ছিল না। উত্তর এই যে, আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক মানুষকে জ্ঞান, বিবেচনা অতঃপর পয়গম্বরগণের মাধ্যমে শিক্ষা দান করেছেন। এগুলোর মাধ্যমে কমপক্ষে তার অবলম্বিত পথের বিপরীতটির সম্ভাবনা ও সন্দেহ অবশ্যই হওয়া উচিত। এখন তার দোষ এই যে, সে এসব সম্ভাবনা ও সন্দেহের প্রতি ভ্রুক্ষেপই করেনি এবং যে ভ্রান্ত পথ অবলম্বন করেছে তাতেই অটল রয়েছে।

অবশ্য যে ব্যক্তি সত্যান্বেষণে যথাসাধ্য চেষ্টা করা সত্ত্বেও বিশুদ্ধ পথ ও সত্যের সন্ধান লাভে ব্যর্থ হয়, আল্লাহ তা'আলার কাছে তার ক্ষমার্হ হওয়ার সম্ভাবনা আছে। ইমাম গাযালী (র.) 'আত্তাফরিকাতু বাইনাল ইসলামি ওয়াযযিনদিকাহ' গ্রন্থে একথা বর্ণনা করেছেন।

৩১ নং আয়াতে বলা হয়েছে : হে আদম সন্তানেরা! তোমরা মসজিদে প্রত্যেক উপস্থিতির সময় স্বীয় পোশাক পরিধান করে নাও এবং তৃপ্তির সাথে খাও ও পান কর সীমালজ্ঘন করো না। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা সীমালজ্ঘনকারীদেরকে পছন্দ করেন না। জাহেলিয়াতের যুগে আরবরা উলঙ্গ অবস্থায় কা'বা গৃহের তওয়াফকে যেমন বিশুদ্ধ ইবাদত এবং কা'বা গৃহের প্রতি সম্মান প্রদর্শন মনে করত, তেমনি তারা হজের দিনগুলোতে পানাহার ত্যাগ করত। এতটুকু পানাহার করত যাতে শ্বাস প্রশ্বাস চালু থাকতে পারে। বিশেষত ঘি, দুধ ও অন্যান্য সুস্বাদু খাদ্য সম্পূর্ণরূপে বর্জন করত। –[ইবনে জরীর]

তাদের এ অর্থহীন আচার অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। এতে বলা হয়েছে যে, উলঙ্গ হয়ে তওয়াফ করা নির্লজ্জতা ও বেআদবী বিধায় বর্জনীয়। এমনিভাবে আল্লাহ প্রদত্ত সুস্বাদু খাদ্য অহেতুক বর্জন করাও কোনো ধর্মকাজ নয়; বরং তাঁর হালালকৃত বস্তুসমূহকে হারাম করে নেওয়া ধৃষ্টতা এবং ইবাদতে সীমালজ্ঘন। আল্লাহ তা'আলা একে পছন্দ করেন না। তাই হজের দিনগুলোকে তৃপ্তির সাথে খাও, পান কর, তবে অপব্যয় করো না। হালাল খাদ্যসমূহ সম্পূর্ণরূপে বর্জন করাও অপব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত। যেমন, হজের আসল লক্ষ্য এবং আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল হয়ে পানাহার মশগুল থাকাও অপব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত।

এ আয়াতটি যদিও জাহিলিয়াত যুগের আরবদের একটি কুপ্রথা উলঙ্গতাকে মিটানো জন্য অবতীর্ণ হয়েছে, যা তারা তওয়াফের সময় আল্লাহর গৃহের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের নামে করত, কিন্তু তাফসীরবিদ ও ফিকহবিদগণ এ বিষয়ে একমত যে, কোনো বিশেষ ঘটনায় কোনো নির্দেশ অবতীর্ণ হওয়ার অর্থ এরূপ নয় যে, নির্দেশটি এ ঘটনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে; বরং ভাষার ব্যাপকতা দেখতে হবে। যে যে বিষয় ভাষার ব্যাপকতার আওতায় পড়ে, সবগুলোর ক্ষেত্রে সে নির্দেশ প্রযোজ্য হবে।

নামাজে গুপ্ত অঙ্গ আবৃত করা ফরজ : তাই সাহাবী, তাবেয়ী ও মুজতাহিদ ইমামগণ এ আয়াত থেকে বেশ কয়েকটি বিধান উদ্ভাবন করেছেন। প্রথম উলঙ্গ অবস্থায় তওয়াফ করা যেমন নিষিদ্ধ হয়েছে, তেমনি উলঙ্গ অবস্থায় নামাজ পড়াও হারাম ও বাতিল। কারণ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: اَلطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلٰوةٌ (বায়তুল্লাহর তওয়াফও এক প্রকার নামাজ) এছাড়া স্বয়ং এ আয়াতেই তাফসীরবিদগণের মতে যখন مَسْجِدٌ বলে সেজদা বুঝানো হয়েছে, তখন সেজদা অবস্থায় উলঙ্গতার নিষেধাজ্ঞা আয়াতে স্পষ্টভাবেই বর্ণিত হয়ে যায়। সেজদা যখন নিষিদ্ধ হলো, তখন নামাজের যাবতীয় ক্রিয়াকর্মেও অপরিহার্যরূপে নিষিদ্ধ হবে।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ–এর উক্তি বিষয়টিকে আরও ফুটিয়ে তুলেছে। এক হাদীসে তিনি বলেন : চাদর পরিধান ব্যতীত কোনো প্রাপ্তবয়স্কা মহিলার নামাজ জায়েজ নয়। –[তিরমিযী]

নামাজ ছাড়া অন্যান্য অবস্থায়ও গুপ্ত অঙ্গ আবৃত করা যে ফরজ তা অন্যান্য আয়াত ও রেওয়ায়েত দ্বারা প্রমাণিত আছে। তন্মধ্যে এ সূরারই একটি আয়াত পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে : يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُّوَارِيْ سَوْاٰتِكُمْ وَرِيْشًا অর্থাৎ হে আদম

সন্তানগণ! আমি অবশ্যই তোমাদের জন্য পোশাক অবতীর্ণ করেছি যাতে তোমরা আবরু ঢাকতে পার। মোটকথা, এই যে, গুপ্তাঙ্গ আবৃত করা মানুষের জন্য প্রথম মানবিক ও ইসলামি ফরজ। এটা সর্বাবস্থায় অপরিহার্য। নামাজ ও তওয়াফে আরও উত্তমরূপে ফরজ।

শব্দ বিশ্লেষণ

يُوَارِيْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব مُفَاعَلَةٌ মাসদার اَلْمُوَارَاةُ মূলবর্ণ (و . ر. ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ– সে আবৃত করছে, সে ঢাকছে।

سَوْاٰتٌ : শব্দটি বহুবচন; একবচন سَوْاَةٌ অর্থ– লজ্জা। লজ্জাস্থান।

رِيْشًا : শব্দটি বহুবচন; একবচন رِيْشَةٌ অর্থ– সাজ-সজ্জার বস্ত্র, সৌন্দর্যের উপকরণ।

يَذَّكَّرُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفَّعُّلٌ মাসদার اَلْاِذَّكُّرُ মূলবর্ণ (ذ . ك . ر) জিনস صحيح অর্থ– তারা উপদেশ গ্রহণ করে।

لَا يَفْتِنَنَّ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ نهى غائب معروف بانون ثقيلة বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْفِتَنُ মূলবর্ণ (ف . ت . ن) জিনস صحيح অর্থ– যেন সে বিভ্রান্ত না করে।

لِبَاسٌ : শব্দটি একবচন; বহুবচন لُبُس . اَلْبِسَةٌ অর্থ– পোশাক, কাপড়।

لِيُرِيَهُمَا : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِرَاءَةُ মূলবর্ণ (ر . أ . ى) জিনস মুরাক্কাব, مهموز عين ও ناقص يائى অর্থ– সে দেখাবে।

فَرِيْقٌ : শব্দটি একবচন; বহুবচন فُرُوْق . اَفْرِقَة অর্থ– দল, গোষ্ঠী, শ্রেণি।

مُهْتَدُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِهْتِدَاءُ মূলবর্ণ (ه . د . ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– সৎপথ প্রাপ্ত।

يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَّكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا ۚ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ (٣١)

অনুবাদ : (৩১) হে বনী আদম! প্রত্যেকবার মসজিদে উপস্থিত হওয়া কালে নিজেদের পোশাক পরিধান করে নাও, এবং খুব খাও ও পান কর, আর সীমার বাইরে যেয়ো না, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা সীমা অতিক্রমকারীদেরকে পছন্দ করেন না।

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِيْنَةَ اللّٰهِ الَّتِيْٓ اَخْرَجَ لِعِبَادِهٖ وَالطَّيِّبٰتِ مِنَ الرِّزْقِ ۚ قُلْ هِيَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَّوْمَ الْقِيٰمَةِ ۚ كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ (٣٢)

(৩২) আপনি বলুন, আল্লাহর সৃষ্ট পোশাক যা তিনি স্বীয় বান্দাদের জন্য বানিয়েছেন, এবং পানাহারের হালাল বস্তুগুলোকে কোন ব্যক্তি হারাম করল? আপনি বলে দিন, প্রকৃতপক্ষে এই নিয়ামতগুলো ঈমানদারদের জন্য, পার্থিব জীবনে বিশেষ করে কিয়ামত দিবসেও তাদেরই জন্য, আমি এরূপেই আয়াতসমূহকে জ্ঞানীদের জন্য স্পষ্টরূপে বর্ণনা করে থাকি।

قُلْ اِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْاِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ

(৩৩) আপনি বলে দিন, অবশ্য আমার রব তো হারাম করেছেন, বিশেষ করে সকল নির্লজ্জ কাজ-কর্মসমূহকে, তন্মধ্যে যেগুলো প্রকাশ্য তাকেও এবং যেগুলো অপ্রকাশ্য তাকেও, এবং সকল প্রকার পাপ কার্যকে এবং অন্যায়ভাবে কারো উপর অত্যাচার করাকে,

শব্দিক অনুবাদ

(৩১) يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ হে বনী আদম! خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ নিজেদের পোশাক পরিধান করে নাও عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ প্রত্যেকবার মসজিদে উপস্থিত হওয়া কালে। وَّكُلُوْا وَاشْرَبُوْا এবং খুব খাও ও পান কর। وَلَا تُسْرِفُوْا আর সীমার বাইরে যেয়ো না اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা সীমা অতিক্রমকারীদেরকে পছন্দ করেন না।

(৩২) قُلْ আপনি বলুন مَنْ حَرَّمَ কোন ব্যক্তি হারাম করল? زِيْنَةَ اللّٰهِ الَّتِيْٓ اَخْرَجَ لِعِبَادِهٖ আল্লাহর সৃষ্ট পোশাক যা তিনি স্বীয় বান্দাদের জন্য বানিয়েছেন وَالطَّيِّبٰتِ مِنَ الرِّزْقِ এবং পানাহারের হালাল বস্তুগুলোকে قُلْ আপনি বলে দিন هِيَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا প্রকৃতপক্ষে এই নিয়ামতগুলো ঈমানদারদের জন্য فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا পার্থিব জীবনে خَالِصَةً يَّوْمَ الْقِيٰمَةِ বিশেষ করে কিয়ামত দিবসেও তাদেরই জন্য كَذٰلِكَ এরূপেই نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ আমি আয়াতসমূহকে স্পষ্টরূপে বর্ণনা করে থাকি لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ জ্ঞানীদের জন্য।

(৩৩) قُلْ আপনি বলে দিন اِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ অবশ্য আমার রব তো হারাম করেছেন الْفَوَاحِشَ বিশেষ করে সকল নির্লজ্জ কাজ-কর্মসমূহকে مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ তন্মধ্যে যেগুলো প্রকাশ্য তাকেও এবং যেগুলো অপ্রকাশ্য তাকেও وَالْاِثْمَ এবং সকল প্রকার পাপ কার্যকে وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ এবং অন্যায়ভাবে কারো উপর অত্যাচার করাকে

www.almodina.com

وَاَنْ تُشْرِكُوا بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهٖ سُلْطَانًا وَّاَنْ تَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ (٣٣)

অনুবাদ : আর তাকে যে, তোমরা আল্লাহর সাথে কোনো এমন বস্তুকে শরিক সাব্যস্ত কর, যার সম্বন্ধে কোনো প্রমাণ আল্লাহ পাক নাজিল করেননি, আর তাকে যে, তোমরা আল্লাহর প্রতি এমন কথা আরোপ কর যার কোনো প্রমাণ তোমাদের নিকট নেই।

وَلِكُلِّ اُمَّةٍ اَجَلٌ ۚ فَاِذَا جَآءَ اَجَلُهُمْ لَا يَسْتَاْخِرُوْنَ سَاعَةً وَّلَا يَسْتَقْدِمُوْنَ (٣٤)

অনুবাদ : (৩৪) আর প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য [শাস্তির] এক নির্ধারিত সময় রয়েছে, সুতরাং যখন তাদের নির্দিষ্ট সময় উপনীত হবে, তখন এক মুহূর্তও পিছনে হটতে পারবে না এবং আগেও বাড়তে পারবে না।

يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ اِمَّا يَاْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُّوْنَ عَلَيْكُمْ اٰيٰتِيْ ۙ فَمَنِ اتَّقٰى وَاَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ (٣٥)

(৩৫) হে বনী আদম! তোমাদেরই মধ্য হতে যদি তোমাদের নিকট রাসূল আগমন করেন, যিনি আমার আহকামসমূহ তোমাদের নিকট বর্ণনা করবেন, তখন যে ব্যক্তি পরহেজগারী অবলম্বন করে এবং [আমল] সংশোধন করে নেয়, তবে এই সমস্ত লোকের কোনো আশঙ্কা থাকবে না এবং তারা চিন্তান্বিতও হবে না।

وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَاسْتَكْبَرُوْا عَنْهَآ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ (٣٦)

(৩৬) আর যারা আমার সেই আহকামসমূহকে মিথ্যা সাব্যস্ত করবে এবং তৎসম্বন্ধে অহংকার করবে, তারা জাহান্নামবাসী হবে, তারা তাতে অনন্তকাল থাকবে।

শাব্দিক অনুবাদ

وَاَنْ تُشْرِكُوْا بِاللّٰهِ আর তাকে যে, তোমরা আল্লাহর সাথে কোনো এমন বস্তুকে শরিক সাব্যস্ত কর مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهٖ سُلْطٰنًا যার সম্বন্ধে কোনো প্রমাণ আল্লাহ পাক নাজিল করেননি وَّاَنْ تَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ আর তাকে যে, তোমরা আল্লাহর প্রতি এমন কথা আরোপ কর مَا لَا تَعْلَمُوْنَ যার কোনো প্রমাণ তোমাদের নিকট নেই।

(৩৪) وَلِكُلِّ اُمَّةٍ اَجَلٌ আর প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য [শাস্তির] এক নির্ধারিত সময় রয়েছে فَاِذَا جَآءَ اَجَلُهُمْ সুতরাং যখন তাদের নির্দিষ্ট সময় উপনীত হবে لَا يَسْتَاْخِرُوْنَ سَاعَةً তখন এক মুহূর্তও পিছনে হটতে পারবে না وَّلَا يَسْتَقْدِمُوْنَ এবং আগেও বাড়তে পারবে না।

(৩৫) يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ হে বনী আদম! اِمَّا يَاْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ তোমাদেরই মধ্য হতে যদি তোমাদের নিকট রাসূল আগমন করেন يَقُصُّوْنَ عَلَيْكُمْ اٰيٰتِيْ যিনি আমার আহকামসমূহ তোমাদের নিকট বর্ণনা করবেন فَمَنِ اتَّقٰى وَاَصْلَحَ তখন যে ব্যক্তি পরহেজগারী অবলম্বন করে এবং [আমল] সংশোধন করে নেয় فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ তবে এই সমস্ত লোকের কোনো আশঙ্কা থাকবে না وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ এবং তারা চিন্তান্বিতও হবে না।

(৩৬) وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا আর যারা আমার সেই আহকামসমূহকে মিথ্যা সাব্যস্ত করবে وَاسْتَكْبَرُوْا عَنْهَآ এবং তৎসম্বন্ধে অহংকার করবে اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ তারা জাহান্নামবাসী হবে هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ তারা তাতে অনন্তকাল থাকবে।

www.almodina.com

فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِاٰيٰتِهٖ ۗ اُولٰٓئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيْبُهُمْ مِّنَ الْكِتٰبِ ۗ حَتّٰٓى اِذَا جَآءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ ۙ قَالُوْٓا اَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۗ قَالُوْا ضَلُّوْا عَنَّا وَشَهِدُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ اَنَّهُمْ كَانُوْا كٰفِرِيْنَ (٣٧)

অনুবাদ : (৩৭) অতএব, সে ব্যক্তি অপেক্ষা কে অধিক জালেম হবে, যে আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে অথবা তাঁর আয়াতগুলোকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে? তাদের ভাগ্যের যা কিছু আছে তারা তা প্রাপ্ত হবে, এমনকি যখন তাদের নিকট আমার প্রেরিত ফেরেশতাগণ তাদের রূহ কব্‌য করার জন্য পৌছবে, তখন [ফেরেশতাগণ] বলবেন, তারা কোথায় গেল, তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে যাদের ইবাদত করছিলে? তারা বলবে, আমাদের নিকট হতে সকলেই অদৃশ্য হয়ে গেছে, এবং নিজেরাই নিজেদের কাফের হওয়ার স্বীকারোক্তি করবে।

শাব্দিক অনুবাদ

(৩৭) فَمَنْ اَظْلَمُ অতএব, সে ব্যক্তি অপেক্ষা কে অধিক জালেম হবে مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا যে আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে اَوْ كَذَّبَ بِاٰيٰتِهٖ অথবা তাঁর আয়াতগুলোকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে اُولٰٓئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيْبُهُمْ مِّنَ الْكِتٰبِ তাদের ভাগ্যের যা কিছু আছে তারা তা প্রাপ্ত হবে حَتّٰٓى اِذَا جَآءَتْهُمْ رُسُلُنَا এমনকি যখন তাদের নিকট আমার প্রেরিত ফেরেশতাগণ পৌছবে يَتَوَفَّوْنَهُمْ তাদের রূহ কব্‌য করার জন্য قَالُوْٓا তখন [ফেরেশতাগণ] বলবেন اَيْنَ مَا তারা কোথায় গেল كُنْتُمْ تَدْعُوْنَ তোমরা যাদের ইবাদত করছিলে مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ আল্লাহকে ছেড়ে قَالُوْا তারা বলবে ضَلُّوْا عَنَّا আমাদের নিকট হতে সকলেই অদৃশ্য হয়ে গেছে وَشَهِدُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ اَنَّهُمْ كَانُوْا كٰفِرِيْنَ এবং নিজেরাই নিজেদের কাফের হওয়ার স্বীকারোক্তি করবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(৩১) قوله يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ الخ **আয়াতের শানে নুযূল- ১ :** হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত রয়েছে যে, আরবের এক শ্রেণির লোকেরা কা'বা গৃহের তওয়াফ করত সম্পূর্ণরূপে উলঙ্গ হয়ে। এমনকি মহিলারাও তওয়াফ করতে হলে উলঙ্গ হয়েই তওয়াফ করত। গাধার চেহারা মাছি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য যেরূপভাবে কাপড়ের টুকরা ঝুলিয়ে রাখ, ঠিক অনুরূপ ভাবেই তওয়াফের সময়ে তাদের লজ্জাস্থান একটি কাপড় দ্বারা ঢেকে রাখত। আর মহিলারা মুখে বলত- اَلْيَوْم يَبْدو بَعْضُهُ اَوْ كُلُّه وما بدا منه فلا احله সে পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। -[রূহুল মা'আনী ১০৯/৮/৪, ফাতহুল কাদীর ২০১/২]

শানে নুযূল- ২ : জাহিলী যুগে মানুষেরা উলঙ্গ হয়ে তওয়াফ করত। হজের দিন সমূহে চর্বিযুক্ত কোনো আহার গ্রহণ করত না। প্রোটিনযুক্ত খাবার তারা গ্রহণ করত না। এসব কিছু করা হতো হজের সম্মানার্থে। সে পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। -[বাহরে মুহীত ২৯১/৪]

শানে নুযূল- ৩ : আল্লামা কালবী (র.) বলেন, জাহিলী যুগে মানুষেরা হজের দিনসমূহের সম্মান রক্ষার্থে তারা চর্বিযুক্ত আহার্য খেতনা। আহার করত না তারা বিলাসপূর্ণ কোনো প্রকারের খাদ্য। তা দেখে কোনো কোনো মুসলমানও রাসূল ﷺ-এর নিকট আবেদন করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! এ কাজটি ছওয়াবের জন্য করা অধিক যোগ্য। তখন সাজ সজ্জা গ্রহণ করা এবং আহার্য গ্রহণ করার বিধান আরোপ করে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। -[রূহুল মা'আনী ১১০/৪/৮]

www.almodina.com

(৩২) قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّٰهِ الَّتِيْٓ أَخْرَجَ لِعِبَادِهٖ وَالطَّيِّبٰتِ مِنَ الرِّزْقِ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** ইবনে জারীর, ইবনুল মুনযির ও ইবনে আবী হাতেম হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, জাহিলী যুগে মানুষেরা আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক হালালকৃত বস্তুসমূহকে হারাম মনে করত। যেমন আল্লাহ বলেন- قُلْ أَرَءَيْتُمْ مَّآ أَنْزَلَ اللّٰهُ لَكُمْ مِّنْ رِّزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِّنْهُ حَرَامًا وَّحَلٰلًا; তখন আল্লাহ তা'আলা হালাল ও হারাম নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাচারিতা সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[ফাতহুল কাদীর ২২০/২]

(৩৩) قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** আল্লামা কালবী (র.) বলেন, মুসলমানরা যখন কাপড় পরিধান করে কা'বা গৃহের তওয়াফ করতে আরম্ভ করে, মুশরিক যারা ছিল, তারা মুসলমানদেরকে লজ্জা দিতে আরম্ভ করে। তারা বলতে লাগল যে, ওরা তো হারাম তথা অবৈধকে বৈধ করতে আরম্ভ করল। তখন মুশরিকদের জবাবে আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়েছে। –[বাহরে মুহীত : ২৯৪/৪]

নামাজের জন্য উত্তম পোশাক : আয়াতের দ্বিতীয় মাসআলা পোশাককে زِيْنَتْ (সাজ সজ্জা) শব্দের সাধ্যমে ব্যক্ত করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, নামাজ শুধু গুপ্ত অঙ্গ আবৃত করা ছাড়াও সামর্থ্য অনুযায়ী সাজ সজ্জার পোশাক পরিধান করা শ্রেয়। হযরত হাসান (রা.) নামাজের সময় উত্তম পোশাক পরিধানে অভ্যস্ত ছিলেন। তিনি বলতেন : আল্লাহ তা'আলা সৌন্দর্য পছন্দ করেন, তাই আমি প্রতিপালকের সামনে সুন্দর পোশাকই পরে হাজির হই। তিনি বলেছেন : خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ বুঝা গেল, এ আয়াত দ্বারা যেমন নামাজে শুধু অঙ্গ আবৃত করা ফরজ বলে প্রমাণিত হয়, তেমনি সামর্থ্য অনুযায়ী পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পোশাক পরিধান করার ফজিলতও প্রমাণিত হয়।

নামাজের পোশাক সম্পর্কে কয়েকটি মাসআলা : যে গুপ্ত অঙ্গ সর্ববস্থায় বিশেষত নামাজ ও তওয়াফে আবৃত করা ফরজ, তার সীমা কি? কুরআন পাক সংক্ষেপে গুপ্ত অঙ্গ আবৃত করার নির্দেশ দিয়ে এর বিবরণ দানের দায়িত্ব রাসূল ﷺ–এর উপর ন্যস্ত করেছে। তিনি বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন যে, পুরুষের গুপ্তাঙ্গ নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত এবং মহিলাদের গুপ্তাঙ্গ মুখমণ্ডল, হাতের তালু এবং পদযুগল বাদে সমস্ত দেহ।

হাদীসসমূহে এসব বিবরণ বর্ণিত রয়েছে। নাভির নিচের অংশ অথবা হাঁটু খোলা থাকলে পুরুষের জন্য এরূপ পোশাক এমনিতেও গর্হিত এবং এতে নামাজও আদায় হয় না। এমনিভাবে নারীর মস্তক, ঘাড় অথবা বাহু অথবা পায়ের গোছা খোলা থাকলে এরূপ পোশাক এমনিতে নাজায়েজ এবং এতে নামাজও আদায় হয় না। এক হাদীসে বলা হয়েছে : যে গৃহে নারী খোলা মাথায় থাকে, সে গৃহে নেকীর ফেরেশতা প্রবেশ করে না।

নারীর মুখমণ্ডল, হাতের তালু এবং পদযুগল সতরের বাইরে রাখা হয়েছে। এর অর্থ এই যে, নামাজ এসব অঙ্গ খোলা থাকলে নামাজে কোনো ত্রুটি হবে না। এর অর্থ এরূপ কখনও নয় যে, মাহরাম নয়, এরূপ ব্যক্তির সামনেও সে শরিয়ত সম্মত ওজর ব্যতীত মুখমণ্ডল খুলে ঘুরাফেরা করবে।

এ হচ্ছে গুপ্তাঙ্গের ফরজ সম্পার্কত বিধান। এটি ছাড়া নামাজই হয় না। নামাজে শুধু গুপ্তাঙ্গ আবৃত করাই কাম্য নয়; বরং সাজ সাজ্জার পোশাক পরিধান করতেও বলা হয়েছে। তাই পুরুষের উলঙ্গ মাথায় নামাজ পড়া কিংবা কনুই খুলে নামাজ পড়া মাকরূহ। হাফশার্ট পরিহিত অবস্থায় হোক কিংবা আস্তিন গুটানো হোক সর্বাবস্থায় মাকরুহ। এমনিভাবে এমন পোশাক পরে নামাজ পড়া মাকরূহ, যা পরিধান করে বন্ধু বান্ধব অথবা অপরের সামনে যাওয়া লজ্জাজনক মনে করা হয়: যেমন কোর্তা ছাড়া শুধু গেঞ্জি গায়ে নামাজ পড়া, যদিও আস্তিক পূর্ণ হয় কিংবা টুপির পরিবর্তে মাথায় অথবা ছোট হাত রুমাল বেধে নামাজ পাড়া। কারণ রুচিসম্পন্ন ব্যক্তি মাত্রই এ অবস্থায় বন্ধু-বান্ধব অথবা অপরের সামনে যাওয়া পছন্দ করে না। এমতাবস্থায় বিশ্ব পালনকর্তা আল্লাহর দরবারে যাওয়া কিরূপে পছন্দনীয় হতে পারে? মাথা, কাঁধ, কনুই ইত্যাদি খুলে নামাজ পড়া যে মাকরূহ তা আয়াতে ব্যবহৃত زِيْنَتْ (সাজ সজ্জা) শব্দ থেকে এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ–এর বক্তব্য থেকেও বুঝা যায়।

আয়াতের প্রথম বাক্য যেমন মূর্খতা যুগের আরবদের উলঙ্গতা মিটানোর জন্য অবতীর্ণ হয়েছে কিন্তু ভাষার ব্যাপকতাদৃষ্টে তা থেকে অনেক বিধান ও মাসআলাও জনা গেছে। এমনিভাবে দ্বিতীয় وَّكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا বাক্যটিও আরবদের হজের দিনগুলোতে উৎকৃষ্ট পানাহারকে গোনাহ মনে করার কুপ্রথা মিটানোর জন্য অবতীর্ণ হলেও ভাষার ব্যাপকাতদৃষ্টে এখানেও অনেক বিধান ও মাসআলা প্রমাণিত হয়।

www.almodina.com

যতটুকু প্রয়োজন, ততটুকু পানাহার ফরজ : প্রথম, শরিয়তের দিক দিয়েও পনাহার করা মানুষের জন্য ফরজ ও জরুরি। সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যদি কেউ পানাহার বর্জন করে, ফলে মৃত্যুমুখে পতিত হয় কিংবা এখন দুর্বল হয়ে পড়ে যে, ফরজ কর্মও সম্পাদন করতে অক্ষম হয়, তবে সে আল্লাহর কাছে অপরাধী ও পাপী হবে।

নিষিদ্ধতা প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত কোনো কিছু অবৈধ হয় না : আহকামুল কুরআন জাসসাসের বর্ণনা মতে এ আয়াতে থেকে একটি মাসআলা এরূপ বুঝা যায় যে, জগতে পানাহারের যত বস্তু রয়েছে আসলের দিক দিয়ে সেগুলো সব হালাল ও বৈধ। যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো বিশেষ বস্তুর অবৈধতা ও নিষিদ্ধতা শরিয়তের কোনো প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত না হয়, ততক্ষণ প্রত্যেক বস্তুকে হালাল ও বৈধ মানে করা হবে। وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا বাক্যে مفعول অর্থাৎ কি বস্তু পানাহার করবে, তা উল্লেখ না করায় এ মাসআলার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। আরবি ভাষায় বিশেষজ্ঞগণ বলেন : এরূপ স্থলে مفعول - এর ব্যাপকতার প্রতি ইঙ্গিত করা হয় অর্থাৎ প্রত্যেক বস্তু পানাহার করতে পারে ঐসব দ্রব্যসামগ্রী বাদে, যেগুলো স্পষ্টভাবে হারাম করা হয়েছে।

পানাহারে সীমালঙ্ঘন বৈধ নয় : আয়াতের শেষ বাক্য وَلَا تُسْرِفُوْا দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, পানাহারের অনুমতি বরং নির্দেশ থাকার সাথে সাথে অপব্যয় করার নিষেধাজ্ঞাও রয়েছে। আয়াতে ব্যবহৃত اِسْرَاف শব্দের অর্থ সীমালঙ্ঘন করা। সীমালাঙ্ঘন কয়েক প্রকারের হতে পারে। **এক.** হালালকে অতিক্রম করে হারাম পর্যন্ত পৌঁছা এবং হারাম বস্তু পানাহার করতে থাকা। এ সীমালঙ্ঘন যে হারাম তা বর্ণনা সাপেক্ষ নয়।

দুই. আল্লাহর হালালকৃত বস্তুমূহকে শরিয়তসম্মত কারণ ছাড়াই হারাম মনে করে বর্জন করা। হারাম বস্তু ব্যবহার করা যেমন অপরাধ ও গুনাহ তেমনি হালালকে হারাম মনে করাও ইলাহী আইনের বিরোধিতা ও কঠোর গুনাহ। –[ইবনে কাছীর, মাযহারী, রূহুল মা'আনী]

ক্ষুধা ও প্রয়োজনের চাইতে অধিক পানাহার করাও সীমালঙ্ঘনের মধ্যে গণ্য। তাই ফিকহবিদগণ উদর পূর্তির অধিক ভক্ষণ করাকে নাজায়েজ লিখেছেন। [আহকামুল কুরআন]

এমনিভাবে শক্তি সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও কম খেয়ে দুর্বল হয়ে পড়া, ফলে ফরজ কর্ম সম্পাদনের শক্তি না থাকা এটাও সীমালঙ্ঘনের মধ্যে গণ্য। উল্লিখিত উভয় প্রকার অপব্যয় নিষিদ্ধ করার জন্য কুরআন পাকের এক জায়গায় বলা হয়েছে : اِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوْا اِخْوَانَ الشَّيٰطِيْنِ অর্থাৎ অপব্যয়কারীরা শয়তানের ভাই। অন্যত্র বলা হয়েছে : وَالَّذِيْنَ اِذَاۤ اَنْفَقُوْا لَمْ يُسْرِفُوْا وَلَمْ يَقْتُرُوْا وَكَانَ بَيْنَ ذٰلِكَ قَوَامًا অর্থাৎ আল্লাহ তাদেরকে পছন্দ করেন, যারা ব্যয় করার ক্ষেত্রে মধ্যবর্তিতা অবলম্বন করে, প্রয়োজনের চাইতে বেশি ব্যয় করে না এবং কমও করে না।

পানাহারে মধ্য পন্থাই দীন দুনিয়ার জন্য উপকারী : হযরত ওমর (রা.) বলেন : বেশি পানাহার থেকে বেঁচে থাক। কারণ অধিক পানাহার দেহকে নষ্ট করে, রোগের জন্ম দেয় এবং কর্মে অলসতা সৃষ্টি করে। পানাহারের ক্ষেত্রে মধ্য পন্থা অবলম্বন করা এটা দৈহিক সুস্থতার পক্ষে উপকারী এবং অপব্যয় থেকে দূরবর্তী। তিনি আরও বলেন ; আল্লাহ তা'আলা স্থুলদেহী আলেমকে পছন্দ করেন না। (অর্থাৎ যে বেশি পানাহার করে সে নিজের প্রচেষ্টায়ই স্থুলদেহী হয়।) আরও বলেন : মানুষ ততক্ষণ ধ্বংস হয় না, যতক্ষণ না সে মানসিক প্রবৃত্তিকে ধর্মের উপর অগ্রাধিকার দান করে। –[রূহুল মা'আনী]

বায়হাকী বর্ণনা করেন, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত আয়েশা (রা.)–কে দিনে দুবার খেতে দেখে বললেন : হে আয়েশা! তুমি কি পছন্দ কর যে, আহার করাই তোমার একমাত্র কাজ হোক?

এ আয়াতে পানাহার সম্পর্কে যে মধ্যবর্তিতার নির্দেশ বর্ণিত হয়েছে, তা শুধু পানাহারের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং পরিধান ও বসবাসের প্রত্যেক কাজেই মধ্য পন্থা পছন্দনীয় ও কাম্য। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন : যা ইচ্ছা পানাহার কর এবং যা ইচ্ছা পরিধান কর, তবে শুধু দু'টি বিষয় থেকে বেঁচে থাক। **এক.** তাতে অপব্যয় অর্থাৎ প্রয়োজনের চাইতে বেশি না হওয়া চাই এবং **দুই.** গর্ব ও অহঙ্কার না থাকা চাই।

এক আয়াত থেকে আটটি মাসআলা : মোট কথা এই যে, وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا বাক্য থেকে আটটি মাসআলার উত্তর হয়। **এক.** যতটুকু প্রয়োজন, ততটুকু পানাহার করা ফরজ। **দুই.** শরিয়তের কোনো প্রমাণ দ্বারা কোনো বস্তুর অবৈধতা প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত সব বস্তুই হালাল। **তিন.** আল্লাহ তা'আলা ও রাসূলুল্লাহ ﷺ কর্তৃক নিষিদ্ধ বস্তুসমূহ ব্যবহার করা অপব্যয় ও অবৈধ। **চার.** যেসব বস্তু আল্লাহ তা'আলা হালাল করেছেন, সেগুলোকে হারাম মনে করাও অপব্যয় এবং মাহাপাপ।

www.almodina.com

পাঁচ. পেট ভরে খাওয়ার পরও আহার করা নাজায়েজ। **ছয়.** এতটুকু কম খাওয়াও অবৈধ, যদ্দরুন দুর্বল হয়ে ফরজ কর্ম সম্পাদন করতে অক্ষম হয়ে পড়ে। **সাত.** সর্বদা পানাহারের চিন্তায় মগ্ন থাকাও অপব্যয়। **আট.** মনে কিছু চাইলেই তা অবশ্যই খাওয়া অপব্যয়।

৩২ নং আয়াতে সেসব লোককে হুশিয়ার করা হয়েছে, যারা ইবাদতে বাড়াবাড়ি করে এবং স্বকল্পিত সংকীর্ণতা সৃষ্টি করে আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক হালালকৃত বস্তুসমূহ থেকে বিরত থাকা এবং হারাম মনে করাকে ইবাদত জ্ঞান করে। যেমন, মক্কার মুশরিকরা হজের দিনগুলোতে তওয়াফ করার সময় পোশাক পরিধানকেই বৈধ মনে করত না এবং আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক হালালকৃত ও উপাদেয় খাদ্যসমূহ বর্জন করাকে ইবাদত মনে করত।

এহেন লোকদেরকে শাসানোর ভাঙ্গিতে হুশিয়ার করা হয়েছে যে, বান্দাদের জন্য সৃজিত আল্লাহর زِينَة অর্থাৎ উত্তম পোশাক এবং আল্লাহ প্রদত্ত সুস্বাদু ও উপাদেয় খাদ্যকে হারাম করেছে?

উৎকৃষ্ট পোশাক ও সুস্বাদু খাদ্য বর্জন করা ইসলামের শিক্ষা নয় : উদ্দেশ্য এই যে, কোনো বস্তু হালাল অথবা হারাম করা একমাত্র সে সত্তারই কাজ যিনি এসব বস্তু সৃষ্টি করেছেন। এতে অন্যের হস্তক্ষেপ বৈধ নয়। কাজেই সেসব লোক দণ্ডনীয়, যারা আল্লাহর হালালকৃত উৎকৃষ্ট পোশাক অথবা পবিত্র ও সুস্বাদু খাদ্যকে হারাম মনে করে। সঙ্গতি থাকা সত্ত্বেও জীর্ণাবস্থায় থাকা ইসলামের শিক্ষা নয় এবং ইসলামের দৃষ্টিতে পছন্দনীয়ও নয়; যেমন অনেক অজ্ঞ লোক মনে করে।

পূর্ববর্তী মনীষীদের অনেককেই আল্লাহ তা'আলা আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য দান করেছিলেন। তাঁরা প্রায়ই উৎকৃষ্ট ও মূল্যবান পোশাক পরিধান করতেন। দু'জাহানের সর্দার রাসূলুল্লাহ ﷺ ও যখন সঙ্গতিপ্রাপ্ত হয়েছিলেন, তখন উৎকৃষ্টতর পোশাকও অঙ্গে ধারণ করেছিলেন। এক হাদীসে আছে, একবার যখন তিনি বাড়ির বাইরে আসেন, তখন তাঁর গায়ে এমন চাদর শোভা পাচ্ছিল যার মূল্য ছিল এক হাজার দিরহাম। বর্ণিত আছে ইমাম আযম আবূ হনীফা (র.) চারশ 'গিনি মূল্যের চাদর ব্যবহার করেছেন। এমনিভাবে হযরত ইমাম মালেক (র.) সব সময় উৎকৃষ্ট পোশাক পরিধান করতেন। তাঁর জন্য জনৈক বিত্তশালী ব্যক্তি সারা বছরের জন্য ৩৬০ জোড়া পোশাক নিজের দায়িত্বে গ্রহণ করেছিল, যে বস্ত্রজোড়া তিনি একবার পরিধান করতেন, দ্বিতীয়বার তা আর ব্যবহার করতেন না। মাত্র একদিন ব্যবহার করেই কোনো দরিদ্র ছাত্রকে দিয়ে দিতেন।

কারণ এই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : আল্লাহ তা'আলা যখন কোনো বান্দাকে নিয়ামত ও স্বাচ্ছন্দ্য দান করেন, তখন আল্লাহ তা'আলা এ নিয়ামতের চিহ্ন তার পোশাক পরিচ্ছদে ফুটে উঠাকে পছন্দ করেন। কেননা নিয়ামতকে ফুটিয়ে তোলাও এক প্রকার কৃতজ্ঞতা। এর বিপরীতে সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও ছিন্নবস্ত্র অথবা মলিন পোশাক পরিধান করা অকৃতজ্ঞতা।

অবশ্য দু'টি বিষয় থেকে বেঁচে থাকা জরুরি : **এক.** রিয়া ও নামযশ এবং **দুই.** গর্ব ও অহঙ্কার। অর্থাৎ শুধু লোক দেখানো এবং নিজের বড় মানুষী প্রকাশ করার জন্য জাঁকজমকপূর্ণ পোশাক পরিধান করা যাবে না। পূর্ববর্তী মনীষীগণ এ দু'টি বিষয় থেকে মুক্ত ছিলেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ও পূর্ববর্তী মনীষীদের মধ্যে হযরত ওমর (রা.) এবং আরও কয়েকজন সাহাবী থেকে মা'মুলী পোশাক কিংবা তালিযুক্ত পোশাক পরিধান করার কথা বর্ণিত আছে। এর কারণ ছিল দ্বিবিধ। প্রথম এই যে, তাঁদের হাতে যে ধন সম্পদ আসত, তা প্রায়ই ফকির মিসকিন ও ধর্মীয় কাজে ব্যয় করে ফেলতেন। নিজের জন্য কিছুই অবশিষ্ট থাকত না, যা দ্বারা উৎকৃষ্ট পোশাক নিতে পারতেন। দ্বিতীয় এই যে, তিনি ছিলেন সবার অনুসৃত। সাদাসিধা ও সস্তা পোশাক পরে অন্যান্য শাসনকর্তাকে শিক্ষা দেওয়া উদ্দেশ্য ছিল যাতে সাধারণ দরিদ্র ও ফকিরদের উপর তাদের আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যের প্রভাব না পড়ে।

এমনিভাবে সুফী বুযুর্গগণ শিষ্যদেরকে প্রথম পর্যায়ে সাজ সজ্জার পোশাক পরিধান করতে এবং উৎকৃষ্ট খাদ্য ভক্ষণ করতে নিষেধ করেন। এর উদ্দেশ্য এরূপ নয় যে, এসব বস্তু স্থায়ীভাবে বর্জন করা ছওয়াবের কাজ; বরং প্রবৃত্তিকে বশে আনার জন্য প্রথম পর্যায়ে চিকিৎসা ও প্রতিকারার্থে এধরনের সাধনার ব্যবস্থা করা হয়। যখন সে প্রবৃত্তিকে বশীভূত করে ফেলে এবং এমন স্তরে পৌঁছে যায় যে, প্রবৃত্তি তাকে হারাম ও নাজায়েজের প্রতি আকৃষ্ট করতে পারে না, তখন সব সূফী বুযুর্গই পূর্ববর্তী সাধক মনীষীদের ন্যায় উত্তম পোশাক ও সুস্বাদু খাদ্য ব্যবহার করেন। তখন এসব উৎকৃষ্ট খাদ্য ও পোশাক তাঁদের জন্য আধ্যাত্ম পথে বিঘ্ন সৃষ্টির পরিবর্তে অধিক নৈকট্য লাভের উপায় হয়ে যায়।

www.almodina.com

খোরাক ও পোশাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সুন্নত : খোরাক ও পোশাক সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবী ও তাবেয়ীগণের সুন্নতের সারকথা এই যে, এসব ব্যাপারে লৌকিকতা পরিহার করতে হবে। যেরূপ পোশাক ও খোরাক সহজলভ্য তাই কৃতজ্ঞতা সহকারে ব্যবহার করতে হবে। মোটা তাত ও মোটা কাপড় জুটলে যে কোনো উপায়ে এমনকি কর্জ করে হলেও উৎকৃষ্টটি অর্জনের জন্য সচেষ্ট হবে না।

এমনিভাবে উৎকৃষ্ট পোশাক ও সুস্বাদু খাদ্য জুটলে তাকে জেনে শুনে খারাপ মনে করবে না অথবা তার ব্যবহার থেকে বিরত থাকবে না। উৎকৃষ্ট পোশাকও সুস্বাদু খাদ্যের পিছনে লাগা যেমন লৌকিকতা, তেমনি উৎকৃষ্টকে নিকৃষ্ট করা কিংবা তা বাদ দিয়ে নিকৃষ্ট বস্তু ব্যবহার করাও নিন্দনীয় লৌকিকতা।

আয়াতের পরবর্তী বাক্যে এর একটি বিশেষ তাৎপর্য বর্ণনা করা হয়েছে। যে দুনিয়ার সব নিয়ামত, উৎকৃষ্ট পোশাক ও সুস্বাদু খাদ্য প্রকৃতপক্ষে আনুগত্যশীল মুমিনদের জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে এবং তাদের কল্যাণেই অন্যরা ভোগ করতে পারছে। কেননা এ দুনিয়া হচ্ছে কর্মক্ষেত্র, প্রতিদান নয়। এখানে পার্থিব নিয়ামতের মধ্যে আসল-নকল ও ভালোমন্দের পার্থক্য করা যায় না। করুণাময় আল্লাহ তা'আলার দস্তরখান সবার জন্য সমভাবে বিছানো রয়েছে; বরং এখানে আল্লাহর রীতি এই যে, মুমিন ও অনুগত বান্দাদের আনুগত্যে কিছু ত্রুটি হয়ে গেলে অন্যরা তাদের উপর প্রবল হয়ে পার্থিব নিয়ামতের ভাণ্ডার অধিকার করে বসে এবং তারা দারিদ্র্য ও উপবাসের কবলে গ্রাসে পতিত হয়।

কিন্তু এ আইন শুধু এ দুনিয়ারূপী কর্মক্ষেত্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। পরকালে সমস্ত নিয়ামত ও সুখ কেবলমাত্র আল্লাহর অনুগত বান্দাদের জন্য নির্দিষ্ট থাকবে। আয়াতের এ বাক্যে তাই বলা হয়েছে : 'قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ' অর্থাৎ আপনি বলে দিন : সব পার্থিব নিয়ামত প্রকৃতপক্ষে পার্থিব জীবনেও মুমিনেরই প্রাপ্য এবং কিয়ামতের দিন তো এককভাবে তাদের জন্যই নির্দিষ্ট হবে।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর মতে এ বাক্যটির অর্থ এই যে, পার্থিব সব নিয়ামত ও সুখ সাচ্ছন্দ্য পরকালে শাস্তির কারণ হবে'– না এ বিশেষ অবস্থাসহ তা একমাত্র অনুগত মুমিন বান্দাদেরই প্রাপ্য। কাফের ও পাপাচারীর অবস্থা এরূপ নয়। পার্থিব নিয়ামত তারাও পায়; বরং আরও বেশি পায়; কিন্তু এসব নিয়ামত পরকালে তাদের জন্য শাস্তি ও স্থায়ী আজাবের কারণ হবে। কাজেই পরিণামের দিক দিয়ে এসব নিয়ামত তাদের জন্য সম্মান ও সুখের বস্তু নয়।

কোনো কোনো তাফসীরবিদের মতে এর অর্থ এই যে, পার্থিব সব নিয়ামতের সাথে পরিশ্রম, কষ্ট,. হস্তচ্যুত হওয়ার আশঙ্কা ও নানারকম দুঃখ কষ্ট লেগে থাকে, নির্ভেজাল নিয়ামত ও অনাবিল সুখের অস্তিত্ব এখানে নেই। তবে কিয়ামতে যারা এসব নিয়ামত লাভ করবে, তারা নির্ভেজাল অবস্থায় লাভ করবে। এগুলোর সাথে কোনোরূপ পরিশ্রম, কষ্ট হস্তচ্যুত হওয়ার আশঙ্কা এবং কোনো চিন্তা ভাবনা থাকবে না। উপরিউক্ত তিন প্রকার অর্থই আয়াতের এ বাক্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। তাই সাহাবী ও তাবেয়ী তাফসীরবিদগণ এসব অর্থই গ্রহণ করেছেন।

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে : كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ অর্থাৎ "আমি স্বীয় অসীম শক্তির নিদর্শনাবলি জ্ঞানবানদের জন্য এমনিভাবে খুলে খুলে বর্ণনা করি, যাতে পণ্ডিত মূর্খ নির্বিশেষে সবাই বুঝে নেয়।" ভালো পোশাক ও ভালো খাদ্য বর্জন করলে আল্লাহ তা'আলা সন্তুষ্ট হন -এ আয়াতে মানুষের এ বাড়াবাড়ি ও মূর্খতাসুলভ ধারণা খণ্ডন করা হয়েছে।

অতঃপর দ্বিতীয় আয়াতে কতিপয় এমন বিষয় বর্ণিত হয়েছে, যেগুলো আল্লাহ তা'আলা হারাম করেছেন। সত্য এই যে, এগুলো বর্জন করলেই আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা যায়। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, তারা দ্বিবিধ মূর্খতায় লিপ্ত। একদিকে আল্লাহ তা'আলার হালালকৃত উত্তম ও মনোরম বস্তুসমূহকে নিজেদের জন্য অহেতুক হারাম সাব্যস্ত করে এসব নিয়ামত থেকে বঞ্চিত হয়েছে এবং অপরদিকে যেসব বস্তু প্রকৃতপক্ষে হারাম ছিল এবং যেগুলো ব্যবহারের পরিণতিতে আল্লাহর গজব ও পরকালের শাস্তি অবশ্যম্ভাবী ছিল, সেগুলোর ব্যবহারে লিপ্ত হয়ে পরকালের শাস্তি ক্রয় করেছে। এভাবে ইহকাল ও পরকাল উভয় ক্ষেত্রে নিয়ামত থেকে বঞ্চিত হয়ে দু'কুলই হারিয়েছে। বলা হয়েছে:

إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ অর্থাৎ "যেসব বস্তুকে তোমরা অহেতুক হারাম সাব্যস্ত করেছ, সেগুলো তো হারাম নয়,. কিন্তু আল্লাহ তা'আলা সব নির্লজ্জ কাজ হারাম করেছেন, তা প্রাকশ্য হোক কিংবা গোপন হোক। আরও হারাম করেছেন, প্রত্যেক পাপকাজ অন্যায় উৎপীড়ন, বিনা প্রমাণে আল্লাহর সাথে কাউকে পাপকাজ অন্যায় উৎপীড়ন, বিনা প্রমাণে আল্লাহর সাথে কাউকে অংশীদার করা এবং আল্লাহর প্রতি এমন কথা আরোপ করা, যার কোনো সনদ তোমাদের কাছে নেই।"

www.almodina.com

এখানে اِثْم (পাপকাজ) শব্দের আওতায় সেসব গোনাহ অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে, যেগুলো মানুষের নিজের সাথে সম্পর্কযুক্ত এবং بَغْى (উৎপীড়ন) শব্দের অর্থ অপরের সাথে লেনদেনও অপরেরের অদিকার সম্পর্কিত গোনাহ এসে গেছে। অতঃপর শিরক ও আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপ এগুলো সুস্পষ্ট ভাবেই বিশ্বাসগত মহাপাপ।

৩২ ও ৩৩ নং আয়াতে মুশরিকদের দু'টি ভ্রান্ত কাজ বর্ণিত হয়েছিল। **এক.** হালালকে হারাম করা এবং **দুই.** হারামকে হালাল করা। তৃতীয় আয়াতে তাদের ভয়াবহ পরিণাম এবং পরকালীন শাস্তি ও আজাব বর্ণনা করা হয়েছে :

وَلِكُلِّ اُمَّةٍ اَجَلٌ فَاِذَا جَآءَ اَجَلُهُمْ لَا يَسْتَاْخِرُوْنَ سَاعَةً وَّلَا يَسْتَقْدِمُوْنَ অর্থাৎ যেসব অপরাধী সর্ব প্রকার অবাধ্যতা সত্ত্বেও আল্লাহ তা'আলার নিয়ামতের মধ্যে লালিত পালিত হচ্ছে এবং বাহ্যত তাদের উপর কোনো আজাব আসতে দেখা যায় না, তারা যেন আল্লাহ তা'আলার এ চিরাচরিত রীতি সম্পর্কে উদাসীন না থাকে যে, তিনি অপরাধীদেরকে কৃপাবশত ঢিল দিতে থাকেন, যাতে কোনো রকমে তারা স্বীয় কার্যকলাপ থেকে বিরত হয়, কিন্তু আল্লাহ তা'আলার জ্ঞানে এ ঢিল ও অবকাশের একটি মেয়াদ নির্দিষ্ট থাকে। যখন এ মেয়াদ শেষ হয়, তখন এক মুহূর্তও আগ পাছ হয় না এবং তাদেরকে আজাব দ্বারা পাকড়াও করা হয়। কখনোও দুনিয়াতেই আজাব এসে যায় এবং যদি দুনিয়াতে না আসে, তবে মৃত্যুর সাথে সাথেই আজাবে প্রবিষ্ট হয়ে যায়।

এ আয়াতে নির্দিষ্ট মেয়াদের আগে পিছে না হওয়ার কথা বলা হয়েছে। এটি এমন একটি বাকপদ্ধতি, যেমন আমাদের পরিভাষায় ক্রেতা দোকানদারকে বলে : মূল্য কিছু কম বেশি হতে পারবে কি না? এখানে জানা কথা যে, বেশি মূল্য তার কাম্য নয়; কম হবে কিনা, তাই জিজ্ঞেস করে। কিন্তু কমের অনুগামী করে বেশিও উল্লেখ করা হয়। এমনিভাবে এখানে আসল উদ্দেশ্য এই যে, নির্দিষ্ট মেয়াদের পর বিলম্ব হবে না। কিন্তু সাধারণের বাকপদ্ধতি অনুযায়ী বিলম্বের সাথে আগে হওয়া উল্লেখ করা হয়েছে।

শব্দ বিশ্লেষণ

اَلْفَوَاحِشَ : শব্দটি বহুবচন; একবচন فَاحِشَةٌ অর্থ– অশ্লীলতা, নির্লজ্জতা।

اَلْاِثْمُ : শব্দটি একবচন; বহুবচন اٰثَامٌ অর্থ– গুনাহ, পাপ।

اُمَّةٌ : শব্দটি একবচন; বহুবচন اُمَمٌ অর্থ– জাতি, দল, সম্প্রদায়।

اَجَلٌ : শব্দটি একবচন; বহুবচন اٰجَالٌ অর্থ– নির্ধারিত সময়।

اِسْتَكْبَرُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِسْتِكْبَارُ মূলবর্ণ (ك . ب . ر) জিনস صحيح অর্থ– তারা অহংকার করেছে।

يَتَوَفَّوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব تَفَعُّلٌ মাসদার اَلتَّوَفِّى মূলবর্ণ (و . ف . ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ– তারা [ফেরেশতাগণ] জান কবজ করার জন্য পৌঁছবে।

كُنْتُمْ تَدْعُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ ماضى استمرارى معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلدَّعْوَةُ মূলবর্ণ (د . ع . و) জিনস ناقص واوى অর্থ– তোমরা আহ্বান করছিলে।

قَالَ ادْخُلُوْا فِيْٓ اُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِّنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ فِي النَّارِ ۚ كُلَّمَا دَخَلَتْ اُمَّةٌ لَّعَنَتْ اُخْتَهَا ۚ حَتّٰٓى اِذَا ادَّارَكُوْا فِيْهَا جَمِيْعًا ۙ قَالَتْ اُخْرٰىهُمْ لِاُوْلٰىهُمْ رَبَّنَا هٰٓؤُلَآءِ اَضَلُّوْنَا فَاٰتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ النَّارِ ۚ قَالَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَّلٰكِنْ لَّا تَعْلَمُوْنَ (٣٨)

অনুবাদ : (৩৮) আল্লাহ তা'আলা বলবেন, যে সকল সম্প্রদায় তোমাদের পূর্বে গত হয়েছে জিনদের মধ্য হতেও এবং মানুষের মধ্য হতেও, তাদের সঙ্গে তোমরাও দোজখে যাও, যখনই কোনো দল [জাহান্নামে] প্রবেশ করবে, তখন নিজেদের অনুরূপ অন্য দলকে লা'নত করবে, এমনকি যখন সকলে তাতে সমবেত হবে, তখন পরবর্তী লোকেরা পূর্ববর্তী লোকদের সম্বন্ধে বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! তারা আমাদেরকে বিপথগামী করেছিল, অতএব, তাদেরকে দোজখের শাস্তি দ্বিগুণ করে দিন, আল্লাহ পাক বলবেন, সকলের জন্যই দ্বিগুণ [শাস্তি] রয়েছে কিন্তু তোমরা বুঝতে পারছ না।

وَقَالَتْ اُوْلٰىهُمْ لِاُخْرٰىهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ فَذُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُوْنَ (٣٩)

(৩৯) আর পূর্ববর্তী লোকেরা পরবর্তী লোকদেরকে বলবে, তা হলে তো আমাদের উপর তোমাদের কোনোই প্রাধান্য নেই, অতএব, তোমরা স্বীয় কৃতকর্মের ফলস্বরূপ শাস্তির আস্বাদ গ্রহণ করতে থাক।

اِنَّ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَاسْتَكْبَرُوْا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ اَبْوَابُ السَّمَآءِ وَلَا يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ حَتّٰى يَلِجَ الْجَمَلُ فِيْ سَمِّ الْخِيَاطِ ۚ وَكَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُجْرِمِيْنَ (٤٠)

(৪০) নিশ্চয় যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে এবং তার প্রতি অহংকার প্রদর্শন করে, তাদের জন্য আসমানের দ্বারগুলো মুক্ত করা হবে না, এবং তারা কখনো জান্নাতে যাবে না যে পর্যন্ত উষ্ট্র চলে যায় সুঁচের ছিদ্রপথ দিয়ে, আর আমি অপরাধীদেরকে এরূপ শাস্তি দিয়ে থাকি।

শাব্দিক অনুবাদ

(৩৮) قَالَ আল্লাহ তা'আলা বলবেন ادْخُلُوْا তাদের সঙ্গে তোমরাও যাও فِيْٓ اُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ যে সকল সম্প্রদায় তোমাদের পূর্বে গত হয়েছে مِّنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ জিনদের মধ্য হতেও এবং মানুষের মধ্য হতেও فِي النَّارِ দোজখে كُلَّمَا دَخَلَتْ اُمَّةٌ যখনই কোনো দল [জাহান্নামে] প্রবেশ করবে لَّعَنَتْ اُخْتَهَا তখন নিজেদের অনুরূপ অন্য দলকে লা'নত করবে حَتّٰٓى اِذَا ادَّارَكُوْا فِيْهَا جَمِيْعًا এমনকি যখন সকলে তাতে সমবেত হবে قَالَتْ اُخْرٰىهُمْ لِاُوْلٰىهُمْ তখন পরবর্তী লোকেরা পূর্ববর্তী লোকদের সম্বন্ধে বলবে رَبَّنَا হে আমাদের প্রতিপালক! هٰٓؤُلَآءِ اَضَلُّوْنَا তারা আমাদেরকে বিপথগামী করেছিল فَاٰتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ النَّارِ অতএব, তাদেরকে দোজখের শাস্তি দ্বিগুণ করে দিন قَالَ আল্লাহ পাক বলবেন لِكُلٍّ ضِعْفٌ সকলের জন্যই দ্বিগুণ [শাস্তি] রয়েছে وَّلٰكِنْ لَّا تَعْلَمُوْنَ কিন্তু তোমরা বুঝতে পারছ না।

(৩৯) وَقَالَتْ اُوْلٰىهُمْ لِاُخْرٰىهُمْ আর পূর্ববর্তী লোকেরা পরবর্তী লোকদেরকে বলবে فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ তা হলে তো আমাদের উপর তোমাদের কোনোই প্রাধান্য নেই فَذُوْقُوا الْعَذَابَ অতএব, তোমরা শাস্তির আস্বাদ গ্রহণ করতে থাক بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُوْنَ স্বীয় কৃতকর্মের ফলস্বরূপ।

(৪০) اِنَّ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا নিশ্চয় যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে وَاسْتَكْبَرُوْا عَنْهَا এবং তার প্রতি অহংকার প্রদর্শন করে لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ اَبْوَابُ السَّمَآءِ তাদের জন্য আসমানের দ্বারগুলো মুক্ত করা হবে না وَلَا يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ এবং তারা কখনো জান্নাতে যাবে না حَتّٰى يَلِجَ الْجَمَلُ যে পর্যন্ত উষ্ট্র চলে যায় فِيْ سَمِّ الْخِيَاطِ সুঁচের ছিদ্রপথ দিয়ে وَكَذٰلِكَ আর এরূপ نَجْزِى الْمُجْرِمِيْنَ আমি অপরাধীদেরকে শাস্তি দিয়ে থাকি।

www.almodina.com

لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ ۚ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ (٤١)

অনুবাদ : (৪১) তাদের জন্য নরকাগ্নির শয্যা হবে, এবং তাদের উপর তারই আচ্ছাদন হবে, এবং আমি এমন জালেমদেরকে এ রকমই শাস্তি দিয়ে থাকি।

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٤٢)

(৪২) আর যারা ঈমান এনেছে, এবং নেক কাজ করেছে, আমি কোনো ব্যক্তিকে তার সাধ্যাতীত কোনো কাজ করতে বলব না, এরূপ লোকই জান্নাতবাসী, তারা তাতে অনন্তকাল থাকবে।

وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ ۖ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ ۖ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ ۖ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (٤٣)

(৪৩) আর তাদের অন্তরে যে মলিনতা থাকবে, আমি তা বিদূরিত করে দিব, [এবং] তাদের [বাসস্থানের] নিম্নদেশ দিয়ে নহরসমূহ বইতে থাকবে এবং তারা বলবে, আল্লাহর অসংখ্য অনুগ্রহ, যিনি আমাদেরকে এই স্থানে পৌছিয়েছেন, আর আমরা [এখানে] কিছুতেই পৌছতে পারতাম না, যদি আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে না পৌছাতেন, বাস্তবিক, আমাদের প্রতিপালকের রাসূলগণ সত্য বাণী নিয়ে এসেছিলেন, আর তাদেরকে সম্বোধন করে বলা হবে, এই জান্নাত তোমাদেরকে দান করা হলো তোমাদের কৃতকার্যের বিনিময়ে।

শাব্দিক অনুবাদ

(৪১) لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ তাদের জন্য নরকাগ্নির শয্যা হবে وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ এবং তাদের উপর তারই আচ্ছাদন হবে وَكَذٰلِكَ نَجْزِي الظّٰلِمِيْنَ এবং আমি এমন জালেমদেরকে এ রকমই শাস্তি দিয়ে থাকি।

(৪২) وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا আর যারা ঈমান এনেছে وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ এবং নেক কাজ করেছে لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَآ আমি কোনো ব্যক্তিকে তার সাধ্যাতীত কোনো কাজ করতে বলব না اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ এরূপ লোকই জান্নাতবাসী هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ তারা তাতে অনন্তকাল থাকবে।

(৪৩) وَنَزَعْنَا مَا فِيْ صُدُوْرِهِمْ مِّنْ غِلٍّ আর তাদের অন্তরে যে মলিনতা থাকবে, আমি তা বিদূরিত করে দিব تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهِمُ الْاَنْهٰرُ [এবং] তাদের [বাসস্থানের] নিম্নদেশ দিয়ে নহরসমূহ বইতে থাকবে وَقَالُوا এবং তারা বলবে الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ هَدٰىنَا لِهٰذَا আল্লাহর অসংখ্য অনুগ্রহ, যিনি আমাদেরকে এই স্থানে পৌছিয়েছেন وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ আর আমরা [এখানে] কিছুতেই পৌছতে পারতাম না لَوْلَآ اَنْ هَدٰىنَا اللّٰهُ যদি আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে না পৌছাতেন لَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ বাস্তবিক, আমাদের প্রতিপালকের রাসূলগণ সত্য বাণী নিয়ে এসেছিলেন وَنُوْدُوْٓا আর তাদেরকে সম্বোধন করে বলা হবে اَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ اُوْرِثْتُمُوْهَا এই জান্নাত তোমাদেরকে দান করা হলো بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ তোমাদের কৃতকার্যের বিনিময়ে।

www.almodina.com

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(৪৩) وَنَزَعْنَا مَا فِيْ صُدُوْرِهِمْ مِنْ غِلٍّ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهِمُ الْاَنْهٰرُ الخ **আয়াতের শানে নুযূল** : আলোচ্য আয়াত বদর অভিযানে অংশ গ্রহণকারীদের সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। হযরত হাসান বিন আলী (রা.) কর্তৃক বর্ণিত রয়েছে যে, তিনি শপথ করে বলেছেন যে, আমাদের মধ্যে যারা বদর অভিযানে অংশগ্রহণ করেছেন তাদের সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। হযরত আলী বিন আবী তালেব (রা.) বলেন যে, আমি উসমান, তালহা ও যুবাইর প্রমুখ সে লোকজনের অন্তর্ভুক্ত হব, যাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেছেন। –[নূরুল কুলূব]

قوله اِنَّ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَاسْتَكْبَرُوْا عَنْهَا الخ পূর্বে কতিপয় আয়াতে একটি অঙ্গীকার বর্ণিত হয়েছে। এটি প্রত্যেক মানুষের কাজ থেকে তার দুনিয়াতে আগমনের পূর্বে আত্মা-জগতে নেওয়া হয়েছিল। অঙ্গীকারটি ছিল এই : যখন আমার পয়গম্বর তোমাদের কাছে আমার নির্দেশাবলি নিয়ে আসবেন, তখন মনে প্রাণে সেগুলো মেনে নেবে এবং তদনুযায়ী কাজ করবে। এ কথাও বলে দেওয়া হয়েছিল যে, দুনিয়াতে আগমনের পর যে ব্যক্তি এ অঙ্গীকারে অটল থেকে তা পূর্ণ করবে, সে যাবতীয় দুঃখ ও চিন্তা থেকে মুক্তি পাবে এবং চিরস্থায়ী সুখ ও শান্তির অধিকারী হবে। পক্ষান্তরে যে পয়গম্বরগণকে মিথ্যা বলবে এবং তাদের নির্দেশাবলি অমান্য করবে, তাদের জন্য জাহান্নামের চিরস্থায়ী শাস্তি অপেক্ষমান রয়েছে। আলোচ্য আয়াতসমূহে সে পরিস্থিতি বর্ণিত হয়েছে, যা দুনিয়াতে আগমনের পর বিভিন্ন শ্রেণির মানুষ সৃষ্টি করেছে। কেউ অঙ্গীকার ভুলে গিয়ে তার বিরুদ্ধাচরণ করেছে আবার কেউ তাতে অটল রয়েছে এবং তদনুযায়ী সৎকর্ম সম্পাদন করেছে। এ উভয় দলের পরিণতি এবং আজাব ও ছওয়াব আলোচ্য ৪০-৪২ নং আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।

প্রথম ও দ্বিতীয় আয়াতে অস্বীকার ভঙ্গকারী অবিশ্বাসীদের কথা এবং শেষ দু'আয়াতে অঙ্গীকার পূর্ণকারী মুমিনদের কথা আলোচিত হয়েছে।

৪০ নং আয়াতে বলা হয়েছে : যারা পয়গম্বরগণকে মিথ্যা বলেছে এবং আমার নির্দেশাবলির প্রতি ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করেছে, তাদের জন্য আকাশের দরজা খোলা হবে না।

তাফসীরে বাহরে মুহীতে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে এ আয়াতের বর্ণিত এক তাফসীরে উল্লেখ রয়েছে যে, তাদের আমল ও তাদের দোয়ার জন্য আকাশের দরজা খোলা হবে না। অর্থাৎ তাদের দোয়া কবুল করা হবে না এবং তাদের আমলকে ঐস্থানে যেতে দেওয়া হবে না, যেখানে আল্লাহর নেক বান্দাদের আমলসমূহ সংরক্ষিত রাখা হয়। কুরআনের সূরা মুতাফফিফীনে এ স্থানটির নাম ইল্লিয়্যীন বলা হয়েছে। কুরআন পাকের অন্য এক আয়াতেও উল্লিখিত বিষয়বস্তুর প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। বলা হয়েছে : اِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهٗ (মানুষের পবিত্র বাক্যাবলি আল্লাহ তা'আলার দিকে উর্ধ্বগামী হয় এবং সৎকর্ম সেগুলোকে উত্থিত করে।) অর্থাৎ মানুষের সৎকর্মসমূহ পবিত্র বাক্যাবলি আল্লাহর বিশেষ দরবারে পৌঁছানোর কারণ হয়।

এ আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে অপর এক রেওয়ায়েত হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস ও অন্যান্য সাহাবী থেকে এমনও বর্ণিত আছে যে, কাফেরদের আত্মার জন্য আকাশের দরজা খোলা হবে না। এসব আত্মাকে নিচে নিক্ষেপ করা হবে। এ বিষয়বস্তুর সমর্থন হযরত বারা ইবনে আযেব (রা.)-এর ঐ হাদীস থেকে পাওয়া যায়, যা আবূ দাঊদ, নাসায়ী, ইবনে মাজা ও ইমাম আহমদ (র.) বিস্তারিত উল্লেখ করেছেন। হাদীসটি সংক্ষেপে এই :

রাসূলুল্লাহ ﷺ জনৈক আনসারী সাহাবীর জানাযায় গামন করেন। কবর প্রস্তুতে কিছু বিলম্ব দেখে তিনি এক জায়গায় বসে যান। সাহাবায়ে কেরামও তাঁর চারদিকে চুপচাপ বসে যান। তিনি মাথা উঁচু করে বললেন; মুমিন বান্দার মৃত্যুর সময় হলে আকাশ থেকে সাদা ধবধবে চেহারা বিশিষ্ট ফেরেশতারা আগমন করে। তাদের সাথে জান্নাতের কাফন ও সুগন্ধি থাকে। তারা মরণোন্মুখ ব্যক্তির সামনে বসে যায়। অতঃপর মৃত্যুদূত আযরাঈল আসেন এবং তার আত্মাকে সম্বোধন করে বলেন: হে নিশ্চিন্ত আত্মা! পালনকর্তার মাগফেরাত ও সন্তুষ্টির জন্য বের হয়ে আস। তখন তার আত্মা এমন অনায়াসে বের হয়ে আসে. যেমন মশকের মুখ খুলে দিলে তার পানি বের হয়ে আসে। মৃত্যুদূত তার আত্মাকে হাতে নিয়ে উপস্থিত ফেরেশতাদের কাছে সমর্পণ করেন। ফেরেশতারা তা নিয়ে রওয়ানা হলে পথিমধ্যে একদল ফেরেশতার সাথে সাক্ষাৎ হয়।

www.almodina.com

তারা জিজ্ঞেস করে : এ পাক আত্মা কার? ফেরেশতারা তার ঐ নাম ও উপাধি উল্লেখ করে করে, যা দুনিয়াতে তার সম্মানার্থে ব্যবহার হতো এবং বলে : ইনি হচ্ছেন অমুকের পুত্র অমুক। ফেরেশতারা তার আত্মাকে নিয়ে প্রথম আকাশে পৌছে দরজা খোলতে বলে। দরজা খোলা হয়। এখান থেকে আরও ফেরেশতা তাদের সঙ্গী হয়। এভাবে তারা সপ্তম আকাশে পৌছে। তখন আল্লাহ তা'আলা বলেন: আমার এ বান্দার আমলনামা ইল্লিয়্যীনে লিখ এবং তাকে ফেরত পাঠিয়ে দাও। এ আত্মা আবার কবরে ফিরে আসে। কবরে হিসাব গ্রহণকারী ফেরেশতা এসে তাকে উপবেশন করায় এবং প্রশ্ন করে : তোমার পালনকর্তা কে? তোমার ধর্ম কি? সে বলে, আমার পালনকর্তা আল্লাহ তা'আলা এবং ধর্ম ইসলাম। এরপর প্রশ্ন হয় : এই যে ব্যক্তি, যিনি তোমাদের জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন, তিনি কে? সে বলে: ইনি আল্লাহর রাসূল । তখন একটি গায়বি আওয়াজ আসে যে আমার বান্দা সত্যবাদী। তার জন্য জান্নতের শয্যা পেতে দাও, জান্নাতের পোষাক পরিয়ে দাও এবং জান্নাতের দিকে তার দরজা খুলে দাও। এ দরজা দিয়ে জান্নাতের সুগন্ধি ও বাতাস আসতে থাকে। তার সৎকর্ম একটি সুশ্রী আকৃতি ধারণ করে তাকে সঙ্গ দেওয়ার জন্য তার কাছে এসে যায়।

'এর বিপরীতে কাফেরের মৃত্যু সময় উপস্থিত হলে আকাশ থেকে কাল রঙের ভয়ঙ্কর মূর্তি ফেরেশতা নিকৃষ্ট চট নিয়ে আগমন করে এবং তার বিপরীত দিকে বসে যায়। অতঃপর মৃত্যুদূত তার আত্মা এমনভাবে বের করে, যেমন কোনো কাঁটা বিশিষ্ট শাখা ভিজা পশমে জড়িয়ে থাকলে তাকে সেখান থেকে টেনে বের করা হয়। আত্মা বের হলে তার দুর্গন্দ মৃত জন্তুর দুর্গন্ধের চাইতেও প্রকট হয়। ফেরেশতারা তাকে নিয়ে রওয়ানা হলে পথিমধ্যে একদল ফেরেশতার সাথে সাক্ষাৎ হয়। তারা জিজ্ঞেস করে : এ দুরাত্মাটি কার? ফেরেশতারা তখন তার ঐ হীনতম নাম ও উপাধি উল্লেখ করে যা দ্বারা সে দুনিয়াতে পরিচিত ছিল। অর্থাৎ সে অমুকের পুত্র অমুক। অতঃপর প্রথম আকাশে পৌছে দরজা খুলতে বললে তার জন্য দরজা খোলা হয় না; বরং নির্দেশ আসে যে, এ বান্দার আমলনামা সিজ্জীনে রেখে দাও। সেখানে অবাধ্য বান্দাদের আমলনামা রাখা হয়। এ আত্মাকে নীচে নিক্ষেপ করা হয় এবং তা পুনরায় দেহে প্রবেশ করে। ফেরেশতারা তাকে কবরে বসিয়ে মুমিন বান্দার অনুরূপ প্রশ্ন করে সে প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তরে কেবল هَاهْ هَاهْ لَا أَدْرِي (হায় হায়! আমি জান না) বলে। তাকে জাহান্নামের শয্যা ও জাহান্নামের পোষাক দেওয়া হয় এবং জাহান্নামের দিকে দরজা খুলে দেওয়া হয়। ফলে তার কবরে জাহান্নামের উত্তাপ পৌছতে থাকে এবং কবরকে তার জন্য সংকীর্ণ করে দেওয়া হয়। আয়াতের শেষে তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে : وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتّٰى يَلِجَ الْجَمَلُ فِيْ سَمِّ الْخِيَاطِ

يَلِجُ শব্দটি وُلُوْجٌ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ সংকীর্ণ জায়গায় প্রবেশ করা। جَمَلٌ-এর অর্থ উট এবং سَمٌّ-এর অর্থ সূচের ছিদ্র। অর্থ এই যে, তারা ততক্ষণ পর্যন্ত জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না, যতক্ষণ না উটের মতো বিরাট-বপু জন্তু সূচের ছিদ্র দিয়ে প্রবেশ করবে। উদ্দেশ্য এই যে, সূচের ছিদ্রে উট প্রবেশ করা যেমন স্বভাবত অসম্ভব, তেমনি তাদের জান্নাতে প্রবেশ করাও অসম্ভব। এতে তাদের চিরস্থায়ী জাহান্নামের শাস্তি বর্ণনা করে বলা হয়েছে : لَهُمْ مِّنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَّمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ - مِهَادٌ শব্দের অর্থ বিছানা এবং غَوَاشٍ শব্দটি غَاشِيَةٌ-এর বহুবচন। এর অর্থ আবৃতকারী বস্তু। উদ্দেশ্য এই যে, তাদের চাদর ও শয্যা সবই জাহান্নামের হবে। ৪০ নং আয়াতে জান্নাত থেকে বঞ্চিত হওয়ার কথা বলা হয়েছিল। তার শেষে وَكَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِيْنَ; বলা হয়েছিল। ৪১ নং আয়াতে জাহান্নামের শাস্তি বর্ণনা করার পর وَكَذٰلِكَ نَجْزِي الظّٰلِمِيْنَ; বলা হয়েছে। কেননা এটি আগেরটির চাইতে গুরুতর।

৪২ নং আয়াতে আল্লাহর নির্দেশাবলি যারা পালন করে, তাদের কথা বলা হয়েছে যে, তারা জান্নাতের অধিবাসী এবং জান্নাতেই অনন্তকাল বসবাস করবে।

শরিয়তের নির্দেশাবলি সহজ করা হয়েছে : কিন্তু তাদের জন্য সেখানে বিশ্বাস স্থাপন করা ও সৎকর্ম সম্পাদন করার শর্ত উল্লেখ করা হয়েছে, যেখানে কৃপাবশত : এ কথাও বলা হয়েছে : لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا; অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা কোনো বান্দার উপর এমন বোঝা চাপান না, যা তার শক্তি ও সাধ্যের বাইরে। উদ্দেশ্য এই যে, জান্নাতে প্রবেশ করার জন্য যেসব সৎকর্ম শর্ত করা হয়েছে সেগুলো মানুষের সাধ্যাতীত কঠিন কাজ নয়; বরং আল্লাহ তা'আলা প্রতি ক্ষেত্রেই শরিয়তের নির্দেশাবলি নরম ও সহজ করেছেন। প্রত্যেক নির্দেশে অসুস্থতা, দুর্বলতা, সফর ও অন্যান্য মানবিক প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে।

www.almodina.com

তাফসীরে বাহরে মুহীতে বলা হয়েছে : মানুষকে সৎকর্মের আদেশ দেওয়ার সময় এরূপ সম্ভাবনা ছিল যে, সব সৎকর্ম সর্বত্র ও সর্বাবস্থায় পালন করা মানুষের সাধ্যাতীত হওয়ার কারণে আদেশটি তাদের জন্য কঠিন হতে পারে। তাই এ সন্দেহ দূরী করণার্থে বলা হয়েছেঃ আমি মানব জীবনের সকল কাল ও অবস্থা যাচাই করে সর্বাবস্থায় সব সময় ও সব জায়গার জন্য উপযুক্ত নির্দেশাবলি প্রদান করি। এগুলোর বাস্তবায়ন মোটেই কঠিন কাজ নয়।

জান্নাতীদের মন থেকে পারস্পরিক মালিন্য অপসারণ করা হবে : ৪৩ নং আয়াতে জান্নাতীদের দু'টি বিশেষ অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। [এক] وَنَزَعْنَا مَا فِىْ صُدُوْرِهِمْ مِّنْ غِلٍّ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهِمُ الْاَنْهٰرُ অর্থাৎ জান্নাতীদের অন্তরে পরস্পরের পক্ষ থেকে যদি কোনো মালিন্য থাকে, তবে আমি তা তাদের অন্তর থেকে অপসারণ করে দিব। তারা একে অপরের প্রতি সন্তুষ্ট ও ভাই ভাই হয়ে জান্নাতে যাবে এবং বসবাস করবে।

সহীহ বুখারীতে বর্ণিত আছে যে, মুমিনরা যখন পুলসিরাত অতিক্রম করে জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভ করবে, তখন জান্নাত ও দোজখের মধ্যবর্তী এক পুলের উপর তাদেরকে থামিয়ে দেওয়া হবে। তাদের পরস্পরের মধ্যে যদি কারো প্রতি কারো কোনো কষ্ট থাকে কিংবা কারো কাছে কারো পাওনা থাকে, তবে এখানে পৌঁছে পরস্পরে প্রতিদান নিয়ে পারস্পরিক সম্পর্ক পরিষ্কার করে নেবে। এভাবে হিংসা, বিদ্বেষ, শত্রুতা, ঘৃণা ইত্যাদি থেকে সম্পূর্ণ পুতপবিত্র হয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

তাফসীর মাযহারীতে আছে, এ পুল বাহ্যত পুলসিরাতের শেষ প্রান্ত এবং জান্নাত সংলগ্ন। আল্লামা সুয়ূতী প্রমুখ এ মতই গ্রহণ করেছেন।

এ স্থলে যেসব পাওনা দাবি করা হবে সেগুলো টাকা পয়সা দ্বারা পরিশোধ করা যাবে না। কারণ সেখানে কারও কাছে টাকা পয়সা থাকবে না। মুসলিমের এক হাদীস অনুযায়ী সৎকর্ম দ্বারা এ সব পাওনা পরিশোধ করা হবে। যদি কারো সৎকর্ম এভাবে নিঃশেষিত হয়ে যায় এবং তার পরেও পাওনা বাকি থাকে, তবে প্রাপকের গুনাহ তার উপর চাপিয়ে দেওয়া হবে।

এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ এরূপ ব্যক্তিকে সর্বাধিক নিঃস্ব বলে আখ্যা দিয়েছেন, যে দুনিয়োতে সৎকর্ম সম্পাদন করে, কিন্তু অপরের পাওনার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করে না, ফলে পরকালে সে যাবতীয় সৎকর্ম থেকে রিক্তহস্ত হয়ে পড়ে।

এ হাদীসে পাওনা পরিশোধের সাধারণ বিধি বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু সবার ক্ষেত্রে এরূপ করা জরুরি নয়। ইবনে কাছীর ও তাফসীরে মাযহারীর বর্ণনা অনুযায়ী সেখানে প্রতিশোধ গ্রহণ ব্যতিরেকে পারস্পরিক হিংসা ও মলিন্য দূর হয়ে যাওয়াও সম্ভব।

যেমন, কোনো কোনো হাদীসে আছে, তারা পুলসিরাত অতিক্রম করে একটি ঝর্ণার কাছে পৌঁছবে এবং পানি পান করবে। এ পানির বৈশিষ্ট্য এই যে, সবার মন থেকে পারস্পরিক হিংসা ও মালিন্য ধুয়ে মুছে যাবে। ইমাম কুরতুবী (র.) কুরআন পাকের وَسَقٰهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُوْرًا আয়াতের তাফসীরও তাই বর্ণনা করেছেন যে, এ পানি দ্বারা সবার মনের কলহ ও মালিন্য ধুয়ে পরিষ্কার হয়ে যাবে।

হযরত আলী (রা.) একবার এ আয়াতে পাঠ করে বললেন : আমি আশা করি আমি, ওসামান, তালহা ও যুবায়ের ঐ সব লোকের অন্তর্ভুক্ত হব, যাদের বক্ষ জান্নাতে প্রবেশের পূর্বে মনোমালিন্য থেকে পরিষ্কার করে দেওয়া হবে। –[ইবনে কাছীর] বলাবাহুল্য দুনিয়াতে তাদের পারস্পরিক মতবিরোধ দেখা দেওয়ার ফলে যুদ্ধ পর্যন্ত সংঘটিত হয়েছিল।

আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত জান্নাতীদের দ্বিতীয় অবস্থা এই যে, জান্নাতে পৌঁছে তারা আল্লাহ তা'আলার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে যে, তিনি তাদেরকে জান্নাতের দিকে পথ প্রদর্শন করেছেন এবং জান্নাতের পথ সহজ করে দিয়েছেন। তারা বলবে; যদি আল্লাহ তা'আলার কৃপা না করতেন তবে এখানে পৌঁছার সাধ্য আমাদের ছিলনা।

এতে বোঝা যায় যে, কোনো মানুষ কেবল স্বীয় প্রচেষ্টায় জান্নাতে যেতে পাবে না, যে পর্যন্ত না তার প্রতি আল্লাহ তা'আলার কৃপা হয়। কেননা স্বয়ং প্রচেষ্টা তার ইচ্ছাধীন নয়। এটাও শুধু আল্লাহ তা'আলার দয়া ও অনুগ্রহে-ই অর্জিত হয়ে থাকে।

হেদায়েতের বিভিন্ন স্তর : ইমাম রাগেব ইস্পাহানী 'হেদায়েত' শব্দের ব্যাখ্যায় অত্যন্ত চমৎকার ও গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন। তা এই যে, 'হেদায়েত' শব্দটি অত্যন্ত ব্যাপক। এর বিভিন্ন স্তর রয়েছে। সত্য এই যে, আল্লাহর দিকে যাওয়ার পথ প্রাপ্তির নামই হেদায়েত। তাই আল্লাহর নৈকট্যের স্তর যেমন বিভিন্ন ও অনন্ত , তেমনি হেদায়েতের স্তরও অত্যধিক বিভিন্ন। কুফর ও শিরক থেকে মুক্তি ও ঈমান এর সর্বনিম্ন স্তর। এরই মাধ্যমে মানুষের গতিধারা ভ্রান্ত পথ থেকে সরে

আল্লাহমুখী হয়ে যায়। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা ও বান্দার মধ্যে যে ব্যবধান রয়েছে, তা অতিক্রম করার প্রত্যেক স্তরই হেদায়েত। তাই হেদায়েত অন্বেষণ থেকে কখনও কোনো মানব এমনকি, নবী রাসূল পর্যন্ত নির্লিপ্ত হতে পারেন না। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ ﷺ জীবনের শেষ পর্যন্ত اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ দোয়াটি যেমন উম্মতকে শিক্ষা দিয়েছেন, তেমনি নিজেও যত্নসহকারে অব্যাহত রেখেছেন। কেননা আল্লাহর নৈকট্যের স্তরের কোনো শেষ নেই। এমন কি আলোচ্য আয়াতে জান্নাতে প্রবেশকেও হেদায়েত শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। কেননা এটি হচ্ছে হেদায়েতের সর্বশেষ স্তর।

শব্দ বিশ্লেষণ

اِدَّارَكُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفَّاعُلٌ মাসদার اَلْاِدَّارُكُ মূলবর্ণ (د . ر . ك) জিনস صحيح অর্থ– তারা একত্রিত হবে।

اُوْلٰهُمْ : শব্দটি একবচন; বহুবচন اُوْلَيَاتٌ অর্থ– প্রথম, শুরু, আদি।

اُخْرٰهُمْ : শব্দটি একবচন; বহুবচন اُخْرَيَاتٌ অর্থ– অন্য, অপর, দ্বিতীয়।

فَضْلٌ : শব্দটি একবচন; বহুবচন اَفْضَالٌ অর্থ– শ্রেষ্ঠত্ব, মর্যাদা, ফজিলত।

يَلِجُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْوُلُوْجُ মূলবর্ণ (و . ل . ج) জিনস مثال واوى অর্থ– সে প্রবেশ করবে।

جَمَلٌ : শব্দটি একবচন; বহুবচন جِمَالٌ ও اَجْمَالٌ অর্থ– উট।

سَمٌّ : শব্দটি একবচন; বহুবচন سُمُوْمٌ، سِمَامٌ অর্থ– সুঁচের ছিদ্র, ছিদ্র।

خِيَاطٌ : শব্দটি একবচন; বহুবচন خِيَاطَاتٌ অর্থ– সুঁই, সুঁচ।

خٰلِدُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব نَصَرَ মাসদার اَلْخُلُوْدُ মূলবর্ণ (خ . ل . د) জিনস صحيح অর্থ– স্থায়ী, চিরস্থায়ী।

نُوْدُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى مجهول বাব مُفَاعَلَةٌ মাসদার اَلْمُنَادَاةُ মূলবর্ণ (ن . د . ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– তাদের আহ্বান করা হবে।

اُوْرِثْتُمُوْهَا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ ماضى مجهول বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِيْرَاثُ মূলবর্ণ (و . ر . ث) জিনস مثال واوى অর্থ– তোমাদেরকে উত্তরাধিকারী করা হয়েছে।

وَنَادٰٓى اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ اَصْحٰبَ النَّارِ اَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُّمْ مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا ۚ قَالُوْا نَعَمْ ۚ فَاَذَّنَ مُؤَذِّنٌۢ بَيْنَهُمْ اَنْ لَّعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الظّٰلِمِيْنَ (٤٤)

অনুবাদ : (৪৪) আর জান্নাতবাসীরা জাহান্নামবাসীদেরকে ডেকে বলবে, আমাদের সাথে আমাদের প্রতিপালক যে ওয়াদা করেছেন, আমরা তো তা যথার্থভাবে প্রাপ্ত হয়েছি, তবে তোমরাও কি প্রাপ্ত হয়েছ যথার্থভাবে তোমাদের রব তোমাদের সাথে যার ওয়াদা করেছিলেন? তারা বলবে, হ্যাঁ, অনন্তর এক ঘোষণাকারী উভয়ের মধ্যবর্তী স্থানে [দাঁড়িয়ে] ঘোষণা করবে যে, আল্লাহর লা'নত হোক সেই জালেমদের উপর।

الَّذِيْنَ يَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَيَبْغُوْنَهَا عِوَجًا ۚ وَّهُمْ بِالْاٰخِرَةِ كٰفِرُوْنَ (٤٥)

(৪৫) যারা আল্লাহর পথ হতে বিরত থাকত এবং তাতে বক্রতা অন্বেষণ করত এবং তারা পরকালের প্রতিও অবিশ্বাসী ছিল।

وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ ۚ وَعَلَى الْاَعْرَافِ رِجَالٌ يَّعْرِفُوْنَ كُلًّاۢ بِسِيْمٰهُمْ ۚ وَنَادَوْا اَصْحٰبَ الْجَنَّةِ اَنْ سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ ۣ لَمْ يَدْخُلُوْهَا وَهُمْ يَطْمَعُوْنَ (٤٦)

(৪৬) আর এতদুভয় সম্প্রদায়ের মধ্যস্থলে একটি ব্যবধায়ক [প্রাচীর] থাকবে, এবং আ'রাফে, বহু লোক অবস্থান করবে, তারা প্রত্যেককে তার লক্ষণ দ্বারা চিনতে পারবে, এবং তারা জান্নাতবাসীকে ডেকে বলবে, আস্‌সালামু আলাইকুম! এই আ'রাফবাসীরা এখনো বেহেশতে প্রবেশ করেনি এবং তার আশায় রয়েছে।

وَاِذَا صُرِفَتْ اَبْصَارُهُمْ تِلْقَآءَ اَصْحٰبِ النَّارِ ۙ قَالُوْا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ (٤٧)

(৪৭) আর যখন তাদের দৃষ্টি জাহান্নামবাসীদের প্রতি পতিত হবে, তখন বলবে, হে আমাদের পরওয়ারদেগার! আমাদেরকে এই জালেম লোকদের সহচর করবেন না।

শাব্দিক অনুবাদ

(৪৪) وَنَادٰٓى اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ اَصْحٰبَ النَّارِ আর জান্নাতবাসীরা জাহান্নামবাসীদেরকে ডেকে বলবে اَنْ قَدْ وَجَدْنَا আমরা তো তা প্রাপ্ত হয়েছি مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا আমাদের সাথে আমাদের প্রতিপালক যে ওয়াদা করেছেন حَقًّا যথার্থভাবে فَهَلْ وَجَدْتُّمْ তবে তোমরাও কি প্রাপ্ত হয়েছ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا যথার্থভাবে তোমাদের রব তোমাদের সাথে যার ওয়াদা করেছিলেন? قَالُوْا তারা বলবে نَعَمْ হ্যাঁ فَاَذَّنَ مُؤَذِّنٌۢ بَيْنَهُمْ অনন্তর এক ঘোষণাকারী উভয়ের মধ্যবর্তী স্থানে [দাঁড়িয়ে] ঘোষণা করবে যে اَنْ لَّعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الظّٰلِمِيْنَ আল্লাহর লা'নত হোক সেই জালেমদের উপর।

(৪৫) الَّذِيْنَ যারা يَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ আল্লাহর পথ হতে বিরত থাকত وَيَبْغُوْنَهَا عِوَجًا এবং তাতে বক্রতা অন্বেষণ করত وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ كٰفِرُوْنَ এবং তারা পরকালের প্রতিও অবিশ্বাসী ছিল।

(৪৬) وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ আর এতদুভয় সম্প্রদায়ের মধ্যস্থলে একটি ব্যবধায়ক [প্রাচীর] থাকবে وَعَلَى الْاَعْرَافِ رِجَالٌ এবং আ'রাফে, বহু লোক অবস্থান করবে يَعْرِفُوْنَ كُلًّاۢ بِسِيْمٰهُمْ তারা প্রত্যেককে তার লক্ষণ দ্বারা চিনতে পারবে وَنَادَوْا اَصْحٰبَ الْجَنَّةِ এবং তারা জান্নাতবাসীকে ডেকে বলবে اَنْ سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ আস্‌সালামু আলাইকুম! لَمْ يَدْخُلُوْهَا এই আ'রাফবাসীরা এখনো বেহেশতে প্রবেশ করেনি وَهُمْ يَطْمَعُوْنَ এবং তার আশায় রয়েছে।

(৪৭) وَاِذَا صُرِفَتْ اَبْصَارُهُمْ আর যখন তাদের দৃষ্টি পতিত হবে تِلْقَآءَ اَصْحٰبِ النَّارِ জাহান্নামবাসীদের প্রতি قَالُوْا তখন বলবে رَبَّنَا হে আমাদের পরওয়ারদেগার! لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ আমাদেরকে এই জালেম লোকদের সহচর করবেন না।

www.almodina.com

وَنَادٰۤى اَصْحٰبُ الْاَعْرَافِ رِجَالًا يَّعْرِفُوْنَهُمْ بِسِيْمٰىهُمْ قَالُوْا مَاۤ اَغْنٰى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُوْنَ (٤٨)

অনুবাদ : (৪৮) আর আ'রাফবাসীগণ বহু লোককে যাদেরকে তারা লক্ষণ দ্বারা চিনবে- ডাকবে- [এবং] বলবে, তোমাদের দলবল এবং তোমাদের আত্মম্ভরিতা তোমাদের কোনো কাজে আসবে না।

اَهٰۤؤُلَآءِ الَّذِيْنَ اَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللّٰهُ بِرَحْمَةٍ ؕ اُدْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَاۤ اَنْتُمْ تَحْزَنُوْنَ (٤٩)

(৪৯) তারা কি সেই [মুসলমান] লোক যাদের সম্পর্কে তোমরা শপথ করে বলতে যে, তাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ প্রদর্শন করবেন না, [এখন তো] তাদের প্রতি এই আদেশ হলো- তোমরা বেহেশতে দাখিল হয়ে যাও, তোমাদের কোনো ভয়ও নেই, এবং তোমরা চিন্তান্বিত হবে না।

وَنَادٰۤى اَصْحٰبُ النَّارِ اَصْحٰبَ الْجَنَّةِ اَنْ اَفِيْضُوْا عَلَيْنَا مِنَ الْمَآءِ اَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ ؕ قَالُوْۤا اِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكٰفِرِيْنَ (٥٠)

(৫০) আর জাহান্নামবাসীরা বেহেশত বাসীদেরকে ডেকে বলবে, আমাদের উপর সামান্য পানিই নিক্ষেপ কর, অথবা অন্য কিছুই দান কর, যা আল্লাহ পাক তোমাদেরকে দিয়েছেন, জান্নাতীরা বলবে, আল্লাহ তা'আলা উভয় বস্তুই কাফেরদের জন্য নিষিদ্ধ করে রেখেছেন।

الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا دِيْنَهُمْ لَهْوًا وَّلَعِبًا وَّغَرَّتْهُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا ۚ فَالْيَوْمَ نَنْسٰىهُمْ كَمَا نَسُوْا لِقَآءَ يَوْمِهِمْ هٰذَا ۙ وَمَا كَانُوْا بِاٰيٰتِنَا يَجْحَدُوْنَ (٥١)

(৫১) যারা ইহলোকে নিজেদের ধর্মকে খেল ও তামাশা করে রেখেছিল, এবং পার্থিব জীবন যাদেরকে ধোঁকায় ফেলে রেখেছিল। অতএব, আমি আজ তাদের নাম নিব না যেরূপ তারা আজকের এই [মহান] দিনের নাম পর্যন্ত নেয়নি, আর যেরূপ তারা আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করত।

শাব্দিক অনুবাদ

(৪৮) وَنَادٰى اَصْحٰبُ الْاَعْرَافِ আর আ'রাফবাসীগণ ডাকবে- رِجَالًا বহু লোককে يَّعْرِفُوْنَهُمْ بِسِيْمٰىهُمْ যাদেরকে তারা লক্ষণ দ্বারা চিনবে- قَالُوْا [এবং] বলবে مَاۤ اَغْنٰى عَنْكُمْ তোমাদের কোনো কাজে আসবে না جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُوْنَ তোমাদের দলবল এবং তোমাদের আত্মম্ভরিতা।

(৪৯) اَهٰۤؤُلَآءِ الَّذِيْنَ اَقْسَمْتُمْ তারা কি সেই [মুসলমান] লোক যাদের সম্পর্কে তোমরা শপথ করে বলতে যে لَا يَنَالُهُمُ اللّٰهُ بِرَحْمَةٍ তাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ প্রদর্শন করবেন না اُدْخُلُوا الْجَنَّةَ [এখন তো] তাদের প্রতি এই আদেশ হলো- তোমরা বেহেশতে দাখিল হয়ে যাও لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ তোমাদের কোনো ভয়ও নেই وَلَاۤ اَنْتُمْ تَحْزَنُوْنَ এবং তোমরা চিন্তান্বিত হবে না।

(৫০) وَنَادٰى اَصْحٰبُ النَّارِ আর জাহান্নামবাসীরা ডেকে বলবে اَصْحٰبَ الْجَنَّةِ জান্নাতবাসীদেরকে اَنْ اَفِيْضُوْا عَلَيْنَا مِنَ الْمَآءِ আমাদের উপর সামান্য পানিই নিক্ষেপ কর اَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ অথবা অন্য কিছুই দান কর, যা আল্লাহ পাক তোমাদেরকে দিয়েছেন قَالُوْۤا জান্নাতীরা বলবে اِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكٰفِرِيْنَ আল্লাহ তা'আলা উভয় বস্তুই কাফেরদের জন্য নিষিদ্ধ করে রেখেছেন।

(৫১) الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا যারা ইহলোকে করে রেখেছিল دِيْنَهُمْ নিজেদের ধর্মকে لَهْوًا وَّلَعِبًا খেল ও তামাশা وَّغَرَّتْهُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا এবং পার্থিব জীবন যাদেরকে ধোঁকায় ফেলে রেখেছিল فَالْيَوْمَ نَنْسٰىهُمْ অতএব, আমি আজ তাদের নাম নিব না كَمَا نَسُوْا لِقَآءَ يَوْمِهِمْ هٰذَا যেরূপ তারা আজকের এই [মহান] দিনের নাম পর্যন্ত নেয়নি وَمَا كَانُوْا بِاٰيٰتِنَا يَجْحَدُوْنَ আর যেরূপ তারা আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(৪৪) وَنَادٰى اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ اَصْحٰبَ النَّارِ الخ **আয়াতের শানে নুযূল** : ওলীদ ইবনে মুগীরা, 'আস ইবনে ওয়ায়েল প্রভৃতি কাফের অংশীবাদীগণ বলত যে, আম্মার, বেলাল ও সুহাইব প্রমুখ দরিদ্র ব্যক্তি জান্নাতে যাবে, আর আমরা সম্মানিত ব্যক্তিরা তাদের সাথে একই জান্নাতে অবস্থান করব, এটা কি সম্ভব? এ ভ্রান্ত ধারণার প্রতিবাদে আল্লাহ অত্র আয়াত অবতীর্ণ করে উভয় দলের প্রকৃত অবস্থার কথা তুলে ধরেছেন। প্রশ্নকারী ও প্রার্থনাকারী বলতে ঐ সকল লোকদেরকে বুঝতে হবে যাদের নিকট ধর্মের দাওয়াত পেশ করা হতো এবং তারা অবজ্ঞা ভরে তা প্রত্যাখ্যান করত ও ধর্মানুরাগীদের উপহাস প্রদর্শন করত।

জান্নাতীরা জান্নাতে এবং দোজখিরা দোজখে নিজ নিজ ঠিকানায় পৌঁছে গেলে বাহ্যতই উভয় স্থানের মধ্যে সব দিক দিয়ে বিরাট ব্যবধান হবে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও কুরআন পাকের অনেক আয়াত সাক্ষ্য দেয় যে, উভয় স্থানের মাঝখানে এমন কিছু রাস্তা থাকবে, যার ফলে একে অপরকে দেখতে পারবে এবং পরস্পরের মধ্যে কথাবার্তা ও প্রশ্নোত্তর হবে।

সূরা সাফফাতে দু'ব্যক্তির কথা বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। তারা দুনিয়াতে একে অপরের সঙ্গি ছিল। কিন্তু একজন ছিল মুমিন আর অপর জন ছিল কাফের। পরকালে যখন মুমিন জান্নাতে এবং কাফের দোজখে চলে যাবে। তখন তারা একে অপরকে দেখবে এবং কথা বার্তা বলবে। বলা হয়েছে। فَاطَّلَعَ فَرَاٰهُ فِیْ سَوَآءِ الْجَحِیْمِ قَالَ تَاللّٰهِ اِنْ كِدْتَّ لَتُرْدِیْنِ وَلَوْ لَا نِعْمَةُ رَبِّیْ لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِیْنَ اَفَمَا نَحْنُ بِمَیِّتِیْنَ اِلَّا مَوْتَتَنَا الْاُوْلٰى وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِیْنَ "জান্নাতী সাথি উকি দিয়ে দোজখী সাথিকে দেখবে এবং তাকে দোজখের মধ্যস্থলে পতিত পাবে। সে বলবে; হতভাগা, তোর ইচ্ছা ছিল আমিও তোর মতো বরবাদ হয়ে যাই। যদি আল্লাহর কৃপা না হতো, তবে আজ আমিও তোর সাথে জাহান্নামে পড়ে থাকতাম। তুমি আমাকে বলতে যে, এ দুনিয়ার মৃত্যুর পর কোনো জীবন, কোনো হিসাব কিতাব বা ছওয়াব আজাব হবে না।" এখন দেখলি এসব কি হচ্ছে?

আলোচ্য আয়াতেসমূহ ও পরবর্তী প্রায় এক রুকূ পর্যন্ত এধরনেরই কথাবার্তা ও প্রশ্নোত্তর বর্ণিত হয়েছে, যা জান্নাতী ও দোজখীদের মধ্যে হবে।

জান্নাত ও দোজখের মাঝখানে একে অপরকে দেখা ও কথাবার্তা বলার পথও প্রকৃতপক্ষে দোজখীদের জন্য এক প্রকার আজাব হবে। চারদিক থেকে তাদের প্রতি অভিসম্পাত বর্ষিত হবে। জান্নাতীদের নিয়ামত ও সুখ দেখে দোজখের আগুনের সাথে সাথে অনুতাপের আগুনেও তারা দগ্ধ হবে। অপরপক্ষে জান্নাতীদের নিয়ামত ও সুখে এক নতুন সংযোজন হবে। কেননা প্রতিপালকের বিপদ দেখে নিজ সুখ ও নিয়ামতের মূল্য বেড়ে যাবে। যারা দুনিয়াতে ধার্মিকদের প্রতি বিদ্রূপ-বাণ বর্ষণ করত এবং তারা কোনোরূপ প্রতিশোধ নিত না, আজ তাদেরকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত অবস্থায় আজাবে পতিত দেখে তারা হাসবে যে, তাদের কৃতকর্মের প্রতিফল তারা পেয়ে গেছে। কুরআন কারীমে এ বিষয়টি সূরা 'মুতাফফিফীনে' এভাবে বিধৃত হয়েছে : فَالْیَوْمَ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا مِنَ الْكُفَّارِ یَضْحَكُوْنَ عَلَى الْاَرَآئِكِ یَنْظُرُوْنَ - هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوْا یَفْعَلُوْنَ : দোজখীদেরকে তাদের পথভ্রষ্টতার জন্য হুশিয়ারি এবং বোকাসুলভ কথাবার্তার জন্য ফেরেশতাদের পক্ষ থেকেও তিরষ্কার করা হবে। তারা তাদেরকে সম্বোধন করে বলবে : هٰذِهِ النَّارُ الَّتِیْ كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُوْنَ - اَفَسِحْرٌ هٰذَا اَمْ اَنْتُمْ لَا تُبْصِرُوْنَ এ হচ্ছে ঐ আগুন, যাকে তোমরা মিথ্যা বলতে। এখন দেখ এটা কি জাদু, না তোমরা চোখে দেখ না।

এমনিভাবে ৪৪ নং আয়াতে বলা হয়েছে, যে, জান্নাতীরা দোজখীদেরকে প্রশ্ন করবে; আমাদের পালনকর্তা আমাদের সাথে যেসব নিয়ামত ও সুখের ওয়াদা করেছিলেন, আমরা সেগুলো সম্পূর্ণ সঠিক পেয়েছি। তোমরা বল, তোমাদেরকে যে শাস্তির ভয় প্রদর্শন করা হয়েছিল, তা তোমাদের সামনে এসেছে কিনা? তারা স্বীকার করবে যে, নিঃসন্দেহে আমরা তা প্রত্যক্ষ করেছি।

তাদের এ প্রশ্নোত্তরের সমর্থনে আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো ফেরেশতা ঘোষণা করবে যে, জালেমদের উপর আল্লাহ তা'আলার অভিসম্পাত হোক। তারা মানুষকে আল্লাহর পথে আসতে বাধা দিত এবং পরকালে অবিশ্বাস করত।

আ'রাফবাসী কারা : জান্নাতী ও দোজখীদের পারস্পরিক কথাবার্তা প্রসঙ্গে তৃতীয় আয়াতে আরও একটি বিষয় বর্ণিত হয়েছে যে, কিছু লোক এমনও থাকবে, যারা দোজখ থেকে তো মুক্তি পাবে, কিন্তু তখনও জান্নাতে প্রবেশ করবে না, তবে তারা জান্নাতে প্রবেশ করতে আশা পোষণ করবে। তাদেরকেই আ'রাফবাসী বলা হয়।

আ'রাফ কি? সূরা হাদীদের আয়াত থেকে এর ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। এতে জানা যায় যে, হাশরের ময়দানে তিনটি দল হবে। [এক] সুস্পষ্ট কাফের ও মুশরিক। এদের পুলসিরাতে চলার প্রশ্নই উঠবে না। এর আগেই জাহান্নামের দরজা দিয়ে

www.almodina.com

ভিতরে ঢুকিয়ে দেওয়া হবে। [দুই] মুমিনের দল। তাদের সাথে ঈমানের আলো থাকবে। [তিন] মুনাফিকের দল। এরা দুনিয়াতে মুসলমানদের সাথে লাগা থাকত। সেখানও প্রথম দিকে তাদের সাথে লাগা থাকবে এবং পুলসিরাতে চলতে শুরু করবে। তখন একটি ভীষণ অন্ধকার সবাইকে ঘিরে ফেলকে। মুমিনরা ঈমানের আলোর সাহায্যে সামনে এগিয়ে যাবে। মুনাফিকরা ডেকে ডেকে তাদেরকে বলবে : একটু আস। আমরাও তোমাদের আলো দ্বারা উপকৃত হই। এতে আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো ফেরেশতা বলবে ; পেছনে ফিরে যাও এবং সেখানেই আলো তালাশ কর। উদ্দেশ্য এই যে, এ আলো হচ্ছে ঈমান ও সৎকর্মের । এ আলো হাসিল করার স্থান পেছনে চলে গেছে। যারা সেখানে ঈমান ও সৎকর্মের মাধ্যমে এ আলো অর্জন করেনি, তারা আজ আলো দ্বারা উপকৃত হবে না। এমতাবস্থায় মুমিন ও মুনাফিকদের মধ্যে একটি প্রাচীর বেষ্টনী দাঁড় করিয়ে দেওয়া হবে। এতে একটি দরজা থাকবে। দরজার বাইরে কেবলই আজাব দৃষ্টি গোচর হবে এবং ভিতরে মুমিনরা থাকবে। তাদের সামনে আল্লাহর রহমত এবং জান্নাতের মনোরম পরিবেশ বিরাজ করবে।

وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ

ইবনে কাছীর ও অন্যান্য তফসীরের মতে এ আয়াতে حِجَابٌ বলে ঐ প্রাচীর বেষ্টনীকেই বুঝানো হয়েছে । এ প্রাচীর বেষ্টনীর উপরিভাগের নামই আ'রাফ। কেননা আ'রাফ ওরফের বহুবচন। এর অর্থ প্রত্যেক বস্তুর উপরিভাগ। কারণ দূর থেকে এ ভাগই মারুফ তথা খ্যাত হয়ে থাকে। এ ব্যাখ্যা থেকে জানা গেল যে, জান্নাত ও দোজখের মধ্যবর্তী প্রাচীর বেষ্টনীর উপরিভাগকে আ'রাফ বলা হয়। আয়াতে বলা হয়েছে যে, হাশরে এ স্থানে কিছু সংখ্যক লোক থাকবে। তারা জান্নাত ও দোজখ উভয় দিকের অবস্থা নিরীক্ষণ করবে এবং উভয়পক্ষের লোকদের সাথে প্রশ্নোত্তর ও কথা বার্তা বলবে।

সালামের মসনুন শব্দ : আ'রাফবাসীদের ব্যাখ্যা ও সংজ্ঞা জ্ঞাত হওয়ার পর এখন আয়াতের বিষয়বস্তু দেখুন। বলা হয়েছে : আ'রাফবাসীরা জান্নাতিদেরলে ডেকে বলবে: "সালামুন আলাইকুম"। এ বাক্যটি দুনিয়াতেও পারস্পারিক সাক্ষাতের সময় সম্মান প্রদর্শনার্থে বলা হয় এবং বলা সুন্নাত। মৃত্যুর পর কবর জেয়ারতের সময় এবং হাশর ও কিয়ামতেও বলা হবে। কিন্তু আয়াত ও হাদীসদৃষ্টে জানা যায় যে, দুনিয়াতে আসসালামু আলাইকুম বলা সুন্নত। কবর জেয়ারতের জন্য কুরআন পাকে سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ উল্লিখিত হয়েছে। ফেরেশতাগণ যখন জান্নাতীদেরকে অভ্যর্থনা জানাবে, তখনও বলা হবে : سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خٰلِدِيْنَ আলোচ্য আয়াতেও আ'রাফবাসীরা জান্নাতিদেরকে এ বাক্য দ্বারা সালাম করবে। অতঃপর আ'রাফবাসীদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তারা এখনও জান্নাতে প্রবেশ করেনি, কিন্তু এ ব্যাপারে আগ্রহী। অতঃপর বলা হয়েছে– وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَآءَ أَصْحٰبِ النَّارِ قَالُوْا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ অর্থাৎ 'আ'রাফবাসীদের দৃষ্টি যখন দোজখীদের উপর পড়বে এবং তাদের শাস্তি ও বিপদ প্রত্যক্ষ করবে, তখন আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করবে যে, আমাদেরকে এসব জালেমের সাথী করবেন না।'

শব্দ বিশ্লেষণ

لَعْنَةٌ : শব্দটি একবচন: বহুবচন لَعَنَاتٌ ও لِعَانٌ অর্থ– অভিশাপ, অভিসম্পাত।

يَبْغُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْبَغْىُ মূলবর্ণ (ب . غ . ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– তারা অনুসন্ধান করে। কামনা করে।

نَادَوْا সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব مُفَاعَلَةٌ মাসদার اَلْمُنَادَاةُ মূলবর্ণ (ن . د . ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– তারা ডেকে বলবে।

لَا يَنَالُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব سَمِعَ মাসদার اَلنَّيْلُ মূলবর্ণ (ن . ى . ل) জিনস اجوف يائى অর্থ– তিনি প্রদর্শন করবেন না।

اَفِيْضُوْا সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِفَاضَةُ মূলবর্ণ (ف . و . ض) জিনস اجوف واوى অর্থ– তোমরা নিক্ষেপ কর।

غَرَّتْهُمْ সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْغُرُوْرُ মূলবর্ণ (غ . ر . ر) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– সে প্রতারিত করেছিল।

www.almodina.com

وَلَقَدْ جِئْنٰهُمْ بِكِتٰبٍ فَصَّلْنٰهُ عَلٰى عِلْمٍ هُدًى وَّرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ (٥٢)

অনুবাদ : (৫২) আর আমি তাদের নিকট এমন এক কিতাব পৌছিয়েছি যাকে আমি স্বীয় জ্ঞান দ্বারা অতি স্পষ্টরূপে বর্ণনা করে দিয়েছি, [এটা] হেদায়েত ও রহমতের উপকরণ তাদের জন্য যারা ঈমান আনয়ন করে।

هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّا تَاْوِيْلَهٗ ؕ يَوْمَ يَاْتِىْ تَاْوِيْلُهٗ يَقُوْلُ الَّذِيْنَ نَسُوْهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ ۚ فَهَلْ لَّنَا مِنْ شُفَعَآءَ فَيَشْفَعُوْا لَنَآ اَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِىْ كُنَّا نَعْمَلُ ؕ قَدْ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ (٥٣)

(৫৩) তারা কেবল তার [নির্দেশিত] পরিণাম ব্যতীত আর কিছুরই প্রতীক্ষা করছে না, যেদিন তার শেষ পরিণতি সমাগত হবে, সেদিন যারা তাকে পূর্ব হতে ভুলে রয়েছে, তারা এরূপ বলবে বাস্তবিক আমাদের রবের রাসূলগণ সত্য কথাই আনয়ন করছিলেন, সুতরাং এখন কি আমাদের জন্য কোনো সুপারিশকারী আছে যে, তারা আমাদের জন্য সুপারিশ করবে, অথবা আমরা কি পুনঃ প্রেরিত হতে পারি? যেন আমরা তার বিপরীত কাজ করতে পারি যা পূর্বে করেছি, নিশ্চয় তারা নিজেদেরকে ক্ষতিতে পতিত করেছে এবং তারা যে সকল অলীক কল্পনা করত [আজ] তৎসমুদয় তাদের থেকে উধাও হয়ে গেছে।

اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِىْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ ۟ يُغْشِى الَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهٗ حَثِيْثًا ۙ وَّالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُوْمَ

(৫৪) নিঃসন্দেহে তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ, যিনি আসমানসমূহ ও জমিনকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর প্রতিষ্ঠিত হলেন আরশের উপর, তিনি আচ্ছন্ন করে দেন রাত্রি দ্বারা দিবসকে এরূপে যে, সেই রাত্রি দিবসের পানে দ্রুত পৌছে, এবং সূর্য ও চন্দ্র ও অন্যান্য নক্ষত্ররাজিকেও সৃষ্টি করেছেন

শাব্দিক অনুবাদ

(৫২) وَلَقَدْ جِئْنٰهُمْ بِكِتٰبٍ আর আমি তাদের নিকট এমন এক কিতাব পৌছিয়েছি فَصَّلْنٰهُ عَلٰى عِلْمٍ যাকে আমি স্বীয় জ্ঞান দ্বারা অতি স্পষ্টরূপে বর্ণনা করে দিয়েছি هُدًى وَّرَحْمَةً [এটা] হেদায়েত ও রহমতের উপকরণ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ তাদের জন্য যারা ঈমান আনয়ন করে।

(৫৩) هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّا تَاْوِيْلَهٗ তারা কেবল তার [নির্দেশিত] পরিণাম ব্যতীত আর কিছুরই প্রতীক্ষা করছে না يَوْمَ يَاْتِىْ تَاْوِيْلُهٗ যেদিন তার শেষ পরিণতি সমাগত হবে يَقُوْلُ الَّذِيْنَ نَسُوْهُ مِنْ قَبْلُ সেদিন যারা তাকে পূর্ব হতে ভুলে রয়েছে তারা এরূপ বলবে قَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ বাস্তবিক আমাদের রবের রাসূলগণ সত্য কথাই আনয়ন করছিলেন فَهَلْ لَّنَا مِنْ شُفَعَآءَ সুতরাং এখন কি আমাদের জন্য কোনো সুপারিশকারী আছে যে فَيَشْفَعُوْا لَنَآ তারা আমাদের জন্য সুপারিশ করবে اَوْ نُرَدُّ অথবা আমরা কি পুনঃ প্রেরিত হতে পারি? فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِىْ كُنَّا نَعْمَلُ যেন আমরা তার বিপরীত কাজ করতে পারি যা পূর্বে করেছি قَدْ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ নিশ্চয় তারা নিজেদেরকে ক্ষতিতে পতিত করেছে وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ এবং তারা যে সকল অলীক কল্পনা করত [আজ] তৎসমুদয় তাদের থেকে উধাও হয়ে গেছে।

(৫৪) اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ নিঃসন্দেহে তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ যিনি আসমানসমূহ ও জমিনকে সৃষ্টি করেছেন فِىْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ছয় দিনে ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ অতঃপর প্রতিষ্ঠিত হলেন আরশের উপর يُغْشِى الَّيْلَ النَّهَارَ তিনি আচ্ছন্ন করে দেন রাত্রি দ্বারা দিবসকে এরূপে যে يَطْلُبُهٗ حَثِيْثًا সেই রাত্রি দিবসের পানে দ্রুত পৌছে وَّالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُوْمَ এবং সূর্য ও চন্দ্র ও অন্যান্য নক্ষত্ররাজিকেও সৃষ্টি করেছেন

www.almodina.com

مُسَخَّرٰتٍۭ بِاَمْرِهٖ ؕ اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ ؕ تَبٰرَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ (٥٤)

অনুবাদ : এমনভাবে যে, সকলেই তাঁর আদেশের অনুবর্তী, স্মরণ রেখ, আল্লাহরই জন্য নির্দিষ্ট রয়েছে স্রষ্টা হওয়া এবং আদেশ প্রদান করা, সকল গুণে পরিপূর্ণ আল্লাহ, যিনি সমগ্র বিশ্বের প্রতিপালক।

اُدْعُوْا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً ؕ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ (٥٥)

(৫৫) তোমরা স্বীয় প্রতিপালকের হুযূরে দোয়া করবে, বিনীতভাবে এবং চুপি চুপিও, নিশ্চয় আল্লাহ ঐ সমস্ত লোককে পছন্দ করেন না যারা সীমা অতিক্রমকারী।

وَلَا تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا وَادْعُوْهُ خَوْفًا وَّطَمَعًا ؕ اِنَّ رَحْمَتَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيْنَ (٥٦)

(৫৬) আর তোমরা ভূপৃষ্ঠে ফ্যাসাদ সৃষ্টি করো না, তার সংস্কারের পর এবং তোমরা আল্লাহর ইবাদত করতে থাক ভয় ও আশা সহকারে; নিশ্চয় আল্লাহর রহমত নেককারদের নিকটবর্তী।

وَهُوَ الَّذِىْ يُرْسِلُ الرِّيٰحَ بُشْرًاۢ بَيْنَ يَدَىْ رَحْمَتِهٖ ؕ حَتّٰۤى اِذَاۤ اَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنٰهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَاَنْزَلْنَا بِهِ الْمَآءَ فَاَخْرَجْنَا بِهٖ مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ ؕ كَذٰلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتٰى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ (٥٧)

(৫৭) আর তিনি এরূপ যে, স্বীয় রহমতরূপ বৃষ্টির পূর্বে বায়ুরাশি প্রেরণ করেন, যা আনন্দিত করে দেয়, এমন কি যখন সেই বায়ুরাশি ভারি মেঘমালাকে বহন করে নেয়, তখন আমি সেই মেঘমালাকে কোনো শুষ্ক ভূখণ্ডের দিকে পরিচালিত করি, অনন্তর সেই মেঘমালা হতে বারি বর্ষণ করি তৎপর সেই পানির দ্বারা সর্বপ্রকার ফল উৎপন্ন করি, এরূপে আমি মৃতদেরকে [জমিন হতে] বের করে দাঁড় করাব, যেন তোমরা বুঝতে পার।

শাব্দিক অনুবাদ

مُسَخَّرٰتٍۭ بِاَمْرِهٖ যে, সকলেই তাঁর আদেশের অনুবর্তী اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ স্মরণ রেখ, আল্লাহরই জন্য নির্দিষ্ট রয়েছে স্রষ্টা হওয়া এবং আদেশ প্রদান করা تَبٰرَكَ اللّٰهُ সকল গুণে পরিপূর্ণ আল্লাহ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ যিনি সমগ্র বিশ্বের প্রতিপালক।

(৫৫) اُدْعُوْا رَبَّكُمْ তোমরা স্বীয় প্রতিপালকের হুযূরে দোয়া করবে تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً বিনীতভাবে এবং চুপি চুপিও اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ নিশ্চয় আল্লাহ ঐ সমস্ত লোককে পছন্দ করেন না الْمُعْتَدِيْنَ যারা সীমা অতিক্রমকারী।

(৫৬) وَلَا تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ আর তোমরা ভূপৃষ্ঠে ফ্যাসাদ সৃষ্টি করো না بَعْدَ اِصْلَاحِهَا তার সংস্কারের পর وَادْعُوْهُ এবং তোমরা আল্লাহর ইবাদত করতে থাক خَوْفًا وَّطَمَعًا ভয় ও আশা সহকারে اِنَّ رَحْمَتَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيْنَ নিশ্চয় আল্লাহর রহমত নেককারদের নিকটবর্তী।

(৫৭) وَهُوَ الَّذِىْ يُرْسِلُ الرِّيٰحَ بُشْرًاۢ بَيْنَ يَدَىْ رَحْمَتِهٖ আর তিনি এরূপ যে, স্বীয় রহমতরূপ বৃষ্টির পূর্বে বায়ুরাশি প্রেরণ করেন, যা আনন্দিত করে দেয় حَتّٰۤى اِذَاۤ اَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا এমন কি যখন সেই বায়ুরাশি ভারি মেঘমালাকে বহন করে নেয় سُقْنٰهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ তখন আমি সেই মেঘমালাকে কোনো শুষ্ক ভূখণ্ডের দিকে পরিচালিত করি فَاَنْزَلْنَا بِهِ الْمَآءَ অনন্তর সেই মেঘমালা হতে বারি বর্ষণ করি فَاَخْرَجْنَا بِهٖ مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ তৎপর সেই পানির দ্বারা সর্বপ্রকার ফল উৎপন্ন করি كَذٰلِكَ এরূপে نُخْرِجُ الْمَوْتٰى আমি মৃতদেরকে [জমিন হতে] বের করে দাঁড় করাব لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ যেন তোমরা বুঝতে পার।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قوله إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ الخ : আলোচ্য আয়াতে নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও গ্রহ নাক্ষত্র সৃষ্টি করা এবং একটি বিশেষ অটল ব্যবস্থার অনুগামী হয়ে তাদের নিজ নিজ কাজে নিয়োজিত থাকার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলার অসীম শক্তির কথা বর্ণনা করে প্রত্যেক বুদ্ধিমান মানুষকে চিন্তার আহবান জানানো হয়েছে যে, যে পবিত্র সত্তা এ বিশাল বিশ্ব সৃষ্টি করতে এবং বিজ্ঞজনোচিত ব্যবস্থাধীন পরিচালনা করতে সক্ষম, তাঁর জন্য এসব বস্তুকে ধ্বংস করে কিয়ামতের দিন পুনরায় সৃষ্টি করা কি কঠিন কাজ? তাই কিয়ামতকে অস্বীকার না করে একমাত্র তাঁকেই স্বীয় পালনকর্তা মনে করে, তার কাছেই প্রয়োজনাদি প্রার্থনা কর, তাঁরই ইবাদত কর এবং সৃষ্ট বস্তুকে পূজা করার পঙ্কিলতা থেকে বিরত হয়ে সত্যকে চিন। এ আয়াতে বলা হয়েছে : আল্লাহ তা'আলাই তোমাদের পালনকর্তা তিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন।

নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলকে ছয় দিনে সৃষ্টি করার কারণ : এখানে প্রশ্ন হয় যে, আল্লাহ তা'আলা সমগ্র বিশ্বকে মুহূর্তের মধ্যে সৃষ্টি করতে সক্ষম। স্বয়ং কুরআন পাকেও বিভিন্ন ভঙ্গিতে একথাই বারবার বলা হয়েছে। কোথাও বলা হয়েছে : وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحِ الْبَصَرِ "এক নিমিষের মধ্যে আমার আদেশ কার্যকরী হয়ে যায়।" কোথাও বলা হয়েছে : إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ "আল্লাহ তা'আলা যখন কোনো বস্তুকে সৃষ্টি করতে চান, তখন বলে দেন : হয়ে যাও। আর সঙ্গে সঙ্গে তা সৃষ্টি হয়ে যায়।" এমতাবস্থায় বিশ্ব সৃষ্টি করতে ছয় দিন লাগার কারণ কি?

তাফসীরবিদ হযরত সায়ীদ ইবনে জোবায়ের (রা.) এ প্রশ্নের উত্তরে বলেন : আল্লাহ তা'আলার মহাশক্তি নিঃসন্দেহে এক নিমিষে সব কিছু সৃষ্টি করতে পারে, কিন্তু মানুষকে বিশ্ব ব্যবস্থা পরিচালনায় ধারাবাহিকতা ও কর্মপক্বতা শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যেই এতে ছয় দিন ব্যয় করা হয়েছে।

নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল ও গ্রহ উপগ্রহ সৃষ্টির পূর্বে দিবা রাত্রির পরিচয় কি ছিল?

দ্বিতীয় প্রশ্ন এই যে, সূর্যের পরিক্রমণের ফলে দিন ও রাত্রির সৃষ্টি। নভোমণ্ডল ও ভুমণ্ডল সৃষ্টির পূর্বে যখন চন্দ্র সূর্যই ছিল না, তখন ছয় দিনের সংখ্যা কি হিসাবে নিরূপিত হলো?

কোনো কোনো তাফসীরবিদ বলেছেন : ছয়দিন বলে এতটুকু সময় বুঝানো হয়েছে, যা এ জগতের হিসাবে ছয় দিন হয়। কিন্তু পরিষ্কার ও নির্মল উত্তর এই যে, সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত যে দিন এবং সূর্যাস্ত থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত যে রাত এটা এ জগতের পরিভাষা। বিশ্ব সৃষ্টির পূর্বে আল্লাহ তা'আলার কাছে দিবা রাত্রির পরিচয়ের জন্য কোনো লক্ষণ নির্দিষ্ট থাকতে পারে, যেমন জান্নাত দিবা রাত্রি সূর্যের পরিক্রমণের অনুগামী হবে না।

সহীহ রেওয়ায়েত অনুযায়ী যে ছয় দিনে জগত সৃষ্টি হয়েছে তা রবিবার থেকে শুরু করে শুক্রবারে শেষ হয়। শনিবার জগত সৃষ্টির কাজ হয়নি। কোনো কোনো আলেম বলেন سَبْت -এর অর্থ কর্তন করা। এদিনে কাজ শেষ হয়ে গিয়েছিল বলে এদিনকে يَوْمُ السَّبْتِ (শনিবার) বলা হয়। –[ইবনে কাছীর]

আলোচ্য আয়াতে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি ছয় দিনে সমাপ্ত হওয়ার কথা বলা হয়েছে। সূরা হামীম সেজদার নবম ও দশম আয়াতে এর বিবরণ দিয়ে বলা হয়েছে যে, দু'দিনে ভূমণ্ডল, দু'দিনে ভূমণ্ডলের পাহাড়, সমুদ্র, খনি, বৃক্ষ, উদ্ভিদ, এবং মানুষ ও জন্তু জানোয়ারের পানাহারের বস্তু সামগ্রী সৃষ্টি করা হয়েছে। মোট চার দিন হলো। বলা হয়েছে : خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ আবার বলা হয়েছে : وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ যে দু'দিনে ভূমণ্ডলে সৃষ্টি করা হয়েছে, তা ছিল রবিবার ও সোমবার। দ্বিতীয় দু'দিন ছিল মঙ্গল ও বুধবার যাতে ভূমণ্ডলের সাজ সরঞ্জাম পাহাড় নদী ইত্যাদি সৃষ্টি করা হয়। এরপর বলা হয়েছে : فَقَضٰهُنَّ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ فِي يَوْمَيْنِ অর্থাৎ অতঃপর সাত আকাশ সৃষ্টি করেন দু'দিনে। বাহ্যত এ দু'দিন হবে বৃহস্পতি ও শুক্রবার। এভাবে শুক্রবার পর্যন্ত ছয় দিন হলো। নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃজনের কথা বর্ণনার পর বলা হয়েছে ; ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ অর্থাৎ অতঃপর আরশের উপর অধিষ্ঠিত হলেন। اِسْتَوٰى -এর শাব্দিক অর্থ– অধিষ্ঠিত হওয়া। 'আরশ' রাজসিংহাসনকে বলা হয়। এখন আল্লাহর 'আরশ' কিরূপ এবং কি –এর উপর অধিষ্ঠিত হওয়ায় অর্থই বা কি? এ সম্পর্কে নির্মল, পরিষ্কার ও বিশুদ্ধ মাযহাব সাহাবী ও তাবেয়ীদের কাছ থেকে এবং পরবর্তীতেকালে সূফী বুযুর্গদের কাছ থেকে এরূপ বর্ণিত হয়েছে

যে, মানব জ্ঞান আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলির স্বরূপ পূর্ণরূপে বুঝতে অক্ষম। এর অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হওয়া অর্থহীন; বরং ক্ষতিকরও বটে। এ সম্পর্কে সংক্ষেপে এরূপ বিশ্বাস স্থাপন করা উচিত যে, এসব বাক্যের যে অর্থ আল্লাহ তা'আলার উদ্দিষ্ট, তাই শুদ্ধ ও সত্য। এরপর নিজে কোনো অর্থ উদ্ভাবন করার চিন্তা করাও অনুচিত।

হযরত ইমাম মলেক (র.) -কে কেউ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ -এর অর্থ জিজ্ঞেস করলে তিনি কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললেন, اِسْتِوَاءٌ শব্দের অর্থ তো জানাই আছে, কিন্তু এর স্বরূপ ও অবস্থা মানব বুদ্ধি সম্যক বুঝতে অক্ষম। এতে বিশ্বাস স্থাপন করা ওয়াজিব। এর অবস্থা ও স্বরূপ জিজ্ঞেস করা বিদ'আত। কেননা সাহাবায়ে কেরাম (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে এ ধরনের প্রশ্ন করেননি। সুফিয়ান ছাওরী ইমাম আওযায়ী' লায়ছ ইবনে সা'দ, সুফিয়ান ইবনে ওয়াইনা, আব্দুল্লাহ ইবনে মোবারক (র.) প্রমুখ বলেছেন : যেসব আয়াত আল্লাহ তা'আলার সত্তা ও গুণাবলি সম্পর্কে বর্ণিত রয়েছে, সেগুলোর প্রতি যেভাবে আছে সেভাবেই রেখে কোনোরূপ ব্যাখ্যা ও সদর্থ ছাড়াই বিশ্বাস স্থাপন করা উচিত। –[মাযহারী]

এরপর বলা হয়েছে : يُغْشِى الَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهٗ حَثِيْثًا অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা রাত্রি দ্বারা দিনকে সমাচ্ছন্ন করেন এভাবে যে, রাত্রি দ্রুত দিনকে ধরে ফেলে। উদ্দেশ্য এই যে, সমগ্র বিশ্বকে আলো থেকে অন্ধকারে অথবা অন্ধকার থেকে আলোতে নিয়ে আসেন। দিবা রাত্রির এ বিরাট পরিবর্তন আল্লাহর কুদরতে অতি দ্রুত ও সহজে সম্পন্ন হয়ে যায় মোটেই দেরি হয় না।

এরপর বলা হয়েছে : وَّالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُوْمَ مُسَخَّرٰتٍ بِاَمْرِهٖ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্র সমূহকে এমতাবস্থায় সৃষ্টি করেছেন যে, সবাই আল্লাহ তা'আলার নির্দেশের অনুগামী।

এতে প্রত্যেক বুদ্ধিমানের জন্য চিন্তার খোরাক রয়েছে। বড় বড় বিশেষজ্ঞদের তৈরি মেশিনসমূহে প্রথমত কিছু না কিছু ত্রুটি নাও থাকে, তবুও যত কঠিন ইস্পাতের মেশিন ও কল কব্জাই হোক না কেন, চলতে চলতে তা ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং এক সময় ঢিলে হয়ে পড়ে। ফলে মেরামত দরকার হয়। এজন্য কয়েকদিন শুধু নয়; বরং অনেক সময় কয়েক সপ্তাহ ও কয়েক মাস তা অকেজো পড়ে থাকে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার নির্মিত মেশিনের প্রতি লক্ষ্য করুন, প্রথম দিন যেভাবে এগুলো চালু করা হয়েছিল আজো তেমনি চালু রয়েছে। এগুলোর গতিতে কখনও এক মিনিট কিংবা এক সেকেন্ডের পার্থক্য হয় না। কখনও এগুলোর কোনো কলকব্জা ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না এবং কখনও মেরামতের জন্য ওয়ার্কশপে পাঠাতে হয় না। কারণ এগুলো শুধুমাত্র আল্লাহর আদেশে চলছে। অর্থাৎ এগুলো চালানোর জন্য না বিদ্যুৎ শক্তির প্রয়োজন হয়, না কোনো ইঞ্জিনের সাহায্য নিতে হয়; বরং শুধু আল্লাহর আদেশের শক্তি বলেই চলছে। এ চলার খাতিরে বিন্দুমাত্র পার্থক্য আসাও অসম্ভব। তবে সর্বশক্তিমান আল্লাহ নিজেই যখন নির্দিষ্ট সময়ে এগুলোকে ধ্বংস করার ইচ্ছা করবেন, তখন গোটা ব্যবস্থাই তছনছ হয়ে যাবে। আর এরই নাম হলো কিয়ামত।

কয়েকটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করার পর আল্লাহ তা'আলার অসীম ক্ষমতা একটি সামগ্রিক বিধির আকারে বর্ণনা করে বলা হয়েছে : اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ - خَلْقٌ শব্দের অর্থ সৃষ্টি করা এবং اَمْرٌ শব্দের অর্থ আদেশ করা। বাক্যের অর্থ এই যে, সৃষ্টিকর্তা হওয়া এবং আদেশদাতা হওয়া আল্লাহর জন্যই নির্দিষ্ট। অন্য কেউ না সামান্যতম বস্তু সৃষ্টি করতে পারে, আর না কাউকে আদেশ করার অধিকার রাখে। তবে আল্লাহর পক্ষ থেকে কাউকে কোনো বিশেষ বিভাগ বা কার্যভার সমর্পণ করা হলে তাও বস্তুত আল্লাহ তা'আলারই আদেশ। তাই আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, এসব বস্তু সৃষ্টি করাও তাঁরই কাজ এবং সৃষ্টির পর এগুলোকে কর্মে নিয়োগ করাও অন্য কারও সাধ্যের বিষয় নয়; বরং আল্লাহ তা'আলারই অসীম শক্তির বহিঃপ্রকাশ।

قوله اُدْعُوْا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً الخ পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলার অসীম শক্তির বহিঃপ্রকাশ এবং গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামতসমূহ বর্ণিত হয়েছিল, আলোচ্য আয়াতসমূহে বর্ণিত হয়েছে যে, একমাত্র বিশ্ব পালকই যখন অসীম শক্তির অধিকারী এবং যাবতীয় অনুকম্পা ও নিয়ামত প্রদানকারী, তখন বিপদাপদ ও অভাব অনটনে তাঁকেই ডাকা এবং তাঁর কাছেই দোয়া প্রার্থনা করা উচিত। তাঁকে ছেড়ে অন্যদিকে মনোনিবেশ করা মূর্খতা এবং বঞ্চিত হওয়ার নামান্তর।

এতদসহ আলোচ্য আয়াতসমূহে দোয়ার কতিপয় আদবও ব্যক্ত করা হয়েছে। এগুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখলে দোয়া কবুল হওয়ার আশা বেড়ে যায়।

আরবি ভাষায় : دُعَاءٌ (দোয়া) শব্দটির অর্থ দ্বিবিধ- এক, বিপদাপদ দূরীকরণ ও অভাব পূরণের জন্য কউকে ডাকা এবং দুই. যে কোনো অবস্থায় কউকে স্মরণ করা। এ আয়াতে উভয় অর্থই হতে পারে। বলা হয়েছে : اُدْعُوْا رَبَّكُمْ অর্থাৎ অভাব পূরণের জন্য স্বীয় পালনকর্তাকে ডাক অথবা স্মরণ কর এবং পালনকর্তার ইবাদত কর।

প্রথমাবস্থায় অর্থ হবে, স্বীয় অভাব অনটনের সমাধান একমাত্র আল্লাহর কাছেই প্রার্থনা কর । আর দ্বিতীয় অবস্থায় অর্থ হবে, স্মরণ ও ইবাদত একমাত্র তাঁরই কর । উভয় তাফসীরই পূর্ববর্তী মনীষী তাফসীরবিদগণের কাছ থেকে বর্ণিত রয়েছে । এরপর বলা হয়েছে : تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً - تَضَرُّعٌ শব্দের অর্থ অক্ষমতা, বিনয় ও ভদ্রতা প্রকাশ করা এবং خُفْيَةً শব্দের অর্থ গোপন । এ শব্দদ্বয়ে দোয়া ও স্মরণের দু'টি গুরুত্বপূর্ণ আদব বর্ণিত হয়েছে । প্রথমত অপারগতা ও অক্ষমতা এবং বিনয় ও নম্রতা প্রকাশ করে দোয়া করা, এটা কবুল হওয়ার জন্য জরুরি শর্ত । দোয়ার ভাষাও অক্ষমতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে । বলার ভঙ্গি এবং দোয়ার আকার-আকৃতিও বিনয় এবং নম্রতাসূচক হওয়া চাই । এতে বোঝা যায় যে, আজকাল জনসাধারণ যে ভঙ্গিতে দোয়া প্রার্থনা করে প্রথমত একে দোয়া প্রার্থনা বলাই যায় না বরং দোয়া পাঠ করা বলা উচিত । কেননা প্রায়ই জানা থাকে না যে, মুখে যে সব শব্দ উচ্চারণ করা হচ্ছে সে গুলোর অর্থ কি? আজকাল সাধারণ মসজিদসমূহে এটি ইমামদের অভ্যাসে পরিণত হয়েছে । তাদের কতিপয় আরবি বাক্য মুখস্থ থাকে এবং নামাজ শেষে সেগুলোই আবৃতি করা হয় । অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্বয়ং ইমামদেরও এসব শব্দের অর্থ জানা থাকে না । তাদের জানা থাকলেও মুক্তাদিরা সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ থাকে । তারা অর্থ না বুঝেই ইমামের আবৃতি করা বাক্যাবলির সাথে সাথে আমীন আমীন বলতে থাকে । এই আগাগোড়া প্রহসনের সামমর্ম কতিপয় বাক্যের আবৃত্তি ছাড়া কিছুই নয় । দোয়া প্রার্থনার যে স্বরূপ তা এ ক্ষেত্রে পাওয়া যায় না । এটা ভিন্ন কথা যে, আল্লাহ তা'আলা স্বীয় কৃপায় এসব নিষ্প্রাণ বাক্যগুলোও কবুল করে নিতে পারেন । কিন্তু একথা বোঝা দরকার যে দোয়া প্রার্থনার বিষয় পাঠ করার বিষয় নয় । কাজেই চাওয়ার যথার্থ রীতি অনুযায়ীই চাইতে হবে ।

এ ছাড়া যদি কারও নিজের উচ্চারিত বাক্যাবলির অর্থও জানা থাকে এবং তা বুঝেসুঝে বলে তবে বলার ভঙ্গি এবং বাহ্যিক আকার আকৃতিতে বিনয় ও নম্রতা ফুটে না উঠলে এ দোয়াও দাবিতে পরিণত হয়, যা করার অধিকার কোনো বান্দারই নেই ।

মোটকথা প্রথম শব্দে দোয়ার প্রাণ এরূপ ব্যক্ত হয়েছে যে, স্বীয় অক্ষমতা , দীনতা, হীনতা এবং বিনয় ও নম্রতা প্রকাশ করে আল্লাহর কাছে অভাব অনটন ব্যক্ত করা । দ্বিতীয় শব্দে আরও একটি নির্দেশ রয়েছে যে, চুপিচুপি ও সঙ্গোপনে দোয়া করা উত্তম এবং কবুলের নিকটবর্তী । কারণ উচ্চৈঃস্বরে দোয়া চাওয়ার মধ্যে প্রথমত বিনয় ও নম্রতা বিদ্যমান থাকা কঠিন । দ্বিতীয়ত এতে রিয়া এবং সুখ্যাতিরও আশঙ্কা রয়েছে । তৃতীয়ত এতে প্রকাশ পায় যে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি একথা জানে না যে, আল্লাহ তা'আলা শ্রোতা ও মহাজ্ঞানী, প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সবই তিনি জানেন এবং সরব ও নীরব সব কথাই তিনি শোনেন । এ কারণেই খায়বর যুদ্ধের সময় দোয়া করতে গিয়ে সাহাবায়ে কেরামের আওয়াজ উচ্চ হয়ে গেলে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমরা কোনো বধিরকে অথবা অনুপস্থিতকে ডাকাডাকি করছনা যে, এত জোরে বলতে হবে; বরং একজন শ্রোতা ও নিকটবর্তীকে সম্বোধন করছ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলাকে, তাই সজোরে বলা অর্থহীন । স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা জনৈক সৎকর্মীর দোয়া উল্লেখ করে বলেন ; إِذْ نَادٰى رَبَّهٗ نِدَآءً خَفِيًّا অর্থাৎ যখন সে তার পালনকর্তাকে অনুচ্চস্বরে ডাকল । এতে বোঝা যায় যে, অনুচ্চস্বরে দোয়া করা আল্লাহ তা'আলার পছন্দনীয় ।

হযরত হাসান বসরী (র,) বলেন : প্রকাশ্যে ও সজোরে দোয়া করা এবং নীরবে ও অনুচ্চস্বরে দোয়া করা এতদুভয়ের ফজিলত ৭০ডিগ্রী তফাত রয়েছে । পূর্ববর্তী মনীষীবৃন্দ অধিকাংশ সময় আল্লাহর স্মরণে ও দোয়ায় মশগুল থাকতেন, কিন্তু কেউ তাদের আওয়াজ শুনতে পেত না; বরং তাদের দোয়া তাদের ও আল্লাহর মধ্যে সীমিত থাকত । তাদের অনেকেই সমগ্র কুরআন মুখস্থ তেলাওয়াত করতেন, কিন্তু অন্য কেউ টেরও পেত না । অনেকেই প্রভূত ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন করতেন । কিন্তু মানুষের কাছে তা প্রকাশ করে বেড়াতেন না । অনেকেই রাতের বেলায় স্বগৃহে দীর্ঘ সময় নামাজ পড়তেন । কিন্তু আগন্তুকরা তা বুঝতেই পারত না । হযরত হাসান বসরী (র.) আরও বলেন : আমি এমন অনেককেই দেখেছি, যারা গোপনে সম্পাদন করার মতো কোনো ইবাদত কখনও প্রকাশ্যে করেননি । দোয়ায় তাঁদের আওয়াজ অত্যন্ত অনুচ্চ হতো । –[ইবনে কাছীর, মাযহারী]

ইবনে জুরাইজ বলেন : দোয়ায় আওয়াজকে উচ্চ করা এবং শোরগোল করা মাকরূহ । আবূ বকর জাসসাস হানাফী আহকামুল কুরআন গ্রন্থে বলেন : এ আয়াত থেকে জানা যায় যে, নীরবে দোয়া করা জোরে দোয়া করার চাইতে উত্তম । হাসান বসরী ও হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকেও এ কথাই বর্ণিত রয়েছে । এ আয়াত থেকে আরও জানা যায় যে, নামাজে সূরা ফাতেহার শেষে 'আমীন' ও আস্তে বলা উত্তম । কারণ এটিও একটি দোয়া ।

অভাব-অনটনের ব্যাপারে দোয়া করা সম্পর্কে এ পর্যন্ত বর্ণনা করা হলো । আয়াতে যদি দোয়ার অর্থ জিকির ও ইবাদত নেওয়া হয় , তবে এ সম্পর্কেও পূর্ববর্তী মনীষীদের সুনিশ্চিত অভিমত এই যে. নীরবে জিকির সরব জিকির অপেক্ষা উত্তম ।

সূফীগণের মধ্যে চিশতিয়া তরিকার বুযুর্গগণ মুরিদকে প্রথম পর্যায়ে সরব জিকির শিক্ষা দিতেন। তাঁরা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির অবস্থার প্রতিকার হিসেবে এরূপ করেন, যাতে শব্দের মাধ্যমে অলসতা দূর হয়ে যায় এবং জিকিরের সাথে আত্মার সম্পর্ক সৃষ্টি হতে পারে। নতুবা সরব জিকির জায়েজ হলেও তা তাঁদের কাম্য নয়। অবশ্য এর বৈধতাও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত রয়েছে, এ বৈধতার জন্য রিয়া ও সুখ্যাতি অর্জন উদ্দেশ্য না হওয়া শর্ত।

ইমাম আহমদ, ইবনে হাব্বান ও বায়হাকী প্রমুখ হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : خَيْرُ الذِّكْرِ الْخَفِيُّ وَخَيْرُ الرِّزْقِ مَا يَكْفِيْ অর্থাৎ নীরব জিকির উত্তম এবং ঐ রিজিক উত্তম যা যথেষ্ট হয়ে যায়।

তবে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ও সময়ে সরব জিকিরও কাম্য ও উত্তম। রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বীয় উক্তি ও কর্ম দ্বারা এসব অবস্থা ও সময় বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। উদাহরণত : আজান ও ইকামত উচ্চৈঃস্বরে বলা, সরব নামাজসমূহে উচ্চৈঃস্বরে কুরআন তেলাওয়াত করা, নামাজের তাকবীর, তাশরীকের তাকবীর এবং হজে লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা উচ্চৈঃস্বরে বলা ইত্যাদি। এ কারণেই এ সম্পর্কে ফিকহবিদগণের সিদ্ধান্ত এই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যেসব বিশেষ অবস্থা ও স্থানে কথা ও কর্মের মাধ্যমে সরব জিকির করার শিক্ষা দিয়েছেন, সেখানে সজোরেই তা করা উচিত। এছাড়া অন্যান্য অবস্থা ও স্থানে নীরব জিকিরই উত্তম ও অধিক উপকারী।

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে : إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ - مُعْتَدِيْنَ শব্দটি اِعْتِدَاءٌ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ সীমা অতিক্রম করা। উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ তা'আলা সীমা অতিক্রম কারীদেরকে পছন্দ করেন না। তা দোয়ায় সীমা অতিক্রম করাই হোক কিংবা অন্য কোনো কাজে, কোনোটিই আল্লাহর পছন্দনীয় নয়। চিন্তা করলে দেখা যায় যে, সীমা ও শর্তাবলি পালন ও আনুগত্যের নামই ইসলাম। নামাজ, রোজা, হজ, জাকাত ও অন্যান্য লেনদেনে শরিয়তের সীমা অতিক্রম করলে সেগুলো ইবাদতের পরিবর্তে গুনাহে রূপান্তরিত হয়ে যায়।

দোয়ায় সীমা অতিক্রম করা কয়েক প্রকারের হতে পারে। **এক.** দোয়ায় শাব্দিক লৌকিকতা, ছন্দ ইত্যাদি অবলম্বন করা। এতে বিনয় ও নম্রতা ব্যাহত হয়। **দুই.** দোয়ায় অনাবশ্যক শর্ত সংযুক্ত করা। যেমন বর্ণিত আছে যে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল (রা.) স্বীয় পুত্রকে এভাবে দোয়া করতে দেখলেন : হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে জান্নাতে শুভ্র রঙের ডান দিকস্থ প্রাসাদ প্রার্থনা করি। তিনি পুত্রকে বারণ করে বললেন : দোয়ায় এ ধরনের শর্তযুক্ত করা সীমা অতিক্রম। কুরআন ও হাদীসে তা নিষিদ্ধ। –[মাযহারী]

তিন. সাধারণ মুসলমানদের জন্য বদ দোয়া কিংবা এমন কোনো বিষয় কামনা করা যা সাধারণ লোকের জন্য ক্ষতিকর এবং এমনিভাবে এখানে উল্লিখিত দোয়ায় বিনা প্রয়োজনে আওয়াজ উচ্চ করাও এক প্রকার সীমা অতিক্রম। –[তাফসীরে মাযহারী, আহকামুল কুরআন]

দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে : وَلَا تُفْسِدُوْا فِي الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا এখানে صَلَاحٌ ও فَسَادٌ দু'টি পরস্পর বিরোধী শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। صَلَاحٌ শব্দের অর্থ সংস্কার এবং فَسَادٌ শব্দের অর্থ অনর্থ ও গোলযোগ। ইমাম রাগেব মুফরাদাতুল কুরআন গ্রন্থে বলেন : সমতা থেকে বের হয়ে যাওয়াকেই فَسَادٌ বলা হয়, তা সামান্য হোক কিংবা বেশি। কম বের হলে কম ফাসাদ এবং বেশি বের হলে বেশি ফাসাদ হবে। اِفْسَادٌ শব্দের অর্থ অনর্থ সৃষ্টি করা এবং اِصْلَاحٌ শব্দের অর্থ সংস্কার করা। কাজেই আয়াতের অর্থ দাঁড়ায় এই যে, পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করো না, আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক সংস্কার করার পর।

ইমাম রাগেব (র.) বলেন : আল্লাহ তা'আলার সংস্কার কয়েক প্রকার হতে পারে। **এক.** প্রথমেই জিনিসটি সঠিকভাবে সৃষ্টি করা। যেমন বলা হয়েছে : وَاَصْلَحَ بَالَهُمْ; **দুই.** অনর্থ আসার পর তা দূর করা। যেমন يُصْلِحْ لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ **তিন.** সংস্কারের নির্দেশ দান করা। আয়াতে বলা হয়েছে, যখন আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীর সংস্কার সাধন করেছেন, তখন তোমরা তাতে অনর্থ সৃষ্টি করো না। এখানে পৃথিবীর সংস্কার সাধন করার দু'টি অর্থ হতে পারে। **এক.** বাহ্যিক সংস্কার অর্থাৎ পৃথিবীকে চাষাবাদ ও বৃক্ষ রোপণের উপযোগী করেছেন, তাতে মেঘের সাহায্যে পানি বর্ষণ করে মাটি থেকে ফল ফুল উৎপন্ন করেছেন এবং মানুষ ও অন্যান্য জীব জন্তুর জন্য মাটির থেকে জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় সামগ্রী সৃষ্টি করেছেন।

দুই. পৃথিবীর অভ্যন্তরীণ ও অর্থগত সংস্কার করেছেন। পয়গম্বর গ্রন্থ ও হেদায়েত প্রেরণ করে পৃথিবীকে কুফর, শিরক ও পাপাচার থেকে পবিত্র করেছেন। আয়াতে উভয় অর্থ, বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ সংস্কারও উদ্দিষ্ট হতে পারে। অতএব,

www.almodina.com

আয়াতের অর্থ এই যে, আল্লাহ তা'আলা বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ দিক দিয়ে পৃথিবীর সংস্কার সাধন করেছেন। এখন তোমরা এতে গুনাহ ও অবাধ্যতার মাধ্যমে গোলযোগ ও অনর্থ সৃষ্টি করো না।

ভূপৃষ্ঠের সংস্কার ও অনর্থের মর্ম : সংস্কার যেমন দু'রকম : বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ, তেমনি অনর্থও দু'রকম । ভূপৃষ্ঠের বাহ্যিক সংস্কার এই যে, আল্লাহ তা'আলা একে এমন এক পদার্থরূপে সৃষ্টি করেছেন, যা পানির মতো নরমও নয় যে, তাতে কোনো কিছু স্থিতাবস্থা লাভ করতে পারে না এবং পাথরের মতো শক্তও নয় যে, খনন করা যাবে না; বরং এক মধ্যবর্তী অবস্থায় রেখেছেন যাতে মানুষ একে চাষাবাদের মাধ্যমে নরম করে নিয়ে বৃক্ষ ও ফল ফুল উৎপন্ন করতে পারে এবং খনন করে কূপ, পরিখা ও নদীনালা তৈরি করতে পারে ও গৃহের ভিত্তি স্থাপন করতে পারে। এরপর মাটির ভিতরে ও বাইরে আবাদ করার উপকরণ সৃষ্টি করেছেন, যাতে শস্য, তরিতরকারি, উদ্ভিদ ও ফলফুল উৎপন্ন হয়। বাইরে বাতাস, আলো, ঠাণ্ডা ও উত্তাপ সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর মেঘমালার মাধ্যমে তাতে বৃষ্টি বর্ষণ করেছেন, যার ফলে বৃক্ষ উৎপন্ন হতে পারে। বিভিন্ন নক্ষত্র ও গ্রহপুঞ্জের শীতল ও উত্তপ্ত কিরণ নিক্ষেপ করে ফুল ও ফলে রঙ ও রস ভরে দেওয়া হয়েছে। মানুষকে জ্ঞান-বুদ্ধি দান করা হয়েছে। যাদ্বারা সে মৃত্তিকাজাত কাঁচামাল কাঠ, লোহা, তামা, পিতল, এলোমোনিয়াম ইত্যাদিকে জোড়া দিয়ে শিল্পদ্রব্যের এক নতুন জগত সৃষ্টি করেছে। এগুলো ভূপৃষ্ঠের বাহ্যিক সংস্কার এবং আল্লাহ তা'আলা স্বীয় অসীম শক্তির বলে তা সাধন করেছেন।

অভ্যন্তরীণ ও আত্মিক সংস্কার হলো আল্লাহর স্মরণ আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপন এবং তাঁর আনুগত্যের উপর নির্ভরশীলতা। এর জন্য আল্লাহ তা'আলা প্রথমে প্রতিটি মানুষের অন্তরে আনুগত্যে ও স্মরণের একটি সূক্ষ্ম প্রেরণা নিহিত রেখেছেন : فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا (আল্লাহ মানুষকে পাপাচার ও খোদাভীতির দ্বারা অনুপ্রাণিত করেছেন) মানুষের চার পাশের প্রতিটি বস্তুর মধ্যে অসীম শক্তি ও বিস্ময়কর কারিগরির এমন বহিঃপ্রকাশ রেখেছেন, যেগুলো দেখে সামান্য বুদ্ধি বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তিও বলে উঠে : فَتَبَارَكَ اللّٰهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ (সমুচ্চ হোন সুন্দরতম স্রষ্টা) এছাড়া রাসূল প্রেরণ করেছেন এবং ধর্মগ্রন্থ নাজিল করেছেন। এভাবে স্রষ্টার সাথে সৃষ্টির সম্পর্ক স্থাপনের পুরোপুরি ব্যবস্থা করা হয়েছে।

এভাবে যেন ভূপৃষ্ঠের পরিপূর্ণ বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ সংস্কার হয়ে গেছে। এখন নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে : আমি এ ভূপৃষ্ঠকে ঠিকঠাক করে দিয়েছি। তোমরা একে বিনষ্ট করো না।

সংস্কার যেমন বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ দু'টি রূপ বর্ণিত হয়েছে, তেমনি এর বিপরীতে ফাসাদ ও অনর্থ সৃষ্টিরও বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ দু'টি প্রকার রয়েছে। আলোচ্য আয়াত দ্বারা ফাসাদের উভয় প্রকারই নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

কুরআন ও রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর আসল ও প্রধান কর্তব্য হচ্ছে অভ্যন্তরীণ সংস্কার সাধন এবং অভ্যন্তরীণ অনর্থ সৃষ্টিকে প্রতিরোধ করা। কিন্তু এ জগতে বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ সংস্কার ও ফাসাদের মধ্যে এমন নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে যে, একটির ফাসাদ অন্যটির ফাসাদের কারণ হয়ে যায়। তাই শরিয়ত অভ্যন্তরীণ ফাসাদের দ্বার যেমন রুদ্ধ করেছে, তেমনি বাহ্যিক ফাসাদকেও প্রতিরোধ করেছে। চুরি, ডাকাতি, হত্যা এবং যাবতীয় অশ্লীল কার্যকলাপও জগতে বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ ফাসাদ সৃষ্টি করে। তাই এসব বিষয়ের উপর বিশেষভাবে নিষেধাজ্ঞা ও কঠোর শাস্তি আরোপ করা হয়েছে এবং নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কেননা প্রত্যেকটি অপরাধ ও পাপ কাজই কোথাও বাহ্যিক ফাসাদ সৃষ্টি করে এবং কোথাও অভ্যন্তরীণ ফাসাদের কারণ হয় । চিন্তা করলে দেখা যায়, প্রতিটি বাহ্যিক ফাসাদ অভ্যন্তরীণ ফাসাদের কারণ হয় এবং প্রতিটি অভ্যন্তরীণ ফাসাদ বহ্যিক ফাসাদ ডেকে আনে।

বাহ্যিক ফাসাদ যে অভ্যন্তরীণ ফাসাদের কারণ হয় তা বলাই বহুল্য। কারণ বাহ্যিক ফাসাদ হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার নির্দেশাবলির বিরুদ্ধাচরণ। বস্তুত : আল্লাহর নাফরমানিরই অপর নাম অভ্যন্তরীণ ফাসাদ। তবে আভ্যন্তরীণ ফাসাদ যে বাহ্যিক ফাসাদ ডেকে আনে, তা বুঝা কিছুটা চিন্তাসাপেক্ষ ব্যাপার। কারণ এ বিশ্বচরাচরে ও এর প্রত্যেকটি ক্ষুদ্র বৃহৎ বস্তু আল্লাহ তা'আলার সৃষ্ট এবং তাঁর আজ্ঞাধীন। মানুষ যত দিন ক্ষুদ্র বৃহৎ বস্তু আল্লাহ তা'আলার সৃষ্ট এবং তাঁর আজ্ঞাধীন। মানুষ যতদিন আল্লাহ তা'আলার আজ্ঞাধীন থকে, তত দিন এসব বস্তুও মানুষের খাদেম হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে মানুষ যখন আল্লাহ তা'আলার অবাধ্যতা করতে শুরু করে, তখন জগতের প্রত্যেকটি বস্তু অজান্তে ও পারোক্ষভাবে মানুষের অবাধ্য হয়ে উঠে, যা মানুষ বাহ্যত চর্মচক্ষে দেখে না; কিন্তু এসব বস্তুর প্রভাব বৈশিষ্ট্য, পরিণাম ও উপকারিতার প্রতি লক্ষ্য করলে এর জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ পাওয়া যায়।

বাহ্যত : জগতের সব বস্তুই মানুষের ব্যবহারে এসে থাকে। পানি কণ্ঠনালীতে পৌছে পিপাসা নিবৃত্ত করতে অস্বীকার করে না। খাদ্য ক্ষুধা দূর করতে বিরত হয় না। পোশক-পরিচ্ছদ ও বাসগৃহ শীত গ্রীষ্মে সুখ সরবরাহ করতে অস্বীকৃত হয় না। কিন্তু পরিণাম চিন্তা করলে বোঝা যায় যে, এসবের কোনো একটি বস্তুও স্বীয় কর্তব্য পুরোপুরি পালন করছে না। কেননা এসব বস্তু ও এসবের ব্যবহারের আসল উদ্দেশ্য আরাম ও সুখ লাভ করা, অস্থিরতা ও কষ্ট দূর হওয়া এবং অসুখে বিসুখে রোগমুক্তি অর্জিত হওয়া। অথচ তা হচ্ছে না।

এখন জগতের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করলে বুঝতে পারবেন যে, আজকাল আরাম আয়েশ ও রোগমুক্তি, সাজ-সরঞ্জামের ধারণাতীত প্রাচুর্য সত্ত্বেও মানবগোষ্ঠী অস্থিরতা ও রোগ ব্যাধির শিকার হচ্ছে। নতুন নতুন রোগ ব্যাধি ও বিপদাপদ ভিড় জমাচ্ছে। কোনো ধনকুবেরও স্বস্থানে নিশ্চিন্ত ও তৃপ্ত নয়; বরং এসব সাজ সরঞ্জাম যে হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে, সে হারেই বিপদাপদ, রোগ ব্যাধি এবং অস্থিরতাও বেড়ে চলছে।

আজ বিদ্যুৎ, বাষ্প ও অন্যান্য বস্তুনিষ্ঠ চাকচিক্যে বিমোহিত মানুষ যদি এসব বস্তুর ঊর্ধ্বে উঠে চিন্তা করে, তবে বুঝা যাবে যে, আমাদের সব প্রচেষ্টা সব শিল্প ও আবিষ্কারই আমাদের আসল লক্ষ্য অর্থাৎ কারণ নেই যে, আমারা স্বীয় প্রতিপালক ও প্রভুর অবাধ্যতার পথ বেছে নিয়েছি। ফলে তাঁর সৃষ্ট বস্তুসমূহও অলক্ষ্যে আমাদের অবাধ্যতা শুরু করেছে।

অর্থাৎ জগতের এসব বস্তুকে বাহ্যত প্রাণহীন ও চেতনাহীন বলে মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে প্রভুর আজ্ঞাহীন হয়ে কাজ করার উপলব্ধি তাদেরও রয়েছে।

সারকথা, চিন্তা করলে বুঝা যায়, প্রতিটি গুনাহ ও আল্লাহর প্রত্যেকটি অবাধ্যতা দুনিয়াতে শুধু অভ্যন্তরীণ অনর্থই সৃষ্টি করে না; বরং বাহ্যিক অনর্থও এর অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হয়ে থাকে। মাওলানা রূমী (র.) বলেছেন–

এটা কোনো কবির কল্পনা নয়; বরং এমন একটি বাস্তব সত্য, কুরআন ও হাদীস যার সাক্ষ্য । শাস্তির হালকা নমুনা এ জগতে রোগ ব্যাধি, মহামারী, ঝড় ও বন্যার আকারে দেখা দেয়।

তাই وَلَا تُفْسِدُوْا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا বাক্যের অর্থে যেমন জগতে বাহ্যিক ফাসাদ সৃষ্টিকারী গুনাহ ও অপরাধসমূহ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তেমনি আল্লাহ তা'আলার যাবতীয় অবাধ্যতাই এর অন্তর্ভুক্ত। তাই আলোচ্য আয়াতে অতঃপর বলা হয়েছে : وَادْعُوْهُ خَوْفًا وَّطَمَعًا; অর্থাৎ আল্লাহকে ভয় ও আশা সহকারে ডাক। অর্থাৎ একদিকে দোয়া অগ্রাহ্য হওয়ার ভয় থাকবে এবং অপরদিকে তাঁর করুণা লাভের পূর্ণ আশাও থাকবে। এ আশা ও ভয়ই দৃঢ়তার পথে মানবাত্মার দু'টি বাহু । এ বাহুদ্বয়ের সাহয্যে সে উর্ধ্বলোকে আরোহণ করে এবং সুউচ্চ পদমর্যাদা অর্জন করে।

এ বাক্য থেকে বাহ্যত প্রতীয়মান হয় যে, আশা ও উভয় সমান সমান হওয়া উচিত। কোনো কোনো আলেম বলেন, জীবিতাবস্থায় ও সুস্থতার সময় ভয়কে প্রবল রাখা প্রয়োজন; যাতে আনুগত্যে ক্রটি না হয়, আর যখন মৃত্যু নিকটবর্তী হয়, তখন আশাকে প্রবল রাখবে। কেননা এখন কাজ করার শক্তি বিদায় নিয়েছে। করুণা লাভের আশা করাই এখন তার একমাত্র কাজ। –[বাহরে মুহীত]

কোনো কোনো সূক্ষ্মদর্শী আলেম বলেন : ধর্মের বিশুদ্ধ পথে অচল থাকা এবং সর্বক্ষণ আল্লাহর আনুগত্য করাই প্রকৃত লক্ষ্য। মানুষের মেজাজ ও স্বভাব বিভিন্নরূপ। কেউ ভয়ের প্রবলতার দ্বারা এ লক্ষ্য অর্জন করতে পারে। আবার কেউ মহব্বত ও আশার প্রবলতার দ্বারা । যার জন্য যে অবস্থা লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক হয়, সে তাই হাসিল করতে চেষ্টিত হবে।

মোটকথা, পরবর্তী আয়াতে দোয়ার দু'টি আদব বর্ণিত হয়েছে। **এক.** বিনয় ও নম্রতা সহকারে দোয়া করা এবং **দুই.** আস্তে ও সঙ্গোপনে দোয়া করা। এদু'টি গুণই মানুষের বাহ্যিক দেহের সাথে সম্পৃক্ত। কেননা বিনয়ের অর্থ হলো দোয়ার সময় দৈহিক আকার আকৃতিকে অপারক ও ফকিরের মতো করে নেওয়া, অহংকারী ও বেপরওয়ার মতো না হওয়া। দোয়া সঙ্গোপনে করার সম্পর্কও মুখ ও জিহবার সাথে যুক্ত।

وَلَا تُفْسِدُوْا فِي الْأَرْضِ الخ; আয়াতে দোয়ার আরও দু'টি অভ্যন্তরীণ আদব বর্ণিত হয়েছে। এ গুলোর সম্পর্ক মানুষের মনের সাথে। আর তা হলো এই যে, দোয়াকারীর মনে এ এ আশঙ্কা থাকা উচিত যে, সম্ভবত দোয়াটি গ্রাহ্য হবে না এবং এ আশাও থাকা উচিত যে, দোয়া কবুল হতে পারে। কেননা পাপ ও গোনাহ থেকে নিশ্চিত হয়ে যাওয়াও ঈমানের পরিপন্থি। অপরদিকে আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ে যাওয়াও কুফর। এতদুভয়ের মধ্যবর্তী অবস্থায় থাকলেই দোয়া কবুল হবে বলে আশা করা যায়।

www.almodina.com

অতঃপর আয়াতের শেষে বলা হয়েছে : إِنَّ رَحْمَتَ اللهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার করুণা সৎকর্মীদের নিকটবর্তী। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, যদিও দোয়ার সময় ভয় ও আশা উভয় অবস্থায়ই থাকা বাঞ্ছনীয়, কিন্তু এতদুভয়ের মধ্যে আশার দিকটিই থাকবে প্রবল। কেননা বিশ্ব প্রতিপালক পরম দয়ালু আল্লাহর দান ও অনুগ্রহে কোনো ত্রুটি ও কৃপণতা নেই। তিনি মন্দের চেয়ে মন্দ লোক এমনকি শয়তানের দোয়াও কবুল করতে পারেন। কবুল না হওয়ার আশঙ্কা একমাত্র স্বীয় কুকর্ম ও গুনাহর অকল্যাণেই থাকতে পারে। কারণ আল্লাহর রহমতের নিকটবর্তী হওয়ার জন্য সৎকর্মী হওয়া প্রয়োজন।

এ কারণেই রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ; বান্দা যতক্ষণ কোনো গোনাহ অথবা আত্মীয়তার সম্পর্কচ্ছেদের দোয়া না করে এবং তড়িঘড়ি না করে, ততক্ষণ তার দোয়া কবুল হতে থাকে। সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন : তড়িঘড়ি দোয়া করার অর্থ কি? তিনি বললেন; এর অর্থ হলো এরূপ ধারণা করে বসা যে , আমি এত দীর্ঘ দিন থেকে দোয়া করছি, অথচ এখনো কবুল হলো না। অতঃপর নিরাশ হয়ে দোয়া ত্যাগ করা। –[মুসলিম, তিরমিযী]

অন্য এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : যখনই আল্লাহর কাছে দোয়া করবে, তখনই কবুল হওয়ার ব্যাপারে নিঃসন্দেহ হয়ে দোয়া করবে।

অর্থাৎ আল্লাহর রহমতের বিস্তৃতিকে সামনে রেখে দোয়া করলে অবশ্যই দোয়া কবুল হবে বলে মনকে মজবুত কর। এমন মনে কর গোনাহের কারণে দোয়া কবুল না হওয়ার আশঙ্কা অনুভব করা এর পরিপন্থি নয়।

قوله وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيٰحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলা তাঁর বিশেষ ও বড় নিয়ামতসমূহ উল্লেখ করেছিলেন। নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল, দিবারাত্র, চন্দ্র সূর্য, সাধারণ নক্ষত্রমণ্ডলীর সৃষ্টি ও মানুষের প্রয়োজনাদি সরবরাহে এবং সেবায় এগুলো নিয়োজিত থাকার কথা উল্লেখ করে এ ব্যাপারে হুশিয়ার করেছিলেন যে, যখন এক পবিত্র সত্তাই যাবতীয় প্রয়োজন; ও সুখ শান্তির উপকরণ সৃষ্টি করেছেন, তখন যে কোনো অভাব অনটন ও প্রয়োজনে তাঁর কাছেই দোয়া প্রার্থনা করা উচিত এবং তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তনকেই সাফল্যের চাবিকাঠি বলে মনে করা কর্তব্য।

আলোচ্য প্রথম আয়াতেও এমনি ধরনের গুরুত্বপূর্ণ ও বড় নিয়ামত সৃষ্টজীবের জীবন ও স্থায়িত্ব নির্ভরশীল। উদাহরণত বৃষ্টি এবং তা দ্বারা উৎপন্ন বৃক্ষ, ফসলাদি তরিতরকারি ইত্যাদি। পার্থক্য এই যে, পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে উর্ধ্বজগতের সাথে সম্পর্কযুক্ত নিয়ামতসমূহ বর্ণিত হয়েছিল এবং আলোচ্য আয়াতে নিম্নজগতের সাথে সম্পর্কশীল নিয়ামতসমূহ বর্ণিত হচ্ছে। –[বাহরে মুহীত]

শব্দ বিশ্লেষণ

شُفَعَاءُ : শব্দটি বহুবচন; একবচন شَفِيعٌ অর্থ– সুপারিশকারী।

يَشْفَعُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব فَتَحَ মাসদার اَلشَّفَاعَةُ মূলবর্ণ (ش ـ ف ـ ع) জিনস صحيح অর্থ– তারা সুপারিশ করবে।

اِسْتَوٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِسْتِوَاءُ মূলবর্ণ (س ـ و ـ ى) জিনস মুরাক্কাব لفيف مقرون অর্থ– তিনি অধিষ্ঠিত হয়েছেন।

اَلْمُعْتَدِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِعْتِدَاءُ মূলবর্ণ (ع ـ د ـ و) জিনস ناقص واوى অর্থ– সীমা অতিক্রমকারী।

اَقَلَّتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِقْلَالُ মূলবর্ণ (ق ـ ل ـ ل) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– সে বহন করে।

سَحَابًا : শব্দটি বহুবচন; একবচন سُحُبٌ অর্থ– মেঘ, জলধর।

ثِقَالًا : শব্দটি বহুবচন; একবচন ثَقِيْلٌ অর্থ– ঘন, ভারি।

سُقْنٰهُ : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلسَّوْقُ মূলবর্ণ (س ـ و ـ ق) জিনস اجوف واوى অর্থ– আমি পরিচালিত করি।

وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ ۚ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا ۚ كَذَٰلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ (٥٨)

অনুবাদ : (৫৮) আর যে ভূ-খণ্ড উত্তম তার ফসল তো আল্লাহর আদেশে প্রচুর উৎপন্ন হয়, আর যা উত্তম নয় তার ফসল সামান্য উৎপন্ন হয়, এভাবে আমি প্রমাণগুলো বিভিন্ন দিক দিয়ে বর্ণনা করি ঐ সমস্ত লোকের জন্য যারা শোকরগুজার।

لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۖ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (٥٩)

(৫৯) আমি নূহকে তাঁর সম্প্রদায়ের নিকট প্রেরণ করলাম, অতএব, তিনি বললেন, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা কেবল আল্লাহর ইবাদত কর, তিনি ব্যতীত তোমাদের কোনো মা'বূদ নেই, আমি তোমাদের জন্য এক কঠিন দিবসের শাস্তির আশঙ্কা করছি।

قَالَ الْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ (٦٠)

(৬০) তাঁর সম্প্রদায়ের সম্ভ্রান্ত লোকগণ বলল, আমরা তোমাকে স্পষ্ট ভ্রান্তিতে দেখছি।

قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلَٰكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ (٦١)

(৬১) তিনি বললেন, হে আমার সম্প্রদায়! আমাতে তো কিছুমাত্রও ভ্রম নেই; বরং আমি বিশ্বপালকের রাসূল।

أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (٦٢)

(৬২) তোমাদেরকে আমার পরওয়ারদেগারের পয়গাম পৌঁছাচ্ছি এবং তোমাদের কল্যাণ কামনা করি, আর আমি আল্লাহর পক্ষ হতে এমন সব বিষয় অবহিত আছি যা তোমরা অবগত নও।

শাব্দিক অনুবাদ

(৫৮) وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ আর যে ভূ-খণ্ড উত্তম يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ তার ফসল তো আল্লাহর আদেশে প্রচুর উৎপন্ন হয় وَالَّذِي خَبُثَ আর যা উত্তম নয় لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا তার ফসল সামান্য উৎপন্ন হয় كَذَٰلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ এভাবে আমি প্রমাণগুলো বিভিন্ন দিক দিয়ে বর্ণনা করি لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ ঐ সমস্ত লোকের জন্য যারা শোকরগুজার।

(৫৯) لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ আমি নূহকে তাঁর সম্প্রদায়ের নিকট প্রেরণ করলাম فَقَالَ অতএব, তিনি বললেন يَا قَوْمِ হে আমার সম্প্রদায়! اعْبُدُوا اللَّهَ তোমরা কেবল আল্লাহর ইবাদত কর مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ তিনি ব্যতীত তোমাদের কোনো মা'বূদ নেই إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ আমি তোমাদের জন্য আশঙ্কা করছি عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ এক কঠিন দিবসের শাস্তির।

(৬০) قَالَ الْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ তাঁর সম্প্রদায়ের সম্ভ্রান্ত লোকগণ বলল إِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ আমরা তোমাকে স্পষ্ট ভ্রান্তিতে দেখছি।

(৬১) قَالَ তিনি বললেন يَا قَوْمِ হে আমার সম্প্রদায়! لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ আমাতে তো কিছুমাত্রও ভ্রম নেই وَلَٰكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ বরং আমি বিশ্বপালকের রাসূল।

(৬২) أُبَلِّغُكُمْ তোমাদেরকে পৌঁছাচ্ছি رِسَالَاتِ رَبِّي আমার পরওয়ারদেগারের পয়গাম وَأَنصَحُ لَكُمْ এবং তোমাদের কল্যাণ কামনা করি وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ আর আমি আল্লাহর পক্ষ হতে এমন সব বিষয় অবহিত আছি مَا لَا تَعْلَمُونَ যা তোমরা অবগত নও।

www.almodina.com

অনুবাদ	আয়াত
অনুবাদ : (৬৩) আর তোমরা কি এ বিষয়ে বিস্ময় বোধ করছ যে, তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে উপদেশবাণী সমাগত হয়েছে তোমাদের নিকট এমন এক ব্যক্তির মাধ্যমে যিনি তোমাদেরই মধ্যকার একজন? যেন তিনি তোমাদেরকে ভয় প্রদর্শন করেন, এবং যেন তোমরা সংযত হও, আর আশা যে, তোমাদের প্রতি দয়া বর্ষিত হবে।	اَوَ عَجِبْتُمْ اَنْ جَآءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَلٰى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوْا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ (٦٣)
(৬৪) অনন্তর তারা তাঁকে মিথ্যাবাদীই সাব্যস্ত করতে রইল, সুতরাং আমি নূহকে এবং যারা তাঁর সঙ্গে নৌকায় ছিল তাদেরকে রক্ষা করলাম, আর যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছিল তাদেরকে নিমজ্জিত করে দিলাম, নিঃসন্দেহে তারা অন্ধ সেজেছিল।	فَكَذَّبُوْهُ فَاَنْجَيْنٰهُ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗ فِى الْفُلْكِ وَاَغْرَقْنَا الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا ؕ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا عَمِيْنَ (٦٤) ع
(৬৫) আর আমি আ'দ সম্প্রদায়ের প্রতি তাদের ভ্রাতা হূদকে প্রেরণ করলাম, তিনি বললেন, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা [কেবল] আল্লাহ তা'আলার ইবাদত কর, তিনি ব্যতীত আর কেউই তোমাদের মা'বূদ নেই, অতএব, তোমরা কি ভয় কর না।	وَاِلٰى عَادٍ اَخَاهُمْ هُوْدًا ؕ قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ؕ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ (٦٥)

শাব্দিক অনুবাদ

(৬৩) اَوَعَجِبْتُمْ আর তোমরা কি এ বিষয়ে বিস্ময় বোধ করছ যে اَنْ جَآءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে উপদেশবাণী সমাগত হয়েছে তোমাদের নিকট عَلٰى رَجُلٍ مِّنْكُمْ এমন এক ব্যক্তির মাধ্যমে যিনি তোমাদেরই মধ্যকার একজন لِيُنْذِرَكُمْ যেন তিনি তোমাদেরকে ভয় প্রদর্শন করেন وَلِتَتَّقُوْا এবং যেন তোমরা সংযত হও وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ আর আশা যে, তোমাদের প্রতি দয়া বর্ষিত হবে।

(৬৪) فَكَذَّبُوْهُ অনন্তর তারা তাঁকে মিথ্যাবাদীই সাব্যস্ত করতে রইল فَاَنْجَيْنٰهُ সুতরাং আমি নূহকে রক্ষা করলাম وَالَّذِيْنَ مَعَهٗ فِى الْفُلْكِ এবং যারা তাঁর সঙ্গে নৌকায় ছিল তাদেরকে وَاَغْرَقْنَا الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا আর যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছিল তাদেরকে নিমজ্জিত করে দিলাম اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا عَمِيْنَ নিঃসন্দেহে তারা অন্ধ সেজেছিল।

(৬৫) وَاِلٰى عَادٍ اَخَاهُمْ هُوْدًا আর আমি আ'দ সম্প্রদায়ের প্রতি তাদের ভ্রাতা হূদকে প্রেরণ করলাম قَالَ তিনি বললেন يٰقَوْمِ হে আমার সম্প্রদায়! اعْبُدُوا اللّٰهَ তোমরা [কেবল] আল্লাহ তা'আলার ইবাদত কর مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ তিনি ব্যতীত আর কেউই তোমাদের মা'বূদ নেই اَفَلَا تَتَّقُوْنَ অতএব, তোমরা কি ভয় কর না।

www.almodina.com

অনুবাদ : (৬৬) তাঁর সম্প্রদায়ের মধ্যে যে সব সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি কাফের ছিল, তারা বলল, আমরা তোমাকে স্বল্প বুদ্ধিতার মধ্যে দেখছি এবং আমরা নিঃসন্দেহে তোমাকে মিথ্যাবাদীদের অন্তর্ভুক্ত মনে করি।	قَالَ الْمَلَاُ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖۤ اِنَّا لَنَرٰىكَ فِیْ سَفَاهَةٍ وَّ اِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكٰذِبِیْنَ (٦٦)
(৬৭) তিনি বললেন, হে আমার সম্প্রদায়! আমার মধ্যে একটুও নির্বুদ্ধিতা নেই; বরং আমি বিশ্ব প্রতিপালকের প্রেরিত রাসূল।	قَالَ یٰقَوْمِ لَیْسَ بِیْ سَفَاهَةٌ وَّ لٰكِنِّیْ رَسُوْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِیْنَ (٦٧)

শাব্দিক অনুবাদ

(৬৬) قَالَ الْمَلَاُ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ তাঁর সম্প্রদায়ের মধ্যে যে সব সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি কাফের ছিল, তারা বলল اِنَّا لَنَرٰىكَ فِیْ سَفَاهَةٍ আমরা তোমাকে স্বল্প বুদ্ধিতার মধ্যে দেখছি وَّ اِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكٰذِبِیْنَ এবং আমরা নিঃসন্দেহে তোমাকে মিথ্যাবাদীদের অন্তর্ভুক্ত মনে করি।

(৬৭) قَالَ তিনি বললেন یٰقَوْمِ হে আমার সম্প্রদায়! لَیْسَ بِیْ سَفَاهَةٌ আমার মধ্যে একটুও নির্বুদ্ধিতা নেই وَلٰكِنِّیْ رَسُوْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِیْنَ বরং আমি বিশ্ব প্রতিপালকের প্রেরিত রাসূল।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قوله وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهٗ بِاِذْنِ رَبِّهٖ الخ আয়াতে বিশেষভাবে একথা বলা হয়েছে যে, আমার এসব বিরাট নিয়ামত যদিও ভূখণ্ডের সর্বত্র ব্যাপক, বৃষ্টি বর্ষিত হলে যদিও পাহাড়, সমুদ্র, উর্বর, অনুর্বর এবং উত্তম ও অনুত্তম সব রকম ভূখণ্ডেই সমভাবে বর্ষিত হয়, কিন্তু ফসল, বৃক্ষ ও তরিতরকারি একমাত্র এমন ভূখণ্ডেই উৎপন্ন হয়, যাতে উর্বরতা রয়েছে, কঙ্কর ও বালুকাময় ভূখণ্ড এ বৃষ্টির দ্বারা উপকৃত হয় না।

وَهُوَ الَّذِیْ یُرْسِلُ الرِّیٰحَ بُشْرًا الخ আয়াতের ফলাফল ব্যক্ত করা হয়েছে যে, যে পবিত্র সত্তা মৃত ভূখণ্ডে ফসল উৎপাদনের মতো জীবনীশক্তি দান করেন, তাঁর পক্ষে যে মানুষ পূর্বে জীবিত ছিল অতঃপর মারা যায়, তার মধ্যে পুনরায় জীবনের স্পন্দন সৃষ্টি করে দেওয়া মোটেই কঠিন নয়। এ ফলাফলটি আয়াতে স্পষ্টরূপে বিবৃত হয়েছে। وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهٗ الخ আয়াত থেকে এরূপ ফলাফল বের করা হয়েছে যে, আল্লাহর হেদায়েত, ঐশী গ্রন্থসমূহ, আম্বিয়া (আ.), তাঁদের প্রতিনিধি আলেম ও মাশায়েখের শিক্ষাও বৃষ্টির মতো সবার জন্যই ব্যাপক কিন্তু বৃষ্টি দ্বারা যেমন সব ভূখণ্ডই উপকৃত হয় না। তেমনি এ আধ্যাত্মিক বৃষ্টির উপকারও তারাই লাভ করে, যাদের মধ্যে যোগ্যতা রয়েছে। পক্ষান্তরে যাদের অন্তর কঙ্করময় কিংবা বালুকাময় ভূখণ্ডের মতো উৎপাদনের যোগ্যতা বিবর্জিত, তারা যাবতীয় সুস্পষ্ট নিদর্শন সত্ত্বেও স্বীয় পথভ্রষ্টতায় অটল থাকে। এর ফলাফলের দিকেই দ্বিতীয় আয়াতের শেষ বাক্যে ইঙ্গিত করা হয়েছে। كَذٰلِكَ نُصَرِّفُ الْاٰیٰتِ لِقَوْمٍ یَّشْكُرُوْنَ অর্থাৎ আমি এমনিভাবে স্বীয় প্রমাণাদি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বর্ণনা করি তাদের জন্য যারা এর মূল্য দেয়। উদ্দেশ্য এই যে, বাস্তবে যদিও এ বর্ণনা সবার জন্যই ব্যাপক, কিন্তু পরিণতির দিক দিয়ে তাদের জন্যই উপকারী প্রমাণিত হয়েছে যারা যোগ্যতাসম্পন্ন এবং যারা এর মূল্য ও মর্যাদা বোঝে। এভাবে উল্লিখিত আয়াতদ্বয়ে ইহকাল ও পরকালের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল। এবার উভয় আয়াতের বিস্তারিত বর্ণনা শুনুন। প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে : وَهُوَ الَّذِیْ یُرْسِلُ الرِّیٰحَ بُشْرًا بَیْنَ یَدَیْ رَحْمَتِهٖ অর্থাৎ এতে رِیَاحٌ শব্দটি رِیْحٌ-এর বহুবচন। এর অর্থ বায়ু। بُشْرٌ শব্দের অর্থ আল্লাহ তা'আলাই বৃষ্টির পূর্বে সুসংবাদ দেওয়ার জন্য বায়ু প্রেরণ করেন।

উদ্দেশ্য এই যে, বৃষ্টির পূর্বে ঠাণ্ডা বায়ু প্রেরণ করা আল্লাহর চিরন্তন রীতি। এ বাতাস দ্বারা স্বয়ং মানুষ আরাম ও প্রফুল্লতা অর্জন করে এবং তা যেন ভারি বৃষ্টির সংবাদও পূর্বাহ্নে প্রদান করে। অতএব, এ বায়ু দু'টি নিয়ামতের সমষ্টি। **এক.** স্বয়ং মানুষ ও সাধারণ সৃষ্টজীবের জন্য উপকারী এবং **দুই.** বৃষ্টির পূর্বে বৃষ্টির আগমনবার্তা বহনকারী। কেননা মানুষ একটি নরম ও নাজুক সৃষ্টি, তার অনেক প্রয়োজনীয় কাজ বৃষ্টির কারণে বন্ধ হয়ে যায়। বৃষ্টির সংবাদ পূর্বে পেয়ে সে নিজের ব্যবস্থা সম্পন্ন করে নেয়। এছাড়া স্বয়ং তার অস্তিত্ব এবং তার আসবাবপত্র ও নিজের রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থা করে নেয়।

এরপর বলা হয়েছে : حَتّٰٓى اِذَآ اَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا - سَحَابٌ শব্দের অর্থ মেঘ এবং ثِقَالٌ শব্দটি ثَقِيْلٌ -এর বহুবচন। এর অর্থ ভারি। অর্থাৎ বায়ু যখন ভারি মেঘমালাকে উপরে উঠিয়ে নেয়। ভারি মেঘমালার অর্থ পানিতে ভরপুর মেঘমালা যা বাতাসের কাঁধে সওয়ার হয়ে উপরে উঠে যায়। এভাবে হাজারো মণ ভারি পানি বাতাসে ভর করে উপরে পৌছে যায়। বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে, এতে কোনো মশিন কাজ করে না এবং কোনো মানুষও শ্রম নিয়োগ করে না। আল্লাহ তা'আলার হুকুম হওয়া মাত্র আপনা আপনি সমুদ্র থেকে বাষ্প (মৌসুমী বায়ু) উত্থিত হতে থাকে এবং উপরে উঠে মেঘমালার আকার ধারণ করে। অতঃপর হাজারো বরং লাখো গ্যালন পানি ভর্তি এ জাহাজ বাতাসের কাঁধে সওয়ার হয়ে আকাশ পানে ধাবিত হয়।

এরপর বলা হয়েছে : سُقْنٰهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ -سَوْقٌ -এর অর্থ কোনো জন্তুকে হাঁকানো ও চালানো, بَلَدٌ -এর অর্থ শহর, বস্তি ও জনপদ। আর مَيِّتٌ -এর অর্থ মৃত। অর্থাৎ বাতাস যখন ভারি মেঘমালাকে তুলে নেয়, তখন আমি মেঘমালাকে কোনো মৃত শহরের দিকে পরিচালিত করি। মৃত শহর বলে এমন জনপদকে বুঝানো হয়েছে। যা পানির অভাবে উজাড় প্রায়। এখানে সাধারণ ভূখণ্ডের পরিবর্তে বিশেষভাবে শহর উল্লেখ করা এ জন্য সমীচীন হয়েছে যে, বৃষ্টি বাদল প্রেরণ ও মাটিকে সিক্ত করার প্রকৃত লক্ষ্য হচ্ছে মানুষের প্রয়োজন মেটানো। মানুষের বাসস্থান হচ্ছে শহর। নতুবা বন জঙ্গলের সজীবতা স্বয়ং কোনো লক্ষ্য নয়।

এ পর্যন্ত আলোচ্য আয়াতের বিষয় বস্তুর কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক প্রমাণিত হলো। প্রথমত বৃষ্টি মেঘমালা থেকে বর্ষিত হয়। যেমন দৃশ্যতও তাই এতে বুঝা গেল যে, যেসব আয়াতে আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণের কথা বলা হয়েছে, সেখানেও 'সামা' (আকাশ) শব্দ দ্বারা মেঘমালাকেই বোঝানো হয়েছে। কোনো সময় সামুদ্রিক মোসুমী বায়ুর পরিবর্তে সরাসরি আকাশ থেকে মেঘমালা সৃষ্টি হয়ে বৃষ্টি বর্ষিত হওয়া সম্ভব নয়।

দ্বিতীয় কোনো বিশেষ দিক কিংবা বিশেষ ভূখণ্ডের দিকে মেঘমালা ধাবিত হওয়া সরাসরি আল্লাহর নির্দেশের সাথে সম্পর্কযুক্ত। তিনি যখন যেখানে ইচ্ছা এবং যে পরিমাণ ইচ্ছা বৃষ্টি বর্ষণের নির্দেশ দান করেন। মেঘমালা আল্লাহর সে নির্দেশই পালন করে মাত্র।

এ বিষয়টি সর্বত্রই এভাবে প্রত্যক্ষ করা যায় যে, মাঝে মাঝে কোনো শহর অথবা জনপদের উপর মেঘমালা পুঞ্জীভূত হয়ে থাকে এবং সেখানে বৃষ্টির প্রয়োজনও থাকে। কিন্তু মেঘমালা সেখানে এক ফোটা পানিও দেয় না; বরং আল্লাহর নির্দেশে যে শহর বা জনপদের প্রাপ্য নির্ধারিত থাকে, সেখানে পৌছেই বর্ষিত হয়। নির্দিষ্ট শহর ছাড়া অন্যত্র মেঘের পানি লাভ করার সাধ্য কারো নেই।

প্রাচীন ও আধুনিক দার্শনিকগণ মৌসুমী বায়ুর গতিপথ নির্ণয়ের জন্য কিছু কিছু বিধি ও মূলনীতি আবিষ্কার করে রেখেছেন। এসবের মাধ্যমে তারা বলে দেন যে, অমুক সাগর থেকে যে মৌসুমী বায়ু উত্থিত হয়েছে তা কোন দিকে প্রবাহিত হবে, কোথায় বৃষ্টি বর্ষণ করবে এবং কতটুকু বৃষ্টি বৃষ্টপাত হবে। বিভিন্ন দেশে এ ধরনের তথ্য পরিবেশন করার জন্য আবহাওয়া বিভাগ কায়েম করা হয়। কিন্তু অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দেয় যে, আবহাওয়া বিভাগ প্রদত্ত খবর প্রচুর পরিমাণে ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়। আল্লাহর নির্দেশ তাদের বিপরীতে বলে তাদের সব নিয়ম কানুনই আকেজো হয়ে যায় এবং মৌসুমী বায়ু তাদের প্রদত্ত খবরের বিপরীতে অন্য কোনো দিকে গতি পরিবর্তন করে চলে যায়। ফলে আবহাওয়া বিভাগের নিষ্ফল তাকিয়ে থাকাই সার হয়।

এছাড়া বায়ুর গতিপ্রবাহ নির্ণয়ের জন্য বৈজ্ঞানিকদের উদ্ভাবিত নীতিমালা ও মেঘমালা যে আল্লাহ তা'আলার আজ্ঞাধীন এ বিষয়ের পরিপন্থি নয়। কেননা বিশ্ব চরাচরের সব কাজ-কারবারে আল্লাহর চিরন্তন রীতি এই যে. আল্লাহর নির্দেশ স্বাভাবিক কারণসমূহের আবরণ ভেদ করে প্রকাশ পায়। এসব স্বাভাবিক কারণ দৃষ্টেই মানুষ নীতিমালা প্রণয়ন করে।

অতঃপর বলা হয়েছে : فَاَنْزَلْنَا بِهِ الْمَآءَ فَاَخْرَجْنَا بِهٖ مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ অর্থাৎ আমি মৃত জনপদে পানি বর্ষণ করি, অতঃপর পানি দ্বারা সব রকম ফল-ফসল উৎপন্ন করি। আয়াতের শেষে বলা হয়েছে : كَذٰلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتٰى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ অর্থাৎ এভাবেই আমি মৃতদেরকে কিয়ামতের দিন উত্থিত করব যাতে তোমরা বুঝ। উদ্দেশ্য এই যে, আমি যেভাবে মৃত ভূখণ্ডকে জীবিত করি এবং তা থেকে বৃক্ষ ও ফল-ফসল নির্গত করি, তেমনিভাবে কিয়ামতের দিন মৃতদেরকে পূনারায় জীবিত করে তুলব। আমি এসব দৃষ্টান্ত এজন্য বর্ণনা করি, যাতে তোমরা চিন্তা ভাবনা করার সুযোগ পাও।

www.almodina.com

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কিয়ামতে দু'বার শিঙ্গা ফুৎকার দেওয়া হবে। প্রথম ফুৎকারের পর সারা বিশ্ব ধ্বংসস্তূপে পরিণত হবে, কোনো কিছু জীবিত থাকবে না। দ্বিতীয় ফুৎকারের পর নতুনভাবে সারা বিশ্ব সৃজিত হবে এবং সব মৃত জীবিত হয়ে যাবে। সূরা হাদীদে আরও বলা হয়েছে যে, উভয়বার শিঙ্গা ফুৎকারের মাঝখানে চল্লিশ বছরের ব্যবধান হবে। এ চল্লিশ বছর পর্যন্ত অবিরাম বৃষ্টিপাত হতে থাকবে। এ সময়ের মধ্যেই প্রতিটি মৃত মানুষ ও জন্তুর দেহের অংশ একত্রিত করে পূর্ণ কাঠামো তৈরি করা হবে। অতঃপর শিঙ্গা ফুঁকার সাথে এসব মৃতদেহে আত্মা এসে যাবে এবং জীবিত হয়ে দণ্ডায়মান হবে। এ রেওয়ায়েতের বেশির ভাগ বুখারী ও মুসলিম থেকে এবং কিছু অংশ আবূ দাউদের কিতাবুল বা'ছ থেকে গৃহীত হয়েছে।

দ্বিতীয় আয়াতে ইরশাদ হয়েছে : وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا - نَكِدٌ শব্দের অর্থ ঐ বস্তু, যা অনর্থক এবং সামান্য। অর্থাৎ বৃষ্টির কল্যাণধারা যদিও প্রত্যেক শহর ও ভূখণ্ডে দু'প্রকার হয়ে থাকে। এক. উর্বর ও ভালো যাতে উৎপাদন ক্ষমতা রয়েছে। এ ধরনের ভূখণ্ড থেকে সর্বপ্রকার ফল-ফসল উৎপন্ন হয়। দুই. শক্ত ও লবণাক্ত ভূভণ্ড। এতে উৎপাদনের যোগ্যতা নেই। এরূপ ভূখণ্ডে একে তো কিছু উৎপন্নই হয় না, আর কিছু হলেও খুব অল্প পরিমাণ হয়। যা উৎপন্ন হয় তাও অকোজো ও নষ্ট হয়ে থাকে।

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে : كَذَٰلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ অর্থাৎ আমি স্বীয় শক্তির প্রমাণাদি নানাভাবে বর্ণনা করি তাদের জন্য যারা এগুলোর মর্যাদা দেয়।

এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, বৃষ্টির কল্যাণধারার মতো আল্লাহর হেদায়েত ও নিদর্শনাবলির কল্যাণও সব মানুষের জন্য ব্যাপক, কিন্তু প্রতিটি ভূখণ্ডই যেমন বৃষ্টি থেকে উপকার লাভ করে না, তেমনি প্রতিটি মানুষই এ হেদায়েত থেকে ফায়দা হাসিল করে না; বরং একমাত্র তারাই ফায়দা হাসিল করে, যারা কৃতজ্ঞ ও জ্ঞান সম্পন্ন এসব নিদর্শনের মর্যাদা দেওয়ার মতো যোগ্যতা রাখে।

قوله لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ ... إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ (٥٩-٦٤) : আলোচ্য আয়াতসমূহ সূরা আ'রাফের পূর্ণ অষ্টম রুকূ'। এতে হযরত নূহ (আ.) এর উম্মতের অবস্থা ও তাদের সংলাপের বিবরণ রয়েছে। নবীগণের পরম্পরায় হযরত আদম (আ.) যদিও সর্বপ্রথম নবী, কিন্তু তাঁর আমলে ঈমানের সাথে কুফর ও গোমরাহীর মোকাবিলা ছিল না। তাঁর শরিয়তের অধিকাংশ বিধানই পৃথিবী আবাদকরণ ও মানবীয় প্রয়োজনাদির সাথে সম্পৃক্ত ছিল। কুফর ও কাফেরদের কোথাও অস্তিত্ব ছিল না। কুফর ও শিরকের সাথে ঈমানের প্রতিদ্বন্দ্বিতা হযরত নূহ (আ.)-এর আমল থেকেই শুরু হয় রিসালত ও শরিয়তের দিক দিয়ে তিনিই জগতের প্রথমত রাসূল। এছাড়া তুফানে সমগ্র বিশ্ব নিমজ্জিত হওয়ার পর যারা প্রাণে বেঁচে ছিল, তারা ছিল হযরত নূহ (আ.) ও তাঁর নৌকাস্থিত সঙ্গী সাথী। তাদের দ্বারাই পৃথিবী নতুনভাবেই আবাদ হয়। এ কারণেই তাঁকে ছোট আদম বলা হয়। বলাবাহুল্য, একারণেই পয়গম্বরগণের কাহিনীর সূচনা তাঁর দ্বারাই করা হয়েছে। এই কাহিনীতে সাড়ে নয়শ' বছরের সুদীর্ঘ আয়ুকালে তাঁর পয়গম্বরসুলভ চেষ্টা চরিত্র, অধিকাংশ উম্মতের বিরুদ্ধাচরণ এবং এর পরিণতিতে গুটি কতক ঈমানদার ছাড়া অবশিষ্ট সবার প্লাবনে নিমজ্জিত হওয়ার বিষয় বর্ণিত হয়েছে। এর বিবরণ নিম্নরূপ :

প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে : لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ নূহ (আ.) হযরত আদমের অষ্টম পুরুষ। মুসতাদরাক হাকেমে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, হযরত আদম (আ.) ও নূহ (আ.)-এর মাঝখানে দশ শতাব্দী অতিক্রান্ত হয়েছে। এ বিষয়বস্তুই তাবারানী হযরত আবূ যর (রা.)-এর বাচনিক রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। -[তাফসীরে মাযহারী]

একশ' বছরে এক শতাব্দী হয়। তাই এ রেওয়ায়েত অনুযায়ী তাঁদের উভয়ের মাঝে এক হাজার বছরের ব্যবধান হয়ে যায়। ইবনে জারীর (র.) বর্ণনা করেন যে, হযরত নূহ (আ.)-এর জন্ম হযরত আদম (আ.)-এর জন্মের আটশ' ছাব্বিশ বছর পর হয়েছিল। আর কুরআনের বর্ণনা অনুযায়ী তাঁর বয়স হয়েছিল নয়শ' পঞ্চাশ বছর, হযরত আদম (আ.)-এর বয়স সম্পর্কে এক হাদীসে চল্লিশ কম এক হাজার বছর বলা হয়েছে। এভাবে হযরত আদম (আ.)-এর জন্ম থেকে হযরত নূহ (আ.)-এর ওফাত পর্যন্ত মোট দু'হাজার আটশ' ছাপ্পান্ন বছর হয়। -[মাযহারী] হযরত নূহ (আ.)-এর আসল নাম 'শাকের'। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে 'সাকান' এবং কোনো কোনো রেওয়ায়াতে আব্দুল গাফফার বর্ণিত হয়েছে।

এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে যে, তাঁর যুগটি হযরত ইদরীস (আ.)-এর পূর্বে ছিল, না পরে? অধিকাংশ সাহাবীর মতে তিনি পূর্বে ছিলেন। -[বাহরে মুহীত]

www.almodina.com

মুস্তাদরাকে হাকেমে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত রয়েছে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : হযরত নূহ (আ.) চল্লিশ বছর বয়সে নবুয়ত প্রাপ্ত হন এবং প্লাবনের পর ষাট বছর জীবিত থাকেন।

لَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, হযরত নূহ (আ.) শুধু স্বজাতিরই জন্য নবী হিসেবে প্রেরিত হয়েছিলেন। তিনি সমগ্র বিশ্বের নবী ছিলেন না। তাঁর সম্প্রদায় ইরাকে বসবাসকারী ছিল এবং বাহ্যত সভ্য হলেও শিরকে লিপ্ত ছিল। তিনি তাদেরকে দাওয়াত দিয়ে একথা বলেন : فَقَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ؕ اِنِّيْٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ অর্থাৎ হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহ তা'আলার ইবাদত কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের কোনো উপাস্য নেই । আমি তোমাদের জন্য একটি মহাদিবসের শাস্তির আশঙ্কা করি। এর প্রথম বাক্যে আল্লাহ তা'আলার ইবাদতের প্রতি দাওয়াত রয়েছে। এটাই সব নীতির মূলনীতি। দ্বিতীয় বাক্যে শিরক ও কুফর থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে। এটি এ সম্প্রদায়ের মধ্যে মহামারীর আকারে ছড়িয়ে পড়েছিল। তৃতীয় বাক্যে ঐ মহাশাস্তির আশঙ্কা সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে যা বিরুদ্ধাচারণের আবশ্যম্ভাবী পরিণতি। এর অর্থ পরকালের মহাশাস্তিও হতে পারে এবং জগতে প্লাবনের শাস্তিও হতে পারে। (কবীর) তাঁর সম্প্রদায় উত্তরে বলল : قَالَ الْمَلَاُ مِنْ قَوْمِهٖٓ اِنَّا لَنَرٰىكَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ এখানে مَلَاٌ শব্দের অর্থ সম্প্রদায়ের সর্দার ও সমাজের মোড়ল। উদ্দেশ্য এই যে, হযরত নূহ (আ.)-এর দাওয়াতের জবাবে সম্প্রদায়ের প্রধানরা বলল : আমরা মনে করি যে, আপনি প্রকাশ্য ভ্রান্তিতে পতিত রয়েছেন। কারণ আপনি আমাদেরকে বাপ দাদার ধর্ম পরিত্যাগ করতে বলছেন। কিয়ামতে পুনরায় জীবিত হওয়া প্রতিদান ও শাস্তি ইত্যাদি কুসংস্কার বৈ নয়।

এহেন পীড়াদায়ক ও মর্মন্তুদ কথাবার্তার জবাবে হযরত নূহ (আ.) পয়গম্বরসুলভ ভাষায় যা বললেন, তা প্রচারক ও সংস্কারকদের জন্য একটি উজ্জ্বল শিক্ষা ও হেদায়েত। উত্তেজনার স্থলে উত্তেজিত ও ক্রোধান্বিত হওয়ার পরিবর্তে তিনি সহজ-সরল ভাষায় তাদের সন্দেহ নিরসনে প্রবৃত্ত হলেন। বললেন :

قَالَ يٰقَوْمِ لَيْسَ بِيْ ضَلٰلَةٌ وَّلٰكِنِّيْ رَسُوْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ - اُبَلِّغُكُمْ رِسٰلٰتِ رَبِّيْ وَاَنْصَحُ لَكُمْ وَاَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ

অর্থাৎ হে আমার সম্প্রদায়! আমার মধ্যে কোনো পথভ্রষ্টতা নেই। তবে আমি তোমাদের ন্যায় পৈতৃক ধর্মের অনুসারী নই; বরং বিশ্ব পালকের পক্ষ থেকে প্রেরিত পয়গম্বর। আমি যা কিছু বলি, মহান পালনকর্তার নির্দেশেই বলি এবং আল্লাহ তা'আলার পয়গামই তোমাদের কাছে পৌঁছাই । এতে তোমাদেরই মঙ্গল। এতে না আল্লাহর কোনো লাভ আছে এবং না আমার কোনো স্বার্থ আছে। এখানে رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ 'বিশ্ব পালনকর্তা' শব্দটি শিরকের মূলে কুঠারাঘাত স্বরূপ।

এ সম্পর্কে চিন্তা করলে কোনো দেবদেবী ইয়াযদাঁ ও আহরেমানই টিকতে পারে না। এরপর বলেছেন : কিয়ামতের শাস্তি সম্পর্কে তোমাদের যে সন্দেহ এর কারণ তোমাদের অজ্ঞতা। আমাকে আল্লাহর পক্ষ থেকে এ সম্পর্কে নিশ্চিত জ্ঞান দান করা হয়েছে।

এর পর তাদের দ্বিতীয় সন্দেহের উত্তর দেওয়া হয়েছে , যা সূরা মুমিনুনে স্পষ্টভাবে উল্লিখিত রয়েছে :

مَا هٰذَآ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُرِيْدُ اَنْ يَّتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَاَنْزَلَ مَلٰٓئِكَةً অর্থাৎ নূহ (আ.)-এর দাওয়াত শোনে তাঁর কওম এমনও সন্দেহ করল যে, সে তো আমাদেরই মতো একজন মানুষ, আমদেরই মতো পানাহার করে এবং নিদ্রিত ও জাগ্রত হয়, তাঁকে আমরা কিরূপে অনুসৃত মেনে নিতে পারি? আল্লাহ তা'আলা যদি আমাদের কাছে কোনো পয়গাম পাঠাতে চাইতেন, তবে ফেরেশতাদেরকে প্রেরণ করতেন। তাদের স্বাতন্ত্র্য ও মাহাত্ম্য আমাদের দৃষ্টিতে সুস্পষ্ট হতো এবং এছাড়া আর কোনো কিছু নয় যে, আমাদের গোত্রেরই এক ব্যক্তি আমাদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে চায়।

এর উত্তরে তিনি বললেন : اَوَعَجِبْتُمْ اَنْ جَآءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَلٰى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوْا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ অর্থাৎ তোমরা কি এ ব্যাপারে বিস্মিত যে, তোমাদের পালনকর্তার পয়গাম তোমাদেরই মধ্য থেকে একজনের মাধ্যমে তোমাদের কাছে এসেছে, যাতে সে তোমাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করে, যাতে তোমরা ভীত হও এবং যাতে তোমরা অনুগৃহীত হও। অর্থাৎ তাঁর ভয় প্রদর্শনের ফলে তোমরা হুশিয়ার হয়ে বিরুদ্ধাচরণ ত্যাগ কর, যার ফলে তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ নাজিল হয়।

উদ্দেশ্য এই যে, মানুষকে রাসূল রাসূলরূপে মনোনীত করা কোনো বিস্ময়কর ব্যাপার নয়। প্রথমত আল্লাহ তা'আলা সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাধীন। তিনি যাকে ইচ্ছা রেসালত দান করবেন। এতে কারও টু-শব্দটি করার অধিকার নেই। এছাড়া আসল ব্যাপারে চিন্তা করলেও বুঝা যায় যে, সাধারণ মানুষের প্রতি রেসালাতের উদ্দেশ্য মানুষের মাধ্যমেই পূর্ণ হতে পারে। ফেরেশতাদের দ্বারা এ উদ্দেশ্য সাধিত হতে পারে না।

www.almodina.com

কারণ রেসালতের আসল লক্ষ্য হচ্ছে মানব জাতিকে আল্লাহর আনুগত্য ও ইবাদতে প্রতিষ্ঠিত করা এবং তাঁর নির্দেশাবলির বিরোধিতা থেকে রক্ষা করা। এটা তখনই সম্ভব, যখন মানুষের মধ্য থেকেই এক ব্যক্তি আদর্শ হয়ে তাদের দেখিয়ে দেয় যে, মানবিক কামনা বাসনার সাথেও আল্লাহর আনুগত্য ও ইবাদত একত্রিত হতে পারে। ফেরেশতা এ দাওয়াত নিয়ে আসলে এবং নিজের দৃষ্টান্ত মানুষের সামনে তুলে ধরলে মানুষের প্রকাশ্য আপত্তি থেকে যেত যে, ফেরেশতারা মানবিক প্রবৃত্তি থেকে মুক্ত তাদের ক্ষুধা তৃষ্ণা এবং নিদ্রা ও শান্তি কিছুই নেই আমরা তাদের মতো হবো কেমন করে? কিন্তু নিজেদেরই এক ব্যক্তি যখন সব মানবিক প্রবৃত্তি ও বৈশিষ্ট্য থাকা সত্ত্বেও খোদায়ী নির্দেশাবলির পূর্ণ আনুগত্য প্রদর্শন করবে, তখন তাদের কোনো অজুহাত থাকতে পারবে না।

এদিকে ইঙ্গিত করার জন্যই বলা হয়েছে : لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا অর্থাৎ মানুষ ও মানবিক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ব্যক্তির ভয় প্রদর্শনে প্রভাবান্বিত হয়েই মানুষ ভীত হতে পার অন্য কারো ভয় প্রদর্শনে নয়। অধিকাংশ উম্মতের কাফেররা এ সন্দেহ উত্থাপন করেছে যে, কোনো মানুষের নবী ও রাসূল হওয়া উচিত নয়। কুরআন পাক সবাইকে এ উত্তরই দিয়েছে। পরিতাপের বিষয় যে, কুরআনের এত সব সুস্পষ্ট বর্ণনা সত্ত্বেও আজও কিছু লোক রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মানবত্ত্বা অস্বীকার করার দুঃসাহস করে। কিন্তু মূর্খরা এ সত্যটি বোঝে না। তারা কোনো সমজাতীয় ব্যক্তির শ্রেষ্ঠত্বকে স্বীকৃতি দিতেও প্রস্তুত নয়। এ কারণেই মূর্খরা সব সময়ই সমসাময়িক ওলী ও আলেমদের প্রতি সমসাময়িকতার কারণে ঘৃণা ও বিমুখতা পোষণ করে এসেছে।

স্বজাতির মর্মন্তুদ কথাবার্তাব জওয়াবে হযরত নূহ (আ.)–এর দয়ার্দ্র এবং শুভেচ্ছামূলক আচরণও চেতানহীন জাতির মধ্যে কোনোরূপ প্রভাব বিস্তার করতে পারল না। তারা অন্ধভাবে মিথ্যারোপেই ব্যাপৃত রইল। তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতি প্লাবনের শাস্তি প্রেরণ করলেন। বলা হয়েছে : فَكَذَّبُوهُ فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ অর্থাৎ নূহ (আ.)-এর জালেম সম্প্রদায় তাঁর উপদেশ ও শুভেচ্ছার পরোয়া করল না এবং যথারীতি মিথ্যারোপে অটল রইল। এর পরিণতিতে আমি নূহ (আ.) ও তাঁর সঙ্গীদেরকে একটি নৌকায় উঠিয়ে মুক্তি দিয়েছি এবং যারা আমার নিদর্শনাবলিকে মিথ্যা বলেছিল তাদেরকে নিমজ্জিত করে দিয়েছি। নিশ্চয় তারা ছিল এক অন্ধ জনগোষ্ঠী।

হযরত নূহ (আ.)-এর কাহিনী, তাঁর সম্প্রদায়ের সলিল সমাধি লাভ এবং নৌকারোহীদের মুক্তির পূর্ণ বিবরণ সূরা নূহ ও সূরা হূদে বর্ণিত হবে। এস্থলে আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে মোটামুটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। হযরত যায়েদ ইবনে আসলাম বলেন; যে সময় হযরত নূহ (আ.)-এর সম্প্রদায়ের উপর প্লাবনের আজাব নেমে এসেছিল, তখন তারা জনসংখ্যা ও শক্তির দিক দিয়ে পরিপূর্ণ ছিল সংখ্যাধিক্যের কারণে ইরাকের ভূখণ্ড এবং পার্বত্য এলাকায়ও তাদের সংকুলান হচ্ছিল না। আল্লাহ তা'আলার চিরন্তন নীতি এই যে, তিনি অবাধ্য জাতিদেরকে অবকাশ দেন। তারা যখন সংখ্যাধিক্য, শক্তি ও ধনাঢ্যতার চরম সীমায় উপনীত হয়ে দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে ফেলে, তখনই তাদের উপর আল্লাহর আজাব নেমে আসে। –[ইবনে কাছীর]

হযরত নূহ (আ.)-এর সাথে নৌকায় কতজন লোক ছিল, এ সম্পর্কে বিভিন্ন রেওয়ায়েত রয়েছে। ইবনে কাছীর ইবনে আবী হাতেমের রেওয়ায়েতক্রমে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, আশি জন লোক ছিল। তন্মধ্যে একজনের নাম ছিল জুরহাম। সে আরবি ভাষায় কথা বলত। –[ইবনে কাছীর]

কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আরও বলা হয়েছে যে, আশি জনের মধ্যে চল্লিশ জন পুরুষ ও চল্লিশ জন মহিলা ছিল। প্লাবনের পর তারা মোসেলের যে স্থানটিতে বসতি স্থাপন করেন, তা ছামানুন (অর্থাৎ আশি) নামে খ্যাত হয়ে যায়।

মোটকথা এখানে হযরত নূহ (আ.) -এর সংক্ষিপ্ত কাহিনী বর্ণনা করে কয়েকটি বিষয় ব্যক্ত করা হয়েছে। এক. পূর্বতন সব পয়গম্বরের দাওয়াত ও বিশ্বাসের মূলনীতি ছিল অভিন্ন। দুই. আল্লাহ তা'আলা স্বীয় পয়গম্বরদের সাহায্য ও সমর্থন কিরূপ বিস্ময়কর পন্থায় করেন যে পাহাড়ের শৃঙ্গে পর্যন্ত সুউচ্চ প্লাবনের মধ্যেও তাঁদের নিরাপত্তা ব্যাহত হয়নি। তিন. পয়গম্বরগণের প্রতি মিথ্যারোপ করা আল্লাহর আজাব ডেকে আনারই নামান্তর। পূর্ববর্তী উম্মতরা যেমন পয়গম্বরদের প্রতি মিথ্যারোপ করার কারণে আজাবে গ্রেফতার হয়েছে, একালের লোকদেরও এ থেকে ভয়মুক্ত হওয়া উচিত নয়।

আদ ও ছামূদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস : 'আদ' প্রকৃতপক্ষে হযরত নূহ (আ.)-এর পঞ্চম পুরুষের মধ্যে এবং তাঁর পুত্র সামের বংশধরেরই এক ব্যক্তির নাম অতঃপর তার বংশধর ও গোটা সম্প্রদায় আদ নামে খ্যাত হয়ে গেছে। কুরআন পাকে আদের সাথে কোথাও আদে উলা (প্রথম আদ) এবং কোথাও إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এতে বুঝা যায় যে, আদ সম্প্রদায়কে ইরাম ও বলা হয় এবং প্রথম আদের বিপরীতে কোনো দ্বিতীয় আদও রয়েছে। এ সম্পর্কে তাফসীরবিদ ও

www.almodina.com

ইতিহাসবিদগণের উক্তি বিভিন্ন রূপ। অধিক প্রসিদ্ধ উক্তি এই যে, আদের দাদার নাম ইরাম। তাঁর পুত্র আওসের বংশধররাই আদ। তাদেরকে প্রথম আদ বলা হয়। অপর পুত্র জাসুর পুত্র হচ্ছে ছামূদ। তার বংশধরকে দ্বিতীয় আদ বলা হয়। এ বক্তব্যের সারমর্ম এই যে, আদ ও ছামূদ উভয়ই ইরামের দু'শাখা। এক শাখাকে প্রথম 'আদ' এবং অপর শাখাকে 'ছামূদ' বা দ্বিতীয় 'আদ' বলা হয়। 'ইরাম' শব্দটি আদ ও ছামূদ উভয়ের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য।

আদ সম্প্রদায়ের তেরটি পরিবার ছিল। আম্মান থেকে শুরু করে হাযরামাওত ও ইয়ামন পর্যন্ত তাদের বসতি ছিল। তাদের খেত খামারগুলো অত্যন্ত সজীব ও শস্য-শ্যামল ছিল। সব রকম বাগান ছিল। তারা ছিল সুঠামদেহী ও বিরাট বপুসম্পন্ন। আয়াতে وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَصْطَةً বাক্যের উদ্দেশ্য তাই। আল্লাহ তা'আলা তাদের সামনে দুনিয়ার যাবতীয় নিয়ামতের দ্বার খুলে দিয়েছিলেন। কিন্তু বক্রবুদ্ধির কারণেই এসব নিয়ামতেই তাদের জন্য কাল হয়ে দাঁড়ালো। তারা শক্তিমদমত্ত হয়ে مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً (আমাদের চাইতে শক্তিশালী কে?)–এর ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করতে থাকে।

যে বিশ্ব প্রতিপালকের নিয়ামতের বৃষ্টি তাদের উপর বর্ষিত হচ্ছিল, তারা তাঁকে পরিত্যাগ করে মূর্তিপূজায় আত্মনিয়োগ করে।

কোনো কোনো তাফসীরবিদ বলেন : আদ সম্প্রদায়ের উপর যখন আজাব আসে, তখন তাদের একটি পতিনিধি দল মক্কা গমন করেছিল। ফলে তারা আজাব থেকে রক্ষা পেয়ে যায়। তাদেরকে দ্বিতীয় আদ বলা হয়। –[বয়ানুল কুরআন]

'হূদ' একজন পয়গম্বরের নাম। তিনি হযরত নূহ (আ.)–এর পঞ্চম পুরুষের মধ্যে এবং সামের বংশধর এক ব্যক্তি। আদ সম্প্রদায় এবং হূদ (আ.)–এর বংশ তালিকা চতুর্থ পুরুষে সাম পর্যন্ত পৌঁছে এক হয়ে যায়। তাই হূদ (আ.) আদের বংশগত ভাই। এ কারণেই আয়াতে أَخَاهُمْ هُودًا (তাদের ভাই হূদ) বলা হয়েছে।

হযরত হূদ (আ.) -এর বংশ তালিকা ও কিছু জীবন-চরিত্র : আল্লাহ তা'আলাই তাদের হেদায়েতের জন্য হযরত হূদ (আ.)-কে পয়গম্বররূপে প্রেরণ করেন। তিনি ছিলেন তারই পরিবারের একজন। আরব বংশে বিশেষজ্ঞ আবুল বারাকাত জওফী লিখেন : হযরত হূদ (আ.)–এর পুত্র ইয়ারাব ইবনে কাহতান ইয়ামনে পৌঁছে বসতি স্থাপন করে। ইয়ামনের সব সম্প্রদায় তাঁরই বংশধর। আরবি ভাষার সূচনা তাঁর থেকেই হয়েছে এবং তার নামানুসারে ভাষার নাম আরবি এবং এ ভাষাভাষীদের নাম হয়েছে আরব। –[বাহরে মুহীত]

কিন্তু বিশুদ্ধ তথ্য এই যে, আরবি ভাষা হযরত নূহ (আ.)-এর আমল থেকেই প্রচলিত ছিল। হযরত নূহ (আ.)–এর নৌকার একজন আরোহী জুরহাম আরবি ভাষায় কথা বলতেন। –[বাহরে মুহীত]। জুরহাম থেকেই মক্কা শহর আবাদ হয়েছে। এটা সম্ভব যে, ইয়ামনে আরবি ভাষার সূচনা ইয়ারাব ইবনে কাহতান থেকে হয়েছিল। আবুল বারাকাতের বক্তব্যের উদ্দেশ্যও হয়তো তাই।

হযরত হূদ (আ.) আদ জাতিকে মূর্তি পূজা ত্যাগ করে একত্ববাদের অনুসরণ করতে এবং অত্যাচার উৎপীড়ন ত্যাগ করে ন্যায় ও সুবিচারেরে পথ ধরতে আদেশ করেন। কিন্তু তারা স্বীয় ধনৈশ্বর্যের মোহে মত্ত হয়ে তাঁর আদেশ অমান্য করে। এ পরিণতিতে তাদের উপর প্রথম আজাব নাজিল হয় এবং তিন বছর পর্যন্ত উপর্যুপরি বৃষ্টি বন্ধ থাকে। তাদের শস্যক্ষেত শুষ্ক বালুকাময় মরুভূমিতে পরিণত হয়ে যায়। বাগান জ্বলে পুড়ে ছারখার হয়ে যায়। কিন্তু এতদসত্ত্বেও তারা শিরক ও মূর্তি পূজা ত্যাগ করে না। অতঃপর আট দিন সাত রাত্রি পর্যন্ত তাদের উপর প্রবল ঘূর্ণিঝড়ের আজাব আপতিত হয়। ফলে তাদের অবশিষ্ট বাগ-বাগিচা ও দালান কোঠা ভূমিসাৎ হয়ে হয়ে যায়। মানুষ ও জীব জন্তু শূন্যে উড়তে থাকে। অতঃপর উপুড় হয়ে মাটিতে পড়তে থাকে। এভাবে আদ জাতিকে সমূলে ধ্বংস করে দেওয়া হয়। আলোচ্য আয়াতসমূহে বলা হয়েছে : وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا অর্থাৎ আমি মিথ্যারোপকারীদের বংশ কেটে দিয়েছি। এর মর্ম কোনো কোনো তাফসীরকার এটাই স্থির করেছেন যে, তখন তাদের মধ্যে যারা জীবিত ছিল তাদের সবাইকে ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে। কেউ কেউ এর অর্থ এরূপ বর্ণনা করেছেন যে, ভবিষ্যতের জন্যও আদ জাতিকে নির্বংশ করে দেওয়া হয়েছে।

হযরত হূদ (আ.)-এর আদেশ অমান্য করা এবং কুফর ও শিরকে লিপ্ত থাকার কারণে যখন আদ জাতির উপর আজাব নাজিল হয়, তখন হযরত হূদ (আ.) ও তাঁর সঙ্গীরা একটি কুড়ে ঘরে আশ্রয় গ্রহণ করেন। আশ্চর্যের বিষয় ছিল এই যে, ঘূর্ণিঝড়ের দাপটে বিরাট বিরাট অট্টালিকা মাটিতে লুটিয়ে পড়লেও এ কুড়ে ঘরটিতে বাতাস খুব সুষম পরিমাণে প্রবেশ করত। হযরত হূদ (আ.) ও তাঁর সঙ্গীরা ঠিক আজাবের মুহূর্তেও এখানে নিশ্চিন্তে বসে রইলেন। তাঁদের কোনো কষ্টই হয়নি। সবাই ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর তিনি মক্কায় চলে যান এবং সেখানেই ওফাত পান। –[বাহরে মুহীত]

www.almodina.com

আদ জাতির উপর ঘূর্ণিঝড়ের আকারে আজাব আসা কুরআন পাকে সুস্পষ্টভাবে উল্লিখিত রয়েছে। সূরা মু'মিনূনে হযরত নূহ (আ.) -এর কাহিনী উল্লেখ করার পর বলা হয়েছে : ثُمَّ اَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا اٰخَرِيْنَ অর্থাৎ অতঃপর আমি তাদের পরে আরও একটি সম্প্রদায় সৃষ্টি করেছি। বাহ্যত এরাই হচ্ছে 'আদ' জাতি। পরে এ সম্প্রদায়ের কাজ-কর্ম ও কথাবার্তা বর্ণনা করার পর বলা হয়েছে فَاَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ অর্থাৎ একটি বিকট শব্দ তাদেরকে পাকড়াও করল। এ আয়াতের ভিত্তিতে কোনো কোনো তাফসীরবিদ বলেন : আদ জাতির উপর বিকট ধরনের শব্দের আজাব আপতিত হয়েছিল। কিন্তু উভয় মতের মধ্যে কোনো বৈপরীত্য নেই। এটা সম্ভব যে, বিকট শব্দ ঘূর্ণিঝড় ও উভয়টিই হয়েছিল।

এ হচ্ছে আদ জাতি ও হযরত হূদ (আ.) -এর সংক্ষিপ্ত ঘটনা। কুরআন পাকের ভাষায় এর বিবরণ এরূপ : وَاِلٰى عَادٍ اَخَاهُمْ هُوْدًا قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ অর্থাৎ আমি আদ জাতির প্রতি তাদের ভাই হূদ (আ.) কে হেদায়েতের জন্য প্রেরণ করেছি। যে বলল : হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা শুধু আল্লাহ তা'আলারই ইবাদত কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের কোনো উপাস্য নেই। তোমরা কি ভয় করো না?

আদ জাতির পূর্বে হযরত নূহ (আ.)–এর সম্প্রদায়ের উপর পতিত মহাশাস্তির স্মৃতি তখনও মানুষের মন থেকে মুছে যায়নি। তাই হযরত হূদ (আ.) আজাবের কঠোরতা বর্ণনা করা প্রয়োজন মনে করেননি; বরং এতটুকু বলাই যথেষ্ট মনে করেছেন যে, তোমরা কি ভয় করো না?

আয়াতে বলা হয়েছে : قَالَ الْمَلَاُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖۤ اِنَّا لَنَرٰىكَ فِيْ سَفَاهَةٍ وَّاِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ অর্থাৎ সম্প্রদায়ের প্রধানরা বলল : আমরা তোমাকে নির্বুদ্ধিতায় লিপ্ত দেখতে পাচ্ছি। আমাদের ধারণা তুমি একজন মিথ্যাবাদী।

এটা প্রায় হযরত নূহ (আ.)-এর সম্প্রদায়ের প্রত্যুত্তরের মতোই শুধু কয়েকটি শব্দের পার্থক্য মাত্র। ৬৭ ও ৬৮ নং আয়াতে এর উত্তর প্রায় তেমনি দেওয়া হয়েছে, যেমন হযরত নূহ (আ.) দিয়েছিলেন। অর্থাৎ আমার মধ্যে কোনো নির্বুদ্ধিতা নেই। ব্যাপার শুধু এতটুকু যে, আমি বিশ্ব পালনকর্তার কাছ থেকে রাসূল হয়ে এসেছি। তাঁর বার্তা তোমাদের কাছে পৌঁছাই। আমি সুস্পষ্টভাবে তোমাদের হিতাকাঙ্ক্ষী। তাই তোমাদের পৈতৃক মূর্খতায় তোমাদের সঙ্গী হওয়ার পরিবর্তে তোমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সত্য কথা তোমাদের কাছে পৌঁছে দেই। কিন্তু তা তোমাদের মনঃপূত নয়।

শব্দ বিশ্লেষণ

نَكِدًا : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ صفت مشبهة বাব سَمِعَ মাসদার اَلنَّكَدُ মূলবর্ণ (ن . ك . د) জিনস صحيح অর্থ– কঠোর পরিশ্রম।

لِتَتَّقُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِتِّقَاءُ মূলবর্ণ (و . ق . ى) জিনস لفيف مقرون অর্থ– যেন তোমরা সংযত হও।

تُرْحَمُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع مجهول বাব سَمِعَ মাসদার اَلرَّحْمَةُ মূলবর্ণ (ر . ح . م) জিনস صحيح অর্থ– তোমরা অনুগ্রহ প্রাপ্ত হবে।

اَغْرَقْنَا : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِغْرَاقُ মূলবর্ণ (غ . ر . ق) জিনস صحيح অর্থ– আমি নিমজ্জিত করেছি।

عَمِيْنَ শব্দটি বহুবচন; একবচন عَمِىٌّ অর্থ– অন্ধলোক

لَنَرٰىكَ সীগাহ جمع متكلم বহছ مضارع معروف বাব فَتَحَ মাসদার اَلرُّؤْيَةُ মূলবর্ণ (ر . أ . ى) জিনস মুরাক্কাব ناقص يائى ও مهموز عين অর্থ– অবশ্যই আমরা দেখছি

اُبَلِّغُكُمْ رِسٰلٰتِ رَبِّيْ وَاَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ اَمِيْنٌ (٦٨)	**অনুবাদ :** (৬৮) তোমাদেরকে আমার প্রতিপালকের পয়গাম পৌছাচ্ছি আর আমি তোমাদের সত্যিকারের হিতাকাঙ্ক্ষী।
اَوَعَجِبْتُمْ اَنْ جَآءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَلٰى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ ۚ وَاذْكُرُوْٓا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنْۢ بَعْدِ قَوْمِ نُوْحٍ وَّزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَصْۜطَةً ۚ فَاذْكُرُوْٓا اٰلَآءَ اللّٰهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ (٦٩)	(৬৯) আর তোমরা কি এ বিষয়ে আশ্চর্যবোধ করছ যে, তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে উপদেশবাণী সমাগত হয়েছে তেমাদের নিকট এমন এক ব্যক্তির মাধ্যমে যিনি তোমাদেরই মধ্যকার একজন? যেন তিনি তোমাদের ভয় প্রদর্শন করেন, আর তোমরা সেই অবস্থা স্মরণ কর, যখন আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে নূহ সম্প্রদায়ের পর [ভূপৃষ্ঠে] আবাদ করেছেন, এবং দৈহিক গঠনে তোমাদেরকে অধিক প্রশস্ততা দান করেছেন, অতএব, আল্লাহর নিয়ামতগুলো স্মরণ কর, যেন তোমাদের কল্যাণ হয়।
قَالُوْٓا اَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللّٰهَ وَحْدَهٗ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ اٰبَآؤُنَا ۚ فَاْتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ (٧٠)	(৭০) তারা বলতে লাগল, আপনি কি আমাদের নিকট এজন্য আগমন করেছেন যে, আমরা শুধু আল্লাহরই ইবাদত করি আর আমাদের পিতৃপুরুষগণ যাদেরকে পূজা করত তাদেরকে ত্যাগ করি? আর আমাদেরকে যে শাস্তির ভয় প্রদর্শন করছেন, তা আমাদের নিকট আনয়ন করুন, যদি আপনি সত্যবাদী হন।

শাব্দিক অনুবাদ

(৬৮) اُبَلِّغُكُمْ رِسٰلٰتِ رَبِّيْ তোমাদেরকে আমার প্রতিপালকের পয়গাম পৌছাচ্ছি وَاَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ اَمِيْنٌ আর আমি তোমাদের সত্যিকারের হিতাকাঙ্ক্ষী।

(৬৯) اَوَعَجِبْتُمْ আর তোমরা কি এ বিষয়ে আশ্চর্য বোধ করছ যে اَنْ جَآءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে উপদেশবাণী সমাগত হয়েছে তেমাদের নিকট عَلٰى رَجُلٍ مِّنْكُمْ এমন এক ব্যক্তির মাধ্যমে যিনি তোমাদেরই মধ্যকার একজন لِيُنْذِرَكُمْ যেন তিনি তোমাদের ভয় প্রদর্শন করেন وَاذْكُرُوْٓا আর তোমরা সেই অবস্থা স্মরণ কর اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ যখন আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে [ভূপৃষ্ঠে] আবাদ করেছেন مِنْۢ بَعْدِ قَوْمِ نُوْحٍ নূহ সম্প্রদায়ের পর وَّزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَصْطَةً এবং দৈহিক গঠনে তোমাদেরকে অধিক প্রশস্ততা দান করেছেন فَاذْكُرُوْٓا اٰلَآءَ اللّٰهِ অতএব, আল্লাহর নিয়ামতগুলো স্মরণ কর لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ যেন তোমাদের কল্যাণ হয়।

(৭০) قَالُوْٓا তারা বলতে লাগল اَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللّٰهَ وَحْدَهٗ আপনি কি আমাদের নিকট এজন্য আগমন করেছেন যে, আমরা শুধু আল্লাহরই ইবাদত করি وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ اٰبَآؤُنَا আর আমাদের পিতৃপুরুষগণ যাদেরকে পূজা করত তাদেরকে ত্যাগ করি فَاْتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ আর আমাদেরকে যে শাস্তির ভয় প্রদার্শন করছেন, তা আমাদের নিকট আনয়ন করুন اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ যদি আপনি সত্যবাদী হন।

www.almodina.com

অনুবাদ	আয়াত
অনুবাদ : (৭১) তিনি বললেন, ব্যস, এখন তোমাদের উপর আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে আজাব ও গজব আসার উপক্রম হয়েছে, তোমরা কি আমার সঙ্গে এমন কতকগুলো নাম সম্পর্কে বিতর্ক করছ যেগুলোকে তোমরা এবং তোমাদের পিতৃপুরুষগণ নির্দিষ্ট করে নিয়েছে, তাদের উপাস্য হওয়া সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা কোনো প্রমাণ প্রেরণ করেননি, অতএব, তোমরা প্রতীক্ষা করতে থাক, আমিও তোমাদের সাথে প্রতীক্ষায় রইলাম।	قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ رِجْسٌ وَّغَضَبٌ ۚ اَتُجَادِلُوْنَنِيْ فِيْٓ اَسْمَآءٍ سَمَّيْتُمُوْهَآ اَنْتُمْ وَاٰبَآؤُكُمْ مَّا نَزَّلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ ۚ فَانْتَظِرُوْٓا اِنِّيْ مَعَكُمْ مِّنَ الْمُنْتَظِرِيْنَ (٧١)
(৭২) ফলকথা আমি তাঁকে এবং তাঁর সঙ্গিদেরকে স্বীয় করুণার দ্বারা রক্ষা করলাম, এবং সে সমস্ত লোকের মূলোৎপাটন করে দিলাম যারা আমার আয়াতগুলোকে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছিল, আর তারা ঈমান আনয়নকারী। [-ও] ছিল না।	فَاَنْجَيْنٰهُ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَمَا كَانُوْا مُؤْمِنِيْنَ (٧٢)
(৭৩) আর আমি ছামূদ সম্প্রদায়ের প্রতি তাদের ভ্রাতা ছালেহকে প্রেরণ করলাম, তিনি [স্বীয় সম্প্রদায়কে] বললেন, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা [কেবল] আল্লাহর ইবাদত কর, তিনি ভিন্ন কেউ তোমাদের মা'বূদ নেই, তোমাদের নিকট তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে একটি স্পষ্ট নিদর্শন এসেছে, এটা আল্লাহর উষ্ট্রী, যা তোমাদের জন্য প্রমাণস্বরূপ, অতএব, এটাকে মুক্ত করে দাও, যেন আল্লাহর জমিনে খেয়ে বেড়ায়, আর তোমরা তাকে মন্দ উদ্দেশ্যে স্পর্শও করো না অন্যথা তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি পাকড়াও করবে।	وَاِلٰى ثَمُوْدَ اَخَاهُمْ صٰلِحًا ۘ قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ۚ قَدْ جَآءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ هٰذِهٖ نَاقَةُ اللّٰهِ لَكُمْ اٰيَةً فَذَرُوْهَا تَاْكُلْ فِيْٓ اَرْضِ اللّٰهِ وَلَا تَمَسُّوْهَا بِسُوْٓءٍ فَيَاْخُذَكُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ (٧٣)

শাব্দিক অনুবাদ

(৭১) قَالَ তিনি বললেন قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ ব্যস, এখন তোমাদের উপর আসার উপক্রম হয়েছে مِّنْ رَّبِّكُمْ আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে رِجْسٌ وَّغَضَبٌ আজাব ও গজব اَتُجَادِلُوْنَنِيْ তোমরা কি আমার সঙ্গে বিতর্ক করছ فِيْٓ اَسْمَآءٍ এমন কতকগুলো নাম সম্পর্কে سَمَّيْتُمُوْهَآ اَنْتُمْ وَاٰبَآؤُكُمْ যেগুলোকে তোমরা এবং তোমাদের পিতৃপুরুষগণ নির্দিষ্ট করে নিয়েছে مَّا نَزَّلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ তাদের উপাস্য হওয়া সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা কোনো প্রমাণ প্রেরণ করেননি فَانْتَظِرُوْٓا অতএব, তোমরা প্রতীক্ষা করতে থাক اِنِّيْ مَعَكُمْ مِّنَ الْمُنْتَظِرِيْنَ আমিও তোমাদের সাথে প্রতীক্ষায় রইলাম।

(৭২) فَاَنْجَيْنٰهُ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗ ফলকথা আমি তাঁকে এবং তাঁর সঙ্গীদেরকে রক্ষা করলাম بِرَحْمَةٍ مِّنَّا স্বীয় করুণার দ্বারা وَقَطَعْنَا دَابِرَ এবং সে সমস্ত লোকের মূলোৎপাটন করে দিলাম الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا যারা আমার আয়াতগুলোকে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছিল وَمَا كَانُوْا مُؤْمِنِيْنَ আর তারা ঈমান আনয়নকারী [-ও] ছিল না।

(৭৩) وَاِلٰى ثَمُوْدَ اَخَاهُمْ صٰلِحًا আর আমি ছামূদ সম্প্রদায়ের প্রতি তাদের ভ্রাতা ছালেহকে প্রেরণ করলাম قَالَ يٰقَوْمِ তিনি [স্বীয় সম্প্রদায়কে] বললেন, হে আমার সম্প্রদায়! اعْبُدُوا اللّٰهَ তোমরা [কেবল] আল্লাহর ইবাদত কর مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ তিনি ভিন্ন কেউ তোমাদের মা'বূদ নেই قَدْ جَآءَتْكُمْ তোমাদের নিকট এসেছে بَيِّنَةٌ একটি স্পষ্ট নিদর্শন مِّنْ رَّبِّكُمْ তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে هٰذِهٖ نَاقَةُ اللّٰهِ এটা আল্লাহর উষ্ট্রী لَكُمْ اٰيَةً যা তোমাদের জন্য প্রমাণস্বরূপ فَذَرُوْهَا অতএব, এটাকে মুক্ত করে দাও تَاْكُلْ فِيْٓ اَرْضِ اللّٰهِ যেন আল্লাহর জমিনে খেয়ে বেড়ায় وَلَا تَمَسُّوْهَا بِسُوْٓءٍ আর তোমরা তাকে মন্দ উদ্দেশ্যে স্পর্শও করো না فَيَاْخُذَكُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ অন্যথা তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি পাকড়াও করবে।

www.almodina.com

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

৬৯ নং আয়াতে আদ জাতির সে আপত্তির কথাই উল্লেখ করা হয়েছে, যা তাদের পূর্বে হযরত নূহ (আ.)–এর সম্প্রদায় উত্থাপন করেছিল। অর্থাৎ আমরা নিজেদেরই মতো কোনো মানুষকে নেতারূপে কিভাবে মেনে নিতে পারি? কোনো ফেরেশতা হলে মেনে নেওয়া সম্ভব ছিল। এর উত্তরেও কুরআন পাক তাই উল্লেখ করেছে, যা হযরত নূহ (আ.) দিয়েছিলেন। অর্থাৎ এটা আশ্চর্যের বিষয় নয় যে, কোনো মানুষ আল্লাহর রাসূল হয়ে মানুষকে ভয় প্রদর্শনের জন্য আসবেন। কেননা মানুষকে বুঝানোর জন্য মানুষের পয়গম্বর হওয়াই কার্যকরী হতে পারে।

এরপর আদ জাতিকে আল্লাহ প্রদত্ত নিয়ামতসমূহ স্মরণ করিয়ে বলা হয়েছে : وَاذْكُرُوْا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاۤءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوْحٍ وَّزَادَكُمْ فِى الْخَلْقِ بَصْۜطَةً فَاذْكُرُوْا اٰلَاۤءَ اللّٰهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ অর্থাৎ স্মরণ কর যে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে কওমে নূহের পর ভূপৃষ্ঠের মালিক করে দিয়েছেন এবং দেহাবয়বে বিশালতা ও সংখ্যায় আধিক্য দিয়েছেন। আল্লাহর এসব নিয়ামত স্মরণ করলে তোমাদের মঙ্গল হবে।

কিন্তু এ আবাধ্য জাতি এসব উপদেশের প্রতি কর্ণপাত করল না। তারা পথভ্রষ্টদের চিরাচরিত প্রথায় উত্তর দিল : তুমি কি আমাদের বাপ দাদাদের ধর্ম আমাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে চাও? দেবতাদেরকে ছেড়ে আমরা এক আল্লাহর ইবাদত করি, এটাই কি তোমার কাম্য? না, আমরা তা করতে পারব না। তুমি যে শাস্তির হুমকি দিচ্ছ, তা নিয়ে আস যদি সত্যবাদী হও।

৭০ নং আয়াতে হযরত হূদ (আ.) উত্তর দিয়েছেন : তোমরা যখন এমনি অবাধ্য ও অজ্ঞান, তখন তোমাদের উপর আল্লাহর গজব ও শাস্তি এলো বলে, তোমরা অপেক্ষা কর। আমিও এখন তারই প্রতীক্ষা করছি। জাতির এ উস্কানিমূলক উত্তর শুনে তিনি আজাব আসার সংবাদ দিয়েছিলেন বটে; কিন্তু পয়গম্বরসুলভ দয়া ও শুভেচ্ছা তাঁকে সাথে সাথে একথা বলতেও বাধ্য করল : পরিতাপের বিষয়, তোমরা এবং তোমাদের বাপ দাদারা জড় ও অচেতন পদার্থসমূহকে উপাস্য করে নিয়েছে। এদের উপাস্য হওয়ার না কোনো যুক্তিগত প্রমাণ আছে, না ইতিহাসগত। এদের ইবাদতে তোমরা এতই পাকা হয়ে গেছ যে, এদের সমর্থনে আমার সাথে বিতর্ক করে যাচ্ছ।

সর্বশেষ আয়াতে বলা হয়েছে, হযরত হূদ (আ.)–এর সব প্রচেষ্টা এবং আদ জাতির অবাধ্যতার সর্বশেষ পরিণতি এই দাঁড়ায় যে, আমি হূদ ও তাঁর সাথি মুমিনদেরকে আজাব থেকে নিরাপদে রেখেছি এবং মিথ্যারোপকারীদের মূল কেটে দিয়েছি। তারা বিশ্বাস স্থাপনকারী ছিল না।

এ কাহিনীতে গাফেলদের জন্য আল্লাহর স্মরণ ও আনুগত্যে আত্মনিয়োগ করার নির্দেশ, বিরুদ্ধাচরণকারীদের জন্য শিক্ষাসামগ্রী এবং প্রচারক সংস্কারকদের জন্য পয়গম্বরসূলভ প্রচার ও সংস্কার পদ্ধতির শিক্ষা বিদ্যমান রয়েছে।

قوله : وَاِلٰى ثَمُوْدَ اَخَاهُمْ صٰلِحًا الخ : আলোচ্য আয়াতসমূহে হযরত ছালেহ (আ.) ও তাঁর সম্প্রদায়ের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। যেমন ইতঃপূর্বে কওমে নূহ ও কওমে হূদের প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে। সূরা আ'রাফের শেষ পর্যন্ত পূর্ববর্তী পয়গম্বরও তাদের উম্মতদের অবস্থা এবং সত্যের প্রতি দাওয়াত দেওয়ার কারণে তাদের কুফর ও অশুভ পরিণতির বিষয় বর্ণিত হবে।

আলোচ্য প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে : وَاِلٰى ثَمُوْدَ اَخَاهُمْ صٰلِحًا ইতঃপূর্বে আদ জাতির আলোচনায় বলা হয়েছে যে, আদ ও ছামূদ একই দাদার বংশধরের দু'ব্যক্তির নাম। তাদের সন্তানরাও তাদের নামে অভিহিত হয়ে দু'সম্প্রদায়ের পরিণত হয়। একটি আদ সম্প্রদায় আর একটি ছামূদ সম্প্রদায় তারা আরবের উত্তর পশ্চিম এলাকায় বসবাস করত । তাদের প্রধান শহরের নাম ছিল ''হজর' বর্তমানে একে সাধারণত 'মাদায়েনে ছালেহ' বলা হয়। আদ জাতির মতো ছামূদ জাতিও সম্পন্ন, শক্তিশালী ও বীর জাতি ছিল। তারা প্রস্তর খোদাই ও স্থাপত্য বিদ্যায় খুবই পারদর্শী ছিল। সমতল ভূমিতে বিশালকায় অট্টালিকা নির্মাণ ছাড়াও পর্বত খোদাই করে নানা রকম প্রকোষ্ঠ নির্মাণ করত। 'আরদুল কুরআন"গ্রন্থে মাওলানা সাইয়্যেদ সোলায়মান নদভী লিখেছেন : তাদের স্থাপত্যের নিদর্শনাবলি আজও পর্যন্ত বিদ্যমান রয়েছে। এগুলোর গায়ে ইরামী ও ছামূদী বর্ণমালায় শিলালিপি রয়েছে।

www.almodina.com

পার্থিব বিত্ত ও ধনৈশ্বর্যের পরিণতি প্রায়ই অশুভ হয়ে থাকে। বিত্তশালীরা আল্লাহ ও পরকাল ভুলে গিয়ে ভ্রান্তপথে পা বাড়ায়। সামূদ জাতির বেলায়ও তাই হয়েছে।

অথচ পূর্ববর্তী কওমে নূহের শাস্তির ঘটনাবলি তখনও লোকমুখে আলোচিত হতো এবং আদ জাতির ধ্বংসের কাহিনী যেন সাম্প্রতিক কালের ঘটনা বলে বিবেচিত হতো। কিন্তু ঐশ্বর্য ও শক্তির নেশা এমন জিনিস যে একজনে ধ্বংসস্তূপের উপর অন্যজন এসে স্বীয় প্রাসাদ নির্মাণ করে এবং প্রথম জনের ইতিবৃত্ত সম্পূর্ণ ভুলে যায়। আদ জাতির ধ্বংসের পর ছামূদ জাতি তাদের পরিত্যক্ত ঘরবাড়ি ও সহায় সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয় এবং যে সব জায়গায় নিজেদের বিলাস বহুল প্রাসাদ গড়ে তোলে সেখানেই তাদের ভাইয়েরা নিশ্চিহ্ন হয়েছিল। তারা আদ জতির অনুরূপ কার্যকলাপও শুরু করে দেয়। আল্লাহ ও পরকাল বিস্মিত হয়ে শিরক ও মূর্তি পূজায় মনোনিবেশ করে। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় চিরন্তন রীতি অনুযায়ী তাদের হেদায়েতের জন্য হযরত সালেহ (আ.) কে পয়গম্বররূপে প্রেরণ করেন। তিনি বংশ ও দেশের দিক দিয়ে ছামূদ জাতিরই একজন এবং সামেরই বংশধর ছিলেন। একারণেই আয়াতে তাঁকে أَخَاهُمْ صَالِحًا অর্থাৎ ছামূদ জাতির ভাই বলে উল্লেখ করা হয়েছে। হযরত সালেহ (আ.) স্বীয় সম্প্রদায়কে সে দাওয়াতেই দেন, যা হযরত আদম (আ.) থেকে শুরু করে তখনও পর্যন্ত সমস্ত পয়গম্বর নিয়ে এসেছিলেন। যেমন, কুরআনে বলা হয়েছে : وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِيْ كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلًا اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ অর্থাৎ আমি প্রত্যেক উম্মতে একজন করে রাসূল প্রেরণ করেছি, যাতে তারা মানুষকে আল্লাহর ইবাদত করার ও মূর্তি পূজা পরিহার করার নির্দেশ দেশ। পূর্ববর্তী পয়গম্বরদের ন্যায় ছালেহ (আ.) ও তাঁর জাতিকে এ কথাই বললেন যে, আল্লাহ তা'আলাকে প্রতিপালক ও স্রষ্টা মনে কর। তিনি ব্যতীত ইবাদতের যোগ্য কেউ নেই তাঁর ভাষায় يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ এতদসঙ্গে আরও বললেন : قَدْ جَآءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ অর্থাৎ এখন তো একটি সুস্পষ্ট নিদর্শনও প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে এসে গেছে। এ নিদর্শনের অর্থ একটি আশ্চর্য ধরনের উষ্ট্রী। এ আয়াতে এর সংক্ষিপ্ত উল্লেখ রয়েছে এবং কুরআনের বিভিন্ন সূরায় এর বিস্তারিত বিবরণ উল্লিখিত হয়েছে। এ উষ্ট্রির ঘটনা এই যে, হযরত সালেহ (আ.) যৌবনকাল থেকেই স্বীয় সম্প্রাদয়কে একত্ববাদের দাওয়াত দিতে শুরু করেন এবং এ কাজেই বার্ধক্যের দ্বারে উপনীত হন। তাঁর বারবার পীড়াপীড়িতে অতিষ্ঠ হয়ে তাঁর সম্প্রদায়ের লোকেরা স্থির করল যে, তাঁর কাছে এমন টি দাবি করতে হবে যা পূরণ করতে তিনি অক্ষম হয়ে পড়বেন এবং তাঁর বিরুদ্ধে জয়লাভ করব। সে মতে তারা দা.ব করল যে, আপনি যদি বাস্তবিকই আল্লাহর পয়গম্বর হন, তবে আমাদেরকে কাতেবা পাহাড়ের ভিতর থেকে একটি দশ মাসের গর্ভবতী, সবল ও স্বাস্থ্যবতী উষ্ট্রী বের করে দেখান।

হযরত সালেহ (আ.) প্রথমে তাদের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিলেন যে, যদি আমি তোমাদের দাবি পূরণ করে দেই, তবে তোমরা আমার প্রতি ও আমার দাওয়াতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে কি না? সবাই যখন এই মর্মে অঙ্গীকার করল, তখন হযরত ছালেহ (আ.) দু'রাকাত নামাজ পড়ে আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন, ইয়া পরওয়ারদেগার, আপনার জন্য কোনো কাজই কঠিন নয়। তাদরে দাবি পূরণ করে দিন। দোয়ার সাথে সাথে পাহাড়ের গায়ে স্পন্দন দেখা গেল এবং একটি বিরাট প্রস্থর খণ্ড বিস্ফারিত হয়, তার ভিতর থেকে দাবির অনুরূপ একটি উষ্ট্রী বের হয়ে এলো।

হযরত সালেহ (আ.)–এর এ বিস্ময়কর মু'জিযা দেখে কিছু লোক তৎক্ষণাৎ মুসলমান হয়ে গেল এবং অবশিষ্টরাও মুসলমান হওয়ার ইচ্ছা করল, কিন্তু দেবদেবীদের বিশেষ পূজারী ও মূর্তিপূজার ঠাকুর ধরনের কিছু সর্দার তাদেরকে ইসলাম গ্রহণে বাধা দিল। হযরত ছালেহ (আ.) স্বীয় সম্প্রদায়কে অঙ্গীকার ভঙ্গ করতে দেখে শঙ্কিত হলেন যে, এদের উপর আজাব এসে যেতে পারে। তাই পয়গম্বরসুলভ দয়া প্রকাশ করে বললেন : এ উষ্ট্রীর দেখাশোনা কর। একে কোনোরূপ কষ্ট দিও না। এভাবে হয়ত তোমরা আজাব থেকে বেঁচে যেতে পার। এর অন্যথায় হলে তোমরা সাথে সাথে আজাবে পতিত হবে। নিম্নোক্ত আয়াতে এই কথাই ব্যক্ত হয়েছে : هٰذِهٖ نَاقَةُ اللّٰهِ لَكُمْ اٰيَةً فَذَرُوْهَا تَاْكُلْ فِيْٓ اَرْضِ اللّٰهِ وَلَا تَمَسُّوْهَا بِسُوْٓءٍ فَيَاْخُذَكُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ অর্থাৎ এটি আল্লাহর উষ্ট্রী তোমাদের জন্য নিদর্শন। অতএব একে আল্লাহর জমিনে চলে বেড়াতে দাও এবং একে অনিষ্টের অভিপ্রায়ে স্পর্শ করো না। নতুবা তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি পাকড়াও করবে। এ উষ্ট্রীকে আল্লাহর উষ্ট্রী বলার কারণ এই যে, এটি আল্লাহর আসীম শক্তির নিদর্শন এবং হযরত ছালেহ (আ.)–এর মু'জিযা হিসেবে বিস্ময়কর পন্থায় সৃষ্টি হয়েছিল। যেমন, হযরত ঈসা (আ.) এর জন্মও অলৌকিক পন্থায় হয়েছিল বলে তাঁকে রূহুল্লাহ (আল্লাহর আত্মা) বলা

হয়েছে। تَأْكُلْ فِيْٓ اَرْضِ اللّٰهِ বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এ উষ্ট্রীর পানাহারে তোমাদের মালিকানা ও তোমাদের ঘর থেকে কিছুই ব্যয় হয় না। জমিন আল্লাহর এবং এর উৎপন্ন ফসলও আল্লাহর সৃজিত। কাজেই তাঁর উষ্ট্রীকে তাঁর জমিনে স্বাধীনভাবে ছেড়ে দাও, যাতে সাধারণভাবে চাবণ ক্ষেত্রে বিচরণ করে বেড়াতে পারে।

ছামূদ জাতি যে কূপ থেকে পানি পান করত এবং জন্তুদেরকে পান করাত, এ উষ্ট্রীও সে কূপ থেকেই পানি পান করত। কিন্তু এ আশ্চর্য ধরনের উষ্ট্রী যখন পানি পান করত, তখন পানি নিঃশেষে পান করে ফেলত। হযরত ছালেহ (আ.) আল্লাহর নির্দেশে ফয়সালা করে দিলেন যে, একদিন এ উষ্ট্রী পানি পান করবে এবং অন্যদিন সম্প্রদায়ের সবাই পানি নিবে। যেদিন উষ্ট্রী পানি পান করত সেদিন অন্যরা উষ্ট্রীর দুধ দ্বারা তাদের সব পাত্র ভর্তি করে নিত। কুরআনের অন্যত্র এভাবে পানি বন্টনের কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে : وَنَبِّئْهُمْ اَنَّ الْمَآءَ قِسْمَةٌۢ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُّحْتَضَرٌ অর্থাৎ হে সালেহ! তুমি স্বজাতিকে বলে দাও যে, কূপের পানি তাদের এবং উষ্ট্রীর মধ্যে বন্টন হবে। একদিন উষ্ট্রীর এবং পরবর্তী দিন তাদের। আল্লাহর পক্ষ থেকে ফেরেশতারা এ বন্টন ব্যবস্থা দেখাশোনা করবে। যাতে কেউ এর খেলাফ করতে না পারে। অন্য এক আয়াতে আছে هٰذِهٖ نَاقَةٌ لَّهَا شِرْبٌ وَّلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَّعْلُوْمٍ অর্থাৎ এটি আল্লাহর উষ্ট্রী। একদিন এর পানি এবং অন্য নির্দিষ্ট দিনের পানি তোমাদের।

শব্দ বিশ্লেষণ

رِسٰلٰتِ : শব্দটি বহুবচন, একবচন رِسَالَةٌ অর্থ- পয়গাম, বাণী।

اَمِيْنٌ : সীগাহ واحد مذكر বহছ صفت مشبهة বাব كَرُمَ মাসদার اَلْاَمَانَةُ মূলবর্ণ (ا . م . ن) জিনস مهموز فاء অর্থ- বিশ্বস্ত, বিশ্বাসী, আমানতদার, নিরাপদ, নিশ্চিন্ত, সচিব, রক্ষক।

جِئْتَ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ ماضى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْمَجِيْئَةُ মূলবর্ণ (ج . ى . ء) জিনস মুরাক্কাব مهموز لام ও اجوف يائى অর্থ- তুমি এসেছ।

فَأْتِنَا : সীগাহ واحد مذ كر حاضر বহছ امر حاضرمعروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِيْتَاءُ মূলবর্ণ (ا . ت . ى) জিনস মুরাক্কাব ناقص يائى ও مهموز فاء অর্থ- তুমি আনয়ন কর।

تَعِدُنَا : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْعِدَةُ মূলবর্ণ (و . ع . د) জিনস مثال واوى অর্থ- তুমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছ।

سَمَّيْتُمُوْ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ ماضى معروف বাব تَفْعِيْلٌ মাসদার اَلتَّسْمِيَةُ মূলবর্ণ (س . م . و) জিনস ناقص واوى অর্থ- তোমরা নাম রেখেছ।

دَابِرَ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব نَصَرَ মাসদার اَلدُّبُوْرُ মূলবর্ণ (د . ب . ر) জিনস صحيح অর্থ- অতিবাহিত হওয়া।

وَاذْكُرُوٓا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنْۢ بَعْدِ عَادٍ وَّبَوَّاَكُمْ فِي الْاَرْضِ تَتَّخِذُوْنَ مِنْ سُهُوْلِهَا قُصُوْرًا وَّتَنْحِتُوْنَ الْجِبَالَ بُيُوْتًا ۚ فَاذْكُرُوٓا اٰلَآءَ اللّٰهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ (٧٤)

অনুবাদ : (৭৪) আর তোমরা সেই অবস্থাকে স্মরণ কর, যখন আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে আদ সম্প্রদায়ের পর [ভূপৃষ্ঠে] আবাদ করেছেন, এবং তোমাদেরকে ভূপৃষ্ঠে থাকার জন্য বাসস্থান প্রদান করেছেন, যেন তোমরা কোমল মাটিতে বড় অট্টালিকা নির্মাণ কর এবং পাহাড়গুলোকে খুঁড়ে খুঁড়ে তাতে গৃহ নির্মাণ কর, সুতরাং আল্লাহ তা'আলার নিয়ামতগুলোকে স্মরণ কর, আর ভূপৃষ্ঠে ফ্যাসাদ বিস্তার করো না।

قَالَ الْمَلَاُ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ لِلَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا لِمَنْ اٰمَنَ مِنْهُمْ اَتَعْلَمُوْنَ اَنَّ صٰلِحًا مُّرْسَلٌ مِّنْ رَّبِّهٖ ؕ قَالُوْٓا اِنَّا بِمَآ اُرْسِلَ بِهٖ مُؤْمِنُوْنَ (٧٥)

(৭৫) তাঁর সম্প্রদায়ের মধ্যে যে সকল দাম্ভিক সরদার ছিল, তারা সেই সকল দরিদ্রদেরকে যারা তাদের মধ্য হতে ঈমান আনয়ন করেছিল, জিজ্ঞাসা করল, তোমরা কি বিশ্বাস কর যে, ছালেহ তার পরওয়ারদেগারের পক্ষ হতে প্রেরিত [রাসূল]? তারা [উত্তরে] বলল, নিশ্চয় আমরা তো পূর্ণ বিশ্বাস রাখি তৎপ্রতি, যা তাঁকে দিয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

قَالَ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْٓا اِنَّا بِالَّذِيْٓ اٰمَنْتُمْ بِهٖ كٰفِرُوْنَ (٧٦)

(৭৬) সেই দাম্ভিক ব্যক্তিরা বলতে লাগল, তোমরা যে বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছ, আমরা তো তার অস্বীকারকারী।

শাব্দিক অনুবাদ

(৭৪) وَاذْكُرُوٓا আর তোমরা সেই অবস্থাকে স্মরণ কর اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ যখন আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে [ভূপৃষ্ঠে] আবাদ করেছেন مِنْۢ بَعْدِ عَادٍ আদ সম্প্রদায়ের পর وَّبَوَّاَكُمْ فِي الْاَرْضِ এবং তোমাদেরকে ভূপৃষ্ঠে থাকার জন্য বাসস্থান প্রদান করেছেন تَتَّخِذُوْنَ مِنْ سُهُوْلِهَا قُصُوْرًا যেন তোমরা কোমল মাটিতে বড় অট্টালিকা নির্মাণ কর وَّتَنْحِتُوْنَ الْجِبَالَ بُيُوْتًا এবং পাহাড়গুলোকে খুঁড়ে খুঁড়ে তাতে গৃহ নির্মাণ কর فَاذْكُرُوٓا اٰلَآءَ اللّٰهِ সুতরাং আল্লাহ তা'আলার নিয়ামতগুলোকে স্মরণ কর وَلَا تَعْثَوْا فِي الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ আর ভূপৃষ্ঠে ফ্যাসাদ বিস্তার করো না।

(৭৫) قَالَ জিজ্ঞাসা করল الْمَلَاُ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا যে সকল দাম্ভিক সরদার ছিল مِنْ قَوْمِهٖ তাঁর সম্প্রদায়ের মধ্যে لِلَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا তারা সেই সকল দরিদ্রদেরকে لِمَنْ اٰمَنَ مِنْهُمْ যারা তাদের মধ্য হতে ঈমান আনয়ন করেছিল اَتَعْلَمُوْنَ তোমরা কি বিশ্বাস কর যে اَنَّ صٰلِحًا مُّرْسَلٌ مِّنْ رَّبِّهٖ সালেহ তার পরওয়ারদেগারের পক্ষ হতে প্রেরিত [রাসূল]? قَالُوْٓا তারা [উত্তরে] বলল اِنَّا بِمَآ اُرْسِلَ بِهٖ مُؤْمِنُوْنَ নিশ্চয় আমরা তো পূর্ণ বিশ্বাস রাখি তৎপ্রতি, যা তাঁকে দিয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

(৭৬) قَالَ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْٓا সেই দাম্ভিক ব্যক্তিরা বলতে লাগল اِنَّا بِالَّذِيْٓ اٰمَنْتُمْ بِهٖ كٰفِرُوْنَ তোমরা যে বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছ, আমরা তো তার অস্বীকারকারী।

فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ اَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوْا يٰصٰلِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَاۤ اِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ (٧٧)	**অনুবাদ :** (৭৭) ফলকথা, তারা সেই উষ্ট্রীকে মেরে ফেলল এবং স্বীয় প্রতিপালকের আদেশের বিরোধিতা করল এবং বলতে লাগল, হে সালেহ! আপনি আমাদেরকে যে [আজাব] সম্বন্ধে ভয় প্রদর্শন করছিলেন, তা আনয়ন করুন, যদি আপনি পয়গম্বর হয়ে থাকেন।
فَاَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَاَصْبَحُوْا فِيْ دَارِهِمْ جٰثِمِيْنَ (٧٨)	(৭৮) অনন্তর ধৃত করল তাদেরক ভূ-কম্পন, ফলে তারা নিজ গৃহে উপুড় হয়ে পড়ে রইল।
فَتَوَلّٰى عَنْهُمْ وَقَالَ يٰقَوْمِ لَقَدْ اَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّيْ وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلٰكِنْ لَّا تُحِبُّوْنَ النّٰصِحِيْنَ (٧٩)	(৭৯) তখন সালেহ তাদের হতে মুখ ফিরিয়ে চললেন এবং বললেন, হে আমার সম্প্রদায়! আমি তো তোমাদেরকে আমার প্রতিপালকের আদেশ পৌছিয়ে দিয়েছিলাম, এবং আমি তোমাদের কল্যাণই কামনা করেছি কিন্তু তোমরা কল্যাণকামীদেরকে পছন্দই করছিলে না।
وَلُوْطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖۤ اَتَاْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ اَحَدٍ مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ (٨٠)	(৮০) আর আমি লূতকে প্রেরণ করলাম, যখন তিনি স্বীয় সম্প্রদায়কে বললেন, তোমরা এমন এক অশ্লীল কাজে লিপ্ত আছ, যা তোমাদের পূর্বে জগদ্বাসীদের মধ্যে কেউই করেনি।
اِنَّكُمْ لَتَاْتُوْنَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُوْنِ النِّسَآءِ ؕ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُوْنَ (٨١)	(৮১) তোমরা পুরুষদের সাথে কামবাসনা চরিতার্থ করছ নারীদেরকে পরিত্যাগ করে; বরং তোমরা [মানবতার] সীমাই অতিক্রম করেছ।

শাব্দিক অনুবাদ

(৭৭) فَعَقَرُوا النَّاقَةَ ফলকথা, তারা সেই উষ্ট্রীকে মেরে ফেলল وَعَتَوْا عَنْ اَمْرِ رَبِّهِمْ এবং স্বীয় প্রতিপালকের আদেশের বিরোধিতা করল وَقَالُوْا এবং বলতে লাগল يٰصٰلِحُ হে সালেহ! ائْتِنَا আপনি তা আনয়ন করুন بِمَا تَعِدُنَاۤ আমাদেরকে যে [আজাব] সম্বন্ধে ভয় প্রদর্শন করছিলেন اِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ যদি আপনি পয়গম্বর হয়ে থাকেন।

(৭৮) فَاَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ অনন্তর ধৃত করল তাদেরকে ভূ-কম্পন فَاَصْبَحُوْا فِيْ دَارِهِمْ جٰثِمِيْنَ ফলে তারা নিজ গৃহে উপুড় হয়ে পড়ে রইল।

(৭৯) فَتَوَلّٰى عَنْهُمْ তখন সালেহ তাদের হতে মুখ ফিরিয়ে চললেন وَقَالَ এবং বললেন يٰقَوْمِ হে আমার সম্প্রদায়! لَقَدْ اَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّيْ আমি তো তোমাদেরকে আমার প্রতিপালকের আদেশ পৌছিয়ে দিয়েছিলাম وَنَصَحْتُ لَكُمْ এবং আমি তোমাদের কল্যাণই কামনা করেছি وَلٰكِنْ لَّا تُحِبُّوْنَ النّٰصِحِيْنَ কিন্তু তোমরা কল্যাণকামীদেরকে পছন্দই করছিলে না।

(৮০) وَلُوْطًا আর আমি লূতকে প্রেরণ করলাম اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖ যখন তিনি স্বীয় সম্প্রদায়কে বললেন اَتَاْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ তোমরা এমন এক অশ্লীল কাজে লিপ্ত আছ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ اَحَدٍ مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ যা তোমাদের পূর্বে জগদ্বাসীদের মধ্যে কেউই করেনি।

(৮১) اِنَّكُمْ لَتَاْتُوْنَ الرِّجَالَ شَهْوَةً তোমরা পুরুষদের সাথে কামবাসনা চরিতার্থ করছ مِّنْ دُوْنِ النِّسَآءِ নারীদেরকে পরিত্যাগ করে بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُوْنَ বরং তোমরা [মানবতার] সীমাই অতিক্রম করেছ।

www.almodina.com

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

৭৪ নং আয়াতে এ অবাধ্য ও অঙ্গীকার ভঙ্গকারী জাতির শুভেচ্ছা ও তাদেরকে আজাব থেকে বাঁচানোর জন্য পুনরায় তাদেরকে আল্লাহর নিয়ামতসমূহ স্মরণ করানো হয়েছে, যাতে তারা অবাধ্যতা পরিহার করে। বলা হয়েছে : وَاذْكُرُوْٓا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَّبَوَّاَكُمْ فِى الْاَرْضِ এতে خُلَفَاءُ শব্দটি خَلِيْفَةٌ-এর বহুবচন। এর অর্থ হলো স্থলাভিষিক্ত ও প্রতিনিধি। قُصُوْرًا শব্দটি قَصْرٌ-এর বহুবচন। এর অর্থ উচ্চ অট্টালিকা ও প্রাসাদ। تَنْحِتُوْنَ শব্দটি نَحْتٌ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ প্রস্তর খোদাই করা। جِبَالٌ শব্দটি جَبَلٌ-এর বহুবচন। এর অর্থ পাহাড়। بُيُوْتًا শব্দটি بَيْتٌ-এর বহুবচন। এর অর্থ প্রকোষ্ঠ। অর্থাৎ আল্লাহর তা'আলার নিয়ামত স্মরণ কর যে, তিনি আদ জাতিকে ধ্বংস করে তাদের স্থলে তোমাদেরকে অভিষিক্ত করেছেন, তাদের ঘর বাড়ি ও সহায় সম্পত্তি তোমাদেরকে দান করেছেন এবং তোমাদেরকে এ শিল্প কার্য শিক্ষা দিয়েছেন যে, উন্মুক্ত জায়গায় তোমরা প্রাসাদোপম অট্টালিকা নির্মাণ করে ফেল এবং পাহাড়ের গাত্র খোদাই করে তাতে প্রকোষ্ঠ তৈরি কর। আয়াতের শেষে বলা হয়েছে : فَاذْكُرُوْٓا اٰلَآءَ اللّٰهِ وَلَا تَعْثَوْا فِى الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ অর্থাৎ আল্লাহর নিয়ামতসমূহ স্মরণ কর, অনুগ্রহ স্বীকার কর, তাঁর আনুগত্য অবলম্বন কর এবং পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করে ফিরো না।

জ্ঞাতব্য বিষয় : আলোচ্য আয়াতসমূহ থেকে কতিপয় মৌলিক ও শাখাগত মাসআলা জানা যায় :

(এক) ধর্মের মূল বিশ্বাসসমূহে সব পয়গম্বরই একমত এবং তাঁদের সবার শরিয়তই অভিন্ন। সবারই দাওয়াত ছিল এক আল্লাহর ইবাদত করা এবং এর বিরুদ্ধাচরণের কারণে ইহকাল ও পরকালের শাস্তির ভয় প্রদর্শন করা।

(দুই) পূর্ববর্তী সব উম্মতের মধ্যে এই হয়েছে যে, সম্প্রদায়ের বিত্তশালী ও প্রধানরা পয়গম্বরদের দাওয়াত কবুল করেনি। ফলে তারা ইহকালেও ধ্বংস হয়েছে এবং পরকালেও শাস্তির যোগ্য হয়েছে।

(তিন) তাফসীরে কুরতুবীতে বলা হয়েছে এ আয়াত দ্বারা জানা গেল যে, আল্লাহর নিয়ামতসমূহ দুনিয়াতে কাফেরদেরকেও দান করা হয় যেমন, আদ ও ছামূদ জাতির সামনে আল্লাহ তা'আলা ধন সম্পদ ও শক্তির দ্বার খুলে দিয়েছেন।

(চার) তাফসীরে কুরতুবীতে আছে, এ আয়াত থেকে জানা গেল যে, সুউচ্চ প্রাসাদ ও বৃহদাকার অট্টালিকা নির্মাণ করাও আল্লাহ তা'আলার নিয়ামত ও বৈধ।

এটা ভিন্ন কথা যে, কোনো নবী, রাসূল ও ওলীগণ অট্টালিকা পছন্দ করেননি। করণ এগুলো মানুষকে গাফেল করে দেয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে সুউচ্চ প্রাসাদ নির্মাণ সম্পর্কে যেসব বক্তব্য বর্ণিত আছে, সেগুলো এ ধরনেরই।

৭৫ ও ৭৬ নং আয়াতে ছামূদ জাতির দু'দলের মধ্যে অনুষ্ঠিত সংলাপ উল্লেখ করা হয়েছে। একদল হযরত সালেহ (আ.)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিল। দ্বিতীয় দল ছিল অবিশ্বাসী কাফেরদের। বলা হয়েছে : قَالَ الْمَلَاُ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ لِلَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا لِمَنْ اٰمَنَ مِنْهُمْ অর্থাৎ সালেহ (আ.)-এর সম্প্রদায়ের মধ্যে যারা অহঙ্কারী ছিল, তারা তাদেরকে বলল, যাদেরকে দুর্বল ও হীন মনে করা হতো অর্থাৎ যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছিল।

ইমাম রাযী (র.) তাফসীরে কাবীরে বলেন : এখানে দু'দলের দু'টি গুণ ব্যক্ত হয়েছে। কিন্তু কাফেরদের গুণটি صِيْغَةٌ مَعْرُوْفٌ ও اِسْتَكْبَرُوْا বলা হয়েছে এবং মুমিনদের গুণটি صِيْغَةٌ مَجْهُوْلٌ এ اُسْتُضْعِفُوْا বলা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, কাফেরদের অহংকার গুণটি ছিল তাদের নিজস্ব কাজ যা দণ্ডনীয়, তিরস্কৃত ও পরিণামে শাস্তির কারণ হয়েছে। পক্ষান্তরে মুমিনদের যে বিশেষণ তারা বর্ণনা করত যে, এরা নিকৃষ্ট, হীন ও দুর্বল এটা কাফেরদেরই কথা, স্বয়ং মুমিনদের বাস্তব অবস্থা ও বিশেষণ নয়, যা তিরস্কারযোগ্য হতে পারে; বরং তিরস্কার তাদেরই প্রাপ্য, যারা বিনা কারণে তাদেরকে হীন ও দুর্বল বলত ও মনে করত। উভয় দলের মধ্যে অনুষ্ঠিত সংলাপ ছিল এই যে, কাফেররা মুমিনদেরকে বলল: তোমরা কি বাস্তবিকই জান যে, সালেহ (আ.) তাঁর পতিপালকের পক্ষ থেকে প্রেরিত রাসূল?

উত্তরে মুমিনরা বলল : আল্লাহর পক্ষ থেকে যে হেদায়েতসহ তিনি প্রেরিত হয়েছেন আমরা সেগুলোর প্রতি বিশ্বাসী।

তাফসীর কাশশাফে বলা হয়েছে : ছামূদ জাতির মুমিনরা কি চমৎকার অলংকার পূর্ণ উত্তরই না দিয়েছে যে, তোমরা এ আলোচনায় ব্যস্ত রয়েছ যে, তিনি রাসূল কি না। আসলে এটা আলোচনার বিষয়ই নয়; বরং জাজ্জ্বল্যমান ও নিশ্চিত। সাথে সাথে এটাও নিশ্চিত যে, তিনি যা বলেন, তা আল্লাহর তা'আলার কাছে থেকে আনীত পয়গাম। জিজ্ঞাস্য বিষয় কিছু থাকলে তা এই যে, কে তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং কে করে না? আল্লাহর ফযলে আমরা তাঁর আনীত সব নির্দেশের প্রতিই বিশ্বাসী।

কিন্তু তাদের অলংকারপূর্ণ উক্তি শুনেও ছামূদ জাতি পূর্ববৎ ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করে বলল : যে বিষয়ের প্রতি তোমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছ, আমরা তা মানি না। দুনিয়ার মহব্বত, ধন সম্পদ ও শক্তির মত্ততা থেকে আল্লাহ তা'আলা নিরাপদ রাখুন। এগুলো মানুষের চোখে পর্দা হয়ে দাঁড়ায়। ফলে তারা জাজ্জ্বল্যমান বিষয়কেও অস্বীকার করতে শুরু করে।

قوله فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ الخ পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত সালেহ (আ.)–এর দোয়ায় পাহাড়ের একটি বিরাট প্রস্তর খণ্ড বিস্ফারিত হয়ে আশ্চর্য ধরনের এক উষ্ট্রী বের হয়ে এসেছিল। আল্লাহ তা'আলা এ উষ্ট্রীকেই এ সম্প্রদায়ের জন্য সর্বশেষ পরীক্ষার বিষয় করে দিয়েছিলেন। সে মতে সে জনপদের সব মানুষ ও জীব জন্তু যে কূপ থেকে পানি পান করত, উষ্ট্রী তার সব পানি পান করে ফেলত। তাই হযরত সালেহ (আ.) তাদের জন্য পানির পালা নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন যে, একদিন উষ্ট্রী পানি পান করবে এবং অন্য দিন জনপদের অধিবাসীরা।

সুতরাং এ উষ্ট্রীর কারণে ছামূদ জাতির বেশ অসুবিধা হচ্ছিল, ফলে তারা এর ধ্বংস কামনা করত। কিন্তু আজাবের ভয়ে নিজেরা একে ধ্বংস করতে উদ্যোগী হতো না।

যে সুবৃহৎ প্রতারণার মাধ্যমে শয়তান মানুষের বুদ্ধি জ্ঞান ও চেতনাকে বিলুপ্ত করে দেয়, তা হচ্ছে নারীর প্রলোভন। সুতরাং সম্প্রদায়ের দু'জন পরমা সুন্দরী নারী বাজি রাখল যে, যে ব্যক্তি এ উষ্ট্রীকে হত্যা করবে, সে আমাদের এবং আমাদের কন্যাদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা গ্রহণ করতে পারবে।

সম্প্রদায়ের দুজন যুবক মিসদা ও কাসার এ নেশায় মত্ত হয়ে উষ্ট্রীকে হত্যা করার জন্য বেরিয়ে পড়ল। তারা উষ্ট্রীর পথে একটি বড় প্রস্তর খণ্ডের আড়ালে আত্মগোপন করে বসে রইল। উষ্ট্রী সামনে আসেতই মিসদা তার প্রতি তীর নিক্ষেপ করল এবং কাসার তারবারির আঘাতে তার পা কেটে হত্যা করল।

কুরআন পাক তাকেই ছামূদ জাতির সর্ববৃহৎ হতভাগা বলে আখ্যা দিয়ে বলেছেন : إِذِ انْبَعَثَ أَشْقٰهَا কেননা তার কারণেই গোটা সম্প্রাদায় আজাবে পতিত হয়।

উষ্ট্রী হত্যার ঘটনা জানার পর হযরত সালেহ (আ.) স্বীয় সম্প্রদায়কে আল্লাহর নির্দেশ জানিয়ে দিলেন যে, এখন থেকে তোমাদের জীবনকাল মাত্র তিন দিন অবশিষ্ট রয়েছে। فَتَمَتَّعُوْا فِيْ دَارِكُمْ ثَلٰثَةَ أَيَّامٍ ذٰلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوْبٍ অর্থাৎ আরও তিন দিন আরাম করে নাও (এরপরই আজাব নেমে আসবে)। এ ওয়াদা সত্য , এর ব্যতিক্রম হওয়া সম্ভবপর নয়। কিন্তু যে জাতির দুঃসময় ঘনিয়ে আসে, তার জন্য কোনো উপদেশ ও হুশিয়ারি কার্যকর হয় না। সুতরাং হযরত সালেহ (আ.)–এর কথা শুনেও তারা ঠাট্টা বিদ্রূপ করে বলল : এ শাস্তি কিভাবে এবং কোথা থেকে আসবে? এর লক্ষণ কি হবে?

হযরত সালেহ (আ.) বললেন: তাহলে আজাবের লক্ষণও শুনে নাও আগামীকাল বৃহস্পতিবার তোমাদের নারী পুরুষ যুবক বৃদ্ধ নির্বিশেষে সবার মুখমণ্ডল হলদে ফ্যাকাশে হয়ে যাবে। অতঃপর পরশু শুক্রবার সবার মুখমণ্ডল গাঢ় লাল বর্ণ ধারণ করবে। অতঃপর শনিবার দিন সবার মুখমণ্ডল ঘোর কৃষ্ণবর্ণ হয়ে যাবে। এটাই হবে তোমাদের জীবনের শেষ দিন । হতভাগ্য জাতি একথা শুনেও ক্ষমা প্রার্থনা করার পরিবর্তে স্বয়ং হযরত সালেহ (আ.)–কেই হত্যা করার সিদ্ধান্ত নিল। তারা ভাবল, যদি সে সত্যবাদী হয় এবং আমাদের উপর আজাব আসেই তবে আমরা নিজেদের পূর্বে তার ভবলীলাই সাঙ্গ করে দিই না কেন? পক্ষান্তরে যদি সে মিথ্যাবাদী হয়, তবে মিথ্যার সাজা ভোগ করুক। ছামূদ জাতির এ সংকল্পের বিষয় কুরআন পাকের অন্যত্র বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে। এ সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কিছু লোক রাতের বেলায় হযরত ছালেহ (আ.)-কে হত্যা করার উদ্দেশ্যে তাঁর গৃহপানে রওয়ানা হলো। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা পথিমধ্যেই প্রস্তর বর্ষণে ওদেরকে ধ্বংস করে দিলেন।

www.almodina.com

وَمَكَرُوْا مَكْرًا وَّمَكَرْنَا مَكْرًا وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ অর্থাৎ তারাও গোপন ষড়যন্ত্র করল এবং আমিও প্রত্যুত্তরে এমন কৌশল অবলম্বন করলাম যে, তারা তা জানতেই পারল না। বৃহস্পতিবার ভোরে হযরত সালেহ (আ.)-এর কথা অনুযায়ী সবার মুখমণ্ডল গভীর হলুদ রঙে আচ্ছাদিত হয়ে গেল। প্রথম লক্ষণ সত্য হওয়ার পরও জালেমরা ঈমানের প্রতি মনোনিবেশ করল না; বরং তারা হযরত সালেহ (আ.)-এর প্রতি আরও চটে গেল এবং সমগ্র জাতি তাকে হত্যা করার জন্য ঘোরাফেরা করতে লাগল। আল্লাহ রক্ষা করুন, তাঁর গজবেরও লক্ষণাদি থাকে। মানুষের মন ও মস্তিষ্ক যখন অধোমুখী হয় যায় তখন লাভকে ক্ষতি ও ক্ষতিকে লাভ এবং ভালোকে মন্দ ও মন্দকে ভালো মনে করতে থাকে।

দ্বিতীয় দিন ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী সবার মুখমণ্ডল লাল এবং তৃতীয় দিন ঘোর কালো হয়ে গেল। তখন সবাই নিরাশ হয়ে অপেক্ষা করতে লাগল যে, কোন দিক থেকে কিভাবে আজাব আসে।

এমতাবস্থায় ভীষণ ভূমিকম্প শুরু হলো এবং উপর থেকে বিকট ও ভয়াবহ চিৎকার শুনা গেল। ফলে সবাই একযোগে বসা অবস্থায় অধোমুখী হয়ে ধরাশায়ী হলো। আলোচ্য আয়াতসমূহে ভূমিকম্পের কথা উল্লিখিত রয়েছে। فَاَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ এখানে رَجْفَةٌ শব্দের অর্থ– ভূমিকম্প।

অন্যান্য আয়াতে فَاَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ ও বলা হয়েছে। صَيْحَةٌ শব্দের অর্থ ভীষণ চিৎকার ও বিকট শব্দ। উভয় আয়াতদৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, তাদের উপর উভয় প্রকার আজাবই এসেছিল : নীচের দিক থেকে ভূমিকম্প আর উপর দিক থেকে বিকট চিৎকার ফলে তারা فَاَصْبَحُوْا فِىْ دَارِهِمْ جٰثِمِيْنَ এ পরিণত হয়েছিল جَاثِمٌ শব্দটি جُثُوْمٌ ধাতু থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ চেতনাহীন হয়ে পড়ে যাওয়া কিংবা বসে থাকা। (কামূস) অর্থাৎ যে যে অবস্থায় ছিল, সে সেভাবেই মৃত্যুমুখে পতিত হলো।
نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ قَهْرِهٖ وَعَذَابِهٖ

এ কাহিনীর প্রধান অংশগুলো স্বয়ং কুরআন পাকের বিভিন্ন সূরায় এবং কিছু অংশ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। কিছু অংশ এমনও রয়েছে যা তাফসীরবিদগণ ইসরাইলী (অর্থাৎ ইহুদি ও খ্রিস্টানদের) বর্ণনা থেকে সংগ্রহ করেছেন। কিন্তু এগুলোর উপর কোনো ঘটনার প্রমাণ নির্ভরশীল নয়।

সহীহ বুখারীর এক হাদীসে বর্ণিত আছে, তাবূক যুদ্ধের সফরে রাসূলুল্লাহ ﷺ হিজর নামক সে স্থানটি অতিক্রম করেন, যেখানে ছামূদ জাতির উপর আজাব এসেছিল। তিনি সহাবায়ে কেরামকে নির্দেশ দেন, কেউ যেন এ আজাব বিধ্বস্ত এলাকার ভিতরে প্রবেশ কিংবা এর কূপের পানি ব্যাবাহর না করে। –[মাযহারী]

কোনো কোনো হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : ছামূদ জাতির উপর আপতিত আজাব থেকে আবূ রেগাল নামক এক ব্যক্তি ছাড়া কেউ প্রাণে বাঁচতে পারেনি। এ ব্যক্তি তখন মক্কায় এসেছিল। মক্কার হেরেমের সম্মনার্থে আল্লাহ তা'আলা তাকে বাঁচিয়ে রাখেন। অবশেষে যখন সে হেরেম থেকে বাইরে যায় তখন ছামূদ; জাতির আজাব তার উপরও পতিত হয় এবং সেও মৃত্যুমুখে পতিত হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবায়ে কেরামকে মক্কার বাইরে আবূ রেগালের কবরের চিহ্নও দেখান এবং বলেন : তার সাথে স্বর্ণের একটি ছড়িও দাফন হয়ে গিয়েছিল। সাহাবায়ে কেরাম কবর খনন করলে ছড়িটি পাওয়া যায়। এ রেয়ায়েতে আরও বলা হয়েছে যে, তায়েফের অধিবাসী ছাকীফ গোত্র আবূ রোগলেরই বংশধর। –[মাযহারী]

এসব আজাব বিধ্বস্ত সম্প্রদায়ের বস্তিগুলোকে আল্লাহ তা'আলা ভবিষ্যৎ লোকদের জন্য শিক্ষাস্থল হিসেবে সংরক্ষিত রেখেছেন। কুরআন পাক আরবদেরকে বারবার হুঁশিয়ার করেছে যে, তোমাদের সিরিয়া গমনের পথে এসব স্থান আজও শিক্ষার কাহিনী হয়ে বিদ্যমান রয়েছে। لَمْ تُسْكَنْ مِّنْ بَعْدِهِمْ اِلَّا قَلِيْلًا

আজাবের ঘটনা বিবৃত করার পর বলা হয়েছে ; فَتَوَلّٰى عَنْهُمْ وَقَالَ يٰقَوْمِ لَقَدْ اَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّىْ وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلٰكِنْ لَّا تُحِبُّوْنَ النّٰصِحِيْنَ অর্থাৎ স্বজাতির উপর আজাব নাজিল হওয়ার পর হযরত ছালেহ (আ.) ও ঈমানদারগণ সে এলাকা পরিত্যাগ করে অন্যত্র চলে যান। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে তাঁর সাথে চার হাজার মুমিন ছিল। তিনি সবাইকে নিয়ে ইয়ামনের হাযারা মাওতে চলে গেলেন। সেখানেই তাঁর ওফাত হয়। কোনো কোনো রেওয়ায়েত থেকে তাঁর মক্কায় প্রস্থান এবং সেখানে ওফাতের কথাও জানা যায়। আয়াতে বহ্যিক অর্থে জানা যায় যে, হযরত সালেহ (আ.) প্রস্থানকালে জাতিকে সম্বোধন করে

বললেন : হে আমার সম্প্রদায়! আমি তোমাদেরকে প্রতিপালকের পয়গাম পৌঁছে দিয়েছি এবং তোমাদের কল্যাণ কামনা করেছি, কিন্তু আফসোস! তোমরা কল্যাণকামীদেরকে পছন্দই কর না।

এখানে প্রশ্ন হয় যে, সবাই যখন ধ্বংস হয়ে গেছে, তখন তাদেরকে সম্বোধন করে লাভ কি? উত্তর এই যে, এক লাভ তো হলো– এ থেকে অন্যরাও শিক্ষা লাভ করতে পারবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজেও বদর যুদ্ধে নিহত কুরাইশ সর্দারদেরকে এমনিভাবে সম্বোধন করে কিছু কথা বলেছিলেন। এছাড়া হযরত সালেহ (আ.)-এর এ সম্বোধন আজাব অবতরণের পূর্বেও হতে পারে। যদিও বর্ণনায় তা পরে উল্লেখ করা হয়েছে।

قوله وَلُوْطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖٓ اَتَاْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ الخ : পয়গম্বর ও তাঁদের উম্মতদেরই কাহিনী পর্বের চতুর্থ কাহিনী হচ্ছে হযরত লূত (আ.)-এর কাহিনী।

হযরত লূত (আ.) ছিলেন হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর ভ্রাতুষ্পুত্র। উভয়ের মাতৃভূমি ছিল পশ্চিম ইরাকে বসরার নিকটবর্তী প্রসিদ্ধ বাবেল শহর। এখানে মূর্তিপূজার ব্যাপক প্রচলন ছিল। স্বয়ং হযরত ইবরাহীম (আ.) -এর পরিবারও মূতিপূজায় লিপ্ত ছিল। তাদের হেদায়েতের জন্য আল্লাহ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে পয়গম্বর করে পাঠান। কিন্তু সবাই তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করে এবং ব্যাপারটি নমরূদের অগ্নি পর্যন্ত গড়ায়। স্বয়ং পিতা তাঁকে গৃহ থেকে বহিষ্কার করার হুমকি দেন।

নিজ পরিবারের মধ্যে শুধু সহধর্মিনী হযরত সারা ও ভ্রাতুষ্পুত্র হযরত লূত মুসলমান হন। فَاٰمَنَ لَهٗ لُوْطٌ অবশেষে তাদেরকে সাথে নিয়ে হযরত ইবরাহীম (আ.) দেশ ছেড়ে সিরিয়ায় হিজরত করেন। জর্দান নদীর তীরে পৌঁছার পর আল্লাহর নির্দেশে হযরত ইবরাহীম (আ.) কেনানে গিয়ে অবস্থানে করেন, যা বায়তুল মাকদিসের অদূরেই অবস্থিত।

হযরত লূত (আ.)-কেও আল্লাহ তা'আলা নবুয়ত দান করে জর্দান ও বায়তুল মাকদিসের মধ্যবর্তী ছামূদের অধিবাসীদের পথ প্রদর্শনের জন্য প্রেরণ করেন। এ এলাকায়, সাদূম, আমূরা, উমা, সাবূবিম, বালে, অথবা সূগর নামক পাঁচটি বড় বড় শহর ছিল। কুরআন পাক বিভিন্ন স্থানে এদের সমষ্টিকে 'মু'তাফিকা ও মু'তাফিকাত শব্দে বর্ণনা করেছে। এসব শহরের মধ্যে সাদূমকেই রাজধানী মনে করা হতো। হযরত লূত (আ.) এখানেই অবস্থান করতেন। এ এলাকার ভূমি ছিল উর্বর ও শস্য শ্যামল। এখানে সর্বপ্রকার শস্য ও ফলের প্রাচুর্য ছিল। –[এসব ঐতিহাসিক তথ্য বাহরে মুহীত, মাযহারী, ইবনে কাছীর. আল মানার প্রভৃতি গ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে]

কুরআন পাকের ভাষায় মানুষের সাধারণ অভ্যাস হচ্ছে كَلَّآ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَيَطْغٰٓى اَنْ رَّاٰهُ اسْتَغْنٰى অর্থাৎ মানুষ যখন দেখে সে কারও মুখাপেক্ষী নয়, তখন অবাধ্যতা শুরু করে। তাদের সামনেও আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নিয়ামতের দ্বার খুলে দিয়েছিলেন। তারা মানুষের সাধারণ অভ্যাস অনুযায়ী ধনৈশ্বর্যের নেশায় মত্ত হয়ে বিলাস-ব্যসন, কাম প্রবৃত্তি ও লোভ লালসার জালে এমনভাবে আবদ্ধ হয়ে পড়ে যে, লজ্জা শরম ও ভালো মন্দের স্বভাবজাত পার্থক্য ও বিস্মৃত হয়ে যায়। তারা এমন প্রকৃতি বিরুদ্ধ নির্লজ্জতায় লিপ্ত হয়, যা হারাম ও গুনাহ তো বটেই, সুস্থ স্বভাবের কাছে ঘৃণ্য হওয়ার কারণে সাধারণ জন্তু জানোয়ারও এর নিকটবর্তী হয় না।

আল্লাহ তা'আলা হযরত লূত (আ.)–কে তাদের হেদায়েতের জন্য নিযুক্ত করেন। তিনি স্বজাতিকে সম্বোধন করে বলেন। اَتَاْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ اَحَدٍ مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ অর্থাৎ হুশিয়ার করে বললেন : তোমরা কি এমন অশ্লীল কাজ কর, যা তোমাদের পূর্বে পৃথিবীর কেউ করেনি। জেনা তথা ব্যভিচার সম্পর্কে কুরআন পাক اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً আলিফ ও লাম ব্যতিরেকেই فَاحِشَةٌ শব্দ ব্যবহার করেছে; কিন্তু এখানে আলিফ লামসহ اَلْفَاحِشَةُ বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এ স্বভাববিরুদ্ধ ব্যভিচার যেন একাই সমস্ত অশ্লীলতার সমাহার এবং জেনার চাইতেও কাঠোর অপরাধ।

এরপর বলা হয়েছে, নির্লজ্জ কাজ তোমাদের পূর্বে পৃথিবীতে কেউ করেনি। আমর ইবনে দীনার বলেন : এ জাতির পূর্বে পৃথিবীতে কখনও এহেন কুকর্ম দেখা যায়নি। –[মাযহারী] সাদূমবাসীদের পূর্বে কোনো ঘোরতর মন্দ ব্যক্তির চিন্তাও এদিকে যায়নি। উমাইয়া খলিফা আব্দুল মালেক বলেন : কুরআনে লূত (আ.)–এর সম্প্রদায়ের ঘটনা উল্লেখ না হলে আমি কল্পনাও করতে পারতাম না যে, কোনো মানুষ এরূপ কাজ করতে পারে। –[ইবনে কাছীর]

এতে তাদের নির্লজ্জতার কারণে দু'দিক দিয়ে হুশিয়ার করা হয়েছে। এক. অনেক গোনাহে মানুষ পরিবেশ অথবা পূর্ববর্তীদের অনুকরণের কারণে লিপ্ত হয়ে যায়। যদিও তা কোনো শরিয়ত সম্মত ওজর নয়; কিন্তু সাধারণের দৃষ্টিতে তাকে কোনো না কোনো স্তরে ক্ষমাযোগ্য মনে করা যায়। কিন্তু যে গুনাহ পূর্বে কেউ করেনি এবং তা করার বিশেষ কোনো কারণও নেই. তা নিঃসন্দেহে অধিক শাস্তির যাগ্য। দুই. যে ব্যক্তি কোনো মন্দ কাজ কিংবা কুপ্রথার উদ্ভাবন ও প্রথম প্রচলন করে, তার উপর তার নিজের কাজের গোনাহ ও শাস্তি তো চাপেই সাথে সাথে ঐসব লোকর শাস্তিও তার গর্দানে চেপে বসে, যারা কিয়ামত পর্যন্ত তার সে কাজে প্রভাবিত হয়ে গোনাহে লিপ্ত হেয়।

৮১ নং আয়াতে তাদের এ নির্লজ্জতাকে আরও স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করে বলা হয়েছে : তোমরা নারীদেরকে বাদ দিয়ে পুরুষদের সাথে কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ কর। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে মানুষের স্বভাবজাত কামনা বাসনা চরিতার্থ করার জন্য আল্লাহ তা'আলা একটি হালাল ও জায়েজ পন্থা নির্ধারণ করেছেন এবং তা হচ্ছে নারীদেরকে বিয়ে করা। এ পন্থা ছেড়ে অস্বাভাবিক পন্থা অবলম্বন করা একান্ত হীনতা ও বিকৃত চিন্তারই পরিচায়ক।

এ কারণেই সাহাবী, তাবেয়ী ও মুজতাহিদগণ এ অপরাধকে সাধারণ ব্যভিচারের চাইতেও অধিক গুরুতর আপরাধ ও গুনাহ বলে সাব্যস্ত করেছেন। ইমাম আজম আবূ হানীফা (র.) বলেন: যারা একাজ করে তাদেরকে ঐ রকম শাস্তিই দেওয়া উচিত, যেমন হযরত লূত (আ.)–এর সম্প্রদায়কে আল্লাহর পক্ষ থেকে দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ আকাশ থেকে প্রস্তর বর্ষিত হয়েছে এবং মাটি উল্টিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাই এরূপ ব্যক্তিকে কোনো উঁচু পাহাড় থেকে নীচে ফেলে দিয়ে উপর থেকে প্রস্তর বর্ষণ করা উচিত। মুসনাদে আহমদ, আবূ দাউদ, তিরমিযী, ও ইবনে মাজায় হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বাচনিক বর্ণিত আছে, যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এরূপ ব্যক্তিদের সম্পর্কে বলেছেন : فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ অর্থাৎ একাজে জড়িত উভয় ব্যক্তিকে হত্যা কর। –[ইবনে কাছীর]

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে : بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ অর্থাৎ তোমরা মনুষ্যত্বের সীমা অতিক্রমকারী সম্প্রদায়। প্রত্যেক কাজে সীমা অতিক্রম করাই তোমাদের আসল রোগ। যৌন কামনার ক্ষেত্রেও তোমরা আল্লাহর নির্ধারিত সীমা ডিঙ্গিয়ে স্বভাব বিরুদ্ধ কাজে লিপ্ত হয়েছ।

৮২ নং আয়াতে লূত (আ.)–এর উপদেশের জওয়াবে তাঁর সম্প্রদায়ের উক্তি বর্ণনা করে বলা হয়েছে : তাদের দ্বারা যখন কোনো যুক্তিসঙ্গত জওয়াব দেওয়া সম্ভবপর হলো না , তখন জেদের বশবর্তী হয়ে পারস্পরিক বলতে লাগল : এরা বড় পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন বলে দাবি করে। এদের চিকিৎসা এই যে, এদেরকে বস্তি থেকে বের করে দাও।

৮২ ও ৮৩ নং আয়াতে সামূদ সম্প্রদায়ের বক্রতা ও বেহায়াপনায় আসমানি শাস্তির কথা বর্ণিত হয়েছে। বলা হয়েছে যে, গোটা জাতিই আল্লাহর আজাবে পতিত হলো। শুধু হযরত লূত (আ.) ও তাঁর কয়েকজন সঙ্গি আজাব থেকে বেঁচে রইলেন। কুরআনের ভাষায় فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ বলা হয়েছে। অর্থাৎ আমি লূত ও তাঁর পরিবারকে আজাব থেকে বাঁচিয়ে রেখেছি। ''আহল' সন্তানাদি তথা পরিবারকে বলা হয়। এ সম্পর্কে কোনো কোনো তাফসীরবিদ বলেন : তাঁর পরিবারের মধ্যে দুটি কন্যা মুসলমান হয়েছিল। কিন্তু তাঁর সহধর্মিনী মুসলমান হয়নি। কুরআন পাকের অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে : فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ অর্থাৎ সমগ্র বস্তির মধ্যে একটি ঘর ছাড়া কোনো মুসলমান ছিল না। এতে বাহ্যত বোঝা যায় যে, হযরত লূত (আ.)–এর ঘরের লোকই শুধু মুসলামন ছিল। সুতরাং তারাই আজাব থেকে মুক্তি পেল। অবশ্য তাদের মধ্যে তাঁর বিবি অন্তর্ভুক্ত ছিল না। কোনো কোনো তাফসীরবিদ বলেন, আহলের অর্থ ব্যাপক। এতে পরিবারের লোকজন এবং অন্যান্য মুসলমানকেও বুঝানো হয়েছে। সারকথা এই যে, গুণা-গুণতি কয়েকজন মুসলমান ছিল। তাদেরকে আজাব থেকে বাঁচানোর জন্য আল্লাহ তা'আলা হযরত লূত (আ.)–কে নির্দেশ দেন যে, বিবি ব্যতীত অন্যান্য পরিবার পরিজন ও সম্পর্কশীল লোকদেরকে নিয়ে শেষ রাতে বস্তি থেকে বের হয়ে যান এবং পেছনে ফিরে দেখবেন না. কেননা আপনি খন বস্তি-হতে বের হয়ে যাবেন. তখনই

হযরত লূত (আ.) এ নির্দেশ মতো স্বীয় পরিবার পরিজন ও সম্পর্কশীলদেরকে নিয়ে শেষ রাত্রে ছামূদ ত্যাগ করেন। তাঁর বিবি প্রসঙ্গে দু'রকম রেওয়ায়েতই বর্ণিত রয়েছে। এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী সে সঙ্গে রওয়ানাই হয়নি। দ্বিতীয় রেওয়ায়েতে আছে, কিছু দূর সঙ্গে চলার পর আল্লাহর নির্দেশের বিপরীতে পিছনে ফিরে বস্তিবাসীদের অবস্থা দেখতে চেয়েছিল। ফলে সাথে সাথে আজাব এসে তাকেও পাকড়াও করল। কুরআন পাকের বিভিন্ন জায়গায় এ ঘটনাটি সংক্ষেপে ও বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। এখানেও তৃতীয় আয়াতে শুধু বলা হয়েছে যে, আমি হযরত লূত (আ.) ও তাঁর পরিবার-পরিজনকে আজাব থেকে মুক্তি দিয়েছি। কিন্তু তাঁর সহধর্মিনী আজাবে লিপ্ত রয়ে গেছে। শেষ রাত্রে বস্তি ত্যাগ করা এবং পিছন ফিরে না দেখার নির্দেশ কুরআন পাকের অন্যান্য আয়াতেও উল্লিখিত রয়েছে।

শব্দ বিশ্লেষণ

بَوَّأَكُمْ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّبْوِيَةُ মূলবর্ণ (ب . و . ء) জিনস মুরাক্কাব اجوف واوى এবং مهموزلام অর্থ– তিনি ঠিকানা দান করেছেন।

قُصُوْرً : শব্দটি বহুবচন; একবচন قَصْرٌ অর্থ– প্রাসাদ, অট্টালিকা।

تَنْحِتُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلنَّحْتُ মূলবর্ণ (ن . ح . ت) জিনস صحيح অর্থ– তোমরা কাটছ, তোমরা খনন করছ।

عَقَرُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْعَقْرُ মূলবর্ণ (ع . ق . ر) জিনস صحيح অর্থ– তারা রদ করল, তারা হত্যা করল।

النَّاقَةُ : শব্দটি একবচন; বহুবচন نَاقَاتٌ অর্থ– উষ্ট্রী, উটনী।

عَتَوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْعُتُوُّ মূলবর্ণ (ع . ت . و) জিনস ناقص واوى অর্থ– তারা অমান্য করেছে।

تَأْتُوْنَ : সীগাহ جمع مذكرحاضر বহছ مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْاِتْيَانُ মূলবর্ণ (ا . ت . ى) জিনস মুরাক্কাব مهموز فاء ও ناقص يائى অর্থ– তোমরা আস, তোমরা গমন কর।

www.almodina.com

وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهٖٓ اِلَّآ اَنْ قَالُوْٓا اَخْرِجُوْهُمْ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ ۚ اِنَّهُمْ اُنَاسٌ يَّتَطَهَّرُوْنَ (٨٢)

অনুবাদ : (৮২) আর তাঁর সম্প্রদায় কোনো উত্তরই দিতে পারল না একথা ব্যতীত, নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগল, তোমরা এদেরকে নিজেদের আবাসভূমি হতে বের করে দাও, এরা বড়ই পবিত্রতা অবলম্বন করছে।

فَاَنْجَيْنٰهُ وَاَهْلَهٗٓ اِلَّا امْرَاَتَهٗ ۖ كَانَتْ مِنَ الْغٰبِرِيْنَ (٨٣)

(৮৩) অনন্তর আমি লূতকে এবং তার পরিবারবর্গ [ও অন্যান্য ঈমানদারগণ]-কে তার স্ত্রীকে ব্যতীত, সে তাদের মধ্যেই রইল, যারা আজাবের মধ্যে রয়ে গিয়েছিল।

وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَّطَرًا ؕ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِيْنَ (٨٤)

(৮৪) আর আমি তাদের উপর এক নতুন ধরনের বৃষ্টি বর্ষণ করলাম, অতএব, এখন দেখ তো! এই পাপীদের কিরূপ পরিণাম হলো।

وَاِلٰى مَدْيَنَ اَخَاهُمْ شُعَيْبًا ؕ قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ؕ قَدْ جَآءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ فَاَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيْزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَآءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا ؕ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ (٨٥)

(৮৫) আর আমি মাদইয়ানের দিকে তাদের ভ্রাতা শোয়াইবকে [রাসূলরূপে] প্রেরণ করলাম, তিনি বললেন, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা [কেবল] আল্লাহ তা'আলার ইবাদত কর, তিনি ব্যতীত আর কেউ তোমাদের মা'বূদ নেই, তোমাদের নিকট তোমাদের পরওয়ারদেগারের পক্ষ হতে স্পষ্ট প্রমাণ এসেছে, অতএব, তোমরা পরিমাপ ও ওজন পূর্ণরূপে করো এবং লোকদেরকে তাদের মালে কম দিও না, আর ভূপৃষ্ঠে তার সংস্কার সাধনের পর ফ্যাসাদ বিস্তার করো না, এটা তোমাদের জন্য কল্যাণকর, যদি তোমরা ঈমান আনয়নকারী হও।

শাব্দিক অনুবাদ

(৮২) وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهٖٓ اِلَّآ اَنْ قَالُوْٓا আর তাঁর সম্প্রদায় কোনো উত্তরই দিতে পারল না একথা ব্যতীত, নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগল اَخْرِجُوْهُمْ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ তোমরা এদেরকে নিজেদের আবাসভূমি হতে বের করে দাও اِنَّهُمْ اُنَاسٌ يَّتَطَهَّرُوْنَ এরা বড়ই পবিত্রতা অবলম্বন করছে।

(৮৩) فَاَنْجَيْنٰهُ وَاَهْلَهٗٓ অনন্তর আমি লূতকে এবং তার পরিবারবর্গ [ও অন্যান্য ঈমানদারগণ]-কে اِلَّا امْرَاَتَهٗ তার স্ত্রীকে ব্যতীত كَانَتْ مِنَ الْغٰبِرِيْنَ সে তাদের মধ্যেই রইল, যারা আজাবের মধ্যে রয়ে গিয়েছিল।

(৮৪) وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَّطَرًا আর আমি তাদের উপর এক নতুন ধরনের বৃষ্টি বর্ষণ করলাম فَانْظُرْ অতএব, এখন দেখ তো! كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِيْنَ এই পাপীদের কিরূপ পরিণাম হলো।

(৮৫) وَاِلٰى مَدْيَنَ আর আমি মাদইয়ানের দিকে اَخَاهُمْ شُعَيْبًا তাদের ভ্রাতা শোয়াইবকে [রাসূলরূপে] প্রেরণ করলাম قَالَ তিনি বললে يٰقَوْمِ হে আমার সম্প্রদায়! اعْبُدُوا اللّٰهَ তোমরা [কেবল] আল্লাহ তা'আলার ইবাদত কর مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ তিনি ব্যতীত আর কেউ তোমাদের মা'বূদ নেই قَدْ جَآءَتْكُمْ তোমাদের নিকট এসেছে بَيِّنَةٌ স্পষ্ট প্রমাণ مِّنْ رَّبِّكُمْ তোমাদের পরওয়ারদেগারের পক্ষ হতে فَاَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيْزَانَ অতএব, তোমরা পরিমাপ ও ওজন পূর্ণরূপে করো وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَآءَهُمْ এবং লোকদেরকে তাদের মালে কম দিও না وَلَا تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ আর ভূপৃষ্ঠে ফ্যাসাদ বিস্তার করো না بَعْدَ اِصْلَاحِهَا তার সংস্কার সাধনের পর ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ এটা তোমাদের জন্য কল্যাণকর اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ যদি তোমরা ঈমান আনয়নকারী হও।

www.almodina.com

وَلَا تَقْعُدُوْا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوْعِدُوْنَ وَتَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِهٖ وَتَبْغُوْنَهَا عِوَجًا ۚ وَاذْكُرُوْٓا اِذْ كُنْتُمْ قَلِيْلًا فَكَثَّرَكُمْ ۪ وَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِيْنَ (٨٦)

অনুবাদ : (৮৬) আর তোমরা পথসমূহে এই উদ্দেশ্যে বসো না যে, আল্লাহর উপর ঈমান আনয়নকারীদের প্রতি ভয় প্রদর্শন করবে এবং আল্লাহর পথ হতে প্রতিরোধ করবে এবং তাতে বক্রতা অন্বেষণ করবে, আর সেই অবস্থাকে স্মরণ কর, যখন তোমরা স্বল্প সংখ্যক ছিলে, অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে পরিবর্ধিত করেছেন, এবং লক্ষ্য কর, ফ্যাসাদকারীদের কিরূপ পরিণাম হয়েছে।

وَاِنْ كَانَ طَآئِفَةٌ مِّنْكُمْ اٰمَنُوْا بِالَّذِيْٓ اُرْسِلْتُ بِهٖ وَطَآئِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوْا فَاصْبِرُوْا حَتّٰى يَحْكُمَ اللّٰهُ بَيْنَنَا ۚ وَهُوَ خَيْرُ الْحٰكِمِيْنَ (٨٧)

(৮৭) আর যদি তোমাদের কেউ কেউ ঈমান এনে থাকে তৎপ্রতি যা দিয়ে আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে, এবং কতক ঈমান না এনে থাকে, তবে অপেক্ষা কর, যে পর্যন্ত না আল্লাহ তা'আলা আমাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেন, বস্তুত তিনি সমস্ত মীমাংসাকারীদের অপেক্ষা উত্তম।

শাব্দিক অনুবাদ

(৮৬) وَلَا تَقْعُدُوْا بِكُلِّ صِرَاطٍ আর তোমরা পথসমূহে এই উদ্দেশ্যে বসো না যে تُوْعِدُوْنَ ভয় প্রদর্শন করবে وَتَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ এবং আল্লাহর পথ হতে প্রতিরোধ করবে مَنْ اٰمَنَ بِهٖ আল্লাহর উপর ঈমান আনয়নকারীদের প্রতি وَتَبْغُوْنَهَا عِوَجًا এবং তাতে বক্রতা অন্বেষণ করবে وَاذْكُرُوْٓا আর সেই অবস্থাকে স্মরণ কর اِذْ كُنْتُمْ قَلِيْلًا যখন তোমরা স্বল্প সংখ্যক ছিলে فَكَثَّرَكُمْ অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে পরিবর্ধিত করেছেন। وَانْظُرُوْا এবং লক্ষ্য কর كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِيْنَ ফ্যাসাদকারীদের কিরূপ পরিণাম হয়েছে।

(৮৭) وَاِنْ كَانَ طَآئِفَةٌ مِّنْكُمْ আর যদি তোমাদের কেউ কেউ اٰمَنُوْا ঈমান এনে থাকে بِالَّذِيْٓ اُرْسِلْتُ بِهٖ তৎপ্রতি যা দিয়ে আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে। وَطَآئِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوْا এবং কতক ঈমান না এনে থাকে। فَاصْبِرُوْا তবে অপেক্ষা কর حَتّٰى يَحْكُمَ اللّٰهُ بَيْنَنَا যে পর্যন্ত না আল্লাহ তা'আলা আমাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেন وَهُوَ خَيْرُ الْحٰكِمِيْنَ বস্তুত তিনি সমস্ত মীমাংসাকারীদের অপেক্ষা উত্তম।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

৮৩ নং আয়াতে আজাব সম্পর্কে সংক্ষেপে এটুকুই বলা হয়েছে যে, তাদের উপর এক অভিনব বৃষ্টি বর্ষণ করা হয়। সূরা হুদে এ আয়াতের বিস্তারিত অবস্থা উল্লেখ করে বলা হয়েছে :

فَلَمَّا جَآءَ اَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّنْ سِجِّيْلٍ مَّنْضُوْدٍ مُّسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ بِبَعِيْدٍ

অর্থৎ যখন আমার আজাব এসে গেল, তখন আমি বস্তিটিকে উলটে দিলাম এব তাদের উপর স্তরে স্তরে প্রস্তর বর্ষণ করলাম যা আপনার প্রতিপালকের নিকট চিহ্নযুক্ত ছিল। সে বস্তিটি এ কাফেরদের থেকে বেশি দূরে নয়।

এতে বুঝা যাচ্ছে যে, উপর থেকে প্রস্তর বর্ষিত হয়েছে এবং নিচে থেকে হযরত জিবরাঈল (আ.) গোটা ভূখণ্ডকে উপরে তুলে উল্টে দিয়েছেন। বর্ষিত প্রস্তরসমূহ স্তরে একত্রিত ছিল। অর্থাৎ এমন অবিরাম ধারায় বর্ষিত হয়েছিল যে, স্তরে স্তরে জমা হয়ে গিয়েছিল। এসব প্রস্তর চিহ্নযুক্ত ছিল। কোনো কোনো তাফসীরবিদ বলেন, প্রত্যেক পাথরে ঐ ব্যক্তির নাম লিখিত ছিল। যাকে খতম করার জন্য পাথরটি নিক্ষিপ্ত হয়েছিল। সূরা হিজরের আয়াতে এ আজাবের বর্ণনার পূর্বে বলা হয়েছে : فَاَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِيْنَ অর্থাৎ সূর্যোদয়ের সময় বিকট শব্দ তাদেরকে পাকড়াও করল।

এতে জান যায় যে, প্রথমে আকাশ থেকে একটি বিকট চিৎকার ধ্বনি এবং এরপর আন্যান্য আজাব এসেছে। বাহ্যত বুঝা যায় যে, চিৎকার ধ্বনির পর প্রথমে ভূখণ্ড উল্টিয়ে দেওয়া হয়। অতঃপর তাদেরকে অধিকতর লাঞ্ছিত করার জন্য উপর

থেকে প্রস্তর বৃষ্টি বর্ষণ করা হয়। তাছাড়া এমনও হতে পারে যে, প্রথমে প্রস্তর বৃষ্টি বর্ষণ করা হয় এবং পরে ভূখণ্ড উল্টিয়ে দেওয়া হয়। কারণ কুরআনের বর্ণনা পদ্ধতিতে যে বিষয়টি আগে উল্লেখ করা হয়, তা বাস্তবেও আগেই সংঘটিত হবে, তা অপরিহার্য নয়।

হযরত লূত (আ.)–এর সম্প্রদায়ের উপর পতিত ভয়াবহ আজাবসমূহের মধ্যে ভূখণ্ড উল্টিয়ে দেওয়ার আজাবটি তাদের অশ্লীল ও নির্লজ্জ কাজের সাথে বিশেষ সঙ্গতিও রাখে। কারণ তারা সিদ্ধ পন্থার বিপরীত কাজ করেছিল।

সূরা হূদে বর্ণিত আয়াতসমূহের শেষে কুরআন পাকে আরবদেরকে হুশিয়ার করে এ কথাও বলেছে যে, وَمَا هِيَ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ بِبَعِيْدٍ অর্থাৎ উল্টে দেওয়া বস্তিগুলো জালেমদের কাছ থেকে বেশি দূরে নয়। সিরিয়া গমনের পথে সব সময়ই সেগুলো তাদের চোখের সামনে পড়ে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় তারা তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে না।

এ দৃশ্য শুধু কুরআন অবতরণের সময়েই নয়, আজও বিদ্যমান রয়েছে । বায়তুল মাকদিস ও জর্দান নদীর মাঝখানে আজও এ ভূখণ্ডটি 'লূত সাগর' অথবা 'মৃত সাগর' নামে পরিচিত। এর ভূভাগ সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে অনেক নীচে অবস্থিত। এর একটি বিশেষ অংশ নদীর আকারে আশ্চর্য ধরনের পানি বিদ্যমান। এ পানিতে কোনো মাছ ব্যাঙ ইত্যাদি জীবিত থাকতে পারে না। এ কারণেই একে মৃত সাগর বলা হয়ে। কথিত আছে, এটাই সাদূমের অবস্থান স্থল।

قوله وَاِلٰى مَدْيَنَ اَخَاهُمْ شُعَيْبًا الخ পয়গম্বরদের কাহিনী পরম্পরার পঞ্চম কাহিনী হচ্ছে হযরত শোয়ায়েব (আ.) ও তাঁর সন্তানদের। আলোচ্য আয়াতসমূহে এ কাহিনীটিই বিবৃত হয়েছে।

মুহাম্মদ ইবনে ইসহাকের বর্ণনা অনুযায়ী হযরত শোয়াবের (আ.) ছিলেন হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর পুত্র মাদইয়ানের বংশধর । হযরত লূত (আ.) -এর সাথেও তাঁর আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল। তাঁর বংশধরও মাদইয়ান নামে খ্যাত হয়েছে। যে বস্তিতে তারা বসবাস করত, তাও মাদইয়ান নামে অভিহিত হয়েছে। অতএব মাদইয়ান একটি জাতির ও একটি শহরের নাম। এ শহর অদ্যাবধি পূর্ব জর্দানের সামুদ্রিক বন্দর মাদইয়ানের অদূরে বিদ্যমান রয়েছে। কুরআন পাকের অন্যত্র হযরত মূসা (আ.)-এর কাহিনীতে বলা হয়েছে وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ এতে এ বস্তিটিকে বুঝানো হয়েছে। [ইবনে কাছীর] হযরত শোয়ায়েব (আ.) -কে চমৎকার বাগ্মিতার কারণে খতিবুল আম্বিয়া বলা হয়। [ইবনে কাছীর, বাহরে মুহীত]

হযরত শোয়ায়েব (আ.) যে সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরিত হয়েছিলেন, কুরআন পাকের কোথাও তাদেরকে আহলে মাদইয়ান ও আসহাবে মাদইয়ান নামে উল্লেখ করা হয়েছে। আবার কোথাও আসহাবে আইকা নামে। আইকা শব্দের অর্থ জঙ্গল ও বন। কোনো কোনো তাফসীরবিদ বলেন, আসহাবে মাদইয়ান ও আসহাবে আইকা পৃথক পৃথক জাতি। তাদের বাসস্থানও ছিল ভিন্ন ভিন্ন এলাকায়। হযরত শোয়ায়েব (আ.) যে সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরিত হয়েছিলেন, তারা ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর অপর জাতির প্রতি প্রেরিত হয়েছিলেন। উভয় জাতির উপর যে আজাব আসে, তার ভাষাও বিভিন্ন রূপ। আসহাবে মাদইয়ানের উপর কোথাও صَيْحَةٌ এবং কোথাও رَجْفَةٌ, এবং আসহাবে আইকার উপর কোথাও ظُلَّةٌ -এর আজাব উল্লেখ করা হয়েছে। صَيْحَةٌ শব্দের অর্থ– বিকট চিৎকার এবং ভীষণ শব্দ। رَجْفَةٌ, শব্দের অর্থ ভূমিকম্প এবং ظُلَّةٌ শব্দের অর্থ ছায়াযুক্ত ছাদ, শামিয়ানা। আসহাবে আইকার উপর এভাবে আজাব নাজিল করা হয় যে, প্রথমে কয়েকদিন তাদের বস্তি ভীষণ গরম পড়ে। ফলে গোটা জাতি ছটফট করতে থাক। অতঃপর নিকটস্থ একটি গভীর জঙ্গলের উপর গাঢ় মেঘমালা দেখা দেয়। ফলে জঙ্গলে ছায়া পড়ে এবং শীতল বাতাস বইতে থাকে। এ দৃশ্য দেখে বস্তির সবাই জঙ্গলে জমায়েত হয়। এভাবে খোদায়ী অপরাধীরা কোনোরূপ গ্রেফতারী পরোয়ানা ও সিপাই-সান্ত্রীর প্রহরা ছাড়াই নিজ পায়ে হেঁটে বধ্যভূমিতে গিয়ে পৌঁছে। যখন সবাই সেখানে একত্রিত হয়, তখন মেঘমালা থেকে অগ্নি বৃষ্টি বর্ষিত হয় এবং নীচের দিকে শুরু হয় ভূমিকম্প। ফলে সবাই নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

কোনো কোনো তাফসীরবিদ বলেন : আসহাবে মাদইয়ান ও আসহাবে আইকা একই সম্প্রদায়ের দুই নাম। পূর্বোল্লিখিত তিন প্রকার আজাবই তাদের উপর নাজিল হয়েছিল। প্রথমে মেঘমালা থেকে অগ্নি বর্ষিত হয়, অতঃপর বিকট চিৎকার শোনা যায় এবং সবশেষে ভূমিকম্প হয়। ইবনে কাছীর এ অভিমতেরই প্রবক্তা।

মোটকথা, উভয় সম্প্রদায় ভিন্ন ভিন্ন হোক কিংবা একটি সম্প্রদায়ের দু'নাম হোক হযরত শোয়ায়েব (আ.) তাদেরকে যে পয়গাম দেন, তা প্রথম ও দ্বিতীয় আয়াতে উল্লিখিত হয়েছে। এর ব্যাখ্যার পূর্বে জেনে নিন যে, ইসলামই সব পয়গম্বরের অভিন্ন দাওয়াত। এর সারমর্ম হচ্ছে হক আদায় করা। হক দু'প্রকার : এক, সরাসরি আল্লাহর হক, যা করা না করার সাথে

অন্য মানুষের কোনো উল্লোখযোগ্য লাভ ক্ষতি সম্পর্কযুক্ত নয়। যেমন- ইবাদত, নামাজ, রোজা ইত্যাদি। **দুই.** বান্দার হক। এর সম্পর্ক অন্য মানুষের সাথে। হযরত শোয়ায়েব (আ.)–এর সম্প্রদায় উভয় প্রকার হক সম্পর্কে অজ্ঞ হয়ে উভয়ের বিপক্ষে কাজ করছিল।

তারা আল্লাহ তা'আলা ও রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করে আল্লাহর হকের বিরুদ্ধাচরণ করছিল। এর সাথে ক্রয় বিক্রয়ে মাপ ও ওজনে কম দিয়ে বান্দাদের হক নষ্ট করছিল। তদুপরি তারা রাস্তা ও সড়কের মুখে বসে থাকত এবং পথিকদের ভয় ভীতি দেখিয়ে তাদের ধন সম্পদ লুটে নিত এবং হযরত শোয়ায়েব (আ.)–এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে বাধা দিত। তারা এভাবে ভূপৃষ্ঠে অনর্থ সৃষ্টি করছিল। এসব অপরাধের পরিপ্রেক্ষিতে তাদের হেদায়েতের জন্য হযরত শোয়ায়েব (আ.) প্রেরিত হয়েছিলেন।

আলোচ্য আয়াতসমূহের ৮৫ ও ৮৬ নং আয়াতে তাদের সংশোধনের জন্য হযরত শোয়ায়েব (আ.) তিনটি বিষয় বর্ণনা করেছেন। প্রথমত يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ অর্থাৎ হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর। তিনি ব্যতীত উপাস্য হওয়ার যোগ্য কেউ নেই। একত্ববাদের এ দাওয়াতই সব পয়গম্বর দিয়ে এসেছেন। এটিই সব বিশ্বাস ও কর্মের প্রাণ। এ সম্প্রদায়ও সৃষ্ট বস্তুর পূজায় লিপ্ত ছিল এবং আল্লাহর সত্তা, গুণাবলি ও হক সম্পর্কে গাফেল হয়ে পড়েছিল। তাই তাদেরকে সর্বপ্রথম এ পয়গাম দেওয়া হয়েছে। আরও বলা হয়েছে : قَدْ جَآءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ অর্থাৎ তোমাদের কাছে প্রতিপালকের পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট প্রমাণ এসে গেছে। এখানে সুস্পষ্ট প্রমাণ এর অর্থ ঐসব মু'জিযা, যা হযরত শোয়ায়েব (আ.)-এর হাতে প্রকাশ পেয়েছিল। তাঁরি মু'জিযার বিভিন্ন প্রকার তাফসীরে বাহরে মুহীতে উল্লিখিত হয়েছে।

দ্বিতীয়ত فَاَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيْزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَآءَهُمْ এতে كَيْلٌ শব্দের অর্থ মাল এবং مِيْزَانٌ শব্দের অর্থ ওজন করা। بَخْسٌ শব্দের অর্থ কারও পাওনা হ্রাস করে ক্ষতি করা। অর্থাৎ তোমরা মাপ ও ওজন পূর্ণ কর এবং মানুষের দ্রব্যাদিতে কম দিয়ে তাদের ক্ষতি করো না।

এতে প্রথমে একটি বিশেষ অপরাধ নিষিদ্ধ করা হয়েছে, যা ক্রয়-বিক্রয়ের সময় ওজনে কম দিয়ে করা হতো। অতঃপর وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَآءَهُمْ বলে সর্ব প্রকার হকে ত্রুটি করাকে ব্যাপকভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে, তা ধন সম্পদ, ইজ্জত-আবরু অথবা অন্য যে কোনো বস্তুর সাথেই সম্পর্ক যুক্ত হোক না কেন। –[বাহরে মুহীত]

এ থেকে জানা গেল যে, মাপ ও ওজনে পাওনার চাইতে কম দেওয়া যেমন হারাম, তেমনি অন্যান্য হকে ত্রুটি করাও হারাম। কারও ইজ্জত-আবরু নষ্ট করা, কারও পদমর্যাদা অনুযায়ী তার সম্মান না করা যাদের আনুগত্য জরুরি তাদের আনুগত্যে ত্রুটি করা। অথবা যার সম্মান করা ওয়াজিব, তার সম্মানে ত্রুটি করা ইত্যাদি সবই এ অপরাধের অন্তর্ভুক্ত যা হযরত শোয়ায়েব (আ.)-এর সম্প্রদায় করত। বিদায় হজের ভাষণে রাসূলুল্লাহ ﷺ মানুষের ইজ্জত-আবরুকে তাদের রক্তের সমান সম্মানযোগ্য ও সংরক্ষণযোগ্য সাব্যস্ত করেছেন।

কুরআন পাকে مُطَفِّفِيْنَ ও تَطْفِيْف –এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে, উপরিউক্ত সব বিষয়ই এর অর্ন্তভুক্ত। হযরত ওমর (রা.) এক ব্যক্তিকে তড়িঘড়ি রুকূ' সেজদা করতে দেখে বললেন; قَدْ طَفَّفْتَ অর্থাৎ তুমি মাপ ও ওজনে ত্রুটি করেছ। (মুয়াত্তা ইমাম মালেক) অর্থাৎ তুমি নামাজের হক পূর্ণ করনি। এখানে নামাজের হক পূর্ণ না করাকে تَطْفِيْف শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে। আয়াতের শেষে বলা হয়েছে : وَلَا تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا অর্থাৎ পৃথিবীর সংস্কার সাধিত হওয়ার পর তাতে অনর্থ ছড়িওনা। এ বাক্যটি সূরা আ'রাফের পূর্বও উল্লিখিত হয়েছে। সেখানে এর বিস্তারিত অর্থ এই বর্ণিত হয়েছে যে, পৃথিবীর বাহ্যিক সংস্কার হলো, প্রত্যেকটি বস্তুকে যথার্থ স্থানে ব্যয় করা, এবং নির্ধারিত সীমার প্রতি লক্ষ্য রাখা। বস্তুত তা ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠার উপর নির্ভরশীল। আর অভ্যন্তরীণ সংস্কার হলো আল্লাহর সাথে সম্পর্ক রাখা এবং তা তাঁর নির্দেশাবলি পালনের উপর ভিত্তিশীল। এমনিভাবে পৃথিবীর বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ অনর্থ এসব নীতি ত্যাগ করার কারণেই দেখা দেয়। হযরত শোয়াইব (আ.)–এর সম্প্রদায় এসব নীতির প্রতি চরম উপেক্ষা প্রদর্শন করেছিল। ফলে পৃথিবীতে বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ সব রকম অনর্থ বিরাজমান ছিল। তাই তাদেরকে উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে, তোমাদের এসব কর্মকাণ্ড সমগ্র ভূপৃষ্ঠে অনর্থ সৃস্টি করবে। তাই এগুলো থেকে বেঁচে থাক।

অতঃপর বলা হয়েছে : ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ অর্থাৎ যদি তোমরা আমার কথা মান্য কর, তবে এ বিষয়টি তোমাদের জন্য উত্তম। উদ্দেশ্য এই যে, যদি তোমরা অবৈধ কাজ কর্ম থেকে বিরত হও, তবে এতেই তোমাদের ইহকাল ও পরকালের কল্যাণ ও মঙ্গল নিহিত রয়েছে। ধর্ম ও পরকালীন মঙ্গলের বর্ণনা নিস্প্রয়োজন। কারণ এটি আল্লাহর

আনুগত্যের সাথেই সর্বতোভাবে জড়িত। ইহকালের মঙ্গল এ জন্য যে, যখন সবাই জানতে পারবে যে, অমুক ব্যক্তি মাপ ও ওজন এবং অন্যান্য হকের ব্যাপারে সত্যনিষ্ঠ, তখন বাজারে তার প্রভাব বিস্তৃত হবে এবং ব্যবসায়ে উন্নতি সাধিত হবে।

৮৭ নং আয়াতে বলা হয়েছে যে, তোমরা মানুষকে ভীতি প্রদর্শন ও আল্লাহর পথে বাধা দান করার জন্য পথে ঘাটে ওঁৎ পেতে বসে থেকো না। কোনো কোনো তাফসীরবিদের মতে এখানে উভয় বাক্যের উদ্দেশ্যই এক। অর্থাৎ তারা রাস্তাঘাটে বসে হযরত শোয়ায়েব (আ.)-এর কাছে আগমনকারীদেরকে ভীতি প্রদর্শন করত। তাদেরকে এ কাজ করতে নিষেধ করা হয়েছে।

আবার কেউ কেউ বলেন যে, তাদের পৃথক পৃথক দুটি অপরাধ ছিল। পথে বসে লুটপাটও করত এবং হযরত শোয়ায়েব (আ.)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতেও বাধা দিত। প্রথম বাক্যে প্রথম অপরাধ এবং দ্বিতীয় বাক্যে দ্বিতীয় অপরাধ বর্ণনা করা হয়েছে। বাহরে মুহীত প্রভৃতি তাফসীর গ্রন্থে এ অর্থই গৃহীত হয়েছে। তারা শরিয়ত বিরোধী অবৈধ ট্যাক্স আদায় করার জন্য রাস্তার মোড়ে স্থাপিত চৌকিসমূহকেও পথে বসে লুটপাট করার অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

আল্লামা কুরতুবী (রা.) বলেন, যারা পথে বসে শরিয়ত বিরোধী অবৈধ ট্যাক্স আদায় করে, তারাও হযরত শোয়ায়েব (আ.)–এর সম্প্রদায়ের ন্যায় অপরাধী; বরং তাদের চাইতেও অধিক অত্যাচারী ও দুষ্কৃতিকারী।

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে– وَتَبْغُوْنَهَا عِوَجًا অর্থাৎ তোমরা আল্লাহর পথে বক্রতার অন্বেষণে ব্যাপৃত থাক, যাতে কোথাও অঙ্গুলি রাখার জায়গা পাওয়া গেলে আপত্তি ও সন্দেহের ঝড় সৃষ্টি করে মানুষকে সত্যধর্ম থেকে বিমুখ করার চেষ্টা করা যায়। এরপর বলা হয়েছে : وَاذْكُرُوْٓا اِذْ كُنْتُمْ قَلِيْلًا فَكَثَّرَكُمْ وَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِيْنَ এখানে তাদেরকে হুশিয়ার করার জন্য উৎসাহ প্রদান ও ভীতি প্রদর্শন উভয় পন্থা ব্যবহার করা হয়েছে। প্রথমে উৎসাহ প্রদানের উদ্দেশ্যে আল্লাহ তা'আলার নিয়ামত স্মরণ করানো হয়েছে যে তোমরা পূর্বে সংখ্যা ও গণনার দিক দিয়ে কম ছিলে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের বংশ বৃদ্ধি করে তোমাদেরকে একটি বিরাট জাতিতে পরিণত করেছেন। অথবা তোমরা ধন সম্পদের দিক দিয়ে কম ছিলে, আল্লাহ তা'আলা ঐশ্বর্য দান করে তোমাদের স্বনির্ভর করে দিয়েছেন। অতঃপর ভীতি প্রদর্শনার্থে বলাই হয়েছে : পূর্ববর্তী অনর্থ সৃষ্টিকারী জাতিসমূহের পরিণামের প্রতি লক্ষ্য কর। কওমে নূহ, আদ, ছামূদ ও কওমে লূতের উপর কি ভীষণ আজাব এসেছে। তোমরা ভেবে চিন্তে কাজ করো।

এরপর এ সম্প্রদায়ের একটি সন্দেহের জওয়াব দেওয়া হয়েছে। হযরত শোয়ায়েব (আ.)-এর দাওয়াতের পর তাঁর সম্প্রদায় দুভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। কিছু সংখ্যক মুসলমান হয় এবং কিছু সংখ্যক কাফেরই থেকে যায়। কিন্তু বাহ্যিক দিক দিয়ে উভয় দল একই রূপ আরাম-আয়েশে দিনাতিপাত করতে থাকে। এতে তারা সন্দেহ প্রকাশ করে যে, কাফের হওয়া অপরাধ হলে অপরাধীরা অবশ্যই শাস্তি পেত। এ সন্দেহের উত্তরে বলা হয়েছে فَاصْبِرُوْا حَتّٰى يَحْكُمَ اللّٰهُ بَيْنَنَا অর্থাৎ তাড়াহুড়া কিসের। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় সহনশীলতা ও কৃপাগুণে অপরাধীদেরকে অবকাশ দিয়ে থাকেন। তারা যখন চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছে যায় তখন সত্য ও মিথ্যার মীমাংসা করে দেওয়া হয়। তোমাদের অবস্থা তদ্রূপ। তোমরা যদি কুফর থেকে বিরত না হও, তবে অতি সত্বর কাফেরদের উপর চূড়ান্ত আজাব নাজিল হয়ে যাবে

শব্দ বিশ্লেষণ

قَرْيَةٌ : শব্দটি একবচন; বহুবচন قُرًى অর্থ– গ্রাম, পল্লী।

اَنَاسٌ : শব্দটি বহুবচন; একবচন انس অর্থ– মানুষ, মানবজাতি।

اَوْفُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব افعال মাসদার اَلْاِيْفَاءُ মূলবর্ণ (و . ف . ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ– তোমরা পূর্ণ কর।

تُوْعِدُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব افعال মাসদার اَلْاِيْعَادُ মূলবর্ণ (و . ع . د) জিনস مثال واوى অর্থ– তোমরা ভীতি প্রদর্শন করছ।

تَصُدُّوْنَ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব نصر মাসদার اَلصَّدُّ মূলবর্ণ (ص . د . د) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– তোমরা বাধা সৃষ্টি করবে, তোমরা প্রতিরোধ করবে

تَبْغُوْنَ সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব ضرب মাসদার البغية মূলবর্ণ (ب . غ . ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– তোমরা অনুসন্ধান করবে।

৯ম পারা

قَالَ الْمَلَاُ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ لَنُخْرِجَنَّكَ يٰشُعَيْبُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَاۤ اَوْ لَتَعُوْدُنَّ فِيْ مِلَّتِنَا ؕ قَالَ اَوَلَوْ كُنَّا كٰرِهِيْنَ (৮৮)

অনুবাদ : (৮৮) তাঁর সম্প্রদায়ের দাম্ভিক সরদারগণ বলল, হে শোয়াইব! আমরা আপনাকে এবং যারা আপনার সাথে ঈমান এনেছে, তাদেরকে আমাদের বস্তি হতে বের করে দিব অথবা এটা যে, আপনারা আমাদের ধর্মে ফিরে আসবেন, শোয়াইব. বললেন, আমরা কি তোমাদের ধর্মে ফিরে আসব, যদিও আমরা তাকে ঘৃণিতই মনে করি?

قَدِ افْتَرَيْنَا عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اِنْ عُدْنَا فِيْ مِلَّتِكُمْ بَعْدَ اِذْ نَجّٰنَا اللّٰهُ مِنْهَا ؕ وَمَا يَكُوْنُ لَنَاۤ اَنْ نَّعُوْدَ فِيْهَاۤ اِلَّاۤ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ رَبُّنَا ؕ وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ؕ عَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا ؕ رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَاَنْتَ خَيْرُ الْفٰتِحِيْنَ (৮৯)

(৮৯) আমরা তো আল্লাহর প্রতি বড়ই মিথ্যা অপবাদকারী হয়ে যাব যদি আমরা তোমাদের ধর্মে ফিরে আসি, এরপর যে, আল্লাহ্ আমাদেরকে তা হতে নাজাত দিয়েছেন, আর আমাদের দ্বারা সম্ভব নয় যে, তোমাদের ধর্মে প্রত্যাবর্তন করি , হ্যাঁ, যদি আল্লাহ্ তা'আলাই– যিনি আমাদের প্রতিপালক নির্ধারণ করে থাকেন, আমাদের প্রতিপালকের জ্ঞান সমস্ত বস্তুকে বেষ্টন করে আছে, আমরা আল্লাহরই উপর ভরসা রাখি। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের ও আমাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে মীমাংসা করে দিন ন্যায় অনুযায়ী, বস্তুতঃ আপনি সর্বাপেক্ষা উত্তম মীমাংসাকারী।

শাব্দিক অনুবাদ

(৮৮) قَالَ الْمَلَاُ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ তাঁর সম্প্রদায়ের দাম্ভিক সরদারগণ বলল لَنُخْرِجَنَّكَ আমরা আপনাকে বের করে দিব يٰشُعَيْبُ হে শোয়াইব! وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَكَ এবং যারা আপনার সাথে ঈমান এনেছে, তাদেরকে مِنْ قَرْيَتِنَاۤ আমাদের বস্তি হতে اَوْ لَتَعُوْدُنَّ فِيْ مِلَّتِنَا অথবা এটা যে, আপনারা আমাদের ধর্মে ফিরে আসবেন قَالَ শোয়াইব বললেন اَوَلَوْ كُنَّا كٰرِهِيْنَ আমরা কি তোমাদের ধর্মে ফিরে আসব, যদিও আমরা তাকে ঘৃণিতই মনে করি?

(৮৯) قَدِ افْتَرَيْنَا عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا আমরা তো আল্লাহর প্রতি বড়ই মিথ্যা অপবাদকারী হয়ে যাব اِنْ عُدْنَا فِيْ مِلَّتِكُمْ যদি আমরা তোমাদের ধর্মে ফিরে আসি بَعْدَ اِذْ نَجّٰنَا اللّٰهُ مِنْهَا এর পর যে, আল্লাহ্ আমাদেরকে তা হতে নাজাত দিয়েছেন وَمَا يَكُوْنُ لَنَاۤ اَنْ نَّعُوْدَ فِيْهَاۤ আর আমাদের দ্বারা সম্ভব নয় যে, তোমাদের ধর্মে প্রত্যাবর্তন করি اِلَّاۤ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ رَبُّنَا হ্যাঁ, যদি আল্লাহ্ তা'আলাই– যিনি আমাদের প্রতিপালক নির্ধারণ করে থাকেন وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا আমাদের প্রতিপালকের জ্ঞান সমস্ত বস্তুকে বেষ্টন করে আছে عَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا আমরা আল্লাহরই উপর ভরসা রাখি رَبَّنَا হে আমাদের প্রতিপালক! افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا আমাদের ও আমাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে মীমাংসা করে দিন بِالْحَقِّ ন্যায় অনুযায়ী وَاَنْتَ خَيْرُ الْفٰتِحِيْنَ বস্তুতঃ আপনি সর্বাপেক্ষা উত্তম মীমাংসাকারী।

وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهٖ لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَّخٰسِرُوْنَ ﴿٩٠﴾

অনুবাদ : (৯০) আর তাঁর সম্প্রদায়ের কাফের সরদারগণ বলল, যদি তোমরা শোয়াইবের অনুসরণ কর তবে অবশ্যই অতি ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِيْ دَارِهِمْ جٰثِمِيْنَ ﴿٩١﴾

(৯১) সুতরাং তাদেরকে ভূমিকম্প ধৃত করল, ফলে তারা নিজেদের ঘরে উপুড় হয়ে পড়ে রইল।

الَّذِيْنَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَأَنْ لَّمْ يَغْنَوْا فِيْهَا ۚ اَلَّذِيْنَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُوا هُمُ الْخٰسِرِيْنَ ﴿٩٢﴾

(৯২) যারা শোয়াইবকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করেছিল তাদের এমন অবস্থা হলো, যেন এ সমস্ত ঘরে কখনো বসবাসই করেনি। যারা শোয়াইবকে মিথ্যাবাদী করেছিল, তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হলো।

فَتَوَلّٰى عَنْهُمْ وَقَالَ يٰقَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسٰلٰتِ رَبِّيْ وَنَصَحْتُ لَكُمْ ۚ فَكَيْفَ اٰسٰى عَلٰى قَوْمٍ كٰفِرِيْنَ ﴿٩٣﴾

(৯৩) তখন শোয়াইব তাদের হতে মুখ ফিরিয়ে চললেন, এবং বলতে লাগলেন, হে আমার সম্প্রদায়! আমি তোমাদেরকে স্বীয় প্রতিপালকের আহকাম পৌছে দিয়েছিলাম এবং আমি তোমাদের কল্যাণ কামনা করেছি, অতএব, আমি এই কাফেরদের উপর কোন অনুশোচনা করব?

وَمَآ أَرْسَلْنَا فِيْ قَرْيَةٍ مِّنْ نَّبِيٍّ إِلَّآ أَخَذْنَآ أَهْلَهَا بِالْبَأْسَآءِ وَالضَّرَّآءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُوْنَ ﴿٩٤﴾

(৯৪) আর আমি [উল্লিখিত এবং তা ব্যতীত অন্যান্য জনপদ হতে] কোনো জনপদে কোনো নবী [এমনভাবে] প্রেরণ করিনি যে, তথাকার অধিবাসীদেরকে [সতর্ক করার উদ্দেশ্যে] দারিদ্র্য ও পীড়া দ্বারা আক্রান্ত না করেছি যেন তারা বিনম্র হয়।

শাব্দিক অনুবাদ

(৯০) وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ আর তাঁর সম্প্রদায়ের কাফের সরদারগণ বলল لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا যদি তোমরা শোয়াইবের অনুসরণ কর إِنَّكُمْ إِذًا لَّخٰسِرُوْنَ তবে অবশ্যই অতি ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

(৯১) فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ সুতরাং তাদেরকে ভূমিকম্প ধৃত করল فَأَصْبَحُوْا ফলে তারা পড়ে রইল فِيْ دَارِهِمْ جٰثِمِيْنَ নিজেদের ঘরে উপুড় হয়ে ।

(৯২) الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا شُعَيْبًا যারা শোয়াইবকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করেছিল তাদের এমন অবস্থা হলো كَأَنْ لَّمْ يَغْنَوْا فِيْهَا যেন এ সমস্ত ঘরে কখনো বসবাসই করেনি الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا شُعَيْبًا যারা শোয়াইবকে মিথ্যাবাদী করেছিল كَانُوْا هُمُ الْخٰسِرِيْنَ তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হলো।

(৯৩) فَتَوَلّٰى عَنْهُمْ তখন শোয়াইব তাদের হতে মুখ ফিরিয়ে চললেন وَقَالَ এবং বলতে লাগলেন يٰقَوْمِ হে আমার সম্প্রদায়! لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسٰلٰتِ رَبِّيْ আমি তোমাদেরকে স্বীয় প্রতিপালকের আহকাম পৌছে দিয়েছিলাম وَنَصَحْتُ لَكُمْ এবং আমি তোমাদের কল্যাণ কামনা করেছি فَكَيْفَ اٰسٰى عَلٰى قَوْمٍ كٰفِرِيْنَ অতএব, আমি এই কাফেরদের উপর কোন অনুশোচনা করব?

(৯৪) وَمَآ أَرْسَلْنَا فِيْ قَرْيَةٍ مِّنْ نَّبِيٍّ আর আমি কোনো জনপদে কোনো নবী প্রেরণ করিনি যে إِلَّآ أَخَذْنَآ أَهْلَهَا بِالْبَأْسَآءِ وَالضَّرَّآءِ তথাকার অধিবাসীদেরকে [সতর্ক করার উদ্দেশ্যে] দারিদ্র্য ও পীড়া দ্বারা আক্রান্ত না করেছি لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُوْنَ যেন তারা বিনম্র হয়।

ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتّٰى عَفَوْا وَّقَالُوْا قَدْ مَسَّ اٰبَآءَنَا الضَّرَّآءُ وَالسَّرَّآءُ فَاَخَذْنٰهُمْ بَغْتَةً وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ (٩٥)

অনুবাদ : (৯৫) অতঃপর আমি ঐ দুরবস্থার স্থলে সুঅবস্থার পরিবর্তন করে দিলাম, এ পর্যন্ত যে, তাদের অতি উন্নতি হলো এবং বলতে লাগল, আমাদের পূর্বপুরুষদের প্রতিও অসচ্ছলতা এবং সচ্ছলতা সমাগত হয়েছিল, অনন্তর আমি তাদেরকে অকস্মাৎ ধৃত করলাম অথচ তাদের খবরও ছিল না।

শাব্দিক অনুবাদ

(৯৫) ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ অতঃপর আমি ঐ দুরবস্থার স্থলে সুঅবস্থার পরিবর্তন করে দিলাম। حَتّٰى عَفَوْا এ পর্যন্ত যে, তাদের অতি উন্নতি হলো। وَقَالُوْا এবং বলতে লাগল قَدْ مَسَّ اٰبَآءَنَا الضَّرَّآءُ وَالسَّرَّآءُ আমাদের পূর্বপুরুষদের প্রতিও অসচ্ছলতা এবং সচ্ছলতা সমাগত হয়েছিল فَاَخَذْنٰهُمْ بَغْتَةً অনন্তর আমি তাদেরকে অকস্মাৎ ধৃত করলাম وَهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ অথচ তাদের খবরও ছিল না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

হযরত শোয়াইব (আ.)-কে তাঁর সম্প্রদায়ের লোকেরা বলল, আপনি যদি সত্যপন্থি হতেন, তবে আপনার অনুসারীরা সমৃদ্ধ হতো এবং অমান্যকারীদের উপর আজাব আসত। কিন্তু হচ্ছে এই যে, উভয় দল সমভাবে আরামে দিন যাপন করছে। এমতাবস্থায় আমরা আপনাকে সত্যপন্থি বলে কিরূপে মেনে নিতে পারি? উত্তরে হযরত শোয়াইব (আ.) বললেন, তাড়াহুড়া কিসের? অতি সত্বর আল্লাহ তা'আলা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে ফয়সালা করে দিবেন। এরপর সম্প্রদায়ের অহংকারী সর্দাররা অত্যাচারী ও উদ্ধত লোকদের চিরাচরিত পন্থায় বলে উঠল : হে শোয়াইব! হয় তুমি এবং তোমার অনুসারী মুমিনরা আমাদের ধর্মে ফিরে আসবে, না হয় আমরা তোমাদেরকে বস্তি থেকে উচ্ছেদ করে দিব।

তাদের ধর্মে ফিরে আসা কথাটা মুমিনের ক্ষেত্রে যথার্থই প্রযোজ্য। কারণ তারা পূর্বে তাদের ধর্মেই ছিল এবং পরে হযরত শোয়াইব (আ.)-এর দাওয়াতে সাড়া দিয়ে মুসলমান হয়েছিল। কিন্তু শোয়াইব (আ.) একদিনও তাদের মিথ্যা ধর্মে ছিলেন না। আল্লাহর কোনো পয়গম্বর কখনও কোনো মুশরিকসুলভ মিথ্যা ধর্মের অনুসারী হতেই পারেন না। এমতাবস্থায় তাঁকে ফিরে আসার কথা বলা সম্ভবত এ কারণে ছিল যে, নবুয়ত প্রাপ্তির পূর্বে হযরত শোয়াইব (আ.) তাদের বাতিল কথাবার্তা ও কাজকর্ম দেখে চুপ থাকতেন এবং তাদের সাথে মিলেমিশে থাকতেন। ফলে তাঁর সম্পর্কেও সম্প্রদায়ের লোকদের ধারণা ছিল যে, তিনিও তাদেরই সমধর্মী। ঈমানের দাওয়াত দেওয়ার পর তারা জনতে পারল যে, তাঁর ধর্ম তাদের থেকে ভিন্ন অথবা তিনি তাদের ধর্ম ত্যাগ করেছেন। হযরত শোয়াইব (আ.) উত্তরে বললেন– اَوَلَوْ كُنَّا كٰرِهِيْنَ অর্থাৎ তোমাদের উদ্দেশ্য কি এই যে, তোমাদের ধর্মকে অপছন্দ করা সত্ত্বেও আমরা তোমাদের ধর্মে ফিরে যাব? অর্থাৎ এটা হতে পারে না। এ পর্যন্ত প্রথম আয়াতের বিষয়বস্তু বর্ণিত হলো।

দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে যে, হযরত শোয়াইব (আ.) তাঁর জাতিকে বললেন, তোমাদের মিথ্যা ধর্ম থেকে আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে মুক্তি দিয়েছেন। এরপর আমরা যদি তোমাদের ধর্মে ফিরে যাই, তবে এ হবে আমাদের পক্ষ থেকে আল্লাহর তা'আলার প্রতি জঘন্য অপবাদ আরোপ করা। কেননা প্রথমত কুফর ও শিরককে ধর্ম বলে স্বীকার করার অর্থ এই যে, আল্লাহ তা'আলাই যেন এ নির্দেশ দিয়েছেন। এটা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা অপবাদ। এছাড়া বিশ্বাস স্থাপন করা এবং জ্ঞান ও চক্ষুষ্মানতা অর্জিত হওয়ার পর পুনরায় কুফরের দিকে ফিরে যাওয়া যেন একথা বলা যে, পূর্বের ধর্ম মিথ্যা ও ভ্রান্ত ছিল। এখন যে ধর্ম গ্রহণ করা হচ্ছে, তাই সত্য ও বিশুদ্ধ এটা দ্বিমুখী মিথ্যা ও অপবাদ। কারণ এতে সত্যকে মিথ্যা এবং মিথ্যাকে সত্য বলা হয়।

হযরত শোয়াইব (আ.)-এর উক্তিতে এক প্রকার দাবি ছিল যে, তোমাদের ধর্মে আমরা কখনও ফিরে যেতে পারি না। এরূপ দাবি করা বাহ্যত আল্লাহর প্রতি আনুগত্যের পরিপন্থি এবং নৈকট্যশীল ও আধ্যাত্মবিদদের পক্ষে অসমীচীন। তাই পরে বলেছেন– وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا ۚ وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ۚ عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا অর্থাৎ আমরা তোমাদের ধর্মে কখনও ফিরে যেতে পারি না। অবশ্য যদি (আল্লাহ না করুন) আমাদের প্রতিপালকই আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করার ইচ্ছা করেন, তবে ভিন্ন কথা। আমাদের প্রতিপালকের জ্ঞান প্রত্যেক বস্তুকে পরিবেষ্টনকারী। আমরা তাঁর উপরই ভরসা করেছি।

এতে স্বীয় অক্ষমতা প্রকাশ করা হয়েছে এবং আল্লাহর উপর ভরসা ব্যক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ আমরা কোনো কাজ করা অথবা না করাকে কোনো সৎকাজ করা অথবা মন্দকাজ থেকে বেঁচে থাকা আল্লাহর মেহেরবানিতেই হয়ে থাকে যেমন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন– وَاللَّهِ لَوْلَا اللَّهُ مَا اهْتَدَيْنَا وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا অর্থাৎ আল্লাহর কৃপা না হলে আমরা সৎপথ পেতাম না, সদকা খয়রাত করতে পারতাম না এবং নামাজ পড়তে সক্ষম হতাম না।

জাতির অহংকারী সর্দারদের সাথে এ পর্যন্ত আলাপ-আলোচনার পর যখন হযরত শোয়াইব (আ.) বুঝতে পারলেন যে, তারা কোনো কিছুতেই প্রভাবান্বিত হচ্ছে না, তখন তাদের সাথে কথাবার্তা ছেড়ে আল্লাহ তা'আলার কাছে দোয়া করলেন– رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ অর্থাৎ হে আমাদের প্রতিপলক! আমাদের ও আমাদের জাতির মধ্যে ফয়সালা করে দিন সত্যভাবে এবং আপনি শ্রেষ্ঠতম ফয়সালাকারী। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, فَتْح শব্দের অর্থ এখানে ফয়সালা করা। এ অর্থেই فَاتِح শব্দটি قَاضِىْ অর্থাৎ বিচারক অর্থে ব্যবহৃত হয়। –[বাহরে মুহীত]

প্রকৃতপক্ষে এর মাধ্যমে হযরত শোয়াইব (আ.) স্বীয় সম্প্রদায়ের কাফেরদেরকে ধ্বংস করার দোয়া করেছিলেন। আল্লাহ তা'আলা এ দোয়া কবুল করে ভূমিকম্পের মাধ্যমে তাদেরকে ধ্বংস করে দেন।

৯০ নং আয়াতে অহংকারী সর্দারদের একটি ভ্রান্ত উক্তি উদ্ধৃত করা হয়েছে যে, তারা পরস্পর অথবা নিজ নিজ অনুসারীদেরকে বলতে লাগল : যদি তোমরা শোয়াইবের অনুসরণ কর, তবে অত্যন্ত বেওকুফ ও মূর্খ প্রতিপন্ন হবে।
–[বাহরে মুহীত]

৯১ নং আয়াতে তাদের আজাবের ঘটনা বর্ণনা করে বলা হয়েছে– فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ অর্থাৎ তাদেরকে ভীষণ ভূমিকম্প পকড়াও করল। ফলে তারা গৃহমধ্যে উপড় হয়ে পড়ে রইল।

হযরত শোয়াইব (আ.)-এর সম্প্রদায়ের আজাবকে এ আয়াতে ভূমিকম্প বলা হয়েছে। কিন্তু অন্যান্য আয়াতে فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ বলা হয়েছে। অর্থাৎ তাদেরকে ছায়া দিবসের আজাব পাকড়াও করেছে। 'ছায়া দিবসের' অর্থ এই যে, প্রথমে তাদের উপর ঘন কালো মেঘের ছায়া পতিত হয়। তারা এর নিচে একত্রিত হয়ে গেলে এ মেঘ থেকেই তাদের উপর প্রস্তর অথবা অগ্নিবৃষ্টি বর্ষণ করা হয়।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) উভয় আয়াতের সামঞ্জস্য প্রসঙ্গে বলেন, হযরত শোয়াইব (আ.)-এর সম্প্রদায়ের উপর প্রথমে এমন ভীষণ গরম চাপিয়ে দেওয়া হয়, যেন জাহান্নামের দরজা তাদের দিকে খুলে দেওয়া হয়েছিল। ফলে তাদের শ্বাস রুদ্ধ হতে থাকে। ছায়া এমনকি পানিতেও তাদের জন্য শান্তি ছিল না। তারা অসহ্য গরমে অতিষ্ঠ হয়ে ভূগর্ভস্থ কক্ষে প্রবেশ করে দেখল, সেখানে আরও বেশি গরম। অতঃপর অস্থির হয়ে জঙ্গলের দিকে ধাবিত হলো। সেখানে আল্লাহ তা'আলা একটি ঘন কালো মেঘ পাঠিয়ে দিলেন যার নিচে শীতল বাতাস বইছিল। তারা সবাই গরমে দিগ্বিদিক জ্ঞানহারা হয়ে মেঘের নিচে এসে ভিড় করল। তখন মেঘমালা আগুনে রূপান্তরিত হয়ে তাদের উপর বর্ষিত হলো এবং ভূমিকম্পও এলো। ফলে তারা সবাই ভস্মস্তূপে পরিণত হলো। এভাবে তাদের উপর ভূমিকম্প ও ছায়ার আজাব উভয়টিই আসে। –[বাহরে মুহীত]

কোনো কোনো তাফসীরবিদ বলেন, এটাও সম্ভব যে, তাদের বিভিন্ন অংশের উপর বিভিন্ন আজাব এসেছে। ফলে এক অংশ ভূমিকম্প এবং এক অংশ ছায়ার আজাবে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়েছে।

৯২ নং আয়াতে তাদের ঘটনা থেকে অন্যান্যদেরকে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, যা এ ঘটনা বর্ণনা করার আসল উদ্দেশ্য। বলা হয়েছে, الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا - غَنِىَ শব্দের এক অর্থ কোনো স্থানে আরাম-আয়েশে জীবন-যাপন করা। এখানে এ অর্থই বোঝানো হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, তারা যেসব গৃহে আরাম-আয়েশে জীবন-যাপন করত, আজাবের পর এমন অবস্থা হলো, যেন এখানে কোনো দিন আরাম-আয়েশের নাম নিশানাও ছিল না। অতঃপর বলা হয়েছে– الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا

كَانُوْا هُمُ الْخٰسِرِيْنَ অর্থাৎ যারা হযরত শোয়াইব (আ.) -কে মিথ্যা বলেছিল তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হলো। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, যারা হযরত শোয়াইব (আ.) ও তাঁর মুমিন সঙ্গীদেরকে বস্তি থেকে বহিষ্কার করার হুমকি দিত, পরিণামে ক্ষতির বোঝা তাদের ঘাড়েই চেপেছে।

৯৩ নং আয়াতে বলা হয়েছে- فَتَوَلّٰى عَنْهُمْ অর্থাৎ স্বজাতির উপর আজাব আসতে দেখে হযরত শোয়াইব (আ.) সঙ্গীদেরকে নিয়ে সেখান থেকে প্রস্থান করেন। তাফসীরবিদগণ বলেন যে, তাঁরা মক্কা মুয়াযযমায় চলে আসেন এবং শেষ পর্যন্ত এখানেই অবস্থান করেন।

জাতির চরম অবাধ্যতায় নিরাশ হয়ে হযরত শোয়াইব (আ.) বদদোয়া করেছিলেন ঠিকই কিন্তু যখন আজাব এসে গেল, তখন পয়গম্বরসুলভ দয়ার কারণে তাঁর অন্তর ব্যথিত হলো। তাই নিজের মনকে প্রবোধ দিয়ে জাতির উদ্দেশ্যে বললেন, আমি তোমাদের কাছে প্রতিপালকের নির্দেশ পৌঁছে দিয়েছিলাম এবং তোমাদের হিতাকাঙ্ক্ষায় কোনো ত্রুটি করিনি। কিন্তু আমি কাফের সম্প্রদায়ের জন্য কতটুকু কি করতে পারি?

পূর্ববর্তী নবীগণ (আ.) তাঁদের জাতিসমূহের ইতিহাস এবং তাঁদের দৃষ্টান্তসুলভ অবস্থা ও স্মরণীয় ঘটনাবলি যার বর্ণনাধারা কয়েক রুকূ পূর্বে থেকে চলে আসছে, তাতে এ পর্যন্ত পাঁচজন নবীর কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। ষষ্ঠ কাহিনীটি হযরত মূসা (আ.) এবং তাঁর সম্প্রদায় বনী ইসরাঈলের।

قوله وَمَآ اَرْسَلْنَا فِىْ قَرْيَةٍ مِّنْ نَّبِيٍّ اِلَّآ اَخَذْنَآ اَهْلَهَا الخ পূর্বেই বলা হয়েছে, কুরআনে কারীম বিশ্ব ইতিহাস এবং বিশ্বের বিভিন্ন জাতির অবস্থা বর্ণনা করে। কিন্তু তার বর্ণনারীতি হলো এই যে, তাতে সাধারণ ইতিহাসগ্রন্থ কিংবা গল্প উপন্যাসের মতো আলোচ্য বিষয়ের সবিস্তার বর্ণনা না করে; বরং স্থান ও কালের উপযোগিতা অনুসারে ইতিহাস ও গল্প কাহিনীর অংশবিশেষ তুলে ধরা হয়। সে সঙ্গে আলোচ্য কাহিনীতে প্রাপ্ত নিদর্শনমূলক ফলাফল সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়। এ নিয়ম অনুযায়ী সে পাঁচটি কাহিনী বর্ণনার পর এখানে কিছু সতর্কতামূলক প্রসঙ্গ আলোচনা করা হয়েছে।

৯৪ নং আয়াতে বলা হয়েছে যে, হযরত নূহ (আ.)-এর সম্প্রদায় এবং 'আদ' ও 'ছামূদ' জাতিকে যেসব ঘটনার সম্মুখীন হতে হয়েছিল, তা শুধুমাত্র তাদের সাথেই এককভাবে সম্পৃক্ত নয়; বরং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন স্বীয় রীতি অনুযায়ী দুনিয়ার বিভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট জাতি সম্প্রদায়ের সংশোধন ও কল্যাণ সাধনকল্পে যেসব নবী-রাসূল প্রেরণ করেন তাঁদের আদেশ উপদেশের প্রতি যারা মনোনিবেশ করে না প্রথমে তাদেরকে পার্থিব বিপদাপদের সম্মুখীন করা হয়, যাতে এই বিপদের চাপে তারা নিজেদের গতিকে আল্লাহ তা'আলার প্রতি পরিবর্তিত করে নিতে পারে। কারণ প্রকৃতিগতভাবেই মানুষের মনে বিপদাপদের মুখেই আল্লাহর কথা স্মরণ হয় বেশি। আর এই বাহ্যিক দুঃখকষ্ট প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ রাহমানুর রাহীমেরই দান। উল্লিখিত আয়াতে قوله اَخَذْنَآ اَهْلَهَا بِالْبَأْسَآءِ وَالضَّرَّآءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُوْنَ বাক্যটির মর্মও তাই। بَأْسَاء ও بُؤْس শব্দ দুটির অর্থ দারিদ্র্য ও ক্ষুধা। আর ضَرَّاء ও ضَرّ শব্দদ্বয়ের অর্থ হলো রোগ ও ব্যাধি। কুরআন মাজীদের বিভিন্ন স্থানে উল্লিখিত অর্থেই শব্দগুলো ব্যবহৃত হয়েছে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)ও এ অর্থই বর্ণনা করেছেন। কোনো কোনো অভিধানবিদ অবশ্য بَأْسَاء ও بُؤْس শব্দ দুটির অর্থ আর্থিক ক্ষতি এবং ضَرَّاء ও ضَرّ অর্থ শারীরিক বা স্বাস্থ্যগত ক্ষতি বলে উল্লেখ করেছেন। মূলত উভয় অর্থেরই মর্ম এক।

আয়াতটির মর্ম হচ্ছে এই যে, যখনই আমি কোনো জাতি বা সম্প্রদায়ের প্রতি রাসূল প্রেরণ করি এবং সে জাতি তাঁদের কথা অমান্য করে, তখন আমার রীতি হলো, প্রথমে সে অবাধ্য লোকগুলোকে পৃথিবীতেই অর্থনৈতিক ও শারীরিক ক্ষতি আর রোগ-ব্যাধির সম্মুখীন করে দেওয়া যাতে পরিণতির প্রতি লক্ষ্য করে আল্লাহর দিকে ফিরে আসে। পরবর্তী আয়াতে ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتّٰى عَفَوْا এখানে سَيِّئَة শব্দে পূর্বোল্লিখিত দারিদ্র্য, ক্ষুধা ও রোগ-ব্যাধির দুরবস্থাই উদ্দেশ্য করা হয়েছে। আর حَسَنَة শব্দে উদ্দেশ্য করা হয়েছে দারিদ্র্য, ক্ষুধা ও রোগ-ব্যাধির বিপরীত দিক, ধনসম্পদের বিস্তৃতি ও সচ্ছলতা এবং সুস্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা। পরবর্তী عَفَوْا শব্দটি عَفْرٌ থেকে উদ্ভূত। এর একটি অর্থ হয় প্রবৃদ্ধি ও উন্নতি লাভ করা।

সারমর্ম এই যে, প্রথম পরীক্ষাটি নেওয়া হয়েছে তাদেরকে দারিদ্র্য, ক্ষুধা এবং রোগ-ব্যাধির সম্মুখীন করে। তারা যখন তাতে অকৃতকার্য হয়েছে আল্লাহ তা'আলার প্রতি ফিরে আসেনি, তখন দ্বিতীয় পরীক্ষাটি নেওয়া হয় দারিদ্র্য, ক্ষুধা ও রোগ-ব্যাধির পরিবর্তে তাদের ধনসম্পদের প্রবৃদ্ধি এবং সুস্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা দানের মাধ্যমে। তাতে তারা যথেষ্ট উন্নত লাভ করে

www.almodina.com

এবং অনেক গুণ বেড়ে যায়। এ পরীক্ষার উদ্দেশ্য ছিল যাতে তারা দুঃখকষ্টের পরে সুখ ও সমৃদ্ধি প্রাপ্তির ফলে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে এবং এভাবে যেন আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত পথে ফিরে আসে। কিন্তু কর্মবিমুখ, শৈথিল্যপরায়ণের দল তাতেও সতর্ক হয়নি; বরং বলতে শুরু করে দেয় যে, এটা কোনো নতুন বিষয় নয়, সৎ কিংবা অসৎ কর্মের পরিণতিও নয়; বরং প্রকৃতির নিয়মই তাই, কখনও সুখ কখনও দুঃখ, কখনও রোগ কখনও স্বাস্থ্য কখনও দারিদ্র্য কখনও সচ্ছলতা –এমনই হয়ে থাকে। আমাদের পিতা পিতামহ প্রমুখ পূর্বপুরুষদেরকেও এমনি সব অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়েছে। আর তখনই ধরা পড়ল আকস্মিক আজাবের মধ্যে। فَاَخَذْنٰهُمْ بَغْتَةً وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ (বাগতাতান) হঠাৎ সহসা বা অকস্মাৎ। তার অর্থ যখন তারা উভয় পরীক্ষা এতই অকৃতকার্য হয়ে গেল এবং সতর্ক হলো না, তখন আমি তাদেরকে আকস্মিক আজাবের মাধ্যমে ধরে ফেললাম এবং এ ব্যাপারে তাদের কোনো খবরই ছিল না।

শব্দ বিশ্লেষণ

لَنُخْرِجَنَّ : সীগাহ جمع متكلم বহছ فعل مستقبل معروف در لام تاكيد بانون تاكيد ثقيله বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِخْرَاجُ মূলবর্ণ (خ . ر . ج) জিনস صحيح অর্থ– অবশ্যই অবশ্যই আমরা বের করে দিব।

لَتَعُوْدُنَّ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ فعل مستقبل معروف در لام تاكيد بانون تاكيد ثقيله বাব نَصَرَ মাসদার اَلْعَوْدُ মূলবর্ণ (ع . و . د) জিনস اجوف واوى অর্থ– অবশ্যই অবশ্যই তোমরা ফিরে আসবে।

نَجّٰنَا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ اثبات فعل ماضى معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّنْجِيَةُ মূলবর্ণ (ن . ج . و) জিনস ناقص واوى অর্থ– তিনি উদ্ধার করেছেন।

يَشَآءُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ اثبات فعل مضارع معروف বাব فَتَحَ মাসদার اَلْمَشِيْئَةُ মূলবর্ণ (ش . ى . ء) জিনস মুরাক্কাব مهموز لام ও اجوف يائى অর্থ– সে চাচ্ছে, সে চাইবে।

جٰثِمِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব نَصَرَ মাসদার اَلْجُثُوْمُ মূলবর্ণ (ج . ث . م) জিনস صحيح অর্থ– উপুড় করে, অধঃমুখে।

يَضَّرَّعُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ اثبات فعل مضارع معروف বাব اِفَّعُّلٌ মাসদার اَلْاِضَّرُّعُ মূলবর্ণ (ض . ر . ع) জিনস صحيح অর্থ– তারা কাকুতি-মিনতি করছে।

وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْقُرٰٓى اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكٰتٍ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ وَلٰكِنْ كَذَّبُوْا فَاَخَذْنٰهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ (٩٦)

অনুবাদ : (৯৬) আর যদি এ সমস্ত জনপদের অধিবাসীরা ঈমান আনত এবং তাকওয়া অবলম্বন করত, তবে আমি তো তাদের জন্য আসমান ও জমিনের বরকতসমূহ উন্মুক্ত করে দিতাম, কিন্তু তারা তো [পয়গম্বরদেরকে] মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করল, অতএব, আমি তাদের কৃতকর্মের দরুন তাদেরকে ধৃত করলাম।

اَفَاَمِنَ اَهْلُ الْقُرٰٓى اَنْ يَّاْتِيَهُمْ بَاْسُنَا بَيَاتًا وَّهُمْ نَآئِمُوْنَ (٩٧)

(৯৭) তবে কি এই জনপদের অধিবাসীরা এ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হয়ে পড়েছে যে, তাদের উপর আমার আজাব রাত্রিকালে আপতিত হয়– যখন তারা নিদ্রিত থাকে?

اَوَ اَمِنَ اَهْلُ الْقُرٰٓى اَنْ يَّاْتِيَهُمْ بَاْسُنَا ضُحًى وَّهُمْ يَلْعَبُوْنَ (٩٨)

(৯৮) আর এই জনপদের অধিবাসীরা কি এ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হয়ে পড়েছে যে, তাদের উপর আমার আজাব দিন দুপুরেই আপতিত হয়, যখন তারা ক্রীড়া-কৌতুকে মগ্ন থাকে?

اَفَاَمِنُوْا مَكْرَ اللّٰهِ ۚ فَلَا يَاْمَنُ مَكْرَ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمُ الْخٰسِرُوْنَ (٩٩)

(৯৯) হ্যাঁ, তবে কি তারা আল্লাহর এই পাকড়াও হতে নিশ্চিন্ত হয়ে পড়েছে? বস্তুতঃ আল্লাহর পাকড়াও হতে কেউই নিশ্চিন্ত হয় না ঐ সকল লোক ব্যতীত যাদের দুর্গতিই উপস্থিত হয়েছে।

اَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِيْنَ يَرِثُوْنَ الْاَرْضَ مِنْۢ بَعْدِ اَهْلِهَآ اَنْ لَّوْ نَشَآءُ اَصَبْنٰهُمْ بِذُنُوْبِهِمْ ۚ وَنَطْبَعُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُوْنَ (١٠٠)

(১০০) আর ভূপৃষ্ঠের সেই অধিবাসীদের পর যারা তাদের স্থলে ভূপৃষ্ঠে [এখন] বাস করছে, তাদেরকে কি উক্ত ঘটনাবলি এই শিক্ষা দেয় না যে, যদি আমি ইচ্ছা করতাম, তবে তাদেরকে [-ও] তাদের গুনাহর দরুন ধ্বংস করে দিতাম, আর আমি তাদের অন্তরসমূহের উপর মোহর করে রেখেছি, অতএব, তারা শুনতে পায় না।

শাব্দিক অনুবাদ

(৯৬) وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْقُرٰٓى اٰمَنُوْا আর যদি এ সমস্ত জনপদের অধিবাসীরা ঈমান আনত وَاتَّقَوْا এবং তাকওয়া অবলম্বন করত لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ তবে আমি তো তাদের জন্য উন্মুক্ত করে দিতাম بَرَكٰتٍ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ আসমান ও জমিনের বরকতসমূহ وَلٰكِنْ كَذَّبُوْا কিন্তু তারা তো [পয়গম্বরদেরকে] মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করল فَاَخَذْنٰهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ অতএব, আমি তাদের কৃতকর্মের দরুন তাদেরকে ধৃত করলাম।

(৯৭) اَفَاَمِنَ اَهْلُ الْقُرٰٓى তবুও কি এই জনপদের অধিবাসীরা এ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হয়ে পড়েছে যে اَنْ يَّاْتِيَهُمْ بَاْسُنَا بَيَاتًا তাদের উপর আমার আজাব রাত্রিকালে আপতিত হয়– وَّهُمْ نَآئِمُوْنَ যখন তারা নিদ্রিত থাকে?

(৯৮) اَوَ اَمِنَ اَهْلُ الْقُرٰٓى আর এই জনপদের অধিবাসীরা কি এ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হয়ে পড়েছে যে اَنْ يَّاْتِيَهُمْ بَاْسُنَا ضُحًى তাদের উপর আমার আজাব দিন দুপুরেই আপতিত হয় وَّهُمْ يَلْعَبُوْنَ যখন তারা ক্রীড়া-কৌতুকে মগ্ন থাকে?

(৯৯) اَفَاَمِنُوْا مَكْرَ اللّٰهِ হ্যাঁ, তবে কি তারা আল্লাহর এই পাকড়াও হতে নিশ্চিন্ত হয়ে পড়েছে فَلَا يَاْمَنُ مَكْرَ اللّٰهِ বস্তুতঃ আল্লাহর পাকড়াও হতে কেউই নিশ্চিন্ত হয় না اِلَّا الْقَوْمُ الْخٰسِرُوْنَ ঐ সকল লোক ব্যতীত যাদের দুর্গতিই উপস্থিত হয়েছে।

(১০০) اَوَلَمْ يَهْدِ আর তাদেরকে কি উক্ত ঘটনাবলি এই শিক্ষা দেয় না যে لِلَّذِيْنَ يَرِثُوْنَ الْاَرْضَ مِنْۢ بَعْدِ اَهْلِهَآ ভূপৃষ্ঠের সেই অধিবাসীদের পর যারা তাদের স্থলে ভূপৃষ্ঠে [এখন] বাস করছে اَنْ لَّوْ نَشَآءُ যদি আমি ইচ্ছা করতাম اَصَبْنٰهُمْ بِذُنُوْبِهِمْ তবে তাদেরকে [-ও] তাদের গুনাহর দরুন ধ্বংস করে দিতাম وَنَطْبَعُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ আর আমি তাদের অন্তরসমূহের উপর মোহর করে রেখেছি فَهُمْ لَا يَسْمَعُوْنَ অতএব, তারা শুনতে পায় না।

অনুবাদ	আয়াত
অনুবাদ : (১০১) এ সমস্ত জনপদের কিছু কিছু ঘটনাবলি আমি আপনার নিকট বর্ণনা করছি, আর যে সকল লোকদের নিকট তাদের নবীগণ মু'জিযাসহ উপস্থিত হয়েছিলেন, অনন্তর তারা যে বিষয়টিকে প্রথমে বলেছিল, অতঃপর এরূপ হলো যে, তারা তা মেনে নিত, আল্লাহ তা'আলা এরূপে কাফেরদের অন্তরসমূহে মোহর মেরে দেন।	تِلْكَ الْقُرٰى نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ اَنْۢبَآئِهَا ۚ وَلَقَدْ جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ ۚ فَمَا كَانُوْا لِيُؤْمِنُوْا بِمَا كَذَّبُوْا مِنْ قَبْلُ ؕ كَذٰلِكَ يَطْبَعُ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِ الْكٰفِرِيْنَ (١٠١)
(১০২) আর তাদের অধিকাংশের মধ্যে আমি অঙ্গীকার পালনকারী দেখিনি, এবং আমি তাদের অধিকাংশকে নাফরমানই পেয়েছি।	وَمَا وَجَدْنَا لِاَكْثَرِهِمْ مِّنْ عَهْدٍ ۚ وَاِنْ وَّجَدْنَآ اَكْثَرَهُمْ لَفٰسِقِيْنَ (١٠٢)
(১০৩) অতঃপর আমি তাঁদের পর মূসাকে স্বীয় প্রমাণসমূহ দিয়ে ফেরাউন এবং তার প্রধানবর্গের নিকট প্রেরণ করেছি, সুতরাং তারা মোটেই তার হক আদায় করেনি, অতএব, দেখুন,সেই ফ্যাসাদকারীদের কি পরিণাম হলো।	ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْۢ بَعْدِهِمْ مُّوْسٰى بِاٰيٰتِنَآ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَا۟ئِهٖ فَظَلَمُوْا بِهَا ۚ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِيْنَ (١٠٣)
(১০৪) আর মূসা বললেন, হে ফেরাউন! আমি সকল জাহানের প্রতিপালকের পক্ষ হতে পয়গম্বর।	وَقَالَ مُوْسٰى يٰفِرْعَوْنُ اِنِّیْ رَسُوْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ (١٠٤)

শাব্দিক অনুবাদ

(১০১) تِلْكَ الْقُرٰى এ সমস্ত জনপদের نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ اَنْۢبَآئِهَا কিছু কিছু ঘটনাবলি আমি আপনার নিকট বর্ণনা করছি وَلَقَدْ جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ আর যে সকল লোকদের নিকট তাদের নবীগণ মু'জিযাসহ উপস্থিত হয়েছিলেন। فَمَا كَانُوْا لِيُؤْمِنُوْا بِمَا كَذَّبُوْا مِنْ قَبْلُ অনন্তর তারা যে বিষয়টিকে প্রথমে বলেছিল অতঃপর এরূপ হলো যে, তারা তা মেনে নিত كَذٰلِكَ يَطْبَعُ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِ الْكٰفِرِيْنَ আল্লাহ তা'আলা এরূপে কাফেরদের অন্তরসমূহে মোহর মেরে দেন।

(১০২) وَمَا وَجَدْنَا لِاَكْثَرِهِمْ مِّنْ عَهْدٍ আর তাদের অধিকাংশের মধ্যে আমি অঙ্গীকার পালনকারী দেখিনি وَاِنْ وَّجَدْنَآ اَكْثَرَهُمْ لَفٰسِقِيْنَ এবং আমি তাদের অধিকাংশকে নাফরমানই পেয়েছি।

(১০৩) ثُمَّ بَعَثْنَا অতঃপর আমি প্রেরণ করেছি مِنْۢ بَعْدِهِمْ مُّوْسٰى তাঁদের পর মূসাকে بِاٰيٰتِنَآ স্বীয় প্রমাণসমূহ দিয়ে اِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَا۟ئِهٖ ফেরাউন এবং তার প্রধানবর্গের নিকট فَظَلَمُوْا بِهَا সুতরাং তারা মোটেই তার হক আদায় করেনি فَانْظُرْ অতএব, দেখুন كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِيْنَ সেই ফ্যাসাদকারীদের কি পরিণাম হলো।

(১০৪) وَقَالَ مُوْسٰى আর মূসা বললেন يٰفِرْعَوْنُ হে ফেরাউন! اِنِّیْ رَسُوْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ আমি সকল জাহানের প্রতিপালকের পক্ষ হতে পয়গম্বর।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْقُرٰۤى اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكٰتٍ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ وَلٰكِنْ كَذَّبُوْا فَاَخَذْنٰهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ অর্থাৎ সে জনপদের অধিবাসীরা যদি ঈমান আনত এবং নাফরমানি থেকে বিরত থাকত তাহলে আমি তাদের জন্য আসমান ও জমিনের সমস্ত বরকতের দ্বার উন্মুক্ত করে দিতাম। কিন্তু তারা যখন মিথ্যারোপ করেছে, তখন আমি তাদেরকে তাদেরই কৃতকর্মের দরুন পাকড়াও করেছি।

বরকতের শাব্দিক অর্থ প্রবৃদ্ধি। আসমান ও জমিনের সমস্ত বরকত খুলে দেওয়া বলতে উদ্দেশ্য হলো সব রকম কল্যাণ সর্বদিক থেকে খুলে দেওয়া। অর্থাৎ তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী সঠিক সময়ে আসমান থেকে বৃষ্টি বর্ষিত হতো আর জমিন থেকে যে কোনো বস্তু তাদের মনমতো উৎপাদিত হতো এবং অতঃপর সেসব বস্তু দ্বারা তাদের লাভবান হওয়ার এবং সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করে দেওয়া হতো। তাতে তাদেরকে এমন কোনো চিন্তাভাবনা কিংবা টানাপড়নের সম্মুখীন হতে হতো না, যার দরুন বড় বড় নিয়ামতও পঙ্কিলতাপূর্ণ হয়ে পড়ে। ফলে তাদের প্রতিটি বিষয়ে বরকত প্রবৃদ্ধি ঘটত।

পৃথিবীতে বরকতের বিকাশ ঘটে দু'রকম। কখনও মূল বস্তুটি প্রকৃতভাবেই বেড়ে যায়। যেমন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মু'জিযাসমূহের মধ্যে রয়েছে, একটি সাধারণ পাত্রের পানি দ্বারা গোটা কাফেলার পরিতৃপ্ত হওয়া। কিংবা সামান্য খাদ্যদ্রব্যে বিরাট সমাবেশের পূর্ণোদর খাওয়া ও যা সঠিক ও বিশুদ্ধ রেওয়ায়েতে বর্ণিত রয়েছে। আবার কোনো কোনো সময় মূল বস্তুতে বাহ্যত কোনো বরকত বা প্রবৃদ্ধি যদিও হয় না, পারিমাণ যা ছিল তাই থেকে যায়, কিন্তু তার দ্বারা এত বেশি কাজ হয় যা এমন দ্বিগুণ-চতুর্গুণ বস্তুর দ্বারাও সাধারণত সম্ভব হয় না। তাছাড়া সাধারণভাবেও দেখা যায়, কোনো একটা পাত্র, কাপড়চোপড় কিংবা ঘরদোর অথবা ঘরের অন্য কোনো আসবাবপত্র এমন বরকতময় হয় যে, মানুষ তাতে আজীবন উপকৃত হওয়ার পরেও তা তেমনি বিদ্যমান থেকে যায়। পক্ষান্তরে অনেক জিনিস তৈরি করার সময়ই ভেঙ্গে বিনষ্ট হয়ে যায়। কিংবা অটুট থাকলেও তার দ্বারা উপকার লাভের কোনো সুযোগ আসে না। অথবা উপকারে আসলেও তাতে পারিপূর্ণ উপকৃত হওয়া সম্ভব হয়ে উঠে না।

এই বরকত মানুষের ধনসম্পদেও হতে পারে, মন-মস্তিষ্কেও হতে পারে। আবার কাজকর্মেও হতে পারে। কোনো কোনো সময় মাত্র একগ্রাস খাদ্যও মানুষের জন্য পূর্ণশক্তি-সামর্থ্যের কারণ হয়। আবার কোনো কোনো সময় অতি উত্তম পুষ্টিকর খাদ্যদ্রব্য বা ঔষধও কোনো কাজে আসে না। তেমনিভাবে কোনো সময়ের মধ্যে বরকত হলে মাত্র এক ঘণ্টা সময়ে এত অধিক কাজ করা যায়, যা অন্য সময় চার ঘণ্টায়ও করা যায় না। বস্তুত এসব ক্ষেত্রে পরিমাণের দিক দিয়ে সম্পদ বা সময় বাড়ে না সত্য কিন্তু এমনি বরকত তাতে প্রকাশ পায় যাতে কাজ হয় বহুগুণ বেশি।

এ আয়াতের দ্বারা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, আসমান ও জমিনের সমস্ত সৃষ্টি ও বস্তুরাজির বরকত ঈমান ও পরহেজগারির উপর নির্ভরশীল । ঈমান ও পরহেজগারির পথ অবলম্বন করলে আখেরাতের মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে দুনিয়ার কল্যাণ এবং বরকতও লাভ হয়। পক্ষান্তরে ঈমান ও পরহেজগারি পরিহার করলে সেগুলোর কল্যাণ ও বরকত থেকে বঞ্চিত হতে হয়। বর্তমান বিশ্বের যে অবস্থা সেদিকে লক্ষ্য করলে বিষয়টি বাস্তব সত্য হয়ে সামনে এসে যায়। এখন বাহ্যিক দিক দিয়ে জমির উৎপাদন পূর্বের তুলনায় অনেক বেশি। তাছাড়া ব্যবহার্য দ্রব্যাদির আধিক্য এবং নতুন নতুন আবিষ্কার এত বেশি যা পূর্ববর্তী বংশধরেরা ধারণা বা কল্পনাও করতে পারত না। কিন্তু এ সমুদয় বস্তু উপকরণের প্রাচুর্য্য ও আধিক্য সত্ত্বেও আজকের মানুষকে নিতান্তই হতবুদ্ধি রুগ্ণ ও দারিদ্র্য-পীড়িত দেখা যায়। সুখ ও শান্তি কিংবা মানসিক প্রশান্তির অস্তিত্ব কোথাও নেই। এর কারণ এছাড়া আর কি বলা যায় যে, উপকরণ সবই বর্তমান এবং প্রচুর পরিমাণেই বর্তমান, কিন্তু এ সবের বরকত শেষ হয়ে গেছে।

اَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِيْنَ يَرِثُوْنَ الْاَرْضَ مِنْ بَعْدِ اَهْلِهَاۤ اَنْ لَّوْ نَشَآءُ اَصَبْنٰهُمْ بِذُنُوْبِهِمْ আয়াতে يَهْدِىْ، هَدٰى অর্থ চিহ্নিতকরণ এবং বাতলে দেওয়া। এখানে এর কর্তা হলো সে সমস্ত ঘটনাবলি যা উপরে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ বর্তমান যুগের লোকেরা যারা অতীত জাতিসমূহের ধ্বংসের পরে তাদের ভূসম্পত্তি ও ঘরবাড়ির উত্তরাধিকারী হয়েছে, কিংবা পরে হবে, তাদেরকে শিক্ষণীয় সেসব অতীত ঘটনাবলি একথা বাতলে দেয়নি যে, কুফরি ও অস্বীকৃতি এবং আল্লাহর বিধানের বিরোধিতার পরিণতিতে যেভাবে তাদের পূর্বপুরুষরা (অর্থাৎ বিগত জাতিসমূহ) ধ্বংস ও বিধ্বস্ত হয়ে গেছে। তেমনিভাবে তারাও যদি অনুরূপ অপরাধে লিপ্ত থাকে তাহলে তাদের উপরও আল্লাহ তা'আলার আজাব ও গজব আসতে পারে।

অতঃপর বলা হয়েছে– وَنَطْبَعُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُوْنَ - طَبْع শব্দের অর্থ ছাপ এবং মোহর লাগানো । তার মানে, এরা অতীত ঘটনাবলি থেকেও কোনো রকম শিক্ষা গ্রহণ করে না। ফলে আল্লাহর গজবের দরুন তাদের অন্তরে মোহর এঁটে যায়; তারা তখন কিছু শুনতে পায় না। হাদীসে মহানবী ﷺ ইরশাদ করেছেন যে, কোনো লোক যখন প্রথম প্রথম পাপ কাজ করে, তখন তার অন্তরে কালির একটা বিন্দু লেগে যায়। দ্বিতীয়বার পাপ করলে দ্বিতীয় বিন্দু লাগে আর তৃতীয়বার পাপ করলে তৃতীয় বিন্দুটি লেগে যায়। এমনকি সে যদি অনবরত পাপের পথে অগ্রসর হতে থাক, তওবা না করে , তাহলে এই

কালির বিন্দু তার সমগ্র অন্তরকে ঘিরে ফেলে ও মানুষের অন্তরে ভালো মন্দকে চেনার এবং মন্দ থেকে বেঁচে থাকার জন্য আল্লাহ তা'আলা যে স্বাভাবিক যোগ্যতাটি দিয়ে রেখেছেন, তা হয় নিঃশেষিত, না হয় পরাভূত হয়ে যায়। আর তখন তার ফল দাঁড়ায় এই যে, সে ভালোকে মন্দ, মন্দকে ভালো এবং ইষ্টকে অনিষ্ট, অনিষ্টকে ইষ্ট বলে ধারণা করতে আরম্ভ করে। এ অবস্থানটিকেই কুরআনে رَانَ অর্থাৎ অন্তরের মরচে বলে অভিহিত করা হয়েছে । আর এ অবস্থার সর্বশেষ পরিণতিকেই আলোচ্য আয়াতে এবং আরও বহু আয়াতে طَبْع অর্থাৎ মোহর এঁটে দেওয়া হয় বলা হয়েছে।

এখানে লক্ষণীয় যে, মোহর লেগে যাওয়ার পরিণতি তো জ্ঞান-বুদ্ধির সম্পূর্ণ বিলুপ্তি– কানের দ্বারা শ্রবণের উপর তো তার কোনো প্রতিক্রিয়া স্বভাবত হওয়ার কথা নয়। কাজেই উক্ত আয়াতের এ স্থানটিতে فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ অর্থাৎ 'তারা বুঝে না।' বলাই সমীচীন ছিল। কিন্তু কুরআনে কারীমে এ ক্ষেত্রে বলা হয়েছে– فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ অর্থাৎ তারা শুনে না। এর কারণ হলো এই যে, এখানে শোনা অর্থ মান্য করা এবং অনুসরণ করা, যা বুঝা বা উপলব্ধি করারই ফল। কাজেই প্রকৃত মর্ম দাঁড়ায় এই যে, অন্তরে মোহর এঁটে যাবার দারুন তারা কোনো সত্য ও ন্যায় বিষয়কে মেনে নিতে উদ্বুদ্ধ হয় না। তাছাড়া এও বলা যেতে পারে যে, মানুষের অন্তর হলো তার সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও অনুভূতিসমূহের কেন্দ্র। অন্তরের ক্রিয়ায় যখন কোনো রকম গোলযোগ দেখা দেয়, তখন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের যাবতীয় কার্যকলাপও গোলযোগপূর্ণ হয়ে যায়। অন্তরে যখন কোনো বিষয়ের ভালো কিংবা মন্দ বদ্ধমূল হয়ে যায়, তখন চোখেও তাই দেখা যায় এবং কানেও তাই শোনা যায়।

تِلْكَ الْقُرٰى نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ اَنْۢبَآئِهَا আয়াতে اَنْبَاءُ শব্দটি نَبَأٌ-এর বহুবচন। যার অর্থ– কোনো গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ। অর্থাৎ বিধ্বস্ত জনপদসমূহের কোনো কোনো ঘটনা আপনাকে বলছি। এখানে مِنْ বিশেষণের মাধ্যমে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, অতীত জাতিসমূহের যে ঘটনাবলি আলেচনা করা হলো, এগুলোই শেষ নয়; বরং এমন হাজারো ঘটনার মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা মাত্র।

অতঃপর বলা হয়েছে– وَلَقَدْ جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَمَا كَانُوْا لِيُؤْمِنُوْا بِمَا كَذَّبُوْا مِنْ قَبْلُ অর্থাৎ এসব লোকদের প্রতি প্রেরিত নবী ও রাসূলগণ তাদের কাছে মু'জিযা (অলৌকিক নিদর্শন) সমূহ নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন, যার দ্বারা সত্য ও মিথ্যার মীমাংসা হয়ে যায়, কিন্তু তাদেব একগুঁয়েমি ও হঠকারিতার এমনি অবস্থা ছিল যে, সে বিষয় সম্পর্কে একবার তাদের মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়তো যে এটা ভুল এবং মিথ্যা, তখন আর সে বিষয়ের যথার্থতা ও সত্যতার পক্ষে যতই মু'জিযা এবং দলিল প্রমাণ উপস্থিত হোক না কেন, কিছুতেই তারা আর তাকে বিশ্বাস ও স্বীকার করতে উদ্বুদ্ধ হতো না।

এ আয়াতের দ্বারা একটা বিষয় জানা গেল যে, সমস্ত নবী রাসূলকেই মু'জিযা দান করা হয়েছে। সেগুলোর মধ্যে কোনো নবী (আ.)-এর মু'জিযার আলোচনা কুরআনে এসেছে, অনেকের আসেওনি। এতে এমন কোনো ধারণা করা যথার্থ হতে পারে না যে, যাদের মু'জিযার বিষয় কুরআনে আলোচিত হয়নি , আদৌ তাদের কোনো মু'জিযাই ছিল না। আর সূরা হূদ এ হযরত হূদ (আ.)-এর সম্প্রদায়ের যে উক্তি উল্লেখ করা হয়েছে যে, مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ অর্থাৎ 'আপনি কোনো মু'জিযা উপস্থিত করেননি' এ আয়াত দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, তাদের এ উক্তিটি ছিল শুধুমাত্র হঠকারিতা ও একগুঁয়েমি বশত কিংবা তাঁর মু'জিযাগুলোকে তারা তুচ্ছ জ্ঞান করে একথা বলেছিল।

এখানে আরেকটি বিষয় লক্ষণীয় যে, এ আয়াতে তাদের সে অবস্থার কথা বলা হয়েছে যে, কোনো ভুল কথা মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেলে তারা তাই পালন করত; তার বিপরীতে যতই প্রকৃষ্ট দলিল-প্রমাণ আসুক না কেন তারা নিজেদের ধ্যানধারণা থেকে ফিরত না। আল্লাহর অস্তিত্বে অবিশ্বাসী ও কাফের জাতিসমূহের এমনি অবস্থা। বহু মুসলমান এমনকি আলেম ওলামা এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গও এ ব্যাধিতে ভুগছেন। প্রথম ধাক্কায় একবার কোনো বিষয়কে মিথ্যা বা ভুল বলে উচ্চারণ করে ফেললে পরে বিষয়টির সত্যতার হাজারো প্রমাণ উপস্থাপিত হলেও তাঁরা নিজেদের সে ধারণাই অনুসরণ করতে থাকেন। সূফীতত্ত্ব মতে এ অবস্থাটি আল্লাহর গজবের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

অতঃপর বলা হয়েছে كَذٰلِكَ يَطْبَعُ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِ الْكٰفِرِيْنَ অর্থাৎ যেভাবে তাদের অন্তরে মোহর এঁটে দেওয়া হয়েছে, তেমনিভাবে সাধারণ কাফের ও নাস্তিকদের অন্তরেও আল্লাহ মোহর এঁটে দিয়ে থাকেন। যাতে সততা বা নেকী অবলম্বনের যোগ্যতা অবশিষ্ট থাকে না।

তারপর বলা হয়েছে– وَإِنْ وَجَدْنَآ أَكْثَرَهُمْ لَفٰسِقِيْنَ অর্থাৎ আমি তাদের অধিকাংশকে শ্রদ্ধা ও আনুগত্য থেকে বিমুখ পেয়েছি। এ পর্যন্ত বিগত নবী রাসূলগণ এবং তাঁদের জাতি সম্প্রদায়ের পাঁচটি ঘটনা বিবৃত করার মাধ্যমে বর্তমান উম্মতকে সেগুলো থেকে শিক্ষা গ্রহণের তাগিদ দেওয়া হয়েছে।

অতঃপর ষষ্ঠ ঘটনাটি তে হযরত মূসা (আ.) সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। এতে প্রসঙ্গক্রমে বহু হুকুম-আহকাম, মাসআলা-মাসায়েল এবং শিক্ষা ও উপদেশ সংক্রান্ত বিচিত্র বিষয় রয়েছে সেজন্যই কুরআনে কারীমে এ ঘটনার অংশবিশেষ বার বার পূনরাবৃত হয়েছে।

قوله ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُّوْسٰى بِاٰيٰتِنَآ اِلٰى فِرْعَوْنَ الخ এ- সূরা নবী-রাসূলগণ এবং তাদের জাতি ও সম্প্রদায় সম্পর্কে যত কাহিনী ও ঘটনাবলি আলোচনা করা হয়েছে, এটা হলো সেগুলোর মধ্যে ষষ্ঠ কাহিনী। এখানে এ কাহিনীটি বেশি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করার কারণ এই যে, হযরত মূসা (আ.)-এর মু'জিযাসমূহ বিগত অন্যান্য নবী রাসূলগণের তুলনায় যেমন সংখ্যায় বেশি তেমনিভাবে প্রকাশের বলিষ্ঠতার দিক দিয়েও অধিক। এমনিভাবে তাঁর সম্প্রদায় বনী ইসরাঈলের মূর্খতা এবং হঠকারিতাও বিগত উম্মত বা জাতিসমূহের তুলনায় বেশি কঠিন। তদুপরি এই কাহিনীর আলোচনা প্রসঙ্গে বহু জ্ঞাতব্য বিষয় ও হুকুম আহকামের কথা এসেছে।

১০৩ নং আয়াতে ইরশাদ হয়েছে যে, তাঁদের পরে অর্থাৎ হযরত নূহ, হুদ, সালেহ, লূত ও শোয়াইব (আ.)-এর বা তাঁদের জাতি ও সম্প্রদায়ের পরে আমি মূসা (আ.)-কে আমার নিদর্শনসহ ফেরাউন ও তার জাতির প্রতি পাঠিয়েছি। নিদর্শন বা আয়াত বলতে আসমানি কিতাব তাওরাতের আয়াতও হতে পারে, কিংবা হযরত মূসা (আ.)-এর মু'জিযাসমূহও হতে পারে। আর সে যুগে ফেরাউন হতো মিসরের সম্রাটের খেতাব। হযরত মূসা (আ.)-এর সময়ে যে ফেরাউন ছিল তাঁর নাম কাবুস বলে উল্লেখ করা হয়। –[কুরতুবী]

فَظَلَمُوْا بِهَا এর যে সর্বনাম তার লক্ষ্য হলো নিদর্শন। অর্থাৎ তারা আয়াত বা নির্দশনসমূহের প্রতি জুলুম করেছে। আর আল্লাহর আয়াত ও নিদর্শনের প্রতি জুলুম করার অর্থ হলো এই যে, আল্লাহ তা'আলার আয়াতে বা নিদর্শনের কোনো মর্যাদা বুঝেনি। সেগুলোর শুকরিয়া আদায় করার পরিবর্তে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছে এবং ঈমানের পরিবর্তে কুফরি অবলম্বন করেছে। কারণ জুলুম-এর প্রকৃত সংজ্ঞা হচ্ছে কোনো বস্তু বা বিষয়কে তার সঠিক স্থান কিংবা সঠিক সময়ের বিপরীত ব্যবহার করা।

অতঃপর বলা হয়েছে– فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِيْنَ অর্থাৎ চেয়ে দেখ না, সেই দাঙ্গা-ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারীদের কি পরিণতি ঘটেছে। এর মর্মার্থ এই যে, ওদের দুষ্কর্মের অশুভ পরিণতি সম্পর্কে চিন্তা কর এবং তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ কর।

শব্দ বিশ্লেষণ

اِتَّقَوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ اثبات فعل ماضى معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِتِّقَاءُ মূলবর্ণ (و . ق . ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ– তারা পরহেজগারী অবলম্বন করেছে।

نَآئِمُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব سَمِعَ মাসদার اَلنَّوْمُ মূলবর্ণ (ن . و . م) জিনস اجوف واوى অর্থ– নিদ্রিত, নিদ্রামগ্ন।

يَلْعَبُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ اثبات فعل مضارع معروف বাব سَمِعَ মাসদার اَللَّعْبُ মূলবর্ণ (ل . ع . ب) জিনস صحيح অর্থ– তারা ক্রীড়ারত থাকবে।

اَصَبْنَا : সীগাহ جمع متكلم বহছ اثبات فعل ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِصَابَةُ মূলবর্ণ (ص . و . ب) জিনস اجوف واوى অর্থ– আমি ধ্বংস করতাম, আমি পাকড়াও করতাম।

ذُنُوْبٌ : শব্দটি বহুবচন; একবচন ذَنْبٌ অর্থ– গুনাহ, পাপ।

اَكْثَرَ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم تفضيل বাব كَرُمَ মাসদার اَلْكَثْرَةُ মূলবর্ণ (ك . ث . ر) জিনস صحيح অর্থ– অধিক হওয়া, বেশি হওয়া।

www.almodina.com

অনুবাদ	আয়াত
অনুবাদ : (১০৫) আমার পক্ষে এটাই শোভনীয় যে, সত্য ব্যতীত অন্য কোনো কথা আল্লাহর প্রতি আরোপ না করি, আমি তোমাদের নিকট তোমাদের রবের পক্ষ হতে একটি বড় প্রমাণও আনয়ন করেছি, অতএব, তুমি বনী ইসরাঈলকে আমার সঙ্গে পাঠিয়ে দাও।	حَقِيْقٌ عَلَىٰٓ اَنْ لَّآ اَقُوْلَ عَلَى اللّٰهِ اِلَّا الْحَقَّ ؕ قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ فَاَرْسِلْ مَعِيَ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ (١٠٥)
(১০৬) ফেরাউন বলল, যদি আপনি কোনো মু'জিযা নিয়ে এসে থাকেন, তবে তা এখন উপস্থিত করুন, যদি আপনি সত্যবাদী হয়ে থাকেন।	قَالَ اِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِاٰيَةٍ فَاْتِ بِهَآ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ (١٠٦)
(১০৭) পরন্তু তিনি স্বীয় লাঠি নিক্ষেপ করলেন, ফলে নিমিষে তা একটি প্রত্যক্ষ অজগর হয়ে গেল।	فَاَلْقٰى عَصَاهُ فَاِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِيْنٌ (١٠٧)
(১০৮) আর তিনি নিজ হস্ত [বগল হতে] বের করলেন, ফলে তা অকস্মাৎ সকল দর্শকের সম্মুখে অতি দীপ্তিমান হয়ে পড়ল।	وَّنَزَعَ يَدَهٗ فَاِذَا هِيَ بَيْضَآءُ لِلنّٰظِرِيْنَ (١٠٨)
(১০৯) ফেরাউন সম্প্রদায়ের প্রধানরা বলল, বাস্তবিকই এই লোকটি অতি দক্ষ জাদুকর।	قَالَ الْمَلَاُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ اِنَّ هٰذَا لَسٰحِرٌ عَلِيْمٌ (١٠٩)
(১১০) সে চায় যে, তোমাদেরকে তোমাদের আবাসভূমি হতে বহিষ্কার করে দেয়, অতএব, তোমরা কি পরামর্শ দাও?	يُّرِيْدُ اَنْ يُّخْرِجَكُمْ مِّنْ اَرْضِكُمْ ۚ فَمَاذَا تَاْمُرُوْنَ (١١٠)

শাব্দিক অনুবাদ

(১০৫) حَقِيْقٌ عَلَىٰٓ اَنْ لَّآ اَقُوْلَ আমার পক্ষে এটাই শোভনীয় যে, আরোপ না করি عَلَى اللّٰهِ আল্লাহর প্রতি اِلَّا الْحَقَّ সত্য ব্যতীত অন্য কোনো কথা قَدْ جِئْتُكُمْ আমি তোমাদের নিকট আনয়ন করেছি بِبَيِّنَةٍ একটি বড় প্রমাণও مِّنْ رَّبِّكُمْ তোমাদের রবের পক্ষ হতে فَاَرْسِلْ مَعِيَ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ অতএব, তুমি বনী ইসরাঈলকে আমার সঙ্গে পাঠিয়ে দাও।

(১০৬) قَالَ ফেরাউন বলল اِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِاٰيَةٍ যদি আপনি কোনো মু'জিযা নিয়ে এসে থাকেন فَاْتِ بِهَآ তবে তা এখন উপস্থিত করুন اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ যদি আপনি সত্যবাদী হয়ে থাকেন।

(১০৭) فَاَلْقٰى عَصَاهُ পরন্তু তিনি স্বীয় লাঠি নিক্ষেপ করলেন فَاِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِيْنٌ ফলে নিমিষে তা একটি প্রত্যক্ষ অজগর হয়ে গেল।

(১০৮) وَّنَزَعَ يَدَهٗ আর তিনি নিজ হস্ত [বগল হতে] বের করলেন فَاِذَا هِيَ بَيْضَآءُ لِلنّٰظِرِيْنَ ফলে তা অকস্মাৎ সকল দর্শকের সম্মুখে অতি দীপ্তিমান হয়ে পড়ল।

(১০৯) قَالَ الْمَلَاُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ ফেরাউন সম্প্রদায়ের প্রধানরা বলল اِنَّ هٰذَا لَسٰحِرٌ عَلِيْمٌ বাস্তবিকই এই লোকটি অতি দক্ষ জাদুকর।

(১১০) يُّرِيْدُ সে চায় যে اَنْ يُّخْرِجَكُمْ مِّنْ اَرْضِكُمْ তোমাদেরকে তোমাদের আবাসভূমি হতে বহিষ্কার করে দেয় فَمَاذَا تَاْمُرُوْنَ অতএব, তোমরা কি পরামর্শ দাও?

www.almodina.com

قَالُوْٓا اَرْجِهْ وَاَخَاهُ وَاَرْسِلْ فِى الْمَدَآئِنِ حٰشِرِيْنَ (١١١)

অনুবাদ : (১১১) তারা বলল, আপনি তাকে ও তার ভ্রাতাকে অবকাশ দিন এবং নগরসমূহে সংগ্রহকারীদেরকে প্রেরণ করুন।

يَاْتُوْكَ بِكُلِّ سٰحِرٍ عَلِيْمٍ (١١٢)

(১১২) যেন তারা অভিজ্ঞ জাদুকরদেরকে [সংগ্রহ করে] আপনার নিকট উপস্থিত করে।

وَجَآءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوْٓا اِنَّ لَنَا لَاَجْرًا اِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغٰلِبِيْنَ (١١٣)

(১১৩) আর সেই জাদুকরেরা ফেরাউনের নিকট উপস্থিত হলো [এবং] বলতে লাগল, যদি আমরা বিজয়ী হই, তবে [কি] আমাদের জন্য কোনো বড় রকমের বিনিময় রয়েছে?

قَالَ نَعَمْ وَاِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ (١١٤)

(১১৪) ফেরাউন বলল, হ্যাঁ, এবং নিশ্চয় তোমরা সান্নিধ্যপ্রাপ্ত লোকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।

قَالُوْا يٰمُوْسٰٓى اِمَّآ اَنْ تُلْقِىَ وَاِمَّآ اَنْ نَّكُوْنَ نَحْنُ الْمُلْقِيْنَ (١١٥)

(১১৫) জাদুকরেরা বলল, হে মূসা! হয় আপনি নিক্ষেপ করুন, আর না হয়, আমরাই নিক্ষেপ করি।

قَالَ اَلْقُوْا ۚ فَلَمَّآ اَلْقَوْا سَحَرُوْٓا اَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوْهُمْ وَجَآءُوْ بِسِحْرٍ عَظِيْمٍ (١١٦)

(১১৬) মূসা (আ.) বললেন, তোমরাই নিক্ষেপ কর, অনন্তর যখন তারা নিক্ষেপ করল, তখন লোকদের চোখে ভেলকি লাগিয়ে দিল এবং তাদের উপর আতঙ্ক বিস্তার করল, বস্তুতঃ একটা বড় রকমের জাদু প্রদর্শন করল।

শাব্দিক অনুবাদ

(১১১) قَالُوْٓا তারা বলল اَرْجِهْ وَاَخَاهُ আপনি তাকে ও তার ভ্রাতাকে অবকাশ দিন وَاَرْسِلْ এবং প্রেরণ করুন فِى الْمَدَآئِنِ নগরসমূহে حٰشِرِيْنَ সংগ্রহকারীদেরকে ।

(১১২) يَاْتُوْكَ যেন তারা আপনার নিকট উপস্থিত করে بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيْمٍ অভিজ্ঞ জাদুকরদেরকে ।

(১১৩) وَجَآءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ আর সেই জাদুকরেরা ফেরাউনের নিকট উপস্থিত হলো قَالُوْٓا বলতে লাগল اِنَّ لَنَا لَاَجْرًا তবে [কি] আমাদের জন্য কোনো বড় রকমের বিনিময় রয়েছে اِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغٰلِبِيْنَ যদি আমরা বিজয়ী হই,?

(১১৪) قَالَ ফেরাউন বলল نَعَمْ হ্যাঁ وَاِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ এবং নিশ্চয় তোমরা সান্নিধ্যপ্রাপ্ত লোকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।

(১১৫) قَالَ জাদুকরেরা বলল يٰمُوْسٰى হে মূসা! اِمَّآ اَنْ تُلْقِىَ হয় আপনি নিক্ষেপ করুন وَاِمَّآ اَنْ نَّكُوْنَ نَحْنُ الْمُلْقِيْنَ আর না হয়, আমরাই নিক্ষেপ করি।

(১১৬) قَالَ মূসা (আ.) বললেন اَلْقُوْا তোমরাই নিক্ষেপ কর فَلَمَّآ اَلْقَوْا অনন্তর যখন তারা নিক্ষেপ করল سَحَرُوْٓا اَعْيُنَ النَّاسِ তখন লোকদের চোখে ভেলকি লাগিয়ে দিল وَاسْتَرْهَبُوْهُمْ এবং তাদের উপর আতঙ্ক বিস্তার করল وَجَآءُوْ بِسِحْرٍ عَظِيْمٍ বস্তুতঃ একটা বড় রকমের জাদু প্রদর্শন করল।

(১১৭) وَاَوْحَيْنَآ اِلٰى مُوْسٰٓى আর আমি মূসাকে আদেশ করলাম যে اَنْ اَلْقِ عَصَاكَ আপনি স্বীয় লাঠি নিক্ষেপ করুন فَاِذَا هِىَ تَلْقَفُ مَا يَاْفِكُوْنَ অতএব লাঠি নিক্ষেপ করতেই তা জাদুকরদের তৈরি সমস্ত খেলার সামগ্রীগুলোকে গ্রাস করতে লাগল।

অনুবাদ	আয়াত
অনুবাদ : (১১৭) আর আমি মূসাকে আদেশ করলাম যে, আপনি স্বীয় লাঠি নিক্ষেপ করুন, অতএব লাঠি নিক্ষেপ করতেই তা জাদুকরদের তৈরি সমস্ত খেলার সামগ্রীগুলোকে গ্রাস করতে লাগল।	وَاَوْحَيْنَآ اِلٰى مُوْسٰٓى اَنْ اَلْقِ عَصَاكَ ۚ فَاِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَاْفِكُوْنَ ﴿١١٧﴾
(১১৮) ফলে সত্য প্রকাশ হয়ে পড়ল এবং তারা যা কিছু বানিয়েছিল, সমস্তই বিলীন হয়ে গেল।	فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿١١٨﴾
(১১৯) সুতরাং তারা [অর্থাৎ ফেরাউন এবং তার সম্প্রদায়] সেস্থলে পরাভূত হলো এবং নিতান্ত অপদস্থ হলো।	فَغُلِبُوْا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوْا صٰغِرِيْنَ ﴿١١٩﴾
(১২০) আর সেই যে জাদুকরেরা ছিল তারা সেজদায় পতিত হলো।	وَاُلْقِيَ السَّحَرَةُ سٰجِدِيْنَ ﴿١٢٠﴾
(১২১) বলতে লাগল, আমরা ঈমান আনলাম সকল জাহানের প্রতিপালকের প্রতি।	قَالُوْٓا اٰمَنَّا بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٢١﴾

শাব্দিক অনুবাদ

(১১৮) فَوَقَعَ الْحَقُّ ফলে সত্য প্রকাশ হয়ে পড়ল وَبَطَلَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ এবং তারা যা কিছু বানিয়েছিল, সমস্তই বিলীন হয়ে গেল।

(১১৯) فَغُلِبُوْا هُنَالِكَ সুতরাং তারা [অর্থাৎ ফেরাউন এবং তার সম্প্রদায়] সেস্থলে পরাভূত হলো وَانْقَلَبُوْا صٰغِرِيْنَ এবং নিতান্ত অপদস্থ হলো।

(১২০) وَاُلْقِيَ আর পতিত হলো السَّحَرَةُ সেই যে জাদুকরেরা ছিল তারা سٰجِدِيْنَ সেজদায়।

(১২১) قَالُوْٓا বলতে লাগল اٰمَنَّا আমরা ঈমান আনলাম بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ সকল জাহানের প্রতিপালকের প্রতি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

১০৪ নং আয়াতে বলা হয়েছে যে, হযরত মূসা (আ.) ফেরাউনকে বললেন, আমি বিশ্ব পালক আল্লাহ তা'আলার রাসূল। আর আমার এই যে, আমার যে নবুয়তী মর্যাদা তার দাবি হলো, যাতে আমি আল্লাহর প্রতি সত্য ছাড়া কোনো বিষয় আরোপ না করি। কারণ, নবীগণকে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে সত্যের যে পয়গাম দান করা হয়, তা তাঁদের নিকট আল্লাহর আমানত। নিজের পক্ষ থেকে সেগুলোতে কোনো পরিবর্তন পরিবর্ধন করা সবই আমানতের খেয়ানত। পক্ষান্তরে নবী-রাসূলগণ হলেন খেয়ানত ও যাবতীয় পাপ থেকে মুক্ত নিষ্পাপ। সারকথা, আমার কথার উপর তোমাদের বিশ্বাস এজন্য স্থাপন করা কর্তব্য যে, আমার সত্যতা তোমাদের সবার সামনে ভাস্বর; আমি কখনও মিথ্যা বলিওনি, বলতে পারিও না। তাছাড়া قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ فَاَرْسِلْ مَعِيَ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ অর্থাৎ শুধু তাই নয় যে আমি কখনও মিথ্যা বলিনি বরং আমার দাবির স্বপক্ষে আমার মু'জিযাসমূহও প্রমাণ হিসেবে রয়েছে। সুতরাং এসব বিষয়ের প্রেক্ষিতে তোমরা আমার কথা শুন, আমার কথা মান। বনী ইসরাঈল সম্প্রদায়কে অন্যায় দাসত্ব থেকে মুক্তি দিয়ে আমার সাথে দিয়ে দাও। কিন্তু ফেরাউন অন্য কোনো কথাই লক্ষ্য করল না। মু'জিযা দেখাবার দাবি করতে লাগল এবং বলল, اِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِاٰيَةٍ فَاْتِ بِهَآ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ অর্থাৎ বাস্তবিকই যদি তুমি কোনো মু'জিযা নিয়ে এসে থাক, তাহলে তা উপস্থাপন কর, যদি তুমি সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাক।

হযরত মূসা (আ.) তার দাবি মেনে নিয়ে স্বীয় লাঠিখানা মাটিতে ফেলে দিলেন। আর অমনি তা এক বিরাট অজগরে পরিণত হয়ে গেল فَاِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِيْنٌ 'ছু'বান' বলা হয় বিরাটকায় অজগরকে। আর তার গুণবাচক مُبِيْنٌ (মুবীন) শব্দ উল্লেখ করে বলে দেওয়া হয়েছে যে, সে লাঠির সাপ হয়ে যাওয়াটা এমন কোনো ঘটনা ছিল না যা অন্ধকারে কিংবা পর্দার আড়ালে ঘটে থাকবে, যা কেউ দেখে থাকবে, কেউ দেখবে না। সাধারণত জাদুকর বা ঐন্দ্রজালিকদের বেলায় ঘটে থাকে; বরং এ ঘটনাটি সংঘটিত হলো প্রকাশ্য দরবারে সবার সামনে।

কোনো কোনো ঐতিহাসিক উদ্ধৃতিতে হযরত ইবনে আবাবস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, সেই অজগর ফেরাউনের প্রতি যখন হা করে মুখ বাড়াল, তখন সে সিংহাসন থেকে লাফিয়ে পড়ে হযরত মূসা (আ.)-এর শরণাপন্ন হলো; আর দরবারের বহু লোক ভয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হলো। –[তাফসীরে কাবীর]

লাঠি সাপ হয়ে যাওয়া অসম্ভব কোনো ব্যাপার নয়, অবশ্য সাধারণ প্রকৃতি বিরুদ্ধ হওয়ার কারণে এটা যে অত্যন্ত বিস্ময়কর, তাতে সন্দেহ নেই। আর মু'জিযা বা কারামতের উদ্দেশ্যও থাকে তাই। যে কাজ সাধারণ মানুষ করতে পারে না, তা নবী রাসূলগণের মাধ্যমে আল্লাহর পক্ষ থেকে অনুষ্ঠিত করে দেওয়া হয় যাতে মানুষ বুঝতে পারে যে, তাঁদের সঙ্গে কোনো ঐশী শক্তি সক্রিয় রয়েছে। কাজেই হযরত মূসা (আ.) এর লাঠির সাপ হয়ে যাওয়াটা বিস্ময়কর কিংবা অস্বীকার করার মতো কোনো বিষয় হতে পারে না।

অতঃপর বলা হয়েছে– وَنَزَعَ يَدَهٗ فَاِذَا هِيَ بَيْضَآءُ لِلنّٰظِرِيْنَ –نزع (নায'উন) অর্থ হচ্ছে কোনো একটি বস্তুকে অপর একটি বস্তুর ভিতর থেকে কিছুটা বল প্রয়োগের মাধ্যমে বের করা। অর্থাৎ নিজের হাতটিকে টেনে বের করলেন। এখানে কিসের ভিতর থেকে বের করলেন, তা উল্লেখ করা হয়নি। অন্য আয়াতে দুটি বস্তুর উল্লেখ রয়েছে। এক স্থানে এসেছে স্বীয় হাত গলাবন্ধ কিংবা বগলের নিচে থেকে অর্থাৎ কখনও গলাবন্ধের ভিতরে ঢুকিয়ে হাত বের করলে আবার কখনো বগল তলে দাবিয়ে সেখান থেকে বের করে আনলে এ মু'জিযা প্রকাশ পেত অর্থাৎ সে হাতটি দর্শকদের সামনে প্রদীপ্ত হতে থাকত।

তখন ফেরাউনের দাবিতে হযরত মূসা (আ.) দুটি মু'জিযা প্রদর্শন করেছিলেন। একটি হলো লাঠির সাপ হয়ে যাওয়া; আর অপরটি হলো হাত গলাবন্ধ কিংবা বগলের নীচে দাবিয়ে বের করে করে আনলে তার প্রদীপ্ত ও উজ্জ্বল হয়ে উঠা। প্রথম মু'জিযাটি ছিল বিরোধীদেরকে ভীতি প্রদর্শন করার জন্য, আর দ্বিতীয়টি তাদেরকে আকৃষ্ট করে কাছে আনার উদ্দেশ্যে। এতে ইঙ্গিত ছিল যে, হযরত মূসা (আ.)-এর শিক্ষায় একটি হেদায়েতের জ্যোতি রয়েছে, আর সেটির অনুসরণ ছিল কল্যাণের কারণ।

قَالَ الْمَلَاُ –مَلَأ শব্দটি ব্যবহৃত হয় কোনো সম্প্রদায়ের প্রভাবশালী নেতৃবর্গকে বুঝাবার জন্য। অর্থ হচ্ছে এই যে, ফেরাউনের সম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা এসব মু'জিযা দেখে তাদের সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করে বলল, এ যে, বড় পারদর্শী জাদুকর। তার কারণ, প্রত্যেকের চিন্তাই তার নিজ যোগ্যতা অনুসারেই হয়ে থাকে। সে হতভাগারা আল্লাহর পরিপূর্ণ কুদরত ও মহিমা সম্পর্কে কি বুঝবে, যারা জীবনভর ফেরাউনকে খোদা আর জাদুকরদেরকে নিজের পথপ্রদর্শক মনে করেছে এবং জাদুকরদের ভোজবাজীই দেখে এসেছে। কাজেই তারা এহেন বিস্ময়কর ঘটনা দেখার পর এছাড়া আর কিইবা বলতে পারত যে, এটা একটা মহা জাদুকর। কিন্তু তারাও এখানে سَاحِرٌ-এর সাথে عَلِيْمٌ শব্দটি যোগ করে একথা প্রকাশ করে দিয়েছে যে, হযরত মূসা (আ.) -এর মু'জিযা সম্পর্কে তাদের মনেও এ অনুভূতি জন্মেছিল যে, এ কাজটি সাধারণ জাদুকরদের কাজ থেকে স্বতন্ত্র ও ভিন্ন প্রকৃতির। সেজন্যই স্বীকার করে দিয়েছে যে, তিনি বড়ই বিজ্ঞ জাদুকর।

মু'জিযা ও জাদুর পার্থক্য : বস্তুত আল্লাহ তা'আলা সর্বযুগেই নবী রাসূলগণের মু'জিযাসমূহকে এমনি ভঙ্গিতে প্রকাশ করেছেন যে, দর্শকবৃন্দ যদি সামান্যও চিন্তা করে আর হঠকারিতা অবলম্বন না করে, তাহলে মু'জিযা ও জাদুর মাঝে যে পার্থক্য তা নিজেরাই বুঝতে পারে। জাদুকররা সাধারণত অপবিত্রতা ও পঙ্কিলতার মধ্যে ডুবে থাকে। পঙ্কিলতা ও অপবিত্রতা যত বেশি হবে, তাদের জাদুও তত বেশি কার্যকর হবে। পক্ষান্তরে পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা হলো নবী-রাসূলগণের সহজাত অভ্যাস। আর এও একটি পরিষ্কার পার্থক্য যে, আল্লাহর পক্ষ থেকেই নবুওয়তের দাবির পর কারও কোনো জাদু কার্যকর হয় না।

তাছাড়া বিজ্ঞজনেরা জানেন যে, জাদুর মাধ্যমে যে বিষয় প্রকাশ করা হয়,. সেসব মানসিক বিষয়সমূহের আওতাভুক্তই হয়ে থাকে। পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, সে বিষয়গুলো সাধারণ মানুষের মাঝে প্রকাশ পায় না; বরং অন্তর্নিহিত থাকে। কাজেই সে মনে করে, এ কাজটি বাহ্যিক কোনো কারণ ছাড়াই প্রকাশিত হয়ে পড়েছে। পক্ষান্তরে মু'জিযাতে বাহ্যিক বা মানসিক কোনো বিষয়ের সামান্যতম সংযোগও থাকে না। তা সরাসরি আল্লাহ তা'আলার কুদরতের কাজ। তাই কুরআন মাজীদে এ বিষয়টিকে আল্লাহ তা'আলার সম্পৃক্ত করা হয়েছে। যেমন, وَلٰكِنَّ اللّٰهَ رَمٰى এবং আল্লাহ তা'আলাই সে তীর নিক্ষেপ করেছিলেন।

এতে বুঝা যাচ্ছে যে, মু'জিযা এবং জাদুর প্রকৃতি সম্পূর্ণ ভিন্ন ও বিপরীতধর্মী। যারা তত্ত্বজ্ঞ তাদের কাছে এতদুভয়ের মিলে যাওয়ার কোনো কারণই নেই। তবে সাধারণ মানুষের কাছে তা মিলে যেতে পারে, কিন্তু আল্লাহ তা'আলা এই বিভ্রান্তিটি দূর করার উদ্দেশ্যে এমনসব বৈশিষ্ট্য স্থাপন করে দিয়েছেন যার ফলে মানুষ ধোঁকা থেকে বেঁচে যেতে পারে।

সারমর্ম এই যে, ফেরাউনের সম্প্রদায়ও হযরত মূসা (আ.) -এর মু'জিযাকে নিজেদের জাদুকরদের কার্যকলাপ থেকে কিছুটা স্বতন্ত্রই মনে করেছিল। সেজন্যই একথা বলতে বাধ্য হয়েছিল যে, এ যে বড় বিজ্ঞ জাদুকর, সাধারণ জাদুকররা যে, এমন কাজ দেখাতে পারে না।

يُرِيْدُ اَنْ يُّخْرِجَكُمْ مِّنْ اَرْضِكُمْ ۚ فَمَاذَا تَاْمُرُوْنَ অর্থাৎ এই বিজ্ঞ জাদুকরের ইচ্ছা হলো তোমাদেরকে দেশ থেকে বের দেওয়া। এবার বল, তোমরা কি পরামর্শ দাও?

قوله قَالُوْٓا اَرْجِهْ وَاَخَاهُ وَاَرْسِلْ فِى الْمَدَآئِنِ الخ এ আয়াতগুলোতে হযরত মূসা (আ.) -এর অবশিষ্ট কাহিনীর উল্লেখ রয়েছে যে, ফেরাউন যখন হযরত মূসা (আ.) -এর প্রকৃষ্ট মু'জিযা দেখল। লাঠি মাটিতে ফেলার সঙ্গে সঙ্গে তা সাপে পরিণত হয়ে গেল এবং আবার যখন সেটাকে হাতে ধরলেন, তখন পুনরায় লাঠি হয়ে গেল। আর হাতকে যখন গলাবন্ধের ভিতরে দাবিয়ে বের করলেন, তখনতা প্রদীপ্ত হয়ে চকমক করতে লাগল। এ ঐশী নিদর্শনরে যৌক্তিক দাবি ছিল হযরত মূসা (আ.)-এর উপর ঈমান নিয়ে আসা, কিন্তু ভ্রান্তবাদীরা যেমন সত্যকে গোপন করার জন্য এবং তা থেকে ফিরিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে বাস্তব ও সঠিক বিষয়ের উপর মিথ্যার শিরোনাম লাগিয়ে থাকে, ফেরাউন এবং তার সম্প্রদায়ের নেতারাও তাই করল। বলল যে, তিনি বড় বিজ্ঞ জাদুকর এবং তাঁর উদ্দেশ্য হলো তোমাদের দেশ দখল করে নিয়ে তোমাদেরকে বের করে দেওয়া। কাজেই তোমরাই বল এখন কি করা উচিত?

ফেরাউনের সম্প্রদায় একথা শুনে উত্তর দিল– اَرْجِهْ وَاَخَاهُ وَاَرْسِلْ فِى الْمَدَآئِنِ حٰشِرِيْنَ এ বাক্যটিতে اَرْجِهْ শব্দটি اِرْجَاءٌ থেকে উদ্ভূত যার অর্থ– ঢিল দেওয়া শিথিল করা এবং আশা দান করা। আর مَدَائِن শব্দটি مَدِيْنَةٌ-এর বহুবচন, যার অর্থ হলো– আহ্বানকারী এবং সংগ্রহকারী। মর্মার্থ হলো সৈন্যদল, যারা দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে জাদুকরদেরকে তুলে এনে একত্রিত করবে।

আয়াতের অর্থ দাঁড়ায় এই যে, সম্প্রদায়ের লোকেরা পরামর্শ দিল যে, ইনি যদি জাদুকর হয়ে থাকেন এবং জাদুর দ্বারাই আমাদের দেশ দখল করতে চান, তবে তাঁর মোকাবিলা করা আমাদের পক্ষে মোটেই কঠিন নয়। আমাদের দেশেও বহু বড় বড় অভিজ্ঞ হাদুকর রয়েছে যারা তাকে জাদুর দ্বারা পরাভূত করে দিবে। কাজেই কিছু সৈন্য সামন্ত দেশের বিভিন্ন স্থানে পাঠিয়ে দিন। তারা সব শহর থেকে জাদুকরদেরকে ডেকে নিয়ে আসবে।

তার কারণ ছিল যে, তখন জাদু মন্ত্রের বহুল প্রচলন ছিল এবং সাধারণ লোকদের উপর জাদুকরদের প্রচুর প্রভাব ছিল। আর মূসা (আ.) কেও লাঠি এবং উজ্জ্বল হাতের মু'জিযা এজন্যই দেওয়া হয়েছিল যাতে জাদুকরদের সাথে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় এবং মু'জিযার মোকাবিলায় জাদুর পরাজয় সবাই দেখে নিতে পারে। আল্লাহ তা'আলার সনাতন রীতিও ছিল তাই। প্রত্যেক যুগের নবী-রাসূলকেই তিনি সে যাগের জনগণের সাধারণ প্রবণতা অনুপাতে মু'জিযা দান করেছেন। হযরত ঈসা (আ.)-এর যুগে গ্রীক বিজ্ঞান ও গ্রীক চিকিৎসা বিজ্ঞান যেহেতু উৎকর্ষের চরম শিখরে ছিল সেহেতু তাঁকে মু'জিযা দেওয়া হয়েছিল জন্মান্ধকে দৃষ্টিসম্পন্ন করে দেওয়া এবং কুষ্ঠরোগগ্রস্তকে সুস্থ করে তোলা। রাসূলে কারীম ﷺ-এর যুগে আরবরা সর্বাধিক পরাকাষ্ঠা অর্জন করেছিল অলংকার শাস্ত্র ও বাগ্মিতায়। তাই রাসূলে আকরাম ﷺ-এর সবচেয়ে বড় মু'জিযা হলো কুরআন যার মোকাবিলা গোটা আরব আজম অসমর্থ হয়ে পড়ে।

হযরত মূসা (আ.)-এর সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতার উদ্দেশ্যে সারা দেশ থেকে যেসব জাদুকর এসে সমবেত হয়েছিল তাদের সংখ্যার ব্যাপারে বিভিন্ন ঐতিহাসিক বর্ণনা রয়েছে। ৯০০ থেকে শুরু করে তিন লক্ষ পর্যন্ত রেওয়ায়েত আছে। তদের সাথে লাঠি ও দাড়ির এক বিরাট স্তূপও ছিল। যা ৩০০ উটের পিঠে বোঝাই করে আনা হয়েছিল। –[কুরতুবী]

ফেরাউনের জাদুকররা প্রথমে এসেই দরকষাকষি করতে শুরু করল যে, আমরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলে এবং তাতে জয়ী হলে, আমরা কি পাব? তার কারণ, যারা ভ্রান্ত বাদী, পার্থিব লাভই হলো তাদের মুখ্য। কাজেই যে কোনো কাজ করার পূর্বে তাদের সামনে থাকে বিনিময় কিংবা লাভের প্রশ্ন। অথচ নবী-রাসূলগণ এবং তাঁদের যারা নায়েব বা প্রতিনিধি তাঁরা প্রতি পদক্ষেপে ঘোষণা করেন– وَمَآ اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ اِنْ اَجْرِىَ اِلَّا عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ অর্থাৎ 'আমরা যে সত্যের বাণী তোমাদের মঙ্গলের জন্য তোমাদেরকে পৌঁছে দেই তার বিনিময়ে তোমাদের কাছে কোনো প্রাতিদান কামনা করি না; বরং আমাদের প্রতিবাদের দায়িত্ব শুধু আল্লাহর উপরই রয়েছে।' ফেরাউন তাদেরকে বলল, তোমরা পারিশ্রমিক চাইছ? আমি পারিশ্রমিক তো দেবই, আর তার সঙ্গে সঙ্গে তোমাদেরকে শাহী দরবারের ঘনিষ্ঠদেরও অন্তর্ভুক্ত করে নেব।

ফেরাউনের সাথে এসব কাথাবার্তা বলে নেওয়ার পর জাদুকররা হযরত মূসা (আ.) -এর সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতার স্থান ও সময় সাব্যস্ত করিয়ে নিল। সেমতে এক বিস্তৃত ময়দানে এবং এক উৎসবের দিনে সূর্যোদয়ের কিছুক্ষণ পরে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সময় সাব্যস্ত হলো। যেমন কুরআনে বলা হয়েছে– قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّيْنَةِ وَاَنْ يُّحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى কোনো কোনো রেওয়ায়েতে বর্ণিত রয়েছে যে, এ সমস্ত জাদুকরদের সর্দারের সাথে হযরত মূসা (আ.) আলোচনা করলেন যে, আমি যদি তোমাদের উপর জয় লাভ করি, তবে তোমরা ঈমান গ্রহণ করবে তো? সে বলল, আমাদের কাছে এমন জাদু রয়েছে যে, তার উপর কেউ জয়ী হতে পারে না। কাজেই আমাদের পরাজয়ের কোনো প্রশ্নই উঠতে পারে না। আর অগত্যাই যদি তুমি জয়ী হয়ে যাও, তাহলে প্রকাশ্য ঘোষণার মাধ্যমে ফেরাউনের চোখের সামনে তোমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে নেব। –[মাযহারী, কুরতুবী]

قَوْلُهٗ قَالُوْا يٰمُوْسٰى اِمَّآ اَنْ تُلْقِىَ وَاِمَّآ اَنْ نَّكُوْنَ نَحْنُ الْمُلْقِيْنَ এখানে اِلْقَاءٌ –এর অর্থ নিক্ষেপ করা । অর্থাৎ প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য যখন মাঠে গিয়ে সবাই উপস্থিত, তখন জাদুকরেরা হযরত মূসা (আ.)-কে বলল, হয় আপনি প্রথমে নিক্ষেপ করুন অথবা আমরা প্রথম নিক্ষেপকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাই। জাদুকরদের এ উক্তিটি ছিল নিজেদের নিশ্চিন্ততা ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করার উদ্দেশ্য যে, এ ব্যাপারে আমাদের কোনো পারোয়াই নেই যে, প্রথমে আমরা শুরু করি। কারণ আমরা নিজের শাস্ত্রের ব্যাপারে সম্পূর্ণ আশ্বস্ত। তাদের বর্ণনাভঙ্গিতে একথা বুঝা গেল যে, তারা মনে করে প্রথমে আক্রমণের প্রত্যাশী ছিল কিন্তু শক্তিমত্তা প্রকাশের উদ্দেশ্যে হযরত মূসা (আ.) -কে জিজ্ঞেস করে নিল যে, প্রথমে আপনি আরম্ভ করবেন, না আমরা করব।

হযরত মূসা (আ.) তাদের উদ্দেশ্য উপলব্ধি করে নিয়ে নিজের মু'জিযা সম্পর্কে পরিপূর্ণ আশ্বস্তার দরুন প্রথম তাদেরকেই সুযোগ দিলেন। বললেন, اَلْقُوْا অর্থাৎ তোমরাই প্রথমে নিক্ষেপ কর।

তাফসীরে ইবনে কাছীরে বলা হয়েছে যে. জাদুকররা হযরত মূসা (আ.)-এর প্রতি আদব ও সম্মানজনক ব্যবহার করতে গিয়েই প্রথম সুযোগ নেওয়ার জন্য তাঁকে আমন্ত্রণ জানাল। তারই প্রতিক্রিয়ায় তাদের ঈমান আনার সৌভাগ্য হয়েছিল। فَلَمَّآ اَلْقَوْا سَحَرُوْٓا اَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوْهُمْ وَجَآءُوْا بِسِحْرٍ عَظِيْمٍ অর্থাৎ জাদুকররা যখন তাদের লাঠি ও দড়িগুলো মাটিতে নিক্ষেপ করল, তখন দর্শকদের নজরবন্দী করে দিয়ে তাদের উপর ভীতি সঞ্চারিত করে দিল এবং মহাজাদু দেখাল।

এ আয়াতের দ্বারা বোঝা যায় যে, তাদের জাদু ছিল এক প্রকার নজরবন্দি যাতে দর্শকদের মনে হতে লাগল যে, এই লাঠি আর দড়িগুলো সাপ হয়ে দৌড়াচ্ছে। অথচ প্রকৃতপক্ষে সেগুলো ছিল, তেমনি লাঠি ও দড়ি যা পূর্বে ছিল, সাপ হয়নি। এটা এক রকম সন্মোহনী , যার প্রভাব মানুষের কল্পনা ও দৃষ্টিকে ধাঁধিয়ে দেয়।

কিন্তু তাই বলে একথা প্রতীয়মান হয় না যে, জাদু এ প্রকারেই সীমাবদ্ধ এবং জাদুর মাধ্যমে বাস্তব বিষয়ের পরিবর্তন ঘটতে পারে না। কারণ শরিয়তের বা যুক্তির কোনো প্রমাণ এর বিরুদ্ধে স্থাপিত হয়নি; বরং বিভিন্ন প্রকার জাদুর প্রমাণ বিদ্যমান রয়েছে। কোথাও তা শুধু নজরবন্দীর কাজ করে। যেমন, কাজ করে সম্মোহনী। আর কোথাও যদি বাস্তব বিষয়ের পরিবর্তন ঘটেও যায়, যেমন মানুষের পাথর হয়ে যাওয়া, তাহলে সেটা শরিয়ত বা বৈজ্ঞানিক যুক্তির বিরুদ্ধে নয়।

www.almodina.com

وَاَوْحَيْنَآ اِلٰى مُوْسٰٓى اَنْ اَلْقِ عَصَاكَ ۚ فَاِذَا هِىَ تَلْقَفُ مَا يَاْفِكُوْنَ অর্থাৎ আমি মূসা (আ.)-কে নির্দেশ দিলাম যে, তোমার লাঠিটি মাটিতে ফেলে দাও। তা মাটিতে পড়তেই সবচেয়ে বড় সাপ হয়ে সমস্ত সাপগুলোকে গিলে খেতে শুরু করল, যেগুলো জাদুকররা জাদুর দ্বারা প্রকাশ করেছিল।

ঐতিহাসিক বর্ণনা রয়েছে যে, হাজার হাজার জাদুকরের লাঠি আর দড়িগুলো যখন সাপ হয়ে দৌড়াতে লাগল, তখন সমগ্র মাঠ সাপে ভরে গেল এবং সমবেত দর্শকদের সাঝে এক অদ্ভুত ভীতি ছেয়ে গিয়েছিল। কিন্তু হযরত মূসা (আ.)-এর লাঠি যখন এক বিরাট আযদাহা বা অজগরের আকার ধরে এলো তখন সে সবগুলোকে গিলে খেয়ে শেষ করে ফেলল।

শব্দ বিশ্লেষণ

عَصًا : শব্দটি একবচন; বহুবচন عِصِىٌّ অর্থ– লাঠি, যষ্টি, দণ্ড।

ثُعْبَانٌ : শব্দটি একবচন; বহুবচন ثَعَابِيْنُ অর্থ– অজগর, সাপ।

اَرْجِهْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِرْجَاءُ মূলবর্ণ (ر ـ ج ـ و) জিনস ناقص واوى অর্থ– আপনি অবকাশ দিন।

اَلْمُلْقِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِلْقَاءُ মূলবর্ণ (ل ـ ق ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– নিক্ষেপকারী।

اسْتَرْهَبُوْهُمْ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ اثبات فعل ماضى معروف বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِسْتِرْهَابُ মূলবর্ণ (ر ـ ه ـ ب) জিনস صحيح অর্থ– তারা ভীত সন্ত্রস্ত করে তুলল।

يَاْفِكُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ اثبات فعل مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْاَفْكُ মূলবর্ণ (ا ـ ف ـ ك) জিনস مهموز فاء অর্থ– তারা মিথ্যা বানাত, তারা মিথ্যা তৈরি করত।

غُلِبُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ اثبات فعل ماضى مجهول বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْغَلَبَةُ মূলবর্ণ (غ ـ ل ـ ب) জিনস صحيح অর্থ– তারা পরাজিত হয়ে গেল।

صٰغِرِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব كَرُمَ মাসদার اَلصِّغَرُ মূলবর্ণ (ص ـ غ ـ ر) জিনস صحيح অর্থ– অপদস্থ, লাঞ্ছিত।

www.almodina.com

অনুবাদ : (১২২) যিনি মূসা এবং হারূনেরও প্রতিপালক।	رَبِّ مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ (١٢٢)
(১২৩) ফেরাউন বলল, বেশ তো! তোমরা মূসার প্রতি ঈমান আনলে আমি তোমাদেরকে অনুমতি দেওয়া ব্যতিরেকেই! নিশ্চয় এটা চক্রান্ত ছিল, যা তোমরা করে দেখালে এই নগরে, যেন তোমরা এই নগর হতে তার অধিবাসীদেরকে বহিষ্কার করে দাও, অতএব, এখনই তোমরা প্রকৃত ব্যাপার [চক্রান্তের পরিণাম] জানতে পারবে।	قَالَ فِرْعَوْنُ اٰمَنْتُمْ بِهٖ قَبْلَ اَنْ اٰذَنَ لَكُمْ ۚ اِنَّ هٰذَا لَمَكْرٌ مَّكَرْتُمُوْهُ فِى الْمَدِيْنَةِ لِتُخْرِجُوْا مِنْهَآ اَهْلَهَا ۚ فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ (١٢٣)
(১২৪) আমি তোমাদের এক দিকের হাত ও অপর দিকের পা কর্তন করব অতঃপর তোমাদের সকলকে শূলে চড়াব।	لَاُقَطِّعَنَّ اَيْدِيَكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَاُصَلِّبَنَّكُمْ اَجْمَعِيْنَ (١٢٤)
(১২৫) তারা বলল, আমরা মরে নিজ পরওয়ারদেগারের সমীপে যাব।	قَالُوْٓا اِنَّآ اِلٰى رَبِّنَا مُنْقَلِبُوْنَ (١٢٥)
(১২৬) আর তুমি আমাদের মধ্যে কি দোষ দেখতে পেলে তা ব্যতীত যে, আমরা আমাদের রবের নির্দেশনাবলির উপর ঈমান এনেছি, হে আমাদের রব! আমাদের প্রতি বর্ষণ করুন ধৈর্য এবং আমাদের প্রাণ মুসলমান অবস্থায় বের করুন।	وَمَا تَنْقِمُ مِنَّآ اِلَّآ اَنْ اٰمَنَّا بِاٰيٰتِ رَبِّنَا لَمَّا جَآءَتْنَا ۚ رَبَّنَآ اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَّتَوَفَّنَا مُسْلِمِيْنَ (١٢٦)

ع ١٤

শাব্দিক অনুবাদ

(১২২) رَبِّ যিনি প্রতিপালক مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ মূসা এবং হারূনেরও।

(১২৩) قَالَ فِرْعَوْنُ ফেরাউন বলল বেশ তো! اٰمَنْتُمْ بِهٖ তোমরা মূসার প্রতি ঈমান আনলে قَبْلَ اَنْ اٰذَنَ لَكُمْ আমি তোমাদেরকে অনুমতি দেওয়া ব্যতিরেকেই! اِنَّ هٰذَا لَمَكْرٌ নিশ্চয় এটা চক্রান্ত ছিল مَّكَرْتُمُوْهُ فِى الْمَدِيْنَةِ যা তোমরা করে দেখালে এই নগরে لِتُخْرِجُوْا مِنْهَآ اَهْلَهَا যেন তোমরা এই নগর হতে তার অধিবাসীদেরকে বহিষ্কার করে দাও فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ অতএব, এখনই তোমরা প্রকৃত ব্যাপার [চক্রান্তের পরিণাম] জানতে পারবে।

(১২৪) لَاُقَطِّعَنَّ اَيْدِيَكُمْ আমি তোমাদের এক দিকের হাত কর্তন করব وَاَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَافٍ ও অপর দিকের পা কর্তন করব ثُمَّ لَاُصَلِّبَنَّكُمْ اَجْمَعِيْنَ অতঃপর তোমাদের সকলকে শূলে চড়াব।

(১২৫) قَالُوْٓا তারা বলল اِنَّآ اِلٰى رَبِّنَا مُنْقَلِبُوْنَ আমরা মরে নিজ পরওয়ারদেগারের সমীপে যাব।

(১২৬) وَمَا تَنْقِمُ مِنَّآ আর তুমি আমাদের মধ্যে কি দোষ দেখতে পেলে اِلَّآ তা ব্যতীত যে اَنْ اٰمَنَّا بِاٰيٰتِ رَبِّنَا لَمَّا جَآءَتْنَا আমরা আমাদের রবের নির্দেশনাবলির উপর ঈমান এনেছি رَبَّنَآ হে আমদের রব! اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا আমাদের প্রতি বর্ষণ করুন ধৈর্য وَّتَوَفَّنَا مُسْلِمِيْنَ এবং আমাদের প্রাণ মুসলমান অবস্থায় বের করুন।

www.almodina.com

وَقَالَ الْمَلَاُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ اَتَذَرُ مُوْسٰى وَقَوْمَهٗ لِيُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ وَيَذَرَكَ وَاٰلِهَتَكَ ۚ قَالَ سَنُقَتِّلُ اَبْنَآءَهُمْ وَنَسْتَحْىٖ نِسَآءَهُمْ ۚ وَاِنَّا فَوْقَهُمْ قٰهِرُوْنَ (١٢٧)

অনুবাদ : (১২৭) ফেরাউন সম্প্রদায়ের প্রধানরা বলল, আপনি কি মূসাকে এবং তার সম্প্রদায়কে এভাবেই থাকতে দিবেন যে, তারা দেশে ফ্যাসাদ করে বেড়াবে, আর সে আপনাকে ও আপনার উপাস্যদেরকে বর্জন করে চলবে? ফেরাউন বলল, আমি এখনই এদের পুত্র-সন্তানদেরকে হত্যা করতে আরম্ভ করব এবং এদের নারীদেরকে জীবিত থাকতে দিব এবং এদের উপর আমার সর্বপ্রকারের ক্ষমতা আছে।

قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهِ اسْتَعِيْنُوْا بِاللّٰهِ وَاصْبِرُوْا ۚ اِنَّ الْاَرْضَ لِلّٰهِ ۙ يُوْرِثُهَا مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ ۚ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ (١٢٨)

(১২৮) মূসা নিজ সম্প্রদায়কে বললেন, আল্লাহর ভরসা রাখ এবং দৃঢ় থাক, এবং জমিন আল্লাহ তা'আলারই, নিজ বান্দাদের মধ্য হতে যাকে ইচ্ছা উত্তরাধিকারী বানিয়ে দেন আর পরিশেষে সফলতা তাদেরই হয়, যারা আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করে।

قَالُوْٓا اُوْذِيْنَا مِنْ قَبْلِ اَنْ تَأْتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا ۚ قَالَ عَسٰى رَبُّكُمْ اَنْ يُّهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِى الْاَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ (١٢٩)

(১২৯) সম্প্রদায়ের লোকেরা বলতে লাগল, আমরা তো সর্বদা মসিবতেই রইলাম আপনার আগমনের পূর্বেও এবং আপনার আগমনের পরেও, মূসা বললেন, সত্বরই আল্লাহ তোমাদের দুশমনকে ধ্বংস করবেন, এবং তাদের স্থলে তোমাদেরকে এই ভূখণ্ডের অধিকারী করে দিবেন, তৎপর তোমাদের কর্ম পদ্ধতি দেখবেন।

ع ١٥

وَلَقَدْ اَخَذْنَآ اٰلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِيْنَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرٰتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ (١٣٠)

(১৩০) আর আমি ফেরাউন বংশধরকে ধৃত করলাম দুর্ভিক্ষ ও ফলাদির স্বল্প উৎপাদনের দ্বারা যেন তারা উপলব্ধি করে।

শাব্দিক অনুবাদ

(১২৭) وَقَالَ الْمَلَاُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ ফেরাউন সম্প্রদায়ের প্রধানরা বলল اَتَذَرُ مُوْسٰى وَقَوْمَهٗ আপনি কি মূসাকে এবং তার সম্প্রদায়কে এভাবেই থাকতে দিবেন যে لِيُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ তারা দেশে ফ্যাসাদ করে বেড়াবে وَيَذَرَكَ وَاٰلِهَتَكَ আর সে আপনাকে ও আপনার উপাস্যদেরকে বর্জন করে চলবে قَالَ ফেরাউন বলল سَنُقَتِّلُ اَبْنَآءَهُمْ আমি এখনই এদের পুত্র-সন্তানদেরকে হত্যা করতে আরম্ভ করব وَنَسْتَحْىٖ نِسَآءَهُمْ এবং এদের নারীদেরকে জীবিত থাকতে দিব وَاِنَّا فَوْقَهُمْ قٰهِرُوْنَ এবং এদের উপর আমার সর্বপ্রকারের ক্ষমতা আছে।

(১২৮) قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهِ মূসা নিজ সম্প্রদায়কে বললেন اسْتَعِيْنُوْا بِاللّٰهِ আল্লাহর ভরসা রাখ وَاصْبِرُوْا এবং দৃঢ় থাক اِنَّ الْاَرْضَ لِلّٰهِ এবং জমিন আল্লাহ তা'আলারই يُوْرِثُهَا উত্তরাধিকারী বানিয়ে দেন مَنْ يَّشَآءُ যাকে ইচ্ছা مِنْ عِبَادِهٖ নিজ বান্দাদের মধ্য হতে وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ আর পরিশেষে সফলতা তাদেরই হয়, যারা আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করে।

(১২৯) قَالُوْٓا সম্প্রদায়ের লোকেরা বলতে লাগল اُوْذِيْنَا مِنْ قَبْلِ اَنْ تَأْتِيَنَا আমরা তো সর্বদা মসিবতেই রইলাম আপনার আগমনের পূর্বেও وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا এবং আপনার আগমনের পরেও قَالَ মূসা বললেন عَسٰى رَبُّكُمْ اَنْ يُّهْلِكَ عَدُوَّكُمْ সত্বরই আল্লাহ তোমাদের দুশমনকে ধ্বংস করবেন وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِى الْاَرْضِ এবং তাদের স্থলে তোমাদেরকে এই ভূখণ্ডের অধিকারী করে দিবেন فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ তৎপর তোমাদের কর্ম পদ্ধতি দেখবেন।

(১৩০) وَلَقَدْ اَخَذْنَآ اٰلَ فِرْعَوْنَ আর আমি ফেরাউন বংশধরকে ধৃত করলাম بِالسِّنِيْنَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرٰتِ দুর্ভিক্ষ ও ফলাদির স্বল্প উৎপাদনের দ্বারা لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ যেন তারা উপলব্ধি করে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قوله قَالَ فِرْعَوْنُ اٰمَنْتُمْ بِهٖ قَبْلَ اَنْ اٰذَنَ لَكُمْ الخ এর পূর্ববর্তী আয়াতগুলোতে উল্লেখ ছিল যে, ফেরাউন তার সম্প্রদায়ের সর্দারদের পরামর্শ অনুযায়ী হযরত মূসা (আ.) -এর সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য যেসব জাদুকরকে সমগ্র দেশ থেকে এনে সমবেত করেছিল, তারা প্রতিদ্বন্দ্বিতার ময়দানে পরাজয় বরণ করল তো বটেই, তদুপরি হযরত মূসা (আ.) -এর প্রতি ঈমানও নিয়ে এলো।

ঐতিহাসিক বর্ণনায় রয়েছে যে, জাদুকরদের সর্দার মুসলমান হয়ে গেলে তার দেখাদেখি ফেরাউনের সম্প্রদায়ের ছয় লক্ষ লোক হযরত মূসা (আ.)-এর প্রতি ঈমান নিয়ে এল এবং তা ঘোষণা করে দিল।

এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও বিতর্কের পূর্বে তো হযরত মূসা (আ.) ও হারূন (আ.) এ দুজন ফেরাউনের বিরোধী ছিলেন, কিন্তু এর পরে সবচেয়ে বড় জাদুকর যে স্বীয় সম্প্রদায়ে বিপুল প্রভাবের অধিকারী ছিল এবং তার সাথে ছিল ছয় লক্ষ জনসাধারণ, তারা সবাই মুসলমান হয়ে যাবার দরুন একটি বিরাট শক্তি ফেরাউনের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়াল।

সে সময় ফেরাউনের ব্যাকুলতা ও ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়াটা একেবারে নিরর্থক ছিল না। কিন্তু সে তা গোপন করে একজন ধূর্ত ও বিজ্ঞ রাজনীতিকের ভঙ্গিতে প্রথমে জাদুকরদের উপর বিদ্রোহমূলক অপবাদ আরোপ করল যে, তোমরা মূসা (আ.) -এর সাথে গোপন ষড়যন্ত্র করে এ কাজটি নিজের দেশ ও জাতিকে ক্ষতিগ্রস্ত করার উদ্দেশ্যে করেছ।

اِنَّ هٰذَا لَمَكْرٌ مَّكَرْتُمُوْهُ فِى الْمَدِيْنَةِ অর্থাৎ এটা একটা ষড়যন্ত্র, যা তোমরা প্রতিদ্বন্দ্বিতার মাঠে আসার পূর্বেই শহরের ভিতরে নিজেদের মধ্যে স্থির করে রেখেছিলে। তারপর জাদুকরদেরকে লক্ষ্য করে বলল اٰمَنْتُمْ بِهٖ قَبْلَ اَنْ اٰذَنَ لَكُمْ অর্থাৎ তোমরা কি আমার অনুমতির পূর্বেই ঈমান গ্রহণ করে ফেললে। অস্বীকৃতিবাচক এই কৈফিয়তটি ছিল হুমকি ও তাম্বীহ স্বরূপ। স্বীয় অনুমতির পূর্বে ঈমান আনার কথা বলে লোকেদেরকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করল যে, আমারও কাম্য ছিল যে, হযরত মূসা (আ.)-এর সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ব্যাপারটি যদি প্রতীয়মান হয়ে যায় তাহলে আমিও তাকে মেনে নিব এবং লোকদেরকে ও মুসলামন হওয়ার জন্য অনুমতি দান করব। কিন্তু তোমরা তাড়াহুড়া করলে এবং প্রকৃত তাৎপর্য না বুঝে শুনেই একটি ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে গেলে।

এই চাতুর্যের মাধ্যমে একদিকে লোকের সামনে হযরত মূসা (আ.) -এর মু'জিযা আর জাদুকরদের স্বীকৃতিকে একটা ষড়যন্ত্র সাব্যস্ত করে তাদেরকে আদি বিভ্রান্তিতে ফেলে রাখার ব্যবস্থা করল। অপরদিকে রাজনৈতিক চালাকিটি করল এই যে, হযরত মূসা (আ.)-এর কার্যকলাপ এবং জাদুকরদের ইসলাম গ্রহণ একান্তই ফেরাউনের পথভ্রষ্টতাকে পরিষ্কার করে তুলে ধরার জন্য অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং জাতি ও জনসাধারণের সাথে যার কোনোই সম্পর্ক ছিল না। একটা রাষ্ট্রীয় ও রাজনৈতিক বিষয়ে পরিণত করার উদ্দেশ্যে বলল لِتُخْرِجُوْا مِنْهَآ اَهْلَهَا অর্থাৎ তোমাদের এই ষড়যন্ত্র এজন্য করেছ যে, তোমরা মিসর দেশের উপর জয়লাভ করে এ দেশের অধিবাসীদের এখান থেকে বহিষ্কার করতে চাও। এই চাতুর্য-চালাকির পর সবার উপর নিজের আতঙ্ক এবং সরকারের প্রভাব ও ভীতি সঞ্চার করার জন্য জাদুকরদের হুমকি দিতে আরম্ভ করল। প্রথমে অস্পষ্ট ভঙ্গিতে বলল, فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ অর্থাৎ তোমাদের যে কি পরিণতি তোমরা এখনই দেখতে পাবে। অতঃপর তা পরিষ্কার ভাবে বলল, لَاُقَطِّعَنَّ اَيْدِيَكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَاُصَلِّبَنَّكُمْ اَجْمَعِيْنَ অর্থাৎ 'আমি তোমাদের সবার বিপরীত দিকের হাত পা কেটে তোমাদের সবাইকে শূলিতে চড়াব।' বিপরীত দিকে কাটা অর্থ হলো ডান হাত, বাম পা। যাতে উভয়পার্শ্বে জখমি হয়ে বেকার হয়ে পড়বে।

ফেরাউন এই দুরবাস্থার উপর নিয়ন্ত্রণ লাভ করার জন্য এবং স্বীয় পরিষদবর্গ ও জনগণকে নিয়ন্ত্রণে রাখার উদ্দেশে যথেষ্ট ব্যবস্থা নিয়েছিল। আর তার উৎপীড়নমূলক শাস্তি আগে থেকেই প্রসিদ্ধ এবং অন্তরাত্মাকে কাঁপিয়ে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট ছিল।

কিন্তু ইসলাম ও ঈমান এমন এক প্রবল শক্তি যে, যখন তা কোনো আত্মার বদ্ধমূল হয়ে যায়, তখন মানুষ সমগ্র পৃথিবী ও তার যাবতীয় উপরণের মোকাবিলা করতে তৈরি হয়ে যায়।

যে জাদুকররা কয়েক ঘণ্টা আগেও ফেরাউনকে নিজের খোদা বলে মানত এবং অন্যকেও এই পথভ্রষ্টতার দীক্ষা দিত, কয়েক মুহূর্তে ইসলামের কালেমা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের মধ্যে সে কি জিনিস সৃষ্টি হয়েছিল, যাতে তারা ফেরাউনের যাবতীয় হুমকির উত্তরে বলে উঠে– اِنَّآ اِلٰى رَبِّنَا مُنْقَلِبُوْنَ অর্থাৎ তুমি যদি আমাদেরকে হত্যা করে ফেল তাতে কিছু আসে যায় না, আমরা আমাদের পালনকর্তার কাছেই চলে যাব, যেখানে আমরা সব রকম শান্তি পাব।

قوله فَاقْضِ مَآ اَنْتَ قَاضٍ اِنَّمَا تَقْضِىْ هٰذِهِ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا অর্থাৎ আমাদের ব্যাপারে তোমার যা ইচ্ছা হুকুম দিয়ে দাও। ব্যাস, এতটুকুই তো যে তোমার হুকুম আমাদের পার্থিব জীবনে চলতে পারে এবং তোমার রোষাণলে আমাদের এ জীবন শেষ হয়ে যেতে পারে। কিন্তু ঈমান আনার পর আমাদের দৃষ্টিতে এই পার্থিব জীবনের সে গুরুত্বই অবশিষ্ট রয়নি যা ঈমান আনার পূর্বে ছিল। কারণ আমরা জেনেছি যে, এ জীবন দুঃখে হোক সুখে হোক কেটে যাবেই। চিন্তা সে জীবনের ব্যাপারে করা কর্তব্য যার পরে আর মৃত্যু নেই এবং যার শান্তিও স্থায়ী, অশান্তিও স্থায়ী।

www.almodina.com

চিন্তা করার বিষয় যে, যারা কিছুক্ষণ আগেও নিকৃষ্টতম কুফরিতে আক্রান্ত ছিল, ফেরাউনের মতো একজন বাজে লোককে খোদা হিসেবে মানত, আল্লাহর মহত্ত্ব সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিল, তাদের মধ্যে সহসা এমন বৈপ্লবিক পরিবর্তন কেমন করে এলো যে, এখন বিগত সমস্ত বিশ্বাস ও কার্যক্রম থেকে একেবারে তওবা করে নিয়ে সত্য দীনের উপর এমন বদ্ধমূল হয়ে গেল যে, তার জন্য প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দিতে প্রস্তুত দেখা যায় এবং দুনিয়া থেকে বিগত হয়ে যাওয়াকে এজন্য পছন্দ করে নেয় যে, এতে স্বীয় পালনকর্তার কাছে চলে যেতে পারবে।

শুধু ঈমানের শক্তি এবং আল্লাহর রাহে জিহাদের সৎ সাহসই যে তাদের মধ্যে সৃষ্টি হয় তাই নয়; বরং মনে হয়, তাদের জন্য সত্য ও প্রকৃত মা'রেফত জ্ঞানের দ্বারও যেন উন্মুক্ত হয়ে গিয়েছিল। সে কারণেই ফেরাউনের বিরুদ্ধে এহেন সাহসী বিবৃতি দেওয়ার সাথে সাথে এ প্রার্থনাও করে যে, رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ অর্থাৎ হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদেরকে পরিপূর্ণ ধৈর্য দান কর এবং মুসলমান অবস্থায় আমাদেরকে মৃত্যু দান কর।

এতে সেই মা'রেফতের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে যে, আল্লাহ যদি না চান তাহলে মানুষের সাহস ও দৃঢ়তা কিছু কাজেরই নয়। কাজেই এখানে স্থিরতার প্রার্থনা করা হয়েছে। আর এ প্রার্থনা যেমন সত্যকে চিনে নেওয়ার ফল, তেমনিভাবে সেই বিপদ থেকে মুক্তি পাবার জন্যও সর্বোত্তম উপায়, যাতে তারা তখন পড়েছিল। কারণ ধৈর্য ও দৃঢ়তাই এমন বিষয় যা মানুষকে তার প্রতিপক্ষের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিজয় লাভের নিশ্চয়তা দিতে পারে।

জাদুকরদের ঈমানী বিপ্লব হযরত মূসা (আ.)-এর এক বিরাট মু'জিযা : পরিতাপের বিষয়, ইদানীং মুসলমানগণ এবং মুসলিম রাষ্ট্রসমূহ নিজেদের শক্তিশালী করে তোলার জন্য সকল ব্যবস্থাই অবলম্বন করে চলছে, কিন্তু সে রহস্যটি তারা ভুলে গেছে যা শক্তি ও স্বকীয়তার প্রাণকেন্দ্র। অথচ ফেরাউনের যাদুকরেরাও প্রথম পর্যায়েই তা বুঝে নিয়েছিল। আর তা সারা জীবন আল্লাহর পরিচয়বিমুখ নাস্তিক কাফেরদেরকে মুহূর্তে শুধু যে মুসলমান বানিয়ে দিয়েছিল, তাই নয়; বরং একেকজনকে পরিপূর্ণ আরেফ এবং মুজাহিদে পরিণত করে দিয়েছিল। কাজেই হযরত মূসা (আ.)-এর এই মু'জিযা লাঠি এবং জ্যোতির্ময় হাতের মু'জিযা অপেক্ষা কম ছিল না।

ফেরাউনের উপর হযরত মূসা ও হারুন (আ.)-এর ভীতিজনক প্রতিক্রিয়া : ফেরাউনের ধূর্ততা এবং রাজনৈতিক চাল তার সাথে পুরাতন পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত থাকার ব্যাপারে কিছুটা সহায়ক হয়েছিল বটে, কিন্তু এই বিস্ময়কর ব্যাপারটি তাদের জন্য লক্ষ্য করার মতো ছিল যে, ফেরাউনের সমস্ত রোষাণল জাদুকরদের উপরই শেষ হয়ে গেল। হযরত মূসা (আ.) সম্পর্কে ফেরাউনের মুখ দিয়ে কোনো কথাই বের হলো না। অথচ তিনিই ছিলেন আসল বিরোধী কাজেই তাদেরকে বলতে হলো : أَتَذَرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ অর্থাৎ তাহলে কি তুমি মূসা (আ.) এবং তাঁর সম্প্রদায়কে এমনি ছেড়ে দিবে, যাতে তোমাকে এবং তোমার উপাস্যদেরকে পরিহার করে দেশময় দাঙ্গা ফাসাদ করতে থাকবে?

এতে বাধ্য হয়ে ফেরাউন বলল : سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ অর্থাৎ তাঁর বিষয়টি আমাদের পক্ষে তেমন চিন্তার বিষয় নয়। আমরা তাদের জন্য এই ব্যবস্থা নিব যে, তাদের মধ্যে কোনো পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করলে তাকে হত্যা করব, শুধু কন্যা সন্তানদের বাঁচতে দেব। যার ফলে কিছুকালের মধ্যেই তাদের জাতি পুরুষশূন্য হয়ে পড়বে; থাকবে শুধু নারী আর নারী। আর তারা হবে আমাদের সেবাদাসী। তাছাড়া তাদের উপরে তো আমাদের পরিপূর্ণ ক্ষমতা রয়েছেই; যা ইচ্ছা তাই করব। এরা আমাদের কোনো ক্ষতিই করতে পারবে না।

তাফসীরকার আলেমগণ বলেছেন যে, সম্প্রদায়ের এহেন জেরার মুখেও ফেরাউন একথাই বলল যে, আমরা বনী ইসরাঈলের ছেলে সন্তানদেরকে হত্যা করে দিব, কিন্তু হযরত মূসা ও হারুন (আ.) সম্পর্কে তখনও তার মুখে কোনো কথাই এলোনা। তার কারণ হযরত মূসা (আ.)-এর এই মু'জিযা এবং তার পরবর্তী ঘটনা ফেরাউনের মন-মস্তিষ্কে হযরত মূসা (আ.)-এর ব্যাপারে কঠিন ভীতির সঞ্চার করে দিয়েছিল।

হযরত সাঈদ ইবনে জুবাইর (রা.) বলেন, ফেরাউনের এমন অবস্থা দাঁড়িয়েছিল যে, যখনই সে হযরত মূসা (আ.)-কে দেখত, তখন অচেতন অবস্থায়ই তার পেশাব বেরিয়ে যেত।

ফেরাউন হযরত মূসা (আ.)-এর সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরাজিত হয়ে বনী ইসরাঈলদের প্রতি তার রাগ ঝাড়ল যে, তাদের ছেলেদেরকে জীবিত হত্যা করে মেয়েদেরকে রাখার আইন তৈরি করে দিল। এতে বনী ইসরাঈলরা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল যে, হযরত মূসা (আ.)-এর জন্মের পূর্বে ফেরাউন তাদের উপর যে আজাব চাপিয়ে দিয়েছিল তা আবার চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। আর হযরত মূসা (আ.)ও যখন তা উপলব্ধি করলেন, তখন একান্তই রাসূল জনোচিত সোহাগ ও দর্শনানুযায়ী সে বিপদ থেকে অব্যাহতি লাভের জন্য তাদেরকে দুটি বিষয় শিক্ষাদান করলেন। (এক) শত্রুর মোকাবিলায় আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করা এবং (দুই) কার্যসিদ্ধি পর্যন্ত সাহস ও ধৈর্যধারণ। সেই সঙ্গে একথাও বাতলে দিলেন যে, এই ব্যবস্থা যদি

অবলম্বন করতে পার, তাহলে এ দেশ তোমাদের, তোমরাই জয়ী হবে। এই হলো ১২৮ নং আয়াতের বক্তব্য যাতে বলা হয়েছে– اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا অর্থাৎ আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা কর এবং ধৈর্যধারণ কর। তারপর বলা হয়েছে– إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ অর্থাৎ সমগ্র ভূমি আল্লাহর। তিনি যাকে ইচ্ছা এই ভূমির উত্তরাধিকারী ও মালিক করবেন। তার একথা নিশ্চিত যে, শেষ পর্যন্ত মুত্তাকী পরহেজগারগণই কৃতকার্যতা লাভ করে থাকে। এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, তোমরা যদি পরহেজগারি অবলম্বন কর যার পদ্ধতি উপরে বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা ও ধৈর্যধারণের ব্যাপারে নিয়মানুবর্তী হও, তাহলে শেষ পর্যন্ত তোমরাই হবে মিসর দেশের মালিক ও অধিপতি।

জটিলতা ও বিপদমুক্তির অমোঘ ব্যবস্থা : হযরত মূসা (আ.) শত্রুর উপর বিজয় লাভের জন্য বনী ইসরাঈলদেরকে যে দার্শনিকসুলভ ব্যবস্থার শিক্ষা দান করেছিলেন, গভীরভাবে লক্ষ্য করলে এই হচ্ছে সেই অমোঘ ব্যবস্থা যা কখনও ভুল হয় না এবং যার অবলম্বনে বিজয় সুনিশ্চিত। এই ব্যবস্থার প্রথম অংশটি হলো আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা। এটাই হলো এ ব্যবস্থার প্রকৃত প্রাণ। কারণ বিশ্বস্রষ্টা যার সহায় থাকেন, তার দিকে সমগ্র বিশ্বের সহায়তার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। সমগ্র সৃষ্টি হয় তাঁরই হুকুমের আওতাভুক্ত।

হাদীসে বর্ণিত রয়েছে যে, আল্লাহ যখন কোনো কাজের ইচ্ছা করেন, তখন আপনা থেকেই তার উপকারণাদি সংগৃহীত হতে থাকে। কাজেই শত্রুর মোকাবিলায় বৃহত্তর শক্তিও মানুষের ততটা কাজে আসতে পারে না, যতটা আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা কাজে লাগাতে পারে। অবশ্য তার শর্ত হলো এই যে, সাহায্য প্রার্থনা হতে হবে একান্তই সত্যনিষ্ঠার সাথে শুধু কিছু শব্দের আবৃত্তি নয়।

দ্বিতীয় অংশটি হলো 'সবর' -এর ব্যবস্থা। অভিধান অনুযায়ী সবর এর প্রকৃত অর্থ হলো ইচ্ছাবিরুদ্ধ বিষয়ে ধীরস্থির থাকা এবং রিপুকে আয়ত্তে রাখা। কোনো বিপদে ধৈর্য ধারণকেও সেজন্যই 'সবর' বলা হয় যে, তাতে কান্নাকাটি এবং বিলাপের স্বাভাবিক চেতনাকে দাবিয়ে রাখা হয়।

যে কোনো অভিজ্ঞ বুদ্ধিমান ব্যক্তিই জানেন যে, দুনিয়ার যে কোনো বৃহৎ উদ্দেশ্যে সাধনের পথে বহু ইচ্ছাবিরুদ্ধ পরিশ্রম ও কষ্টসহিষ্ণুতা অপরিহার্য। যে লোক পরিশ্রমের অভ্যাস করে নিতে পারে এবং ইচ্ছাবিরুদ্ধ বিষয়সমূহকে সহ্য করার ক্ষমতা অর্জন করে নিতে পারে, সে তার অধিকাংশ উদ্দেশ্য সিদ্ধি লাভ করতে পারে। হাদীসে রাসূলে কারীম ﷺ-এর ইরশাদ বর্ণিত আছে যে, সবর বা ধৈর্য এমন একটি নিয়ামত, যার চাইতে বিস্তৃত আর কোনো নিয়ামত কেউ পায়নি। –[আবূ দাউদ]

হযরত মূসা (আ.)-এর বিজ্ঞজনোচিত উপদেশ এবং তার প্রেক্ষিতে বিজয় ও কৃতকার্যতার সংক্ষিপ্ত ওয়াদা কুটিলমতি বনী ইসরাঈল কি বুঝবে; এসব শুনে বরং বলে উঠল– أُوذِينَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا অর্থাৎ আপনার আগমনের পূর্বেও আমাদেরকে কষ্টই দেওয়া হয়েছে আর আপনার আগমনের পরেও তাই হচ্ছে।

উদ্দেশ্য ছিল এই যে, আপনার আগমনের পূর্বে তো এ আশায় দিন কেটে যেত যে, আমাদের উদ্ধারের জন্য কোনো একজন পয়গম্বর আসবেন। অথচ এখন আপনার আগমনের পরেও উৎপীড়নের সে ধারাই যদি বহাল থাকল, তাহলে আমরা কি করব।

শব্দবিশ্লেষণ

مَكَرْتُمُوهُ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْمَكْرُ মূলবর্ণ (م ـ ك ـ ر) জিনস صحيح অর্থ– তোমরা প্রতারণা করেছ।

لَأُقَطِّعَنَّ : সীগাহ واحد متكلم বহছ فعل مستقبل معروف در لام تاكيد بانون تاكيد ثقيلة বাব تَفْعِيل মাসদার اَلتَّقْطِيْعُ মূলবর্ণ (ق ـ ط ـ ع) জিনস صحيح অর্থ– আমি অবশ্যই অবশ্যই কর্তন করব।

لَأُصَلِّبَنَّ : সীগাহ واحد متكلم বহছ فعل مستقبل معروف در لام تاكيد بانون تاكيد ثقيلة বাব تَفْعِيل মাসদার اَلتَّصْلِيْبُ মূলবর্ণ (ص ـ ل ـ ب) জিনস صحيح অর্থ– অবশ্যই অবশ্যই আমি শূলিবিদ্ধ করব।

تَذَرُ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْوَذْرُ মূলবর্ণ (و ـ ذ ـ ر) জিনস مثال واوى অর্থ– তুমি ছেড়ে দিবে।

قٰهِرُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব فَتَحَ মাসদার اَلْقَهْرُ মূলবর্ণ (ق ـ ه ـ ر) জিনস صحيح অর্থ– প্রবল, ক্ষমতাবান, পরাস্তকারী।

اسْتَعِيْنُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ امر حاضر معروف বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِسْتِعَانَةُ মূলবর্ণ (ع ـ و ـ ن) জিনস اجوف واوى অর্থ– তোমরা সাহায্য প্রার্থনা কর।

اُوْذِيْنَا : সীগাহ جمع متكلم বহছ اثبات فعل ماضى مجهول বাব افتعال মাসদার اَلْاِيْذَاءُ মূলবর্ণ (ا ـ ذ ـ ى) জিনস মুরাক্কাব مهموز فاء ও ناقص يائى অর্থ– আমরা নির্যাতিত হয়েছি।

www.almodina.com

فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هٰذِهِ ۚ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسٰى وَمَنْ مَّعَهُ ۗ أَلَا إِنَّمَا طٰٓئِرُهُمْ عِنْدَ اللّٰهِ وَلٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (١٣١)	**অনুবাদ :** (১৩১) অতএব, যখন উপস্থিত হতো তাদের প্রতি সুঅবস্থা তখন বলত, এটা তো যেন আমাদের জন্য হওয়াই চাই, আর যদি উপস্থিত হতো তাদের প্রতি কোনো দুরবস্থা তখন মূসা ও তাঁর সঙ্গীদের অশুভ লক্ষণ বলে মন্তব্য করত, স্মরণ রেখ, তাদের [এই] অশুভ লক্ষণ [-এর কারণ] আল্লাহ তা'আলার জ্ঞানে রয়েছে, কিন্তু তাদের অধিকাংশ লোক জানত না।
وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهٖ مِنْ اٰيَةٍ لِّتَسْحَرَنَا بِهَا ۙ فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ (١٣٢)	(১৩২) আর এরূপ বলত যে, যত চমকপ্রদ বিষয়ই আমাদের নিকট আনয়ন কর যে, তা দ্বারা আমাদের প্রতি জাদু চালনা করার জন্য, তবুও আমরা তোমার কথা কিছুতেই মানব না।
فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ اٰيٰتٍ مُّفَصَّلٰتٍ ۟ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُّجْرِمِينَ (١٣٣)	(১৩৩) অতঃপর আমি তাদের প্রতি প্রেরণ করলাম, তূফান এবং পঙ্গপাল এবং ঘুণ-কীট এবং ভেক ও রক্ত, এ সমস্ত স্পষ্ট মু'জিযা ছিল। তবুও তারা অহংকার করতে রইল এবং তারা ছিলও অপরাধপরায়ণ জাতি।
وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يٰمُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ ۚ لَئِنْ كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِيٓ إِسْرَآءِيلَ (١٣٤)	(১৩৪) আর যখন তাদের উপর কোনো আজাব আপতিত হতো তখন এরূপ বলত, হে মূসা! আমাদের জন্য নিজ পরওয়ারদেগারের সমীপে সেই দোয়া করুন যে সম্বন্ধে তিনি আপনার সাথে ওয়াদা করে রেখেছেন, যদি আপনি এই আজাবকে আমাদের হতে বিদূরিত করে দেন, তবে অবশ্যই আমরা আপনার কথানুসারে ঈমান আনব এবং আমরা বনী ইসরাঈলদেরকেও মুক্ত করে আপনার সঙ্গে যেতে দিব।

শাব্দিক অনুবাদ

(১৩১) فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ অতএব, যখন উপস্থিত হতো তাদের প্রতি সুঅবস্থা। قَالُوا তখন বলত لَنَا هٰذِهِ এটা তো যেন আমাদের জন্য হওয়াই চাই وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ আর যদি উপস্থিত হতো তাদের প্রতি কোনো দুরবস্থা। يَطَّيَّرُوا তখন অশুভ লক্ষণ বলে মন্তব্য করত بِمُوسٰى وَمَنْ مَّعَهُ মূসা ও তাঁর সঙ্গীদের أَلَا إِنَّمَا طٰٓئِرُهُمْ স্মরণ রেখ, তাদের [এই] অশুভ লক্ষণ [-এর কারণ] عِنْدَ اللّٰهِ আল্লাহ তা'আলার জ্ঞানে রয়েছে وَلٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ কিন্তু তাদের অধিকাংশ লোক জানত না।

(১৩২) وَقَالُوا আর এরূপ বলত যে مَهْمَا تَأْتِنَا بِهٖ مِنْ اٰيَةٍ যত চমকপ্রদ বিষয়ই আমাদের নিকট আনয়ন কর যে لِتَسْحَرَنَا بِهَا তা দ্বারা আমাদের প্রতি জাদু চালনা করার জন্য فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ তবুও আমরা তোমার কথা কিছুতেই মানব না।

(১৩৩) فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ অতঃপর আমি তাদের প্রতি প্রেরণ করলাম الطُّوفَانَ তূফান وَالْجَرَادَ এবং পঙ্গপাল وَالضَّفَادِعَ এবং ঘুণ-কীট وَالدَّمَ এবং ভেক ও রক্ত اٰيٰتٍ مُّفَصَّلٰتٍ এ সমস্ত স্পষ্ট মু'জিযা ছিল فَاسْتَكْبَرُوا তবুও তারা অহংকার করতে রইল وَكَانُوا قَوْمًا مُّجْرِمِينَ এবং তারা ছিলও অপরাধপরায়ণ জাতি।

(১৩৪) وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ আর যখন তাদের উপর কোনো আজাব আপতিত হতো قَالُوا তখন এরূপ বলত يٰمُوسَى হে মূসা! ادْعُ لَنَا رَبَّكَ আমাদের জন্য নিজ পরওয়ারদেগারের সমীপে সেই দোয়া করুন بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ যে সম্বন্ধে তিনি আপনার সাথে ওয়াদা করে রেখেছেন لَئِنْ كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ যদি আপনি এই আজাবকে আমাদের হতে বিদূরিত করে দেন لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ তবে অবশ্যই আমরা আপনার কথানুসারে ঈমান আনব وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِيٓ إِسْرَآءِيلَ এবং আমরা বনী ইসরাঈলদেরকেও মুক্ত করে আপনার সঙ্গে যেতে দিব।

www.almodina.com

অনুবাদ	আয়াত
অনুবাদ : (১৩৫) অতঃপর যখন আমি তাদের থেকে সেই আজাবকে এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত যে পর্যন্ত তাদের উপনীত হওয়া অনিবার্য ছিল দূর করে দিতাম, তখন তারা সঙ্গে সঙ্গেই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করতে আরম্ভ করত।	فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ اِلٰٓى اَجَلٍ هُمْ بٰلِغُوْهُ اِذَا هُمْ يَنْكُثُوْنَ (١٣٥)
(১৩৬) অতঃপর আমি তাদের হতে প্রতিশোধ নিলাম, অর্থাৎ তাদেরকে নদীগর্ভে নিমজ্জিত করে দিলাম, এ কারণে যে, তারা আমার আয়াতগুলোকে মিথ্যা সাব্যস্ত করত এবং তার প্রতি সম্পূর্ণ অমনোযোগিতা প্রদর্শন করত।	فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَاَغْرَقْنٰهُمْ فِى الْيَمِّ بِاَنَّهُمْ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَكَانُوْا عَنْهَا غٰفِلِيْنَ (١٣٦)
(১৩৭) আর আমি সেই লোকদেরকে যারা অতি দুর্বল বিবেচিত হতো, সেই ভূখণ্ডের পূর্ব ও পশ্চিমের উত্তরাধিকারী করে দিলাম যাতে আমি [জাহেরী ও বাতেনী] বরকত রেখেছি, আর আপনার প্রতিপালকের মঙ্গলকর অঙ্গীকার বনী ইসরাঈলদের প্রতি পূর্ণ হলো, তাদের ধৈর্যধারণের দরুন, আর আমি ধ্বংস করে দিলাম ফেরাউনের ও তার সম্প্রদায়ের তৈরি কারখানাসমূহ এবং যে সকল সুউচ্চ প্রাসাদগুলো তারা নির্মাণ করত।	وَاَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِيْنَ كَانُوْا يُسْتَضْعَفُوْنَ مَشَارِقَ الْاَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِىْ بٰرَكْنَا فِيْهَا ؕ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنٰى عَلٰى بَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ ۙ۬ بِمَا صَبَرُوْا ؕ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهٗ وَمَا كَانُوْا يَعْرِشُوْنَ (١٣٧)

শাব্দিক অনুবাদ

(১৩৫) فَلَمَّا كَشَفْنَا অতঃপর যখন আমি দূর করে দিতাম عَنْهُمُ الرِّجْزَ তাদের থেকে সেই আজাবকে اِلٰٓى اَجَلٍ এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত هُمْ بٰلِغُوْهُ যে পর্যন্ত তাদের উপনীত হওয়া অনিবার্য ছিল اِذَا هُمْ يَنْكُثُوْنَ তখন তারা সঙ্গে সঙ্গেই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করতে আরম্ভ করত।

(১৩৬) فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ অতঃপর আমি তাদের হতে প্রতিশোধ নিলাম فَاَغْرَقْنٰهُمْ فِى الْيَمِّ অর্থাৎ তাদেরকে নদীগর্ভে নিমজ্জিত করে দিলাম بِاَنَّهُمْ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا এ কারণে যে, তারা আমার আয়তগুলোকে মিথ্যা সাব্যস্ত করত। وَكَانُوْا عَنْهَا غٰفِلِيْنَ এবং তার প্রতি সম্পূর্ণ অমনোযোগিতা প্রদর্শন করত।

(১৩৭) وَاَوْرَثْنَا الْقَوْمَ আর আমি সেই লোকদেরকে উত্তরাধিকারী করে দিলাম الَّذِيْنَ كَانُوْا يُسْتَضْعَفُوْنَ যারা অতি দুর্বল বিবেচিত হতো مَشَارِقَ الْاَرْضِ وَمَغَارِبَهَا সেই ভূখণ্ডের পূর্ব ও পশ্চিমের الَّتِىْ بٰرَكْنَا فِيْهَا যাতে আমি [জাহেরী ও বাতেনী] বরকত রেখেছি وَتَمَّتْ আর পূর্ণ হলো كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنٰى আপনার প্রতিপালকের মঙ্গলকর অঙ্গীকার عَلٰى بَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ বনী ইসরাঈলদের প্রতি। بِمَا صَبَرُوْا তাদের ধৈর্যধারণের দরুন وَدَمَّرْنَا আর আমি ধ্বংস করে দিলাম مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهٗ ফেরাউনের ও তার সম্প্রদায়ের তৈরি কারখানাসমূহ وَمَا كَانُوْا يَعْرِشُوْنَ এবং যে সকল সুউচ্চ প্রাসাদগুলো তারা নির্মাণ করত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قوله فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوْفَانَ وَالْجَرَادَ الخ আলোচ্য আয়াতগুলোতে ফেরাউনের সম্প্রদায় এবং হযরত মূসা (আ.)-এর অবশিষ্ট কাহিনীর আলোচনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, ফেরাউনের জাদুকররা হযরত মূসা (আ.)-এর সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় হেরে গিয়ে ঈমান এনেছে, কিন্তু ফেরাউনের সম্প্রদায় তেমনি ঔদ্ধত্য ও কুফরিতে আঁকড়ে রয়েছে।

এ ঘটনার পর ঐতিহাসিক বর্ণনা অনুযায়ী হযরত মূসা (আ.) বিশ বছর যাবৎ মিসরে অবস্থান করে সেখানকার অধিবাসীদেরকে আল্লাহর বাণী শোনান এবং সত্য ও সরল পথের দিকে আহ্বান করতে থাকেন। এ সময়ে আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ.)-কে নয়টি মু'জিযা দান করেছিলেন। এগুলোর উদ্দেশ্য ছিল ফেরাউনের সম্প্রদায়কে সতর্ক করে সত্য পথে আনা وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسٰى تِسْعَ اٰيٰتٍ; আয়াতে এই নয়টি মু'জিযা সম্পর্কেই বলা হয়েছে। এ নয়টি মু'জিযার মধ্যে প্রথম দুটি মু'জিযা অর্থাৎ লাঠির সাপে পরিণত হওয়া এবং হাতের কিরণময় হওয়া ফেরাউনের দরবারে প্রকাশিত হয়। আর এগুলোর মাধ্যমেই জাদুকরদের বিরুদ্ধে হযরত মূসা (আ.) জয়লাভ করেন। তারপরের একটি মু'জিযা যার আলোচনা পূর্ববর্তী আয়াতে করা হয়েছে, তা ছিল ফেরাউনের সম্প্রদায়ের হঠকারিতা ও দুরাচরণের ফলে দুর্ভিক্ষের আগমন। যাতে তাদের ক্ষেতের ফসল এবং বাগ-বাগিচার উপাদান চরমভাবে হ্রাস পেয়েছিল। ফলে এরা অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে পড়ে এবং শেষ পর্যন্ত হযরত মূসা (আ.)-এর মাধ্যমে দুর্ভিক্ষ থেকে মুক্তি লাভের দোয়া করায়। কিন্তু দুর্ভিক্ষ রহিত হয়ে গেলে পুনরায় নিজেদের ঔদ্ধত্যে লিপ্ত হয় এবং বলতে শুরু করে যে, এই দুর্ভিক্ষ তো মূসা (আ.) -এর সঙ্গী সাথীদের অলক্ষণের দরুনই আপতিত হয়েছিল। আর এখন যে দুর্ভিক্ষ রহিত হয়েছে তা হলে আমাদের সুকৃতির স্বাভাবিক ফলশ্রুতি। এমনটিই তো আমাদের প্রাপ্য।

পরবর্তী ছয়টি মু'জিযার বিষয় আলোচিত হয়েছে আলোচ্য আয়াতগুলোতে। فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوْفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ اٰيٰتٍ مُّفَصَّلٰتٍ অর্থাৎ অতঃপর আমি তাদের উপর পাঠিয়েছি তুফান, পঙ্গপাল, ঘুণ পোকা, বেঙ এবং রক্ত। এতে ফেরাউনের সম্প্রদায়ের উপর আপতিত পাঁচ রকমের আজাবের কথা আলোচিত হয়েছে এবং এগুলোকে উক্ত আয়াতে وَالدَّمَ اٰيٰتٍ مُّفَصَّلٰتٍ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর তফসীর অনুযায়ী এর অর্থ হলো এই যে, এগুলোর মধ্যে প্রত্যেকটি আজাবই নির্ধারিত সময় পর্যন্ত থেকে রহিত হয়ে যায় এবং কিছু সময় বিরতির পর দ্বিতীয় ও তৃতীয় আজাব পৃথক পৃথকভাবে আসে।

ইবনে মুনযির হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করেছেন যে, এর প্রতিটি আজাব ফেরাউনের সম্প্রদায়ের উপর সাত দিন করে স্থায়ী হয়। শনিবার দিন শুরু হয়ে দ্বিতীয় শনিবারে রহিত হয়ে যেত এবং পরবর্তী আজাব আসা পর্যন্ত তিন সপ্তাহের অবকাশ দেওয়া হতো।

ইমাম বগভী (র.) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন যে, প্রথমবার যখন ফেরাউনের সম্প্রদায়ের উপর দুর্ভিক্ষের আজাব চেপে বসে এবং হযরত মূসা (আ.)–এর দোয়ায় তা রহিত হয়ে যায়, কিন্তু তারা নিজেদের ঔদ্ধত্য থেকে বিরত হয় না, তখন হযরত মূসা (আ.) প্রার্থনা করেন, হে আমার পরওয়ারদেগার! এরা এতই উদ্ধত যে, দুর্ভিক্ষের আজাবেও প্রভাবিত হয়নি; নিজেদের কৃত প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেছে। এবার তাদের উপর এমন কোনো আজাব চাপিয়ে দাও, যা হবে তাদের জন্য বেদনাদায়ক এবং আমাদের জাতির জন্য উপদেশের কাজ করবে ও পরবর্তীদের জন্য যা হবে ভৎসনামূলক শিক্ষা। তখন আল্লাহ তা'আলা প্রথমে তাদের উপর নাজিল করেন তুফানজনিত আজাব। প্রখ্যাত মুফাসসিরগণের মতে তুফান অর্থ পানির তুফান। অর্থাৎ জলোচ্ছ্বাস। তাতে ফেরাউনের সম্প্রদায়ের সমস্ত ঘর বাড়ি ও জমি জমা জলোচ্ছ্বাসের আবর্তে এসে যায়। না থাকে কোথাও শোয়া বসার জায়গা, না থাকে জমিতে চাষ বাসের কোনো ব্যবস্থা আরো আশ্চর্যের বিষয় ছিল এই যে, ফেরাউনের সম্প্রদায়ের সঙ্গেই ছিল বনী ইসরাঈলদের ও জমা-জমি ও ঘরবাড়ি। অথচ বনী ইসরাঈলদের ঘর-বাড়ি ও জমি-জমা সবই ছিল শুষ্ক। সেগুলোর কোথাও জলোচ্ছ্বাসের পানি ছিল না, অথচ ফেরাউনের সম্প্রদায়ের জমি ছিল অথৈ পানির নীচে।

এই জলোচ্ছ্বাসে ভীত হয়ে ফেরাউন সম্প্রদায় হযরত মূসা (আ.)-এর নিকট প্রার্থনা করল যে, আপনার পরওয়ারদেগারের দরবারে দোয়া করুন যাতে এ আজাব দূর হয়ে যায়, তাহলে আমরা ঈমান আনব এবং বনী ইসরাঈলদেরকে মুক্ত করে দিব। হযরত মূসা (আ.)-এর দোয়ায় জলোচ্ছ্বাসের তুফান রহিত হয়ে গেল এবং তারপর তাদের শস্য ফসল অধিকতর সবুজ শ্যামল হয়ে উঠল। তখন তারা বলতে আরম্ভ করল যে, আদতে এই তুফান তথা জলোচ্ছ্বাস কোনো আজাব ছিল না; বরং আমাদের ফয়দার জন্যই তা এসেছিল। যার ফলে আমাদের শস্যভূমি উৎপাদন ক্ষমতা বেড়ে গেছে। সুতরাং হযরত মূসা (আ.)-এর এতে কোনো দখল নেই। এসব কথা বলেই তারা কৃত প্রতিজ্ঞার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করতে শুরু করে।

www.almodina.com

এভাবে এরা মাসাধিককাল সুখে-শান্তিতে বসবাস করতে থাকে। আল্লাহ তাদের চিন্তা-ভাবনার অবকাশ দান করলেন। কিন্তু তাদের চৈতন্যোদয় হলো না। তখন দ্বিতীয় আজাব পঙ্গপালকে তাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হলো। এই পঙ্গপাল তাদের সমস্ত শস্য, ফসল ও বাগানের ফল-ফলারী খেয়ে নিঃশেষ করে ফেলল। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যেত, কাঠের দরজা জানালা ছাদ প্রভৃতিসহ ঘরে ব্যবহার্য সমস্ত আসবাবপত্র পঙ্গপালেরা খেয়ে শেষ করে ফেলেছিল। আর এ আজাবের ক্ষেত্রেও মূসা (আ.)-এর মু'জিযা পরিলক্ষিত হয় যে, এই সমস্ত পঙ্গপালই শুধুমাত্র কিবতী বা ফেরাউনের সম্প্রদায়ের শস্যক্ষেত্র ও ঘর বাড়িতে ছেয়ে গিয়েছিল। সংলগ্ন ইসরাঈলীদের ঘরবাড়ি, শস্যভূমি ও বাগ-বাগিচা সম্পূর্ণ সুরক্ষিত থাকে।

এবারও ফেরাউনের সম্প্রদায় চিৎকার করতে লাগল এবং হযরত মূসা (আ.)-এর নিকট আবেদন জানাল যে, এবার আপনি আল্লাহ তা'আলার দরবারে দোয়া করে আজাব সরিয়ে দিলে আমরা পাকা ওয়াদা করছি যে, ঈমান আনব এবং বনী ইসরাঈলদেরকে মুক্তি দিয়ে দিব। তখন হযরত মূসা (আ.) আবার দোয়া করলেন এবং এ আজাবও সরে গেল। আজাব সরে যাওয়ার পর তারা দেখল যে, আমাদের কাছে এখনও এ পরিমাণ খাদ্যশস্য মজুদ রয়েছে, যা আমরা আরও বছরকাল খেতে পারব। তখন আবার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করতে এবং ঔদ্ধত্য প্রদর্শনে প্রবৃত্ত হলো। ঈমানও আনল না, বনী ইসরাঈলদেরকেও মুক্তি দিল না। আবার আল্লাহ তা'আলা এক মাসের জন্য অবকাশ দান করলেন। এই অবকাশের পর তাদের উপর চাপালেন তৃতীয় আজাব قُمَّلَ (কোম্মালা)। قُمَّلَ সে উকুনকে বলা হয়, যা মানুষের চুলে বা কাপড়ে জন্মে থাকে এবং সেসব পোকা বা কীটকেও বলা হয় , যা কোনো কোনো সময় খাদ্য শস্যে পড়ে এবং যাকে সাধারণত ঘুণ এবং কেরী পোকাও বলা হয়। কোম্মালের এ আজাবে সম্ভবত উভয় রকমের পোকাই অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাদের খাদ্যশস্যেও ঘুণ ধরেছিল এবং শরীরে মাথায়ও উকুন পড়েছিল বিপুল পরিমাণে।

সে যুগের ফলে খাদ্যশস্যের অবস্থা দাঁড়িয়েছিল যে, দশ সের গমে তিন সের আটাও হতো না। আর উকূন তাদরে চুল ভ্রু পর্যন্ত খেয়ে ফেলেছিল।

শেষে আবার ফেরাউনের সম্প্রদায় ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল এবং হযরত মূসা (আ.)-এর নিকট এসে ফরিয়াদ করল, এবার আর আমরা ওয়াদা ভঙ্গ করব না, আপনি দোয়া করুন। হযরত মূসা (আ.)–এর দোয়ায় এ আজাবও চলে গেল। কিন্তু যে হতভাগাদের জন্য ধ্বংসই ছিল অনিবার্য এরা প্রতিজ্ঞা পূরণ করবে কেমন করে। অব্যাহতি লাভের সাথে সাথে সবই ভুলে গেল এবং অস্বীকার করে বসল।

তারপর আবার একমাসের সময় দেওয়া হলো। যাতে প্রচুর আরাম আয়েশে কাটাল। কিন্তু যখন এই অবকাশেরও কোনো সুযোগ নিল না , তখন চতুর্থ আজাব হিসাবে এসে হাজির হলো বেঙ। এত অধিক সংখ্যায় ব্যাঙ তাদের ঘরে জন্মাল যে, কোনোখানে বসতে গেলে গলা পর্যন্ত উঠত ব্যাঙের স্তুপ। শুতে গেলে বেঙের স্তুপের নীচে তলিয়ে যেতে হতো, পাশ ফেরা অসম্ভব হয়ে পড়ত। রান্নার হাড়ি, আটা চালের মটকা বা টিন সব কিছুই ব্যাঙে ভরে যেত। এই আজাবে অসহ্য হয়ে সবাই বিলাপ করতে লাগল এবং আগের চাইতেও পাকাপাকি ওয়াদার পর হযরত মূসা (আ.)–এর দোয়ায় এ আজাবও সরলো।

কিন্তু যে জাতির উপর খোদায়ী গজব চেপে থাকে তাদের বুদ্ধি-বিবেচনা, জ্ঞান-চেতনা কোনো কাজই করে না। কাজেই এ ঘটনার পরেও আজাব থেকে মুক্তি পেয়ে এরা আবারও নিজেদের হঠকারিতায় আঁকড়ে বসল এবং বলতে আরম্ভ করল যে, এবার তো আমাদের বিশ্বাস আরও দৃঢ় হয়ে গেছে যে, হযরত মূসা (আ.) মহাজাদুকর, আর এসবই তাঁর জাদুর কীর্তিকাণ্ড।

অতঃপর আরেক মাসের জন্য আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে অব্যাহতি দান করলেন, কিন্তু তারা এবারও কোনো সুযোগ নিল না। তখন এল পঞ্চম আজাব 'রক্ত'। তাদের সমস্ত পানাহারের বস্তু রক্তে রূপান্তরিত হয়ে গেল। কূপ কিংবা হাউজ থেকে পানি তুলে আনলে তা রক্ত হয়ে যায়, খাবার রান্না করার জন্য তৈরি করে নিলে, তাও রক্ত হয়ে যায়। কিন্তু এ সমস্ত আজাবের বেলায়ই হযরত মূসা (আ.)-এর এ মু'জিযা বরাবর প্রকাশ পেতে থকে যে, যে কোনো আজাব থেকে ইসরাঈলীরা থাকে মুক্ত ও সুরক্ষিত । রক্তের আজাবের সময় ফেরাউনের সম্প্রদায়ের লোকেরা বনী ইসরাঈলদের বাড়ি থেকে পানি চাইত। কিন্তু তা তাদের হাতে যাওয়া মাত্র রক্তে পরিণত হয়ে যেত। একই দস্তরখানে ব'সে কিবতী ও বনী ইসরাঈল খাবার খাচ্ছে খাবার খেতে গেলে যে লোকমাটি বনী ইসরাঈলরা তুলতো তা যথারূপ থাকত, কিন্তু যে লোকমা বা

www.almodina.com

পানির ঘোট কোনো কিবতী মুখে তুলত তাই রক্ত হয়ে যেত। এ আজাবও পূর্বরীতি অনুযায়ী সাত দিন পর্যন্ত স্থায়ী হলো এবং আবার এই দুরাচার প্রতিজ্ঞাভঙ্গকারী জাতি চীৎকার করতে লাগল। অতঃপর হযরত মূসা (আ.)-এর নিকট ফরিয়াদ করল এবং অধিকতর দৃঢ়ভাবে ওয়াদা করল। দোয়া করা হলে এ আজাবও সরে গেল, কিন্তু এরা তেমনি গোমরাহীতে স্থির থাকল। এ বিষয়েই কুরআন বলেছে : فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ অর্থাৎ এরা আত্মগর্ব প্রকাশ করতে থাকল। বস্তুত এরা ছিল অপরাধে অভ্যস্ত জাতি।

অতঃপর ষষ্ঠ আজাবের আলোচনা প্রসঙ্গে আয়াতে رِجْز -এর নাম বলা হয়েছে। এই শব্দটি অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্লেগ রোগকে বুঝাবার জন্য ব্যবহৃত হয়। অবশ্য বসন্ত প্রভৃতি মহামারীকেও رِجْز (রিজয) বলা হয়।

তাফসীর সংক্রান্ত রেওয়ায়েতে উল্লেখ রয়েছে যে, ওদের উপর প্লেগের মহামারী চাপিয়ে দেওয়া হয়, যাতে তাদের সত্তর হাজার লোকের মৃত্যু ঘটেছিল। তখন আবারও তারা নিবেদন করে এবং পুনরায় দোয়া করা হলে প্লেগের আজাবও তাদের উপর থেকে সরে যায়। কিন্তু তারা যথারীতি ওয়াদা ভঙ্গ করে। ক্রমাগত এতবার পরীক্ষা ও অবকাশ দানের পরেও যখন তাদের মধ্যে অনুভূতির সৃষ্টি হয়নি তখন চলে আসে সর্বশেষ আজাব। তাহলো এই যে, তারা নিজেদের ঘর বাড়ি, জমি-জমা ও আসবাবাপত্র ছেড়ে হযরত মূসা (আ.)–এর পশ্চাদ্ধাবনের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ে এবং শেষ পর্যন্ত লোহিত সাগরের গ্রাসে পরিণত হয়। তাই বলা হয়েছে–

فَأَغْرَقْنٰهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِاٰيٰتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غٰفِلِينَ ـ قوله وَاَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْاَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بٰرَكْنَا فِيهَا

অর্থাৎ যে জাতিকে দুর্বল ও হীন বলে মনে করা হতো, তাদেরকে আমি সে ভূমির উদয়াচল ও অস্তাচলের অধিপতি বানিয়ে দিয়েছি, যাতে আমি রেখেছি বরকত বা আশীর্বাদ।

কুরআনের শব্দগুলো লক্ষ্য করলে দেখা যায়, এতে যে জাতিকে ফেরাউনের সম্প্রদায় দুর্বল ও হীন মনে করেছিল' বলা হয়েছে। এ কথা বলা হয়নি যে, 'যে জাতি দুর্বল ও হীন ছিল'; এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা 'যে জাতির সহায়তায় থাকেন প্রকৃতপক্ষে তারা কখনও দুর্বল হয় না। যদিও কোনো সময় তাদের বাহ্যিক অবস্থা দেখে অন্যান্য লোক ধোঁকায় পড়ে যায় এবং তাদেরকে দুর্বল বলে মনে করে বসে। কিন্তু শেষ পরিণতির ক্ষেত্রে সবাই দেখতে পায় যে, তারা মোটেই দুর্বল ও হীন ছিল না। কারণ প্রকৃত শক্তি ও মর্যাদা সম্পূর্ণভাবে আল্লাহরই হাতে।

আর জমিনের মালিক বানিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে وَاَوْرَثْنَا শব্দটি ব্যবহার করে বলেছেন যে, তাদেরকে উত্তরাধিকারী বানিয়েছি। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, 'ওয়ারিশ' বা উত্তরাধিকারী যেমন করে নিজের পূর্ব পুরুষের সম্পদের অধিকারী হয় এবং পিতার জীবদ্দশায়ই সবাই একথা জেনে নিতে পারে যে, শেষ পর্যন্ত তাঁর ধন সম্পদের মালিক তাঁর সন্তানেরাই হবে, তেমনিভাবে আল্লাহর জানা মতে বনী ইসরাঈলরা পূর্ব থেকেই কওমে ফেরাউনের ধন সম্পদের অধিকারী ছিল।

مَشَارِقَ শব্দটি مَشْرِقَ-এর বহুবচন। আর مَغَارِبُ হচ্ছে مَغْرِبٌ এর বহুবচন। শীত ও গ্রীষ্মের বিভিন্ন ঋতুতে যেহেতু সূর্যের উদয়াস্ত পরিবর্তিত হয়ে থাকে, সেহেতু এখানে 'মাশরিক' (উদয়াচলসমূহ) এবং 'মাগরিব' (অস্তাচলসমূহ) বহুবচন জ্ঞাপক শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। আর ভূমি ও জমিন বলতে এক্ষেত্রে অধিকাংশ মুফাসসিরীনের মতে শাম বা সিরিয়া ও মিসর ভূমিকেই উদ্দেশ্য করা হয়েছে– যাতে আল্লাহ তা'আলা কওমে ফেরাউন ও কওমে আ'মালেকাকে ধ্বংস করার পর বনী ইসরাঈলকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন এবং শাসনক্ষমতা দান করেছিলেন।

হযরত মূসা (আ.) যখন স্বীয় সম্প্রদায়ের সাথে সাহায্যের ওয়াদা করেছিলেন তখনও তিনি জাতিকে বলেছিলেন যে, আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা এবং একান্ত দৃঢ়তার সাথে বিপদাপদের মোকাবিলা করাই কৃতকার্যতার চাবিকাঠি। হযরত হাসান বসরী (র.) বলেছেন যে, এ আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মানুষ যদি এমন কোনো লোক বা দলের প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন হয়, যাকে প্রতিহত করা তার ক্ষমতার বাইরে, তবে সে ক্ষেত্রে কৃতকার্যতা ও কল্যাণের সঠিক পথ হলো তার মোকাবিলা না করে; বরং সবর করা। তিনি বলেন, যখন কোনো ব্যক্তি অপর কোনো ব্যক্তির উৎপীড়নের মোকাবিলা উৎপীড়নের মাধ্যমে করে অর্থাৎ নিজেই নিজের প্রতিশোধ নেওয়ার চিন্তা করে, তখন আল্লাহ তা'আলা তাকে তার শক্তি-সামর্থ্যের উপর ছেড়ে দেন। তাতে সে কৃতকার্য হোক, কি অকৃতকার্য হোক– সে ব্যাপারে তাঁর কোনো দায়িত্ব থাকে না। পক্ষান্তরে যখন কোনো লোক মানুষের উৎপীড়নের মোকাবিলা ধৈর্য বা সবর এবং আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনার মাধ্যমে করে, তখন আল্লাহ স্বয়ং তার জন্য পথ খুলে দেন।

www.almodina.com

আর যেভাবে আল্লাহ বনী ইসরাঈলের সাথে তাদের সবর ও দৃঢ়তার প্রেক্ষিতে এই ওয়াদা করেছিলেন যে, তাদেরকে শত্রুর উপর বিজয় এবং জমিনের উপর শাসনক্ষমতা দান করবেন, তেমনিভাবে মহানবী ﷺ -এর উম্মতের প্রতিও ওয়াদা করেছেন। وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى الْاَرْضِ
আর যেভাবে বনী ইসরাঈলরা আল্লাহর ওয়াদা প্রত্যক্ষ করেছিল মহানবী (সা.)-এর উম্মতরা তার চেয়েও প্রকৃষ্টভাবে আল্লাহর সাহায্য প্রত্যক্ষ করেছে; সমগ্র বিশ্বে তাদের শাসন ও রাষ্ট্রকে ব্যাপাক করে দেওয়া হয়েছে। –[রূহুল বয়ান]

শব্দবিশ্লেষণ

يَطَّيَّرُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ اثبات فعل مضارع معروف বাব تَفَعُّلْ মাসদার اَلتَّطَيُّرُ মূলবর্ণ (ط . ى . ر) জিনস اجوف يائى অর্থ– তারা অক্ষুণে বলে অভিহিত করে।

اَلْجَرَادُ : শব্দটি বহুবচন; একবচন جَرَادَةٌ অর্থ– পঙ্গপাল, ফড়িং।

اَلْقُمَّلُ : শব্দটি বহুবচন; একবচন قُمْلَةٌ অর্থ– উকুন, ঘুণকীট।

اَلضَّفَادِعُ : শব্দটি বহুবচন; একবচন ضِفْدَعٌ অর্থ– বেঙ।

لَنُؤْمِنَنَّ : সীগাহ جمع متكلم বহছ فعل مستقبل معروف در لام تاكيد بانون تاكيد ثقيلة বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِيْمَانُ মূলবর্ণ (ا . م . ن) জিনস مهموز فاء অর্থ– অবশ্যই অবশ্যই আমরা ঈমান আনব।

يَنْكُثُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ اثبات فعل مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلنَّكْثُ মূলবর্ণ (ن . ك . ث) জিনস صحيح অর্থ– তারা অঙ্গীকার ভঙ্গ করে।

كَانُوْا يَعْرِشُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ اثبات فعل ماضى استمرارى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْعَرْشُ মূলবর্ণ (ع . ر . ش) জিনস صحيح অর্থ– তারা সুউচ্চ করেছিল, তারা সুউচ্চ প্রাসাদগুলো নির্মাণ করেছিল।

www.almodina.com

অনুবাদ : (১৩৮) আর আমি বনী ইসরাঈলদেরকে নদী হতে [অপর] তীরে পৌছে দিলাম, অনন্তর তারা এমন এক সম্প্রদায়ের নিকট পৌছল, যারা নিজেদের কতগুলো প্রতিমার সন্নিকটে [উপাসনার উদ্দেশ্যে] বসে রয়েছে। বনী ইসরাঈলরা বলল, হে মূসা! আমাদের জন্যও এরূপ একটি উপাস্য নির্ধারণ করে দিন, যেরূপ এদের এই উপাস্যগুলো। মূসা বললেন, বাস্তবিকই তোমাদের মধ্যে মূর্খতা রয়েছে।	وَجٰوَزْنَا بِبَنِیْٓ اِسْرَآءِیْلَ الْبَحْرَ فَاَتَوْا عَلٰی قَوْمٍ یَّعْكُفُوْنَ عَلٰٓی اَصْنَامٍ لَّهُمْ ۚ قَالُوْا یٰمُوْسَی اجْعَلْ لَّنَآ اِلٰهًا كَمَا لَهُمْ اٰلِهَةٌ ؕ قَالَ اِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُوْنَ (١٣٨)
(১৩৯) এরা যে কাজে লিপ্ত রয়েছে তা বিনষ্ট করে দেওয়া হবে, আর এদের ঐ কাজগুলো সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।	اِنَّ هٰٓؤُلَآءِ مُتَبَّرٌ مَّا هُمْ فِیْهِ وَبٰطِلٌ مَّا كَانُوْا یَعْمَلُوْنَ (١٣٩)
(১৪০) মূসা বললেন, তবে কি আল্লাহ ভিন্ন কাউকেও তোমাদের উপাস্য করে দিব? অথচ তিনি তোমাদেরকে সমস্ত বিশ্ববাসীর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন।	قَالَ اَغَیْرَ اللّٰهِ اَبْغِیْكُمْ اِلٰهًا وَّهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَی الْعٰلَمِیْنَ (١٤٠)
(১৪১) আর সেই সময়টি স্মরণ কর, যখন আমি তোমাদেরকে ফেরাউন সম্প্রদায়ের কবল হতে মুক্ত করলাম, যারা তোমাদেরকে কঠোর শাস্তি প্রদান করত, তোমাদের পুত্রসন্তানদেরকে হত্যা করত এবং তোমাদের নারীদেরকে জীবিত রাখত, আর তাতে তোমাদের রবের পক্ষ হতে পরীক্ষা ছিল।	وَاِذْ اَنْجَیْنٰكُمْ مِّنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ یَسُوْمُوْنَكُمْ سُوْٓءَ الْعَذَابِ ۚ یُقَتِّلُوْنَ اَبْنَآءَكُمْ وَیَسْتَحْیُوْنَ نِسَآءَكُمْ ؕ وَفِیْ ذٰلِكُمْ بَلَآءٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَظِیْمٌ (١٤١)

১৬ ع

শাব্দিক অনুবাদ

(১৩৮) وَجٰوَزْنَا بِبَنِیْٓ اِسْرَآءِیْلَ الْبَحْرَ আর আমি বনী ইসরাঈলদেরকে নদী হতে [অপর] তীরে পৌছে দিলাম فَاَتَوْا عَلٰی قَوْمٍ অনন্তর তারা এমন এক সম্প্রদায়ের নিকট পৌছল یَّعْكُفُوْنَ عَلٰٓی اَصْنَامٍ لَّهُمْ যারা নিজেদের কতগুলো প্রতিমার সন্নিকটে [উপাসনার উদ্দেশ্যে] বসে রয়েছে قَالُوْا বনী ইসরাঈলরা বলল یٰمُوْسَی হে মূসা! اجْعَلْ لَّنَآ اِلٰهًا আমাদের জন্যও এরূপ একটি উপাস্য নির্ধারণ করে দিন كَمَا لَهُمْ اٰلِهَةٌ যেরূপ এদের এই উপাস্যগুলো قَالَ মূসা বললেন اِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُوْنَ বাস্তবিকই তোমাদের মধ্যে মূর্খতা রয়েছে।

(১৩৯) اِنَّ هٰٓؤُلَآءِ مُتَبَّرٌ مَّا هُمْ فِیْهِ এরা যে কাজে লিপ্ত রয়েছে তা বিনষ্ট করে দেওয়া হবে وَبٰطِلٌ مَّا كَانُوْا یَعْمَلُوْنَ আর এদের ঐ কাজগুলো সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

(১৪০) قَالَ মূসা বললেন اَغَیْرَ اللّٰهِ اَبْغِیْكُمْ اِلٰهًا তবে কি আল্লাহ ভিন্ন কাউকেও তোমাদের উপাস্য করে দিব وَّهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَی الْعٰلَمِیْنَ অথচ তিনি তোমাদেরকে সমস্ত বিশ্ববাসীর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন।

(১৪১) وَاِذْ اَنْجَیْنٰكُمْ مِّنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ আর সেই সময়টি স্মরণ কর, যখন আমি তোমাদেরকে ফেরাউন সম্প্রদায়ের কবল হতে মুক্ত করলাম یَسُوْمُوْنَكُمْ سُوْٓءَ الْعَذَابِ যারা তোমাদেরকে কঠোর শাস্তি প্রদান করত یُقَتِّلُوْنَ اَبْنَآءَكُمْ তোমাদের পুত্রসন্তানদেরকে হত্যা করত وَیَسْتَحْیُوْنَ نِسَآءَكُمْ এবং তোমাদের নারীদেরকে জীবিত রাখত وَفِیْ ذٰلِكُمْ بَلَآءٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَظِیْمٌ আর তাতে তোমাদের রবের পক্ষ হতে পরীক্ষা ছিল।

www.almodina.com

وَوٰعَدْنَا مُوْسٰى ثَلٰثِيْنَ لَيْلَةً وَّاَتْمَمْنٰهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيْقَاتُ رَبِّهٖٓ اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً ۚ وَقَالَ مُوْسٰى لِاَخِيْهِ هٰرُوْنَ اخْلُفْنِيْ فِيْ قَوْمِيْ وَاَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيْلَ الْمُفْسِدِيْنَ (١٤٢)

অনুবাদ : (১৪২) আর আমি মূসার সাথে ত্রিশ রাত্রির ওয়াদা করলাম এবং ঐ ত্রিশ রাত্রির সাথে আরো দশ রাত্রি সংযোজন করলাম। অতএব, তাঁর প্রতিপালকের [নির্ধারিত] সময় পূর্ণ চল্লিশ রাত্রি হলো, আর মূসা নিজ ভ্রাতা হারূনকে বললেন, আমার অনুপস্থিতিতে এ সমস্ত লোকদের পরিচালনা করতে থাক এবং [এদের] সংশোধন করতে থাক, আর বিশৃঙ্খলাকারীদের অভিমতানুসারে কাজ করো না।

وَلَمَّا جَآءَ مُوْسٰى لِمِيْقَاتِنَا وَكَلَّمَهٗ رَبُّهٗ ۙ قَالَ رَبِّ اَرِنِيْٓ اَنْظُرْ اِلَيْكَ ۚ قَالَ لَنْ تَرٰىنِيْ وَلٰكِنِ انْظُرْ اِلَى الْجَبَلِ فَاِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهٗ فَسَوْفَ تَرٰىنِيْ ۚ فَلَمَّا تَجَلّٰى رَبُّهٗ لِلْجَبَلِ جَعَلَهٗ دَكًّا وَّخَرَّ مُوْسٰى صَعِقًا ۚ فَلَمَّآ اَفَاقَ قَالَ سُبْحٰنَكَ تُبْتُ اِلَيْكَ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُؤْمِنِيْنَ (١٤٣)

(১৪৩) আর মূসা যখন আমার নির্ধারিত সময়ে উপস্থিত হলেন এবং তাঁর প্রতিপালক তাঁর সাথে বাক্যালাপ করলেন, তখন আরজ করলেন, হে আমার পরওয়ারদেগার! আপনার দীদার আমাকে দেখিয়ে দিন, যেন আমি আপনাকে এক নজর দেখতে পাই। আল্লাহ বললেন, তুমি আমাকে কিছুতেই দেখতে পারবে না কিন্তু তুমি এই পর্বতের দিকে দেখতে থাক, অতএব, যদি এটা স্বস্থানে স্থির থাকে, তবে তুমিও আমাকে দেখতে পারবে, অনন্তর তাঁর রব যখন পর্বতের উপর জ্যোতি বিকাশ করলেন, জ্যোতি তাকে চূর্ণবিচূর্ণ করে ফেলল, আর মূসা সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে গেলেন। অতঃপর যখন সংজ্ঞা লাভ করলেন, তখন আরজ করলেন, নিশ্চয় আপনার সত্তা পবিত্র, আমি আপনার হুযুরে ক্ষমা চাচ্ছি এবং সর্বপ্রথম আমি এটার প্রতি ঈমান আনয়ন করছি।

শাব্দিক অনুবাদ

(১৪২) وَوٰعَدْنَا مُوْسٰى ثَلٰثِيْنَ لَيْلَةً আর আমি মূসার সাথে ত্রিশ রাত্রির ওয়াদা করলাম وَّاَتْمَمْنٰهَا بِعَشْرٍ এবং ঐ ত্রিশ রাত্রির সাথে আরো দশ রাত্রি সংযোজন করলাম فَتَمَّ مِيْقَاتُ رَبِّهٖ অতএব, তাঁর প্রতিপালকের [নির্ধারিত] সময় পূর্ণ হলো اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً চল্লিশ রাত্রি وَقَالَ مُوْسٰى لِاَخِيْهِ هٰرُوْنَ আর মূসা নিজ ভ্রাতা হারূনকে বললেন اخْلُفْنِيْ فِيْ قَوْمِيْ আমার অনুপস্থিতিতে এ সমস্ত লোকদের পরিচালনা করতে থাক وَاَصْلِحْ এবং [এদের] সংশোধন করতে থাক وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيْلَ الْمُفْسِدِيْنَ আর বিশৃঙ্খলাকারীদের অভিমতানুসারে কাজ করো না।

(১৪৩) وَلَمَّا جَآءَ مُوْسٰى لِمِيْقَاتِنَا আর মূসা যখন আমার নির্ধারিত সময়ে উপস্থিত হলেন وَكَلَّمَهٗ رَبُّهٗ এবং তাঁর প্রতিপালক তাঁর সাথে বাক্যালাপ করলেন قَالَ তখন আরজ করলেন رَبِّ হে আমার পরওয়ারদেগার! اَرِنِيْ আপনার দীদার আমাকে দেখিয়ে দিন اَنْظُرْ اِلَيْكَ যেন আমি আপনাকে এক নজর দেখতে পাই قَالَ আল্লাহ বললেন لَنْ تَرٰىنِيْ তুমি আমাকে কিছুতেই দেখতে পারবে না وَلٰكِنِ انْظُرْ اِلَى الْجَبَلِ কিন্তু তুমি এই পর্বতের দিকে দেখতে থাক فَاِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهٗ অতএব, যদি এটা স্বস্থানে স্থির থাকে فَسَوْفَ تَرٰىنِيْ তবে তুমিও আমাকে দেখতে পারবে فَلَمَّا تَجَلّٰى رَبُّهٗ لِلْجَبَلِ অনন্তর তাঁর রব যখন পর্বতের উপর জ্যোতি বিকাশ করলেন جَعَلَهٗ دَكًّا জ্যোতি তাকে চূর্ণবিচূর্ণ করে ফেলল وَّخَرَّ مُوْسٰى صَعِقًا আর মূসা সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে গেলেন فَلَمَّآ اَفَاقَ অতঃপর যখন সংজ্ঞা লাভ করলেন قَالَ তখন আরজ করলেন سُبْحٰنَكَ নিশ্চয় আপনার সত্তা পবিত্র تُبْتُ اِلَيْكَ আমি আপনার হুযুরে ক্ষমা চাচ্ছি وَاَنَا اَوَّلُ الْمُؤْمِنِيْنَ এবং সর্বপ্রথম আমি এটার প্রতি ঈমান আনয়ন করছি।

www.almodina.com

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قوله وَجٰوَزْنَا بِبَنِىٓ اِسْرَآءِيْلَ الْبَحْرَ অর্থাৎ আমি বনী ইসরাঈলদেরকে সাগর পার করে দিয়েছি। ফেরাউন সম্প্রদায়ের মোকাবিলায় বনী ইসরাঈলদের যে আলৌকিক কৃতকার্যতা ও প্রশান্তি লাভ হয়, তার সে প্রতিক্রিয়াই হয়েছে যা সাধারণত প্রাচুর্য আসার পর বস্তুবাদী জনগোষ্ঠীর মধ্যে সৃষ্টি হয়ে থাকে। অর্থাৎ ওরাও ভোগবিলাসের প্রতি আকৃষ্ট হতে শুরু করল।
ঘটনাটি হলো এই যে, এই জাতি হযরত মূসা (আ.)-এর মু'জিযা বলে সদ্য লোহিত সাগর পাড়ি দিয়ে এসেছিল এবং গোটা ফেরাউন সম্প্রদায়ের সাগরে ডুবিয়ে মরার দৃশ্য স্বচক্ষে দেখে নিয়েছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও একটু অগ্রসর হতেই তারা এমন এক মানব গোষ্ঠীর বাসভূমির উপর দিয়ে অতিক্রম করল, যারা বিভিন্ন মূর্তির পূজায় লিপ্ত ছিল। এই দেখে বনী ইসরাঈলদেরও তাদের সে রীতিনীতিই পছন্দ হতে লাগল। তাই হযরত মূসা (আ.)–এর নিকট আবেদন জানাল, এসব লোকের যেমন বহু উপাস্য রয়েছে, আপনি আমাদের জন্যও এমনি ধরনের কোনো একটা উপাস্য নির্ধারণ করে দিন, যাতে আমরা একটা দৃষ্ট বস্তুকে সামনে রেখে ইবাদত উপাসনা করতে পারি- আল্লাহর সত্তা তো আর সামনে আসে না।
হযরত মূসা (আ.) বললেন– اِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُوْنَ অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে বড়ই মূর্খতা রয়েছে। যাদের রীতিনীতি তোমরা পছন্দ করছ, তাদের সমস্ত আমল যে বিনষ্ট ও বরবাদ হয়ে গেছে। এরা মিথ্যার অনুগামী। ওদের এসব ভ্রান্ত রীতিনীতির প্রতি আকৃষ্ট হওয়া তোমাদের পক্ষে উচিত নয়। আল্লাহকে বাদ দিয়ে আমি কি তোমাদের জন্য অন্য কোনো উপাস্য বানিয়ে দেব? অথচ তিনিই তোমাদেরকে দুনিয়াবাসীর উপর বিশিষ্টতা দান করেছেন অর্থাৎ তৎকালীন বিশ্ববাসীর উপর মর্যাদাসম্পন্ন করেছেন। কারণ তখন হযরত মূসা (আ.)–এর উপর যারা ঈমান এনেছিল, তারাই ছিল অন্যান্য লোক অপেক্ষা বেশি মর্যাদা সম্পন্ন ও উত্তম। অতঃপর বনী ইসরাঈলদেরকে তাদের বিগত অবস্থা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, ফেরাউনের কওমের হাতে তারা এমনই অসহায় ও দুর্দশাগ্রস্ত ছিল যে, তাদের ছেলেদেরকে হত্যা করে নারীদেরকে অব্যাহতি দেওয়া হতো সেবাদাসী বানিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে। আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ.)-এর বদৌলতে এবং তাঁর দোয়ার বরকতে তাদেরকে সে আজাব থেকে মুক্তি দিয়েছেন। এই অনুগ্রহের প্রভাব কি এই হওয়া উচিত যে, তোমরা সেই রাব্বুল আলামীনের সাথে দুনিয়ার নিকৃষ্টতর পাথরকে অংশীদার সাব্যস্ত করবে। এ যে মহা জুলুম। এর থেকে তওবা কর।
قوله وَوٰعَدْنَا مُوْسٰى ثَلٰثِيْنَ لَيْلَةً الخ এতে وٰعَدْنَا শব্দটি وَعْدَه (ওয়াদাহ) থেকে উদ্ভূত। আর ওয়াদার তাৎপর্য হলো এই যে, কাউকে লাভজনক কোনো কিছু দেওয়ার পূর্বে তা প্রকাশ করে দেওয়া যে, তোমার জন্য অমুক কাজ করব।
এ ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ.)-এর প্রতি স্বীয় কিতাব নাজিল করার ওয়াদা করেছেন এবং সেজন্য শর্ত আরোপ করেছেন যে, মূসা (আ.) ত্রিশ রাত্রি তূর পর্বতে ই'তেকাফ ও আল্লাহর ইবাদত আরাধনায় অতিবাহিত করবেন। অতঃপর এই ত্রিশ রাত্রির উপর আরও দশ রাত্রি বাড়িয়ে চল্লিশ করে দিয়েছেন।
وٰعَدْنَا শব্দটির প্রকৃত অর্থ হলো দু'পক্ষ থেকে প্রতিজ্ঞা বা প্রতিশ্রুতি দান করা। এখানেও আল্লাহ জাল্লা শানুহূর পক্ষ থেকে ছিল তাওরাত দানের প্রতিশ্রুতি, আর হযরত মূসা (আ.)-এর পক্ষ থেকে চল্লিশ রাত এবং ই'তেকাফের প্রতিজ্ঞা কাজেই وٰعَدْنَا না বলে وَعَدْنَا বলা হয়েছে।

এ আয়াতে কয়েকটি বিষয় ও নির্দেশ লক্ষণীয়

প্রথমত : চল্লিশ রাত ই'তেকাফ করানোই যখন আল্লাহর ইচ্ছা ছিল, তখন প্রথমে ত্রিশ এবং পরে দশ বৃদ্ধি করে চল্লিশ করার তাৎপর্য কি? একত্রেই চল্লিশ রাতের ই'তেকাফের হুকুম দিয়ে দিলে কি ক্ষতি ছিল? আল্লাহর হিকমতের সীমা পরিসীমা কে জানবে। তবুও আলেম সমাজ এর কিছু কিছু হিকমত বা তাৎপর্য বর্ণনা করেছেন।
তাফসীরে রূহুল বয়ানে বলা হয়েছে যে, এর একটি তাৎপর্য হলো ক্রমধারা সৃষ্টি করা। যাতে কোনো কাজ কারো দায়িত্ব অর্পণ করতে হলে, প্রথমেই তার উপর সম্পূর্ণ কাজের চাপ সৃষ্টি করা হয় না; বরং ক্রমান্বয়ে বা ধাপে ধাপে যেন বাড়ানো হয়, যাতে সে সহজে তা পালন করতে পারে। তারপর অতিরিক্ত কাজ অর্পণ করা।
তাফসীরে কুরতুবীতে আরও বলা বলা হয়েছে যে, এভাবে শাসক ও দায়িত্বশীল লোকদেরকে শিক্ষা দেওয়া উদ্দেশ্যে যে, কাউকে যদি কোনো নির্দিষ্ট সময়ে কোনো কাজের বা বিষয়ের দায়িত্ব দেওয়া হয় আর সে যদি উক্ত সময়ের মধ্যে তা

www.almodina.com

সম্পাদন করতে ব্যর্থ হয় তাহলে তাকে আরও সময় দেওয়া বাঞ্ছনীয়। যেমন, হযরত মূসা (আ.)-এর সাথে হয়েছে ত্রিশ রাত্রিতে যে অবস্থা লাভ উদ্দেশ্য ছিল তা যখন পূর্ণ হয়নি, তখন অতিরিক্ত দশ রাত্রি বাড়িয়ে দেওয়া হয়। কারণ এই দশ রাত্রি বৃদ্ধির ব্যাপারে তাফসীরকারগণ যে ঘটনার উল্লেখ করেছেন তা হলো এই যে, ত্রিশ রাত্রির ই'তেকাফের সময় হযরত মূসা (আ.) নিয়মানুযায়ী ত্রিশটি রোজাও রেখেছেন, কিন্তু মাঝে কোনো ইফতার করেননি। ত্রিশ রোজা শেষ করার পর ইফতার করে তূর পর্বতের নির্ধারিত স্থানে গিয়ে হাজির হলে আল্লাহর পক্ষ থেকে যে বিশেষ এক রকম গন্ধ পেটের বাষ্পজনিত কারণে সৃষ্টি হয়, তা আল্লাহ তা'আলার নিকট অতি পছন্দনীয়, কিন্তু আপনি মিসওয়াক করে সে গন্ধ দূর করে দিয়েছেন। কাজেই আরও দশটি রোজা রাখুন যাতে সে গন্ধ আবার সৃষ্টি হয়।

কোনো কোনো তাফসীর সংক্রান্ত রেওয়ায়েতে উদ্ধৃত আছে যে, ত্রিশ রোজার পর হযরত মূসা (আ.) মিসওয়াক করে ফেলেছিলেন, যার ফলে রোজাজনিত মুখের গন্ধ চলে গিয়েছিল। এতে প্রমাণিত হয় না যে, রোজাদারের জন্য মিসওয়াক করা অনুত্তম বা নিষিদ্ধ। কারণ, প্রথমত এই রেওয়ায়েতের কোনো সনদ নেই। দ্বিতীয়ত এমনও হতে পারে যে, এ হুকুমটি ব্যক্তিগতভাবে শুধু হযরত মূসা (আ.)-এরই জন্য; সাধারণ নির্দেশ নয়। অথবা হযরত মূসা (আ.) -এর শরিয়তে এ ধরনের হুকুম হয়তো সবারই জন্য ছিল যে, রোজার সময় মিসওয়াক করা যাবে না। কিন্তু শরিয়তে মুহাম্মদীয়া বা মহানবী ﷺ -এর শরিয়তে রোজা অবস্থায় মিসওয়াক করার প্রচলন হাদীসের দ্বারা প্রমাণিত রয়েছে, যা বায়হাকী হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.)-এর রেওয়ায়েতে উদ্ধৃত করেছেন। তাতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, রাসূল ﷺ বলেছেন– خَيْرُ خِصَالِ الصِّيَامِ السِّوَاكُ। অর্থাৎ 'রোজাদারের সর্বোত্তম কাজ হলো মিসওয়াক করা।' এ রেওয়ায়েটি জামেউস সগীরে উদ্ধৃত করে একে 'হাসান' বলা হয়েছে।

জ্ঞাতব্য : এ রেওয়ায়েতের প্রেক্ষিতে একটা প্রশ্ন হয় যে, হযরত মূসা (আ.) হযরত খিযিরের সন্ধানে যখন সফর করছিলেন, তখন যে ক্ষেত্রে অর্ধ দিনের ক্ষুধাতেও ধৈর্যধারণ করতে পারেননি এবং নিজের ভ্রমণসঙ্গীকে বলেছেন যে, اٰتِنَا غَدَآءَنَا لَقَدْ لَقِيْنَا مِنْ سَفَرِنَا هٰذَا نَصَبًا অর্থাৎ 'আমাদের নাশতা বের কর। কারণ এ ভ্রমণ আমাদেরকে পরিশ্রান্তির সম্মুখীন করে দিয়েছে।' সেক্ষেত্রে তূর পর্বতে ক্রমাগত এমনভাবে ত্রিশ রোজা করা যাতে রাতের বেলায়ও কোনো ইফতার করা যাবে না বিস্ময়ের ব্যাপার নয় কি?

তাফসীরে রূহুল বয়ানে বর্ণিত আছে যে, এই পার্থক্যটা ছিল এতদুভয় সফরের প্রকৃতির পার্থক্যের দরুন। প্রথমোক্ত সফরের সম্পর্ক ছিল সৃষ্টির সাথে সৃষ্টির। পক্ষান্তরে তূর পর্বতের এই সাফর ছিল সৃষ্টি থেকে আলাদা হয়ে মহান পরওয়ারদেগারের অন্বেষায়। এমন একটি মহৎ ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়াতেই তাঁর জৈবিক চাহিদা এমন স্তিমিত হয়ে গেছে এবং পানাহারের প্রয়োজনীয়তা এত কমে গেছে যে, ত্রিশ রোজা পর্যন্ত কোনো কষ্টই তিনি অনুভব করেননি।

ইবাদতের বেলায় চান্দ্র হিসাব ও পার্থিব ব্যাপারে সৌর হিসাবের অবকাশ : আয়াতটিতে আরও একটি বিষয় সাব্যস্ত হয় যে, নবী-রাসূলগণের শরিয়তে তারিখের হিসাব ধরা হতো রাত থেকে। কারণ এ আয়াতেও ত্রিশ দিনের স্থলে ত্রিশ রাতের উল্লেখ করা হয়েছে। এর কারণ হলো এই যে, নবী রাসূলগণের শরিয়তে চান্দ্রমাস গ্রহণীয়। আর চান্দ্রমাস শুরু হয় চাঁদ দেখা থেকে এবং তা রাতের বেলাতেই হতে পারে। সেজন্যই চান্দ্রমাস শুরু হয় রাত থেকে এবং তার প্রতিটি তারিখের গণনা শুরু হয় সূর্যাস্তের সাথে সাথে। আসমানি যত গ্রন্থ রয়েছে সে সবগুলোর হিসাবই এভাবে চান্দ্রমাস থেকে এবং তারিখের গণনা সূর্যাস্ত থেকে সাব্যস্ত করা হয়েছে।

ইবনে আরাবীর বরাতে কুরতুবী উদ্ধৃত করেছেন যে, حِسَابُ الشَّمْسِ لِلْمَنَافِعِ وَحِسَابُ الْقَمَرِ لِلْمَنَاسِكِ অর্থাৎ সৌর হিসাব হলো পার্থিব লাভের জন্য; আর চান্দ্র হিসাব হলো ইবাদত উপাসনার জন্য।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) -এর তাফসীর অনুসারে এই ত্রিশ রাত্রি ছিল জিলকদ মাসের রাত্রি; আর এরই উপর জিলহজ মাসের দশ রাত বাড়িয়ে দেওয়া হয়। এতে বুঝা যাচ্ছে যে, হযরত মূসা (আ.) তাওরাতের উপঢৌকনটি লাভ করেছিলেন কুরবানির দিনে। –[কুরতুবী]

আত্মশুদ্ধিতে ৪০ দিনের বিশেষ তাৎপর্য : এ আয়াতের ইঙ্গিত বুঝা যাচ্ছে যে, অভ্যন্তরীণ অবস্থার সংশোধনে ৪০ দিনের একটি বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে লোক ৪০ দিন নিঃস্বার্থতার সাথে আল্লাহর ইবাদত করবে, আল্লাহ তার অন্তর থেকে জ্ঞান ও হিকমতের ঝর্ণাধারাই প্রবাহিত করে দেন। –[রূহুল বয়ান]

মানুষের প্রতি সকল কাজে ধীরস্থিরতা ও ক্রমান্বয়ের শিক্ষা : এ আয়াতের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য একটা বিশেষ সময় নির্ধারিত করে নেওয়া এবং তা ধীরস্থিরতার সাথে পর্যায়কক্রমিকভাবে সমাধা করা আল্লাহ তা'আলার রীতি। কোনো কাজে তাড়াহুড়া করা আল্লাহর পছন্দ নয়।

সর্বপ্রথম স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা তাঁর কাজের জন্য অর্থাৎ বিশ্ব সৃষ্টি উপলক্ষে ছয় দিনের সময় নির্ধারণ করে এ নিয়মটিই বাতলে দিয়েছেন। অথচ আল্লাহর পক্ষে আসমান-জমিন তথা সমগ্র বিশ্বজাহান সৃষ্টির জন্য এক মিনিট সময়েরও প্রয়োজন ছিল না। কারণ তিনি যখনই কোনো কিছু সৃষ্টি করতে ইচ্ছা করেন, সঙ্গে সঙ্গে তা হয়ে যায়। কিন্তু সময় নির্ধারণ এ বিশেষ পদ্ধতির মাধ্যমে সৃষ্টিকে এ হেদায়েত দানই উদ্দেশ্য ছিল যে, তোমরা প্রতিটি কাজ একান্ত বিচার-বিবেচনার মাধ্যমে ধীর-স্থিরভাবে সমাধা করবে। তেমনিভাবে হযরত মূসা (আ.)-কে তওরাত দান করার জন্যও যে সময় নির্ধারণ করা হয় তাতেও সে ইঙ্গিতই রয়েছে।

আর এই হলো সে রীতি, যাকে উপেক্ষা করার দরুন বনী ইসরাঈলদেরকে গোমরাহির সম্মুখীন হতে হয়। কারণ হযরত মূসা (আ.) আল্লাহ তা'আলার সাবেক হুকুম অনুসারে স্বীয় সম্প্রদায়কে বলে গিয়েছিলেন যে, আমি ত্রিশ দিনের জন্য যাচ্ছি। কিন্তু এদিকে যখন দশ দিনের সময় বাড়িয়ে দেওয়া হয়, তখন এরা নিজেদের তাড়াহুড়ার দরুন বলতে শুরু করে যে, হযরত মূসা (আ.) তো কোথাও হারিয়েই গেছেন। কাজেই আমাদের অপর কোনো নেতা নির্ধারণ করে দেওয়াই উচিত। তার ফলে তারা সহসাই 'সামেরী'-এর ফাঁদে আটকে গিয়ে 'বাছুর'-এর পূজা করতে শুরু করে দেয়। তারা যদি চিন্তাভাবনা করে এবং নিজেদের কাজে ধীরস্থিরতা ও পর্যায়ক্রমিকতা আবলম্বন করত, তাহলে এহেন পরিণতি হতো না। –[কুরতুবী]

প্রয়োজনবশত স্থলাভিষিক্ত নির্ধারণ : প্রথমত হযরত মূসা (আ.) আল্লাহ তা'আলার ওয়াদা অনুসারে তূর পর্বতে গিয়ে যখন ই'তেকাফ করার ইচ্ছা করেন, তখন স্বীয় সঙ্গী হযরত হারুন (আ.)-কে বললেন, اُخْلُفْنِیْ فِیْ قَوْمِیْ। অর্থাৎ আমার পিছনে বা অবর্তমানে আপনি আমার সম্প্রদায়ে আমার স্থলাভিষিক্ত হিসেবে দায়িত্ব পালন করুন। এতে প্রমাণিত হয় যে, যদি কোনো ব্যক্তি কোনো কাজের দায়িত্বে নিয়োজিত হন তবে প্রয়োজনবোধে কোথাও যেতে হলে সে কাজের ব্যবস্থাপনার জন্য কোনো লোক নিয়োগ করে যাওয়া কর্তব্য।

আরও প্রমাণিত হয় যে, রাষ্ট্রের দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ যখন কোথাও সফরে যাবেন, তখন নিজের কোনো লোককে স্থলাভিষিক্ত বা প্রতিনিধি নিযুক্ত করে যাবেন।

রাসূলে কারীম ﷺ-এর সাধারণ রীতি এই ছিল যে, কখনও যদি তাঁকে মদিনার বাইরে যেতে হতো, তখন তিনি কাউকে প্রতিনিধি নিযুক্ত করে যেতেন। একবার তিনি হযরত আলী মুর্তজা (রা.) -কে খলিফা বা প্রতিনিধি নির্ধারণ করেন এবং একবার হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম (রা.)-কে খলিফা নিযুক্ত করেন। এমনিভাবে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সাহাবী (রা.)-কে মদিনায় খলিফা নিযুক্ত করে তিনি বাইরে যেতেন। –[কুরতুবী]

হযরত মূসা (আ.) হযরত হারুন (আ.)-কে খলিফা নিযুক্ত করার সময় তাঁকে কয়েকটি উপদেশ দান করেন। তাতে প্রমাণিত হয় যে, কাজের সুবিধার জন্য প্রতিনিধিকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ বা উপদেশ দিয়ে যেতে হয়। এই হেদায়েত বা নির্দেশাবলির মধ্যে প্রথম নির্দেশ হলো اَصْلِحْ; এখানে اَصْلِحْ; -এর কোনো 'কর্ম' উল্লেখ করা হয়নি যে, কার ইসলাহ বা সংশোধন করা হবে। এতে বুঝা যায় যে, নিজেরও ইসলাহ করবেন এবং সঙ্গে সঙ্গে স্বীয় সম্প্রদায়ের এসলাহ করবেন। অর্থাৎ তাদের মাঝে দাঙ্গা হাঙ্গামা জনিত কোনো বিষয় আঁচ করতে পারলে তাদেরকে সরল পথে আনয়নের চেষ্টা করবেন। দ্বিতীয় হেদায়েত দেওয়া হলো এই যে, لَا تَتَّبِعْ سَبِیْلَ الْمُفْسِدِیْنَ; অর্থাৎ 'দাঙ্গা হাঙ্গামা সৃষ্টিকারীদের পথ অনুসরণ করবেন না। বলাবাহুল্য, হযরত হারুন (আ.) হলেন আল্লাহর নবী; তাঁর নিজের পক্ষে ফাসাদে পতিত হওয়ার কোনো আশঙ্কাই ছিল না।' কাজেই এই হেদায়েতের উদ্দেশ্য ছিল এই যে, দাঙ্গাহাঙ্গামা বা ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের কোনো সাহায্য-সহায়তা করবেন না।

সুতরাং হযরত হারুন (আ.) যখন দেখলেন, তাঁর সম্প্রদায় 'সামেরী' এর অনুগমন করতে শুরু করেছে, এমনকি তাঁর কথা মতো 'বাছুরের' পূজা করতে শুরু করে দিয়েছে, তখন তাঁর সম্প্রদায়কে এহেন ভণ্ডামি থেকে বাধা দান করলেন এবং

সামেরীকে সে জন্য শাসালেন। অতঃপর ফিরে এসে হযরত মূসা (আ.) যখন ধারণা করলেন যে, হারূন (আ.) আমার অবর্তমানে কর্তব্য পালনে অবহেলা করেছেন, তখন তাঁর প্রতি কঠোরতা অবলম্বন করলেন।

হযরত মূাস (আ.)-এর এ ঘটনা থেকে সেসব লোকের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত, যারা অব্যবস্থা এবং নিশ্চিন্ততাকেই সবচেয়ে বড় বুজুর্গি বলে মনে করে থাকেন।

لَنْ تَرٰىنِىْ (অর্থাৎ আপনি আমাকে দেখতে পারবেন না।) এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, দর্শন যদিও অসম্ভব নয়, কিন্তু যার প্রতি সম্বোধন করা হচ্ছে অর্থাৎ হযরত মূসা (আ.) বর্তমান অবস্থায় তা সহ্য করতে পারবেন না। পক্ষান্তরে দর্শন যদি আদৌ সম্ভব না হতো তাহলে لَنْ تَرٰىنِىْ না বলে বলা হতো, لَنْ اُرٰى 'আমার দর্শন হতে পারে না'। –[মাযহারী]

এতে প্রমাণিত হয় যে, যৌক্তিকতার বিচারে পৃথিবীতে আল্লাহর দর্শন লাভ যদিও সম্ভব, কিন্তু তবুও এতে তার সংঘটনের অসম্ভবতা প্রমাণিত হয়ে গেছে। আর এটাই হলো, অধিকাংশ আহলে সুন্নাহর মত যে, এ পৃথিবীতে আল্লাহর দীদার বা দর্শন লাভ যুক্তিগতভাবে সম্ভব হলেও শরিয়তের দৃষ্টিতে সম্ভব নয়। যেমন সহীহ মুসলিম শরীফের হাদীসে বর্ণিত আছে– لَنْ يَرٰى اَحَدٌ مِّنْكُمْ رَبَّهٗ حَتّٰى يَمُوْتَ অর্থাৎ 'তোমাদের মধ্যে কেউ মৃত্যুর পূর্বে তার পরওয়ারদেগারকে দেখতে পরবে না।' وَلٰكِنِ انْظُرْ اِلَى الْجَبَلِ এতে প্রমাণ করা হচ্ছে যে, বর্তমান অবস্থায় শ্রোতা আল্লাহর দর্শন সহ্য করতে পারবে না বলেই পাহাড়ের উপর যৎসামান্য ছটা বিকিরণ করে বলে দেওয়া হয়েছে, তাও তোমার পক্ষে সহ্য করা সম্ভবপর নয়। মানুষ তো একান্ত দুর্বলচিত্ত সৃষ্টি সে তা কেমন করে সহ্য করবে?

فَلَمَّا تَجَلّٰى رَبُّهٗ لِلْجَبَلِ আরবি অভিধানে تَجَلّٰى অর্থ– প্রকাশিত ও বিকশিত হওয়া। সূফী সম্প্রদায়ের পরিভাষায় 'তাজাল্লী' অর্থ হলো কোনো বিষয়কে কোনো কিছুর মাধ্যমে দেখা। যেমন, কোনো বস্তুকে আয়নার মাধ্যমে দেখা হয়। সেজন্যই তাজাল্লীকে দর্শন বলা যায় না। স্বয়ং এ আয়াতেই তার সাক্ষ্য বর্তমান যে, আল্লাহ তা'আলা দর্শনকে বলেছেন অসম্ভব আর তাজাল্লী বা বিকশিত হওয়াকে তা বলেননি।

ইমাম আহমদ, তিরমিযী ও হাকেম হযরত আনাস (রা.) -এর উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করেছেন যে, নবী করীম ﷺ এ আয়াতটি তেলাওয়াত করে হাতের কনিষ্ঠাঙ্গুলির মাথায় বৃদ্ধাঙ্গুলিটি রেখে ইঙ্গিত করেছেন যে, আল্লাহ জাল্লা শানুহুর এতটুকু অংশই শুধু প্রকাশ করা হয়েছিল, যাতে পাহাড় পর্যন্ত ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। অবশ্য এতে গোটা পাহাড় যে, খণ্ডবিখণ্ড হয়ে যেতে হবে তা অপরিহার্য নয়; বরং পাহাড়ের যে অংশে আল্লাহর তাজাল্লী বিকিরিত হয়েছিল সে অংশটিই হয়তো প্রভাবিত হয়ে থাকবে।

হযরত মূসা (আ.)-এর সাথে আল্লাহর কালাম বা বাক্যবিনিময় : এ বিষয়টি তো কুরআনের প্রকৃষ্ট শব্দের দ্বারাই প্রমাণিত যে, আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ.) -এর সাথে সরাসরিই বাক্য বিনিময় করেছেন। এ কালামের মধ্যে রয়েছে প্রথমত সেসব কালাম যা নবুয়ত দানকালে হয়েছিল। আর দ্বিতীয়ত সেসব কালাম, যা তাওরাত দানকালে হয়েছে এবং যার আলোচনা এ আয়াতে করা হয়েছে। আয়াতের শব্দের দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে যে, দ্বিতীয় পর্যায়ের কালাম বা বাক্যবিনিময় প্রথম পর্যায়ের কালামের তুলনায় ছিল কিছুটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এ কালামের তাৎপর্য এবং তা কেমন করে সংঘটিত হয়েছিল, তা একমাত্র আল্লাহ তা'আলা ছাড়া কেউ জানতে পারেনা। তবে এতে শরিয়তের পরিপন্থি নয়, এমন যত রকম যৌক্তিক সম্ভাব্যতা থাকতে পারে, সেগুলোর কোনো একটিকে বিনা প্রমাণে নির্দিষ্ট করা জায়েজ হবে না। তাছাড়া এ ব্যাপারে পূর্ববর্তী সাহাবী তাবেয়ীগণের মতামতই সব চাইতে উত্তম যে, এ বিষয়টি আল্লাহর উপর ছেড়ে দেওয়া এবং নানা ধরনের সম্ভাব্য খুঁজে বেড়ানোর পেছনে না পড়াই বাঞ্ছনীয়।–[বয়ানুল কুরআন]

قوله سَاُورِيْكُمْ دَارَ الْفٰسِقِيْنَ এ دَارَ الْفٰسِقِيْنَ ক্ষেত্রের অর্থ কি? এতে দুটি মত রয়েছে। একটি মিসর, অপরটি শাম বা সিরিয়া। কারণ হযরত মূসা (আ.)-এর বিজয়ের পূর্বে মিশরে ফেরাউনে এবং তার সম্প্রদায় ছিল শাসক ও প্রবল। এ হিসেবে মিসরকে 'দারুল ফাসেকীন' বা পাপাচারীদের আবাসস্থল বলা যায়। আর সিরিয়ায় যেহেতু তখন আমালেকা সম্প্রদায়ের অধিকার প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং যেহেতু ওরাও ছিল ফাসেক বা পাপাচারী সেহেতু তখন সিরিয়াও ছিল ফাসেকদেরই আবাসভূমি। এতদুভয় অর্থের কোনটি যে এখানে উদ্দেশ্য, সে ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে। আর তার ভিত্তি হলো

ফেরাউনের সম্প্রদায়ের ডুবে মরার পর বনী ইসরাঈলরা মিসরে ফিরে গিয়েছিল কি না? যদি মিসরে ফিরে গিয়ে থাকে এবং মিসর সাম্রাজ্যে অধিকার প্রতিষ্ঠা করে থাকে: যেমন আয়াতে وَاَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِيْنَ -এর দ্বারা সমর্থন পাওয়া যায়, তবে মিসরে তাদের আধিপত্য আলোচ্য তূর পর্বতের তাজাল্লী বা জ্যোতি বিকিরণের ঘটনার আগেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তাতে এ আয়াতে دَارَ الْفٰسِقِيْنَ অর্থ শাম দেশ বা সিরিয়াই নির্ধারিত হয়ে যায়। কিন্তু যদি তখন তারা মিসরে ফিরে না গিয়ে থাকে, তাহলে তাতে উভয় দেশই উদ্দেশ্য হতে পারে।

শব্দ বিশ্লেষণ

اَبْغِيْكُمْ : সীগাহ واحد متكلم বহছ اثبات فعل مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْبَغْىُ মূলবর্ণ (ب ـ غ ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– আমি অনুসন্ধান করব।

يَسُوْمُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ اثبات فعل مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلسَّوْمُ মূলবর্ণ (س ـ و ـ م) জিনস اجوف واوى অর্থ– তারা শাস্তি দিত।

يَسْتَحْيُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ اثبات فعل مضارع معروف বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِسْتِحْيَاءُ মূলবর্ণ (ح ـ ى ـ ى) জিনসে لفيف مقرون অর্থ– তারা জীবিত রাখত।

تَجَلّٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব تَفَعُّلٌ মাসদার اَلتَّجَلِّىْ মূলবর্ণ (ج ـ ل ـ و) জিনস ناقص واوى অর্থ– তিনি জ্যোতি প্রকাশ করলেন।

خَرَّ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ اثبات فعل ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْخَرُّ মূলবর্ণ (خ ـ ر ـ ر) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– তিনি পড়ে গেলেন।

صَعِقًا : সীগাহ واحد مذكر বহছ صفت مشبه বাব سَمِعَ মাসদার اَلصَّعْقُ মূলবর্ণ (ص ـ ع ـ ق) জিনস صحيح অর্থ– সংজ্ঞাহীন, অজ্ঞান।

اَفَاقَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ اثبات فعل ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِفَاقَةُ মূলবর্ণ (ف ـ و ـ ق) জিনস اجوف واوى অর্থ– সে সংজ্ঞা ফিরে পেল।

قَالَ يٰمُوْسٰٓى اِنِّىْ اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسٰلٰتِىْ وَبِكَلَامِىْ ۖ فَخُذْ مَآ اٰتَيْتُكَ وَكُنْ مِّنَ الشّٰكِرِيْنَ (١٤٤)

অনুবাদ : (১৪৪) ইরশাদ হলো, হে মূসা! আমি পয়গম্বরী এবং আমার সাথে বাক্যালাপের [মর্যাদা] দ্বারা অন্যান্য লোকদের উপর তোমাকে বৈশিষ্ট্য দান করলাম, অতএব, আমি তোমাকে যা কিছু দান করলাম তা গ্রহণ কর এবং কৃতজ্ঞ হও।

وَكَتَبْنَا لَهٗ فِى الْاَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَىْءٍ مَّوْعِظَةً وَّتَفْصِيْلًا لِّكُلِّ شَىْءٍ ۚ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَّاْمُرْ قَوْمَكَ يَاْخُذُوْا بِاَحْسَنِهَا ۗ سَاُورِيْكُمْ دَارَ الْفٰسِقِيْنَ (١٤٥)

(১৪৫) আর আমি কয়েকখানি ফলকের উপর সর্বপ্রকার উপদেশ এবং সকল বিষয়ের বিস্তারিত বর্ণনা তাঁকে লিখে দিয়েছি, অতএব, তাদেরকে কার্যে পরিণত কর, দৃঢ়তার সাথে এবং নিজ সম্প্রদায়কে আদেশ কর যে, তাদের ভালো ভালো আদেশগুলো পালন করে, আমি সত্বরই তোমাদেরকে ঐ নাফরমানদের বাসস্থান দেখাচ্ছি।

سَاَصْرِفُ عَنْ اٰيٰتِىَ الَّذِيْنَ يَتَكَبَّرُوْنَ فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۗ وَاِنْ يَّرَوْا كُلَّ اٰيَةٍ لَّا يُؤْمِنُوْا بِهَا ۚ وَاِنْ يَّرَوْا سَبِيْلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوْهُ سَبِيْلًا ۚ وَاِنْ يَّرَوْا سَبِيْلَ الْغَىِّ يَتَّخِذُوْهُ سَبِيْلًا ۗ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَكَانُوْا عَنْهَا غٰفِلِيْنَ (١٤٦)

(১৪৬) আমি এমন লোকদেরকে আমার নির্দেশনাবলি হতে বিমুখ করে রাখব যারা পৃথিবীতে অহংকার করে যা করার কোনো অধিকার তাদের নেই, আর যদি তারা সমস্ত নিদর্শনও দেখে নেয়, তবুও তার প্রতি ঈমান আনবে না, আর যদি হেদায়েতের পথ দেখতেও পায়, তবু তাকে নিজেদের পথরূপে গ্রহণ করবে না, আর যদি গোমরাহির পথ দেখতে পায়, তবে তাকে নিজেদের পথরূপে গ্রহণ করে, এটা এ কারণে যে, তারা আমার আয়াতগুলোকে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে এবং তা হতে গাফেল রয়েছে।

শাব্দিক অনুবাদ

(১৪৪) قَالَ ইরশাদ হলো يٰمُوْسٰى হে মূসা! اِنِّىْ اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ আমি অন্যান্য লোকদের উপর তোমাকে বৈশিষ্ট্য দান করলাম بِرِسٰلٰتِىْ وَبِكَلَامِىْ পয়গম্বরী এবং আমার সাথে বাক্যালাপের [মর্যাদা] দ্বারা فَخُذْ مَآ اٰتَيْتُكَ অতএব, আমি তোমাকে যা কিছু দান করলাম তা গ্রহণ কর وَكُنْ مِّنَ الشّٰكِرِيْنَ এবং কৃতজ্ঞ হও।

(১৪৫) وَكَتَبْنَا لَهٗ আর আমি তাঁকে লিখে দিয়েছি فِى الْاَلْوَاحِ কয়েকখানি ফলকের উপর مِنْ كُلِّ شَىْءٍ مَّوْعِظَةً সর্বপ্রকার উপদেশ وَّتَفْصِيْلًا لِّكُلِّ شَىْءٍ এবং সকল বিষয়ের বিস্তারিত বর্ণনা فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ অতএব, তাদেরকে কার্যে পরিণত কর দৃঢ়তার সাথে وَّاْمُرْ قَوْمَكَ এবং নিজ সম্প্রদায়কে আদেশ কর যে يَاْخُذُوْا بِاَحْسَنِهَا তাদের ভালো ভালো আদেশগুলো পালন করে سَاُورِيْكُمْ دَارَ الْفٰسِقِيْنَ আমি সত্বরই তোমাদেরকে ঐ নাফরমানদের বাসস্থান দেখাচ্ছি।

(১৪৬) سَاَصْرِفُ عَنْ اٰيٰتِىَ আমি এমন লোকদেরকে আমার নির্দেশনাবলি হতে বিমুখ করে রাখব الَّذِيْنَ يَتَكَبَّرُوْنَ فِى الْاَرْضِ যারা পৃথিবীতে অহংকার করে بِغَيْرِ الْحَقِّ যা করার কোনো অধিকার তাদের নেই وَاِنْ يَّرَوْا كُلَّ اٰيَةٍ আর যদি তারা সমস্ত নিদর্শনও দেখে নেয় لَّا يُؤْمِنُوْا بِهَا তবুও তার প্রতি ঈমান আনবে না وَاِنْ يَّرَوْا سَبِيْلَ الرُّشْدِ আর যদি হেদায়েতের পথ দেখতেও পায় لَا يَتَّخِذُوْهُ سَبِيْلًا তবু তাকে নিজেদের পথরূপে গ্রহণ করবে না وَاِنْ يَّرَوْا سَبِيْلَ الْغَىِّ আর যদি গোমরাহীর পথ দেখতে পায় يَتَّخِذُوْهُ سَبِيْلًا তবে তাকে নিজেদের পথরূপে গ্রহণ করে ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا এটা এই কারণে যে, তারা আমার আয়াতগুলোকে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে وَكَانُوْا عَنْهَا غٰفِلِيْنَ এবং তা হতে গাফেল রয়েছে।

www.almodina.com

وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَلِقَاۤءِ الْاٰخِرَةِ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ ۗ هَلْ يُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ (١٤٧)	অনুবাদ : (১৪৭) আর যারা আমার আয়াতগুলোকে এবং কিয়ামত আগত হওয়াকে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে, তাদের সমস্ত আমল ব্যর্থ হয়েছে, তাদেরকে ঐ শাস্তিই প্রদান করা হবে যা কিছু এরা করছিল।
وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوْسٰى مِنْۢ بَعْدِهٖ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهٗ خُوَارٌ ۗ اَلَمْ يَرَوْا اَنَّهٗ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيْهِمْ سَبِيْلًا ۘ اِتَّخَذُوْهُ وَكَانُوْا ظٰلِمِيْنَ (١٤٨)	(১৪৮) আর মূসার সম্প্রদায় তাঁর [তূরে গমন করার] পর নিজেদের অলঙ্কারসমূহ দ্বারা একটি গো-বৎস নির্ধারণ করল, যা একটি দেহ ছিল, তাতে একপ্রকার শব্দ ছিল, তারা কি এটা লক্ষ্য করেনি যে, তা তাদের সাথে কথাও বলত না এবং তাদেরকে কোনো [সৎ] পথও দেখাত না। তাকে তারা উপাস্যরূপে স্থির করল, বস্তুতঃ নিতান্ত অশোভনীয় কাজ করল।
وَلَمَّا سُقِطَ فِيْۤ اَيْدِيْهِمْ وَرَاَوْا اَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوْا ۙ قَالُوْا لَئِنْ لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ (١٤٩)	(১৪৯) আর যখন তারা লজ্জিত হলো, এবং জানতে পারল যে, বাস্তবিকই পথভ্রষ্ট হয়েছে, তখন বলতে লাগল, যদি আমাদের রব আমাদের প্রতি অনুগ্রহ না করেন এবং আমাদের অপরাধ ক্ষমা না করেন, তবে আমরা সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত হবো।

শাব্দিক অনুবাদ

(১৪৭) وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا আর যারা মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে بِاٰيٰتِنَا আমার আয়াতগুলোকে وَلِقَاۤءِ الْاٰخِرَةِ এবং কিয়ামত আগত হওয়াকে حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ তাদের সমস্ত আমল ব্যর্থ হয়েছে هَلْ يُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ তাদেরকে ঐ শাস্তিই প্রদান করা হবে যা কিছু এরা করছিল।

(১৪৮) وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوْسٰى আর মূসার সম্প্রদায় নির্ধারণ করল مِنْۢ بَعْدِهٖ তাঁর পর مِنْ حُلِيِّهِمْ নিজেদের অলঙ্কারসমূহ দ্বারা عِجْلًا একটি গো-বৎস جَسَدًا لَّهٗ خُوَارٌ যা একটি দেহ ছিল, তাতে এক প্রকার শব্দ ছিল اَلَمْ يَرَوْا তারা কি এটা লক্ষ্য করেনি যে اَنَّهٗ لَا يُكَلِّمُهُمْ তা তাদের সাথে কথাও বলত না وَلَا يَهْدِيْهِمْ سَبِيْلًا এবং তাদেরকে কোনো [সৎ] পথও দেখাত না اِتَّخَذُوْهُ তাকে তারা উপাস্যরূপে স্থির করল وَكَانُوْا ظٰلِمِيْنَ বস্তুতঃ নিতান্ত অশোভনীয় কাজ করল।

(১৪৯) وَلَمَّا سُقِطَ فِيْۤ اَيْدِيْهِمْ আর যখন তারা লজ্জিত হলো وَرَاَوْا এবং জানতে পারল যে اَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوْا বাস্তবিকই পথভ্রষ্ট হয়েছে قَالُوْا তখন বলতে লাগল لَئِنْ لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا যদি আমাদের রব আমাদের প্রতি অনুগ্রহ না করেন وَيَغْفِرْ لَنَا এবং আমাদের অপরাধ ক্ষমা না করেন لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ তবে আমরা সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত হবো।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قوله وَكَتَبْنَا لَهٗ فِى الْاَلْوَاحِ এতে প্রতীয়মান হয় যে, পূর্ব থেকে লেখা তাওরাতের পাতা বা তখতী হযরত মূসা (আ.)-কে অর্পণ করা হয়েছিল। আর সে তখতীগুলোর নামই হলো 'তওরাত'।

১৪৬ নং আয়াতে বলা হয়েছে যে, "আমি আমার নিদর্শনসমূহ থেকে সেসব লোককে বিমুখ বা বঞ্চিত করব, যারা পৃথিবীতে অধিকার না থাকা সত্ত্বেও গর্বিত অহংকারী হয়।"

এখানে "অধিকার না থাকা" শব্দটি প্রয়োগ করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, গর্বিত অহংকারীদের মোকাবিলায় প্রতি-অহংকার করা অন্যায় ও গুনাহ নয়। কারণ এক্ষেত্রে তা শুধু বাহ্যিক রূপের দিক দিয়ে অহংকার, প্রকৃত প্রস্তাবে তা নয়। যেমন প্রবাদ আছে অর্থাৎ অহংকারীদের সাথে প্রতি-অহংকারই হলো নম্রতা। –[মাসায়েলে সুলূক]

অহংকার মানুষকে সুষ্ঠু জ্ঞান ও আসমানি ইলম থেকে বঞ্চিত করে দেয় : গর্বিত অহংকারীদেরকে স্বীয় নিদর্শসমূহ থেকে বঞ্চিত করে দেওয়ার প্রকৃত মর্ম হচ্ছে এই যে, তাদের থেকে আল্লাহর নিদর্শন বা আয়াতসমূহ বুঝা বা উপলব্ধি করার এবং

তার দ্বারা উপকৃত হওয়ার সামর্থ্য ও তওফীক তুলে নেওয়া হয়। আর এখানে আল্লাহর নিদর্শন বা আয়াত কথাটিও ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হতে পারে। যাতে তাওরাত, যাবূর ও কুরআনে বর্ণিত আয়াত বা নিদর্শসমূহের যেমন অন্তর্ভুক্ত তেমনিভাবে সৃষ্টির মাঝে বিস্তৃত। কাজেই আলোচ্য আয়াতের মূল বক্তব্য দাঁড়ায় এই যে, তাকাব্বুর, অর্থাৎ নিজকে নিজে অন্যান্যদের চাইতে বড় ও উত্তম মনে করা এমনই দূষণীয় ও জঘন্য অভ্যাস যে, এতে যে পতিত হয়, তার সুষ্ঠু বুদ্ধি জ্ঞান থাকে না। সেজন্যই সে আল্লাহ তা'আলার আয়াতের জ্ঞান থেকে বঞ্চিত থেকে যায়। না থাকে কুরআনের আয়াত বুঝবার ক্ষমতা ও তওফীক, না আল্লাহর সৃষ্ট প্রাকৃতিক নিদর্শনসমূহ সম্পর্কে যথার্থ চিন্তাভাবনার মাধ্যমে আল্লাহর মা'রেফাত বা পরিচয় লাভ। তাফসীরে রূহুল বয়ানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, অহংকার ও গর্ব এমন এক মন্দ অভ্যাস যা আসমানি জ্ঞান লাভের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। কারণ আল্লাহর জ্ঞান লাভ হতে পারে একমাত্র আল্লাহরই রহমতে। আর আল্লাহর রহমত হয় একমাত্র বিনম্রতার মাধ্যমে।

হযরত মূসা (আ.) যখন তওরাত গ্রহণ করার জন্য তূর পাহাড়ে গিয়ে ধ্যানে বসলেন এবং ইতঃপূর্বে ত্রিশ দিন ও ত্রিশ রাত ধ্যানের যে নির্দেশ হয়েছিল, সে মতে স্বীয় সম্প্রদায়কে বলে গিয়েছিলেন যে, ত্রিশ দিন পরে আমি ফিরে আসব, সেক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলা যখন আরও দশ দিন ধ্যানের মেয়াদ বাড়িয়ে দিলেন, তখন ইসরাঈলী সম্প্রদায় তাদেরই চিরাচরিত তাড়াহুড়া ও ভ্রষ্টতার দরুন নানা রকম মন্তব্য করতে আরম্ভ করল। তাঁর সম্প্রদায়ে 'সামেরী' নামে একটি লোক ছিল। তাকে সম্প্রদায়ের লোকেরা 'বড় মোড়ল' বলে মানত। কিন্তু সে ছিল একান্তই দুর্বল বিশ্বাসের লোক। কাজেই সে সুযোগ বুঝে বনী ইসরাঈলের লোকদের বলল, তোমাদের কাছে ফেরাউনের সম্প্রদায়ের যেসব অলংকারপত্র রয়েছে সেগুলো তো তোমরা কিবতীদের কাছ থেকে ধার করে এনেছিলে, এখন তারা সবাই ডুবে মরেছে, আর অলংকারগুলো তোমাদের কাছেই রয়ে গেছে, কাজেই এগুলো তোমাদের জন্য হালাল নয়। কারণ তখন কাফেরদের সাথে যুদ্ধে বিজিত সম্পদও হালাল ছিল না। বনী ইসরাঈলরা তার কথামতো সমস্ত অলংকারাদি তার কাছে (সামেরীর কাছে) এনে জমা দিল। সে এই সোনা রূপা দিয়ে একটি বাছুরের প্রতিমূর্তি তৈরি করল এবং হযরত জিবরাইল (আ.) -এর ঘোড়ার খুরের তলার মাটি যা পূর্ব থেকেই তার কাছে রাখা ছিল এবং যাকে আল্লাহ তা'আলা জীবন ও জীবনী শক্তিতে সমৃদ্ধ করে দিয়েছিলেন, সোনা রূপাগুলো আগুনে গলাবার সময় সে তাতে মাটি মিশিয়ে দিল। ফলে বাছুরের প্রতিমূর্তিটিতে জীবনী শক্তির নিদর্শন সৃষ্টি হলো এবং তার ভিতর থেকে গাভীর মতো হাম্বা রব বেরোতে লাগল। এ ক্ষেত্রে عِجْلًا শব্দের ব্যাখ্যায় جَسَدًا لَّهٗ خُوَارٌ বলে এ দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

সামেরীর এ বিস্ময়কর পৈশাচিক আবিষ্কার যখন সামনে উপস্থিত হলো, তখন সে বনী ইসরাঈলদেরকে কুফরির প্রতি আমন্ত্রণ জানাল যে, "এটাই হলো খোদা। হযরত মূসা (আ.) তো আল্লাহর সাথে কথা বলার জন্য গেছেন তূর পাহাড়ে, আর এদিকে আল্লাহ (নাউযুবিল্লাহ) সশরীরে এখানে এসে হাজির হয়ে গেছেন। হযরত মূসা (আ.)-এর সত্যি ভুলই হয়ে গেল।" বনী ইসরাঈলদের সবাই পূর্ব থেকেই সামেরীর কথা শুনত। আর এখন তার এই অদ্ভূত ম্যাজিক দেখার পর তো আর কথাই নেই; সবাই একেবারে ভক্তে পরিণত হয়ে গেল এবং সে বাছুরকে খোদা মনে করে তারই উপাসনা ইবাদতে প্রবৃত্ত হলো।

শব্দ বিশ্লেষণ

سَأُرِيْكُمْ : সীগাহ واحد متكلم বহছ اثبات فعل مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِرَاءَةُ মূলবর্ণ (ر ـ ا ـ ى) জিনস মুরাক্কাব ناقص يائى ও مهموز عين অর্থ– অতি সত্বর আমি দেখাচ্ছি।

حُلِيٌّ : শব্দটি বহুবচন; একবচন حُلًى অর্থ– গহনা, অলংকার।

عِجْلًا : শব্দটি একবচন; বহুবচন عُجُوْلٌ ও عِجَالٌ অর্থ– গো-বৎস, বাছুর।

جَسَدٌ : শব্দটি একবচন; বহুবচন اَجْسَادٌ অর্থ– দেহ, শরীর।

خُوَارٌ : শব্দটি বাব نَصَرَ-এর মাসদার। অর্থ– হাম্বা-হাম্বা শব্দ।

لَمْ يَرَوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ نفى جحد بلم درمستقبل معروف বাব فَتَحَ মাসদার اَلرُّؤْيَةُ মূলবর্ণ (ر ـ أ ـ ى) জিনস মুরাক্কাব ناقص يائى ও مهموز عين অর্থ– তারা দেখে না।

لَنَكُوْنَنَّ : সীগাহ جمع متكلم বহছ لام تاكيد بانون تاكيد ثقيلة در فعل مستقبل معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْكَيْنُوْنَةُ মূলবর্ণ (ك ـ و ـ ن) জিনস اجوف واوى অর্থ– আমরা হয়ে যাব।

وَلَمَّا رَجَعَ مُوْسٰىٓ اِلٰى قَوْمِهٖ غَضْبَانَ اَسِفًا ۙ قَالَ بِئْسَمَا خَلَفْتُمُوْنِيْ مِنْۢ بَعْدِيْ ۚ اَعَجِلْتُمْ اَمْرَ رَبِّكُمْ ۚ وَاَلْقَى الْاَلْوَاحَ وَاَخَذَ بِرَاْسِ اَخِيْهِ يَجُرُّهٗٓ اِلَيْهِ ؕ قَالَ ابْنَ اُمَّ اِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُوْنِيْ وَكَادُوْا يَقْتُلُوْنَنِيْ ۖ فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْاَعْدَآءَ وَلَا تَجْعَلْنِيْ مَعَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ (١٥٠)

অনুবাদ : (১৫০) আর যখন মূসা নিজ সম্প্রদায়ের নিকট ফিরে আসলেন ক্রোধ ও অনুতাপসহ, তখন তিনি বললেন, তোমরা আমার [তূরে যাওয়ার] পর এটা অতি জঘন্য কাজ করেছ, তোমরা কি নিজ পরওয়ারদেগারের আদেশের পূর্বেই তাড়াহুড়া করে ফেললে? এবং তিনি তাড়াতাড়ি ফলকখণ্ডগুলো এক পার্শ্বে রেখে দিলেন এবং নিজ ভ্রাতার মস্তক ধরে নিজের দিকে টানতে লাগলেন, হারূন বললেন, হে আমার সহোদর! তারা আমাকে দুর্বল ভেবেছিল এবং তারা আমাকে হত্যা করে ফেলার উপক্রম করেছিল, অতএব, আপনি আমাকে শত্রুদের হাস্যের বস্তু করবেন না এবং আমাকে এই জালেমদের অন্তর্ভুক্ত করবেন না।

قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَلِاَخِيْ وَاَدْخِلْنَا فِيْ رَحْمَتِكَ ۖ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ (١٥١)

(১৫১) মূসা বললেন, হে আমার প্রতিপালক! আমার ত্রুটি ক্ষমা করে দিন এবং আমার ভ্রাতারও এবং আমাদের উভয়কে নিজ রহমতে দাখিল করুন, বস্তুতঃ আপনি সমস্ত দয়ালুদের চেয়ে অধিক দয়াশীল।

اِنَّ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ؕ وَكَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِيْنَ (١٥٢)

(১৫২) যারা গো-বৎস পূজা করছে, সত্ত্বরই তাদের উপর পরওয়ারদেগারের পক্ষ হতে পতিত হবে গজব এবং লাঞ্ছনা এই পার্থিব জীবনেই এবং আমি মিথ্যা রচনাকারীদেরকে এরূপই শাস্তি প্রদান করে থাকি।

শাব্দিক অনুবাদ

(১৫০) وَلَمَّا رَجَعَ مُوْسٰى আর যখন মূসা ফিরে আসলেন اِلٰى قَوْمِهٖ নিজ সম্প্রদায়ের নিকট غَضْبَانَ اَسِفًا ক্রোধ ও অনুতাপসহ قَالَ তখন তিনি বললেন بِئْسَمَا خَلَفْتُمُوْنِيْ مِنْۢ بَعْدِيْ তোমরা আমার [তূরে যাওয়ার] পর এটা অতি জঘন্য কাজ করেছ اَعَجِلْتُمْ তোমরা কি তাড়াহুড়া করে ফেললে اَمْرَ رَبِّكُمْ নিজ পরওয়ারদেগারের আদেশের পূর্বেই? وَاَلْقَى الْاَلْوَاحَ এবং তিনি তাড়াতাড়ি ফলকখণ্ডগুলো এক পার্শ্বে রেখে দিলেন وَاَخَذَ بِرَاْسِ اَخِيْهِ يَجُرُّهٗٓ اِلَيْهِ এবং নিজ ভ্রাতার মস্তক ধরে নিজের দিকে টানতে লাগলেন قَالَ হারূন বললেন ابْنَ اُمَّ হে আমার সহোদর! اِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُوْنِيْ তারা আমাকে দুর্বল ভেবেছিল وَكَادُوْا يَقْتُلُوْنَنِيْ এবং তারা আমাকে হত্যা করে ফেলার উপক্রম করেছিল فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْاَعْدَآءَ অতএব, আপনি আমাকে শত্রুদের হাস্যের বস্তু করবেন না وَلَا تَجْعَلْنِيْ مَعَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ এবং আমাকে এই জালেমদের অন্তর্ভুক্ত করবেন না।

(১৫১) قَالَ মূসা বললেন رَبِّ হে আমার প্রতিপালক! اغْفِرْ لِيْ আমার ত্রুটি ক্ষমা করে দিন وَلِاَخِيْ এবং আমার ভ্রাতারও وَاَدْخِلْنَا فِيْ رَحْمَتِكَ এবং আমাদের উভয়কে নিজ রহমতে দাখিল করুন وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ বস্তুতঃ আপনি সমস্ত দয়ালুদের চেয়ে অধিক দয়াশীল।

(১৫২) اِنَّ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ যারা গো-বৎস পূজা করছে سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ সত্ত্বরই তাদের উপর পরওয়ারদেগারের পক্ষ হতে পতিত হবে গজব وَذِلَّةٌ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا এবং লাঞ্ছনা এই পার্থিব জীবনেই وَكَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِيْنَ এবং আমি মিথ্যা রচনাকারীদেরকে এরূপই শাস্তি প্রদান করে থাকি।

وَالَّذِيْنَ عَمِلُوا السَّيِّاٰتِ ثُمَّ تَابُوْا مِنْۢ بَعْدِهَا وَ اٰمَنُوْٓا ۡ اِنَّ رَبَّكَ مِنْۢ بَعْدِهَا لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ (١٥٣)

অনুবাদ : (১৫৩) আর যারা পাপ কার্য সম্পাদন করেছে, অনন্তর তারা তার উপর তওবা করে নেয় এবং ঈমান আনয়ন করে, তাহলে তোমার প্রতিপালক ঐ তওবার পর ক্ষমাশীল, দয়াশীল ।

وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُّوْسَى الْغَضَبُ اَخَذَ الْاَلْوَاحَ ۖ وَفِيْ نُسْخَتِهَا هُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّلَّذِيْنَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُوْنَ (١٥٤)

(১৫৪) আর যখন মূসার ক্রোধ প্রশমিত হলো, তখন সেই ফলকগুলো তুলে নিলেন, আর তাদের বিষয়বস্তুগুলোর মধ্যে হেদায়েত ও রহমত ছিল সে সমস্ত লোকের জন্য যারা নিজেদের প্রতিপালককে ভয় করে ।

وَاخْتَارَ مُوْسٰى قَوْمَهٗ سَبْعِيْنَ رَجُلًا لِّمِيْقَاتِنَا ۚ فَلَمَّآ اَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ اَهْلَكْتَهُمْ مِّنْ قَبْلُ وَاِيَّايَ ؕ اَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَآءُ مِنَّا ۚ اِنْ هِيَ اِلَّا فِتْنَتُكَ ؕ تُضِلُّ بِهَا مَنْ تَشَآءُ وَتَهْدِيْ مَنْ تَشَآءُ ؕ اَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَاَنْتَ خَيْرُ الْغٰفِرِيْنَ (١٥٥)

(১৫৫) আর মূসা সত্তরজন পুরুষকে নিজ সম্প্রদায় হতে আমার নির্ধারিত সময়ের জন্য নির্বাচন করলেন, অনন্তর যখন তাদেরকে ভূমিকম্প পাকড়াও করল, তখন মূসা আরজ করলেন, হে আমার পরওয়ারদেগার! যদি আপনি ইচ্ছা করতেন, তবে এটার পূর্বেই এদেরকে ও আমাকে ধ্বংস করতে পারতেন, এটা কেমন করে হতে পারে যে, আপনি আমাদের মধ্যকার কতিপয় নির্বোধ লোকের কার্যের দরুন, আমাদের সকলকে ধ্বংস করে ফেলবেন, এই ঘটনাটি তো কেবল আপনার পক্ষ হতে একটি পরীক্ষা, এরূপ পরীক্ষা দ্বারা আপনি যাকে ইচ্ছা বিপথগামী করতে পারেন এবং যাকে ইচ্ছা সৎপথে স্থায়ী রাখতে পারেন। আপনিই তো আমাদের তত্ত্বাবধায়ক, আমাদেরকে ক্ষমা করুন ও দয়া করুন, আর আপনিই সর্বোত্তম ক্ষমাকারী ।

শাব্দিক অনুবাদ

(১৫৩) وَالَّذِيْنَ عَمِلُوا السَّيِّاٰتِ আর যারা পাপ কার্য সম্পাদন করেছে ثُمَّ تَابُوْا مِنْۢ بَعْدِهَا অনন্তর তারা তার উপর তওবা করে নেয় وَ اٰمَنُوْٓا এবং ঈমান আনয়ন করে اِنَّ رَبَّكَ مِنْۢ بَعْدِهَا তাহলে তোমার প্রতিপালক ঐ তওবার পর لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ক্ষমাশীল, দয়াশীল ।

(১৫৪) وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُّوْسَى الْغَضَبُ আর যখন মূসার ক্রোধ প্রশমিত হলো اَخَذَ الْاَلْوَاحَ তখন সেই ফলকগুলো তুলে নিলেন وَفِيْ نُسْخَتِهَا هُدًى وَّرَحْمَةٌ আর তাদের বিষয়বস্তুগুলোর মধ্যে হেদায়েত ও রহমত ছিল لِّلَّذِيْنَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُوْنَ সে সমস্ত লোকের জন্য যারা নিজেদের প্রতিপালককে ভয় করে ।

(১৫৫) وَاخْتَارَ مُوْسٰى আর মূসা নির্বাচন করলেন قَوْمَهٗ নিজ সম্প্রদায় হতে سَبْعِيْنَ رَجُلًا সত্তরজন পুরুষকে لِّمِيْقَاتِنَا আমার নির্ধারিত সময়ের জন্য فَلَمَّآ اَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ অনন্তর যখন তাদেরকে ভূমিকম্প পাকড়াও করল قَالَ তখন মূসা আরজ করলেন رَبِّ হে আমার পরওয়ারদেগার! لَوْ شِئْتَ যদি আপানি ইচ্ছা করতেন اَهْلَكْتَهُمْ مِّنْ قَبْلُ وَاِيَّايَ তবে এটার পূর্বেই এদেরকে ও আমাকে ধ্বংস করতে পারতেন اَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَآءُ مِنَّا এটা কেমন করে হতে পারে যে, আপনি আমাদের মধ্যকার কতিপয় নির্বোধ লোকের কার্যের দরুন আমাদের সকলকে ধ্বংস করে ফেলবেন اِنْ هِيَ اِلَّا فِتْنَتُكَ এ ঘটনাটি তো কেবল আপনার পক্ষ হতে একটি পরীক্ষা تُضِلُّ بِهَا مَنْ تَشَآءُ এরূপ পরীক্ষা দ্বারা আপনি যাকে ইচ্ছা বিপথগামী করতে পারেন وَتَهْدِيْ مَنْ تَشَآءُ এবং যাকে ইচ্ছা সৎপথে স্থায়ী রাখতে পারেন اَنْتَ وَلِيُّنَا আপনিই তো আমাদের তত্ত্বাবধায়ক فَاغْفِرْ لَنَا আমাদেরকে ক্ষমা করুন وَارْحَمْنَا ও দয়া করুন وَاَنْتَ خَيْرُ الْغٰفِرِيْنَ আর আপনিই সর্বোত্তম ক্ষমাকারী ।

www.almodina.com

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

কোন কোন পাপের শাস্তি পার্থিব জীবনেই পাওয়া যায় : সামেরী ও তার সঙ্গীদের যেমন হয়েছিল যে, গোবৎস উপাসনা থেকে যখন তারা যথার্থভাবে তওবা করল না, তখন আল্লাহ তা'আলা তাকে এ পৃথিবীতে অপদস্থ অপমানিত করে ছেড়েছেন। তাকে হযরত মূসা (আ.) নির্দেশ দিয়ে দিলেন, সে যেন সকলের কাছ থেকে পৃথক থাকে, সেও যাতে কাউকে না ছোঁয়, তাকেও যেন কেউ না ছোঁয়। সুতরাং সারা জীবন এমনিভাবে জীবজন্তুর সাথে বসবাস করতে থকে, কোনো মানুষ তার সংস্পর্শে আসত না।

তাফসীরে কুরতুবীতে হযরত কাতাদাহ (রা.) -এর উদ্ধৃতিতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা তার উপর এমন আজাব চাপিয়ে দিয়েছিলেন যে, যখনই সে কাউকে স্পর্শ করত কিংবা তাকে কেউ স্পর্শ করতে তখন সঙ্গে সঙ্গে উভয়েরই গায়ে জ্বর এসে যেত। –[কুরতুবী]

তাফসীরে রূহুল বয়ানে বলা হয়েছে যে, আজও তার বংশধরদের মাঝে এমনি অবস্থা বিদ্যমান। আয়াতের শেষদিকে বলা হয়েছে– وَكَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُفْتَرِيْنَ অর্থাৎ যারা আল্লাহর প্রতি অপবাদ আরোপ করে, তাদেরকে এমনি শাস্তি দিয়ে থাকি। হযরত সুফিয়ান ইবনে উইয়াইনাহ (র.) বলেন, যারা ধর্মীয় ব্যাপারে বিদআত অবলম্বন করে (অর্থাৎ ধর্মে কোনো রকম কুসংস্কার সৃষ্টি অথবা গ্রহণ করে।) তারাও আল্লাহর প্রতি অপবাদ আরোপের অপরাধে অপরাধী হয়ে সে শাস্তিরই যোগ্য হয়ে পড়ে। –[মাযহারী] ইমাম মালেক (র.) এ আয়াতের মাধ্যমে প্রমাণ করেন যে, ধর্মীয় ব্যাপারে যারা নিজেদের পক্ষ থেকে কোনো বিদ'আত বা কুসংস্কার আবিষ্কার করে তাদের শাস্তি এই যে, তারা আখেরাতে আল্লাহর রোষাণলে পতিত হবে এবং পার্থিব জীবনে অপমান ও লাঞ্ছনা ভোগ করবে। –[কুরতুবী]

১৫৩ নং আয়াতে সেসব লোকের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে, যারা হযরত মূসা (আ.) -এর সতর্কীকরণের পর নিজেদের এই অপরাধের জন্য তওবা করে নিয়েছে এবং তওবার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে যে কঠোরতর শর্ত আরোপ করা হয়েছিল যে, তাদেরই একজন অপরজনকে হত্যা করতে থাকলেই তওবা কবুল হবে তারা সে শর্তও পালন করল, তখন হযরত মূসা (আ.) আল্লাহ তা'আলার নির্দেশক্রমে তাদেরকে ডেকে বললেন, তোমাদের সবার তওবাই কবুল হয়েছে। এই হত্যাযজ্ঞে যারা মৃত্যুবরণ করেছে, তারা শহীদ হয়েছে, আর যারা বেঁচে রয়েছে তারা এখন ক্ষমাপ্রাপ্ত। এ আয়াতে বলা হয়েছে, যেসব লোক মন্দকাজে লিপ্ত হয়ে পড়ে তা সে কাজ যত বড় পাপই হোক, কুফরিও যদি হয়, তবুও পরবর্তীতে তওবা করে নিলে এবং ঈমান ঠিক করে ঈমানের দাবি অনুযায়ী নিজের আমল বা কর্ম সংশোধন করে নিলে, আল্লাহ তাকে নিজ রহমতে ক্ষমা করে দিবেন। কাজেই কারো দ্বারা কোনো পাপ হয়ে গেলে, সঙ্গে সঙ্গে তা থেকে তওবা করে নেওয়া একান্ত কর্তব্য।

১৫৪ নং আয়াতে বলা হয়েছে যে, হযরত মূসা (আ.) -এর রাগ যখন প্রশমিত হয়, তখন তাড়াতাড়িতে ফেলে রাখা তওরাতের তখতিগুলো আবার তুলে নিলেন। আল্লাহ তা'আলাকে যারা ভয় করে তাদের জন্য সে 'সংকলনে' হেদায়েত ও রহমত ছিল। نُسْخَةٌ 'সংকলন' বলা হয় সে লেখাকে যা কোনো গ্রন্থরাজি থেকে উদ্ধৃত করা হয়। কোনো কোনো বর্ণনায় রয়েছে যে, হযরত মূসা (আ.) রাগের মাথায় যখন তওরাতের তখতিগুলো তাড়াতাড়িতে নামিয়ে রাখেন তখন সেগুলো ভেঙ্গে গিয়েছিল। ফলে পরে আল্লাহ তা'আলা অন্য কোনো কিছুতে লেখা তাওরাত দান করেছিলেন। তাকেই 'নোসখা' বা সংকলন বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

সত্তরজন বনী ইসরাঈলের নির্বাচন এবং তাদের ধ্বংসের ঘটনা : ১৫৫ নং আয়াতে একটি বিশেষ ঘটনা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে যে, হযরত মূসা (আ.) যখন আল্লাহর কিতাব তাওরাত নিয়ে এসে বনী ইসরাঈলদেরকে দিলেন, তখন নিজেদের বক্রতা ও ছলছুতার দরুন বলতে লাগল যে, আমরা একথা কেমন করে বিশ্বাস করব যে, এটা আল্লাহরই কালাম? এমনও তো হতে পারে যে, আপনি নিজেই এগুলো নিয়ে এসে থাকবেন। হযরত মূসা (আ.) তখন এ বিষয়ে তাদের নিশ্চয়তা বিধানের জন্য আল্লাহ তা'আলার দরবারে প্রার্থনা করলেন। তারই প্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে বল হলো যে, আপনি এ সম্প্রদায়ের নির্বাচিত ব্যক্তিদেরকে তূরে নিয়ে আসুন। আমি তাদেরকেও নিজের কালাম শুনিয়ে দেব। তাহলেই বিষয়টি তাদের বিশ্বাস হয়ে যাবে। হযরত মূসা (আ.) তাদের মধ্য থেকে সত্তরজনকে নির্বাচিত করে তূরে নিয়ে গেলেন। ওয়াদা অনুযায়ী তারা নিজ কানে আল্লাহর কালামও শুনল। এ প্রমাণও যথার্থভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে তারা পুনরায় বলতে লাগল, কে জানে এ শব্দ আল্লাহরই না অন্য কারও। আমরা তো তখনই বিশ্বাস করব, আল্লাহকে যখন

প্রকাশ্য আমাদের সামনে সরাসরি দেখতে পাব। তাদের এ দাবি যেহেতু একান্তই হঠকারিতা ও মূর্খতার ভিত্তিতে ছিল, তাই তাদের উপর ঐশী রোষাণল বর্ষিত হলো। ফলে তাদের নিচের দিক থেকে এলো ভূমিকম্প, আর উপর দিকে থেকে শুরু হলো বজ্র গর্জন। যার দরুন তারা অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল এবং দৃশ্যত মৃতে পরিণত হলো। এ ঘটনার বর্ণনা প্রসঙ্গে সূরা বাক্বারায় এ ক্ষেত্রে صاعقة (সা'ইক্বাহ) শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। আর এখানে বলা হয়েছে رجفة (রাজফাহ্)। 'সা'ইক্বাহ' অর্থ– বজ্র গর্জন। আর 'রাজফাহ' অর্থ– ভূমিকম্প। কাজেই ভূমিকম্প ও বজ্র গর্জন একই সাথে আরম্ভ হয়ে যাওয়াও কিছুই অসম্ভব নয়।

প্রকৃতপক্ষে মৃত্যু হোক আর নাই হোক, তারা মৃতের মতো হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল, যাতে বাহ্যত মৃত বলেই মনে হতে পারে। এ ঘটনায় হযরত মূসা (আ.) অত্যন্ত বিচলিত হলেন। কারণ, একে তো এরা ছিল সম্প্রদায়ের বাছা বাছা (বুদ্ধিজীবী) লোক, দ্বিতীয়ত জাতির কাছে গিয়ে তিনি কি জবাব দিবেন। তারা অপবাদ আরোপ করবে যে, হযরত মূসা (আ.) তাদেরকে কোথাও নিয়ে গিয়ে হত্যা করে ফেলেছে। তদুপরি এ অপবাদ আরোপের পর এরা আমাকেও রেহাই দিবে না; নির্ঘাত হত্যা করবে। সেজন্যই তিনি আল্লাহর দরবারে নিবেদন করলেন, হে পরওয়ারদেগার! আমি জানি, এ ঘটনায় তাদেরকে হত্যা করা আপনার উদ্দেশ্য নয়। কারণ তাই যদি হতো, তবে ইতঃপূর্বে বহু ঘটনা ঘটেছে যাতে এরা নিহত হয়ে যেতে পারত; ফেরাউনের সাথে তাদরেও সলিল সমাধি হতে পারত; কিংবা গোবৎস পূজার সময়ও সবার সামনে হত্যা করে দেওয়া যেতে পারত। তাছাড়া আপনি ইচ্ছা করলে আমাকেও তাদের সাথেই ধ্বংস করে দিতে পারতেন, কিন্তু আপনি তা চাননি। তাতে বুঝা যাচ্ছে, এক্ষেত্রেও তাদেরকে ধ্বংস করে দেওয়া উদ্দেশ্য নয়; বরং উদ্দেশ্য হলো শাস্তি দেওয়া এবং সতর্ক করা। তাছাড়া এটা হয়ইবা কেমন করে যে, আপনি আমাদের কয়েকজন নিরেট মূর্খের কার্যকলাপের দরুন আমাদের সবাইকে ধ্বংস করে দিবেন। এক্ষেত্রে নিজকে নিজে ধ্বংস করা এজন্য বলা হয়েছে যে, এ সত্তরজনের এভাবে অদৃশ্য মৃত্যুর পরিণতি সম্প্রদায়ের হাতে হযরত মূসা (আ.) -এর ধ্বংসেরই নামান্তর ছিল।

অতঃপর নিবেদন করলেন যে, আমি জানি, এটা একান্তই পরীক্ষা, যাতে আপনি কোনো কোনো লোককে পথভ্রষ্ট গোমরাহ করে দেন, যার ফলে তারা আল্লাহ তা'আলার নাশোকর বা অকৃতজ্ঞ হয়ে উঠে। আবার অনেককে এর দ্বারা সুপথে প্রতিষ্ঠিত রাখেন। পরে তারা আল্লাহ তা'আলার তত্ত্ব ও কল্যাণসমূহ উপলব্ধি করে প্রশান্তি অনুভব করতে থাকে। আমিও আপনার বিজ্ঞতা ও জ্ঞানী হওয়ার ব্যাপারে জ্ঞাত রয়েছি। সুতরাং আপনার এ পরীক্ষায় আমি সন্তুষ্ট। তাছাড়া আপনিই তো আমাদের প্রকৃত অভিভাবক আমাদেরকে ক্ষমা করুন, আমাদের প্রতি করুণা ও রহমত দান করুন। আপনিই সমস্ত ক্ষমাকারীদের মধ্যে মহান ক্ষমাকারী। কাজেই তাদের ধৃষ্টতাকেও ক্ষমা করুন। বস্তুত (এ প্রার্থনার পর) তারা যথাপূর্ব জীবিত হয়ে উঠে।

শব্দ বিশ্লেষণ

عَجِلْتُمْ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ اثبات فعل ماضى معروف বাব سَمِعَ মাসদার اَلْعَجَلُ মূলবর্ণ (ع - ج - ل) জিনস صحيح অর্থ– তোমরা ত্বরান্বিত করলে।

يَجُرُّ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ اثبات فعل مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْجَرُّ মূলবর্ণ (ج - ر - ر) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– তিনি টেনে আনলেন।

لَاتُشْمِتْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ نهى حاضر معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِشْمَاتُ মূলবর্ণ (ش - م - ت) জিনস صحيح অর্থ– তুমি হাস্যের বস্তু বানাবে না।

سَيَنَالُهُمْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব سَمِعَ মাসদার اَلنَّيْلُ মূলবর্ণ (ن - ى - ل) জিনস اجوف يائى অর্থ– সে পতিত হবে।

يَرْهَبُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ اثبات فعل مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلرَّهْبُ মূলবর্ণ (ر - ه - ب) জিনস صحيح অর্থ– তারা ভয় করে।

شِئْتَ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ اثبات فعل ماضى معروف বাব فَتَحَ মাসদার اَلْمَشِيْئَةُ মূলবর্ণ (ش - ى - ء) জিনস মুরাক্কাব مهموز لام ও اجوف يائى অর্থ– তুমি ইচ্ছা করেছ।

www.almodina.com

وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ ۚ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ ۖ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ۚ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ (١٥٦)

অনুবাদ : (১৫৬) আর আমাদের নামে কল্যাণ লিখে দিন ইহলোকেও এবং পরলোকেও, আমরা আপনার দিকেই প্রত্যাবর্তন করছি। আল্লাহ বললেন, আমি স্বীয় আজাব তো তাকেই প্রদান করি যাকে ইচ্ছা করি, আর আমার অনুগ্রহ সকল বস্তুকে পরিবেষ্টন করে আছে, অতএব, সেই অনুগ্রহ তো তাদের জন্য অবশ্যই লিখব যারা আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করে এবং জাকাত প্রদান করে এবং যারা আমার আয়াতসমূহের প্রতি ঈমান আনয়ন করে।

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۚ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ ۙ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (١٥٧)

(১৫৭) যারা অনুসরণ করে এমন রাসূলের যিনি নবীয়ে-উম্মী, যাঁকে তারা লিখিত পায় নিজেদের নিকটে তাওরাত ও ইঞ্জীলে, তিনি তাদেরকে সৎকাজের আদেশ করনে এবং মন্দকাজ হতে নিষেধ করেন, আর পবিত্র বস্তুগুলোকে তাদের জন্য হালাল বলেন এবং অপবিত্র বস্তুগুলোকে তাদের উপর হারাম করে দেন এবং তাদের উপর যে গুরুভার ও বেড়ী ছিল তা তাদের হতে বিদূরিত করেন, অতএব, যারা এই নবীর প্রতি ঈমান আনয়ন করে এবং তাঁর সহযোগিতা ও তাঁর সাহায্য করে এবং সেই নূর [কুরআন] -এর অনুসরণ করে যা প্রেরিত হয়েছে তাঁর সাথে, এরূপ লোকই পূর্ণ সফলকাম।

শাব্দিক অনুবাদ

(১৫৬) وَاكْتُبْ لَنَا আর আমাদের নামে লিখে দিন فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا ইহলোকেও حَسَنَةً কল্যাণ وَفِي الْآخِرَةِ এবং পরলোকেও إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ আমরা আপনার দিকেই প্রত্যাবর্তন করছি قَالَ আল্লাহ বললেন عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ আমি স্বীয় আজাব তো তাকেই প্রদান করি যাকে ইচ্ছা করি وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ আর আমার অনুগ্রহ সকল বস্তুকে পরিবেষ্টন করে আছে فَسَأَكْتُبُهَا অতএব, সেই অনুগ্রহ তো তাদের জন্য অবশ্যই লিখব لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ যারা আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করে وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ এবং জাকাত প্রদান করে وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ এবং যারা আমার আয়াতসমূহের প্রতি ঈমান আনয়ন করে

(১৫৭) الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ যারা অনুসরণ করে الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ এমন রাসূলের যিনি নবীয়ে-উম্মী الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا যাকে তারা লিখিত পায় عِنْدَهُمْ নিজেদের নিকটে فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ তাওরাত ও ইঞ্জীলে يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ তিনি তাদেরকে সৎকাজের আদেশ করেন وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ এবং মন্দকাজ হতে নিষেধ করেন وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ আর পবিত্র বস্তুগুলোকে তাদের জন্য হালাল বলেন وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ এবং অপবিত্র বস্তুগুলোকে তাদের উপর হারাম করে দেন وَيَضَعُ عَنْهُمْ এবং তাদের হতে বিদূরিত করেন إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ তাদের উপর যে গুরুভার ও বেড়ি ছিল তা فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ অতএব, যারা এই নবীর প্রতি ঈমান আনয়ন করে وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ এবং তাঁর সহযোগিতা ও তাঁর সাহায্য করে وَاتَّبَعُوا النُّورَ, এবং সেই নূর [কুরআন] -এর অনুসরণ করে الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ যা প্রেরিত হয়েছে তাঁর সাথে أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ এরূপ লোকই পূর্ণ সফলকাম।

www.almodina.com

অনুবাদ : (১৫৮) আপনি বলে দিন, হে মানবসকল! আমি তোমাদের সকলের প্রতি সেই আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত [রাসূল] যাঁর পূর্ণ আধিপত্য রয়েছে আসমানসমূহে এবং জমিনে, তিনি ভিন্ন কেউই ইবাদতের যোগ্য নয়, তিনিই জীবন দান করেন এবং তিনিই মৃত্যু ঘটান। অতএব তোমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান আন এবং তাঁর প্রেরিত নবীয়ে-উম্মীর প্রতি [-ও] যিনি [স্বয়ং] আল্লাহ তা'আলার প্রতি এবং তাঁর নির্দেশনাবলির প্রতি ঈমান রাখেন এবং তাঁর অনুসরণ কর, যেন তোমরা [সৎ] পথ প্রাপ্ত হও।

قُلْ يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعَا ۨ الَّذِىْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ يُحْىٖ وَيُمِيْتُ ۖ فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ النَّبِىِّ الْاُمِّىِّ الَّذِىْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَكَلِمٰتِهٖ وَاتَّبِعُوْهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ (১৫৮)

(১৫৯) আর মূসার সম্প্রদায়ের মধ্যে একদল এমনও রয়েছে, যারা সত্যের অনুরূপ হেদায়েত করে এবং তারই অনুরূপ বিচারও করে।

وَمِنْ قَوْمِ مُوْسٰۤى اُمَّةٌ يَّهْدُوْنَ بِالْحَقِّ وَبِهٖ يَعْدِلُوْنَ (১৫৯)

শাব্দিক অনুবাদ

(১৫৮) قُلْ আপনি বলে দিন يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ হে মানব সকল! اِنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعَا আমি তোমাদের সকলের প্রতি সেই আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত [রাসূল] الَّذِىْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ যাঁর পূর্ণ আধিপত্য রয়েছে আসমানসমূহে এবং জমিনে لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ তিনি ভিন্ন কেউই ইবাদতের যোগ্য নয় يُحْىٖ وَيُمِيْتُ তিনিই জীবন দান করেন এবং তিনিই মৃত্যু ঘটান فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ অতএব তোমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান আন وَرَسُوْلِهِ النَّبِىِّ الْاُمِّىِّ এবং তাঁর প্রেরিত নবীয়ে-উম্মীর প্রতি [-ও] الَّذِىْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَكَلِمٰتِهٖ যিনি [স্বয়ং] আল্লাহ তা'আলার প্রতি এবং তাঁর নির্দেশনাবলির প্রতি ঈমান রাখেন وَاتَّبِعُوْهُ এবং তাঁর অনুসরণ কর لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ যেন তোমরা [সৎ] পথ প্রাপ্ত হও।

(১৫৯) وَمِنْ قَوْمِ مُوْسٰۤى اُمَّةٌ আর মূসার সম্প্রদায়ের মধ্যে একদল এমনও রয়েছে يَّهْدُوْنَ بِالْحَقِّ যারা সত্যের অনুরূপ হেদায়েত করে وَبِهٖ يَعْدِلُوْنَ এবং তাঁরই অনুরূপ বিচারও করে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(১৫৬) قوله وَرَحْمَتِىْ وَسِعَتْ كُلَّ شَىْءٍ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** আবুশ শায়খ আল্লামা সুদ্দীর বরাত দিয়ে বলেন যে, তিনি বলেছেন وَرَحْمَتِىْ وَسِعَتْ كُلَّ شَىْءٍ (আমার রহমত সকল বস্তুকে পরিবেষ্টন করে রেখেছে) আয়াতাংশ যখন নাজিল হয়, তখন শয়তান বলল, আমিও তো একটি বস্তু। সুতরাং আমিও আল্লাহর রহমতের পরিবেষ্টনীতে রয়েছি। তখন শয়তানের সে প্রত্যাশার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত রহিত করে তার পরবর্তী অংশ فَسَاَكْتُبُهَا لِلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِاٰيٰتِنَا يُؤْمِنُوْنَ নাজিল করেন। -[ফাতহুল কাদীর : ২৫৩/২]

(১৫৯) **قوله وَمِنْ قَوْمِ مُوْسٰۤى اُمَّةٌ يَّهْدُوْنَ بِالْحَقِّ وَبِهٖ يَعْدِلُوْنَ الاية : আয়াতের শানে নুযূল :** প্রখ্যাত মুফাসসির ইবনে জারীর, ইবনে কাছীর প্রমুখ এ প্রসঙ্গে এক কাহিনী উদ্ধৃত করেছেন যে, এ জামাত দ্বারা সে দলই উদ্দেশ্য যারা বনী ইসরাঈলের গোমরাহি, অসৎকর্ম, নারী, হত্যা প্রভৃতি কার্যকলাপে অতিষ্ঠ হয়ে তাদের থেকে সরে পড়েছিল। বনী ইসরাঈলদের বারটি গোত্রের মধ্যে একটি গোত্র ছিল যারা নিজেদের জাতির কার্যকলাপে অতিষ্ঠ হয়ে প্রার্থনা করেছিল যে, হে আল্লাহ! আমাদেরকে তাদের থেকে সরিয়ে কোনো দূর দেশে পুনর্বাসিত করে দিন। যাতে আমরা আমাদের দীনের উপর দৃঢ়তার সাথে আমল করতে পারি। আল্লাহ তাঁর পরিপূর্ণ কুদরতের দ্বারা তাদেরকে দূর প্রাচ্যের কোনো ভূখণ্ডে পৌঁছে দেন। সেখানে তারা

www.almodina.com

নির্ভেজাল ইবাদতে আত্মনিয়োগ করে। রাসূলে কারীম ﷺ-এর আবির্ভাবের পরেও আল্লাহর মহিমায় তাদের মুসলমান হওয়ার এই ব্যবস্থা হয় যে, মিরাজের রাত্রে হযরত জিবরাঈল (আ.) রাসূল ﷺ-কে সেদিকে নিয়ে যান তখন তারা মহানবী ﷺ-এর উপর ঈমান আনে। রাসূল ﷺ তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের কি মাপের কোনো ব্যবস্থা আছে? তোমাদের জীবিকার ব্যবস্থা কি? তারা উত্তরে দিল যে, আমরা জমিতে শস্য বপন করি। যখন তা উপযুক্ত হয় তখন সেগুলোকে কেটে সেখানেই স্তূপীকৃত করে দেই। সে স্তূপ থেকে সবাই নিজ নিজ প্রয়োজন মতো নিয়ে আসে। সুতরাং আমাদের মাপের কোনো প্রয়োজন পড়ে না।

রাসূল ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের মধ্যে কি কেউ মিথ্যা বলে? তারা বলল, না। কারণ কেউ যদি তা করে তাহলে সাথে সাথে একটি আগুন এসে তাকে পুড়িয়ে দেয়। রাসূল ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের সবার ঘরবাড়িগুলো একই রকম কেন? তারা বলল যাতে কেউ কারও উপর প্রাধান্য প্রকাশ করতে না পারে। অতঃপর রাসূল ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা তোমাদের বাড়িগুলোর সামনে এসব কবর কেন বানিয়ে রেখেছ? তারা বলল, যাতে আমাদের সামনে সর্বক্ষণ মৃত্যু উপস্থিত থাকে। অতঃপর যখন রাসূল ﷺ মিরাজ থেকে মক্কায় ফিরে আসলেন তখন উক্ত আয়াতটি নাজিল হয়। তাফসীরে কুরতুবী এ রেওয়ায়েতটিকে মৌলিক সাব্যস্ত করে অন্যান্য সম্ভাব্যর কথাও লিখেছেন। ইবনে কাছীর একে বিস্ময়কর কাহিনী বলেছেন। কিন্তু একে খণ্ডন করেননি। অবশ্য কুরতুবী এ রেওয়ায়েতটি উদ্ধৃত করে বলেছেন যে, সম্ভবত এ রেওয়ায়েতটি বিশুদ্ধ নয়। –[সূত্র তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন-৪৯২]

অন্য রেওয়ায়েতে আছে যে, উক্ত আয়াতটি আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম ও তার সঙ্গীদের সম্পর্কে নাজিল হয়েছে যারা প্রথমে ইহুদি ছিল পরবর্তীতে মুসলমান হয়ে যায়।

খাতামুন্নাবিয়্যীন মুহাম্মদ মোস্তফা ﷺ ও তাঁর উম্মতের গুণ বৈশিষ্ট্য : পূর্ববর্তী আয়াতে হযরত মূসা (আ.)–এর দোয়ার প্রতিউত্তরে বলা হয়েছিল যে, সাধারণত আল্লাহর রহমত তো সমস্ত মানুষ ও বিষয় সামগ্রীতে ব্যাপক, আপনার বর্তমান উম্মতও তা থেকে বঞ্চিত নয়, কিন্তু পরিপূর্ণ নিয়ামত ও রহমতের অধিকারী হলো তারাই যারা ঈমান, তাকওয়া পরহেজগারি ও জাকাত দান প্রভৃতি বিশেষ শর্তসমূহ পূরণ করেন।

এ আয়াতে তাদেরই সন্ধান দেওয়া হয়েছে যে, উল্লিখিত শর্তসতমূহের যথার্থ পূরণকারী কারা হতে পারে। বলা হয়েছে, এরা হচ্ছে সেসব লোক যারা উম্মী নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা ﷺ-এর যথাযথ অনুসরণ করবে। এ প্রসঙ্গে মহানবী ﷺ -এর কয়েকটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও নিদর্শনের কথা উল্লেখ করে তাঁর প্রতি শুধু ঈমান আনা বা বিশ্বাস স্থাপনই নয়; বরং সেই সাথে তাঁর অনুসরণ ও আনুগত্যেরও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এতে প্রতীয়মাণ হয় যে, পরকালীন কল্যাণ লাভের জন্য ঈমানের সঙ্গে সঙ্গে শরিয়ত ও সুন্নাহর আনুগত্য অনুসরণও একান্ত আবশ্যক।

اَلرَّسُوْلَ النَّبِيَّ الْاُمِّيَّ এখানে মহানবী ﷺ-এর দুটি পদবী 'রাসূল' ও 'নবী' -এর সাথে সাথে তৃতীয় একটি বৈশিষ্ট্য 'উম্মী' -এরও উল্লেখ করা হয়েছে। اُمِّيٌّ (উম্মী) শব্দের অর্থ হলো– নিরক্ষর। যে লেখাপড়া কোনোটাই জানে না। সাধারণ আরবদেরকে সে কারণেই কুরআনে اُمِّيِّيْنَ (উম্মিয়ীন) বা নিরক্ষর জাতি বলে অভিহিত করেছে যে, তাদের মধ্যে লেখাপড়ার প্রচলন খুবই কম ছিল। তবে উম্মী বা নিরক্ষর হওয়াটা কোনো মানুষের জন্য প্রসংশনীয় গুণ নয়; বরং ত্রুটি হিসেবেই গণ্য। কিন্তু রাসূলে কারীম ﷺ-এর জ্ঞান-গরীমা, তত্ত্ব ও তথ্য অবগতি এবং আন্যান্য গুণ বৈশিষ্ট্য ও পরাকাষ্ঠা সত্ত্বেও উম্মী হওয়া তাঁর পক্ষে বিরাট গুণ ও পরিপূর্ণতায় পরিণত হয়েছে। কারণ শিক্ষাগত, কার্যগত ও নৈতিক পরাকাষ্ঠা যদি কোনো লেখাপড়া জানা মানুষের দ্বারা প্রকাশ পায়, তাহলে তা হয়ে থাকে তার সে লেখাপড়ারই ফলশ্রুতি, কিন্তু কোনো একান্ত নিরক্ষর ব্যক্তির দ্বারা এমন অসাধারণ, অভূতপূর্ব ও অনন্য তত্ত্ব, তথ্য ও সূক্ষ্ম বিষয় প্রকাশ পেলে, তা তাঁর প্রকৃষ্ট মু'জিযা ছাড়া আর কি হতে পারে– যা কোনো প্রথম শ্রেণির বিদ্বেষীও অস্বীকার করতে পারে না। বিশেষ করে মহানবী ﷺ-এর জীবনের প্রথম চল্লিশটি বছর মক্কা নগরীতে সবার সামনে এমনভাবে অতিবাহিত হয়েছে, যাতে তিনি কারও কাছে এক অক্ষর পড়েনওনি লেখেনওনি। ঠিক চল্লিশ বছর বয়সকালে সহসা তাঁর পবিত্র মুখ থেকে এমন বাণীর ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হলো, যার একটি ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর অংশের মতো একটি সূরা রচনায় সমগ্র বিশ্ব অপারগ হয়ে পড়ল। কাজেই এমতাবস্থায় তাঁর উম্মী বা নিরক্ষর হওয়া, আল্লাহ কর্তৃক মনোনীত রাসূল হওয়ার এবং কুরআন মাজীদ আল্লাহর কালাম হওয়ারই সবচেয়ে বড় প্রমাণ। অতএব উম্মী হওয়া যদিও অন্যদের জন্য কোনো প্রশংসনীয় গুণ নয়, কিন্তু রাসূলে কারীম

ﷺ-এর জন্য একটি প্রশংসনীয় ও মহান গুণ ও পরাকাষ্ঠা ছাড়া আর কিছুই নয়। কোনো মানুষের জন্য যেমন অহংকারী শব্দটি কোনো প্রসংশা বাচক গুণ নয় বরং ত্রুটি বলে গণ্য হয়, কিন্তু মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের জন্য এটি বিশেষভাবেই প্রশংসাবাচক সিফত।

আলোচ্য আয়াতে মহানবী ﷺ-এর চতুর্থ বৈশিষ্ট্য এই বর্ণনা করা হয়েছে যে, তারা (অর্থাৎ ইহুদি নাসারারা) আপনার সম্পর্কে তাওরাতে ও ইঞ্জীলে লেখা দেখবে। এখানে লক্ষণীয় যে, কুরআন মাজীদ একথা বলেনি যে, 'আপনার গুণ বৈশিষ্ট্য ও অবস্থাসমূহ তাতে লেখা পাবে।' এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, তওরাত ও ইঞ্জীলে মহানবী ﷺ-এর অবস্থা ও গুণ বৈশিষ্ট্যসমূহ এমন স্পষ্ট ও বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে, যার প্রতি লক্ষ্য করা স্বয়ং রাসূল ﷺ-কে দেখারই শামিল। আর এখানে তাওরাত ও ইঞ্জীলের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ এই যে. বনী ইসরাঈলরা এ দুটি গ্রন্থকেই স্বীকৃতি দিয়ে থাকত। তা না হলে মহানবী ﷺ-এর গুণ বৈশিষ্ট্যের আলোচনা 'যাবুর' গ্রন্থেও রয়েছে।

উল্লিখিত আয়াতের প্রকৃত লক্ষ্য হচ্ছেন হযরত মূসা (আ.)। এতে তাঁকে বলা হয়েছে, দুনিয়া ও আখেরাতের পরিপূর্ণ কল্যাণ আপনার উম্মতের মধ্যে তারাই পেতে পারবে, যারা উম্মী নবী ও খাতামুল আম্বিয়া আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের অনুসরণ করবে। এ বিষয়গুলো তারা তওরাত ও ইঞ্জীলে লেখা দেখতে পাবে।

তাওরাত ও ইঞ্জীলে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর গুণবৈশিষ্ট্য ও নিদর্শন : বর্তমান কালের তাওরাত ও ইঞ্জীল অসংখ্য রদবদল ও বিকৃতি সাধনের ফলে বিশ্বাসযোগ্য থাকেনি। কিন্তু তা সত্ত্বেও এখন পর্যন্ত তাদের এমন সব বাক্যও বর্ণনা রয়েছে, যাতে মহানবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা ﷺ-এর সন্ধান পাওয়া যায়। আর এ বিষয়টি অত্যন্ত স্পষ্ট যে, কুরআন মাজীদ যখন ঘোষণা করেছে যে, শেষ নবীর গুণবৈশিষ্ট্য ও নিদর্শনসমূহ তাওরাত ও ইঞ্জীলে রয়েছে, তখন একথাটি যদি বাস্তবতার বিরোধী হতো, তাবে সে যুগের ইহুদি ও নাসারাদের হাতে ইসলামের বিরুদ্ধে এমন এক বিরাট হাতিয়ার উপস্থিত হতো যার মাধ্যমে (সহজেই) কুরআনকে মিথ্যা সাব্যস্ত করতে পারত যে, না তাওরাত ও ইঞ্জীলের কোথাও নবীয়ে উম্মী ﷺ সম্পর্কে আলোচনা নেই। কিন্তু তখনকার ইহুদি বা নাসারারা কুরআনের এ ঘোষণার বিরুদ্ধে কোনো পাল্টা ঘোষণা করেনি। এটাই একটা বিরাট প্রমাণ যে, তখনকার তাওরাত ও ইঞ্জীলে রাসূলে করীম ﷺ-এর গুণ-বৈশিষ্ট্য ও নিদর্শনাদি সম্পর্কে বিশদ আলোচনা বিদ্যমান ছিল, ফলে তারাও ছিল সম্পূর্ণ নীরব নিশ্চুপ।

খাতামুন্নাবিয়্যীন (সমস্ত নবীর শেষ নবী ﷺ-এর যেসব গুণ-বৈশিষ্ট্য তাওরাত ও ইঞ্জীলে লিপিবদ্ধ ছিল সেগুলোর কিছু আলোচনা তাওরাত ও ইঞ্জীলের উদ্ধৃতি সাপেক্ষে কুরআন মাজীদেও করা হয়েছে। আর কিছু সে সমস্ত মনীষীবৃন্দের উদ্ধৃতিতে হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে, যাঁরা তওরাত ও ইঞ্জীলের আসল সংকলন স্বচক্ষে দেখেছেন এবং তাতে রাসূলে কারীম ﷺ-এর আলোচনা নিজে পড়েই মুসলমান হয়েছেন।

হযরত বায়হাকী (র.) 'দালায়েলুন্নবুয়্যাত' গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন যে, কোনো এক ইহুদি বালক নবী করীম ﷺ -এর খেদমত করত। হঠাৎ সে একবার অসুস্থ হয়ে পড়লে রাসূল ﷺ তার অবস্থা জানার জন্য তশরিফ নিয়ে গেলেন। তিনি দেখলেন তার পিতা তার মাথার কাছে দাঁড়িয়ে তাওরাত তেলাওয়াত করছে। রাসূল ﷺ বললেন, হে ইহুদি! আমি তোমাকে কসম দিচ্ছি সে মহান সত্তার যিনি হযরত মূসা (আ.) -এর উপর তাওরাত নাজিল করেছেন, তুমি কি তাওরাতে আমার অবস্থা ও গুণ-বৈশিষ্ট্য এবং আবির্ভাব সম্পর্কে কোনো বর্ণনা পেয়েছ? সে অস্বীকার করল। তখন তার ছেলে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি (অর্থাৎ এই ছেলের পিতা) ভুল বলছেন। তাওরাতে আমরা আপনার আলোচনা এবং আপনার গুণ-বৈশিষ্ট্য দেখতে পাই। আর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো উপাস্য নেই এবং আপনি তাঁর প্রেরিত রাসূল। অতঃপর রাসূলে কারীম ﷺ সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-কে নির্দেশ দিলেন যে, এখন এ বালক মুসলমান। তার মৃত্যুর পর তার কাফন-দাফন মুসলমানরা করবে। তার পিতার হাতে দেওয়া হবে না। –[মাযহারী]

হযরত আলী মুর্তাযা (রা.) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলে কারীম ﷺ-এর নিকট জনৈক ইহুদির কিছু ঋণ প্রাপ্য ছিল। সে এসে তার ঋণ চাইল। রাসূল ﷺ বললেন, এ মুহূর্তে আমার কাছে কিছুই নেই; আমাকে কিছু সময় দাও। ইহুদি কঠোরভাবে তাগাদা করে বলল, আমি আপনাকে ঋণ প্ররিশোধ না করা পর্যন্ত কিছুতেই ছাড়ব না। রাসূল ﷺ বললেন, তোমার সে অধিকার রয়েছে আমি তোমার কাছে বসে পড়ব। তারপর রাসূল ﷺ সেখানেই বসে পড়লেন এবং জোহর, আসর, মাগরিব ও ইশার নামাজ সেখানেই আদায় করলেন। এমনকি পরের দিন ফজরের নামাজও সেখানেই পড়লেন।

বিষয়টি দেখে সাহাবায়ে কেরাম (রা.) অত্যন্ত মর্মাহত হলেন এবং ক্রমাগত রাগান্বিত হচ্ছিলেন; আর ইহুদিকে আস্তে আস্তে ধমকাচ্ছিলেন যাতে সে রাসূল ﷺ কে ছেড়ে দেয়। রাসূল ﷺ বিষয়টি বুঝতে পেরে সাহাবীগণকে বললেন, একি করছ? তখন তাঁরা নিবেদন করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এটা আমরা কেমন করে সহ্য করব যে, একজন ইহুদি আপনাকে বন্দি করে রাখবে? রাসূল ﷺ বললেন, 'আমার পরওয়ারদেগার কোনো চুক্তিবদ্ধ ব্যক্তির প্রতি জুলুম করতে আমাকে বারণ করেছেন।' ইহুদি এসব ঘটনাই লক্ষ্য করছিল। ভোর হওয়ার সাথে সাথে ইহুদি বলল– أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ অর্থাৎ (আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, নিশ্চয়ই আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই এবং আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিঃসন্দেহে আপনি আল্লাহর রাসূল।) এভাবে ইসলাম গ্রহণ করে সে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আমার অর্ধেক সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় দিয়ে দিলাম। আর আমি আল্লাহর কসম করে বলছি, এতক্ষণ আমি যা কিছু করেছি তার উদ্দেশ্য ছিল শুধু পরীক্ষা করা যে, তাওরাতে আপনার যেসব গুণ বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয়েছে তা আপনার মধ্যে যথার্থই বিদ্যমান কি না। আমি আপনার সম্পর্কে তাওরাতে এ কথাগুলো পড়েছি। "মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ, তাঁর জন্ম হবে মক্কায়, তিনি হিজরত করবেন 'তাইবা'র দিকে; আর তাঁর দেশ হবে সিরিয়া। তিনি কঠোর মেজাজের হবেন না, কঠোর ভাষায় তিনি কথাও বলবেন না, হাটে বাজারে তিনি হট্টগোলও করবেন না। অশ্লীলতা ও নির্লজ্জতা থেকে তিনি দূরে থাকবেন।"

পরীক্ষা করে আমি এখন এসব বিষয় সঠিক পেয়েছি। কাজেই সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্যই নেই; আর আপনি হলেন আল্লাহর রাসূল। আর এই হলো আমার অর্ধেক সম্পদ। আপনি যেভাবে খুশি খরচ করতে পারেন। সে ইহুদি বহু ধনসম্পত্তির মালিক ছিল। তার অর্ধেক সম্পদও ছিল এক বিরাট সম্পদ। –[বায়হাকী কৃত 'দালায়েলুন্নবুয়ত' গ্রন্থের বরাত দিয়ে তাফসীরে মাযহারীতে ' ঘটনাটি উদ্ধৃত করা হয়েছে]

ইমাম বগভী (র.) নিজ সনদে কা'আবে আহবার (রা.) থেকে উদ্ধৃত করেন যে, তিনি বলেছেন, তাওরাতে রাসূলে কারীম ﷺ সম্পর্কে লেখা রয়েছে। "মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল ও নির্বাচিত বান্দা। তিনি না কঠোর মেজাজের লোক, না বাজে বক্তা। নাইবা তিনি হাটে-বাজারে হট্টগোল করার লোক। তিনি মন্দের প্রতিশোধ মন্দের দ্বারা গ্রহণ করেন না; বরং ক্ষমা করে দেন এবং ছেড়ে দেন। তাঁর জন্ম হবে মক্কায় আর হিজরত হবে তাইবায়। তাঁর দেশ হবে শাম (সিরিয়া)। আর তাঁর উম্মত হবে 'হাম্মাদীন'। অর্থাৎ আনন্দ বেদনা উভয় অবস্থাতেই আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী। তারা যে, কোনো উর্ধ্বারোহণকালে তাকবীর বলবে। তারা সূর্যের ছায়ার প্রতি লক্ষ্য রাখবে, যাতে সময় নির্ণয় করে যথাসময়ে নামাজ পড়তে পারে। তিনি তাঁর শরীরের নিম্নাংশে 'তহবন্দ' (লুঙ্গি) পরবেন এবং হস্ত-পদাদি অজুর মাধ্যমে পবিত্র পরিচ্ছন্ন রাখবেন। তাঁদের আজানদাতা আকাশে সুউচ্চ স্বরে আহ্বান করবেন। জিহাদের ময়দানে তাদের সারিগুলো এমন হবে, যেমন নামাজে হয়ে থাকে। রাতের বেলায় তাদের তেলাওয়াত ও জিকিরের শব্দ এমনভাবে উঠতে থাকবে, যেন মধুমক্ষিকার শব্দ।" –[মাযহারী]

ইবনে সা'আদ ও ইবনে আসাকির (র.) হযরত সাহাল মওলা খাইসামা (রা.) থেকে সনদ সহকারে উদ্ধৃত করেছেন যে, হযরত সাহাল বলেন, আমি নিজে ইঞ্জীলে মুহাম্মদ মুস্তফা ﷺ-এর গুণ বৈশিষ্ট্যসমূহ পড়েছি যে, "তিনি খুব বেঁটেও হবেন না, আবার খুব লম্বাও হবেন না। উজ্জ্বল বর্ণ ও দুটি কেশ গুচ্ছাধারী হবেন। তাঁর দু-কাঁধের মধ্যস্থলে নবুয়তের মোহর থাকবে। তিনি সদকা গ্রহণ করবেন না। গাধা ও উটের উপর সওয়ারি করবেন। ছাগলের দুধ নিজে দোহন করে নিবেন। তালি লাগানো জামা পরবেন। আর যারা এমন করে তারা অহংকারমুক্ত হয়ে থাকেন। তিনি হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর বংশধর হবেন তার নাম হবে আহমদ।"

আর ইবনে সা'আদ দারেমী ও বায়হাকী যথাক্রমে তাবাকাত, মুসনাদ ও দালায়েলে নবুয়ত গ্রন্থে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম (রা.) থেকে উদ্ধৃত করেছেন, যিনি ছিলেন ইহুদিদের সবচেয়ে বড় আলেম এবং তাওরাতের সর্বপ্রধান বিশেষজ্ঞ। তিনি বলেছেন যে, তাওরাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ সম্পর্কে উল্লেখ রয়েছে : "হে নবী! আমি আপনাকে সমস্ত উম্মতের জন্য সাক্ষী, সৎকর্মশীলদের জন্য সুসংবাদদাতা, অসৎকর্মীদের জন্য ভীতি প্রদর্শনকারী এবং উম্মিয়্যীন অর্থাৎ আরবদের জন্য রক্ষণাবেক্ষণকারী বানিয়ে পাঠিয়েছি। আপনি আমার বান্দা ও রাসূল। আমি আপনার নাম 'মুতাওয়াক্কিল' রেখেছি। আপনি কঠোর মেজাজও নন, দাঙ্গাবাজও নন। হাটে-বাজারে হট্টগোলকারীও নন। মন্দের প্রতিশোধ মন্দের দ্বারা গ্রহণ করেন না;

বরং ক্ষমা করে দেন। আল্লাহ তা'আলা ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁকে মৃত্যু দিবেন না; যতক্ষণ না তাঁর মাধ্যমে বাঁকা জাতিকে সোজা করে নেবেন। এমনকি যতক্ষণ না তারা لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ (আল্লাহ ছাড়া আর কোনো উপাস্য নেই) এর মন্ত্রে স্বীকৃত হয়ে যাবেন. যতক্ষণ না অন্ধ চোখ খুলে দিবেন, বধির কান যতক্ষণ না শোনার যোগ্য বানাবেন এবং বদ্ধ হৃদয় যতক্ষণ না খুলে দেবেন।"

এমনি ধরনের একটি রেওয়ায়েত হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রা.) থেকে বুখারী শরীফেও উদ্ধৃত করা হয়েছে।

আর প্রাচীন গ্রন্থ বিশারদ আলেম হযরত ওহাব ইবনে মুনাব্বিহ (রা.) থেকে ইমাম বায়হাকী তাঁর তাঁর দালায়েলে নবুয়ত গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন যে, "আল্লাহ তা'আলা হযরত দাঊদ (আ.)-এর প্রতি ওহী নাজিল করেন যে, হে দাঊদ! আপনার পরে একজন নবী আসবেন, যাঁর নাম হবে 'আহমদ'। আমি তাঁর প্রতি কখনো অসন্তুষ্ট হবো না এবং তিনি কখনো আমার নাফরমানি করবেন না। আমি তাঁর গত আগত সমস্ত পাপ ক্ষমা করে দিয়েছি। তাঁর উম্মত হলো দয়াকৃত উম্মত (উম্মতে মরহুমাহ)। আমি তাদেরকে সে সমস্ত নফল বিষয় দান করছি, যা পূর্ববর্তী নবীগণকে দিয়েছিলাম এবং তাদের উপর সেসব ফরজ আরোপ করেছি, যা পূর্ববর্তী নবীগণের প্রতি অপরিহার্য করেছিলাম। এমনকি তারা হাশরের দিন আমার সামনে এমন অবস্থায় উপস্থিত হবে যে, তাদের নূর আম্বিয়া (আ.)-এর নূরের মতো হবে। হে দাঊদ! আমি মুহাম্মদ ﷺ ও তাঁর উম্মতকে সমস্ত উম্মত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি। আমি তাদেরকে বিশেষভাবে ছয়টি বিষয় দিয়েছি যা অন্য কোনো উম্মতকে দেইনি। ১. কোনো ভুল-ভ্রান্তির জন্য তাদের কোনো শাস্তি হবে না। ২. অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাদের দ্বারা কোনো পাপ কাজ হয়ে গেলে যদি সে আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে, তাহলে আমি তাকে ক্ষমা করে দেব। ৩. যে মাল সে পবিত্র মনে আল্লাহর রাহে খরচ করবে, আমি দুনিয়াতেই তাকে তা থেকে বহুগুণ বেশি দিয়ে দেব। ৪. তাদের উপর কোনো বিপদ এসে উপস্থিত হলে যদি তারা اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ পড়ে, তবে আমি তাদের জন্য এ বিপদকে করুণা ও রহমত এবং জান্নাতের দিকে পথনির্দেশে পরিণত করে দেব। ৫-৬. তারা যে দোয়া করবে আমি তা কবুল করব, কখনও যা চেয়েছে তাই দান করে , আর কখনও এই দোয়াকেই তাদের আখেরাতের পাথেয় করে দিয়ে। -[রূহুল মা'আনী]

শত শত আয়াতের মধ্যে এ ক'টি রেওয়ায়েত তাওরাত, ইঞ্জীল ও যাবূর এর উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করা হলো। সমগ্র রেওয়ায়েতসমূহ মুহাদ্দিসগণ বিভিন্ন গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন।

তাওরাত ও ইঞ্জীলে বর্ণিত শেষনবী ﷺ ও তাঁর উম্মতের গুণ বৈশিষ্ট্য এবং নিদর্শনসমূহের বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা সম্পর্কে বহু স্বতন্ত্র গ্রন্থ প্রণয়ন করা হয়েছে। বর্তমান জমানায় হযরত মাওলানা রহমতুল্লাহ কীরানভী মুহাজিরে মাক্কী (র.) তাঁর গ্রন্থ 'এযহারুল হক' -এ বিষয়টিকে অত্যন্ত বিস্তারিত ব্যাখ্যা ও গবেষণাসহ লিখেছেন। তাতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, বর্তমান যুগের তাওরাত ও ইঞ্জীল যাতে সীমাহীন বিকৃতি সাধিত সাধিত হয়েছে, তাতেও মহানবী ﷺ -এর বহু গুণাগুণ বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ রয়েছে বলে প্রমাণিত হয়েছে। এ গ্রন্থটির উর্দু অনুবাদ ইতঃমধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে।

উপরে তাওরাতের উদ্ধৃতিতে রাসূলে কারীম ﷺ -এর যে সমস্ত গুণ বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হয়েছিল তাতে একথাও ছিল যে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর মাধ্যমে অন্ধ চোখে আলো এবং বধির কানে শ্রবণশক্তি দান করবেন; আর বদ্ধ অন্তরাত্মাকে খুলে দেবেন। রাসূলে কারীম ﷺ -কে আল্লাহ তা'আলা اَمْرٌ بِالْمَعْرُوْفِ (সৎ কাজের নির্দেশ দান) এবং نَهْىٌ عَنِ الْمُنْكَرِ (অন্যায় কাজ থেকে বারণ করা) এর জন্য যে, অনন্য স্বাতন্ত্র্য দান করেছিলেন এ সমস্ত গুণাবলিও হয়তো তারই ফলশ্রুতি ।

দ্বিতীয় গুণটি এই বলা হয়েছে যে, মহানবী ﷺ মানবজাতির জন্য পবিত্র ও পছন্দনীয় বস্তু সামগ্রী হালাল করবেন, আর পঙ্কিল বস্তু সামগ্রীকে হারাম করবেন। অর্থাৎ অনেক সাধারণ পছন্দনীয় বস্তু সামগ্রী যা শাস্তি স্বরূপ বনী ইসরাঈলদের জন্য হারাম করে দেওয়া হয়েছিল রাসূলে কারীম ﷺ সেগুলোর উপর থেকে বিধি নিষেধ প্রত্যাহার করে নিবেন। উদাহরণত পশুর চর্বি বা মেদ প্রভৃতি যা বনী ইসরাঈলদের জন্য অসদাচরণের শাস্তি হিসেবে হারাম করে দেওয়া হয়েছিল, মহানবী ﷺ সেগুলোকে হালাল সাব্যস্ত করেছেন। আর নোংরা ও পঙ্কিল বস্তু সামগ্রীর মধ্যে রক্ত, মৃত পশু, মদ ও সমস্ত হারাম জন্তু অন্তর্ভুক্ত এবং যাবতীয় হারাম উপায়ের আয় যথা, সুদ, ঘুষ, জুয়া প্রভৃতিও এর অন্তর্ভুক্ত। -[আসসিরাজুল মুনীর] কোনো কোনো মনীষী মন্দ চরিত্র ও অভ্যাসকেও পঙ্কিলতার অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

www.almodina.com

তৃতীয় গুণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে– وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ অর্থাৎ মহানবী ﷺ মানুষের উপর থেকে সেই বোঝা ও প্রতিবন্ধকতাও সরিয়ে দিবেন যা তাদের উপর চেপে ছিল।

اِصْر (ইসর) শব্দের অর্থ এমন ভারী বোঝা যা নিয়ে মানুষ চলাফেরা করতে অক্ষম। আর اَغْلَال (আগলাল) غُلٌّ -এর বহুবচন। 'গুল্লুন' সে হাতকড়াকে বলা হয় যা দ্বারা অপরাধীর হাত তার ঘাড়ের সাথে বেঁধে দেওয়া হয় এবং একেবারেই নিরূপায় হয়ে পড়ে।

اِصْر (ইসর) ও اَغْلَال (আগলাল) অর্থাৎ অসহনীয় চাপ ও আবদ্ধতা বলতে এ আয়াতে সে সমস্ত কঠিন ও সাধ্যাতীত কর্তব্যের বিধি বিধানকে বুঝানো হয়েছে যা প্রকৃতপক্ষে ধর্মের উদ্দেশ্য ছিল না। কিন্তু বনী ইসরাঈল সম্প্রদায়ের উপর একান্ত শাস্তি হিসেবে আরোপ করা হয়েছিল। যেমন, কাপড় নাপাক হয়ে গেলে পানিতে ধুয়ে ফেলা বনী ইসরাঈলদের জন্য যথেষ্ট ছিল না; বরং যে স্থানটিতে অপবিত্র বস্তু লেগেছে সেটুকু কেটে ফেলা ছিল তাদের জন্য অপরিহার্য। আর বিধর্মী কাফেরদের সাথে জিহাদ করে গনিমতের যে মাল পাওয়া যেত, তা বনী ইসরাঈলদের জন্য হালাল ছিল না; বরং আকাশ থেকে একটি আগুন নেমে এসে সেগুলোকে জ্বালিয়ে দিত। শনিবার দিন শিকার করাও তাদের জন্য বৈধ ছিল না। কোনো অঙ্গ দ্বারা কোনো পাপ কাজ সংঘটিত হয়ে গেলে সেই অঙ্গটি কেটে ফেলা ছিল অপরিহার্য ওয়াজিব। কারো হত্যা, তা ইচ্ছাকৃত হোক বা অনিচ্ছাকৃত, উভয় অবস্থাতেই হত্যাকরীকে হত্যা করা ছিল ওয়াজিব। খুনের ক্ষতিপূরণের কোনো বিধানই ছিল না।

এ সমস্ত কঠিন ও জটিল বিধানসমূহ যা বনী ইসরাঈলদের উপর আরোপিত ছিল, কুরআনে সেগুলোকে 'ইসর' ও 'আগলাল' বলা হয়েছে এবং সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে যে, রাসূলে কারীম ﷺ এসব কঠিন বিধিবিধানের পরিবর্তন অর্থাৎ এগুলোকে রহিত করে তদস্থলে সহজ বিধি বিধান প্রবর্তন করবেন।

এক হাদীসে মহানবী ﷺ এ বিষয়টিই বলেছেন যে, আমি তোমাদেরকে একটি সহজ ও সার্বজনীন শরিয়তের উপর প্রতিষ্ঠিত করেছি। তাতে না আছে কোনো পরিশ্রম, না পথভ্রষ্টতার কোনো ভয় ভীতি।

অন্য এক হাদীসে ইরশাদ হয়েছে اَلدِّيْنُ يُسْرٌ অর্থাৎ ধর্ম সহজ। কুরআনে কারীমে বলা হয়েছে وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা ধর্মের ব্যাপারে কোনো সংকীর্ণতা আরোপ করেননি।

উম্মী নবী ﷺ-এর বিশেষ ও পরিপূর্ণ গুণ বৈশিষ্ট্যের আলোচনার পর বলা হয়েছে– فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِهٖ وَعَزَّرُوْهُ وَنَصَرُوْهُ وَاتَّبَعُوا النُّوْرَ الَّذِيْٓ اُنْزِلَ مَعَهٗٓ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ অর্থাৎ তাওরাত ও ইঞ্জীলে আখেরী নবী ﷺ-এর প্রকৃষ্ট গুণ বৈশিষ্ট্য ও লক্ষণাদি বাতলে দেওয়ার পরিণতি এই যে, যারা আপনার প্রতি ঈমান আনবে এবং আপনার সহায়তা করবে আর সেই নূরের অনুসরণ করবে, যা আপনার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে অর্থাৎ যারা কুরআনের অনুসরণ করবে, তারাই হলো কল্যাণপ্রাপ্ত।

এখানে কল্যাণ লাভের জন্য চারটি শর্ত আরোপ করা হয়েছে। প্রথমত মহানবী ﷺ-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে ঈমান আনা, দ্বিতীয়ত তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান করা, তৃতীয়ত তাঁর সাহায্য ও সহায়তা করা এবং চতুর্থত কুরআন অনুযায়ী চলা। শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন বুঝাবার জন্য عَزَّرُوْهُ (আযযারূহু) শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে যা تَعْزِيْر (তা'যীর) অর্থ– সস্নেহে বারণ করা ও রক্ষা করা। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) عَزَّرُوْهُ (আযযারুহু) -এর অর্থ করেছেন শ্রদ্ধা ও সম্মান করা। মুবাররাদ বলেছেন যে, উচ্চতর সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শনকে বলা হয় تَعْزِيْر (তা'যীর)।

তার অর্থ যারা মহানবী ﷺ -এর প্রতি যথাযথ সম্মান ও মহত্ত্ববোধ সহকারে তাঁর সাহায্য ও সমর্থন করবে এবং বিরোধীদের মোকাবিলায় তাঁর সহায়তা করবে, তারাই হবে পরিপূর্ণ কৃতকার্য ও কল্যাণপ্রাপ্ত। নবী করীম ﷺ -এর জীবনকালে সাহায্য ও সমর্থনের সম্পর্ক ছিল স্বয়ং তাঁর সত্তার সাথে। কিন্তু রাসূল ﷺ-এর তিরোধানের পর তাঁর শরিয়ত এবং তাঁর প্রবর্তিত দীনের সাহায্য সমর্থনই হলো মহানবীর সাহায্য সমর্থনের শামিল।

এ আয়াতে কুরআনে কারীমকে 'নূর' বলে অভিহিত করা হয়েছে। তার কারণ এই যে, 'নূর' বা জ্যোতির পক্ষে জ্যোতি হওয়ার জন্য যেমন কোনো দলিল প্রমাণের প্রয়োজন নেই; বরং সে নিজেই নিজের অস্তিত্বের প্রমাণ, তেমনিভাবে কুরআন কারীমও নিজেই আল্লাহর কালাম সত্যবাণী হওয়ার প্রমাণ যে, একজন একবার একান্ত উম্মী বা নিরক্ষর ব্যক্তির মুখ দিয়ে এমন উচ্চতর সালঙ্কার বাগ্মিতাপূর্ণ কালাম বেরিয়েছে, যার কোনো উপমা উপস্থাপনে সমগ্র বিশ্ব অপারগ হয়ে পড়েছে। এটা স্বয়ং কুরআন কারীমের আল্লাহর কালাম হওয়ারই প্রমাণ।

তদুপরি নূর যেমন নিজেই উজ্জ্বল হয়ে উঠে এবং অন্ধকারকে আলোময় করে দেয়, তেমনিভাবে কুরআন কারীমও ঘোর অন্ধকারের আবর্তে আবদ্ধ পৃথিবীকে আলোতে নিয়ে এসেছে।

কুরআনের সাথে সাথে সুন্নাহর অনুসরণও ফরজ : এ আয়াতের শুরুতে বলা হয়েছে يَتَّبِعُوْنَ الرَّسُوْلَ النَّبِيَّ الْاُمِّيَّ -এর আয়াতের শেষে বলা হয়েছে– وَاتَّبَعُوا النُّوْرَ الَّذِيْٓ اُنْزِلَ مَعَهٗ -এর প্রথম বাক্যে 'উম্মী নবীর' অনুসরণ এবং পরবর্তী বাক্যে কুরআনের অনুসরণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এতে প্রমাণিত হয়ে যায় যে, আখেরাতের মুক্তি কুরআন ও সুন্নাহ উভয়টি অনুসরণের উপরই নির্ভরশীল। কারণ, উম্মী নবীর অনুসরণ তাঁর সুন্নাহর অনুসরণের মাধ্যমেই সম্ভব হতে পারে।

শুধু রাসূলের অনুসরণই নয়; বরং মুক্তির জন্য তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা এবং মহব্বত থাকাও ফরজ : উল্লিখিত বাক্য দুটির মাঝে وَعَزَّرُوْهُ وَنَصَرُوْهُ শীর্ষক দুটি শব্দ সংযোজন করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মহানবী ﷺ কর্তৃক প্রবর্তিত বিধিবিধানের এমন অনুসরণ উদ্দেশ্য নয়; যেমন সাধারণত দুনিয়ার শাসকদেরকে বাধ্যতামূলকভাবে করতে হয়; বরং অনুসরণ বলতে এমন অনুসরণ উদ্দেশ্য যা হলে মহত্ত্ব, শ্রদ্ধাবোধ ও ভালোবাসার ফলশ্রুতি। অর্থাৎ অন্তরে রাসূলে আকরাম ﷺ -এর মহবত ও ভালোবাসা এত অধিক পরিমাণে থাকতে হবে, যার ফলে তাঁর বিধিবিধানের অনুসরণে বাধ্য হতে হয়। কারণ উম্মতের সম্পর্ক থাকে নিজ রাসূলের সাথে বিভিন্ন রকম। একে তো তিনি হলেন আজ্ঞাদানকারী মনিব, আর উম্মত হচ্ছে আজ্ঞাবহ প্রজা। দ্বিতীয়ত তিনি হলেন প্রেমাষ্পদ, আর উম্মত হচ্ছে প্রেমিক।

এদিকে রাসূলে কারীম ﷺ জ্ঞান কর্ম ও নৈতিকতার ভিত্তি স্থাপনকারী একক মহত্ত্বের আধার; আর সে তুলনায় সমগ্র উম্মত হচ্ছে একান্তই হীণ ও অক্ষম।

আমাদের পেয়ারা নবী ﷺ -এর মাঝে যাবতীয় মহত্ত্ব পরিপূর্ণভাবে বিদ্যমান, কাজেই তাঁর প্রতিটি মহত্ত্বের দাবি পূরণ করা প্রত্যেক উম্মতের জন্য অবশ্য কর্তব্য। রাসূল হিসেবে তাঁর প্রতি ঈমান আনতে হবে, মনিব ও হাকিম হিসেবে তাঁর সাথে গভীরতম প্রেম ও ভালোবাসা রাখতে হবে এবং নবুয়তের ক্ষেত্রে যেহেতু তিনি পরিপূর্ণ তাই তার প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করতে হবে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর আনুগত্য ও অনুসরণ তো উম্মতের উপর ফরজ হওয়াই উচিত কারণ,. এছাড়া নবী-রাসূলগণকে প্রেরণের উদ্দেশ্যই সাধিত হয় না। কিন্তু আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের রাসূলে মকবুল ﷺ সম্পর্কে শুধু অনুগত্য অনুসরণের উপর ক্ষান্ত করেননি; বরং উম্মতের উপর তাঁর প্রতি সম্মান, শ্রদ্ধা ও মর্যাদা দান করাকেও অবশ্য কর্তব্য সাব্যস্ত করে দিয়েছেন। উপরন্তু কুরআন কারীমের বিভিন্ন স্থানে তাঁর রীতি নীতির শিক্ষা দেওয়া হয়েছে।

এ আয়াতে وَعَزَّرُوْهُ وَنَصَرُوْهُ বাক্যে সেদিকেই হেদায়েত দান করা হয়েছে। অপর এক আয়াতে বলা হয়েছে– وَتُعَزِّرُوْهُ وَتُوَقِّرُوْهُ অর্থাৎ 'তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন কর এবং তাঁকে পরিপূর্ণ মর্যাদা দান কর।' এ ছাড়া আরও কয়েকটি আয়াতে এ হেদায়েত দেওয়া হয়েছে যে, মহানবী ﷺ -এর উপস্থিতিতে এত উচ্চৈঃস্বরে কথা বলো না, যা তার স্বর থেকে বেড়ে যেতে পারে। বলা হয়েছে ; يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَرْفَعُوْٓا اَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ অন্য আয়াতে বলা হয়েছে يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَيِ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ অর্থাৎ হে মুসলমানগণ! আল্লাহ ও তাঁর রাসূল থেকে এগিয়ে যেয়ো না। অর্থাৎ যদি মজলিসে হুজুর আকরাম ﷺ উপস্থিত থাকেন এবং তাতে কোনো বিষয় উপস্থিত হয় তাহলে তোমরা তাঁর আগে কোনো কথা বলো না।

হযরত সাহল ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) এ আয়াতের অর্থ করতে গিয়ে বলেছেন যে, রাসূল ﷺ -এর পূর্বে কেউ কথা বলবে না এবং তিনি যখন কোনো কথা বলবেন, তখন সবাই তা নিশ্চুপ বসে শুনবে।

কুরআনের এক আয়াতে বলা হয়েছে যে, মহানবী ﷺ –কে ডাকার সময় আদবের প্রতি লক্ষ্য রাখবে; এমনভাবে ডাকবে না; নিজেদের মধ্যে একে অপরকে যেভাবে ডেকে থাক। বলা হয়েছে– لَا تَجْعَلُوْا دُعَآءَ الرَّسُوْلِ بَيْنَكُمْ كَدُعَآءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا এ আয়াত শেষে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে যে, এ নির্দেশের খেলাফ কোনো অসম্মান জনক কাজ করা হলে সমস্ত সৎকর্ম ধ্বংস ও বরবাদ হয়ে যাবে।

এ কারণেই সাহাবায়ে কেরাম রেযওয়ানুল্লাহি আলাইহিম যদিও সর্বক্ষণ সর্বাবস্থায় মহানবী ﷺ -এর কর্মসঙ্গী ছিলেন এবং এমতাবস্থায় সম্মান ও আদবের প্রতি পরিপূর্ণ লক্ষ্য রাখা বড়ই কঠিন হয়ে থাকে; তবুও তাঁদের অবস্থা এই ছিল যে, এ আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার পর হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা.) যখন মহানবী ﷺ -এর খেদমতে কোনো বিষয় নিবেদন করতেন, তখন এমনভাবে বলতেন যেন কোনো গোপন বিষয় আস্তে আস্তে বলছেন। এমনি অবস্থা ছিল হযরত ফারুকে আজম (রা.) -এরও। –[শেফা]

www.almodina.com

হযরত আমর ইবনুল আ'স (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ অপেক্ষা আমার কোনো প্রিয় ব্যক্তি সারা বিশ্বে ছিল না। আর আমার এ অবস্থা ছিল যে, আমি তাঁর প্রতি পূর্ণ দৃষ্টিতে দেখতেও পারতাম না। আমার কাছে যদি রাসূল ﷺ -এর আকার অবয়ব সম্পর্কে কেউ জানতে চায় তাহলে তা বলতে আমি এজন্য অপারগ যে, আমি কখনও তাঁর প্রতি পূর্ণ দৃষ্টিতে চেয়েও দেখিনি।

ইমাম তিরমিযী হযরত আনাস (রা.) এর বর্ণনায় রেওয়ায়েত করেছেন যে, মজলিসে যখন রাসূল ﷺ তশরিফ আনতেন তখনই সবাই নিম্নদৃষ্টি হয়ে বসে থাকতেন। শুধু সিদ্দীকে আকবর ও ফারূকে আ'যম (রা.) তাঁর দিকে চোখ তুলে চাইতেন আর তিনি তাদের দিকে চেয়ে মুচকি হাসতেন।

ওরওয়া ইবনে মাসউদকে মক্কাবাসীরা গুপ্তচর বানিয়ে মুসলমানদের অবস্থা জানার জন্য মদিনায় পাঠাল। সে সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-কে রাসূল ﷺ -এর প্রতি এমন নিবেদিত প্রাণ দেখতে পেল যে, ফিরে গিয়ে রিপোর্ট দিল– "আমি কিসরা ও কায়সারের দরবারেও দেখেছি এবং সম্রাট নাজাশীর সাথেও সাক্ষাৎ করেছি; কিন্তু মুহাম্মদ ﷺ -এর সাহাবীগণের যে অবস্থা আমি দেখেছি, এমনটি আর কোথাও দেখিনি। আমার ধারণা তোমরা কস্মিনকালেও তাদের মোকাবিলায় জয়ী হতে পারবে না।"

হযরত মুগীরা ইবনে শো'বা (রা.)-এর বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ রয়েছে যে, রাসূল ﷺ যখন ঘরের ভিতর অবস্থান করতেন, তখন তাঁকে বাইরে থেকে সশব্দে ডাকাকে সাহাবায়ে কেরাম বেআদবি মনে করতেন। দরজায় কড়া নাড়তে হলেও শুধু নখ দিয়ে টোকা দিতেন যাতে বেশি জোরে শব্দ না হয়।

মহানবী ﷺ -এর তিরোধানের পরও সাহাবায়ে কেরামের অভ্যাস ছিল যে, মসজিদে নববীতে কখনও জোরে কথা বলা তো দূরের কথা কোনো ওয়াজ কিংবা বয়ান বিবৃতিও উচ্চৈঃস্বরে করা পছন্দ করতেন না। অধিকাংশ সাহাবী (রা.)-এর এমনি অবস্থা ছিল যে, যখনই কেউ রাসূল ﷺ -এর পবিত্র নাম উল্লেখ করতেন, তখনই কেঁদে উঠতেন এবং ভীত হয়ে পড়তেন।

এই শ্রদ্ধা ও মর্যাদাবোধের বরকতেই তাঁরা নবুয়তি ফয়েয থেকে বিশেষ উত্তরাধিকার লাভ করতে পেরেছিলেন এবং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এখানেই তাঁদেরকে আম্বিয়া (আ.) -এর পর সর্বোচ্চ মর্যাদা দান করেছেন।

قوله قُلْ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا এ আয়াতে ইসলামের মূলনীতি সংক্রান্ত বিষয়গুলোর মধ্য থেকে রেসালতের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক আলোচিত হয়েছে যে, আমাদের রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর রেসালত সমগ্র দুনিয়ার সমস্ত জিন ও মানবজাতি তথা কিয়ামত পর্যন্ত আগত তাদের বংশধরদের জন্য ব্যাপক।

এ আয়াতে রাসূলে করীম ﷺ -কে সাধারণভাবে ঘোষণা করে দেওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, আপনি মানুষকে বলে দিন যে, আমি তোমাদের সবার প্রতি নবীরূপে প্রেরিত হয়েছি। আমার নবুয়ত লাভ ও রেসালাতপ্রাপ্তি বিগত নবীগণের মতো কোনো বিশেষ জাতি কিংবা বিশেষ ভূখণ্ড অথবা কোনো নির্দিষ্টসময়ের জন্য নয়; বরং সমগ্র বিশ্ব মানবের জন্য বিশ্বের প্রতিটি অংশ প্রতিটি দেশ ও রাষ্ট্র এবং বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য কিয়ামত কাল পর্যন্ত জন্য তা পরিব্যাপ্ত। আর মানব জাতি ছাড়াও এতে জিন জাতিও অন্তর্ভুক্ত।

মহানবী ﷺ -এর নবুয়ত কিয়ামতকাল পর্যন্ত সমগ্র বিশ্বের জন্য ব্যাপক, তাই তাঁর উপরই নবুয়তের ধারাও সমাপ্ত : নবুয়ত সমাপ্তির এটাই হলো প্রকৃত রহস্য। কারণ মহানবী ﷺ -এর নবুয়ত যখন কিয়ামত পর্যন্ত আগত বংশধরদের জন্য ব্যাপক তখন আর অন্য কোনো নবী বা রাসূলের আবির্ভাবের না কোনো প্রয়োজনীয়তা রয়ে গেছে না তার কোনো অবকাশ আছে। আর এই হলো মহানবী ﷺ -এর উম্মতের বৈশিষ্ট্যের প্রকৃত রহস্য যে, নবী করীম ﷺ -এর ভাষায় এতে সর্বদাই এমন একটি দল প্রতিষ্ঠিত থাকবে, যারা ধর্মের মাঝে সৃষ্ট যাবতীয় ফেতনা ফ্যাসাদের মোকাবিলা করবেন এবং ধর্মীয় বিষয়ে সৃষ্ট সমস্ত প্রতিবন্ধকতা প্রতিরোধ করতে থাকবেন। কুরআন সুন্নাহর ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে যেসব বিভ্রান্তির সৃষ্টি হবে, এদল সেগুলোরও অপানোদন করবে এবং আল্লাহ তা'আলার বিশেষ সাহায্য ও সহায়তাপ্রাপ্ত হবেন, যার ফলে তারা সবার উপরই বিজয়ী হবেন। কারণ প্রকৃতপক্ষে এ দলটি হবে মহানবী ﷺ -এর রেসালাতের দায়িত্ব সম্পাদনে তাঁরই স্থলাভিষিক্ত, নায়েব।

www.almodina.com

ইমাম রাযী (র.) وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন যে, এ আয়াতে এই ইঙ্গিত বিদ্যমান রয়েছে যে, এ উম্মতের মধ্যে 'সাদেকীন' অর্থাৎ সত্যনিষ্ঠদের একটি দল অবশ্যই অবশিষ্ট থাকবে। তা না হলে বিশ্ববাসীর প্রতি সত্যনিষ্ঠদের সাথে থাকার নির্দেশই দেওয়া হতো না। আর এরই ভিত্তিতে ইমাম রাযী (রা.) সর্বযুগে ইজমায়ে উম্মত বা মুসলমান জাতির ঐকমত্যকে শরিয়তের দলিল বলে প্রমাণ করেছেন। তার কারণ, সত্যনিষ্ঠ দলের বর্তমানে কোনো ভুল বিষয় কিংবা কোনো পথভ্রষ্টতায় সবাই ঐকমত্য বা ঐক্যবদ্ধ হতে পারে না।

ইমাম ইবনে কাছীর (র.) বলেছেন যে, এ আয়াতে মহানবী ﷺ-এর খাতামুন্নাবিয়্যীন বা শেষনবী হওয়ার বিষয়ে ইঙ্গিত করা হয়েছে। কারণ রাসূল ﷺ–এর আবির্ভাব ও রিসালত যখন কিয়ামত পর্যন্ত আগত সমস্ত বংশধরদের জন্য এবং সমগ্র বিশ্বের জন্য ব্যাপক তখন আর অন্য কোনো নতুন রাসূলের প্রয়োজনীয়তা অবশিষ্ট থাকেই না। সেজন্যই শেষ জামানায় হযরত ঈসা (আ.) যখন আসবেন, তখন তিনিও যথাস্থানে নিজের নবুয়তে বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও মহানবী ﷺ কর্তৃক প্রবর্তিত শরিয়তের উপরই আমল করবেন। রাসূল ﷺ-এর আবির্ভাবের পূর্বে তাঁর নিজস্ব যে শরিয়ত ছিল, তাকে তখন তিনিও রহিত বলেই গণ্য করবেন। বিশুদ্ধ রেওয়ায়েতের দ্বারা তাই প্রতীয়মান হয়।

মহানবী ﷺ -এর কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য : ইবনে কাছীর মুসনাদে আহমদ গ্রন্থের বরাত দিয়ে অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য সনদের সাথে উদ্ধৃত করেছেন যে, গযওয়ায়ে তাবূকের (তাবূক যুদ্ধ) সময় রাসূলে করীম ﷺ তাহাজ্জুদের নামাজ পড়ছিলেন। সাহাবায়ে কেরামের ভয় হচ্ছিল যে, শত্রুরা না এ অবস্থায় আক্রমণ করে বসে। তাই তাঁরা রাসূল ﷺ–এর চারদিকে সমবেত হয়ে গেলেন। রাসূল ﷺ নামাজ শেষ করে ইরশাদ করলেন, আজকের রাতে আমাকে এমন পাঁচটি বিষয় দান করা হয়েছে, যা আমার পূর্বে আর কোনো নবী-রাসূলকে দেওয়া হয়নি। তার একটি হলো এই যে, আমার রেসালত ও নবুয়তকে সমগ্র দুনিয়ার জাতিসমূহের জন্য ব্যাপক করা হয়েছে। আর আমার পূর্বে যত নবী-রাসূলই এসেছেন, তাঁদের দাওয়াত ও আবির্ভাব নিজ নিজ সম্প্রদায়ের সাথে সম্পৃক্ত ছিল। দ্বিতীয়ত আমাকে আমার শত্রুর মোকাবিলায় এমন প্রভাব দান করা হয়েছে যাতে তারা যদি আমার কাছ থেকে এক মাসের দূরত্বেও থাকে, তবুও তাদের উপর আমার প্রভাব ছেয়ে যাবে। তৃতীয়ত কাফেরদের সাথে যুদ্ধে প্রাপ্ত মালে গনিমত আমার জন্য হালাল করে দেওয়া হয়েছে। অথচ পূর্ববর্তী উম্মতদের জন্য তা হালাল ছিল না; বরং এসব মালের ব্যবহার মহাপাপ বলে মনে করা হতো। তাদের গনিমতের মাল ব্যয়ের একমাত্র স্থান ছিল এই যে, আকাশ থেকে বিদ্যুৎ এসে সে সমস্তকে জ্বালিয়ে খাক করে দিয়ে যাবে। চতুর্থত আমার জন্য সমগ্র ভূমণ্ডলকে মসজিদ করে দেওয়া হয়েছে এবং পবিত্র করার উপকরণ বানিয়ে দেওয়া হয়েছে, যাতে আমাদের নামাজ যে কোনো জমি যে কোনো জায়গায় শুদ্ধ হয়, কোনো বিশেষ মসজিদে সীমাবদ্ধ নয়। পক্ষান্তরে পূর্ববর্তী উম্মতদের ইবাদত শুধু তাদের উপাসনালয়েই হতো, অন্য কোথাও নয়। নিজেদের ঘরে কিংবা মাঠে ময়দানে তাদের নামাজ বা ইবাদত হতো না। তাছাড়া পানি ব্যবহারের যখন সামর্থ্যও না থাকে তা পানি না পাওয়ার জন্য হোক কিংবা কোনো রোগ শোকের কারণে, তখন মাটির দ্বারা তায়াম্মুম করে নেওয়াই পবিত্রতা ও অজুর পরিবর্তে যথেষ্ট হয়ে যায়। পূর্ববর্তী উম্মতদের জন্য এ সুবিধা ছিল না। অতঃপর বললেন আর পঞ্চমটির কথা তো বলতেই নেই, তা নিজেই নিজের উদাহরণ, একেবারে অনন্য। তা হলো এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর প্রত্যেক রাসূলকে একটি দোয়া কবুল হওয়ার এমন নিশ্চয়তা দান করেছেন, যার কোনো ব্যতিক্রম হতে পারে না। আর প্রত্যেক নবী-রাসূলই তাঁদের নিজ নিজ দোয়াতে বিশেষ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে নিয়েছেন এবং সে উদ্দেশ্যেও সিদ্ধ হয়েছে। আমাকে তাই বলা হলো যে, আপনি কোনো একটা দোয়া করুন আমি আমার দোয়াকে আখেরাতের জন্য সংরক্ষিত করিয়ে নিয়েছি। সে দোয়া তোমাদের জন্য এবং কিয়ামত পর্যন্ত لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ কালেমার সাক্ষ্য দানকারী যেসব লোকের জন্য হবে, তাদের কাজে লাগবে।

হযরত আবূ মূসা আশ'আরী (রা.) থেকে উদ্ধৃত ইমাম আহমদ (র.) ইরশাদ করেছেন যে, যে লোক আমার আবির্ভাব সম্পর্কে শুনবে, তা সে আমার উম্মতদের মধ্যে হোক কিংবা ইহুদি খ্রিস্টান হোক যদি সে আমার উপর ঈমান না আনে তাহলে জাহান্নামে যাবে।

আর সহীহ বুখারী শরীফে এ আয়াতের বর্ণনা প্রসঙ্গে হযরত আবুদ্দারদা (রা.)-এর রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করা হয়েছে যে, হযরত আবূ বকর ও হযরত ওমর (রা.)-এর মধ্যে কোনো এক বিষয় মতবিরোধ হয়। তাতে হযরত ওমর (রা.) নারাজ হয়ে চলে যান। তা দেখে হযরত আবূ বকর (রা.) তাকে মানাবার জন্য এগিয়ে যান। কিন্তু হযরত ওমর (রা.) কিছুতেই

রাজি হলেন না। এমনকি নিজের ঘরে পৌঁছে দরজা বন্ধ করে দিলেন। হযরত আবূ বকর (রা.) ফিরে যেতে বাধ্য হন এবং মহানবী ﷺ-এর দরবারে গিয়ে হাজির হন। এদিকে কিছুক্ষণ পরেই হযরত ওমর (রা.) নিজের এহেন আচরণের জন্য লজ্জিত হয়ে মহানবী ﷺ -এর দরবারে গিয়ে উপস্থিত হয়ে নিজের ঘটনা বিবৃত করেন। হযরত আবুদ্দারদা (রা.) বলেন, যে, এতে রাসূলুল্লাহ ﷺ অসন্তুষ্ট হয়ে পড়েন। হযরত আবূ বকর (রা.) যখন লক্ষ্য করলেন যে, হযরত ওমর (রা.)-এর প্রতি ভর্ৎসনা করা হচ্ছে, তখন নিবেদন করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ দোষ আমারই বেশি। রাসূলে কারীম ﷺ বললেন, আমার একজন সহচরকে কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত থাকাটাও কি তোমাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। তোমরা কি জান না যে, আল্লাহর অনুমতিক্রমে আমি যখন বললাম يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا অর্থাৎ "হে মানবমণ্ডলী আমি তোমাদের সমস্ত লোকের আল্লাহর রাসূল।" তখন তোমরা সবাই আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিলে। শুধু এই আবূ বকর (রা.) ই ছিলেন যিনি সর্বপ্রথম আমাকে সত্য বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন।

সারমর্ম এই যে, এ আয়াতের দ্বারা বর্তমান ও ভবিষ্যত বংশধরদের জন্য, প্রত্যেক দেশ ও ভূখণ্ডের অধিবাসীদের জন্য এবং প্রত্যেকটি জাতি ও সম্প্রদায়ের জন্য মহানবী ﷺ-এর ব্যাপকভাবে রাসূল হওয়া প্রমাণিত হয়েছে। সাথে সাথে একথাও সাব্যস্ত হয়ে গেছে যে, রাসূলে কারীম ﷺ -এর আবির্ভাবের পর যে লোক তাঁর প্রতি ঈমান আনবে না, সে লোক কোনো সাবেক শরিয়ত ও কিতাবের কিংবা অন্য কোনো ধর্ম ও মতের পরিপূর্ণ আনুগত্য একান্ত নিষ্ঠাপরায়ণভাবে করতে থাকা সত্ত্বেও কস্মিনাকলেও মুক্তি পাবে না।

হযরত মূসা (আ.)-এর সম্প্রদায়ের একটি সত্যনিষ্ঠ দল : দ্বিতীয় আয়াতে ইরশাদ হয়েছে– وَمِنْ قَوْمِ مُوْسٰى اُمَّةٌ يَّهْدُوْنَ بِالْحَقِّ وَبِهٖ يَعْدِلُوْنَ অর্থাৎ হযরত মূসা (আ.)-এর সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন একটি দলও রয়েছে যারা নিজেরা সত্যের অনুসরণ করে এবং নিজেদের বিতর্কমূলক বিষয়সমূহের মীমাংসার বেলায় সত্য অনুযায়ী মীমাংসা করে থাকে।

বিগত আয়াতসমূহে হযরত মূসা (আ.)-এর সম্প্রদায়ের অসদাচরণ কূটতর্ক এবং গোমরাহীর বর্ণনা ছিল। কিন্তু এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, গোটা জাতিটিই এমন নয়; তাদের মধ্যে বরং কিছু লোক ভালোও রয়েছে যারা সত্যানুসরণ করে এবং ন্যায়ভিত্তিক মীমাংসা করে। এরা হলো সেসব লোক, যারা তাওরাত ও ইঞ্জীলের যুগে সেগুলোর হেদায়েত অনুযায়ী আমল করত এবং যখন খাতামুন্নাবিয়্যীন ﷺ -এর আবির্ভাব হয়, তখন তাওরাত ও ইঞ্জীলের সুসংবাদ অনুসারে তাঁর উপর ঈমান আনে এবং তাঁর যথাযথ অনুসরণও করে। বনী ইসরাঈলদের এই সত্যনিষ্ঠ দলটির উল্লেখও কুরআন মাজীদে বারংবারই করা হয়েছে।

প্রখ্যাত তাফসীরকার ইবনে জারীর ও ইবনে কাছীর (র.) প্রমুখ এ প্রসঙ্গে এক কাহিনী উদ্ধৃত করেছেন যে, এ জামাত বা দল দ্বারা সে দলই উদ্দেশ্য, যারা বনী ইসরাঈলদের গোমরাহি, অসৎকর্ম, নারী হত্যা প্রভৃতি কার্যকলাপে অতিষ্ঠ হয়ে তাদের থেকে সরে পড়েছিল। বনী ইসরাঈলদের বারটি গোত্রের মধ্যে একটি গোত্রি ছিল যারা নিজেদের জাতির কর্যকালাপে অতিষ্ঠ হয়ে প্রার্থনা করেছিল যে, হে পরওয়ারদেগারে আলম! আমাদেরকে এদের থেকে সরিয়ে কোনো দূর দেশে পূণর্বাসিত করে দেন, যাতে আমরা আমাদের দীনের উপর দৃঢ়তার সাথে আমল করতে পারি। আল্লাহ তাঁর পরিপূর্ণ কুদরতের দ্বারা তাদেরকে দূর প্রাচ্যের কোনো ভূখণ্ডে পৌঁছে দেন। সেখানেই তারা নির্ভেজাল ইবাদতে আত্মনিয়োগ করে। রাসূলে কারীম ﷺ-এর আবির্ভাবের পরেও আল্লাহর মহিমায় তাদের মুসলমান হওয়ার এই ব্যবস্থা হয় যে, মি'রাজের রাতে হযরত জিবরাঈল (আ.) রাসূল ﷺ-কে সেদিকে নিয়ে যান। তখন তারা মহানবী ﷺ-এর উপর ঈমান আনে। রাসূল ﷺ তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন যে, তোমাদের কি মাপ জোপের কোনো ব্যবস্থা আছে? আর তোমাদের জীবিকার ব্যবস্থা কি? তারা উত্তর দিল যে, আমরা জমিতে শস্য বপন করি, যখন তা উপযোগী হয়, তখন সেগুলোকে কেটে সেখানেই স্তূপীকৃত করে দেই। সেই স্তূপ থেকে সবাই নিজ নিজ প্রয়োজনমতো নিয়ে আসে। কাজেই আমাদের মাপজোখের কোনো প্রয়োজন পড়ে না। রাসূল ﷺ জিজ্ঞোসা করলেন, তোমাদের মধ্যে কি কেউ মিথ্যা কথা বলে? তারা নিবেদন করল না। কারণ কেউ যদি তা করে, তাহলে সাথে সাথে একটি আগুন এসে তাকে পুড়িয়ে দেয়। হুজুর ﷺ জিজ্ঞেস করলেন তোমাদের সবার ঘর বাড়িগুলো একই রকম কেন? নিবেদন করল, যাতে কেউ কারও উপর প্রাধান্য প্রকাশ করতে না পারে। অতঃপর রাসূল ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা তোমাদের বাড়িগুলোর সামনে এসব কবর কেন বানিয়ে রেখেছ? নিবেদন করল যাতে আমাদের সামনে সর্বক্ষণ মৃত্যু উপস্থিত থাকে। অতঃপর রাসূল ﷺ যখন মে'রাজ

থেকে মক্কায় ফিরে আসলেন, তখন আয়াতটি নাজিল হলো وَمِنْ قَوْمِ مُوْسٰى اُمَّةٌ يَّهْدُوْنَ بِالْحَقِّ وَبِهٖ يَعْدِلُوْنَ তাফসীরে কুরতুবী এ রেওয়ায়েত দুটিকে মৌলিক সাব্যস্ত করে অন্যান্য সম্ভাব্যতার কথাও লিখেছেন। ইবনে কাছীর একে বিস্ময়কর কাহিনী বলেছেন, কিন্তু একে খণ্ডন করেননি। অবশ্য কুরতুবী এ রেওয়ায়েতটি উদ্ধৃত করে বলেছেন যে, সম্ভবত এই রেওয়ায়েতটি বিশুদ্ধ নয়।

যাহোক এ আয়াতের মর্ম দাঁড়ায় এই যে, হযরত মূসা (আ.)-এর সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি দল রয়েছে যারা সব সময়ই সত্যে সুদৃঢ় রয়েছে। তা তারা রাসূল ﷺ -এর আবির্ভাবের সংবাদ শুনে যারা ইসলামে দীক্ষিত হয়েছিল তারাই হোক অথবা বনী ইসরাঈলদের দ্বাদশতম সে গোত্রই হোক, যাকে আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীর কোনো বিশেষ স্থানে পুনর্বাসিত করে রেখেছেন, যেখানে যাওয়া অন্য কারও পক্ষে সম্ভব নয়। (আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞানী)

শব্দ বিশ্লেষণ

هُدْنَا : সীগাহ جمع متكلم বহছ اثبات فعل ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْهَوْدُ মূলবর্ণ (ه . و . د) জিনস اجوف واوى অর্থ– আমরা প্রত্যাবর্তন করছি।

اَشَآءُ : সীগাহ واحد متكلم বহছ اثبات فعل مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْمَشِيْئَةُ মূলবর্ণ (ش . ى . ء) জিনস মুরাক্কাব مهموز لام ও اجوف يائى অর্থ– আমি ইচ্ছা করি।

يَنْهٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ نفى فعل مضارع معروف বাব فَتَحَ মাসদার اَلنَّهْىُ মূলবর্ণ (ن . ه . ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– তিনি বাধা দেন।

اَلْمُنْكَرُ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم مفعول বাব افعال মাসদার اَلْاِنْكَارُ মূলবর্ণ (ن . ك . ر) জিনস صحيح অর্থ– অসৎকাজ।

خَبٰٓئِثُ : শব্দটি বহুবচন; একবচন خَبِيْثَةٌ অর্থ– অপবিত্র বস্তু।

اِصْرٌ : শব্দটি একবচন; বহুবচন اٰصَارٌ অর্থ– ভারী বোঝা, কঠিন কাজ।

اَلْاَغْلٰلُ : শব্দটি বহুবচন; একবচন غُلٌّ অর্থ– বেড়ি, শৃঙ্খল।

عَزَّرُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ اثبات فعل ماضى معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّعْزِيْرُ মূলবর্ণ (ع . ز . ر) জিনস صحيح অর্থ– তারা সম্মান করেছে।

وَقَطَّعْنٰهُمُ اثْنَتَیْ عَشْرَةَ اَسْبَاطًا اُمَمًا ؕ وَاَوْحَیْنَاۤ اِلٰی مُوْسٰۤی اِذِ اسْتَسْقٰىهُ قَوْمُهٗۤ اَنِ اضْرِبْ بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ ۚ فَانْۢبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَیْنًا ؕ قَدْ عَلِمَ كُلُّ اُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ ؕ وَظَلَّلْنَا عَلَیْهِمُ الْغَمَامَ وَاَنْزَلْنَا عَلَیْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوٰی ؕ كُلُوْا مِنْ طَیِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ ؕ وَمَا ظَلَمُوْنَا وَلٰكِنْ كَانُوْۤا اَنْفُسَهُمْ یَظْلِمُوْنَ (١٦٠)

অনুবাদ : (১৬০) আর আমি তাদেরকে দ্বাদশ গোত্রে বিভক্ত করে সকলকে পৃথক পৃথক দল নির্ধারণ করে দিলাম এবং আমি মূসাকে আদেশ দিলাম, যখন তাঁর সম্প্রদায় তাঁর নিকট পানি চাইল, আপনার এই লাঠি দ্বারা অমুক পাথরের উপর আঘাত করুন, অনন্তর তৎক্ষণাৎ তা হতে বারটি প্রস্রবণ বের হলো, প্রত্যেকে নিজ নিজ পানি পানের স্থান জেনে নিল, আর আমি তাদের উপর মেঘমালাকে ছায়াদার করে দিলাম এবং তাদেরকে মান্না ও সালওয়া পৌঁছালাম। খাও পবিত্র বস্তুগুলো হতে যা আমি তোমাদেরকে দিয়েছি, বস্তুতঃ তারা আমার কোনো ক্ষতি করেনি, বরং নিজেদের ক্ষতি করছিল।

وَاِذْ قِیْلَ لَهُمُ اسْكُنُوْا هٰذِهِ الْقَرْیَةَ وَكُلُوْا مِنْهَا حَیْثُ شِئْتُمْ وَقُوْلُوْا حِطَّةٌ وَّادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطِیْٓـٰٔتِكُمْ ؕ سَنَزِیْدُ الْمُحْسِنِیْنَ (١٦١)

(১৬১) আর যখন তাদেরকে আদেশ করা হলো যে, তোমরা এই জনপদে, বসবাস কর এবং তা হতে ভক্ষণ কর– যেখানে তোমাদের আগ্রহ হয় এবং মুখে এটা বলতে থাক, তওবা এবং দ্বারদেশে দিয়ে অবনত মস্তকে প্রবেশ করিও, আমি তোমাদের ত্রুটিগুলো ক্ষমা করে দিব, যারা নেক কাজ করবে তাদেরকে তদুপরি আরো প্রদান করব।

শাব্দিক অনুবাদ

(১৬০) وَقَطَّعْنٰهُمُ اثْنَتَیْ عَشْرَةَ اَسْبَاطًا اُمَمًا আর আমি তাদেরকে দ্বাদশ গোত্রে বিভক্ত করে সকলকে পৃথক পৃথক দল নির্ধারণ করে দিলাম وَاَوْحَیْنَاۤ اِلٰی مُوْسٰۤی এবং আমি মূসাকে আদেশ দিলাম اِذِ اسْتَسْقٰىهُ قَوْمُهٗۤ যখন তাঁর সম্প্রদায় তাঁর নিকট পানি চাইল اَنِ اضْرِبْ بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ আপনার এই লাঠি দ্বারা অমুক পাথরের উপর আঘাত করুন فَانْۢبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَیْنًا অনন্তর তৎক্ষণাৎ তা হতে বারটি প্রস্রবণ বের হলো قَدْ عَلِمَ জেনে নিল كُلُّ اُنَاسٍ প্রত্যেকে مَّشْرَبَهُمْ নিজ নিজ পানি পানের স্থান وَظَلَّلْنَا عَلَیْهِمُ الْغَمَامَ আর আমি তাদের উপর মেঘমালাকে ছায়াদার করে দিলাম وَاَنْزَلْنَا عَلَیْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوٰی এবং তাদেরকে মান্না ও সালওয়া পৌঁছালাম كُلُوْا খাও مِنْ طَیِّبٰتِ পবিত্র বস্তুগুলো হতে مَا رَزَقْنٰكُمْ যা আমি তোমাদেরকে দিয়েছি وَمَا ظَلَمُوْنَا বস্তুতঃ তারা আমার কোনো ক্ষতি করেনি وَلٰكِنْ كَانُوْۤا اَنْفُسَهُمْ یَظْلِمُوْنَ বরং নিজেদের ক্ষতি করছিল।

(১৬১) وَاِذْ قِیْلَ لَهُمُ আর যখন তাদেরকে আদেশ করা হলো যে اسْكُنُوْا هٰذِهِ الْقَرْیَةَ তোমরা এই জনপদে বসবাস কর وَكُلُوْا مِنْهَا এবং তা হতে ভক্ষণ কর– حَیْثُ شِئْتُمْ যেখানে তোমাদের আগ্রহ হয় وَقُوْلُوْا এবং মুখে এটা বলতে থাক حِطَّةٌ তওবা وَادْخُلُوا الْبَابَ এবং দ্বারদেশে দিয়ে প্রবেশ করিও سُجَّدًا অবনত মস্তকে نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِیْٓـٰٔتِكُمْ আমি তোমাদের ত্রুটিগুলো ক্ষমা করে দিব سَنَزِیْدُ الْمُحْسِنِیْنَ যারা নেক কাজ করবে তাদেরকে তদুপরি আরো প্রদান করব

www.almodina.com

فَبَدَّلَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِىْ قِيْلَ لَهُمْ فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَآءِ بِمَا كَانُوْا يَظْلِمُوْنَ (١٦٢)

অনুবাদ : (১৬২) অনন্তর সেই জালেমগণ পরিবর্তন করে দিল অন্য এক বাক্য- যা বিপরীত ছিল ঐ বাক্যের যার আদেশ তাদেরকে প্রদান করা হয়েছিল। অতএব, আমি তাদের প্রতি আসমান হতে একটি আজাব প্রেরণ করলাম, এ কারণে যে, তারা আদেশ অমান্য করত।

وَاسْئَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِىْ كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ ۘ اِذْ يَعْدُوْنَ فِى السَّبْتِ اِذْ تَاْتِيْهِمْ حِيْتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَّيَوْمَ لَا يَسْبِتُوْنَ ۙ لَا تَاْتِيْهِمْ ۚ كَذٰلِكَ ۚ نَبْلُوْهُمْ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ (١٦٣)

(১৬৩) আর আপনি এই লোকদের নিকট সেই জনপদের [অধিবাসীদের] অবস্থা জিজ্ঞাসা করুন যা লোহিত সাগর উপকূলে অবস্থিত ছিল। যখন তারা শনিবার সম্বন্ধে সীমালঙ্ঘন করছিল, যখন শনিবার দিবসে তাদের [সমুদ্রের] মৎসগুলো আত্মপ্রকাশ করে তাদের সম্মুখে আসত, আর যেদিন শনিবার দিবস না হতো সেদিন তাদের সামনে আসত না, এভাবে আমি তাদেরকে পরীক্ষা করতাম এজন্য যে, তারা আদেশ লঙ্ঘন করত।

শাব্দিক অনুবাদ

(১৬২) فَبَدَّلَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْهُمْ قَوْلًا অনন্তর সেই জালেমগণ পরিবর্তন করে দিল অন্য এক বাক্য- غَيْرَ الَّذِىْ قِيْلَ لَهُمْ যা বিপরীত ছিল ঐ বাক্যের যার আদেশ তাদেরকে প্রদান করা হয়েছিল فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ অতএব, আমি তাদের প্রতি প্রেরণ করলাম رِجْزًا مِّنَ السَّمَآءِ আসমান হতে একটি আজাব بِمَا كَانُوْا يَظْلِمُوْنَ এ কারণে যে, তারা আদেশ অমান্য করত।

(১৬৩) وَاسْئَلْهُمْ আর আপনি অবস্থা জিজ্ঞাসা করুন عَنِ الْقَرْيَةِ এই লোকদের নিকট সেই জনপদের [অধিবাসীদের] الَّتِىْ كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ যা লোহিত সাগর উপকূলে অবস্থিত ছিল اِذْ يَعْدُوْنَ فِى السَّبْتِ যখন তারা শনিবার সম্বন্ধে সীমালঙ্ঘন করছিল اِذْ تَاْتِيْهِمْ حِيْتَانُهُمْ যখন তাদের মৎসগুলো সম্মুখে আসত يَوْمَ سَبْتِهِمْ শনিবার দিবসে شُرَّعًا আত্মপ্রকাশ করে وَّيَوْمَ لَا يَسْبِتُوْنَ আর যে দিন শনিবার দিবস না হতো لَا تَاْتِيْهِمْ সেদিন তাদের সামনে আসত না كَذٰلِكَ نَبْلُوْهُمْ এভাবে আমি তাদেরকে পরীক্ষা করতাম بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ এজন্য যে, তারা আদেশ লঙ্ঘন করত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(১৬৩) قوله وَاسْئَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِىْ كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** মহানবী ﷺ মদিনার ইহুদিগণকে তাদের কুফরির জন্য খুবই ধমক দিতেন এবং ভর্ৎসনা করতেন। আর বলতেন তোমরা কুফরিকরণে এবং নবী-রাসূলগণকে অস্বীকারকরণে তোমাদের পূর্বপুরুষগণকে অনুসরণ করে চলছ। তখন তারা জবাবে বলত আমাদের বাপদাদা ও পূর্ববপুরুষগণ কখনো নিজেদের প্রতিপালকের সাথে কুফরি করেননি এবং কোনো নবী-রাসূলকেও অস্বীকার করেননি। উপরিউক্ত জনপদে যা কিছু ঘটেছিল সে বিষয়ে ইহুদিরা ভালোভাবে ওয়াকিফহাল ছিল। কিন্তু বিষয়টি তারা গোপন রাখত আর মনে করত এ ঘটনা সম্পর্কে আর কেউ ওয়াকিফহাল নয়। তখন আল্লাহ তা'আলা وَاسْئَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِىْ كَانَتْ حَاضِرَةَ

اَلْبَحْرِ হতে আটটি আয়াত নাজিল করে নবী করীম ﷺ-কে মূল ঘটনা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল করেন। তারা নবী করীম ﷺ-এর কণ্ঠে এটা শুনে বিস্ময় বোধ করল। এ সূরাটি যদিও মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে; কিন্তু আয়াতগুলোতে মদিনার ইহুদিকেই সম্বোধন করা হয়েছে।

قوله وَقَطَّعْنٰهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ اَسْبَاطًا اُمَمًا الخ আলোচ্য আয়াতের পূর্ববর্তী আয়াতে হযরত মূসা (আ.)-এর অবশিষ্ট কাহিনী বিবৃত করার পর তাঁর উম্মত (ইহুদি)-এর অসৎকর্মশীল লোকদের প্রতি নিন্দাবাদ এবং তাদের নিকৃষ্ট পরিণতির বর্ণনা এসেছে। এ আয়াতগুলোতেও তাদের শাস্তি এবং অশুভ পরিণতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

প্রথম আয়াতে সে দুটি শাস্তির বর্ণনা দেওয়া হয়েছে যা পৃথিবীতে তাদের উপর আরোপিত হয়েছে আর তা হলো প্রথমত কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর এমন কোনো ব্যক্তিকে অবশ্যই চাপিয়ে রাখতে থাকবেন, যে তাদেরকে কঠিন শাস্তি দিতে থাকবে এবং অপমান ও লাঞ্ছনায় জড়িয়ে রাখবে। সুতরাং তখন থেকে নিয়ে অদ্যাবধি ইহুদিরা সবসময়ই সর্বত্র ঘৃণিত, পরাজিত ও পরাধীন অবস্থায় রয়েছে। সাম্প্রতিককালের ইসরাঈলী রাষ্ট্রের কারণে এ বিষয়ে এজন্য সন্দেহ হতে পারে না যে, যারা বিষয়টি সম্পর্কে অবগত তাদের জনা আছে যে, প্রকৃতপক্ষে আজও ইসরাঈলীদের না আছে নিজস্ব কোনো ক্ষমতা, না আছে রাষ্ট্র। প্রকৃতপক্ষে এটা ইসলামের প্রতি রাশিয়া ও আমেরিকার একান্ত শত্রুতারই ফলশ্রুতি হিসেবে আদেরই একটা ঘাঁটি মাত্র। এর চেয়ে বেশি কোনো গুরুত্বই এর নেই। তাছাড়া আজও ইহুদিরা তাদেরই অধীন ও আজ্ঞাবহ। যখনই এতদুভয় শক্তি তাদের সাহায্য করা বন্ধ করে দিবে, তখনই ইসরাঈলের অস্তিত্ব বিশ্বের পাতা থেকে মুছে যেতে পারে।

শব্দ বিশ্লেষণ

اَسْبَاطًا : শব্দটি বহুবচন; একবচন سِبْطٌ অর্থ– সন্তানের সন্তান। (এখানে উদ্দেশ্য কন্যার পুত্র, দৌহিত্র।)

اُمَمًا : শব্দটি বহুবচন; একবচন اُمَّةٌ অর্থ– দল, গোত্র, সম্প্রদায়।

مَشْرَبٌ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم ظرف বাব سَمِعَ মাসদার اَلشُّرْبُ মূলবর্ণ (ش . ر . ب) জিনস صحيح অর্থ– পানস্থান, ঘাট।

ظَلَّلْنَا : সীগাহ جمع متكلم বহছ اثبات فعل ماضى معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّظْلِيْلُ মূলবর্ণ (ظ . ل . ل) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– আমি ছায়া দান করলাম।

غَمَامٌ : শব্দটি একবচন; বহুবচনে غَمَائِمُ অর্থ– মেঘ, মেঘমালা।

كُلُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْاَكْلُ মূলবর্ণ (ا . ك . ل) জিনস مهموز فاء অর্থ– তোমরা খাও, তোমরা আহার কর।

يَعْدُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ اثبات فعل مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْعُدْوَانُ মূলবর্ণ (ع . د . و) জিনস ناقص واوى অর্থ– তারা সীমালঙ্ঘন করেছে।

حِيْتَانٌ : শব্দটি বহুবচন; একবচন حُوْتٌ অর্থ– মাছ।

شُرَّعًا : শব্দটি বহুবচন; একবচন شارع অর্থ– পানির উপর দৃশ্যমান, ভাসমান, আত্মপ্রকাশ করা।

لَا يَسْبِتُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ نفى فعل مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلسَّبْتُ মূলবর্ণ (س . ب . ت) জিনস صحيح অর্থ– তারা শনিবার উদযাপন করত না।

وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا ۙ اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ۖ قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ (١٦٤)

অনুবাদ : (১৬৪) আর যখন তাদের মধ্যকার একটি দল এরূপ বলল যে, তোমরা এমন লোকদেরকে কেন উপদেশ দিচ্ছ যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করবেন অথবা তাদেরকে কঠোর শাস্তি প্রদান করবেন, তারা [দ্বিতীয় দল] বলল, তোমাদের রবের সমীপে ওজর পেশ করার জন্য, আর এজন্য যে, হয়তো তারা ভীত হবে।

فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ (١٦٥)

(১৬৫) অনন্তর যখন তারা সেই কাজ বর্জনকারীই রইল, যে সম্বন্ধে তাদেরকে উপদেশ দেওয়া হতো, তখন আমি সে সকল লোকদেরকে তো বাঁচিয়ে নিলাম যারা সেই মন্দ কার্য হতে বারণ করত, আর সেই সকল লোক যারা সীমা অতিক্রম করত, তাদেরকে আক্রান্ত করলাম এক কঠোর আজাবে তাদের নাফরমানি করার দরুন।

فَلَمَّا عَتَوْا عَن مَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ (١٦٦)

(১৬৬) অর্থাৎ যখন তারা সীমা অতিক্রম করল ঐ কাজে যে কাজ হতে তাদেরকে নিষেধ করা হয়েছিল, তখন আমি তাদেরকে বললাম যে, তোমরা লাঞ্ছিত বানর হয়ে যাও।

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ ۗ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ ۖ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ (١٦٧)

(১৬৭) আর ঐ সময়কে স্মরণ করুন, যখন আপনার রব একথা জানিয়ে দিলেন যে, তিনি অবশ্যই এই ইহুদিদের উপর কিয়ামত পর্যন্ত এমন ব্যক্তিকে আধিপত্য দান করতে থাকবেন, যে তাদেরকে কঠোর শাস্তি দ্বারা যাতনা দিতে থাকবে; নিশ্চয় আপনার পরওয়ারদেগার সত্বরই শাস্তি প্রদান করে থাকেন। আর নিশ্চয় তিনি অতি ক্ষমাশীল, পরম করুণাময়।

শাব্দিক অনুবাদ

(১৬৪) وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ আর যখন তাদের মধ্যকার একটি দল এরূপ বলল যে لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا তোমরা এমন লোকদেরকে কেন উপদেশ দিচ্ছ اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করবেন أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا অথবা তাদেরকে কঠোর শাস্তি প্রদান করবেন। قَالُوا তারা [দ্বিতীয় দল] বলল مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ তোমাদের রবের সমীপে ওজর পেশ করার জন্য وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ আর এজন্য যে, হয়তো তারা ভীত হবে।

(১৬৫) فَلَمَّا نَسُوا অনন্তর যখন তারা সেই কাজ বর্জনকারীই রইল مَا ذُكِّرُوا بِهِ যে সম্বন্ধে তাদেরকে উপদেশ দেওয়া হতো أَنجَيْنَا তখন আমি সে সকল লোকদেরকে তো বাঁচিয়ে নিলাম الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ যারা সেই মন্দ কার্য হতে বারণ করত। وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا আর সেই সকল লোক যারা সীমা অতিক্রম করত তাদেরকে আক্রান্ত করলাম بِعَذَابٍ بَئِيسٍ এক কঠোর আজাবে بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ তাদের নাফরমানি করার দরুন।

(১৬৬) فَلَمَّا عَتَوْا অর্থাৎ যখন তারা সীমা অতিক্রম করল عَن مَّا نُهُوا عَنْهُ ঐ কাজে যে কাজ হতে তাদেরকে নিষেধ করা হয়েছিল قُلْنَا لَهُمْ তখন আমি তাদেরকে বললাম যে كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ তোমরা লাঞ্ছিত বানর হয়ে যাও।

(১৬৭) وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ আর ঐ সময়কে স্মরণ করুন, যখন আপনার রব একথা জানিয়ে দিলেন যে لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ তিনি অবশ্যই এই ইহুদিদের উপর এমন ব্যক্তিকে আধিপত্য দান করতে থাকবেন যে إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ কিয়ামত পর্যন্ত مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ তাদেরকে কঠোর শাস্তি দ্বারা যাতনা দিতে থাকবে إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ নিশ্চয় আপনার পরওয়ারদেগার সত্বরই শাস্তি প্রদান করে থাকেন وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ আর নিশ্চয় তিনি অতি ক্ষমাশীল, পরম করুণাময়।

www.almodina.com

وَقَطَّعْنٰهُمْ فِي الْاَرْضِ اُمَمًا ۚ مِنْهُمُ الصّٰلِحُوْنَ وَمِنْهُمْ دُوْنَ ذٰلِكَ ؗ وَبَلَوْنٰهُمْ بِالْحَسَنٰتِ وَالسَّيِّاٰتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ (١٦٨)

অনুবাদ : (১৬৮) আর আমি ভূপৃষ্ঠে তাদেরকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে দিয়েছি, তাদের মধ্যে কতক ভালো [ও] ছিল এবং তাদের মধ্যে কতক অন্য রকমের ছিল, আর আমি তাদেরকে পরীক্ষা করে থাকি, সু-অবস্থা ও দুরবস্থাসমূহ দ্বারা, যেন তারা ফিরে আসে।

فَخَلَفَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَّرِثُوا الْكِتٰبَ يَاْخُذُوْنَ عَرَضَ هٰذَا الْاَدْنٰى وَيَقُوْلُوْنَ سَيُغْفَرُ لَنَا ۚ وَاِنْ يَّاْتِهِمْ عَرَضٌ مِّثْلُهٗ يَاْخُذُوْهُ ؕ اَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِّيْثَاقُ الْكِتٰبِ اَنْ لَّا يَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ اِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوْا مَا فِيْهِ ؕ وَالدَّارُ الْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ (١٦٩)

(১৬৯) অনন্তর তাদের পর এমন লোক তাদের স্থলাভিষিক্ত হলো, যারা তাদের নিকট হতে কিতাব লাভ করল, কিন্তু [তারা কিতাবের বিনিময়ে] এই তুচ্ছ দুনিয়ার ধনসম্পদ গ্রহণ করে এবং বলে যে, নিশ্চয় আমরা ক্ষমা প্রাপ্ত হবো, অথচ যদি [পুনরায়] তাদের নিকট তদ্রূপ ধনসম্পদ আসে তখন তারা তা গ্রহণ করে না, তাদের নিকট হতে কি সেই কিতাবের এই বিষয়টির অঙ্গীকার গ্রহণ করা হয়নি যে, আল্লাহর প্রতি সত্য ভিন্ন অন্য কোনো কথা আরোপ করবে না, আর তারা সেই কিতাবে যা [লিপিবদ্ধ] ছিল তা পাঠ [ও] করেছে, আর পরকালের বাসস্থান ঐ সমস্ত লোকদের জন্য উত্তম যারা পরহেজ করে চলে, তবে কি তোমরা বুঝ না?

وَالَّذِيْنَ يُمَسِّكُوْنَ بِالْكِتٰبِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ ؕ اِنَّا لَا نُضِيْعُ اَجْرَ الْمُصْلِحِيْنَ (١٧٠)

(১৭০) আর যারা কিতাব [তাওরাত]-কে দৃঢ়ভাবে ধারণ করে, এবং নামাজ কায়েম রাখে; নিশ্চয় আমি এরূপ লোকদের বিনিময় নষ্ট করব না, যারা নিজেদের সংশোধন করে নেয়।

শাব্দিক অনুবাদ

(১৬৮) وَقَطَّعْنٰهُمْ فِي الْاَرْضِ اُمَمًا আর আমি ভূপৃষ্ঠে তাদেরকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে দিয়েছি مِنْهُمُ الصّٰلِحُوْنَ তাদের মধ্যে কতক ভালো [ও] ছিল وَمِنْهُمْ دُوْنَ ذٰلِكَ এবং তাদের মধ্যে কতক অন্য রকমের ছিল وَبَلَوْنٰهُمْ আর আমি তাদেরকে পরীক্ষা করে থাকি بِالْحَسَنٰتِ وَالسَّيِّاٰتِ সু-অবস্থা ও দুরবস্থাসমূহ দ্বারা لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ যেন তারা ফিরে আসে

(১৬৯) فَخَلَفَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ অনন্তর তাদের পর এমন লোক তাদের স্থলাভিষিক্ত হলো وَّرِثُوا الْكِتٰبَ যারা তাদের নিকট হতে কিতাব লাভ করল يَاْخُذُوْنَ عَرَضَ هٰذَا الْاَدْنٰى কিন্তু [তারা কিতাবের বিনিময়ে] এই তুচ্ছ দুনিয়ার ধন সম্পদ গ্রহণ করে وَيَقُوْلُوْنَ এবং বলে যে سَيُغْفَرُ لَنَا নিশ্চয় আমরা ক্ষমা প্রাপ্ত হবো وَاِنْ يَّاْتِهِمْ عَرَضٌ مِّثْلُهٗ অথচ যদি [পুনরায়] তাদের নিকট তদ্রূপ ধন-সম্পদ আসে يَاْخُذُوْهُ তখন তারা তা গ্রহণ করে اَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ তাদের নিকট হতে কি গ্রহণ করা হয়নি যে مِّيْثَاقُ الْكِتٰبِ সেই কিতাবের এই বিষয়টির অঙ্গীকার اَنْ لَّا يَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ اِلَّا الْحَقَّ আল্লাহর প্রতি সত্য ভিন্ন অন্য কোনো কথা আরোপ করবে না وَدَرَسُوْا مَا فِيْهِ আর তারা সেই কিতাবে যা [লিপিবদ্ধ] ছিল তা পাঠ [ও] করেছে وَالدَّارُ الْاٰخِرَةُ خَيْرٌ আর পরকালের বাসস্থান ঐ সমস্ত লোকদের জন্য উত্তম لِّلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ যারা পরহেজ করে চলে اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ তবে কি তোমরা বুঝ না?

(১৭০) وَالَّذِيْنَ يُمَسِّكُوْنَ بِالْكِتٰبِ আর যারা কিতাব [তাওরাত]-কে দৃঢ়ভাবে ধারণ করে وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ এবং নামাজ কায়েম রাখে اِنَّا لَا نُضِيْعُ اَجْرَ الْمُصْلِحِيْنَ নিশ্চয় আমি এরূপ লোকদের বিনিময় নষ্ট করব না, যারা নিজেদের সংশোধন করে নেয়।

www.almodina.com

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(১৭০) قَوْلُهُ وَالَّذِيْنَ يُمَسِّكُوْنَ بِالْكِتٰبِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ الخ আয়াতের শানে নুযূল : আহলে কিতাবদের মধ্যে যারা নবী করীম ﷺ -এর প্রতি ঈমান এনে ইসলাম গ্রহণ করেছিল। যেমন- হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম ও তাঁর সঙ্গী-সাথীবৃন্দ তাঁদের সম্পর্কে অত্র আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিল। কেননা তাঁরা প্রথমে তাঁদের নবীর কিতাব তাওরাতের ও অন্যান্য কিতাবের প্রতি ঈমান এনেছিল এবং একে দৃঢ়ভাবে ধারণ করে রেখেছিল এবং যথাসময়ে সে কিতাবের বিধান কায়েম করতে সর্বদা সচেষ্ট ছিল। তাদের সম্পর্কেই উপরিউক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়। অত্র আয়াতে বলা হয়েছে, বনী ইসরাঈলের কোনো কোনো আলেম এমনও রয়েছে যারা তাওরাতের বিধিবিধানকে দৃঢ়তার সাথে ধরেছে এবং বিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে সৎকাজের অবলম্বন করেছে আর যথারীতি নামাজও প্রতিষ্ঠা করেছে এমনি লোকদের প্রতিদান ও প্রাপ্য বিনষ্ট হতে পারে না।

قَوْلُهُ وَقَطَّعْنٰهُمْ فِى الْاَرْضِ اُمَمًا الخ ১৬৮ নং আয়াতে ইহুদিদের উপর আরোপিত অন্য আরেক শাস্তির কথা বলা হয়েছে, যা এই পৃথিবীতেই তাদেরকে দেওয়া হয়েছে, যা এই পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে একান্ত বিক্ষিপ্ত করে দেওয়া। কোথাও কোনো এক দেশে তাদের সমবেতভাবে বসবাসের সুযোগ হয়নি। وَقَطَّعْنٰهُمْ فِى الْاَرْضِ اُمَمًا এর মর্মও তাই। قَطَّعْنَا শব্দটি تَقْطِيْعٌ থেকে নির্গত। যার অর্থ খণ্ড বিখণ্ড করে দেওয়া। আর اُمَمٌ হলো اُمَّةٌ-এর বহুবচন। যার অর্থ দল বা শ্রেণি। মর্ম হলো এই যে, আমি ইহুদি জাতিকে খণ্ডখণ্ড করে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে বিক্ষিপ্ত করে দিয়েছি।

এতে বুঝা গেল যে, কোনো জাতিবিশেষের কোনো এক স্থানে সমবেত জীবনযাপন ও সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনও আল্লাহ তা'আলার একটি নিয়ামত পক্ষান্তরে তাদের বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়া একরকম আসমানি আজাব। মুসলমানদের প্রতি আল্লাহর এ নিয়ামত সব সময়ই রয়েছে এবং ইনশাআল্লাহ থাকবেও কিয়ামত পর্যন্ত। তারা যেখানেই অবস্থান করেছে সেখানেই তাদের প্রবল একটি সমবেত শক্তি গড়ে উঠেছে। মদিনা থেকে এ ধারা শুরু হয়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে এভাবেই এক বিস্ময়কর প্রক্রিয়ায় বিস্তার লাভ করেছে। দূরপ্রাচ্যে পাকিস্তান, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি স্থায়ী ইসলামি রাষ্ট্রসমূহের ফলশ্রুতিতে গঠিত। পক্ষান্তরে ইহুদিরা সব সময়ই বিভন্ন দেশে বিক্ষিপ্ত হয়েছে। যতই ধনী ও সম্পদশালী হোক না কেন কখনও শাসনক্ষমতা তাদের হাতে আসেনি।

কয়েক বছর থেকে ফিলিস্তিনের একটি অংশ তাদের সমবেত হওয়া এবং কৃত্রিম ক্ষমতার কারণে ধোঁকায় পড়া উচিত হবে না; শেষ জমানায় এখনে তাদের সমবেত হওয়াটা ছিল অপরিহার্য। কারণ সদাসত্য রাসূলে করীম ﷺ -এর হাদীসে বলা আছে যে, কিয়ামতের কাছাকাছি সময়ে তাই ঘটবে। শেষ জমানায় হযরত ঈসা (আ.) অবতীর্ণ হবেন, সমস্ত খ্রিস্টান মুসলমান হয়ে যাবে এবং তিনি ইহুদিদের সাথে জিহাদ করে তাদেরকে হত্যা করবেন। অবশ্য আল্লাহর অপরাধীকে সমন জারি করে এবং পুলিশের মাধ্যমে ধরে হাজির করা হবে না; বরং তিনি এমনই প্রাকৃতিক উপকরণ সৃষ্টি করবেন যাতে অপরাধী পায়ে হেটে বহু চেষ্টা করে নিজের বধ্যভূমিতে গিয়ে হাজির হবে। হযরত ঈসা (আ.)-এর অবতরণ ঘটবে সিরিয়ার দামেশকে। ইহুদিদের সাথে তার যুদ্ধ ও সেখানে সংঘটিত হবে যাতে ঈসা (আ.) -এর পক্ষে তাদেরকে নিধন করা সহজ হয়। আল্লাহ তা'আলা ইহুদিদেরকে সর্বদাই রাজক্ষমতা থেকে বঞ্চিত অবস্থায় বিভিন্ন দেশে বিক্ষিপ্ত করে রেখে অমর্যাদা জনিত শাস্তির আস্বাদ গ্রহণ করিয়েছেন। অতঃপর শেষ জমানায় হযরত ঈসা (আ.)-এর জন্য সহজসাধ্য করার লক্ষ্যে তাদেরকে তাদের বধ্যভূমিতে সমবেত করেছেন। কাজেই তাদের এ সমবেত হওয়া বর্ণিত আজাবের পরিপন্থি নয়।

রইল তাদের বর্তমান রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার প্রশ্ন। বস্তুত এটা এমন একটা ধোঁকা যার উপরে বর্তমান যুগের সভ্য পৃথিবী যদিও অতি সুন্দর কারুকার্যময় আবরণ জড়িয়ে দিয়েছে, কিন্তু বিশ্ব রাজনীতি সম্পর্কে সজাগ কোনো ব্যক্তি এক মুহূর্তের জন্যও এতে ধোঁকা খেতে পারে না। কারণ অধুনা যে এলাকাটিকে ইসরাঈল নামে অভিহিত করা হয়, প্রকৃতপক্ষে রাশিয়া, আমেরিকা ও ইংল্যাণ্ডের একটা যৌথ ছাউনির অতিরিক্ত কোনো গুরুত্ব তার নেই। এটি শুধুমাত্র এসব দেশের সাহায্যেই বেঁচে আছে এবং এদের বশংবদ থাকার ভিতরেই নিহিত রয়েছে তার অস্তিত্বের রহস্য। বলাবাহুল্য, নির্ভেজাল দাসত্বকে ভেজাল রাষ্ট্র নামে অভিহিত করে দেওয়ায় এ জাতির কোনো ক্ষমতা লাভ ঘটেনা কুরআনে কারীম তাদের সম্পর্কে কিয়ামতকাল পর্যন্ত অপমান ও লাঞ্ছনা জনিত যে শাস্তির কথা বলেছে তা আজও তেমনিভাবে অব্যাহত। ১৬৭ নং আয়াতটিতে তারই আলোচনা এভাবে করা হয়েছে- وَاِذْ تَاَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ مَنْ يَّسُوْمُهُمْ سُوْٓءَ الْعَذَابِ অর্থাৎ আপনার পালনকর্তা যখন সুদৃঢ় ইচ্ছা করে নিয়েছেন যে, কিয়ামত পর্যন্ত তাদের উপর এমন এক শক্তিকে চাপিয়ে দিবেন,

যা তাদেরকে নিকৃষ্ট আজাবের স্বাদ আস্বাদন করাবে। যেমন প্রথমে হযরত সোলায়মান (আ.) -এর হাতে পরে বুখতানাসারের দ্বারা এবং অতঃপর মহানবী ﷺ -এর মাধ্যমে. আর সর্বশেষ হযরত ফারুকে আ'যম (রা.)-এর মাধ্যমে সব জায়গা থেকে অপামন ও লাঞ্ছনার সাথে ইহুদিদের বহিষ্কার করা একান্ত প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ঘটনা।

এ আয়াতের দ্বিতীয় বাক্যটি হলো এই– مِنْهُمُ الصّٰلِحُوْنَ وَمِنْهُمْ دُوْنَ ذٰلِكَ অর্থাৎ 'এদের মধ্যে কিছু লোক রয়েছে সৎ এবং কিছু অন্য রকম। 'অন্য রকম' এর মর্ম হলো এই যে, কাফের দুষ্কৃতকারী অসৎলোক রয়েছে। অর্থাৎ ইহুদিদের মধ্যে সবই এক রকম লোক নয়, কিছু সৎও আছে। এর অর্থ সেসব লোক, যারা তাওরাতের যুগে তাওরাতের নির্দেশাবলির পূর্ণ আনুগত্য ও অনুশীলন করেছে। না তার হুকুমের প্রতি কৃতঘ্নতা প্রকাশ করেছে, আর না কোনো রকম অপব্যাখ্যা ও বিকৃতির আশ্রয় নিয়েছে। এছাড়া এতে তারাও উদ্দেশ্য হতে পারেন, যারা কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার পর তার আনুগত্যে আত্মনিয়োগ করেছেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উপর ঈমান এনেছেন। অপরদিকে রয়েছে সে সমস্ত লোক যারা তাওরাতকে আসমানি গ্রন্থ বলে স্বীকার করা সত্ত্বেও তার বিরুদ্ধাচরণ করেছে, কিংবা তার আহকাম বা বিধি বিধানের বিকৃতি ঘটিয়ে নিজেদের পরকালকে পৃথিবীতে নিকৃষ্ট বস্তু সামগ্রীর বিনিময়ে বিক্রি করে দিয়েছে।

আয়াতের শেষাংশে ইরশাদ হয়েছে : وَبَلَوْنٰهُمْ بِالْحَسَنٰتِ وَالسَّيِّاٰتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ; অর্থাৎ আমি ভালো মন্দ অবস্থার দ্বারা তাদের পরীক্ষা করেছি যেন তারা নিজেদের গর্হিত আচার আচরণ থেকে ফিরে আসে। 'ভালো অবস্থার দ্বারা' এর অর্থ হলো এই যে, তাদেরকে ধন সম্পদের প্রাচুর্য ও ভোগ বিলাসের উপকরণ দান আর মন্দ অবস্থার অর্থ হয় লাঞ্ছনা গঞ্জনার সে অবস্থা যা যুগে যুগে বিভিন্নভাবে তাদের উপর নেমে এসেছে, অথবা কোনো কোনো সময়ে তাদের উপর আপতিত দুর্ভিক্ষ ও দারিদ্র্য। যাহোক সারমর্ম হলো এই যে, মানব জাতির আনুগত্যে ও ঔদ্ধত্যের পরীক্ষা করার দুটিই প্রক্রিয়া। তাদের ব্যাপারে উভয়টিই ব্যবহৃত হয়েছে। একটি হলো দান ও অনুগ্রহের মাধ্যমে পরীক্ষা করা যে, তারা দাতা ও অনুগ্রহকারীর কৃতজ্ঞতা ও আনুগত্য স্বীকার ও সম্পাদন করে কি না? দ্বিতীয়ত তাদেরকে বিভিন্ন কষ্ট ও দ্বন্দ্বের সম্মুখীন (করে পরীক্ষা) করা হয় যে, তারা নিনেজেদের পালনকর্তার দিকে প্রত্যাবর্তন করে নিজেদের মন্দ ও আসদাচরণ থেকে তওবা করে কি না? কিন্তু ইহুদি সম্প্রদায় এতদুভয় পরীক্ষাতেই অকৃতকার্য হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা যখন তাদের জন্য নিয়ামতের দুয়ার খুলে দিয়েছেন ধন সম্পদের প্রাচুর্য দান করেছেন, তখন তারা বলতে শুরু করেছে– قَالُوْا اِنَّ اللّٰهَ فَقِيْرٌ وَّنَحْنُ اَغْنِيَآءُ; অর্থাৎ (নাউযুবিল্লাহ) আল্লাহ হলেন ফকির আর আমরা ধনী। আর তাদেরকে যখন দারিদ্র্য ও দুর্দশার মাধ্যমে পরীক্ষা করা হয়েছে, তখন বলতে শুরু করেছে– وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ يَدُ اللّٰهِ مَغْلُوْلَةٌ; অর্থাৎ আল্লাহর হাত সংকুচিত হয়ে গেছে।

জ্ঞাতব্য বিষয় : এ আয়াতের দ্বারা একটা বিষয় তো এই জানা গেল যে, কোনো জাতির একত্র বাস আল্লাহ তা'আলার নিয়ামত এবং তার বিচ্ছিন্নতা হলো একটা শাস্তি। দ্বিতীয়ত পার্থিব আরাম-আয়েশ. আনন্দ-বেদনা এগুলো প্রকৃতপক্ষে আসমানি পরীক্ষারই বিভিন্ন উপকরণ যার যার মাধ্যমে তাদের ঈমান ও আল্লাহর আনুগত্যের পরীক্ষা নেওয়া হয়। এখানকার যে দুঃখ কষ্ট তা তেমন একটা হা হুতাশ বা কান্নাকাটির বিষয় নয়। তেমনিভাবে এখানকার আনন্দ-উচ্ছলতাও অহংকারী হয়ে উঠার মতো কোনো উপকরণ নয়। দূরদর্শী বুদ্ধিমানের জন্য এতদুভয়টিই লক্ষণীয় বিষয়।

পূর্ববর্তী আয়াতগুলোতে একটি প্রতিজ্ঞা ও প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে যা বিশেষত বনী ইসরাঈলদের আলেম সম্প্রদায়ের নিকট থেকে তওরাত সম্পর্কে নেওয়া হয়েছিল যে, এতে কেনো রকম পরিবর্তন কিংবা বিকৃতি সাধন করবে না এবং সত্য ও সঠিক বিষয় ছাড়া মহান পরওয়ারদেগারের প্রতি অন্য কোনো বিষয় আরোপ করবে না। আর এ বিষয়টি পূর্বেই উল্লিখিত হয়ে গিয়েছিল যে, বনী ইসরাঈলের আলেমগণ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে স্বার্থান্বেষীদের কাছ থেকে উৎকোচ নিয়ে তাওরাতের বিধিবিধানের পরিবর্তন করেছে এবং তাদের উদ্দেশ্যও স্বার্থের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে বাতলিয়েছে। এখন আলোচ্য ১৭০ আয়াতটিতে সে বর্ণনারই উপসংহার হিসেবে বলা হয়েছে যে, বনী ইসরাঈলের সব বিধিবিধানকে দৃঢ়তার সাথে ধরেছে এবং বিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে সৎকাজেও নিষ্ঠা অবলম্বন করেছে। আর যথারীতি নামাজও প্রতিষ্ঠা করেছে। এমনি লোকদের সম্পর্কে বলা হয়েছে আল্লাহ তাদের প্রতিদান বিনষ্ট করে দেন না, যারা নিজেদের সংশোধন করে। কাজেই যারা ঈমান ও আমলের উভয় ফরজ আদায়ের মাধ্যমে নিজের সংশোধন করে নিয়েছে তাদের প্রতিদান বা প্রাপ্য বিনষ্ট হতে পারে না।

এ আয়াতে কয়েকটি লক্ষণীয় ও জ্ঞাতব্য বিষয় রয়েছে। প্রথমত এই যে, কিতাব বলতে এতে সে কিতাবই উদ্দেশ্য। যেমন তাওরাত যাবূর ইঞ্জীল ও কুরআন।

দ্বিতীয়ত এ আয়াতের দ্বারা বুঝা গেছে যে, আল্লাহর কিতাবকে একান্ত আদব ও সম্মানের সাথে অতি যত্ন সহকারে নিজের কাছে শুধু রেখে দিলেই তার উদ্দেশ্য সাধিত হয় না; বরং তার বিধি বিধান ও নির্দেশবলির অনুবর্তীও হতে হবে। আর এর কারণেই এখানে বলা হয়েছে يُمَسِّكُوْنَ যার অর্থ হয় দৃঢ়তার সাথে পরিপূর্ণভাবে ধরা। অর্থাৎ তার সমস্ত বিধিবিধানের অনুশীলন করা।

তৃতীয়ত লক্ষণীয় বিষয় হলো এই যে, এখানে তাওরাতের বিধি-বিধানের অনুবর্তিতার কথা বলা হয়েছিল আর তাওরাতের বিধিনিষেধ একটি দুটি নয় শত শত। সেগুলোর মধ্যে এখানে একটিমাত্র বিধান নামাজ প্রতিষ্ঠা করার কথা বলেই ক্ষান্ত করা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আল্লাহর কিতাবের বিধিবিধানসমূহের মধ্যে সর্বোত্তম ও গুরুত্বপূর্ণ বিধান হলো নামাজ। তদুপরি নামাজের অনুবর্তিতা আসমানি বিধানসমূহের অনুবর্তিতার বিশেষ লক্ষণ। এরই মাধ্যমে চেনা যায় কে কৃতজ্ঞ আর কে কৃতঘ্ন। আর এর নিয়মানুবর্তিতার একটা বিশেষ কার্যকারিতাও রয়েছে যে, যে লোক নামাজে নিয়মানুবর্তী হয়ে যাবে তার জন্য অন্যান্য বিধিবিধানের নিয়মানুবর্তিতাও সহজ হয়ে যায়। পক্ষান্তরে যে লোক নামাজের ব্যাপারে নিয়মানুবর্তী নয়, তার দ্বারা অন্যান্য বিধিবিধানের নিয়মানুবর্তিতাও সম্ভব হয় না। সহীহ হাদীসে রাসূলে কারীম ﷺ-এর ইরশাদ রয়েছে নামাজ হলো দীনের স্তম্ভ, যার উপরে তার ইমারত রচিত হয়েছে, যে ব্যক্তি এই স্তম্ভকে প্রতিষ্ঠিত রেখেছে– সে দীনকে প্রতিষ্ঠিত রেখেছে, যে এ স্তম্ভকে বিধ্বস্ত করেছে, সে গোটা দীনের ইমারতকে বিধ্বস্ত করে দিয়েছে।

সে কারণেই এ আয়াতে وَالَّذِيْنَ يُمَسِّكُوْنَ بِالْكِتٰبِ -এর পরে وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ বলে এ কথাই বাতলে দেওয়া হয়েছে যে, দৃঢ়তার সাথে কিতাব অবলম্বনকারী এবং তার অনুবর্তী তাকেই বলা যাবে যে সমুদয় শর্ত মোতাবেক নিয়মানুবর্তিতার সাথে নামাজ আদায় করে। আর যে নামাজের ব্যাপারে গাফলতি করে, সে যত তাসবীহ অজিফাই পড়ুক কিংবা যত মুজাহাদা সাধনাই করুক না কেন আল্লাহর নিকট সে কিছুই নয়। এমনকি তার যদি কারামত কাশফও হয় তবুও তার কোনো গুরুত্ব আল্লাহর কাছে নেই।

ধর্মের ব্যাপারে বাধ্যবাধকতা না থাকার প্রকৃত মর্ম ও কয়েকটি সন্দেহের উত্তর : এখানে একটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য যে, কুরআন মাজীদের পরিষ্কার ঘোষণা রয়েছে যে, لَآ اِكْرَاهَ فِي الدِّيْنِ অর্থাৎ দীনের ব্যাপারে কোনো জবরদস্তি বা বাধ্যতামূলকভাবে সত্যধর্ম গ্রহণে বাধ্য করা যেতে পারে। অথচ আলোচ্য এই ঘটনায় পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে যে, দীন কবুল করার জন্য বনী ইসরাঈলদেরকে বাধ্য করা হয়েছে।

কিন্তু সামান্য একটু চিন্তা করলেই পার্থক্যটা স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, কোনো অমুসলিমকে ইসলাম গ্রহণে কোথাও কখনও বাধ্য করা হয়নি। কিন্তু যে ব্যক্তি মুসলমান হয়ে ইসলামি প্রতিজ্ঞা প্রতিশ্রুতির অনুবর্তী হয়ে যায় এবং তারপরে সে যদি তার বিরুদ্ধাচরণ করতে আরম্ভ করে, তাহলে অবশ্যই তার উপর জবরদস্তি করা হবে এবং এই বিরুদ্ধাচরণের দরুন তাকে শাস্তি দেওয়া হবে। ইসলামি শাস্তি বিধানে এ ব্যাপারে বহুবিধ শাস্তি নির্ধারিত রয়েছে।

শব্দ বিশ্লেষণ

تَعِظُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ اثبات فعل مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْوَعْظُ মূলবর্ণ (و ـ ع ـ ظ) জিনস مثال واوى অর্থ– তোমরা সদুপদেশ দিচ্ছ।

عَتَوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ اثبات فعل ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْعُتُوُّ মূলবর্ণ (ع ـ ت ـ و) জিনস ناقص واوى অর্থ– তারা অহংকার করল।

نُهُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى مجهول বাব سَمِعَ মাসদার اَلنَّهْىُ মূলবর্ণ (ن ـ ه ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– তাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে।

بَلَوْنَا : সীগাহ جمع متكلم বহছ اثبات فعل ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْبَلَاءُ মূলবর্ণ (ب ـ ل ـ و) জিনস ناقص واوى অর্থ– আমি পরীক্ষা করেছি।

مِيْثَاقٌ : শব্দটি একবচন; বহুবচন مواثيق অর্থ– অঙ্গীকার, প্রতিশ্রুতি।

حَقٌّ : শব্দটি একবচন; বহুবচন حقوق অর্থ– ন্যায়।

لَانُضِيْعُ : সীগাহ جمع متكلم বহছ اثبات فعل مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِضَاعَةُ মূলবর্ণ (ض ـ ى ـ ع) জিনস اجوف يائى অর্থ– আমি বিনষ্ট করব না।

اَجْرٌ : শব্দটি একবচন; বহুবচনে اُجُوْرٌ অর্থ– প্রতিদান, প্রতিফল।

www.almodina.com

অনুবাদ : (১৭১) আর এ সময়টিও স্মরণ করুন, যখন আমি পাহাড়কে উত্তোলন করে তাদের উপর ছাদের মতো [শূন্যে] ঝুলিয়ে রাখলাম, আর তাদের বিশ্বাস জন্মিল যে, এখনই তা তাদের উপর পতিত হচ্ছে, [এবং আল্লাহ বলবেন,] যে কিতাব আমি তোমাদেরকে দান করেছি, তা দৃঢ়তার সাথে গ্রহণ কর, এবং ঐ নির্দেশনাবলি স্মরণ রাখ যা তাতে রয়েছে, যা দ্বারা আশা করা যায় যে, তোমরা মুত্তাকী হবে।	وَاِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَاَنَّهٗ ظُلَّةٌ وَّظَنُّوْٓا اَنَّهٗ وَاقِعٌۢ بِهِمْ ۚ خُذُوْا مَآ اٰتَيْنٰكُمْ بِقُوَّةٍ وَّاذْكُرُوْا مَا فِيْهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ (١٧١)
(১৭২) আর যখন আপনার রব আদম সন্তানগণের পৃষ্ঠ হতে তাদের বংশধরদেরকে বের করলেন এবং তাদের হতে তাদেরই সম্বন্ধে স্বীকারোক্তি নিলেন, আমি কি তোমাদের রব নই? সকলেই বলল, হ্যাঁ! আমরা সকলে সাক্ষী রইলাম, [এটা এজন্য যে,] যেন তোমরা কিয়ামত দিবসে এরূপ বলতে না পার যে, আমরা তো এটা হতে সম্পূর্ণ বে-খবর ছিলাম।	وَاِذْ اَخَذَ رَبُّكَ مِنْۢ بَنِيْٓ اٰدَمَ مِنْ ظُهُوْرِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَاَشْهَدَهُمْ عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ ۚ اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ؕ قَالُوْا بَلٰى ۛۚ شَهِدْنَا ۛۚ اَنْ تَقُوْلُوْا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اِنَّا كُنَّا عَنْ هٰذَا غٰفِلِيْنَ (١٧٢)
(১৭৩) অথবা এরূপ বলতে না পার যে, শিরক তো আমাদের পূর্বপুরুষেরা করেছিল, আর আমরা হচ্ছি তাদের পরবর্তী বংশধর; তবে কি আপনি সেই বিপথগামীদের কর্মের দরুন আমাদেরকে ধ্বংস করে দিবেন?	اَوْ تَقُوْلُوْٓا اِنَّمَآ اَشْرَكَ اٰبَآؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّنْۢ بَعْدِهِمْ ۚ اَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُوْنَ (١٧٣)
(১৭৪) আর আমি এরূপেই আয়াতগুলোকে স্পষ্টরূপে বর্ণনা করি, আর যেন তারা ফিরে আসে।	وَكَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ (١٧٤)

শাব্দিক অনুবাদ

(১৭১) وَاِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ আর এ সময়টিও স্মরণ করুন, যখন আমি পাহাড়কে উত্তোলন করে ঝুলিয়ে রাখলাম فَوْقَهُمْ তাদের উপর كَاَنَّهٗ ظُلَّةٌ ছাদের মতো [শূন্যে] وَّظَنُّوْٓا আর তাদের বিশ্বাস জন্মিল যে اَنَّهٗ وَاقِعٌۢ بِهِمْ এখনই তা তাদের উপর পতিত হচ্ছে ; خُذُوْا তা গ্রহণ কর مَآ اٰتَيْنٰكُمْ যে কিতাব আমি তোমাদেরকে দান করেছি بِقُوَّةٍ দৃঢ়তার সাথে ; وَّاذْكُرُوْا مَا فِيْهِ এবং ঐ নির্দেশনাবলি স্মরণ রাখ যা তাতে রয়েছে لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ যা দ্বারা আশা করা যায় যে, তোমরা মুত্তাকী হবে।

(১৭২) وَاِذْ اَخَذَ رَبُّكَ আর যখন আপনার রব বের করলেন مِنْۢ بَنِيْٓ اٰدَمَ مِنْ ظُهُوْرِهِمْ আদম সন্তানগণের পৃষ্ঠ হতে ذُرِّيَّتَهُمْ তাদের বংশধরদেরকে ; وَاَشْهَدَهُمْ عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ এবং তাদের হতে তাদেরই সম্বন্ধে স্বীকারোক্তি নিলেন اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ আমি কি তোমাদের রব নই? قَالُوْا সকলেই বলল بَلٰى হ্যাঁ! شَهِدْنَا আমরা সকলে সাক্ষী রইলাম। اَنْ تَقُوْلُوْا যেন তোমরা এরূপ বলতে না পার যে يَوْمَ الْقِيٰمَةِ কিয়ামত দিবসে اِنَّا كُنَّا عَنْ هٰذَا غٰفِلِيْنَ আমরা তো এটা হতে সম্পূর্ণ বে-খবর ছিলাম।

(১৭৩) اَوْ تَقُوْلُوْٓا অথবা এরূপ বলতে না পার যে اِنَّمَآ اَشْرَكَ اٰبَآؤُنَا مِنْ قَبْلُ শিরক তো আমাদের পূর্বপুরুষেরা করেছিল وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّنْۢ بَعْدِهِمْ ; আর আমরা হচ্ছি তাদের পরবর্তী বংশধর اَفَتُهْلِكُنَا তবে কি আপনি আমাদেরকে ধ্বংস করে দিবেন بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُوْنَ সেই বিপথগামীদের কর্মের দরুন?

(১৭৪) وَكَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ ; আর আমি এরূপেই আয়াতগুলোকে স্পষ্টরূপে বর্ণনা করি وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ আর যেন তারা ফিরে আসে।

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَاَ الَّذِيْٓ اٰتَيْنٰهُ اٰيٰتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَاَتْبَعَهُ الشَّيْطٰنُ فَكَانَ مِنَ الْغٰوِيْنَ (١٧٥)

অনুবাদ : (১৭৫) আর এদেরকে সেই ব্যক্তির অবস্থা পাঠ করে শুনিয়ে দিন, যাকে আমি আমার আয়াতগুলো প্রদান করেছিলাম, অনন্তর সে তা হতে সম্পূর্ণরূপে বের হয়ে পড়ল, অতএব, শয়তান তার পিছনে লেগে গেল, ফলে সে বিপথগামীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল।

وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنٰهُ بِهَا وَلٰكِنَّهٗٓ اَخْلَدَ اِلَى الْاَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوٰىهُ ۚ فَمَثَلُهٗ كَمَثَلِ الْكَلْبِ ۚ اِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ اَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ؕ ذٰلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا ۚ فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ (١٧٦)

(১৭৬) আর যদি আমি ইচ্ছা করতাম তবে তাকে সেই আয়াতসমূহের কল্যাণে উচ্চ মর্যাদাশীল করে দিতাম, কিন্তু সে তো দুনিয়ার দিকে আকৃষ্ট হয়ে পড়ল। এবং নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করতে লাগল। ফলতঃ তার অবস্থা কুকুরের মতো হয়ে গেল, তুমি যতি তাকে আক্রমণ কর, তবুও হাঁপাতে থাকে অথবা যদি তাকে [নিজ অবস্থায়] ছেড়ে দাও, তবুও হাঁপাতে থাকে। এ অবস্থাই হলো সেই লোকদের যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে, অতএব, আপনি এই অবস্থাটি বর্ণনা করে দিন, হয়তো তারা কিছুটা চিন্তা করে দেখবে।

سَآءَ مَثَلَا ۨالْقَوْمُ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَاَنْفُسَهُمْ كَانُوْا يَظْلِمُوْنَ (١٧٧)

(১৭৭) ঐ লোকদের অবস্থাও মন্দ যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে, বস্তুতঃ তারা নিজেদেরই ক্ষতি করে।

مَنْ يَّهْدِ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِيْ ۚ وَمَنْ يُّضْلِلْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ (١٧٨)

(১৭৮) আল্লাহ পাক যাকে পথ প্রদর্শন করেন সেই ব্যক্তিই পথ প্রাপ্ত হয়, আর তিনি যাকে পথভ্রষ্ট করেন, বস্তুতঃ এরূপ লোকেরাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

শাব্দিক অনুবাদ

(১৭৫) وَاتْلُ عَلَيْهِمْ আর এদেরকে পাঠ করে শুনিয়ে দিন نَبَاَ الَّذِيْٓ اٰتَيْنٰهُ সেই ব্যক্তির অবস্থা যাকে আমি প্রদান করেছিলাম اٰيٰتِنَا আমার আয়াতগুলো فَانْسَلَخَ مِنْهَا অনন্তর সে তা হতে সম্পূর্ণরূপে বের হয়ে পড়ল فَاَتْبَعَهُ الشَّيْطٰنُ অতএব, শয়তান তার পিছনে লেগে গেল فَكَانَ مِنَ الْغٰوِيْنَ ফলে সে বিপথগামীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল।

(১৭৬) وَلَوْ شِئْنَا আর যদি আমি ইচ্ছা করতাম لَرَفَعْنٰهُ بِهَا তবে তাকে সেই আয়াতসমূহের কল্যাণে উচ্চ মর্যাদাশীল করে দিতাম وَلٰكِنَّهٗٓ اَخْلَدَ اِلَى الْاَرْضِ কিন্তু সে তো দুনিয়ার দিকে আকৃষ্ট হয়ে পড়ল وَاتَّبَعَ هَوٰىهُ এবং নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করতে লাগল فَمَثَلُهٗ كَمَثَلِ الْكَلْبِ ফলতঃ তার অবস্থা কুকুরের মতো হয়ে গেল اِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ তুমি যতি তাকে আক্রমণ কর, তবুও হাঁপাতে থাকে اَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ অথবা যদি তাকে [নিজ অবস্থায়] ছেড়ে দাও, তবুও হাঁপাতে থাকে ذٰلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ এ অবস্থাই হলো সেই লোকদের الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে فَاقْصُصِ الْقَصَصَ অতএব, আপনি এই অবস্থাটি বর্ণনা করে দিন لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ হয়তো তারা কিছুটা চিন্তা করে দেখবে?

(১৭৭) سَآءَ مَثَلَا الْقَوْمُ ঐ লোকদের অবস্থাও মন্দ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে وَاَنْفُسَهُمْ كَانُوْا يَظْلِمُوْنَ বস্তুতঃ তারা নিজেদেরই ক্ষতি করে।

(১৭৮) مَنْ يَّهْدِ اللّٰهُ আল্লাহ তা'আলা যাকে পথ প্রদর্শন করেন فَهُوَ الْمُهْتَدِيْ সেই ব্যক্তিই পথ প্রাপ্ত হয় وَمَنْ يُّضْلِلْ আর তিনি যাকে পথভ্রষ্ট করেন فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ বস্তুতঃ এরূপ লোকেরাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

www.almodina.com

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(১৭২) قوله وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِيٓ ءَادَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** আল্লাহ তা'আলা রুহ জগতে হযরত আদম (আ.)-কে সৃষ্টি করার পর যেরূপ তাকে ফেরেশতার দ্বারা সেজদা করিয়েছিলেন এবং যাবতীয় জ্ঞান দান করে পৃথিবীতে তার প্রতিনিধি মনোনীত করেছিলেন, তদ্রূপ হযরত আদম (আ.)-এর পৃষ্ঠদেশ হতে দুনিয়ায় আগত সমগ্র মানুষকে জীবন চেতনা ও বিবেক এবং বাকশক্তি দান করে বের করেছিলেন। আর আল্লাহ সমুদয় কুদরত, ক্ষমতা ও সৃষ্টি রহস্য অবলোকন করে মানবকুলের নিকট এ জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আমি কি তোমাদের প্রভু নই? তখন সমস্ত মানবকুলই স্বীকার করেছিল যে, হ্যাঁ আপনি আমাদের প্রভু! আপনি ব্যতীত আর আমাদের কোনো প্রতিপালক নেই। উপরিউক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা এ ঘটনার প্রতিশ্রুতি প্রদানের কথাই স্মরণ করে দিয়েছিলেন। অতএব, তোমরা সে প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করো এবং পরকালের জবাবদিহির জন্য প্রস্তুত হও।

আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের মতে রুহ জগতে এরূপ ঘটনা হওয়া এবং মানবকুল হতে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করা স্বাভাবিক ব্যাপার। কিন্তু মু'তাযিলা সম্প্রদায় এ ঘটনার বাস্তবতা স্বীকার করে না। তারা একে একটি ব্যাপক ঘটনা বলে থাকে। তাদের মতে এরূপ ঘটনা হওয়ার এবং প্রতিশ্রিুতি নেওয়ার কোনো প্রয়োজন ছিল না।

(১৭৫) قوله وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِيٓ ءَاتَيْنَٰهُ ءَايَٰتِنَا الخ **আয়াতের শানে নুযূল– ১ :** হযরত সাঈদ ইবনে মুসায়্যিব বলেন, আলোচ্য আয়াত আবূ আমের ইবনে সাঈফী সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। জাহিলিয়া যুগে সে মাসিহী পোশাক পরিধান করেছিল। অতঃপর নবী (আ.)-কে অস্বীকার করল। সে মদিনায় নবী করীম ﷺ-এর নিকট গমন করে বলল, হে মুহাম্মদ! আপনি কোন ধর্ম নিয়ে এসেছেন? রাসূল ﷺ বললেন, সঠিক সরল দীনে ইবরাহীমী নিয়ে এসেছি। তখন সে বলল, আমিও তো ইবরাহীমী ধর্মে রয়েছি। রাসূল ﷺ জবাবে বললেন, তুমি তাতে ছিলে না; বরং তুমি তাতে প্রবেশ করেছ। ফলে আবূ আমের বলল, আল্লাহ সকল মিথ্যুককে মৃত্যু দান করেছেন। রাসূল ﷺ বললেন, অবশ্য অনুরূপভাবে আমাদের মধ্যকার মিথ্যুককেও মৃত্যুদান করেছেন। সে যখন মক্কা থেকে বের হয়েছিল, তখন এমন বলেছিল। অতঃপর সে সিরিয়া চলে গিয়ে মুনাফিকদের নামে পত্র লিখল যে, তোমরা প্রস্তুতি গ্রহণ করে থাক, আমি কায়সারের পক্ষ থেকে সৈন্য নিয়ে তোমাদের নিকট আসব মুহাম্মদকে মদিনা থেকে বহিষ্কার করার জন্য। অতঃপর সে সিরিয়াতে একা থেকেই মৃত্যুবরণ করে। সেই নরাধম সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। –[কুরতুবী-২৮১/১]

শানে নুযূল– ২ : হযরত উবাদা ইবনে সামেত (রা.) বলেন, আলোচ্য আয়াত কুরাইশ সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা সেই নিদর্শনই তাদের সামনে দিয়েছেন মুহাম্মদ ﷺ–এর প্রতি তিনি যা নাজিল করেছেন। বস্তুত তারা তা থেকে কেটে পরে তারা তা গ্রহণ করেনি। তাদের এহেন বিভ্রান্তির প্ররিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[কুরতুবী-২২৮/৭]

"أَلَسْتُ" সংক্রান্ত প্রতিশ্রুতির বিশ্লেষণ : এ আয়াতগুলোতে মহা প্রতিজ্ঞা ও প্রতিশ্রুতির কথা আলোচনা করা হয়েছে যা স্রষ্টা ও সৃষ্টি এবং দাস ও মনিবের মাঝে সেসময় হয়েছিল, যখন এই দাঙ্গা বিক্ষুব্ধ পৃথিবীতে কোনো সৃষ্টি আসেওনি। যাকে বলা হয় عَهْدِ أَلَسْتُ বা عَهْدِ أَزَلْ

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সমগ্র বিশ্বের স্রষ্টা ও অধিপতি। আকাশ ও ভূমণ্ডলের মাঝে অথবা এসবের বাইরে যা কিছু রয়েছে সবই তাঁর সৃষ্টি ও অধিকারভুক্ত। তিনিই এসবের মালিক। না তাঁর উপর কারো কোনো বিধান টলতে পারে, আর নাই বা থাকতে পারে তাঁর কোনো কাজের উপর কারও কোনো প্রশ্ন করার অধিকার।

কিন্তু তিনি নিজের একান্ত অনুগ্রহে বিশ্বব্যবস্থাকে এমনভাবে তৈরি করেছেন যে, প্রত্যেকটি বস্তুর জন্য একটি নিয়ম, একটা বিধিব্যবস্থা রয়েছে। নিয়ম ও বিধিব্যবস্থা অনুযায়ী যারা চলবে তাদের জন্য নির্ধারিত রয়েছে স্থায়ী ও সুখ ও শান্তি। আর তার বিপরীতে যারা তার বিরুদ্ধচারী তাদের জন্য রয়েছে সব রকমের আজাব ও শাস্তি।

তাছাড়া বিরুদ্ধাচরণকারী অপরাধীকে শাস্তি দেওয়ার জন্য তার নিজস্ব সর্বব্যাপক জ্ঞানই যথেষ্ট ছিল, যা সমগ্র বিশ্বের প্রতিটি অণু পরামাণুকে পর্যন্ত অন্তর্ভুক্ত করে নেয় এবং সে জ্ঞানের সামনে গোপন ও প্রকাশ্য যাবতীয় কাজ কর্ম; বরং মনের গোপন ইচ্ছে পর্যন্ত সম্পূর্ণ বিকশিত। কাজেই আমলনামা লিখে রাখার জন্য কোনো পরিদর্শক নিয়োগ করা, আমলনামা তৈরি করা, আমলনামাসমূহের ওজন দেওয়া এবং সেজন্য সাক্ষী সাবুদ দাঁড় করানোর কোনো প্রয়োজনীয়তাই ছিল না।

www.almodina.com

কিন্তু তিনিই তাঁর বিশেষ অনুগ্রহের দারুন এ ইচ্ছাও করলেন যে, কোনো লোককে ততক্ষণ পর্যন্ত শাস্তি দেবেন না, যতক্ষণ না তার বিরুদ্ধে লিখিত-পড়িত প্রমাণ এবং অনস্বীকার্য সাক্ষী-সাবুদের মাধ্যমে সে অপরাধ তার সামনে এমনভাবে এসে যায়, যেন সে নিজেও নিজেকে অপরাধী বলে স্বীকার করে এবং নিজেকে যথার্থই শাস্তিযোগ্য মনে করে।

সে জন্যই প্রতিটি মানুষের সঙ্গে তার প্রতিটি আমল এবং প্রতিটি বাক্য লেখার জন্য ফেরেশতা নিয়োগ করে দিয়েছেন। বলা হয়েছে– مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ অর্থাৎ এমন কেনো বাক্য মানুষের মুখ থেকে উচ্চারিত হয় না, যার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে পরিদর্শক ফেরেশতা নিয়োগ করে দিয়েছেন। বলা হয়েছে– وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ অর্থৎ মানুষের প্রতিটি ছোট বড় কাজ লিখিত রয়েছে।

অতঃপর হাশর ময়দানে ন্যায়বিচারের মানদণ্ড স্থাপন করে মানুষের সৎ ও অসৎ কর্মের ওজন দেওয়া হবে। যদি সৎকর্মের পাল্লা ভারী হয়ে যায়, তাহলে সে মুক্তি পাবে। আর যদি পাপের পাল্লা ভারী হয়ে যায়, তাহলে আজাবে ধরা পড়বে।

এছাড়া মহাবিচারকের দরবার যখন হাশরের মাঠে স্থাপিত হবে, তখন প্রত্যেকের কাজ কর্মের উপর সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে। কেনো কোনো অপরাধী সাক্ষীদেরকে মিথ্যা বলে দাবি করবে, তখন তারই হাত পা এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গ থেকে এবং সে ভূমি ও স্থান থেকে সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে, যার দ্বারা এবং যেখানে সে এ অপরাধমূলক কাজ করেছিল। সেগুলো আল্লাহর নির্দেশক্রমে সত্য সঠিক ঘটনা বাতলে দেবে। এমনকি তখন অপরাধীদের মিথ্যা প্রতিপন্ন করা কিংবা অস্বীকার করার কোনো সুযোগই থাকবে না। তারা স্বীকার করবে– فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ মহান করুণাময় প্রভু ন্যায়বিচার অনুষ্ঠানের এ ব্যবস্থা করেই ক্ষান্ত হননি এবং পার্থিব রাষ্ট্রসমূহের মতো নিছক একটা পদ্ধতি ও আইনই শুধু তাদেরকে দিয়ে দেননি; বরং আইনের সঙ্গে একটা ধারাবাহিক বাস্তবায়ন ব্যবস্থাও স্থাপন করেছেন।

একজন অনন্য সাধারণ স্নেহপরায়ণ পিতা যেমন নিজের পারিবারিক ব্যবস্থার সুষ্ঠুতা বিধানের উদ্দেশ্যে এবং পরিবার-পরিজনকে ভদ্রতা ও শিষ্টাচার শেখাবার জন্য কিছু পারিবারিক নিয়মপদ্ধতি ও রীতিনীতি তৈরি করেন যে, যে-ই এর বিরুদ্ধাচরণ করবে সেই শাস্তিপ্রাপ্ত হবে। কিন্তু তার (পিতার) স্নেহ ও অনুগ্রহ তাকে এমন ব্যবস্থা স্থাপনেও উদ্বুদ্ধ করে, যাতে কেউ শাস্তি যোগ্য না হয়; বরং সবাই যেন সেই নিয়মপদ্ধতি মোতাবেক চলতে পারে। বাচ্চার জন্য যদি সকালবেলা স্কুলে যাওয়ার নির্দেশ থাকে এবং তার বিরুদ্ধাচরণের জন্য যদি শাস্তি নির্ধারিত থাকে, তাহলে পিতা ভোর হতেই এ চিন্তাও করেন, যাতে বাচ্চা তার কাজটি করার জন্য সময়ের আগেই তৈরি হয়ে যেতে পারে।

সৃষ্টির প্রতি আল্লাহর রাব্বুল আলামীনের রহমত মাতা পিতার দয়া ও করুণার চেয়ে বহুগুণ বেশি। কাজেই তিনি তার কিতাবকে শুধু আইন কানুন ও শাস্তিবিধি হিসেবেই তৈরি করে দেননি; বরং একটি নির্দেশনামাও বানিয়েছেন এবং প্রতিটি আইনের সাথে সাথে এমন সব নিয়ম পদ্ধতি লিখে দিয়েছেন, যেগুলোর মাধ্যমে আইনের উপর আমল করা সহজ হয়ে যায়।

ঐশী এ ব্যবস্থার তাগিদেই তিনি নিজে নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন, তাঁদের সাথে পাঠিয়েছেন আসমানি নির্দেশনামা। এক বিরাট সংখক ফেরেশতাকে সৎকর্মের প্রতি পথ প্রদার্শনের জন্য এবং সৎকর্মে সাহায্য করার জন্য নিয়োজিত করে দিয়েছেন।

এই ঐশী ব্যবস্থারই একটা তাগিদ ছিল, প্রত্যেকটি জাতি ও সম্প্রদায়কে অবহেলা থেকে সজাগ করার এবং নিজের মহান পালনকর্তাকে স্মরণ করার জন্য বিভিন্ন উপকরণ তৈরি করে দেওয়া, আসমান ও জমিনের সমস্ত সৃষ্টি রাত ও দিনের পরিবর্তন এবং স্বয়ং মানুষের নিজস্ব পরিমণ্ডলে তাকে স্মরণ করিয়ে দেওয়ার মতো এমনসব নিদর্শন স্থাপন করে দেওয়া যে, যদি সামান্য সচেতনতা অবলম্বণ করা যায়, তাহলে কোনো সময় স্বীয় মালিককে ভুলবে না। তাই বলা হয়েছে– وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ অর্থাৎ যারা দৃষ্টিমান তাদের জন্য পৃথিবীতে আমার নিদর্শন রয়েছে। আর স্বয়ং তোমাদের সত্তার মাঝেও (নিদর্শন রয়েছে)। তারপরেও কি তোমরা দেখছ না?

তা ছাড়া যারা গাফেল তাদেরকে সজাগ করার জন্য এবং সৎকাজে নিয়োজিত করার জন্য রাব্বুল আলামীন একটি ব্যবস্থা এটাও করেছেন, যে ব্যক্তি, দল ও জাতিসমূহের কাছ থেকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সমসয়ে নবী-রাসূলগণের মাধ্যমে প্রতিজ্ঞা প্রতিশ্রুতি আদায় করে তাদেরকে আইনের অনুবর্তিতার জন্য প্রস্তুত করেছেন।

কুরআন মাজীদের একাধিক আয়াতে বহু প্রতিজ্ঞা-প্রতিশ্রুতির কথা আলোচনা করা হয়েছে, যা বিভিন্ন দল ও সম্প্রদায়ের কাছ থেকে বিভিন্ন সময়ে ও অবস্থায় আদায় করা হয়েছে। নবী-রাসূলগণের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি নেওয়া হয়েছে, তারা যেন আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে প্রাপ্ত রেসালাতের বাণীসমসূহ অবশ্যই উম্মতকে পৌছে দেন। এতে যেন কারো ভয়

www.almodina.com

ভীতি মানুষের অপমান ও ভর্ৎসনার কেনো আশঙ্কাই তাঁদের জন্য অন্তরায় না হয়। আল্লাহর এই পবিত্র দল নিজেদের এই প্রতিশ্রুরি হক পরিপূর্ণভাবে সম্পাদন করেছেন। রেসালাতের বাণী পৌছাতে গিয়ে তাঁরা নিজেদের সবকিছু কুরবান করে দিয়ছেন।

এমনিভাবে প্রত্যেক রাসূল ও নবীর উম্মতের কাছ থেকেও প্রতিশ্রুতি নেওয়া হয়েছে যে, তারাও নিজ নিজ নবী রাসূলের যথাযথ অনুসরণ করবে। তারপর প্রতিশ্রুতি নেওয়া হয়েছে বিশেষ বিশেষ বিষয়ে এবং বিশেষভাবে সেগুলো সম্পদান করতে গিয়ে নিজের পূর্ণ শক্তি ও সামর্থ্যকে ব্যয় করার জন্য– যা কেউ পূরণ করেছে, কেউ পূরণ করেনি।

এসব প্রতিশ্রুতির মধ্যে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিশ্রুতি হলো সে প্রতিশ্রুতিটি যা আমাদের রাসূল ﷺ সম্পর্কে সমস্ত নবী রাসূলগণের কাছ থেকে নেওয়া হয়েছে যে, তারা নবীয়ে উম্মী খাতামুল আম্বিয়া ﷺ -এর অনুসরণ করবেন। আর যখনই সুযোগ পাবেন, তাঁকে সাহায্য সহায়তা করবেন। যার আলোচনা নিম্নের আয়াতে করা হয়েছে– وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ النَّبِيّٖنَ لَمَآ اٰتَيْتُكُمْ مِّنْ كِتٰبٍ وَّحِكْمَةٍ এ সমুদয় প্রতিজ্ঞা প্রতিশ্রুতিই হলো আল্লাহ রাবাবুল আলামীনের পরিপূর্ণ রহমতের বিকাশ। এগুলোর উদ্দেশ্য হলো এই যে, মানুষ যারা অত্যন্ত মনভোলা, প্রায়ই যারা নিজেদের কর্তব্যকর্ম ভুলে যায়, তাদেরকে বার বার এসব প্রতিজ্ঞা প্রতিশ্রুতির মাধ্যমে সতর্ক করে দেওয়া, যাতে সেগুলোর বিরুদ্ধাচরণ করে তারা ধ্বংসের সম্মুখীন না হয়।

বায়আত গ্রহণের তাৎপর্য : নবী রাসূল এবং তাঁদের প্রতিনিধি ওলামা ও মাশায়েখগণের মাঝে বায়আত গ্রহণের যে রীতি প্রচলিত রয়েছে, তাও এই ঐশী রীতিরই অনুসরণ। স্বয়ং রাসূলে কারীম ﷺ ও বিভিন্ন ব্যাপারে সাহাবীগণ (রা.)–এর নিকট থেকে বায়আত গ্রহণ করেছেন। সেসব বায়আতের মধ্যে 'বায়আতে রেদওয়ান' এর কথা কুরআন কারীমে আলোচনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে– لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ অর্থাৎ আল্লাহ তাঁদের উপর সন্তুষ্ট হয়েছেন, যারা বিশষ গাছের নিচে আপনার হাতে বায়আত নিয়েছেন।

হিজরতের পূর্বে মদিনার আনসারগণের বায়আতে 'আকাবা'–ও এমনি ধরনের প্রতশ্রিুতির অন্তর্ভুক্ত।

বহু সাহাবীর নিকট থেকে ঈমান ও সৎকর্মের নিষ্ঠার ব্যাপারে বায়আত নেওয়া হয়েছে। মুসলমান সূফী সম্প্রদায়ে যে বায়আত প্রচলিত রয়েছে, তাও ঈমান সৎকর্মে নিয়মানুবর্তিতা এবং পাপাচার থেকে বিরত থাকারই আনুষ্ঠানিক প্রতিশ্রুতি এবং আল্লাহর ও নবী-রাসূলগণের সে রীতিরই অনুসরণ। আর সে কারণেই এতে বিশেষ বরকত রয়েছে। এতে মানুষ পাপাচার থেকে বেঁচে থাকার এবং শরিয়তের নির্দেশাবলি যথাযথ পালনের সৎসাহস ও সামর্থ্য লাভ করতে পারে। বায়আতের তাৎপর্য জানার সঙ্গে সঙ্গে একথাও স্পষ্ট হয়ে গেল' যে, বর্তমানে যে ধরনের বায়আত সাধারণভাবে অজ্ঞ ও মূর্খদের মাঝে প্রচলিত হয়ে গেছে যে, কোনো বুযুর্গের হাতে হাত রেখে দেওয়াকেই মুক্তির জন্য যথেষ্ট বলে ধারণা করা হয় তা সম্পূর্ণই মূর্খতা। বায়আত হলো একটি চুক্তি বা প্রতিশ্রুতির নাম । তখনই এর উপকারিতা লাভ হবে, যখন এ চুক্তি কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করা হবে। অন্যথায় এতে মহাবিপদের আশঙ্কা।

সূরা আ'রাফের বিগত আয়াতগুলোতে সে প্রতিশ্রুতির বিষয় আলোচিত হয়েছে যা বনী ইসরাঈলদের কাছ থেকে তাওরাতের বিধিবিধানের অনুবর্তিতার ব্যাপারে গ্রহণ করা হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতে সেই বিশ্বজনীন প্রতিশ্রুতির কথা বর্ণনা করা হচ্ছে, যা সমস্ত আদম সন্তানের কাছ থেকে এই দুনিয়ায় আসারও পূর্বে সৃষ্টিলগ্নে নেওয়া হয়েছিল। যা সাধারণ ভাষায় عَهْدِ اَلَسْتُ (আহদে আলাস্তু) বলে প্রসিদ্ধ।

وَاِذْ اَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِيْٓ اٰدَمَ مِنْ ظُهُوْرِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَاَشْهَدَهُمْ عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ এ আয়াতগুলোতে আদম সন্তানদের বুঝাবার জন্য ذُرِّيَّت শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। ইমাম রাগেব ইসফাহানী বলেন যে, এ শব্দটি প্রকৃতপক্ষে ذرا (যরউন) থেকে গঠিত । যার অর্থ সৃষ্টি করা। কুরআন কারীমে কয়েক জায়গায় এ শব্দটি এ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন وَلَقَدْ ذَرَاْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيْرًا প্রভৃতি। কাজেই 'যুররিয়্যাৎ' -এর শাব্দিক তরজমা হলো সৃষ্টি। এ শব্দটি দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এই প্রতিশ্রুতি সে সমস্ত মানুষেরই ব্যাপক ও প্রসারিত যারা আদম (আ.)–এর মাধ্যমে এ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছে ও করবে।

হাদীসের রেওয়ায়েতে এই আদি প্রতিশ্রুতির আরও কিছু বিস্তারিত আলোচনা এসেছে। যথা–

ইমাম মালেক, আবূ দাউদ, তিরমিযী ও ইমাম আহমদ (র.) মুসলিম ইবনে ইয়াসারের বরাত উদ্ধৃত করেছেন, যে কিছু লোক হযরত ফারূকে আ'যম (রা.) -এর নিকট এ আয়াতটির মর্ম জিজ্ঞেস করে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এ আয়াতটির মর্ম জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। তাঁর কাছে যে উত্তর আমি শুনেছি তা হলো এই–

'আল্লাহ তা'আলা সর্বপ্রথম হযরত আদম (আ.) -কে সৃষ্টি করেন। তারপর নিজের কুদরতের হাত যখন তাঁর পিঠে বুলিয়ে দিলেন, তখন তাঁর ঔরসে যত সৎমানুষ জন্মাবার ছিল তারা সব বেরিয়ে এলো। তখন তিনি বললেন, এদেরকে আমি জান্নাতের জন্য সৃষ্টি করেছি এবং এরা জান্নাতেরই কাজ করবে। পুনরায় দ্বিতীয়বার তাঁর পিঠে কুদরতের হাত বুলালেন। তখন যত পাপী তাপী মানুষ তাঁর ঔরসে জন্মাবার ছিল, তাদেরকে বের করে আনলেন এবং বললেন, এদেরকে আমি দোজখের জন্য সৃষ্টি করেছি এবং এরা দোজখে যাবার মতোই কাজ করবে।' সাহাবীগণের মধ্যে একজন নিবেদন করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! প্রথমেই যখন জান্নাতী ও দোজখী সাব্যস্ত করে দেওয়া হয়েছে, তখন আর আমল করানো হয় কি উদ্দেশ্য? হুজুর ﷺ বললেন, 'যখন আল্লাহ তা'আলা কাউকে জান্নাতের জন্য সৃষ্টি করেন, তখন সে জান্নাত বাসের কাজই করতে শুরু করে। এমনকি তার মৃত্যুও এমন কাজের ভিতরেই হয়, যা জান্নাতবাসীদের কাজ। আর আল্লাহ যখন কাউকে দোজখের জন্য তৈরি করেন, তখন সে দোজখের কাজই করতে আরম্ভ করে। এমন কি তার মৃত্যুও এমন কাজের মাধ্যমেই হয়, যা জাহান্নামের কাজ।'

অর্থাৎ মানুষ যখন জানে না যে, সে কোন শ্রেণিভুক্ত, তখন তার পক্ষে নিজের সামর্থ্য শক্তি ও ইচ্ছাকে এমন কাজেই ব্যয় করা উচিত যা জান্নাতবাসীদের কাজ, আর এমন আশাই পোষণ করা কর্তব্য যে, সেও তাদেরই অন্তর্ভুক্ত হবে।

ইমাম আহমদ (র.)-এর রেওয়ায়েতে বিষয়টি হযরত আবুদ্দারদা (রা.) -এর উদ্ধৃতিতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, প্রথমবারে যারা হযরত আদম (আ.)-এর ঔরস থেকে বেরিয়ে এসেছিল তারা ছিল শ্বেতবর্ণ যাদেরকে বলা হয়েছে জান্নাতবাসী। আর দ্বিতীয়-বার যারা বেরিয়েছিল তারাই ছিল কৃষ্ণবর্ণ যাদেরকে জাহান্নামসবাসী বলা হয়েছে।

আর তিরমিযীতেও একই বিষয় হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) -এর রেওয়ায়েতে উদ্ধৃত করা হয়েছে। এতে এ কথাও রয়েছে যে, এভাবে কিয়ামত পর্যন্ত জন্মানোর মতো যত আদম সন্তান বেরিয়ে এল, তাদের সবার ললাটে একটা বিশেষ ধরনের দীপ্তি ছিল।

এখন লক্ষণীয় এই যে, এসব হাদীসে তো 'যুররিয়াত' -এর হযরত আদম (আ.) -এর পৃষ্ঠদেশ থেকে নেওয়ার এবং বেরিয়ে আসার কথা উল্লেখ রয়েছে, অথচ কুরআনের শব্দে 'বনী আদম' অর্থাৎ আদম সন্তানের ঔরসে জন্মগ্রহণের কথা বলা হয়েছে। এতদুভয়ের সামঞ্জস্য এই যে, হযরত আদম (আ.)-এর পিঠ থেকে তাদেরকে বের করা হয়েছে যারা সরাসরি আদম (আ.)-এর ঔরসে জন্মগ্রহণ করার ছিল। তারপর তাঁর বংশধরদের পৃষ্ঠদেশ থেকে বের করা হয়েছে।

হাদীসের বর্ণনায় সবাইকে হযরত আদম (আ.)-এর পৃষ্ঠদেশ থেকে বের করার অর্থও এই যে, আদম থেকে তাঁর সন্তানদেরকে, অতঃপর এই সন্তানদের থেকে তাদের সন্তানদেরকে আনুক্রমিকভাবে সৃষ্টি করা হয়।

কুরআন মাজীদে সমস্ত আদম সন্তানের কাছ থেকে যে, স্বীকৃতি নেওয়া হয়েছে বলে উল্লেখ রয়েছে, এতে ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে যে, এই আদম সন্তান, যাদেরকে তখন পৃষ্ঠদেশ থেকে বের করা হয়েছিল, তারা শুধু আত্মাই ছিল না; বরং আত্মা ও শরীরের এমন একটা সমন্বয় ছিল যা শরীরের সুক্ষ্মতর অণু পরমাণুর দ্বারা তৈরি করা হয়েছিল। কারণ পালনকর্তা, বিদ্যমানতা এবং লালন-পালনের প্রয়োজন বেশির ভাগ সে ক্ষেত্রেই দেখা দেয়, যেখানে দেহ ও আত্মার সমন্বয় ঘটে এবং যাকে এক পর্যায় থাকে আরেক পর্যায়ে উন্নীত হতে হয়। রূহ বা আত্মাসমূহের অবস্থা তা নয়। তা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত একই অবস্থায় থাকে। তাছাড়া উল্লিখিত হাদীসসমূহে যে তাদের সাদা ও কালো বর্ণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে কিংবা তাদের ললাটদেশে দীপ্তির বর্ণনা রয়েছে তাতেও বুঝা যায় যে, সেগুলো শুধু অশরীরি আত্মাই ছিল না। রূহ বা আত্মার কোনো রং বা বর্ণ নেই , শরীরের সাথেই এসব গুণ বৈশিষ্ট্যের সম্পর্ক হয়ে থাকে।

এতেও বিস্ময়ের কোনো কারণ নেই যে, কিয়ামত পর্যন্ত জন্মাবার যোগ্য সমস্ত মানুষ এক জায়গায় কেমন করে সমবেত হতে পারল? কারণ হযরত আবুদ্দারদা (রা.)-এর বর্ণিত হাদীসে এ বিষয়েরও বিশ্লেষণ রয়ে গেছে যে, তখন যে আদম সন্তানকে আদমের পৃষ্ঠদেশ থেকে বের করা হয়েছিল, সেগুলো নিজেদের প্রকৃত অবয়বে ছিল না যা নিয়ে তারা পৃথিবীতে আসবে; বরং তখন তারা ছিল ক্ষুদ্র পিঁপড়ার মতো। তাছাড়া বিজ্ঞানে বর্তমান উন্নতির যুগে তো কোনো সমঝদার লোকের এ ব্যাপারে কোনো প্রশ্নই উদয় হওয়া উচিত নয় যে, এত বড় আকার অবয়বসম্পন্ন মানুষ একটি পিঁপড়ার আকৃতিতে কেমন করে বিকাশ লাভ করল। ইদানিং তো একটি অণুর ভিতরে গোটা সৌরজগৎ মণ্ডলীর ব্যবস্থার অস্তিত্ব সম্পর্কে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। ফিল্মের মাধ্যমে একটি বড়র চেয়ে বড় বস্তুকেও একটি বিন্দুর আয়তনে দেখানো যেতে পারে। কাজেই আল্লাহ তা'আলা যদি এই অঙ্গীকার ও প্রতিজ্ঞা-প্রতিশ্রুতির সময় সমস্ত আদম সন্তানকে নিতান্ত ক্ষুদ্র দেহে অস্তিত্ব দান করে থাকেন, তবে তা আর তেমন কঠিন হবে কেন?

www.almodina.com

আদি প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে কয়েকটি প্রশ্ন ও তার উত্তর : এই আদি প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে আরও কয়েকটি লক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। প্রথমত এই প্রতিজ্ঞা প্রতিশ্রুতি কোথায় এবং কখন নেওয়া হয়েছিল?

দ্বিতীয়ত এ অঙ্গীকার যখন এমন অবস্থাতে নেওয়া হয় যে, তখন একমাত্র আদম ছাড়া অন্য কোনো মানুষের জন্মই হয়নি, তখন তাদের জ্ঞান বুদ্ধি কেমন করে হলো, যাতে তারা আল্লাহকে চিনতে পারবে এবং তার পালনকর্তা হওয়ার কথা স্বীকার করবে? কারণ পালনকর্তার কথা সেই স্বীকার করতে পারে, যে পালনকর্তা সম্পর্কে জানবে বা প্রত্যক্ষ করবে। পক্ষান্তরে এই প্রত্যক্ষ করাটা এ পৃথিবীতে জন্মানোর পরেই সম্ভব হতে পারে।

প্রথম প্রশ্ন যে, প্রতিজ্ঞা-প্রতিশ্রুতি কোথায় এবং কখন নেওয়া হয়েছিল এ সম্পর্কে মুফাসসিরে কুরআন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য সনদ সহকারে ইমাম আহমদ, নাসায়ী ও হাকেম (র.) যে রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করেছেন তা হলো এই যে, এই প্রতিজ্ঞা-প্রতিশ্রুতি তখনই নেওয়া হয়, যখন হযরত আদম (আ.)-কে জান্নাত থেকে পৃথিবীতে নামিয়ে দেওয়া হয়। আর এ প্রতিশ্রুতির স্থানটি হলো, 'ওয়াদিয়ে নু'মান' যা পরবর্তীকালে আরাফাতের ময়দান নামে প্রসিদ্ধি ও খ্যাতি লাভ করেছে। –[তাফসীরে মাযহারী]

থাকল দ্বিতীয় প্রশ্ন যে, এই নতুন সৃষ্টি যাকে এখনও উপকরণগত অস্তিত্ব দান করা হয়নি, সে কেমন করে বুঝবে যে, আমাদের কোনো স্রষ্টা ও পালনকর্তা রয়েছেন? এমন অবস্থাতে তাদেরকে প্রশ্ন করাই তাদের উপর অসহনীয় চাপ, তা তারা উত্তর কি দেবে। এর উত্তর হলো এই যে, যে বিশ্বস্রষ্টা তাঁর পরিপূর্ণ ক্ষমাতাবলে সমস্ত মানুষকে একটি অণুর আকারে সৃষ্টি করেছেন, তাঁর পক্ষে তখনও প্রয়োজনানুপাতে তাদেরকে জ্ঞান বুদ্ধি ও চেতনা অনুভূতি দেওয়া কি তেমন কঠিন ব্যাপার ছিল। আর প্রকৃতপক্ষে হয়েও ছিল তাই। আল্লাহ জাল্লা শানুহু সেই ক্ষুদ্র অস্তিত্বের মাঝে যাবতীয় মানবীয় ক্ষমতার সমন্বয় ঘটিয়েছিলেন। তার মধ্যে সবচেয়ে বড় ছিল জ্ঞানানুভূতি।

স্বয়ং মানুষের অস্তিত্বে আল্লাহ তা'আলার মহত্ত্ব ও কুদরতে এমনসব অসংখ্য নিদর্শন রয়েছে, যেগুলো সম্পর্কে গাফেল থাকতে পারে না। কুরআনে রয়েছে– وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ অর্থাৎ 'বিজ্ঞানদের জন্য এ পৃথিবীতে আল্লাহ তা'আলার বহু নিদর্শন রয়েছে। আর স্বয়ং তোমাদের সত্তার মাঝেও (নিদর্শন রয়েছে) তবুও কি তোমরা দেখছ না?'

এখানে তৃতীয় আরেকটি প্রশ্ন হতে পারে যে, এই আদি প্রতিশ্রুতি (আহদে আলাস্তু) যতই নিশ্চিত ও নিঃসন্দেহে হোক না কেন, কিন্তু এ কথাটি তো অন্তত সবাই জানে যে, এ পৃথিবীতে আসার পর এ প্রতিশ্রুতি কারোই স্মরণ থাকেনি। তাহলে প্রতিশ্রুতিতে লাভটা কি হলো?

এর উত্তর এই যে, একে তো এই আদম সন্তাদের মধ্যে অনেক এমন ব্যক্তিবর্গও রয়েছে যারা একথা স্বীকার করেছেন যে, আমাদের এই প্রতিশ্রুতির কথা যথার্থই মনে আছে। হযরত যুন্নুন মিসরী (র.) বলেছেন, এই প্রতিশ্রুতির কথা আমার এমনভাবে স্মরণ আছে, যেন এখনও শুনছি। আর অনেকে তো এমনও বলেছেন যে, যখন এই স্বীকারোক্তি গ্রহণ করা হয়, তখন আমার আশেপাশে কারা কারা উপস্থিত ছিল সে কথাও আমার স্মরণ আছে। তবে একথা বলাই বাহুল্য যে, এমন লোকের সংখ্যা একান্তই বিরল। কাজেই সাধারণ লোকের বুঝার বিষয় হলো এই যে, বহু কাজ থাকে যেগুলোর বৈশিষ্ট্যগত কিছু প্রভাব থেকে যায়, তা কারো স্মরণ থাক বা নাই থাক। এ বিষয়ে কারও ধারণা-কল্পনা না থাকলেও সে তার প্রভাব বিস্তার করবেই। এই প্রতিজ্ঞা-প্রতিশ্রুতির অবস্থাও তেমনি। প্রকৃতপক্ষে এই স্বীকারোক্তি প্রত্যেকটি মানুষের মনে আল্লাহ পরিচিতের একটা বীজ রোপণ করে দিয়েছে, যা ক্রমান্বয়ে লালিত হচ্ছে, সে ব্যাপারে কারও জানা থাক কিংবা না থাক। আর এই বীজেরই ফুল ফসল এই যে, প্রতিটি মানুষের মনেই ঐশী প্রেম ও মহত্ত্বের অস্তিত্ব বিদ্যমান রয়েছে। তার বিকাশ যেভাবেই হোক। চাই পৌত্তলিকতা এবং কতিপয় হতভাগা, যাদের প্রকৃতি বিকৃত হয়ে গিয়ে তাদের জ্ঞান ও রুচিবোধ বিনষ্ট হয়ে গেছে এবং তিক্ত মিষ্টির পার্থক্য করাও যাদের দ্বারা সম্ভব নয়, তাদের ছাড়া সমগ্র দুনিয়ার শত শত কোটি মানুষ আল্লাহর ধ্যান, তাঁর কল্পনা ও মহিমান্বিত অস্তিত্বের অনুভূতি থেকে শূন্য নয়। অবশ্য যদি কেউ জৈবিক কামনা বাসনায় মোহিত হয়ে অথবা কোনো গোমরাহ ও ভ্রষ্ট সমাজ পরিবেশের কবলে পড়ে সেই সহজাত বৃত্তিকে ভুলে যায়, তবে তা স্বতন্ত্র কথা। মহানবী ﷺ ইরশাদ করেছেন– كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ কোনো কোনো বর্ণনায় রয়েছে– عَلَى هٰذِهِ الْمِلَّةِ। (বুখারী ও মুসলিম) অর্থাৎ প্রতিটি সন্তান স্বভাবধর্ম অর্থাৎ ইসলামের উপরেই জন্মায়। পরে তার পিতামাতা তাকে অন্যান্য মত ও পথে প্রবৃত্ত করে দেয়। সহীহ মুসলিমের এক হাদীসে আছে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন আল্লাহ বলেন যে, আমি আমার বান্দাদেরকে 'হানীফ' অর্থাৎ এক আল্লাহতে বিশ্বাসীরূপে সৃষ্টি করেছি। অতঃপর শয়তান তাদের পিছনে লেগে গেছে এবং তাদেরকে সেই সঠিক পথ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়েছে।

এমনিভাবে বৈশিষ্ট্যগত প্রভাব বা প্রতিক্রিয়াসম্পন্ন বহু আমল ও কথা রয়েছে, যা এ পৃথিবীতে ও নবী-রাসূল (আ.)-এর শিক্ষার মাধ্যমে প্রচলিত হয়েছে। সেগুলোর ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া মানুষ বুঝুক বা না বুঝুক, স্মরণ রাখুক বা না রাখুক সেগুলো কিন্তু যে কোনো অবস্থাতেই নিজের কাজ করে যাচ্ছে এবং আপন ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া বিকশিত করছে।

উদাহরণত শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার সাথে সাথে তার ডান কানে আজান আর বাম কানে একামত ও তাকবীর বলার যে সুন্নতটি সব মুসলমানই জানে এবং (আলহামদু লিল্লাহ) সমগ্র মুসলিম বিশ্বে প্রচলিত রয়েছে যদিও শিশুরা এসব বাক্যের অর্থ কিছুই বুঝে না এবং বড় হওয়ার পরে স্মরণও থাক না যে, তার কি কথা বলা হয়েছিল, কিন্তু তবুও এর একটা তাৎপর্য রয়েছে আর তাহলো এই যে, এতে করে সেই আদি প্রতিশ্রুতিতে শক্তি সঞ্চার করে কানের পথে অন্তরে ঈমানের বীজ বপন করে দেওয়া হয়। পরবর্তীকালে এরই প্রতিক্রিয়ায় লক্ষ্য করা যায় যে, বড় হওয়ার পর যদি সে ইসলাম ও ইসলামিয়াত থেকে বহু দূরেও সরে পড়ে, কিন্তু নিজকে নিজে মুসলমান বলে এবং মুসলমানের তালিকা থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়াকে একান্তই খারাপ মনে কর। এমনিভাবে যারা কুরআনের ভাষা জানে না তাদের প্রতিও কুরআন তেলাওয়াতের যে নির্দেশটি দেওয়া হয়েছে, তারও তাৎপর্য হয় তো এই যে, এতে করে অন্তত এই গোপন উপকারিতা নিশ্চিতই লাভ হয় যে, মানুষের মনে ঈমানের জ্যোতি সজীব হয়।

সেজন্যই আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে– أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هٰذَا غٰفِلِيْنَ অর্থাৎ এ স্বীকারোক্তি আমি এ কারণে গ্রহণ করেছি যাতে তোমরা কেয়ামতের দিন একথা বলতে না পার যে, আমরা তো এ ব্যাপারে অজ্ঞ ছিলাম। এতেও ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এই আদি প্রশ্নোত্তরে তোমাদের অন্তরে ঈমানের মূল এমনিভাবে স্থাপিত হয়ে গেছে যে, সামান্য একটু চিন্তা করলেই তোমাদের পক্ষে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনকে পালনকর্তা স্বীকার না করে কোনো অব্যাহতি থাকবে না।

অতঃপর দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে : أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ ۚ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُوْنَ অর্থাৎ 'এ অঙ্গীকার আমি এজন্যও গ্রহণ করেছি, আবার না তোমরা কিয়ামতের দিন এমন কোনো ওজর আপত্তি করতে থাক যে, শিরক ও পৌত্তলিকতা তো আসলে আমাদের বড়রা অবলম্বন করেছিল, আর আমরা তো ছিলাম তাদের পরে তাদের বংশধর। আমরা তো খাঁটি অখাঁটি ভুল শুদ্ধ কোনোটাই জানতাম না। কাজেই বড়রা যা কিছু করেছে আমরাও তাই করেছি। অতএব, বড়দের শাস্তি আমাদেরকে দেওয়া হবে কেন?' আল্লাহ তা'আলা বাতলে দিয়েছেন যে, অন্যের শাস্তি তোমাদেরকে দেওয়া হয়নি; বরং স্বয়ং তোমাদেরই শৈথিল্য ও গাফলতির শাস্তি দেওয়া হয়েছে। কারণ আদি প্রতিশ্রুতির মাধ্যমে মানবাত্মায় এমন এক জ্ঞান ও দর্শনের বীজ রোপণ করে দেওয়া হয়েছিল যাতে সামান্য চিন্তা করলেই এটুকু বিষয় বুঝতে পারা কোনো কঠিন ছিল না যে, এসব পাথরের মূর্তি যেগুলোকে আমরা নিজের হাতে গড়ে নিয়েছি কিংবা আগুন, পানি, বৃক্ষ অথবা কোনো মানুষ প্রভৃতির কেনো একটিও এমন নয়, যাকে কোনো মানুষ নিজের স্রষ্টা ও পালনকর্তা বা মোক্ষদাতা কিংবা মুক্তি দাতা বলে বিশ্বাস করতে পারে।

তৃতীয় আয়াতেও একই বিষয়ে বর্ণনা এভাবে দেওয়া হয়েছে– وَكَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ অর্থাৎ 'আমি এমনিভাবে আমার নিদর্শনগুলোকে সবিস্তারে বর্ণনা করে থাকি, যাতে মানুষ শৈথিল্য, গাফলতি ও অনাচার থেকে ফিরে আসে।, অর্থাৎ আল্লাহর নিদর্শনসমূহ সম্পর্কে যদি কেউ সামান্য লক্ষ্যও করে, তাহলে সে সেই আদি প্রতিজ্ঞা-প্রতিশ্রুতির দিকে ফিরে আসতে পারে, যা সৃষ্টিলগ্নে করেছিল। অর্থাৎ একটু লক্ষ্য করলেই আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পালনকর্তা হওয়ার স্বীকৃতি দিতে শুরু করবে এবং তার ফলে তাঁর আনুগত্যকে নিজের জন্য অবশ্যম্ভাবী মনে করবে।

قوله وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَاَ الَّذِيْٓ اٰتَيْنٰهُ اٰيٰتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا الخ উল্লিখিত আয়াতে বনী ইসরাঈলের জনৈক বড় আলেম ও অনুসরণীয় ব্যক্তির জ্ঞান ও দর্শনের সুউচ্চ স্তরে পৌছার পর সহসা গোমরাহ ও অভিশপ্ত হয়ে যাওয়ার একটি দৃষ্টান্তমূলক ঘটনা এবং তার কারণসমূহ বিবৃত হয়েছে। আর তাতে বহু শিক্ষণীয় বিষয়ও রয়েছে।

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহের সাথে এ ঘটনার যোগসূত্র এই যে, পূর্বের আয়াতগুলোতে সেই প্রতিজ্ঞা প্রতিশ্রুতির আলোচনা ছিল যা আল্লাহ তা'আলা আদিলগ্নে সমস্ত আদম সন্তান থেকে এবং পরবর্তীতে বিশেষ বিশেষ অবস্থায় ইহুদি নাসারা প্রভৃতি বিশেষ জাতি সম্প্রদায়ের কাছ থেকে নিয়েছেন। আর উল্লিখিত আয়াতগুলোতে এ আলোচনাও প্রাসঙ্গিকভাবে এসেছিল যে, প্রতিশ্রুতিদাতাদের মধ্যে অনেকেই সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেনি। যেমন ইহুদিরা খাতামুন্নাবিয়্যীন ﷺ-এর এ পৃথিবীতে আগমনের পূর্বে তাঁর আবির্ভাবের জন্য অপেক্ষা করত এবং তাঁর গুণ বৈশিষ্ট্য ও আকার অবয়ব সম্পর্কে মানুষের কাছে বর্ণনা করত এবং তিনি যে সত্য নবী তার প্রমাণ করত। কিন্তু যখন মহানবী ﷺ-এর আবির্ভাব হয়, তখন তুচ্ছ পার্থিব স্বার্থের লোভে তাঁর প্রতি ঈমান আনতে এবং তাঁর অনুসরণ করতে বিরত থাকে।

www.almodina.com

বনী ইসরাঈলের জনৈক অনুসরণীয় আলেমের পথভ্রষ্টতার দৃষ্টান্তমূলক ঘটনা : এ আয়াতগুলোতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রতি নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, আপনি স্বীয় জাতিকে সে ঘটনা শুনিয়ে দিন, যাতে বনী ইসরাঈলের একজন বিরাট আলেম ও আরেফের এমনি উত্থানের পর পতন ও হেদায়েতের পর গোমরাহির কথা বর্ণিত রয়েছে। সে বিস্তারিত জ্ঞান এবং পরিপূর্ণ মারেফাত হাসিল করার পর যখন রৈপিক কামনা-বাসনা ও স্বার্থ তার উপর প্রবল হয়ে গেল, তখন তার সমস্ত জ্ঞান গরিমা, নৈকট্য ও সমস্ত মর্যাদা বিলুপ্ত হয়ে গেল এবং তাকে চরম লাঞ্ছনা ও অপমানের সম্মুখীন হতে হলো।

কুরআন মাজীদে সে লোকের নাম বা কোনো পরিচয় উল্লেখ করা হয়নি। তাফসীরবিদ, সাহাবী ও তাবেয়ীদের কাছ থেকে এ ব্যাপারে বিভিন্ন রেওয়ায়েত উল্লেখ রয়েছে। সেগুলোর মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ এবং অধিকাংশ আলেমের নিকট গ্রহণযোগ্য রেওয়ায়েতটি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে হযরত ইবনে মারদুইয়াহ (র.) উদ্ধৃত করেছেন। তাতে বলা হয়েছে যে, সে লোকটির নাম ছিল বালআম ইবনে বা'উরা। সে সিরিয়ায় বায়তুল মোকাদ্দাসের নিকটবর্তী কেনআনের অধিবাসী ছিল। অপর এক রেওয়ায়েতে আছে, সে বনী ইসরাঈল সম্প্রদায়ের লোক ছিল। আল্লাহর কোনো কোনো কিতাবের ইলম তার ছিল। তার গুণ বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে কুরআন কারীমে যে, اٰتَيْنٰهُ اٰيٰتِنَا বলা হয়েছে, তাতে সে ইলমের প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

ফেরাউনের জলমগ্নতা ও মিসর বিজয়ের পর যখন হযরত মূসা (আ.) ও বনী ইসরাঈলদেরকে 'জাব্বারীন' সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে জিহাদ করার হুকুম হলো এবং 'জাব্বারীন' সম্প্রদায় যখন দেখল যে, হযরত মূসা (আ.) সমগ্র বনী ইসরাঈল সৈন্যসহ পৌঁছে গেছেন পক্ষান্তরে তাদের মোকাবিলায় ফেরাউন সম্প্রদায়ের জলমগ্ন হয়ে মারার কথা পূর্ব থেকেই তাদের জানা ছিল, তাখন তাদের ভয় হলো। তারা সবাই মিলে বালআম ইবনে বা'উরার কাছে সমবেত হয়ে বলল, হযরত মূসা (আ.) অতি কঠিন লোক, তদুপরি বিপুল সংখ্যক লোকজনও রয়েছে তাঁর সাথে। তারা এসেছে আমাদেরকে তাদের দেশ থেকে বের করে দেওয়ার জন্য। আপনি আমাদের জন্য আল্লাহ তা'আলার দরবারে প্রর্থনা করুন, যাতে তিনি তাদেরকে আমাদের মোকাবিলা থেকে ফিরিয়ে দেন। বালআম ইবনে বা'উরা ইসমে আজম জানত এবং সেই ইসমের মাধ্যমে যে দোয়া করত তাই কবুল হতো।

বালআ'ম বলল, অতি পরিতাপের বিষয়, তোমরা একি বলছ। তিনি হলেন আল্লাহর নবী। তাঁর সাথে রয়েছেন আল্লাহর ফেরেশতা । আমি তাঁর বিরুদ্ধে কেমন করে বদদোয়া করতে পারি? অথচ আল্লাহর দরবারে তাঁর যে মর্যাদা, তাও আমি জানি। আমি যদি এহেন কাজ করি, তাহলে আমার দুনিয়া আখেরাত সবই ধ্বংস হয়ে যাবে।

সমাজের প্রভাবশালী লোকেরা পীড়াপীড়ি করতে থাকলে বালআম বলল, আচ্ছা তাহলে আমি আমার পালনকর্তার নিকট জেনে নেই, এ ব্যাপারে দোয়া করার অনুমতি আছে কিনা? সে তার নিয়মানুযায়ী বিষয়টি জানার জন্য এস্তেখারা কিংবা অন্য কোনো আমল করল। তাতে স্বপ্ন যোগে তাকে বলে দেওয়া হলো যে, সে যেন এমন কাজ কখনও না করে। সে সম্প্রদায়কে বলল যে, বদদোয়া করতে আমাকে বারণ করা হয়েছে। তখন সমাজপতিরা তাকে একটা লোভনীয় উপঢৌকন দান করল। প্রকৃতপক্ষে সেটি ছিল উৎকোচ বিশেষ। সে যখন সেই উপঢৌকন গ্রহণ করে নিল, তখন সমম্প্রদায়ের লোকজন তার পেছনে লেগে গেল যে, আপনি এ কাজটি করে দিন। তাদের অনুরোধ-উপরোধ আর পীড়াপীড়ির অন্ত ছিল না। কেনো কোনো বর্ণনা অনুযায়ী তার স্ত্রী উৎকোচ গ্রহণ করে তাদের কাজটি করে দেওয়ার পরামর্শ দেয়। তখন স্ত্রীর সন্তুষ্টি কামনা এবং সম্পদের মোহ তাকে অন্ধ করে দিল। ফলে সে হযরত মূসা (আ.) এবং বনী ইবাঈলদের বিরুদ্ধে বদদোয়া করতে আরম্ভ করল।

সে মুহূর্তে আল্লাহর মহা কুদরতের এক অশ্চর্য বিষয় দেখা দেয়, হযরত মূসা (আ.) ও তাঁর সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে বদদোয়া করতে গিয়ে সে যেসব বাক্য বলতে চাইছিল সেসবই নিজ সম্প্রদায়ের প্রভবশালীদের বিরুদ্ধে উচ্চারিত হয়ে যাচ্ছিল। তখন সবাই চিৎকার করে উঠল, তুমি যে আমাদের জন্যই বদদোয়া করছ। বালআ'ম বলল, এটা আমার ইচ্ছাকৃত নয় আমার জিহ্বা এর বিরুদ্ধাচারণে সমর্থ নয়।

ফল দাঁড়াল এই যে, সে সম্প্রদায়ের উপর ধ্বংস নাজিল হলো। আর বালআমের শাস্তি হলো এই যে, তার জিহ্বা বেরিয়ে এসে বুকের উপর লটকে গেল। আমার দোয়া যে আর চলছে না। তবে আমি তোমাদেরকে একটা কৌশল বলে দিচ্ছি, যার দ্বারা তোমরা হযরত মূসা (আ.) -এর বিরুদ্ধে জয়ী হতে পারবে। তা হলো এই যে, তোমরা তোমাদের সুন্দরী নারীদেরকে সাজিয়ে বনী ইসরাঈল সৈন্যদের মাঝে পাঠিয়ে দাও। তাদেরকে একথা ভালো করে বুঝিয়ে দাও যে, বনী

ইসরাঈলের লোকেরা তাদের সাথে যাই কিছু করতে চায়, তারা যেন তা করতে দেয়; কোনো রকম বাধ যেন না সাধে। এরা মুসাফির, দীর্ঘদিন ঘর ছাড়া, হয় তো বা এরা এ অবস্থায় ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ে পড়বে। আর আল্লাহর নিকট ব্যভিচার অত্যন্ত ঘৃণিত কাজ। যে জাতির মাঝে তা অনুপ্রবেশ করে, তাদের উপর গজব ও অভিসম্পাত নাজিল হয়, সে জাতি কখনও বিজয় কিংবা কৃতকার্যতা অর্জন করতে পারে না।

বালআ'মের এই পৈশাচিক চালটি তাদের বেশ পছন্দ হলো এবং সেমতেই কাজ করা হলো। বনী ইসরাঈলদের জনৈক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি এ চালের শিকার হয়ে গেল। হযরত মূসা (আ.) তাকে এই দুষ্কর্ম থেকে বারণ করলেন। কিন্তু সে বিরত হলো না; বরং পৈশাচিক ফাঁদে জড়িয়ে পড়ল।

ফলে বনী ইসরাঈলের মাঝ কঠিন প্লেগ ছড়িয়ে পড়ল তাতে একই দিনে সত্তর হাজার ইসরাঈলী মৃত্যুমুখে পতিত হলো। এমনকি যে লোক অসৎকর্মে লিপ্ত হয়েছিল, তাকে এবং যার সাথে লিপ্ত হয়েছিল তাকে বনী ইসরাঈলরা হত্যা করে প্রকাশ্যে টাঙ্গিয়ে রাখল, যাতে অন্যান্যরা শিক্ষা গ্রহণ করে এবং তারা সবাই তওবাও করল। তখন সে প্লেগ দমিত হলো।

কুরআন মাজীদে উল্লিখিত ব্যাপারে বলা হয়েছে যে, فَانْسَلَخَ مِنْهَا অর্থাৎ আমি আমার নিদর্শনসমূহ এবং এর সম্পর্কিত জ্ঞান পরিচয় সে লোককে দান করেছিলাম, কিন্তু সে তা থেকে বেরিয়ে গেছে। اِنْسِلَاخٌ (ইনসিলাখুন) শব্দটি প্রকৃতপক্ষে পশুদের চামড়ার ভিতর থেকে কিংবা সাপের ছলমের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসার ক্ষেত্রেও বলা হয়। এখানেও আয়াতের জ্ঞানকে একটি পোশাকে বা লেবাসের সাথে তুলনা করে বলা হয়েছে যে, এ লোকটি জ্ঞান বিজ্ঞানের আওতা থেকে সম্পূর্ণভাবে সরে পড়েছে। فَاَتْبَعَهُ الشَّيْطٰنُ (শয়তান তার পিছনে লেগে গেছে।) অর্থাৎ যে পর্যন্ত আয়াতের জ্ঞান এবং আল্লাহর স্মরণ তার সাথে ছিল, সে পর্যন্ত তার উপর শয়তান কোনো রকম প্রভাব বিস্তার করতে পারছিল না। কিন্তু যখন তা শেষ হয়ে গেল, তখন শয়তান তাকে কাবু করে ফেলল। فَكَانَ مِنَ الْغٰوِيْنَ (অতঃপর সে হয়ে গেল গোমরাহদের অন্তর্ভুক্ত) অর্থাৎ শয়তান কাবু করে ফেলার দরুন সে পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল।

অন্য আয়াতে বলা হয়েছে– وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنٰهُ بِهَا وَلٰكِنَّهٗ اَخْلَدَ اِلَى الْاَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوٰىهُ অর্থাৎ আমি ইচ্ছা করলে এসব আয়াতের মাধ্যমে তাকে উচ্চমর্যাদা সম্পন্ন করে দিতাম, কিন্তু সে দুনিয়ার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে গিয়ে রৈপিক কামনা-বাসনার দাসত্ব করতে শুরু করেছে। এখানে اَخْلَدَ শব্দটি اِخْلَادٌ ধাতু থেকে গঠিত হয়েছে। যার অর্থ হলো– কোনো কিছুর প্রতি আকৃষ্ট হওয়া কিংবা কোনো স্থানকে আঁকড়ে ধরা। আর اَرْض -এর প্রকৃত অর্থ হলো– ভূমি। পৃথিবীতে যাবতীয় যা কিছু রয়েছে সেগুলো হয় সরাসরি ভূমি হবে, আর না হয় ভূমি সংক্রান্ত বিষয়সম্পত্তি, বাড়িঘর, ক্ষেত-খামার প্রভৃতি হবে অথবা ভূমি থেকেই উৎপন্ন অন্যান্য লাখো কোটি বস্তু সামগ্রী যার উপর মানুষের জীবন এবং আরাম-আয়েশ নির্ভরশীল। সুতরাং اَرْض (আরয) শব্দ বলে এখানে সমগ্র পৃথিবীকেই বুঝানো হয়েছে। এ আয়াতে ইঙ্গিত করে দেওয়া হয়েছে যে, ঐ আয়াতসমূহ এবং সে সম্পর্কিত জ্ঞানই হলো প্রকৃত মর্যাদা ও উন্নতির কারণ। কিন্তু যে লোক এ সমস্ত আয়াতের যথার্থ সম্মান না দিয়ে পার্থিব কামনা-বাসনাকে আল্লাহর আয়াতসমূহ অপেক্ষা অগ্রাধিকার দিবে তার জন্য এই জ্ঞানই মহাবিপদ হয়ে যাবে।

এ বিপদের কথাটিও আয়াতে এভাবে বলা হয়েছে– فَمَثَلُهٗ كَمَثَلِ الْكَلْبِ اِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ اَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ -لَهْث শব্দের অর্থ হলো– জিহ্বা বের করে জোরে শ্বাস নেওয়া।

প্রত্যেকটি প্রাণীই নিজের জীবন রক্ষার জন্য ভিতরের উষ্ণ বায়ু বাইরে বের করে দিতে এবং বাইরে থেকে নতুন তাজা বায়ু নাক ও গলার মাধ্যমে ভিতরে টেনে নিতে বাধ্য। এরই উপর নির্ভরশীল প্রতিটি প্রাণীর জীবন। আল্লাহ তা'আলাও প্রত্যেক জীবের জন্য এ কাজটি এতই সহজ ও সাবলীল করে দিয়েছেন যে, কোনো ইচ্ছা বা পরিশ্রম ছাড়াই নাকের রন্ধ্র দিয়ে ভিতরের হাওয়া বাইরে এবং বাইরের হওয়া ভিতরে আসা যাওয়া করছে। এতে না কোনো শক্তি প্রয়োগের প্রয়োজন হয়, না ইচ্ছা করে করার প্রয়োজন পড়ে। স্বাভাবিক ও প্রাকৃতিকভাবেই এ কাজটি ক্রমাগত সম্পন্ন হতে থাকে।

জীব জন্তুর মধ্যে শুধু কুকুরই এমন এক জীব যাকে নিজের শ্বাস-প্রশ্বাসের আসা যাওয়ার ব্যাপারে জিহ্বা বের করে জোর দিতে হয় এবং পরিশ্রম করতে হয়। অন্যান্য জীবের বেলায় এমন অবস্থা তখনই সৃষ্টি হয়, যখন তাদের প্রতি কেউ আক্রমণ করে কিংবা সে ক্লান্ত প্ররিশ্রান্ত হয়ে পড়ে অথবা আকস্মিক কোনো বিপদের সম্মুখীন হয়।

কুরআনে কারীম সে ব্যক্তিকে কুকুরের সাথে তুলনা করেছে। তার কারণ আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করার দরুনই তাকে এ শাস্তি দেওয়া হয়েছিল। তার জিহ্বা বেরিয়ে গিয়ে বুকের উপর ঝুলে পড়েছিল এবং তাতে সে অনবরত কুকুরের মতো হাঁপাচ্ছিল। তাকে কেউ তাড়া করুক আর নাই করুক, সে যে কোনো অবস্থায় শুধু হাঁপাতেই থাকত।

উল্লিখিত আয়াতগুলোর সারমর্ম হচ্ছে-

প্রথমত : কারো পক্ষেই নিজের জ্ঞান গরিমা এবং ইবাদত-উপাসনার ব্যাপারে গর্ব করা উচিত নয়। কারণ সময় বদলাতে এবং বিপরীতগামী হতে দেরি হয় না। যেমন হয়েছিল বালআ'ম ইবনে বাউরার পরিণতি। ইবাদত-উপাসনার সাথে সাথে আল্লাহর শোকরগুজারী ও তাতে দৃঢ়তার জন্য আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করা এবং তাঁর উপর ভরসা করা কর্তব্য।

দ্বিতীয়ত : এমনসব পরিবেশ ও কার্যকলাপ থেকে বেঁচে থাকা উচিত যাতে স্বীয় ধর্মীয় ব্যাপারে ক্ষতির আশঙ্কা থাকে। বিশেষ করে ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততির ভালোবাসার ক্ষেত্রে সেই অশুভ পরিণতির কথা সর্বক্ষণ স্মরণ রাখা আবশ্যক।

তৃতীয়ত : অসৎ ও পথভ্রষ্ট লোকদের সাথে সম্পর্ক রাখা এবং তাদের নিমন্ত্রণ বা উপহার উপঢৌকন গ্রহণ করা থেকে বেঁচে থাকাও কর্তব্য। কারণ ভ্রান্ত লোকদের উপঢৌকন গ্রহণ করার কারণেই বাল'আম ইবনে বা'উরা এই মহাবিপদের সম্মুখীন হয়েছিল।

চুতর্থত : অশ্লীলতা ও হারামের অনুসরণ গোটা জাতির জন্য ধ্বংস ও বিলুপ্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। যে জাতি নিজেদেরকে বিপদাপদ থেকে বিমুক্ত রাখতে চায়, তার কর্তব্য হলো নিজ জাতিকে যথাশক্তি অশ্লীলতার প্রকোপ হতে বিরত রাখা। অন্যথায় আল্লাহ তা'আলার আজাবকেই আমন্ত্রণ জানানো হবে।

পঞ্চমত : আল্লাহর আয়াতসমূহের বিরুদ্ধাচরণ নিজেরও একটি আজাব এবং এর কারণে শয়তান তার উপর প্রবল হয়ে গিয়ে আরও হাজার রকমের মন্দ কাজে উদ্বুদ্ধ করে দেয়। কাজেই যে লোককে আল্লাহ তা'আলা দীনের জ্ঞান দান করেছেন, সাধ্যমতো সে জ্ঞানের সম্মান দান এবং নিজ আমল সংশোধনের চিন্তা থেকে এক মুহূর্তের জন্যও বিরত না থাকা তার একান্ত কর্তব্য।

শব্দ বিশ্লেষণ

نَتَقْنَا : সীগাহ جمع متكلم বহছ اثبات فعل ماضى معروف বাব ضَرَبَ ও نَصَرَ মাসদার اَلنَّتْقُ মূলবর্ণ (ن . ت . ق) জিনস صحيح অর্থ– আমি উত্তোলন করলাম।

خُذُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْاَخْذُ মূলবর্ণ (ا . خ . ذ) জিনস مهموز فاء অর্থ– তোমরা ধর, তোমরা গ্রহণ কর।

شِئْنَا : সীগাহ جمع متكلم বহছ اثبات فعل ماضى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْمَشِيْئَةُ মূলবর্ণ (ش . ى . ء) জিনস মুরাক্কাব اجوف يائى ও مهموز لام অর্থ– আমি চাইলে, আমি ইচ্ছা করলে।

هَوٰى : শব্দটি একবচন, বহুবচন اَهْوَاءُ অর্থ– প্রবৃত্তি, কামনা।

قَصَصٌ : শব্দটি বহুবচন, একবচন قِصَّةٌ অর্থ– কেসসা, কাহিনী, গল্প।

سَآءَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ (فعل ذم) ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلسُّوْءُ মূলবর্ণ (س . و . ء) জিনস মুরাক্কাব اجوف واوى ও مهموز لام অর্থ– মন্দ হওয়া।

www.almodina.com

وَلَقَدْ ذَرَاْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيْرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ ۖ لَهُمْ قُلُوْبٌ لَّا يَفْقَهُوْنَ بِهَا ۫ وَلَهُمْ اَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُوْنَ بِهَا ۫ وَلَهُمْ اٰذَانٌ لَّا يَسْمَعُوْنَ بِهَا ؕ اُولٰٓئِكَ كَالْاَنْعَامِ بَلْ هُمْ اَضَلُّ ؕ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْغٰفِلُوْنَ (۱۷۹)

অনুবাদ : (১৭৯) আর আমি এমন অনেক জিন ও মানবকে সৃষ্টি করেছি দোজখের জন্য, যাদের অন্তর [আছে কিন্তু] এরূপ যা দ্বারা তারা [হক] বুঝে না এবং যাদের চক্ষুসমূহ [আছে কিন্তু] এরূপ যা দ্বারা তারা দর্শন করে না, আর যাদের কর্ণসমূহ [আছে কিন্তু] এরূপ যা দ্বারা তারা শ্রবণ করে না, এই সকল লোকেরাই চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায় বরং এরা [তদপেক্ষা] অধিক পথভ্রষ্ট। এ সমস্ত লোকেরা হচ্ছে গাফেল।

وَلِلّٰهِ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى فَادْعُوْهُ بِهَا ۪ وَذَرُوا الَّذِيْنَ يُلْحِدُوْنَ فِيْٓ اَسْمَآئِهٖ ؕ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ (۱۸۰)

(১৮০) আর আল্লাহরই জন্য ভালো ভালো নামসমূহ রয়েছে। সুতরাং সেই নামসমূহ দ্বারা আল্লাহকেই ডাকবে, আর এরূপ লোকদের সাথে সংস্রবও রেখ না যারা তাঁর নামসমূহে বক্রতা অবলম্বন করে, এরা নিশ্চয় তাদের কৃতকর্মের প্রতিফল পাবে।

وَمِمَّنْ خَلَقْنَآ اُمَّةٌ يَّهْدُوْنَ بِالْحَقِّ وَبِهٖ يَعْدِلُوْنَ (۱۸۱)

(১৮১) আর আমি যাদেরকে সৃষ্টি করেছি তাদের মধ্যে এমন একটি দলও রয়েছে, যারা সত্য [অর্থাৎ দীন ইসলাম] -এর অনুরূপ হেদায়েত করে এবং তারই অনুরূপ ইনসাফও করে।

শাব্দিক অনুবাদ

(১৭৯) وَلَقَدْ ذَرَاْنَا আর আমি সৃষ্টি করেছি لِجَهَنَّمَ দোজখের জন্য كَثِيْرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ এমন অনেক জিন ও মানবকে لَهُمْ قُلُوْبٌ যাদের অন্তর [আছে] لَّا يَفْقَهُوْنَ بِهَا [কিন্তু] এরূপ যা দ্বারা তারা [হক] বুঝে না وَلَهُمْ اَعْيُنٌ এবং যাদের চক্ষুসমূহ [আছে] لَّا يُبْصِرُوْنَ بِهَا [কিন্তু] এরূপ যা দ্বারা তারা দর্শন করে না وَلَهُمْ اٰذَانٌ আর যাদের কর্ণসমূহ [আছে] لَّا يَسْمَعُوْنَ بِهَا [কিন্তু] এরূপ যা দ্বারা তারা শ্রবণ করে না اُولٰٓئِكَ كَالْاَنْعَامِ এই সকল লোকেরাই চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায় بَلْ هُمْ اَضَلُّ বরং এরা [তদপেক্ষা] অধিক পথভ্রষ্ট اُولٰٓئِكَ هُمُ الْغٰفِلُوْنَ এই সমস্ত লোকেরা হচ্ছে গাফেল।

(১৮০) وَلِلّٰهِ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى আর আল্লাহরই জন্য ভালো ভালো নামসমূহ রয়েছে فَادْعُوْهُ بِهَا সুতরাং সেই নামসমূহ দ্বারা আল্লাহকেই ডাকবে وَذَرُوا الَّذِيْنَ আর এরূপ লোকদের সাথে সংস্রবও রেখ না يُلْحِدُوْنَ فِيْٓ اَسْمَآئِهٖ যারা তাঁর নামসমূহে বক্রতা অবলম্বন করে سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ এরা নিশ্চয় তাদের কৃতকর্মের প্রতিফল পাবে।

(১৮১) وَمِمَّنْ خَلَقْنَآ আর আমি যাদেরকে সৃষ্টি করেছি اُمَّةٌ তাদের মধ্যে এমন একটি দলও রয়েছে يَّهْدُوْنَ بِالْحَقِّ যারা সত্য [অর্থাৎ দীন ইসলাম] -এর অনুরূপ হেদায়েত করে وَبِهٖ يَعْدِلُوْنَ এবং তারই অনুরূপ ইনসাফও করে।

www.almodina.com

(১৮২) আর যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে, আমি তাদেরকে ক্রমান্বয়ে [দোজখের দিকে] নিয়ে যাচ্ছি এরূপে যে, তারা অবগতও নয়।	وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُوْنَ (١٨٢)
অনুবাদ : (১৮৩) আর তাদেরকে অবকাশ প্রদান করি, নিঃসন্দেহে আমার ব্যবস্থা অতি দৃঢ়।	وَاُمْلِيْ لَهُمْ ؕ اِنَّ كَيْدِيْ مَتِيْنٌ (١٨٣)
(১৮৪) তারা কি এ বিষয়ে চিন্তা করে দেখেনি যে, যাঁর সাথে এদের সম্পর্ক তাঁর মধ্যে উন্মাদনার লেশমাত্রও নেই। তিনি তো কেবল একজন প্রকাশ্য ভয় প্রদর্শনকারী।	اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوْا ٚ مَا بِصَاحِبِهِمْ مِّنْ جِنَّةٍ ؕ اِنْ هُوَ اِلَّا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ (١٨٤)
(১৮৫) আর এরা কি ভেবে দেখেনি– নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল রাজ্যের প্রতি, আর ঐ বস্তুসমূহের প্রতি, যেগুলো আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি করেছেন? আর এই বিষয়ে [-ও ভেবে দেখে না] যে, হয়তো তাদের [নির্দিষ্ট] কাল নিকটবর্তী হয়ে এসেছে, তবে তারা কুরআনের পরে আর কোনো কথার উপর ঈমান আনবে?	اَوَلَمْ يَنْظُرُوْا فِيْ مَلَكُوْتِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللّٰهُ مِنْ شَيْءٍ ۙ وَّاَنْ عَسٰۤى اَنْ يَّكُوْنَ قَدِ اقْتَرَبَ اَجَلُهُمْ ۚ فَبِاَيِّ حَدِيْثٍۭ بَعْدَهٗ يُؤْمِنُوْنَ (١٨٥)
(১৮৬) আল্লাহ যাকে গোমরাহ করেন তাকে কেউই সুপথে আনতে পারে না, আর আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে তাদের গোমরাহিতে ঘুরপাক খেতে ছেড়ে দেন।	مَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ ؕ وَيَذَرُهُمْ فِيْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ (١٨٦)

শাব্দিক অনুবাদ

(১৮৩) وَاُمْلِيْ لَهُمْ আর তাদেরকে অবকাশ প্রদান করি اِنَّ كَيْدِيْ مَتِيْنٌ নিঃসন্দেহে আমার ব্যবস্থা অতি দৃঢ়।

(১৮৪) اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوْا তারা কি এ বিষয়ে চিন্তা করে দেখেনি যে مَا بِصَاحِبِهِمْ مِّنْ جِنَّةٍ যাঁর সাথে এদের সম্পর্ক তাঁর মধ্যে উন্মাদনার লেশ মাত্রও নেই اِنْ هُوَ اِلَّا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ তিনি তো কেবল একজন প্রকাশ্য ভয় প্রদর্শনকারী।

(১৮৫) اَوَلَمْ يَنْظُرُوْا আর এরা কি ভেবে দেখেনি– فِيْ مَلَكُوْتِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল রাজ্যের প্রতি وَمَا خَلَقَ اللّٰهُ مِنْ شَيْءٍ আর ঐ বস্তুসমূহের প্রতি, যেগুলো আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি করেছেন? وَّاَنْ عَسٰۤى اَنْ يَّكُوْنَ قَدِ اقْتَرَبَ اَجَلُهُمْ আর এই বিষয়ে [-ও ভেবে দেখে না] যে, হয়তো তাদের [নির্দিষ্ট] কাল নিকটবর্তী হয়ে এসেছে فَبِاَيِّ حَدِيْثٍۭ بَعْدَهٗ يُؤْمِنُوْنَ তবে তারা কুরআনের পরে আর কোন কথার উপর ঈমান আনবে?

(১৮৬) مَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ আল্লাহ যাকে গোমরাহ করেন فَلَا هَادِيَ لَهٗ তাকে কেইউ সুপথে আনতে পারে না وَيَذَرُهُمْ আর আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ছেড়ে দেন فِيْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ তাদের গোমরাহিতে ঘুরপাক খেতে।

(১৮২) وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا আর যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে سَنَسْتَدْرِجُهُمْ আমি তাদেরকে ক্রমান্বয়ে [দোজখের দিকে] নিয়ে যাচ্ছি مِّنْ حَيْثُ এরূপে যে لَا يَعْلَمُوْنَ তারা অবগতও নয়।

www.almodina.com

(১৮৭) এরা আপনার নিকট কিয়ামত সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে যে কখন তার সংঘটন হবে? আপনি বলে দিন যে, তার খবর কেবল আমার রবেরই নিকট রয়েছে, তাকে তার সময়মতো আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউ প্রকাশ করবে না। তা আসমানসমূহ এবং জমিনে অতি গুরুতর ব্যাপার হবে। তা কেবল তোমাদের উপর অকস্মাৎই এসে পড়বে। তারা আপনাকে এমনভাবে জিজ্ঞাসা করে, যেন আপনি তার অনুসন্ধান করে রেখেছেন। আপনি বলে দিন, তার খবর একমাত্র আল্লাহরই নিকট রয়েছে, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ অবগত নয়।

يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ السَّاعَةِ اَيَّانَ مُرْسٰهَا ؕ قُلْ اِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّیْ ۚ لَا يُجَلِّيْهَا لِوَقْتِهَاۤ اِلَّا هُوَ ؔۘ ثَقُلَتْ فِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ لَا تَاْتِيْكُمْ اِلَّا بَغْتَةً ؕ يَسْـَٔلُوْنَكَ كَاَنَّكَ حَفِیٌّ عَنْهَا ؕ قُلْ اِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللّٰهِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ (١٨٧)

শাব্দিক অনুবাদ

(১৮৭) يَسْـَٔلُوْنَكَ এরা আপনার নিকট জিজ্ঞাসা করে عَنِ السَّاعَةِ কিয়ামত সম্বন্ধে اَيَّانَ مُرْسٰهَا যে কখন তার সংঘটন হবে? قُلْ আপনি বলে দিন যে اِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّیْ তার খবর কেবল আমার রবেরই নিকট রয়েছে لَا يُجَلِّيْهَا তাকে অন্য কেউ প্রকাশ করবে না لِوَقْتِهَاۤ তার সময়মতো اِلَّا هُوَ আল্লাহ ব্যতীত ثَقُلَتْ তা অতি গুরুতর ব্যাপার হবে فِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ আসমানসমূহ এবং জমিনে لَا تَاْتِيْكُمْ اِلَّا بَغْتَةً তা কেবল তোমাদের উপর অকস্মাৎই এসে পড়বে يَسْـَٔلُوْنَكَ তারা আপনাকে এমনভাবে জিজ্ঞাসা করে كَاَنَّكَ حَفِیٌّ عَنْهَا যেন আপনি তার অনুসন্ধান করে রেখেছেন قُلْ আপনি বলে দিন اِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللّٰهِ তার খবর একমাত্র আল্লাহরই নিকট রয়েছে وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ কিন্তু অধিকাংশ মানুষ অবগত নয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(১৮০) قوله وَلِلّٰهِ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى فَادْعُوْهُ بِهَا الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** মুকাতিল ও অন্যান্য তাফসীরবিদগণ বলেন যে, আলোচ্য আয়াত মুসলমানদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। যারা নামাজ বা দোয়ায় বলতেন, ইয়া রাহমান! ইয়া রাহীম! তখন মক্কার মুশরিকরা বলত যে, মুহাম্মদ ﷺ ও তাঁর সাথিদের দাবি হলো যে, তারা এক আল্লাহর ইবাদত করে। পক্ষান্তরে তাদের দাবি হলো, তারা তো দুজন উপাস্যের উপাসনা করে, তখন আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদের বিভ্রান্তিকর এ দাবির পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[কুরতুবী-২৫৮/৭]

(১৮৩) قوله وَاُمْلِیْ لَهُمْ اِنَّ كَيْدِیْ مَتِيْنٌ الاية **আয়াতের শানে নুযূল :** আলোচ্য আয়াত কুরাইশের বিদ্রূপকারীদের সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা যাদেরকে দীর্ঘ কাল অবকাশ ও সুযোগ দান করার পর এক রাতেই তাদেরকে হত্যা ও ধ্বংস করে দিয়েছেন। এরাই রূহুল মা'আনীর বর্ণনানুযায়ী কুরাইশের সে সকল লোক, যারা রাসূল ﷺ -কে নিয়ে বিদ্রূপ করত, তাদেরকে দীর্ঘকাল অবকাশ দেওয়ার পর বদরের দিন ধ্বংস করে দিলেন। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[কুরতুবী-২৮৯/৭, রূহুল মা'আনী-১২৭/৯/৫, বাহরে মুহীত-৪২৯/৪]

(১৮৪) قوله اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوْا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِّنْ جِنَّةٍ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** হাসান ও কাতাদাহ বলেন, রাসূল ﷺ একদা রাতে সাফা পাহাড়ের উপর আরোহণ করে নাম ধরে কুরাইশের গোত্রগুলোকে ডাকতে থাকেন যে, হে অমুক গোত্র! হে অমুক গোত্রের লোক-জন! তাদেরকে আল্লাহ তা'আলার প্রতি আহ্বান করা হচ্ছে। সুতরাং যখন সকাল হলো, তখন কাফের নেতৃবর্গ বলতে লাগল যে, এ পাগল রাত ভর সকাল পর্যন্ত চিৎকার করেছে। তারা এও বলত যে, এ হলো পাগল কবি। সুতরাং তারা যে মন্তব্য করত তা ছিল মিথ্যা। তাদের এ দাবি অবান্তর ঘোষণা করেই আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত অবতরণ করেন এবং এতে বলে দেওয়া হয় যে, তিনি পাগল নন, প্রকৃতপক্ষে তিনি হলেন আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে একজন সতর্ককারী। –[বাহরে মুহীত- ৪২৯/৪, কুরতুবী- ২৯০/৭, রূহুল মা'আনী ১২৮/৯/৫৫]

(১৮৭) قوله يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ السَّاعَةِ اَيَّانَ مُرْسٰهَا الخ আয়াতের শানে নুযূল– ১. রাসূল ﷺ -কে কিয়ামত তথা মহাপ্রলয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল । যারা জিজ্ঞেস করেছিল তাদের ব্যাপারে মতপার্থক্য রয়েছে। ক. তারা ইহুদি ছিল। খ. তারা কুরাইশ ছিল।

শানে নুযূল– ২ : ইবনে ইসহাক ও অন্যান্য তাফসীরবিদগণ হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) -এর বরাত দিয়ে বলেন যে, তিনি বলেন, ইহুদিদের থেকে হামল ইবনে আবী কুশাইর, শামুল ইবনে যায়েদ রাসূল ﷺ -কে জিজ্ঞেস করেছিল, আপনি যেরূপভাবে নবীত্বের কথা দাবি করেন প্রকৃতপক্ষে আপনি সত্যিকার অর্থে যদি নবী হয়ে থাকেন, তাহলে বলুন তো দেখি কিয়ামত কবে বা কখন হবে? সে সম্পর্কে জেনে, যদি সত্যই বলে থাকেন, তাহলে ঈমান আনব? সুতরাং আল্লাহ কিয়ামত সম্পর্কিত উত্থাপিত জিজ্ঞাসা সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাজিল করে জানিয়ে দেন যে, এ বিষয়ে আল্লাহ ছাড়া আর অন্য কেউ জানে না।

শানে নুযূল– ৩ : আব্দ ইবনে হুমাইদ ও ইবনে জারীর কাতাদাহ এর বরাত দিয়ে বলেন যে, কুরাইশের কিছু লোকজন এসে বলল, হে মুহাম্মদ! কিয়ামত সম্পর্কে আমাদেরকে অবগত করুন। কারণ আমাদের মধ্যে ও আপনার মধ্যে রয়েছে আত্মীয়তার গভীর সম্পর্ক। তখন কিয়ামত সম্পর্কে গায়েবী ইলম রাসূল ﷺ –এর অজানা বিষয় ঘোষণা দিয়ে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[রূহুল মা'আনী-১৩২/৯/৫, বাহরে মুহীত-৪৩১/৪, ফাতহুল কাদীর-২৭৫/২]

কাফেরদের না বুঝা, না দেখা ও না শুনার তাৎপর্য : এ আয়াতে সেসব লোকের বুঝা, দেখা ও শুনাকে সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করা হয়েছে। বলা হয়েছে– এরা কিছুই বুঝে না, কোনো কিছু দেখেও না এবং শোনেও না। অথচ বাস্তবে এরা পাগল বা উন্মাদ নয় যে, কিছুই বুঝতে পারে না। অন্ধও নয় যে, কোনো কিছু দেখবে না, কিংবা কালাও নয় যে, কোনো কিছু শুনবে না; বরং প্রকৃতপক্ষে এরা পার্থিব বিষয়ে অধিকাংশ লোকের তুলনায় অধিক সতর্ক ও চতুর।

কিন্তু কথা হলো এই যে, আল্লাহ তা'আলা স্বীয় সৃষ্টির প্রয়োজন অনুপাতে তার জীবনের লক্ষ্য অনুযায়ী বুদ্ধি ও উপলব্ধি ক্ষমতা দান করেছেন। যেসব জিনিসকে আমরা বুদ্ধি বিবর্জিত ও অনুভূতিহীন বলে মনে করি, প্রকৃতপক্ষে সেগুলোও জ্ঞান-বুদ্ধি ও চেতনা-অনুভূতি বিবর্জিত নয়। অবশ্য এসব বিষয় সেগুলোর মাঝে সে অনুপাতেই দেওয়া হয়েছে যেটুকু তাদের অস্তিত্বের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন। সবচেয়ে কম বুদ্ধি ও চেতনা-উপলব্ধি রয়েছে মাটি, পাথর প্রভৃতি জড়পদার্থের মাঝে। যাদের না আছে প্রবৃদ্ধি, না স্বস্থান থেকে কোথাও যাওয়া কিংবা চলাফেরার প্রয়োজন। কাজেই এতে সে শক্তি-সামর্থ্য এতই ক্ষীণ যে, তাদের জীবনীশক্তির আন্দাজ করাও কঠিন। এগুলোর চাইতে সামান্য বেশি রয়েছে উদ্ভিদদের মধ্যে যার অস্তিত্বের লক্ষ্যের মাঝে প্রবৃদ্ধি এবং ফল দান প্রভৃতি অন্তর্ভুক্ত। এগুলোকে বুদ্ধি-উপলব্ধিও সে অনুপাতেই দেওয়া হয়েছে। তারপর আসে পশুর নাম্বার; যাদের জীবনের উদ্দেশ্যগুলোর মধ্যে রয়েছে প্রবর্ধন ও চলাফেরা করে খাবার আহরণ, ক্ষতিকর বিষয় থেকে আত্মরক্ষা আর বংশবৃদ্ধি প্রভৃতি বিষয়। এ কারণেই তাদেরকে যে বুদ্ধি, চেতনা ও অনুভূতি দেওয়া হয়েছে, তা অন্যান্য সৃষ্টির তুলনায় বেশি। কিন্তু ততটুকু বেশি যাতে তারা নিজেদের পানাহার, উদরপূর্তি ও নিদ্রা জাগরণ প্রভৃতি ব্যবস্থা সম্পন্ন করতে পারে, শত্রুর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করতে পারে। এসবের পরে আসে মানুষের নম্বর; যার অস্তিত্বের সর্বপ্রথম উদ্দেশ্য হলো নিজের স্রষ্টা ও পালনকর্তাকে চেনা, তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী চলা, তাঁর অসন্তুষ্টির বিষয় থেকে বেঁচে থাকা, সমগ্র সৃষ্টির তাৎপর্যের প্রতি লক্ষ্য করা এবং তাঁর দ্বারা উপকৃত হওয়া। সমগ্র বস্তুজগতের পরিণতি ও ফলাফলকে উপলব্ধি করা, আসল ও মেকী যাচাই করে যা ভালো, মঙ্গল ও কল্যাণকর সেগুলোকে গ্রহণ করা, আর যা কিছু মন্দ, অকল্যাণকর সেগুলো থেকে বেঁচে থাকা। এ কারণেই মানব জাতি এমন বৈশিষ্ট্যপ্রাপ্ত হয়েছে, জীবনের উন্নতি লাভের সুবিস্তৃত ক্ষেত্র লাভ করেছে যা অন্য কোনো সৃষ্টি পায়নি। মানুষ উন্নতি লাভ করে ফেরেশতাদের কাতার থেকেও এগিয়ে যেতে পারে। একমাত্র মানুষের মাঝেই এমন গুণ বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান রয়েছে যে, তার কর্মের জন্য ভালোমন্দ প্রতিদান রয়েছে। যে কারণে তাদেরকে বুদ্ধি-জ্ঞান এবং চেতনা-উপলব্ধিও দেওয়া হয়েছে। সমগ্র সৃষ্টির তুলনায় অধিক, যাতে করে সাধারণ জীবের স্তরের উর্ধ্বে উঠে নিজের অস্তিত্বের উদ্দেশ্য মোতাবেক কাজে আত্মনিয়োগ করে। আল্লাহ প্রদত্ত বিশেষ বুদ্ধি চেতনা ও উপলব্ধিকে এবং দর্শন ও শ্রবণশক্তিকে যেন সেমত কাজে নিয়োগ করে।

এই তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়টি সামনে এসে যাবার পর একজন মানুষের বুঝা, তার দর্শন অন্যান্য জীব জন্তুর বুঝা, শোনা ও দেখা থেকে ভিন্ন রকম হওয়াই উচিত। মানুষও যদি নিজেদের দর্শন শ্রবণ ও বিবেচনা শক্তিকে তেমনি কাজে নিয়োগ করে, যেমন কাজে অন্যান্য জীবজন্তুরা নিয়োগ করে থাকে এবং মানুষের জন্য মন্দ পরিণতি ও ভবিষ্যৎ ফলাফলের প্রতি লক্ষ্য

www.almodina.com

রাখা, অমঙ্গল থেকে বেঁচে থাকা. কল্যাণ ও মঙ্গলকর বিষয়কে গ্রহণ করা প্রভৃতি যেসব কাজ নির্ধারিত ছিল, সেগুলোর প্রতি যদি লক্ষ্য না রাখে, তবে বুদ্ধি থাকা সত্ত্বেও তাকে নির্বোধ বলা হবে, চোখ থাকা সত্ত্বেও তাকে অন্ধ এবং কান থাক সত্ত্বেও তাকে বধির বলেই আখ্যায়িত করা হবে। সেজন্যই কুরআন কারীম অন্যত্র এ ধরনের লোকদিগকে صُمٌّ بُكْمٌ عُمْىٌ অর্থাৎ বধির, বোবা ও অন্ধ বলে আখ্যায়িত করেছে।

এতে একথা বিবৃত করা হয়নি যে, তারা নিজেদের পানাহার, থাকা পরা ও নিদ্রা জাগরণ প্রভৃতি জৈবিক প্রয়োজন সম্পর্কেও বুঝে না কিংবা জৈবিক প্রয়োজন সম্পর্কিত বিষয়গুলোও দেখতে বা শোনতে পায় না; বরং স্বয়ং কুরআনে পাক তাদের সম্পর্কে আরেক জায়গায় বলেছে– يَعْلَمُوْنَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْاٰخِرَةِ هُمْ غٰفِلُوْنَ অর্থাৎ 'তারা পার্থিব জীবনের বাহ্যিক দিকগুলো সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন, কিন্তু আখেরাত সম্পর্কে একান্ত গাফেল।' আর ফেরাউন, হামান এবং তাদের সম্প্রদায় সম্পর্কে বলেছে- وَكَانُوْا مُسْتَبْصِرِيْنَ 'তারা একান্তভাবেই বাহ্যদৃষ্টিসম্পন্ন ছিল'। কিন্তু তাদের বুদ্ধিমত্তা ও দর্শনক্ষমতার ব্যবহার যেহেতু শুধুমাত্র সে পর্যায়েই সীমিত ছিল, যে পর্যায়ে সাধারণ জীবজন্তুর থাকে অর্থাৎ শুধু পেট ও দেহের সেবা করা, আত্মার সেবা কিংবা তার তৃপ্তি সম্পর্কে কোনো কিছুই না ভাবা বা না দেখা, সেহেতু তারা এই বৈষয়িকতা ও সামাজিকতায় যত উন্নতি অগ্রগতিই লাভ করুক না কেন, চন্দ্র ও মঙ্গলের অভিযানে যত বিজয়ই অর্জন করুক না কেন এবং কৃত্রিম উপগ্রহে সমগ্র নভোমণ্ডলকে ভবে দিক না কেন, কিন্তু এসব পেট ও শরীরের সেবা, তার চেয়ে অধিক কিছু নয়। আত্মার স্থায়ী শান্তি ও তৃপ্তির জন্য এগুলোতে কিছুই নেই। কাজেই কুরআন তাদেরকে অন্ধ বধির বলেছে। এ আয়াতে তাদের উপলব্ধি দর্শন ও শ্রবণকে অস্বীকার করা হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, তাদের যা বুঝা বা উপলব্ধি করা উচিত ছিল তারা তা করেনি, যা দেখা উচিত ছিল তা তারা দেখেনি, যা কিছু তাদের শোনা উচিত ছিল তা তারা শোনেনি। আর যা কিছু বুঝেছে, দেখেছে এবং শুনেছে। তা সবই ছিল সাধারণ জীব জন্তুর পর্যায়ের বুঝা. দেখা ও শোনা যাতে গাধা ঘোড়া গরু ছাগল সবই সমান।

এজন্যই উল্লিখিত আয়াতের শেষাংশে এসব লোক সম্পর্কে বলা হয়েছে- اُولٰٓئِكَ كَالْاَنْعَامِ অর্থাৎ এরা চুতষ্পদ জীব জানোয়ারের মতো, শুধুমাত্র শরীরের বর্তমান কাঠামোর সেবায় নিয়েজিত। খাদ্য আর পেটই হলো তাদের চিন্তার সর্বোচ্চ স্তর। অতঃপর বলা হয়েছে بَلْ هُمْ اَضَلُّ অর্থাৎ এরা চুতষ্পদ জীব জানোয়ারের চেয়েও নিকৃষ্ট। তার কারণ চতুষ্পদ জীব জানোয়ার শরিয়তের বিধি নিষেধের আওতাভুক্ত নয়। তাদের জন্য কোনো সাজা শাস্তি কিংবা দান প্রতিদান নেই। তাদের লক্ষ্য যদি শুধুমাত্র জীবন ও শরীর কাঠামোতে সীমিত থাকে তবেই যথেষ্ট। কিন্তু মানুষকে যে স্বীয় কৃতকর্মের হিসাব দিতে হবে। সে জন্য তাদের সুফল কিংবা শাস্তি ভোগ করতে হবে। কাজেই এসব বিষয়কেই নিজেদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বলে সাব্যস্ত করে বর্সা জীবজন্তুর চেয়েও অধিক নিবুর্দ্ধিতা। তাছাড়া জীব জানোয়ার নিজের প্রভু ও মালিকের সেবা যথার্থই সম্পাদন করে। পক্ষান্তরে অকৃতজ্ঞ নাফরমান মানুষ স্বীয় মালিক, পরওয়ারদেগারের আনুগত্যে ত্রুটি করতে থাকে। সে কারণে তারা চতুষ্পদ জানোয়ার অপেক্ষা বেশি নির্বোধ ও গাফেল প্রতিপন্ন হয়। কাজেই বলা হয়েছে– اُولٰٓئِكَ هُمُ الْغٰفِلُوْنَ অর্থাৎ এরাই হলো প্রকৃত গাফেল। وَلِلّٰهِ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى فَادْعُوْهُ بِهَا অর্থাৎ সব উত্তম নাম আল্লাহরই জন্য নির্ধারিত রয়েছে। কাজেই তোমরা তাঁকে সেসব নামেই ডাক।

'আসমায়ে হুসনা' বা উত্তম নামের বিশ্লেষণ : উত্তম নাম বলতে সে সমস্ত নামকে বুঝানো হয়েছে, যা গুণ-বৈশিষ্ট্যের পরিপূর্ণতার সর্বোচ্চ স্তরকে চিহ্নিত করে। বলাবাহুল্য, কোনো গুণ বা বৈশিষ্ট্যের পরিপূর্ণতার সর্বোচ্চ স্তর যার উর্ধ্বে আর কোনো স্তর থাকতে পারে না, তা শুধুমাত্র সহান পালনকর্তা আল্লাহ জাল্লা শানুহুর জন্যই নির্দিষ্ট। তাঁকে ছাড়া কোনো সৃষ্টির পক্ষে এই স্তরে উন্নীত হওয়া সম্ভব নয়। কারণ যে কোনো পূর্ণ ব্যক্তি অপেক্ষা অপর ব্যক্তি পূর্ণতার এবং জ্ঞানী অপেক্ষা অধিক জ্ঞানী হতে পারে। وَفَوْقَ كُلِّ ذِىْ عِلْمٍ عَلِيْمٌ -এর মর্মও তাই। প্রত্যেক জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি অপেক্ষা অপর ব্যক্তি অধিকতর জ্ঞানসম্পন্ন হতে পারে।

সে কারণেই আয়াতে এমন ভাষা প্রয়োগ করা হয়েছে, যাতে বুঝা যায় যে, এসব আসমায়ে হুসনা বা উত্তম নামসমূহ একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের বৈশিষ্ট্য। এ বৈশিষ্ট্য লাভ করা অন্য কারও পক্ষে সম্ভব নয়; কাজেই فَادْعُوْهُ بِهَا অর্থাৎ এ বিষয়টি যখন জানা গেল যে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কিছু আসমায়ে হুসনা রয়েছে এরং সে সমস্ত আসমা বা নাম একমাত্র আল্লাহর সত্তার সাথেই নির্দিষ্ট তখন আল্লাহকে যখনই ডাকবে এসব নামে ডাকাই কর্তব্য।

ডাকা কিংবা আহ্বান করা হলো 'দোয়া' শব্দের অর্থ। আর দোয়া শব্দটি কুরআনে দুই অর্থে ব্যবহৃত হয়। একটি হলো আল্লাহর জিকির প্রশংসা ও তাসবীহ তাহলীলের সাথে যুক্ত। আর অপরটি হলো নিজের অভীষ্ট বিষয় প্রার্থনা এবং বিপদাপদ থেকে মুক্তি আর সকল জটিলতার নিরসনকল্পে সাহায্যের আবেদন সম্পর্কিত। এ আয়াতে فَادْعُوْهُ بِهَا শব্দটি উভয়

অর্থেই ব্যাপক। অতএব আয়াতের মর্ম হলো এই যে, হামদ বিপদাপদে মুক্তি দান আর প্রয়োজন মেটানোও শুধু তাঁরই ক্ষমতায়। কাজেই যদি প্রশংসা বা গুণকীর্তন করতে হয়, তবে তাঁরই করবে আর নিজের প্রয়োজন বা উদ্দেশ্য সিদ্ধি কিংবা বিপদ মুক্তির জন্য ডাকতে হলে, সাহায্য প্রার্থনা করতে হলে শুধু তাঁকেই ডাকবে, তাঁরই কাছে সাহায্য চাইবে।

আর ডাকার সে পদ্ধতিও বলে দেওয়া হয়েছে যে, এসব আসমায়ে হুসনা বা উত্তম নামে ডাকবে যা আল্লাহর নাম রূপে প্রমাণিত

দোয়া করার কিছু আদবকায়দা : এ আয়াতের মাধ্যমে গোটা মুসলিম জাতি দোয়া প্রার্থনার বিষয়ে দুটি হেদায়েত বা দিকনির্দেশ লাভ করেছে। প্রথমত আল্লাহ ব্যতীত কোনো সত্তাই প্রকৃত হামদ ছানা কিংবা বিপদ মুক্তি বা উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য ডাকার যোগ্য নয়। দ্বিতীয়ত তাঁকে ডাকার জন্য মানুষ এমন মুক্ত নয় যে, যে কোনো শব্দে ইচ্ছা ডাকতে থাকবে; বরং আল্লাহ বিশেষ অনুগ্রহ পরবশ হয়ে আমাদেরকে সেসব শব্দসমষ্টিও শিখিয়ে দিয়েছেন যাতে আমরা নিজের মতে শব্দের পরিবর্তন না করি। কারণ আল্লাহর গুণ বৈশিষ্ট্যের সব দিক লক্ষ্য রেখে তাঁর মহত্ত্বের উপযোগী শব্দ চয়ন করতে পারা মানুষের সাধ্যের উর্ধ্বে।

ইমাম বুখারী ও মুসলিম হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে রেওয়ায়েত করেছেন যে, রাসূলে কারীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ তা'আলার নিরানব্বইটি নাম রয়েছে। যে ব্যক্তি এগুলোকে আয়ত্ত করে নিবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। এই নিরানব্বইটি নাম সম্পর্কে ইমাম তিরমিযী ও হাকেম (র.) সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন।

আল্লাহর নিরানব্বই নাম পাঠাতে যে উদ্দেশ্যের জন্যই প্রার্থনা করা হয় তা কবুল হয়। আল্লাহ স্বয়ং ওয়াদা করেছেন– ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ অর্থাৎ 'তোমরা যদি আমাকে ডাক, তাহলে আমি তোমাদের প্রার্থনা মঞ্জুর করব।' উদ্দেশ্য সিদ্ধি কিংবা জটিলতা বা বিপদমুক্তির জন্য দোয়া ছাড়া অন্য কোনো পন্থা এমন নেই যাতে কোনো না কোনো ক্ষতির আশঙ্কা থাকবে না এবং ফল লাভ নিশ্চিত হবে। নিজের প্রয়োজনের জন্য আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করাতে কোনো ক্ষতির সম্ভাবনা নেই তদুপরি একটা নগদ লাভ হলো এই যে, দোয়া যে একটি ইবাদত তার ছওয়াব দোয়াকারীর আমলনামায় তখনই লেখা হয়ে যায়। হাদীসে বর্ণিত আছে اَلدُّعَاءُ مُخُّ الْعِبَادَةِ অর্থাৎ দোয়া হলো ইবাদতের মগজ। যে উদ্দেশ্যে মানুষ দোয়া করে অধিকাংশ সময় হুবহু সে উদ্দেশ্যটি সিদ্ধ হয়ে যায়। আবার কোনো কোনো সময় এমনও হয় যে, যে বিষয়টিকে প্রার্থনাকারী নিজের উদ্দেশ্য সাব্যস্ত করেছিল, তা তার পক্ষে কল্যাণকর নয় বলে আল্লাহ স্বীয় অনুগ্রহে সে দোয়াকে অন্য দিকে ফিরিয়ে দেন, যা তার জন্য একান্ত উপকারী ও কল্যাণকর। আর আল্লাহর হামদ ও ছানার মাধ্যমে জিকির করা হলো ঈমানের খোরাক। এর দ্বারা আল্লাহ তা'আলার প্রতি মানুষের মহব্বত ও আগ্রহ বৃদ্ধি পায় এবং তাতে সামান্য পার্থিব দুঃখকষ্ট হলেও শীঘ্রই সহজ হয়ে যায়।

সেজন্যই বুখারী মুসলিম তিরমিযী ও নাসায়ীর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে লোক চিন্তাভাবনা, পেরেশানি কিংবা কোনো জটিল বিষয়ের সম্মুখীন হবে, তার পক্ষে নিম্নলিখিত বাক্যগুলো পড়া উচিত : তাতে সমস্ত জটিলতা সহজ হয়ে যাবে। বাক্যগুলো এরূপ–

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْعَظِيْمُ الْحَلِيْمُ . لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ . لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ .

'মুসতাদরাকে হাকেমে' হযরত আনাস (রা.)-এর উদ্ধৃতিতে বর্ণিত রয়েছে যে, রাসূলে কারীম ﷺ হযরত ফাতেমা যাহরা (রা.)-কে বলেন, আমার অসিয়তগুলো শুনে নিতে (এবং সেমতে আমল করতে) তোমার বাধা কিসে। সে অসিয়তটি হলো এই যে, সকাল-সন্ধ্যায় এই দোয়াটি পড়ে নেবে–

يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ اَسْتَغِيْثُ اَصْلِحْ لِيْ شَانِيْ كُلَّهُ وَلَا تَكِلْنِيْ اِلٰى نَفْسِيْ طَرْفَةَ عَيْنٍ

এটি সমস্ত মকসূদ ও জটিলতা থেকে মুক্তি লাভের জন্য তুলনাহীন। সারকথা হলো, উল্লিখিত আয়াতের এ বাক্যে উম্মতকে দুটি হেদায়েত দেওয়া হয়েছে। একটি হলো এই যে, যে কোনো উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য যে কোনো বিপদ থেকে মুক্তি লাভের জন্য শুধুমাত্র আল্লাহকেই ডাকবে, কোনো সৃষ্টিকে নয়। অপরটি হলো, তাঁকে সে নামেই ডাকবে যা আল্লাহ তা'আলার নাম হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে। তার শব্দের কোনো পরিবর্তন করবে না।

আয়াতের পরবর্তী বাক্যে এ সম্পর্কেই বলা হয়েছে– وَذَرُوا الَّذِيْنَ يُلْحِدُوْنَ فِيْٓ اَسْمَآئِهٖ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ অর্থাৎ সেসমস্ত লোকের কথা ছাড়ুন, যারা আল্লাহ তা'আলার আসমায়ে হুসনার ব্যাপারে বাঁকা চাল অবলম্বন করে। তারা তাদের কৃত বাঁকামীর প্রতিফল পেয়ে যাবে। অভিধান অনুযায়ী اَلْحَادٌ (ইলহাদ) অর্থ ঝুঁকে পড়া এবং মধ্যমপন্থা থেকে সরে পড়া। এ কারণেই বগলী কবরকে لَحْد বলা হয়। কারণ তাতেও লাশ মাঝ থেকে সরিয়ে রাখা হয়। কুরআনের পরিভাষায় اَلْحَادٌ বলা হয় কুরআনের সঠিক অর্থ ছেড়ে তাতে এদিক সেদিকের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ জুড়ে দেওয়াকে।

এ আয়াতে রাসূলে করীম ﷺ-কে হেদায়েত দেওয়া হয়েছে যে, আপনি এমন সব লোকের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেলুন, যারা আল্লাহ তা'আলার আসমায়ে হুসনার ব্যাপারে বক্রতা অর্থাৎ অপব্যাখ্যা ও অপবিশ্লেষণ করে।

আল্লাহর নামের বিকৃতি সাধনের নিষেধাজ্ঞা এবং তার কয়েকটি দিক : আল্লাহর নামের অপব্যাখ্যা ও বিকৃতির কয়েকটি পন্থাই হতে পারে। আর সে সমস্তই এ আয়াতে বর্ণিত বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্ত।

প্রথমত আল্লাহ তা'আলার জন্য এমন কোনো নাম ব্যবহার করা যা কুরআন হাদীসের দ্বারা প্রমাণিত নয়। সত্যনিষ্ঠ আলেমগণ এ ব্যাপারে একমত যে, আল্লাহর নাম ও গুণাবলির ব্যাপারে কারোই এমন কোনো অধিকার নেই যে, যা ইচ্ছা নাম রাখবে কিংবা যে গুণে ইচ্ছা তাঁর গুণকীর্তন করবে। শুধুমাত্র সে সমস্ত শব্দ প্রয়োগ করাই আবশ্যক যা কুরআন ও সুন্নাহতে আল্লাহ তা'আলার নাম কিংবা গুণবাচক হিসাবে উল্লিখিত রয়েছে। যেমন আল্লাহকে 'করীম' বলা যাবে, কিন্তু 'সখী' বা 'দাতা' বলা যাবে না। 'নূর' বলা যাবে, কিন্তু জ্যোতি বলা যাবে না। 'শাফী' বলা যাবে, কিন্তু 'তবীব' বা চিকিৎসক বলা যাবেনা। কারণ এই দ্বিতীয় শব্দগুলো প্রথম শব্দের সমার্থক হলেও কুরআন হাদীসে বর্ণিত হয়নি।

ইসলামে বিকৃতি সাধনের দ্বিতীয় পন্থাটি হলো আল্লাহর যে সমস্ত নাম কুরআন হাদীসে উল্লেখ রয়েছে সেগুলোর মধ্যে কোনো নামকে অশোভন মনে করে বর্জন বা পরিহার করা। এতে সে নামের প্রতি বেআদবী বা অবজ্ঞা প্রদর্শন বুঝা যায়।

কোনো লোককে আল্লাহ তা'আলার জন্য নির্ধারিত নামে সম্বোধন করা জায়েজ নয় : তৃতীয় পন্থা হলো আল্লাহর জন্য নির্ধারিত নাম অন্য কোনো লোকের জন্য ব্যবহার করা। তবে এতে এই ব্যাখ্যা রয়েছে যে, আসমায়ে হুসনাসমূহের মধ্যে কিছু নাম এমনও আছে যেগুলো স্বয়ং কুরআন ও হাদীসে অন্যান্য লোকের জন্যও ব্যবহার করা হয়েছে। আর কিছু নাম রয়েছে যেগুলো শুধুমাত্র আল্লাহ ব্যতীত অপর কারোও জন্য ব্যবহার কারার কোনো প্রমাণ কুরআন হাদীসে নেই। যেসব নাম আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও জন্য ব্যবহার করা কুরআন হাদীস দ্বারা প্রমাণিত, সেসব নাম অন্যের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। যেমন– রাহীম, রাশীদ, আলী, কারীম, আজীজ প্রভৃতি। পক্ষান্তরে আল্লাহ ছাড়া অপর কারো জন্য যেসব নামের ব্যবহার কুরআন হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়, সেগুলো একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট। আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো জন্য এগুলোর ব্যবহার করাই উল্লিখিত 'এলহাদ' তথা বিকৃতি সাধনের অন্তর্ভুক্ত এবং নাজায়েজ ও হারাম। যেমন রাহমান, বুরহান, রাযযাক, খালেক, গাফফার, কুদ্দূস প্রভৃতি।

তদুপরি এই নির্দিষ্ট নামগুলো যদি আল্লাহ ছাড়া অপর করো ক্ষেত্রে কোনো ভ্রান্ত বিশ্বাসের ভিত্তিতে হয় যে, যাকে এসব শব্দের দ্বারা সম্বোধন করা হচ্ছে তাকেই যদি খালেক কিংবা রাযযাক মনে করা হয়, তাহলে তা সম্পূর্ণ কুফর। আর বিশ্বাস যদি ভ্রান্ত না হয়, শুধুমাত্র অমনোযোগিতা কিংবা না বুঝার দরুন কাউকে খালেক, রাযযাক, রাহমান, কিংবা সুবহান বলে ডেকে থাকে, তাহলে তা যদিও কুফর নয়, কিন্তু শিরকিসুলভ শব্দ হওয়ার কারণে কঠিন পাপের কাজ বটে।

উল্লিখিত আয়াতসমূহের সারমর্ম এই যে, তাদের হঠকারিতা এবং সত্য গ্রহণে অনীহার দরুন তিনি যেন মনঃক্ষুণ্ণ না হন। কারণ সত্য বিষয়টি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও হৃদয়গ্রাহী ভঙ্গিতে পৌঁছে দেওয়াই ছিল তাঁর নির্ধারিত দায়িত্ব। তা তিনি সম্পাদনও করেছেন। তাঁর উপর অর্পিত দায় দায়িত্বও শেষ হয়ে গেছে। এখন কারও মানা না মানার ব্যাপারটি হলো একান্ত ভাগ্য সংক্রান্ত। এতে তাঁর কোনো হাত নেই। সুতরাং তিনি কেন দুঃখিত হবেন।

এ সূরার বিষয়বস্তুগুলোর মধ্যে তিনটি বিষয় ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যথা–১. তাওহীদ। ২. রেসালাত। ৩. আখেরাত। আর এই তিনটি বিষয়ই ঈমান ও ইসলামের মূলভিত্তি। এগুলোর মধ্যে তাওহীদ ও রেসালতের বিষয় পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে সবিস্তারে আলোচিত হয়েছে। উল্লিখিত আয়াতগুলোর মধ্যে শেষ দুটি আয়াতে বর্ণিত হয়েছে আখেরাত ও কিয়ামত সংক্রান্ত বিষয়। এগুলো নাজিলের পিছনে বিশেষ একটি ঘটনাও কার্যকর ছিল। তাই তাফসীরে ইমাম ইবনে জরীর (র.) এবং আবদ ইবনে হুমাইদ (রা.) হযরত কাতাদাহ (রা.)-এর রেওয়ায়েতে উদ্ধৃত করেছেন যে, মক্কার কুরাইশরা রাসূলে কারীম ﷺ-এর নিকট ঠাট্টা ও বিদ্রূপচ্ছলে জিজ্ঞেস করল যে, আপনি কিয়ামত আগমনের সংবাদ দিয়ে দিয়ে মানুষকে এ ব্যাপারে ভীতি প্রদর্শন করে থাকন, এ ব্যাপারে যদি আপনি সত্য হয়ে থাকেন, তবে নির্দিষ্ট করে বলুন, কিয়ামত কোন সালের কত তারিখে অনুষ্ঠিত হবে, যাতে আমরা তা আসার আগেই তৈরি হয়ে যেতে পারি। আপনার এবং আমাদের মাঝে আত্মীয়তার যে সম্পর্ক বিদ্যমান তার দাবিও তাই। আর যদি সাধারণ লোকদেরকে বিষয়টি আপনি বলতে না চান, তবে অন্তত আমাদেরকে বলে দিন। এ ঘাটনার ভিত্তিতেই নাজিল হয় يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ السَّاعَةِ আয়াতটি।

এখানে উল্লিখিত سَاعَةٌ শব্দটি আরবি ভাষায় সামান্য সময় বা মুহূর্তকে বলা হয়। আভিধানিকভাবে যার কোনো বিশেষ পরিসীমা নেই। আর গণিতিক ও জ্যোতির্বিদদের পরিভাষায় রাত ও দিনের চব্বিশ অংশের এক অংশকে বলা হয় سَاعَةٌ

(সা'আত) যাকে বাংলায় ঘণ্টা নামে অভিহিত করা হয়। কুরআনের পরিভাষায় এ শব্দটি সে দিবসকে বুঝাবার জন্য ব্যবহৃত হয়, যা হবে সমগ্র সৃষ্টির মৃত্যুদিবস এবং সেদিনকেও বলা হয় যাতে সমগ্র সৃষ্টি পুনরায় জীবিত হয়ে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে উপস্থিত হবে। أَيَّانَ (আইয়্যানা) অর্থ– কবে। আর مُرْسٰى (মুরসা) অর্থ অনুষ্ঠিত কিংবা স্থাপিত হওয়া। لَا يُجَلِّيهَا শব্দটি تَجْلِيَةٌ থেকে গঠিত। এর অর্থ– প্রকাশিত এবং খোলা। بَغْتَةً (বাগতাতান) অর্থ– অকস্মাৎ। حَفِيٌّ (হাফিয়্যুন) অর্থ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, জ্ঞানী ও অবহিত ব্যক্তি। প্রকৃতপর্বে এমন লোককে 'হাফী বলা হয়, যে প্রশ্ন করে বিষয়ের পরিপূর্ণ তথ্য অনুসন্ধান করে নিতে পারে।

কাজেই আয়াতের মর্ম দাঁড়াল এই যে, এরা আপনার নিকট কিয়ামত নির্দিষ্টতার জ্ঞান শুধুমাত্র আমার পালনকর্তারই রয়েছে এ ব্যাপারে পূর্ব থেকে কারও জানা নেই এবং সঠিক সময় ও কেউ জানতে পারবে না। নির্ধারিত সময়টি যখন উপস্থিত হয়ে যাবে, ঠিক তখনই আল্লাহ তা'আলা তা প্রকাশ করে দেবেন। এতে কোনো মাধ্যম থাকবে না। কিয়ামতের ঘটনাটি আসমান ও জমিনের জন্য একান্ত ভয়ানক ঘটনা হবে। সেগুলোও টুকরা টুকরা হয়ে উড়তে থাকবে। সুতরাং এহেন ভয়াবহ ঘটনা সম্পর্কে পূর্ব থেকে প্রকাশ না করাই বিচক্ষণতার তাকাদা। তা না হলে যারা বিশ্বনবী তাদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠত এবং যারা অবিশ্বাসী মুনকির তারা অধিকতর ঠাট্টা-বিদ্রূপের সুযোগ পেয়ে যেত। সেজন্যই বলা হয়েছে–
لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً অর্থাৎ কিয়ামত তোমাদের নিকট আকস্মিকভাবেই এসে উপস্থিত হবে।

বুখারী ও মুসলিমের হাদীসে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর রেওয়ায়েতক্রমে উদ্ধৃত করা হয়েছে যে, রাসূল কারীম ﷺ কিয়ামতের আকস্মিক আগমন সম্পর্কে বলেছেন, 'মানুষ নিজ নিজ কাজে পরিব্যাপ্ত থাকবে। এক লোক খরিদদারকে দেখাবার উদ্দেশ্যে কাপড়ের থান খুলে সামনে ধরে থাকবে, সে (সওদার) এ বিষয়টিও সাব্যস্ত করতে পারবে না, এরই মধ্যে কিয়ামত এসে যাবে। এক লোক তার উষ্ট্রনীর দুধ দোহন করে নিয়ে যেতে থাকবে এবং তখনও তা ব্যবহার করতে পারবে না, এরই মধ্যে কিয়ামত সংঘটিত হয়ে যাবে। কেউ নিজের হাউজ মেরামত করতে থাকবে– তা থেকে অবসর হওয়ার পূর্বেই কিয়ামত সংঘটিত হয়ে যাবে। কেউ হয় তো খাবার লোকমা হাতে তুলে নেবে, তা মুখে দেওয়ার পূর্বেই কিয়ামত হয়ে যাবে।, –[রূহুল মা'আনী]

যেভাবে মানুষের ব্যক্তিগত মৃত্যুর তারিখ ও সময়-ক্ষণ অনির্দিষ্ট ও গোপন রাখার মাঝে বিরাট তাৎপর্য নিহিত রয়েছে, তেমনিভাবে কিয়ামতকেও যা সমগ্র বিশ্বের সামগ্রিক মৃত্যুরই নামান্তর, তাকে গোপন এবং অনির্দিষ্ট রাখার মধ্যেও বিপুল রহস্য ও তাৎপর্য বিদ্যমান। তা না হলে একে তো এতই বিশ্ববাসীদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠবে এবং পার্থিব যাবতীয় কাজকর্ম অত্যন্ত কঠিন হয়ে দাঁড়ায়, তদুপরি অবিশ্বাসীরা সুদীর্ঘ সময়ের কথা শুনে ঠাট্টা-বিদ্রূপের সুযোগ পাবে এবং তাদের ঔদ্ধত্য অধিকতর বৃদ্ধি পাবে।

সে জন্যই হেকমত ও বিচক্ষণতার তাগিদে তার তারিখ বা দিন ক্ষণকে অনির্দিষ্ট রাখা হয়েছে, যাতে করে মানুষ তার ভয়াবহতা সম্পর্কে সদা ভীত থাকে। আর এ ভয়ই মানুষকে অপরাধ প্রবণতা থেকে বিরত রাখার জন্য সর্বাধিক কার্যকর পন্থা। সুতরাং উক্ত আয়াতগুলোতে এ জ্ঞানই দেওয়া হয়েছে যে, কোনো একদিন কিয়ামতের আগমন ঘটবে, আল্লাহর সমীপে সবারই উপস্থিত হতে হবে এবং তাদের সারা জীবনের ছোট বড় ভালো মন্দ সমস্ত কার্যকলাপের হিসাব নিকাশ নেওয়া হবে। যার ফলে হয় জান্নাতের অকল্পনীয় ও অনন্ত নিয়ামতরাজি লাভ হবে অথবা জাহান্নামের সেই কঠিন ও দুর্বিষহ যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি ভোগ করতে হবে, যার কল্পনা করতেও পিত্ত পানি হয়ে যেতে থাকবে। যখন কারও বিশ্বাস ও প্রত্যয় থাকবে, তখন কোনো বুদ্ধিমানের কাজ এমন হওয়া উচিত নয় যে, আমলের অবকাশকে এমন বিতর্কের মাঝে নষ্ট করবে যে, এ ঘটনা কবে কখন সংঘটিত হবে; বরং বুদ্ধিমত্তার সঠিক দাবি হলো বয়সের অবকাশকে গনিমত মনে করে সে দিবসের জন্য তৈরি হওয়ার কাজে ব্যাপৃত থাকা এবং আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নির্দেশ লঙ্ঘন করতে গিয়ে এমনভাবে ভয় করা, যেমন আগুনকে ভয় করা হয়।

আয়াতের শেষাংশে পুনরায় তাদের প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করে বলা হয়েছে– يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا প্রথম প্রশ্নটি ছিল এ প্রসঙ্গে যে, এমন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা যখন সংঘটিত হবেই তখন আমাদেরকে তার যথাযথ ও সঠিক তারিখ, দিন-ক্ষণ ও সময় সম্পর্কে অবহিত করা প্রয়োজন। তারই উত্তর দেওয়া হয়েছে যে, এ প্রশ্নটি একান্ত নির্বুদ্ধিতা ও বোকামিপ্রসূত। পক্ষান্তরে বুদ্ধিমত্তার দাবি হলো এর নির্দিষ্টতা সম্পর্কে কাউকে অবহিত না করা, যাতে প্রত্যেক আমলকারী প্রতি মুহূর্তে আখেরাতের আজাবের ভয় করে নেক আমলঅবলম্বন করার এবং অসৎকর্ম থেকে বিরত থাকার প্রতি পরিপূর্ণ মনোযোগী হয়।

www.almodina.com

আর এ দ্বিতীয় প্রশ্নের উদ্দেশ্য হলো তাদের একথা বুঝা যে, মহানবী ﷺ অবশ্যই কিয়ামতের তারিখ ও সময়-ক্ষণ সম্পর্কে অবগত এবং আল্লাহ তা'আলার নিকট থেকে এ বিষয়ে অবশ্যই তিনি জ্ঞান লাভ করে নিয়েছেন, কিন্তু তিনি কোনো বিশেষ কারণে সে কথা বলছেন না। সেজন্যই নিজ আত্মীয়তার দোহাই দিয়ে তারা তাঁকে প্রশ্ন করল যে, আমাদেরকে কিয়ামতের পরিপূর্ণ সন্ধান দিয়ে দিন। এ প্রশ্নের উত্তরে ইরশাদ হয়েছে– قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللّٰهِ وَلٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ অর্থাৎ আপনি লোকদেরকে বলে দিন যে, প্রকৃতপক্ষে কিয়ামতের সঠিক তারিখ সম্পর্কিত জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ ছাড়া তাঁর কোনো ফেরেশতা কিংবা নবী-রাসূল পর্যন্ত জানতে পারেন না। মানুষ নিজেদের মূর্খতাবশত মনে করে যে, কিয়ামত অনুষ্ঠানের তারিখ সম্পর্কিত জ্ঞান নবী কিংবা রাসূল হওয়ার জন্য অপরিহার্য। এরই ভিত্তিতে তারা এই প্রেক্ষিত আবিষ্কার করে যে, মহানবী ﷺ-এর যখন এ ব্যাপারে পরিপূর্ণ ইলম নেই, কাজেই এটা তাঁর নবী না হওয়ারই লক্ষণ (নাউযুবিল্লাহ)। কিন্তু উপরোল্লিখিত আলোচনায় জানা গেছে যে, এ ধরনের ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত।

সারকথা হলো, যারা এ ধরনের প্রশ্ন উত্থাপন করে, তারা বড়ই বোকা, নির্বোধ ও অজ্ঞ। না এরা বিষয়ের তাৎপর্য সম্পর্কে অবগত, না জানে তার অন্তর্নিহিত রহস্য ও প্রশ্ন করার পদ্ধতি।

তবে হ্যাঁ, মহানবী ﷺ-কে কিয়ামতের কিছু নিদর্শন ও লক্ষণাদি সম্পর্কিত জ্ঞান দান করা হয়েছে। আর তা হলো এই যে, এখন তা নিকটবর্তী। এ বিষয়টি মহানবী ﷺ বহু বিশুদ্ধ হাদীসে অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করে দিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে– "আমার আবির্ভাব এবং কিয়ামত এমনভাবে মিশে আছে, যেমন মিশে থাকে হাতের দুটি আঙ্গুল।" –[তিরমিযী]

কোনো কোনো ইসলামি কিতাবে পৃথিবীর বয়স সাত হাজার বছর হয়েছে বলে যে কথা বলা হয়েছে, তা রাসূলে কারীম ﷺ-এর কোনো হাদীস নয়; বরং তা ইসরাঈলী মিথ্যা রেওয়ায়েত থেকে নেওয়া বিষয়।

ভূমণ্ডল বিষয়ক পণ্ডিতগণ আধুনিক গবেষণার মাধ্যমে পৃথিবীর বয়স লক্ষ লক্ষ বছর হয়েছে বলে মত প্রকাশ করেছেন। কুরআনের কোনো আয়াত কিংবা কোনো বিশুদ্ধ হাদীসের সাথে এ নতুন গবেষণার কোনো বিরোধ ঘটে না। ইসলামি রেওয়ায়েতসমূহে এহেন অলীক রেওয়ায়েত ঢুকিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যই হয় তো ইসলামের বিরুদ্ধে মানুষের মনে কু-ধারণা সৃষ্টি করা, যার খণ্ডন স্বয়ং বিশুদ্ধ হাদীসেও বিদ্যমান রয়েছে। বিশুদ্ধ এক হাদীসে রাসূলে কারীম ﷺ স্বয়ং উম্মতকে লক্ষ্য করে ইরশাদ করেছেন যে "পূর্ববর্তী উম্মতদের তুলনায় তোমাদের উদাহরণ এমন যেন এক কালো বলদের গায়ে একটা সাদা লোম।" এতে যে কেউ অনুমান করতে পারে যে, হুজুর ﷺ-এর দৃষ্টিতেও পৃথিবীর বয়স এত দীর্ঘ, যার অনুমান করাও কঠিন। সে কারণেই হাফেজ ইবনে হাযেম উন্দুলুসী (র.) বলেছেন যে, আমাদের বিশ্বাস দুনিয়ার বয়স সম্পর্কে সঠিক কোনো ধারণা করা যায় না; তার সঠিক জ্ঞান শুধুমাত্র আল্লাহ তা'আলারই রয়েছে। –[মুরাগী]

শব্দ বিশ্লেষণ

قَدْ ذَرَأْنَا : সীগাহ جمع متكلم বহছ اثبات فعل ماضى قريب معروف বাব فَتَحَ মাসদার اَلذَّرْءُ মূলবর্ণ (ذ ـ ر ـ ء) জিনস مهموز لام অর্থ– অবশ্যই আমি সৃষ্টি করেছি।

يُلْحِدُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ اثبات فعل مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِلْحَادُ মূলবর্ণ (ل ـ ح ـ د) জিনস صحيح অর্থ– তারা বক্রতা অবলম্বন করে।

سَيُجْزَوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ اثبات فعل مضارع مجهول বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْجَزَاءُ মূলবর্ণ (ج ـ ز ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– অতি শীঘ্রই তাদেরকে প্রতিদান দেওয়া হবে।

يَهْدُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ اثبات فعل مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْهِدَايَةُ মূলবর্ণ (ه ـ د ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– তারা পথ দেখায়।

حَقٌّ : শব্দটি একবচন; বহুবচন حُقُوْقٌ অর্থ– সত্য, ন্যায়, সঠিক।

مَتِيْنٌ : সীগাহ واحد مذكر বহছ صفت مشبهة অর্থ– বলিষ্ঠ, অতি পাকা।

اَجَلٌ : শব্দটি একবচন; বহুবচন اٰجَالٌ অর্থ– নির্ধারিত।

حَدِيْثٌ : শব্দটি একবচন; বহুবচন اَحَادِيْثُ অর্থ– কথা, বাণী।

مُرْسٰهَا : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم ظرف বাব افعال মাসদার اَلْاِرْسَاءُ মূলবর্ণ (ر ـ س ـ و) জিনস ناقص واوى অর্থ– সংঘটিত হওয়ার সময়, ঘটার সময়।

www.almodina.com

قُلْ لَّآ اَمْلِكُ لِنَفْسِیْ نَفْعًا وَّلَا ضَرًّا اِلَّا مَا شَآءَ اللّٰهُ ؕ وَلَوْ كُنْتُ اَعْلَمُ الْغَیْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَیْرِ ۛۚ وَمَا مَسَّنِیَ السُّوْٓءُ ۛؕ اِنْ اَنَا اِلَّا نَذِیْرٌ وَّبَشِیْرٌ لِّقَوْمٍ یُّؤْمِنُوْنَ (۱۸۸)

অনুবাদ : (১৮৮) আপনি বলে দিন, আমি তো না আমার নিজের জন্যও কোনো উপকারের ক্ষমতা রাখি আর না কোনো অপকারের কিন্তু এতটুকু যতটুকু আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করেন, আর যদি আমি গায়েবের বিষয়সমূহ জানতে পারতাম, তাহলে আমি বহু কল্যাণ সঞ্চয় করতে পারতাম এবং কোনো ক্ষতি আমাকে স্পর্শ করতে পারত না, আমি তো কেবল ভয় প্রদর্শনকারী ও সুসংবাদ প্রদানকারী সেই সকল লোকদের জন্য যারা ঈমান রাখে।

هُوَ الَّذِیْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِیَسْكُنَ اِلَیْهَا ۚ فَلَمَّا تَغَشّٰىهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِیْفًا فَمَرَّتْ بِهٖ ۚ فَلَمَّآ اَثْقَلَتْ دَّعَوَا اللّٰهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ اٰتَیْتَنَا صَالِحًا لَّنَكُوْنَنَّ مِنَ الشّٰكِرِیْنَ (۱۸۹)

(১৮৯) সেই আল্লাহ এমন যিনি তোমাদেরকে এক প্রাণী [অর্থাৎ আদম (আ.)] হতে সৃষ্টি করেছেন, এবং তা হতেই তার জুড়ি [হওয়াকে] সৃষ্টি করেছেন, যেন সে তার জুড়ির সান্নিধ্যে শান্তি লাভ করে, অনন্তর স্বামী যখন স্ত্রীতে উপগত হলো, তখন সে লঘুভার গর্ভ ধারণ করল, অতঃপর সে তা নিয়ে চলাফেরা করতে থাকল, অনন্তর যখন সে ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ল, তখন স্বামী স্ত্রী উভয়ই তাদের পরওয়ারদেগার আল্লাহর সমীপে প্রার্থনা করতে রইল- যদি আপনি আমাদেরকে নিখুঁত সুস্থ সন্তান দান করেন, তাহলে আমরা খুব শোকর করব।

فَلَمَّآ اٰتٰىهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهٗ شُرَكَآءَ فِیْمَآ اٰتٰىهُمَا ۚ فَتَعٰلَى اللّٰهُ عَمَّا یُشْرِكُوْنَ (۱۹۰)

(১৯০) অতঃপর যখন আল্লাহ তাদেরকে নিখুঁত সুস্থ সন্তান দান করলেন, তখন আল্লাহ প্রদত্ত বস্তুকে তারা উভয়ে আল্লাহর শরিক সাব্যস্ত করতে লাগল, বস্তুতঃ আল্লাহ হচ্ছেন তাদের শিরক হতে পবিত্র।

শাব্দিক অনুবাদ

(১৮৮) قُلْ আপনি বলে দিন لَّآ اَمْلِكُ আমি তো না ক্ষমতা রাখি لِنَفْسِیْ আমার নিজের জন্যও نَفْعًا কোনো উপকারের وَّلَا ضَرًّا আর না কোনো অপকারের اِلَّا مَا شَآءَ اللّٰهُ কিন্তু এতটুকু যতটুকু আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করেন وَلَوْ كُنْتُ اَعْلَمُ الْغَیْبَ আর যদি আমি গায়েবের বিষয়সমূহ জানতে পারতাম لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَیْرِ তাহলে আমি বহু কল্যাণ সঞ্চয় করতে পারতাম؛ وَمَا مَسَّنِیَ السُّوْٓءُ এবং কোনো ক্ষতি আমাকে স্পর্শ করতে পারত না اِنْ اَنَا اِلَّا نَذِیْرٌ আমি তো কেবল ভয় প্রদর্শনকারী وَّبَشِیْرٌ ও সুসংবাদ প্রদানকারী لِّقَوْمٍ یُّؤْمِنُوْنَ সেই সকল লোকদের জন্য যারা ঈমান রাখে।

(১৮৯) هُوَ الَّذِیْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ সেই আল্লাহ এমন যিনি তোমাদেরকে এক প্রাণী [অর্থাৎ আদম (আ.)] হতে সৃষ্টি করেছেন؛ وَّجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا এবং তা হতেই তার জুড়ি [হওয়াকে] সৃষ্টি করেছেন لِیَسْكُنَ اِلَیْهَا যেন সে তার জুড়ির সান্নিধ্যে শান্তি লাভ করে فَلَمَّا تَغَشّٰىهَا অনন্তর স্বামী যখন স্ত্রীতে উপগত হলো حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِیْفًا তখন সে লঘুভার গর্ভ ধারণ করল فَمَرَّتْ بِهٖ অতঃপর সে তা নিয়ে চলাফেরা করতে থাকল فَلَمَّآ اَثْقَلَتْ অনন্তর যখন সে ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ল دَّعَوَا اللّٰهَ رَبَّهُمَا তখন স্বামী স্ত্রী উভয়ই তাদের পরওয়ারদেগার আল্লাহর সমীপে প্রার্থনা করতে রইল- لَئِنْ اٰتَیْتَنَا صَالِحًا যদি আপনি আমাদেরকে নিখুঁত সুস্থ সন্তান দান করেন لَّنَكُوْنَنَّ مِنَ الشّٰكِرِیْنَ তাহলে আমারা খুব শোকর করব।

(১৯০) فَلَمَّآ اٰتٰىهُمَا صَالِحًا অতঃপর যখন আল্লাহ তাদেরকে নিখুঁত সুস্থ সন্তান দান করলেন جَعَلَا لَهٗ شُرَكَآءَ فِیْمَآ اٰتٰىهُمَا তখন আল্লাহ প্রদত্ত বস্তুকে তারা উভয়ে আল্লাহর শরিক সাব্যস্ত করতে লাগল فَتَعٰلَى اللّٰهُ عَمَّا یُشْرِكُوْنَ বস্তুতঃ আল্লাহ হচ্ছেন তাদের শিরক হতে পবিত্র।

www.almodina.com

অনুবাদ	আয়াত
অনুবাদ : (১৯১) তবে কি তারা এমন সব বস্তুকে অংশী সাব্যস্ত করে যারা কোনো কিছু সৃষ্টি করতে পারে না; বরং তারা নিজেরাই সৃষ্ট।	اَيُشْرِكُوْنَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْـًٔا وَّهُمْ يُخْلَقُوْنَ (١٩١)
(১৯২) আর না তারা তাদের কোনো রকম সাহায্য করতে পারে আর না তারা নিজেরা নিজেদেরও সাহায্য করতে পারে।	وَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ لَهُمْ نَصْرًا وَّلَآ اَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُوْنَ (١٩٢)
(১৯৩) আর যদি তোমরা তাদেরকে কোনো কথা বলে দিতে আহ্বান কর, তবে তারা তোমাদের কথার অনুসরণ করে না, তোমাদের পক্ষে উভয় বিষয়ই সমান– তোমরা তাদেরকে আহ্বান কর অথবা নীরব থাক।	وَاِنْ تَدْعُوْهُمْ اِلَى الْهُدٰى لَا يَتَّبِعُوْكُمْ ؕ سَوَآءٌ عَلَيْكُمْ اَدَعَوْتُمُوْهُمْ اَمْ اَنْتُمْ صَامِتُوْنَ (١٩٣)
(১৯৪) বাস্তবিকই তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে যাদের উপাসনা কর, তারাও তো তোমাদেরই মতো বান্দা, অতএব, তোমরা তাদেরকে ডাক, অতঃপর তাদের উচিত যেন তারা তোমাদের প্রার্থনা পূর্ণ করে যদি তোমরা [দাবিতে] সত্যবাদী হও।	اِنَّ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ عِبَادٌ اَمْثَالُكُمْ فَادْعُوْهُمْ فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ (١٩٤)
(১৯৫) তাদের কি পা আছে, যা দ্বারা তারা চলতে পারে? অথবা তাদের কি হাত আছে, যা দ্বারা তারা কোনো কিছু ধরতে পারে? অথবা তাদের কি চক্ষু আছে, যা দ্বারা তারা দেখতে পায়? অথবা তাদের কি কান আছে, যা দ্বারা তারা শুনতে পায়? আপনি বলে দিন যে, তোমরা তোমাদের সকল অংশীদারদেরকে ডেকে নাও, তৎপর [সকলে একত্রে] আমার ক্ষতি সাধনের তদবির কর এবং আমাকে একটুও অবকাশ দিও না।	اَلَهُمْ اَرْجُلٌ يَّمْشُوْنَ بِهَآ ؗ اَمْ لَهُمْ اَيْدٍ يَّبْطِشُوْنَ بِهَآ ؗ اَمْ لَهُمْ اَعْيُنٌ يُّبْصِرُوْنَ بِهَآ ؗ اَمْ لَهُمْ اٰذَانٌ يَّسْمَعُوْنَ بِهَا ؕ قُلِ ادْعُوْا شُرَكَآءَكُمْ ثُمَّ كِيْدُوْنِ فَلَا تُنْظِرُوْنِ (١٩٥)

শাব্দিক অনুবাদ

(১৯১) اَيُشْرِكُوْنَ তবে কি তারা এমন সব বস্তুকে অংশী সাব্যস্ত করে مَا لَا يَخْلُقُ شَيْـًٔا যারা কোনো কিছু সৃষ্টি করতে পারে না وَّهُمْ يُخْلَقُوْنَ বরং তারা নিজেরাই সৃষ্ট।

(১৯২) وَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ لَهُمْ نَصْرًا আর না তারা তাদের কোনো রকম সাহায্য করতে পারে وَّلَآ اَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُوْنَ আর না তারা নিজেরা নিজেদেরও সাহায্য করতে পারে।

(১৯৩) وَاِنْ تَدْعُوْهُمْ اِلَى الْهُدٰى আর যদি তোমরা তাদেরকে কোনো কথা বলে দিতে আহ্বান কর لَا يَتَّبِعُوْكُمْ তবে তারা তোমাদের কথার অনুসরণ করে না سَوَآءٌ عَلَيْكُمْ তোমাদের পক্ষে উভয় বিষয়ই সমান– اَدَعَوْتُمُوْهُمْ তোমরা তাদেরকে আহ্বান কর اَمْ اَنْتُمْ صَامِتُوْنَ অথবা নীরব থাক।

(১৯৪) اِنَّ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ বাস্তবিকই তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে যাদের উপাসনা কর عِبَادٌ اَمْثَالُكُمْ তারাও তো তোমাদেরই মতো বান্দা فَادْعُوْهُمْ অতএব, তোমরা তাদেরকে ডাক فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لَكُمْ অতঃপর তাদের উচিত যেন তারা তোমাদের প্রার্থনা পূর্ণ করে اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ যদি তোমরা [দাবিতে] সত্যবাদী হও।

(১৯৫) اَلَهُمْ اَرْجُلٌ তাদের কি পা আছে يَّمْشُوْنَ بِهَآ যা দ্বারা তারা চলতে পারে اَمْ لَهُمْ اَيْدٍ অথবা তাদের কি হাত আছে يَّبْطِشُوْنَ بِهَآ যা দ্বারা তারা কোনো কিছু ধরতে পারে? اَمْ لَهُمْ اَعْيُنٌ অথবা তাদের কি চক্ষু আছে يُّبْصِرُوْنَ بِهَآ যা দ্বারা তারা দেখতে পায়? اَمْ لَهُمْ اٰذَانٌ অথবা তাদের কি কান আছে يَّسْمَعُوْنَ بِهَا যা দ্বারা তারা শুনতে পায়? قُلِ আপনি বলে দিন যে ادْعُوْا شُرَكَآءَكُمْ তোমরা তোমাদের সকল অংশীদারদেরকে ডেকে নাও ثُمَّ كِيْدُوْنِ তৎপর [সকলে একত্রে] আমার ক্ষতি সাধনের তদবির কর فَلَا تُنْظِرُوْنِ এবং আমাকে একটুও অবকাশ দিও না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(১৮৮) قوله قُلْ لَّآ اَمْلِكُ لِنَفْسِىْ نَفْعًا وَّلَا ضَرًّا اِلَّا مَا شَآءَ اللّٰهُ الخ **আয়াতের শানে নুযূল– ১ :** হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, মক্কাবাসীরা বলল, তোমার রব কি দ্রব্য মূল্য বেড়ে যাবার আগে তার কম মূল্য সম্পর্কে তোমাকে অবগত কী করেননি? তাহলে তো তা খরিদ করে রেখে লাভবান হতে পারতে এবং সে ফসলহীন ভূমি সম্পর্কে অবগত কি করেননি, তাহলে তুমি সেখান থেকে ফলনশীল ভূমিতে চলে যেতে। তখন মক্কাবাসীদের অহেতুক জিজ্ঞাসাবাদের জবাবে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

শানে নুযূল– ২ : অপর এক বর্ণনায় বর্ণিত রয়েছে যে, বনী মুস্তালিক অভিযান থেকে নবী কারীম ﷺ যখন প্রত্যাবর্তন করেন, তখন পথিমধ্যে প্রচণ্ড বাতাস আক্রান্ত করে। সে মুহূর্তে রেফআর মৃত্যু সংবাদ দেওয়া হলো, যার মধ্যে ছিল প্রচণ্ড নেফাক। তখন রাসূল ﷺ বললেন, আমার উট কোথায়? মুনাফিক নেতা আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই বলল, এমন ব্যক্তি সম্পর্কে কি তোমাদের আশ্চার্য বোধ হয় না? যে ব্যক্তি মদিনায় এক ব্যক্তি মারা গিয়েছে সে সংবাদটুকু বলতে পারল, কিন্তু নিজের উট সম্পর্কে কিছুই বলছেন না। তখন রাসূল ﷺ বললেন যে, মুনাফিকদের থেকেই কোনো কোনো মানুষ এমন বলে আর আমার উট রয়েছে পর্বত চূড়ায় তার লোম এক গাছে ঝড়িয়ে আছে। সুতরাং তারা সেখানে গিয়ে তা পেয়েছে। তখন আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই এর বিদ্রূপ করার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[বাহরে মুহীত–৪৩৩/৪]

(১৮৯) قوله هُوَ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ اِلَيْهَا الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** অত্র আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের স্বীয় অসীম ও পরিপূর্ণ ক্ষমতার একটি নিদর্শন হযরত আদম ও হাওয়ার জন্ম বৃত্তান্ত প্রসঙ্গে নাজিল হয় এবং তাতে আদম ও বিবি হাওয়ার অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছিল। বিবি হাওয়ার গর্ভলগ্নে শয়তান তাকে নানাভাবে ভীতি বিভ্রান্ত করতে চেষ্টা করেছিল। শয়তান বিবি হাওয়ার প্রসূত সন্তানের নাম আব্দুল হারিছ রাখতে পরামর্শ দিয়েছিল। মূলত হারিছ ছিল শয়তানের নাম, কিন্তু শয়তানের সেই প্রতারণা কার্যকরী হতে পারেনি। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, বিবি হাওয়ার গর্ভজাত সন্তানের নাম তারা আব্দুল্লাহ বা ওবায়দুল্লাহ, আব্দুর রহমান বা ওবায়দুর রহমান রাখতেন। কিন্তু সেই সন্তান শৈশবেই মৃত্যুবরণ করলে বিবি হাওয়া শোকাতুর হয়ে পড়েছিলেন। ইত্যবসরে চতুর শয়তান তাকে পরামর্শ দিয়েছিল যে, পরবর্তী সময়ে যদি তার সন্তানের নাম আব্দুল হারিছ রাখে তাহলে সে জীবিত থাকবে। সুতরাং পরবর্তী সময়ে জন্মগ্রহণকারী ছেলেন নাম আব্দুল হারিছ রেখেছিলেন। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাদের সেই ভুল সংশোধন করে দিয়েছিলেন এবং তাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন।

(১৯৫) قوله قُلِ ادْعُوْا شُرَكَآءَكُمْ ثُمَّ كِيْدُوْنِ فَلَا تُنْظِرُوْنِ الاية **আয়াতের শানে নুযূল :** কুরআনের ভাষায় মক্কার কাফেরদের প্রতিমা ও দেবদবীর ক্ষমার গোমর তুলে ধরায় কাফেররা খুব ক্ষিপ্ত হলো। তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এই বলে ধমক দিতে লাগল যে, হে মুহাম্মদ! তুমি আমাদের প্রতিমাগুলোর কুৎসা রটনা হতে বিরত থাক, নতুবা তোমার উপর বিরাট আপদ-বিপদ এসে পড়বে, তুমি ধ্বংস হয়ে যাবে। এ বক্তব্যের প্রতিবাদেই আল্লাহ তা'আলা قُلِ ادْعُوْا شُرَكَآءَكُمْ ثُمَّ كِيْدُوْنِ فَلَا تُنْظِرُوْنِ আয়াতটি নাজিল করেন।

قوله قُلْ لَّآ اَمْلِكُ لِنَفْسِىْ نَفْعًا وَّلَا ضَرًّا الخ আয়াত মুশরিক ও সাধারণ মানুষের সেই ভ্রান্ত আকিদার খণ্ডন করা হয়েছে: যা তারা নবী-রাসূলগণের ব্যাপারে পোষণ করত যে, তাঁরা গায়বি বিষয়েও অবগত রয়েছেন। তাঁদের জ্ঞানও আল্লাহর মতোই সমগ্র বিশ্বের প্রতিটি অনু পরমাণুতে পরিব্যাপ্ত এবং তাঁরা কল্যাণ ও অকল্যাণের মালিক। যাকে ইচ্ছা কল্যাণ দান কিংবা যার জন্য ইচ্ছা অকল্যাণ করার ক্ষমতাও তাদেরই হাতে।

এ আয়াতে তাদের এই শিরকি আকিদার খণ্ডন উপলক্ষে বলা হয়েছে যে, ইলমে গায়ব এবং সমগ্র বিশ্বের প্রতিটি অণু-পরমাণুর ব্যাপক ইলম শুধুমাত্র আল্লাহ তা'আলারই রয়েছে। এটা তাঁরই বিশেষ বৈশিষ্ট্য। এতে কোনো সৃষ্টিকে অংশীদার সাব্যস্ত করা, তা ফেরেশতাই হোক আর নবী ও রাসূলগণই হোক– শিরকি এবং মহাপাপ। তেমনিভাবে প্রত্যেক লাভ ক্ষতি কিংবা মঙ্গলামঙ্গলের মালিক হওয়াও এককভাবে আল্লাহ তা'আলারই গুণ। এতে কাউকে অংশীদার দাঁড় করানোও শিরকি। বস্তুত এই শিরকি বা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সাথে কোনো অংশীদারিত্বের আকিদাকে খণ্ডন করার জন্যই কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে এবং রাসূলে মাকবুল ﷺ -এর আবির্ভাব ঘটেছে।

কুরআনে কারীম অসংখ্য আয়াতে এ বিষয়টি একান্ত প্রকৃষ্টভাবে বিশ্লেষণ করেছে। ইরশাদ হয়েছে, ইলমে গায়ব এবং ব্যাপক জ্ঞান যে জ্ঞানের বাইরে কোনো কিছুই থাকতে পারে না, তা শুধুমাত্র আল্লাহ তা'আলারই একক গুণ। তেমনি সাধারণ ক্ষমতা অর্থাৎ যাবতীয় কল্যাণ অকল্যাণ লাভ লোকসান সবই যার অন্তর্ভুক্ত তাও আল্লাহর একক গুণ। এতে আল্লাহ ছাড়া অপর কাউকে অংশীদার সাব্যস্ত করা শিরক।

www.almodina.com

এ আয়াতে মহানবী ﷺ -কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, আপনি ঘোষণা করে দিন যে, আমি নিজের লাভ-ক্ষতিরও মালিক নই অন্যের লাভ-ক্ষতি তো দূরের কথা।

এভাবে তিনি যেন একথাও ঘোষণা করে দেন যে, আমি আলেমে গায়ব নই যে, যাবতীয় পূর্ণ জ্ঞান আমার থাকা অনিবার্য হবে। তাছাড়া আমার যদি গায়বি জ্ঞান থাকতই, তবে আমি প্রত্যেকটি লাভজনক বস্তুই হাসিল করে নিতাম. কোনো একটি লাভও আমার হাতছাড়া হতে পারত না। আর প্রতিটি ক্ষতিকর বিষয় থেকে সর্বদা রক্ষিত থাকতাম। কখনও কোনো ক্ষতি আমার ধারেকাছে পর্যন্ত পৌঁছতে পারত না। অথচ এতদুভয় বিষয়ের কোনোটিই বাস্তব নয়। বহু বিষয় রয়েছে যা রাসূলে কারীম ﷺ আয়ত্ত করতে চেয়েছেন, কিন্তু তা করতে পারেননি। তাছাড়া বহু দুঃখকষ্ট রয়েছে যা থেকে আত্মরক্ষার জন্য তিনি ইচ্ছা করেছেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাতে পতিত হতে হয়েছে। হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় রাসূল ﷺ ইহরাম বেঁধে সাহাবায়ে কেরামের সাথে ওমরা করার উদ্দেশ্যে হেরেমের সীমানা পর্যন্ত এগিয়ে যান, কিন্তু হেরেম শরীফে প্রবেশ কিংবা ওমরা করা তখনও সম্ভব হতে পারেনি: সবাইকে ইহরাম খুলে ফিরে আসতে হয়েছে।

তেমনিভাবে ওহুদ যুদ্ধে মহানবী ﷺ আহত হন এবং মুসলমানদেরকে সাময়িক পরাজয় বরণ করতে হয়। এমনি আরও বহু অতি প্রসিদ্ধ ঘটনা রয়েছে যা মহানবী ﷺ -এর জীবনে সংঘটিত হয়েছে।

আর এমনসব ঘটনা প্রকাশের উদ্দেশ্যও হয়তো এই ছিল যে, যাতে মানুষের সামনে কার্যত একথা স্পষ্ট করে দেওয়া যায় যে, নবী-রাসূলগণ আল্লাহ তা'আলার নিকট সবচেয়ে বেশি উত্তম ও প্রিয় সৃষ্টি, কিন্তু তবুও তাঁরা খোদায়ী জ্ঞান ও শক্তির অধিকারী নন। এভাবে সুস্পষ্ট করে দেওয়ার উদ্দেশ্যও এই, যাতে মানুষ এমন কোনো বিভ্রান্তিতে পতিত না হয় যে, নবী রাসূলগণ আল্লাহর গুণাবলি ও বৈশিষ্ট্যাবলির অধিকারী। যেমন, ইহুদি-খ্রিস্টানরা এমনিভাবে নিজেদের রাসূলগণ সম্পর্কে খোদায়ী গুণাবলির অধিকারী হওয়ার বিশ্বাস করে শিরক ও কুফরে পতিত হয়েছিল।

এ আয়াত একথাও স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, নবী-রাসূলগণ সর্বশক্তিমানও নন এবং ইলমে গায়েবের মালিকও নন; বরং তাঁরা জ্ঞান ও কুদরতের ততটুকুরই অধিকারী হয়েছিলেন, যতটা আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁদেরকে নিজের পক্ষ থেকে দান করেছিলেন।

অবশ্য এতে কোনো রকম সংশয়ের অবকাশ নেই যে, তাঁদেরকে জ্ঞানের যতটা অংশ দান করা হয়েছে, তা সমগ্র সৃষ্টির সমষ্টিগগত জ্ঞানের চাইতেও বহু বেশি। বিশেষ করে আমাদের রাসূলে কারীম ﷺ -কে তাঁর পূর্ববর্তী সমগ্র সৃষ্টির সমপরিমাণ জ্ঞান দান করা হয়েছে। অর্থাৎ সমস্ত নবী-রাসূলগণকে যে পরিমাণ জ্ঞান দান করা হয়েছে সে সমুদয় এবং তার চেয়েও বহুগুণ বেশি জ্ঞান দান করা হয়েছিল। আর এই দানকৃত জ্ঞান অনুযায়ী তিনি শত সহস্র গোপন বা সাধারণভাবে অজানা বিষয়ের সংবাদ দিয়েছেন, যার সত্যতা সম্পর্কে সাধারণ অসাধারণ নির্বিশেষে সবাই প্রত্যক্ষ করেছেন। ফলে বলা যেতে পারে যে, রাসূলে কারীম ﷺ -কে লক্ষ লক্ষ গায়বি বিষয়ের জ্ঞান দান করা হয়েছিল। কিন্তু একে কুরআনের পরিভাষায় ইলমে গায়ব বলা হয় না। কাজেই রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জ্ঞানকে 'ইলমে গায়ব' বলা যেতে পারে না।

শব্দ বিশ্লেষণ

إِسْتَكْثَرْتُ : সীগাহ واحد متكلم বহছ اثبات فعل ماضى معروف বাব إِسْتِفْعَالٌ মাসদার اَلْإِسْتِكْثَارُ মূলবর্ণ (ك . ث . ر) জিনস صحيح অর্থ– আমি বহু অর্জন করে নিতে পারতাম।

تَغَشَّا : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ اثبات فعل ماضى معروف বাব تَفَعُّلٌ মাসদার اَلتَّغَشِّىْ মূলবর্ণ (غ . ش . ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– সে আবৃত করল।

خَفِيْفًا : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْخِفَّةُ মূলবর্ণ (خ . ف . ف) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– লঘু, হালকা।

تَدْعُوْا : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ اثبات فعل مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلدَّعْوَةُ মূলবর্ণ (د . ع . و) জিনস ناقص واوى অর্থ– তুমি ডাক, তুমি আহ্বান কর।

يَمْشُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ اثبات فعل مضارع معروف বাব ضرب মাসদার المشى মূলবর্ণ (م . ش . ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– তারা চলাফেরা করে।

كِيْدُوْنِ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব ضَرَبَ মাসদার الكيد মূলবর্ণ (ك . ى . د) জিনস اجوف يائى অর্থ– তোমরা ষড়যন্ত্র কর।

অনুবাদ	আয়াত
অনুবাদ : (১৯৬) নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলাই হচ্ছেন আমার মদদগার, যিনি এই কিতাব অবতরণ করেছেন, আর তিনি নেক বান্দাদের সাহায্য করে থাকেন।	إِنَّ وَلِـيِّ اللّٰهُ الَّذِيْ نَزَّلَ الْكِتٰبَ ۖ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصّٰلِحِيْنَ (١٩٦)
(১৯৭) আর তোমরা আল্লাহ ব্যতীত যাদের উপাসনা কর, তারা না তোমাদের কোনো সাহায্য করতে পারে, আর না নিজেরা নিজেদের সাহায্য করতে পারে।	وَالَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ نَصْرَكُمْ وَلَآ اَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُوْنَ (١٩٧)
(১৯৮) আর যদি তাদেরকে কোনো কথা বলে দেওয়ার জন্য ডাক, তাও শুনে না, আর আপনি তাদেরকে দেখছেন যেন তারা আপনার প্রতি তাকিয়ে আছে, অথচ তারা কিছুই দেখে না।	وَاِنْ تَدْعُوْهُمْ اِلَى الْهُدٰى لَا يَسْمَعُوْا ؕ وَتَرٰىهُمْ يَنْظُرُوْنَ اِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُوْنَ (١٩٨)
(১৯৯) বাহ্যিক [দৃষ্টিতে তাদের সাথে যে] আচরণ [সমীচীন মনে হয়, তা] গ্রহণ করুন, আর ভালো কাজের শিক্ষা দিতে থাকুন এবং মূর্খদের হতে একদিকে সরে থাকুন।	خُذِ الْعَفْوَ وَاْمُرْ بِالْعُرْفِ وَاَعْرِضْ عَنِ الْجٰهِلِيْنَ (١٩٩)
(২০০) আর যদি শয়তানের পক্ষ হতে কোনো প্ররোচনা আপনাকে প্ররোচিত করতে চায়, তবে আল্লাহ তা'আলার আশ্রয় প্রার্থনা করতে থাকুন, নিশ্চয় তিনি অতি শ্রবণকারী, মহাজ্ঞানী।	وَاِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطٰنِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ ؕ اِنَّهٗ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ (٢٠٠)

শাব্দিক অনুবাদ

(১৯৬) إِنَّ وَلِـيِّ اللّٰهُ নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলাই হচ্ছেন আমার মদদগার الَّذِيْ نَزَّلَ الْكِتٰبَ যিনি এই কিতাব অবতরণ করেছেন وَهُوَ يَتَوَلَّى الصّٰلِحِيْنَ আর তিনি নেক বান্দাদের সাহায্য করে থাকেন।

(১৯৭) وَالَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ আর তোমরা আল্লাহ ব্যতীত যাদের উপাসনা কর لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ نَصْرَكُمْ তারা না তোমাদের কোনো সাহায্য করতে পারে وَلَآ اَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُوْنَ আর না নিজেরা নিজেদের সাহায্য করতে পারে।

(১৯৮) وَاِنْ تَدْعُوْهُمْ اِلَى الْهُدٰى আর যদি তাদেরকে কোনো কথা বলে দেওয়ার জন্য ডাক لَا يَسْمَعُوْا তাও শুনে না وَتَرٰىهُمْ আর আপনি তাদেরকে দেখছেন يَنْظُرُوْنَ اِلَيْكَ যেন তারা আপনার প্রতি তাকিয়ে আছে وَهُمْ لَا يُبْصِرُوْنَ অথচ তারা কিছুই দেখে না।

(১৯৯) خُذِ الْعَفْوَ বাহ্যিক [দৃষ্টিতে তাদের সাথে যে] আচরণ [সমীচীন মনে হয়, তা] গ্রহণ করুন وَاْمُرْ بِالْعُرْفِ আর ভালো কাজের শিক্ষা দিতে থাকুন وَاَعْرِضْ عَنِ الْجٰهِلِيْنَ এবং মূর্খদের হতে একদিকে সরে থাকুন।

(২০০) وَاِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطٰنِ نَزْغٌ আর যদি শয়তানের পক্ষ হতে কোনো প্ররোচনা আপনাকে প্ররোচিত করতে চায় فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ তবে আল্লাহ তা'আলার আশ্রয় প্রার্থনা করতে থাকুন اِنَّهٗ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ নিশ্চয় তিনি অতি শ্রবণকারী, মহাজ্ঞানী।

www.almodina.com

অনুবাদ : (২০১) নিশ্চয় যারা আল্লাহকে ভয় করে, যখন তাদের প্রতি শয়তানের পক্ষ হতে কোনো আশঙ্কা দেখা দেয়, তখন তারা [আল্লাহর] স্মরণে লিপ্ত হয়ে যায়, ফলে অমনি তাদের চক্ষু খুলে যায়।	إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَٰٓئِفٌ مِّنَ الشَّيْطَٰنِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ (٢٠١)
(২০২) আর যারা শয়তানের অনুগত হয় তারা তাদেরকে গোমরাহির প্রতি আকর্ষণ করতে থাকে, অতঃপর তারা বিরত হয় না।	وَإِخْوَٰنُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ (٢٠٢)
(২০৩) আর যখন আপনি তাদের সম্মুখে কোনো মু'জিযা প্রকাশ না করেন, তখন তারা বলে, আপনি এই মু'জিযা কেন আনয়ন করলেন না? আপনি বলে দিন, আমি তারই অনুসরণ করি, যে আদেশ আমার পরওয়ারদেগারের পক্ষ হতে আমার নিকট প্রেরিত হয়, এটা [অর্থাৎ কুরআন] হচ্ছে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে প্রমাণসমূহ, আর হোদায়েত ও রহমত সেই সমস্ত লোকের জন্য যারা ঈমান রাখে।	وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِم بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا ۚ قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ مِن رَّبِّي ۚ هَٰذَا بَصَآئِرُ مِن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (٢٠٣)
(২০৪) আর যখন কুরআন পাঠ করা হয়, তখন মনোনিবেশের সাথে তা শ্রবণ করো এবং চুপ থেকো, যেন তোমাদের উপর রহমত বর্ষিত হয়।	وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (٢٠٤)

শাব্দিক অনুবাদ

(২০১) إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا নিশ্চয় যারা আল্লাহকে ভয় করে إِذَا مَسَّهُمْ طَٰٓئِفٌ مِّنَ الشَّيْطَٰنِ যখন তাদের প্রতি শয়তানের পক্ষ হতে কোনো আশঙ্কা দেখা দেয় تَذَكَّرُوا তখন তারা [আল্লাহর] স্মরণে লিপ্ত হয়ে যায় فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ ফলে অমনি তাদের চক্ষু খুলে যায়।

(২০২) وَإِخْوَٰنُهُمْ আর যারা শয়তানের অনুগত হয় يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ তারা তাদেরকে গোমরাহির প্রতি আকর্ষণ করতে থাকে ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ অতঃপর তারা বিরত হয় না।

(২০৩) وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِم بِآيَةٍ আর যখন আপনি তাদের সম্মুখে কোনো মু'জিযা প্রকাশ না করেন قَالُوا তখন তারা বলে, لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا আপনি এই মু'জিযা কেন আনয়ন করলেন না? قُلْ আপনি বলে দিন إِنَّمَا أَتَّبِعُ আমি তারই অনুসরণ করি مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ مِن رَّبِّي যে আদেশ আমার পরওয়ারদেগারের পক্ষ হতে আমার নিকট প্রেরিত হয় هَٰذَا بَصَآئِرُ مِن رَّبِّكُمْ এটা [অর্থাৎ কুরআন] হচ্ছে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে প্রমাণসমূহ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ আর হোদায়েত ও রহমত لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ সেই সমস্ত লোকের জন্য যারা ঈমান রাখে।

(২০৪) وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ আর যখন কুরআন পাঠ করা হয় فَاسْتَمِعُوا لَهُ তখন মনোনিবেশের সাথে তা শ্রবণ করো وَأَنصِتُوا এবং চুপ থেকো فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ যেন তোমাদের উপর রহমত বর্ষিত হয়।

অনুবাদ	আয়াত
অনুবাদ : (২০৫) আর হে মানব! স্মরণ কর স্বীয় প্রতিপালককে নিজ অন্তঃকরণে বিনয়ের সাথে এবং ভয়ের সাথে, আর উচ্চৈস্বর ব্যতিরেকে নিম্নস্বরের সাথে প্রত্যুষে ও সন্ধ্যায়, আর গাফেলদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।	وَاذْكُرْ رَّبَّكَ فِيْ نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَّخِيْفَةً وَّدُوْنَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ وَلَا تَكُنْ مِّنَ الْغٰفِلِيْنَ (٢٠٥)
(২০৬) নিশ্চয় যারা [অর্থাৎ ফেরেশতাগণ] তোমার প্রতিপালকের নিকটে রয়েছে, তারা তাঁর ইবাদত করতে অহংকার করে না এবং তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করে, আর তাঁকেই সেজদা করে।	اِنَّ الَّذِيْنَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِهٖ وَيُسَبِّحُوْنَهٗ وَلَهٗ يَسْجُدُوْنَ (٢٠٦)

শাব্দিক অনুবাদ

(২০৫) وَاذْكُرْ رَّبَّكَ আর হে মানব! স্মরণ কর স্বীয় প্রতিপালককে فِيْ نَفْسِكَ নিজ অন্তঃকরণে تَضَرُّعًا বিনয়ের সাথে وَّخِيْفَةً এবং ভয়ের সাথে وَّدُوْنَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ আর উচ্চৈস্বর ব্যতিরেকে নিম্নস্বরের সাথে بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ প্রত্যুষে ও সন্ধ্যায় وَلَا تَكُنْ مِّنَ الْغٰفِلِيْنَ আর গাফেলদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।

(২০৬) اِنَّ الَّذِيْنَ عِنْدَ رَبِّكَ নিশ্চয় যারা [অর্থাৎ ফেরেশতাগণ] তোমার প্রতিপালকের নিকটে রয়েছে لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِهٖ তারা তাঁর ইবাদত করতে অহংকার করে না وَيُسَبِّحُوْنَهٗ এবং তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করে وَلَهٗ يَسْجُدُوْنَ আর তাঁকেই সেজদা করে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(২০০) قوله وَاِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطٰنِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ الخ **আয়াতের শানে নুযূল- ১ :** সাঈদ ইবনে মানসূর, ইবনে আবী শাইবা, বুখারী, আবূ দাউদ, নাসায়ী, নাহহাস নাসেখ গ্রন্থে, ইবনে জারীর, ইবনুল মুনযির ইবনে আবী হাতেম, তাবারী, আবুশ শায়খ, ইবনে মারদুভিয়া দালায়েল গ্রন্থে এবং বায়যাভী প্রমুখ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রা.)-এর বরাত দিয়ে বর্ণনা করেন যে, আলোচ্য আয়াত মানুষের মতানৈক্য সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। অপর এক মতানুসারে আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবী (আ.)-কে মানবীয় উত্তম গুণাবলি ক্ষমা প্রদর্শনকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। সে সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে।

শানে নুযূল- ২ : ইবনে জারীর, ইবনে যায়েদ হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, خُذِ الْعَفْوَ الخ আয়াত যখন নাজিল হয়, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন "ক্রোধের সময় কিরূপভাবে হবে হে আমার রব!" তখন পরবর্তী আয়াত وَاِمَّا يَنْزَغَنَّكَ الخ নাজিল হয়। -[ফাতহুল কাদীর : ২৮২/২, বাহরে মুহীত : ৪৪৪/৪, ইবনে কাছীর : ২৮৩/২]

(২০৪) قوله وَاِذَا قُرِئَ الْقُرْاٰنُ فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ الخ **আয়াতের শানে নুযূল- ১ :** ইবনে জারীর ও ইবনে আবী হাতেম প্রমুখ হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর বরাত দিয়ে বলেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূল ﷺ-এর পিছনে নামাজরত অবস্থায় সাহাবায়ে কেরাম উচ্চৈঃস্বরে কেরাত পাঠ করতেন। রাসূল ﷺ -এর পিছনে একতেদা করলে নীরবতা অবলম্বন করা সম্পর্কে নির্দেশ দিয়ে আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়েছে।

শানে নুযূল- ২ : ইবনে মারদুভিয়া ও বায়হাকী হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ কেরাত পাঠ করতেন, পিছন থেকে সাহাবীগণও কেরাত পাঠ করত। এতে রাসূল ﷺ -এর কেরাতে এলোমেলোর সৃষ্টি হতো এমনভাবে কেরাতে বাধা দিয়ে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

শানে নুযূল- ৩ : যুহরীর এক বর্ণনায় রয়েছে, আনসারীর এক যুবক ছিল সে রাসূল ﷺ -এর সাথে সাথে কেরাত পাঠ করত। সুতরাং তাকে নিষেধ করেই আলোচ্য আয়াতের অবতারণা হয়। -[ফাতহুল কাদীর : ২৮২/২, ইবনে কাছীর : ২৮৬/২, কুরতুবী-৩১০/৭]

www.almodina.com

শানে নুযূল– ৪ : কাতাদা বলেন, প্রাথমিক যুগে নামাজরত অবস্থায় কেউ আসলে নামাজিকে জিজ্ঞেস করত নামাজ কত রাকাত আদায় করেছ, আর কত রাকাত বাকি রয়েছে? তখন নামাজে কথা না বলে নীরবতা অবলম্বন করার জন্য আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

শানে নাযূল– ৫ : মুজাহিদ বলেন, প্রাথমিক যুগে মানুষেরা নামাজের মধ্যেই নিজেদের প্রয়োজনাদি নিয়ে আলোচনা করত। ফলে তা হতে নিষেধ করে لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ অবতীর্ণ করা হয়। –[কুরতুবী]

শানে নাযূল– ৬ : হযরত আতা, ইবনে জুবাইর, মুজাহিদ, আমর ইবনে দিনার ও আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক প্রমুখ বলেন যে, আলোচ্য আয়াত খুৎবা পাঠকালে নীরবতা পালন করা সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। তবে এ মতামতটি নেহায়েতই দুর্বল। কারণ খোতবায় কুরআন হতে খুব কম অংশ পাঠ করা হয়। এ আয়াতটি হচ্ছে মাক্কী। খোতবা সংক্রান্ত বিষয়টি হিজরতের পরবর্তী সময়ের। ইবনে জুবাইর বলেন যে-যেখানে জেহরী পড়তে হয়, সেখানে নীরব থাকা সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। –[বাহরে মুহীত : ৪৪৮/৪]

(২০৩) قوله وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** মক্কার লোকেরা রাসূলুল্লাহ ﷺ–এর নিকট অসংখ্য মু'জিযা মানুষের সামনে আসা সত্ত্বেও নিজেদের জেদ ও হঠকারিতাবশত নিজের পক্ষ হতে নির্ধারণ করে নতুন নতুন মু'জিযা দেখানোর দাবি করে। তাদের এহেন কাজের প্রতিবাদে আল্লাহ তা'আলা আয়াত নাজিল করেন। তার সারসংক্ষেপ হলো, পয়গম্বরের মু'জিযা তাঁর নবুয়ত ও রিসালাতের একটি সাক্ষ্যও প্রমাণ স্বরূপ। বস্তুত বাদীর দাবি যখন কোনো বিশ্বস্ত ও নিশ্চিত সাক্ষ্য-প্রমাণে প্রমাণিত হয়ে যায় এবং প্রতিপক্ষও যখন তার উপর প্রতিবাদ করে না তখন তাকে পৃথিবীর কোনো আদালতই এমন অধিকার দান করে না যে, সে বাদীর নিকট এমন কোনো দাবি পেশ করবে যে, অমুক অমুক বিশেষ লোকের সাক্ষী উপস্থিত করলেই আমরা তা মেনে নিব, অন্যথা নয়। বর্তমান সাক্ষ্য-প্রমাণের উপর কোনো প্রকার জেরা আরোপ ব্যতীত আমরা মেনে নিব না। অতএব বহুবিধ প্রকাশ্য প্রকৃষ্ট মু'জিযা প্রত্যক্ষ করার পর বিরোধীদের এ কথা বলা যে, অমুক প্রকার মু'জিযা যদি দেখাতে পারেন তবেই আমরা আপনাকে রাসূল বলে মেনে নিব– এটা একান্তই বিদ্বেষমূলক দাবি যা কোনো আদালতই যথার্থ বলে স্বীকার করতে পারে না। অতএব হে নবী! আপনি তাদেরকে এ উত্তর দিয়ে দিন যে, নিজের ইচ্ছামতো কোনো রকম মু'জিযা প্রদর্শন করা আমার কাজ নয়; বরং আমার আসল কাজ হলো সে সমস্ত আহকামের অনুসরণ করা যা আমার প্রতিপালকের পক্ষ হতে আমার উপর ওহীর মাধ্যমে প্রেরণ করা হয় যাতে প্রচার ও প্রসার অন্তর্ভুক্ত। অতএব আমি আমার আসল কাজেই নিয়োজিত রয়েছি।

إِنَّ وَلِيِّيَ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ এখানে 'ওলী' অর্থ রক্ষাকারী। আর 'কিতাব' অর্থ কুরআন। 'সালেহীন' অর্থ হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর ভাষায় সে সমস্ত লোক, যাঁরা আল্লাহর সাথে কাউকে সমান করে না। এতে নবী-রাসূল থেকে শুরু করে সাধারণ সৎকর্মশীল মুসলমান পর্যন্ত সবাই অন্তর্ভুক্ত।

বস্তুত আয়াতের অর্থ হলো এই যে, তোমাদের বিরোধিতার কোনো ভয় আমার এ কারণেই নেই যে, আমার রক্ষাকারী হলেন আল্লাহ যিনি আমার উপর কুরআন অবতীর্ণ করেছেন।

এখানে আল্লাহ তা'আলার সমস্ত গুণাবলির মধ্যে বিশেষভাবে কুরআন অবতীর্ণ করার গুণটি উল্লেখ করা হয়েছে এজন্য যে, তোমরা যে আমার শত্রুতা ও বিরোধিতায় বদ্ধপরিকর হয়ে আছ তার কারণ হচ্ছে যে, আমি তোমাদেরকে কুরআনের শিক্ষা দেই এবং কুরআনের প্রতি আহ্বান করি। কাজেই যিনি আমার উপর কুরআন নাজিল করেছেন তিনিই আমার সাহায্যদাতা ও রক্ষণাবেক্ষণকারী। অতএব, আমার কি চিন্তা?

অতঃপর আয়াতের শেষ বাক্যটিতে একটি সাধারণ নিয়ম বাতলে দেওয়া হয়েছে যে, নবী-রাসূলগণের মর্যাদা তো বহু উর্ধ্বে সাধারণ সৎ মুসলমানদের জন্যও আল্লাহ সহায় ও রক্ষাকারী। তিনি তাদের সাহায্য করেন বলেই কোনো শত্রুর শত্রুতা তাদের ক্ষতিসাধন করতে পারে না। অধিকাংশ সময় এ পৃথিবীতেই তাদেরকে শত্রুর উপর জয়ী করে দেওয়া হয়। আর যদি কখনও কোনো বিশেষ তাৎপর্যের কারণে তাৎক্ষণিক বিজয় দান করা নাও হয়, তাতে বিজয়ের প্রকৃত উদ্দেশ্যের কোনো ব্যাঘাত ঘটে না। তারা বাহ্যিক অকৃতকার্যতা সত্ত্বেও উদ্দেশ্যের দিক দিয়ে কৃতকার্য হয়ে থাকেন। কারণ সৎকর্মশীল মুমিনের প্রতিটি কাজ হয় আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টিরই উদ্দেশ্যে নিবেদিত। তাঁর আনুগত্যের জন্য। কাজেই তারা যদি কোনো কারণে পার্থিব জীবনে অকৃতকার্যও হয়, কিন্তু আল্লাহ তা'আলার ক্ষেত্রে তাদের উদ্দেশ্য লাভে কৃতকার্য হয়ে থাকে। বস্তুত এটাই হলো সত্যিকার কৃতজ্ঞতা।

www.almodina.com

কুরআনি চরিত্রের একটি ব্যাপক হেদায়েতনামা : قوله خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَاَعْرِضْ عَنِ الْجٰهِلِيْنَ আলোচ্য আয়াতগুলো কুরআনি চরিত্র দর্শনের এক অনন্য ও ব্যাপক হেদায়েতনামা স্বরূপ। এর মাধ্যমে রাসূলে কারীম ﷺ -কে প্রশিক্ষণ দান করে তাঁকে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সমস্ত সৃষ্টির মাঝে মহান চরিত্রবান খেতাবে ভূষিত করা হয়েছে।

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে ইসলামের শত্রুদের মন্দ চালচলন, হঠকারিতা ও অসচ্চরিত্রতার আলোচনার পর আলোচ্য এই আয়াতগুলোতে তার বিপরীতে মহানবী ﷺ -কে সর্বোত্তম চরিত্রের হেদায়েত দেওয়া হয়েছে। তাতে তিনটি বাক্য রয়েছে। প্রথম বাক্য خُذِ الْعَفْوَ। আরবি অভিধান মোতাবেক عَفْوٌ (আফবুন) -এর অর্থ একাধিক হতে পারে এবং একত্রে সব ক'টি অর্থই প্রযোজ্য হতে পারে। সে কারণেই তাফসীরবিদ আলেমগণের বিভিন্ন দল বিভিন্ন অর্থ গ্রহণ করেছেন। অধিকাংশ তাফসীরকার যে অর্থ নিয়েছেন তাহলো এই যে, عَفْو বলা হয় এমন প্রত্যেকটি কাজকে যা সহজে কোনো রকম আয়াস ব্যতিরেকে সম্পন্ন হতে পারে। তা হলে বাক্যটির অর্থ দাঁড়ায় এই যে, আপনি এমন বিষয় গ্রহণ করে নিন, যা মানুষ অনায়াসে করতে পারে। অর্থাৎ শরিয়ত নির্ধারিত কর্তব্য সম্পাদনে আপনি সাধারণ মানুষের কাছে সুউচ্চমান দাবি করবেন না; বরং তারা সহজে যে পরিমাণ আমল করতে পারে আপনি তাই গ্রহণ করে নিন। যেমন, নামাজের প্রকৃত রূপ হচ্ছে এই যে, বান্দা সমগ্র দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন ও একাগ্র হয়ে আপন পালনকর্তার সামনে হাত বেঁধে এমনভাবে দাঁড়াবে, যেন আল্লাহর প্রশংসা ও গুণাবলি বর্ণনার মাধ্যমে নিজের আবেদনসমূহ কোনো প্রকার মাধ্যম ব্যতীত তাঁর দরবারে সরাসরি পেশ করছে। তখন সে যেন সরাসরি আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সাথে কথোপকথন করছে। এজন্য যে বিনয়, নম্রতা, রীতি-পদ্ধতি ও সম্মানবোধের প্রয়োজন, তা যে লাখো নামাজির মধ্যে বিরল বান্দাদের ভাগ্যেই জোটে, তা বলাই বাহুল্য। সাধারণ মানুষ এ স্তর লাভ করতে পারে না। অতএব, এ আয়াতে রাসূলে কারীম ﷺ-কে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, আপনি সেসব লোকদের কাছে এমন সুউচ্চ স্তরের প্রত্যাশাই করবেন না; বরং যে স্তর তারা সহজে ও অনায়াসে লাভ করতে পারে তাই গ্রহণ করে নিন। তেমনিভাবে অন্যান্য ইবাদত জাকাত, রোজা, হজ এবং সাধারণ আচার আচরণ ও সামাজিক ব্যাপারে শরিয়ত নির্ধারিত কর্তব্যসমূহ যারা পরিপূর্ণভাবে সম্পাদন করতে পারে না, তাদের কাছ থেকে সেটুকুই কবুল করে নেওয়া বাঞ্ছনীয়, যা তারা অনায়াসে করতে পারে।

সহীহ বুখারী শরীফেও হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যোবায়ের (রা.)-এর উদ্ধৃতিতে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে উল্লিখিত আয়াতের এ অর্থই বর্ণনা করা হয়েছে।

অপর এক রেওয়ায়েতে আছে, এ আয়াতটি নাজিল হলে রাসূল ﷺ বললেন, আল্লাহ আমাকে মানুষের আমল আখলাকের ব্যাপারে সাধারণ আনুগত্য কবুল করে নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। আমি প্রতিজ্ঞা করে নিয়েছি যে, যে পর্যন্ত আমি তাদের মাঝে থাকব এমনি করব। –[ইবনে কাছীর]

তাফসীরশাস্ত্রের ইমামগণের এক বিরাট জামাত হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যোবায়ের, হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) এবং মুজাহিদ প্রমুখও এ বাক্যটির উল্লিখিত অর্থই সাব্যস্ত করেছেন।

عَفْو -এর অপর অর্থ– ক্ষমা করা এবং অব্যাহতি দেওয়াও হয়ে থাকে। তাফসীরকার আলেমগণের এক দল এ ক্ষেত্রে এ অর্থেই বাক্যটির মর্ম সাব্যস্ত করেছেন এই যে, আপনি পাপী-তাপীদের অপরাধ ক্ষমা করে দিন।

তাফসীরশাস্ত্রের ইমাম ইবনে জারীর (র.) উদ্ধৃত করেছেন যে, এ আয়াতটি যখন নাজিল হয়, তখন মহানবী ﷺ হযরত জিবরাঈল আমীনকে এর মর্ম জিজ্ঞেস করেন। অতঃপর হযরত জিবরাঈল (আ.) স্বয়ং আল্লাহ তা'আলার নিকট থেকে জেনে নিয়ে মহানবী ﷺ -কে জানান যে, কেউ যদি আপনার প্রতি অন্যায়-অবিচার করে তবে আপনি তাকে ক্ষমা করে দিন। যে আপনাকে কিছুই দেয় না, তাকে আপনি দান করুন এবং যে আপনার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে আপনি তার সাথেও মেলামেশা করুন।

এ প্রসঙ্গে ইবনে মারদুবিয়া (র.) হযরত সা'দ ইবনে ওবাদা (রা.)-এর রেওয়ায়েতক্রমে উদ্ধৃত করেন যে, গযওয়ায়ে ওহুদের সময় যখন রাসূল ﷺ-এর চাচা হযরত হামযা (রা.) -কে শহীদ করা হয় এবং অত্যন্ত নৃশংসভাবে তাঁর শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কেটে লাশের প্রতি চরম অসম্মানজনক আচরণ করা হয়, তখন মহানবী ﷺ লাশটিকে সে অবস্থায় দেখতে পেয়ে বললেন, যারা হামযা (রা.)-এর সাথে এহেন আচরণ করেছে, আমি তাদের সত্তর জনের সাথে এমনি আচরণ করে ছাড়ব। এরই প্রেক্ষিতে এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয় এবং এতে রাসূল ﷺ -কে বাতলে দেওয়া হয় যে, এটা আপনার মর্যাদাসম্পন্ন নয়; বরং আপনার মর্যাদার উপযোগী হলো ক্ষমা ও অব্যাহতি দান করা।

www.almodina.com

وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ– مَعْرُوف অর্থে عُرْف বলা হয় যে কোনো ভালো ও প্রশংসনীয় কাজকে। অর্থাৎ যেসব লোক আপনার সাথে মন্দ ও উৎপীড়নমূলক আচরণ করে আপনি তাদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন না; বরং তাদেরকে ক্ষমা করে দিন। কিন্তু সেই সাথে তাদেরকে তাদের আচরণ এবং অত্যাচারের বিনিময় শুধুমাত্র ন্যায়নীতির মাধ্যমেই নয়; বরং অনুগ্রহের মাধ্যমে দান করুন।

وَأَعْرِضْ عَنِ الْجٰهِلِيْنَ -এর অর্থ হলো এই যে, যারা জাহেল বা মূর্খ তাদের কাছ থেকে আপনি দূরে সরে থাকুন। মর্মার্থ এই যে. আপনি অত্যাচারের প্রতিশোধ না নিয়ে তাদের সাথে কল্যাণকর ও সৌহার্দ্যপূর্ণ ব্যবহার করুন এবং একান্ত কোমলতার সাথে তাদেরকে সত্য ও ন্যায়ের বিষয় বাতলে দিন। কিন্তু বহু মূর্খ এমনও থাকে যারা এহেন ভদ্রোচিত রূঢ় ব্যবহারে প্রবৃত্ত হয় এমন ধরনের লোকদের সাথে আপনার আচরণ হবে এই যে. তাদের হৃদয়বিদারক মূর্খজনোচিত কথা বার্তায় দুঃখিত হয়ে তাদেরই মতো ব্যবহার আপনিও করবেন না; বরং তাদের থেকে দূরে সরে থাকবেন।

তাফসীরশাস্ত্রের ইমাম ইবনে কাছীর (র.) বলেন যে, দূরে সরে থাকার অর্থও মন্দের প্রত্যুত্তরে মন্দ ব্যবহার না করা। এর অর্থ এই নয় যে. তাদের হেদায়েত করাও বর্জন করতে হবে। কারণ এটা রেসালত ও নবুয়তের দায়িত্ব এবং মর্যাদার যোগ্য নয়।

সহীহ বুখারীতে এক্ষেত্রে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত একটি ঘটনা উদ্ধৃত করা হয়েছে যে, হযরত ফারূকে আ'যম (রা.)-এর খেলাফত আমলে উয়াইনাহ ইবনে হিসন একবার মদিনায় আসে এবং স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্র হুর ইবনে কায়সের মেহমান হয়। হুর ইবনে কায়স ছিলেন সে সমস্ত বিজ্ঞ আলেমদের একজন যাঁরা হযরত ফারূকে আ'যম (রা.)-এর পরামর্শ সভায় অংশগ্রহণ করতেন। উয়াইনাহ স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্র হুরকে বলল, তুমি তো আমীরুল মু'মিনীনের একজন অতি ঘনিষ্ঠ লোক, আমার জন্য তাঁর সাথে সাক্ষাতের একটা সময় নিয়ে এসো। হুর ইবনে কায়স (রা.) হযরত ফারুকে আ'যম (রা.)-এর নিকট নিবেদন করলেন যে, আমার চাচা উয়াইনাহ আপনার সাথে সাক্ষাৎ করতে চান। তখন তিনি অনুমতি দিয়ে দিলেন।

কিন্তু উয়াইনাহ হযরত ফারূকে আ'যম (রা.)-এর দরবারে উপস্থিত হয়েই একান্ত অমার্জিত ও ভ্রান্ত কথাবার্তা বলতে লাগল যে, "আপনি আমাদেরকে না দেন আমাদের ন্যায্য অধিকার, না করেন আমাদের সাথে ন্যায় ও ইনসাফের আচরণ।" হযরত ফারূকে আ'যম (রা.) তার এসব কথা শুনে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলে হুর ইবনে কায়স (রা.) নিবেদন করলেন, ইয়া আমীরুল মু'মিনীন! "আল্লাহ রাব্বুর আলামীন বলেছেন– خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجٰهِلِيْنَ আর এ লোকটিও জাহেলদের একজন।" এ আয়াতটি শোনার সাথে সাথে হযরত ফারূকে আ'যম (রা.)-এর সমস্ত রাগ শেষ হয়ে গেল এবং তাকে কোনো কিছুই বললেন না। হযরত ফারূকে আ'যম (রা-এর ব্যাপারে প্রসিদ্ধ ছিল যে, كَانَ وَقَافًا عِنْدَ كِتَابِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ অর্থাৎ আল্লাহর কিতাবে বর্ণিত হুকুমের সামনে তিনি ছিলেন উৎসর্গিত প্রাণ।

قوله وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطٰنِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ اِنَّهٗ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ অর্থাৎ আপানার মনে যদি শয়তানের পক্ষ থেকে কোনো ওয়াসওয়াসা আসতে আরম্ভ করে, তখন সাথে সাথে আল্লাহ তা'আলার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করবেন। তিনি শ্রবণকারী, পরিজ্ঞাত।

প্রকৃতপক্ষে এ আয়াতটিও পূর্ববর্তী আয়াতের উপসংহার। কারণ এতে হেদায়েত দেওয়া হয়েছে যে, যারা অত্যাচার উৎপীড়ন করে এবং মূর্খজনোচিত ব্যবহার করে, তাদের ভুল ত্রুটি ক্ষমা করে দিবেন। তাদের মন্দের উত্তর মন্দের দ্বারা দেবেন না। এ বিষয়টি মানব প্রকৃতির পক্ষে একান্তই কঠিন। বিশেষত এমন পরিস্থিতিতে সৎ এবং ভালো মানুষদেরকেও শয়তান রাগান্বিত করে লড়াই ঝগড়ায় প্রবৃত্ত করেই ছাড়ে। সেজন্যই পরবর্তী আয়াতে উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে, যদি এহেন মুহূর্তে রোষানল জ্বলে উঠতে দেখা যায়, তবে বুঝবেন শয়তানের পক্ষ থেকেই এমনটি হচ্ছে এবং তার প্রতিকার হলো আল্লাহর নিকট পানাহ চাওয়া, তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করা।

হাদীসে উল্লেখ রয়েছে যে, দুজন লোক মহানবী ﷺ -এর সামনে ঝগড়া-বিবাদ করছিল। এদের একজন রাগে হিতাহিত জ্ঞান হারাবার উপক্রম হলে রাসূল ﷺ বললেন, "আমি একটি বাক্য জানি, যদি এ লোকটি সে বাক্য উচ্চারণ করে, তাহলে তার এই উত্তেজনা প্রশমিত হয়ে যাবে। তারপর বললেন, বাক্যটি হলো এই– اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ সে লোক রাসূল ﷺ -এর নিকট শুনে সঙ্গে সঙ্গে বাক্যটি উচ্চারণ করল। তাতে সাথে সাথে তার রোষানল প্রশমিত হয়ে গেল।"

هٰذَا بَصَآئِرُ مِن رَّبِّكُمْ অর্থাৎ এই কুরআন তোমাদের পরওয়ারদেগারের পক্ষ থেকে আগত বহুবিধ দলিল-প্রমাণ ও মু'জিযার এক সমাহার। এতে সামান্য লক্ষ্য করলেই একথা বিশ্বাস না করে উপায় থাকে না যে, এটি যথার্থই আল্লাহর কালাম। এতে কোনো সৃষ্টিরই কোনো হাত নেই। অতঃপর বলা হয়েছে : وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ অর্থাৎ এই কুরআন সারা বিশ্বের জন্য সত্য দলিল তো বটেই, তদুপরি যারা ঈমানদার তাদেরকে আল্লাহর রহমত ও হেদায়েত পর্যন্ত পৌছে দেওয়ার অবলম্বনও বটে।

২০৪ নং আয়াতে বলা হয়েছে যে, কুরআন মু'মিনদের জন্য রহমত। কিন্তু এই রহমতের দ্বারা লাভবান হওয়ার জন্য কয়েকটি শর্ত ও প্রক্রিয়া রয়েছে, যা সাধারণ সম্বোধনের মাধ্যমে এভাবে বলা হয়েছে। وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا অর্থাৎ যখন কুরআন পাঠ করা হয়, তখন তোমরা সবাই তার প্রতি কান লাগিয়ে চুপচাপ থাকবে।

এ আয়াতের শানে নুযূল সম্পর্কে বিভিন্ন রেওয়ায়েতে রয়েছে যে, এ হুকুমটি কি নামাজের কুরআন পাঠ সংক্রান্ত, না কোনো বয়ান বিবৃতিতে কুআন পাঠের ব্যাপারে, নাকি সাধারণভাবে কুরআন পাঠের বেলায়; তা নামাজেই হোক অথবা অন্য যে কোনো অবস্থায় হোক। অধিকাংশ মুফাসসিরীনের মতে এটাই যথার্থ যে, আয়াতের শব্দগুলো যেমন ব্যাপক, তেমনি এই হুকুমটিও ব্যাপক। কতিপয় নিষিদ্ধ স্থান বা কাল ব্যতীত যে কোনো অবস্থায় কুরআন পাঠের ক্ষেত্রে এ নির্দেশ ব্যাপক।

সে কারণেই হানাফী মাযহাবের ওলামাগণ এ আয়াত দ্বারা প্রমাণ করেছেন যে, ইমামের পেছনে নামাজ পড়ার সময় মুকতাদীগণের জন্য কেরাত পড়া বিধেয় নয়। পক্ষান্তরে যেসব ফেকাহা মুকতাদীগণকে (ইমামের পেছনে নামাজ পড়ার ক্ষেত্রেও) সূরা ফাতেহা পাঠ করার কথা বলেছেন, তাঁদের মধ্যেও অনেকে বলেছেন যে, ফাতেহা পড়লেও তা ইমামের কেরাতের ফাঁকে ফাঁকে পড়বে।

আলোচ্য আয়াতের প্রকৃত বিষয় হলো এই যে, কুরআন কারীমকে যাদের জন্য রহমত সাব্যস্ত করা হয়েছে সে জন্য শর্ত হচ্ছে যে, তাদেরকে কুরআনের আদব ও মর্যাদা সম্পর্কে অবহিত হতে হবে এবং এর উপর আমল করতে হবে আর কুরআনের বড় আদব হলো এই যে, যখন তা পাঠ করা হয়, ততক্ষণ শ্রোতা সেদিকে কান লাগিয়ে নিশ্চুপ থাকবে

কুরআন পাঠ শ্রবণ করা এবং তার হুকুম আহকামের উপর আমল করার চেষ্টা করা উভয়টিই কান লাগিয়ে রাখার অন্তর্ভুক্ত। –[মাযহারী ও কুরতুবী] আয়াত শেষে لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, কুরআনের রহমত হওয়া উল্লিখিত আসবাবসমূহের অনুবর্তিতার উপর নির্ভরশীল।

কুরআন তেলাওয়াতের সময় নীরব থেকে তা শ্রবণ করা সম্পর্কে কয়েকটি জরুরি মাসায়েল : একথা একান্তই সুস্পষ্ট যে, কেউ যদি উল্লিখিত নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ করে কুরআন কারীমের প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করে, তবে সে রহমতের পরিবর্তে আল্লাহর গজব ও রোষাণলের অধিকারী হবে।

নামাজের মধ্যে কুরআনের দিকে কান লাগানো এবং নিশ্চুপ থাকার অমনোযোগিতার কারণে এমনও ঘটে যায় যে, অনেকে একথাও বলতে পারে ইমাম কোন সূরাটি পাঠ করেছেন। তাদের পক্ষে কুরআনের মাহাত্ম্য অবগত হওয়া এবং শোনার জন্য মনোনিবেশ করা কর্তব্য। জুম'আ কিংবা ঈদের খুতবার হুকুমও তাই। এই আয়াত ছাড়াও রাসূলে কারীম ﷺ বিশেষ করে খুতবার ব্যাপারে ইরশাদ করেছেন– إِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ لِلْخُطْبَةِ فَلَا صَلٰوةَ وَلَا كَلَامَ অর্থাৎ ইমাম যখন খুতবার জন্য এসে উপস্থিত হন তখন না নামাজ পড়বে, না কোনো কিছু বলবে।

অন্য এক হাদীসে বর্ণিত আছে, তখন কোনো লোক অপর কাউকে উপদেশ দেওয়ার উদ্দেশ্যে একথাও বলবে না যে, চুপ কর। (অগত্যা যদি বলতেই হয়, তবে হাতে ইশারা করে দিবে) যাহোক খুতবা চলাকালে কোনো রকম কথাবার্তা, তাসবীহ তাহলীল, দোয়া দরূদ কিংবা নামাজ প্রভৃতি জায়েজ নয়।

ফিকহবিদগণ বলেছেন যে, জুমার খুতবার যে হুকুম, ঈদ কিংবা বিয়ে প্রভৃতির খুতবার হুকুমও তাই অর্থাৎ তখন মনোনিবেশ সহকারে নীরব থাকা ওয়াজিব।

অবশ্য নামাজ এবং খুতবা ব্যতীত সাধারণ অবস্থায় কেউ যখন আপন মনে কুরআন তেলাওয়াত করতে থাকে, তখন অন্যান্যদের কান লাগিয়ে রাখা এবং নীরব থাকা ওয়াজিব কিনা, এ ব্যাপারে ফকীহগণের মতপার্থক্য রয়েছে। কোনো কোনো মনীষী কান লাগানো এবং নীরব থাকাকে ওয়াজিব বলেছেন, আর এর বিরুদ্ধাচরণকে পাপ বলে সাব্যস্ত করেছেন। সেজন্যই যেসব স্থানে মানুষ নিজ নিজ কাজকর্মে নিয়োজিত থাকে কিংবা বিশ্রাম করতে থাকে, সেসব জায়গায় কারও পক্ষে সরবে কুরআন পাঠ করাকে তাঁরা অবৈধ বলেছেন এবং যে লোক এমন জায়গায় উচ্চৈঃস্বরে কুরআন পাঠ করবে তাকে গুনাহগার বলেছেন। 'খোলাসাতুল ফাতাওয়া প্রভৃতি গ্রন্থেও তাই লেখা রয়েছে।

কিন্তু কোনো কোনো ফকীহ বিশ্লেষণ করেছেন যে, কান লাগানো এবং শোনা শুধুমাত্র সে সমস্ত জায়গায়ই ওয়াজিব, যেখানে শোনাবার উদ্দেশ্যেই কতুরআন তেলাওয়াত করা হয়। যেমন নামাজ ও খুতবা প্রভৃতিতে আর যদি কোনো লোক নিজের ভাবে তেলাওয়াত করতে থাকে, কিংবা কয়েকজন কোনো এক স্থানে নিজ নিজ তেলাওয়াতে নিয়েজিত থাকে, তাহলে অন্যের আওয়াজের প্রতি কান লাগিয়ে রাখা এবং নীরব থাকা ওয়াজিব নয়। তার কারণ সহীহ ও বিশুদ্ধ হাদীসের দ্বারা প্রামণিত রয়েছে যে, রাসূলে কারীম ﷺ রাত্রি বেলায় নামাজে সরবে কুরআন তেলাওয়াত করতেন এবং আযওয়াজে মুতাহহারাত তখন ঘুমোতে থাকতেন। অনেক সময় হুজরার বাইরেও রাসূল ﷺ -এর আওয়াজ শোনা যেত।

নীরব ও সরব জিকিরের বিধিবিধান : এ আয়াতে কুরআনে কারীম নিঃশব্দ জিকির কিংবা সশব্দ জিকির দুরকম জিকিরেরই স্বাধীনতা দিয়েছে। নিঃশব্দ জিকির সম্পর্কে বলা হয়েছে– وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ অর্থাৎ স্বীয় পরওয়ারদেগারকে স্মরণ কর নিজের মনে। এরও দুটি উপায় রয়েছে। যথা– ১. জিহ্বা না নেড়ে শুধু মনে মনে আল্লাহর 'যাত' (সত্তা) ও গুণাবলির ধ্যান করবে, যাকে 'যিকরে ক্বলবী' (আত্মিক জিকির) বা 'তাফাককুর' (নিবিষ্ট চিন্তা) বলা হয়। ২. তৎসঙ্গে মুখেও ক্ষীণ শব্দে আল্লাহ তা'আলার নামের অক্ষরগুলো উচ্চারণ করবে। এটাই হলো জিকিরের সর্বোত্তম ও উৎকৃষ্টতার উপায় যে, যে বিষয়ের জিকির করা হয়েছে তার বিষয়বস্তু উপলব্ধি করে অন্তরেও তার প্রতিফলন ঘটিয়ে ধ্যান করবে এবং মুখেও তা উচ্চারণ করবে। কারণ এভাবে অন্তরের সাথে মুখও জিকিরে অংশগ্রহণ করে। পক্ষান্তরে যদি শুধু মনে মনেই ধ্যান ও চিন্তায় মগ্ন থাকে, মুখে কোনো অক্ষর উচ্চারিত না হয়, তবে তাতেও যথেষ্ট ছওয়াব রয়েছে, কিন্তু সর্বনিম্ন স্তর হলো শুধু মুখে মুখে জিকির করা, অন্তরাত্মার তা থেকে বিমুখ থাকা।

জিকিরেরে দ্বিতীয় পন্থা এ আয়াতেই বলা হয়েছে– وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ অর্থাৎ 'সুউচ্চ স্বরের চাইতে কম স্বরে।' অর্থাৎ যে লোক আল্লাহ তা'আলার জিকির করবে তার স্বশব্দ জিকির করার অধিকার রয়েছে। তবে তার আদব হলো এই যে, অত্যন্ত জোরে চিৎকার করে জিকির করবে না। মাঝামাঝি আওয়াজে করবে যাতে আদব এবং মর্যাদাবোধের প্রতি লক্ষ্য হয়ে থাকে। অতি উচ্চৈঃস্বরে জিকির বা তেলাওয়াত করাতে এ কথাই প্রতীয়মান যে, যার উদ্দেশ্যে জিকির করা হচ্ছে তাঁর মর্যাদাবোধ অন্তরে নেই। যে সত্তার সম্মান ও মর্যাদা এবং ভয় মানব মনে বিদ্যমান থাকে, তাঁর সামনে স্বভাবগতভাবেই মানুষ অতি উচ্চৈঃস্বরে কথা বলতে পারে না। কাজেই আল্লাহর সাধারণ জিকিরই হোক কিংবা কুরআনের তেলাওয়াতই হোক যখন আওয়াজের সাথে পড়া হবে, তখন সেদিকে লক্ষ্য রাখা কর্তব্য যাতে তা প্রয়োজনের চাইতে বেশি উচ্চৈঃস্বরে না হতে পারে।

সারকথা এই যে, এ আয়াতের দ্বারা আল্লাহর জিকির বা কুরআন তেলাওয়াতের তিনটি পদ্ধতি বা নিয়ম জানা গেল। প্রথমত আত্মিক জিকির অর্থাৎ কুরআনের মর্ম এবং জিকির কল্পনা ও চিন্তার মাঝেই যা সীমিত থাকবে যার সাথে জিহ্বার সামান্যতম স্পন্দনও হবে না। দ্বিতীয়ত যে জিকিরে আত্মার চিন্তা কল্পনার সাথে সাথে জিহ্বাও নড়বে। কিন্তু বেশি উচ্চ শব্দ হবে না, যা অন্যান্য লোকেও শোনবে। এ দুটি পদ্ধতিই আল্লাহর বাণী وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ –এর অন্তর্ভুক্ত। আর তৃতীয় পদ্ধতিটি হলো অন্তরে উদ্দিষ্ট সত্তার উপস্থিতি ও ধ্যান করার সাথে সাথে জিহ্বার স্পন্দনও হবে এবং সেই সঙ্গে শব্দও বেরোবে। কিন্তু এই পদ্ধতির জন্য আদব বা রীতি হলো আওয়াজকে অধিক উচ্চ না করা। সীমার বাইরে যাতে না যায় সে দিকে লক্ষ্য রাখা। জিকিরের এ পদ্ধতিটিই وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ আয়াতে শেখানো হয়েছে। কুরআনের আরও একটি আয়াতে বিষয়টিকে বিশেষ বিশ্লেষণ করে বলা হয়েছে– وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا -এতে রাসূলে কারীম ﷺ -এর প্রতি নির্দেশ করা হয়েছে যাতে কেরাত্ পড়তে গিয়ে অতি উচ্চৈঃস্বরেও পড়া না হয় এবং একেবারে মনে মনেও নয়; বরং কেরাতে যেন মাঝামাঝি আওয়াজ অবলম্বন করা হয়।

নামাজের মাঝে কুরআন তেলাওয়াত সম্পর্কে মহানবী ﷺ হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা.) ও হযরত ফারূকে আ'যম (রা.) -কে এ হেদায়েতই দিয়েছেন।

সহীহ ও বিশুদ্ধ হাদীসে উল্লেখ রয়েছে যে, একবার রাসূলে কারীম ﷺ শেষ রাতে ঘর থেকে বেরিয়ে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-এর বাড়ি গিয়ে দেখলেন, তিনি নামাজ পড়ছেন। কিন্তু তাতে আস্তে আস্তে অর্থাৎ শব্দহীনভাবে কুরআন তেলাওয়াত করছেন। তারপর তিনি (রাসূল ﷺ -সেখান থেকে হযরত ওমর ফারুক (রা.)-এর বাড়ি গিয়ে দেখলেন, তিনি অতি উচ্চৈঃস্বরে তেলাওয়াত করছেন। অতঃপর ভোরে যখন উভয়ে রাসূলে কারীম ﷺ -এর খেদমতে উপস্থিত হলেন, তখন তিনি হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-কে লক্ষ্য করে বললেন, আমি রাতে আপনার নিকট গিয়ে দেখলাম,

www.almodina.com

আপনি অতি ক্ষীণ আওয়াজে কুরআন তেলাওয়াত করছিলেন। হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা.) নিবেদন করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যে সত্তাকে শোনানো আমার উদ্দেশ্য ছিল তিনি শুনে নিয়েছেন, তাই যথেষ্ট নয় কি? তেমনিভাবে হযরত ফারূককে আ'যম (রা.)-কে লক্ষ্য করে রাসূল ﷺ বললেন, আপনি অতি উচ্চৈঃস্বরে তেলাওয়াত করছিলেন। তিনি নিবেদন করলেন, উচ্চ শব্দে কেরাত পড়তে গিয়ে আমার উদ্দেশ্য ছিল, যাতে ঘুম আসতে না পারে এবং শয়তান যেন সে শব্দ শুনে পালিয়ে যায়। অতঃপর রাসূলে কারীম ﷺ মীমাংসা করে দিলেন। তিনি হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা.)-কে কিছুটা জোরে এবং হযরত ফারূকে আযম (রা.) কে কিছুটা আস্তে তেলাওয়াত করতে বললেন। –[আবূ দাউদ]

সেজদার কতিপয় ফজিলত ও আহকাম : এখানে নামাজসংক্রান্ত ইবাদতের মধ্য থেকে শুধু সেজদার কথা উল্লেখ করার কারণ এই যে, নামাজের সমগ্র আরকানের মধ্যে সেজদার একটি বিশেষ ফজিলত রয়েছে।

সহীহ মুসলিমে বর্ণিত রয়েছে যে, কোনো এক লোক হযরত ছাওবান (রা.)-এর নিকট নিবেদন করলেন যে, আমাকে এমন একটা আমল বাতলে দিন যাতে আমি জান্নাতে যেতে পারি। হযরত ছাওবান (রা.) নীরব রইলেন, কিছুই বললেন না, লোকটি আবার নিবেদন করলেন, তখনও তিনি চুপ করে রইলেন। এভাবে তৃতীয়বার যখন বললেন, তখন তিনি বললেন, আমি এ প্রশ্নটিই রাসূলে করীম ﷺ-এর দরবারে করেছিলাম। তিনি আমাকে অসিয়ত করেছিলেন যে, অধিক পরিমাণে সেজদা করতে থাক। কারণ তোমরা যখন একটি সেজদা কর তখন তার ফলে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের মর্যাদা এক ডিগ্রি বাড়িয়ে দেন এবং একটি গুনাহ ক্ষমা করে দেন।

লোকটি বললেন, হযরত ছাওবান (রা.)-এর সাথে আলাপ করার পর আমি হযরত আবুদ্দারদা (রা.) -এর সাথে সাক্ষাৎ করে তাঁর কাছেও একই নিবেদন করলাম এবং তিনিও একই উত্তর দিলেন।

সহীহ মুসলিমে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর রেওয়ায়েতক্রমে উদ্ধৃত করা হয়েছে যে, রাসূলে কারীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, বান্দা স্বীয় পরওয়ারদেগারের সর্বাধিক নিকটবর্তী তখনই হয়, যখন সে বান্দা সেজদায় অবনত থাকে। কাজেই তোমরা সেজাদরত অবস্থায় খুব বেশি করে দোয়া প্রার্থনা করবে। তাতে তা কবুল হওয়ার যথেষ্ট আশা রয়েছে।

মনে রাখতে হবে যে, শুধুমাত্র সেজদা হিসেবে কোনো ইবাদত নেই। কাজেই ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে অধিক পরিমাণে সেজদা করার অর্থ অধিক পরিমাণে নফল নামাজ পড়া। নফল যত বেশি হবে সেজদাও ততই বেশি হবে। কিন্তু কোনো লোক যদি শুধু সেজদা করেই দোয়া করে নেয়, তাহলে তাতেও কোনো ক্ষতি নেই। আর সেজদারত অবস্থায় দোয়া করার হেদায়েত শুধু নফল নামাজের সাথে সম্পৃক্ত, ফরজ নামাজে নয়।

সূরা আ'রাফ শেষ হলো। এর শেষ আয়াতটি হলো আয়াতে সেজদা। সহীহ মুসলিম শরীফে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর রেওয়ায়েতক্রমে উদ্ধৃত রয়েছে যে, কোনো আদম সন্তান যখন কোনো সেজদার আয়াত পাঠ করে অতঃপর সেজদায় তেলাওয়াত সম্পন্ন করে, তখন শয়তান কাঁদতে কাঁদতে পালিয়ে যায় এবং বলে যে, আফসোস, মানুষের প্রতি সেজদার হুকুম হলো আর সে তা আদায়ও করল, ফলে তার ঠিকানা হলো জান্নাত, আর আমার প্রতিও সেজদার হুকুম হলো কিন্তু আমি তার নাফরমানি করেছি বলে আমার ঠিকানা হলো জাহান্নাম।

শব্দ বিশ্লেষণ

يَنْزَغَنَّ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ اثبات فعل مضارع معروف বাব فَتَحَ মাসদার النَّزْغ মূলবর্ণ (ن ـ ز ـ غ) জিনস صحيح অর্থ– অবশ্যই সে প্ররোচিত করতে চায়।।

يَمُدُّ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ اثبات فعل مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার الْمَدّ মূলবর্ণ (م ـ د ـ د) জিনস مضاعف ثلاثي অর্থ– তারা টেনে নিয়ে যায়।

قُرِئَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ اثبات فعل ماضي مجهول বাব فَتَحَ মাসদার الْقِرَاءَة মূলবর্ণ (ق ـ ر ـ ء) জিনস مهموز لام অর্থ– পাঠ করা হয়।

يُسَبِّحُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ اثبات فعل مضارع معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّسْبِيْحُ মূলবর্ণ (س ـ ب ـ ح) জিনস صحيح অর্থ– তারা পবিত্রতা বর্ণনা করে।

سُوْرَةُ الْاَنْفَالِ
সূরা আনফাল

মদীনায় অবতীর্ণ : আয়াত– ৭৫, রুকূ'– ১০

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْاَنْفَالِ ۭ قُلِ الْاَنْفَالُ لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ ۚ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَصْلِحُوْا ذَاتَ بَيْنِكُمْ ۠ وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗۤ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ (١)

অনুবাদ : (১) তারা আপনার নিকট গনিমতসমূহের বিধান জিজ্ঞাসা করে, আপনি বলে দিন, এই গনিমতসমূহ আল্লাহ ও রাসূলের জন্য, অতএব, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, এবং তোমাদের পারস্পরিক সম্পর্কের সংশোধন কর, আর আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুসরণ কর, যদি তোমরা ঈমানদার হও।

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيٰتُهٗ زَادَتْهُمْ اِيْمَانًا وَّعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ (٢)

(২) নিশ্চয় ঈমানদারগণ তো এরূপই হয় যে, যখন [তাদের সম্মুখে] আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা হয়, তখন তাদের অন্তরসমূহ ভীত হয়ে পড়ে, আর যখন তাদেরকে আল্লাহর আয়াতসমূহ পড়ে শুনানো হয়, তখন সেই আয়াতসমূহ তাদের ঈমানকে আরো বৃদ্ধি করে দেয়, আর তারা নিজেদের পরওয়ারদেগারের উপর নির্ভর করে।

الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ (٣)

(৩) [আর] যারা নামাজের পাবন্দি করে এবং আমি যা কিছু তাদেরকে দিয়েছি তা হতে ব্যয় করে।

শাব্দিক অনুবাদ

(১) يَسْئَلُوْنَكَ তারা আপনার নিকট জিজ্ঞাসা করেছে عَنِ الْاَنْفَالِ গনিমতসমূহের বিধান قُلِ আপনি বলে দিন الْاَنْفَالُ لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ এই গনিমতসমূহ আল্লাহ ও রাসূলের জন্য فَاتَّقُوا اللّٰهَ অতএব, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর وَاَصْلِحُوْا ذَاتَ بَيْنِكُمْ এবং তোমাদের পারস্পরিক সম্পর্কের সংশোধন কর وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ আর আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুসরণ কর اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ যদি তোমরা ঈমানদার হও।

(২) اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ নিশ্চয় ঈমানদারগণ তো এরূপই হয় যে الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ যখন [তাদের সম্মুখে] আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা হয় وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ তখন তাদের অন্তরসমূহ ভীত হয়ে পড়ে وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيٰتُهٗ আর যখন তাদেরকে আল্লাহর আয়াতসমূহ পড়ে শুনানো হয় زَادَتْهُمْ اِيْمَانًا তখন সেই আয়াতসমূহ তাদের ঈমানকে আরো বৃদ্ধি করে দেয় وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ আর তারা নিজেদের পরওয়ারদেগারের উপর নির্ভর করে।

(৩) الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ [আর] যারা নামাজের পাবন্দি করে وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ এবং আমি যা কিছু তাদেরকে দিয়েছি তা হতে ব্যয় করে।

www.almodina.com

أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا ۚ لَّهُمْ دَرَجَٰتٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ (٤)

অনুবাদ : (৪) এরাই সত্যিকারের ঈমানদার, এদের জন্য রয়েছে উচ্চ পদসমূহ তাদের রবের সন্নিধানে, আর ক্ষমা ও সম্মানজনক রিজিক।

كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِن بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَٰرِهُونَ (٥)

(৫) যেরূপে আপনার রব আপনাকে আপনার গৃহ হতে [বদরের দিকে] যথাযথভাবে বের করলেন, আর মুসলমানদের একটি দল তাকে দুর্বহ মনে করছিল।

يُجَٰدِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَمَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنظُرُونَ (٦)

(৬) সেই যথার্থ বিষয় প্রকাশ হওয়ার পরও তাতে তারা আপনার সঙ্গে এরূপ বিবাদ করছিল, যেন কেউ তাদেরকে মৃত্যুর দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, আর তারা প্রত্যক্ষ করছে।

وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَٰتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَٰفِرِينَ (٧)

(৭) আর তোমরা সেই সময়টিকে স্মরণ কর, যখন আল্লাহ তোমাদেরকে সেই দুটি দলের মধ্য হতে একটি সম্বন্ধে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছিলেন যে, তা তোমাদের করতলগত হবে, আর তোমরা এই অভিপ্রায়ে ছিলে যেন নিরস্ত্র দলটি তোমাদের আয়ত্তে এসে পড়ে, আর আল্লাহর ইচ্ছা ছিল এই যে, আপন নির্দেশাবলি দ্বারা সত্যকে সত্যরূপে প্রতিপন্ন করে দেন এবং সেই কাফেরদের মূলকে কর্তন করে দেন।

لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَٰطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ (٨)

(৮) যেন সত্যকে সত্যরূপে এবং অসত্যকে অসত্যরূপে প্রমাণিত করে দেন, যদিও এই অপরাধীরা অপ্রীতিকরই মনে করে।

শাব্দিক অনুবাদ

(৪) أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا এরাই সত্যিকারের ঈমানদার لَّهُمْ دَرَجَٰتٌ এদের জন্য রয়েছে উচ্চ পদসমূহ عِندَ رَبِّهِمْ তাদের রবের সন্নিধানে وَمَغْفِرَةٌ আর ক্ষমা وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ও সম্মানজনক রিজিক।

(৫) كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ যেরূপে আপনার রব আপনাকে [বদরের দিকে] বের করলেন مِن بَيْتِكَ আপনার গৃহ হতে بِالْحَقِّ যথাযথভাবে وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَٰرِهُونَ আর মুসলমানদের একটি দল তাকে দুর্বহ মনে করছিল।

(৬) يُجَٰدِلُونَكَ তারা আপনার সঙ্গে এরূপ বিবাদ করছিল فِي الْحَقِّ بَعْدَمَا تَبَيَّنَ সেই যথার্থ বিষয় প্রকাশ হওয়ার পরও كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ যেন কেউ তাদেরকে মৃত্যুর দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাচ্ছে وَهُمْ يَنظُرُونَ আর তারা প্রত্যক্ষ করতেছে।

(৭) وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ আর তোমরা সেই সময়টিকে স্মরণ কর, যখন আল্লাহ তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছিলেন إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ সেই দুটি দলের মধ্য হতে একটি সম্বন্ধে أَنَّهَا لَكُمْ যে তা তোমাদের করতলগত হবে وَتَوَدُّونَ আর তোমরা এই অভিপ্রায়ে ছিলে أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ যেন নিরস্ত্র দলটি تَكُونُ لَكُمْ তোমাদের আয়ত্বে এসে পড়ে وَيُرِيدُ اللَّهُ আর আল্লাহর ইচ্ছা ছিল এই যে أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَٰتِهِ আপন নির্দেশাবলি দ্বারা সত্যকে সত্যরূপে প্রতিপন্ন করে দেন وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَٰفِرِينَ এবং সেই কাফেরদের মূলকে কর্তন করে দেন।

(৮) لِيُحِقَّ الْحَقَّ যেন সত্যকে সত্যরূপে প্রমাণিত করে দেন وَيُبْطِلَ الْبَٰطِلَ এবং অসত্যকে অসত্যরূপে وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ যদিও এই অপরাধীরা অপ্রীতিকরই মনে করে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

যোগসূত্র : সূরা আল আ'রাফে অন্যান্য আম্বিয়ায়ে কেরামের বিজয়ের কথা বর্ণিত হয়েছে। এ সূরায় রাসূলে কারীম ﷺ-এর সাফল্যের বিবরণ স্থান পেয়েছে। বিশেষত রাসূলে কারীম ﷺ ও তাঁর সাহাবায়ে কেরামকে আল্লাহ তা'আলা বদরের যুদ্ধে যে সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন তার উল্লেখ রয়েছে। ইসলামের ইতিহাসে এটিই ছিল প্রথম জিহাদ। এ জিহাদে আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদেরকে বিজয় দান করেছিলেন। উক্ত আলোচনার দ্বারা পূর্ববর্তী সূরার সাথে এ সুরার যোগসূত্র সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হলো।

নামকরণের কারণ : اَلْاَنْفَال শব্দটি বহুবচন, একবচনে نَفْل অর্থ– অতিরিক্ত। পারিভাষিক অর্থ হলো, মুজাহিদগণকে সাধারণ পারিশ্রমিক ব্যতীত অতিরিক্ত যা প্রদান করা হয়, তাকেই আনফাল বলা হয়। হযরত ইমাম আবূ উবায়েদ (র.) বলেছেন, মূল আভিধানিক অর্থ অনুসারে নফল বলা হয়, দান, উপঢৌকন ও পুরস্কারকে। কেননা এ উম্মতের প্রতি এটা এক বিশেষ দান যে, জিহাদ ও লড়াইয়ে মাধ্যমে যে সমস্ত দ্রব্যাদি কাফের ও মুশরিকদের নিকট হতে অর্জিত হয় সেগুলো মুসলমানদের জন্য হালাল তথা বৈধ করে দেওয়া হয়েছে। এ সূরাতে 'আনফাল' ছাড়াও আরো অনেক বিধিবিধানের বর্ণনা করা হয়েছে, তা সত্ত্বেও تَسْمِيَةُ الْكُلِّ بِاسْمِ الْجُزْءِ [অংশবিশেষের নাম অনুসারে সম্পূর্ণ বিষয়ের নামকরণ]-এর নিয়ম অনুসারে এ সূরাকে 'আল আনফাল' নামকরণ করা হয়েছে। অথবা এ সূরাতে যুদ্ধলব্ধ ধনসম্পদ বণ্টনের নিয়মকানুন বর্ণিত হয়েছে, তাই এ সূরাকে 'আল আনফাল' নামকরণ করা হয়েছে। অথবা হযরত জিবরাঈল আমীন (আ.) আল্লাহ তা'আলার নির্দেশক্রমে কুরআন মাজীদের এ অংশের নাম 'আল আনফাল' রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন। সে জন্যই এ সূরাকে 'আল আনফাল' নামকরণ করা হয়েছে।

বিষয়বস্তু : সূরা আল আনফাল মদিনা মুনাওয়ারায় অবতীর্ণ হয়েছে। এতে ৭৫ টি আযাত ও ১০ টি রুকূ রয়েছে। এ সূরাটি দ্বিতীয় হিজরিতে সংঘটিত বদর যুদ্ধের পরে অবতীর্ণ হয়েছে। পূর্ববর্তী সূরা আল আ'রাফে মুশরিকীন (অংশীবাদী) এবং আহলে কিতাবদের মূর্খতা, বিদ্বেষ, কুফরি ও ফিতনা-ফ্যাসাদ সংক্রান্ত আলোচনা এবং সে সম্পর্কিত বিষয়ের বর্ণনা ছিল। এ সূরাতে আলোচিত অধিকাংশ বিষয়ই গযওয়ায়ে বদর বা বদরের যুদ্ধকালে সেই কাফের, মুশরিক ও আহলে কিতাবদের অশুভ পরিণতি, তাদের পরাজয় ও অকৃতকার্যতা এবং তাদের মোকাবিলায় মুসলমানদের কৃতকার্যতা সম্পর্কিত, যা মুসলমানদের জন্য ছিল একান্ত কৃপা ও দান এবং কাফেরদের জন্য ছিল আজাব ও প্রতিশোধ স্বরূপ। আর যেহেতু এ কৃপা ও দানের সবচেয়ে বড় কারণ ছিল মুসলমানদের নিঃস্বার্থতা, পারস্পরিক ঐক্য, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পরিপূর্ণ আনুগত্যের ফল, সেহেতু সূরার প্রারম্ভেই তাকওয়া, পরহেজগারি এবং আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য, জিকির ও ভরসা প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। –[মা'আরেফুল কুরআন]

আর কাফেরদের সাথে সংঘর্ষে মুসলমানদের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সাফল্য যেহেতু সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে নিছক আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের নিয়ত এবং নিজেদের মধ্যে ঐক্য সংরক্ষণের উপর; অতএব সূরাটিকে আল্লাহভীতি, আত্মসংশোধন, আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্যের আদেশের সাথে এবং আল্লাহভীতি ও ঈমানের উৎকর্ষতা সাধনের, আল্লাহর প্রতি ভরসা রাখার, নামাজ কায়েম করার এবং নেক কাজে খরচ করার ফজিলত বর্ণনার সাথে আরম্ভ করেছেন। কেননা এ সমস্ত ইবাদত দ্বারাই আল্লাহর ওয়াস্তের নিয়ত এবং একতা শক্তিশালি হয়ে থাকে। বদর যুদ্ধের পর গনিমতের মাল বণ্টনকালে যোদ্ধাদের মধ্যে সামান্য রকমের বাদানুবাদের সৃষ্টি হয়, যা কতকাংশে নিয়তের বিশুদ্ধতা ও একতার পরিপন্থি ছিল। মূল বক্তব্য বিষয়ের সাথে এদিক দিয়ে এটার সামঞ্জস্য প্রকাশ পাচ্ছে। যাতে মুমিনগণ এরকম আচরণ ত্যাগ করত পূর্ণ 'লিল্লাহিয়্যাত' ও একতা অবলম্বন করতে পারে, এ উদ্দেশ্যে আল্লাহ তা'আলা সর্বপ্রথমেই এটারও মীমাংসা করে দিয়েছেন। –[বয়ানুল কুরআন]

(১) قوله يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْاَنْفَالِ ۖ قُلِ الْاَنْفَالُ لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ الخ **আয়াতের শানে নুযূল– ১ :** আবূ দাউদ নাসাঈ, ইবনে জারীর, ইবনুল মুনযির, ইবনে আব্বাস, আবুশ শায়খ দালায়েল গ্রন্থে এবং বায়হাকী ও হাকেম হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বরাত দিয়ে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, বদরের দিনে রাসূল ﷺ ঘোষণা দেন যে, যে ব্যক্তি কাউকে হত্যা করবে তার পরিধেয় পোশাক ও অস্ত্রের অধিকারী সেই হবে। যে কেউ কোনো কাফেরকে বন্দি করবে সে তারই গোলাম হিসেবে রয়ে

www.almodina.com

যাবে। সুতরাং বৃদ্ধ যারা তারা পতাকা তলে রয়ে গেলেন এবং যুবকেরা হত্যা ও গনিমতের মালামাল জমায়েত করার জন্য প্রতিযোগিতায় নেমে গেলেন। তখন বৃদ্ধরা যুবকদের বললেন যে, তোমাদের সাথে আমাদেরকেও শরিক রাখবে। আমরা তোমাদের পশ্চাৎ বাহিনী। তোমরা যদি কোনো প্রকারের আঘাতপ্রাপ্ত হতে, তাহলে আমাদের নিকট এসে তোমরা আশ্রয় গ্রহণ করতে। সুতরাং সেই সম্পর্কীয় বিরোধ নিয়ে তারা রাসূল ﷺ-এর নিকট পেশ করলেন। তখন গনিমতের মাল বন্টন করা সম্পর্কীয় বিধানসহ আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

শানে নুযূল– ২ : আবদ ইবনে হুমাইদ, নাহাস, আশ শায়খ ও ইবনে মরাদুভীয়া হযরত সা'আদ (রা.) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূল ﷺ বিপুল পরিমাণে গনিমতের মাল লাভ করেন। সেখানে একটি তরবারিও ছিল। সুতরাং আমি তরবারিটি হাতে নিয়ে রাসূল ﷺ-এর নিকট এসে বললাম, এ তরবারিটি আমাকে অতিরিক্ত হিসেবে দিয়ে দিন। জানার মতো শুধু আমিই একা। রাসূল ﷺ বললেন যেখান হতে এনেছ, সেখানে নিয়ে রেখে দাও। সুতরাং তা স্তুপে নিয়ে রেখে দেওয়ার জন্য আমি ফিরে গেলাম। নিজকে নিজে ভর্ৎসনা ও তিরস্কার করলাম। রাসূল ﷺ-এর নিকট ফিরে গিয়ে বললাম। আমাকে তা দিয়ে দিন। ফলে রাসূল ﷺ আমার প্রতি কঠোরতা আরোপ করে বললেন যে, যে জায়গা হতে এনেছিলে সেখানে নিয়ে রেখে এস। তখন আল্লাহ তা'আলা সে পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

শানে নুযূল– ৩ : আল্লামা নাহাস তার নাসেখ গ্রন্থে হযরত সাঈদ ইবনে জুবাইর (রা.) হতে বর্ণনা করেন যে, সা'আদ ও আনসারী এক ব্যক্তি দুজনে অতিরিক্ত কিছু অনুসন্ধানের জন্য বের হয়ে দুজনে মিলে একটি তরবারি পান। তারা উভয়জন তা নিয়ে বাদানুবাদ করতে থাকেন। সা'আদ বলেন, এ তরবারিটি আমার। আনসারী ব্যক্তি বলেন, আমি তা মানি না, তরবারিটি আমার। অবশেষে তারা রাসূল ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হয়ে ঘটনার বর্ণনা শুনালেন। পরে রাসূল (সা.) বলেন, হে সা'আদ! এ তরবারিটি তোমার নয় আনসারী ব্যক্তিরও নয়। তরবারিটি হলো আমার। তখন এ বিরোধ নিরসনকরণার্থে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[রূহুল মা'আনী : ১৬২/৯/৫, ফাতহুল কাদীর : ২৮৪/২, কুরতুবী : ৩১৭/৭, ইবনে কাছীর : ২৯০/২]

শানে নুযূল– ৪ : উবাদা ইবনে সামেত (রা.) বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বদর অভিমুখে যাত্রা করে শত্রুবাহিনীর সাথে মুখোমুখি হন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা শত্রু বাহিনীকে পরাজিত করেন, তখন মুসলমানদের একটি দল তাদের পিছনে তাড়া করে হত্যা করে এগিয়ে যায়। অপর একটি দল রাসূলকে ঘিরে রাখে। তৃতীয় একটি দল গনিমতের মালামাল জমায়েত করতে থাকে। আল্লাহ তা'আলা যখন শত্রুবাহিনীকে বিতারিত করলেন এবং যারা তদেরকে পশ্চাদ্ধাবন করেছিল তারাও ফিরে এল, তখন তারা বললেন, নফল বা অতিরিক্ত সম্পদের অধিকারী আমরা। আমরাই তো শত্রুবাহিনীর অনুসন্ধান করেছি এবং আমাদের মাধ্যমেই আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে বিতারিত ও পরাজিত করেছেন। যারা রাসূল ﷺ-কে ঘিরে রেখেছিলেন, তারা বললেন, তোমরা আমাদের অপেক্ষা নফলের অধিকারী অধিক নও; নফলের অধিকারী একমাত্র আমরাই। কারণ আমরা রাসূল ﷺ-কে পরিবেষ্টন করে রেখেছি। যার কারণে শত্রু বাহিনীরা তাঁর নিকট পর্যন্ত পৌঁছাতে পারেনি। যারা গনিমতের মালামাল জমায়েত করতে ব্যস্ত রয়ে ছিলেন, তারা বললেন আমরাই একমাত্র তার অধিকারী তোমরা তার অধিকারী নও। কারণ আমরাই এ মালামাল জমায়েত করেছি এবং তা হেফাজত করেছি। সে বিরোধ নিরসনের পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[কুরতুবী : ৩১৬/৭, ফাতহুল কাদীর-২৮৩/২]

(৫) **قوله كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ الخ আয়াতের শানে নুযূল :** ইবনে জারীর, ইবনে আবী হাতেম প্রমুখ হযরত আবূ আইয়ুব আনসারী (রা.) -এর বরাত দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমরা যখন মদিনায় অবস্থানরত ছিলাম, তখন রাসূল ﷺ আমাদেরকে ইরশাদ করেন যে, আমি সংবাদ পেয়েছি, আবূ সুফিয়ানের বাণিজ্যিক কাফেলা আসছে. তোমাদের কি ক্ষমতা রয়েছে যে, সামনে বাঁধা হয়ে দাঁড়াবে? আল্লাহ আমাদেরকে হয়তো গনিমত হিসেবে এ সম্পদ দিয়েও দিতে পারেন আমরা তখন হ্যাঁ বলে সাড়া দিলাম। সুতরাং তিনি আমাদেরকে নিয়ে বের হলেন। অতএব আমরা একদিন অথবা দুদিন চলার পর আমাদেরকে বললেন, শত্রুবাহিনীর সাথে মোকাবিলা করতে তোমরা কি মতামত প্রকাশ কর। তারা তো তোমাদের বের হয়ে আসা সম্পর্কীয় সংবাদ পেয়ে ফেলেছে আমরা সে মুহূর্তে বললাম যে, আল্লাহর কসম শত্রু সৈন্যের সাথে মোকাবিলা করতে আমাদের কি মতামত রয়েছে? আমরা তখনও পূর্বের ন্যায় বললাম। তখন মিকাদদ ইবনে ওমর বললেন যে, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর শপথ, মূসা (আ.) -এর উম্মতেরা মূসা (আ.)-কে যেরূপ বলেছিল, আমরা

আপনাকে তদ্রূপ বলব না যে, আপনি এবং আপনার রব দুজন গিয়ে তাদের সাথে যুদ্ধ করুন, আমরা এখানে অবস্থান করে থাকি। হযরত মিকদাদ (রা.) -এর দ্ব্যর্থহীনভাবে এ মতামত প্রকাশ করার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[ইবনে কাছীর-২৯৪/২, ফাতহুল কাদীর-২৮৮/২]

এ আয়াতটি বদর যুদ্ধে সংঘটিত একটি ঘটনার সাতে সম্পর্কিত। আয়াতের বিস্তারিত তাফসীরের পুর্বে সে ঘটনাটি জানা থাকবে এর তাফসীর বুঝতে সহজ হবে বলে আশা করি।

ঘটনাটি হলো এই যে, কুফর ও ইসলামের প্রথম সংঘর্ষ বদর যুদ্ধে যখন মুসলমানদের বিজয় সূচিত হয়ে গেল এবং কিছু গনিমতের মাল সামান্য হাতে এলো, তখন সেগুলোর বিলিবণ্টন নিয়ে সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে এমন এক ঘটনা ঘটে যা নিঃস্বার্থতা, এখলাস ও ঐক্যের সেই সুউচ্চমানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল না, যার ভিত্তিতে সাহাবায়ে কেরাম (রা.) -এর গোটা জীবন ঢেলে সাজানো ছিল। সেজন্য সর্বাগ্রে এ আয়াতে তার সমাধান দেওয়া হয়, যাতে করে এই পুতঃপবিত্র এবং নিষ্কলষ সম্প্রদায়ের অন্তরে বিশ্বাস ও নিঃস্বার্থতা এবং ঐক্য ও আত্মত্যাগের প্রেরণা ছাড়া অন্য কোনো বিষয় থাকতে না পারে।

এ ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী হযরত ওবাদা (রা.)-এর রেওয়ায়েতক্রমে মুসনাদে আহমদ, তিরমিযী, ইবনে মাজা, মুসতাদরাকে হাকেম প্রভৃতি গ্রন্থে এভাবে উদ্ধৃত রয়েছে যে, হযরত ওবাদা ইবনে সামেত (রা.)-এর নিকট কোনো এক ব্যক্তি আয়াতে উল্লিখিত 'আনফাল' শব্দের মর্ম জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, "এ আয়াতটি তো আমাদের অর্থাৎ বদর যুদ্ধে যারা অংশগ্রহণ করেছিলেন তাদের সম্পর্কেই নাজিল হয়েছে। সে ঘটনাটি ছিল এই যে, গনিমতের মালামাল বিলি বণ্টন ব্যাপারে আমাদের মাঝে সামান্য মত বিরোধ হয়ে গিয়েছিল যাতে আমাদের পবিত্র চরিত্র একটা অশুভ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। আল্লাহ এ আয়াতের মাধ্যমে গনিমতের সমস্ত মালামাল আমাদের হাত থেকে নিয়ে রাসূলে করীম ﷺ -এর দায়িত্বে অর্পণ করেন। আর রাসূলে কারীম ﷺ বদরে অংশগ্রহণকারী সবার মধ্যে সমানভাবে সেগুলো বন্টন করে দেন।:

ব্যাপার ঘটেছিল এই যে, বদরের যুদ্ধে আমরা সবাই রাসূলে করীম ﷺ -এর সাথে বেরিয়ে যাই এবং উভয় দলের মধ্যে তুমুল যুদ্ধের পর আল্লাহ তা'আলা যখন শত্রুদের পরাজিত করে দেন, তখন আমাদের সেনাবাহনী তিনটি ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। কিছু লোক শত্রুদের পশ্চাদ্ধাবন করেন, যাতে তারা পুনারায় ফিরে আসতে না পারে। কিছু লোক কাফেরদের পরিত্যক্ত গনিমতের মালামাল সংগ্রহে মনোনিবেশ করেন। আর কিছু লোক রাসূলে করীম ﷺ -এর পাশে এসে সমবেত হন, যাতে গোপনে লুকিয়ে থাকা কোনো শত্রু মহানবী ﷺ -এর উপর আক্রমণ করতে না পারে। যুদ্ধ শেষে সবাই যখন নিজেদের অবস্থানে এসে উপস্থিত হন, তখন যাঁরা গনিমতের মালামাল সংগ্রহ করেছিলেন, তাঁরা বলতে লাগলেন যে, এ সমস্ত মালামাল যেহেতু আমরা সংগ্রহ করেছি, কাজেই এতে আমাদের ছাড়া অপর কারও ভাগ নেই। আর যারা শত্রুর পশ্চাদ্ধাবন করতে গিয়েছিলেন তাঁরা বললেন, এতে তোমরা আমাদের চাইতে বেশি অধিকারী নও। কারণ, আমরাই তো শত্রুকে হটিয়ে দিয়ে তোমাদের জন্য সুযোগ করে দিয়েছি। যাতে তোমরা নিশ্চিন্তে গনিমতের মালামালগুলো সংগ্রহ করে আনতে পার। পক্ষান্তরে যারা মহানবী ﷺ -এর হেফাযতকল্পে তাঁর পাশে সমবেত ছিলেন, তাঁরা বললেন, আমরাও ইচ্ছা করলে গনিমতের এই মাল সংগ্রহে তোমাদের সাথে অংশগ্রহণ করতে পারতাম, কিন্তু আমরা জিহাদের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপুর্ণ কাজ রাসূলে কারীম ﷺ -এর হেফাযতে নিয়োজিত ছিলাম। অতএব আমরাও এর অধিকারী।

সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর কথাবার্তা হুজুর (সা.) পর্যন্ত পৌঁছার পর এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। এতে পরিষ্কার হয়ে যায় যে, এসব মালামাল আল্লাহ তা'আলার; একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত এর জন্য কোনো মালিক বা অধিকারী নেই, শুধু তাঁকে ছাড়া যাকে রাসূলে কারীম ﷺ দান করেন। সুতরাং মহানবী ﷺ আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নির্দেশ অনুযায়ী এসব মালামাল জিহাদে অংশগ্রহণকারীদের মাঝে সমানভাবে বণ্টন করে দেন। –[ইবনে কাছীর]

অতঃপর সবাই আল্লাহ ও রাসুলের এই সিদ্ধান্তের উপর রাজি হয়ে যান এবং তাঁদের মহান মর্যাদার পরিপন্থি পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল সেজন্য সবাই লজ্জিত হন।

اَنْفَالٌ শব্দটি نَفْلٌ -এর বহুবচন। এর অর্থ– অনুগ্রহ, দান ও উপঢৌকন। নফল নামাজ, রোজা সদকা প্রভৃতিকে এ কারণেই 'নফল' বলা হয় যে, নিজের খুশিতেই করে থাকে। কুরআন ও সুন্নাহর পরিভাষায় 'নফল ও আনফাল' গনিমত বা যুদ্ধলব্ধ মালামালকে বুঝাবার জন্য ব্যবহৃত হয় যা যুদ্ধ চলাকালে কাফেরদের থেকে লাভ করা হয়। তবে কুরআন মাজীদে

www.almodina.com

এতদর্থে তিনটি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে– ১. আনফাল ২. গনিমত এবং ৩. ফায়। اَنْفَال শব্দটি তো এ আয়াতেই রয়েছে আর غَنِيْمَةٌ (গনিমত) এবং তার ব্যাখ্যা সূরা হাশরের আয়াত وَمَا اَفَاءَ اللّٰهُ প্রসঙ্গে করা হয়েছে। এ তিনটি শব্দের অর্থ যৎসামান্য পার্থক্যসহ বিভিন্ন রকম। সামান্য ও সাধারণ পার্থক্যের কারণে অনেক সময় একটি শব্দকে অন্যটির জায়গায় শুধু 'গনিমতের মাল' অর্থেও ব্যবহার করা হয়। اَنْفَال (গনিমত) সাধারণত সে মালকে বলা হয়, যা যুদ্ধ জিহাদের মাধ্যমে বিরোধী দলের কাছ থেকে হাসিল করা হয়। আর فَيْءٌ (ফায়) বলা হয় সে মালকে যা কোনো রকম যুদ্ধবিগ্রহ ছাড়াই কাফেরদের কাছ থেকে পাওয়া যায়। তা সেগুলো ফেলে কাফেররা পালিয়েই যাক, অথবা স্বেচ্ছায় দিয়ে দিতে রাজি হোক। আর نَفْلٌ ও اَنْفَالٌ (নফল ও আনফাল) শব্দটি অধিকাংশ সময় এনআম বা পুরস্কার অর্থেও ব্যবহৃত হয়, যা জিহাদের নায়ক কোনো বিশেষ মুজাহিদকে তার কৃতিত্বের বিনিময় হিসেবে গনিমতের প্রাপ্য অংশের অতিরিক্ত পুরস্কার দিয়ে থাকেন। তাফসীরে ইবনে জারীর গ্রন্থে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে এ অর্থই উদ্ধৃত করা হয়েছে। -[ইবনে কাছীর] আবার কখনও 'নফল' ও 'আনফাল' শব্দ দ্বারা সাধারণ গনিমতের মালকেও বুঝানো হয়। এ আয়াতের ক্ষেত্রেও অধিকাংশ তাফসীরকার এই সাধারণ অর্থই গ্রহণ করেছেন। সহীহ বুখারী শরীফে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে এ অর্থই উদ্ধৃত করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এ শব্দটি সাধারণ অসাধারণ উভয় অর্থেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এতে কোনো মতবিরোধ নেই। বস্তুত এর সর্বোত্তম ব্যাখ্যা ও পর্যালোচনা হলো সেটাই যা ইমাম আবূ ওবাইদ (র.) করেছেন। তিনি স্বীয় গ্রন্থ 'কিতাবুল আমওয়াল' এ উল্লেখ করেছেন যে, মুল অভিধান অনুযায়ী 'নফল' বলা হয় দান ও পুরস্কারকে। আর এই উম্মতের প্রতি এটা এক বিশেষ দান যে, জিহাদ ও লড়াইয়ের মাধ্যমে যেসব মাল সামান কাফেরদের কাছ থেকে লাভ করা হয়, সেগুলো মুসলমানদের জন্য হালাল করে দেওয়া হয়েছে। বিগত উম্মতের মধ্যে এই প্রচলন ছিল না।

উল্লিখিত আয়াতে আনফাল -এর বিধান বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, এগুলো আল্লাহর এবং রাসূলের। তার অর্থ এই যে, এগুলোর প্রকৃত মালিকানা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের এবং রাসূলে করীম ﷺ হচ্ছেন সেগুলোর ব্যবস্থাপক। তিনি আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ মোতাবেক স্বীয় কল্যাণ বিবেচনায় সেগুলো বিলি বন্টন করবেন।

সেজন্যই হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.), ইকরিমা (রা.) এবং মুজাহিদ ও সুদ্দী (র.) প্রমুখসহ তাফসীরবিদগণের এক বিরাট দল মত প্রকাশ করেছেন যে, এ হুকুমটি ছিল ইসলামের প্রাথমিক আমলের যখন গনিমতের মাল সামান বিলি বন্টনের ব্যাপারে কোনো আইন অবতীর্ণ হয়নি [আলোচ্য সূরায় পঞ্চম রুকূকেত এ বিষয়টিই আলোচিত হবে। এ আয়াতে গনিমতের যাবতীয় মালামালের বিষয়টি মহানবী ﷺ-এর কল্যাণ বিবেচনায় উপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। তিনি যেভাবে ইচ্ছা তার ব্যবস্থা করতে পারেন। কিন্তু পরবর্তীতে যে বিস্তারিত বিধি বিধান এসেছে, তাতে বলে দেওয়া হয়েছে যে, গনিমতের সম্পূর্ণ মালামালকে পাঁচ ভাগ করে তার এক ভাগ বায়তুল মালে সাধারণ মুসলমানদের প্রয়োজনের লক্ষ্যে সংরক্ষণ করতে হবে এবং বাকী চার ভাগ বিশেষ নিয়ম নীতির ভিত্তিতে জিহাদে অংশগ্রহণকারী মুজাহিদগণের মাঝে বন্টন করে দেওয়া হবে। এ সম্পর্কিত বিস্তারিত বিবরণ হাদীসে উল্লেখ রয়েছে। সে সমস্ত বিস্তারিত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ সূরা আনফালের আলোচ্য প্রথম আয়াতটিকে রহিত করে দিয়েছে। আবার কোনো কোনো মনীষী বলেছেন যে, এখানে কোনো 'নাসেখ মনসুখ' অর্থাৎ রহিত কিংবা রহিতকারী নেই; বরং সংক্ষেপন ও বিশ্লেষণের পার্থক্য মাত্র। সূরা আনফালের প্রথম আয়াতে যা সংক্ষেপে বলা হয়েছে, একত্রিশতম আয়াতে তারই বিশ্লেষণ করা হয়েছে। অবশ্য 'ফায়' এর মালামাল যার বিধান সূরা হাশরে বিবৃত হয়েছে, তা সম্পূর্ণভাবে রাসূলে কারীম ﷺ-এর অধিকারভুক্ত। তিনি নিজের ইচ্ছা ও বিবেচনা অনুযায়ী যেভাবে ইচ্ছা ব্যবহার করতে পারেন। সে কারণেই সেখানে তার বিধান বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে– "আমার রাসূল যা কিছু তোমাদের দেন, তা গ্রহণ কর এবং যা থেকে বারণ করেন, তা থেকে বিরত থাক।"

এ বিশ্লেষণের দ্বারা প্রতীয়মান হচ্ছে যে, গনিমতের মাল হলো সে সমস্ত মালামাল যা যুদ্ধ জিহাদের মাধ্যমে হস্তগত করা হয়। আর 'ফায়' হলো সে সমস্ত মালামাল যা কোনো রকম লড়াই এবং জিহাদ ছাড়াই হাতে আসে। আর اَنْفَال (আনফাল) শব্দটি উভয় মালামালের জন্য সাধারণভাবে ব্যবহৃত হয় এবং সেই বিশেষ পুরস্কার বা উপঢৌকনের অর্থেও ব্যবহৃত হয়, যা জিহাদের নেতা বা পরিচালক দান করেন।

এ প্রসঙ্গে সাথিদেরকে পুরস্কার দেওয়ার চারটি রীতি মহানবী ﷺ-এর যুগ থেকে প্রচলিত রয়েছে। ১. একথা ঘোষণা করে দেওয়া যে, যে লোক কোনো বিরোধী শত্রুকে হত্যা করতে পারবে যে সামগ্রী তার সাথে থাকবে সেগুলো তারই হয়ে যাবে, যে হত্যা করেছে। এসব সামগ্রী গনিমতের সাধারণ মালামালের সাথে জমা হবে না। ২. বড় কোনো সৈন্যদল থেকে

কোনো দলকে পৃথক করে কোনো বিশেষ দিকে জেহাদ করার জন্য পাঠিয়ে দেওয়া এবং এমন নির্দেশ দেওয়া যে, এদিক থেকে যেসব গনিমতের মালামাল সংগৃহীত হবে সেগুলো উল্লিখিত বিশেষ দলের জন্য নির্দিষ্ট হয়ে যাবে। যারা সে অভিযানে অংশগ্রহণ করবে। তবে এতে শুধু এটুকু করতে হবে যে, সমস্ত মালামাল থেকে এক পঞ্চমাংশ সাধারণ মুসলমানদের প্রয়োজনে বায়তুল মালে জমা করতে হবে। ৩. বায়তুল মালে গনিমতের যে এক পঞ্চমাংশ জমা করা হয়, তা থেকে কোনো বিশষ গাজী (জয়ী)-কে তার কোনো বিশেষ কৃতিত্বের প্রতিদান হিসাবে আমীরের কল্যাণে বিবেচনা অনুযায়ী কিছু দান করা। ৪. সমগ্র গনিমতের মালামালের মধ্য থেকে কিছু অংশ পৃথক করে নিয়ে সেবাজীবী লোকদের মধ্যে পুরস্কারস্বরূপ দান করা, যারা মুজাহিদ বা সৈনিকদের ঘোড়া প্রভৃতির দেখাশোনা করে এবং তাদের বিভিন্ন কাজে সাহায্য করে । –[ইবনে কাছীর]

তাহলে আয়াতের মোটামুটি বিষয়বস্তু দাঁড়াল এই যে, এতে আল্লাহ তা'আলা রাসূলে কারীম ﷺ -কে উদ্দেশ্য করে বলেছেন, আপনার নিকট লোকেরা 'আনফাল' সম্পর্কে প্রশ্ন করে। আপনি তাদেরকে বলে দিন যে, 'আনফাল' সবই হলো আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের। অর্থাৎ নিজস্বভাবে কেউ এসবের অধিকারী কিংবা মালিক নয়। আল্লাহর নির্দেশক্রমে তাঁর রাসূল ﷺ এগুলোর ব্যাপারে যে সিদ্ধান্ত নিবেন, তাই কার্যকর হবে।

তাকওয়া ও আল্লাহভীতি সৌহার্দ্য ও ঐক্যের ভিত্তি : এ আয়াতের শেষ বাক্যে বলা হয়েছে– فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَصْلِحُوْا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗٓ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ এতে সাহাবায়ে কেরামকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে যে, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং পারস্পরিক সম্পর্ককে ভালো রাখ। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, ঘটনার প্রতি যা বদর যুদ্ধে গনিমতের মালামালের বিলিবন্টন সংক্রান্ত ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরামরে মাঝে ঘটে গিয়েছিল। এতে পারস্পরিক তিক্ততা এবং অসন্তুষ্টি সৃষ্টির আশঙ্কা বিদ্যমান ছিল। কাজেই আল্লাহ রাব্বুল আলামীন স্বয়ং গনিমতের মালামালের বিলি বণ্টনের বিষয় এ আয়াতের দ্বারা পরে মীমাংসা করে দিয়েছেন। তার পর তাঁদের আভ্যন্তরীণ সংস্কার ও পারস্পরিক সম্পর্ককে সুন্দর করার উপায় বলা হয়েছে যার কেন্দ্রবিন্দু হলো তাকওয়া বা পরহেজগারি এবং আল্লাহভীতি।

وَاَصْلِحُوْا ذَاتَ بَيْنِكُمْ অর্থাৎ তাকওয়া ও পরহেজগারির মাধ্যমে পারস্পরিক সম্পর্কের সংশোধন কর। এরই কিছুটা বিশ্লেষণ করে বলা হয়েছে– وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗٓ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ অর্থাৎ তোমরা যদি মুমিনই হবে, তাহলে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পুর্ণ আনুগত্য কর। অর্থাৎ ঈমানের দাবিই হলো আনুগত্য। আর আনুগত্যের ফল হলো তাকওয়া। কাজেই মানুষ যখন এ বিষয়গুলো লাভ করতে সমর্থ হয়, তখন তাদের পারস্পরিক বিবাদ বিসংবাদ, লড়াই ঝগড়া আপনা থেকেই তিরোহিত হয়ে যায় এবং শত্রুতার স্থলে অন্তরে সৃষ্টি হয় প্রেম সৌহার্দ্য।

মুমিনের বিশেষ গুণ বৈশিষ্ট্য : এ আয়াতগুলোতে সে সমস্ত গুণ-বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয়েছে যা প্রতিটি মুমিনের মধ্যে থাকা প্রয়োজন। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, প্রতিটি মুমিন নিজের বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ অবস্থায় পর্যালোচনা করে দেখবে, যদি তার মধ্যে এসব গুণ-বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকে, তাহলে আল্লাহ তা'আলার শুকরিয়া আদায় করবে যে, তিনি তাকে মুমিনের গুণাবলিতে মণ্ডিত করেছেন। আর যদি এগুলোর মধ্যে কোনো একটি গুণ তার মধ্যে না থাকে, কিংবা থাকলেও তা একান্ত দুর্বল বলে মনে হয়, তাহলে তা অর্জন করার কিংবা তাকে সবল করে তোলার প্রচেষ্টয় আত্মনিয়োগ করবে।

প্রথম বৈশিষ্ট্য আয়াহর ভয় : আয়াতে প্রথম বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে বলা হয়েছে– اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ অর্থাৎ তাদের সামনে যখন আল্লাহর আলোচনা করা হয়, তখন তাদের অন্তর আঁতকে উঠে। অর্থাৎ তাদের অন্তর আল্লাহর মহত্ত্ব ও প্রেমে ভরপুর, যার দাবী হলো ভয় ও ভীতি। কুরআন কারীমের অন্য এক আয়াতে তারই আলোচনাক্রমে খোদ প্রেমিকদেরকে সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে– وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ অর্থাৎ '(হে নবী) সুসংবাদ দিয়ে দিন সে সমস্ত বিনয়ী, কোমলপ্রাণ লোকদেরকে যাদের অন্তর তখন ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে উঠে, যখন তাদের সামনে আল্লাহর আলোচনা করা হয়।' এতদুভয় আয়াতে আল্লাহর আলোচনা ও স্মরণের একটা বিশেষ অবস্থার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তা হলো ভয় ও ত্রাস। আর অপর আয়াতটিতে আল্লাহর জিকিরের এ বৈশিষ্ট্যরও বর্ণনা করা হয়েছে যে, তাতে অন্তর প্রশান্ত হয়ে উঠে। বলা হয়েছে– اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ অর্থাৎ আল্লাহর জিকিরের দ্বারাই আত্মা শান্তি লাভ করে, প্রশান্ত হয়।

এতে বুঝা যাচ্ছে যে, আয়াতে যে ভয় ও ভীতির কথা বলা হয়েছে তা মনের প্রশান্তি এবং স্বস্তির পরিপন্থি নয়, যেমন হিংস্র জীবজন্তু কিংবা শত্রুর ভয় মানুষের মনের শান্তিকে ধ্বংস করে দেয়। আল্লাহর জিকিরের দরুন অন্তরে সৃষ্ট ভয় তা থেকে

সম্পূর্ণ আলাদা। সেজন্য এখানে خَوْف শব্দটি ব্যবহার করা হয়নি; وَجَل শব্দের দ্বারা বুঝানো হয়েছে। এর অর্থ সাধারণ ভয় নয়; বরং এমন ভয়, যা বড়দের মহত্ত্বের কারণে মনের মধ্যে সৃষ্টি হয়। কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন যে, এখানে আল্লাহর জিকির বা স্মরণ অর্থ হচ্ছে, কোনো ব্যক্তি কোনো পাপ কাজে লিপ্ত হতে ইচ্ছা করছিল, তখনই আল্লাহর কথা তার স্মরণ হয়ে গেল এবং তাতে সে আল্লাহর আজাবের ভয়ে ভীত হয়ে গেল এবং সে পাপ থেকে বিরত রইল। এ ক্ষেত্রে ভয় অর্থ হবে আজাবের ভয়। –[বাহরে মহীত]

দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য ঈমানের উন্নতি : মুমিনের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, তার সামনে যখন আল্লাহ তা'আলার আয়াত পাঠ করা হয়, তখন তার ঈমান বৃদ্ধি পায়। সমস্ত আলেম, তাফসীরবিদ ও হাদীসবিদগণের সর্বসম্মত মতে, ঈমান বৃদ্ধির অর্থ হলো ঈমানের শক্তি, অবস্থা এবং ঈমানী শক্তি, অবস্থা এবং ঈমানী জ্যোতির উন্নতি। আর একথা অভিজ্ঞতার মাধ্যমে প্রমাণিত যে, সৎকাজের দ্বারা ঈমানী শক্তি এবং এমন আত্মিক প্রশান্তি সৃষ্টি হয়, তাতে সৎকর্ম মানুষের অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়। তখন তা পরিহার করতে গেলে খুবই কষ্ট হয় এবং পাপের প্রতি একট প্রকৃতিগত ঘৃণার উদ্ভব হয়, যার ফলে সে তার কাছেও যেতে পারে না। ঈমানের এ অবস্থাকেই হাদীসে 'ঈমানের মাধুর্য' শব্দে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

সুতরাং আয়াতের সারমর্ম হচ্ছে এই যে, একজন পরিপূর্ণ মুমিনের এমন গুণ বৈশিষ্ট্য থাকা উচিত যে, তার সামনে যখনই আল্লাহর আয়াত পাঠ করা হবে, তখন তার ঈমানের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি পাবে, তাতে উন্নতি সাধিত হবে এবং সৎকর্মের প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধি পাবে, তাতে উন্নতি সাধিত হবে এবং সৎকর্মের প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধি পাবে। এতে বুঝা যাচ্ছে, সাধারণ মুসলমানরা যেভাবে কুরআন পাঠ করে এবং শুনে, যাতে না থাকে কুরআনের আদব ও মর্যাদাবোধের কোনো খেয়াল, না থাকে আল্লাহ জাল্লা শানুহুর মহত্ত্বের ফলাফলও সৃষ্টি হয় না। অবশ্য সেটাও সম্পূর্ণভাবে পূর্ণ বিবর্জিত নয়।

তৃতীয় বৈশিষ্ট্য আল্লাহর প্রতি ভরসা: মুমিনের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে যে, তারা আল্লাহ তা'আলার উপর ভরসা করবে। তাওয়াক্কুল অর্থ হলো– আস্থা ও ভরসা। অর্থাৎ নিজের যাবতীয় কাজ কর্ম ও অবস্থায় তার পরিপূর্ণ আস্থা ও ভরসা থাকে শুধুমাত্র একক সত্তা আল্লাহ তা'আলার উপর। সহীহ হাদীসে বর্ণিত রয়েছে মহানবী (সা.) চেষ্টা চরিত্রকে পরিত্যাগ করে বসে থাকবে; বরং এর অর্থ হলো এই যে, বাহ্যিক জড় উপকরণকেই প্রকৃত কৃতকার্যতার জন্য যথেষ্ট বলে মনে না করবে বরং নিজের সামর্থ্য ও সাহস অনুযায়ী জড় উপকরণের আয়োজন ও চেষ্টা চরিত্রের পর সাফল্য আল্লাহ তা'আলার উপর ছেড়ে দেবে এবং মনে করবে যে, যাবতীয় উপরকণও তাঁরই সৃষ্টি এবং সে উকরণসমুহের তিনিই সৃষ্টি করেন। বস্তুত হবেও তাই, যা তিনি চাইবেন। এক হাদীসে বলা হয়েছে اَجْمِلُوْا فِى الطَّلَبِ وَتَوَكَّلُوْا عَلَى اللّٰهِ অর্থাৎ স্বীয় জিকির এবং অন্যান্য প্রয়োজনের জন্য মাঝামাঝি পর্যায়ের অন্বেষণ এবং জড় উপকরণের মাধ্যমে চেষ্টা করার পর তা আল্লাহর উপর ছেড়ে দাও। নিজের মন মস্তিষ্কেরে শুধুমাত্র স্থুল পচেষ্টা ও জড়উপরকরণের মাঝেই জড়িয়ে রেখোনা।

চুতর্থ বৈশিষ্ট্য নামাজ প্রতিষ্ঠা করা : মুমিনের চতুর্থ বৈশিষ্ট্য বলা হয়েছে নামাজ প্রতিষ্ঠা করা। এখানে এ বিষয়টি স্মরণ রাখার যোগ্য যে, এখানে 'নামাজ' পড়ার কথা নয়; বরং নামাজ প্রতিষ্ঠা করার কথা বলা হয়েছে। اِقَامَتْ শব্দের অর্থ হলো কোনো কিছুকে সোজা দাঁড় করানো। কাজেই اِقَامَتْ صَلٰوة এর মর্মার্থ হচ্ছে নামাজের যাবতীয় আদব কায়দা রীতি নীতি ও শর্তাশর্ত এমনভাবে সম্পাদন করা, যেমন করে রাসূলে কারীম (সা.) স্বীয় কথা ও কাজের মাধ্যমে বাতলে দিয়েছেন। আদবকায়দা ও শর্তাশর্তের কোনো রকম ত্রুটি হলে তাকে নামাজ পড়া বলা গেলেও নামাজ প্রতিষ্ঠা করা বলা যেতে পারে না। কুরআন মাজীদে নামাজের যেসব উপকারিতা, প্রভাব-প্রতিক্রিয়া এবং বরকতের কথা বলা হয়েছে যেমন– اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاۤءِ وَالْمُنْكَرِ (অর্থাৎ নামাজ লজ্জাহীনতা ও পাপ থেকে বিরত রাখে।) তা নামাজ প্রতিষ্ঠা করার উপরই নির্ভরশীল। নামাজের আদবসমূহের যখন কোনো রকম ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটে তখন ফতোয়ার দিক দিয়ে তার সে নামাজকে জায়েজ বলা হলেও ত্রুটির পরিমাণ হিসেবে নামাজের বরকত ও কল্যাণে পার্থক্য দেখা দিবে। কোনো কোনো অবস্থায় তার বরকত বা কল্যাণ থেকে সম্পূর্ণভাবে বঞ্চিত হতে হবে।

পঞ্চম বৈশিষ্ট্য আল্লাহর রাহে ব্যয় করা : মর্দে মুমিনের পঞ্চম বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তাকে যে রিজিক দান করেছেন, তা থেকে আল্লাহর রাহে খরচ করবে। আল্লাহর রাহে এই ব্যয় করার অর্থ ব্যাপক। এতে শরিয়ত নির্ধারিত যাকাত ফেতরা প্রভৃতি নফল দান-খয়রাতসহ মেনমানদারি, বড়দের কিংবা বন্ধুবান্ধবের প্রতি কৃত আর্থিক সাহায্য-সহায়তা প্রভৃতি সব করমের দান খয়রাতই অন্তর্ভুক্ত।

www.almodina.com

মর্দে মুমিনের এই পাঁচটি বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করার পর বলা হয়েছে أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا অর্থাৎ এমনসব লোকই হলো সত্যিকার মুমিন যাদের ভিতর ও বাহির এক রকম এবং মুখ ও অন্তর ঐক্যবদ্ধ। অন্যথা যাদের মধ্যে এ সমস্ত বৈশিষ্ট্য অবর্তমান, তারা মুখে أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللَّهِ বললেও তাদের অন্তরে না থকে তাওহীদের রং আর না থাকে রাসূলের আনুগত্য। তাদের কার্যধারা তাদের কথাকে প্রত্যাখ্যান করে। কাজেই এ আয়াতে এই ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে যে, প্রত্যেক সত্যেরই একটি তাৎপর্য থাকে। তা যখন অর্জিত হয় না, তখন সত্যটিও লাভ হয় না।

কোনো এক ব্যক্তি হযরত হাসান বসরী (র.)-এর নিকট জিজ্ঞেস করেছিল যে, হে আবূ সাঈদ! আপনি কি মুমিন? তখন তিনি বললেন, ভাই ঈমান দু'প্রকার। তোমার পশ্নের উদ্দেশ্য যদি এই হয়ে থাকে যে, আমি আল্লাহ তাঁর ফেরেশতাগণ, কিতাবসমূহ ও রাসূলগণের উপর এবং বেহেশত দোজখ কেয়ামত ও হিসাব কিতাবের উপর বিশ্বাস রাখি কি না? তাহলে তার উত্তর এই যে, নিশ্চয়ই আমি মুমিন। পক্ষান্তরে সূরা আনফলের আয়াতে যে মুমিনে কামেল বা পরিপুর্ণ মুমিনের কথা বলা হয়েছে তোমার প্রশ্নের উদ্দেশ্য যদি এই হয় আমি তেমন মুমিন কি না? তাহলে আমি তা কিছুই জানি না যে, আমি তার অন্তর্ভুক্ত কিনা। সূরা আনফালের আয়াত বলতে সে আয়াতগুলেই উদ্দেশ্য যা আপনারা এইমাত্র শুনলেন।

আয়াতগুলোতে সত্যিকার মুমিনের গুণ বৈশিষ্ট্য ও লক্ষণাদি বর্ণনা করার পর বলা হয়েছে لَهُمْ دَرَجَٰتٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ এতে মুমিনদের জন্য তিনটি বিয়য়ের ওয়াদা করা হয়েছে। ১. সুউচ্চ মর্যাদা, ২. মাগফেরাত বা ক্ষমা এবং ৩.সম্মানজনকক রিজিক।

তাফসীরে বাহরে মুহীতে উল্লেখ রয়েছে যে, এর পূর্ববর্তী আয়াতে মুমিনদের যে গুণ-বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয়েছে সেগুলো তিন রকম– ১. সেসব বৈশিষ্ট্য যার সম্পর্ক অন্তর ও অভ্যন্তরের সাথে। যেমন ইমান খোদাভীতি আল্লাহর উপর ভরসা বা নির্ভরশীলতা, ২. যার সম্পর্ক দৈহিক কার্যকলাপের সাথে। যেমন নামাজ, রোজা প্রভৃতি ৩. যার সম্পর্ক ধনসম্পদের সাথে। যেমন আল্লাহর পথে ব্যয় কর।

এ তিনটি বৈশিষ্ট্যের প্রেক্ষিতে তিনিটি পুরস্কারের কথা বলা হয়েছে। আত্মিক গুণাবলরি জন্য 'সুউচ্চ মার্যাদা'। সে সমস্ত আমল বা জকাজ কর্মের জন্য 'মাগফেরাত' ক্ষমা যেগুলোর সম্পর্ক মানুষের দেহের সাথে। যেমন নামাজ, রোজা প্রভৃতি। হাদীসে উল্লেখ রয়েছে যে, রিজিক এর ওয়াদা দেওয়া হয়েছে আল্লাহর রাহে ব্যয় করার জন্য। মুমিন এ পথে যা ব্যয় করবে, আখেরাতে সে তদপেক্ষা বহু উত্তম ও বেশি প্রাপ্ত হবে।

সূরার শুরুতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, সুরা আনফালের অধিকাংশ বিষয়টিই হলো কাফের মুশরিকদের আজাব ও প্রতিশোধ এবং মুসলমানদের প্রতি অনুগ্রহ ও পুরস্কার সম্পর্কিত। এতে উভয়পক্ষের জন্যই শিক্ষা ও উপদেশমূলক বিষয় এবং বিধি বিধান বর্ণিত হয়েছে। আর এসব বিষয়ের মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি ছিল বদর যুদ্ধ। এতে বিপুল আয়োজন, সংখ্যাধিক গুরুত্বপুর্ণ বিষয়টি ছিল বদর যুদ্ধ। এতে বিপুল আয়োজন, সংখ্যাধিক্য ও প্রচুর শক্তি সত্ত্বেও মুশরিকরা জান মালের বিপুল ক্ষতিসহ পরাজয় বরণ করেছে। পক্ষান্তরে মুসলমানরা সর্বপ্রকার স্বল্পতা সত্ত্বেও বিজয়ের গৌরব অর্জন করেছেন।

বদর যুদ্ধের সময় কোনো কোনো মুসলমান জিহাদের অভিযান পছন্দ করছিলেন না, কিন্তু আল্লাহ তা'আলার বিশেষ ফরমানের সাহায্যে রাসূলে কারীম ﷺ-কে জিহাদাভিযানের নির্দেশ দিলে তারাও তাতে অংশগ্রহণ করেন যারা ইতঃপূর্বে বিষয়টিকে পছন্দ করছেলেন। এর বিষয়টি বর্ণনা করতে গিয়ে কুরআন করীম এমনসব শব্দ প্রয়োগ করেছে, যেগুলো বিভিন্নভাবে প্রণিধানযোগ্য।

আয়াতটিতে আরজ করা হয়েছে كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ বাক্য দিয়ে। এতে كَمَا এমন একটি বাক্যাংশ যা তুলনা বা উদাহরণ দিতে গিয়ে প্রয়োগ করা হয়। অতএব, লক্ষ্য করার বিষয় যে, এখানে কিসের সাথে কিসের তুলনা করা হচ্ছে। তাফসীরকার মনীষীবৃন্দ এর বিভিণ্ন বিশ্লেষণ করেছেন। তাতে বহুবিধ সম্ভাবত রয়েছে।

১. এই তুলনার উদ্দেশ্য এই যে, যেভাবে বদর যুদ্ধে হস্তগত গনিমতের মালামতাল বণ্টন করার সময় সাহাবায়ে কেরাম (রা.) -এর মাঝে পারস্পরিক কিছুটা মতবিরোধ হয়েছিল এবং পরে আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ মোতাবেক সবাই মহানবী ﷺ-এর হুকুমের প্রতি আনুগত্য করেন এবং তাঁর বরকত ও শুভ পরিণতিসমূহ দেখতে পান, তেমনিভাবে এ জিহাদের প্রারম্ভে কারো পক্ষ থেকে তা অপছন্দ করা হলেও পরে আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ অনুযায়ী সবাই আনুগত্য প্রদর্শন করে এবং তার শুভফল ও উত্তম পরণতি দেখতে পায়। এ বিশ্লষণকে ফাররা ও মুবাররাদ নাহবীদ্বয়ের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। তাছাড়া বয়ানুল কুরআনেও এ বিশ্লেষণকেই অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে।

২. এমন সম্ভাবনাও হতে পারে যে, বিগত আয়াতসমূহে সত্যিকার মুমিনগণের জন্য আখেরাতে সুউচ্চ মর্যাদা ক্ষমা ও সম্মানজনক রুজি দানের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। অতঃপর এ আয়াতগুলোতে সে সমস্ত প্রতিশ্রুতি যদিও এখনই চোখে পড়ে না, কিন্তু বদর যুদ্ধে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে বিজয় ও সাহায্যের যে প্রতিশ্রুতি প্রত্যক্ষ করা গেছে তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ কর এবং দৃঢ়ভাবে একথা বিশ্বাস কর যে, এ পৃথিবীতেই যেভাবে ওয়াদা বাস্তবায়িত হয়েছে তেমনিভাবে আখেরাতের ওয়াদাও অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে। –[কুরতুবী]

৩. এমনও সম্ভাবনা রয়েছে যা আবু হাইয়্যান (র.) মুফাসসেরীনদের উক্তি উদ্ধৃত করার পর লিখেছেন যে, এ সমস্ত উক্তির যে কোনোটির উপরেও আমার পরিপূর্ণ আস্থা ছিল না। একদিন আমি এ আয়াতটির বিষয় চিন্তা করতে করতে ঘুমিয়ে পড়লে স্বপ্নে দেখলাম, আমি কোথাও যাচ্ছি এবং আমার সাথে অন্য একটি লোক রয়েছে। আমি সে লোকটির সাথে এ আয়াতের ব্যাপারে তর্ক বিতর্ক করতে গিয়ে বললাম আমি কখনোও এমন জটিলতার সম্মুখীন হয়নি, যেমনটি এ আয়াতের ব্যাপারে হয়েছি। আমার মনে হচ্ছে, যেন এখানে কোনো একটি শব্দ উহ্য রয়ে গেছে তারপর হঠাৎ স্বপ্নের মাঝেই আমার মনে পড়ে গেল যে, এখানে نَصَرَكَ (নাসারাকা) শব্দটি উহ্য রয়েছে। বিষয়টি আমারও বেশ মনঃপূত ও পছন্দ হলো এবং যার সাথে তর্ক করছিলাম সেও পছন্দ করলো। ঘুম থেকে জাগার পর পুনরায় বিষয়টি নিয়ে আমি ভাবতে লাগলাম। তাতে আমার মনের সন্দেহ বা প্রশ্ন দূর হয়ে গেল। কারণ এ ক্ষেত্রে كَمَا শব্দটির ব্যবহার উদাহরণ ব্যক্ত করার জন্য থাকে না; বরং কারণ বিশ্লেষণাত্মক হয়ে দাঁড়ায়। আর তখন আয়াতের অর্থ দাঁড়ায় এই যে, বদর যুদ্ধের সময় মহান পরওয়ারদেগার আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকেই যে বিশেষ সাহায্য সহায়তা নবী করীম ﷺ-এর প্রতি হয়েছিল তার কারণ ছিল এই যে, এই জিহাদে তিনি যা কিছু করেছিলেন তার কোনো কিছুই নিজের মতে করেননি; বরং সেসবই করেছিলেন প্রভুর নির্দেশে এবং খোদায়ী হুকুমের প্রেক্ষিতে। তাঁরই হুকুমে তিনি ঘর ছেড়ে বেরিয়েছিলেন। আল্লাহর আনুগত্যের ফলও তাই হওয়া উচিত এবং তাতেই আল্লাহর সাহায্য সহায়তা পাওয়া যায়।

যাহোক, আয়াতে বর্ণিত এই বাক্যটিতে উল্লিখিত তিনটি অর্থেরই সম্ভাবনা রয়েছে এবং তিনটিই যথার্থ বটে।

বস্তুত : اَخْرَجَكَ বাক্যের দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, জিহাদের উদ্দেশ্যে মহানবী ﷺ-এর যাত্রা প্রকৃত প্রস্তাবে যেন আল্লাহ তা'আলারই যাত্রা ছিল যা হুজুরের মাধ্যমে বাস্তবতা লাভ করেছে বা প্রকাশ পেয়েছে।

এখানে এ বিষয়টিও লক্ষণীয় যে, এখানে اَخْرَجَكَ رَبُّكَ বলা হয়েছে যাতে আল্লাহর উল্লেখ এসেছে 'রব' গুণবাচক নামে। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, তাঁর এ জিহাদ মাত্র ছিল পালনকর্তা ও লালনসুলভ গুণেরই দাবী, কারণ এতে অত্যাচারিত উৎপীড়িত মুসলমানদের জন্য বিজয় এবং অত্যাচারী, দাম্ভিক কাফেরদের জন্য আজাবের বিকাশই ছিল উদ্দেশ্য।

مِنْ بَيْتِكَ -এর অর্থ হলো– আপনার ঘর থেকে। অর্থাৎ আপনার পালনকর্তা আপনাকে আপনার ঘর থেকে বের করেছেন। অধিকাংশ তাফসীরকারের মতে এই 'ঘর' বলতে মদিনা তাইয়্যেবার ঘর কিংবা মদিনাকে বুঝানো হয়েছে। যেখানে হিজরতের পর তিনি অবস্থান করছিলেন। কারণ বদরের ঘটনাটি হিজরি দ্বিতীয় বর্ষে সংঘটিত হয়েছিল। এরই সঙ্গে بِالْحَقِّ শব্দ ব্যবহার করে বাতলে দেওয়া হয়েছে যে, এই সমুদয় বিষয়টিই সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা এবং অন্যায় ও অসত্যকে প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হয়েছে। অন্যান্য রাষ্ট্র বা সরকারের মতো রাজ্য বিস্তারের লোভ কিংবা রাজ্যবর্গের রাগ রোষের প্রেক্ষিতে ছিল না। আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে– وَاِنَّ فَرِيْقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ لَكٰرِهُوْنَ অর্থাৎ মুসলমানদের কোনো একটি দল এ জিহাদ কঠিন মনে করছিল এবং পছন্দ করছিল না। সাহাবায়ে কেরামের মনে এই কঠিনতাবোধ কেমন করে এল, সেকথা উপলব্ধি করার জন্য এবং পরবর্তী অন্যান্য আয়াতগুলো যথাযথভাবে বুঝার জন্য প্রথম গযওয়ায়ে বদরের প্রাথমিক অবস্থা ও কারণগুলো জেনে নেওয়া প্রয়োজন।

ইবনে আকাবাহ ও ইবনে আমরের বর্ণনা অনুসারে ঘটনাটি ছিল এই যে, রাসূলে কারীম ﷺ -এর নিকট মীনায় এ সংবাদ এসে পৌঁছে যে, আবু সুফিয়ান একটি বাণিজ্যিক কাফেলাসহ বাণিজ্যিক পণ্য সামগ্রী নিয়ে সিরিয়া থেকে মক্কার দিকে যাচ্ছে। আর এই বাণিজ্যে মক্কার সমস্ত কুরাইশ অংশীদার। ইবনে আকাবার বর্ণনা অনুযায়ী মক্কায় এমন কোনো কুরাইশ নারী বা পুরুষ ছিল না যার অংশ এ বাণিজ্যে ছিল না। কারো কাছে এক সিকাল (সাড়ে চার মাশা) পরিমাণ সোনা থাকলে সেও তা এতে নিজের অংশ হিসাবে লাগিয়েছিল। এই কাফেলার মোট পুঁজি সম্পর্কে ইবনে আকাবার বর্ণনা হচ্ছে এই যে, তা পঞ্চাশ হাজার দিনার ছিল। দিনার হলো একটি স্বর্ণমুদ্রা যার ওজন সাড়ে চার মাশা। স্বর্ণের দর অনুযায়ী এর মূল্য হয়, বায়ান্ন টাকা এবং গোটা পুঁজির মূল্য হয় ছাব্বিশ লক্ষ টাকা। আর তাও আজকের নয়; বরং চৌদ্দ শত বছর পূর্বেকার

www.almodina.com

ছাব্বিশ লক্ষ যা বর্তমান চাব্বিশ কোটি অপেক্ষাও অনেক গুণ বেশি হতে পাারে। এই বাণিজ্যিক কাফেলার রক্ষণাবেক্ষণ এবং ব্যবসার জন্য সত্তর জন কুরাইশ যুবক ও সর্দার এর সাথে ছিল। এতে প্রতীয়মান হয় যে, পকৃতপক্ষে এই বাণিজ্য কাফেলাটি ছিল কুরাইশদের একটি বাণিজ্য কোম্পানী।

ইবনে আব্বাস (রা.) প্রমুখের রেওয়ায়েত মতে বগভী (র.) উল্লেখ করেছেন যে, এই কাফেলার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন কুরাইশদের চল্লিশ জন ঘোড়সওয়ার সর্দার যাদের মধ্যে আমর ইবনুল আস, মাখরামাহ ইবনে নাওফেল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া একথাও সবাই জানত যে, কুরাইশদের এই বাণিজ্য এবং বানিজ্যিক এই পুঁজিই ছির সবচেয়ে বেড় শক্তি। এরই ভরসায় তারা রাসূলে কারীম (সা.) ও তাঁর সঙ্গী সাথীদেরকে উৎপীড়ন করে মক্কা ছেড়ে যেতে বাধ্য করেছিল। সে কারণেই রাসূল ﷺ যখন সিরিয়া থেকে এই কাফেলা ফিরে আসার সংবাদ পেলেন, তখন তিনি স্থির করলেন যে, এখনই কাফেলার মোকাবিলা করে কুরাইশদের ক্ষমতাকে ভেঙ্গে দেওয়ার উপযুক্ত সময়। তিনি সহাবায়ে কেরামের সাথে এ বিষেয়ে পরামর্শ করলেন। তখন ছিল রমজানের মাস। যুদ্ধেরও কোনো পুর্বপ্রস্তুতি ছিল না। কাজেই কেউ কেউ সাহস ও শৌর্য প্রদর্শন করলেও অনেকে কিছুট দোদুল্যমানতা প্রকাশ করলেন। স্বয়ং রাসূল ﷺ ও সবার সাব্যস্ত করলেন না; বরং তিনি হুকুম করলেন, যাদের কাছে সওয়ারির ব্যবস্থা রয়েছে, তারা যেন আমাদের সাথে যুদ্ধ যাত্রা করেন। তাতে অনেকে যুদ্ধ যাত্রা থেকে বিরত থেকে যান। আর যারা যুদ্ধে যেতে ইচ্ছুক ছিলেন, কিন্তু তাদের সওয়ারী ছিল গ্রাম এলাকায়, তাঁরা গ্রাম থেকে সওয়ারী আনিয়ে পরে যুদ্ধে অংশগ্রহণের অনুমতি চাইলেন, কিন্তু এতটা অপেক্ষা করার মতো সময় তখন ছিল না। তাই নির্দেশ হলো, যাদের নিকট এ মুহূর্তে সওয়ারী উপস্থিত রয়েছে এবং জিহাদে যেতে চান, শুধু তাঁরাই যাবেন। বাইরে থেকে সওয়ারী আনিয়ে নেবার মতো সময় এখন নেই। কাজেই রাসূল ﷺ-এর সাথে যেতে আগ্রহীদের মধ্যেও অল্পই তৈরী হতে পারলেন।

বস্তুত যারা এই জিহাদে অংশগ্রহণের আদৌ ইচ্ছাই করেনি, তার কারণও ছিল তা এই যে, মহানবী ﷺ এতে অংশগ্রহণ করা সবার জন্য ওয়াজিব বা অপরিহার্য সাব্যস্ত করেননি। তাছাড়া তাদের মনে এ বিশ্বাসও ছিল যে, এটা একটি বাণিজ্যিক কাফেলা মাত্র, কোনো যুদ্ধবাহিনী নয় যার মোকাবিলা করার জন্য রাসূলে কারীম ﷺ এবং তাঁর সঙ্গীদেরকে খুব বেশি পরিমাণ সৈন্য কিংবা মুজাহেদীনের প্রয়োজন পড়তে পারে। কাজেই সাহাবায়ে কেরামরে এক বিরাট অংশ এতে অংশগ্রহণ করেননি।

মহানবী ﷺ 'বি'রে সুকইয়া' নামক স্থানে পৌঁছে যখন কায়েস ইবনে সা'দ আদ (রা.)-কে সৈন্য গণনা করার নির্দেশ দেন, তখন তিনি তা গুণে নিয়ে জানান তিন'শ তের জন রয়েছে। মহানবী ﷺ এ কথা শুনে আনন্দিত হয়ে বললেন, তালুতের সৈন্য সংখ্যাও তাই ছিল। কাজেই লক্ষণ শুভ। বিজয় ও কৃতকার্যতারই রক্ষণ বটে। সাহাবায়ে কেরামের সাথে মোট উট ছিল সত্বরটি। প্রতি তিন জনের জন্য একটি , যাতে তারা পালাক্রমে সওয়ারী করেছিলেন। স্বয়ং রাসূলে করীম ﷺ-এর সাথে অপর দুজন একটি উটের অংশীদার ছিলেন। তাঁরা ছিলেন হযরত আবূ লুবাবা ও হযরত আলী (রা.)। যখন রাসূল ﷺ-এর পায়ে হেঁটে চলার পালা আসত, তখন তারা বলতেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি উটের উপরেই থাকুন, আপনার পরিবর্তে আমরা হেঁটে চলব। তাতে রাহমাতুল্লিল আলামীনের পক্ষ থেকে উত্তর আসত না, তোমরা আমর চাইতে বেশি বলিষ্ঠ, আর না আখেরাতের ছওয়াবে আমার প্রয়োজন নেই যে, আমার বলিষ্ঠ, আর না আখোরতের ছওয়াবের সুযোগটি তোমাদেরকে দিয়ে দেব। সুতরাং নিজের পালা এলে মহানবী ﷺ ও পায়ে হেঁটে চলতেন।

অপরদিকে সিরিয়ার বিখ্যাত স্থান 'আইনে যোরকায়' পৌঁছে এক ব্যাক্তি কোরায়েশ কাফেলার নেতা আবূ সুফিয়ানকে এ সংবাদ দিল যে, রাসূলে করীম (সা.) তদের এ কাফেলার অপেক্ষা করেছেন। তিনি এর পশ্চাদ্ধাবন করবেন। আবূ সুফিয়ান সতকর্তা মুলক ব্যবস্থা অবলম্বন করল। যখন কাফেলাটি হেজাযের সীমানায় পৌঁছাল, তখন বিচক্ষণ ও কর্মক্ষম জনৈক দমদম ইবনে ওমরকে কুড়ি মেসকাল সোনা অর্থাৎ প্রায় দু'হাজার টাকা মজুরি দিয়ে এ ব্যাপারে রাজি করাল যে, সে একটি দুতগামী উষ্ট্রীতে চড়ে যথাশীঘ্রই মক্কা মুকাররামায় গিয়ে এ সংবাদটি পৌঁছে দিবে যে, তাদের কাফেলা সাহাবায়ে কেরামের আক্রমণ আশঙ্কার সম্মুখীন হয়েছে।

দমদম ইবনে ওমর সেকালের বিশেষ রীতি অনুযায়ী আশঙ্কার ঘোষণা দেওয়ার উদ্দেশ্যে তার উষ্ট্রীর নাক কান কেটে এবং নিজের পরিধেয় পোশাকের সামনে পেছনে ছিঁড়ে ফেলল এবং হাওদাটি উলে। এভাবে উষ্ট্রীর পিঠে বসিয়ে দেল। এটি ছিল সেকালের ঘোর বিপদের চিহ্ন যখন সে এভাবে মক্কায় এসে ঢুকল, তখন; গোটা মক্কা নগরীতে এক হৈচে পড়ে গেল, সাজ

www.almodina.com

সাজ রব উঠলছ। সমস্ত কুরাইশ প্রতিরোধের জন্য তৈরি হয়ে গেল। যারা এ যুদ্ধে যেতে পারল, নিজেই অংশগ্রহণ করল। আর যারা কোনো কারণে অপারগ ছিল, তারা অন্য কাউকে নিজের স্থলাভিষিক্ত করে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করল। এভাবে মাত্র তিন দিনের মধ্যে সমগ্র কুরাইশ বাহিনী পরিপুর্ণ সাজ সরঞ্জাম নিয়ে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে গেল।

তাদের মধ্যে যারা এ যুদ্ধে অংশগ্রহণে গড়িমসি করত, তাদেরক তার সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখত এবং মুসলমানদের সমর্থক বলে মনে করত। কাজেই এ ধরনের লোকদের তারা বিশেষভাবে যুদ্ধে অংশগ্রহণে বাধ্য করেছিল। যারা প্রকাশ্যভাবে মুসলমান ছিলেন এবং কোনো অসুবিধার দরুন তখনও হিজরত করতে না পেরে মক্কাতে অবস্থান করছিলেন, তাদেরকেও এ যুদ্ধে অংশগ্রহণে বাধ্য করা হয়েছিল। এ সমস্ত অসহায় লোকদের মধ্যে মহানবী ﷺ-এর পিতৃব্য হযরত আব্বাস (রা.) এবং আবূ তালেবের দুই পুত্র তালেব ও আকীলও ছিলেন।

যাহোক এভাবে সব মিলিয়ে এই বাহিনীতে এক হাজার জওয়ান দুইশ ঘোড়া ছয়শ বর্মধারী এবং সারী গায়িকা বাঁদী দিল তাদের বাদ্যযন্ত্রাদিসহ বদর অভিমুখে রওয়ানা হলো। প্রত্যেক মঞ্জিলে তাদের খাবার জন্য দশটি করে উট জবাই করা হতো।

অপরদিকে রাসূলে কারীম ﷺ শুধুমাত্র একটি বাণিজ্যিক কাফেলার মোকাবিলা করার অনুপাতে প্রস্তুতি নিয়ে ১২ই রমজান শনিবার মদিনা তাইয়্যেবা থেকে রওয়ানা হন এবং কয়েক মঞ্জিল অতিক্রম করার পর বদরের নিকট এসে পৌছে দুজন সাহাবীকে আবু সুফিয়ানের কাফেলার সংবাদ নিয়ে আসার জন্য পাঠিয়ে দেন। –[তাফসীরে মাযহারী]

সংবাদবাহকরা ফিরে এসে জানালেন যে, আবূ সুফিয়ানের কাফেলা মহানবীর পশ্চাদ্ধাবনের সংবাদ জানতে পেরে নদীর তীর ধরে অতিক্রম করে চলে গেছে। আর কুরাইশরা তাদেব রক্ষণাবেক্ষণ ও মুসলমানদের সাথে মোকবিলা করার জন্য মক্কা থেকে এক হাজার সৈন্যের এক বাহিনী নিয়ে এগিয়ে আসছে। –[ইবনে কাছীর]

বলাবাহুল্য' এ সংবাদে অবস্থার মোড় পাল্টে গেল তখন রাসূলে কারীম ﷺ সঙ্গী সাহাবীগণের সাথে পরামর্শ করলেন যে, আগত এ বাহিনীর সাথে যুদ্ধ করা হবে কিনা। হযরত আবূ আইয়ূব আনসারী ও অন্যান্য কতিপয় সাহাবী নিবেদন করলেন, তাদের মোকাবিলা করার মতো শক্তি আমাদের নেই। তাছাড়া আমরা এমন কোনো উদ্দেশ্য নিয়েও আসিনি। তখন হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা.) উঠে দাঁড়ালেন এবং তেমনিভাবে নির্দেশ পালনের জন্য নিজেকে নিবেদন করলেন। তারপর হযরত ফারূকে আযম (রা.) উঠে দাঁড়ালেন এবং তেমনিভাবে নির্দেশ পালন ও জিহাদের জন্য প্রস্তুতির কথা প্রকাশ করলেন। অতঃপর মেকদাদ (রা.) উঠে নিবেদন করলেন: "ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহর পক্ষ থেকে আপনি যে ফরমান পেয়েছেন, তা জারি করে দিন, আমরা আপনার সাথে রয়েছি। আল্লাহর কসম! আমরা আপনাকে এমন উত্তর দেব না, যা বনী ইসরাঈলরা দিয়েছিল হযরত মুসা (আ.)-কে। তারা বলেছিল– فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ অর্থাৎ 'যান, আপনি ও আপনার রব (পালনকর্তা) গিয়ে লড়াই করুন, আমরা তো এখানে বসে থাকলাম।' সে সত্তার কসম, যিনি আপনাকে সত্য ধর্ম দিয়ে পাঠিয়েছেন, আপনি যদি আমাদের আবিসিনিয়ার নামক স্থান নিয়ে যান, তবুও আমরা জিহাদ করার জন্য আপনার সাথে যাব"।

মহানবী ﷺ হযরত মেকদাদের কথা শুনে অত্যন্ত আনন্দিত হন এবং দোয়া করেন। কিন্তু তখনও আনসারগণের পক্ষ থেকে সহযোগিতার কোনো সাড়া পাওয়া যাচ্ছিল না আর এমন একটা সম্ভাবনাও ছিল যে, রাসূলে কারীম ﷺ-এর সাথে আনসারগণের যে সহযোগহিতা চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল যেহেতু তা ছিল মদিনার অভ্যন্তরের জন্য সেহেতু তারা মদিনার বাইরে সাহায্য-সহায়তার ব্যাপারে বাধ্যও ছিলেন না। সুতরাং মহানবী ﷺ সভাসদকে লক্ষ্য করে বললেন, বন্ধুগণ! তোমরা আমাকে পরামর্শ দাও যে, আমরা এই জিহাদে মদিনার বাইরে এগিয়ে যাব কিনা? এই সম্বোধণের মূল লক্ষ্য ছিলেন আনসারগণ। হযরত সা'দ ইবনে মো'আয আনসারী (রা.) হুজুর ﷺ -এর উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে নিবেদন করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কি আমাদেরকে জিজ্ঞেস করছেন? তিনি বললেন হ্যাঁ, তখন সা'দ ইবনে মো'আয (রা.) বললেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা আপনার উপর ঈমান এনেছি এবং সাক্ষ্য দান করেছি যে, আপনি যা কিছু বলেন তা সত্য। আমরা এ প্রতিশ্রুতি গিয়েছি যে, যে কোনো অবস্থায় আপনার আনুগত্য করব। অতএব, আপনি আল্লাহর পক্ষ থেকে যে ফরমান লাভ করেছেন, তা জারি করে দিন। সে সত্তার কসম! যিনি আপনাকে দীনে হক দিয়ে পাঠিয়েছেন আপনি যদি আমাদেরকে সমুদ্রে নিয়ে যান, তবে আমরা আপনার সাথে তাতেই ঝাঁপিয়ে পড়ব। আমাদের মধ্য থেকে কোনো একটি লোকও আপনার কাছ থেকে সরে যাবেন না। আপনি যদি কালই আমাদেরকে শত্রুর সম্মুখীন করে দেন, তবুও আমাদের

www.almodina.com

মনে এতটুকু ক্ষোভ থাকবে না। আমরা আশা করি আল্লাহ তা'আলা আমাদের কর্মের মাধ্যমে এমন বিষয় প্রত্যক্ষ করবেন, যা দেখে আপনার চোখ জুড়িয়ে যাবে। আল্লাহর নামে আমাদেরকে যেখানে ইচ্ছা নিয়ে যান।" এ বক্তব্য শুনে রাসূলুল্লাহ (সা.) অত্যন্ত খুশী হলেন এবং স্বীয় কাফেলাকে হুকুম করলেন আল্লাহর নামে এগিয়ে যাও। সাথে সাথে এ সুসংবাদও শোনালেন যে, আমাদের আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ওয়াদা করেছেন যে, এ দুটি দলের মধ্যে একটির উপর আমাদের ভয় হবে। দু'ই দল বলতে একটি হলো আবূ সুফিয়ানের বাণিজ্যিক কাফেলাআর অপরটি হলো মক্কা থেকে আগত সৈন্যদল। অতঃপর তিনি ইরশাদ করলেন আল্লাহর কসম আমি যেন মুশরিকদের বধ্যভূমি স্বচক্ষে দেখছি। –[এ সমুদয় ঘটনা তাফসীরে ইবনে কাছীর এবং মাযহারী থেকে উদ্ধৃত]

وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ অর্থাৎ মুসলমানদের একটি দল এই জিহাদকে কঠিন মনে করছিল বলে যে উক্তি করা হয়েছে, তাতে পরামর্শকালে সাহাবায়ে কেরামের পক্ষ থেকে জিহাদের ব্যাপারে যে দুর্বলতা প্রকাশ পেয়েছিল, সেদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

আর এ ঘটনারই বিশ্লেষণ ব্যক্ত হয়েছে পরবর্তী يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَمَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنظُرُونَ আয়াতে।

অর্থাৎ এরা আপনার সাথে সত্যের ব্যাপারে বিতর্ক ও বিরোধ করেছে যেন তাদেরকে মৃত্যুর দিকে টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, যা তারা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছে।

সাহাবায়ে কেরাম যদিও কোনো রকম নির্দেশ লজ্ঘন করেননি; বরং পরামর্শের উত্তরে নিজেদের দুর্বলতা ও ভীরুতা প্রকাশ করেছিলেন, কিন্তু রাসূলের সহচরদের কাছ থেকে এহেন মত প্রকাশও তাদের সুউচ্চ মর্যাদার প্রেক্ষিতে আল্লাহর পছন্দ ছিল না।, কাজেই অসন্তোষের ভাষায়ই তা বিবৃত করা হয়েছে।

শব্দ বিশ্লেষণ

الْأَنْفَالِ : শব্দটি বহুবচন, একবচন نَفْلٌ অর্থ– বিনাযুদ্ধে লব্ধ সম্পদ।

أَطِيعُوا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব إِفْعَالٌ মাসদার اَلْإِطَاعَةُ মূলবর্ণ (ط - و - ع) জিনস صحيح অর্থ– তোমরা অনুসরণ কর।

تُلِيَتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ اثبات فعل ماضى مجهول বাব نَصَرَ মাসদার اَلتِّلَاوَةُ মূলবর্ণ (ت - ل - و) জিনস ناقص واوى অর্থ– তাকে তেলাওয়াত করা হয়, তাকে পাঠ করা হয়।

يُسَاقُونَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ اثبات فعل فعل مضارع مجهول বাব نَصَرَ মাসদার اَلسَّوْقُ মূলবর্ণ (س - و - ق) জিনসে اجوف واوى অর্থ– তারা চালিত হচ্ছে, তাদেরকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

تَوَدُّونَ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ اثبات فعل مضارع معروف বাব سَمِعَ মাসদার اَلْمَوَدَّةُ মূলবর্ণ (و - د - ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ– তোমরা চাচ্ছ, তোমরা কামনা করছিলে।

الشَّوْكَةُ : শব্দটি একবচন, বহুবচন شَوْكَاتٌ অর্থ– কাটা, কন্টক।

دَابِرٌ : শব্দটি একবচন, বহুবচন دَوَابِرُ অর্থ– মূল, প্রত্যেক জিনিসের শেষাংশ।

إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ (٩)

অনুবাদ : (৯) সেই সময়টি [-ও] স্মরণ কর, যখন তোমরা নিজ প্রতিপালকের সমীপে ফরিয়াদ করছিলে, তৎপর আল্লাহ তোমাদের [ফরিয়াদ]-কে কবুল করলেন যে, আমি তোমাদেরকে এক হাজার ফেরেশতা দ্বারা সাহায্য করব, যারা ক্রমান্বয়ে চলে আসবে।

وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ ۚ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (١٠)

(১০) আর আল্লাহ এই সাহায্য কেবল খোশ-খবরির জন্য করেছিলেন, আর যেন তোমাদের অন্তরসমূহ শান্ত হয়ে যায়, আর সাহায্য কেবল আল্লাহরই পক্ষ হতে হয়, তিনি জবরদস্ত হেকমতওয়ালা।

إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ (١١)

(১১) সেই সময়কে স্মরণ কর, যখন আল্লাহ তোমাদেরকে স্বীয় সন্নিধান হতে শান্তি প্রদানের জন্য তন্দ্রাচ্ছন্ন করছিলেন, আর তোমাদের উপর আসমান হতে পানি বর্ষণ করছিলেন যেন সেই পানি দ্বারা তোমাদেরকে পবিত্র করে দেন, আর তোমাদের থেকে শয়তানের ওয়াসওয়াসা দূরীভূত করে দেন এবং তোমাদের অন্তরসমূহকে দৃঢ় করে দেন, আর যেন তোমাদের পদসমূহকে স্থিতিশীল করে দেন।

إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا ۚ سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ

(১২) সেই সময়টি স্মরণ করুন, যখন আপনার পরওয়ারদেগার ফেরেশতাদেরকে আদেশ দিচ্ছিলেন যে, আমি তোমাদের সঙ্গে আছি, সুতরাং তোমরা ঈমানদারদের সাহস বাড়াও, আমি সত্বরই কাফেরদের অন্তরসমূহে আতঙ্ক বিস্তার করে দিচ্ছি,

শাব্দিক অনুবাদ

(৯) إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ সেই সময়টি [-ও] স্মরণ কর, যখন তোমরা নিজ প্রতিপালকের সমীপে ফরিয়াদ করছিলে فَاسْتَجَابَ لَكُمْ তৎপর আল্লাহ তোমাদের [ফরিয়াদ]-কে কবুল করলেন যে أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ আমি তোমাদেরকে এক হাজার ফেরেশতা দ্বারা সাহায্য করব مُرْدِفِينَ যারা ক্রমান্বয়ে চলে আসবে

(১০) وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ আর আল্লাহ এই সাহায্য কেবল খোশ-খবরির জন্য করেছিলেন وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ আর যেন তোমাদের অন্তরসমূহ শান্ত হয়ে যায় وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ আর সাহায্য কেবল আল্লাহরই পক্ষ হতে হয় إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ তিনি জবরদস্ত হেকমতওয়ালা।

(১১) إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِنْهُ সেই সময়কে স্মরণ কর, যখন আল্লাহ তোমাদেরকে স্বীয় সন্নিধান হতে শান্তি প্রদানের জন্য তন্দ্রাচ্ছন্ন করতেছিলেন وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ আর তোমাদের উপর বর্ষণ করছিলেন مِنَ السَّمَاءِ مَاءً আসমান হতে পানি لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ যেন সেই পানি দ্বারা তোমাদেরকে পবিত্র করে দেন وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ আর তোমাদের থেকে দূরীভূত করে দেন رِجْزَ الشَّيْطَانِ শয়তানের ওয়াসওয়াসা وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ এবং তোমাদের অন্তরসমূহকে দৃঢ় করে দেন وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ, আর যেন তোমাদের পদসমূহকে স্থিতিশীল করে দেন।

(১২) إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ সেই সময়টি স্মরণ করুন, যখন আপনার পরওয়ারদেগার ফেরেশতাদেরকে আদেশ দিচ্ছিলেন যে أَنِّي مَعَكُمْ আমি তোমাদের সঙ্গে আছি فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا সুতরাং তোমরা ঈমানদারদের সাহস বাড়াও سَأُلْقِي আমি সত্বরই বিস্তার করে দিচ্ছি فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا কাফেরদের অন্তরসমূহে الرُّعْبَ আতঙ্ক

অনুবাদ	আরবি
অনুবাদ : অতএব, তোমরা [কাফেরদের] গর্দানসমূহের উপর আঘাত হান, আর আঘাত কর তাদের অঙ্গুলিসমূহের প্রত্যেক জোড়ায় জোড়ায়।	فَاضْرِبُوْا فَوْقَ الْاَعْنَاقِ وَاضْرِبُوْا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ (١٢)
(১৩) এটা এই অপরাধের শাস্তি যে, তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করেছে, আর যারা আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে, তবে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে কঠোর শাস্তি প্রদান করেন।	ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ شَاۤقُّوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ۚ وَمَنْ يُّشَاقِقِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ (١٣)
(১৪) অতএব, এই শাস্তির স্বাদ আস্বাদন কর, আর জেনে রাখ যে, কাফেরদেরই জন্য দোজখের আজাব নির্ধারিত রয়েছে।	ذٰلِكُمْ فَذُوْقُوْهُ وَاَنَّ لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابَ النَّارِ (١٤)
(১৫) হে ঈমানদারগণ! যখন তোমরা কাফেরদের সাথে মুখোমুখি যুদ্ধে লিপ্ত হও, তখন তাদের দিকে পিঠ ফিরায়ো না।	يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوْهُمُ الْاَدْبَارَ (١٥)
(১৬) আর সেই সময়ে যে ব্যক্তি তাদের দিকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে, কিন্তু হ্যাঁ, যে ব্যক্তি যুদ্ধের জন্য কৌশল অবলম্বন করে কিংবা যে ব্যক্তি স্বদলের নিকট আশ্রয় নিতে আসে তার কথা স্বতন্ত্র, এতদ্ব্যতীত আর যে ব্যক্তি এরূপ করবে, সে আল্লাহর গজবে পতিত হবে এবং তার ঠিকানা হবে দোজখ, আর তা অতিশয় মন্দ আবাসস্থল।	وَمَنْ يُّوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهٗۤ اِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ اَوْ مُتَحَيِّزًا اِلٰى فِئَةٍ فَقَدْ بَاۤءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَمَاْوٰىهُ جَهَنَّمُ ۚ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ (١٦)

শাব্দিক অনুবাদ

فَاضْرِبُوْا فَوْقَ الْاَعْنَاقِ অতএব, তোমরা [কাফেরদের] গর্দানসমূহের উপর আঘাত হান وَاضْرِبُوْا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ আর আঘাত কর তাদের অঙ্গুলিসমূহের প্রত্যেক জোড়ায় জোড়ায়।

(১৩) ذٰلِكَ এটা এই অপরাধের শাস্তি যে بِاَنَّهُمْ شَاۤقُّوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করেছে وَمَنْ يُّشَاقِقِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ আর যারা আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে فَاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ তবে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে কঠোর শাস্তি প্রদান করেন।

(১৪) ذٰلِكُمْ فَذُوْقُوْهُ অতএব, এই শাস্তির স্বাদ আস্বাদন কর وَاَنَّ لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابَ النَّارِ আর জেনে রাখ যে, কাফেরদেরই জন্য দোজখের আজাব নির্ধারিত রয়েছে।

(১৫) يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا হে ঈমানদারগণ! اِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا زَحْفًا যখন তোমরা কাফেরদের সাথে মুখোমুখি যুদ্ধে লিপ্ত হও فَلَا تُوَلُّوْهُمُ الْاَدْبَارَ তখন তাদের দিকে পিঠ ফিরায়ো না।

(১৬) وَمَنْ يُّوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهٗ আর সেই সময়ে যে ব্যক্তি তাদের দিকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে اِلَّا কিন্তু হ্যাঁ مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ যে ব্যক্তি যুদ্ধের জন্য কৌশল অবলম্বন করে مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ কিংবা যে ব্যক্তি স্বদলের নিকট আশ্রয় নিতে আসে তার কথা স্বতন্ত্র فَقَدْ بَاۤءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ এতদ্ব্যতীত আর যে ব্যক্তি এরূপ করবে সে আল্লাহর গজবে পতিত হবে وَمَاْوٰىهُ جَهَنَّمُ এবং তার ঠিকানা হবে দোজখ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ আর তা অতিশয় মন্দ আবাসস্থল।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(৯) قوله إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُم الخ **আয়াতের শানে নুযূল** : ইমাম আহমদ, মুসলিম, আবূ দাউদ ও তিরমিযী প্রমুখ হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) -এর বরাত দিয়ে হযরত ওমর (রা.) কর্তৃক বর্ণিত এক হাদীস বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, বদর অভিযান করে রাসূল ﷺ সাহাবীগণের প্রতি লক্ষ্য করে যখন দেখতে পেলেন তারা হলেন তিন শতের কিছু উর্ধ্বে। মুশরিক ও কাফেরদের প্রতি লক্ষ্য করে দেখতে পেলেন যে, তার হলো হাজার হতে কিছু উর্ধ্বে নবী ﷺ তৎক্ষণাৎ কিবলামুখী হয়ে বসে পড়লেন অতঃপর দুহাত আল্লাহর দরবারে উঠিয়ে তদীয় রবের দরবারে আওয়াজ করে কাঁদতে আরম্ভ করেন এরূপভাবে যে, হে আল্লাহ! তুমি আমাকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলে তা আমকে দাও। হে আল্লাহ! তুমি যদি মুসলমানদের এ জামাতকে ধ্বংস করে দাও, তাহলে ভূপৃষ্ঠে তোমার উপাসনা করা হবে না। তিনি এমনভাবে তাঁর রবের সমীপে কিবলামূখী হয়ে দুহাত প্রশারিত করে আওয়াজ করে কাঁদতে থাকেন। এমনকি পরিধেয় চাদর পড়ে গেল। অতঃপর হযরত আবূ বকর (রা.) এসে চাদর মুবারক তুলে তাঁর কাঁধে রেখে পিছন দিক থেকে জড়িয়ে ধরে বলেন, হে আল্লাহর নবী! আপনার রবের সাথে এ মুনাজিরা যথেষ্ট। আল্লাহ আপনাকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তা অবশ্যই পূর্ণ করে দিবেন। এ অবস্থায় পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[রূহুল মা'আনী-১৭৩/৯/৫, ইবনে কাছীর-২৯৬/২, কুরতুবী-৩২৫/৭]

(১১) قوله إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً الخ **আয়াতের শানে নুযূল** : বদর যুদ্ধের প্রথম রাত তিনশত তেরোজন নিরস্ত্র মুসলমান কাফেরদের প্রায় এক হাজার সশস্ত্র বাহিনীর সাথে মোকাবিলা করার জন্য প্রস্তুতি নিয়েছিলেন। দেখা গেল যুদ্ধক্ষেত্রের উপযুক্ত স্থানটি কুরাইশ বাহিনীর দখলে। পক্ষান্তরে নিম্নাঞ্চল, তাও বালুময় এলাকা, যাতে চলাফেরাও কষ্টকর সে স্থানটি পড়ল মুসলমানদের ভাগে। স্বাভাবিকভাবে যুদ্ধের পেরেশানী, দুশ্চিন্তা ও দুর্ভাবনা সবার মধ্যে নিহিত ছিল। কারো কারো মনে শয়তান এমন ধারণাও সঞ্চার করেছিল যে, তোমরা নিজেদেরকে ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত বলে দাবি করো এবং এখনও আরাম ও স্বস্তি করার পরিবর্তে তাহাজ্জুদের নামাজে লিপ্ত রয়েছে 'থচ সবদিক দিয়েই শত্রুরা তোমাদের উপর বিজয়ী এবং ভালো অবস্থায় রয়েছে। এমনি অবস্থায় আল্লাহ মুসলমানদের উপর এক বিশেষ ধরণের তন্দ্রা চাপিয়ে দিলেন, যুদ্ধ অবস্থায়ই ঘুম আসাটা আল্লাহর পক্ষ হতে শান্তি ও স্বস্তির লক্ষণ। এ রাতেই আরও যে নিয়ামতটি প্রাপ্ত হয়েছিলেন। তা ছিল বৃষ্টি, এর কারণে চলাফেরা করা ছিল দুষ্কর। বৃষ্টি এভাবে অল্প হয়, যাতে সমস্ত বালুকে বসিয়ে দিয়ে মাঠকে অতি সমতল ও আরামদায়ক করে দেওয়া হয়। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা উল্লিখিত দু'টি নিদ্রা ও বৃষ্টি নিয়ামতের কথা স্মরণ করে দিয়েছে।

সূরা আনফালের শুরু থেকেই আল্লাহ তা'আলার সে সমস্ত নিয়ামতের আলোচনা চলছে যা তাঁর অনুগত বান্দাদের প্রতি প্রদত্ত হয়েছে। গযওয়ায়ে বদরের ঘটনাগুলোও সে ধারারই কয়েকটি বিষয়। গযওয়ায়ে বদরে যেসব নিয়ামত আল্লাহ তা'আলার তরফ থেকে দান করা হয়েছে তার প্রথমটি ছিল এ যুদ্ধের জন্য মুসলমানদের যাত্রা করা যা كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ আয়াতের বিবৃত হয়েছে। দ্বিতীয় নিয়ামত হলো ফেরেশতাদের মাধ্যমে সাহায্য করার ওয়াদা যা وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ আয়াতে ব্যক্ত হয়েছে। আর তৃতীয় নিয়ামত দোয়ার মঞ্জুরী ও সাহায্যের ওয়াদা পূরণ। আর তারই আলোচনা করা হয়েছে– إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ আয়াতে। উল্লিখিত আয়াতসমূহের প্রথমটিতে রয়েছে চতুর্থ দানের আলোচনা। তাতে মুসলমানদের জন্য দু'ট নিয়ামতের কথা বলা হয়েছে। একটি হলো সবার উপর তন্দ্রা নেমে আসার ফলে ক্লান্তি-শ্রান্তি বিদূরিত হয়ে যাওয়া এবং দ্বিতীয়টি হলো বৃষ্টির মাধ্যমে তাদের জন্য পানির ব্যবস্থা করে দেওয়া এবং যুদ্ধক্ষেত্রটিকে তাদের জন্য সমতল আর শত্রুদের জন্য কাদাপূর্ণ করে দেওয়া।

এ ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ এই যে, কুফর ও ইসলামের সর্ব প্রথম এই সফর যখন অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে, তখন মক্কার কাফের বাহিনী প্রথমে সেখানে পৌঁছে গিয়ে এমন জায়গায় অবস্থান নিয়ে নেয় যা উপরের দিকে ছিল। পানি ছিল তাদের নিকটে। পক্ষান্তরে মহানবী ﷺ ও সাহাবায়ে কেরাম সেখানে পৌঁছলে তাদেরকে অবস্থান গ্রহণ করতে হয় নিম্নাঞ্চলে। কুরআনে কারীম এই যুদ্ধক্ষেত্রের নকশা সূরার বিয়াল্লিশতম আয়াতে এভাবে বিবৃত করেছে– إِذْ أَنتُم بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُم بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَىٰ সবিস্তার বিশ্লেষণ পরবর্তীতে করা হবে।

যেখানে পৌঁছার পর রাসূলে করীম ﷺ প্রথম অবস্থান গ্রহণ করেন, সে স্থানের সাথে পরিচিত হযরত হোবাব ইবনে মুনযির (রা.) স্থানটিকে যুদ্ধের জন্য অনুপযোগী বিবেচনা করে নিবেদন কররেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যে জায়গাটি আপনি গ্রহণ করেছেন, তা কি আপনি আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে গ্রহণ করেছেন, যাতে আমদের কিছু বলার কোনো অধিকার নেই, নাকি শুধুমাত্র নিজের মতে ও অন্যান্য কল্যাণ বিবেচনায় বেছে নিয়েছেন?

রাসূলে কারীম ﷺ বললেন, না এটা আল্লাহর নির্দেশ নয়; এতে পরিবর্তনও করা যেতে পারে। তখন হোবাব ইবনে মুনযির (রা.) নিবেদন করলেন, তাহলে এখান থেকে এগিয়ে গিয়ে মক্কী সর্দারদের বাহিনীর নিকটবর্তী একটি পানিপুর্ণ স্থান রয়েছে, সেটি অধিকার করাই হবে উত্তম। মহানবী ﷺ তাঁর এ পরামর্শ গ্রহণ করেন এবং সেখানে পৌঁছে পানির উপর কাজ করে নেন। একটি হাউজ বানিয়ে তাতে পানির সঞ্চয় গড়ে তোলেন।

এ বিষয়ে নিশ্চিত হওয়ার পর হযরত সা'দ ইবনে মো'আয (রা.) নিবেদন করেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমরা আপনার জন্য কোনো একটি সুরক্ষিত স্থানে একটি সামিয়ানা টাঙ্গিয়ে দিতে চাই। সেখানে আপনি অবস্থান করবেন এবং আপনার সওয়ারিগুলোও আপনার কাছেই থাকবে।

এর উদ্দেশ্য এই যে, আমরা শত্রুর বিরুদ্ধে জিহাদ করব। আল্লাহর যদি আমাদেরকে বিজয় দান করেন, তবে তো এটাই উদ্দেশ্য । আর যদি খোদানাখাস্তা অন্য কোনো অবস্থার উদ্ভব হয়ে যায়, তাহলে পানি আপনার সওয়ারীতে সওয়ার হয়ে সে সমস্ত সাহাবায়ে কেরামের সাথে গিয়ে মিলবেন, যারা মদিনা তাইয়্যেবায় রয়ে গেছেন। কারণ, আমার ধারণা, তাঁরাও একান্ত জীবন উৎসর্গকারী এবং আপনার সাথে মহব্বতের ক্ষেত্রে তাঁরাও আমাদের চাইতে কোনো অংশে কম নয়। আপনার মদিনা থেকে বেরিয়ে আসার সময় তাঁরা যদি একথা জানতেন যে, আপনাকে এহেন মুসজ্জিত বাহিনরি সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হতে হবে। তাহলে তাদের একজনও পিছনে থাকতেন না। আপনি মদিনায় গিয়ে পৌঁছলে তাঁরা হবেন আপনার সহকর্মী। মহানবী ﷺ তার এই বরোচিত প্রস্তবনার প্রেক্ষিতে দোয়া করলেন এবং তাঁর জন্য একটি সংক্ষিপ্ত সামিয়ানার ব্যবস্থা করে দেওয়া হলো। তাতে মহানবী ﷺ এবং সিদ্দীকে আকবর (রা.) ছাড়া আর কেউ ছিলেন না। হযরত মো'আয (রা.) তাঁদের হেফাজতের জন্য তরবারি হাতে দরজায় দাঁড়িয়ে ছিলেন।

যুদ্ধের প্রথম রাত। তিনশ' তেরোজন নিরস্ত্র লোকের মোকাবিলা নিজেদের চাইতে তিন গুণ অর্থাৎ প্রায় এক হাজার লোকের এক বাহিনীর সাথে। যুদ্ধক্ষেত্রের উপযুক্ত স্থানটিও ওদের দখলে। পক্ষান্তরে নিম্নাঞ্চল, তাও বালুময় এলাকা, যাতে চলাফেরাও কষ্টকর, সেটি পড়ল মুসলমানদের ভাগে। স্বাভাবিকভাবেই পেরেশানি চিন্তা দুর্ভাবনা সবারই মধ্যে ছিল; কারো কারো মনে শয়তান এমন ধারণাও সঞ্চার করেছিল যে, তোমরা নিজেদেরকে ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত বলে দাবি কর এবং এখনও আরাম করার পরিবর্তে তাহাজ্জুদের নামাজে ব্যাপৃত রয়েছে। অথচ সবদিক দিয়েই শত্রুরা তোমাদের উপর বিজয়ী এবং ভালো অবস্থায় রয়েছে। এমনি অবস্থায় আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদের উপর এক বিশেষ ধরণের তন্দ্রা চাপিয়ে দিলেন। তাতে ঘুমানোর কোনো প্রবৃত্তি থাক বা নাই থাক জবরদাস্তি সবাইকে ঘুম পাড়িয়ে দিলেন।

হাফেযে হাদীস আবু ইয়া'লা উদ্ধৃত করেছেন যে, হযরত আলী (রা.) বলেছেন, বদর যুদ্ধের এই রাতে কেউ ছিল না, যে ঘুমায়নি শুধু রাসূলে কারীম ﷺ সারা রাত জেগে থেকে ভোর পর্যন্ত তাহাজ্জুদের নামাজে নিয়েজিত থাকেন।

ইবনে কাছীর বিশুদ্ধ সনদসহজ উদ্ধৃত করেছেন যে, রাসূলে কারীম ﷺ এ রাতে যখন স্বীয় 'আরীশ' অর্থাৎ সামিয়ানার নীচে তাহাজ্জুদ নামাজে নিয়েজিত ছিলেন তখন তাঁর চোখেও সামান্য নিদ্রা এসে গিয়েছিল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তিনি হাসতে হাসতে জেগে উঠে বললেন হে আবু বকর! সুসংবাদ শোন, এই যে, হযরত জিবরাঈল (আ.) টিলার কাছে দাঁড়িয়ে আছেন। একথা বলতে বলতে তিনি سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ আয়াতটি পড়তে পড়তে সামিয়ানার বাইরে বেরিয়ে এলেন। আয়াতের অর্থ এই যে, শীঘ্রই শত্রুপক্ষ পরাজিত হয়ে যাবে এবং পশ্চাদপসরণ করে পালিয়ে যাবে। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে যে, তিনি সামিয়ানার বাইরে এসে বিভিন্ন জায়গার প্রতি ইশারা করে বললেন, এটা আবূ জাহলের হত্যা স্থান, এটা অমুকের; সেটা অমুকের। অতঃপর ঘটনা তেমনিভাবে ঘটতে থাকে। –[তাফসীরে মাযহারী] আর বদর যুদ্ধে যেমন ক্লান্তি পরিশ্রান্তি দূর করে দেওয়ার জন্য আল্লাহ তা'আলা সমস্ত সাহাবায়ে কেরামরে উপর এক বিশেষ ধরনের তন্দ্রালুতা চাপিয়ে দিয়েছিলেন, তেমনি ঘটনা ঘটেছিল ওহুদ যুদ্ধের ক্ষেত্রেও।

www.almodina.com

সুফিয়ান ছওরী (রা.) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) -এর রেওয়ায়েতক্রমে উদ্ধৃত করেছেন যে, যুদ্ধাবস্থায় ঘুম আসাটা আল্লাহর পক্ষ থেকে শান্তি ও স্বস্তির লক্ষণ, আর নামাজের সময় ঘুম আসাটা শয়তানের পক্ষ থেকে। –[ইবনে কাছীর]

এ রাতে মুসলমানগণ দ্বিতীয় যে নিয়ামতটি প্রাপ্ত হয়েছিলেন, তা ছিল বৃষ্টি। এর ফলে গোটা সমরাঙ্গণের চেহারাই পাল্টে যায়। কুরাইশ সৈন্যরা যে জায়গাটি দখল করেছিল তাতে বৃষ্টি হয় খুবই তীব্র এবং সারা মাঠ জুড়ে কাদা হয়ে গিয়ে চলাচলই দুষ্কর হয়ে পড়ে। পক্ষান্তরে যেখানে মহানবী ﷺ ও সাহাবায়ে কেরাম অবস্থান করেছিলেন, সেখানে বালুর কারণে চলাচল করা ছিল দুষ্কর। বৃষ্টি এখানে অল্প হয়। যাতে সমস্ত বালুকে বসিয়ে দিয়ে মাঠকে অতি সমতল ও আরামদায়ক করে দেওয়া হয়।

উল্লিখিত আয়াতে এ দুটি নিয়ামতের কথাই বলা হয়েছে– ১. নিদ্রা ও ২. বৃষ্টি, যাতে গোটা মাঠের রূপই বদলে যায় এবং দুর্বলচিত্ত ব্যক্তিদের মন থেকে সে সমস্ত শয়তানি ওসওয়াসা ধুয়ে মুছে যায় যে, আমরা ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা সত্ত্বেও পারাজিত ও পতিত বলে মনে হচ্ছে, অথচ শত্রুরা অন্যায়ের উপর থেকেও শক্তি সামর্থ্য ও শান্তিপূর্ণ অবস্থায় রয়েছে।

উল্লিখিত আয়াতে বলা হয়েছে যে, সে সময়ের কথা স্মরণ কর, যখন আল্লাহ তোমাদের উপর তন্দ্রাচ্ছন্নতা চাপিয়ে দিচ্ছিলেন তোমাদেরক প্রশান্তি দান করার জন্য আর তোমাদের উপর পানি বর্ষণ করেছিলেন, যেন তোমাদের পবিত্র করে দেন এবং যেন তোমাদের মন থেকে শয়তানি ওসওয়াসা দূর করে দেন। আর যেন তোমাদরে মনকে সুদৃঢ় করেন এবং তোমাদেরকে দৃঢ়পদ করেন।

দ্বিতীয় আয়াতে পঞ্চম নিয়ামতের উল্লেখ করা হয়েছে, যা বদরের সমরাঙ্গণে মুসলমানদের দেওয়া হয়েছে। তাহলো এই যে, আল্লাহ তা'আলা যেসব ফেরেশতাকে মুসলমানদের সাহায্যের জন্য পাঠিয়েছিলেন তাঁদের সম্বোধন করে বলা হয়েছে, আমি এখনই তাদের মনে ভীতির সঞ্চার করে দিচ্ছি। বস্তুত কাফেরদের গর্দানের উপর অস্ত্রের আঘাত হানে: তাদের হত্যা কর দলে দলে।

এভাবে ফেরেশতাদেরকে দুটি কাজের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। প্রথমত মুসলমানদের সাহস বৃদ্ধি করবে। এ কাজটি ফেরেশতাগণ কর্তৃক মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হয়ে দলবৃদ্ধি করে কিংবা তাঁদের সাথে মিলে যুদ্ধ করার মাধ্যমেও হতে পারে এবং নিজেদের বৈক্ষমাত প্রয়োগের মাধ্যমে মুসলমানদের অন্তরসমূহকে সুদৃঢ় ও শক্তিশালী করাও হতে পারে। যাহোক তাঁদের উপর দ্বিতীয় দায়িত্ব অর্পণ করা হয় যে, ফেরেশতাগেণ নিজেরাও যুদ্ধে অংশগ্রহণ করবেন এবং কাফেরদের উপর আক্রমণও করবেন। সুতরাং এ আয়াতের দ্বারা একথাই প্রতীয়মান হয় যে, ফেরেশাতাগণ উভয় দায়িত্বই যথাযথ সম্পাদন করেছেন। মুসলমানদের মনে দৈবক্ষমতা প্রয়োগক্রমে তাদের সাহস ও বল বৃদ্ধিও করেছেন এবং যুদ্ধেও অংশগ্রহণ করেছন। তদুপরি বিষয়টির সমর্থন কতিপয় হাদীসের বর্ণনার দ্বারাও হয়, যো তাফসীরে দুররে মানসুর ও মাযহারীতে সবিস্তারে বিধৃত হয়েছে। তাতে ফেরেশাতাদের যুদ্ধ সম্পর্কে সাহাবায়ে কেরামের চাক্ষুস সাক্ষ্য-প্রমাণও বর্ণনা করো হয়েছে।

আলোচ্য তৃতীয় আয়াতে বলা হয়েছে যে, কুফর ও ইসলামের এ সম্মুখ সমরে যা কিছু ঘটেছে তার কারণ ছিল কুফফার কর্তৃক আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের বিরুদ্ধাচরণ। আর যে লোক আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে তার উপর আরোপিত হয় আল্লাহ তা'আলার সুকঠিন আযাব। এতে বুঝা যাচ্ছে যে, বদর যুদ্ধে একদিকে মুসলমানদের উপর নাজিল হয়েছে আল্লাহ তা'আলার নিয়ামতরাজি অপরদিকে কাফেরদের উপর মুসলমানদের মাধ্যমে আজাব নাজিল করে তাদেই অসদাচরণর যসামান্য শাস্তি দেওয়া হয়েছে। অবশ্য তার চেয়ে কঠিনর শাস্তি হবে আখেরাতে। আর তাই বলা হয়েছে চতুর্থ আয়াতে ذٰلِكُمْ فَذُوْقُوْهُ وَاَنَّ لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابَ النَّارِ অর্থাৎ এটা হলো আমার যৎসামান্য আজাব, এর আস্বাদ গ্রহণ কর এবং জেনে রাখ যে, এরপরেও কাফেরদের জন্য আরো আজাব আসবে, যা হবে অত্যন্ত কঠিন, দীর্ঘস্থায়ী ও কল্পনাতীত।

উল্লিখিত ১৫ ও ১৬নং আয়াতে زَحْفًا শব্দের মর্মার্থ হলো উভয় বাহিনীর মোকাবিলা ও মুখোমুখি সংঘর্ষ। অর্থাৎ এমনভাবে যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে যাবার পর পশ্চাদপসরণ এবং যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যাওয়া মুসলমানদের জন্য জায়েজ নয়।

১৬ নং আয়াতে এই হুকুমের আওতা থেকে একটি অব্যাহতি এবং নাজায়েজ পন্থায় পলায়নকারীদের সুকঠিন আজাবের বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে।

www.almodina.com

দুটি অবস্থার ক্ষেত্রে অব্যাহতি রয়েছে– اِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ اَوْ مُتَحَيِّزًا اِلٰى فِئَةٍ অর্থাৎ যুদ্ধাবস্থায় পশ্চাদপসরণ করা দুই অবস্থায় জায়েজ। প্রথমত যুদ্ধক্ষেত্র থেকে এ পশ্চাদপসরণ হবে শুধুমাত্র যুদ্ধের কৌশলস্বরূপ, শত্রুকে দেখাবার জন্য । প্রকৃতপক্ষে এতে যুদ্ধ ছেড়ে পালায়নের কোনোই উদ্দেশ্য থাকবেনা; বরং প্রতিপক্ষকে অসতর্কাবস্থায় ফেলে হঠাৎ আক্রমণ করাই থাকবে এর প্রকৃত উদ্দেশ্য। এটাই হলো ফেলে اِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ-এর অর্থ। কারণ تَحَرُّفٌ অর্থ হয় কোনো একদিকে ঝুঁকে পড়া। –[রূহুল মা'আনী]

দ্বিতীয়ত বিশেষ কোনো অবস্থা যাতে সম্মুখ থেকে পশ্চাদপসরণের অনুমতি রয়েছে, তা হলো এই যে, নিজেদের উপস্থিত মুজাহিদগণ অতিরিক্ত শক্তি অর্জন করে নিয়ে পুনরায় আক্রমণ করতে সমর্থ হয়। اَوْ مُتَحَيِّزًا اِلٰى فِئَةٍ -এর অর্থ তাই। কারণ -এর আভিধানিক অর্ত হলো মিলিত হওয়া এবং فِئَةٌ অর্থ দল। কাজেই এর মর্মার্থ হচ্ছে এই যে, নিজেদের দলের সাথে মিলিত হয়ে শক্তি অর্জন করে নিয়ে পুনারায় আক্রমণ করার উদ্দেশ্যে সমারাঙ্গন থেকে পেছনের দিকে সরে আসলে তা জায়েয।

এই স্বতন্ত্রতার বর্ণনার পর সেসব লোকের শাস্তির কথা বলা হয়েছে, যারা এই স্বতন্ত্রাবস্থায় ছাড়াই অবৈধভাবে যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ কছে কিংবা পশ্চাদপসরণ করেছে। ইরশাদ হয়েছে– فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَمَأْوٰهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ অর্থাৎ যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে যারা পারিয়ে যায় তারা আল্লাহ তা'আলার গজব নিয়ে ফিরে যায় এবং ততদের ঠিকানা হলো জাহান্নাম। আর সেটি হলো নিকৃষ্ট অবস্থান।

এ আয়াত দুটির দ্বারা এই নির্দেশ বুঝা যাচ্ছে যে, প্রতিপক্ষ সংখ্যা, শক্তি ও আড়ম্বরের দিক দিয়ে যত বেশিই হোক না কেন, মুসলমানদের জন্য তাদের মোকাবিলা থেকে পশ্চদপসারণ করা হারাম, দু'টি স্বতন্ত্র অবস্থা ব্যতীত। তা হলো এই যে, এই পশ্চাদপসরণ পলায়নের উদ্দেশ্য হবে না; বরং তা হবে পাঁয়তারা, পরিবর্তন কিংবা শক্তি অর্জনের মাধ্যমে পুরাক্রমণের উদ্দেশ্যে।

বদর যুদ্ধকালে যখন এ্ আয়াতগুলো নাজিল হয়, তখন এটাই ছিল সাধারণ হুকুম যে, নিজেদের সৈন্য সংখার সাথে প্রতিপক্ষের কোনো তুলনা করা না গেলেও পশ্চাদপসরণ কিংবা যুদ্ধক্ষেত্রে ছেড়ে যাওয়া জায়েয নয়। বদর যদ্ধের অবস্থাও ছিল তাই। মাত্র তিনশ' তেরো জনকে মোকাবিলা করতে হচ্ছিল তিন গুণ অর্থাৎ এক হাজারের অধিক সৈন্যের সাথে। তারপরে অবশ্য এই হুকুমটি শিথিল করার জন্য সূরা আনফালের ৬৫ ও ৬৬ তম আয়াত নাজিল করা হয়। ৬৫ তম আয়াতে বিশজন মুসলমানকে দু'শ কাফেরের সাথে এবং একশ' মুসলমানকে এক হাজার কাফেরের সাথে যুদ্ধ করার হুকুম দেওয়া হয়। তারপর ৬৬ তম আয়াত তা আরো শিথিল করার জন্য ও বিধান অবতীর্ণ হয়– اَلْئٰنَ خَفَّفَ عَنْكُمْ وَعَلِمَ اَنَّ فِيْكُمْ ضَعْفًا فَاِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يَّغْلِبُوْا مِائَتَيْنِ অর্থাৎ এখন আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য সহজ করে দিয়েছেন এবং তোমাদের দুর্বলতার প্রেক্ষিতে এই বিধান জাহির করেছেন যে, দৃঢ়চিত্ত মুসলমান যদি একশ' হয় তবে তারা দু'শ' কাফেরের উপর জয়ী হতে পারবে। এতে ইঙ্গিত করে দেওয়া হয়েছে যে, নিজেদের দ্বিগুণ সংখ্যক প্রতিপক্ষের মোকাবলিায় মুসলমানদেরই জয়ী হওয়ার আশা করা যায়। কাজেই এমন ক্ষেত্রে পশ্চাদপসরণ করা জায়েয নয়। তবে প্রতিপক্ষের সংখ্যা যদি দ্বিগুণের বেশি হয়ে যায়। তাহলে সেক্ষেত্রে যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করা জায়েজ রয়েছে।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, যে ব্যক্তি একা তিন ব্যক্তির মোকাবিলা থেকে পালিয়ে যায়, তা পালায়ন নয়। অবশ্য সে ব্যক্তি দুজনের মোকাবিলা থেকে পালায় সেই পলাতক বলে গণ্য হবে। অর্থাৎ সে কবীরা গুনাহে লিপ্ত হবে। –[রূহুল মা'আনী] এখন এই হুকুমই কেয়ামত পর্যন্ত বলবৎ থকবে।

অধিকাংশ উম্মত এবং চার ইমামের মতেও এটাই শরিয়তের নির্দেশ যে, প্রতিপক্ষের সংখ্যা যতক্ষণ না দ্বিগুণের বেশি হয়ে যায়, ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে পালিয়ে যাওয়া হারাম ও গুনাহে কবীরা।

বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) এর রেওয়ায়েতক্রমে উদ্ধৃত রয়েছে যে, রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সাতটি বিষয়কে মানুষের জন্য মারাত্মক বলেছেন। সেগুলোর মধ্যে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যাওয়া অন্তর্ভুক্ত। কাজেই গযওয়ায়ে হুনাইনের ঘটনায় সাহাবায়ে কেরামের প্রাথমিক পশ্চাদপসরণকে কুরআনে করীম একটি শয়তানি পদস্খলন বলে সাব্যস্ত করেছে, যা মহাপাপেরই দলিল। ইরশাদ হয়েছে– اِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطٰنُ

তাছাড়া তিরমিযী ও আবূ দাউদে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) -এর এক কাহিনী বর্ণিত রয়েছে যে, একবার তিনি যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে মদিনা এসে আশ্রয় নেন এবং মহানবী ﷺ -এর দরবারে উপস্থিত হয়ে এই বলে অপরাধ স্বীকার করেন যে, আমরা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলাতক অপরাধীতে পরিণত হয়ে পড়েছি। মহানবী ﷺ অসন্তোষ প্রকাশের পরিবর্তে তাঁকে সান্ত্বনা দান করলেন। বললেন– بَلْ اَنْتُمُ الْعَكَّارُوْنَ وَاَنَا فِئَتُكُمْ অর্থাৎ "তোমরা পালাতক নও ; বরং অতিরিক্ত শক্তি সঞ্চয় করে পুনর্বার আক্রমণকারী, আর আমি হলাম তোমাদের জন্য সে অতিরিক্ত শক্তি।" এতে মহানবী ﷺ এ বাস্তবতাকেই পরিষ্কার করে দিয়েছেন যে, তাঁদের পালিয়ে এসে মদিনায় আশ্রয় গ্রহণ সেই স্বাতন্ত্র্যের অন্তর্ভুক্ত যাতে অতিরিক্ত শক্তি সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে সমরাঙ্গণ ত্যাগ করার অনুমতি দেওয়া হেয়েছে। হযতর আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) আল্লাহ তা'আলার ভয় ভীতি ও মহত্ত্ব জ্ঞানের যে সুউচ্চ স্তরে অধিষ্ঠিত ছিলেন তারই ভিত্তিতে তিনি এই বাহ্যিক পশ্চাদপসরণেরও ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন এবং সেজন্যই নিজের অপরাধী হিসেবে মহানবী ﷺ -এর খেদমতে উপস্থিত করছিলেন।

শব্দ বিশ্লেষণ

اِسْتَجَابَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ اثبات فعل ماضى معروف বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِسْتِجَابُ মূলবর্ণ (ج . و . ب) জিনস اجوف واوى অর্থ–তিনি জওয়াব দিয়েছিলেন।

مُمِدٌّ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِمْدَادُ অর্থ– (م . د . د) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– সাহায্যকারী।

مُرْدِفِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِرْدَافُ মূলবর্ণ (ر . د . ف) জিনস صحيح অর্থ– ধারাবাহিকভাবে আগত, একের পর এক আগমনকারী।

بُشْرٰى : সীগাহ واحد مؤنث বহছ اسم تفضيل বাব سَمِعَ মাসদার اَلْبَشَرُ মূলবর্ণ (ب . ش . ر) জিনস صحيح অর্থ– শুভ-সংবাদ, সু-সংবাদ।

تَطْمَئِنَّ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ اثبات فعل مضارع معروف বাব اِفْعِيْعَالٌ মাসদার اَلْاِطْمِيْنَانُ মূলবর্ণ (ط . م . ن) জিনস صحيح অর্থ– সে প্রশান্তি লাভ করে।

اَلْاَعْنَاقُ : শব্দটি বহুবচন, একবচন عُنُقٌ অর্থ– গরদান, ঘাড়।

بَنَانٌ : শব্দটি বহুবচন, একবচন بَنَانَةٌ অর্থ– আঙ্গুলের অগ্রভাগ।

ذُوْقُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلذَّوْقُ মূলবর্ণ (ذ . و . ق) জিনস اجوف واوى অর্থ– তোমরা স্বাদ গ্রহণ কর।

لَاتُوَلُّوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ نهى حاضر معروف বাব تَفْعِيْلٌ মাসদার اَلتَّوْلِيَةُ মূলবর্ণ (و . ل . ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ– তোমরা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করো না।

اَدْبَارٌ : শব্দটি বহুবচন, একবচন دُبُرٌ অর্থ– পিঠ, পৃষ্ঠ।

www.almodina.com

অনুবাদ	আয়াত
অনুবাদ : (১৭) বস্তুতঃ তোমরা তাদেরকে নিহত করনি, পরন্তু আল্লাহ তাদেরকে নিহত করেছেন, আর আপনি [তাদের প্রতি] মৃত্তিকা-মুষ্টি নিক্ষেপ করেননি, পরন্তু আল্লাহ তা নিক্ষেপ করেছেন, আর যেন মুসলমানদেরকে স্বীয় সন্নিধান হতে উত্তম পুরস্কার প্রদান করেন, নিশ্চয় আল্লাহ অতিশয় শ্রবণকারী, মহাজ্ঞানী।	فَلَمْ تَقْتُلُوْهُمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ قَتَلَهُمْ ۖ وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ رَمٰى ۚ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِيْنَ مِنْهُ بَلَآءً حَسَنًا ۭ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ (١٧)
(১৮) এই তো হলো একটি কথা, আর দ্বিতীয় কথা এই যে, আল্লাহর উদ্দেশ্যে ছিল কাফেরদের দুরভিসন্ধিকে শিথিল করে দেওয়া।	ذٰلِكُمْ وَاَنَّ اللّٰهَ مُوْهِنُ كَيْدِ الْكٰفِرِيْنَ (١٨)
(১৯) [হে কাফেরগণ!] যদি তোমরা মীমাংসা চাও, তবে সেই মীমাংসা তো তোমাদের সম্মুখে এসে পৌছেছে, আর যদি বিরত থাক তবে এটা তোমাদের জন্য অতি উত্তম, আর যদি তোমরা পুনরায় ঐ কাজই কর , তবে আমিও আবার এই কাজই করব, আর তোমাদের দলবল, তোমাদের কোনোই কাজে আসবে না যদিও সংখ্যায় অধিক হয়, আর বাস্তব কথা এই যে, আল্লাহ ঈমানদারদের সঙ্গে আছেন।	اِنْ تَسْتَفْتِحُوْا فَقَدْ جَآءَكُمُ الْفَتْحُ ۚ وَاِنْ تَنْتَهُوْا فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَاِنْ تَعُوْدُوْا نَعُدْ ۚ وَلَنْ تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَّلَوْ كَثُرَتْ ۙ وَاَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُؤْمِنِيْنَ (١٩) ع ٢ / ١٦
(২০) হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ তা'আলার আদেশ পালন কর আর তাঁর রাসূলের [-ও], আর সেই আদেশ পালনে বিমুখ হয়ো না, অথচ তোমরা তো শ্রবণ করেই থাক।	يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَاَنْتُمْ تَسْمَعُوْنَ (٢٠)

শাব্দিক অনুবাদ

(১৭) فَلَمْ تَقْتُلُوْهُمْ বস্তুতঃ তোমরা তাদেরকে নিহত করনি وَلٰكِنَّ اللّٰهَ قَتَلَهُمْ পরন্তু আল্লাহ তাদেরকে নিহত করেছেন وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ আর আপনি [তাদের প্রতি] মৃত্তিকা-মুষ্টি নিক্ষেপ করেননি وَلٰكِنَّ اللّٰهَ رَمٰى পরন্তু আল্লাহ তা নিক্ষেপ করেছেন وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِيْنَ مِنْهُ بَلَآءً حَسَنًا আর যেন মুসলমানদেরকে স্বীয় সন্নিধান হতে উত্তম পুরস্কার প্রদান করেন اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ নিশ্চয় আল্লাহ অতিশয় শ্রবণকারী, মহাজ্ঞানী।

(১৮) ذٰلِكُمْ এই তো হলো একটি কথা وَاَنَّ اللّٰهَ مُوْهِنُ كَيْدِ الْكٰفِرِيْنَ আর দ্বিতীয় কথা এই যে, আল্লাহর উদ্দেশ্যে ছিল কাফেরদের দূরভিসন্ধিকে শিথিল করে দেওয়া।

(১৯) اِنْ تَسْتَفْتِحُوْا [হে কাফেরগণ!] যদি তোমরা মীমাংসা চাও فَقَدْ جَآءَكُمُ الْفَتْحُ তবে সেই মীমাংসা তো তোমাদের সম্মুখে এসে পৌছেছে وَاِنْ تَنْتَهُوْا আর যদি বিরত থাক فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ তবে এটা তোমাদের জন্য অতি উত্তম وَاِنْ تَعُوْدُوْا আর যদি তোমরা পুনরায় ঐ কাজই কর نَعُدْ তবে আমিও আবার এই কাজই করব وَلَنْ تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا আর তোমাদের দলবল, তোমাদের কোনোই কাজে আসবে না وَلَوْ كَثُرَتْ যদিও সংখ্যায় অধিক হয় وَاَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُؤْمِنِيْنَ আর বাস্তব কথা এই যে, আল্লাহ ঈমানদারদের সঙ্গে আছেন।

(২০) يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا হে ঈমানদারগণ! اَطِيْعُوا اللّٰهَ তোমরা আল্লাহ তা'আলার আদেশ পালন কর وَرَسُوْلَهٗ আর তাঁর রাসূলের [-ও] وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ আর সেই আদেশ পালনে বিমুখ হয়ো না وَاَنْتُمْ تَسْمَعُوْنَ অথচ তোমরা তো শ্রবণ করেই থাক।

www.almodina.com

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ (٢١)	**অনুবাদ :** (২১) আর তোমরা সেই সকল লোকের ন্যায় হয়ো না, যারা দাবি তো করে যে, আমরা শ্রবণ করেছি, বস্তুত তারা মোটেই শুনে না।
إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ (٢٢)	(২২) নিশ্চয় সৃষ্টির নিকৃষ্টতম জীব আল্লাহর নিকট ঐ সমস্ত লোক যারা বধির মূক, [আর] যারা একটুও বুঝে না।
وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ ۖ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ (٢٣)	(২৩) আর যদি আল্লাহ তা'আলা তাদের মধ্যে কোনো কল্যাণ দেখতেন, তবে তাদেরকে শুনার সামর্থ্য দান করতেন, আর যদি তাদেরকে এখন [-ও] শুনিয়ে দেন, তবে তারা অবশ্যই ফিরে যাবে বিমুখ হয়ে।
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (٢٤)	(২৪) হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের হুকুম তামিল করবে, যখন রাসূল তোমাদেরকে তোমাদের জীবন-সঞ্চারক বস্তুর দিকে আহ্বান করেন, আর জেনের রাখ যে, আল্লাহ তা'আলা মানুষ ও তার অন্তরের মধ্যস্থলে আড়াল হয়ে থাকেন, এবং নিঃসন্দেহে তোমাদের সকলকে আল্লাহ তা'আলারই সমীপে সমবেত হতে হবে।
وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٢٥)	(২৫) আর তোমরা এরূপ ফিতনা হতে বেঁচে থাক, যা কেবল তাদের উপরই পতিত হবে না যারা তোমাদের মধ্য হতে সে সমস্ত পাপসমূহে লিপ্ত হয়েছে, আর এ কথা জেনে রাখ যে, আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা।

শাব্দিক অনুবাদ

(২১) وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ আর তোমরা সেই সকল লোকের ন্যায় হয়ো না قَالُوا যারা দাবি তো করে যে سَمِعْنَا আমরা শ্রবণ করেছি وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ বস্তুত তারা মোটেই শুনে না।

(২২) إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ নিশ্চয় সৃষ্টির নিকৃষ্টতম জীব عِنْدَ اللَّهِ আল্লাহর নিকট ঐ সমস্ত লোক الصُّمُّ যারা বধির الْبُكْمُ মূক الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ [আর] যারা একটুও বুঝে না।

(২৩) وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ আর যদি আল্লাহ তা'আলা দেখতেন فِيهِمْ خَيْرًا তাদের মধ্যে কোনো কল্যাণ لَأَسْمَعَهُمْ তবে তাদেরকে শুনার সামর্থ্য দান করতেন وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ আর যদি তাদেরকে এখন [-ও] শুনিয়ে দেন لَتَوَلَّوْا তবে তারা অবশ্যই ফিরে যাবে وَهُمْ مُعْرِضُونَ বিমুখ হয়ে।

(২৪) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا হে ঈমানদারগণ! اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের হুকুম তামিল করবে إِذَا دَعَاكُمْ যখন রাসূল তোমাদেরকে আহবান করেন لِمَا يُحْيِيكُمْ তোমাদের জীবন-সঞ্চারক বস্তুর দিকে وَاعْلَمُوا আর জেনের রাখ যে أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ আল্লাহ তা'আলা আড়াল হয়ে থাকেন بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ মানুষ ও তার অন্তরের মধ্যস্থলে وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ এবং নিঃসন্দেহে তোমাদের সকলকে আল্লাহ তা'আলারই সমীপে সমবেত হতে হবে।

(২৫) وَاتَّقُوا فِتْنَةً আর তোমরা এরূপ ফিতনা হতে বেঁচে থাক لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً যা কেবল তাদের উপরই পতিত হবে না যারা তোমাদের মধ্য হতে সে সমস্ত পাপসমূহে লিপ্ত হয়েছে وَاعْلَمُوا আর এ কথা জেনে রাখ যে أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা।

www.almodina.com

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(১৭) قوله فَلَمْ تَقْتُلُوْهُمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ قَتَلَهُمْ الخ **আয়াতের শানে নুযূল– ১ :** বর্ণিত রয়েছে যে, সাহাবায়ে কেরাম যখন বদর অভিযান হতে ফিরে আসেন, তখন তাঁরা সকলেই যে যা করেছেন আ, সে সম্পর্কে আলোচনা করতে লাগলেন যে, আমি যুদ্ধ করেছি, হত্যা করেছি, এমন কাজ করেছি। ক্রম ধারা গর্ব-অহমিকার বহিপ্রকাশ ঘটতে লাগল। তখন বদরের অর্জিত বিজয় মূলত কোনো ব্যক্তির কৃতিত্ব নয়; বরং তা ছিল আল্লাহ কর্তৃক করুণা। সে সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নজিল হয় এটি জানিয়ে দেওয়ার জন্য যে, এতে যা কিছু ঘটেছে সবকিছুর পিছনে ছিল মহান আল্লাহ তা'আলার কুদরতী শক্তিশালি হাত –[কুরতুবী-৩৩৭/৭]

আয়াতের শান নুযূল– ২ : আল্লামা সুদ্দী বলেন যে, রাসূল ﷺ হযরত আলী (রা.) -কে বদর যুদ্ধকালে বলেন যে, আমাকে কিছু ধুলিবালি দাও। সুতরাং তিনি রাসূল ﷺ-কে ধুলি বালি দিলেন, ফলে রাসূল ﷺ সে ধুলিবালি কাফেরদের প্রতি ছুড়ে দিলেন। কাফেরদের থেকে কেউই বাকি থাকেনি সকলের চক্ষেই সে মাটি পতিত হয়। অতঃপর মুমিনীনরা তাদের পিছু ধাওয়া করে তাদেরকে হত্যা ও বন্দি করতে আরম্ভ করে। বদর যুদ্ধের সেই প্রেক্ষাপট বর্ণনা করার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[ইবনে কাছীর-৩০২]

আয়াতের শানে নুযূল– ৩ : উল্লিখিত আযাতে وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ -এর মধ্যে যে, رَمْىٌ উল্লেখ্য করা হয়েছে এর দ্বারা তখনকার رَمْىٌ নিক্ষেপ করাকে বুঝানো হয়েছে, সে বিষয়ে ওলামায়ে কেরাম হতে চারটি মতামত রয়েছে। আয়াতে যে, اَلرَّمْىُ উল্লেখ করা হয়েছে তা দ্বারা হুনাইনের অভিযানের দিনে রাসূল ﷺ কাফেরদের লক্ষ্য করে যে ধুলি বালি নিক্ষেপ করেছিলেন তাকে বুঝানো হয়েছে। ইবনে ওহাব মালিক থেকে তা বর্ণনা করেছেন।

আয়াতের শানে নুযূল– ৪ : ওহুদ যুদ্ধের দিনে উবাই ইবনে খালফের গ্রীবায় যখন রাসূল ﷺ বর্শা নিক্ষেপ করেন, তখন সে পরাজিত হয়ে চিৎকার করে ফিরে যায়। অবস্থা দৃষ্টে মুশরিকরা তাকে জিজ্ঞেস করল, আল্লাহর কসম তোমার উপর কি আঘাত হলো! সে বলল, আল্লাহর কসম তিনি যদি আমার প্রতি থুথুও নিক্ষেপ করেন, তাহলে আমাকে হ্যাঁ করে দিবেন। তিনি তো আমাকে লক্ষ্য করে বলেছেন; বরং আমি তাকে হত্যা করব। অথচ উবাই মক্কায় রাসূল ﷺ-কে হত্যা করার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত বরেছিল। তখন রাসূল ﷺ বলেছিলেন; বরং আমি তোমাকে হত্যা করব। পরবর্তীতে আল্লাহর শত্রু রাসূল ﷺ-এর সামান্যতম আঘাতে মক্কায় প্রত্যাবর্তন করে তানঈমের নিকটবর্তী সিরাফ নামক স্থানে সে নরাধম মৃত্যুবরণ করে। সে পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়েছে।

আয়াতের শানে নুযূল–৫ : তীর নিক্ষেপ করার দ্বারা খায়বর প্রাচীরে রাসূল ﷺ যে তীর নিক্ষেপ করেছিলেন। সে তীরকে বুঝানো হয়েছে। অতঃপর সে তীরটি হাওয়ায় মিশে ইবনে উবাই আল হুকাইকের উপর আঘাত হানে। তখন সে বিছানায় ছিল। তবে এ মতামত নির্ভরযোগ্যশিল নয় বলে বর্ণিত রয়েছে। খায়বর অভিযান ও খায়বর বিজয় ওহুদের অনেক পরে সংঘটিত হয়েছিল। ইবনে উবাইয়ের হত্যা ছাড়া অন্য কোনো মতামত সঠিক হবে।

আয়াতের শানে নুযূল– ৬ : সে তীর নিক্ষেপ ছিল বদর অভিযানের দিনে। ইবনে ইসহাক এ মতামত প্রকাশ করেন এবং তাই সর্বাপেক্ষা সঠিক। কারণ এ সূরায় বদরী ঘটনা প্রবাহ বর্ণনা করা হচ্ছে, যা হযরত জিবরাঈল (আ.) হযরত নবী করীম ﷺ -কে বলেছেন যে, "আপনি এক মুষ্টি মাটি হাতে নিন" সুতরাং রাসূল ﷺ এক মুষ্টি মাটি হাতে নিয়ে তাদের চেহারাকে লক্ষ্য করে তা নিক্ষেপ করে দিলেন। ফলে মুশরিকদের এমন কোনো ব্যক্তি ছিল না, যাদের চক্ষে, নাকে, ও মুখে সেই মাটি নিপতিত হয়নি। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)ও এ মতামতই প্রকাশ করেছেন। –[কুরতুবী-৩৩৮]

বিভিন্ন মাতপার্থক্যতার দৃষ্টিকোণে এবং বিভিন্ন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ رَمٰى আলোচ্য আয়াতাংশটি নাজিল হয়েছে।

আয়াতের শানে নুযূল– ৭ : হযরত আলী (রা.) হতে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন যে, বদরের দিনে রাসূল ﷺ পবিত্র দু'হাত উঠিয়ে আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করেন–(يَا رَبِّ اِنْ تُهْلِكْ هٰذِهِ الْعِصَابَةَ فَلَنْ تُعْبَدَ فِى الْاَرْضِ اَبَدًا) হে আল্লাহ! মুষ্টিমেয় ক্ষুদ্র এ জামাতটিকে তুমি যদি ধ্বংস করে দাও, তাহলে এ ভূপৃষ্ঠে তুমি আর কখনোও পূজনীয় থাকবে না। সে মুহূর্তে হযরত জিবরাঈল আমীন তাঁকে বললেন যে, এক মুষ্টি মাটি নিয়ে তাদের চেহারা লক্ষ্য করে

www.almodina.com

নিক্ষেপ করেন। ফলে মুশরিকদের সকলেরই চক্ষুতে নাকে ও মুখে সেই মাটি গুলোর অণু কনা পৌছে যায়। এতে করে তার পশ্চাদমুখী হয়ে পালিয়ে যায়। সে মাঠি নিক্ষেপ করার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তাআলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[ইবনে কাছীর–৩৯২/২]

(১৯) قوله إِن تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ الخ আয়াতের শানে নুযূল– ১ : ইবনে আবী শাইবা, ইবনে জারীর, ইবনুল মুনযির ও ইবনে আবী হাতেম হযরত আতিয়্যা (রা.) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আবূ জাহেল বদরের দিনে বলল, اَللّٰهُمَّ اُنْصُرْ اَهْدَى الْفِئَتَيْنِ وَ اَفْضَلَ الْفِئَتَيْنِ وَ خَيْرَ الْفِئَتَيْنِ অর্থাৎ 'হে আল্লাহ! দুটি দল হতে অধিক হেদায়েত প্রাপ্ত দলের প্রতি অতি শ্রেষ্ঠ দলের প্রতি এবং অতি উত্তম দলের প্রতি তুমি সাহায্য প্রদান কর। আবূ জাহেলের বিজয় কামনা করার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ করেন। –[ফাতহুল কাদীর-২৯৭/২]

আয়াতের শানে নাযূল– ২ : আবূ জাহেল এ দোয়া করার কারণ ছিল যে, মুশরিকদের ধারণা ছিল মুসলমানদের তুলনায় তারা অধিক হেদায়েত প্রাপ্ত দল। মুসলমানদের ভদ্রতার অধিকারী দল। সেই দৃষ্টিকোণেই এ দোয়া করেছিল। সে পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। –[প্রাগুক্ত]

(২৫) قوله وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً الخ আয়াতের শানে নুযূল– ১ : সুদ্দী (র.) বলেন যে, আলোচ্য আয়াত বিশেষ করে বদর অভিযানে যারা অংশগ্রহণ করেছিলেন তাদের সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। পরবর্তীতে উষ্ট্রীর যুদ্ধে তাদের মাঝে কলহ দেখা দেয়, ফলে তারা যুদ্ধে লিপ্ত হয়।

আয়াতের শানে নুযূল– ২ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, আলোচ্য আয়াত আসহাবে রাসূল ﷺ সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। –[কুরতুবী-৩৪৩/৭]

১৭নং আয়াতে গযওয়ায়ে বদরের অপরাপর ঘটনাবলি বর্ণনা করার সঙ্গে সঙ্গে মুসলমাগণকে হেদায়েত দেওয়া হয়েছে যে, বদরের যুদ্ধে অধিকের সাথে অল্পের এবং সবলের সাথে দুর্বলের আলৌকিক বিজয়েকে তোমরা নিজেদের চেষ্টায় ফসল বলে মনে করো না; বরং সে মহান সত্তার প্রতি লক্ষ্য কর; যাঁর সাহায্য-সহায়তা গোটা যুদ্ধেরই চেহারা পাল্টে দিয়েছে।

এ আয়াতে যে ঘটনা বর্ণিত হয়েছে তারই বিস্তারতি বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে ইবনে জারীর ও হযরত বায়হাকী (র.) প্রমুখ মনীষীবৃন্দ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) প্রমুখ থেকে উদ্ধৃত করেছেন যে, বদর যুদ্ধের দিনে যখন মক্কার এক হাজার জওয়ান বাহিনী টিলার পিছনে দিক থেকে ময়দানে এসে উপস্থিত হয়, তখন মুসলমানদের সংখ্যাল্পতা এবং নিজেদের সংখ্যাধিক্যের কারণে তারা একান্ত গর্বিত ও সদম্ভ ভঙ্গিতে উপস্থিত হয়। সে সময় রাসূলে করীম ﷺ দোয়া করেন, "ইয়া আল্লাহ! আপনাকে মিথ্যা জ্ঞানকারি এই কুরাইশরা গর্ব ও দম্ভ নিয়ে এগিয়ে আসছে, আপনি বিজয়ের যে প্রতিশ্রুতি আমাকে দিয়েছেন, তা যথা শীঘ্র পূরণ করুন।" –[রূহুল বয়ান]

তখন হযরত জিবরাঈল (আ.) অবতীর্ণ হয়ে নিবেদন করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ আপনি এক মুঠো মাটি তুলে নিয়ে শত্রুবহিনীর প্রতি নিক্ষেপ করুন। তিনি তাই করলেন। এ প্রসঙ্গে হযরত ইবনে হাতেম হযরত ইবনে যায়েদের রেওয়ায়েতক্রমে বর্ণনা করেন যে, মহানবী ﷺ তিন বার মাটি ও কাঁকরের মুঠো তুলে নেন এবং একটি শত্রুবাহিনীর ডান অংশের উপর, একটি বাম অংশের উপর এবং একটি সামনের দিকে নিক্ষেপ করেন। তার ফল দাঁড়ায় এই যে, সেই এক কিংবা তিন মুষ্ঠি কাঁকরে আল্লাহ তা'আলা একান্ত ঐশীভাবে এমন বিস্তৃত করে দেন যে, প্রতিপক্ষের সৈন্যদের এমন একটি লোকও বাকি ছিল না, যার চোখে অথবা মুখমণ্ডলে এই ধূলি ও কাঁকর পৌছেনি। আর তারই প্রতিক্রিয়ায় গোটা শত্রুবহিনীর মাঝে এক ভীতির সঞ্চার হয়ে যায়। আর এই সুযোগ মুসলমানরা তদের ধাওয়া করে। ফেরেশতাগণ পৃথকভাবে তাঁদের সাথে যুদ্ধে শরিক ছিলেন।–[মাযহারী, রূহুল বয়ান]

শেষ পর্যন্ত প্রতিপক্ষের কিছু লোক নিহত হয়, কিছু হয় বন্দি, আর বাকি সবাই পালিয়ে যায় এবং ময়দান চলে আসে মুসলমানদের হাতে।

সম্পূর্ণ নৈরাশ্য ও হতাশার মধ্যে মুসলমানগণ এই মহান বিজয় লাভে সমর্থ হন। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরে আসার পর তাদের মধ্যে এ প্রসঙ্গে আলাপ-আলোচনা আরম্ভ হয়। সাহাবায়ে কেরাম একে অপরের কাছে নিজ নিজ কৃতিত্বের বর্ণনা দিচ্ছিলেন। এরই প্রেক্ষিতে নাজিল হয়, فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ আয়াত। এতে তাদেরকে হেদায়েত দান করা হয় যে, কেউ নিজের চেষ্টা চরিত্রে জন্য গর্ব করো না; যা কিছু ঘটেছে তা শুধুমাত্র তোমাদের পরিশ্রম ও চেষ্টারই ফসল নয়; বরং এটা আল্লাহ তা'আলার একান্ত সাহায্য ও সহায়হতাবই ফল। তোমাদের হাতে যেসব শত্রু নিহত হয়েছে প্রকৃতপক্ষে তাদেরকে তোমরা হত্যা করনি; বরং আল্লাহ তাআলাই হত্যা করেছেন।

এমনিভাবে রাসূলে করীম ﷺ-কে উদ্দেশ্য করে ইরশাদ হয়েছে– وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ অর্থাৎ আপনি যে কাঁকরের মুঠো নিক্ষেপ করেছেন প্রকৃতপক্ষে তা আপনি নিক্ষেপ করেছেন। সামরমর্ম হচ্ছে, কাঁকর নিক্ষেপের এই ফলাফল যে, তা প্রতিটি শত্রু সৈন্যের চোখে পৌঁছে গিয়ে সবাইকে ভীত-সন্ত্রস্ত করে দেয়, এটা আপনার নিক্ষেপের প্রভাবে হয়নি; বরং স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা স্বীয় কুদরতের দ্বারা এহেন পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছিলেন।

গভীরভাবে লক্ষ্য করলে বুঝা যায় , মুসলমানদের জন্য জিহাদে বিজয় লাভের চাইতে অধিক মূল্যবান ছিল এই হেদায়েতটি যা তাদের মনমানসকে উপকরণ থেকে ফিরিয়ে উপকরণের স্রষ্টার সাতে সম্পৃক্ত করে দেয় এবং তাতে করে এমন অহংকার ও আত্মগর্বের অভিশাপ থেকে তাঁদেরকে মুক্তি দান করে, যার নেশায় সাধারণত বিজয়ী সম্প্রদায় লিপ্ত হয়ে পড়ে। তারপর বলে দেওয়া হয়েছে যে, জয় পরাজয় আমারই হুকুমের অধীন। আর আমার সাহায্য ও বিজয় তারাই লাভ করে যারা অনুগত।

وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا অর্থাৎ আমি মুমিনগণকে এই মহাবিজয় দিয়েছি তাদের পরিশ্রমের পরিপূর্ণ প্রতিদান দেওয়ার উদ্দেশ্যে। কখনো হয় বিপদাপদের সম্মুখীন করে আবার কখনো হয় ধন-দৌলত ও সাহায্য বিজয় দানের মাধ্যমে। بَلَاءً حَسَنً বলা হয় এমন পরীক্ষাকে যা আয়েশ-আরাম, ধনসম্পদ ও সাহায্য দানের মাধ্যমে নেওয়া হয়। এতে দেখা হয় যে, এরা একে আমার অনুগ্রহের দান মনে করে শুকরিয়া আদায় করে, নাকি একে নিজেদের ব্যক্তিগত যোগ্যতার ফল ধারণা করে গর্ব ও অহংকারে লিপ্ত হয়ে পড়ে এবং কৃত আমলকে বরবাদ করে দেয়। কারণ আল্লাহ তা'আলার দরবারে কারও অর্বহংকারের কোনো অবকাশ নেই।

পরবর্তীতে আয়াতে এর পাশাপাশি এই বিজয়ের আরও একটি উপকারিতার কথা বাতলে দেওয়া হয়েছে যে, ذَٰلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ অর্থাৎ মুসলমানদেরকে এ বিজয় এ কারণেই দেওয়া হয়েছে যেন এর মাধ্যমে কাফেরদের পরিকল্পনা ও কলাকৌশলসমূহকে নস্যাৎ করে দেওয়া যায় এবং যাতে কাফেররা একতা উপলব্ধি করে যে, আল্লাহ তা'আলার সহায়তা আমাদের প্রতি নেই এবং কোনো কলাকৌশল তথা পরিকল্পনাই আল্লাহ তা'আলার সাহায্য ছাড়া কৃতকার্য হতে পারে না।

পঞ্চম আয়াতে পরাজিত কুরাইশী কাফেরদের সম্বোধন করে একটি ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যা মুসলমানদের সাথে মোকাবিলা করার উদ্দেশ্যে কুরাইশ বাহিনীর মক্কা থেকে বেরোবার সময় ঘটেছিল।

ঘটনাটি এই যে, কুরাইশ কাফেরদের বাহিনী মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে প্রস্তুতি নেওয়ার পর মক্কা থেকে রওয়ানা হওয়ার প্রাক্কালে বাহিনী প্রধান আবূ জাহল প্রমুখ বায়তুল্লাহর পর্দা ধরে প্রার্থনা করেছিল। আর আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, এই দোয়া করতে গিয়ে তারা নিজেদের জিয়ের দোয়ার পরিবর্তে সাধারণ বাক্যে এভাবে দোয়া করেছিলঃ ইয়া আল্লাহ! উভয় বাহিনীর মধ্যে যেটি উত্তম ও উচ্চতর, উভয় বাহিনীর মধ্যে যেটি বেশী হেদায়েতের উপর রয়েছে এবং উভয় দলের যেটি বেশী ভদ্র ও শালীন এবং উভয়ের মধ্যে যে ধর্ম উত্তম তাকেই বিজয় দান করো। –[মাযহারী]

এই নির্বোধরা এ কথাই ভাবছিল যে, মুসলমানদের তুলনায় আমরাই উত্তম ও উচ্চতর এবং অধিক হেদায়েতের উপর রয়েছি, কাজেই এ দোয়াটি আমাদেরই অনুকূলে হচ্ছে। আর এই দোয়ার মাধ্যমে তার কামনা করছিল, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে যেন হক ও বাতেল তথা সত্য ও মিথ্যার ফয়সালা হয়ে যায়। তাদের ধারণা ছিল, যখন আমরা বিজয় অর্জন করব, তখন এটাই হবে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে আমাদের সত্যতার ফয়সালা।

কিন্তু তারা একথা জানত না যে, এ দোয়ার মাধ্যমে প্রকৃতপক্ষে তারা নিজেদের জন্য বদদোয়া ও মুসলমানদের জন্য নেক দোয়া করে যাচ্ছে। যুদ্ধের ফলাফল সামনে আসার পর কুরআনে কারীম তাদের বাতলে দিল إِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ অর্থাৎ তোমরা যদি ঐশী মীমাংসা কামনা কর, তবে তা সামনে এসে গেছে। সত্যের জয় এবং মিথ্যার পরাজয় সূচিত হয়েছে। وَإِنْ تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ অর্থাৎ আর যদি তোমরা এখনও কুফরিজনিত শত্রুতা পরিহার কর, তাহলে তা তোমাদের পক্ষে কল্যাণকর। وَإِنْ تَعُودُوا نَعُدْ আর তোমরা আবারো যদি নিজেদের দুষ্টামী ও যুদ্ধের দিকে ফিরে যাও, তবে আমিও মুসলমানদের সাহায্যের দিকে ফিরে যাব। وَلَنْ تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ অর্থাৎ তোমাদের দল ও জোট যতই অধিক হোক না কেন, আল্লাহর সাহায্যের মোকাবিলায় তা কোনো কাজেই লাগবে না। وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ অর্থাৎ আল্লাহ যখন মুসলমানদের সাথে রয়েছেন, তখন কোনো দল তোমাদের কিউ বা কাজে লাগতে পারে।

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ অর্থাৎ সর্বপ্রকার উপকরণ ও শক্তি থাকা সত্ত্বেও মক্কার মুশরিকদের পরাজয়ের প্রকৃত কারণ ছিল আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরোধিতা। এতে সে সমস্ত লোকের জন্য এক চরম শিক্ষা বিদ্যমান রয়েছে, যারা আসমান

জমিনের স্রষ্টা ও একচ্ছত্র মালিকের পরিপূর্ণ ক্ষমতা ও গায়েবী শক্তিকে উপেক্ষা করে শুধুমাত্র স্থূল ও জড়-উপকরণ এবং শক্তির উপর নির্ভর করে থাকে, কিংবা আল্লাহর নাফরমানী করা সত্ত্বেও তাঁর সাহায্য লাভের ভ্রান্ত আশার মাধ্যমে নিজের সাথে প্রতারণা করে।

উল্লিখিত আয়াতে এই দ্বিতীয় আরেকটি দিক মুসলমানদের সম্বোধন করে বর্ণনা করা হয়েছে। সংক্ষেপে তা হলো এই যে, মুসলমানগণ তাদের সংখ্যাল্পতা ও নিঃসম্বলতা সত্ত্বেও শুধুমাত্র আল্লাহ তা'আলার সাহায্যের মাধ্যমেই এহেন বিপুল বিজয় অর্জন করতে সমর্থ হয়েছেন। আর এই যে সাহায্য, এটা হলো আল্লাহর প্রতি তাঁদের আনুগত্যের ফল। এই আনুগত্যের উপর দৃঢ়তার সাথে স্থির থাকার জন্য মুসলমানদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে– يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য অবলম্বন কর এবং তাতে স্থির থাক। অতঃপর এ বিষয়টির প্রতি অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ করতে গিয়ে বলা হয়েছে, وَلَا تَوَلَّوْا۟ عَنْهُ وَأَنتُمْ تَسْمَعُونَ অর্থাৎ কুরআন ও সত্যের বাণী শুনে নেবার পরেও তোমরা আনুগত্য বিমুখ হয়ো না।

وَلَا تَكُونُوا۟ كَٱلَّذِينَ قَالُوا۟ سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ অর্থাৎ তোমরা তাদের মতো হয়ো না যারা মুখে একথা বলে সত্য যে, আমরা শুনে নিয়েছি, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কিছুই শুনেনি। 'সে সমস্ত লোক' বলতে উদ্দেশ্য হলো সাধারণ কাফেরকুল, যারা শোনার দাবি করে বটে, কিন্তু বিশ্বাস করে বলে দাবি করে না এবং এতে মুনাফিকও উদ্দেশ্য যারা শোনার সাথে সাথে বিশ্বাসেরও দাবিদার, কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে গভীরভাবে চিন্তাভাবনা এবং সঠিক উপলব্ধি থেকে এতদুভয় সম্প্রদায়ই বঞ্চিত। কাজেই তাদের এই শ্রবণ না শোনারই শামিল। মুসলমানদেরকে এদের অনুরূপ হেতা বরণ করা হয়েছে।

তৃতীয় আয়াতে সে সমস্ত লোকের কঠিন নিন্দা করা হয়েছে, যারা সত্য ও ন্যায়ের বিষয় গভীর মনোযোগ ও নিবিষ্টতার সাথে শ্রবণ করে না এবং তা কবুলও করে না। এহেন লোককে কুরআনে কারীম চতুষ্পদ জীবজন্তু অপেক্ষাও নিকৃষ্ট প্রতিপন্ন করেছে। ইরশাদ করেছে–

إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآبِّ عِندَ ٱللَّهِ ٱلصُّمُّ ٱلْبُكْمُ ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ - ٱلدَّوَابُّ শব্দটি دَابَّةٌ-এর বহুবচন। অভিধান অনুযায়ী জমিনের উপর বিচরণকারী প্রতিটি জীবকেই دابة বলা হয়। কিন্তু সাধারণ প্রচলন ও পরিভাষায় دَابَّةٌ বলা হয় শুধুমাত্র চতুষ্পদ জন্তুকে। সুতরাং আয়াতের অর্থ দাঁড়ায় এই যে, আল্লাহর নিকট সে সমস্ত লোকই সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট ও চতুষ্পদ জীবতুল্য যারা সত্য ও ন্যায়ের শ্রবণের ব্যাপারে বধির এবং তা গ্রহণ করার ব্যাপারে মূক। বস্তু মূক ও বধিরদের মধ্যে, সামান্য বুদ্ধি থাকলেও তারা ইঙ্গিত ইশারায় নিজেদের মনের কথা ব্যক্ত করে এবং অন্যের কথা কথা উপলব্ধি করে নেয়। অথচ এরা মূক ও বধির হওয়ার সাথে সাথে নির্বোধও বটে। বলাবাহুল্য, যে মূক বধির বুদ্ধি বিবর্জিতও হবে, তাকে বুঝাবার কোনোই পথ থাকে না।

এ আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন একথা সুস্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, মানুষকে যে فِىٓ أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ (সুগঠিত অঙ্গ সৌষ্ঠব) দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং সৃষ্টির সেরা ও বিশ্বের বরেণ্য করা হয়েছে এই যাবতীয় এনআম ও ন্যায়কে শুনতে, উপলব্ধি করতে এবং তা মেনে নিতে অস্বীকার করে, তখন এই সমুদয় পুরস্কার ও কৃপা তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হয় এবং তার ফলে সে জানোয়ার অপেক্ষাও নিকৃষ্ট হয়ে পড়ে।

তাফসীরে রূহুল বয়ান গ্রন্থে বর্ণিত রয়েছে যে, মানুষ প্রকৃত সৃষ্টির দিক দিয়ে সমস্ত জীব-জানোয়ার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং ফেরেশতা অপেক্ষা নিম্ন মর্যাদার অধিকারী। কিন্তু যখন সে তার অধ্যাবসায়, আমল ও সত্যানুগত্যের সাধনায় ব্রতী হয়, তখন ফেরেশতা অপেক্ষাও উত্তম এবং শ্রেষ্ঠ হয়ে যায়। পক্ষান্তরে সে যদি সত্যানুগত্যে বিমুখ হয়, তখন নিকৃষ্টতার সর্বনিম্ন পর্যায়ে উপনীত হয় এবং জানোয়ার অপেক্ষাও অধম হয়ে যায়।

وَلَوْ عَلِمَ ٱللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسْمَعَهُمْ ۖ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوا۟ وَّهُم مُّعْرِضُونَ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যদি তাদের মধ্যে সামান্যতম কল্যাণকর দিক তথা সৎচিন্তা দেখতেন, তবে তারেকে বিশ্বাস সহকারে শোনার সামর্থ্য দান করতেন কিন্তু বর্তমান সত্যানুরাগ না থাকা অবস্থায় যদি আল্লাহ তা'আলা সত্য ও ন্যায় কথা তাদেরকে শুনিয়ে দেন, তাহলে তারা অনীহাভরে তা থেকে বিমুখতা অবলম্বন করবে।

এখানে কল্যাণকর দিক বা সৎচিন্তা বলতে সত্যানুরাগ বুঝানো হয়েছে। কারণ, অনুরাগ ও অনুসন্ধিৎসার মাধ্যমেই চিন্তাভাবনা ও উপলব্ধির দ্বার উর্দ্ঘাটিত হয় এবং এতেই বিশ্বাস ও আমলের সামর্থ্য লাভ হয়। পক্ষান্তরে যার মাঝে সত্যানুরাগ বা অনুসন্ধিৎসা নেই, তাতে যেন কোনো রকম কল্যাণ নেই। অর্থাৎ তাদের মধ্যে যদি কোনো রকম ভালাই

www.almodina.com

থাকত, তবে তা আল্লাহ তা'আলার অবশ্যই জানা থাকত। যখন আল্লাহ তা'আরার জানা মতো তদের মধ্যে কোনো ভালাই তথা সৎচিন্তা নেই, তখন একথাই প্রতীয়মান হল যে, প্রকৃতপক্ষেই তারা যাবতীয় কল্যাণ থেকে বঞ্চিত। আর এই প্রবঞ্চিত অবস্থায় তাদেরকে যদি চিন্তা ভাবনা ও সত্যের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের আহবান জানানো হয়, তবে তারা কস্মিনকালেও তা গ্রহণ করবে না; বরং তা থেকে মখ ফিরিয়েই নিবে। অর্থাৎ তাদের এই বিমুখিতা এ কারণে হবে না যে, তারা দীনের মধ্যে কোনো আপত্তিকর বিষয় দেখতে পেয়েছে, সে জন্যই তা গ্রহণ করেনি; বরং প্রকৃতপক্ষে তারা সত্যের বিষয় কোনো লক্ষ্যই করেনি

وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ يَحُوْلُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهٖ অর্থাৎ 'জেনে রাখ, আল্লাহ তা'আলা মানুষের এবং তার অন্তরের মাঝে অন্তরায় হয়ে থাকেন।' এ বাক্যটির দুটি অর্থ হতে পারে এবং উভয়টির মধ্যেই বিরাট তাৎপর্য ও শিক্ষণীয় বিষয় পাওয়া যায়, যা প্রতিটি মানুষের পক্ষে সর্বক্ষণ স্মরণ রাখা কর্তব্য।

একটি অর্থ এই হতে পারে যে, যখনই কোনো সৎকাজ করার কিংবা পাপ থেকে বিরত থাকার সুযোগ আসে, তখন সঙ্গে সঙ্গে তা করে ফেলে; এতটুকু বিলম্ব করো না এবং অবকাশকে গনিমত জ্ঞান কর। কারণ, কোনো কোনো সময় মানুষের ইচ্ছার মাঝে আল্লাহ নির্ধারিত কাযা বা নিয়তি অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় এবং সে তখন আর নিজের ইচ্ছায় সফল হতে পারে না। কোনো রোগ-শোক, মৃত্যু কিংবা এমন কোনো কাজ উপস্থিত হয়ে যেতে পারে, যাতে সে কাজ করার আর অবকাশ থাকে না। সুতরাং মানুষের কর্তব্য হলো আয়ু এবং সময়ের অবকাশকে গনিমত মনে করা। আজকের কাজ কালকের জন্য ফেলে না রাখা। কারণ, একথা কারোই জানা নেই, কাল কি হবে।

তাছাড়া এ বাক্যের দ্বিতীয় মর্ম এও হতে পারে যে, এতে আল্লাহ তা'আলা যে বান্দার অতি সন্নিকটে তাই বলে দেওয়া হয়েছে। যেমন, অন্য আয়াত : وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ এতে আল্লাহ তা'আলা যে মানুষের জীবন শিরার চেয়েও নিকটবর্তী সে কথা ব্যক্ত করা হয়েছে।

সারকথা এই যে, মানবাত্মা সর্বক্ষণ আল্লাহর নিয়ন্ত্রণে রয়েছে, যখনই তিনি কোনো বান্দাকে অকল্যাণ থেকে রক্ষা করতে চান, তখন তিনি তার অন্তর ও পাপের মাঝে অন্তরায় সৃষ্টি করে দেন। আবার যখন কারও ভাগ্যে অমঙ্গল থাকে, তখন তার অন্তর ও সৎকর্মের মাঝে অন্তরায় সৃষ্টি করে দেওয়া হয়। সে কারণেই রাসূলে কারীম ﷺ অধিকাংশ সময় এই দোয়া করতেন– يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ ثَبِّتْ قَلْبِيْ عَلٰى دِيْنِكَ অর্থাৎ হে অন্তরসমূহের বিবর্তনকারী আমার অন্তরকে তোমার দীনের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখ।

শব্দ বিশ্লেষণ

لِيُبْلِيَ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اثبات فعل مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْبَلَاءُ মূলবর্ণ (ب . ل . و) জিনস اجوف واوى অর্থ– যেন তিনি পরীক্ষা করেন।

مُوْهِنُ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِيْهَانُ মূলবর্ণ (و . ه . ن) জিনস مثال واوى অর্থ– দুর্বল, শক্তিহীন।

تَعُوْدُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ اثبات فعل مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْعَوْدُ মূলবর্ণ (ع . و . د) জিনস اجوف واوى অর্থ– তোমরা পুনরায় কর।

لَا تَوَلَّوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ نهى حاضر معروف বাব تَفَعُّلٌ মাসদার اَلتَّوَلِّىْ মূলবর্ণ (و . ل . ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ– তোমরা পিঠ ফিরিও না।

اِسْتَجِيْبُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِسْتِجَابَةُ মূলবর্ণ (ج . و . ب) জিনস اجوف واوى অর্থ– তোমরা মান্য কর।

تُحْشَرُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ اثبات فعل مضارع مجهول বাব نَصَرَ মাসদার اَلْحَشْرُ মূলবর্ণ (ح . ش . ر) জিনস صحيح অর্থ– তোমাদেরকে একত্রিত করা হবে।

www.almodina.com

وَاذْكُرُوْٓا اِذْ اَنْتُمْ قَلِيْلٌ مُّسْتَضْعَفُوْنَ فِى الْاَرْضِ تَخَافُوْنَ اَنْ يَّتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَاٰوٰىكُمْ وَاَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهٖ وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ (٢٦)

অনুবাদ : (২৬) আর সেই অবস্থাকে স্মরণ কর, যখন তোমরা স্বল্প সংখ্যক ছিলে [এবং] ভূপৃষ্ঠে দুর্বল বলে পরিগণিত হতে, [আর] এই আশঙ্কায় থাকতে যে, লোকেরা নাকি তোমাদেরকে ছোঁ মেরে নিয়ে যায়, অনন্তর আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে [মদিনায় নিরাপদ] আবাসস্থল প্রদান করলেন এবং তোমাদেরকে আপন সাহায্যের দ্বারা শক্তিশালী করলেন, আর তোমাদেরকে উত্তম বস্তুসমূহ দান করলেন, যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَخُوْنُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ وَتَخُوْنُوْٓا اَمٰنٰتِكُمْ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ (٢٧)

(২৭) হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের হকসমূহের ব্যতিক্রম করো না, আর নিজেদের রক্ষণযোগ্য বস্তুগুলোতে খেয়ানত করো না অথচ তোমরা তো অবগত আছ।

وَاعْلَمُوْٓا اَنَّمَآ اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ۙ وَّاَنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗٓ اَجْرٌ عَظِيْمٌ (٢٨)

(২৮) আর তোমরা এ কথা জেনে রাখ যে, তোমাদের ধন সম্পদসমূহ এবং তোমাদের সন্তানাদি একটা পরীক্ষার বস্তুমাত্র, আর এ কথাও জেনে রাখ যে, আল্লাহ তা'আলার নিকট মহান পুরস্কার রয়েছে।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ تَتَّقُوا اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّكُمْ فُرْقَانًا وَّيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۭ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ (٢٩)

(২৯) হে ঈমানদারগণ! যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় করতে থাক, তবে তিনি তোমাদেরকে একটি [হক ও বাতিলের] মীমাংসার বস্তু দান করবেন, আর তোমাদের থেকে তোমাদের পাপসমূহ মোচন করে দিবেন এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন, আর আল্লাহ তা'আলা মহা অনুগ্রহশীল।

শাব্দিক অনুবাদ

(২৬) وَاذْكُرُوْٓا আর সেই অবস্থাকে স্মরণ কর اِذْ اَنْتُمْ قَلِيْلٌ যখন তোমরা স্বল্প সংখ্যক ছিলে مُّسْتَضْعَفُوْنَ فِى الْاَرْضِ ভূপৃষ্ঠে দুর্বল বলে পরিগণিত হতে تَخَافُوْنَ [আর] এই আশঙ্কায় থাকতে যে اَنْ يَّتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ লোকেরা নাকি তোমাদেরকে ছোঁ মেরে নিয়ে যায় فَاٰوٰىكُمْ অনন্তর আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে [মদিনায় নিরাপদ] আবাসস্থল প্রদান করলেন وَاَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهٖ এবং তোমাদেরকে আপন সাহায্যের দ্বারা শক্তিশালী করলেন وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ আর তোমাদেরকে উত্তম বস্তুসমূহ দান করলেন لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

(২৭) يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا হে ঈমানদারগণ! لَا تَخُوْنُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের হকসমূহের ব্যতিক্রম করো না وَتَخُوْنُوْٓا اَمٰنٰتِكُمْ আর নিজেদের রক্ষণযোগ্য বস্তুগুলোতে খেয়ানত করো না وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ অথচ তোমরা তো অবগত আছ।

(২৮) وَاعْلَمُوْٓا আর তোমরা এ কথা জেনে রাখ যে اَنَّمَآ اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ তোমাদের ধনসম্পদসমূহ এবং তোমাদের সন্তানাদি একটা পরীক্ষার বস্তুমাত্র وَّاَنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗٓ اَجْرٌ عَظِيْمٌ আর এ কথাও জেনে রাখ যে, আল্লাহ তা'আলার নিকট মহান পুরস্কার রয়েছে।

(২৯) يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا হে ঈমানদারগণ! اِنْ تَتَّقُوا اللّٰهَ যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় করতে থাক يَجْعَلْ لَّكُمْ فُرْقَانًا তবে তিনি তোমাদেরকে একটি [হক ও বাতিলের] মীমাংসার বস্তু দান করবেন وَّيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ আর তোমাদের থেকে তোমাদের পাপসমূহ মোচন করে দিবেন وَيَغْفِرْ لَكُمْ এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ

وَاِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِيُثْبِتُوْكَ اَوْ يَقْتُلُوْكَ اَوْ يُخْرِجُوْكَ ۖ وَيَمْكُرُوْنَ وَيَمْكُرُ اللّٰهُ ۖ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمٰكِرِيْنَ (٣٠)	অনুবাদ : (৩০) আর সেই ঘটনাও স্মরণ করুন, যখন কাফেরগণ আপনার সম্বন্ধে দুরভিসন্ধি চিন্তা করছিল যে, আপনাকে বন্দি করে রাখবে অথবা আপনাকে নিহত করে ফেলবে, কিংবা আপনাকে দেশান্তর করে দিবে, আর তারা তো নিজেদের তদবীর করছিল, এবং আল্লাহ আপন তদবীর করছিলেন, আর আল্লাহ হচ্ছেন সর্বাধিক দৃঢ় তদবীরকারক।
وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا قَالُوْا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَآءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هٰذَآ ۙ اِنْ هٰذَآ اِلَّآ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ (٣١)	(৩১) আর যখন তাদের সম্মুখে আমার আয়াতসমূহ পঠিত হয়, তখন তারা বলে যে, আমরা শুনেছি, যদি ইচ্ছা করি, তবে আমরাও এর অনুরূপ বলতে পারি, এটা কতকগুলো ভিত্তিহীন কাহিনী ব্যতীত আর কিছুই নয়, যা প্রাচীন লোকগণ হতে বর্ণিত হয়ে আসছে।
وَاِذْ قَالُوا اللّٰهُمَّ اِنْ كَانَ هٰذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَاَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَآءِ اَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ (٣٢)	(৩২) আর যখন তারা বলল যে, আয় আল্লাহ! যদি এই কুরআন বাস্তবিকই আপনার পক্ষ হতে হয়ে থাকে, তবে আমাদের উপর আসমান হতে প্রস্তর বর্ষণ করুন, অথবা আমাদের উপর কোনো যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি অবতীর্ণ করুন।
وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ فِيْهِمْ ۚ وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ (٣٣)	(৩৩) আর আল্লাহ তা'আলা এরূপ করবেন না যে, আপনি তাদের মধ্যে বিদ্যমান থাকা অবস্থায় তাদেরকে শাস্তি প্রদান করেন, আর আল্লাহ তা'আলা এ অবস্থায়ও তাদেরকে শাস্তি প্রদান করবেন না যে, তারা ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকে।

শাব্দিক অনুবাদ

(৩০) وَاِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا আর সেই ঘটনাও স্মরণ করুন, যখন কাফেরগণ আপনার সম্বন্ধে দুরভিসন্ধি চিন্তা করছিল যে لِيُثْبِتُوْكَ আপনাকে বন্দি করে রাখবে اَوْ يَقْتُلُوْكَ অথবা আপনাকে নিহত করে ফেলবে اَوْ يُخْرِجُوْكَ কিংবা আপনাকে দেশান্তর করে দিবে وَيَمْكُرُوْنَ আর তারা তো নিজেদের তদবীর করতেছিল وَيَمْكُرُ اللّٰهُ এবং আল্লাহ আপন তদবীর করতেছিলেন وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمٰكِرِيْنَ আর আল্লাহ হচ্ছেন সর্বাধিক দৃঢ় তদবীরকারক।

(৩১) وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا আর যখন তাদের সম্মুখে আমার আয়াতসমূহ পঠিত হয় قَالُوْا তখন তারা বলে যে قَدْ سَمِعْنَا আমরা শুনেছি لَوْ نَشَآءُ যদি ইচ্ছা করি لَقُلْنَا مِثْلَ هٰذَآ তবে আমরাও এর অনুরূপ বলতে পারি اِنْ هٰذَآ اِلَّآ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ এটা কতকগুলো ভিত্তিহীন কাহিনী ব্যতীত আর কিছুই নয়, যা প্রাচীন লোকগণ হতে বর্ণিত হয়ে আসছে।

(৩২) وَاِذْ قَالُوْا আর যখন তারা বলল যে اللّٰهُمَّ আয় আল্লাহ! اِنْ كَانَ هٰذَا هُوَ الْحَقَّ যদি এই কুরআন বাস্তবিকই হয়ে থাকে مِنْ عِنْدِكَ আপনার পক্ষ হতে فَاَمْطِرْ عَلَيْنَا তবে আমাদের উপর বর্ষণ করুন حِجَارَةً مِّنَ السَّمَآءِ আসমান হতে প্রস্তর اَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ অথবা আমাদের উপর কোনো যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি অবতীর্ণ করুন।

(৩৩) وَمَا كَانَ اللّٰهُ আর আল্লাহ তা'আলা এরূপ করবেন না যে لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ فِيْهِمْ আপনি তাদের মধ্যে বিদ্যমান থাকা অবস্থায় তাদেরকে শাস্তি প্রদান করেন وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ আর আল্লাহ তা'আলা এ অবস্থায়ও তাদেরকে শাস্তি প্রদান করবেন না যে وَهُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ তারা ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(২৮) قوله وَاعْلَمُوْٓا اَنَّمَآ اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ الخ **আয়াতের শানে নুযূল–১ :** যাহুরী ও কালবী বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ বনী কুরাইযার ইহুদিদেরকে এগারো রাত অবরুদ্ধ করে রাখেন। বায়হাকীর বর্ণনা মতে পনেরো রাত অবরুদ্ধ করে রাখেন। ফলে তারা রাসূল ﷺ -এর নিকট সন্ধি করার আবেদন পেশ করে যেরূপভাবে বনী নযীরের গোত্রবাসীরা সন্ধি স্থাপন করেছিল। তারা এই মর্মে সন্ধি স্থাপন করেছিল যে, তারা সিরিয়ার ইহুদিদের কাছে চলে যাবে। রাসূল ﷺ তাদেরকে এ ধরনের সুযোগ দিতে অস্বীকার করেন। তবে তারা সা'আদ ইবনে মা'আয (রা.)-এর ফয়সালার ভিত্তিতে বের হতে পারে। তারা এ শর্ত প্রত্যাখ্যান করে বলল যে, আমাদের নিকট আবূ লুবাবাহ রিফাআহ বিন আব্দিল মুনযিরকে প্রেরণ করেন। তাঁর মাল, সন্তান ও পরিবারের লোকজন তাদের নিকটে থেকে যাওয়ার কারণে তিনি তাদের জন্য মঙ্গলকামী ব্যক্তি ছিলেন। সুতরাং রাসূল ﷺ তাদের নিকট আবূ লুবাবাহ (রা.) কে প্রেরণ করলেন। তারা তাঁকে জেজ্ঞোস করল যে, হে আবূ লুবাবা! আমরা কি সা'আদ বিন মা'আয়ের ফয়সালার ভিত্তিতে অবরুদ্ধতা থেকে বের হয়ে আসতে পারি, এতে তোমার মতামত কি? তখন তিনি তার হাত হলকুমে লাগিয়ে জবাই করে হত্যা করা হবে বলে ইঙ্গিত করেন। হযরত আবূ লুবাবা বলেন যে, আল্লাহ তা'আলার কসম আমার পা দুটি স্থানান্তরিত হবার আগেই আমি বুঝতে পেরেছি যে, আল্লাহ ও তদ্বীয় রাসূলের খিয়ানত করেছি। অতঃপর তিনি নিজেকে মসজিদে নববীর খুটির সাথে বেঁধে ফেলেন এবং বলেন, যতক্ষণ না আমি মৃত্যুবরণ করব অথবা যতক্ষণ না পর্যন্ত আমার তওবা কবুল হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমি কিছুই পানাহার করব না। হযরত রাসূল (সা.)-এর নিকট ততক্ষণ এ খবর পৌছলে তিনি বলেন, সে যদি আমার নিকট আসত তা হলে আমি তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতাম। বস্তুত সে যা করেছে, সুতরাং আল্লাহ তার তওবা কবুল না করা পর্যন্ত আম তার বাঁধন খুলব না। সুতরাং তিনি দীর্ঘ এক সপ্তাহ পর্যন্ত পানাহার ছেড়ে দিয়ে এ অবস্থায় থাকেন। ফলে তিনি বেহুঁশ হয়ে পড়লেন। অতঃপর আল্লাহ তার তওবা কবুল করেন। কেউ এসে তার নিকট এ খবর বললেন যে, হে আবুদ দারদা! আল্লাহ তা'আলা তোমার তওবা কবুল করেছেন। তখন তিনি বললেন, আল্লাহর কসম রাসূল ﷺ এসে তাঁর হাত মুবারক দ্বারা আবূ লুবাবার বাঁধন খোলেন। অতঃপর আবূ লুবাবা বললেন যে, আমার তাওবার পরিপূর্ণতা হলো যে, আমি আমার গোত্রীয় ঘর বাড়ী ছেড়ে দিব যেগুলো আমাকে অপরাধে নিপতিত করেছে। আমার মাল সম্পদও আল্লাহর পথে দিয়ে দিব। রাসূল ﷺ বললেন মালের $\frac{১}{৩}$ অংশ দান করে দাও। সন্তান ও সম্পদের মুহাব্বতে গোপনীয়তা প্রকাশ করে দেওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। তবে সূরা বরাতের আয়াত দ্বারা তা রহিত হয়ে যায়। –[রূহুল মা'আনী১৯৫/৫, ইবনে কাছীর ৩০৭/২, বাহরে মুহীত৪৮০/৪, কুরতুবী৩৪৬/৭]

আয়াতের শানে নুযূল– ২ : আবুশ শায়খ হযরত জাবের ইবনে আব্দিল্লাহ (রা.) -এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, আবূ সুফিয়ান যখন মক্কা হতে যুদ্ধের উদ্দেশ্যে বের হলো, তখন হযরত জিবরাঈল (আ.) এসে নবী করীম ﷺ-কে বললেন, আবূ সুফিয়ান অমুক জায়গায় রয়েছে, তখন রাসূল ﷺ সাহাবায়ে কেরামকে লক্ষ্য করে বললেন যে, আবূ সুফিয়ান অমুক জায়গায় রয়েছে কাজেই তোমরা তাকে উদ্দেশ্য করে বের হও এবং গোপনীয়তা বজায় রাখ। মুনাফিকদের থেকে এক ব্যক্তি আবূ সুফিয়ানের নিকট পত্র লিখল যে, মুহাম্মদ ﷺ তোমাদের উদ্দেশ্যে বের হচ্ছেন, সুতরাং নিজেদের অস্ত্র ধারণ কর। তখন মুনাফিকদের কর্তৃক এ ভাবে গোপনীয়তা প্রকাশ করে দেওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। –[রুহুল মা'আনী-১৯৬/৯/৫]

(৩১) قوله وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا قَالُوْا قَدْ سَمِعْنَا الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** আলোচ্য আয়াত নজর বিন হারেছ সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। ঘটনা প্রবাহ হচ্ছে যে, নযর বিন হারেছ ব্যবসার উদ্দেশ্যে হিরা যাত্রা করেছিল। তখন সে কালীলা, দিমনা, কায়সার ও কেসরার গল্প কাহিনী কিনে আনে। অতঃপর রাসুল (সা.) যখন অতীত কালের ঘটনাবলি বর্ণনা করেন, তখন নযর বলল, আমি ইচ্ছা করলেও এরূ বলতে পারি। এগুলো তো কাল্পনিক ও মিথ্যার সংমিশ্রণ। তখন নযর ইবনে হারিছের এ বিভ্রান্তকর এ দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। –[কুরতুবী-৩৮৪/৭]

(৩৩) قوله وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ فِيْهِمْ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** আলোচ্য আয়াতে আবূ জাহেল সম্পর্কে নাজিল হয়েছে. ঘটনা প্রবাহ হচ্ছে যে, হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন যে, আবূ জাহল

www.almodina.com

বিন হিশাম বলে, হে অল্লাহ! তোমার নিকট মুহাম্মদ যদি সত্যবাদী হয়ে থাকেন, তাহলে আমাদের উপর আসমান হতে পাথর বর্ষণ কর অথবা আমাদের উপর কষ্টদায়ক শাস্তি প্রদান কর। আবূ জাহল আল্লাহর শাস্তি কামনা করেছিল, আবু জাহলের শাস্তি কামনা করার প্রেক্ষাপটে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। –[ইবনে কাছীর-৩১১/২, কুরতুবী-৩৪৯/৭, ফাতহুল কাদীর-৩০৪/২]

শানে নুযূল : তাফসীরে ইবনে কাছীর ও মাযহারীতে মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক, ইমাম মুহাম্মদ ও ইবনে জারীর (র.) প্রমুখের রেওয়ায়েতক্রমে এ ঘটনাটি এভাবে উদ্ধৃত হয়েছে যে, মদিনা থেকে আগত আনসারদের মুসলমান হওয়ার বিষয়টি যখন মক্কায় জানাজানি হয়ে যায়, তখন মক্কার কুরাইশরা চিন্তান্বিত হয়ে পড়ে যে, এ পর্যন্ত তো তাঁর ব্যাপারটি মক্কার ভিতরেই সীমিত ছিল, যেখানে সর্বপ্রকার ক্ষমতাই ছিল আমাদের হাতে। কিন্তু এখন যখন মদিনাতেও ইসলাম বিস্তার লাভ করছে এবং বহু সাহাবী হিজরত করে মদিনায় চলে গেছেন তখন এদের একটি কেন্দ্র মদিনাতেও স্থাপিত হয়েছে। এমতাবস্থায় এরা যে কোনো রকম শাস্তি আমাদের বিরুদ্ধে সংগ্রহ করতে পারে এবং শেষ পর্যন্ত আমাদের উপর আক্রমণও করে বসতে পারে। সঙ্গে সঙ্গে তারা এ কথাও উপলবিদ্ধ করতে পারে যে, এ পর্যন্ত সামান্য কিছু সাহাবীই হিজরত করে মদিনায় গেছেন, কিন্তু এখন প্রবল সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে যে, স্বয়ং মুহাম্মদ ﷺ ও সেখানে চলে যেতে পারেন। সে কারণেই মক্কার নেতৃবর্গও এ বিষয়ে সলাপরামর্শ করার উদ্দেশ্যে দারুন নদওয়াতে এক বিশেষ বৈঠকের আয়োজন করে। দারুন-নদওয়া ছিল মসজিদে হারাম সংলগ্ন কোসাই ইবনে কেলাবের বাড়ি। বিশেষ জটিল বিষয় ও সমস্যাদির ব্যাপারে সলা-পরামর্শ ও বৈঠকের জন্য তারা এ বাড়িটিকে নির্দিষ্ট করে রেখেছিল। অবশ্য ইসলামি আমলে এটিকে মসজিদে হারামের অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া হয়। কথিত আছে যে, বর্তমান 'বাবু যিয়াদাতই' সে স্থানকে যাকে তৎকালে দারুন নদওয়া বলা হতো। প্রচলিত নিয়মানুযায়ী এ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরামর্শের জন্য কুরাইশ নেতৃবর্গ দারুন-নদওয়াতেই সমবেত হয়েছিল। যাতে আবূ জাহল, নযর ইবনে হারিছ, উমাইয়া ইবনে কালফ, আবূ সুফিয়ান প্রমুখসহ সমস্ত বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিত্ব অংশগ্রহণ করে এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ ও ইসলামের ক্রমবর্ধমান শক্তির মোকাবিলার উপায় ও ব্যবস্থা সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করা হয়। এখানে বসেই মহানবী ﷺ-কে হত্যার ষড়যন্ত্র করা হয়। কিন্তু নবী-রাসূলগণের গায়েবী শক্তি সম্পর্কে এ মূর্খের দল কেমন করে জানবে। এ দিকে হযরত জিবরাঈল (আ.) তাদের পরামর্শ কক্ষের যাবতীয় অবস্থা সম্পর্কে রাসূল ﷺ-কে অবহিত করে এ ব্যবস্থা বাতলে দেন যে, আজকের রাতে আপনি নিজের বিছানায় শয়ন করবেন না। আল্লাহ তা'আলা আপনাকে মক্কা থেকে হিজরত করারও অনুমতি দিয়ে দিয়েছেন।

এদিকে পরামর্শ অনুযায়ী কুরাইশী নওজোয়ানরা সন্ধ্যা থেকেই সরওয়ারে দু'আলম ﷺ -এর বাড়িটি অবরোধ করে ফেলে। রাসূলে কারীম ﷺ বিষয়টি লক্ষ্য করে হযরত আলী (রা.)-কে নির্দেশ দিলেন যে, আজ রাতে তিনি মহানবীর বিছানায় রাত্রি যাপন করবেন এবং সাথে সাথে এ সুসংবাদ শুনিয়ে দিলেন যে, এতে বাহ্যিক দৃষ্টিতে প্রাণের ভয় থাকলেও শত্রুরা কিছুই ক্ষতি করতে পারবে না। হযরত আলী (রা.) এ কাজের জন্য নিজের পেশ করলেন এবং মহানবী (সা.)-এর বিছানায় শুয়ে পড়লেন। কিন্তু সমস্যা দেখা দিয়েছিল যে, হুজুর (সা.) এ অবরোধ ভেদ করে বের হবেন কেমন করে। বস্তুত স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা এক মু'জিযার মাধ্যমে এ সমস্যার সমাধান করে দেন। তা হলো এই যে, আল্লাহর নির্দেশক্রমে মহানবী ﷺ একমুঠো মাটি হাতে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসেন এবং অবরোধকারীরা তাঁর ব্যাপারে যে, আলাপ-আলোচনা করছিল, তার উত্তর দান করেন। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাদের দৃষ্টি ও চিন্তা শক্তিকে তাঁর দিক থেকে ফিরিয়ে অন্য দিকে নিবদ্ধ করে দিয়েছিলেন। ফলে কেউ তাঁকে দেখতে পায়নি অথচ তিনি সবার মাথায় মাটি দিয়ে দিয়ে বেরিয়ে চলে গেলেন। তাঁর চলে যাবার পর কোনো এক আগন্তুক এসে অবরোধকারীদের কাছে জিজ্ঞেস করল, তোমরা এখানে কেন দাঁড়িয়ে আছ? তারা জানাল, মুহাম্মদ ﷺ-এর অপেক্ষায়। আগন্তুক বলল, কোন স্বপ্নে পড়ে রয়েছ; তিনি এখান থেকে বেরিয়ে চলেও গেছেন এবং যাবার সময় তোমাদের প্রত্যেকের মাথায় মাটি দিয়ে গেছেন। তখন তারা সবাই নিজেদের মাথায় হাত দিয়ে বিষয়টি সত্য বলে প্রমাণ পেল।

হযরত আলী (রা.) মহানবী ﷺ -এর বিছানায় শুয়েছিলেন। কিন্তু অবরোধকারীরা তাঁর পাশ ফেরার ভঙ্গি দেখে বুঝতে পারল, তিনি মুহাম্মদ ﷺ নন। এ রাত এবং এতে রাসূলে কারীম ﷺ -এর জন্য নিজেকে নিশ্চিত মৃত্যুর সম্মুখীন করার বিষয়টি হযরত আলী (রা.)-এর বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অন্তর্ভুক্ত।

www.almodina.com

কুরাইশী সর্দারদের পরামর্শে মহানবী ﷺ-এর সম্পর্কে যে তিনটি মত উপাস্থাপিত হয়েছিল সে সব কটিই কুরআনের এ আয়াতে উল্লেখ করে বলা হয়েছে– وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ অর্থাৎ 'সে সময়টি স্মরণযোগ্য, যখন কাফেররা আপনার বিরুদ্ধে নানা রকম ব্যবস্থা নেওয়ার বিষয় চিন্তা ভাবনা করেছিল যে, আপনাকে বন্দি করে রাখবে, না হত্যা করবে, নাকি দেশ থেকে বের করে দিবে।' কিন্তু আল্লাহ তাদের সমস্ত পরিকল্পনা ধূলিসাৎ করে দিয়েছেন। সুতরাং আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে, وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمٰكِرِيْنَ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা সবচেয়ে উত্তম ব্যবস্থাপক, যা যাবতীয় ব্যবস্থা ও পরিকল্পনাকে ছাপিয়ে যায়। যেমনটি এ ঘটনার ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয়েছে।

কুরআনে কারীম গযওয়ায়ে বদরের কিছু বিস্তারিত বিবরণ এবং তাতে মুসলমনাদের প্রতি নাজিলকৃত এনআমসমূহের উল্লেখের পর তা থেকে অর্জিত ফলাফল এবং অতঃপর সে প্রসঙ্গে মুসলমানদের প্রতি কিছু উপদেশ দান করেছে يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَجِيْبُوْا لِلّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ আয়াত থেকে তা আরম্ভ হয়। আলোচ্য এ আয়াতগুলো তারই কয়েকটি আয়াত।

এর মধ্যে প্রথম আয়াতটিতে এমন সব পাপ থেকে বেঁচে থাকার জন্য বিশেষভাবে দোয়েত করা হয়েছে যার জন্য নির্ধারিত সুকঠিন আজাব শুধু পাপীদের পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকে না; রবং পাপ করেনি এমন লোকও তাতে জড়িয়ে পড়ে।

সে পাপ যে কি, সে সম্পর্কে তাফসীরবিদ ওলামায়ে কেরামের বিভিন্ন মত রয়েছে। কোনো কোনো মনীষী বলেন, 'আমর বিল মা'রূফ' তথা সৎকাজের নির্দেশ দান এবং 'নাহী আনিল মুনকার' অর্থাৎ অসৎকাজ থেকে মানুষকে বিরত করার চেষ্টা পরিহার করাই হলো এই পাপ। হযরত আব্দুল্লাহ ইবেন আব্বাস (রা.) বলেন, আল্লাহ মানুষকে নির্দেশ দিয়েছেন যেন তারা নিজের এলাকায় কোনো অপরাধ ও পাপানুষ্ঠান হতে না দেয়। কারণ, যদি তারা এমন না করে, অর্থাৎ সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও অপরাধ ও পাপকর্ম অনুষ্ঠিত হতে দেখে তা থেকে বারণ না করে, তবে আল্লাহ স্বীয় আজাব সবার উপরই ব্যাপক করে দেন। তখন তা থেকে বাঁচতে পারে কোনো গুনাহগার, আর না বাঁচতে পারে নিরপরাধ।

এখানে 'নিরপরাধ' বলতে সেসব লোককেই বুঝানো হয়েছে। যারা মূল পাপে পাপীদের সাথে অংশগ্রহণ করেনি, কিন্তু তারাও 'আমর বিল মা'রূফ' বর্জন করার পাপে পাপী। কাজেই এ ক্ষেত্রে এমন কোনো সন্দেহ করার কারণ নেই যে, একজনরে পাপের জন্য অন্যের উপর আজাব করাটা অবিচার এবং কুরআনি সিদ্ধান্ত وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى এর পরিপন্থি। কারণ এখানে পাপী তার মূল পাপের পরিণতিতে এবং নিরপরাধরা তাদের 'আমর বিল মা'রূফ' থেকে বিরত থাকার পাপের দরুন ধরা পড়েছে, কারো পাপ অন্যের কাঁধে চাপানো হয়নি।

ইমাম বগভী (র.) 'শরহুসসুন্নাহ' ও 'মা'আলিম' নামক গ্রন্থে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) ও হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.)-এর রেওয়ায়েতক্রমে উদ্ধৃত করেছেন যে, রাসূলে করীম ﷺ বলেন, আল্লাহ তা'আলা কোনো নির্দিষ্ট দলের পাপের আজাব সাধারণ মানুষের উপর আরোপ করেন না, যতক্ষণ না এমন কোনো অবস্থার উদ্ভব হয় যে, সে নিজের এলাকা পাপকর্ম অনুষ্ঠিত হতে দেখে তা বাধাদানের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তাতে বাধা দেয় না, তবেই আল্লাহর আজাব সবাইকে ঘিরে ফেলে।

তিরমিযী ও আবূ দাউদ প্রভৃতি গ্রন্থে বিশুদ্ধ সনদসহ উদ্ধৃত করা রয়েছে যে, হযরত আবূ বকর (রা.) তাঁর এক ভাষণে বলেছেন যে, আমি রাসূলে কারীম ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন যে, মানুষ যখন কোনো অত্যাচারীকে দেখেও অত্যাচার থেকে তার হাতকে প্রতিরোধ করবে না, শীঘ্রই আল্লাহ তাদের সবার উপর ব্যাপক আজাব নাজিল করবেন।

সহীহ বুখারীতে হযরত নো'মান ইবনে বশীর (রা.) -এর রেওয়ায়েতক্রমে উদ্ধৃত রয়েছে যে, রাসূলে করীম ﷺ বলেছেন, যারা আল্লাহর কানুনের সীমালঙ্ঘনকারী গুনাহগার এবং যারা তাদের দেখেও মৌনাতা অবলম্বন করে, অর্থাৎ সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও তাদেরকে সেই পাপানুষ্ঠান থেকে বাধা দান করে না, এতদুভয় শ্রেণির উদাহরণ এমন একটি সামুদ্রিক জাহাজের মতো যাতে দুটি শ্রেণি রয়েছে এবং নিচের শ্রেণির লোকেরা উপরে উঠে এসে নিজেদের প্রয়াজনে পানি নিয়ে যায়, যাতে উপরের লোকেরা কষ্ট অনুভব করে। নীচের লোকেরা এমন অবস্থা দেখে জাহাজের তলায় ছিদ্র করে নিজেদের কাজের জন্য পানি সংগ্রহ করতে শুরু করে। কিন্তু উপরের লোকেরা এহেন কাণ্ড দেখেও বারণ করে না। এতে বলাইবাহুল্য যে, গোটা জাহাজেই পানি ঢুকে পড়বে। আর তাতে নীচের লোকেরা যখন ডুবে মরবে, তখন উপরের লোকেরাও বাঁচতে পারবে না।

www.almodina.com

এসব রেওয়ায়েতের ভিত্তিতে অনেক তাফসীরবিদ মনীষী সাব্যস্ত করেছেন যে, 'এই' বলতে উদ্দেশ্য হলো জিহাদ বর্জন করা। বিশেষ করে এমন সময়ে জেহাদ থেকে বিরত থাকা, যখন আমীরুল মু'মিনীন তথা মুসলমানদের নেতার পক্ষ থেকে জিহাদের জন্য সাধারণ মুসলমানদের প্রতি আহ্বান জানানো হয় এবং ইসলমি 'শিয়ার' সমূহের হেফজতও তার উপর নির্ভরশীল হয়ে দাঁড়ায়। কারণ, তখন জিহাদ বর্জনের পরিণতি শুধু জিহাদ বর্জনকারীদের উপরই নয়; বরং সমগ্র মুসলিম জাতির উপর এসে পড়ে। কাফেররদের বিজয়ের ফলে নাবীম শিশু, বৃদ্ধ, এবং অন্যান্য বহু নিরপরাধ মুসলমান হত্যার শিকারে পরিণত হয়। তাদের জান মাল বিপদের সম্মুখীন; হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় 'আজাব' অর্থ হবে পার্থিব বিপদাপদ।

আর যেহেতু আল্লাহ ও বান্দার হকসমূহ আদায় করার ক্ষেত্রে গাফিলতি ও শৈথিল্যের কারণ সাধারণত মানুষের ধনদৌলত ও সন্তানসন্ততিই হয়ে থাকে, কাজেই সে সম্পর্কে সতর্ক করার উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে– وَاعْلَمُوْٓا اَنَّمَآ اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ۙ وَّاَنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗٓ اَجْرٌ عَظِيْمٌ অর্থাৎ জেনে রেখো যে, তোমাদের ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততি তোমাদের জন্য ফিতনা।

'ফিতনা' শব্দের অর্থ পরীক্ষাও হয়; আবার আজাবও হয়। তাছাড়া এমনসব বিষয়কেও ফিতনা বলা হয়। তাছাড়া এমনসব বিষয়কেও ফিতনা বলা হয় যা আজাবের কারণ হয়ে থাকে। কুরআন কারীমের বিভিন্ন আয়াতে এ তিন অর্থেই ফিতনা শব্দের ব্যবহার হচ্ছে। বস্তুত এখানে তিনটি অর্থেরই সুযোগ রয়েছে। কোনো কোনো সময় সম্পদ ও সন্তান মানুষের জন্য পৃথিবীতেই প্রাণ শত্রু হয়ে দাঁড়ায় এবং সেগুলোর জন্য শৈথিল্য ও পাপে লিপ্ত হয়ে আজাবের কারণ হয়ে পড়াটা একান্তই স্বাভাবিক। প্রথমত ধন দৌলত ও সন্তান সন্ততির মাধ্যমে তোমাদের পরীক্ষা করাই আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশ্য যে, আমার এসব দান গ্রহণ করার পর তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর, না অকৃজ্ঞ হও। দ্বিতীয় ও তৃতীয় অর্থ এও হতে পারে যে, ধন সম্পদ ও সন্তান সন্ততির মায়ায় জড়িয়ে গিয়ে যদি আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করা হয়, তবে এই ধন সম্পদও সন্তান সন্ততিই তোমাদের জন্য আজাব হয়ে দাঁড়াবে। কোনো সময় তো পার্থিব জীবনেই এসব বস্তু মানুষকে কঠিন বিপদের সম্মুখীন করে দেয় এবং দুনিয়াতে সে ধনদৌলত ও সন্তানসন্ততিকে আজাব বলে মনে করতে শুরু করে। অন্যথায় একথাটি অপরিহার্য সে, যে ধনসম্পদ দুনিয়ায় আল্লাহ তা'আলার হুকুম আহকামের বিরুদ্ধাচরণের মাধ্যমে অর্জন করা হয়েছে বিংবা ব্যয় করা হয়েছে, সে সম্পদই আখেরাতে তার জন্য সাপ বিচ্ছু ও আগুনে পোড়ার কারণ হবে। যেমন, কুরআনের বিভিন্ন আয়াত ও অসংখ্য হাদীসে তার বিস্তারিত বিবরণ উল্লেখ রয়েছে। আর তৃতীয় অর্থ এই যে, এসব বস্তু সামগ্রী আজাবের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এ বিষয়টি তো একান্তই স্পষ্ট যে, এসব বস্তু আল্লাহর প্রতি মানুষকে গাফেল করে তোলে এবং তাঁর হুকুম আহকামের প্রতি আমনোযোগী করে দেয়, তখন সেগুলোই আজাবের কারণ হয়। আয়াত শেষে বলা হয়েছে– وَاَنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗٓ اَجْرٌ عَظِيْمٌ অর্থাৎ এ কথাটিও জেনে রেখো যে, যে লোক আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করতে গিয়ে ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততির ভালোবাসার সামনে পরাজয় বরণ না করবে তার জন্য আল্লাহ তা'আলার নিকট রয়েছে মহান প্রতদিান।

পূর্ববর্তী আয়াতে এ বিষয়ের আলোচনা হচ্ছিল যে, মানুষের জন্য ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততি একটি ফিতনাবিশেষ। অর্থাৎ এগুলো সবই পরীক্ষার বিষয়। কারণ এসব বস্তুর মায়ায় হেরে গিয়েই মানুষ সাধারণত মহা নেয়ামতের যৌক্তিক দাবি ছিল, আল্লাহর এহেন অনুগ্রহের জন্য তার প্রতি অধিকতর বিনত হওয়া।

আলোচ্য এ আয়াতসমূহের প্রথমটি সে বিষয়েরই উপসংহার। এতে বলা হয়েছে, যে লোক বিবেককে স্বভাবের উপর প্রবল রেখে এই পরীক্ষায় দৃঢ়তা অবলম্বন করবে এবং আল্লাহর আনুগত্য ও মহব্বতকে সবকিছুর উর্ধ্বে স্থাপন করবে যাকে কুরআন ও শরিয়তের ভাষায় 'তাকওয়া' বলা হয় তাহলে সে এর বিনিময়ে তিনটি প্রতিদান লাভ করে– (১) ফোরকান (২) পাপের প্রায়শ্চিত্ত (৩) মাগফেরাত বা পরিত্রাণ।

فُرْقَانٌ ও فَرْقٌ দুটি ধাতুর সমর্থক। পরিভাষাগতভাবে فُرْقَانٌ (ফোরকান) এমন সব বস্তু বা বিষয়কে বলা হয় যা দু'টি বস্তুর মাঝে প্রকৃষ্ট পাথৃব্য ও দুরত্ব মুটিত করে দেয়। সেজন্যই কোনো বিষয়ের মীমাংসাকে করে দেয়। সেজন্যই কোনো বিষয়ের মীমাংসাকে ফোরকান বলা হয়। কারণ, উহা হক ও না হকের মধ্যকার মধ্যকার পার্থক্য স্পষ্ট করে দেয়। তাছাড়া আল্লাহ তা'আলার সাহায্যকেও ফোরকান বলা হয়। কারণ এর দ্বারাও সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে যায়। সে জন্যই কুরআনে কারীম গযওয়ায়ে বদরকে 'ইয়াওমুল ফোরকান' তথা পার্থক্যসূচক দিন বলে আখ্যয়িত করা হয়েছে।

www.almodina.com

এ আয়াতে বর্ণিত "তাকওয়া' অবলম্বনকারীদের প্রতি 'ফোরকান' দান করা হবে। কথাটির মর্ম অধিকাংশ মুফাসসিরীনের মতে এই যে, তাদের প্রতি আল্লাহ তা'আলার সাহায্য-সহায়তা থাকবে এবং তিনি তাদের হেফাজত করেন। কোনো শত্রু তাদের ক্ষতিসাধন করতে পারে না। যাবতীয় উদ্দেশ্যে তারা সাফল্য লাভে সমর্থ হন।

তাফসীরে মুহায়েমী গ্রন্থে বর্ণিত রয়েছে যে, পূর্ববর্তী ঘটনায় হযরত আবূ লুবার (রা.) কর্তৃক স্বীয় পরিবার-পরিজনের রক্ষণাবেক্ষণের লক্ষ্যে যে পদস্খলন ঘটে গিয়েছিল, তা এ কারণেও একটি ত্রুটি ছিল যে, পরিবার-পরিজনের হেফাজত ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্যও আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি যথাযথ আনুগত্য অবলম্বন করাই ছিল সঠিক পন্থা। তাহলেই ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততি সবই আল্লাহ তা'আলার হেফাজতে চলে আসত। কোনো কোনো মুফাসসীরে বলেছেন যে, এ আয়াতে ফোরকান বলতে সেসব জ্ঞান-বুদ্ধিকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে যার মাধ্যমে সত্য-মিথ্যা ও খাঁটি-মেকির মাঝে পার্থক্য করা সহজ হয়ে যায়। অতএব, মর্ম দাঁড়ায় এই যে, যারা 'তাকওয়া' অবলম্বন করেন, আল্লাহ তাদেরকে এমন জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টি দান করেন যাতে তাদের পক্ষে ভলো-মন্দের পার্থক্য করা সহজ হয়ে যায়।

দ্বিতীয়ত তাকওয়ার বিনিময়ে যা লাভ হয়, তা হলো পাপের মোচন। অর্থাৎ পার্থিব জীবনে মানুষের দ্বারা যেসব ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটে যায় দুনিয়াতে সেগুলোর কাফফারা ও বদলার ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়। অর্থাৎ এমন সৎকর্ম সম্পদানের তৌফিক তার হয়, যা তার সমুদয় ত্রুটি-বিচ্যুতির উপর প্রবল হয়ে পড়ে। তাকওয়ার প্রতিদানে তৃতীয় যে জিনিসটি লাভ হয়, তা হলো আখেরাতের মুক্তি ও যাবতীয় পাপের ক্ষমা লাভ।

আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে– وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ অর্থাৎ 'আল্লাহ তা'আলা বড়ই অনুগ্রহশীল ও করুণাময়।' এতে ইঙ্গিত করে দেওয়া হয়েছে যে, আমলের যে প্রতিদান তা তো আমলের পরিমাণ অনুযায়ীই হয়ে থাকে। এখানেও তাকওয়ার প্রতিদানে যে তিনটি বিষয়ের উল্লেখ করা হয়েছে তা তারই বদলা বা প্রতিদান। কিন্তু আল্লাহ হচ্ছেন বিরাট অনুগ্রহ ও এহসানের অধিকারী। তাঁর দান ও দয়া কোনো পরিমাপের গণ্ডিতে আবদ্ধ নয় এবং তাঁর দান ও এহসানের অনুমান করা কারও পক্ষে সম্ভব নয়। কাজেই তাকওয়া অবলম্বনকারীদের জন্য তিনটি নির্ধারিত প্রতিদান ছাড়াও আল্লাহ তা'আলার নিকট থেকে আরও বহু দান ও অনুগ্রহ লাভের আশা রাখা কর্তব্য।

দ্বিতীয় আয়াতে আল্লাহ তা'আলার বিশেষ এক অনুগ্রহ ও দানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে যা রাসূলে মাকবূল ﷺ, সাহাবায়ে কেরাম তথা সমগ্র বিশ্বের উপরই হয়েছে। তা হলো এই যে, হিজরত পূর্বকালে মহানবী ﷺ যখন কাফের পরিবেষ্ঠিত ছিলেন এবং তারা তাকে হত্যা কিংবা বন্দী করার ব্যাপারে সলাপরামর্শ করছিল তখন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাদের এ অপবিত্র চিন্তাকে ধূলিসাৎ করে দেন এবং মহানবী ﷺ কে নিরাপদে মদিনায় পৌঁছে দেন।

তাফসীরে ইবনে কাছীর ও মাযহারীতে মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক, ইমাম আহমদ ও ইবনে জরীর (র.) প্রমুখের রেওয়ায়েতক্রমে এ ঘটনাটি এভাবে উদ্ধৃত হয়েছে যে, মদিনা থেকে আহত আনসারদের মুসলমান হওয়ার বিষয়টি যখন মক্কায় জানাজানি হয়ে যায়। তখন মক্কার কুরাইশরা চিন্তান্বিত হয়ে পড়ে যে, এ পর্যন্ত তো তাঁর ব্যাপারটি মক্কার ভিতরেই সীমিত ছিল, যেখানে সর্বপ্রকার ক্ষমতাই ছিল আমাদের হাতে। কিন্তু এখন যখন মদিনাতেও ইসলাম বিস্তার লাভ করছে এবং বহু সাহাবী হিজরত করে মদিনায় চলে গেছেন তখন এদের একটি কেন্দ্র মদিনাতেও স্থাপিত হয়েছে। এমতাবস্থায় এরা যে কোনো রকম শক্তি আমাদের বিরুদ্ধে সংগ্রহ করতে পারেন এবং শেষ পর্যন্ত আমাদের উপর আক্রমণও করে বসতে পারেন। সঙ্গে সঙ্গে তারা এ কথাও উপলব্দি করতে পারে যে, এ পর্যন্ত সামান্য কিছু সাহাবীই হিজরত করে মদিনায় গিয়েছেন, কিন্তু একন প্রবল সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে যে, স্বয়ং মুহাম্মদ ﷺ ও সেখানে চলে যেতে পারেন। সে কারণেই মক্কার নেতৃবর্গ এ বিষয়ে সলা পরামর্শ করার উদ্দেশ্যে দারুন নদওয়াতে এক বিশেষ বৈঠকের আয়োজন করে। 'দারুন নাদওয়া' ছিল মসজিদে হারাম সংলগ্ন কোসাই ইবনে কেলাবের বাড়ী। বিশেষ জটিল বিষয়ে ও সমস্যাদির ব্যাপারে সলা পরামর্শ ও বৈঠকের জন্য তারা এ বাড়িটিকে নির্দিষ্ট করে রেখেছিল। অবশ্য ইলামী আমলে এটিকে মসজিদে হারামের অন্তর্ভুক্ত করে দেওয়া হয়। কথিত আছে যে, বর্তমান 'বাবুয যিয়াদাত'ই সে স্থান যাকে তৎকালে দারুন নদওয়া বলা হতো।

প্রচলিত নিয়মানুযায়ী এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরামর্শের জন্য কুরইশ নেতৃবর্গ দারুন নদওয়াতেই সমবেত হয়েছিলেন। যাতে আবূ জাহল, নযর ইবনে হারেস, উমাইয়া ইবনে খালফ, আবূ সুফিয়ান প্রমুখসহ সমস্ত বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিত্ব অংশগ্রহণ

www.almodina.com

করেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ ও ইসলামের ক্রমবর্ধমান শক্তির মোকাবিলার উপায় ও ব্যবস্থা সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করা হয়। এখানে বসেই মহানবী ﷺ -কে হত্যার ষড়যন্ত্র করা হয়।

কিন্তু নবী রাসূলগণের গায়বী শক্তি সম্পর্কে এই মুর্খের দর কেমন করে জানবে। সেদিকে হযরত জিবরাঈল (আ.) তাদের পরামর্শ কক্ষের যাবতীয় অবস্থা সম্পর্কে রাসূল কারীম ﷺ -কে অবহিত করে এই ব্যবস্থা বাতলে দেন যে, আজকের রাতে আপনি নিজের বিছানায় শয়ন করবেন না। আল্লাহ তা'আলা আপানাকে মক্কা থেকে হিজরত করারও অনুমতি দিয়ে দিয়েছেন।

এদিকে পরামর্শ অনুযায়ী কোরাইশী নওজোয়ানরা সন্ধ্যা থেকেই সরওয়ারে দু'আলাম ﷺ -এর বাড়ীটি অবরোধ করে ফেলে। রাসূলে কারীম ﷺ বিষয়টি লক্ষ্য করে হযরত আলী (রা.)-কে নির্দেশ দিলেন যে, আজ রাতে তিনি মহানবীর বিছানায় রাত্রি যাপন করবেন এবং সাথে সাথে এই সুসংবাদ শুনিয়ে দিলেন যে, এতে বাহ্যিক দৃষ্টিতে প্রাণের ভয় থাকলেও শত্রুরা কিছুই ক্ষতি করতে পারবে না।

হযরত আলী (রা.) এ কাজের জন্য নিজেকে পেশ করলেন এবং মহানবী ﷺ -এর বিছানায় শুয়ে পড়লেন। কিন্তু সমস্যা দেখা দিয়েছে যে, রাসূল ﷺ এই অবরোধে ভেদ করে বেরোবেন কেমন করে। বস্তুত স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা এক মু'জিযার মাধ্যমে এ সমস্যার সামাধান করে দেন। কথা হলো এই যে, আল্লাহর নির্দেশক্রমে মহানবী ﷺ একমুঠো মাটি হাতে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসেন এবং অবরোধকারীরা তার ব্যাপারে যে আলাপ আলোচনা করছিল, তার উত্তর দান করেন। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাদের দৃষ্টি ও চিন্তাশক্তিকে তাঁর দিক থেকে ফিরিয়ে অন্য দিকে নিবদ্ধ করে দিয়েছিলেন। ফলে কেউই তাঁকে দেখতে পায়নি। অথচ তিনি সবার মাথায় মাটি দিয়ে বেরিয়ে চলে গেলেন। তাঁর ব্যাপারে যে আলাপ আলোচনা করছিল তার উত্তর দান করেন। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাদের দৃষ্টি ও চিন্তাশক্তিকে তাঁর দিক থেকে ফিরিয়ে অন্যদিকে নিবদ্ধ করে দিয়েছিলেন। ফলে কেউই তাঁকে দিক থেকে ফিরিয়ে অন্যদিকে নিবদ্ধ করে দিয়েছিলেন। ফলে কেউই তাঁকে দেখতে পায়নি। অথচ তিনি সবার মাথায় মাটি দিয়ে বেরিয়ে চলে গেলেন। তাঁর চলে যাবার পর কোনো এক আগন্তুক এসে অবরোধকারীদের কাছে জিজ্ঞেস করল, তোমরা এখানে কেন দাঁড়িয়ে আছ? তারা জানাল, মুহাম্মদ ﷺ -এর অপেক্ষায়। আগন্তুক বলল, কোন স্বপ্নে পড়ে রয়েছে, তিনি এখান থেকে বেরিয়ে চলেও গিয়েছেন এবং যাবার সময় তোমাদের প্রত্যেকের মাথায় মাটি দিয়ে গিছেন। তখন তারা সবাই নিজেদের মাথায় হাত দিয়ে বিষয়টি সত্য বলে প্রমাণ পেল।

হযরত আলী (রা.) মহানবী ﷺ-এর বিছানায় শুয়েছিলেন। কিন্তু অবরোধকারীরা তাঁর পাশ ফেরার ভঙ্গি দেখে বুঝতে পারল, তিনি মুহাম্মদ ﷺ নন। কাজেই তাঁকে তারা হত্যা করতে উদ্যোগী হলো না। ভোর পর্যন্ত অবরোধ করে রাখার পর এরা লজ্জিত অপদস্থ হয়ে ফিরে গেল। এই রাত এবং এতে রাসূলে ﷺ-এর জন্য জন্য নিজেকে নিশ্চিত মৃত্যুর সম্মুখীন করার বিষয়টি হযরত আলী (রা.) -এর বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অন্তর্ভুক্ত।

কুরাইশী সর্দারদের পরামর্শে মহানবী ﷺ -এর সম্পর্কে যে তিনটি মত উপস্থাপিত হয়েছিল সে সবকটিই কুরআনের এ আয়াতে উল্লেখ করে বলা হয়েছে– وَاِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِيُثْبِتُوْكَ اَوْ يَقْتُلُوْكَ اَوْ يُخْرِجُوْكَ অর্থাৎ সে সময়টি স্মরণযোগ্য, যখন কাফেররা আপনার বিরুদ্ধে নানা রকম ব্যবস্থা নেওয়ার বিষয় চিন্তাভাবনা করছিল যে, আপনাকে বন্দী করে রাখবে না হত্যা করবে, নাকি দেশ থেকে বের করে দিবে।

কিন্তু আল্লাহ তাদের সমস্ত পরিকল্পনা ধূলিসাৎ করে দিয়েছেন। সুতরাং আয়াতের শেষাংশে বলা হযেছে وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمٰكِرِيْنَ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা সবচেয়ে উত্তম ব্যবস্থাপক, যা যাবতীয় ব্যবস্থা ও পরিকল্পনাকে ছাপিয়ে যায়। যেমনটি এ ঘটনার ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয়েছে।

আরবি অভিধানে مَكْرٌ শব্দের অর্থ হলো– কোনো ছলা-কৌশলের মাধ্যমে প্রতিপক্ষের লোককে তার উদ্দেশ্য সাধনে বিরত রাখা। বস্তুত একাজ যদি কোনো সদুদ্দেশ্যে করা হয় তবে তা উত্তম ও প্রশংসার যোগ্যও। কিন্তু অসৎ কোনো মতলবে করা হলে দুষণীয় এবং মন্দকাজ। কাজেই এ শব্দটি মানুষের ক্ষেত্রে বলা যেতে পারে এবং আল্লাহ তা'আলার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। অবশ্য আল্লাহ তা'আলার ক্ষেত্রে শুধুমাত্র এমনসব পরিবেশে ও পরিস্থিতিতেই এ শব্দের ব্যবহার হতে পারে যেখানে বাক্যের ধারাবাহিকতা কিংবা তুলনার মাধ্যমে দুষণীয় ছলনার কোনো অবকাশ থাকতে না পারে। যেমনটি এখানে হয়েছে। –[মাযহারী]

www.almodina.com

এখানে এ কথাটিও প্রণিধানযোগ্য যে, আয়াতের শেষাংশে যেসব শব্দ বলা হয়েছে তা বর্তমান ভবিষ্যতকাল জ্ঞাপক ক্রিয়াপদে ব্যবহৃত হয়েছে। বলা হয়েছে وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللهُ অর্থাৎ তারা ঈমানদারদেরকে কষ্ট দানের জন্য করা কৌশল করতে থাকে এবং আল্লাহ তাদের সে কলা কৌশলকে ব্রর্ত করে দেওয়ার ব্যবস্থা নিতে থাকবেন। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মুসলমানদের ক্ষতি সাধনের চেষ্টা তদবীর করাটা কাফেরদের চিরাচরিত বৃত্তি থাকবে। আর তেমনিভাবে আল্লাহ তা'আলার সাহায্য সাহায়তাও সর্বকালেই সত্যিকার মুসললমানদের উপর থেকে তাদের সেসব ব্যবস্থাকে ব্যর্থ করে দিতে থাকবে।

একত্রিশ ও বত্রিশতম আয়াতে সেই 'দারুন নদওয়ার' জনৈক সদস্য নযর ইবনে হারেছের এক অহেতুক সংলাপ এবং ত্রিশতম আয়াতে তার জওয়াব সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। নযর ইবনে হারেছ ব্যবসায়ী লোক ছিল এবং বিভিন্ন দেশ ভ্রমণের ফলে ইহুদি নাসারাদের গ্রন্থ ও তাদের ইবাদত উপাসনা বার বার দেখার সুযোগ পেয়েছিল। কাজেই সে যখন কুরআনে কারীমে বিগত উম্মতসমূহের অবস্থা সংক্রান্ত বিবরণ শুনল তখন বলল– قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هٰذَا اِنْ هٰذَا اِلَّا اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ অর্থাৎ "এসব তো আমাদের শোনা কথাই। আমরা ইচ্ছা করলে এমন কথা বলতে পারি। এগুলো তো বিগত লোকদেরই ইতিকথা"। তারপর কোনো কোনো সাহাবী যখন তাকে দা জওয়াব করে দিলেন যে, যদি বলতেই পার, তবে বলছ না কেন? কুরআন যে সত্য ও মিথ্যায় মাঝে পার্থক্য বিধান করে দিয়েছে এবং সমগ্র বিশ্বকে চ্যালেঞ্জও করে দিয়েছে যে, এর বিরোধীরা যদি সত্যি হয়ে থাকে, তবে কুরআনের ছোট একটি সূরার অনুরূপই একটি সূরা উপস্থাপন করে দেখাক। অথচ বিরোধিতায় যারা জানের বাজি লাগিয়েছিল, যারা ধন দৌলত আর সন্তান সন্ততিকে পর্যন্ত কুরবান করেছিল তাদের সবাই মিলে কুরআনের মোকাবিলায় ছোট একটি সূরাও পেশ করতে পারেনি। তাহলে একথা বলা যে, আমরা যদি ইচ্ছা করি তবে আমরাও এমন বালাম বলতে পারি। এমন একটি কথা যা লাজ লজ্জার অধিকারী কোনো লোকই বলতে পারে না। তাপর নযর ইবনে হারেছের সামনে সাহাবায়ে কেরাম এই কালামের সত্যতা সম্পর্কে বর্ণনা করেলেন, তখন সে স্বীয় ভ্রান্ত মতবাদের উপর তার দৃঢ়তা প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে বলতে লাগল– اللّٰهُمَّ اِنْ كَانَ هٰذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَاَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ اَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ অর্থাৎ 'হে আল্লাহ! এই কুরআনই যদি আপনার পক্ষ থেকে সত্য হয়ে থাকে, তবে আমাদের উপর আকাশ থেকে পাথর বর্ষণ করুন কিংবা কোনো কঠিন আজাব নাজিল করে দিন।

স্বয়ং কুরআন কারীম এর উত্তর দিয়েছে। প্রথমে বলা হয়েছে– وَمَا كَانَ اللهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ فِيْهِمْ অর্থাৎ হে মুহাম্মদ! অপনার মক্কায় থাকা অবস্থায় আল্লাহ তাদের উপর আজাব করবেন না। কারণ, সমস্ত নবী রাসূলগণের ব্যাপারেই আল্লাহর নীতি এই যে, তাঁরা যে জনপদে থাকেন তাতে ততক্ষণ পর্যন্ত কোনো আজাব নাজিল করেন না, যতক্ষণ না স্বীয় পয়গম্বরগণকে সেখান থেকে সরিয়ে নেন।

এ উত্তরের সারমর্ম এই যে, তোমারা তো কুরআন ও ইসলামের বিরোধিতার কারণে পাথর বর্ষণেরই যোগ্য কিন্তু মহানবী ﷺ-এর মক্কায় অবস্থান এর অন্তরায়। ইমাম ইবনে জারীর (র.) বলেন, আয়াতের এ অংশটি সে সময় নাজিল হয়েছিল যখন রাসূল ﷺ মক্কায় অবস্থান করছিলেন। তারপর মদনিায় হিজরত করার পর আয়অতের দ্বিতীয় অংশ অবতর্ণি হয়। وَمَا كَانَ اللهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তাদরে উপর আজাব নাজিল করবেন না, তখন তারা এস্তেগফার তথা ক্ষমা প্রার্থনা করে। এর মর্ম এই যে, মহানবী ﷺ-এর মদিনা চলে যাবার পর যদিও ব্যাপক আজাবের পথে যে অন্তরায় ছিল তা দূর হয়ে গেছে, অর্থাৎ তাঁর সেখানে বর্তমান থাক, কিন্তু তারপরেও আজাব আসার পথে আরেকটি বাধা রয়ে গেছে তাহলো এই যে, অনেক দুর্বল মুসলমান যারা হিজরত করতে পারছিলেন না, সেখানে রয়ে গিয়েছিলেন এবং আল্লাহর দরবারে এস্তেগফার ও ক্ষমাপ্রার্থনা করে যাচ্ছিলেন। তাঁদেরই খাতিরে মক্কাবাসীদের উপর আজাব নাজিল করা হয়নি।

অতঃপর এ সমস্ত মুসলমানও হিজরত করে যখন মদিনায় পৌছে যান, তারপরে আয়াতের এ বাক্যটি নাজিল হয়– وَمَا لَهُمْ اَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللهُ وَهُمْ يَصُدُّوْنَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ অর্থাৎ আল্লাহ তাদেরকে আজাব দিবেন না তা কেমন করে হয়, অর্থাৎ তারা রাসূলকে মসজিদে হারামে গিয়ে ইবাদত করতে বাধা দান করে।

অর্থাৎ আজাব আসার পরের দুটি অন্তরায়ই এখন দূর হয়ে গেছে। এখন মক্কাতে না আছেন মহানবী ﷺ, না আছেন ক্ষমা প্রার্থনাকারী মুসলমানগণ। অতএব, আজাব আসতে এখন আর কোনো বাধাই অবশিষ্ট নেই। বিশেষত তাদের

শাস্তিযোগ্য অপরাাধের মধ্যে ইসলাম বিরোধিতা ছাড়াও আরেকটি অপরাধ সংযোজিত হয়েছে যে, তারা নিজের তো ইবাদত উপাসনার যোগ্য ছিলই না, তদুপরি যেসব মুসলমান ইবাদত, ওমরা ও তওয়াফের উদ্দেশ্যে মসজিদে হারামে আসতে চায় তাদেরকেও বাধা দান করতে শুরু করেছে। অতএব, এখন তাদের শাস্তিযোগ্য অপরাধের মধ্যে ইসলাম বিরোধিতা ছাড়াও আরেকটি অপরাধ সংযেজিত হয়েছে যে, তারা নিজেরা তো ইবাদ উপাসনার যোগ্য ছিলই না, তদুপরি যেসব মুসলমান ইবাদত, বাধাদান করতে শুরু করেছে। অতএব, এখন তাদের শাস্তি প্রাপ্তির বিষয়টি পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। সুতরাং মক্কা বিজয়ের মাধ্যমে তাদের উপর সে আজাবই নাজিল করা হয়।

শব্দ বিশ্লেষণ

آوٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ اثبات فعل ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِيْوَاءُ মূলবর্ণ (ا ـ و ـ ى) জিনস মুরাক্কাব لفيف مقرون ও مهموز فاء অর্থ– তিনি আশ্রয় দান করেছেন।

لِيُثْبِتُوْ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ اثبات فعل مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِثْبَاتُ মূলবর্ণ (ث ـ ب ـ ت) জিনসে صحيح অর্থ– তারা বন্দি করে রাখবে।

يَمْكُرُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ اثبات فعل مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْمَكْرُ মূলবর্ণ (م ـ ك ـ ر) জিনস صحيح অর্থ– তারা ষড়যন্ত্র করছে, তারা কৌশল অবলম্বন করছে।

تُتْلٰى : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ اثبات فعل مضارع مجهول বাব نَصَرَ মাসদার اَلتِّلَاوَةُ মূলবর্ণ (ت ـ ل ـ و) জিনসে ناقص واوى অর্থ– পাঠ করা হয়। তেলাওয়াত করা হয়।

اَسَاطِيْرُ : শব্দটি বহুবচন, একবচন اُسْطُوْرَةٌ অর্থ– উপকথা, রূপকথা।

اَوَّلِيْنَ : শব্দটি বহুবচন, একবচন اَوَّلٌ অথ– প্রথম, শুরু।

اِئْتِ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْاِتْيَانُ মূলবর্ণ (ا ـ ت ـ ى) জিনস মুরক্কাব, مهموز فاء ও ناقص يائى অর্থ– তুমি দাও।

وَمَا لَهُمْ اَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللّٰهُ وَهُمْ يَصُدُّوْنَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوْٓا اَوْلِيَآءَهٗ ؕ اِنْ اَوْلِيَآؤُهٗٓ اِلَّا الْمُتَّقُوْنَ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ (٣٤)	অনুবাদ : (৩৪) আর তাদের কি যুক্তি আছে যে, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে শাস্তি প্রদান না করেন? এই অবস্থায় যে, তারা মসজিদে হারাম হতে [পয়গম্বর ﷺ ও মুসলমানগণকে] প্রতিরোধ করে অথচ তারা সেই মসজিদের তত্ত্বাবধায়ক [-ও] নয়, তার তত্ত্বাবধায়ক তো আল্লাহভীরুগণ ব্যতীত আর কেউই নয়, কিন্তু তাদের অনেকেই অবগত নয়।
وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ اِلَّا مُكَآءً وَّتَصْدِيَةً ؕ فَذُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ (٣٥)	(৩৫) আর তাদের নামাজ কাবা শরীফের নিকট এই ছিল- কেবল শিস দেওয়া ও করতালি দেওয়া, অতএব, এই শাস্তির স্বাদ আস্বাদন কর নিজেদের কুফরের দরুন
اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ فَسَيُنْفِقُوْنَهَا ثُمَّ تَكُوْنُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُوْنَ ؕ۬ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِلٰى جَهَنَّمَ يُحْشَرُوْنَ (٣٦)	(৩৬) নিশ্চয় এই কাফেররা নিজেদের ধন সম্পদসমূহ এজন্য ব্যয় করছে যেন আল্লাহ তা'আলার পথ হতে [লোকদেরকে] প্রতিরোধ করে, অতএব, তারা তো নিজেদের মাল ব্যয় করতেই থাকবে, [কিন্তু] পরিণামে সেই মাল তাদের পক্ষে অনুশোচনার কারণ হয়ে পড়বে, অনন্তর তারা পরাভূত হয়ে যাবে, আর কাফেরদেরকে দোজখের দিকে সমবেত করা হবে।

শাব্দিক অনুবাদ

(৩৪) وَمَا لَهُمْ আর তাদের কি যুক্তি আছে যে اَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللّٰهُ আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে শাস্তি প্রদান না করেন وَهُمْ يَصُدُّوْنَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ এই অবস্থায় যে, তারা মসজিদে হারাম হতে [পয়গম্বর (সা.) ও মুসলমানগণকে] প্রতিরোধ করে وَمَا كَانُوْٓا اَوْلِيَآءَهٗ অথচ তারা সেই মসজিদের তত্ত্বাবধায়ক [-ও] নয় اِنْ اَوْلِيَآؤُهٗٓ اِلَّا الْمُتَّقُوْنَ তার তত্ত্বাবধায়ক তো আল্লাহভীরুগণ ব্যতীত আর কেউই নয় وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ কিন্তু তাদের অনেকেই অবগত নয়।

(৩৫) وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ আর তাদের নামাজ عِنْدَ الْبَيْتِ কাবা শরীফের নিকট এই ছিল- اِلَّا مُكَآءً وَّتَصْدِيَةً কেবল শিস দেওয়া ও করতালি দেওয়া فَذُوْقُوا الْعَذَابَ অতএব, এই শাস্তির স্বাদ আস্বাদন কর بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ নিজেদের কুফরের দরুন।

(৩৬) اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا নিশ্চয় এই কাফেররা يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ নিজেদের ধনসম্পদসমূহ এজন্য ব্যয় করছে لِيَصُدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ যেন আল্লাহ তা'আলার পথ হতে [লোকদেরকে] প্রতিরোধ করে فَسَيُنْفِقُوْنَهَا অতএব, তারা তো নিজেদের মাল ব্যয় করতেই থাকবে ثُمَّ تَكُوْنُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً পরিণামে সেই মাল তাদের পক্ষে অনুশোচনার কারণ হয়ে পড়বে ثُمَّ يُغْلَبُوْنَ অনন্তর তারা পরাভূত হয়ে যাবে وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِلٰى جَهَنَّمَ يُحْشَرُوْنَ আর কাফেরদেরকে দোজখের দিকে সমবেত করা হবে।

অনুবাদ	আয়াত
অনুবাদ : (৩৭) যেন আল্লাহ তা'আলা অপবিত্র [লোকদের]-কে পবিত্র [লোকদের] হতে পৃথক করে দেন এবং অপবিত্রদেরকে পরস্পরের সাথে মিলিত করেন, অর্থাৎ তাদের সকলকে স্তূপীকৃত করে দেন, অতঃপর তাদের সকলকে দোজখে নিক্ষেপ করেন, এরূপ লোকেরাই পূর্ণ ক্ষতির মধ্যে রয়েছে।	لِيَمِيزَ اللّٰهُ الْخَبِيْثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيْثَ بَعْضَهٗ عَلٰى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهٗ جَمِيْعًا فَيَجْعَلَهٗ فِىْ جَهَنَّمَ ؕ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ (٣٧)
(৩৮) আপনি সেই সকল লোকদেরকে যারা কুফরি করেছে, বলে দিন যে, যদি তারা [কুফর হতে] নিবৃত্ত হয়, তবে তাদের অতীতের সকল পাপ ক্ষমা করা হবে, আর যদি তারা নিজেদের সেই [কুফরের] অভ্যাসই রাখে তবে পূর্ববতী কাফেরদের সম্বন্ধে [আমার] বিধান প্রবর্তিত রয়েছে।	قُلْ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِنْ يَّنْتَهُوْا يُغْفَرْ لَهُمْ مَّا قَدْ سَلَفَ ۚ وَاِنْ يَّعُوْدُوْا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْاَوَّلِيْنَ (٣٨)
(৩৯) আর তোমরা তাদের বিরুদ্ধে সেই পর্যন্ত যুদ্ধ করতে থাক, যে পর্যন্ত না তাদের হতে ফিতনা [শিরক] বিলুপ্ত হয়ে যায়, এবং [তাদের] ধর্ম [কেবল] আল্লাহ তা'আলারই হয়ে যায়, অনন্তর যদি তারা নিবৃত্ত হয়, তবে আল্লাহ তাদের কার্যকলাপ উত্তমরূপে দেখছেন।	وَقَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ كُلُّهٗ لِلّٰهِ ۚ فَاِنِ انْتَهَوْا فَاِنَّ اللّٰهَ بِمَا يَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ (٣٩)
(৪০) আর যদি তারা বিমুখ থাকে, তবে দৃঢ় বিশ্বাস রাখ যে, আল্লাহ তা'আলা হচ্ছেন তোমাদের সাথি, তিনি অতি উত্তম সাথি এবং অতি উত্তম মদদগার।	وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ مَوْلٰىكُمْ ؕ نِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ النَّصِيْرُ (٤٠)

ع ১৮

শাব্দিক অনুবাদ

(৩৭) لِيَمِيزَ اللّٰهُ الْخَبِيْثَ مِنَ الطَّيِّبِ যেন আল্লাহ তা'আলা অপবিত্র [লোকদের]-কে পবিত্র [লোকদের] হতে পৃথক করে দেন وَيَجْعَلَ الْخَبِيْثَ بَعْضَهٗ عَلٰى بَعْضٍ এবং অপবিত্রদেরকে পরস্পরের সাথে মিলিত করেন فَيَرْكُمَهٗ جَمِيْعًا অর্থাৎ তাদের সকলকে স্তূপীকৃত করে দেন فَيَجْعَلَهٗ فِىْ جَهَنَّمَ অতঃপর তাদের সকলকে দোজখে নিক্ষেপ করেন اُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ এরূপ লোকেরাই পূর্ণ ক্ষতির মধ্যে রয়েছে।

(৩৮) قُلْ আপনি বলে দিন لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا সেই সকল লোকদেরকে যারা কুফরি করেছে। اِنْ يَّنْتَهُوْا যদি তারা [কুফর হতে] নিবৃত্ত হয় يُغْفَرْ لَهُمْ مَّا قَدْ سَلَفَ তবে তাদের অতীতের সকল পাপ ক্ষমা করা হবে। وَاِنْ يَّعُوْدُوْا আর যদি তারা নিজেদের সেই [কুফরের] অভ্যাসই রাখে فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْاَوَّلِيْنَ তবে পূর্ববতী কাফেরদের সম্বন্ধে [আমার] বিধান প্রবর্তিত রয়েছে।

(৩৯) وَقَاتِلُوْهُمْ আর তোমরা তাদের বিরুদ্ধে সেই পর্যন্ত যুদ্ধ করতে থাক حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ যে পর্যন্ত না তাদের হতে ফেতনা [শিরক] বিলুপ্ত হয়ে যায় وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ كُلُّهٗ لِلّٰهِ এবং [তাদের] ধর্ম [কেবল] আল্লাহ তা'আলারই হয়ে যায় فَاِنِ انْتَهَوْا অনন্তর যদি তারা নিবৃত্ত হয় فَاِنَّ اللّٰهَ بِمَا يَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ তবে আল্লাহ তাদের কার্যকলাপ উত্তমরূপে দেখছেন।

(৪০) وَاِنْ تَوَلَّوْا আর যদি তারা বিমুখ থাকে। فَاعْلَمُوْٓا তবে দৃঢ় বিশ্বাস রাখ যে اَنَّ اللّٰهَ مَوْلٰىكُمْ আল্লাহ তা'আলা হচ্ছেন তোমাদের সাথি نِعْمَ الْمَوْلٰى তিনি অতি উত্তম সাথি وَنِعْمَ النَّصِيْرُ এবং অতি উত্তম মদদগার।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(৩৫) قوله وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً الخ **আয়াতের শানে নুযূল– ১ :** ইবনে আবী হাতেম, আবুশ শায়খ, ইবনে মারদুভীয়া ও যিয়া প্রমুখ হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, কুরাইশরা করতল বাজিয়ে ও শিস দিয়ে উলঙ্গ হয়ে কাবা গৃহের তওয়াফ করত। সে পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তাআলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

শানে নুযূল– ২ : আবদ ইবনে হুমাইদ ও ইবনে জারীর হযরত সাঈদ ইবনে জুবাইর (রা.) -এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ কর্তৃক কাবা গৃহের তওয়াফ করা সম্পর্কে কুরাইশরা বিদ্রূপ করেছিল; বরং তাই নয় শুধু যে তারা শিষ ও করতালিও দিচ্ছিল, তখন সে পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[ফাতহুল কাদীর-৩০৭/২]

(৩৭) قوله لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَىٰ بَعْضٍ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক বলেন যে, জহুরী মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহইয়া ইবনে হাব্বান, আসেম ইবনে উমর ইবনে কাতাদহ , হুই ইবনে আব্দির রহমান ইবনে আমর ইবনে সাঈদ বিন মা'আয প্রমূখ আমার নিকট বর্ণনা করে তারা বলেন যে, বদর যুদ্ধে কুরাইশ বাহিনী যখন ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে মক্কায় ফিরে গেল। আর আবূ সুফিয়ান তার বাণিজ্য কাফেলা নিয়ে মক্কায় গমন করল। তখন আব্দুল্লাহ বিন আবী রবীআ, ইকরিমা বিন আবী জাহল, সাফওয়ান বিন উমাইয়্যাহ যাদের পিতা পুত্র ও ভাইয়েরা বদর অভিযানে নিহত হয়েছে তারা এসে আবু সুফিয়ান এবং কুরাইশরে আরোও যারা ছিল তাদের সাথে আলোচনা করল। তখন তারা বলল যে, হে কুরাইশের লোকজন! মুহাম্মদ তোমাদের ক্ষতি করেছে। তোমাদের বড়দেরকে হত্যা করেছে। সুতরাং তোমরা আমাদেরকে এই মালের বিনিময়ে মুহাম্মদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য সহযোগিতা কর। আমরা অবশ্যই তার কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করব। তাদের সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। –[ইবনে কাছীর-৩১৪/২, ফাতহুল কাদীর-৩০৭/২]

পূর্ববর্তী আয়াতগুলোতে বলা হয়েছিল যে, মক্কার মুশরিকরা নিজেদের কুফরি ও অস্বীকৃতির দরুন যদিও আসমানি আজাব প্রাপ্তিরই যোগ্য, কিন্তু মক্কায় রাসূলে কারীম ﷺ-এর উপস্থিতি ব্যাপরক আজাবের পথে অন্তরায় হয়ে আছে। আর তাঁর হিজরতের পর সে সমস্ত অসহায় দুর্বল মুসরমানেদের কারণে এমন; আযাব আসছে না যারা মক্কায় থেকে আল্লাহ তা'আলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে থাকেন।

আলোচ্য আয়াতগুলোতে বলা হচ্ছে যে, রাসূলে কারীম ﷺ কিংবা আসহায় ও দুর্বল মুসলমানদের কারণে যদি দুনিয়াতে তাদের আজাব রহিত হয়েও গিয়ে থাকে, তাদের ধারণা করা উচিত নয় যে, এরা আজাবের যোগ্যই নয়; বরং তাদের আজাবের যোগ্য হওয়াটা পরিষ্কার। তাছাড়া কুফরি ও অস্বীকৃতি ছাড়াও তাদের এমনসব অপরাধ রয়েছে যার ফলে তাদের উপর আজাব নেমে আসা উচিত। আলোচ্য আয়াত দুটিতে তাদের তিনটি অপরাধ বর্ণনা করা হয়েছে।

প্রথমত এরা নিজেরা তো মসজিদে হারাম অর্থাৎ খানায়ে কা'বায় ইবাদত-বন্দেগি ও নামাজ, তওয়াফ প্রভৃতি আদায় করতে চায়, তাদেরকে বাধা দান করে। এতে হুদায়বিয়ার ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। ৬ষ্ঠ হিজরি সালে যখন রাসূলে কারীম ﷺ সাহাবায়ে কেরামসহ ওমরা পালনের উদ্দেশ্যে মক্কায় আগমন করেন, তখন মক্কায় মুশরিকরা তাঁকে বাধাদান করেছিল এবং ফিরে যেতে বাধ্য করেছিল।

দ্বিতীয় অপরাধ হলো এই যে, এই নির্বোধের দল মনে করত এবং বলত যে, আমরা মসজিদে হারামের মোতাওয়াল্লী, যাকে ইচ্ছা এখানে আসতে অনুমতি দিব, যাকে ইচ্ছা দিব না।

তাদের এই ধারণা ছিল দুটি ভুল বুঝাবুঝির ফলশ্রুতি। প্রথমত এই যে, তারা নিজেদেরকে মসজিদে হারামের মোতাওয়াল্লী বলে বলে মনে করেছিল, অথচ কোনো কাফের কোনো মসজিদের মোতাওয়াল্লী হতে পারে না। দ্বিতীয়ত তাদের এই ধারণা যে, যাকে ইচ্ছা তারা মসজিদে আসতে বাধাদান করতে পারে। অথচ মসজিদ যেহেতু আল্লাহর ঘর, সুতরাং এতে আসতে বাধা দেবার অধিকার কারো নেই। তবে এমন বিশেষ অবস্থার কথা স্বতন্ত্র, যাতে মসজিদের অবমাননা কিংবা অন্যান্য নামাজীদের কষ্টের আশঙ্কা থাকে। যেমন, রাসূলে করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন "নিজেদের মসজিদসমূহকে রক্ষা

www.almodina.com

কর ছোট শিশুদের থেকে পাগলদের থেকে এবং নিজেদের পারস্পরিক বিবাদ বিসংবাদ থেকে।" ছোট শিশু বলতে সেসব শিশুকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, যাদের দ্বারা মসজিদ অপবিত্র হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। আর পাগলদের দ্বারা অপবিত্রতারও আশঙ্কা থাকে এবং নামাজিদের কষ্টেরও সম্ভবনা থাকে। এছাড়া নিজেদের পারস্পরিক বিবাদ বিসংবাদের দরুন মসজিদের অসম্মানও হয় এবং নামাজিদের কষ্টও হয়।

এ হাদীসের ভিত্তিতে মসজিদের একজন মোতওয়াল্লীর এমন শিশু ও পাগলদেরকে মসজিদে আসতে না দেওয়ার এবং মসজিদে পারস্পরিক বিবাদ বিসংবাদ হতে না দেওয়ার অধিকার থাকলেও এমন অবস্থা বা পরিস্থিত ব্যতীত কোনো মুসলমানকে মসজিদে আসতে বাধা দেওয়ার কোনো অধিকার নেই।

কুরআন করীমে আ্যালোচ্য আয়াতটিতে শুধু প্রথম বিষয়টিরই আলোচনা করা হয়েছে যে, মসজিদে হারামের মোতাওয়াল্লী যখন শুধুমাত্র মুত্তকী পরহেজগার ব্যক্তিই হতে পারেন, তখন তাদেরকে কেমন করে এর মোতওয়াল্লী হিসাবে স্বীকার করা যায়। এতে প্রতীয়মান হয় যে, মসজিদের মোতাওয়াল্লী কোনো মুসলমান দীনদার ও পরহেজগার ব্যক্তিরাই হওয়া বাঞ্ছনীয় কোনো কোনো মুফাসসেরীন إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ -এর সর্বনামটি আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তিত বলে সাব্যস্ত করে এই অর্থ করেছেন যে, আল্লাহর ওলী শুধুমাত্র মুত্তাকী পরহেজগার ব্যক্তিরাই হতে পারেন।

এই তাফসীর বা ব্যাখ্যা অনুযায়ী আয়াতের মর্ম এই দাঁড়ায় যে, যারা শরিয়ত ও সুন্নতের বরখেলাফ আমল করা সত্ত্বেও আল্লাহর ওলী হওয়ার দাবি করে, তারা সর্বৈব মিথ্যাবাদী এবং যারা এহেন লোকদের ওলী আল্লাহ বলে মনে করে, তারা (একান্তভাবেই) ধোঁকায় পতিত।

তাদের তৃতীয় অপরাধ এই যে, তাদের মধ্যে কুফর ও শিরকের পঙ্কিলতা তো ছিলই, তাদের কার্যকলাপও সাধারণ মানবিকতার স্তর থেকেও বহু নিম্নে রয়েছে। কারণ এরা নিজেদের যে কাজকে 'নামাজ' নামে অভিহিত করে, তা মুখে কিছু শিস দেওয়া এবং হাতে কিছু তালি বাজানো ছাড়া আর কিছু নয়। বলাবাহুল্য, যার সামান্যতম বুদ্ধিও থাকবে সেও এ ধরনের কার্যকলাপকে ইবাদত কিংবা নামাজ তো দূরের কথা সঠিক কোনো মানবীয় আচরণও বলতে পাারে না। কাজেই আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে– فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ অর্থাৎ তোমাদের কুফরি ও অপরাধের পরিণতি এই যে, এবার আল্লাহর আজাবের আস্বাদ গ্রহণ কর। আজাব বলতে এখানে আখেরাতের আজাব হতে পারে এবং পার্থিব আজাবও হতে পারে যা বদরের যুদ্ধে মুসলমানদের মাধ্যমে তাদের উপর নাজিল হয়।

এ ঘটনার বিবরণ মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক (রা.)-এর বর্ণনা মতে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে উদ্ধৃত রয়েছে যে, গাযওয়ায়ে বদরের পরাজয়ের পর অবশিষ্ট আহত মক্কাবাসী কাফেররা যখন মক্কায় গিয়ে পৌঁছল, তখন যাদের পিতা পুত্র এ যুদ্ধে নিহত হয়েছিল, তারা বাণিজ্যিক কাফেলার আমীর আবূ সুফিয়ানের কাছে উপস্থিত হয় এবং বলে যে, আপনি তো জানেন, এ যুদ্ধটি বাণিজ্যিক কাফেলার হেফাজতকল্পে করা হয়েছে, যার ফলে জান মালের এহেন ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়। কাজেই আমরা চাই, সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলোর পক্ষ থেকে আমাদের কিছু সাহায্য করা হোক, যাতে আমরা ভবিষ্যতে মুসলমানদের থেকে এর প্রতিশোদ গ্রহণ করতে পারি। তারা এ দাবি মেনে নিয়ে তাদেরকে এক বিরাট অঙ্কের অর্থ দিয়ে দেয় যা তারা বদর যুদ্ধের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য ওহুদ যুদ্ধে ব্যয় করে এবং তাতেও শেষ পর্যন্ত পরাজিত হয়। ফলে পরজয়ের গ্লানির সাথে সাথে অর্থ অপচয়ের অতিরিক্ত অনুাতপ যোগ হয়ে যায়।

কুরআন করীম এ আয়াতে এই ঘটনার পূর্বেই রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে এর পরিণতি সম্পর্কে অবহিত করে দেয়। বলা হয়, যারা কাফের, তারা নিজেদের ধন সম্পদ আল্লাহর দীন থেকে মানুষকে বাধা দান করার কাজে ব্যয় করতে চাইছে। অতএব, তার পরিণতি হবে এই যে, নিদের ধনসম্পদও ব্যয় করে বসবে এবং পরে এ ব্যয়ের জন্য তাদের অনুতাপ হবে। অথচ শেষ পর্যন্ত তাদেরকে পরাজয়ই বরণ করতে হবে। বস্তুত গযওয়ায়ে ওহুদে ঠিক তাই ঘটেছে: সঞ্চিত ধন সম্পদও ব্যয় করে ফেলেছে এবং পরে যখন পরাজিত হয়েছে, তখন পরাজয়ের গ্লানির সাথে সাথে ধনসম্পদ বিনষ্ট হওয়ার জন্য অতিরিক্ত অনুতাপ ও দুঃখ পোহাতে হয়েছে।

বগভী প্রমুখ কোনো কোনো তাফসীরবিদ এ আয়াতের বিষয়বস্তুকে বদর যুদ্ধের ব্যয় সংক্রান্ত বলেই অভিহিত করেছেন। বদর যুদ্ধে এক হাজার জোওয়ানের বাহিনী মুসলমানদের মোকাবিলা করতে গিয়েছিল। তাদের খাবার দাবার এবং অন্যান্য

যাবতীয় ব্যয়ভার মক্কার বারো জন সর্দার নিজেদের দায়িত্বে নিয়ে নিয়েছিল। তাদের মধ্যে ছিল আবূ জাহল, ওতবা, শায়বা, প্রমুখ। বলাবহুল্য এক হাজার লোকের যাতায়াত ও খানাপিনা প্রভৃতিতে বিরাট অঙ্কের অর্থ ব্যয়ের জন্যও বিপুল অনুতাপ ও আফসোস হয়েছিল।–[মাযহারী]

আয়াত শেষে আখেরাতের দিক দিয়ে তাদের মন্দ পরিণতির বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে : وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِلٰى جَهَنَّمَ يُحْشَرُوْنَ অর্থাৎ যারা কাফের জাহান্নামের দিকেই হবে তাদের হাশর।

উল্লিখিত আয়াতসমূহে সত্য দীন থেকে বাধা দানকল্পে অর্থ ব্যয়ের যে অশুভ পরিণতির কথা বলা হয়েছে, তাতে বর্তমান কালের কাফেরও অন্তর্ভুক্ত যারা মানুষকে ইসলাম থেকে বিরত রাখাতে এবং নিজেদের মিথ্যা ও জাতির মতবাদের প্রতি আহবান করতে গিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা হাসপাতালে, শিক্ষাঙ্গনে এবং দান-খায়রাতের নামে ব্যয় করতে থকে। তেমনিভাবে সেসব পথভ্রষ্ট ব্যক্তিরাও এর অন্তর্ভুক্ত, যারা ইসলামের সর্ববাদীসম্মত আকীদা ও বিশ্বাসসমূহে সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি ও সেগুলোর বিরুদ্ধে মানুষকে আহ্বান করার উদ্দেশ্যে অর্থসম্পদ ব্যয় করে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং তাঁর দীনের হেফাজত করেন। অনেক ক্ষেত্রে দেখাও যায় যে, এরা বিপুল পরিমাণ ধনসম্পদ ব্যয় করা সত্ত্বেও নিজেদের উদ্দেশ্যে ব্যর্থ ও অকৃতকার্য থেকে যায়।

৩৭ তম আয়াতে উল্লিখিত ঘটনাবলির কিছু ফলাফল বর্ণনা করা হয়েছে যার সারসংক্ষেপ এই যে, কাফেররা যেসব সম্পদ ইসলামের বিরুদ্ধে ব্যবহার করেছে এবং পরে যার জন্য দুঃখ ও অনুতাপ করেছে আর অপমানিত অপদাস্থ হয়েছে, তাতে ফায়দা হয়েছে এই لِيَمِيْزَ اللّٰهُ الْخَبِيْثَ مِنَ الطَّيِّبِ অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা যাতে অপবিত্র পঙ্কিল এবং পবিত্র পূত বস্তুত পার্থক্য প্রকাশ করে দেন। طَيِّبٌ ও خَبِيْثٌ দু'টি বিপরীত অর্থবোধক শব্দ। خَبِيْثٌ শব্দটি পবিত্র পঙ্কিল ও হারাম বস্তুকে বুঝাতে ব্যবহার হয়। আর طَيِّبٌ শব্দটি বিপরীতে পবিত্র, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও হালাল বস্তুকে বুঝাতে বলা হয়। এখানে এ দু'টি শব্দের দ্বারা যথাক্রমে কাফেরদের অপবিত্র ধন সম্পদ এবং মুসলমানদের পবিত্র সম্পদ ও অর্থ বুঝা যেতে পারে। এমতাবস্থায় এর অর্থ হবে এই যে কাফেররা যে বিপুল অর্থ সম্পদ ব্যয় করেছে তা ছিল অপবিত্র ও হারাম সম্পদ। ফলে তার অশুভ পরিণতি দাঁড়িয়েছে এই যে, তাতে মালও গেছে এবং জানও গেছে। পক্ষান্তরে তার বিপরিতে মুসলমান অতি অল্প পরিমাণ সম্পদ ব্যয় করেছে, কিন্তু সে সম্পদ ছিল পবিত্র ও হালাল। ফলে তারা বিজয় অর্জন করেছন এবং সাথে সাথে গনিমতের মালামাল অর্জনেও সমর্থ হয়েছেন। তারপর ইরশাদ হয়েছে– وَيَجْعَلَ الْخَبِيْثَ بَعْضَهٗ عَلٰى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهٗ جَمِيْعًا فَيَجْعَلَهٗ فِىْ جَهَنَّمَ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা এক 'খরীস' কথা পবিত্রকে অপর অপবিত্রের সাথে মিলিয়ে দেন এবং তারপর সে সমস্তকে সমবেত করে দিবেন জাহান্নামে। বস্তুত এরাই হলো ক্ষতির সম্মুখীন।

অর্থাৎ পৃথিবীতে যেমন চুম্বক লোহাকে আকর্ষণ করে এবং আধুনিক বিজ্ঞানরে অভিজ্ঞাতা অনুযায়ী সমগ্র বিশ্বের ব্যবস্থাই পারস্পরিক আকর্ষণের উপর স্থাপিত, তেমনিভাবে কাজকর্ম, আচার-আচরণ ও স্বভাব চরিত্রের মধ্যেও একটা আকষ্ণ রয়েছে। একটি মন্দ কাজ অন্যান্য মন্দ কাজকে এবং একটি ভালো কাজ অন্যান্য ভালো কাজকে আকর্ষণ করে। একটি খারাপ সম্পদ আরেকটি খারাপ সম্পদকে টেনে আনে এবং তারপর এসব খারাপ সম্পদ মিলে অশুভ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। আর এরই পরিণতি হিসেবে আল্লাহ তা'আলা সমস্ত অপবিত্র সম্পদরাজিকে জাহান্নামে সমবেত করবেন এবং এসব সম্পদের অধিকারীরা ক্ষতির সম্মুখীন হয়ে পড়বে।

এছাড়া এখানে অনেক তাফসীরবিদ মনষী خَبِيْثٌ ও طَيِّبٌ -এর সাধারণ অর্থ যথাক্রমে অপবিত্র ও পবিত্র বলেই সাব্যস্ত করেছেন এবং 'পাক' বলতে মুমিন আর অপবিত্র বলতে কাফেব বুঝিয়েছেন। এমতাবস্থায় মর্ম হবে এই যে উল্লিখিত অবস্থার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা পবিত্র ও অপবিত্র অর্থাৎ মুমিন ও কাফেররের মধ্যে পার্থক্য করতে চান, সমস্ত মুমিন জান্নাতের আর সমস্ত কাফের জাহান্নামে সমবেত হোক, এটাই তাঁর ইচ্ছা।

৩৮ তম আয়াতে কাফেরদের প্রতি আবারো এক মুরব্বীসুলভ আহ্বান জানানো হয়েছে। এতে উৎসাহও রয়েছে এবং ভীতিও রয়েছে। উৎসাহ এ ব্যাপারে যে, যদি তারা সমুদয় কুকর্মের পরে কখনও তওবা করে নেয় এবং ঈমান নিয়ে আসে, তাহলে পূর্বকৃত সমস্ত পাপ ক্ষমা করে দেওয়া হবে। আর ভীতি হলো এই যে, তারা যদি এখানো অপকর্ম থেকে বিরত না হয় তবে তাদের জেনে রাখা উচিত যে, তাদের জন্য আল্লাহ তা'আলাকে নতুন কোনো আইন প্রণয়ন করতে

www.almodina.com

কিংবা নতুন করে কোনো চিন্তা ভাবনা করতে হবে না। বিগত কালের কাফেরদের জন্যও যে আইন প্রবর্তিত হয়ে গেছে তাই তাদের উপরও প্রবর্তণ করা হবে। অর্থাৎ পৃথিবীতে তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে গেছে এবং আখেরাতে হয়েছে কঠিন আজাবের যোগ্য ।

এটি হেরা সূরা আনফলের উনচল্লিশতম আয়াতে। এতে দু'টি শব্দ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

(১) ফিতনা ২. দীন। আরবি অভিধান অনুযায়ী শব্দ দুটি একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

তাফসীরশাস্ত্রের ইমামগণ সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীনদের নিকট থেকে এখানে দুটি অর্থ উদ্ধৃত করেছেন। ১. ফিতনা অর্থ কুফর ও শিরক আর ২. দীন অর্থ ইসলাম। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকেও এই বিশ্লেষণই বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং এই তাফসীর অনুযায়ী আয়াতের অর্থ হতে এই যে, মুসলমানদেরকে কাফেরদের বিরুদ্ধে ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ করে যেতে হবে যতক্ষণ না কাফের নিঃশেষিত হয়ে ইসলামরে পুর্ণ প্রতিষ্ঠা ঘটে এবং ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ধর্মের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে যায়। এ ক্ষেত্রে এই নির্দেশ শুধুমাত্র মক্কাবাসী এবং আরববাসীদের জন্য। নির্দিষ্ট হবে। কারণ, আরব হচ্ছে ইসলামের উৎসস্থল। এতে ইসলাম ছাড়া যদি অন্য কোনো ধর্ম বিদ্যমান থাকে তাহলে দীনে ইসলামের জন্য তা হবে আশংকাজনক। তবে পৃথিবীর অন্যত্র অন্যান্য ধর্মমত ও আদর্শকে আশ্রয় দেওয়া যেতে পারে। যেমন কুরআন কারীমের অন্যান্য আয়াতে এবং হাদীসের বিভিন্ন বর্ণনাময় প্রমাণিত হয়েছে।

আর দ্বিতীয় তাফসীর যা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) প্রমুখ সাহাবায়ে কেরামের উদ্ধৃতিতে বর্ণিত রয়েছে তাহলো এই যে, এতে 'ফেৎনা' অর্থ হচ্ছে সেসব দুঃখ দুর্ধশা ও বিপদাপদের ধারা, যা মক্কার কাফেররা সদাসর্বদা মুসলমানদের উপর অব্যাহত রেখেছিল যতক্ষণ পর্যন্ত তারা মক্কায় অবস্থন করছিলেন। প্রতি মুহূর্তে তাদের অবরোধে আবদ্ধ থেকে নানা কষ্ট সহ্য করে গেছেন। তারপর যখন তারা মদিনায় হিজরত করেন, তখন তারা মুসলমানের পশ্চাদ্ভাবন করে তাঁদের হত্যা ও লুন্ঠন করতে থকে। এমনকি মদিনায় পৌছার পরও গোটা মদিনা আক্রমণের মাধ্যমে তাদের হিংসা রোষই প্রকাশ পেতে থাকে।

পক্ষান্তরে 'দীন' শব্দের অর্থ হলো– প্রভাব ও বিজয়। এ ক্ষেত্রে আয়াতের ব্যাখ্যা হবে এই যে মুসলমানদেরকে কাফেরদের বিরুদ্ধে ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ করতে থাকা কর্তব্য, যতক্ষণ না তাঁরা অন্যের অত্যাচার উৎপীড়ন থেকে মুক্তি লাভ করতে সমর্থ হন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)-এর এক ঘটনার দ্বারাও এ ব্যাখ্যাই পাওয়া যায়। তাহল এই যে, মক্কার প্রশাসক হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা.) -এর বিরুদ্ধে নিবেদন করেন যে, এইক্ষণে মুসলমানগণ যে মহাবিপদের সম্মুখীন, তা আপনি নিজেই দেখছেন। অথচ আপনি সেই ওমর ইবনে খাত্তাবের পুত্র, যিনি কোনোক্রমেই এহেন ফেৎনা ফাসাদকে বরদাশত করতেন না। কাজেই আপনি আজকের ফেৎনার সমাধান করার উদ্দেশ্য কি কারণে এগিয়ে আসেন না? হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বললেন, তার কারণ এই যে, আল্লাহ তা'আলা কোনো মুসলমানের রক্তপাত করাকে হারাম সাব্যস্ত করেছেন। আগত দুজন আরজ কররেলন, আপনি কি কুরআনের এ আয়াতটি পাঠ করেন না। وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ অর্থাৎ যুদ্ধ করে থাক, যতক্ষণ না ফিতনা-ফাসাদ তথা দাঙ্গাহাঙ্গামা থাকে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বললেন, নিশ্চয় আমি এ আয়াত পাঠ করি এবং এর উপর আমলও করি। আমরা এ আয়াতের ভিত্তিতে কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ অব্যাহত রেখেছি যতক্ষণ না ফেৎনা শেষ হয়ে দীন ইসলামের বিজয় সুচিত হবে। অথচ তোমরা আল্লাহ ব্যতীত সত্যধর্মের বিরুদ্ধে অন্য কারো বিজয় সূচিত হোক। তা চাও না। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল এই যে, জিহাদ ও যুদ্ধের হুকুম ছিল কুফরি ফেৎনা এবং কাফেরদের অত্যাচার উৎপীড়নের বিরুদ্ধে। তা আমরা করেছি এবং বরাবরই করে যাচ্ছি। আর তাতে করে সে ফেৎনা প্রদমিত হয়ে গেছে। মুসলমানদের পারস্পরিক গৃহযুদ্ধকে তার সাথে তুলনা করা যথার্থ নয়; বরং মুসলমানদের পারস্পরিক লড়াই বিবাদের ক্ষেত্রে মহানবী ﷺ-এর হেদায়েত হচ্ছে এই যে, তাতে বসে থাকা লোকটি দাঁড়ানো ব্যক্তি অপেক্ষা উত্তম।

এ বিশ্লেষণের সারমর্ম এই যে, মুসলমানদের উপর ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ জিহাদ অব্যাহত রাখা ওয়াজিব, যতক্ষণ না মুসলমানদের উপর তাদের অত্যাচার-উৎপীড়নের ফিতনার পরিসমাপ্তি ঘটে এবং যতক্ষণ না তথাকথিত সমস্ত ধর্মের উপর ইসলামের বিজয় সূচিত হয়। আর এমন অবস্থাটি কেয়ামতের নিকটবর্তী কালেই বাস্তবায়িত হবে এবং সে কারণে কেয়ামত পর্যন্তই জিহাদের হুকুম অব্যাহত ও বলবৎ থাকবে।

www.almodina.com

ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ জিহাদের পরিণতিতে দুটি অবস্থায় সৃষ্টি হতে পারে। প্রথমত এই যে, তারা মুসলমানদের উপর অত্যাচার উৎপীড়ন থেকে বিরত হয়ে যাবে, তা ইসলামি ভ্রাতৃত্বের অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমেও হতে পারে, কিংবা নিজ নিজ ধর্মমত থেকেই আনুগত্যের চুক্তি সম্পাদন করার মাধ্যমেও হতে পার।

দ্বিতীয়ত এতদুভয় অবস্থায় কোনোটি গ্রহণ না করে অব্যাহত মোকাবিলায় স্থির থাকবে। আয়াতে এ উভয় অবস্থার হুকুমই বর্ণিত হয়েছে। বলা হয়েছে- فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللّٰهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ অর্থাৎ তারা যদি বিরত হয়ে যায়, তাহলে আল্লাহ তাদের কার্যকলাপ যথার্থভাবেই অবলোকন করেন।

শব্দ বিশ্লেষণ

يَصُدُّوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ اثبات فعل مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلصَّدُّ মূলবর্ণ (ص ـ د ـ د) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ- তারা বাধা প্রদান করে।

ذُوْقُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلذَّوْقُ মূলবর্ণ (ذ ـ و ـ ق) জিনস اجوف واوى অর্থ- তোমরা স্বাদ নাও।

يَرْكُمْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ اثبات فعل مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلرَّكْمُ মূলবর্ণ (ر ـ ك ـ م) জিনস صحيح অর্থ- সে স্তূপীকৃত করে।

تَوَلَّوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ اثبات فعل ماضى معروف বাব تَفَعُّلْ মাসদার اَلتَّوَلِّيْ মূলবর্ণ (و ـ ل ـ ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ- তারা মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে।

مَوْلٰى : শব্দটি একবচন, বহুবচন موالى অর্থ- সাহায্যকারী।

غَنِمْتُمْ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ اثبات فعل ماضى معروف বাব سَمِعَ মাসদার اَلْغَنَمُ মূলবর্ণ (غ ـ ن ـ م) জিনস صحيح অর্থ- তোমরা গনিমত হিসেবে পাও।

الْجَمْعٰن : শব্দটি দ্বিবচন, একবচনে جَمْعٌ বহুবচনে جُمُوْعٌ অর্থ- একত্রকারী।

www.almodina.com

১০ম পারা

وَاعْلَمُوْٓا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَاَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهٗ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِي الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ۙ اِنْ كُنْتُمْ اٰمَنْتُمْ بِاللّٰهِ وَمَآ اَنْزَلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعٰنِ ؕ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ (٤١)

অনুবাদ : (৪১) আর এ বিষয়ে জেনে নাও যে, যা কিছু গনিমতস্বরূপ তোমাদের হস্তগত হয়, তবে তার বিধান এই যে, সম্পূর্ণ মালের এক পঞ্চমাংশ হচ্ছে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্য এবং রাসূলের আত্মীয়স্বজনের জন্য, আর এতিমদের ও দরিদ্রদের এবং মুসাফিরদের জন্য, যদি তোমরা আল্লাহর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রাখ, আর সেই বিষয়ের প্রতি, যা আমি আমার বান্দার উপর নাজিল করেছিলাম মীমাংসার দিন, যেদিন উভয় দল পরস্পর সম্মুখীন হয়েছিল, আর আল্লাহই হচ্ছেন সর্ব বিষয়ে পরিপূর্ণ ক্ষমতাবান।

اِذْ اَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوٰى وَالرَّكْبُ اَسْفَلَ مِنْكُمْ ؕ وَلَوْ تَوَاعَدْتُّمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيْعٰدِ ۙ وَلٰكِنْ لِّيَقْضِيَ اللّٰهُ اَمْرًا كَانَ مَفْعُوْلًا ۙ۬ لِّيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْۢ بَيِّنَةٍ وَّيَحْيٰى مَنْ حَيَّ عَنْۢ بَيِّنَةٍ ؕ وَاِنَّ اللّٰهَ لَسَمِيْعٌ عَلِيْمٌ (٤٢)

(৪২) এটা সেই সময় ছিল, যখন তোমরা সেই ময়দানের এই দিকের [মদিনার নিকটবর্তী] প্রান্তরে ছিলে এবং তারা ময়দানের ঐ দিকের [মদিনার দূরবর্তী] প্রান্তে ছিল, আর সেই [কুরাইশদের] কাফেলা ছিল তোমাদের নিম্নভূমিতে; আর যদি তোমরা এবং তারা [যুদ্ধের জন্য] কোনো সিদ্ধান্ত করতে, তবে অবশ্যই সেই সিদ্ধান্ত সম্পর্কে তোমাদের মধ্যে মতভেদ দেখা দিত, কিন্তু যে কাজ করা আল্লাহর ইচ্ছা ছিল, যেন তা সমাপন করে দেন অর্থাৎ যে ব্যক্তি ধ্বংস হওয়ার যেন সে নিদর্শন আসার পর ধ্বংস হয়, আর যে ব্যক্তি জীবিত হওয়ার, সেও নিদর্শন আসার পর জীবিত হয়, আর নিঃসন্দেহে আল্লাহ খুব শ্রবণকারী মহাজ্ঞানী।

শাব্দিক অনুবাদ

(৪১) وَاعْلَمُوْٓا আর এ বিষয় জেনে নাও যে, اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ যা কিছু গনিমতস্বরূপ তোমাদের হস্তগত হয়, তবে তার বিধান এই যে, فَاَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهٗ وَلِلرَّسُوْلِ সম্পূর্ণ মালের এক পঞ্চমাংশ হচ্ছে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্য وَلِذِي الْقُرْبٰى এবং রাসূলের আত্মীয়স্বজনের জন্য وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ আর এতিমদের ও দরিদ্রদের এবং মুসাফিরদের জন্য اِنْ كُنْتُمْ اٰمَنْتُمْ بِاللّٰهِ যদি তোমরা আল্লাহর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রাখ وَمَآ اَنْزَلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا আর সেই বিষয়ের প্রতি, যা আমি আমার বান্দার উপর নাজিল করেছিলাম يَوْمَ الْفُرْقَانِ মীমাংসার দিন يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعٰنِ যেদিন উভয় দল পরস্পর সম্মুখীন হয়েছিল وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ আর আল্লাহই হচ্ছেন সর্ব বিষয়ে পরিপূর্ণ ক্ষমতাবান।

(৪২) اِذْ اَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا এটা সেই সময় ছিল, যখন তোমরা সেই ময়দানের এই দিকের [মদিনার নিকটবর্তী] প্রান্তরে ছিলে وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوٰى এবং তারা ময়দানের ঐ দিকের [মদিনার দূরবর্তী] প্রান্তে ছিল وَالرَّكْبُ اَسْفَلَ مِنْكُمْ আর সেই [কুরাইশদের] কাফেলা ছিল তোমাদের নিম্নভূমিতে وَلَوْ تَوَاعَدْتُّمْ আর যদি তোমরা এবং তারা [যুদ্ধের জন্য] কোনো সিদ্ধান্ত করত لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيْعٰدِ তবে অবশ্যই সেই সিদ্ধান্ত সম্পর্কে তোমাদের মধ্যে মতভেদ দেখা দিত وَلٰكِنْ কিন্তু لِّيَقْضِيَ اللّٰهُ اَمْرًا كَانَ مَفْعُوْلًا যে কাজ করা আল্লাহর ইচ্ছা ছিল, যেন তা সমাপন করে দেন مَنْ هَلَكَ যে ব্যক্তি ধ্বংস হওয়ার لِّيَهْلِكَ যেন সে ধ্বংস হয় عَنْۢ بَيِّنَةٍ নিদর্শন আসার পর وَّيَحْيٰى مَنْ حَيَّ عَنْۢ بَيِّنَةٍ আর যে ব্যক্তি জীবিত হওয়ার, সেও নিদর্শন আসার পর জীবিত হয় وَاِنَّ اللّٰهَ لَسَمِيْعٌ عَلِيْمٌ আর নিঃসন্দেহে আল্লাহ খুব শ্রবণকারী মহাজ্ঞানী।

www.almodina.com

إِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا ۖ وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَّفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ ۗ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (٤٣)

অনুবাদ : (৪৩) আর সেই সময়ও স্মরণীয়, যখন আল্লাহ আপনাকে আপনার স্বপ্নে তাদেরকে কম দেখালেন, আর যদি আল্লাহ আপনাকে তাদের বহু সংখ্যক দেখাতেন, তবে তোমরা সাহসহারা হয়ে পড়তে এবং এ বিষয়ে তোমাদের মধ্যে পরস্পর বিবাদ ঘটত, কিন্তু আল্লাহ তা'আলা রক্ষা করে নিলেন, নিশ্চয় তিনি অন্তরসমূহের কথাগুলো খুব জানেন।

وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا ۗ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ (٤٤)

(৪৪) আর সেই সময়টি স্মরণ কর, যখন তোমাদের সম্মুখীন হওয়ার সময় আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের দৃষ্টিতে তাদেরকে কম করে দেখাচ্ছিলেন এবং তাদের দৃষ্টিতে তোমাদেরকে কম করে দেখাচ্ছিলেন, যেন আল্লাহ তা'আলা সেই কাজ সমাপন করে দেন যা করা তাঁর অভিপ্রায় ছিল, আর সমস্ত ব্যাপার আল্লাহ তা'আলারই দিকে রুজু করা হবে।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٤٥)

(৪৫) হে ঈমানদারগণ! যখন তোমাদেরকে [জিহাদে] কোনো দলের সাথে সম্মুখীন হতে হয়, তখন দৃঢ়পদ থাকবে এবং আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণ করবে, আশা যে, তোমরা সফলকাম হবে।

শাব্দিক অনুবাদ

(৪৩) إِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ আর সেই সময়ও স্মরণীয়, যখন আল্লাহ আপনাকে তাদেরকে দেখালেন فِي مَنَامِكَ আপনার স্বপ্নে قَلِيلًا কম وَلَوْ أَرَاكَهُمْ আর যদি আল্লাহ আপনাকে তাদের দেখাতেন كَثِيرًا বহু সংখ্যক لَفَشِلْتُمْ তবে তোমরা সাহসহারা হয়ে পড়তে وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ এবং এ বিষয়ে তোমাদের মধ্যে পরস্পর বিবাদ ঘটত وَلَٰكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ কিন্তু আল্লাহ তা'আলা রক্ষা করে নিলেন إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ নিশ্চয় তিনি অন্তরসমূহের কথাগুলো খুব জানেন।

(৪৪) وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ আর সেই সময়টি স্মরণ কর, যখন আল্লাহ তোমাদেরকে তাদেরকে দেখাচ্ছিলেন إِذِ الْتَقَيْتُمْ তোমাদের সম্মুখীন হওয়ার সময় فِي أَعْيُنِكُمْ তোমাদের দৃষ্টিতে قَلِيلًا কম করে وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ এবং তাদের দৃষ্টিতে তোমাদেরকে কম করে দেখাচ্ছিলেন لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا যেন আল্লাহ তা'আলা সেই কাজ সমাপন করে দেন যা করা তাঁর অভিপ্রায় ছিল وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ আর সমস্ত ব্যাপার আল্লাহ তা'আলারই দিকে রুজু করা হবে।

(৪৫) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا হে ঈমানদারগণ! إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً যখন তোমাদেরকে [জিহাদে] কোনো দলের সাথে সম্মুখীন হতে হয় فَاثْبُتُوا তখন দৃঢ়পদ থাকবে وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا এবং আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণ করবে لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ আশা যে, তোমরা সফলকাম হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(৪১) قوله وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** আল্লামা কালবী (র.) হতে বর্ণিত আছে যে, আলোচ্য আয়াত বদর অভিযানকালে নাজিল হয়েছে। জমহুরের মতামতও তাই। তবে আল্লামা ওয়াহেদী (র.) বলেন যে, খুমুস সংক্রান্ত বিষয়টি ছিল বনূ কায়নুকার অভিযানে। যা শাওয়ালের পনেরো তারিখ বদর যুদ্ধের একমাস তিন দিন পর সংগঠিত হয়েছিল। হিজরত করার ২০ মাস পূর্তিকালে সে ঘটনা ঘটে ছিল। গনিমত তথা যুদ্ধলব্ধ মালের মধ্যে কাদের অধিকার ও হক রয়েছে সে সম্পর্কে বিশদ বর্ণনা দিয়ে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[রূহুল মা'আনী-২/৫, বাহরে মুহীত-৪৯২/৪]

www.almodina.com

এ আয়াতে গনিমতের বিধান ও তার বণ্টননীতি বিশ্লেষণ করা হয়েছে। অভিধানে গনিমত বলা হয় সে সমস্ত মালসামানকে যা শত্রুর নিকট থেকে লাভ হয়। শরিয়তের পরিভাষা অনুযায়ী অমুসলমানদের নিকট থেকে যুদ্ধবিগ্রহে বিজয়ার্জনের মাধ্যমে যে মালামাল অর্জিত হয়, তাকেই বলা হয় 'গনিমত'। আর যা কিছু আপস, সন্ধি-সম্মতির মাধ্যমে অর্জিত হয়, যেমন, জিযিয়া কর, খাজনা, টেক্স প্রভৃতি তাকে বলা হয় 'ফাই'। কুরআন কারীমে এতদুভয় শব্দের মাধ্যমে (অর্থাৎ 'গনিমত' ও 'ফাই') এতদুভয় প্রকার মালামালের হুকুম-আহকাম তথা বিধিবিধান বর্ণনা করা হয়েছে। সূরা আনফালে সে গনিমতের মালামালের কথাই আলোচিত হয়েছে যা যুদ্ধকালে অমুসলমানদের কাছ থেকে লাভ হয়েছে। এখানে সর্বাগ্রে একটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে যে, ইসলামি ও কুরআনি মতাদর্শ অনুযায়ী সমগ্র বিশ্বজাহানের মালিকানা শুধুমাত্র সে সত্তার জন্য নির্ধারিত যিনি এগুলোকে সৃষ্টি করেছেন। মানুষের পক্ষে কোনো কিছুর মালিকানা লাভ করার একটি মাত্র পন্থা রয়েছে। তা হলো এই যে, স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা স্বীয় আইনের মাধ্যমে কোনো বস্তুকে কোনো ব্যক্তির মালিকানা সাব্যস্ত করে দেন। যেমন, সূরা ইয়াসীনে চতুষ্পদ জীবের আলোচনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে– اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ اَيْدِيْنَا اَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مٰلِكُوْنَ 'এরা কি দেখতে পায় না যে, চতুষ্পদ জন্তুসমূহকে আমি নিজে সৃষ্টি করেছি (এবং) তারপর তারা সেগুলোর মালিক হয়েছে।' অর্থাৎ এদের মালিকানা নিজস্ব নয়; বরং আমিই নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে এগুলোর মালিক বনিয়েছি।

কোনো জাতি যখন আল্লাহ তা'আলার প্রতি বিদ্রোহ ঘোষণা করে, অর্থাৎ কুফর ও শিরকে লিপ্ত হয়ে পড়ে, তখন প্রথম আল্লাহ তা'আলা তাদের সংশোধনের উদ্দেশ্যে স্বীয় রাসূল ও কিতাব পাঠিয়ে থাকেন। যে হতভাগা এ খোদায়ী দানের মাধ্যমেও প্রভাবিত না হয়, তার বিরুদ্ধে জিহাদ করার জন্য আল্লাহ তা'আলা যে নির্দেশ দিয়েছেন তার মর্ম দাঁড়ায় এই যে, এ বিদ্রোহীদের জানমাল সবই হালাল করে দেওয়া হয়েছে, আল্লাহ প্রদত্ত মালামালের দ্বারা লাভবান হওয়ার কোনো অধিকারই আর তাদের নেই; বরং তাদের ধনসম্পদ সরকারের পক্ষে বাজেয়াপ্ত করে নেওয়া হয়েছে। এ বাজেয়াপ্ত করা মালামালেরই অপর নাম, গনিমতের মাল যা কাফেরদের মালিকানা থেকে বেরিয়ে একান্তভাবে আল্লাহ তা'আলার মালিকানায় রয়ে গেছে।

শব্দ বিশ্লেষণ

اَلْقُصْوٰى : সীগাহ واحد مؤنث বহছ اسم تفضيل বাব نَصَرَ মাসদার اَلْقُصُوُّ মূলবর্ণ (ق - ص - و) জিনস ناقص واوى অর্থ- দূর প্রান্তে।

اَلرَّكْبُ : শব্দটি বহুবচন; একবচন رَاكِبٌ অর্থ– কাফেলা, উষ্ট্রারোহী, ঘোড়ার বাহিনী। কেউ কেউ বলেন, এ শব্দটি ইসমে জমা তার বহুবচন رُكُوْبٌ ও اَرْكُبٌ।

تَوَاعَدْتُّمْ : সীগাহ جمع مذكرحاضر বহছ اثبات فعل ماضى معروف বাব تَفَاعُلٌ মাসদার اَلتَّوَاعُدُ মূলবর্ণ (و - ع - د) জিনস مثال واوى অর্থ–পরস্পরে অঙ্গীকারাবদ্ধ হওয়া।

اَرٰىكَ : সীগাহ واحدمذكر غائب বহছ اثبات فعل ماضى معروف বা اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِرَائَةُ মূলবর্ণ (ر - أ - ى) জিনস মুরাক্কাব ناقص يائى ও مهموز عين অর্থ–দেখানো, প্রদর্শন করা। "ك" ضميرمنصوب متصل।

فَشِلْتُمْ : সীগাহ جمع مذكرحاضر বহছ اثبات فعل ماضى معروف বাব سَمِعَ মাসদার اَلْفَشَلُ মূলবর্ণ (ف - ش - ل) জিনস صحيح অর্থ– ব্যর্থ হওয়া, কাপুরুষ হওয়া।

تَنَازَعْتُمْ : সীগাহ جمع مذكرحاضر বহছ اثبات فعل ماضى معروف বাব تَفَاعُلٌ মাসদার اَلتَّنَازُعُ মূলবর্ণ (ن - ز - ع) জিনস صحيح অর্থ–বিরোধ সৃষ্টি করা, পরস্পর বিবাদ ঘটানো।

www.almodina.com

অনুবাদ	আয়াত
অনুবাদ : (৪৬) আর আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করতে থাকবে এবং আপসে বিবাদ করবে না, অন্যথায় সাহসহারা হয়ে পড়বে এবং তোমাদের প্রভাব বিনষ্ট হয়ে যাবে। আর ধৈর্যধারণ কর, নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে আছেন।	وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَلَا تَنَازَعُوْا فَتَفْشَلُوْا وَتَذْهَبَ رِيْحُكُمْ وَاصْبِرُوْا ؕ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ (٤٦)
(৪৭) আর সেই সকল লোকদের ন্যায় হয়ো না যারা নিজেদের গৃহসমূহ হতে সদর্পে এবং লোকদেরকে [স্বীয় শক্তি] প্রদর্শন করতে বের হয়েছিল এবং লোকদেরকে আল্লাহর পথ হতে বিরত রাখছিল, আর আল্লাহ তাদের কার্যসমূহকে বেষ্টন করে আছেন।	وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ خَرَجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَّرِئَآءَ النَّاسِ وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا يَعْمَلُوْنَ مُحِيْطٌ (٤٧)
(৪৮) আর সেই সময়টি তাদের নিকট বর্ণনা করুন, যখন শয়তান তাদেরকে তাদের কার্যসমূহ সুশোভন করে দেখিয়েছিল, আর বলেছিল, আজ কেউই তোমাদের উপর বিজয়ী হতে পারবে না, আর আমি তোমাদের সহায়ক আছি। অনন্তর যখন উভয়দল পরস্পর সম্মুখীন হলো তখন সে পশ্চাৎপদ হয়ে পলায়ন করল এবং এই বলল যে, তোমাদের সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই, আমি সে সকল বস্তু দেখছি যা তোমাদের দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না, আমি তো আল্লাহকে ভয় করি, আর আল্লাহ কঠোর শাস্তি প্রদানকারী।	وَاِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ اَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَاِنِّيْ جَارٌ لَّكُمْ ۚ فَلَمَّا تَرَآءَتِ الْفِئَتٰنِ نَكَصَ عَلٰى عَقِبَيْهِ وَقَالَ اِنِّيْ بَرِيْٓءٌ مِّنْكُمْ اِنِّيْٓ اَرٰى مَا لَا تَرَوْنَ اِنِّيْٓ اَخَافُ اللّٰهَ ؕ وَاللّٰهُ شَدِيْدُ الْعِقَابِ (٤٨)

শাব্দিক অনুবাদ

(৪৬) وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ আর আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করতে থাকবে। وَلَا تَنَازَعُوْا এবং আপসে বিবাদ করবে না। فَتَفْشَلُوْا অন্যথায় সাহসহারা হয়ে পড়বে وَتَذْهَبَ رِيْحُكُمْ এবং তোমাদের প্রভাব বিনষ্ট হয়ে যাবে। وَاصْبِرُوْا আর ধৈর্যধারণ কর اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে আছেন।

(৪৭) وَلَا تَكُوْنُوْا আর তোমরা হয়ো না। كَالَّذِيْنَ خَرَجُوْا সেই সকল লোকদের ন্যায় যারা বের হয়েছিল مِنْ دِيَارِهِمْ নিজেদের গৃহসমূহ হতে। بَطَرًا সদর্পে وَرِئَآءَ النَّاسِ এবং লোকদেরকে [স্বীয় শক্তি] প্রদর্শন করতে وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ এবং লোকদেরকে আল্লাহর পথ হতে বিরত রাখছিল وَاللّٰهُ بِمَا يَعْمَلُوْنَ مُحِيْطٌ আর আল্লাহ তাদের কার্যসমূহকে বেষ্টন করে আছেন।

(৪৮) وَاِذْ زَيَّنَ لَهُمُ আর সেই সময়টি তাদের নিকট বর্ণনা করুন, যখন তাদেরকে সুশোভন করে দেখিয়েছিল الشَّيْطٰنُ শয়তান اَعْمَالَهُمْ তাদের কার্যসমূহ وَقَالَ আর বলেছিল لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ আজ কেউই তোমাদের উপর বিজয়ী হতে পারবে না وَاِنِّيْ جَارٌ لَّكُمْ আর আমি তোমাদের সহায়ক আছি فَلَمَّا تَرَآءَتِ الْفِئَتٰنِ অনন্তর যখন উভয়দল পরস্পর সম্মুখীন হলো نَكَصَ عَلٰى عَقِبَيْهِ তখন সে পশ্চাৎপদ হয়ে পলায়ন করল وَقَالَ এবং এই বলল যে, اِنِّيْ بَرِيْٓءٌ مِّنْكُمْ তোমাদের সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই اِنِّيْٓ اَرٰى مَا لَا تَرَوْنَ আমি সে সকল বস্তু দেখছি যা তোমাদের দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না اِنِّيْٓ اَخَافُ اللّٰهَ আমি তো আল্লাহকে ভয় করি وَاللّٰهُ شَدِيْدُ الْعِقَابِ আর আল্লাহ কঠোর শাস্তি প্রদানকারী।

إِذْ يَقُولُ الْمُنٰفِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ غَرَّ هٰٓؤُلَآءِ دِينُهُمْ ۗ وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَإِنَّ اللّٰهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٤٩)	**অনুবাদ :** (৪৯) আর সেই সময়টিও স্মরণীয় যখন মুনাফিকরা এবং যাদের অন্তরে পীড়া ছিল তারা এরূপ বলছিল যে, এসব লোকদেরকে তাদের ধর্ম ভ্রমে ফেলে রেখেছে, আর যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার উপর নির্ভর করে, তবে নিশ্চয় আল্লাহ জবরদস্ত হেকমতওয়ালা।
وَلَوْ تَرٰٓى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا ۙ الْمَلٰٓئِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ ۚ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ (٥٠)	(৫০) আর যদি আপনি দেখতেন, যখন ফেরেশতাগণ এই কাফেরদের জান কবজ করতে থাকে, [এবং] তাদের চেহারায় ও তাদের পিঠে মারতে থাকে এবং এই বলতে থাকে যে, অগ্নির শাস্তি ভোগ কর।
ذٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ (٥١)	(৫১) এই শাস্তি সে সকল কর্মের দরুন যা তোমরা স্বহস্তে কুড়িয়েছ, আর এটা সুনিশ্চিত যে, আল্লাহ তা'আলা বান্দাদের উপর অত্যাচারী নন।
كَدَأْبِ اٰلِ فِرْعَوْنَ ۙ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۗ كَفَرُوا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ فَأَخَذَهُمُ اللّٰهُ بِذُنُوبِهِمْ ۗ إِنَّ اللّٰهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٥٢)	(৫২) তাদের অবস্থা এরূপ যেরূপ ফেরাউন সম্প্রদায় এবং তার পূর্ববর্তী লোকদের অবস্থা ছিল, তারা আল্লাহ তা'আলার আয়াতসমূহকে অমান্য করল, সুতরাং আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে পাপের দরুন পাকড়াও করলেন। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা অতি ক্ষমতাবান, কঠোর শাস্তি প্রদানকারী।

শাব্দিক অনুবাদ

(৪৯) إِذْ يَقُولُ الْمُنٰفِقُونَ আর সেই সময়টিও স্মরণীয় যখন মুনাফিকরা وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ এবং যাদের অন্তরে পীড়া ছিল তারা غَرَّ هٰٓؤُلَآءِ دِينُهُمْ এরূপ বলছিল যে, এসব লোকদেরকে তাদের ধর্ম ভ্রমে ফেলে রেখেছে وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ আর যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার উপর নির্ভর করে فَإِنَّ اللّٰهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ তবে নিশ্চয় আল্লাহ জবরদস্ত হেকমতওয়ালা।

(৫০) وَلَوْ تَرٰٓى আর যদি আপনি দেখতেন إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا যখন ফেরেশতাগণ এই কাফেরদের জান কবজ করতে থাকে [এবং] يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ তাদের চেহারায় ও তাদের পিঠে মারতে থাকে وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ এবং এই বলতে থাকে যে, অগ্নির শাস্তি ভোগ কর।

(৫১) ذٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ এই শাস্তি সে সকল কর্মের দরুন যা তোমরা স্বহস্তে কুড়িয়েছ وَأَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ আর এটা সুনিশ্চিত যে, আল্লাহ তা'আলা বান্দাদের উপর অত্যাচারী নন।

(৫২) كَدَأْبِ اٰلِ فِرْعَوْنَ তাদের অবস্থা এরূপ যেরূপ ফেরাউন সম্প্রদায় وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ এবং তার পূর্ববর্তী লোকদের অবস্থা ছিল كَفَرُوا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ তারা আল্লাহ তা'আলার আয়াতসমূহকে অমান্য করল فَأَخَذَهُمُ اللّٰهُ সুতরাং আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে পাকড়াও করলেন بِذُنُوبِهِمْ তাদের পাপের দরুন إِنَّ اللّٰهَ قَوِيٌّ নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা অতি ক্ষমতাবান شَدِيدُ الْعِقَابِ কঠোর শাস্তি প্রদানকারী।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(৪৭) قوله وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** আলোচ্য আয়াত আবূ জাহল ও তার সাথিদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। ঘটনাপ্রবাহ হচ্ছে যে, এরা আবূ সুফিয়ানের বাণিজ্য কাফেলাকে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে চিত্র তারকা বাদ্য যন্ত্রসহ বের হয়ে জুহফায় অবস্থান করে। তখন আবূ জাহলের মিত্র খেফাফে কেনানী হাদিয়া দিয়ে তার পুত্রকে আবূ জাহলের নিকট পাঠায় এবং বলে দিল যে, তুমি সাহায্য কামনা কর যদি তাহলে আমার গোত্রের লোকজন নিয়ে আমি তোমাকে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে আসব। জবাবে আবূ জাহল বলল যে, মুহাম্মদের ধারণা মতে আমরা যদি আল্লাহর মোকাবিলায় যুদ্ধ করতে এসে থাকি, তাহলে আল্লাহর সাথে মোকাবিলা করার সামর্থ্য আমাদের নেই। আর একান্তভাবে যদি মানুষের মোকাবিলায়ই এসে থাকি, তাহলে আমাদের সাথে যথেষ্ট জনবল রয়েছে। আল্লাহর কসম আমরা বদরে না গিয়ে মুহাম্মদের সাথে যুদ্ধ করা থেকে ফিরে যাব না। আমরা সেখানে মদপান করব এবং শিল্পীরা আমাদের সামনে ঝুমুর ঝুমুর নাচ গান করবে। বদর আরবের একটি কেন্দ্রীয় বাজার। আমাদের অভিযান সম্পর্কে আরবরা জানতে পারবে। ফলে চিরকাল আমাদেরকে ধন্যবাদ দিয়ে যাবে। তাদের এ চরিত্র সম্পর্কে বর্ণনা দিয়ে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করে মুমিনদেরকে এমন দুশ্চরিত্রতা থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেন। –[বাহরে মুহীত–৫০০/৪]

(৪৮) قوله وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ أَعْمَالَهُمْ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** ইমাম ইবনে জারীর (র.) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর রেওয়ায়েতক্রমে উদ্ধৃত করেছেন যে, মক্কার কুরাইশ বাহিনী যখন মুসলমানদের সাথে মোকাবিলার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়, তখন তাদের মনে এমন এক আশঙ্কা চেপেছিল যে, আমাদের প্রতিবেশী বনূ বকর গোত্রও আমাদের শত্রু আমরা মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করতে চলে গেলে সে সুযোগে এই শত্রুগোত্র না আবার আমাদের বাড়ি ঘর এবং নারী শিশুদের উপর হামলা করে বসে। সুতরাং কাফেলার নেতা আবূ সুফিয়ানের ভয়ার্ত আবেদনের প্রেক্ষিতে প্রস্তুতি নিয়ে বাড়ি থেকে তারা বেরিয়ে গেল বটে, কিন্তু মনের এ আশঙ্কা তাদের পায়ের বেড়ি হয়ে রইল। এমন সময়ে শয়তান সোরাকা ইবনে মালেকের রূপে এমনভাবে সামনে এসে উপস্থিত হলো যে, তাঁর হাতে রয়েছে একটি পতাকা আর তার সাথে রয়েছে বীর সৈনিকদের একটি খণ্ড দল। সোরাকা ইবনে মালেক ছিল সে এলাকার এবং গোত্রের বড় সর্দার। কুরাইশদের মনে তারই আক্রমণের আশঙ্কা ছিল। সে এগিয়ে গিয়ে কুরাইশ জোওয়ানদের বাহিনীকে লক্ষ্য করে এক ভাষণ দিয়ে বসল এবং দু-ভাবে তাদেরকে প্রতারিত করল। **প্রথমত** لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ অর্থাৎ আজকের দিনে এমন কেউ নেই যারা তোমাদের উপর জয়লাভ করতে পারে। এর উদ্দেশ্য ছিল এ কথা বুঝিয়ে দেওয়া যে, আমি তোমাদের প্রতিপক্ষ সম্পর্কেও অবগত রয়েছি এবং তোমাদের শক্তি-সামর্থ্য ও সংখ্যাধিক্য তো চোখেই দেখছি, কাজেই তোমাদের এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিশ্চয়তা দিচ্ছি যে, তোমরা নিশ্চিন্তে এগিয়ে যাও, তোমরাই প্রবল থাকবে। তোমাদের মোকাবিলায় বিজয় অর্জন করার মতো কেউ নেই। **দ্বিতীয়ত** وَإِنِّي جَارٌ لَّكُمْ অর্থাৎ বনূ বকর প্রভৃতি গোত্রের ব্যাপারে তোমাদের মনে যে আশঙ্কা চেপে আছে যে, তোমাদের অবর্তমানে তারা মক্কা আক্রমণ করে বসবে, তার দায়দায়িত্ব নিয়ে নিচ্ছি যে, এমনটি হবে না; আমি তোমাদের সমর্থনে রয়েছি। মক্কার কুরাইশরা সোরাকা ইবনে মালেক এবং তার বিরাট ব্যক্তিত্ব ও প্রভাব প্রতিপত্তি সম্পর্কে পূর্ব থেকে অবগত ছিল। কাজেই তার বক্তব্য শোনামাত্র তা তাদের মনে বসে গেল এবং বনূ বকর গোত্রের আক্রমণাশঙ্কা মুক্ত হয়ে মুসলমানদের মোকাবিলায় উদ্বুদ্ধ হলো। এ দ্বিবিধ প্রতারণার মাধ্যমে শয়তান তাদেরকে নিজেদের বধ্যভূমির দিকে দাবড়ে দিল। কিন্তু فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتٰنِ نَكَصَ عَلٰى عَقِبَيْهِ অর্থাৎ যখন মক্কার মুশরিক ও মুসলমানদের উভয় দল (বদরপ্রাঙ্গণে) সম্মুখ সমরে লিপ্ত হলো, তখন শয়তান পেছন ফিরে পালিয়ে গেল। বদর যুদ্ধে যেহেতু মক্কার মুশরিকদের সহায়তায় একটি শয়তানি বাহিনীও এসে উপস্থিত হয়েছিল, কাজেই আল্লাহ তা'আলা তাদের মোকাবিলায় হযরত জিবরাঈল ও মীকাঈল (আ.)-এর নেতৃত্বে ফেরেশতাদের বাহিনী পাঠিয়ে দিলেন। ইমাম ইবনে জারীর হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর রেওয়ায়েতের উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন যে, শয়তান যখন সোরাকা ইবনে মালেকের রূপে স্বীয় বাহিনীর নেতৃত্ব দিচ্ছিল তখন সে জিবরাঈল আমীন এবং তাঁর সাথি ফেরেশতা বাহিনী দেখে আতঙ্কিত হয়ে পড়ল। সে সময় তার হাত এক কুরাইশী যুবক হারেছ ইবনে ইহতিশামের হাতে ধরা ছিল। সঙ্গে সঙ্গে সে তার হাত ছাড়িয়ে নিয়ে পালাতে চাইল। হারেছ তিরস্কার করে বলল, এ কি করছ। তখন সে বুকের উপর এক প্রবল ঘা মেরে হারেছকে ফেলে দিল এবং নিজের বাহিনী নিয়ে পালিয়ে গেল। হারেছ তাকে সোরাকাহ মনে করে বলল, হে আরব সর্দার! সোরাকাহ, তুমি তো বলেছিলে, আমি তোমাদের

www.almodina.com

সমর্থনে রয়েছি। অথচ ঠিক যুদ্ধের ময়দানে এমন আচরণ করছ। তখন শয়তান সোরাকাহ'র বেশেই উত্তর দিল إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ অর্থাৎ আমি তোমাদের সাথে কৃত চুক্তি থেকে মুক্ত হয়ে যাচ্ছি। কারণ আমি এমন জিনিস দেখছি যা তোমাদের চোখ দেখতে পায় না অর্থাৎ ফেরেশতা বাহিনী। তাছাড়া আমি আল্লাহকে ভয় করি। কাজেই তোমাদের সঙ্গ ত্যাগ করে চলে যাচ্ছি।

যুদ্ধ-জেহাদে কৃতকার্যতা লাভের জন্য কুরআনের হেদায়েত : প্রথম দুই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মুসলমানগণকে যুদ্ধক্ষেত্র এবং শত্রুর মোকাবিলার জন্য একটি বিশেষ হেদায়েতনামা দান করেছেন, যা তাদের জন্য পার্থিব জীবনে কৃতকার্যতা এবং পরকালীন নাজাতের আমোঘ ব্যবস্থা। প্রাথমিক যুগের যুদ্ধসমূহে মুসলমানদের কৃতকার্যতা ও বিজয়ের রহস্যও এতেই নিহিত ছিল। আর তা হলো কয়েকটি বিষয়।

প্রথমত দৃঢ়তা: অর্থাৎ দৃঢ়তা অবলম্বন করা ও স্থির অটল থাকা। মনের দৃঢ়তা ও সংকল্পের অটলতা উভয়টিই এর অন্তর্ভুক্ত। মুমিন ও কাফের নির্বিশেষে সবাই জানে, উপলব্ধি করে এবং পৃথিবীর প্রতিটি জাতি নিজেদের যুদ্ধে এরই উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করে থাকে। কারণ নিজেদের লোকদের কাছে এ বিষয়টি গোপন নেই যে, সমরক্ষেত্রে সর্বপ্রথম এবং সবচেয়ে কার্যকর অস্ত্রই হচ্ছে মন ও পদক্ষেপের দৃঢ়তা। এর অবর্তমানে অন্যান্য সমস্ত উপায়-উপকরণই অকোজো ও বেকার।

দ্বিতীয়ত আল্লাহর জিকির : এটি সেই বিশেষ ধরনের আধ্যাত্মিক হাতিয়ার যার ব্যাপারে ঈমানদারগণ ব্যতীত সাধারণ পৃথিবী গাফেল। সমগ্র পৃথিবী যুদ্ধের জন্য সর্বোত্তম অস্ত্রশস্ত্র, আধুনিকতম সাজসরঞ্জাম ও উপায়-উপকরণ সংগ্রহ করার জন্য এবং সেনাবাহনীকে সুদৃঢ় রাখার জন্য পরিপূর্ণ চেষ্টা নেয়। কিন্তু মুসলমানদের আধ্যাত্মিক ও পার্থিব এ হাতিয়ার সম্পর্কে তারা অপরিচিত ও অজ্ঞ। সে কারণেই এই হেদায়েত, এই নির্দেশনামা। এই নির্দেশনামা মোতাবেক যে কোনো অঙ্গনে যে কোনো জাতির সাথে মোকাবিলা হয়েছে, প্রতিপক্ষের সমস্ত শক্তি ও চেষ্টা-তদবীর পুরোপুরি নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছে। আল্লাহর জিকিরের নিজস্বভাবে যে বরকত ও কল্যাণ রয়েছে তা তো যথাস্থানে আছেই, তদুপরি এটাও একটি বাস্তব সত্য যে, দৃঢ়তার জন্যও এর চেয়ে পরিক্ষিত কোনো ব্যবস্থা নেই। আল্লাহকে স্মরণ করা এবং তাতে বিশ্বাস রাখা এমন এক বিদ্যুৎ শক্তি যা একজন দুর্বলতর মানুষকেও পাহাড়ের সাথে মোকাবিলা করতে উদ্বুদ্ধ করে তোলে। বিপদ যত কঠিনই হোক না কেন, আল্লাহর স্মরণ সে সমস্ত হাওয়ায় উড়িয়ে দেয় এবং মানুষের মন-মানসকে বলিষ্ঠ ও পদক্ষেপকে সুদৃঢ় করে রাখে।

কুরআনে কারীম এহেন শঙ্কাপূর্ণ পরিবেশে মুসলমানদেরকে আল্লাহকে স্মরণ করার শিক্ষা দিয়েছে, তাও আবার অধিক পরিমাণে স্মরণ করার তাকিদসহ।

এখানে এ বিষয়টিও লক্ষণীয় যে, সমগ্র কুরআনে আল্লাহর জিকির ব্যতীত অন্য কোনো ইবাদতই এত অধিক পরিমাণে করার হুকুম কোথাও উল্লেখ নেই। صَلٰوةً كَثِيْرَةً বা صِيَامًا كَثِيْرًا কোথাও উল্লেখ নেই তার কারণ এই যে, আল্লাহর জিকির তথা স্মরণ এমন সহজ একটি ইবাদত যে, তাতে না তেমন কোনো বিরাট সময় ব্যয় হয়, না পরিশ্রম এবং নাইবা অন্য কোনো কাজের কোনো রকম ব্যাঘাত ঘটে। তদুপরি আল্লাহ রাব্বুল আলামীন একান্ত অনুগ্রহ করে আল্লহর জিকিরের জন্য কোনো শর্তাশর্ত, কোনো বাধ্যবাধকতা, অজু কিংবা পবিত্রতা পোশাকাশাক এবং বেলামখী হওয়া প্রভৃতি কোনো নিয়মই আরোপ করেননি। যে কোনো মানুষ যে কোনো অবস্থায় অজুর সাথে বিনা অজুতে, দাঁড়িয়ে বসে, শুয়ে যেভাবে উচ্ছা আল্লাহকে স্মরণ করতে পারে। এর পরেও যদি ইমাম জাযারীর গবেষণার বিষয়টি তুলে ধরা যায়, যা তিনি হিসনে হাসীন গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, আল্লাহর জিকির শুধু মুখে কিংবা মনে মনে জিকির করাকেই বল হয় না; বরং প্রতিটি জায়েজ বা বৈধ কাজ আল্লাহ রাসূলের আনুগত্যের আওতায় থেকে করা হলে সে সে সবই যিকরুল্লাহর অন্তর্ভুক্ত তবে এই পর্যালোচনা অনুযায়ী যিকরুল্লাহর মর্ম এতে ব্যাপক ও সহজ হয়ে যায় যে, নিদ্রিত মানুষকেও যাকের বলা যেতে পারে। যেমন কোনো কোনো রেওয়ায়েতে উল্লেখ রয়েছে نَوْمُ الْعَالِمِ عِبَادَةٌ 'আলেম ব্যক্তির ঘুমও ইবাদতেরই অন্তর্ভুক্ত'। কারণ যে আলেম তার ইলমের চাহিদা অনুযায়ী আমল করেন তার জন্য তাঁর নিদ্রা, তাঁর জাগরণ সবই আল্লাহর আনুগত্যের আওতাভুক্ত হওয়া অপরিহার্য।

যুদ্ধক্ষেত্রে আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণ করার নির্দেশটিতে যদিও বাহ্যিক দৃষ্টিতে মুজাহেদীনের জন্য একটি কাজ বাড়িয়ে দেওয়া হলো বলে মনে হয় যা স্বভাবতই কষ্ট ও পরিশ্রমসাধ্য হবে, কিন্তু আল্লাহর জিকিরের এটা এক বিস্ময়কর

www.almodina.com

বৈশিষ্ট্য যে, তাতে কখনও কোনো পরিশ্রম তো হয়ই না; বরং এতে একটা সুখের অনুভূতি, একটি শক্তি এবং একটা পৃথক স্বাদ অনুভূত হতে থাকে যা মানুষের কাজ কর্মে অধিকতর সহায়ক হয়। তাছাড়া এমনিতেও কষ্ট পরিশ্রমের কাজ যারা করে থাকে তাদের অভ্যাস থাকে কোনো একটা বাক্য কিংবা কোনো গানের কলি কাজের ফাঁকেও গুনগুনিয়ে পড়তে বা গাইতে থাকার। সুতরাং কুরআনে কারীম মুসলমানগণকে তার একটি উত্তম বিকল্প দিয়েছে যা হাজারো উপকারিতা ও তাৎপর্যমণ্ডিত। সে কারণেই আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে : لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ অর্থাৎ তোমরা যদি দৃঢ়তা এবং আল্লাহর জিকিরের দুটি গোপন রহস্য স্মরণ রাখ এবং কর্মক্ষেত্রে সেগুলো প্রয়োগ কর, তবে বিজয় ও কৃতকার্যতা তোমাদেরই হবে। যুদ্ধক্ষেত্রের একটি জিকির তো হলো তাই, যা সাধারণত 'না'রায়ে তাকবীর' শ্লোগানের মাধ্যমে করা হয়। এছাড়া আল্লাহ তা'আলার উপর ভরসার খেয়াল রাখা, তাঁরই উপর নির্ভর করতে থাকা, তাঁর কথা মনে রাখা প্রভৃতি সবই যিকিরুল্লাহ' –এর অন্তর্ভুক্ত।

৪৬ তম আয়াতে তৃতীয় আরেকটি বিষয়ের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে– وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ অর্থাৎ "আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যকে অপরিহার্যভাবে পালন কর"। কারণ আল্লাহর সাহায্য সমর্থন শুধুমাত্র তাঁর আনুগত্যের মাধ্যমেই অর্জন করা যেতে পারে। পক্ষান্তরে পাপকর্ম ও আনুগত্যহীনতা আল্লাহ তা'আলার অসন্তুষ্টি ও বঞ্চনার কারণ হয়ে থাকে। এভাবে যুদ্ধক্ষেত্রের জন্য কুরআনি হেদায়েতনামার তিনটি ধারা সাব্যস্ত হয়ে যায়। তা হলো দৃঢ়চিত্ততা, আল্লাহর জিকির ও আনুগত্য। অতঃপর وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا আয়াতে ক্ষতিকর দিকগুলোর উপর আলোকপাত করে তা থেকে বেঁচে থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তাই বলা হয়েছে وَلَا تَنَازَعُوا অর্থাৎ 'তোমরা পারস্পরিক বিবাদ-বিসংবাদে লিপ্ত হয়ো না।' তাহলে তোমাদের মাঝে সাহসহীনতা বিস্তার লাভ করবে এবং তোমাদের মনোবল ভেঙ্গে যাবে, তোমরা হীনবল হয়ে পড়বে।

তারপর وَاصْبِرُوا (অবশ্য অবশ্যই ধৈর্যধারণ কর।) বাক্যের বিন্যাসধারায় প্রতীয়মান হয় যে, এতে বিবাদ-বিসংবাদ থেকে রক্ষা পাবার একান্ত কার্যকর ব্যবস্থা বাতলে দেওয়া হয়েছে। এর বিশ্লেষণ এই যে, কোনো দলের মত ও উদ্দেশ্যে যত ঐক্যই থাক না কেন, কিন্তু ব্যক্তি মানুষের স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য অবশ্যই বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। তাছাড়া কোনো উদ্দেশ্য লাভের প্রচেষ্টার ক্ষেত্রেও অভিজ্ঞতা বুদ্ধিজীবীদের মতপার্থক্য থাকা অপরিহার্য। কাজেই অন্যের সাথে চলতে গিয়ে এবং অন্যকে সঙ্গে রাখতে গিয়ে মানুষকে স্বভাব বিরুদ্ধ বিষয়েও ধৈর্যধারণ ও সহনশীলতার মনোভাব গড়ে তোলা এবং নিজের মতের উপর এত অধিক দৃঢ়তা ও অনমনীয়তা না থাকা উচিত যা গৃহীত না হলে ক্ষেপে যায়। এই গুণের অপর নামই হলো 'সবর'। ইদানীং এ কথাটি সবাই জানে এবং বলেও থাকে যে, নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক বিবাদ-বিসংবাদ সৃষ্টি করা অত্যন্ত মন্দ কাজ। কিন্তু তা থেকে বেঁচে থাকার মূল কথা 'সবর' অবলম্বনে অভ্যস্ত হওয়া এবং নিজের মত মানাবার ফিকিরে ক্ষেপে না যাওয়ার গুণটি অতি অল্প লোকের মাঝেই পাওয়া যায়। সে কারণেই ঐক্য ও একতার যাবতীয় ওয়াজ নসিহতই নিষ্ফল হয়ে যায়।

এখানে এ বিষয়টিও লক্ষণীয় যে, এক্ষেত্রে কুরআনে কারীম وَلَا تَنَازَعُوا বলেছে। অর্থাৎ পারস্পরিক বিবাদ-দ্বন্দ্ব থেকে বিরত করেছে, মতের পার্থক্য কিংবা তা প্রকাশ করতে বাধা দেয়নি। যে ক্ষেত্রে মতপার্থক্যের সাথে সাথে নিজের মত অন্যকে মানাবার প্রেরণা কার্যকর থাকে তাকেই বলা হয় বিবাদ ও বিসংবাদ। আর এটিই হলো সে প্রেরণা যাকে কুরআনে কারীম وَاصْبِرُوا শব্দে ব্যক্ত করেছে এবং সবশেষে 'সবর' অবলম্বনের এক বিরাট উপকারিতার কথা বলে এর তিক্ততা দূর করে দিয়েছে যে, إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ (যারা সবর তথা ধৈর্যধারণ করে আল্লাহ তাদের সঙ্গে রয়েছেন।) এটি এমন এক মহাসম্পদ যে, এটা পরকালের যাবতীয় সম্পদ এর মোকাবিলায় নগণ্য।

ইমাম ইবনে জারীর হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর রেওয়ায়েতক্রমে উদ্ধৃত করেছেন যে, মক্কার কুরাইশ বাহিনী যখন মুসলমানদের সাথে মোকাবিলার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়, তখন তাদের মনে এমন এক আশঙ্কা চেপে ছিল যে, আমাদের প্রতিবেশী বনূ বকর গোত্রও আমদের শত্রু, আমরা মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করতে চলে গেলে সেই সুযোগে এই শত্রুগোত্র না আবার আমদের বাড়ি-ঘর এবং নারী-শিশুদের উপর হামলা করে বসে। সুতরাং কাফেলার নেতা আবূ সুফিয়ানের ভয়ার্ত আবেদনের প্রেক্ষিতে প্রস্তুতি নিয়ে বাড়ি থেকে তারা বেরিয়ে গেল বটে, কিন্তু মনের এ আশঙ্কা তাদের পায়ের বেড়ি হয়ে রইল। এমনি সময়ে শয়তান সুরাকা ইবনে মালেকের রূপে এমনভাবে সামনে এসে উপস্থিত হলো যে, তাঁর হাতে রয়েছে একটি পতাকা আর তাঁর সাথে রয়েছে বীর সৈনিকদের একটি খণ্ড দল। সুরাকা ইবনে মালেক ছিল সে এলাকার এবং গোত্রের বড় সর্দার। কুরাইশদের মনে তারই আক্রমণের আশঙ্কা ছিল। সে এগিয়ে গিয়ে কুরাইশ

জোওয়ানদের বাহিনীকে লক্ষ্য করে এক ভাষণ দিয়ে বসল এবং দুভাবে তাদেরকে প্রতারিত করল। **প্রথমত** لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ অর্থাৎ 'আজকের দিনে এমন কেউ নেই যারা তোমাদের উপর জয়লাভ করতে পারে। -এর উদ্দেশ্য ছিল একথা বুঝিয়ে দেওয়া যে, আমি তোমাদের প্রতিপক্ষ সম্পর্কেও অবগত রয়েছি এবং তোমাদের শক্তি-সামর্থ্য ও সংখ্যাধিক্য তো চোখেই দেখছি, কাজেই তোমাদের এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিশ্চয়তা দিচ্ছি যে, তোমরা নিশ্চিন্তে এগিয়ে যাও, তোমরাই প্রবল থাকবে, তোমাদের মোকাবিলায় বিজয় অর্জন করবে, এমন কেউ নেই।

দ্বিতীয়ত وَإِنِّي جَارٌ لَّكُمْ অর্থাৎ বনূ বকর প্রভৃতি গোত্রের ব্যাপারে তোমাদের মনে যে আশঙ্কা চেপে আছে যে, তোমাদের অবর্তমানে তারা মক্কা আক্রমণ করে বসবে, তার দায়দায়িত্ব নিচ্ছি যে, এমনটি হবে না। আমি তোমাদের সমর্থনেই রয়েছি। মক্কার কুরাইশরা সুরাকা ইবনে মালেক এবং তার বিরাট ব্যক্তিত্ব ও প্রভাব প্রতিপত্তি সম্পর্কে পূর্ব থেকেই অবগত ছিল। কাজেই তার বক্তব্য শোনামাত্র তা তাদের মনে বসে গেল এবং বনূ বকর গোত্রের আক্রমণাশঙ্কা মুক্ত হয়ে মুসলমানদের মোকাবিলায় উদ্বুদ্ধ হলো।

এই দ্বিবিধ প্রতারণার মাধ্যমে শয়তান তাদেরকে নিজেদের বধ্যভূমির দিকে দাবড়ে দিল। কিন্তু فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ অর্থাৎ যখন মক্কার মুশরিক ও মুসলমানদের উভয় দল (বদর প্রাঙ্গণে) সম্মুখ সমরে লিপ্ত হলো, তখন শয়তান পেছন ফিরে পলিয়ে গেল।

বদর যুদ্ধে যেহেতু মক্কার মুশরিকদের সহায়তায় একটি শয়তানি বহিনীও এসে উপস্থিত হয়েছিল, কাজেই আল্লাহ তা'আলা তাদের মোকাবিলায় হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর নেতৃত্বে ফেরেশতাদের বাহিনী পাঠিয়ে দিলেন। ইমাম ইবনে জারীর হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর রেওয়ায়েতের উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন যে, শয়তান যখন সুরাকা ইবনে মালেকের রূপে স্বীয় বাহিনীর নেতৃত্ব দিচ্ছিল, তখন সে জিবরাঈল আমীন এবং তাঁর সাথি ফেরেশতা বাহিনী দেখে আতঙ্কিত হয়ে পড়ল। সে সময় তার হাত এক কুরাইশী যুবক হারেছ ইবনে হিশামের হাতে ধরা ছিল। সঙ্গে সঙ্গে সে তার হাত ছাড়িয়ে নিয়ে পালাতে চাইল। হারেছ তিরস্কার করে বলল, এ কি করছ। তখন সে বুকের উপর এক প্রবল ঘা মেরে হারেছকে ফেলে দিল এবং নিজের বাহনী নিয়ে পালিয়ে গেল। হারেছ তাকে সুরাকাহ মনে করে বলল, হে আরব সর্দার সুরাকাহ তুমি তো বলেছিলে, আমি তোমাদের সমর্থনে রয়েছি। অথচ ঠিক যুদ্ধের ময়দানে এমন আচরণ করছ। তখন শয়তান সুরাকার বেশেই উত্তর দিল. إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ অর্থাৎ আমি তোমাদের সাথে কৃত চুক্তি থেকে মুক্ত হয়ে যাচ্ছি। কারণ আমি এমন জিনিস দেখছি যা তোমাদের চোখ দেখতে পায় না অর্থাৎ ফেরেশতা বাহিনী। তাছাড়া আমি আল্লাহকে ভয় করি। কাজেই তোমাদের সঙ্গ ত্যাগ করে চলে যাচ্ছি।

শয়তান যখন ফেরেশতা বাহিনী দেখতে পেল এবং সে যেহেতু তাদের শক্তি সম্পর্কে অবহিত ছিল, তখন বুঝল যে, এবার আর পরিত্রাণ নেই। তবে তার বাক্য 'আমি আল্লাহকে ভয় করি।' সম্পর্কে তাফসীরশাস্ত্রেই ইমাম কাতাদাহ (রা.) বলেন যে, কথাটি সে মিথ্যা বলেছিল । সত্যি সত্যিই যদি সে আল্লাহকে ভয় করত, তাহলে নাফরমানি করবে কেন? কিন্তু যেহেতু আল্লাহ তা'আলার পরিপূর্ণ কুদরত তথা মহাক্ষমতা এবং কঠিন আজাব সম্পর্কে ভালোভাবেই অবগত, কাজেই ভয় না করার কোনো কারণ থাকতে পারে না। তবে ঈমান ও আনুগত্য ছাড়া শুধু ভয় করায় কোনো লাভ নেই।

শয়তানের প্রতারণা থেকে বাঁচার উপায় : আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত ঘটনা থেকে কয়েকটি বিষয় জানা যাচ্ছে– ১. শয়তান মানুষের জাতশক্র, তাদের ক্ষতি সাধনের জন্য সে নানা রকম কলা-কৌশল ও চাল-ছলনার আশ্রয় নেয় এবং বিভিন্ন রূপ বদলাতে থাকে। কোনো কোনো সময় শুধু মনে ওয়াসওয়াসা সৃষ্টি করে পেরেশান করে তোলে, আবার কখনো সামনাসামনি এসে ধোঁকা দেয়।

(২) শয়তানকে আল্লাহ তা'আলা ক্ষমতা দান করেছেন যে, সে বিভিন্ন রূপে আত্মপ্রকাশ করতে পারে। জনৈক প্রখ্যাত হানাফী ফিকহবিদের গ্রন্থ 'আকামুল মার্জান ফী আহকামিল জানান' -এ বিষয়টি সবিস্তারে প্রমাণ করা হয়েছে। সে কারণেই গবেষক সূফী মনিষীবৃন্দ যারা আধ্যাত্মিক কাশফ ও দর্শনের ক্ষমতা রাখেন তারা মানুষকে এ বিষয়ে সতর্ক করে দিয়েছেন যে, কোনো লোককে দেখেই কিংবা তার কথাবার্তা শুনেই কোনো রকম অনুসন্ধান না করে তার পেছনে চলতে আরম্ভ করা অত্যন্ত আশঙ্কাজনক হয়ে থাকে– এমনকি কাশফ ও ইলহামেও শয়তানের পক্ষ থেকে সংমিশ্রণ হয়ে যেতে পারে।

কৃতকার্যতার জন্য নিষ্ঠাই যথেষ্ট নয়, পথের সরলতাও অপরিহার্য : ৩. যেসব লোক কুফর ও শিরক কিংবা অন্য কোনো অবৈধ কার্যকলাপে লিপ্ত হয়, তার কারণ বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এই হয়ে থাকে যে, শয়তান তাদের দুষ্কর্মকে সুন্দর, প্রশংসনীয়

এবং কল্যাণকর হিসাবে প্রকাশ করে তাদের মন-মস্তিষ্কে ন্যায় ও সত্য এবং প্রকৃত পরিণতি থেকে ফিরিয়ে দেয়। তারা নিজেদের অন্যায়কেই ন্যায় এবং মন্দকেই ভালো মনে করতে শুরু করে। ন্যায়পন্থিদের মতো তারাও নিজেদের অন্যায় অসত্যের জন্য প্রাণ বিসর্জন দিতে তৈরি হয়ে যায়। সেজন্য কুরাইশ বাহিনী এবং তার সর্দার যখন বায়তুল্লাহ থেকে বিদায় নিচ্ছিল তখন বায়তুল্লাহর সামনে এসব শব্দে প্রার্থনা করে বলেছিল– اَللّٰهُمَّ انْصُرْ اَهْدَى الطَّائِفَتَيْنِ অর্থাৎ আয় আল্লাহ! উভয় দলের যেটি অধিকতর সৎপন্থি তারই সাহায্য করো তাকেই বিজয় দান করো। এই অজ্ঞ লোকেরা শয়তানের প্রতারণায় পড়ে নিজেরা নিজেদেরকেই অধিক হেদায়েত প্রাপ্ত এবং ন্যায়পন্থি বলে মনে করত। আর পরিপূর্ণ নিষ্ঠার ও একাগ্রতার সাথে নিজেদের মিথ্যা ও অন্যায়ের সাহায্য ও সমর্থনে জানমাল কোরবান করে দিত।

এতেই প্রতীয়মান হয় যে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমল তথা কার্যকলাপের গতি প্রকৃতি সঠিক না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত শুধুমাত্র নিষ্ঠাই যথেষ্ট নয়।

অতঃপর দ্বিতীয় আয়াতে মুসলমানদের ব্যাপারে মদিনার মুনাফেক ও মক্কার মুশরিকদের একটি যৌথ সংলাপ উদ্ধৃত করা হয়েছে যা তাদের জন্য দুঃখ করেই যেন বলা হয়েছিল। তা হচ্ছে এই غَرَّ هٰؤُلَاءِ دِيْنُهُمْ অর্থাৎ, বদরের ময়দানে মুষ্টিমেয় এই মুসলমানরা যে এহেন বিরাট শক্তিশালী বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়তে এসেছে, তা এই বেচারাদেরকে তাদের দীনই প্রতারণায় ফেলে মৃত্যুর মুখে এনে দাঁড় করিয়েছে। আল্লাহ তা'আলা তাদের উত্তরে বলেছেন– وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَاِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ অর্থাৎ যে লোক আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল ও ভরসা করে, জেনে রাখো! সে কখনও আপমানিত ও অপদস্থ হয় না। কারণ আল্লাহ তা'আলা সব কিছুর উপর পরাক্রমশীল। তাঁর কৌশলের সামনে সবার জ্ঞান-বুদ্ধিই বিকল হয়ে যায়। মর্মার্থ এই যে, তোমরা শুধু বস্তু ও বস্তুজগৎ সম্পর্কেই অবগত এবং তারই উপর নির্ভর কর। কিন্তু সেই গোপন শক্তি সম্পর্কে তোমাদের কোনো খবরই নেই যা বস্তু ও বস্তুজগৎ সম্পর্কেই অবগত এবং তারই উপর নির্ভর কর। কিন্তু সেই গোপন শক্তি সম্পর্কে তোমাদের কোনো খবরই নেই, যা বস্তুজগতের স্রষ্টা আল্লাহ তা'আলার ভাণ্ডারে রয়েছে এবং যা তাঁর উপর ঈমান ও বিশ্বাস স্থাপনকারী লোকদের সঙ্গে থাকে।

ইদানিং কালেও সরল সোজা ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের দেখে তথাকথিত অনেক বিজ্ঞ বুদ্ধিমান বলে থাকে এরা সেকেলে, এদের কিছু বলো না। কিন্তু এদের মধ্যে যদি আল্লাহর উপর পরিপূর্ণ ঈমান ও ভরসা থাকে, তবে এতে তাদের কিছুই অনিষ্ট হতে পারে না।

قوله وَلَوْ تَرٰى اِذْ يَتَوَفَّى الَّذِيْنَ كَفَرُوْا الخ আলোচ্য আয়াতসমূহের পূর্ববর্তী দু'আয়াতে কাফেরদের মৃত্যুকালীন আজাব এবং ফেরেশতাদের সতর্কীকরণের আলোচনা করা হয়েছে। এতে নবী করীম ﷺ-কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে যে, যখন আল্লাহর ফেরেশতাগণ কাফেরদের রূহ কবজ করছিলেন, তাদের মুখে ও পিঠে আঘাত করেছিলেন এবং বলছিলেন যে, আগুনে জ্বলার আযাবের স্বাদ গ্রহণ করত, আপনি যদি সে সময়ে তাদের অবস্থা দেখতেন, তখন আপনি এক ভায়াবহ দৃশ্য দেখতে পেতেন।

তাফসীরশাস্ত্রের ইমামগণের কেউ কেউ এ বিবরণকে সে সমস্ত কুরাইশ কাফেরের অবস্থা বলে সাব্যস্ত করেছেন, যারা বদর যুদ্ধে মুসলমানদের মোকাবিলায় অবতীর্ণ হয়েছিল এবং আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদের সাহায্যের জন্য ফেরেশতা বাহিনী পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। এক্ষেত্রে এর অর্থ হবে এই যে, বদর যুদ্ধে যেসব কাফের সর্দার নিহত হয় তাদের মৃত্যুতে ফেরেশতাদের হাত ছিল। তাঁরা তাদেরকে সামনের দিক দিয়ে তাদের মুখে এবং পেছন দিক থেকে তাদের পিঠে আঘাত করে তাদের হত্যা করেছিলেন আর সেই সঙ্গে আখেরাতের জাহান্নামের আজাব সম্পর্কে তাদের সংবাদ দিয়ে দিচ্ছিলেন।

আর যারা আয়াতের শব্দের ব্যাপকতার ভিত্তিতে এর বিষয়বস্তুকেও ব্যাপক হিসাবেই গ্রহণ করেছেন তাঁদের ব্যাখ্যা অনুযায়ী আয়াতের অর্থ হবে এই যে, যখন কোনো কাফের মৃত্যুবরণ করে, তখন মওতের ফেরেশতা রূহ কবজ করার সময় তার মুখে ও পিঠে আঘাত করেন। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে, তাঁদের হাতে আগুনের চাবুক এবং লোহার গদা থাকে যার দ্বারা মরণোন্মুখ কাফেরকে আঘাত করা হয়। কিন্তু যেহেতু এ আজাবের সম্পর্ক জড়জগতের সাথে নয়; বরং কবর জগতের সাথে যাকে বরযখ বলা হয়, কাজেই এই আজাব সাধারণত চোখে দেখা যায় না।

সেজন্যই রাসূলে কারীম ﷺ-কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে, যদি আপনি দেখতেন তবে বড়ই করুণ দৃশ্য দেখতে পেতেন। এতে বুঝা যাচ্ছে যে, মৃত্যুর পর আলমে বরযখেও অর্থাৎ মৃত্যুর পর থেকে কেয়ামতের বিচারের পূর্ব পর্যন্ত সময়ের কাফেরদের উপর আজাব হয়ে থাকে। তাই তা সাধারণভাবে দেখা যায় না। কুরআন মাজীদের অন্যান্য আয়াতে এবং হাদীসের বর্ণনাতেও কবরের আজাবের ব্যাপারে বিপুল আলোচনা রয়েছে।

www.almodina.com

দ্বিতীয় আয়াতে কাফেরদেরকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে, দুনিয়া আখেরাতেও এ আজাব তোমাদের নিজের হাতেরই অর্জিত। সাধারণ কাজকর্ম যেহেতু হাতের দ্বারা সম্পাদিত হয়, সেহেতু এখানেও হাতেরই উল্লেখ করা হয়েছে। মর্মার্থ হলো এই যে, এসব আজাব তোমাদের নিজেদের আমলেরই ফলাফল। আর একথা সত্য যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দার উপর জুলুমকারী নন যে, অকারণেই কাউকে আজাবে নিপতিত করে দেবেন।

তৃতীয় আয়াতে বলা হয়েছে যে, এসব অপরাধীর উপর আল্লাহ তা'আলার এই আজাব নতুন কিছু নয়; বরং এটাই আল্লাহ তা'আলার সাধারণ রীতি যে, তিনি তাঁর বান্দাদের হেদায়েতের জন্য তাদেরকে জ্ঞান বুদ্ধি-দান করেন, আশেপাশে তাদের জন্য এমন অসংখ্য বিষয় বিদ্যমান থাকে যেগুলো নিয়ে চিন্তাভাবনা করলেই তারা আল্লাহ তা'আলার অসীম কুদরত ও মহত্ত্ব সম্পর্কে জানতে পারে এবং অসহায় সৃষ্টিকে আর তাঁর সাথে শরিক করে না। তদুপরি অতিরিক্ত সতর্কীকরণের জন্য নবী-রাসূল পাঠান। আল্লাহর রাসূল তাদের বুঝতে ও বুঝাতে সামান্যতম ত্রুটিও রাখেন না। তাঁরা তাদেরকে মু'জিযা আবারো আল্লাহ তা'আলার ভয়ানক ক্ষমতার দৃশ্যাবলিও দেখান। তারপরেও যখন কোনো ব্যক্তি বা সম্প্রদায় এ সমস্ত বিষয়ে চোখ বন্ধ করে নেয় এবং খোদায়ী সতর্কতার কোনোটিতেই কান দেয় না, তখন এহেন লোকদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার রীতি হলো এই যে, পৃথিবীতেও তাদের উপর আযাব নেমে আসে এবং আখেরাতেও অন্তহীন আজাবে বন্দি হয়ে যায়। ইরশাদ হয়েছে– كَدَاْبِ اٰلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ দَأْبِ- অর্থাৎ রীতি অভ্যাস। অর্থাৎ ফেরাউনের অনুসারী এবং তাদের পূর্ববর্তী কাফের ও উদ্ধত লোকদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার রীতি সম্পর্কে গোটা বিশ্বই জানতে পেরেছে যে, তিনি ফেরাউনকে তার সমস্ত আড়ম্বর ও প্রভাব-প্রতিপত্তিসহ সাগরে ডুবিয়ে দিয়েছেন এবং তার পূর্ববর্তী আদ ও ছামূদ জাতিসমূহকে বিভিন্ন প্রকৃতির আজাবের মাধ্যমে ধ্বংস করে দিয়েছেন। ইরশাদ হচ্ছে– كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ فَاَخَذَهُمُ اللّٰهُ بِذُنُوْبِهِمْ অর্থাৎ তারা আল্লাহ তা'আলার আয়াত ও নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করলে তখন আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে স্বীয় আজাবে নিপতিত করেছেন। اِنَّ اللّٰهَ قَوِيٌّ شَدِيْدُ الْعِقَابِ আল্লাহ অত্যন্ত শক্তিশালী কোনো ক্ষমতাবানই নিজের শক্তির বলে তাঁর আজাব থেকে অব্যাহতি পেতে পারে না। আর আল্লাহ তা'আলার শাস্তিও অত্যন্ত কঠিন।

শব্দ বিশ্লেষণ

وَاَطِيْعُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِطَاعَةُ মূলবর্ণ (ط - و - ع) জিনস اجوف واوى অর্থ– তোমরা অনুসরণ কর।

فَتَفْشَلُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ اثبات فعل مضارع معروف বাব سَمِعَ মাসদার اَلْفَشَلُ মূলবর্ণ (ف - ش - ل) জিনস صحيح অর্থ– তোমরা সাহসহারা হবে।

لَاتَرَوْنَ সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ نفى فعل مضارع معروف বাব فَتَحَ মাসদার اَلرُّؤْيَةُ মূলবর্ণ (ر - ء - ى) জিনস মুরাক্কাব ناقص يائى ও مهموز عين অর্থ–তোমরা দেখছ না।

ذُوْقُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلذَّوْقُ মূলবর্ণ (ذ - و - ق) জিনস اجوف واوى অর্থ– তোমরা স্বাদ গ্রহণ কর।

دَاْبٌ : শব্দটি একবচন; বহুবচন– اَدْؤُبٌ اَدْؤُوْبٌ অর্থ–অভ্যাস, আচরণ, স্বভাব, অবস্থা, কাজ।

ذُنُوْبٌ : শব্দটি বহুবচন; একবচন– ذَنْبٌ অর্থ– অপরাধ, গুনাহ, পাপ।

قَوِيٌّ শব্দটি একবচন; বহুবচন– اَقْوِيَاءُ অর্থ– শক্তিশালী, শক্তিধর, সবল, শক্তিমান, ক্ষমতাবান, বলবান, প্রবল।

অনুবাদ	আয়াত
অনুবাদ : (৫৩) এটা এরই কারণে যে, আল্লাহ তা'আলা এমন কোনো নিয়ামতকে যা কোনো জাতিকে দিয়েছেন, পরিবর্তন করেন না, যে পর্যন্ত না তারা নিজেদের কার্যকলাপকে পরিবর্তন করে ফেলে, আর একথা স্থির নিশ্চিত যে, আল্লাহ তা'আলা অতি শ্রবণকারী, মহাজ্ঞানী।	ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً اَنْعَمَهَا عَلٰى قَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ ۙ وَاَنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ (٥٣)
(৫৪) তাদের অবস্থা ফেরাউন সম্প্রদায় এবং তাদের পূর্ববর্তীদের অবস্থার ন্যায়, তারা আপন প্রতিপালকের আয়াতগুলোকে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছিল। সুতরাং আমি তাদেরকে তাদের পাপসমূহের কারণে ধ্বংস করে দিলাম এবং ফেরাউন সম্প্রদায়কে নিমজ্জিত করে দিলাম, আর তারা সকলেই জালেম ছিল।	كَدَاْبِ اٰلِ فِرْعَوْنَ ۙ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ؕ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ فَاَهْلَكْنٰهُمْ بِذُنُوْبِهِمْ وَاَغْرَقْنَاۤ اٰلَ فِرْعَوْنَ ۚ وَكُلٌّ كَانُوْا ظٰلِمِيْنَ (٥٤)
(৫৫) নিশ্চয় সৃষ্টির নিকৃষ্টতম জীব হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার নিকট এই কাফেররা, অতএব তারা ঈমান আনবে না।	اِنَّ شَرَّ الدَّوَآبِّ عِنْدَ اللّٰهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ (٥٥)
(৫৬) যাদের অবস্থা এই যে, আপনি তাদের হতে [কয়েককবার] প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছেন, অনন্তর তারা প্রত্যেকবারই নিজেদের অঙ্গীকার ভঙ্গ করে ফেলেছে, আর তারা ভয় করে না।	اَلَّذِيْنَ عٰهَدْتَّ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَهُمْ فِيْ كُلِّ مَرَّةٍ وَّهُمْ لَا يَتَّقُوْنَ (٥٦)

শাব্দিক অনুবাদ

(৫৩) ذٰلِكَ এটা এরই কারণে যে, بِاَنَّ اللّٰهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا আল্লাহ তা'আলা পরিবর্তন করেন না نِّعْمَةً এমন কোনো নিয়ামতকে اَنْعَمَهَا عَلٰى قَوْمٍ যা কোনো জাতিকে দিয়েছেন حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ যে পর্যন্ত না তারা নিজেদের কার্যকলাপকে পরিবর্তন করে ফেলে وَاَنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ আর একথা স্থির নিশ্চিত যে, আল্লাহ তা'আলা অতি শ্রবণকারী, মহাজ্ঞানী।

(৫৪) كَدَاْبِ اٰلِ فِرْعَوْنَ ۙ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ তাদের অবস্থা ফেরাউন সম্প্রদায় এবং তাদের পূর্ববর্তীদের অবস্থার ন্যায় كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ তারা আপন প্রতিপালকের আয়াতগুলোকে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছিল। فَاَهْلَكْنٰهُمْ بِذُنُوْبِهِمْ সুতরাং আমি তাদেরকে তাদের পাপসমূহের কারণে ধ্বংস করে দিলাম وَاَغْرَقْنَاۤ اٰلَ فِرْعَوْنَ এবং ফেরাউন সম্প্রদায়কে নিমজ্জিত করে দিলাম وَكُلٌّ كَانُوْا ظٰلِمِيْنَ আর তারা সকলেই জালেম ছিল।

(৫৫) اِنَّ شَرَّ الدَّوَآبِّ নিশ্চয় সৃষ্টির নিকৃষ্টতম জীব হচ্ছে عِنْدَ اللّٰهِ আল্লাহ তা'আলার নিকট الَّذِيْنَ كَفَرُوْا এই কাফেররা فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ অতএব, তারা ঈমান আনবে না।

(৫৬) اَلَّذِيْنَ عٰهَدْتَّ مِنْهُمْ যাদের অবস্থা এই যে, আপনি তাদের হতে [কয়েকবার] প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছেন ثُمَّ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَهُمْ فِيْ كُلِّ مَرَّةٍ অনন্তর তারা প্রত্যেকবারই নিজেদের অঙ্গীকার ভঙ্গ করে ফেলেছে وَّهُمْ لَا يَتَّقُوْنَ আর তারা ভয় করে না।

فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَّنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ (٥٧)

অনুবাদ : (৫৭) সুতরাং আপনি যদি যুদ্ধে তাদের কাবু করতে পারেন, তবে তাদের [উপর আক্রমণ করত সেই আক্রমণ] দ্বারা তাদের ব্যতীত অন্যান্য লোকদেরকে ছত্রভঙ্গ করে দিন, যেন তারা বুঝতে পারে।

وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلٰى سَوَآءٍ ۚ إِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْخَآئِنِيْنَ (٥٨)

(৫৮) আর যদি কোনো সম্প্রদায় সম্বন্ধে আপনার আশঙ্কা হয় বিশ্বাসঘাতকতার, তবে আপনি সেই চুক্তি তাদেরকে এভাবে ফিরিয়ে দিন, যেন তারা এবং আপনি [সন্ধি রহিত হওয়ার অবগতি সম্পর্কে] সমান হয়ে যান, নিঃসন্দেহে আল্লাহ বিশ্বাসঘাতকদেরকে পছন্দ করেন না।

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَبَقُوْا ۚ إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُوْنَ (٥٩)

(৫৯) আর কাফেররা যেন নিজেদের সম্পর্কে এরূপ ধারণা না করে যে, তারা বেঁচে গিয়েছে, কিছুতেই তারা [আল্লাহ তা'আলাকে] অক্ষম করতে পারবে না।

وَأَعِدُّوْا لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ قُوَّةٍ وَّمِنْ رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُوْنَ بِهٖ عَدُوَّ اللّٰهِ وَعَدُوَّكُمْ

(৬০) আর এই কাফেরদের [সাথে মোকাবিলার] জন্য তোমাদের সাধ্যানুযায়ী অস্ত্রাদি দ্বারা এবং প্রতিপালিত অশ্বাদি দ্বারা সরঞ্জাম প্রস্তুত রাখ, যা দ্বারা তোমরা প্রভাব বিস্তার করে রাখতে পার সেই সকল লোকদের উপর যারা আল্লাহ তা'আলার শত্রু এবং তোমাদেরও শত্রু

শাব্দিক অনুবাদ

(৫৭) فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ সুতরাং আপনি যদি যুদ্ধে তাদের কাবু করতে পারেন فَشَرِّدْ بِهِمْ مَّنْ خَلْفَهُمْ তবে তাদের [উপর আক্রমণ করত সেই আক্রমণ] দ্বারা তাদের ব্যতীত অন্যান্য লোকদেরকে ছত্রভঙ্গ করে দিন لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ যেন তারা বুঝতে পারে।

(৫৮) وَإِمَّا تَخَافَنَّ আর যদি আশঙ্কা হয় مِنْ قَوْمٍ কোনো সম্প্রদায় সম্বন্ধে আপনার خِيَانَةً বিশ্বাসঘাতকতার فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ তবে আপনি সেই চুক্তি তাদেরকে এভাবে ফিরিয়ে দিন, যেন তারা এবং আপনি [সন্ধি রহিত হওয়ার অবগতি সম্পর্কে] عَلٰى سَوَآءٍ সমান হয়ে যান إِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْخَآئِنِيْنَ নিঃসন্দেহে আল্লাহ বিশ্বাসঘাতকদেরকে পছন্দ করেন না।

(৫৯) وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا আর কাফেররা যেন নিজেদের সম্পর্কে এরূপ ধারণা না করে যে, سَبَقُوْا তারা বেঁচে গিয়েছে إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُوْنَ কিছুতেই তারা [আল্লাহ তা'আলাকে] অক্ষম করতে পারবে না।

(৬০) وَأَعِدُّوْا لَهُمْ আর এই কাফেরদের [সাথে মোকাবিলার] জন্য সরঞ্জাম প্রস্তুত রাখ مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ قُوَّةٍ তোমাদের সাধ্যানুযায়ী অস্ত্রাদি দ্বারা وَّمِنْ رِّبَاطِ الْخَيْلِ এবং প্রতিপালিত অশ্বাদি দ্বারা تُرْهِبُوْنَ بِهٖ যা দ্বারা তোমরা প্রভাব বিস্তার করে রাখতে পার সেই সকল লোকদের উপর عَدُوَّ اللّٰهِ যারা আল্লাহ তা'আলার শত্রু وَعَدُوَّكُمْ এবং তোমাদেরও শত্রু

www.almodina.com

وَاٰخَرِيْنَ مِنْ دُوْنِهِمْ ۚ لَا تَعْلَمُوْنَهُمْ ۚ اَللّٰهُ يَعْلَمُهُمْ ۗ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ يُوَفَّ اِلَيْكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تُظْلَمُوْنَ (٦٠)

অনুবাদ : এবং এদের ব্যতীত অন্যান্য লোকদের উপরও যাদেরকে তোমরা জান না, তাদেরকে আল্লাহ জানেন, আর তোমরা আল্লাহর রাস্তায় যা কিছু ব্যয় করবে, তা [-র ছওয়াব] তোমাদেরকে পুরোপুরি দেওয়া হবে এবং তোমাদের জন্য একটুও কম করা হবে না।

وَاِنْ جَنَحُوْا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ۗ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ (٦١)

(৬১) আর যদি তারা সন্ধির দিকে অগ্রসর হয়, তবে আপনিও অগ্রসর হোন এবং আল্লাহ তা'আলার উপর ভরসা রাখুন; নিশ্চয় তিনি খুব শ্রবণকারী, মহাজ্ঞানী।

শাব্দিক অনুবাদ

وَاٰخَرِيْنَ مِنْ دُوْنِهِمْ এবং এদের ব্যতীত অন্যান্য লোকদের উপরও لَا تَعْلَمُوْنَهُمْ যাদেরকে তোমরা জান না اللّٰهُ يَعْلَمُهُمْ তাদেরকে আল্লাহ জানেন وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ আর তোমরা যা কিছু ব্যয় করবে فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ আল্লাহর রাস্তায় يُوَفَّ اِلَيْكُمْ তা [-র ছওয়াব] তোমাদেরকে পুরোপুরি দেওয়া হবে وَاَنْتُمْ لَا تُظْلَمُوْنَ এবং তোমাদের জন্য একটুও কম করা হবে না।

(৬১) وَاِنْ جَنَحُوْا لِلسَّلْمِ আর যদি তারা সন্ধির দিকে অগ্রসর হয় فَاجْنَحْ لَهَا তবে আপনিও অগ্রসর হোন وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ এবং আল্লাহ তা'আলার উপর ভরসা রাখুন اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ নিশ্চয় তিনি খুব শ্রবণকারী, মহাজ্ঞানী।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(৫৫) قوله اِنَّ شَرَّ الدَّوَآبِّ عِنْدَ اللّٰهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا الخ **আয়াতের শানে নুযূল– ১ :** বনূ কুরাইযার কা'আব ইবনে আশরাফ ও তার অনুচরদের সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। ঘটনাপ্রবাহ হচ্ছে যে, তারা রাসূল ﷺ-এর সাথে এই মর্মে সন্ধি স্থাপন করেছিল যে, তারা রাসূল ﷺ -এর মুকাবিলায় শক্তিদান করবেনা। অতঃপর তারা তা ভঙ্গ করে মক্কার মুশরিকদেরকে অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করছে। পরবর্তীতে তারা বলল যে, আমরা ভুলে গিয়েছিলাম, আমরা অন্যায় করেছি। অতঃপর তারা চুক্তি ভঙ্গ করে। কা'আব ইবনে আশরাফ মক্কায় চলে যায়। তদের এমনভাবে চুক্তি ভঙ্গের ন্যাক্কারজনক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[বাহরে মুহীত-৫০৩/৪]

শানে নুযূল– ২ : আবুশ শায়খ সাঈদ ইবনে জুবাইর (রা.) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি; বলেন, আলোচ্য আয়াত ইহুদিদের ছয় ব্যক্তি সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। তাদের মধ্যে ইবনে তাবুত একজন ছিল। –[দুররে মানছুর-১৯১/৩, ফতহুল কাদীর-৩২১/২]

(৫৬) قوله الَّذِيْنَ عَاهَدْتَّ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَهُمْ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** আলোচ্য আয়াত বনূ কুরাইযার ইহুদিদের সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। ঘটনাপ্রবাহ হচ্ছে যে, বনূ কুরাইযার ইহুদিরা মুসলমানদের সাথে চুক্তিবদ্ধ ছিল যে, তারা মুসলমানদের প্রতিকূল শত্রুবাহিনীকে কোনো প্রকারের সহযোগিতা করবে না। তারা বদর অভিযানকালে অঙ্গীকার ভঙ্গ করে মুসলমানদের শত্রুবাহিনীকে সমর সাহায্য প্রদান করেছিল। অতঃপর তারা অনুতাপ স্বরূপ বলতে লাগল যে, আমরা তো ভুলে গিয়েছিলাম। সুতরাং আর কখনও মুসলমানদের শত্রুবহিনীকে কোনো প্রকার সহযোগিতা না করার শর্তে আবারও চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। কিন্তু পরবর্তীতে খন্দক যুদ্ধকালে তারা আবারো তাদের চুক্তি ভঙ্গ করার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেছেন। –[নূরুল কুলূব]

(৫৮) قوله وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ الخ **আয়াতের শানে নুযূল– ১ :** ইমাম তাবারী মুজাহিদের উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, আলোচ্য আয়াত বনী কুরাইযা ও বনী নাযীর সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। –[কুরতুবী-৩২/১০/৫]

শানে নুযূল– ২ : আবুশ শায়খ ইবনে শিহাবের উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন হযরত জিবরাঈল আমীন (আ.) হযরত রাসূল ﷺ–এর নিকট গমন করে বলেছেন, আপনিতো যুদ্ধাস্ত্র রেখে দিলেন, আর আমরা (ফেরেশতারা) কাফেরদের অনুসন্ধানে রয়েছি। সুতরাং আপনি বের হয়ে পড়েন। আল্লাহ আপনাকে বনূ কুরাইযা সম্পর্কে অনুমতি দান করেছেন। বনূ কুরাইযাদের চুক্তি ভঙ্গ করার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়েছে। –[ফাতহুল কাদীর-৩২১/২, দুররে মানছূর-১৯১/৩]

(৫৯) قوله وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** ইমাম যুহরী (র.) বলেন, যে সকল কাফের মুশরিকরা বদর অভিযানকালে জান বাঁচিয়ে চলে যায় এতে মুসলমানদের দুঃখ হলো তাদেরকে সমূলে ধ্বংস না করতে পারাতে। তখন সে অবস্থাদৃষ্টে রাসূল ﷺ–কে শান্ত্বনা দান এবং কাফেরদের প্রতি চরম বাণী প্রকাশ করে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেছেন। –[বাহরে মুহীত-৫০৫/৪]

(৬১) قوله وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** আবুশ শায়খ সুদ্দীর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন যে, আলোচ্য আয়াত বনী কুরাইযা সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। পরবর্তীতে فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ الخ এ আয়াত দ্বারা রহিত হয়ে যায়। –[ফাতহুল কাদীর-৩২৩/২]

৫৩ নং আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর নিয়ামতের স্থায়িত্বের জন্য এবং তা অব্যাহত রাখার জন্য একটি মূলনীতি বর্ণনা করেছেন। ইরশাদ হয়েছে– ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা কোনো জাতিকে যে নিয়ামত দান করেন তিনি তা ততক্ষণ পর্যন্ত বদলান না, যে পর্যন্ত না সে জাতি নিজেই নিজেদের অবস্থা ও কার্যকলাপ বদলে দেয়।

এখানে প্রথম একথাটি লক্ষণীয় যে, আল্লাহ নিয়ামত দান করার অন্য কোনো মূলনীতি বর্ণনা করেননি। না সে জন্য কোনো রকম বাধ্যবাধকতার ও শর্তাশর্ত আরোপ করেছেন। না কারো কোনো সৎকর্মের উপর তা নির্ভরশীল রেখেছেন। তার কারণ যদি এমনই হতো, তবে সর্বপ্রথম নিয়ামত আমাদের অস্তিত্ব যাতে আল্লাহর আশ্চর্যজনক শিল্পকর্মের হাজারো বিস্ময়কর নিয়ামতের সমারোহ ঘটানো হয়েছে। বলাই বাহুল্য, এসব নিয়ামত যে সময় দান করা হয়, যখন না ছিলাম আমরা না ছিল আমাদের কোনো আমল বা কাজকর্ম।

কাজেই যদি আল্লাহ তা'আলার নিয়ামত ও অনুগ্রহসমূহ বান্দার সৎকর্মের অপেক্ষা থাকত, তবে আমদের অস্তিত্বই স্থাপিত হতো না। সুতরাং আল্লাহ তা'আলার নিয়ামত ও রহমত তথা তাঁর দান ও করুণা তাঁর রাব্বুল আলামীন ও রাহমানুররাহীম গুণেরই প্রকৃতিগত ফসল। অবশ্য এ সমস্ত নিয়ামতের স্থায়িত্বের জন্য একটা নিয়ম বা মূলনীতি রয়েছে যা এ আয়াতে এভাবে বলা হয়েছে যে, যে জাতিকে আল্লাহ তা'আলা কোনো নিয়ামত দান করেন, ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি তা তাদের কাছে থেকে ফিরিয়ে নেন না, যে পর্যন্ত না তারা নিজেরাই নিজেদের অবস্থা ও কার্যকলাপকে পরিবর্তত করে আল্লাহ তা'আলার আজাবকে আমন্ত্রণ জানায়।

অবস্থা পরিবর্তনের অর্থ হচ্ছে ভালো ও সৎ অবস্থা ও কর্মের পরিবর্তে মন্দ অবস্থা ও কার্যকলাপ অবলম্বন করে নেওয়া কিংবা আল্লাহ তা'আলার নিয়ামত আগমনের সময় যে সমস্ত মন্দ ও পাপ কাজে লিপ্ত ছিল নিয়ামত প্রাপ্তির পর তার চেয়ে অধিক মন্দ কাজে লিপ্ত হয়ে পড়া।

এই বিশ্লেষণ দ্বারা একথাও বুঝা গেল যে, বিগত আয়াতগুলোতে যে সমস্ত জাতি সম্প্রদায়ের আলোচনা করা হয়েছে অর্থাৎ কুরাইশ গোত্রের কাফেররা এবং ফেরাউনের সম্প্রদায়; এ আয়াতের সাথে তাদের সম্পর্ক এ কারণে যে, এরা যদিও আল্লাহ তা'আলার নিয়ামত প্রাপ্তির সময়ও তেমন কোনো ভালো অবস্থায় ছিল না; সবাই ছিল মুশরিক ও কাফের, কিন্তু নিয়ামত প্রাপ্তির পর এরা নিজেদের মন্দাচার ও অসৎ কর্মে পূর্বের চেয়ে বহুগুণে বেশি তৎপর হয়ে উঠে।

ফেরাউনের বংশধররা বনী ইসরাঈলদের উপর নানা রকম অত্যাচার উৎপীড়ন আরম্ভ করে এবং হযরত মূসা (আ.) -এর মোকাবিলা ও বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হয়ে যায়। যা ছিল তাদের পূর্ববর্তী অপরাধে আরেকটি সংযোজন। এতে করে তারা নিজেদের অবস্থাকে অধিকতর অকল্যাণের দিকে প্রত্যাবর্তিত করে দেয়। তখন আল্লাহ তা'আলাও তাঁর নিয়ামতকে বিপদাপদ ও শাস্তি-সাজায় বদলে দেন। তোমনিভাবে মক্কার কুরাইশরা যদিও মুশরিক ও বদকার ছিল, কিন্তু তার সাথে

www.almodina.com

সাথে তাদের মাঝে কিছু সৎকর্ম, সেলাহ রেহমী, তথা স্বজনবাৎসল্য, মেহমান-নাওয়াযী তথা অতিথিপরায়ণতা, হাজীদের সেবা বায়তুল্লাহর প্রতি সম্মানবোধ প্রভৃতি কিছু সদগুণও বিদ্যমান ছিল। আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্য দীন দুনিয়ার নিয়ামতরাজির দরজা খুলে দিয়েছেন; দুনিয়াতে তাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি দান করেছেন। যেসব দেশে কারো বাণিজ্যিক কাফেলা নিরাপদে অতিক্রম করতে পারত না সেসব দেশে যেমন সিরিয়া ও ইয়েমেনে তাদের বাণিজ্যিক কাফেলা৷ যেত এবং একান্ত নিরাপদে লাভবান হয়ে ফিরে আসত।

আর দীনের দিক দিয়ে সে মহানিয়ামত তাদের দান করা হয়েছে যা বিগত কোনো জাতি-সম্প্রদায়ই পায়নি। তাদেরই মাঝে আবির্ভূত হন নবীকুল শিরোমণি সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা ﷺ এবং তাদের মাঝে অবতীর্ণ হয় আল্লাহ তা'আলার সর্বশ্রেষ্ঠ মহাগ্রন্থ আল-কুরআনুল কারীম।

কিন্তু এরা আল্লাহ তা'আলার এ সমস্ত দান ও অনুগ্রহের জন্য শুকরিয়া আদায় করা, এর যথার্থ মর্যাদা দান করা এবং এগুলোর মাধ্যমে নিজেদের অবস্থার সংশোধন করার পরিবর্তে আগের চেয়েও বেশি পঙ্কিলতায় মজে যায়। সেলাহ রেহমী পরিহার করে মুসলমান হয়ে যাওয়ার অপরাধে নিজ ভ্রাতুষ্পুত্রের উপর চরম বর্বরতাসুলভ উৎপীড়ন চালাতে আরম্ভ করে, অতিথিপরায়ণতার পরিবর্তে সেই মুসলমানদের জন্য দানাপানি বন্ধ করার প্রতিজ্ঞাপত্র স্বাক্ষর করে, হাজীদের সেবা করার পরিবর্তে মুসলমানদের হেরেমে প্রবেশে পর্যন্ত বাধা দান করতে থাকে। এগুলো ছিল সেসব অবস্থা যাকে কুরাইশ কাফেররা পরিবর্তিত করে ফেলেছিল। এরই পরিণতিতে আল্লাহ তা'আলা তাঁর নিয়ামতসমূহকে বিপদাপদ ও আজাবে রূপান্তরিত করে দেন। ফলে এরা দুনিয়াতেও অপদস্থ হয় এবং যে সত্তা দুনিয়া ও আখেরাতের জন্য রাহমাতুললিল আলামীন হয়ে আগমন করেছিলেন তাঁরই মাধ্যমে এরা নিজেদের মৃত্যু ও ধ্বংসকে আমন্ত্রণ জানায়।

তাফসীরে মাযহারীতে নির্ভরযোগ্য ইতিহাস গ্রন্থের উদ্ধৃতি সহকারে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কিলাব ইবনে মুররা যিনি রাসূলে কারীম ﷺ-এর বংশ পরম্পরায় তৃতীয় পুরুষে পরদাদা হিসাবে গণ্য। তিনি প্রথম থেকেই দীনে ইবরাহীমী ও ইসমাঈলীর অনুগামী ছিলেন এবং বংশানুক্রমিকভাবে এ দীনের নেতৃত্ব ও পৌরোহিত্য তাদেরই হাতে ন্যস্ত ছিল। কোসাই ইবনে কিলাবের সময়ে তাদের মধ্যে মূর্তি উপাসনার সূচনা হয়। তাঁর পূর্বে তাদের ধর্মীয় নেতা ছিলেন কা'আব ইবনে লুওয়াই। তিনি জুমার দিন যাকে তাদের ভাষায় 'আরোয়িয়া' বলা হয় (সমাজের) সবাইকে সমবেত করে ভাষণ দিতেন এবং বলতেন যে, তার সন্তানবর্গের মাঝে শেষনবী ﷺ -এর জন্ম হবে। তাঁর অনুসরণ ও আনুগত্য করা সবার জন্য অপরিহার্য হবে। যে লোক তাঁর উপর ঈমান আনবে না, তার কোনো আমলই কবুল হবেনা। মহানবী (সা.) সম্পর্কে তার আরবি কবিতা জাহেলিয়াত আমলের কবিদের মধ্যে খুবই প্রসিদ্ধি ও জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। এই কোসাই ইবনে কিলাব সমস্ত হাজীর জন্য খানাপিনার ব্যবস্থা করতেন। এমনকি এ দায়িত্বটি মহানবী ﷺ-এর বংশে তাঁর আমলেও বলবৎ ছিল। এই ইতিহাসের দ্বারা একথাও বলা যেতে পারে যে, কুরাইশদের পরিবর্তন হলো দীনে ইবরাহীমী পরিহার করে মূর্তি উপাসনা আরম্ভ করা।

যাহোক, আয়াতের প্রতিপাদ্যে এ কথা বুঝা যাচ্ছে যে, কোনো কোনো সময় আল্লাহ তা'আলা তাঁর নিয়ামত এমন কোনো কোনো লোককেও দান করেন, যে তার আমল বা কর্মের দ্বারা তার যোগ্য নয়, কিন্তু প্রদত্ত হওয়ার পর যদি সে নিজের আমল বা কর্মধারা সংশোধন করে কল্যাণের দিকে ফিরানোর পরিবর্তে মন্দ কাজের দিকে আরো বেশি উৎসাহী হয়ে পড়ে, তখন প্রদত্ত নিয়ামত তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হয় এবং সে লোক আল্লাহর আজাবের যোগ্য হয়ে পড়ে।

আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে وَاَنَّ اللّٰهَ سَمِيۡعٌ عَلِيۡمٌ অর্থাৎ আল্লাহ তাদের প্রতিটি কথাবার্তা শুনেন এবং তাদের সমস্ত আমল ও কার্যকলাপ জানেন। এতে কোনো রকম ভুল বিভ্রান্তির কোনোই অবকাশ নেই।

قوله كَدَأْبِ اٰلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ الخ উল্লিখিত আয়াতগুলোর মধ্যে প্রথম আয়াতের বিষয় বস্তু; বরং শব্দাবলিও প্রায় তেমনি, যা এক আয়াত আগেই আলোচিত হয়েছে।

قوله اِنَّ شَرَّ الدَّوَآبِّ عِنْدَ اللّٰهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا এতে دَوَآبّ শব্দটি دَابَّةٌ-এর বহুবচন। এর আভিধানিক অর্থ– ভূপৃষ্ঠে বিচরণ করে সবই এর অন্তর্ভুক্ত। তবে সাধারণ প্রচলনে এ শব্দটি বিশেষ করে চতুষ্পদ জীবের ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়। যেহেতু নির্বুদ্ধিতা ও অনুভূতিহীনতার দিক দিয়ে তাদের অবস্থা চতুষ্পদ জীব-জানোয়ার অপেক্ষাও নীচে নেমে গিয়েছিল, কাজেই তাদেরকে বুঝাতে গিয়ে এ শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। আয়াতের অর্থ সুস্পষ্ট যে, সমস্ত জীবজন্তু ও মানুষের মধ্যে এরাই সবচেয়ে নিকৃষ্টতর। আয়াতের শেষাংশে রয়েছে– فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ অর্থাৎ এরা ঈমান আনবে না। মর্মার্থ হচ্ছে এই যে,

www.almodina.com

আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে যেসব যোগ্যতা দান করেছিলেন, তারা সে সবই হারিয়ে ফেলেছে এবং চতুষ্পদ জীব-জানোয়ারেরই মতো পানাহারে ও নিদ্রা জাগরণকেই জীবনের চরম ও পরম উদ্দেশ্য সাব্যস্ত করে নিয়েছে। কাজেই ঈমান পর্যন্ত তাদের পৌছা হবে না।

হযরত সাঈদ ইবনে জুবায়ের (রা.) বলেছেন যে, এ আয়াতটি ইহুদি সম্প্রদায়ের ছ'জন লোক সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে যাদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা পূর্বাহ্নেই সংবাদ দিয়ে দিয়েছেন যে, এরা শেষ পর্যন্ত ঈমান আনবে না।

قوله الَّذِيْنَ عَاهَدْتَّ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَهُمْ فِيْ كُلِّ مَرَّةٍ وَّهُمْ لَا يَتَّقُوْنَ -এ আয়াতটি মদিনার ইহুদি এবং বনূ কোরায়যা ও বনূ নাযীর সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। পূর্ববর্তী আয়াতগুলো মক্কার মুশরিকদের উপর বদর ময়দানে মুসলমানদের মাধ্যমে আল্লাহর আজাব অবতীর্ণ হওয়ার বিষয় আলোচনা এবং পূর্ববর্তী উম্মতের কাফেরদের সাথে তাদের সামঞ্জস্যের বর্ণনা ছিল। এ আয়াতে সে জালেম দলের আলোচনা করা হয়েছে যারা মদিনায় হিজরতের পর মুসলমানদের জন্য আস্তীনের সাপে পরিণত হয় এবং যারা একদিকে মুসলমানদের বন্ধুত্ব ও সখ্যতার দাবিদার ছিল এবং অপরদিকে মক্কার কাফেরদের সাথে মুসলমানদের মাঝে আবূ জাহল যেমন ইসলামের বিরুদ্ধে সবচেয়ে অগ্রবর্তী ছিল, তেমনি মদিনার ইহুদিদের মধ্যে এ কাজের নেতা ছিল কা'আব ইবনে আশরাফ।

রাসূলে কারীম ﷺ হিজরত কারে মদিনায় চলে আসার পর মুসলমানদের ক্রমবর্ধমান প্রভাব প্রতিপত্তি লক্ষ্য করে এরা ভীত হলেও তাদের মনে ইসলামের প্রতি শত্রুতার এক দাবদাহ জ্বলেই যাচ্ছিল।

ইসলামি জাতীয়তা : রাসূলে কারীম ﷺ মদিনায় আগমনের পর ইসলামি রাজনীতির সর্বপ্রথম বুনিয়াদ প্রতিষ্ঠিত করেন। মুহাজিরীন ও আনসারদের সবদেশী ও স্বজাতীয় সাম্প্রদায়িকতাকে মিটিয়ে দিয়ে ইসলামের নামে এক নতুন জাতীয়তা প্রতিষ্ঠা করেন। মুহাজিরীন ও আনসারদের বিভিন্ন গোত্রকে ভাই ভাইয়ে পরিণত করে দেন। আর রাসূল ﷺ -এর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা আনসারদের সে সমস্ত বিরোধও দূর করে দেন যা শতাব্দীর থেকে চলে আসছিল এবং মুহাজিরদের সাথেও তিনি পারস্পরিকভাবে ভাই ভাই সম্পর্ক স্থাপন করেন।

ইহুদিদের সাথে মৈত্রী চুক্তি : হিজরতের পর দেখা যায়, মুসলমানদের প্রতিপক্ষ ছিল দুটি। ১. মক্কার মুশরিকরা, যাদের অত্যাচার-উৎপীড়ন মক্কা ত্যাগ করতে বাধ্য করছিল এবং ২. মদিনার ইহুদিবর্গ, যারা এখন মুসলমানদের প্রতিবেশী হয়েছিল। এদের মধ্য থেকে ইহুদিদের সাথে এক চুক্তি সম্পাদন করা হয়, যার একটা বিস্তারিত প্রতিজ্ঞা পত্রও লেখা হয়। এই চুক্তির প্রতি আনুগত্য মদিনা এলাকার সমস্ত ইহুদি এবং মুসলমান, আনসার ও মুহাজিরদের উপর আরোপ করা হয়। চুক্তির পূর্ণ ভাষ্য ইবনে কাছীর 'আলবিদায়াহ ওয়ান্নিহায়াহ' গ্রন্থে এবং সীরাতে ইবনে হিশাম প্রভৃতি গ্রন্থে লিপিবদ্ধ রয়েছে। বস্তুত এর সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল এই যে, মদিনার ইহুদিগণ মুসলমানদের বিরুদ্ধে কোনো শত্রুকে প্রকাশ্য কি গোপন সাহায্য করবে না। কিন্তু এরা বদর যুদ্ধের সময় সম্পাদিত চুক্তি লঙ্ঘন করে মক্কার মুশরিকদেরকে অস্ত্রশস্ত্র ও যুদ্ধের সাজাসরঞ্জাম দিয়ে সাহায্য করে, তবে বদর যুদ্ধের ফলাফল যখন মুসলমানদের সুস্পষ্ট বিজয় এবং কাফেরদের অপমানজনক পরাজয়ের আকারে সামনে এসে যায়, তখন পুনারায় তাদের উপর মুসলমানদের প্রভাব ও ভীতি প্রবল হয়ে উঠে এবং তারা মহানবী ﷺ -এর দারবারে হাজির হয়ে ওজর পেশ করে যে, এবারে আমাদের ভুল হয়ে গেছে, এবার বিষয়টি ক্ষমা করে দিন, ভবিষ্যতে আর এমনভাবে আমরা চুক্তি লঙ্ঘন করব না।

মহানবী ﷺ ইসলামি গাম্ভীর্য, দয়া ও সহনশীলতার প্রেক্ষিতে যা তাঁর অভ্যাস ছিল আবারও তাদের সাথে চুক্তি নবায়ন করে নিলেন। কিন্তু এরা নিজেদের অসৎ স্বভাব থেকে বিরত ছিল না। উহুদের যুদ্ধে মুসলমানদের সাময়িক পরাজয় ও ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কথা জানতে পেরে তাদের সাহস বেড়ে যায় এবং তাদের সর্দার কা'আব ইবনে আশরাফ মক্কায় গিয়ে মক্কার মুশরিকদের পরিপূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে মুসলমানদের উপর আক্রমণ করতে উদ্বুদ্ধ করে এবং আশ্বাস দেয় যে, মদিনার ইহুদিরা তোমাদের সাথে থাকবে। এটা ছিল তাদের দ্বিতীয়বার চুক্তি লঙ্ঘন যা তারা ইসলামের বিরুদ্ধে করেছে। আলোচ্য আয়াতে এভাবে বার বার চুক্তি লঙ্ঘনের কথা উল্লেখ করে তাদের দুষ্কৃতির বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে যে, এরা হচ্ছে ঐ সমস্ত লোক, যাদের সাথে আপনি চুক্তি সম্পাদন করে নিয়েছেন, কিন্তু এরা প্রতিবারই সে চুক্তি লঙ্ঘন করে চলছে। আয়াতের শেষাংশে ইরশাদ হয়েছে– وَّهُمْ لَا يَتَّقُوْنَ অর্থাৎ এরা ভয় করে না। এর মর্মার্থ এও হতে পারে যে, এ হতভাগারা যেহেতু দুনিয়ার লোভে উন্মাদ ও অজ্ঞান হয়ে আছে, তাদের মনে আখেরাতের

কোনো চিন্তাই নেই। কাজেই এরা আখেরাতের আজাবকে ভয় করে না। এছাড়া এও হতে পারে যে, এহেন দুরাচার ও চুক্তি লঙ্ঘনকারী লোকদের যে অশুভ পরিণতি পৃথিবীতেই হয়ে থাকে এরা নিজেদের গাফলতি ও অজ্ঞানতার দরুন সে ব্যাপারেও ভয় করে না।

অতঃপর সমগ্র বিশ্বই স্বচক্ষে দেখে নিয়েছে যে, এসব লোক নিজেদের দুষ্কর্মের শাস্তি পৃথিবীতেও ভোগ করেছে। আবূ জাহেলের মতো কা'আব ইবনে আশরাফ নিহত হয়েছে এবং মদিনার ইহুদিদেরকে দেশছাড়া করা হয়েছে।

قوله فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِم مَّنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ এতে تَثْقَفَنَّهُمْ শব্দটির অর্থ তাদের উপর ক্ষমতা লাভ করা। আর شَرِّدْ মূল ধাতু আর تَشْرِيْد থেকে গঠিত হয়েছে। এর প্রকৃত অর্থ– বিতাড়িত এবং বিক্ষিপ্ত করে দেওয়া। অতএব আয়াতের অর্থ হবে যে, "আপনি যদি কোনো যুদ্ধে তাদের উপর ক্ষমতা লাভে সমর্থ হয়ে যান, তবে তাদেরকে এমন কঠোর শাস্তি দিবেন যা অন্যান্যের জন্যও দৃষ্টান্ত হয়ে যায়।" তাদের পশ্চাতে যারা তাদের সহায়তা ও ইসলামের শত্রুতায় লেগে আছে তারাও যেন একথা উপলব্ধি করে নেয় যে, এখান থেকে পালিয়ে প্রাণ বাঁচানোই কল্যাণ। এর মর্ম হলো এই যে, এদেরকে এমন শাস্তিই যেন দেওয়া হয়, যা দেখে মক্কার মুশরিকরা ও অন্যান্য শত্রু সম্প্রদায়গুলোও প্রভাবিত হবে এবং ভবিষ্যতে মুসলমানদের মোকাবিলা করার সাহস করবে না।

আয়াতের শেষাংশে لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ বলে রাব্বুর আলামীনের ব্যাপক রহমতের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে. এই সুকঠিন দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির প্রকৃত উদ্দেশ্য প্রতিশোধ গ্রহণ কিংবা প্রতিহিংসা চরিতার্থ করা নয়; বরং এতে তাদেরই কল্যাণ যে, হয়তো বা এহেন অবস্থা দেখে এরা কিছুটা চেতনা ফিরে পাবে এবং নিজেদের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হয়ে নিজেদের সংশোধন করে নেবে।

সন্ধি চুক্তি বাতিল করার উপায় : পরবর্তী আয়াতে রাসূলে মাকবুল ﷺ-কে যুদ্ধ ও সন্ধির আইনসংক্রান্ত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ধারা বলে দেওয়া হয়েছে। এতে যদি চুক্তির দ্বিতীয় পক্ষের দিক থেকে বিশ্বাসঘাতকতা অর্থাৎ চুক্তি লঙ্ঘনের আশঙ্কা সৃষ্টি হয়ে যায়, তবে চুক্তির বাধ্যবাধকতাকে অক্ষুণ্ন রাখা অপরিহার্য নয়। কিন্তু চুক্তিকে সম্পূর্ণভাবে বাতিল করে দেওয়ার পূর্বে তাদের বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করাও জায়েজ নয়; বরং এর বিশুদ্ধ পন্থা হলো এই যে, পতিপক্ষকে শান্ত পরিস্থিতিতে এবং অবকাশের অবস্থায় এ ব্যাপারে অবহিত করে দিতে হবে যে, তোমাদের কুটিলতা ও বিরুদ্ধাচরণের বিষয়টি আমাদের নিকট প্রকাশ হয়ে পড়েছে, কিংবা তোমাদের আচার-আচরণ আমাদের সন্দেহজনক বলে মনে হয়েছে, তাই আমরা আগামীতে এই চুক্তি পালনে বাধ্য থাকব না; তোমাদেরও সব রকম অধিকার থাকবে যে, তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে যা ইচ্ছা করতে পার। আয়াতের খাতগুলো হলো এই– وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ। অর্থাৎ আপনার যদি কোনো চুক্তিবদ্ধ সম্প্রদায়ের ব্যাপারে চুক্তি ভঙ্গের আশঙ্কা হয় তবে তাদের চুক্তি তাদের দিকে এমনভাবে ফিরিয়ে দেবেন যেন আপনারা এবং তারা সমান সমান হয়ে যান। কারণ আল্লাহ খোয়ানতকারীদেরকে পছন্দ করেন না।

অর্থাৎ যে জাতির সাথে কোনো সন্ধিচুক্তি সম্পাদিত হয়ে গেছে, তার মোকাবিলায় কোনো রকম সামরিক পদক্ষেপ খোয়ানতের অন্তর্ভুক্ত। আর আল্লাহ খেয়ানতকারীদেরকে পছন্দ করেন না। যদি এ খেয়ানত কাফের শত্রুর সাথেও করা হয়, তবুও তা জায়েজ নয়। অবশ্য যদি অপরপক্ষ থেকে চুক্তি ভঙ্গের আশঙ্কা সৃষ্টি হয় তবে এমনটি করা যেতে পারে যে, তাদেরকে প্রকাশ্যভাবে ঘোষণার মাধ্যমে অবহিত করে দেবেন যে, আগামীতে আমরা এ চুক্তির বাধ্য থাকব না। কিন্তু ঘোষণাটি এমনভাবে হতে হবে যেন মুসলমান ও অপর পক্ষ এতে সমান সমান হয়। অর্থাৎ এমন অবস্থা যেন সৃষ্টি করা হয় যে, এই ঘোষণা ও সতর্কীকরণের পূর্ব থেকেই তাদের বিরুদ্ধে মোকাবিলা করার প্রস্তুতি নিয়ে নেবে এবং তারা চিন্তামুক্ত হয়ে থাকার দরুন প্রস্তুতি নিতে পারবে না; বরং যদি কোনো প্রস্তুতি নিতে হয়, তা এই ঘোষণা ও সতর্কীকরণের পরেই নেবেন।

চুক্তির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের একটি বিস্ময়কর ঘটনা : আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.) প্রমুখ সুলাইম ইবনে 'আমের -এর রেওয়ায়েতক্রমে উদ্ধৃত করেছেন যে, নির্দিষ্ট এক সময়ের জন্য হযরত মো'আবিয়া (রা.) এবং কোনো এক সম্প্রদায়ের সাথে এক যুদ্ধবিরতি চুক্তি ছিল। হযরত মো'আবিয়া (রা.) ইচ্ছা করলেন যে, এই চুক্তির

দিনগুলোতে নিজেদের সৈন্যসামন্ত ও যুদ্ধের সাজসরঞ্জাম সে সম্প্রদায়ের কাছাকাছি নিয়ে রাখবেন, যাতে চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার সাথে সাথেই শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়া যায়। কিন্তু ঠিক যখন হযরত মো'আবিয়া (রা.)-এর সৈন্য দল সেদিকে রওয়ানা হচ্ছিল, দেখা গেল, একজন বুড়ো লোক ঘোড়ায় চড়ে খুব উচ্চৈঃস্বরে না'রা লাগিয়ে আসেছেন যে, اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَفَاءٌ لَا غَدْرًا অর্থাৎ না'রায়ে তাকবীরের সাথে তিনি বললেন, সম্পাদিত চুক্তি পূরণ করা কর্তব্য। এর বিরুদ্ধাচরণ করা উচিত নয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কোনো জাতি-সম্প্রদায়ের সাথে কোনো সন্ধি বা যুদ্ধ বিরতি চুক্তি সম্পাদিত হয়ে গেলে, তার বিরুদ্ধে কোনো গিঠ খোলা অথবা বাঁধাও উচিত নয়। যাহোক হযরত মো'আবিয়া (রা.)-কে বিষয়টি জানানো হলো। দেখা গেল কথাগুলো যিনি বলেছেন, তিনি হলেন সাহাবী হযরত আমর ইবনে আম্বাসাহ (রা.)। হযরত মো'আবিয়া (রা.) ততক্ষণাৎ স্বীয় বাহিনীকে ফিরে আসার নির্দেশ দিয়ে দিলেন, যাতে যুদ্ধবিরতির মেয়াদে সৈন্য স্থাপনার পদক্ষেপের দরুন খোয়ানতকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে না পড়েন। –[ইবনে কাছীর]

قوله وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَبَقُوْا الخ ৫৯ নং আয়াতে সে সমস্ত কাফেরের বিষয় আলোচনা করা হয়েছে, যারা বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি বলে বেঁচে গেছে কিংবা অংশ নিয়েও পালিয়ে নিজের প্রাণ রক্ষা করেছে। তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, এরা যেন এমন ধারণা না করে যে, বাস্তবিকপক্ষেই আমরা বেঁচে গেছি। কারণ বদরের যুদ্ধটি কাফেরদের জন্য এক খোদায়ী আজাব। এই পাকড়াও থেকে বেঁচে যাওয়া কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। সুতরাং বলা হয়েছে– اِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُوْنَ অর্থাৎ এরা নিজেদের চতুরতার দ্বারা আল্লাহকে আপারক করতে পারবে না। তিনি যখনই ওদেরকে ধরতে চাইবেন, তখন এরা এক পা'ও সরতে পারবে না। হয়তো বা পৃথিবীতেই এরা ধরা পড়ে যেতে পারে, না হয় আখেরাতে তো তাদের আটকে পড়া অবধারিত।

এ আয়াত ইঙ্গিত করে দিচ্ছে যে, কোনো অপরাধী পাপী যদি কোনো বিপদ ও কষ্ট থেকে মুক্তি পেয়ে যায় এবং তারপরেও যদি তওবা না করে; বরং স্বীয় অপরাধে অটল অবিচল থাকে, তবে তাকে এর লক্ষণ মনে করো না যে, সে কৃতকার্য হয়ে গেছে এবং চিরকালের জন্যেই মুক্তি পেয়ে গেছে; বরং সে সর্বক্ষণই আল্লাহর হাতের মুঠোয় রয়েছে এবং এর অব্যাহতি তার বিপদকে আরো বাড়াচ্ছে যদিও সে তা অনুভব করতে পারছে না।

জিহাদের জন্য যুদ্ধোপকরণ ও অস্ত্রশস্ত্র তৈরি করা ফরজ : পরবর্তী আয়াতে ইসলামের শত্রুকে প্রতিরোধ ও কাফেরদের সাথে মোকাবিলা করার জন্য প্রস্তুতির বিধান বর্ণিত হয়েছে। বলা হয়েছে– وَاَعِدُّوْا لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ قُوَّةٍ وَّمِنْ رِّبَاطِ الْخَيْلِ وَاٰخَرِيْنَ مِنْ دُوْنِهِمْ لَا تَعْلَمُوْنَهُمْ ۚ اَللّٰهُ يَعْلَمُهُمْ ۗ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ يُوَفَّ اِلَيْكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تُظْلَمُوْنَ অর্থাৎ কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধোপকরণ তৈরি করার সাথে مَا اسْتَطَعْتُمْ -এর শর্ত আরোপ করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, তোমাদের সফলতা লাভের জন্য এটা অপরিহার্য নয় যে, তোমাদের প্রতিপক্ষের নিকট যে ধরনের এবং যে পরিমাণ উপকরণ রয়েছে তোমাদেরকেও ততটাই অর্জন করতে হবে; বরং সামর্থ্য অনুযায়ী যা কিছু উপকরণ জোগাড় করতে পার তাই সংগ্রহ করে নাও, তবে সেটুকুই যথেষ্ট আল্লাহর সাহায্য ও সহায়তা তোমাদের সঙ্গে থাকবে।

অতঃপর সে উপকরণের কিছুটা বিশ্লেষণ এভাবে করা হয়েছে مِنْ قُوَّةٍ অর্থাৎ মোকাবিলা করার শক্তি সঞ্চয় কর। এতে সমস্ত যুদ্ধোপকরণ, অস্ত্রশস্ত্র, যানবাহন প্রভৃতি অন্তর্ভুক্ত এবং শরীর চর্চা ও সমর বিদ্যা শিক্ষা করাও অন্তর্ভুক্ত। কুরআনে কারীম এখানে তৎকালে প্রচলিত আস্ত্রশস্ত্রের কোনো উল্লেখ করেনি; বরং ব্যাপাক অর্থবোধক শব্দ 'শক্তি' ব্যবহার করে ইঙ্গিত করে দিয়েছে যে, শক্তি প্রত্যেক যুগ, দেশ ও স্থান অনুযায়ী বিভিন্ন রকম হতে পারে। তৎকালীন সময়ের অস্ত্র ছিল তীর তলোয়ার, বর্শা প্রভৃতি। তারপরে বন্দুক তোপের যুগ এসেছে। তারপর এখন চলছে বোমা রকেটের যুগ। 'শক্তি' শব্দটি এসব কিছুতেই ব্যাপক। সুতরাং যে কোনো বিদ্যা ও কৌশল শিক্ষা করার প্রয়োজন হবে সেসবই যদি এই নিয়তে হয় যে, তার মাধ্যমে ইসলাম ও মুসলমানদের শত্রুকে প্রতিহত করা এবং কাফেরদের মোকাবিলা করা হবে, তাহলে তাও জিহাদেরই শামিল।

বিশুদ্ধ হাদীসসমূহে রাসূলুল্লাহ ﷺ যুদ্ধোপকরণ সংগ্রহ করা এবং সেগুলো ব্যবহার করার কায়দা-কৌশল অনুশীলন করাকে বিরাট ইবাদত ও মহাপুণ্য লাভের উপায় বলে সাব্যস্ত করেছেন। আর জিহাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য যেহেতু ইসলামের ও মুসলমানদের প্রতিরক্ষা এবং প্রতিরক্ষার বিষয়টি সর্বযুগে ও সব জাতিতে আলাদা রকম, সেহেতু রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন– وَجَاهِدُوْا الْمُشْرِكِيْنَ بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ وَاَلْسِنَتِكُمْ "মুশরিকদের বিরুদ্ধে জান মাল ও মুখে জিহাদ কর"।

–[আবূ দাউদ নাসায়ী]

এ হাদীসের দ্বারা বুঝা যাচ্ছে, জিহাদ ও প্রতিরোধ যেমন অস্ত্রশস্ত্রের মাধ্যমে হয়ে থাকে, তেমনি কোনো কোনো সময় মুখেও হয়ে থাকে। তাছাড়া কলমও মুখেরই পর্যায়ভুক্ত। ইসলাম ও কুরআনের বিরুদ্ধে কাফের ও মুলহিদদের আক্রমণ এবং এর বিকৃতি সাধনের প্রতিরোধ মুখে কিংবা কলমের দ্বারা করাও এই সুস্পষ্ট নির্দেশের ভিত্তিতে জিহাদের অন্তর্ভুক্ত।

উল্লিখিত আয়াতে যুদ্ধোপকরণ প্রস্তুত করার নির্দেশ দানের পর সেসব সাজসরঞ্জাম সংগ্রহ করার ফায়দা এবং আসল উদ্দেশ্যও এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে– تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ অর্থাৎ যুদ্ধোপকরণ সংগ্রহ করার প্রকৃত উদ্দেশ্য দুষ্কবিগ্রহ করা নয়; বরং কুফর ও শিরককে পরাভূত ও প্রতারিত করে দেওয়া। তা কখনো মুখ ও কলমের মাধ্যমেও হতে পারে, আবার অনেক সময় যুদ্ধেরও প্রয়োজন হয়। কাজেই পরিস্থিতি অনুযায়ী প্রতিরোধ করা ফরজ।

অতঃপর বলা হয়েছে, যুদ্ধ ও প্রতিরক্ষা প্রস্তুতিতে যাদেরকে প্রভাবিত করা উদ্দেশ্য তাদের অনেককে মুসলমানরা জানে। আর তারা হলো সেসব লোক যাদের সাথে মুসলমানদের মোকাবিলা চলছে। এ ছাড়াও কিছু লোক রয়েছে যাদেরকে এখনও মুসলামানরা জানে না। এর মর্ম হলো সারা দুনিয়ার কাফের ও মুশরিক, যারা এখনও মুসলমানদের মোকাবিলায় আসেনি কিন্তু ভবিষ্যতে তাদের সাথেও সংঘর্ষ বাঁধতে পারে। কুরআনে কারীমের এ আয়াতটিতে বলে দেওয়া হয়েছে যে, মুসলমানগণ যদি নিজেদের উপস্থিত শত্রুর মোকাবিলার প্রস্তুতি নেয় তবে এর অপ্রভাব শুধু সে শত্রুর উপরই পড়বে না; বরং দূরদূরান্তের কাফের শক্তির উপরেও পড়বে। বস্তুত হয়েছেও তাই। খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলে এরা সবাই পরাজিত ও প্রভাবিত হয়ে যায়।

যুদ্ধোপকরণ সংগ্রহ করাতে গিয়ে এবং যুদ্ধ পরিচালনার জন্য অর্থেরও প্রয়োজন হয়; বরং যুদ্ধের সাজসরঞ্জাম অর্থসম্পদের দ্বারাই তৈরি করা যেতে পারে। সেজন্যই আয়াতের শেষাংশে আল্লাহর রাহে মাল বা অর্থসম্পদ ব্যয় করার ফজিলত এবং তার মধ্যে প্রতিদানের বিষয়টি এভাবে বলা হয়েছে যে, এ পথে তোমরা যা কিছুই ব্যয় করবে তার বদলা পুরোপুরিভাবে তোমাদেরকে দেওয়া হবে। কোনো সময় দুনিয়াতেই গনিমতের মালের আকারে এ বদলা যায়, না হয় আখেরাতের বদলা তো নির্ধারিত রয়েছেই। বলাবাহুল্য, সেটিই অধিকতর মূল্যবান।

৬১ নং আয়াতে সন্ধির বিধিবিধান এবং সে সম্পর্কিত বর্ণনায় বলা হয়েছে– وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا – سَلْم সীন বর্ণের উপর যবর এবং سِلْم সীন বর্ণের উপর যের উভয় উচ্চারণেই শব্দটি সন্ধি অর্থে ব্যবহৃত হয়। তাহলে আয়াতের অর্থ দাড়ায় এই যে, যদি কাফেররা কোনো সময় সন্ধির প্রতি আগ্রহী হয়, তবে আপনারও তাই করা উচিত। এখানে নির্দেশ বাচক পদ উত্তমতা বুঝাবার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। মর্মার্থ এই যে, কাফেররা যদি সন্ধির প্রতি আগ্রহী হয়, তবে সেক্ষেত্রে আপনার এ অধিকার রয়েছে যে সন্ধি করায় যদি মুসলমানদের কল্যাণ মনে করেন, তাহলে সন্ধিও করতে পারেন।

আর وَإِنْ جَنَحُوا -এর শর্ত আরোপ করাতে বুঝা যাচ্ছে, সন্ধি তখনই করা যেতে পারে যখন কাফেরদের পক্ষ থেকে সন্ধির আগ্রহ প্রকাশ পাবে। কারণ তাদের আগ্রহ ব্যতীত যদি স্বয়ং মুসলমানগণ সন্ধির উদ্যোগ করে, তবে এতে তাদের দুর্বলতা প্রকাশ পাবে। তবে যদি এমন কোনো পরিস্থিতির উদ্ভব হয় যে, মুসলমানরা অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে এবং নিজেদের প্রাণের নিরাপত্তার জন্য একমাত্র সন্ধি ছাড়া অন্য কোনো পন্থা দেখা না যায়, তবে সেক্ষেত্রে ফিকহ শাস্ত্রবিদদের মতে সন্ধির উদ্যোগ আর যদি শত্রুদের পক্ষ থেকে সন্ধির আগ্রহ প্রকাশে এমন কোনো সম্ভাবনা বিদ্যমান থাকে যে, তারা মুসলমানদেরকে ধোঁকা দিয়ে, শৈথিল্যে ফেলে হঠাৎ আক্রমণ করে বসবে, সেজন্য আয়াতের শেষাংশে রাসূলে কারীম ﷺ -কে হেদায়েত দান করা হয়েছে যে, وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ; অর্থাৎ আপনি আল্লাহ তা'আলার উপর ভরসা করুন। কারণ তিনিই যথার্থ শ্রবণকারী, পরিজ্ঞাত। তিনি তাদের কথাবার্তাও শোনেন এবং তাদের মনের গোপণ ইচ্ছাও জানেন। তিনি আপনার সাহায্যের জন্য যথেষ্ট। কাজেই আপনি এহেন প্রমাণহীন আশঙ্কা-সম্ভাবনার উপর নিজ কাজের ভিত রাখবেন না। এসব আশঙ্কার বিষয়গুলো আল্লাহর উপর ছেড়ে দিন।

৬২ নং আয়াতে বিষয়টিকে আরো কিছুটা বিশ্লেষণের মাধ্যমে এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ ۚ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ " এ সম্ভাবনাই যদি বাস্তবায়িত হয়ে যায়, সন্ধি করতে গিয়ে তাদের নিয়তে যদি খারাপি থাকে

এবং আপনাকে যদি এভাবে ধোঁকা দিতে চায়, তবুও আপনি কোনো পরোয়া করবেন না। আল্লাহ তা'আলাই আপনার জন্য যথেষ্ট। পূর্বেও আল্লাহর সাহায্য-সমর্থনেই আপনার ও মুমিনদের কার্যসিদ্ধি হয়েছে।" তিনি তাঁর বিশেষ সাহায্যে আপনার সহায়তা করেছেন, যা আপনার বিজয় ও কৃতকার্যতার ভিত্তি ও বাস্তব সত্য। আবার বাহ্যিকভাবে মুসলমানদের জামাতকে আপনার সাহায্যে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন, যা ছিল বাহ্যিক উপকরণ। সুতরাং যিনি প্রকৃত মালিক ও মহাশক্তিমান, যিনি বিজয় ও কৃতকার্যতার যাবতীয় উপকরণকে বাস্তবতায় রূপায়িত করেছেন, তিনি আজও শত্রুদের ধোঁকা প্রতারণার ব্যাপারে আপনার সাহায্য করবেন।

শব্দ বিশ্লেষণ

مُغَيِّرًا : সীগাহ واحد مذكر اسم فاعل বহছ বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّغْيِيْرُ মূলবর্ণ (غ - ى - ر) জিনস اجوف يائى অর্থ– পরিবর্তনকারী।

شَرٌّ : শব্দটি একবচন; বহুবচন اَشْرَارٌ অর্থ–অনিষ্টকারী। ক্ষতিকারক।

دَوَآبٌّ : শব্দটি বহুবচন; একবন–دَابَّةٌ অর্থ–চতুষ্পদ জন্তুসমূহ।

تَثْقَفَنَّ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ اثبات فعل مضارع معروف بانون ثقيله বাব سَمِعَ মাসদার اَلثَّقْفُ মূলবর্ণ (ث - ق - ف) জিনস صحيح অর্থ–আপনি কাবু করতে পারেন, তুমি নাগালে পাও।

اَلْحَرْبُ : শব্দটি একবচন; বহুবচন– حُرُوْبٌ অর্থ–যুদ্ধ, লড়াই, সমর, সংঘাত।

اِنْبِذْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلنَّبْذُ মূলবর্ণ (ن - ب - ذ) জিনস صحيح অর্থ–তুমি ছুড়ে ফেলে দাও।

اَعِدُّوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضرَ বহছ امر حاضرمعروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِعْدَادُ মূলবর্ণ (ع - د - د) অর্থ–তোমরা প্রস্তুত রাখ, তোমরা প্রস্তুত কর।

تُرْهِبُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ اثبات فعل مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِرْهَابُ মূলবর্ণ (ر - ه - ب) জিনস صحيح অর্থ– তোমরা ভীতসন্ত্রস্ত করতে পার।

يُوَفَّ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ اثبات فعل مضارع مجهول বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّوْفِيَةُ মূলবর্ণ (و - ف - ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ–তাকে পূর্ণ প্রতিদান দেওয়া হবে, তাকে পুরাপুরি দেওয়া হবে।

وَاِنْ يُّرِيْدُوْٓا اَنْ يَّخْدَعُوْكَ فَاِنَّ حَسْبَكَ اللّٰهُ ۭ هُوَ الَّذِيْٓ اَيَّدَكَ بِنَصْرِهٖ وَبِالْمُؤْمِنِيْنَ (٦٢)

অনুবাদ : (৬২) আর যদি তারা আপনাকে ধোঁকা দিতে চায়, তবে আল্লাহ তা'আলা আপনার জন্য যথেষ্ট, তিনিই সেই সত্তা যিনি আপনাকে নিজের সাহায্য দ্বারা এবং মুসলমানদের দ্বারা শক্তি দান করেছেন।

وَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ ۭ لَوْ اَنْفَقْتَ مَا فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا مَّآ اَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ اَلَّفَ بَيْنَهُمْ ۭ اِنَّهٗ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ (٦٣)

(৬৩) আর তাদের অন্তরসমূহে একতা সৃষ্টি করেছেন, যদি আপনি দুনিয়ার সম্পদসমূহের সমস্তই ব্যয় করতেন, তবুও তাদের অন্তরসমূহে একতা সৃষ্টি করতে পারতেন না, কিন্তু আল্লাহ তা'আলাই তাদের মধ্যে পরস্পর ঐক্য সৃষ্টি করে দিয়েছেন, নিশ্চয় তিনি হচ্ছেন মহা পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়।

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللّٰهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ (٦٤)

(৬৪) হে নবী! আপনার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট এবং যে মুমিনগণ আপনার অনুসরণ করেছে তারাই যথেষ্ট।

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَى الْقِتَالِ ۭ اِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ عِشْرُوْنَ صٰبِرُوْنَ يَغْلِبُوْا مِائَتَيْنِ ۚ وَاِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ مِّائَةٌ يَّغْلِبُوْٓا اَلْفًا مِّنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُوْنَ (٦٥)

(৬৫) হে নবী! আপনি মুমিনদেরকে জিহাদের উৎসাহ দান করুন, [এবং তৎসম্পর্কে এটাও বলে দিন যে,] যদি তোমাদের মধ্যকার বিশ ব্যক্তি দৃঢ়পদ থাকে, তবে তারা দুই শতের উপর বিজয় লাভ করবে, আর যদি [অনুরূপভাবে] তোমাদের মধ্যকার একশত ব্যক্তি থাকে, তবে এক সহস্র কাফেরের উপর জয় লাভ করবে, এ কারণে যে, তারা এমন লোক, যারা [সত্য ধর্মের] জ্ঞান রাখে না।

শাব্দিক অনুবাদ

(৬২) وَاِنْ يُّرِيْدُوْٓا আর যদি তারা চায় اَنْ يَّخْدَعُوْكَ আপনাকে ধোঁকা দিতে فَاِنَّ حَسْبَكَ اللّٰهُ তবে আল্লাহ তা'আলা আপনার জন্য যথেষ্ট هُوَ الَّذِيْٓ اَيَّدَكَ তিনিই সেই সত্তা যিনি আপনাকে শক্তি দান করেছেন بِنَصْرِهٖ নিজের সাহায্য দ্বারা وَبِالْمُؤْمِنِيْنَ এবং মুসলমানদের দ্বারা।

(৬৩) وَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ আর তাদের অন্তরসমূহে একতা সৃষ্টি করেছেন لَوْ اَنْفَقْتَ যদি আপনি ব্যয় করতেন مَا فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا দুনিয়ার সম্পদসমূহের সমস্তই مَّآ اَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ তবুও তাদের অন্তরসমূহে একতা সৃষ্টি করতে পারতেন না وَلٰكِنَّ اللّٰهَ اَلَّفَ بَيْنَهُمْ কিন্তু আল্লাহ তা'আলাই তাদের মধ্যে পরস্পর ঐক্য সৃষ্টি করে দিয়েছেন اِنَّهٗ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ নিশ্চয় তিনি হচ্ছেন মহাপরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়।

(৬৪) يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ হে নবী! حَسْبُكَ اللّٰهُ আপনার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট এবং وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ যে মুমিনগণ আপনার অনুসরণ করেছে তারাই যথেষ্ট।

(৬৫) يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ হে নবী! حَرِّضِ الْمُؤْمِنِيْنَ আপনি মুমিনদেরকে উৎসাহ দান করুন عَلَى الْقِتَالِ জিহাদের [এবং তৎসম্পর্কে এটাও বলে দিন যে,] اِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ عِشْرُوْنَ صٰبِرُوْنَ যদি তোমাদের মধ্যকার বিশ ব্যক্তি দৃঢ়পদ থাকে يَغْلِبُوْا مِائَتَيْنِ তবে তারা দুই শতের উপর বিজয় লাভ করবে وَاِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ مِّائَةٌ আর যদি [অনুরূপভাবে] তোমাদের মধ্যকার একশত ব্যক্তি থাকে يَّغْلِبُوْٓا اَلْفًا مِّنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا তবে এক সহস্র কাফেরের উপর জয় লাভ করবে بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُوْنَ এই কারণে যে, তারা এমন লোক যারা [সত্য ধর্মের] জ্ঞান রাখে না।

www.almodina.com

অনুবাদ : (৬৬) এখন আল্লাহ তা'আলা তোমাদের হতে [ভালো] লঘু করে দিলেন এবং জেনে নিলেন যে, তোমাদের মধ্যে সাহসের অভাব রয়েছে; অতএব, যদি তোমাদের একশত জন্য দৃঢ়পদ থাকে, তবে তারা দুই শতের উপর জয় লাভ করবে, আর যদি তোমাদের মধ্যকার এক সহস্র লোক হয়, তবে তারা আল্লাহর হুকুমে দুই সহস্রের উপর বিজয়ী হবে, আর আল্লাহ তা'আলা ধৈর্যশীলদের সঙ্গে থাকেন।	اَلْـٰٔنَ خَفَّفَ اللّٰهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ اَنَّ فِيْكُمْ ضَعْفًا ؕ فَاِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يَّغْلِبُوْا مِائَتَيْنِ ۚ وَاِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ اَلْفٌ يَّغْلِبُوْٓا اَلْفَيْنِ بِاِذْنِ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ (٦٦)
(৬৭) নবীর পক্ষে শোভনীয় নয় যে, তাঁর বন্দি জীবিত থাকে [বরং হত্যা করে ফেলা চাই] যে পর্যন্ত তিনি ভূপৃষ্ঠে উত্তমরূপে রক্ত পাত না করেন, তোমরা তো দুনিয়ার ধনসম্পদ চাচ্ছ, আর আল্লাহ তা'আলা চাচ্ছেন পরকাল, আর আল্লাহ অতি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।	مَا كَانَ لِنَبِيٍّ اَنْ يَّكُوْنَ لَهٗٓ اَسْرٰى حَتّٰى يُثْخِنَ فِى الْاَرْضِ ؕ تُرِيْدُوْنَ عَرَضَ الدُّنْيَا ۖ وَاللّٰهُ يُرِيْدُ الْاٰخِرَةَ ؕ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ (٦٧)
(৬৮) যদি আল্লাহ তা'আলার লিখন নির্ধারিত হয়ে না থাকত, তবে যে ব্যবস্থা তোমরা অবলম্বন করেছ, তৎসম্বন্ধে তোমাদের উপর কোনো বড় শাস্তি এসে পড়ত।	لَوْلَا كِتٰبٌ مِّنَ اللّٰهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيْمَآ اَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ (٦٨)
(৬৯) অতএব, তোমরা যা কিছু [ফিদিয়াস্বরূপ] নিয়েছ তাতে হালাল পাক ভেবে খাও, আর আল্লাহকে ভয় করতে থাক, নিশ্চয় আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, দয়াময়।	فَكُلُوْا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلٰلًا طَيِّبًا ۖ وَّاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ (٦٩)

৫৩

শাব্দিক অনুবাদ

(৬৬) اَلْـٰٔنَ এখন خَفَّفَ اللّٰهُ عَنْكُمْ আল্লাহ তা'আলা তোমাদের হতে [ভার] লঘু করে দিলেন وَعَلِمَ এবং জেনে নিলেন যে, اَنَّ فِيْكُمْ ضَعْفًا তোমাদের মধ্যে সাহসের অভাব রয়েছে فَاِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ مِّائَةٌ صَابِرَةٌ অতএব, যদি তোমাদের একশত জন্য দৃঢ়পদ থাকে يَّغْلِبُوْا مِائَتَيْنِ তবে তারা দুই শতের উপর জয় লাভ করবে وَاِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ اَلْفٌ আর যদি তোমদের মধ্যকার এক সহস্র লোক হয় يَّغْلِبُوْا اَلْفَيْنِ তবে তারা দুই সহস্রের উপর বিজয়ী হবে بِاِذْنِ اللّٰهِ আল্লাহর হুকুমে وَاللّٰهُ مَعَ الصَّابِرِيْنَ আর আল্লাহ তা'আলা ধৈর্যশীলদের সঙ্গে থাকেন।

(৬৭) مَا كَانَ لِنَبِيٍّ নবীর পক্ষে শোভনীয় নয় যে, اَنْ يَّكُوْنَ لَهٗٓ اَسْرٰى তাঁর বন্দী জীবিত থাকে [বরং হত্যা করে ফেলা চাই] حَتّٰى يُثْخِنَ فِى الْاَرْضِ যে পর্যন্ত তিনি ভূপৃষ্ঠে উত্তমরূপে কাফেরদের রক্তপাত না করেন تُرِيْدُوْنَ عَرَضَ الدُّنْيَا তোমরা তো দুনিয়ার ধন-সম্পদ চাইছ وَاللّٰهُ يُرِيْدُ الْاٰخِرَةَ আর আল্লাহ তা'আলা চাচ্ছেন পরকাল وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ আর আল্লাহ অতি পরক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

(৬৮) لَوْلَا كِتٰبٌ مِّنَ اللّٰهِ سَبَقَ যদি আল্লাহ তা'আলার লিখন নির্ধারিত হয়ে না থাকত لَمَسَّكُمْ فِيْمَآ اَخَذْتُمْ তবে যে ব্যবস্থা তোমরা অবলম্বন করেছ, তৎসম্বন্ধে তোমাদের উপর এসে পড়ত عَذَابٌ عَظِيْمٌ কোনো বড় শাস্তি ।

(৬৯) فَكُلُوْا অতএব, তোমরা খাও مِمَّا غَنِمْتُمْ যা কিছু [ফিদিয়াস্বরূপ] নিয়েছ তাতে حَلٰلًا طَيِّبًا হালাল পাক ভেবে। وَاتَّقُوا اللّٰهَ আর আল্লাহকে ভয় করতে থাক اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ নিশ্চয় আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, দয়াময়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(৬৩) قوله وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** ইবনে আবী হাতেম, আবুশ শায়খ হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণনা করে বলেন যে, আলোচ্য আয়াত আল্লাহর ওয়াস্তে পরস্পরে মুহাব্বতকারীদের সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। –[ফাতহুল কাদীর-৩২৩/২]

(৬৪) قوله يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ **আয়াতের শানে নুযূল– ১ :** বাযযার হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, হযরত ওমর (রা.) যখন ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন, তখন মুশরিকরা বলেছিল যে, আজ আমাদের গোত্র অর্ধেক হয়ে গিয়েছে। আর তখনই আল্লাহ্ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

শানে নুযূল– ২ : ইমাম তাবারানী, আবুশ শায়খ ও ইবনে মারদুভীয়া হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন যে, পুরুষ মহিলা মিলে ৩৯ জন মানুষ যখন যখন নবী করীম ﷺ-এর প্রতি ঈমান আনেন। অতঃপর ওমর (রা.)ও ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন, ফলে মুসলমানরা মোট সংখ্যা হয় ৪০ জন তাদের সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। –[ফাতহুল কাদীর : ৩২৪/২, বাহরে মুহীত : ৫১০/৪, ইবনে কাছীর : ৩১১/২, রুহুল মা'আনী : ৩০/১০/৫, কুরতুবী : ৪৪/৮]

শানে নুযূল– ৩ : আল্লামা কালবী (র.) বলেন যে, আলোচ্য আয়াত বদর অভিযান কালে যুদ্ধ আরম্ভ হরার আগে বায়দা নামক স্থানে নাজিল হয়েছে।

শানে নুযূল– ৪ : যুহরীর বর্ণনা মতে আনসারদের সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। –[রুহুল মা'আনী-৩০/৫, বাহরে মুহীত-৫১০]

(৬৬) قوله اَلْئٰنَ خَفَّفَ اللهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ اَنَّ فِيْكُمْ ضَعْفًا الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** ইমাম বুখারী (র.) ও অন্যান্য ইমামগণ হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন– ان يكن منكم عشرون صبرون يغلبوا مائتين আয়াত যখন নাজিল হয়, তখন তা মুসলমানদের নিকট অত্যন্ত কষ্টকর মনে হলো। যাকে ফরজ করে দেওয়া হলো যে, দশজন থেকে কেউ পালিয়ে যেতে পারবেন। সুতরাং এ হুকুম হালকাকরণার্থে আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়েছে। তবে আয়াত রহিত কারী কিনা এ নিয়ে তাফসীরকারদের মাঝে মত বিরোধ রয়েছে।

আল্লামা মক্কী বলেন যে, এ হুকুম রহিতকারী হুকুম নয়; বরং এখানকার হালকা করার কারণটি হলো মুসাফিরদের উপর রোজা না রাখার অনুমতি প্রদান করার মত। জমহুরে মুফাসসিরীন প্রথম মতামত গ্রহণ করেছেন। তাদের মতে এ আয়াত রহিতকারী। –[রুহুল মা'আনী-৩২/৫, ফাতহুল কাদীর-৩২৫/২, ইবনে কাছীর-৩৩২/২, কুরতুবী-৪৫/৮]

(৬৭) قوله مَا كَانَ لِنَبِيٍّ اَنْ يَّكُوْنَ لَهٗ اَسْرٰى **আয়াতের শানে নুযূল– ১ :** ইমাম মুসলিম হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, বদর যুদ্ধে যখন (৭০ জন) কাফের যুদ্ধবন্দি হয়ে এলো, তখন হযরত রাসূল ﷺ আবূ বকর ও হযরত ওমর (রা.) কে বললেন যে, এ সকল বন্দীদের সম্পর্কে তোমাদের মতামত কি? হযরত আবূ বকর (রা.) বললেন যে, হে আল্লাহর রাসূল! তারা চাচার বংশীয় ও নিকট আত্মীয়-স্বজন। আমার মতামত হলো, তাদের থেকে মুক্তিপণ গ্রহণ করা। তাহলে আমাদের জন্য কাফেরদের মোকাবিলায় কিছুটা আর্থিক শক্তি সঞ্চয় হলো। অদূর ভবিষ্যতে আল্লাহ তাদেরকে ইসলামের পথও দেখাতে পারেন। অতঃপর রাসূল ﷺ বললেন, হে ইবনে খাত্তাব! তোমার কি মতামত? তখন আমি বললাম হে আল্লাহর রাসূল! আবূ বকরের সাথে আমি একমত, তবে আমার একটি ভিন্ন মত হলো যে, আমাকে অনুমতি দেন আমি তাদের শিরশ্ছেদ করে দেই। আলীকে অনুমতি দান করুন আলী আকিল ইবনে আবূ তালিবকে হত্যা করবে এবং আমার বংশীয় যারা তাদেরকে হত্যা করার জন্য আমাকে অনুমতি দান করুন। কারণ এরাই কাফের নেত্রীবর্গ ও দলপতিগণ। সে মুহূর্তে রাসূল ﷺ আমার মতামত গ্রহণ না করে আবূ বকরের অভিমত গ্রহণ করেন। পরদিন প্রভাতে আমি যখন রাসূল ﷺ -এর নিকট এলাম, তখণ রাসূল ﷺ ও আবূ বকরকে এক সাথে বসে ক্রন্দনরত দেখতে পেলাম। তখন আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! কিসের জন্য আপনি ও আপনার সাথি একসাথে কাঁদছেন? আমিও কাঁদব, যদি কাঁদতে না পারি, তাহলে কাঁদার ভান হলেও করব। ফলে রাসূল ﷺ বললেন যে, আমি এজন্যই কাঁদছি, তোমার সাথি তাদের থেকে মুক্তিপণ গ্রহণ করার মতামত প্রকাশ করেছে, অথচ আমার নিকট এ গাছটি থেকেও নিকটতম এসেছিল আল্লাহর আজাব (নবী আলাইহিস সালামের কছাকাছি জায়গাতে একটি গাছ ছিল) তখন বদরী বন্দীদেরকে মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দেওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেছেন। –[কুরতুবী-৪৬/৮, রুহুল মা'আনী-৩৪/১০/৫, বাহরে মুহীত-৫১৩/৪, ইবনে কাছীর-৩৩৩/২]

আলোচ্য আয়াত প্রমাণ করে যে, নবীগণ কখনও ইজতেহাদও করেছেন আবার তা কোনো সময় ওহীর খেলাফতু হয়েছে তবে তা দূষণীয় নয়। –[রূহুল মা'আনী-৩৪/৫]

শানে নুযূল– ২ : আ'মাশ হযরত আব্দুল্লাহর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, বদর যুদ্ধের দিনে রাসূল ﷺ যুদ্ধবন্দিদের সম্পর্কে তোমাদের অভিমত কি? তখন হযরত আবূ বকর (রা.) বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! এরা আপনার গোত্র ও আপনার নিকটাত্মীয়। এদের জীবিত ছেড়ে দিন এবং তাদেরকে তওবা করিয়ে নিন। আল্লাহ তা'আলা হয়তো তাদের প্রতি অনুগ্রহ করতে পারেন। হররত ওমর (রা.) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! ওরা আপনাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে। আপনাকে মাতৃভূমি হতে বহিষ্কার করেছে। আদেশ করুন তাদের গর্দান উড়িয়ে দেব। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রা.) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! এ ভূমিতে অধিক পরিমাণে লাকড়ি রয়েছে। আদেশ করুন সেই লাকড়িতে আগুন জ্বালিয়ে তাতে তাদেরকে নিক্ষেপ করে দেব। রাবী বলেন যে, তখন রাসূল ﷺ চুপ থাকেন। তাদের কোনো কথার জবাব দেননি। অতঃপর তিনি চলে যাবার পর আবার প্রবেশ করলেন, তখন উপস্থিত কতিপয় সাহাবী বললেন যে, আবূ বকরের মতামত গ্রহণ করা হোক। কেউ বললেন, ওমরের মতমত গ্রহণ করা হোক। অতঃপর রাসূল ﷺ আবারও তাশরিফ এনে বলেন, এক শ্রেণির মানুষের কলবকে আল্লাহ দুধ অপেক্ষাও অধিক নরম আবার কারো অন্তরকে পাথর অপেক্ষাও অধিক কঠোর করেছেন। পক্ষান্তরে, হে আবূ বকর! তুমি হলে হযরত ইবরাহীম (আ.) তুল্য, তিনি বলেন, فَمَنْ تَبِعَنِيْ فَإِنَّهُ مِنِّيْ وَمَنْ عَصَانِيْ فَإِنَّكَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ হে আবূ বকর! তোমার তুলনা হলো ঈসা (আ.) তুল্য বটে। কারণ তিনি বলেন– إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ হে ওমর! তুমি হযরত মূসা (আ.) তুল্য। তিনি বলেন– رَبَّنَا لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِيْنَ دَيَّارًا আর তোমরা হলে আর্থিক দুর্বল সুতরাং তাদের কেউই মুক্তিপণ ছাড়া রেহাই পাবে না অথবা গর্দান উড়িয়ে দেবে। হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন যে, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! সুহাইল ইবনে রাইযা ভিন্ন। কারণ আমি শুনতে পেয়েছি এ ব্যক্তি ইসলাম সম্পর্কে আলোচনা করেছে। তখন রাসূল ﷺ নীরব থাকেন। হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, আল্লাহর কসম! আসমান থেকে আমার প্রতি এ অপরাধে পাথর নিক্ষেপ হওয়ার ভয়ে আতঙ্কগ্রস্ত ছিলাম। অবশেষে রাসূল ﷺ বললেন যে, সুহাইল ইবনে বাইযা ছাড়া। তখন আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[ইবনে কাছীর-৩৩২/২, রূহুল মা'আনী-৩৪/৫, ফাতহুল কাদীর-৩২৬/২, কুরতুবী-৪৭/৮, দুররে মানছূর-২০১/৩]

(৬৮) قوله لَوْلَا كِتَابٌ مِّنَ اللّٰهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيْمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ **আয়াতের শানে নুযূল :** মুসনাদে আহমদ (র.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, হযরত নবী করীম ﷺ বদর অভিযানে অর্জিত যুদ্ধবন্দিদের সম্পর্কে পরামর্শ তলব করে বললেন যে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে তাদের উপর কর্তৃত্ব দান করেছেন। সুতরাং হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রা.) দাঁড়িয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! তাদের গর্দান উড়িয়ে দিন। তখন নবী করীম ﷺ সেখান থেকে ফিরে আসেন। অতঃপর রাসূল ﷺ আবার এসে বললেন যে, হে মানুষেরা! আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর তোমাদেরকে কর্তৃত্ব দান করেছেন। গতকাল এরাই তোমাদের ভাই ছিল। তখনও হযরত ওমর (রা.) দাঁড়িয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! তাদের গর্দান উড়িয়ে দিন। ফলে রাসূল ﷺ সেখান থেকে ফিরে এলেন। অতঃপর আবারও রাসূল ﷺ ফিরে এসে অনুরূপভাবে বললেন, তখন হযরত আবূ বকর (রা.) দাড়িয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার অভিমত হলো আপনি তাদেরকে ক্ষমা করে দিন এবং তাদের কাছ থেকে মুক্তিপণ আদায় করুন। সুতরাং রাসূল ﷺ তাদের ক্ষমা করে দিলেন এবং তাদের থেকে মুক্তিপণ গ্রহণ করলেন। তখন এ জাতীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার কারণে ভীতি প্রদর্শন করে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[ফাতহুল কাদীর-৩২৬/২, ইবনে কাছীর-৩৩২/২]

(৬৯) قوله فَكُلُوْا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلٰلًا طَيِّبًا ۖ وَّاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ إِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ **আয়াতের শানে নুযূল :** মহিউস সুন্নাহ বর্ণনা করেন যে, পূর্ববর্তী আয়াত যখন নাজিল হয়, তখন ফেদিয়া স্বরূপ যে অর্থ গ্রহণ করা হয়েছিল, সাহাবায়ে কেরাম সে সম্পদ ব্যবহার করা থেকে সম্পূর্ণভাবেই তাদের হাত গুটিয়ে নিলেন। কারণ তা পূর্ব যুগে অবৈধ ছিল তখন যুদ্ধলব্ধ মাল গনিমত হোক বা ফেদিয়া যাই হোক তা ব্যবহার করার অনুমতি দান করা স্বরূপ আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়েছে। –[রূহুল মা'আনী-৩৬/৫]

(গনিমত স্বরূপ অর্জিত সম্পদ পূর্ববর্তী কোনো উম্মতের জন্য বৈধ ছিল না। সে যুগে গনিমতের মালকে আসমান থেকে অগ্নি এসে তা জালিয়ে পুড়িয়ে দিত।

মুসলমানদের পারস্পরিক স্থায়ী ঐক্য ও সম্প্রীতির প্রকৃত ভিত্তি : এতে বুঝা যাচ্ছে যে, মানুষের অন্তরে পারস্পরিক সম্প্রীতি সৃষ্টি হওয়া আল্লাহ তা'আলার দান। তাছাড়া এতে একথাও প্রতীয়মান হচ্ছে যে, আল্লাহ তা'আলার নাফরমানির মাধ্যমে তাঁর দান অর্জন করা সম্ভব নয়; বরং তাঁর দান লাভের জন্য তার আনুগত্য ও সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা একান্ত শর্ত।

দল বা ব্যক্তিবর্গের মাঝে একতাও ঐকমত্য এমন একটি বিষয় যার উপকারিতা ও প্রশংসনীয় হওয়ার ব্যাপারে কোনো মাযহাব ও ধর্ম কিংবা কোনো মতবাদেই কোনো দ্বিমত থকাতে পারে না। সেজন্যই এমন প্রতিটি লোক যে, মানুষের সংশোধন ও সংস্কার কামনা করে সে তাদের পরস্পরের মাঝে ঐক্য সৃষ্টির উপর জোর দিয়ে থাকে। কিন্তু সাধারণ পৃথিবী এ বাস্তবতা সম্পর্কে অবহিত নয় যে, দীর্ঘস্থায়ী ও আন্তরিক ঐক্য বাহ্যিক প্রচেষ্টার দ্বারা অর্জিত হয় না। একমাত্র আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি বিধান ও আনুগত্যের মাধ্যমেই তা অর্জিত হতে পারে। কুরআনে হাকীম এই বাস্তবতার প্রতিই কায়েকটি আয়াতে ইঙ্গিত করেছে। এক জায়গায় বলা হয়েছে– وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا এ আয়াতে মতবিরোধ ও অনৈক্য থেকে বাঁচার পন্থা নির্দেশ করা হয়েছে যে, সবাই মিলে আল্লাহ রজ্জুকে অর্থাৎ কুরআন তথা ইসলামি শরিয়তকে সুদৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধর। তাহলে সবাই আপনা থেকেই ঐক্যবদ্ধ হয়ে যাবে এবং পারস্পরিক যেসব বিরোধ রয়েছে, তা মিটে যাবে। অবশ্য মতের পার্থক্য থাকা পৃথক জিনিস; যতক্ষণ পর্যন্ত এ পার্থক্য তার সীমায় থাকে, ততক্ষণ তা বিবাদ-বিসংবাদ ও বিভেদের কারণ হতে পারে না। ঝগড়া বিবাদ তখনই হয়, কযখন শরিয়ত নির্ধারিত সীমা লঙ্ঘিত হয়।

আয়াতের শেষভাগে সাধারণ নীতি আকারে বলা হয়েছে– اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা দৃঢ়চিত্ত লোকদের সাথে রয়েছেন। এতে যুদ্ধক্ষেত্রে দৃঢ়তা অবলম্বনকারীও অন্তর্ভুক্ত এবং শরিয়তের সাধারণ হুকুম-আহকামের অনুবর্তিতায় দৃঢ়তা অবলম্বনকারীরাও শামিল। তাদের সঙ্গই প্রকৃতপক্ষে তাদের কৃতকার্যতা ও বিজয়ের মূল রহস্য। কারণ যে, ব্যক্তি একক ক্ষমতার অধিকারী পরওয়ারদেগারের সঙ্গলাভে সমর্থ হবে, তাকে সারা বিশ্বের সমবেত শক্তিও নিজের জায়গা থেকে এক বিন্দু নাড়াতে পারে না।

قوله مَا كَانَ لِنَبِيٍّ اَنْ يَّكُوْنَ لَهٗ اَسْرٰى আয়াতটি গযওয়ায়ে বদরের বিশেষ এক ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত বিধায় এগুলোর তাফসীর করার পূর্বে বিশুদ্ধ ও প্রামাণ্য রেওয়ায়েত ও হদীসের মাধ্যমে ঘটনাটি বিবৃত করা বাঞ্ছনীয়। ঘটনাটি হলো এই যে, বদর যুদ্ধটি ছিল ইসলামের সর্বপ্রথম জিহাদ যা একান্তই দৈবাৎ সংঘটিত হয়। তখনও জিহাদ সংক্রান্ত হুকুম-আহকামের কোনো বিস্তারিত বিবরণ কুরআনে অবতীর্ণ হয়নি। যেমন জিহাদ করতে গিয়ে গনিমতের মাল হস্তগত হলে তা কি করতে হবে, শত্রু সৈন্য নিজেদের আয়ত্তে এসে গেলে, তাকে বন্দি করা জায়েজ হবে কিনা এবং বন্দি করে ফেললে তাদের সাথে কেমন আচরণ করতে হবে প্রভৃতি।

সহীহ বুখারী ও মুসলিমের রেয়ায়েতে বর্ণিত রয়েছে যে, রাসূলে কারীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, আমাকে এমন পাঁচটি বিষয় দান করা হয়েছে, যা আমার পূর্বে অন্য কোনো নবীকে দেওয়া হয়নি সেগুলোর মাঝে এও একটি যে, কাফেরদের থেকে প্রাপ্ত গনিমতের মালামাল কারো জন্য হালাল ছিল না, কিন্তু আমার উম্মতের জন্য তা হালাল করে দেওয়া হয়েছে। গনিমতের মাল বিশেষভাবে এ উম্মতের জন্য হালাল হওয়ার বিষয়টি আল্লাহর তো জানা ছিল, কিন্তু গযওয়ায়ে বদরের পূর্ব পর্যন্ত এর হালাল হওয়ার ব্যাপারে মহানবী ﷺ–এর উপর কোনো ওহী নাজিল হয়নি। অথচ গযওয়ায়ে বদরে এমন এক পরিস্থিতির উদ্ভব হয় যে আল্লাহ তা'আলা মুসলমানগণকে ধারণা কল্পনার বাইরে অসাধারণ বিজয় দান করেন। শত্রুরা বহু মালামালও ফেলে যায়, যা গনিমত হিসাবে মুসলমানদের হস্তগত হয় এবং তাদের বড় বড় সত্তর জন সর্দারও মুসলমানদের হাতে বন্দী হয়ে আসে। কিন্তু এতদুভয় বিষয়ের বৈধতা সম্পর্কে কোনো ওহী তখনও আসেনি।

সে কারণেই সাহাবায়ে কেরামের প্রতি এহেন তাড়িৎ পদক্ষেপের দরুন ভর্ৎসনা অবতীর্ণ হয়। এ ভর্ৎসনা ও অসন্তুষ্টিই এই ওহীর মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়েছে যাতে যুদ্ধবন্দিদের সম্পর্কে বাহ্যত দুটি অধিকার মুসলমানগণকে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এরই মাঝে এ ইঙ্গিতও করা হয়েছিল যে, বিষয়টির দুটি দিকের মধ্যে আল্লাহ তা'আলার নিকট একটি পছন্দনীয় এবং অপরটি অপছন্দনীয়। তিরমিযী, সুনানে নাসায়ী, সহীহ ইবনে হাব্বান প্রভৃতি গ্রন্থে হযরত আলী মুর্তাযা (রা.)-এর রেওয়ায়েতক্রমে উদ্ধৃত করা হয়েছে যে, এ সময় হযরত জিবরাঈল আমীন রাসূলে কারীম ﷺ-এর নিকট আগমন করে তাঁকে আল্লাহর এ নির্দেশ শোনান যে, আপনি সাহাবায়ে কেরামকে দুটি বিষয়ের যে কোনো একটি গ্রহণ করার অধিকার দান করুন। তার একটি হলো এই যে, এ যুদ্ধবন্দিদেরকে হত্যা করে শত্রুর মনোবলকে চিরতরে ভেঙ্গে দেবে। আর দ্বিতীয়টি হলো এ যে, তাদেরকে মুক্তিপণের বিনিময়ে ছেড়ে দেবে। তবে দ্বিতীয় অবস্থায়, আল্লাহ তা'আলার নির্দেশক্রমে

www.almodina.com

একথা অবধারিত হয়ে রয়েছে যে, এর বদলা হিসাবে আগামী বছর মুসলমানদের এমনি সংখ্যক লোক শহীদ হবেন, যে সংখ্যক বন্দি আজ মুক্তি পণের বিনিময়ে ছেড়ে দেওয়া হবে। এভাবে যদিও ক্ষমতা দেওয়া হয় এবং সাহাবায়ে কেরামকে এ দু'টি থেকে একটি বেছে নেওয়ার অধিকার দেওয়া হয় কিন্তু দ্বিতীয় অবস্থায় সত্তরজন সাহাবার শাহাদাতের ফয়সালার বিষয় উল্লেখ করার মাঝে অবশ্যই এই ইঙ্গিত বিদ্যমান ছিল যে, এ দিকটি আল্লাহর নিকট পছন্দনীয় নয়। কারণ এটি যদি পছন্দই হতো, তবে এর ফলে সত্তরজন মুসলমানের খুন অবধারিত হতো না।

সাহাবায়ে কেরামের সামনে এ দুটি বিষয় যখন ঐচ্ছিক বিষয় হিসাবে পেশ করা হলো যে, এদেরকে যদি মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়। তবে হয়তো এরা সবাই অথবা এদের কেউ কেউ কোনো সময় মুসলমান হয়ে যাবে। আর প্রকৃতপক্ষে এটাই হলো জিহাদের উদ্দেশ্য ও মূল উপকারিতা। দ্বিতীয়ত এমনও ধারণা করা হয়েছিল যে, এ সময় মুসলমানগণ যখন নিদারুণ দৈন্যাবস্থায় দিন কাটাচ্ছেন, তখন সত্তরজনের আর্থিক মুক্তিপণ অর্জিত হলে এ কষ্টও কিছুটা লাঘব হতে পারে এবং তা ভবিষ্যতে জিহাদের প্রস্তুতির জন্যও সহায়ক হতে পারে। রইল সত্তর জন মুসলমানের শাহাদাতের বিষয়। প্রকৃতপক্ষে এটাও একটা বিপুল গৌরবের বিষয়। এতে ঘাবড়ানো উচিত নয়। এসব ধারণার প্রেক্ষিতে হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা.) ও অন্যান্য অধিকাংশ সাহাবায়ে কেরাম এ মতই প্রদান করলেন যে, বন্দিগণকে মুক্তিপণ নিয়ে মুক্ত করে দেওয়া হোক। শুধুমাত্র হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রা.) ও হযরত সা'দ ইবনে মু'আয (রা.) প্রমুখ কয়েকজন এ মতের বিরোধিতা করলেন এবং বন্দীদের সবাইকে হত্যা করার পক্ষে মত দান করলেন। তাদের যুক্তি ছিল এই যে, একান্ত সৌভাগ্যক্রমে ইসলামের মোকাবিলায় শক্তি ও সামর্থ্যের বলে যোগদানকারী সমস্ত কুরাইশ সর্দার এখন মুসলমানদের হস্তগত হলেও পরে তাদের ইসলাম গ্রহণ করার বিষয়টি একান্তই কল্পনা নির্ভর। কিন্তু ফিরে গিয়ে এরা যে মুসলমানদের বিরুদ্ধে অধিকতর তৎপরতা প্রদর্শন করবে সে ধারণাই প্রবল।

রাসূলে কারীম ﷺ যিনি রাহমাতুল্লিল আলামীন হয়ে আগমন করেছিলেন এবং আপাদমস্তক করুণার আধার ছিলেন, তিনি সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে দুটি মত লক্ষ্য করে সে মতটিই গ্রহণ করে নিলেন, যাতে বন্দীদের ব্যাপারে রহমত ও করুণা প্রকাশ পাচ্ছিল এবং বন্দীদের জন্যও ছিল সহজ। অর্থাৎ মুক্তিপণের বিনিময়ে তাদেরকে মুক্ত করে দেওয়া। তিনি সিদ্দীকে আকবর (রা.) ও ফারুকে আযম (রা.) -কে উদ্দেশ্য করে বললেন- لَوِ اتَّفَقْتُمَا مَا خَالَفْتُكُمَا অর্থাৎ 'তোমরা উভয়ে যদি কোনো বিষয়ে একমত হয়ে যেতে তবে আমি তোমাদের বিরোধিতা করতাম না।' [মাযহারী] তাঁদের মতবিরোধের ক্ষেত্রে বন্দিদের প্রতি সহজতা প্রদর্শন করাই ছিল সৃষ্টির প্রতি তাঁর দয়া ও করুণার তাকাদা। অতএব, তাই হলো। আর তারই পরিণতিতে পরবর্তী বছর খোদায়ী বাণী মোতাবেক সত্তরজন মুসলমানের শাহাদাতের ঘটনা সংঘটিত হলো।

تُرِيْدُوْنَ عَرَضَ الدُّنْيَا আয়াতে সে সমস্ত সাহাবীকে সম্বোধন করা হয়েছে, যারা মুক্তিপণের বিনিময়ে বন্দিদের ছেড়ে দেওয়ার পক্ষে মত দিয়েছিলেন। এতে বলা হয়েছে যে, তোমরা আমার রাসূলকে অসঙ্গত পরামর্শ দান করছো। কারণ শত্রুদেরকে বশে পাওয়ার পারেও তাদের শক্তি ও দম্ভকে চূর্ণ করে না দিয়ে অনিষ্টকর শত্রুকে ছেড়ে দিয়ে মুসলমানদের জন্য স্থায়ী বিপদ দাঁড় করিয়ে দেওয়া কোনো নবীর পক্ষেই শোভন নয়।

এ আয়াতে حَتّٰى يُثْخِنَ فِى الْاَرْضِ বাক্য ব্যবহৃত হয়েছে اِثْخَان -এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে কারোও শক্তি ও দম্ভকে ভেঙ্গে দিতে গিয়ে কঠোরতার ব্যবস্থা নেওয়া এ অর্থের তাকিদ বুঝাবার জন্য فِى الْاَرْضِ বাক্যের প্রয়োগ। এর সারার্থ হলো এই যে, শত্রুর দম্ভকে ধূলিসাৎ করে দেন।

যেসব সাহাবী মুক্তিপণ নিয়ে বন্দিদের ছেড়ে দেওয়ার পক্ষে মত দিয়েছিলেন, তাঁদের সে মতে যদিও নির্ভেজাল একটি দীনি প্রেরণাও বিদ্যমান ছিল অর্থাৎ মুক্তি পাবার পর তাদের মুসলমান হয়ে যাবার আশা, কিন্তু সেই সাথে আত্মস্বার্থজনিত অপর একটি দিকও ছিল যে, এতে করে তাদের হাতে কিছু অর্থসম্পদ এসে যাবে। অথচ তখন পর্যন্ত কোনো সরাসরি 'নস' বা খোদায়ী বাণীর মাধ্যমে সে সমস্ত মালামালের বৈধতা প্রমাণিত ছিল না। কাজেই মানুষের যে সমাজটিকে রাসূলে কারীম ﷺ-এর তত্ত্বাবধানে এমন মানদণ্ডের উপর গঠন করা হচ্ছিল, যাতে তাদের মর্যাদা ফেরেশতাদের চেয়েও বেশি হবে, তাদের পক্ষে গনিমতের সে মাল সামান বা দ্রব্য সামগ্রীর আগ্রহকেও এক রকম পাপ বলে গণ্য করা হয়। তাছাড়া যে কাজে বৈধাবৈধের সমন্বয় থাকে, তার সমষ্টিকে অবৈধ বলেই বিবেচনা করা হয়। সেজন্যই সাহাবায়ে কেরামের সে কাজটিকে ভর্ৎসনাযোগ্য সাব্যস্ত করে বলা হয়েছে- تُرِيْدُوْنَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللّٰهُ يُرِيْدُ الْاٰخِرَةَ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ অর্থাৎ তোমরা দুনিয়া কামনা করছ অথচ তোমাদের কাছ থেকে আল্লাহ চান, তোমরা যেন আখেরাত কামনা কর। এখানে ভর্ৎসনা হিসাবে

শুধুমাত্র তাদের সে কাজের কথাই উল্লেখ করা হয়েছে যা ছিল অসন্তুষ্টির কারণ। বন্দিদের মুসলমান হওয়ার আশা সংক্রান্ত দ্বিতীয় কারণটির কথা এখানে উল্লেখ করা হয়নি। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, সাহাবায়ে কেরামের মতো নিঃস্বার্থ, পবিত্রাত্মা দলের পক্ষে এমন দ্ব্যর্থবোধক নিয়ত করা, যাতে কিছু পার্থিব স্বার্থও নিহিত থাকবে গ্রহণযোগ্য নয়। এখানে এ বিষয়টিও লক্ষনীয় যে, এ আয়াতে ভর্ৎসনা ও সতর্কীকরণের লক্ষ্যস্থল হলেন সাহাবায়ে কেরাম (রা.)। যদিও রাসূলে কারীম ﷺ নিজেও তাঁদের মতামত সমর্থন করে তাদের সাথে আংশিকভাবে যুক্ত হয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর সে কাজটি ছিল একান্তভাবেই তাঁর রাহমাতুল্লিল আলামীন বৈশিষ্ট্যের বহিঃপ্রকাশ। সে কারণেই তিনি মতানৈক্যের ক্ষেত্রে সে দিকটিই গ্রহণ করে নিয়েছিলেন, যা বন্দীদের পক্ষে সহজ ও দয়াভিত্তিক।

আয়াতের শেষাংশে وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা মহাপরাক্রমশীল, হেকমতওয়ালা; আপনারা যদি তাড়াহুড়া না করতেন, তবে তিনি স্বীয় অনুগ্রহে পরবর্তী বিজয়ে আপনাদের জন্য ধনসম্পদের ব্যবস্থাও করে দিতেন।

মাসআলা : উল্লিখিত আয়াতে মুক্তিপণের বিনিময়ে বন্দিদের মুক্তিদান ও গনিমতের মালামাল সংগ্রহের কারণে ভর্ৎসনা নাজিল হয়েছে এবং আল্লাহর আজাবের প্রতি ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে এবং পরে তা ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে কিন্তু এতে ভবিষ্যতে এ সমস্ত ব্যাপারে মুসলমানগণকে কোন পন্থা অবলম্বন করতে হবে, তা পরিষ্কারভাবে বুঝা যায় না। সে কারণেই পরবর্তী আয়াতে গনিমতের মালামাল সংক্রান্ত মাসআলাটি পরিষ্কার করে দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে– فَكُلُوْا مِمَّا غَنِمْتُمْ অর্থাৎ গনমিতের যেসব মালামাল তোমাদের হস্তগত হবে, এখন থেকে সেগুলো তোমরা খেতে পারবে এবং ভবিষ্যতের জন্যও তা হালাল করে দেওয়া হলো। কিন্তু তার পরেও এতে একটি সন্দেহের অবকাশ থেকে যায় যে, গনিমতের মাল হালাল হওয়ার নির্দেশটি তো এখন হলো; কিন্তু ইতঃপূর্বে সে মালামাল সংগ্রহ করে নেওয়া হয়েছিল হয়তো সেগুলোতে কোনো রকম কারাহাত বা দোষ থাকতে পারে। সেজন্যই এরপর حَلٰلًا طَيِّبًا বলে সে সন্দেহের অপনোদন করা হয়েছে যে, যদিও বৈধতার হুকুম নাজিল হওয়ার প্রাক্কালে গনিমতের মাল সংগ্রহের পদক্ষেপ নেওয়া জায়েজ ছিল না, কিন্তু এখন যখন গনিমতের মালের বৈধতা সংক্রান্ত হুকুম এসে গেছে, তখন সংগৃহীত মালামালও নির্দোষভাবেই হালাল।

মাসআলা : এখানে উসূলে ফিকহের একটি বিষয় লক্ষণীয় ও প্রণিধানযোগ্য। তা হলো এই যে, যখন কোনো অবৈধ পদক্ষেপের পর স্বতন্ত্র কোনো আয়াতের মাধ্যমে সে বিষয়টিকে হালাল করার নির্দেশ অবতীর্ণ হয়, তখন তাতে পূর্ববর্তী পদক্ষেপের কোনোই প্রভাব থাকে না। সে মালামাল যথার্থভাবেই পবিত্র ও হালাল হয়ে যায়।

শব্দ বিশ্লেষণ

اَيَّدَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ اثبات فعل ماضى معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّاْيِيْدُ মূলবর্ণ (ا - ى - د) জিনস দুরাক্কাব اجوف يائى ও مهموز فاء অর্থ–তিনি শক্তিশালী করেছেন।

اَلَّفَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ اثبات فعل ماضى معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّاْلِيْفُ মূলবর্ণ (ا - ل - ف) জিনস مهموز فاء অর্থ–তিনি প্রীতি সৃষ্টি করেছেন।

حَرِّضْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّحْرِيْضُ মূলবর্ণ (ح - ر - ض) জিনস صحيح অর্থ–আপনি উৎসাহিত করুন, আপনি উদ্বুদ্ধ করুন।

اَسْرٰى : শব্দটি বহুবচন; একবচন اَسِيْرٌ অর্থ–বন্দি,কয়েদি, আটককৃত, যুদ্ধবন্দি।

يُثْخِنَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ اثبات فعل مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِثْخَانُ মূলবর্ণ (ث - خ - ن) জিনসে صحيح অর্থ–সে প্রচুর রক্তপাত ঘটাবে।

عَرَضٌ : শব্দটি একবচন; বহুবচনে اَعْرَاضٌ অর্থ– সম্পদ, সামগ্রী, ধনসম্পদ।

كُلُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْاَكْلُ মূলবর্ণ (ا - ك - ل) জিনস مهموز فاء অর্থ– তোমরা খাও, তোমরা আহার কর।

طَيِّبًا : সীগাহ واحد مذكر বহছ صفة مشبه বাব ضَرَبَ মাসদার اَلطِّيْبُ মূলবর্ণ (ط - ى - ب) জিনস اجوف يائى অর্থ– উত্তম, পাক-পবিত্র।

يَاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّمَنْ فِيْۤ اَيْدِيْكُمْ مِّنَ الْاَسْرٰۤى ۙ اِنْ يَّعْلَمِ اللّٰهُ فِيْ قُلُوْبِكُمْ خَيْرًا يُّؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّاۤ اُخِذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ (٧٠)

অনুবাদ : (৭০) হে নবী! আপনার অধিকারে যে সমস্ত বন্দি রয়েছে, আপনি তাদেরকে বলে দিন যে, যদি আল্লাহ তা'আলা তোমাদের অন্তরে ঈমান দেখতে পান, তবে তোমাদের নিকট হতে যা কিছু গ্রহণ করা হয়েছে, তদপেক্ষা উত্তম বস্তু তোমাদেরকে প্রদান করবেন এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন, আর আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

وَاِنْ يُّرِيْدُوْا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللّٰهَ مِنْ قَبْلُ فَاَمْكَنَ مِنْهُمْ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ (٧١)

(৭১) আর যদি তারা আপনার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করার ইচ্ছা রাখে, তবে এর পূর্বে আল্লাহর সাথে [-ও] তারা বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল, অতঃপর আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করে দিলেন, আর আল্লাহ মহাজ্ঞানী, বড় হেকমতওয়ালা।

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ اٰوَوْا وَّنَصَرُوْۤا اُولٰٓئِكَ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ؕ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ يُهَاجِرُوْا مَا لَكُمْ مِّنْ وَّلَايَتِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ حَتّٰى يُهَاجِرُوْا ۚ

(৭২) নিঃসন্দেহে যারা ঈমান এনেছে এবং হিজরতও করেছে এবং নিজেদের ধন ও প্রাণ দ্বারা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদও করেছে, আর যারা [মুহাজিরদেরকে] আশ্রয় দান করেছে, এবং সাহায্য করেছে তারা পরস্পর একে অন্যের ওয়ারিশ হবে, আর যারা ঈমান তো এনেছে, অথচ হিজরত করেনি, তাদের সাথে তোমাদের উত্তরাধিকারিত্বের কোনো সংস্রব নেই, যে পর্যন্ত না তারা হিজরত করে,

শাব্দিক অনুবাদ

(৭০) يَاَيُّهَا النَّبِيُّ ط হে নবী! قُلْ আপনি বলে দিন لِّمَنْ فِيْۤ اَيْدِيْكُمْ مِّنَ الْاَسْرٰۤى আপনার অধিকারে যে সমস্ত বন্দি রয়েছে তাদেরকে যে, اِنْ يَّعْلَمِ اللّٰهُ فِيْ قُلُوْبِكُمْ خَيْرًا যদি আল্লাহ তা'আলা তোমাদের অন্তরে ঈমান দেখতে পান يُّؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّاۤ اُخِذَ مِنْكُمْ তবে তোমাদের নিকট হতে যা কিছু গ্রহণ করা হয়েছে তদপেক্ষা উত্তম বস্তু তোমাদেরকে প্রদান করবেন وَيَغْفِرْ لَكُمْএবং তোমদেরকে ক্ষমা করবেন وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ আর আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

(৭১) وَاِنْ يُّرِيْدُوْا خِيَانَتَكَ ط আর যদি তারা আপনার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করার ইচ্ছা রাখে فَقَدْ خَانُوا اللّٰهَ مِنْ قَبْلُ তবে এর পূর্বে আল্লাহর সাথে [-ও] তারা বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল فَاَمْكَنَ مِنْهُمْ অতঃপর আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করে দিলেন وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ আর আল্লাহ মহাজ্ঞানী, বড় হেকমতওয়ালা।

(৭২) اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا নিঃসন্দেহে যারা ঈমান এনেছে। وَهَاجَرُوْا এবং হিজরতও করেছে। وَجٰهَدُوْا এবং জিহাদও করেছে بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ নিজেদের ধন ও প্রাণ দ্বারা فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ আল্লাহর রাস্তায়। وَالَّذِيْنَ اٰوَوْا আর যারা [মুহাজিরদেরকে] আশ্রয় দান করেছে। وَنَصَرُوْا এবং সাহায্য করেছে اُولٰٓئِكَ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ তারা পরস্পর একে অন্যের ওয়ারিশ হবে। وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا আর যারা ঈমান তো এনেছে। وَلَمْ يُهَاجِرُوْا অথচ হিজরত করেনি مَا لَكُمْ مِّنْ وَّلَايَتِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ তাদের সাথে তোমাদের উত্তরাধিকারিত্বের কোনো সংস্রব নেই। حَتّٰى يُهَاجِرُوْا যে পর্যন্ত না তারা হিজরত করে,

وَاِنِ اسْتَنْصَرُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ اِلَّا عَلٰى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيْثَاقٌ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ (٧٢)

অনুবাদ : আর যদি তারা তোমাদের নিকট ধর্মীয় ব্যাপারে সাহায্য চায়, তবে তোমাদের জিম্মায় সাহায্য করা ওয়াজিব, কিন্তু ঐ সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে নয়– তোমাদের মধ্যে এবং তাদের মধ্যে পরস্পর [সন্ধির] অঙ্গীকার রয়েছে। আর আল্লাহ তা'আলা তোমাদের সকল কার্যকলাপ দেখেন।

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ؕ اِلَّا تَفْعَلُوْهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِى الْاَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيْرٌ (٧٣)

(৭৩) আর যারা কাফের তারা পরস্পর একে অন্যের উত্তরাধিকারী, যদি এটার [অর্থাৎ এই বিধানের] উপর আমল না কর, তবে ভূপৃষ্ঠে বড় ফেতনা ও মহা বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়বে।

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ اٰوَوْا وَّنَصَرُوْۤا اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَقًّا ؕ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ (٧٤)

(৭৪) আর যারা মুসলমান হয়েছে এবং হিজরত করেছে এবং আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে আসছে, আর যারা নিজেদের নিকট আশ্রয় দান করেছে এবং তাদের সাহায্য করেছে, এরাই হচ্ছে ঈমানের পূর্ণ হক আদায়কারী, তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও অতি সম্মানজনক রিজিক।

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْۢ بَعْدُ وَهَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا مَعَكُمْ فَاُولٰٓئِكَ مِنْكُمْ ؕ وَاُولُوا الْاَرْحَامِ بَعْضُهُمْ اَوْلٰى بِبَعْضٍ فِىْ كِتٰبِ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ (٧٥)

(৭৫) আর যারা [নবী ﷺ-এর হিজরতের] পরবর্তী কালে ঈমান আনয়ন করেছে এবং হিজরত করেছে এবং তোমাদের সঙ্গে একত্রেও জিহাদ করেছে, বস্তুতঃ তারা তোমাদেরই অন্তর্ভুক্ত, আর যারা [পরস্পর] আত্মীয়, তারা [অনাত্মীয়দের তুলনায়] একে অন্যের [মিরাসের] অধিক হকদার, আল্লাহর কিতাব [অর্থাৎ শরিয়তের বিধান] মতে, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক বস্তুকে ভালোভাবে জানেন।

শাব্দিক অনুবাদ

وَاِنِ اسْتَنْصَرُوْكُمْ আর যদি তারা তোমাদের নিকট সাহায্য চায় فِى الدِّيْنِ ধর্মীয় ব্যাপারে فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ তবে তোমাদের জিম্মায় সাহায্য করা ওয়াজিব اِلَّا عَلٰى قَوْمٍ কিন্তু ঐ সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে নয়– بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيْثَاقٌ তোমাদের মধ্যে এবং তাদের মধ্যে পরস্পর [সন্ধির] অঙ্গীকার রয়েছে وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ আর আল্লাহ তা'আলা তোমাদের সকল কার্যকলাপ দেখেন।

(৭৩) وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا আর যারা কাফের بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ তারা পরস্পর একে অন্যের উত্তরাধিকারী اِلَّا تَفْعَلُوْهُ যদি এর [অর্থাৎ এই বিধানের] উপর আমল না কর تَكُنْ فِتْنَةٌ فِى الْاَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيْرٌ তবে ভূপৃষ্ঠে বড় ফিতনা ও মহাবিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়বে।

(৭৪) وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا আর যারা মুসলমান হয়েছে وَهَاجَرُوْا এবং হিজরত করেছে وَجٰهَدُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ এবং আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে আসছে وَالَّذِيْنَ اٰوَوْا আর যারা নিজেদের নিকট আশ্রয় দান করেছে وَنَصَرُوْا এবং তাদের সাহায্য করেছে اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَقًّا এরাই হচ্ছে ঈমানের পূর্ণ হক আদায়কারী لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা وَرِزْقٌ كَرِيْمٌ ও অতি সম্মানজনক রিজিক।

(৭৫) وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْۢ بَعْدُ আর যারা [নবী ﷺ-এর হিজরতের] পরবর্তী কালে ঈমান আনয়ন করেছে وَهَاجَرُوْا এবং হিজরত করেছে وَجٰهَدُوْا مَعَكُمْ এবং তোমাদের সঙ্গে একত্রেও জিহাদ করেছে فَاُولٰٓئِكَ مِنْكُمْ বস্তুতঃ তারা তোমাদেরই অন্তর্ভুক্ত وَاُولُوا الْاَرْحَامِ আর যারা [পরস্পর] আত্মীয় بَعْضُهُمْ اَوْلٰى بِبَعْضٍ তারা [অনাত্মীয়দের তুলনায়] একে অন্যের [মিরাসের] অধিক হকদার فِىْ كِتٰبِ اللّٰهِ আল্লাহর কিতাব [অর্থাৎ শরিয়তের বিধান] মতে اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক বস্তুকে ভালোভাবে জানেন।

www.almodina.com

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(৭০) قوله يَآيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّمَنْ فِيْٓ اَيْدِيْكُمْ مِّنَ الْاَسْرٰٓى الخ **আয়াতের শানে নুযূল– ১ :** হযরত মুজাহিদ , হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন– হযরত আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন যে, আলোচ্য আয়াত আমার সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। ঘটনাপ্রবাহ হচ্ছে যে, আমি যখন আমার ইসলাম গ্রহণ করার কথা রাসূল ﷺ-এর নিকট প্রকাশ করলাম এবং বন্দিকালে আমার নিকট হতে যে বিশ হাজার উকিয় দেওয়া হয়েছিল, তার হিসাব দান করার আবেদন জানলাম, তাতে রাসূল ﷺ সম্মতি দান করেননি কিন্তু এর বিনিময়ে আল্লাহ আমাকে বিশটি গোলাম দান করেছেন। বলা বাহুল্য প্রতিটি গোলামের হাতেও রয়েছে সমানভাবে এ পরিমাণের মালামাল। আমার এ মালের আগাম সুসংবাদ প্রদান করে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেছেন। –[ইবনে কাছীর-৩৩৪/২, কুরতুবী-৫৩/৮]

শানে নুযূল– ২ : হাকেম, ও বায়হাকী তার সুনান গ্রন্থে হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, মক্কাবাসীরা যখন তাদের যুদ্ধবন্দিদের ছাড়িয়ে নেওয়ার জন্য মুক্তিপণ প্রেরণ করল, তখন নবী কন্যা হযরত যয়নব বিনতে রাসূলুল্লাহ ﷺ মা হযরত খাদীজা (রা.) হতে প্রাপ্ত হারটি তার স্বামী আবিল আস -এর মুক্তিপণ স্বরূপ প্রেরণ করলেন। রাসূল ﷺ তা দেখে আত্যন্ত মর্মাহত হলেন এবং সাহাবায়ে কেরামকে বললেন যে, তোমরা যদি ইচ্ছে কর, তাহলে তার বদিকে মুক্তি দিয়ে দিতে পার এবং হযরত আব্বাস (রা.) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি মুসলমান। তিনি বললেন, তোমার ইসলাম সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলাই ভালো জানেন। তোমার কথা যদি সত্য হয়ে থাকে, তাহলে আল্লাহ তার প্রতিদান অবশ্যই দেবেন। সুতরাং তুমি তোমার এবং তোমার দুই ভ্রাতুষ্পুত্র নাওফল ইবনে হারেছ ও আকীল ইবনে আবী তালেব এবং তোমারই মিত্র উতবা ইবনে ওমরের মুক্তিপণ দাও। তখন তিনি বললেন, তাতো আমার নিকট নেই হে আল্লাহর রাসূল! ফলে রাসূল ﷺ বললেন যে, তুমি ও তোমার স্ত্রী উম্মে ফযল যে সম্পদ দাফন করে রেখেছ তা কোথায়? হযরত আব্বাস (রা.) বললেন, আমি যদি মৃত্যুবরণ করি তাহলে তা আমার পুত্রের জন্য। অতঃপর বললেন যে, হে আল্লাহর রাসূল! এ মাল সম্পর্কে আমি ও উম্মে ফযল ছাড়া আর কেউ জানে না। সুতরাং আমার নিকট হতে যা প্রাপ্ত হয়েছেন তাতেই মেনে যান। রাসূল ﷺ তাতে রাজি না হয়ে বললেন যে, তোমার ও তোমার দুই ভাতিজা এবং তোমার মিত্রের মুক্তিপণ দাও। সুতরাং তিনি নিজের ও দুই ভাতিজা ও তার মিত্রের মুক্তিপণ (ফেদিয়া) আদায় করেন। তবে আইনানুযায়ী এ ফেদিয়া প্রদান করার বিনিময়ে উত্তম প্রতিদানের সুসংবাদ প্রদান করে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[দুররে মানছুর-২০৪/৩, ফাতহুল কাদীর-৩২৯/২]

শানে নুযূল– ৩ : ইবনে জুরাইজ, আত্বা আল-খুরাসানীর উদ্ধৃতি দিয়ে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণনা করেন যে, يَآيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّمَنْ فِيْٓ اَيْدِيْكُمْ مِّنَ الْاَسْرٰٓى নাজিল হলে হযরত আব্বাস (রা.) ও তাঁর সাথিগণ বললেন যে, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি যা কিছু নিয়ে আবির্ভূত হয়েছেন তার প্রতি আমরা ঈমান এনেছি এবং আপনি আল্লাহর প্রেরিত রাসূল ﷺ সে কথারও দৃঢ় কণ্ঠে সাক্ষী দিচ্ছি। আমরা আমাদের গোত্রের মোকাবিলায় অবশ্যই আপনাকে সাহায্যকারী। তখন আল্লাহ তা'আলা নাজিল করেন اِنْ يَّعْلَمِ اللّٰهُ فِيْ قُلُوْبِكُمْ خَيْرًا يُّؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّآ اُخِذَ مِنْكُمْ – [ইবনে কাছীর-৩৩৫/২]

শানে নুযূল– ৪ : রূহুল মা'আনীর এক বর্ণনায় এসেছে যে, আলোচ্য আয়াত হযরত আব্বাস (রা.)-এর সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। তিনি বলেন যে, আমি মুসলমান হয়েছিলাম, তবে কাফেররা আমাকে আসতে বাধ্য করেছে। তখন রাসূল ﷺ বললেন যে, তুমি যা বলছ তা যদি সত্য হয়ে থাকে, আল্লাহ তোমাকে তার প্রতিদান দেবেন। তবে তোমার বাহ্যিক দিক দিয়ে তোমার এবং তোমার ভাতিজাদ্বয় নওফল বিন হারেছ ও আকীল ইবনে আবী তালিব ও তোমার মিত্র উতবা ইবনে আমরের ফিদিয়া (মুক্তিপণ) প্রদান কর। তখন আমি বললাম যে, হে আল্লাহর রাসূল! তাতো আমার নিকট নেই। রাসূল ﷺ বললেন যে, তুমি ও উম্মে ফযল মিলে যা দাফন করে রেখেছ সেই সম্পদ কোথায়? জবাবে আমি বললাম, আমার উপর কি বিপদ আপতিত হবে তা তো আমার জানা নেই। আমি যদি দুনিয়াতে না থাকি, তাহলে সেই সম্পদ আপনার আব্দুল্লাহ, উবাইদুল্লাহ ও কাসেমের জন্য। অতঃপর আমি বললাম যে, হে আল্লাহর রাসূল! আমার সেই মাল সম্পর্কে আপনাকে অবগত কে করলেন? রাসূল ﷺ বললেন যে, আমার রব আমাকে জানিয়ে দিয়েছেন। হযরত আব্বাস (রা.) তৎক্ষণাত বললেন যে, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি সত্যবাদী, আর আল্লাহ ছাড়া আর অন্য কোনো উপাস্য নেই। আর

www.almodina.com

নিশ্চয় আপনি হলেন আল্লাহর প্রেরিত রাসূল। এ সম্পর্কে একমাত্র আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ জানার উপায় নেই। আমি উম্মে ফযলের নিকট সে মাল রাতের গভীর ঘন আঁধারে রেখে দিয়েছি। সে সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[রূহুল মা'আনী-৩৬/৫]

হযরত আব্বাস (রা.) কর্তৃক অপর এক বর্ণনায় রয়েছে যে, তিনি বলেন, আল্লাহ আমাকে এর চেয়ে (মুক্তিপণে আদায় কৃত মাল অপেক্ষা) অধিক দিয়েছেন। এখন আমার বিশটি গোলাম রয়েছে। তাদের নিকট রয়েছে বিশ হাজার মুদ্রা করে। আল্লাহ আমাকে যমযম দিয়েছেন, যা মক্কার মধ্যে সকল মাল অপেক্ষা আমার নিকট অতি প্রিয়তম বস্তু। আর আমি আমার রবের ক্ষমার প্রত্যাশায় রয়েছি। –[রুহুল মা'আনী-৩৭/৫]

(৭১) قوله وَاِنْ يُّرِيْدُوْا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللّٰهَ مِنْ قَبْلُ فَاَمْكَنَ مِنْهُمْ ۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ **আয়াতের শানে নুযূল :** হযরত কাতাদাহ বলেন, আলোচ্য আয়াত আব্দুল্লাহ ইবনে সা'আদ ইবনে আবী রেবাহ কাতেবে ওহী সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। সে যখন মুরতাদ হয়ে মুশরিকদের সাথে মিলে যায়, তখন আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে।

ইবনে জুরাইজ, আতা আল খুরাসানীর বরাত দিয়ে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণনা করেন যে, আলোচ্য আয়াত হযরত আব্বাস (রা.) ও তাঁর সাথি সঙ্গীদের সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। তারা যখন বলেছিল যে, আমরা আমাদের গোত্রের মোকাবিলায় আপনার পক্ষ অবলম্বনকারী। তখন আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়। –[ইবনে কাছীর-৩৩৫/২]

(৭৫) قوله وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْۢ بَعْدُ وَهَاجَرُوْا وَجَاهَدُوْا مَعَكُمْ **আয়াতের শানে নুযূল– ১ :** আবূ বকর তা'য়ালিসী, তাবারানী ও অন্যান্য তাফসীরবিদগণের মতানুসারে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) কর্তৃক বর্ণিত রয়েছে যে, রাসূল ﷺ মক্কা হতে মদিনায় হিজরত করে চলে যাবার পর নিঃসম্বল মুহাজির এবং আনসারগণের মধ্যে তিনি ভ্রাতৃত্বতা স্থাপন করে দিলেন। ফলে মুহাজির ও আনসারী সাহাবীগণ একে অপরের মাল থেকে মরণোত্তর ওয়ারিশত্ব সূত্রে ত্যাজ্য সম্পদের অধিকারী হতো। সে ওয়ারিশত্ব বিধানকে রহিতকরণার্থে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ করা হয়। অতঃপর মৈত্রীতা সূত্রে ওয়ারিশত্ব অধিকারকে ছেড়ে দিয়ে বংশীয় সূত্রে ওয়ারিশত্বকে প্রচলন করেন।

শানে নুযূল– ২ : ইবনে মারদুভিয়া হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হাদীছ বর্ণনা করে তিনি বলেন যে, মুসলমানরা যখন মদিনায় আগমন করেন, তখন তারা হিজরতের মধ্যস্থতায় একে অপরের ওয়ারিশ হতেন অতঃপর আলোচ্য আয়াত নাজিল হবার মাধ্যমে তা রহিত হয়ে যায়। –[রূহুল মা'আনী-৩৯/৫, দূররে মানছুর-২০৭/৩, ফতহুল কাদীর-৩৩১/২]

শানে নুযূল– ৩ : আবূ উবাইদা, ইবনে জারীর, ইবনুল মুনযির ও ইবনে মারদুভিয়া প্রমুখ ইবনে যুবাইর হতে বর্ণনা করেন যে, কোনো এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তির সাথে এ মর্মে চুক্তি স্থাপন করে যে, তুমি আমার ওয়ারিশ হবে, আমি তোমার ওয়ারিশ হবো। তখন আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়। –[দুররে মানছূর-২০৭/৩]

قوله يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّمَنْ فِيْۤ اَيْدِيْكُمْ مِّنَ الْاَسْرٰۤى الخ গযওয়ায়ে বদরের বন্দিদেরকে মুক্তিগণ নিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়। ইসলাম ও মুসলমানদের সে শত্রু যারা তাদেরকে কষ্ট দিতে, মারতে এবং হত্যা করতে কখনই কোনো ত্রুটি করেনি, যখনই কোনো রকম সুযোগ পেয়েছে একন্ত নির্দয়ভাবে অত্যাচার-উৎপীড়ন করেছে, মুসলমানদের হাতে বন্দি হয়ে আসার পর এহেন শত্রুদেরকে প্রাণে বাঁচিয়ে দেওয়াটা সাধারণ ব্যাপার ছিল না, এটা ছিল তাদের জন্য বিরাট প্রাপ্তি এবং অসাধারণ দয়া ও করুণা। পক্ষান্তরে মুক্তিপণ হিসাবে তাদের কাছ থেকে যে অর্থ গ্রহণ করা হয়েছিল, তাও ছিল অতি সাধারণ।

এটা আল্লাহ তা'আলার একান্ত মেহেরবানি ও দয়া যে, এই সাধারণ অর্থ পরিশোধ করতে গিয়ে যে কষ্ট তাদের করতে হয়, তাও তিনি কি চমৎকারভাবে দূর করে দিয়েছেন। উল্লিখিত আয়াতে ইরশাদ হয়েছে, আল্লাহ তা'আলা যদি তোমাদের মন-মানসিকতায় কোনো রকম কল্যাণ দেখতে পান, তবে তোমাদের কাছ থেকে যা কিছু নেওয়া হয়েছে, তার চেয়ে উত্তম বস্তু তোমাদের দিয়ে দেবেন। তদুপরি তোমাদের অতীত পাপও তিনি ক্ষমা করে দেবেন। এভাবে خير অর্থ ঈমান ও নিষ্ঠা অর্থাৎ মুক্তি লাভের পর সেসব বন্দিদের মধ্যে যারা পরিপূর্ণ নিষ্ঠার সাথে ঈমান ও ইসলাম গ্রহণ করবে, তারা যে মুক্তিপণ দিয়েছে, তার চাইতে অধিক ও উত্তম বস্তু পেয়ে যাবে। বন্দিদেরকেমুক্ত করে দেওয়ার সাথে সাথে তাদেরকে এমনভাবে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে যে, তারা যেন মুক্তি লাভের পর নিজেদের লাভক্ষতির প্রতি মনোনিবেশ সহকারে লক্ষ্য করে। সুতরাং বাস্তব ঘটনার দ্বারা প্রমাণিত রয়েছে যে, তাদের মধ্যে যারা মুসলমান হয়েছিলেন, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ক্ষমা এবং জান্নাতে সুউচ্চ স্থান দান ছাড়াও পার্থিব জীবনে এত অধিক পরিমাণ ধনসম্পদ দান করেছিলেন, যা তাদের দেওয়া মুক্তিপণ অপেক্ষা বহুগুণে উত্তম ও অধিক ছিল।

www.almodina.com

অধিকাংশ তাফসীরবিদ বলেছেন যে, এ আয়াতটি মহানবী ﷺ -এর পিতৃব্য হযরত আব্বাস (রা.) সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছিল। কারণ তিনিও বদরের যুদ্ধবন্দিদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তাঁর কাছ থেকেও মুক্তিপণ নেওয়া হয়েছিল। এ ব্যাপারে তাঁর বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, মক্কা থেকে তিনি যখন বদর যুদ্ধে যাত্রা করেন, তখন কাফের সৈন্যদের জন্য ব্যয় করার উদ্দেশ্যে প্রায় সাতশ' স্বর্ণমুদ্রা সাথে নিয়ে যাত্রা করেছিলেন। কিন্তু সেগুলো ব্যয় করার পূর্বেই তিনি গ্রেফতার হয়ে যান। যখন মুক্তিপণ দেওয়ার সময় আসে, তখন তিনি রাসূলে কারীম ﷺ -এর নিকট নিবেদন করলেন আমার কাছে যে স্বর্ণ ছিল সেগুলো রেখেই আমার মুক্তিপণ হিসাবে গণ্য করা হোক। রাসূল ﷺ বললেন, যে সম্পদ আপনি কুফরির সাহায্যের উদ্দেশ্যে নিয়ে এসেছিলেন, তা তো মুসলমানদের গনিমতের মালে পরিণত হয়ে গেছে, ফিদিয়া বা মুক্তিপণ হতে হবে সেগুলো বাদে। সাথে সাথে তিনি এ কথাও বললেন যে, আপনার দুই ভাতিজা 'আকীল ইবনে আবী তালেব এবং নওফল ইবনে হারেছের মুক্তিপণ আপনাকেই পরিশোধ করতে হবে। হযরত আব্বাস (রা.) নিবেদন করলেন, আমার উপর যদি এত অধিক পরিমাণে অর্থনৈতিক চাপ সৃষ্টি করা হয়, তবে আমাকে কুরাইশদের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করতে হবে, আমি সম্পূর্ণভাবে ফকির হয়ে যাব। মহানবী ﷺ বললেন, কেন আপনার নিকট কি সে সম্পদগুলো নেই, যা আপনি মক্কা থেকে রওয়ানা হওয়ার প্রাক্কালে আপনার স্ত্রী উম্মুল ফযলের নিকট রেখে এসেছেন? হযরত আব্বাস (রা.) বললেন, আপনি সে কথা কেমন করে জানলেন? আমি যে রাতের অন্ধকারে একান্ত গোপনে সেগুলো আমার স্ত্রীর নিকট অর্পণ করেছিলাম এবং এ ব্যাপারে তৃতীয় কোনো লোকই অবগত নয়। রাসূল ﷺ বললেন, সে ব্যাপারে আমার পরওয়ারদেগার আমাকে বিস্তারিত অবহিত করেছেন। একথা শুনেই হযরত আব্বাস (রা.) -এর মনে রাসূল ﷺ -এর নবুয়তের সত্যতা সম্পর্কে পরিপূর্ণ বিশ্বাস সৃষ্টি হয়ে যায়। তাছাড়া এর আগেও তিনি মনে মনে হুযূর ﷺ -এর ভক্ত ছিলেন, কিন্তু কিছু সন্দেহও ছিল যা এ সময় আল্লাহ তা'আলা দূর করে দেন এবং প্রকৃতপক্ষে তিনি তখনই মুসলমান হয়ে যান। কিন্তু তিনি বহু টাকা-কড়ি মক্কার কুরাইশদের নিকট ঋণ হিসাবে প্রাপ্য ছিলেন। তিনি যদি তখনই তাঁর মুসলমান হয়ে যাওয়ার ব্যাপারটি প্রকাশ্যে ঘোষণা করতেন, তবে সে টাকাগুলো মারা যেত। কাজেই তিনি তখনই তা ঘোষণা কলেন না। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ ও এ ব্যাপারে কারো কাছে কিছু প্রকাশ করলেন না। মক্কা বিজয়ের পূর্বে তিনি মহানবী ﷺ -এর নিকট মক্কা থেকে হিজরত করে মদিনায় চলে আসার অনুমতি প্রর্থনা করলে মহানবী ﷺ তাঁকে এ পরামর্শই দিলেন, যাতে তিনি এ মুহূর্তে হিজরত না করেন।

হযরত আব্বাস (রা.)-এর এ সমস্ত কথোপথানের প্রেক্ষিতে রাসূলে কারীম ﷺ উল্লিখিত আয়াতে বর্ণিত খোদায়ী ওয়াদার বিষয়টিও তাঁকে জানিয়ে দিলেন যে, আপনি যদি মুসলমান হয়ে গিয়ে থাকেন এবং একান্ত নিষ্ঠা সহকারে ঈমান এনে থাকেন, তবে যেসব মালামাল আপনি মুক্তিপণ বাবদ খরচ করেছেন, আল্লাহ তা'আলা আপনাকে তার চেয়ে উত্তম প্রতিদান দেবেন। সুতরাং হযরত আব্বাস (রা.) ইসলাম প্রকাশের পর প্রায়ই বলে থাকতেন, আমি তো সে ওয়াদার বিকাশ ও বাস্তবতা স্বচক্ষেই প্রত্যক্ষ করছি। কারণ আমার নিকট থেকে মুক্তিপণ বাবদ বিশ উকিয়া সোনা নেওয়া হয়েছিল। অথচ এখন আমার বিশটি গোলাম (ক্রীতদাস) বিভিন্ন স্থানে আমার ব্যবসায় নিয়োজিত রয়েছে, এবং তাদের কারো ব্যবসায়ই বিশ হাজার দেরহাম থেকে কম নয়। তদুপরি হজের সময় হাজীদের পানি খাওয়ানোর খেদমতটিও আমাকেই অর্পণ করা হয়েছে যা আমার নিকট এমন এক অমূল্য বিষয় যে, সমগ্র মক্কাবাসীর যাবতীয় ধনসম্পদও এ তুলনায় তুচ্ছ বলে মনে হয়।

গযওয়ায়ে বদরের বন্দিদের মধ্যে কিছু লোক মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু তাদের সম্পর্কে লোকদের মনে একটা খটকা ছিল যে, হয়তো এরা মক্কায় ফিরে গিয়ে আবার ইসলাম থেকে ফিরে দাঁড়াবে এবং পরে আমাদের কোনো না কোনো ক্ষতি সাধনে প্রবৃত্ত হবে। পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ তা'আলা এ খটকাটি এভাবে দূর করে দিয়েছেন : وَاِنْ يُّرِيْدُوْا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللّٰهَ مِنْ قَبْلُ فَاَمْكَنَ مِنْهُمْ ۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ অর্থাৎ যদি আপনার সাথে খেয়ানত করার সংকল্পই তারা করে তবে তাতে আপনার কোনো ক্ষতিই সাধিত হবে না। এরা তো সেসব লোকই, যারা ইতিপূর্বে আল্লাহর সাথেও খেয়ানত করেছে। অর্থাৎ সৃষ্টিলগ্নে আল্লাহ তা'আলা রাব্বুল আলামীন যা বিশ্বপালক হওয়ার ব্যাপারে যে অঙ্গীকার তারা করেছিল, পরবর্তীকালে তার বিরোধিতা করতে আরম্ভ করেছিল। কিন্তু তাদের এই খেয়ানত তাদের নিজেদের জন্যই ক্ষতিকর প্রমাণিত হয়েছে। শেষ পর্যন্ত তারা অপদস্ত, পদদলিত, লাঞ্ছিত ও বন্দী হয়েছে। বস্তুত আল্লাহ তা'আলা যাদের গোপনতম রহস্য সম্পর্কেও অবহিত রয়েছেন। তিনি বড়ই সুকৌশলী, হেকমতওয়ালা। এখনও যদি তারা আপনার বিরোধিতায় প্রবৃত্ত

www.almodina.com

হয়, তবে আল্লাহর হাত থেকে অব্যাহতি লাভ করে যাবেটা কোথায়? তিনি এমনিভাবে তাদেরকে পুনরায় গ্রেফতার করে ফেলবেন। পূববর্তী আয়াতগুলোতে মুক্তিপ্রাপ্ত বন্দীদেরকে একান্ত উৎসাহ ব্যাঞ্জক ভঙ্গিতে ইসলামের প্রতি আহ্বান করা হয়েছিল। আর আলোচ্য আয়াতে তাদেরকে ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে যে, তাদের পার্থিব ও পারত্রিক কল্যাণ শুধুমাত্র ইসলাম ও ঈমানের উপরই নির্ভরশীল।

এ পর্যন্ত কাফেরদের সাথে যুদ্ধ বিগ্রহ তাদের বন্দীদশা ও মুক্তিদান এবং তাদের সাথে সন্ধি সমঝোতার বিধান সংক্রান্ত আলোচনা চলছিল। পরবর্তী আয়াতসমূহে অর্থাৎ সূরার শেষ পর্যন্ত এ প্রসঙ্গেই এক বিশেষ অধ্যায়ের আলোচনা ও তার বিধিবিধান সংক্রান্ত কিছু বিশ্লেষণ বর্ণিত হয়েছে। আর সেগুলো হচ্ছে হিজরত সংক্রান্ত হুকুম আহকাম। কারণ কাফেরদের সাথে মোকাবিলা করতে গিয়ে এমন পরিস্থিতিরও উদ্ভব হতে পারে যে, মুসলমানদের হয়তো তাদের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা থাকবে না এবং তারাও সন্ধি করতে রাজি হবে না। এহেন নাজুক পরিস্থিতিতে মুসলমানদের পরিত্রাণ লাভের একমাত্র পথ হলো হিজরত। অর্থাৎ এ নগরী বা দেশ ছেড়ে অন্য কোনো নগরী বা জনপদে গিয়ে বসতি স্থাপন করা, যেখানে স্বাধীনভাবে ইসলামি হুকুম আহকামের উপর আমল করা যাবে।

قوله إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ الخ সূরা আনফালের শেষ চারটি আয়াতে সে সমস্ত আহকাম বর্ণনাই প্রকৃত ও মূল উদ্দেশ্য যা মুসলমান মুহাজিরদের উত্তরাধিকারের সাথে সম্পৃক্ত। তবে প্রাসঙ্গিকভাবে অমুহাজির মুসলমানও অমুসলমানদের উত্তরাধিকার সংক্রান্ত আলোচনাও এসে গেছে।

এসব বিধিবিধান বা হুকুম-আহকামের সারমর্ম এই যে, যে সমস্ত লোকের উপর শরিয়তের বিধিবিধান বর্তায় তারা প্রথমত দু'ভাগে বিভক্ত : মুসলমান ও কাফের। আবার মুসলমান তখনকার দৃষ্টিতে দু'রকম; ১. মুহাজির, যারা হিজরত ফরজ হওয়ার প্রেক্ষিতে মক্কা থেকে মদিনায় এসে অবস্থান করতে থাকেন। ২. যারা কোনো বৈধ অসুবিধার দরুন কিংবা অন্য কোনো কারণে মক্কাতেই থেকে যান।

পারস্পরিক আত্মীয়তার সম্পর্ক এসব রকম লোকদের মাঝেই বিদ্যমান ছিল। কারণ ইসলামের প্রাথমিক পর্বে এমন হয়েছিল যে, পুত্র হয়তো মুসলমান হয়ে গেলেন কিন্তু পিতা কাফেরই রয়ে গেল, কিংবা পিতা মুসলমান হয়ে গেলেন কিন্তু পুত্র রয়ে গেল কাফের। তেমনিভাবে ভাই-ভাতিজা, নানা-মামা প্রভৃতির অবস্থাও ছিল তাই। তদুপরি মুহাজির অমুহাজির মুসলমানেদের মধ্যে আত্মীয়তা থাকাতো বলাই বাহুল্য।

আল্লাহ তা'আলা তাঁর অসীম রহমত ও পরম কুশলতার দরুন মৃত ব্যক্তিদের পরিত্যক্ত মাল-আসবাব তথা ধনসম্পদের অধিকারী তারই নিটবর্তী ঘনিষ্ঠ আত্মীয়স্বজনকে সাব্যস্ত করেছেন। অথচ যে যা কিছু এ পৃথিবীতে অর্জন করেছেন, প্রকৃতপক্ষে সে সমস্ত কিছুর মালিকানাই আল্লাহ তা'আলার। তাঁর পক্ষ থেকে এগুলো সারা জীবন ব্যবহার করার জন্য এগুলোর দ্বারা উপকৃত হওয়ার জন্য মানুষকে অস্থায়ী মালিক বানিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সুতরাং মানুষের মৃত্যুর পর পরিত্যক্ত সব কিছু আল্লাহ তা'আলার অধিকারে চলে যাওয়াটাই ছিল ন্যায়বিচার ও যুক্তিসম্মত। যার কার্যকর রূপ ছিল ইসলামি বায়তুল মাল তথা সরকারি কোষাগারে জমা হয়ে যাওয়ার পর তা দ্বারা সমগ্র সৃষ্টির লালন-পালন ও শিক্ষা প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। কিন্তু এমনটি করতে গেলে একদিকে মানুষের স্বাভাবিক ও প্রাকৃতিক অনুভূতি আহত হতো। তাছাড়া মানুষ যখন একথা জানত যে, মৃত্যুর পর আমার ধনসম্পদ না পাবে আমার সন্তানসন্ততি, না পারে আমার পিতামাতা, আর না পাবে আমার স্ত্রী, তখন তার ফল দাঁড়াত এই যে, স্বভাবসিদ্ধভাবে কোনো মানুষই স্বীয় মালামাল ও ধন-সম্পদ বৃদ্ধি কিংবা রক্ষণাবেক্ষণের চিন্তা করত না। শুধুমাত্র নিজের জীবন পর্যন্তই প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী সংগ্রহ করত। তার বেশি কিছু করার জন্য কেউ এতটুকু যত্নবান হতো না। বলাবাহুল্য, এতে সমগ্র মানবজাতিও সমস্ত শহর নগরীর উপর ধ্বংস ও বরবাদি নেমে আসত।

সে কারণেই আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মৃতের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে তার আত্মীয়স্বজনের অধিকার বলে সাব্যস্ত করে দিয়েছেন। বিশেষ করে এমন আত্মীয়স্বজনের উপকারিতার লক্ষ্যে সে তার জীবনে ধনসম্পদ অর্জন ও সঞ্চয় করত এবং নানা রকম কষ্ট পরিশ্রমে ব্রতী হতো।

এরই সাথে সাথে ইসলাম যে অতি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্যের প্রতিও মিরাসের বন্টন ব্যাপার লক্ষ্য রেখেছে, যার জন্য গোটা মানব জাতির সৃষ্টি। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য ও ইবাদত। এদিক দিয়ে সমগ্র মানব বিশ্বকে দু'টি পৃথক পৃথক জাতি হিসাবে গণ্য করা হয়েছে ; মুমিন ও কাফের। কুরআনে উল্লিখিত এ আয়াত خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ

এই দ্বিবিধ জাতীয়তার দর্শনই বংশ ও গোত্রগত সম্পর্কে মিরাসের পর্যায় পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। সুতরাং কোনো মুসলমান কোনো কাফের আত্মীয়ের মিরাসের কোনো অংশ পাবে না এবং কোনো কাফেরেরও তার কোনো মুসলমান আত্মীয়ের মিরাসে কোনো অধিকার থাকবে না। প্রথমোক্ত দুটি আয়াতে এ বিষয়েরই বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। বস্তুত এ নির্দেশটি চিরস্থায়ী ও অরহিত। ইসলামের প্রাথমিক যুগ থেকে শুরু করে কিয়ামত পর্যন্ত ইসলামের এ উত্তরাধিকার নীতিই বলবৎ থাকবে।

এর সাথে মুসলমান মুহাজির ও আনসারদের মিরাস সংক্রান্ত অন্য একটি হুকুম রয়েছে, যার সম্পর্কে প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে, মুসলমানগণ যতক্ষণ মক্কা থেকে হিজরত না করবে, হিজরতকারী মুসলমানদের সাথে তাদের উত্তরাধিকার সংক্রান্ত সম্পর্কও বিচ্ছিন্ন থাকবে। না কোনো মুহাজির মুসলমান তার অমুহাজির মুসলমান আত্মীয়ের উত্তরাধিকারী হবে, না অমুহাজির মুসলমানদের মিরাসের কোনো অংশ পাবে। বলাবাহুল্য, এ নির্দেশটি তখন পর্যন্তই কার্যকর ছিল যতক্ষণ না মক্কা বিজয় হয়ে যায়। কারণ মক্কা বিজয়ের পর স্বয়ং রাসূলে কারীম ﷺ ঘোষণা করে দেন– لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ অর্থাৎ মক্কা বিজয়ের পর হিজরতের হুকুমটিই শেষ হয়ে গেছে। আর হিজরতের হুকুমই যখন শেষ হয়ে গেল, তখন যারা হিজরত করবে না, তাদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদের প্রশ্নটিও শেষ হয়ে যায়।

এ কারণেই অধিকাংশ তাফসীরবিদ বলেছেন এ হুকুমটি মক্কা বিজয়ের মাধ্যমে রহিত হয়ে গেছে। পক্ষান্তরে অনুসন্ধানবিদদের মতে এ হুকুমটিও চিরস্থায়ী ও গায়রে মানসূখ, কিন্তু এটি অবস্থার প্রেক্ষিতে পরিবর্তিত হয়েছে। যে পরিস্থিতে কুরআনের অবতারণকালে এ হুকুমটি নাজিল হয়েছিল, যদি কোনো কালে কোনো দেশে এমনি পরিস্থিতির উদ্ভব হয়, তাহলে সেখানেও এ হুকুমই প্রবর্তিত হবে।

বিষয়টি বিশ্লেষণ করতে গেলে এই দাঁড়ায় যে, মক্কা বিজয়ের পূর্বে প্রতিটি মুসলিম নর-নারীর উপর হিজরত করা 'ফরযে আইন' তথা অপরিহার্য কর্তব্য হিসোবে সাব্যস্ত করা হয়েছিল। এ নির্দেশ পালন করতে গিয়ে হাতে গণা কতিপয় মুসলমান ছাড়া বাকি সব মুসলমানই হিজরত করে মদিনায় চলে এসেছিলেন। তখন মক্কা থেকে হিজরত না করা এরই লক্ষণ হয়ে গিয়েছিল যে, সে মুসলমান নয়। কাজেই অমুহাজিরদের ইসলামও তখন সন্দিগ্ধ হয়ে পড়েছিল। সেজন্যই মুহাজির অমুহাজিরদের উত্তরাধিকার স্বত্ব ছিন্ন করে দেওয়া হয়েছিল।

এখন যদি কোনো দেশে আবারও এমনি পরিস্থিতির উদ্ভব হয়, সেখানে বসবাস করে যদি ইসলামি ফারায়েয সম্পাদন করা আদৌ সম্ভব না হয়, তবে সে দেশ থেকে হিজরত করা পুনরায় ফরজ হয়ে যাবে। আর এমন পরিস্থিতিতে অতি জটিল কোনো ওজর ব্যতীত হিজরত না করা নিশ্চিতভাবে যদি কুফরির লক্ষণ বলে গণ্য হয়, তবে আবারও এ হুকুমই আরোপিত হবে। মুহাজির ও অমুহাজিরের মাঝে পারস্পরিক উত্তরাধিকার স্বত্ব বজায় থাকবে না। এ বর্ণনাতে এ বিষয়টিও স্পষ্ট হয়ে যায় যে, মুহাজির ও অমুহাজিরদের মাঝে মিরাসি স্বত্ব রহিতকরণের হুকুমটি প্রকৃতপক্ষে পৃথক কোনো হুকুম নয়; বরং এটিও সে প্রাথমিক নির্দেশ, যা মুসলমান ও অমুসলমানদের মাঝে মাঝে উত্তরাধিকার স্বত্বকে ছিন্ন করে দেয়। পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, এই কুফরির লক্ষণের প্রেক্ষিতে তাকে কাফের বলে সাব্যস্ত করা হয়নি, যতক্ষণ না তার মধ্যে প্রকৃষ্ট ও সুস্পষ্টভাবে কুফরির প্রমাণ পাওয়া যাবে।

আর হয়তো এ যুক্তিতেই এখানে একটি নির্দেশ অমুহাজির মুসলমানদের কথা উল্লেখ করে দেওয়া হয়েছে যে, যদি তারা মুহাজির মুসলমানদের নিকট কোনো রকম সাহায্য-সহায়তা কামনা করে, তবে মুহাজির মুসলমানদের জন্য তাদের সাহায্য করা কর্তব্য, যাতে একথা প্রতীয়মান হয়ে যায় যে, অমুহাজির মুসলমানদেরকে সম্পূর্ণভাবে কাফেরদের কাতারে গণ্য করা হয়নি; বরং তাদের এই ইসলামি অধিকার এখনও বলবৎ রয়ে গেছে যে, সাহায্য কামনা করলে তারা সাহায্য পেতে পারে।

আর যেহেতু এ আয়াতের শানে নুযূল মক্কা থেকে মদিনায় বিশেষ হিজরতের সাথে যুক্ত এবং তারাই অমুহাজের মুসলমান ছিলেন, যারা মক্কায় অবস্থান করেছিলেন এবং কাফেরদের উৎপীড়নের সম্মুখীন হচ্ছিলেন, কাজেই তাঁদের সাহায্য প্রার্থনার বিষয়টি যে, একান্তই মক্কার কাফেরদের বিরুদ্ধে ছিল, তা বলাই বাহুল্য। আর কুরআনে কারীম যখন মুহাজির মুসলমানদের প্রতি তাদের (অমুহাজির) মক্কাবাসী মুসলমানদের সাহায্যের নির্দেশ দান করেছে, তাতে বাহ্যিক দৃষ্টিতে একথাই বুঝা যায় যে, যে কোনো অবস্থায়, যে কোনো জাতির মোকাবিলায় তাঁদের সাহায্য করা মুসলমানদের উপর অপরিহার্য করে দেওয়া হয়েছে। এমনকি যে জাতি বা সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে সাহায্য প্রার্থনা করা হবে তাদের সাথে যদি মুসলমানদের কেনো যুদ্ধ

www.almodina.com

বিরতি চুক্তি সম্পাদিত হয়েও থাকে তবুও তাই করতে হবে, অথচ ইসলামি নীতিকে ন্যায়নীতি ও চুক্তির অনুবর্তিতা একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ফরজ। সে কারণেই এ আয়াতে একটি ব্যতিক্রমী নির্দেশের ও উল্লেখ করা হয়েছে যে, অমুহাজির মুসলমান যদি মুহাজির মুসলমানের নিকট এমন কোনো জাতি বা সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে সাহায্য প্রার্থনা করে, যাদের সাথে মুসলমানরা যুদ্ধ নয় চুক্তি সম্পাদন করে রেখেছে তবে চুক্তিবদ্ধ কাফেরদের মোকাবেলায় নিজেদের মুসলমান ভাইদের সাহায্য করাও জায়েজ নয়।

এই ছিল প্রথম দু'টি আয়াতের সংক্ষিপ্ত বিষয়বস্তু। এবার বাক্যের সাথে তুলনা করে দেখা যাক। ইরশাদ হচ্ছে– إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَٰئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا অর্থাৎ যে সমস্ত লোক যারা ঈমান এনেছে এবং যারা আল্লাহর ওয়াস্তে নিজেদের প্রিয় জন্মভূমি ও আত্মীয়-আপনজনদের পরিত্যাগ করেছে এবং আল্লাহর রাহে নিজেদের জানমাল দিয়ে জিহাদ করেছে, সম্পদ ব্যয় করে যুদ্ধের জন্য ও সাজসরঞ্জাম সংগ্রহ করেছে এবং যুদ্ধের জন্য নিজেদেরকে উৎসর্গ করেছে, অর্থাৎ প্রাথমিক পর্যায়ের মুহাজিরবৃন্দ এবং যারা তাদেরকে আশ্রয় দিয়েছে ও সাহায্য করেছে; অর্থাৎ মদিনার আনসার মুসলমানগণ এতদুভায়ের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তারা পরস্পরের ওলী বা সহায়ক। অতঃপর বলা হয়েছে, সেসব লোক যারা ঈমান এনেছে বটে কিন্তু হিজরত করেনি, তাদের সাথে তোমাদের কোনো সম্পর্ক নেই যতক্ষণ না তারা হিজরত করবে।

এখানে কুরআন কারীম وَلِيٌّ ও وِلَايَتٌ শব্দ ব্যবহার করেছে, যার প্রকৃত অর্থ হলো– বন্ধুত্ব ও গভীর সম্পর্ক। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.), হযরত হাসান, কাতাদাহ ও মুজাহিদ (র.) প্রমুখ তাফসীরশাস্ত্রের ইমামগণের মতে এখানে وِلَايَتٌ অর্থ উত্তরাধিকার এবং وَلِيٌّ অর্থ উত্তরাধিকারী। আর কেউ কেউ এখানে এর আভিধানিক অর্থ বন্ধুত্ব ও সাহায্য-সহায়তাও নিয়েছেন।

প্রথম তাফসীর অনুসারে আয়াতের মর্ম এই যে, মুসলমান মুহাজির ও আনসার পারস্পরিকভাবে একে অপরের ওয়ারিশ হবেন। তাদের উত্তরাধিকারের সম্পর্ক না থাকবে অমুসলমানদের সাথে আর নাইবা থাকবে সে সমস্ত মুসলমানদের সাথে যারা হিজরত করেননি। প্রথম নির্দেশ অর্থাৎ দীনি পার্থক্য তথা ধর্মীয় বৈপরীত্যের ভিত্তিতে উত্তরাধিকারের ছিন্নতার বিষয়টি তো চিরস্থায়ী আছেই, বাকি থাকল দ্বিতীয় হুকুমটি। মক্কা বিজয়ের পর যখন হিজরতেরই প্রয়োজন থাকেনি, তখন মুহাজের ও অমুহাজেরদের উত্তরাধিকারের বিচ্ছিন্নতার হুকুমটিও আর বলবৎ থাকেনি। এর দ্বারা কোনো কোনো ফিকহবিদ প্রমাণ করেছেন যে, দীনের পার্থক্য যেমন উত্তরধিকার ছিন্ন হওয়ার কারণ তেমনিভাবে দেশের পার্থক্যও উত্তরাধিকার ছিন্ন হওয়ার কারণ। বিষয়টির বিস্তারিত আলোচনা ফিকহের কিতাবে উল্লেখ রয়েছে।

অতঃপর ইরশাদ হয়েছে– وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ অর্থাৎ এসব লোক হিজরত করেনি যদিও তাদের উত্তরাধিকারের সম্পর্ক ছিন্ন করে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু যে কোনো অবস্থায় তারাও মুসলমান। যদি তারা নিজেদের দীনের হেফাজতের জন্য মুসলমানদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন, তবে তাঁদের সাহায্য করা তাঁদের উপর অপরিহার্য কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু তাই বলে ন্যায় ও ইনসাফের অনুবর্তিতার নীতিকে বিসর্জন দেওয়া যাবে না। তারা যদি এমন কোনো সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে তোমাদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে, যাদের সাথে তোমাদের যুদ্ধ নয় চুক্তি সম্পাদিত হয়ে গেছে, তবে সেক্ষেত্রে তাদের বিরুদ্ধে সেসব মুসলমানদের সাহায্য করা জায়েজ নয়।

হুদায়বিয়ার সন্ধিকালে এমনি ঘটনা ঘটেছিল। রাসূলে কারীম ﷺ যখন মক্কার কাফেরদের সাথে সন্ধিচুক্তি সম্পাদন করেন এবং চুক্তির শর্তে এ বিষয়টিও অন্তর্ভুক্ত থাকে যে, এখন মক্কা থেকে যে ব্যক্তি মদিনায় চলে যাবে রাসূল ﷺ তাকে ফিরিয়ে দেবেন। ঠিক এই সন্ধি চুক্তিকালেই আবূ জান্দাল (রা.) যাকে কাফেররা মক্কায় বন্দি করে রেখেছিল এবং নানাভাবে নির্যাতন করছিল কোনো রকমে মহানবীর খেদমতে গিয়ে হাজির হলেন এবং নিজের উৎপীড়নের কাহিনী প্রকাশ করে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করলেন। যে নবী সমগ্র বিশ্বের জন্য রহমত হয়ে আগমন করেছিলেন, একজন নিপীড়িত মুসলমানের ফরিয়াদ শুনে তিনি কি পরিমাণ মর্মাহত হয়েছিলেন, তার অনুমান করাও যার তার জন্য সম্ভব নয়, কিন্তু এহেন মর্মপীড়া সত্ত্বেও উল্লিখিত আয়াতের হুকুম অনুসারে তিনি তাঁর সাহায্যের ব্যাপারে অপারকতা জানিয়ে ফিরিয়ে দেন।

www.almodina.com

তাঁর এভাবে ফিরে যাওয়ার বিষয়টি সমস্ত মুসলমানদের জান্য একান্ত পীড়াদায়ক ছিল, কিন্তু সরওয়ারে কায়েনাত ﷺ খোদায়ী নির্দেশের আলোকে যেন প্রত্যক্ষ করছিলেন যে, এখন আর এ নির্যাতন-নিপীড়নের আয়ু বেশি দিন নেই। তাছাড়া আর ক'টি দিন ধৈর্যধারণের ছওয়াবও আবূ জান্দালের প্রাপ্য রয়েছে। এর পরেই মক্কা বিজয়ের মাধ্যমে এসব কাহিনীর সমাপ্তি ঘটতে যাচ্ছে। যাহোক, তখন মহানবী ﷺ কুরআনি নির্দেশ মোতাবেক চুক্তির অনুবর্তিতাকেই তাঁর ব্যক্তিগত বিপদাপদের উপর গুরুত্ব দান করেছিলেন। এটাই হলো ইসলামি শরিয়তের সেই অসাধারণ বৈশিষ্ট্য যার ফলে তাঁরা পার্থিব জীবনের বিজয় ও সম্মান এবং আখেরাতের কল্যাণ ও মুক্তির অধিকারী হতে পেরেছেন। অন্যথায় সাধারণভাবে দেখা যায়, পৃথিবীর সরকারসমূহ চুক্তির নামে এক ধরনের প্রহসনের অবতারণা করে থাকে, যাতে দুর্বলকে দাবিয়ে রাখা এবং সবলকে ফাঁকি দেওয়াই থাকে উদ্দেশ্য। যখন নিজেদের সামান্যতম স্বার্থ দেখতে পায়, তখনই নানা রকম ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে সম্পাদিত চুক্তি বাতিল করে দেওয়া হয় এবং দোষ অন্যের উপর চাপানোর ফন্দি-ফিকির করতে থাকে।

৭৩ নং আয়াতে বল হয়েছে– وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ অর্থাৎ কাফেররা পরস্পর একে অপরের বন্ধু। وَلِىٌّ শব্দটি যেমন পূর্বে বলা হয়েছে, একটি সাধারণ ও ব্যাপকার্থক শব্দ। এতে যেমন ওরাসত বা উত্তরাধিকারের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত তেমনিভাবে অন্তর্ভুক্ত বৈষয়িক সম্পর্ক ও পৃষ্ঠপোষকতার বিষয়ও। কাজেই এ আয়াতের দ্বারা বুঝা যায় যে, কাফেরদেরকে পারস্পরিক উত্তরাধিকারী মনে করতে হবে এবং উত্তরাধিকার বন্টনের যে আইন তাদের নিজেদের ধর্মে প্রচলিত রয়েছে, তাদের উত্তরাধিকারের বেলায় সে আইনই প্রয়োগ করা হবে। তদুপরি তাদের এতিম অনাথ শিশুদের ওলী এবং বিবাহ-শাদির অভিভাবক তাদেরই মধ্য থেকে নির্ধারিত হবে। সারকথা, সামাজিক বিষয়াদিতে অমুসলমানদের নিজস্ব আইন কানুন ইসলামি রাষ্ট্রেও সংরক্ষিত রাখা হবে।

আয়াতের শেষভাগে ইরশাদ হয়েছে– اِلَّا تَفْعَلُوْهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِى الْاَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيْرٌ অর্থাৎ তোমরা যদি এমনটি না কর, তাহলে গোটা পৃথিবীতে ফিতনা-ফ্যাসাদ ও দাঙ্গাহাঙ্গামা ছড়িয়ে পড়বে।

এ বাক্যটি সে সমস্ত হুকুম আহকামের সাথে সম্পর্কযুক্ত যা ইতঃপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। যেমন মুহাজিরীন ও আনসারগণকে একে অপরের অভিভাবক হতে হবে যাতে পারস্পরিক সাহায্য-সহায়তা এবং ওরাসাত তথা উত্তরাধিকারের বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত। দ্বিতীয়ত এখানকার মুহাজিরীন ও মুহাজিরীন মুসলমানদের মধ্যে পারস্পরিক উত্তরাধিকারের সম্পর্ক বিদ্যমান থাকা বাঞ্ছনীয় নয়। কিন্তু সাহায্যসহায়তার সম্পর্ক তার শর্ত মোতাবেক বলবৎ থাকা উচিত। তৃতীয়ত কাফেরগণ একে অন্যের ওলী বিধায় পারস্পরিক অভিভাবকত্ব ও তাদের উত্তরাধিকার আইনের ব্যাপারে কোনো রকম হস্তক্ষেপ করা মুসলমানদের জন্য সমীচীন নয়। বস্তুত এ সমস্ত নির্দেশের উপর যদি আমল করা না হয়, তাহলে পৃথিবীতে গোলযোগ ও দাঙ্গা হাঙ্গামা ছড়িয়ে পড়বে। সম্ভবত এ ধরনের সতর্কতা এ কারণে উচ্চারিত হয়েছে যে, এখানে যেসব হুকুম আহকাম বর্ণিত হয়েছে, সেগুলো ন্যায়, সুবিচার ও সাধারণ শান্তি-শৃঙ্খলার মূলনীতি স্বরূপ। কারণ এসব আয়াতের দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়ে গেছে যে, পারস্পরিক সাহায্যসহযোগিতা ও উত্তরাধিকার সংক্রান্ত সম্পর্ক যেমন আত্মীয়তার উপর নির্ভরশীল, তেমনিভাবে এক্ষেত্রে ধর্মীয় ও মতাদর্শগত সম্পর্কও বংশগত সম্পর্কের চেয়ে অগ্রবর্তী। সেজন্যই বংশগত সম্পর্কের দিক দিয়ে পিতাপুত্র কিংবা ভাই-ভাই হওয়া সত্ত্বেও কোনো কাফের কোনো মুসলমানের এবং কোনো মুসলমান কোনো কাফেরের উত্তরাধিকারী হতে পারে না। এরই সঙ্গে সঙ্গে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা ও মূর্খতা জনোচিত বিদ্বেষের প্রতিরোধকল্পে এই হেদায়েতও দেওয়া হয়েছে যে, ধর্মীয় সম্পর্ক এহেন সুদৃঢ় হওয়া সত্ত্বেও চুক্তির অনুবর্তিতা তার চেয়েও বেশি অগ্রাধিকারযোগ্য। ধর্মীয় সাম্প্রাদায়িকতার উত্তেজনাবশে সম্পাদিত চুক্তির বিরুদ্ধাচরণ করা জয়েজ নয়। এমনিভাবে এ হেদায়েতও দেওয়া হয়েছে যে, কাফের একে অপরের উত্তরাধিকারী ও অভিভাবক। তাদের ব্যক্তিগত অধিকার ও উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে যেন কোনো রকম হস্তক্ষেপ করা না হয়। দৃশ্যত এগুলোকে কতিপয় আনুষঙ্গিক ও শাখাগত বিধান বলে মনে হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বিশ্বশান্তির জন্য এগুলোই ন্যায় ও সুবিচারের সর্বোত্তম ও ব্যাপক মূলনীতি। আর সে কারণেই এখানে এসব আহকাম তথা বিধি-বিধান বর্ণনার পর এমন কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে, যা সাধারণত অন্যান্য আহকামের ক্ষেত্রে করা হয়নি। তা হলো এই যে, তোমরা যদি এসব আহকামের উপর আমল না কর, তবে বিশ্বময় বিশৃঙ্খলা ও দাঙ্গাহাঙ্গামা বিস্তার লাভ করবে। বাক্যটিতে এ ইঙ্গিতও বিদ্যমান যে, দাঙ্গা-বিশৃঙ্খলা রোধে এসব বিধিবিধানের বিশেষ প্রভাব ও অবদান রয়েছে।

www.almodina.com

৭৪ নং আয়াতে মক্কা থেকে হিজরতকারী সাহাবায়ে কেরাম এবং তাঁদের সাহায্যকারী মদিনাবাসী আনসারদের প্রশংসা, তাঁদের সত্যিকার মুসলমান হওয়ার সাক্ষ্য ও তাঁদের মাগফেরাত ও সম্মানজনক উপার্জন দানের ওয়াদার কথা বলা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে– أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا অর্থাৎ তারাই হচ্ছেন সত্যিকারভাবে মুসলমান। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, যারা হিজরত করতে পারেননি যদিও তাঁরা মুসলমান, কিন্তু তাদের ইসলাম পরিপূর্ণ নয় এবং নিশ্চিতও নয়। কারণ তাতে এমন সম্ভাবনাও রয়েছে যে, হয়তোবা তারা প্রকৃতপক্ষে মুনাফেক হয়ে প্রকাশ্যে ইসলামের দাবি করছে। তারপরেই বলা হয়েছে– لَهُمْ مَغْفِرَةٌ অর্থাৎ তাঁদের জন্য মাগফেরাত নির্ধারিত। যেমন বিশুদ্ধ হাদীসসমূহে বর্ণিত রয়েছে যে, الْإِسْلَامُ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا وَالْهِجْرَةُ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ অর্থাৎ ইসলাম গ্রহণ যেমন তার পূর্ববর্তী সমস্ত পাপকে নিঃশেষ করে দেয়, তেমনিভাবে হিজরত তার পূর্ববর্তী সমস্ত পাপকে নিঃশেষ করে দেয়।

৭৫ নং আয়াতে মুহাজিরগণের বিভিন্ন শ্রেণির নির্দেশাবলি বর্ণিত হয়েছে। বলা হয়েছে, যদিও তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ রয়েছেন প্রাথমিক পর্যায়ের মুহাজের, যারা হুদায়বিয়ার সন্ধি চুক্তির পূর্বে হিজরত করেছেন এবং কেউ কেউ রয়েছেন দ্বিতীয় পর্যায়ের মুহাজির যাঁরা হুদায়বিয়ার সন্ধির পরে হিজরত করেছেন। এর ফলে তাঁদের পরকালীন মর্যাদায় পার্থক্য হলেও পার্থিব বিধান মতে তাঁদের অবস্থা প্রাথমিক পর্যায়ের মুহাজিরগণেরই অনুরূপ। তাঁরা সবাই পরস্পরের ওয়ারিশ তথা উত্তরাধিকারী হবেন। সুতরাং মুহাজিরগণকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে– فَأُولَٰئِكَ مِنْكُمْ অর্থাৎ দ্বিতীয় পর্যায়ের এই মুহাজিরগণও তোমাদেরই সমপর্যায়ভুক্ত। সে কারণেই উত্তরাধিকার সংক্রান্ত বিধিতেও তাদের হুকুম সাধারণ মুহাজিরগণই মতো।

قوله وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا الخ এটি সূরা আনফলের সর্বশেষ আয়াত। এর শেষাংশে উত্তরাধিকার আইনের একটি ব্যাপক মূলনীতি বর্ণনা করা হয়েছে। এরই মাধ্যমে সেই সাময়িক বিধানটি বাতিল করে দেওয়া হয়েছে, যেটি হিজরতের প্রথম পর্বের মুহাজির ও আনসারদের মাঝে পারস্পরিক ভ্রাতৃ-বন্ধন স্থাপনের মাধ্যমে একে অপরের উত্তরাধিকারী হওয়ার ব্যাপারে নাজিল হয়েছিল। বলা হয়েছে– وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ আরবি অভিধানে أُولُو শব্দটি "সাথি" অর্থে ব্যবহৃত হয়। যার বাংলা অর্থ হলো 'সম্পন্ন'। যেমন أُولُو الْعَقْلِ বুদ্ধি সম্পন্ন। أُولُو الْأَمْرِ দায়িত্ব সম্পন্ন। কাজেই وَأُولُو الْأَرْحَامِ অর্থ হয় গর্ভসাথি, একই গর্ভসম্পন্ন أَرْحَامٌ শব্দটি رَحِمٌ শব্দের বহুবচন। এর প্রকৃত অর্থ হলো সে অঙ্গ যাতে সন্তানের জন্মক্রিয়া সম্পন্ন হয়। আর যেহেতু আত্মীয়তার সম্পর্ক গর্ভের অংশীদারিত্বের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়, কাজেই وَأُولُو الْأَرْحَامِ আত্মীয় অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

বস্তুত আয়াতের অর্থ হচ্ছে এই যে, যদিও পারস্পরিকভাবে একে অপেরের উপর প্রত্যেক মুসলমানই একটি সাধারণ অধিকার সংরক্ষণ করে এবং তার ভিত্তিতে প্রয়োজনের ক্ষেত্রে একের প্রতি অন্যের সাহায্য করা ওয়াজিব হয়ে দাঁড়ায় এবং একে অন্যের উত্তরাধিকারীও হয় কিন্তু যেসব মুসলমানের মাঝে পারস্পরিক আত্মীয়তা ও নৈকট্যের সম্পর্ক বিদ্যমান, তারা অন্যান্য মুসলমানের তুলনায় অগ্রবর্তী। এখানে فِي كِتَابِ اللَّهِ অর্থ فِي حُكْمِ اللَّهِ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা এক বিশেষ নির্দেশ বলে এ বিধান জারি করেছেন।

এ আয়াত এই মূলনীতি বাতলে দিয়েছে যে, মৃতের পরিত্যক্ত সম্পত্তি আত্মীয়তার মান অনুসারে বন্টন করা কর্তব্য। আর وَأُولُو الْأَرْحَامِ সাধারণভাবে সমস্ত আত্মীয়স্বজন অর্থেই বলা হয়। তাদের মধ্যে বিশেষ বিশেষ আত্মীয়ের অংশ স্বয়ং কুরআনে কারীমে সূরা নিসায় নির্ধারিত করে দিয়েছে। মিরাসশাস্ত্রের পরিভাষায় এদেরকে বলা হয় 'আহলে ফারায়েয' বা 'যাবিল ফুরূয'। এদেরকে দেওয়ার পর যে সম্পদ উদ্বৃত্ত হবে তা আয়াত দৃষ্টে অন্যন্য আত্মীয়স্বজনের মধ্যে বন্টন করা কর্তব্য।

তাছাড়া এ বিষয়টিও সুস্পষ্ট যে, সমস্ত আত্মীয়ের মধ্যে কোনো সম্পত্তি বন্টন করে দেওয়ার ক্ষমতা কারো নেই। কারণ, দূরবর্তী আত্মীয়তা যে সমগ্র বিশ্বমানুষের মাঝেই বর্তমান, তাতে কোনো রকম সন্দেহ-সংশয়েরই অবকাশ নেই। সারা পৃথিবীর মানুষ একই পিতামাতা, আদম ও হাওয়ার বংশধর। কাজেই নিটবর্তী আত্মীয়দেরকে দূরবর্তীর উপর অগ্রাধিকার দেওয়া এবং নিকটবর্তীর বর্তমানে দূরবর্তীকে বঞ্চিত করাই আত্মীয়দের মধ্যে মিরাস বন্টনের কার্যকর ও বাস্তবরূপ হতে পারে। এর বিস্তারিত বিবরণ রাসূলে কারীম ﷺ-এর হাদীসে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, 'যাবিল ফরূযে'র অংশ দিয়ে দেওয়ার পর যা কিছু অবশিষ্ট থাকবে, তা মৃত ব্যক্তির 'আসাবাগণ অর্থাৎ পিতামহ সম্পর্কীয় আত্মীয়দের মধ্যে

পর্যায়ক্রমিকভাবে দেওয়া হবে। অর্থাৎ নিকটবর্তী আসাবাকে দূরবর্তী আসাবা অপেক্ষা অগ্রাধিকার দিতে হবে এবং নিকটবর্তী আসাবার বর্তমানে দূরবর্তীকে বঞ্চিত করা হবে। আর 'আসাবা' -এর মধ্যে আর কেউ জীবিত না থাকলে অন্যান্য আত্মীয়দের মধ্যে বন্টন করা হবে।

আসাবা ছাড়াও অন্যান্য যেসব লোক আত্মীয় হতে পারে, ফারায়েযশাস্ত্রের পরিভাষায় তাদের বুঝাবার জন্য 'যাবিল আরহাম' শব্দ নির্ধারিত করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এই পরিভাষাটি পরবর্তীকালে নির্ধারিত হয়েছে। কুরআনে কারীমে বর্ণিত وَاُولُو الْاَرْحَامِ শব্দটি কিন্তু আভিধানিক অর্থ অনুযায়ী সমস্ত আত্মীয়স্বজনের ক্ষেত্রেই ব্যাপক। এতে যাবিল ফরূয আসাবা এবং যাবিল আরহাম সবাই মোটামুটিভাবে অন্তর্ভুক্ত।

তদুপরি এর কিছু বিস্তারিত বিশ্লেষণ সূরা নিসার বিভিন্ন আয়াতে দেওয়া হয়েছে। তাতে বিশেষ বিশেষ আত্মীয়ের প্রাপ্য অংশ আল্লাহ তা'আলা নিজেই নির্ধারণ করে দিয়েছেন। তাদেরকে মিরাসশাস্ত্রের পরিভাষায় 'যাবিল ফুরূয' বলা হয়। এছাড়া আন্যান্যদের সম্পর্কে রাসূলে কারীম ﷺ-ইরশাদ করেছেন– اَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِاَهْلِهَا فَمَا بَقِىَ فَهُوَ لِاَوْلٰى رَجُلٍ ذَكَرٍ অর্থাৎ যাদের অংশ স্বয়ং কুরআন নির্ধারণ করে দিয়েছে, তাদের দেওয়ার পর যা অবশিষ্ট থাকে তা তাদেরকেই দিতে হবে যারা মৃতের ঘনিষ্ঠতম পুরুষ।

এদেরকে মিরাসের পরিভাষায় 'আসাবা' (عَصَبَة) বলা হয়। যদি কোনো মৃত ব্যক্তির আসাবাদের কেউ বর্তমান না থাকে, রাসূলে কারীম ﷺ -এর কথা অনুযায়ী তবেই মৃতের সম্পত্তির অংশ তাদেরকে দিতে হবে। এদেরকে বলা হয় 'যাবিল আরহাম'। যেমন মামা ও খালা প্রভৃতি।

সূরা আনফালের শেষ আয়াতের সর্বশেষ বাক্যটির দ্বারা ইসলামি উত্তরাধিকার আইনের সে ধারাটি বাতিল করা হয়েছে, যা ইতঃপূর্বে বর্ণিত আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে এবং যার ভিত্তিতে মুহাজিরগণ ও আনসারগণ আত্মীয়তার কোনো বন্ধন না থাকলেও পরস্পরের ওয়ারিশ বা উত্তরাধিকারী হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু এ হুকুমটি ছিল একটি সাময়িক হুকুম যা হিজরতের প্রাথমিক পর্যায়ে দেওয়া ছিল।

শব্দ বিশ্লেষণ

يُرِيْدُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ اثبات فعل مضارع معروف বাব اِفْعَال মাসদার اَلْاِرَادَةُ মূলবর্ণ (ر - و - د) অর্থ– তারা ইচ্ছা করে, তারা চায়।

قَدْ خَانُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ اثبات فعل ماضى قريب معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْخِيَانَةُ মূলবর্ণ (خ - و - ن) জিনস اجوف واوى অর্থ– তারা বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, তারা প্রতারণা করেছে।

اٰوَوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ اثبات فعل ماضى معروف বাব اِفْعَال মাসদার اَلْاِيْوَاءُ মূলবর্ণ (ا - و - ى) জিনস মুরাক্কাব مهموز فاء ও لفيف مقرون অর্থ– তারা আশ্রয় দিয়েছে, তারা আশ্রয়দান করেছে।

قَوْمٌ : শব্দটি একবচন; বহুবচন اَقْوَامٌ অর্থ– জাতি, গোষ্ঠী, সম্প্রদায়।

مِيْثَاقٌ : শব্দটি একবচন, বহুবচন مَوَاثِيْقُ অর্থ– চুক্তি, অঙ্গীকার, সনদ, প্রতিশ্রুতি, দলিল, প্রতিজ্ঞা।

اُولُوْ : শব্দটি বহুবচন; একবচন ذُوْ অর্থ–অধিকারী, ওয়ালা।

اَرْحَامٌ : শব্দটি বহুবচন; একবচন رَحِمٌ ও رِحْمٌ অর্থ– আত্মীয়তার সম্পর্ক।

سُوْرَةُ التَّوْبَةِ
সূরা তাওবা

মদীনায় অবতীর্ণ : আয়াত– ১২৯, রুকূ'– ১৬

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু

بَرَآءَةٌ مِّنَ اللهِ وَرَسُوْلِهٖٓ اِلَى الَّذِيْنَ عٰهَدْتُّمْ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ (١)

অনুবাদ : (১) আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে এবং তাঁর রাসূলের পক্ষ হতে অব্যহতি হচ্ছে, সেই মুশরিকদের [অঙ্গীকার] হতে, যাদের সাথে তোমরা সন্ধি করে রেখেছিলে।

فَسِيْحُوْا فِى الْاَرْضِ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّاعْلَمُوْٓا اَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِى اللهِ ۙ وَاَنَّ اللهَ مُخْزِى الْكٰفِرِيْنَ (٢)

(২) অতএব, হে মুশরিকগণ! তোমরা এই ভূমণ্ডলে চার মাস বিচরণ করে নাও এবং এটা জেনে রাখ যে, তোমরা আল্লাহকে অক্ষম করতে পারবে না, আর নিশ্চয় আল্লাহ কাফেরদেরকে অপদস্থ করবেন।

وَاَذَانٌ مِّنَ اللهِ وَرَسُوْلِهٖٓ اِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْاَكْبَرِ اَنَّ اللهَ بَرِىْٓءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۙ وَرَسُوْلُهٗ ؕ فَاِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوْٓا اَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِى اللهِ ؕ وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ (٣)

(৩) আর আল্লাহর ও তাঁর রাসূলের পক্ষ হতে বড় হজের তারিখসমূহে জনসাধারণের সম্মুখে ঘোষণা করা হচ্ছে যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল উভয়ই এই মুশরিকদের [-কে নিরাপত্তা প্রদান করা] হতে নিঃসম্পর্ক হচ্ছেন, তবে যদি তোমরা তওবা করে নাও, তাহলে তোমাদের জন্য উত্তম, আর যদি তোমরা বিমুখ হও, তবে জেনে রাখ যে, তোমরা আল্লাহকে অক্ষম করতে পারবে না, আর এই কাফেরদেরকে এক যন্ত্রণাময় শাস্তির খবর শুনিয়ে দিন।

শাব্দিক অনুবাদ

(১) بَرَآءَةٌ অব্যহতি হচ্ছে مِّنَ اللهِ وَرَسُوْلِهٖ আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে এবং তাঁর রাসূলের পক্ষ হতে اِلَى الَّذِيْنَ عٰهَدْتُّمْ যাদের সাথে তোমরা সন্ধি করে রেখেছিল مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ সেই মুশরিকদের [অঙ্গীকার] হতে ।

(২) فَسِيْحُوْا فِى الْاَرْضِ অতএব, হে মুশরিকগণ! তোমরা এ ভূমণ্ডলে বিচরণ করে নাও اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ চার মাস وَّاعْلَمُوْٓا এবং এটা জেনে রাখ যে اَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِى اللهِ তোমরা আল্লাহকে অক্ষম করতে পারবে না وَاَنَّ اللهَ مُخْزِى الْكٰفِرِيْنَ আর নিশ্চয় আল্লাহ কাফেরদেরকে অপদস্থ করবেন।

(৩) وَاَذَانٌ مِّنَ اللهِ وَرَسُوْلِهٖ আর আল্লাহর ও তাঁর রাসূলের পক্ষ হতে ঘোষণা করা হচ্ছে যে, اِلَى النَّاسِ জনসাধারণের সম্মুখে يَوْمَ الْحَجِّ الْاَكْبَرِ বড় হজের তারিখসমূহে اَنَّ اللهَ بَرِىْٓءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ وَرَسُوْلُهٗ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল উভয়ই এ মুশরিকদের [-কে নিরাপত্তা প্রদান করা] হতে নিঃসম্পর্ক হচ্ছেন فَاِنْ تُبْتُمْ তবে যদি তোমরা তওবা করে নাও فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ তাহলে তোমাদের জন্য উত্তম وَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ আর যদি তোমরা বিমুখ হও فَاعْلَمُوْٓا তবে জেনে রাখ যে, اَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِى اللهِ তোমরা আল্লাহকে অক্ষম করতে পারবে না وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا আর এ কাফেরদেরকে শুনিয়ে দিন بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ এক যন্ত্রণাময় শাস্তির খবর ।

অনুবাদ	আয়াত
অনুবাদ : (৪) কিন্তু হ্যাঁ, সেই সকল মুশরিকরা হচ্ছে স্বতন্ত্র, যাদের নিকট হতে তোমরা অঙ্গীকার নিয়েছ, অতঃপর তারা তোমাদের সাথে [অঙ্গীকার পালনে] একটুও ত্রুটি করেনি, এবং তারা তোমাদের বিরুদ্ধে কারো সাহায্য করেনি সুতরাং তাদের সন্ধি-চুক্তিকে তাদের [নির্ধারিত] সময় পর্যন্ত পূর্ণ কর, নিশ্চয় আল্লাহ সৎকর্মশীলদেরকে পছন্দ করেন।	اِلَّا الَّذِیۡنَ عٰهَدۡتُّمۡ مِّنَ الۡمُشۡرِکِیۡنَ ثُمَّ لَمۡ یَنۡقُصُوۡکُمۡ شَیۡـًٔا وَّلَمۡ یُظَاهِرُوۡا عَلَیۡکُمۡ اَحَدًا فَاَتِمُّوۡۤا اِلَیۡهِمۡ عَهۡدَهُمۡ اِلٰی مُدَّتِهِمۡ ؕ اِنَّ اللّٰهَ یُحِبُّ الۡمُتَّقِیۡنَ (٤)
(৫) অতএব, যখন নিষিদ্ধ মাসগুলো অতীত হয়ে যায়, তবে সেই মুশরিকদেরকে যেখানে পাও বধ কর এবং তাদেরকে ধৃত কর এবং অবরোধ করে রাখ এবং ঘাঁটিস্থলসমূহে তাদের সন্ধানে অবস্থান কর, অতঃপর যদি তওবা করে নেয় এবং নামাজ পড়ে ও জাকাত আদায় করে, তবে তাদের পথ ছেড়ে দাও, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা অতি ক্ষমাপরায়ণ, পরম করুণাময়।	فَاِذَا انۡسَلَخَ الۡاَشۡهُرُ الۡحُرُمُ فَاقۡتُلُوا الۡمُشۡرِکِیۡنَ حَیۡثُ وَجَدۡتُّمُوۡهُمۡ وَخُذُوۡهُمۡ وَاحۡصُرُوۡهُمۡ وَاقۡعُدُوۡا لَهُمۡ کُلَّ مَرۡصَدٍ ۚ فَاِنۡ تَابُوۡا وَاَقَامُوا الصَّلٰوۃَ وَاٰتَوُا الزَّکٰوۃَ فَخَلُّوۡا سَبِیۡلَهُمۡ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوۡرٌ رَّحِیۡمٌ (٥)
(৬) আর যদি মুশরিকদের মধ্য হতে কেউ আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে, তবে আপনি তাকে আশ্রয় দান করুন, যাতে সে আল্লাহর কালাম শুনতে পায়, অতঃপর তাকে তার নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দিন, এ আদেশ এ জন্য যে, এরা এমন লোক যে, পূর্ণ জ্ঞান রাখে না।	وَاِنۡ اَحَدٌ مِّنَ الۡمُشۡرِکِیۡنَ اسۡتَجَارَکَ فَاَجِرۡهُ حَتّٰی یَسۡمَعَ کَلٰمَ اللّٰهِ ثُمَّ اَبۡلِغۡهُ مَاۡمَنَهٗ ؕ ذٰلِکَ بِاَنَّهُمۡ قَوۡمٌ لَّا یَعۡلَمُوۡنَ (٦)

শাব্দিক অনুবাদ

(৪) اِلَّا الَّذِیۡنَ عٰهَدۡتُّمۡ مِّنَ الۡمُشۡرِکِیۡنَ কিন্তু হ্যাঁ, সে সকল মুশরিকরা হচ্ছে স্বতন্ত্র, যাদের নিকট হতে তোমরা অঙ্গীকার নিয়েছ ثُمَّ لَمۡ یَنۡقُصُوۡکُمۡ شَیۡـًٔا অতঃপর তারা তোমাদের সাথে [অঙ্গীকার পালনে] একটুও ত্রুটি করেনি وَّلَمۡ یُظَاهِرُوۡا عَلَیۡکُمۡ اَحَدًا এবং তারা তোমাদের বিরুদ্ধে কারো সাহায্য করেনি فَاَتِمُّوۡۤا اِلَیۡهِمۡ عَهۡدَهُمۡ সুতরাং তাদের সন্ধি চুক্তিকে পূর্ণ কর اِلٰی مُدَّتِهِمۡ তাদের [নির্ধারিত] সময় পর্যন্ত اِنَّ اللّٰهَ یُحِبُّ الۡمُتَّقِیۡنَ নিশ্চয় আল্লাহ সৎকর্মশীলদেরকে পছন্দ করেন।

(৫) فَاِذَا انۡسَلَخَ الۡاَشۡهُرُ الۡحُرُمُ অতএব, যখন নিষিদ্ধ মাসগুলো অতীত হয়ে যায় فَاقۡتُلُوا الۡمُشۡرِکِیۡنَ حَیۡثُ وَجَدۡتُّمُوۡهُمۡ তবে সেই মুশরিকদেরকে যেখানে পাও বধ কর وَخُذُوۡهُمۡ এবং তাদেরকে ধৃত কর وَاحۡصُرُوۡهُمۡ এবং অবরোধ করে রাখ وَاقۡعُدُوۡا لَهُمۡ کُلَّ مَرۡصَدٍ এবং ঘাঁটিস্থলসমূহে তাদের সন্ধানে অবস্থান কর فَاِنۡ تَابُوۡا অতঃপর যদি তওবা করে নেয় وَاَقَامُوا الصَّلٰوۃَ এবং নামাজ পড়ে وَاٰتَوُا الزَّکٰوۃَ ও জাকাত আদায় করে فَخَلُّوۡا سَبِیۡلَهُمۡ তবে তাদের পথ ছেড়ে দাও اِنَّ اللّٰهَ غَفُوۡرٌ رَّحِیۡمٌ নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা অতি ক্ষমাপরায়ণ, পরম করুণাময়।

(৬) وَاِنۡ اَحَدٌ مِّنَ الۡمُشۡرِکِیۡنَ আর যদি মুশরিকদের মধ্য হতে কেউ اسۡتَجَارَکَ আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে فَاَجِرۡهُ তবে আপনি তাকে আশ্রয় দান করুন حَتّٰی یَسۡمَعَ کَلٰمَ اللّٰهِ যাতে সে আল্লাহর কালাম শুনতে পায় ثُمَّ اَبۡلِغۡهُ مَاۡمَنَهٗ অতঃপর তাকে তার নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দিন ذٰلِکَ بِاَنَّهُمۡ قَوۡمٌ لَّا یَعۡلَمُوۡنَ এ আদেশ এজন্য যে, এরা এমন লোক যে, পূর্ণ জ্ঞান রাখে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সাধারণ নিয়ম অনুসারে অন্য সূরা হতে পৃথক করার জন্য تَسْمِيَة বা বিসমিল্লাহ সূরার প্রথমে লিপিবদ্ধ করা হতো, কিন্তু এ সূরায় মহানবী ﷺ তা লেখেননি এবং এ সূরা কোন সূরার অংশ তাও বলেননি, কাজেই মাসহাফে ওসমানী তথা তৃতীয় খলিফা হযরত ওসমান (রা.) কর্তৃক প্রকাশিত কুরআনে এ সূরার সূচনাতে বিসমিল্লাহ লেখা হয়নি, সূরায়ে আনফাল-এর পূর্বে অবতীর্ণ হওয়ায় এটার পূর্বে সন্নিবিষ্ট হয়েছে। এ সূরাটি সূরায়ে আনফালের সাথে পঠিত হলে এর পূর্বে বিসমিল্লাহ পড়তে হয় না। অন্যথায় বিসমিল্লাহ পড়তে হয়।

নামকরণের কারণ : এ সূরাটি দু-নামে পরিচিত ও খ্যাত। এক নাম সূরা বারাআত, দ্বিতীয় নাম সূরা তাওবা। بَرَاءَة বলা হয় এজন্য যে, এতে কাফিরদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ ও তাদের ব্যাপারে দায়িত্ব মুক্তির উল্লেখ রয়েছে। আর তাওবা বলা হয় এজন্য যে, এতে মুসলমানদের তওবা কবুল হওয়ার বর্ণনা রয়েছে। এ সূরা অবতীর্ণ হওয়ার পর হতে চুক্তি ভঙ্গকারী সকল মুশরিকের সাথে সন্ধি চুক্তি বাতিল ঘোষণা করা হয়েছে এবং তাদের সাথে সর্বপ্রকার সম্পর্কচ্ছেদ করা হয়েছে এবং এ সূরার শেষের দিকে কতিপয় মুসলমানদের তওবা কবুল হওয়ার সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ তাদের গুনাহ মাফ হওয়ার কথা ঘোষিত হয়েছে। একে উপলক্ষ করে সূরাটি 'তাওবাহ' বলে নামকরণ করা হয়েছে।

সূরাটি নাজিল হওয়ার সময়কাল : এ সূরাটি তিনটি ভাষণে সম্পূর্ণ হয়েছে :

প্রথম ভাষণ : শুরু হতে পঞ্চম রুকূর শেষ পর্যন্ত। এটা নাজিল হওয়ার সময়কাল হচ্ছে নবম হিজরির জিলকদ মাস কিংবা তার কাছাকাছি সময়।

দ্বিতীয় ভাষণ : ষষ্ঠ রুকূ'র শুরু হতে নবম রুকূর শেষ পর্যন্ত। এটা নবম হিজরির রজব মাস কিংবা তার কিছু পূর্বে নাজিল হয়।

তৃতীয় ভাষণ : দশম রুকূ হতে শুরু হয়ে সূরার শেষ পর্যন্ত। এটা তাবুক যুদ্ধ হতে প্রত্যাবর্তনকালে নাজিল হয়েছিল। এতে এমন কতগুলো অংশও রয়েছে যা বিভিন্ন সময়ে নাজিল হয়েছে। পরে নবী করীম ﷺ আল্লাহর নির্দেশ অনুসারে এ ভাষণগুলোকে একত্রিত করে একটি ভাষণের ধারাবাহিকতায় সংযোজিত করে দেন। উপরিউক্ত ভাষণগুলো একই বিষয় সম্পর্কিত ও একই ঘটনার ধারাবাহিকতার সাথে সংশ্লিষ্ট।

প্রথম ভাষণে কাফের ও মুশরিকদের প্রতি চরমপত্র। তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গ, ক্ষমতা লাভের পর কোনো প্রতিশ্রুতি এবং ন্যায়-অন্যায়ের বালাই না থাকা। আল্লাহর মসজিদের কর্তৃত্ব, হজযাত্রী এবং হারাম শরীফের সেবা ঈমান এবং জিহাদের সমকক্ষ নয়। মুশরিকরা অপবিত্র, ইহুদি খ্রিস্টানদের ভ্রান্ত প্রত্যয় ও উক্তি, আহবার ও রোহবানের স্থান এবং ভূমিকা, জাকাত না দেওয়ার ভয়ঙ্কর পরিণাম ইত্যাদি রয়েছে।

দ্বিতীয় ভাষণে ঈমানদার লোকদেরকে জিহাদে উদ্বুদ্ধ করা হয়। আর যারা মুনাফিকী কিংবা ঈমানের দুর্বলতা অথবা অবসাদ ও গাফিলতির কারণে আল্লাহর পথে জানমাল ব্যয় করতে প্রস্তুত ছিল না, তাদেরকে তিরস্কার করা হয়েছে।

তৃতীয় ভাষণে মুনাফিকদেরকে তাম্বীহ এবং তাবূক যুদ্ধে যারা পিছনে রয়ে গিয়েছিল তাদের ভর্ৎসনা করা হয়েছে। আর যেসব লোক সত্যিকারভাবে ঈমান থাকা সত্ত্বেও আল্লাহর পথে জিহাদে অংশগ্রহণ হতে বিরত হয়েছিল তাদের জন্য ক্ষমার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। নাজিল হওয়ার ক্রমিকতার দৃষ্টিতে প্রথম ভাষণটির স্থান সর্বশেষে নির্দিষ্ট হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু বিষয়বস্তুর গুরুত্বের দৃষ্টিতে তার স্থান সর্বপ্রথম হওয়ার কারণে নবী করীম ﷺ সংযোজন কালে তাকেই সর্বপ্রথম রেখেছেন। আর অপর ভাষণদ্বয়কে শেষে রেখেছেন।

তাসমিয়াহ উল্লেখ না করার কারণ : সূরার শুরুতে 'বিসমিল্লাহ' উল্লেখ না করার কারণ সম্পর্কে তাফসীরকারগণ বিভিন্ন মতামত উল্লেখ করেছেন, কিন্তু সঠিক কথা তাই যা ইমাম রাযী (র.) বলেছেন। তা এই যে, নবী করীম ﷺ নিজেই এটার শুরুতে বিসিল্লাহ লেখেননি। এ কারণে সাহাবায়ে কেরামও লেখেননি। পরবর্তী কালের লোকেরাও এরই অনুসরণ করেছেন। কুরআন মাজীদকে নবী করীম ﷺ-এর নিকট হতে যথাযথভাবে গ্রহণ করা এবং আনুরূপভাবে তাকে পূর্ণমাত্রায় সংরক্ষিত রাখার ব্যাপারে যে কতটুকু সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে এটা তার এক সুস্পষ্ট প্রমাণ। সূরার প্রারম্ভে বিসমিল্লাহ উল্লেখ না করার কারণ সম্পর্কে তাফসীরকারগণ যে কয়েকটি কারণ উল্লেখ করেছেন তা এই –

www.almodina.com

১. কুরআন সংকলনের সময়ে সাহাবীগণের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দেয়। কতেক এটাকে আলাদা সূরা বলে অভিমত প্রকাশ করেন, আর কতেক বলেন, এটা সূরা আনফালের অংশ, এ কারণে বিসমিল্লাহ লেখা হয়নি।

২. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হযরত আলী (রা.)-এর নিকট সূরা তওবার প্রারম্ভে বিসমিল্লাহ উল্লেখ না করার কারণ জিজ্ঞাসা করলে তারা বলেন, বিসমিল্লাহ রহমত কামনা এবং নিরাপত্তা প্রার্থনার জন্য হয়ে থাকে। যেহেতু এ সূরায় কাফেরদের জন্য কোনো নিরাপত্তার ব্যবস্থা রাখা হয়নি, আর এতে মুনাফিকদের দুরাচার ও শাস্তির কথা বর্ণিত হয়েছে।

৩. কেউ কেউ বলেন, এ সূরা নাজিল হওয়ার সময় হযরত জিবরাঈল (আ.) বিসমিল্লাহ না নিয়ে আসার কারণেই তা লিখিত হয়নি। যেভাবে অবতীর্ণ হয়েছে অনুরূপভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

৪. ইমাম কুরতুবী (র.) বলেন যে, সূরায়ে বারআত (তওবা)-এর প্রথমে বিসমিল্লাহ ব্যবহৃত না হবার ক্ষেত্রে উলামায়ে কেরামের মাঝে মতপার্থক্য রয়েছে। এ সম্পর্কে উলামায়ে কেরামের ৫টি অভিমত রয়েছে। ১. কোনো কোনো উলামায়ে কেরামের মতে, জাহেলিয়া যুগে আরবদের স্বভাব ছিল তাদের মধ্যে এবং কোনো সম্প্রদায়ের মধ্যে যদি কোনো প্রকারের চুক্তি সম্পাদিত থাকত, সে চুক্তিকে যদি ভঙ্গ করে দেওয়ার ইচ্ছা হতো, তখন তাদের নামে কোনো পত্র লিখে পাঠাতো, যার মধ্যে তাসমিয়া লিখা হতো না।

সুতরাং নবী করীম ﷺ ও মুশরিকদের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি ভঙ্গের ঘোষণা নিয়ে যখন সূরায়ে বারআত নাজিল হয়, তখন রাসূল ﷺ হযরত আলী ইবনে আবী তালিবকে (রা.) এ সূরা দিয়ে পাঠালেন। ফলে তিনি হজ মৌসুমে এ সূরা মুশরিকদের উপস্থিতিতে পাঠ করে শুনিয়ে দিলেন। তখন তিনি তাতে বিসমিল্লাহ পাঠ করেননি।

৫. নাসাঈ শরীফের বর্ণনানুযায়ী হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন যে, আমি হযরত উসমান (রা.) -কে জিজ্ঞেস করলাম যে, সূরা "আনফাল" হলো মাছানী এবং সূরা বারআত হলো মিয়্যীন সূরাসমূহের অন্তর্গত। তা সত্ত্বেও এ দুটি সূরাকে আপনারা পাশাপাশি লিখলেন, আবার তাতে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীমও লিখেননি কেন? অথচ তাকে সাবউতত্ত্বওয়ালের অন্তর্গত গণ্য করে রেখেছেন। হযরত ওসমান (রা.) বললেন যে, রাসূল ﷺ-এর নিকট যখনই কোনো ওহী নাজিল হতো, তখন তার নিকটতম কোনো কাতেবে ওহীকে ডেকে বলে দিতেন যে, তাকে অমুক সূরার অমুক জায়গায় লিখে নাও। সূরা 'আনফাল' মদিনায় প্রথম দিক দিয়ে নাজিলকৃত সূরাসমূহের অন্তর্ভুক্ত আর সূরা 'বারআত' মদিনায় শেষ দিকে নাজিলকৃত সূরাসমূহের মধ্য হতে। উভয় সূরার বিষয়বস্তুও সাদৃশ্যশীল। এমতাবস্থায় রাসূল ﷺ ইন্তেকাল করলেন কিন্তু বারআত 'আনফাল'-এর অন্তর্ভুক্ত কিনা সে বিষয়ে সুস্পষ্ট কিছুই বলে যাননি। সুতরাং আমি একে আনফালের অন্তর্ভুক্ত ধারণা করেই উভয় সূরাকে মিলিয়ে রেখেছি। তবে তাতে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম লিখিনি।

৬. হযরত ওসমান (রা.) হতে অপর এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত রয়েছে যে, মালেক বলেন যে, সে সম্পর্কে ইবনে ওহাব, ইবনুল কাসেম ও ইবনে আবুল হিকাম প্রমুখ বর্ণনা করেন যে, আলোচ্য সূরা বারআত সূরা বাকারার সমপরিমাণ অথবা সে সূরার প্রায় সমপরিমাণের কাছাকাছি ছিল। তবে প্রথমাংশ যেহেতু রহিত হয়ে গেল সেহেতু বিসমিল্লাহও তার সাথে রহিত হয়ে গিয়েছে। এ সম্পর্কে ইবনে ইজলান কর্তৃক বর্ণিত রয়েছে যে, তার নিকট এ সংবাদ পৌঁছেছে যে, সূরায়ে বারআত, সূরায়ে বাকারার সাদৃশ অথবা তার সাথে মিলিত ছিল। তার সে স্থানটি চলে যাবার কারণে আনফাল এবং বারআতের মাঝে বিসমিল্লাহ লিখা হয়নি।

৭. খারেজা ও আবূ ইসমা প্রমুখ বলেন যে, হযরত উছমান (রা.)-এর খেলাফতকালে যখন কুরাআন শরীফ লিখা হচ্ছিল, তখন সাহাবীগণের মাঝে মতবিরোধ দেখা দিল (কারো মতে 'আনফাল ও বারআত') উভয়টি একই সূরা। কেউ কেউ বললেন যে, এ হলো ভিন্ন দুটি সূরা। উভয় পক্ষের সমন্বয় সাধন কল্পে মধ্যখানে পার্থক্য রেখে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম লিখাকে ছেড়ে দেওয়া হলো। তা উভয় পক্ষই মেনে নিলেন এবং উভয় পক্ষের দাবিই সমর্থিত হলো।

৮. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, আমি আলী ইবনে আবী তালিব (রা.)-কে জিজ্ঞেস করলাম যে, সূরায়ে বারআতের মাঝে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম লিখা হলো না কেন? উত্তরে তিনি বলেন যে, বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম হলো নিরাপত্তার বিষয় আর সূরায়ে বারআত যুদ্ধের ঘোষণা নিয়ে নাজিল করা হয়েছে যাতে কোনো প্রকারের নিরাপত্তা নেই। সেজন্য এ দুটি বিষয়কে একসাথে মিলিয়ে দেওয়া হয়নি। –[কুরতুবী-৬০-৬১/৮, ফাতহুল কাদীর-৩৩/২]

বিষয়বস্তু : সূরাটি মদিনায় অবতীর্ণ হয়। এতে ১২৯ টি আয়াত, ১৬টি রুকূ' রয়েছে। সূরাটি তিনটি ভাষণে সম্পূর্ণ হয়েছে। এতে রয়েছে, মক্কা বিজয়কালে মুশরিকদের বিভিন্ন শ্রেণি ও তাদের প্রতি চরমপত্র, চুক্তি ও তার মর্যাদা রক্ষার নির্দেশ, ইসলামের সপক্ষে দলিল প্রমাণ পেশ করার দায়িত্ব আলিমদের। ইসলামি রাষ্ট্রে অমুসলমানদের অধিক সময়ের অনুমতি দেওয়া যায় না। নিষ্ঠাবান মুসলমানের আলামত অমুসলিমদের অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করা অবৈধ। আল্লাহর মসজিদের কর্তৃত্ব, হজযাত্রী এবং হারাম শরীফের সেবা ঈমান ও জিহাদের সমকক্ষ নয়। আল্লাহর জিকির জিহাদের চেয়েও পুণ্য কাজ, হিজরতের মাসায়েল পূর্ণতর ঈমানের পরিচয়, হুনায়নের যুদ্ধ (আনুষঙ্গিক বিষয়) মসজিদুল হারামের প্রবেশের অধিকার, আহলে কিতাব প্রসঙ্গ, জিযিয়ার তাৎপর্য , চান্দ্রমাসের হিসাব, মুশরিকরা অপবিত্র, ইহুদি খ্রিস্টানদের ভ্রান্ত প্রত্যয় ও উক্তি। আহবার রোহবানের স্থান এবং ভূমিকা ও জাকাত না দেওয়ার ভয়ঙ্কর পরিণতি, তাবুক যুদ্ধ প্রথম, দুনিয়ার মোহ, আখেরাতের প্রতি উদাসীনতা, জিহাদ অভিযানে মুনাফিকদের ভূমিকা, সদকা ও জাকাতের ব্যয় খাত. মুনাফিকদের আচরণ ও পরিণাম অতীত জাতির ইতিহাস ও শিক্ষা, মুনাফিকদের অকথ্য উক্তি, মুনাফিকদের জানাযা ও মাগফেরাত প্রসঙ্গ, রুগ্‌ণ, অক্ষম অপারগদের জিহাদ বিরতিতে অপরাধ নেই। মুনাফিকদের প্রকৃত রূপ ও রহস্য প্রসঙ্গে সাহাবায়ে কেরাম জান্নাতী ও আল্লাহর সন্তুষ্টি প্রাপ্ত, জাকাত আদায় ও দোয়া মুশরিকদের জন্য ইস্তিগফার প্রসঙ্গ, আল্লাহর তাকওয়া এবং দীন ইসলামের প্রসঙ্গ এবং জিহাদ অভিযানে জাতীয় কর্তব্য। সূরা অবতরণ কালে মুনাফিকদের আচরণ এবং রাসূলুল্লাহর গুণ বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি।

সূরার শানে নুযূল : আলোচ্য সূরার শানে নুযূল হলো হিজরি ৮ম সনে মক্কা বিজয় হয়। তখন অনেক কওমের লোকজনই মুসলমান হয়েছে। অনেক গোত্রের লোকেরাই রাসূল ﷺ -এর সাথে এ মর্মে চুক্তি সম্পাদিত করে যে, আমরা আপনার সাথে এবং আপনার সাথে যারা চুক্তিতে আবদ্ধ রয়েছে, তাদের সাথে কোনো প্রকারের যুদ্ধবিগ্রহ করব না। প্রয়োজন হলে যথাযথভাবে সাহায্য প্রদান করে যাব। রাসূল ﷺ ও তাদের সাথে সন্ধি স্থাপন করেছিলেন। ৯ম হিজরি সনে যখন সিরিয়া অভিমুখে তাবুক অভিযানে বের হন, তখন অনেক গোত্রবাসীরাই চুক্তি ভঙ্গ করেছিল এবং মুনাফেক সম্প্রদায়ের লোকেরা অনেক অপপ্রচার করতে আরম্ভ করল। সেই তাবুক অভিযান হতে ফিরে আসার পর, চুক্তিকারী তাবুক অভিযানে যারা অংশগ্রহণ করেনি এবং যারা অপপ্রচার চলিয়ে বিভ্রান্ত সৃষ্টি করার অপপ্রয়াস চলিয়ে ছিল, তাদের প্রতি ধিক্কার স্বরূপ আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য সূরা অবতীর্ণ করেন।

কুরআন সংগ্রাহক হযরত ওছমান গনী (রা.) স্বীয় শাসনামলে যখন কুরআনকে গ্রন্থের রূপ দেন, তখন দেখা যায়, অপরাপর সূরার বরখেলাফ সূরা তওবার শুরুতে 'বিসমিল্লাহ' নেই। তাই সন্দেহ ঘনীভূত হয় যে, হয়তো এটি স্বতন্ত্র কোনো সূরা নয়; বরং অন্য কোনো সূরার অংশ। এতে এ প্রশ্নের উদ্ভবও হয় যে, এমতাবস্থায় তা কোন সূরার অংশ হতে পারে? বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে একে সূরা আনফালের অংশ বলাই সঙ্গত।

হযরত ওসমান (রা.)-এর এক রেওয়ায়েতে একথাও বর্ণিত আছে যে, নবী করীম ﷺ -এর যুগে সূরা আনফাল ও তওবাকে করীনাতাইন বা মিলিত সূরা বলা হতো। –[মাযহারী] সেজন্য একে সূরা আনফালের পর স্থান দেওয়া হয়। এতে এ সতর্কতাও অবলম্বিত হয়েছে যে, বাস্তবে যদি এটি সূরা আনফালের অংশ হয়, তবে তারই সাথে যুক্ত থাকাই দরকার। পক্ষান্তরে সূরা তওবার স্বতন্ত্র সূরা হওয়ার সম্ভাবনাও কম নয়। তাই কুরআন লিপিবদ্ধ হওয়ার সময় সূরা আনফালের শেষে এবং সূরা তওবা শুরু করার আগে কিছু ফাঁক রাখার ব্যবস্থা নেওয়া হয়। যেমন, অপরাপর সূরার শুরুতে 'বিসমিল্লাহ' –এর স্থান হয়।

সূরা বারাআত বা তওবার শুরুতে বিসমিল্লাহ লিখিত না হওয়ার এ তত্ত্বটি হাদীসের কিতাব আবূ দাউদ, নাসায়ী ও মুসনাদে ইমাম আহমদে স্বয়ং হযরত ওসমান গনী (রা.) থেকে এবং তিরমিযী শরীফে মুফাসসিরে কুরআন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে। এ বিষয়ে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হযরত ওসমান গনী (রা.) -কে প্রশ্নও করেছিলেন যে, যে নিয়মে কুরআনের সূরাগুলোর বিন্যাস করা হয়, অর্থাৎ প্রথম দিকে শতাধিক আয়াত সংবলিত বৃহৎ সূরাগুলো রাখা হয়, পরিভাষায় যাদের বলা হয় 'মিঈন' অতঃপর রাখা হয় শতের কম আয়াত সংবলিত সূরাগুলো যাদের বলা হয় 'মাছানী'। এরপর স্থান দেওয়া হয় ছোট সূরাগুলোকে যাদের বলা হয় 'মুফাসসালাত'। কুরআন সংকলনের এ নিয়মানুসারে সূরা তওবাকে সূরা আনফালের সাথে স্থান দেওয়া কি উচিত ছিল না? কারণ সূরা তওবার আয়াত সংখ্যা

শতের অধিক। আর আনফলের শতের কম। প্রথম দিকের দীর্ঘ সাতটি সূরাকে আয়াতের সংখ্যানুসারে যে নিয়মে রাখা হয়েছে যাদের سَبْعِ طِوَالْ বলা হয়, তদনুসারে আনফালের স্থলে সূরা তওবা থাকাই তো অধিক সঙ্গত। অথচ এখানে এ নিয়মের বরখেলাফ করা হয়। এর রহস্য কি?

হযরত ওসমান গনী (রা.) বলেন, কথাগুলো সত্য, কিন্তু কুরআনের বেলায় যা করা হলো, তা সাবধানতার খাতিরে। কারণ বাস্তবে সূরা তওবা যদি স্বতন্ত্র সূরা না হয়ে আনফালের অংশ হয়, আর একথা প্রকাশ্য যে, আনফালের আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয় তওবার আয়াতগুলোর আগে, তাই ওহীর ইঙ্গিত ব্যতীত আনফালের আগে সূরা তওবাকে স্থান দেওয়া আমাদের পক্ষে বৈধ হবে না। আর একথাও সত্য যে, ওহীর মাধ্যমে এ ব্যাপারে আমাদের কাছে কোনো হেদায়েত আসেনি। তাই আনফালকে আগে এবং তওবাকে পরে রাখা হয়েছে।

এ তত্ত্ব থেকে বুঝা গেল যে, সূরা তওবা স্বতন্ত্র সূরা না হয়ে সূরা আনফালের অংশ হওয়ার সম্ভাবনাটি এর শুরুতে বিসমিল্লাহ না লেখার কারণ, এ সম্ভাবনা থাকার ফলে এখানে বিসমিল্লাহ লেখা বৈধ নয়, যেমন বৈধ নয় কোনো সূরার মাঝখানে বিসমিল্লাহ লেখা। এ কারণেই আমাদের মান্য ফিকহ্শাস্ত্রবিদগণ বলেন, যে ব্যক্তি সূরা আনফালের তেলাওয়াত সমাপ্ত করে সূরা তওবা শুরু করে, সে বিসমিল্লাহ পাঠ করবে না। কিন্তু যে ব্যক্তি প্রথমেই সূরা তওবা থেকে আরম্ভ করে, সে বিসমিল্লাহ পড়বে। অনেকে মনে করে যে, সূরা তওবার তেলাওয়াত কালে কোনো অবস্থায়ই বিসমিল্লাহ পাঠ জায়েজ নয়। তাদের এ ধারণা ভুল। অধিকন্তু এ ভুলও তারা করে বসে যে, এখানে বিসমিল্লাহ -এর স্থলে أَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ النَّارِ তারা পাঠ করে। এর কোনো প্রমাণ রাসূল ﷺ থেকে ও তাঁর সাহাবায়ে কেরাম থেকে পাওয়া যায় না।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) কর্তৃক হযরত আলী (রা.) থেকে অপর একটি রেওয়ায়েত বর্ণিত আছে। এতে সূরা তওবার শুরুতে বিসমিল্লাহ না লেখার কারণ দর্শানো হয় যে, বিসমিল্লাহতে আছে শান্তি ও নিরাপত্তার পয়গাম, কিন্তু সূরা তওবায় কাফেরদের জন্য শান্তি ও নিরাপত্তা চুক্তি গুলো নাকচ করে দেওয়া হয়। নিঃসন্দেহে এটিও এক সূক্ষ্ম তত্ত্ব যা মূল কারণের পরিপন্থি নয়। মূল কারণ হলো, তওবা ও আনফাল একটি মাত্র সূরা হওয়ার সম্ভাবনা। হ্যাঁ, উপরিউক্ত কারণও যুক্ত হতে পারে যে, এ সূরায় কাফেরদের নিারাপত্তাকে নাকচ করে দেওয়া হয় বিধায় 'বিসমিল্লাহ' সঙ্গত নয়।

সূরা তওবার উপরিউক্ত আয়াতগুলোর যথাযথ মর্মোপলব্ধির জন্য যে ঘটনাবলির প্রেক্ষিতে আয়াতগুলো নাজিল হয়েছে, প্রথমে তা জেনে নেওয়া আবশ্যক। এখানে সংক্ষেপে ঘটনাগুলোর বিবরণ দেওয়া হলো।

১. সূরা তওবার সর্বত্র কতিপয় যুদ্ধ, যুদ্ধ সংক্রান্ত ঘটনাবলি এবং এ আরবদের সকল গোত্রের সাথে কৃত সকল চুক্তি বাতিলকরণ, মক্কা বিজয়, হুনাইন ও তাবুক যুদ্ধ প্রভৃতি। এ সকল ঘটনার মধ্যে প্রথম হয়েছে অষ্টম হিজরি সালের মক্কা বিজয়। অতঃপর এ বছরেই সংঘটিত হয় হুনাইন যুদ্ধ। এরপর তাবুক যুদ্ধ বাধে নবম হিজরির রজব মাসে। তারপর এ সালের জিলহজ্ মাসে আরবের সকল গোত্রের সাথে সকল চুক্তি বাতিল করার ঘোষণা দেওয়া হয়।

২. চুক্তি বাতিলের যে কথাগুলো আয়াতে উল্লিখিত আছে, তার সারমর্ম হলো, ষষ্ঠ হিজরি সালে রাসূলুল্লাহ ﷺ ওমরা পালনের নিয়ত করেন। কিন্তু মক্কার কুরাইশ বংশীয় লোকেরা রাসূল ﷺ-কে মক্কা প্রবেশে বাধা দেয়। পরে তাদের সাথে হুদায়বিয়ায় সন্ধি হয়। এর মেয়াদকাল ছিল তাফসীরে 'রূহুল মা'আনী'র বর্ণনা মতে, দশ বছর। মক্কার কুরাইশদের সাথে অন্যান্য গোত্রের লোকেরাও বসবাস করত। হুদায়বিয়ায় যে সন্ধি হয়, তার একটি ধারা এও ছিল যে, কোরাইশ বংশীয় লোক ছাড়া অন্যান্য বংশের লোকেরা ইচ্ছা করলে কোরাইশদের মিত্র অথবা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মিত্র হয়ে তাঁর সঙ্গী হতে পারে। এ ধারা মতে 'খোযাআ' গোত্র রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এবং বনূ বকর গোত্র কুরাইশদের মিত্রে পরিণত হয়। এ সন্ধির অপর উল্লেখযোগ্য ধারা হলো, এ দশ বছরে না পরস্পরের মধ্যে কোনো যুদ্ধ বাধবে, আর না কেউ কোনো যুদ্ধকারীদের সাহায্য করবে। যে গোত্র যার সাথে রয়েছে তার বেলায়ও এ নীতি প্রযোজ্য হবে। অর্থাৎ এদের কারো প্রাতি আক্রমণ বা আক্রমণে সাহায্যদান হবে চুক্তি ভঙ্গের নামান্তর।

এ সন্ধি স্থাপিত হয় ষষ্ঠ হিজরিতে। সপ্তম হিজরিতে রাসূলুল্লাহ ﷺ গত বছরের ওমরা কাযা করার উদ্দেশ্যে মক্কা শরীফে গমন করেন এবং তিন দিন সেখানে অবস্থান করে সন্ধি মোতাবেক মদিনা প্রত্যাবর্তন করেন। এ সময়ের মধ্যে কোনো পক্ষ থেকে চুক্তি ভঙ্গের কিছু পাওয়া যায়নি।

www.almodina.com

এরপর পাঁচ ছয় মাস অতিবাহিত হলে এক রাতে বনূ বকর গোত্র বনূ খোযাআর উপর অতর্কিত আক্রমণ চালায়। কুরাইশগণ মনে করে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর অবস্থান বহুদূরে তদুপরি এ হলো নৈশ অভিযান। ফলে ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ তাঁর কাছে সহজে পৌঁছবে না। তাই তারা এ আক্রমণে লোক ও অস্ত্র দিয়ে বনূ বকরের সাহায্য করে। এ ঘটনার প্রেক্ষিতে যা কুরাইশরাও স্বীকার করে নিয়েছিল, অর্থাৎ হুদায়বিয়ার সন্ধি বাতিল হয়ে যায়, যাতে ছিল দশ বছরকাল যুদ্ধ স্থগিত রাখার চুক্তি।

ওদিকে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মিত্র বনূ খোযাআ গোত্র ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ তাঁর কাছে পৌঁছে দেয়। তিনি কুরাইশদের চুক্তি ভঙ্গের সংবাদ পেয়ে তাদের বিরুদ্ধে গোপনে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন।

বদর, ওহুদ ও আহযাব যুদ্ধে মুসলমানদের গায়েবি সাহায্য লাভের বিষয়টি কুরাইশরা আঁচ করে হীনবল হয়ে পড়েছিল। তার উপর চুক্তি ভঙ্গের বর্তমান ঘটনায় মুসলমানদের যুদ্ধ প্রস্তুতির আশঙ্কা বেড়ে গেল। চুক্তি ভঙ্গের সংবাদ হযরতের কাছে পৌঁছার পর পূর্ণ নীরবতা লক্ষ্য করে এ আশঙ্কা আরো ঘনীভূত হলো। তাই তারা বাধ্য হয়ে আবূ সুফিয়ানকে অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য মদিনায় প্রেরণ করে, যাতে তিনি মুসলমানদের যুদ্ধ প্রস্তুতি আঁচ করতে পারলে পূর্ববর্তী ঘটনার জন্য ক্ষমা চেয়ে নিয়ে ভবিষ্যতের জন্য সেই চুক্তিকে নবায়ন করতে পারেন।

আবূ সুফিয়ান মদিনায় উপস্থিত হয়ে রাসূল ﷺ -এর যুদ্ধ প্রস্তুতি অবলোকন করেন, এতে তিনি শঙ্কিত হয়ে গণ্যমান্য সাহাবীদের কাছে যান, যাতে তাঁরা রাসূল ﷺ -এর কাছে চুক্তিটি বলবৎ রাখার সুপারিশ করেন। কিন্তু তাঁরা সবাই তাদের পূর্ববর্তী ও উপস্থিত ঘটনাবলির তিক্ত অভিজ্ঞতার দরুন কথাটি নাকচ করে দেন। ফলে আবূ সুফিয়ান বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে আসেন, আর এতে মক্কার সর্বত্র যুদ্ধের ভয়ভীতি ছড়িয়ে পড়ে।

'বিদায়া' ও 'ইবনে কাছীর' -এর বর্ণনা মতে হযরত রাসূলে কারীম ﷺ অষ্টম হিজরির দশই রমজান সাহাবায়ে কেরামের এক বিশাল বাহিনী নিয়ে মক্কা জয়ের উদ্দেশ্যে মদিনা ত্যাগ করেন, পরিশেষে মক্কা বিজিত হয়।

সূরার তৃতীয় আয়াত يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ বাক্যের অর্থ নিয়ে মুফাসসিরগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.), হযরত ওমর ফারূক (রা.), আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) এবং আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা.) প্রমুখ সাহাবা বলেন– يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ -এর অর্থ আরাফাতের দিন। কারণ রাসূলুল্লাহ ﷺ হাদীস শরীফে ইরশাদ করেছেন– اَلْحَجُّ عَرَفَةُ 'হজ হলো আরাফাতের দিন' [আবূ দাউদ] আর কেউ বলেন, এর অর্থ কুরবানির দিন বা দশই জিলহজ।

হযরত সুফিয়ান ছওরী (র.) এবং অপরাপর ইমামগণ এ সকল উক্তির সমন্বয় সাধন উদ্দেশ্যে বলেন, হজের পাঁচ দিন হলো হজ্জে আকবরের দিন। এতে আরাফাত ও কুরবানির দিনগুলোও রয়েছে। তবে এখানে يَوْمٌ (দিন) শব্দের একবচন আরবি বাকরীতির বিরুদ্ধ নয়। কুরআনের অপর আয়াতে বদর যুদ্ধের দিনগুলোকে يَوْمُ الْفُرْقَانِ রূপে অভিহিত করা হয়েছে। এখানেও শব্দটি একবচন রূপে ব্যবহৃত হয়। তেমনি আরবের অপরাপর যুদ্ধ যথা يَوْمُ اُحُدٍ يَوْمُ بُعَاثٍ প্রভৃতি একবচন রয়েছে। অনেক দিনব্যাপী এ সকল যুদ্ধ চলতে থাকে।

তা'ছাড়া ওমরার অপর নাম হলো হজ্জে আসগর বা ছোট হজ। এর থেকে হজকে পৃথক করার জন্য বলা হয় হজে আকবর অর্থাৎ বড় হজ। তাই কুরআনের পরিভাষা মতে প্রতি বছরের হজকে হজ্জে আকবর বলা যাবে। সাধারণ লোকেরা যে মনে করে, যে বছর আরাফাতের দিন হবে শুক্রবার সে বছরের হজ হলো হজ্জে আকবর তাদের এ ধারণা ভুল। তবে এতটুকু কথা বলা আছে যে, রাসূল ﷺ -এর বিদায় হজে আরাফতের দিনটি ঘটনাচক্রে শুক্রবার পড়েছিল। সম্ভবত এর থেকে উক্ত ধারণার উৎপত্তি। অবশ্য শুক্রবারের বিশেষ ফজিলতের বিষয়টি অস্বীকার করা যায় না। তবে আয়াতের মর্মের সাথে উক্ত ধারণার কোনো সম্পর্ক নেই।

ইমাম জাসসাস (র.) 'আহাকমুল কুরআন' গ্রন্থে বলেন, হজের দিনগুলোকে হজ্জে আকবর নামে অভিহিত করা থেকে এ মাসআলাটি বের হয় যে, হজের দিনগুলোতে ওমরা পালন করা যাবে না। কেননা কুরআন মাজীদে এ দিনগুলোকে হজ্জে আকবরের জন্য নির্দিষ্ট রেখেছে।

قوله وَاِنْ اَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ اسْتَجَارَكَ فَاَجِرْهُ الخ সূরা তওবার প্রথম পাঁচ আয়াতে মক্কা বিজয়ের পর মক্কা ও তার আশপাশের সকল কাফের-মুশরিকের জান-মালের সার্বিক নিরাপত্তা দানের ষিয়টি উল্লিখিত হয়। তবে তাদের চুক্তিভঙ্গ ও বিশ্বাসঘাতকতার তিক্ত অভিজ্ঞতার প্রেক্ষিতে ভবিষ্যতে তাদের সাথে আর কোনো চুক্তি না করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এ

সত্ত্বেও ইতিপূর্বে যাদের সাথে চুক্তি করা হয় এবং যারা চুক্তিভঙ্গ করেনি, তাদের মেয়াদ পূর্ণ হওয়া অবধি চুক্তি রক্ষার জন্য এ আয়াতসমূহে মুসলমানদের আদেশ দেওয়া হয়। আর যাদের সাথে কোনো চুক্তি হয়নি, কিংবা যাদের সাথে কোনো মেয়াদি চুক্তি হয়নি, তাদের প্রতি এ অনুকম্পা করা হয় যে, ত্বরিত মক্কা ত্যাগের আদেশের স্থলে চার মাসের দীর্ঘ সময় দেওয়া হয়। যাতে এ অবসরে যেদিকে সুবিধা চলে যেতে পারে অথবা, এ সময়ে ইসলামের সত্যতা উপলব্ধি করে মুসলমান হতে পারে। আল্লাহর এ সকল আদেশের উদ্দেশ্য হলো, আগামী সাল নাগাদ যেন মক্কা শরীফ এ সকল বিশ্বাসঘাতক মুশরিকদের থেকে পবিত্র হয়ে যায়। তার এ ব্যবস্থা যেহেতু প্রতিশোধমূলক নয়; বরং তাদের একটানা বিশ্বাসঘাতকতার প্রেক্ষিতে নিজেদের নিরাপত্তার জন্য নেওয়া হয়। সেহেতু তাদের সংশোধন ও মঙ্গল লাভের দরজা খোলা রাখা হয়।

ইসলামের সত্যতার দলিল-প্রমাণ পেশ করা আলেমগণের কর্তব্য : প্রথমত আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, কোনো বিধর্মী যদি ইসলামের সত্যতার দলিল জানতে চায়, তবে প্রমাণপঞ্জী সহাবায়ে কেরাম তার সামনে ইসলামকে পেশ করা মুসলমানদের কর্তব্য।

দ্বিতীয়ত কোনো বিধর্মী ইসলামের সম্যক তথ্য ও তত্ত্বাবলি হাসিলের জন্য যদি আমাদের কাছে আসে, তবে এর অনুমতি দান ও তার নিরাপত্তা বিধান আমাদের পক্ষে ওয়াজিব। তাকে বিব্রত করা বা তার ক্ষতিসাধন অবৈধ। তাফসীরে কুরতুবীতে আছে : এ হুকুম প্রযোজ্য হয় তখন, যখন আল্লাহর কালাম শোনা ও ইসলামের গবেষণাই তার উদ্দেশ্য হয়। ভিন্ন কোনো উদ্দেশ্য ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতির জন্য যদি আসতে চায়, তবে তা মুসলিম স্বার্থ ও মুসলিম শাসকগণের বিবেচনার উপর নির্ভরশীল। সঙ্গত মনে হলে অনুমতি দেওয়া যেতে পারে।

ইসলামি রাষ্ট্রে অমুসলমানদের অধিক সময়ের অনুমতি দেওয়া যায় না : তৃতীয়ত বিদেশী অমুসলমান যাদের সাথে আমাদের কোনো চুক্তি নেই, আবশ্যকভাবে অধিক সময় অবস্থানের অনুমতি তাদের দেওয়া যাবে না। কারণ এ আয়াতে তাদের আশ্রয় দান অবস্থানের সীমা নির্ধারণের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে যে, حَتّٰى يَسْمَعَ كَلٰمَ اللّٰهِ অর্থাৎ এদের অবস্থানের এতটুকু সময় দাও, যাতে এরা আল্লাহর কালাম শুনতে পায়।

চতুর্থত মুসলিম শাসক ও রাষ্ট্রনায়কের কর্তব্য হবে কোনো অমুসলমান প্রয়োজনে আমাদের অনুমতি (ভিসা) নিয়ে আমাদের দেশে আগমন করলে তার গতিবিধির প্রতি লক্ষ্য রাখা এবং প্রয়োজন শেষে নিরাপদে তাকে প্রত্যার্পণ করা।

শব্দ বিশ্লেষণ

سِيْحُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلسَّيْحُ، اَلسِّيَاحَةُ মূলবর্ণ (س - ى - ح) জিনস اجوف يائى অর্থ– তোমরা ভ্রমণ কর, তোমরা বিচরণ কর।

تُبْتُمْ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ اثبات فعل ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلتَّوْبَةُ মূলবর্ণ (ت - و - ب) জিনস اجوف واوى অর্থ– তোমরা তওবা করেছ, তোমরা অনুশোচনা করেছ।

مَرْصَدٌ : শব্দটি একবচন; বহুবচন مَرَاصِدُ অর্থ– পর্যবেক্ষণ করা, যেতে দেওয়া, মুক্তি দেওয়া, বরাদ্দ করা।

خَلُّوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّخْلِيَةُ মূলবর্ণ (خ - ل - و) জিনস ناقص واوى অর্থ– তোমরা ছেড়ে দাও।

مَاْمَنٌ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم ظرف বাব سَمِعَ মাসদার اَلْاَمْنُ মূলবর্ণ (ا - م - ن) জিনস مهموز فاء অর্থ– নিরাপদ স্থান।

www.almodina.com

অনুবাদ	আয়াত
অনুবাদ : (৭) এই [কুরাইশ] মুশরিকদের অঙ্গীকার আল্লাহ তা'আলার নিকট এবং তাঁর রাসূলের নিকট কিরূপে [বলবৎ] থাকবে? কিন্তু যাদের থেকে তোমরা মসজিদে হারামের সন্নিকটে অঙ্গীকার নিয়েছ, অতএব, যে পর্যন্ত এরাই তোমাদের সাথে সরলভাবে থাকে তোমরাও তাদের সাথে সরলভাবে থাকবে, নিঃসন্দেহে আল্লাহ সংযমশীলদেরকে পছন্দ করেন।	كَيْفَ يَكُوْنُ لِلْمُشْرِكِيْنَ عَهْدٌ عِنْدَ اللّٰهِ وَعِنْدَ رَسُوْلِهٖٓ اِلَّا الَّذِيْنَ عٰهَدْتُّمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ فَمَا اسْتَقَامُوْا لَكُمْ فَاسْتَقِيْمُوْا لَهُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ (٧)
(৮) কি করে [কুরাইশ মুশরিকরা চুক্তি রক্ষা করবে?] অথচ অবস্থা এই যে, যদি তারা তোমাদের উপর প্রাধান্য লাভ করে, তবে তোমাদের আত্মীয়তার মর্যাদাও রক্ষা করবে না, আর না অঙ্গীকারের, এরা তোমাদেরকে নিজেদের মুখের কথায় সন্তুষ্ট করছে এবং তাদের অন্তরসমূহ অস্বীকার করে, আর তাদের অধিকাংশ লোকই দুষ্ট।	كَيْفَ وَاِنْ يَّظْهَرُوْا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوْا فِيْكُمْ اِلًّا وَّلَا ذِمَّةً ۗ يُرْضُوْنَكُمْ بِاَفْوَاهِهِمْ وَتَاْبٰى قُلُوْبُهُمْ ۚ وَاَكْثَرُهُمْ فٰسِقُوْنَ (٨)
(৯) তারা আল্লাহর আহকামের বিনিময়ে অস্থায়ী সম্পদ বরণ করে রেখেছে, ফলতঃ তারা আল্লাহর রাস্তা হতে সরে রয়েছে, নিশ্চয় তাদের কাজ অতি মন্দ।	اِشْتَرَوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ثَمَنًا قَلِيْلًا فَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِهٖ ۗ اِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ (٩)
(১০) এরা কোনো মুসলমানের ব্যাপারে আত্মীয়তার মর্যাদাও রক্ষা করে না, আর না অঙ্গীকারের, আর এরা [বিশেষতঃ এ ব্যাপারে] খুবই বাড়াবাড়ি করছে।	لَا يَرْقُبُوْنَ فِيْ مُؤْمِنٍ اِلًّا وَّلَا ذِمَّةً ۗ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُوْنَ (١٠)

শাব্দিক অনুবাদ

(৭) كَيْفَ يَكُوْنُ কিরূপে [বলবৎ] থাকবে لِلْمُشْرِكِيْنَ عَهْدٌ এই মুশরিকদের অঙ্গীকার عِنْدَ اللّٰهِ আল্লাহ তা'আলার নিকট وَعِنْدَ رَسُوْلِهٖ এবং তাঁর রাসূলের নিকট اِلَّا الَّذِيْنَ عٰهَدْتُّمْ কিন্তু যাদের থেকে তোমরা অঙ্গীকার নিয়েছ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ মসজিদে হারামের সন্নিকটে فَمَا اسْتَقَامُوْا لَكُمْ অতএব, যে পর্যন্ত এরাই তোমাদের সাথে সরলভাবে থাকে فَاسْتَقِيْمُوْا لَهُمْ তোমরাও তাদের সাথে সরলভাবে থাকবে اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ নিঃসন্দেহে আল্লাহ সংযমশীলদেরকে পছন্দ করেন।

(৮) كَيْفَ কি করে [কুরাইশ মুশরিকরা চুক্তি রক্ষা করবে] وَاِنْ يَّظْهَرُوْا عَلَيْكُمْ অথচ অবস্থা এই যে, যদি তারা তোমাদের উপর প্রাধান্য লাভ করে لَا يَرْقُبُوْا فِيْكُمْ اِلًّا وَّلَا ذِمَّةً তবে তোমাদের আত্মীয়তার মর্যাদাও রক্ষা করবে না, আর না অঙ্গীকারের يُرْضُوْنَكُمْ بِاَفْوَاهِهِمْ এরা তোমাদেরকে নিজেদের মুখের কথায় সন্তুষ্ট করছে وَتَاْبٰى قُلُوْبُهُمْ এবং তাদের অন্তরসমূহ অস্বীকার করে وَاَكْثَرُهُمْ فٰسِقُوْنَ আর তাদের অধিকাংশ লোকই দুষ্ট।

(৯) اِشْتَرَوْا তারা বরণ করে রেখেছে بِاٰيٰتِ اللّٰهِ আল্লাহর আহকামের বিনিময়ে ثَمَنًا قَلِيْلًا অস্থায়ী সম্পদ فَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِهٖ ফলতঃ তারা আল্লাহর রাস্তা হতে সরে রয়েছে اِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ নিশ্চয় তাদের কাজ অতি মন্দ।

(১০) لَا يَرْقُبُوْنَ فِيْ مُؤْمِنٍ এরা কোনো মুসলমানের ব্যাপারে রক্ষা করে না اِلًّا وَّلَا ذِمَّةً আত্মীয়তার মর্যাদাও আর না অঙ্গীকারের وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُوْنَ আর এরা [বিশেষতঃ এ ব্যাপারে] খুবই বাড়াবাড়ি করছে।

www.almodina.com

فَاِنْ تَابُوْا وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ فَاِخْوَانُكُمْ فِى الدِّيْنِ ۗ وَنُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ (١١)

অনুবাদ : (১১) অতএব, যদি তারা তওবা করে নেয় এবং নামাজ পড়তে থাকে ও জাকাত দিতে থাকে, তবে তারা তোমাদের ধর্ম ভাই হয়ে যাবে। আর আমি জ্ঞানী লোকদের জন্য বিধানাবলি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করে থাকি।

وَاِنْ نَّكَثُوْۤا اَيْمَانَهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوْا فِىْ دِيْنِكُمْ فَقَاتِلُوْۤا اَئِمَّةَ الْكُفْرِ ۙ اِنَّهُمْ لَاۤ اَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُوْنَ (١٢)

(১২) আর যদি তারা অঙ্গীকার করার পর নিজেদের শপথগুলোকে ভঙ্গ করে ফেলে এবং তোমাদের ধর্মের প্রতি দোষারোপ করে, তবে তোমরা কুফরের অগ্রনায়কদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর, [এই অবস্থায়] তাদের শপথ রইল না, যেন তারা প্রত্যাবর্তন করে।

اَلَا تُقَاتِلُوْنَ قَوْمًا نَّكَثُوْۤا اَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوْا بِاِخْرَاجِ الرَّسُوْلِ وَهُمْ بَدَءُوْكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ ۚ اَتَخْشَوْنَهُمْ ۚ فَاللّٰهُ اَحَقُّ اَنْ تَخْشَوْهُ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ (١٣)

(১৩) তোমরা এমন লোকদের বিরুদ্ধে কেন যুদ্ধ কর না? যারা নিজেদের শপথগুলোকে ভঙ্গ করে ফেলেছে, আর রাসূলকে দেশান্তর করার সিদ্ধান্ত করেছে এবং তারা তোমাদের বিরুদ্ধে নিজেরাই প্রথমে বিবাদ সৃষ্টি করল, তোমরা কি তাদেরকে ভয় করছ? বস্তুতঃ আল্লাহ তা'আলা হচ্ছেন অধিক হকদার এ বিষয়ে যে, তোমরা তাঁকে ভয় কর, যদি তোমরা ঈমান রাখ।

শাব্দিক অনুবাদ

(১১) فَاِنْ تَابُوْا অতএব, যদি তারা তওবা করে নেয় وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ এবং নামাজ পড়তে থাকে وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ ও জাকাত দিতে থাকে فَاِخْوَانُكُمْ فِى الدِّيْنِ তবে তারা তোমাদের ধর্ম ভাই হয়ে যাবে وَنُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ আর আমি বিধানাবলি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করে থাকি لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ জ্ঞানী লোকদের জন্য।

(১২) وَاِنْ نَّكَثُوْۤا اَيْمَانَهُمْ আর যদি তারা নিজেদের শপথগুলোকে ভঙ্গ করে ফেলে مِّنْۢ بَعْدِ عَهْدِهِمْ অঙ্গীকার করার পর وَطَعَنُوْا فِىْ دِيْنِكُمْ এবং তোমাদের ধর্মের প্রতি দোষারোপ করে فَقَاتِلُوْۤا اَئِمَّةَ الْكُفْرِ তবে তোমরা কুফরের অগ্রনায়কদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর اِنَّهُمْ لَاۤ اَيْمَانَ لَهُمْ [এই অবস্থায়] তাদের শপথ রইল না لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُوْنَ যেন তারা প্রত্যাবর্তন করে।

(১৩) اَلَا تُقَاتِلُوْنَ قَوْمًا তোমরা এমন লোকদের বিরুদ্ধে কেন যুদ্ধ কর না نَّكَثُوْۤا اَيْمَانَهُمْ যারা নিজেদের শপথগুলোকে ভঙ্গ করে ফেলেছে وَهَمُّوْا بِاِخْرَاجِ الرَّسُوْلِ আর রাসূলকে দেশান্তর করার সিদ্ধান্ত রয়েছে وَهُمْ بَدَءُوْكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ এবং তারা তোমাদের বিরুদ্ধে নিজেরাই প্রথমে বিবাদ সৃষ্টি করল اَتَخْشَوْنَهُمْ তোমরা কি তাদেরকে ভয় করছ فَاللّٰهُ اَحَقُّ اَنْ تَخْشَوْهُ বস্তুতঃ আল্লাহ তা'আলা হচ্ছেন অধিক হকদার এ বিষয়ে যে, তোমরা তাঁকে ভয় কর اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ যদি তোমরা ঈমান রাখ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(১৩) قوله اَلَا تُقَاتِلُوْنَ قَوْمًا نَّكَثُوْۤا اَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوْا بِاِخْرَاجِ الخ **আয়াতের শানে নুযূল– ১ :** আল্লামা সুদ্দী, ইবনে ইসহাক ও কালবী বলেন যে, আলোচ্য আয়াত মক্কার সে সকল কাফেরদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে যারা হুদায়বিয়ার সন্ধি করার পর অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছিল এবং বনূ বকর রাসূল ﷺ -এর মিত্র খুযাআর মোকাবিলায় সকল প্রকারের সাহায্য করেছিল। এমনকি কুরাইশরা যখন দারুন নদওয়ায় রাসূল ﷺ -কে মক্কা হতে বের করার জন্য পরামর্শ করেছিল, তখন তারা কুরাইশের সাথে ঐকমত্য প্রকাশ করেছিল।

শানে নুযূল– ২ : অথবা ইহুদিরা চুক্তি ভঙ্গ করে মদিনা হতে রাসূল ﷺ -কে বের করার জন্য বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। তাদের সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত দুটি নাজিল হয়েছে। –[বাহরে মুহীত-১৮/৫, কুরতুবী-৮০/৮, ইবনে কাছীর-৩৪৬/২]

সদা ন্যায়ের উপর অবিচল এবং বাড়াবাড়ি হতে বিরত থাকার শিক্ষা : কুরআন মাজীদ মুসলমানদের তাকিদ করে যে, শত্রুদের বেলায়ও ইনসাফ থেকে কোনো অবস্থায় যেন বিচ্যুত না হয়। আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ তার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। যেমন নগণ্য সংখ্যক মুশরিক ছাড়া বাকি সবাই চুক্তিভঙ্গ করেছে। সাধারণত এমতাবস্থায় বাছ-বিচার তেমন থাকে না। নির্দোষ ক্ষুদ্র দলকেও সংখ্যাগুরু অপরাধী দলের একই ভাগ্য বরণ করতে হয়। কিন্তু কুরআন إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ "তবে যাদের সাথে তোমরা মসজিদুল হারামের পাশে চুক্তি সম্পাদন করেছ" বলে ওদের পৃথক করে দেয়, যারা চুক্তি ভঙ্গ করেনি এবং আদেশ দেওয়া হয় যে, সংখ্যাগুরু চুক্তি ভঙ্গকারী মুশরিকদের প্রতি রাগ করে এদের সাথে তোমরা চুক্তিভঙ্গ করো না; বরং এরা যতদিন তোমাদের প্রতি সরল ও চুক্তির উপর অবিচল থাকে, তোমরাও তাদের প্রতি সরল থাক। ওদের প্রতি আক্রোশ বশত এদের কষ্ট দেবে না। অষ্টম আয়াতের শেষ বাক্য থেকেও বিষয়টি আঁচ করা যায়। যেখানে বলা হয়– وَأَكْثَرُهُمْ فٰسِقُونَ; "এদের অধিকাংশই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারী।" অর্থাৎ এদের মধ্যে কিছুসংখ্যক ভদ্রচিত্ত লোক চুক্তির উপর অবিচল থাকতে চায়। কিন্তু সংখ্যাগুলোর ভয়ে তারাও জড়সড়। কুরআন মাজীদ বিষয়টি অপর এক আয়াতে পরিষ্কার ব্যক্ত করেছে। বলা হয়েছে–وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى أَلَّا تَعْدِلُوْا। "কোনো জাতির শত্রুতা যেন বেইনসাফ হতে তাদের উদ্বুদ্ধ না করে।" –[মায়েদাহ]

এরপর নবম আয়াতে বিশ্বাসঘাতক মুশরিকদের বিশ্বাসঘাতকতা ও তাদের মর্মপীড়ার কারণ উল্লেখ করে তাদের উপদেশ দেওয়া হয় যে, তারা যেন বিচার-বিবেচনা করে নিজেদের বিশুদ্ধ করে নেয়। তৎসঙ্গে মুসলমানদেরও হুঁশিয়ার করা হয় যে, ওরা যে কারণে বিশ্বাস ভঙ্গে লিপ্ত হয়েছে, সাবধান! তোমরা তার থেকে পূর্ণ সতর্ক থাকবে। সে কারণটি হলো দুনিয়া প্রীতি। মূলত দুনিয়াবী অর্থসম্পদের লালসা এদের অন্ধ করে রেখেছে। তাই এরা আল্লাহর আদেশাবলি ও ঈমানকে তুচ্ছ মূল্যে বিক্রি করে দেয়। তাদের এ স্বভাব বড়ই পূঁতিগন্ধময়।

দশম আয়াতে এদের চরম হঠকারিতার বর্ণনা দেওয়া হয়। لَا يَرْقُبُوْنَ فِىْ مُؤْمِنٍ إِلًّا وَّلَا ذِمَّةً এরা চুক্তিবদ্ধ মুসলমানদের সাথেই যে বিশ্বাসঘাতকতা ও আত্মীয়তার মর্যাদা ক্ষুণ্ন করে, তা নয়; বরং তারা যে কোনো মুসলমানের সাথে বিশ্বাস ভঙ্গ করবে, আত্মীয়তাকেও জলাঞ্জলি দেবে।

মুশরিকদের উপরিউক্ত ঘৃণ্য চরিত্রের প্রেক্ষিতে মুসলমানদের জন্য তাদের সাথে চিরতরে সম্পর্কচ্ছেদ করে নেওয়াই ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু না। কুরআন যে আদর্শ ও ন্যায়নীতিকে প্রতিষ্ঠা করতে চায় তার আলোকে মুসলমানদের হেদায়েত দেয়– فَإِنْ تَابُوْا وَأَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِى الدِّيْنِ "তবে তারা যদি তওবা করে, নামাজ কায়েম করে ও জাকাত আদায় করে, তবে তারা তোমাদের দীনি ভাই।" এখানে বলা হয় যে, কাফেররা যত শত্রুতা করুক, যত নিপীড়ন চালাক, যখন সে মুসলমান হয়, তখন আল্লাহ যেমন তাদের কৃত অপরাধগুলো ক্ষমা করেন, তেমনি সকল তিক্ততা ভুলে তাদের ভ্রাতৃবন্ধনে আবদ্ধ করা এবং ভ্রাতৃত্বের সকল দাবি পূরণ করা মুসলমানদের কর্তব্য।

ইসলামি ভ্রাতৃত্ব লাভের তিনটি শর্ত : এ আয়াত প্রমাণ করে যে, ইসলামি ভ্রাতৃত্যের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার তিনটি শর্ত রয়েছে। প্রথম কুফর ও শিরক থেকে তওবা। দ্বিতীয় নামাজ। তৃতীয় জাকাত। কারণ, ঈমান ও তওবা হলো গোপন বিষয়। এর যথার্থতা সাধারণ মুসলমানের জানার কথা নয়। তাই ঈমান তওবার দুই প্রকাশ্য আলামতের উল্লেখ করা হয়, নামাজ ও জাকাত।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, এ আয়াত সকল কেবলানুসারী মুসলমানের রক্তকে হারাম করে দিয়েছে। অর্থাৎ যারা নিয়মিত নামাজ ও জাকাত আদায় করে এবং ইসলামের রবখেলাফ কথা ও কর্মের প্রমাণ পাওয়া যায় না। সর্বক্ষেত্রে তারা মুসলমানরূপে গণ্য; তাদের অন্তরে সঠিক ঈমান বা মুনাফেকী যাই থাক না কেন।

হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) জাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে এ আয়াত থেকে অস্ত্রধারণের যৌক্তিকতা প্রমাণ করে সাহাবায়ে কেরামের সন্দেহ নিরসন করেছিলেন। –[ইবনে কাছীর]

একাদশ আয়াতের শেষ বাক্যে চুক্তিকারী ও তওবাকারী লোকদের উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট আদেশাবলি পালনের তাকিদ দিয়ে বলা হয়– وَنُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ; "আর আমরা জ্ঞানী লোকদের জন্য বিধানসমূহ সবিস্তারে বর্ণনা করে থাকি।"

قوله وَإِنْ نَّكَثُوْٓا أَيْمَانَهُمْ مِّنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ الخ ষষ্ঠ হিজরিতে হুদায়বিয়ায় মক্কার যে কুরাইশদের সঙ্গে যুদ্ধ স্থগিত রাখার সন্ধি হয়েছিল, তাদের ব্যাপারে সূরা তওবার শুরুর আয়াতগুলোতে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয় যে. তারা সন্ধি চুক্তির উপর অবিচল থাকবে না। অতঃপর অষ্টম, নবম ও দশম আয়াতে তাদের চুক্তি ভঙ্গের কারণসমূহ বর্ণিত হয়। একাদশ

www.almodina.com

আয়াতে বলা হয় যে, চুক্তিভঙ্গের ভীষণ অপরাধে অপরাধী হলেও তারা যদি মুসলমান হয় এবং ইসলামকে নামাজ ও জাকাতের মাধ্যমে প্রকাশ করে, তবে অতীতের সকল তিক্ততা ভুলে যাওয়াও তাদের ভ্রাতৃবন্ধনে আবদ্ধ করা মুসলমানদের কর্তব্য।

আলোচ্য দ্বাদশ আয়াতে বলা হচ্ছে যে, উক্ত ভবিষ্যদ্বাণী মোতাবেক এরা যখন চুক্তিটি ভঙ্গ করে দিল; তখন এদের সাথে মুসলমানদের কি ব্যবহার করা উচিত। ইরশাদ হয়– وَاِنْ نَّكَثُوْٓا اَيْمَانَهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوْا فِيْ دِيْنِكُمْ فَقَاتِلُوْٓا اَئِمَّةَ الْكُفْرِ অর্থাৎ "এরা যদি চুক্তি সম্পাদনের পর শপথ ও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে এবং ইসলামও গ্রহণ না করে, অধিকন্তু ইসলামকে নিয়ে বিদ্রূপ করে, তবে সেই কুফর-প্রধানদের সাথে যুদ্ধ কর।"

فَقَاتِلُوْاهُمْ লক্ষণীয় যে, এখানে আপাতদৃষ্টিতে বলা সঙ্গত ছিল, 'সেই কাফেরদের সাথে যুদ্ধ কর।' কিন্তু তা না বলে বলা হয় فَقَاتِلُوْٓا اَئِمَّةَ الْكُفْرِ "সেই কুফর-প্রধানদের সাথে যুদ্ধ কর।" তার কারণ উপযুক্ত হয়। এ বাক্যরীতিতে যুদ্ধাদেশের কারণের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে।

কতিপয় মুফাসসির বলেন, এখানে কুফর প্রধান বলতে বুঝায় মক্কার ঐ সকল কুরাইশ প্রধান যারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে লোকদের উস্কানি দান ও রণ প্রস্তুতিতে নিয়োজিত ছিল। বিশেষত এদের সাথে যুদ্ধ করার আদেশ এজন্য দেওয়া হয় যে, মক্কাবাসীদের শক্তির উৎস হলো এরা। তাছাড়া এদের সাথে ছিল অনেক মুসলমানের আত্মীয়তা। যার ফলে এরা হয়তো প্রশ্রয় পেয়ে বসত। –[মাযহারী]

وَطَعَنُوْا فِيْ دِيْنِكُمْ "এবং বিদ্রূপ করে তোমাদের দীন সম্পর্কে" বাক্য থেকে কতিপয় আলেম প্রমাণ করেন যে, মুসলমানদের ধর্মের প্রতি বিদ্রূপ করা চুক্তিভঙ্গের নামান্তর। যে ব্যক্তি ইসলাম ও ইসলামি শরিয়তকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে, তাকে চুক্তি রক্ষাকারী বলা যাবে না। তবে মাননীয় ফকীহ বৃন্দের ঐকমত্যে আলোচ্য বিদ্রূপ হলো তা, যা ইসলাম ও মুসলমানদের হেয় করার উদ্দেশ্যে প্রকাশ্যরূপে করা হয়, ইসলামি আইন কানুনের গবেষণার উদ্দেশ্যে কৃত সমালোচনা বিদ্রূপের শামিল নয় এবং আভিধানিক অর্থেও তাকে বিদ্রূপ বলা যায় না। মোটকথা ইসলামি রাষ্ট্রে অবস্থানকারী অমুসলিম জিম্মিদের তত্ত্বগত সমালোচনার অনুমতি দেওয়া যায়, কিন্তু ঠাট্টা-বিদ্রূপের অনুমতি দেওয়া যায় না।

আয়াতের অপর বাক্য হলো– اِنَّهُمْ لَآ اَيْمَانَ لَهُمْ অর্থাৎ 'এদের কোনো শপথ নেই, কারণ এরা শপথ ও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গে অভ্যস্ত। তাই এদের শপথের কোনো মূল্য নেই।

আয়াতের শেষ বাক্য হলো– لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُوْنَ "যাতে তারা ফিরে আসে।" এতে বলা হয় যে, মুসলমানদের যুদ্ধবিগ্রহের উদ্দেশ্য অপরাপর জাতির মতো শত্রু নির্যাতন ও প্রতিশোধ-স্পৃহা নিবারণ, কিংবা সাধারণ রাষ্ট্রনায়কগণের মতো নিছক দেশ দখল না হওয়া চাই; বরং তাদের যুদ্ধের উদ্দেশ্য হওয়া চাই শত্রুদের মঙ্গল কামনা ও সহানুভূতি এবং বিপথ থেকে তাদের ফিরিয়ে আনা।

শব্দ বিশ্লেষণ

ذِمَّةٌ : শব্দটি একবচন; বহুবচনে ذِمَمٌ অর্থ– প্রতিশ্রুতি, প্রতিজ্ঞা।

يُرْضُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ اثبات فعل مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِرْضَاءُ মূলবর্ণ (ر - ض - و) জিনস ناقص واوى অর্থ–তারা সন্তুষ্ট রাখে।

اِشْتَرَوْا : সীগাহ جمع مذكرغائب বহছ اثبات فعل ماضى معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِشْتِرَاءُ মূলবর্ণ (ش - ر - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– তারা ক্রয় করেছে।

اَلْمُعْتَدُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব افتعال মাসদার اَلْاِعْتِدَاءُ মূলবর্ণ (ع - د - و) জিনস ناقص واوى অর্থ– সীমালঙ্ঘনকারী, সীমা অতিক্রমকারী।

هَمُّوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বচছ اثبات فعل ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْهَمُّ মূলবর্ণ (ه - م - م) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– তারা সংকল্প করেছে, তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

تَخْشَوْنَ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ اثبات فعل مضارع معرو বাব سَمِعَ মাসদার اَلْخَشْىُ মূলবর্ণ (خ - ش - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– তোমরা ভয় করছ।

www.almodina.com

قَاتِلُوْهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللّٰهُ بِاَيْدِيْكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُوْرَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِيْنَ (١٤)

অনুবাদ : (১৪) তাদের সঙ্গে যুদ্ধ কর, আল্লাহ তোমাদের হাতে তাদেরকে শাস্তি দিবেন এবং তাদেরকে লাঞ্ছিত করবেন, আর তোমাদেরকে তাদের উপর বিজয়ী করবেন, আর বহু মুসলমানের অন্তরসমূহকে উপশান্ত করবেন।

وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوْبِهِمْ ۚ وَيَتُوْبُ اللّٰهُ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ ۚ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ (١٥)

(১৫) আর তাদের অন্তরসমূহের ক্ষোভ [ও ক্রোধ] দূর করে দিবেন এবং [সেই কাফেরদের মধ্যকার] যার প্রতি ইচ্ছা হয়, আল্লাহ করুণা [-ও] প্রদর্শন করবেন, আর আল্লাহ তা'আলা মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।

اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تُتْرَكُوْا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ جٰهَدُوْا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلَا رَسُوْلِهٖ وَلَا الْمُؤْمِنِيْنَ وَلِيْجَةً ۚ وَاللّٰهُ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ (١٦)

(১৬) তোমরা কি এই ধারণা কর যে, তোমাদেরকে এভাবেই ছেড়ে দেওয়া হবে? অথচ আল্লাহ তো এখনো সেই সকল লোকদেরকে [প্রকাশ্যভাবে] দেখেননি, যারা তোমাদের মধ্য হতে জিহাদ করেছে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল এবং মুমিনগণ ব্যতীত অন্য কাউকেও অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করেনি, আর আল্লাহ তা'আলা তোমাদের সকল কর্মসমূহের পূর্ণ খবর রাখেন।

مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِيْنَ اَنْ يَّعْمُرُوْا مَسٰجِدَ اللّٰهِ شٰهِدِيْنَ عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ ۚ اُولٰٓئِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ ۚۖ وَفِي النَّارِ هُمْ خٰلِدُوْنَ (١٧)

(১৭) মুশরিকদের এই যোগ্যতাই নেই যে, তারা আল্লাহর মসজিদসমূহকে আবাদ করে, যে অবস্থায় তারা নিজেদের কুফরির স্বীকারোক্তি করছে, তাদের সমস্ত [সৎ] কার্যগুলো বিফল হলো, আর তারা দোজখে অনন্তকাল থাকবে।

শাব্দিক অনুবাদ

(১৪) قَاتِلُوْهُمْ তাদের সঙ্গে যুদ্ধ কর يُعَذِّبْهُمُ اللّٰهُ بِاَيْدِيْكُمْ আল্লাহ তোমাদের হাতে তাদেরকে শাস্তি দিবেন وَيُخْزِهِمْ এবং তাদেরকে লাঞ্ছিত করবেন وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ আর তোমাদেরকে তাদের উপর বিজয়ী করবেন وَيَشْفِ صُدُوْرَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِيْنَ আর বহু মুসলমানের অন্তরসমূহকে উপশান্ত করবেন।

(১৫) وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوْبِهِمْ আর তাদের অন্তরসমূহের ক্ষোভ [ও ক্রোধ] দূর করে দিবেন وَيَتُوْبُ اللّٰهُ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ এবং [সেই কাফেরদের মধ্যকার] যার প্রতি ইচ্ছা হয়, আল্লাহ করুণা [-ও] প্রদর্শন করবেন وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ আর আল্লাহ তা'আলা মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।

(১৬) اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تُتْرَكُوْا তোমরা কি এই ধারণা কর যে, তোমাদেরকে এভাবেই ছেড়ে দেওয়া হবে وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ جٰهَدُوْا مِنْكُمْ অথচ আল্লাহ তো এখনো সেই সকল লোকদেরকে [প্রকাশ্যভাবে] দেখেননি, যারা তোমাদের মধ্য হতে জিহাদ করেছে وَلَمْ يَتَّخِذُوْا এবং গ্রহণ করেনি مِنْ دُوْنِ ব্যতীত اللّٰهِ وَلَا رَسُوْلِهٖ وَلَا الْمُؤْمِنِيْنَ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল এবং মুমিনগণ অন্য কাউকেও وَلِيْجَةً অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে وَاللّٰهُ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ আর আল্লাহ তা'আলা তোমদের সকল কর্মসমূহের পূর্ণ খবর রাখেন।

(১৭) مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِيْنَ شٰهِدِيْنَ মুশরিকদের এই যোগ্যতাই নেই যে, اَنْ يَّعْمُرُوْا مَسٰجِدَ اللّٰهِ তারা আল্লাহর মসজিদসমূহকে আবাদ করে عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ যে অবস্থায় তারা নিজেদের কুফরির স্বীকারোক্তি করছে اُولٰٓئِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ তাদের সমস্ত [সৎ] কার্যগুলো বিফল হলো وَفِي النَّارِ هُمْ خٰلِدُوْنَ আর তারা দোজখে অনন্তকাল থাকবে।

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسٰجِدَ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ وَلَمْ يَخْشَ اِلَّا اللّٰهَ فَعَسٰۤى اُولٰۤئِكَ اَنْ يَّكُوْنُوْا مِنَ الْمُهْتَدِيْنَ (١٨)

অনুবাদ : (১৮) হ্যাঁ, আল্লাহর মসজিদগুলো আবাদ করা তাদের কাজ যারা আল্লাহর প্রতি এবং কিয়ামত দিবসের প্রতি ঈমান আনয়ন করে এবং নামাজ কায়েম রাখে এবং জাকাত প্রদান করে, আর আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত কাউকেও ভয় করে না, বস্তুতঃ এ সকল লোক সম্বন্ধে আশা যে, তারা নিজেদের লক্ষ্যস্থলে পৌছে যাবে।

اَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاۤجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَجٰهَدَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۭ لَا يَسْتَوٗنَ عِنْدَ اللّٰهِ ۭ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ (١٩)

(১৯) তোমরা কি হাজীদের পানি পান করানোকে এবং মসজিদে হারামের আবাদ রাখাকে সেই ব্যক্তির [কাজের] সমান সাব্যস্ত করে রেখেছ? যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলা ও কিয়ামত দিবসের প্রতি ঈমান এনেছে, আর সে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করেছে, এরা আল্লাহ তা'আলার সমীপে সমান নয়। আর যারা অবিচারক, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে সুবুদ্ধি দান করেন না।

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ ۙ اَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللّٰهِ ۭ وَاُولٰۤئِكَ هُمُ الْفَاۤئِزُوْنَ (٢٠)

(২০) যারা ঈমান আনয়ন করেছে এবং হিজরত করেছে, আর তারা নিজেদের ধন ও প্রাণ দ্বারা আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় জিহাদ করেছে, তারা মর্যাদায় আল্লাহ তা'আলার সমীপে অতি বড়, আর এরাই হচ্ছে পূর্ণ সফলকাম।

শাব্দিক অনুবাদ

(১৮) اِنَّمَا يَعْمُرُ مَسٰجِدَ اللّٰهِ হ্যাঁ, আল্লাহর মসজিদগুলো আবাদ করা তাদের কাজ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ যারা আল্লাহর প্রতি এবং কিয়ামত দিবসের প্রতি ঈমান আনয়ন করে وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ এবং নামাজ কায়েম রাখে وَاٰتَى الزَّكٰوةَ এবং জাকাত প্রদান করে وَلَمْ يَخْشَ اِلَّا اللّٰهَ আর আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত কাউকেও ভয় করে না فَعَسٰۤى اُولٰۤئِكَ اَنْ يَّكُوْنُوْا مِنَ الْمُهْتَدِيْنَ বস্তুতঃ এ সকল লোক সম্বন্ধে আশা যে, তারা নিজেদের লক্ষ্যস্থলে পৌছে যাবে।

(১৯) اَجَعَلْتُمْ তোমরা কি সেই ব্যক্তির [কাজের] সমান সাব্যস্ত করে রেখেছ سِقَايَةَ الْحَاۤجِّ হাজীদের পানি পান করানোকে وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ এবং মসজিদে হারামের আবাদ রাখাকে كَمَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলা ও কিয়ামত দিবসের প্রতি ঈমান এনেছে وَجٰهَدَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ আর সে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করেছে لَا يَسْتَوٗنَ عِنْدَ اللّٰهِ এরা আল্লাহ তা'আলার সমীপে সমান নয় وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ আর যারা অবিচারক, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে সুবুদ্ধি দান করেন না।

(২০) اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا যারা ঈমান আনয়ন করেছে وَهَاجَرُوْا এবং হিজরত করেছে وَجٰهَدُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ আর তারা আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় জিহাদ করেছে بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ নিজেদের ধন ও প্রাণ দ্বারা اَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللّٰهِ তারা মর্যাদায় আল্লাহ তা'আলার সমীপে অতি বড় وَاُولٰۤئِكَ هُمُ الْفَاۤئِزُوْنَ আর এরাই হচ্ছে পূর্ণ সফলকাম।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(১৪) قوله قَاتِلُوْهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللهُ بِاَيْدِيْكُمْ وَيُخْزِهِمْ الخ **আয়াতের শানে নুযূল– ১ :** হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বর্ণনা মতে মক্কা বিজয়ের পূর্বে মক্কা বিজয়ের প্রতি উৎসাহ যোগান দেওয়ার লক্ষ্যে আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়েছে। তবে উক্ত সূরার প্রথম অংশ মক্কা বিজয়ের পর নাজিল হয়েছিল। –[রূহুল মা'আনী-৬২/৫]

শানে নুযূল– ২ : ইবনে আবী শায়বা, ইবনুল মুনযির, ইবনে আবী হাতেম ও আবুশ শায়খ ইকরিমা হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন যে, আলোচ্য আয়াত বনূ খুযাআ অধিবাসীদের সম্পর্কে নাজিল করা হয়েছে। –[ফাতহুল কাদীর-৩৪৩/২]

সে ঘটনাটি হলো মুজাহিদের বর্ণনা মতে, বনূ খুযাআর মোকাবিলায় বনূ বকর যুদ্ধে অতবীর্ণ হয়। খুযাআ গোত্রীয়রা রাসূল ﷺ-এর মিত্র ছিল। আর কুরাইশ কাফেরেরা বনূ বকরের পক্ষাবলম্বনকারী ছিল। একদা বনূ বকরের এক লোক রাসূল ﷺ-এর সমালোচনা মূলকভাবে কবিতা আবৃত্তি করল, তখন খুযাঈ কোনো এক ব্যক্তি বলল যে, আবার পুনরাবৃত্তি করলে তোর মুখ ছিঁড়ে ফেলব। অতঃপর সে জেদ বশত আবারও কবিতা আবৃত্তি করল, তার প্রতিকার স্বরূপ তার মুখ ছিঁড়ে দিল। এতে করে তাদের মধ্যে যুদ্ধের এক অগ্নি শিখা দাউ দাউ করে জ্বলে উঠে, ফলে এ যুদ্ধে অনেক লোকজনকে মেরে ফেলে। সে পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[কুরতুবী-৮১/৫]

(১৭) قوله مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِيْنَ اَنْ يَّعْمُرُوْا مَسٰجِدَ اللهِ شٰهِدِيْنَ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** আবুশ শায়খ ও ইবনে জারীর যাহহাক হতে বর্ণনা করেন যে, হযরত আব্বাস (রা.) যখন বন্দী হন, তখন মুসলমনেরা তাকে শিরক এবং আত্মীয়তা ছেদনের ন্যায় কর্ম দ্বারা লজ্জা দিচ্ছিলেন, কথার দিক দিয়ে হযরত আলী (রা.) ছিলেন সর্বাধিক কঠুভাষী। তখন তিনি বললেন যে, তোমরা আমাদের দুষ্কর্মগুলো বর্ণনা করছ এবং আমাদের সেবাসমূহ গোপন করে রেখেছ। আমরা মসজিদে হারাম নির্মাণ করেছি। কাবা গৃহের গিলাফ পড়িয়েছি, হাজীদের আথিতেয়তা করছি, অনেক হত্যা জনিত অপরাধকে ক্ষমা করেছি। মুশরিকদের এ সকল ভালো কোনো কাজেই আসবে না। সে বিষয়টি বর্ণনা করার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেছেন। –[রূহুল মা'আনী-৬৫/৫]

(১৯) قوله اَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَآجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الخ **আয়াতের শানে নুযূল– ১ :** মুসলিম . আবূ দাউদ, ইবনে জারীর, ইবনুল মুনযির ও আরো অনেকেই হযরত নোমান ইবনে বশীর (রা.) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন যে, আমি রাসূল ﷺ-এর মিম্বরের নিকট ছিলাম। সেখানে সাহাবায়ে কেরাম হতে আরো অনেকেই ছিলেন। সে মুহূর্তে কোনো একজন সাহাবী বললেন যে, ইসলাম গ্রহণ করার পর হাজীদেরকে পানি পান করানো ছাড়া অন্য কোনো আমল করব না। অপরজন বললেন যে. তোমরা যা বলছ তদাপেক্ষা আল্লাহর পথে জিহাদ করা সর্বোৎকৃষ্ট। তখন হযরত ওমর (রা.) তদেরকে ভর্ৎসনা করে বলেন যে, لَا تَرْفَعُوْا اَصْوَاتَكُمْ عِنْدَ مِنْبَرِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ তোমরা রাসূল ﷺ-এর মিম্বারের পাশে থেকে উচ্চৈঃস্বরে কথোপকথন করো না। সে দিনটি ছিল শুক্রবার। সুতরাং যখন নামাজ শেষ হয়ে যাবে তখন আমি রাসূল ﷺ-এর নিকট গমন করে তোমরা যে বিষয়ে বিতর্ক করছ সে সম্পর্কে তাঁর নিকট থেকে জেনে নেব। তাদের এ বিতর্কের পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[কুরতুবী-৮৫/৮, রূহুল মা'আনী-৬৭/৫, বাহরে মুহীত-২২/৫, ফাতহুল কাদীর-৩৪৫/২]

শানে নুযূল– ২ : একাধিক রেওয়ায়েতে বর্ণিত রয়েছে যে, আলোচ্য আয়াত হযরত আলী (রা.) ও আব্বাস (রা.) সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। এর ঘটনাপ্রবাহ হচ্ছে, একদা হযরত আলী (রা.) তাঁকে বলেন, হে আমার চাচা! আপনি যদি মদিনায় হিজরত করতেন কতই না ভালো হতো। তখন তিনি তাকে বললেন যে, আমি হিজরত করা অপেক্ষা উত্তম কাজে আত্মনিয়োগ করে রাখিনি কী? আমি কি হাজীদের পানি পান করাচ্ছি না? এবং মসজিদে হারাম আবাদ করার কাজে আমি লেগে নেই কী? হাজীদের পানি পান করানো ও মসজিদে হারাম আবাদ করাকে তখন তারা ঈমান গ্রহণ ও হিজরত করা অপেক্ষা উত্তম কাজ মনে করত। সে প্রেক্ষাপট বর্ণনা করে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[রূহুল মা'আনী-৬৭/৫]

www.almodina.com

قَوْلُهُ قَاتِلُوْهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللّٰهُ بِاَيْدِيْكُمْ الخ : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে মুশরিকদের হঠকারিতা, বিশ্বাসঘাতকতা ও নিজেদের বাতিল ধর্মকে টিকিয়ে রাখার সকল প্রচেষ্টা এবং তাদের মোকাবিলায় মুসলমানদের জিহাদে অনুপ্রাণিত করার বর্ণনা রয়েছে। আর উপরিউক্ত আয়াতসমূহে জিহাদের তাগিদের সাথে রায়েছে এর তাৎপর্য। অর্থাৎ জিহাদের দ্বারা মুসলমানদের পরীক্ষা করা হয়। এ পরীক্ষায় নিষ্ঠাবান মুসলমান এবং মুনাফিক ও দুর্বল ঈমান সম্পন্নদের মধ্যে পার্থক্য করা যায়। অতএব, এ পরীক্ষা জরুরি।

ষষ্ঠদশ আয়াতে বলা হয়েছে, তোমরা কি মনে কর যে, শুধু কালেমার মৌখিক উচ্চারণ ও ইসলামের দাবি শুনে তোমাদের এমনিতে ছেড়ে দেওয়া হবে? অথচ আল্লাহ্ তা'আলা প্রকাশ্য দেখতে চান কারা আল্লাহর রাহে জিহাদকারী এবং কারা আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও মুমিনদের ব্যতীত আর কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করছে না। এ আয়াতে সম্বোধন রয়েছে মুসলমানদের প্রতি। এদের মধ্যে কিছু মুনাফিক প্রকৃতির আর কিছু দুর্বল ঈমান সম্পন্ন ইতস্তকারী, যারা মুসলমানদের গোপন বিষয়গুলো নিজেদের অমুসলিম বন্ধুদের বলে দিত। সেজন্য অত্র আয়াতে নিষ্ঠাবান মুসলমানদের দুটি আলামতের উল্লেখ করা হয়।

নিষ্ঠাবান মুসলমানদের দুই আলামত : প্রথম শুধু আল্লাহর জন্য কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করে। দ্বিতীয় কোনো অমুসলমানদেরকে নিজের অন্তরঙ্গ বন্ধু সাব্যস্ত করে না। এ আয়াতের শেষে বলা হয়, وَاللّٰهُ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ "আর আল্লাহ তোমরা যা কর সে সম্মন্ধে সবিশেষ আবহিত।" তাই তাঁর কাছে কোনো হীলা-বাহানা চলবে না।

অমুসলিমদের অন্তরঙ্গ বন্ধু করা জায়েজ নয় : ষষ্ঠদশ আয়াতে উল্লিখিত শব্দ يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا بِطَانَةً مِّنْ دُوْنِكُمْ لَا يَأْلُوْنَكُمْ خَبَالًا অর্থাৎ " হে ঈমানদারগণ! মুমিনদের ব্যতীত আর কাউকেও অন্তরঙ্গ বন্ধু সাব্যস্ত করো না, তারা তোমাদের ধ্বংস সাধনে কোনো ক্রুটি বাকি রাখবে না।"

এ সকল বিষয় আলোচনার পর সপ্তদশ ও অষ্টাদশ আয়াতে মসজিদুল হারাম ও অন্যান্য মসজিদগুলোকে বাতিল উপাসনা থেকে পাবিত্রকরণ এবং সঠিক ও কবুলযোগ্য তরিকায় ইবাদত করার পথনির্দেশ রয়েছে।

কতিপয় মাসায়েল : আয়াতে বলা হয়েছে যে. মসজিদ আবাদ করার উপযুক্ততা কাফেরদের নেই। অর্থ হলো কাফেররা মসজিদের মুতাওয়াল্লী ও ব্যবস্থাপক হতে পারবে না। আরও ব্যাপক অর্থে বলা যায়– কোনো কাফেরকে কোনো ইসলামি ওয়াকফ সম্পত্তির মুতাওয়াল্লী ও ব্যবস্থাপক পদে নিয়োগ করা জায়েজ নয়। তবে নির্মাণকাজে অমুসলিমের সাহায্য নিতে দোষ নেই। –[তাফসীরে মুরাগী]

কোনো অমুসলিম যদি ছওয়াব মনে করে মসজিদ নির্মাণ করে দেয় অথবা মসজিদ নির্মাণের জন্য মুসলমানদের চাঁদা দেয়, তবে কোনো প্রকার দীনি বা দুনিয়াবি ক্ষতি সেটার উপর আরোপ করা অথবা খোঁটা দেওয়ার আশঙ্কা না থাকলে তা গ্রহণ করা জায়েজ রয়েছে। –[শামী]

দ্বিতীয় আয়াতে যা বলা হয়েছে, আল্লাহর মসজিদ আবাদ করার যোগ্যতা রয়েছে উপরিউক্ত গুণাবলিসম্পন্ন নেককার মুসলমানদের। এর থেকে বুঝা যায়, যে ব্যক্তি মসজিদের হেফাজত, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও অন্যান্য ব্যবস্থায় নিয়োজিত থাকে কিংবা যে ব্যক্তি আল্লাহর জিকির বা দীনি ইলমের শিক্ষা দানে, কিংবা শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে মসজিদে যাতায়াত করে, তা তার কামেল মুমিন হওয়ার সাক্ষ্য বহন করে। তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ শরীফে বর্ণিত আছে : রাসূলে কারীম ﷺ ইরশাদ করেছন, যে ব্যক্তিকে তোমরা মসিজিদে উপস্থিত হতে দেখ তোমরা তার ঈমানদার হওয়ার ব্যাপারে সাক্ষ্য দেবে। কারণ আল্লাহ নিজেই বলেছেন, اِنَّمَا يَعْمُرُ مَسٰجِدَ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ "আল্লাহর মসজিদগুলো আবাদ করে তারা, যারা ঈমান এনেছে আল্লাহর প্রতি...................... ।"

বুখারী ও মুসলিমের হাদীসে আছে, নবী কারীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যা মসজিদে উপস্থিত হয়, আল্লাহ্ তার জন্য জান্নাতের একটি মাকাম প্রস্তুত করেন"। হযরত সালমান ফারেসী (রা.) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "মসজিদে অগমনকারী ব্যক্তি আল্লাহর জেয়ারতকারী মেহমান, আর মেজবানের কর্তব্য হলো মেহমানরে সম্মান করা"। –[মাযহারী, তাবারানী, ইবনে জারীর, ও বায়হাকী শরীফ প্রভৃতি]

www.almodina.com

কাযী সানাউল্লাহ পানিপথী (র.) বলেন, মসজিদের উদ্দেশ্য বহির্ভূত কার্যকলাপ থেকে মসজিদকে পবিত্র রাখাও মসজিদ আবাদ করার শামিল। যেমন মসজিদে ক্রয়-বিক্রয় দুনিয়াবি কথাবার্তা, হারানো বস্তুর সন্ধান, ভিক্ষাবৃত্তি, বাজে কবিতা পাঠ, ঝগড়া, বিবাদ ও হৈহুল্লুড় প্রভৃতি মসজিদের উদ্দেশ্য বহির্ভূত কাজ। –[মাযহারী]

قوله اَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الخ ১৯ থেকে ২২ পর্যন্ত বর্ণিত চারটি আয়াত একটি বিশেষ ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত। তা হলো মক্কার অনেক মুশরিক মুসলমানদের মোকাবিলায় গর্ব সহাকারে বলত মসজিদুল হারামের আবাদ ও হাজীদের পানি সরবরাহের ব্যবস্থা আমরাই করে থাকি। এর উপর আর কারো কোনো আমল শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদার হতে পারে না। ইসলাম গ্রহণের আগে হযরত আব্বাস (রা.) যখন বদর যুদ্ধে বন্দি হন এবং তাঁর মুসলিম আত্মীয়গণ তাঁকে বাতিল ধর্মের উপর বহাল থাকায় বিদ্রূপের সাথে বলেন, আপনি এখনো ঈমানের দৌলত থেকে বঞ্চিত রয়েছেন। উত্তরে তিনি বলেন, তোমরা ঈমান ও হিজরত (দেশত্যাগ) -কে বড় শ্রেষ্ঠ কাজ মনে করে আছ, কিন্তু আমরাও তো মসজিদুল হারামের রক্ষণাবেক্ষণ ও হাজীদের পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করে থাকি। তাই আমাদের সমান আর কারো আমল হতে পারে না। তাফসীরে ইবনে কাছীরে আছে এ ঘটনার প্রেক্ষিতে উপরিউক্ত আয়াতসমূহ নাজিল হয়।

মুসনাদে আব্দুর রাযযাকের রেওয়ায়েতে আছে, হযরত আব্বাস (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণের পর তালহা ইবনে শায়বা, হযরত আব্বাস (রা.) ও হযরত আলী (রা.)-এর মধ্যে আলোচনা চলছিল। হযরত তালহা বলেন, আমাদের যে ফজিলত তা তোমাদের নেই। বায়তুল্লাহ শরীফের চাবি আমার দখলে। ইচ্ছা করলে বায়তুল্লাহর অভ্যন্তরেও রাত্রিযাপন করতে পারি। হযরত আব্বাস (রা.) বললেন, হাজীদের পানি সরবরাহের ব্যবস্থাপনা আমার হাতে। মসজিদুল হারামের শাসনক্ষমতা, আমার নিয়ন্ত্রণে। হযরত আলী (রা.) অতঃপর বললেন, বুঝতে পারি না এগুলোর উপর তোমাদের এত গর্ব কেন? আমার কৃতিত্ব হলো আমি সবার থেকে ছয় মাস আগে বায়তুল্লাহর দিকে করে নামাজ আদায় করেছি এবং রাসূলুল্লাহর সাথে যুদ্ধেও অংশ নিয়েছি। তাঁদের এ আলোচনার প্রেক্ষিতে উপরিউক্ত আয়াত নাজিল হয়। যাতে স্পষ্ট করে দেওয়া হয় যে, ঈমানশূন্য কোনো আমল তা যত বড়ই হোক আল্লাহর কাছে কোনো মূল্য রাখে না। আর না শিরক অবস্থায় অনুরূপ আমলকারী আল্লাহর মকবুল বান্দায় পরিণত হতে পারবে।

মুসলিম শরীফে নোমান ইবনে বশীর (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীসে ঘটনাটি ভিন্ন রূপে উদ্ধৃত হয়। এক জুমার দিন তিনি কতিপয় সাহাবর সাথে মসজিদে নববীতে মিম্বরের পাশে বসা ছিলেন। উপস্থিত একজন বললেন, ইসলাম ও ঈমানের পর আমার দৃষ্টিতে হাজীদের পানি সরবরাহের মতো মর্যাদাসম্পন্ন আর কোনো আমল নেই এবং এর মোকাবিলায় আর কোনো আমলের আমি ধার ধারি না। তাঁর উক্তি খণ্ডন করে আপরজন বললেন, আল্লাহর রাহে জিহাদ করার মতো উত্তম আমল আর নেই। এভাবে দুজনের মধ্যে বাদানুবাদ চলতে থাকে। হযরত ওমর ফারুক (রা.) তাদের ধমক দিয়ে বললেন, রাসূলুল্লাহর মিম্বরের কাছে শোরগোল বন্ধ কর। জুমার নামাজের পর স্বয়ং হযরতের কাছে বিষয়টি পেশ কর। কথামতো প্রশ্নটি তাঁর কাছে রাখা হয়। এর প্রেক্ষিতেই উপরিউক্ত আয়াত নাজিল হয় এবং এতে মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণ ও হাজীদের পানি সরবরাহের উপর জিহাদকে প্রাধান্য দেওয়া হয়।

ঘটনা যাই হোক না কেন, আয়াতগুলো অবতরণ হয়েছিল মূলত মুশরিকদের অহংকার নিবারণের উদ্দেশ্যে। অতঃপর মুসলমানদের পরস্পরের মধ্যে যে সকল ঘটনা ঘটে, তার সম্পর্কে প্রমাণ উপস্থাপিত করা হয় এ সকল আয়াত থেকে। যার ফলে শ্রোতারা ধরে নিয়েছে যে, এ ঘটনার প্রেক্ষিতে আয়াতগুলো নাজিল হয়।

সে যাহোক, উপরিউক্ত আয়াতে যে সত্যটি তুলে ধরা হয় তা হলো শিরক মিশ্রিত আমল তা যত বড় আমলই হোক কবুলযোগ্য নয় এবং এর কোনো মূল্যমানও নেই। সে কারণে কোনো মুশরিক মসজিদ রক্ষণাবেক্ষণ ও হাজীদের পানি সরবরাহ দ্বারা মুসলমানদের মোকাবিলায় ফজিলত ও মর্যাদা লাভ করতে পারবে না। অন্যদিকে ইসলাম গ্রহণের পর ঈমান ও জিহাদের মর্যাদা মসজিদুল হারামের রক্ষণাবেক্ষণ ও হাজীদের পানি সরবরাহের তুলনায় অনেক বেশি। তাই যে মুসলমান ঈমান ও জিহাদে অগ্রগামী, সে জিহাদের অনুপস্থিত মুসলমানের চেয়ে অধিক মর্যাদার অধিকারী।

আয়াতের শেষ বাক্য হলো وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ "আর আল্লাহ জালেম লোকদের হেদায়েত করেন না।" অর্থাৎ ঈমান যে সকল আমলের মূল ও সকল এবাদত থেকে আফজল এবং জিহাদ যে মসজিদ আবাদ ও হাজীদের পানি সরবরাহ থেকে উত্তম, তা কোনো সূক্ষ্ম তত্ত্ব বা দুর্বোধ্য বিষয় নয়; রবং একান্ত পরিষ্কার কথা। কিন্তু আল্লাহ জালেম লোকদের হেদায়েত ও উপলব্ধি শক্তি দান করেন না বিধায় তারা একটি সোজা কথায়ও কু-তর্কে অবতীর্ণ হয়।

বিংশতম আয়াতে তার উপরের আয়াতে উল্লিখিত শব্দ لَا يَسْتَوٗنَ 'সমান নয়' -এর ব্যাখ্যা দেওয়া হয়। ইরশাদ হয়– اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ اَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللّٰهِ…… "যারা ঈমান এনেছে, দেশ ত্যাগ করেছে, এবং আল্লাহর রাহে মাল ও জান দিয়ে যুদ্ধ করেছে, আল্লাহর কাছে রয়েছে তাদের বড় মর্যাদা এবং তারাই সফলকাম"। পক্ষান্তরে তাদের প্রতিপক্ষ মুশরিকদের কোনো সফলতা আল্লাহ দান করেন না। তবে সাধারণ মুসলমানগণ এ সফলতার অংশীদার, কিন্তু দেশত্যাগী মুজাহিদগণের সফলতা সবার উর্ধ্বে। তাই পূর্ণ সফলতার অধিকারী হলো তারা।

শব্দ বিশ্লেষণ

يَشْفِ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ اثبات فعل مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلشِّفَاءُ মূলবর্ণ (ش - ف - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– তিনি প্রশান্ত করে দিবেন, তিনি উপশম করে দিবেন।

وَلِيْجَةً : শব্দটি একবচন; বহুবচন وَلَائِجُ অর্থ– অন্তরঙ্গ বন্ধু, ঘনিষ্ঠ সহচর, অন্তরাত্মা।

خَبِيْرٌ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব نَصَرَ মাসদার اَلْخَبْرُ মূলবর্ণ (خ - ب - ر) জিনস صحيح অর্থ– সবিশেষ অবহিত।

اَقَامَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ اثبات فعل ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِقَامَةُ মূলবর্ণ (ق - و - م) জিনস اجوف واوى অর্থ– সে কায়েম করে, সে নামের পাবন্দি করে।

اٰتٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ اثبات فعل ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِيْتَاءُ মূলবর্ণ (ء - ت - ى) জিনস মুরাক্কাব مهموز فاء ও ناقص يائى অর্থ– সে দেয়, সে প্রদান করে। মূলত اِئْتَايٌ ছিল, تاء -এর পূর্বের হামযাকে ياء দ্বারা এবং শেষের ياء -কে হামযা দ্বারা পরিবর্তন করা হয়েছে।

অনুবাদ	আয়াত
অনুবাদ : (২১) তাদের প্রতিপালক তাদেরকে সুসংবাদ দিচ্ছেন নিজের পক্ষ হতে বড় রহমতের ও অতি সন্তুষ্টির, আর এমন বাগানসমূহের যার মধ্যে তাদের জন্য চিরস্থায়ী নিয়ামত থাকবে।	يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَّجَنّٰتٍ لَّهُمْ فِيْهَا نَعِيْمٌ مُّقِيْمٌ (٢١)
(২২) তাতে তারা অনন্তকাল থাকবে, নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলার নিকট রয়েছে শ্রেষ্ঠ বিনিময়।	خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ۭ اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗٓ اَجْرٌ عَظِيْمٌ (٢٢)
(২৩) হে ঈমানদারগণ! নিজেদের পিতৃগণকে এবং ভ্রাতাগণকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না, যদি তারা ঈমানের মোকাবিলায় কুফরকে প্রিয় মনে করে, আর যারা তোমাদের মধ্য হতে তাদের সাথে বন্ধুত্ব রাখবে, বস্তুত এরূপ লোকেরাই হচ্ছে বড় নাফরমান।	يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْٓا اٰبَاۗءَكُمْ وَاِخْوَانَكُمْ اَوْلِيَاۗءَ اِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْاِيْمَانِ ۭ وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَاُولٰۗىِٕكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ (٢٣)
(২৪) আপনি বলে দিন যে, যদি তোমাদের পিতৃবর্গ এবং তোমাদের পুত্রগণ এবং তোমাদের ভ্রাতাগণ এবং তোমাদের স্ত্রীগণ এবং তোমাদের স্বগোত্র আর সেই সকল ধনসম্পদ যা তোমরা অর্জন করেছ এবং সেই ব্যবসায় যাতে তোমরা মন্দা পড়ার আশঙ্কা করছ, আর সেই গৃহসমূহ যা তোমরা পছন্দ করছ, [যদি এসব] তোমাদের নিকট অধিক প্রিয় হয় আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের চেয়ে	قُلْ اِنْ كَانَ اٰبَاۗؤُكُمْ وَاَبْنَاۗؤُكُمْ وَاِخْوَانُكُمْ وَاَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيْرَتُكُمْ وَاَمْوَالُۨ اقْتَرَفْتُمُوْهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسٰكِنُ تَرْضَوْنَهَآ اَحَبَّ اِلَيْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ

শাব্দিক অনুবাদ

(২১) يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ তাদের প্রতিপালক তাদেরকে সুসংবাদ দিচ্ছেন بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ নিজের পক্ষ হতে বড় রহমতের وَرِضْوَانٍ ও অতি সন্তুষ্টির وَّجَنّٰتٍ আর এমন বাগানসমূহের لَّهُمْ فِيْهَا نَعِيْمٌ مُّقِيْمٌ যার মধ্যে তাদের জন্য চিরস্থায়ী নিয়ামত থাকবে।

(২২) خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا তাতে তারা অনন্তকাল থাকবে اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗٓ اَجْرٌ عَظِيْمٌ নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলার নিকট রয়েছে শ্রেষ্ঠ বিনিময়।

(২৩) يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا হে ঈমানদারগণ! لَا تَتَّخِذُوْٓا গ্রহণ করো না اٰبَاۗءَكُمْ নিজেদের পিতৃগণকে وَاِخْوَانَكُمْ এবং ভ্রাতাগণকে اَوْلِيَاۗءَ বন্ধুরূপে اِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْاِيْمَانِ যদি তারা ঈমানের মোকাবিলায় কুফরকে প্রিয় মনে করে وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ আর যারা তোমাদের মধ্য হতে তাদের সাথে বন্ধুত্ব রাখবে فَاُولٰۗىِٕكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ বস্তুত এরূপ লোকেরাই হচ্ছে বড় নাফরমান।

(২৪) قُلْ আপনি বলে দিন যে, اِنْ كَانَ যদি হয় اٰبَاۗؤُكُمْ তোমাদের পিতৃবর্গ وَاَبْنَاۗؤُكُمْ এবং তোমাদের পুত্রগণ وَاِخْوَانُكُمْ এবং তোমাদের ভ্রাতাগণ وَاَزْوَاجُكُمْ এবং তোমাদের স্ত্রীগণ وَعَشِيْرَتُكُمْ এবং তোমাদের স্বগোত্র وَاَمْوَالُۨ اقْتَرَفْتُمُوْهَا আর সেই সকল ধনসম্পদ যা তোমরা অর্জন করেছ وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا এবং সেই ব্যবসায় যাতে তোমরা মন্দা পড়ার আশঙ্কা করছ وَمَسٰكِنُ تَرْضَوْنَهَآ আর সেই গৃহসমূহ যা তোমরা পছন্দ করছ, [যদি এসব] اَحَبَّ اِلَيْكُمْ তোমাদের নিকট অধিক প্রিয় হয় مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের চেয়ে

وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتّٰى يَأْتِيَ اللّٰهُ بِأَمْرِهِ ۗ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفٰسِقِينَ (٢٤)

অনুবাদ : এবং তাঁর রাস্তায় জিহাদ করার চেয়ে, তবে তোমরা প্রতীক্ষা করতে থাক এ পর্যন্ত যে, আল্লাহ তা'আলা নিজের নির্দেশ পাঠিয়ে দেন, আর আল্লাহ তা'আলা আদেশ অমান্যকারীদেরকে তাদের উদ্দেশ্যস্থল পর্যন্ত পৌছান না।

لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ ۙ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ ۙ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ (٢٥)

(২৫) অবশ্যই আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে [যুদ্ধে] বহু ক্ষেত্রে [কাফেরদের উপর] বিজয়ী করেছেন এবং হুনাইনের দিনেও, যখন তোমাদেরকে তোমাদের সংখ্যাধিক্য গর্বে উন্মুক্ত করেছিল, অতঃপর সেই সংখ্যাধিক্য তোমাদের কোনোই কাজে আসেনি, আর ভূপৃষ্ঠে নিজের প্রশস্ততা সত্ত্বেও [তা] তোমাদের উপর সংকীর্ণ হতে লাগল, অতঃপর তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শনপূর্বক পলায়ন করলে।

ثُمَّ أَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِينَتَهُ عَلٰى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ وَذٰلِكَ جَزَاءُ الْكٰفِرِينَ (٢٦)

(২৬) অতঃপর আল্লাহ তা'আলা নিজ রাসূলের প্রতি এবং অন্যান্য মুমিনদের প্রতি নিজের [পক্ষ হতে] সান্ত্বনা নাজিল করলেন এবং এমন সৈন্যদল [অর্থাৎ ফেরেশতা] নাজিল করলেন, যাদেরকে তোমরা দেখনি, আর কাফেরদেরকে শাস্তি প্রদান করলেন, আর এটা হচ্ছে কাফেরদের শাস্তি।

শাব্দিক অনুবাদ

وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ এবং তাঁর রাস্তায় জিহাদ করার চেয়ে। فَتَرَبَّصُوا তবে তোমরা প্রতীক্ষা করতে থাক حَتّٰى يَأْتِيَ اللّٰهُ بِأَمْرِهِ এই পর্যন্ত যে, আল্লাহ তা'আলা নিজের নির্দেশ পাঠিয়ে দেন وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفٰسِقِينَ আর আল্লাহ তা'আলা আদেশ অমান্যকারীদেরকে তাদের উদ্দেশ্যস্থল পর্যন্ত পৌছান না।

(২৫) لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ অবশ্যই আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে [যুদ্ধে] বহু ক্ষেত্রে [কাফেরদের উপর] বিজয়ী করেছেন وَيَوْمَ حُنَيْنٍ এবং হুনাইনের দিনেও إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ যখন তোমাদেরকে তোমাদের সংখ্যাধিক্য গর্বে উন্মুক্ত করেছিল فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا অতঃপর সেই সংখ্যাধিক্য তোমাদের কোনোই কাজে আসেনি وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ আর ভূপৃষ্ঠে নিজের প্রশস্ততা সত্ত্বেও [তা] তোমাদের উপর সংকীর্ণ হতে লাগল ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ অতঃপর তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শনপূর্বক পলায়ন করলে।

(২৬) ثُمَّ أَنْزَلَ اللّٰهُ অতঃপর আল্লাহ তা'আলা নাজিল করলেন سَكِينَتَهُ নিজের [পক্ষ হতে] সান্ত্বনা عَلٰى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ নিজ রাসূলের প্রতি এবং অন্যান্য মুমিনদের প্রতি وَأَنْزَلَ جُنُودًا এবং এমন সৈন্যদল [অর্থাৎ ফেরেশতা] নাজিল করলেন لَمْ تَرَوْهَا যাদেরকে তোমরা দেখনি وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا আর কাফেরদেরকে শাস্তি প্রদান করলেন وَذٰلِكَ جَزَاءُ الْكٰفِرِينَ আর এটা হচ্ছে কাফেরদের শাস্তি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(২১) قوله يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنّٰتٍ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, একমাত্র মুহাজিরগণের জন্য সুসংবাদ স্বরূপ আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। মুহাজিরগণ নিজেদের আত্মীয় স্বজন ও বাড়িঘর ছেড়ে জানমাল নিয়ে জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহে সর্বাত্মকভাবে নিয়োজিত থাকার কারণে আল্লাহ তা'আলা তাঁদের সুসংবাদ প্রদান করার জন্য আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[বাহরে মুহীত-২৩/৫]

www.almodina.com

(২৩) قوله يَٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا اٰبَآءَكُمْ وَاِخْوَانَكُمْ اَوْلِيَآءَ الخ **আয়াতের শানে নুযূল– ১ :** হযরত ছা'লাবী হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণনা করেন যে, আলোচ্য আয়াত মুহাজিরগণ সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। মুহাজিরগণ হিজরত করার জন্য যখন আদেশপ্রাপ্ত হন, তখন তারা বললেন যে, আমরা যদি হিজরত করে যাই, তাহলে তো আমরা আমাদের পিতা-মাতা, সন্তানসন্ততি ও আত্মীয়স্বজনকে বিচ্ছেদ করে চলে যাব। আমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে কবে। ধ্বংস হবে আমাদের ধনসম্পদ উজাড় হয়ে যাবে। আমাদের বড়িঘর। ফলে আমাদেরকে নিঃস্ব হয়ে জীবনযাপন করতে হবে। তখন আল্লাহ তা'আলা সাহাবায়ে কেরামের এমন মনোভাবের পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। এ আয়াত নাজিল হবার পর সাহাবায়ে কেরাম হিজরত করতে আরম্ভ করেন।

শানে নুযূল- ২ : মুকাতিল কর্তৃক এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত রয়েছে যে, নয়জন ব্যক্তি মুরতাদ (ধর্মত্যাগী) হয়ে মক্কায় অবস্থান করতে থাকে। তাদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করার নির্দেশ দিয়ে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ করা হয়েছে।

শানে নুযূল– ৩ : আবূ জা'ফর ও আবূ আব্দুল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত রয়েছে যে, আলোচ্য আয়াত হাতেব ইবনে আবী বালতাআহ সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। হযরত রাসূল আকরাম ﷺ যখন মক্কা বিজয় করার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞা নিয়ে পরিকল্পনা চূড়ান্ত করেন, তখন তিনি এ সম্পর্কীয় সকল গোপন তথ্য সংবলিত পত্র লিখেন কুরাইশদের প্রতি। হাতেব ইবনে আবি বালতাআহ কর্তৃক গোপনীয়তা প্রকাশ করে দেওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। এ শানে নুযূলের দৃষ্টিকোণে এ আয়াত মক্কা বিজয় হবার পূর্ববর্তী আয়াত বলে গণ্য করা যায়। –[রূহুল মা'আনী-২৩/৫, বাহরে মুহীত-২৩/৫]

(২৪) قوله قُلْ اِنْ كَانَ اٰبَآؤُكُمْ وَاَبْنَآؤُكُمْ وَاِخْوَانُكُمْ وَاَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيْرَتُكُمْ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** রাসূল ﷺ যখন মক্কা হতে মদিনায় হিজরত করার আদেশ প্রাপ্ত হয়ে সাহাবায়ে কেরামকে হিজরত করার নির্দেশ জানিয়ে দিলেন, তখন মানুষেরা একে অপরকে অর্থাৎ পুত্র পিতাকে, পিতা পুত্রকে, ভাই ভাইকে, স্বামী স্ত্রীকে বলতে লাগল যে, আমরা হিজরত করার জন্য আদেশ প্রাপ্ত হয়েছি। ফলে তাদের মধ্যে অনেকেই দ্রুত হিজরত করে যান। আবার কেউ হিজরত করতে অস্বীকারও করেন। তখন তারা বললেন যে, আল্লাহর কসম! তোমরা যদি হিজরত না কর, তাহলে আমি তোমাদের কোনো উপকার করব না। তোমাদের প্রতি কোনো প্রকারের খরচ বহন করব না। তাদের মধ্যে যাদের সাথে স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিদের সম্পর্ক ছিল, তারা তাকে বলল, তোমাকে আল্লাহর শপথ দিয়ে বলছি; তুমি যদি হিজরত করে যাও, তাহলে আমরা ধ্বংস হয়ে যাব। তাদের থেকে যারা কোমল হৃদয়ী ছিল, তারা হিজরত করা থেকে বিরত থেকে তাদের সাথেই জীবন-যাপন করতে আরম্ভ করতে থাকে, সে পরিপ্রেক্ষিতে উল্লিখিত আয়াত নাজিল করা হয়েছে। –[কুরতুবী-৮৭/৮]

(২৫) قوله لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ فِىْ مَوَاطِنَ كَثِيْرَةٍ وَّيَوْمَ حُنَيْنٍ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** দালায়েল গ্রন্থে ইমাম বায়হাকী (র.) রবী এর বরাত দিয়ে বর্ণনা করেন, হুনাইন অভিযানের দিনে এক ব্যক্তি বলল যে, স্বল্প সংখ্যক শত্রু সৈন্যের মোকাবিলায় আমরা কখনো পরজিত হবো না। এ মন্তব্যটি রাসূল ﷺ-এর মনে অত্যন্ত পীড়াদায়ক হয়ে পড়ল। সে পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা উল্লিখিত আয়াত নাজিল করেন। হুনাইনের অবস্থানটি হলো মক্কা ও তায়েফের মধ্যবর্তীতে একটি স্থান। সেখানে রাসূল ﷺ হাওয়াযেন ও ছাকীফের সাথে মোকাবিলা করেছিলেন। তৎকালে হাওয়াযিনের দলপতি ছিল মালিক ইবনে আউফ এবং ছাকীফের দলপতি ছিল আবূ যালীল ইবনে আমর আছ ছাকাফী। বনূ ছাকীফের সাথে ছিল চার হাজারের মতো সৈন্য-সামন্ত এবং মুসলমানদের সাথে ছিল আট হাজার, মতান্তরে ছয় হাজার, পাঁচ হাজার, তা ছাড়া বিভিন্ন মত রয়েছে। –[ফাতহুল কাদীর-৩৪৮/২]

قوله يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ الخ ২১ তম ও ২২ তম আয়াতে সেই সকল লোকদের পুরস্কার ও পরকালীন মর্যাদার বর্ণনা রয়েছে। ইরশাদ হয়– يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَّجَنّٰتٍ لَّهُمْ فِيْهَا نَعِيْمٌ مُّقِيْمٌ "তাদের প্রতিপালক তাদের সুসংবাদ দিচ্ছেন স্বীয় দয়া ও সন্তোষের এবং জান্নাতের, যেখানে তাদের জন্য রয়েছে স্থায়ী শান্তি, তারা থাকবে সেখানে চিরদিন, আর আল্লাহর কাছে রয়েছে মহান পুরস্কার।"

উপরিউক্ত আয়াতে হিজরত ও জিহাদের ফজিলত বর্ণিত হয়। সেক্ষেত্রে দেশ আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব ও অর্থ-সম্পদকে দিয়ে জানাতে হয়। আর এটি হলো মনুষ্য স্বভাবের পক্ষে বড় কঠিন কাজ। তাই সামনের আয়াতে সেগুলোর সাথে মাত্রাতিরিক্ত ভালোবাসার নিন্দা করে হিজরত ও জিহাদের জন্য মুসলমানদের উৎসাহিত করা হয়। ইরশাদ হয়– يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ

اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْٓا اٰبَآءَكُمْ وَاِخْوَانَكُمْ اَوْلِيَآءَ الخ "হে ঈমানদারগণ, তোমরা নিজেদের পিতা ও ভাইদের অভিভাবকরূপে গ্রহণ করো না, যদি তারা ঈমানের বদলে কুফরকে ভালোবাসে। আর তোমাদের যারা অভিভাবকরূপে তাদের গ্রহণ করে, তারাই হবে সীমালঙ্ঘনকারী।"

মাতা-পিতা, ভাই-বোন এবং অপরাপর আত্মীয়স্বজনের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখার তাগিদ কুরআনের বহু আয়াত রয়েছে। কিন্তু আলোচ্য আয়াতে বলা হয় যে, প্রত্যেক সম্পর্কের একেকটি সীমা আছে এবং এ সকল সম্পর্ক তা মাতা-পিতা, ভাই-বোন ও আত্মীয়স্বজন যার বেলাতেই হোক, আল্লাহ ও রাসূলের সম্পর্কের প্রশ্নে বাদ দেওয়ার উপযুক্ত। যেখানে এ দুঃসম্পর্কের সংঘাত দেখা দেবে, সেখানে আল্লাহ ও রাসূলের সম্পর্ককেই বহাল রাখা আবশ্যক।

আরও কিছু প্রাসঙ্গিক বিষয় : উল্লিখিত পাঁচটি আয়াত থেকে আরও কিছু তত্ত্ব পাওয়া যায়। প্রথমত ঈমান হলো আমলের প্রাণ। ঈমান-বিহীন আমল প্রাণশূন্য দেহের মতো যা কবুলিয়তের অযোগ্য। আখেরাতের নাজাত ক্ষেত্রে এর কোনো দাম নেই। তবে আল্লাহ যেহেতু বে-ইনসাফ নন, সেহেতু কাফেরদের নিষ্প্রাণ ভালো আমলগুলোকেও সম্পূর্ণ নষ্ট করেন না; রবং দুনিয়ায়–এর বিনিময় স্বরূপ আরাম-আয়েশ ও অর্থসম্পদ দান করে হিসাব পরিষ্কার করে নেন। কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে বিষয়টির উল্লেখ রয়েছে।

দ্বিতীয় : গুনাহ ও পাপাচারের ফলে মানুষের বিবেক ও বিচারশক্তি নষ্ট হয়ে যায়। যার ফলে সে ভালো-মন্দের পার্থক্য করতে পারে না। উনবিংশতম আয়াতের শেষ বাক্য وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ "আল্লাহ জালেম লোকদের সত্য পথ প্রদর্শন করেন না" থেকে কথাটির ইঙ্গিত পাওয়া যায়। যেমন– এর বিপরীতে অপর এক আয়াতে বলা হয়– اِنْ تَتَّقُوا اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّكُمْ فُرْقَانًا 'তোমরা যদি আল্লাহকে ভয় কর, তবে তিনি ভালো-মন্দের পার্থক্যের শক্তি দান করবেন।" অর্থাৎ ইবাদত-বন্দেগি ও তাকওয়া-পরহেজগারির ফলে বিবেক প্রখর হয়, সুষ্ঠু বিচার-বিবেচনার শক্তি আসে। তাই সে ভালো-মন্দের পার্থক্যে ভুল করে না।

তৃতীয় : নেক আমলগুলোর মর্যাদায় তারতম্য রয়েছে। সেমতে আমলকারীর মর্যাদায় তারতম্য হবে। অর্থাৎ সকল আমলকারীকে একই মর্যাদায় অভিষিক্ত করা যাবে না। আর একটি কথা হলো, আমলের আধিক্যের উপর ফজিলত নির্ভরশীল নয়; বরং আমলের সৌন্দর্যের উপর তা নির্ভরশীল। সূরা মুলকের শুরুতে আছে– لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا "যাতে আল্লাহ পরীক্ষা করতে পারেন তোমাদের কার আমল কত সৌন্দর্যমণ্ডিত।"

চতুর্থ : আরাম-আয়েশের স্থায়িত্বের জন্য দুটি বিষয় আবশ্যক। প্রথম নিয়ামতের স্থায়িত্ব। দ্বিতীয় নিয়ামত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে না পড়া। তাই আল্লাহর মকবুল বান্দাদের জন্য আয়াতে এ দুটি বিষয়ের নিশ্চয়তা দেওয়া হয়। نَعِيْمٌ مُّقِيْمٌ (স্থায়ী শান্তি) এতে আছে প্রথম বিষয়, আর خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا (তথায় চিরদিন বসবাস করবে।) বাক্যে আছে দ্বিতীয় বিষয়।

পঞ্চম : এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তা হলো, আত্মীয়তা ও বন্ধুত্বের সকল সম্পর্কের উপর আল্লাহ ও রাসূলের সম্পর্ক অগ্রগণ্য। এ দুই সম্পর্কের সাথে সংঘাত দেখা দিলে আত্মীয়তার সম্পর্ককে জলাঞ্জলি দিতে হবে। উম্মতের শ্রেষ্ঠ জামাতরূপে সাহাবায়ে কেরাম যে অভিহিত, তার মূলে রয়েছে এ ত্যাগ ও কুরবানি। তাঁরা সর্বক্ষেত্রে সর্বাবস্থায় আল্লাহ ও রাসূলের সম্পর্কেই প্রাধান্য দিয়েছিলেন।

তাই আফ্রিকার হযরত বেলাল (রা.), রোমের হযরত সোহাইব (রা.), পারস্যের হযরত সালমান (রা.), মক্কার কুরাইশ ও মদিনার আনসারগণ গভীর ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন এবং ওহুদ ও বদর যুদ্ধে পিতা ও পুত্র এবং ভাই ও ভায়ের মধ্যে অস্ত্রের প্রচণ্ড প্রতিযোগিতায় এই প্রমাণ বহন করে।

সূরা তওবার ২৪ তম আয়াতটি নাজিল হয় মূলত ওদের ব্যাপারে যারা হিজরত ফরজ হওয়াকালে মক্কা থেকে হিজরত করেন। মাতা-পিতা, ভাই-বোন, সন্তান-সন্ততি, স্ত্রী-পরিবার ও অর্থ সম্পদের মায়া হিজরতের ফরয আদায়ে এদের বিরত রাখেনি। এদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা রাসূলে কারীম ﷺ-কে নির্দেশ দেন যে, আপনি তাদেরকে বলে দিন: "যদি তোমাদের নিকট তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভাই, তোমাদের পত্নী, তোমাদের গোত্র, তোমাদের অর্জিত ধন-সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা যা বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় কর এবং তোমাদের বাসস্থান যাকে তোমরা পছন্দ কর, আল্লাহ তাঁর রাসূল ও তাঁর রাহে জিহাদ করা থেকে তোমাদের নিকট অধিক প্রিয় হয়, তবে অপেক্ষা কর আল্লাহর বিধান আসা পর্যন্ত, আল্লাহ নাফরমানদেরকে কৃতকার্য করেন না।"

www.almodina.com

এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলার বিধান আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করার যে কথা আছে, তৎসম্পর্কে তাফসীরশাস্ত্রের ইমাম হযরত মুজাহিদ (র.) বলেন, এখানে 'বিধান' অর্থে যুদ্ধবিগ্রহ ও মক্কা জয়ের আদেশ। বাক্যের মর্ম হলো, যারা দুনিয়াবি সম্পর্কের জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সম্পর্ককে জলাঞ্জলি দিচ্ছে, তাদের করুণ পরিণতির দিন সমাগত। মক্কা যখন বিজিত হবে আর এ সকল নাফরমানেরা লাঞ্ছিত ও অপদস্থ হবে, তখন দুনিয়াবি সম্পর্ক তাদের কোনো কাজে আসবে না।

হযরত হাসান বসরী (র.) বলেন, এখানে বিধান অর্থ আল্লাহর আজাবের বিধান। অর্থাৎ আখেরাতের সম্পর্কের উপর যারা দুনিয়াবি সম্পর্ককে প্রাধান্য দিয়ে হিজরত থেকে বিরত রয়েছে, আল্লাহর আজাব অতি শীঘ্রই তাদের গ্রাস করবে। দুনিয়ার মধ্যেই এ আজাব আসতে পারে। অন্যথায় আখেরাতের আজাব তো আছেই। এখানে হুঁশিয়ারি উচ্চারণটি মূলত হিজরত না করার প্রেক্ষিতে। কিন্তু তদস্থলে উল্লেখ করা হয় জিহাদের যা হলো হিজরতের পরবর্তী পদক্ষেপ। এই বর্ণনাভঙ্গির দ্বারা ইঙ্গিত দেওয়া হয় যে, সবেমাত্র হিজরতের আদেশ দেওয়া হলো। এতেই অনেকের হাঁপ ছেড়ে বসার অবস্থা। কিন্তু অচিরেই আসবে জিহাদের আদেশ, এ আদেশ পালনে আল্লাহ ও রাসূলের জন্য সকল বস্তুর মায়া এমনকি প্রাণের মায়া পর্যন্ত ত্যাগ করতে হবে।

এও হতে পারে যে, এখানে 'জিহাদ' বলে হিজরতকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। কারণ হিজরত মূলত জিহাদেরই অন্যতম অংশ। আয়তের শেষ বাক্য হলো– وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ "আর আল্লাহ ফাসেক সম্প্রদায়কে হেদায়েত করবেন না।" এতে বলা হয় যে, যার হিজরতের আদেশ আসা সত্ত্বেও দুনিয়াবি সম্পর্ককে প্রাধান্য দিয়ে আত্মীয়স্বজন এবং অর্থসম্পদকে বুকে জড়িয়ে বসে আছে তাদের এ আচরণ দুনিয়াতেও কোনো কাজ দেবে না এবং তারা আত্মীয়স্বজন পরিবেষ্টিত অবস্থায় স্বগৃহে আরাম-আয়েশ ও ভোগের যে আশা পোষণ করে আছে, তা পূরণ হওয়ার নয়; বরং জিহাদের দামামা বেজে উঠার পর সকল সহায়-সম্পত্তি তাদের জন্য অভিশাপ হয়ে দাঁড়াবে। কারণ আল্লাহর নীতি হলো, তিনি নাফরমান লোকদের উদ্দেশ্য পূরণ করেন না।

হিজরতের মাসায়েল : প্রথম : মক্কা থেকে মদিনায় হিজরতের ফরজ হুকুম যখন আসে তখন এ হুকুম পালন শুধু কর্তব্য আদায় করাই ছিল না; বরং তা ছিল মুসলমান হওয়ার আলামতও। তাই যারা সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও হিজরত থেকে বিরত ছিল তাদের মুসলমান বলা যেতো না। মক্কা বিজয়ের পর এ আদেশ রহিত হয়। তবে আদেশের মূল বক্তব্য এখনো বলবৎ আছে যে, যে দেশে আল্লাহর আদেশ তথা নামাজ, রোজা প্রভৃতি পালন সম্ভব না হয়, সামর্থ্য থাকলে সে দেশ ত্যাগ করা মুসলমানদের পক্ষে সব সময়ের জন্য ফরজ।

দ্বিতীয় : গুনাহ ও পাপাচার যে দেশে প্রবল, সে দেশ ত্যাগ করা মুসলমানদের পক্ষে সব সময়ের জন্য মোস্তাহাব।

–[বিস্তারিত অবগতির জন্য ফাতহুল বারী দ্রষ্টব্য]

উল্লিখিত আয়াতে সরাসরি সম্বোধন রয়েছে তাদের প্রতি, যারা হিজরত ফরজ হওয়াকালে পার্থিব সম্পর্কের মোহে হিজরত করেনি। তবে আয়াতটির সংশ্লিষ্ট শব্দের ব্যাপক অর্থে সকল মুসলমানদের প্রতি এ আদেশ রয়েছে যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ভালোবাসাকে এমন উন্নত স্তরে রাখা ওয়াজিব, যে স্তর অন্য কারো ভালোবাসা অতিক্রম করবে না। ফলে যার ভালোবাসা এ স্তরে নয়, সে আজাবের যোগ্য।

পূর্ণতর ঈমানের পরিচয় : এজন্য বুখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসে হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করছেন, "কোনো ব্যক্তি ততক্ষণ মুমিন হতে পারে না যতক্ষণ না আমি তার কাছে তার পিতামাতা, সন্তানসন্ততি ও অন্যান্য সকল লোক থেকে অধিক প্রিয় হই।" আবূ দাউদ ও তিরমিযী শরীফে আবূ উমামা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, 'যে ব্যক্তি কারো সাথে বন্ধুত্ব রেখেছে শুধু আল্লাহর জন্য, শত্রুতা রেখেছে শুধু আল্লাহর জন্য, অর্থ ব্যয় করে আল্লাহর জন্য, অর্থ ব্যয় থেকে বিরত রয়েছে আল্লাহর জন্য, সে নিজের ঈমানকে পরিপূর্ণ করেছে।'

হাদীসের এ বর্ণনা থেকে বুঝা যায় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ভালোবাসাকে অপরাপর ভালোবাসার উর্ধ্বে স্থান দেওয়া এবং শত্রুতা ও মিত্রতায় আল্লাহ 'রাসূলের হুকুমের অনুগত থাকা পূর্ণতর ঈমান লাভের পূর্বশর্ত।

ইমামে তাফসীর কাযী বায়যাবী (র.) বলেন, অল্পসংখ্যক লোকই আয়াতে উল্লিখিত শাস্তি থেকে রেহাই পাবে। কারণ অনেক বড় বড় আলেম ও পরহেজগার লোককেও স্ত্রী-পরিজন এবং অর্থ-সম্পদের মোহে মত্ত দেখা যায়, তবে আল্লাহ

www.almodina.com

যাদের হেফাজত করেন তাদের কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু কাযী বায়যাবী প্রসঙ্গত একথাও বলেছেন যে, এখানে ভালোবাসা অর্থ অনিচ্ছাকৃত ভালোবাসা উদ্দেশ্য নয়। কারণ আল্লাহ কোনো মানুষকে তার সামর্থ্যের বাইরে কষ্ট দেন না। তাই কারো অন্তরে যদি পার্থিব সম্পর্কের স্বাভাবিক আকর্ষণ বিদ্যমান থাকে, কিন্তু এ আকর্ষণ আল্লাহ রাসূলের ভালোবাসাকে প্রভাবিত এবং বিরুদ্ধাচরণে প্ররোচিত না করে, তাব তার এ পার্থিব আকর্ষণ উপরিউক্ত দণ্ডবিধির আওতায় আসে না। যেমন কোনো অসুস্থ লোক ঔষদের তিক্ততা বা অস্ত্রপাচারকে ভয় পায় কিন্তু তার বিবেক একে শান্তি ও আরোগ্যের মাধ্যম মনে করে। এখানে যেমন তার অপারেশন ভীতি স্বাভাবিক এবং এর জন্য কেউ তাকে তিরস্কারও করে না, তেমনি স্ত্রী-পরিজন ও অর্থসম্পদের মোহে কারো অন্তর যদি শরিয়তের কোনো কোনো হুকুম পালনে অনিচ্ছাকৃতভাবে চাপ বোধ করে এবং এ সত্ত্বেও সে শরিয়তের হুকুম পালন করে, তবে তার পক্ষে দুনিয়ার এ আকর্ষণ দূষণীয় নয়; বরং সে প্রশংসার পাত্র এবং তার আল্লাহ-রাসূলের এ ভালোবাসাকে এ আয়াত অনুসারে সবার উর্ধ্বে স্থানপ্রাপ্তগণের কাতারে শামিল রাখা হবে।

কাযী ছানাউল্লাহ পানিপথী (র.) তাফসীরে মাযহারীতে বলেন, 'আল্লাহ ও রাসূলের ভালোবাসার এ স্তরে উপনীত হওয়া এক বিরাট নিয়ামত। কিন্তু এ নিয়ামত লাভ করা যায় আল্লাহর ওলীগণের সংসর্গে থেকে। এজন্য সুফিয়ায়ে কেরাম তা হাসিলের জন্য মাশায়েখগণের পদসেবাকে আবশ্যকীয় মনে করেন।' তাফসীরে 'রুহুল বয়ান' প্রণেতা বলেন, 'বন্ধুত্বের এই মাকাম হাসিল হয় তাদের, যারা হযরত ইবরাহীম খলীলুল্লাহ (আ.)-এর মতো নিজের জানমালও সন্তানের কুরবানি দিয়েছে আল্লাহর পথে, তাঁরই প্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে।'

কাযী বায়যাবী (র.) স্বীয় তাফসীরে বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নত ও শরিয়তের হেফাজত এবং এতে ছিদ্র সৃষ্টিকারী লোকদের প্রতিরোধও আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের ভালোবাসার স্পষ্ট প্রমাণ।

২৫ তম আয়াতের শুরুতে আল্লাহর সেই দয়া ও দানের উল্লেখ রয়েছে যা প্রতি ক্ষেত্রে মুসলমানরা লাভ করে। বলা হয়– لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ فِيْ مَوَاطِنَ كَثِيْرَةٍ "আল্লাহ তোমাদের সাহায্য করেছেন অনেক ক্ষেত্রে। এরপর বিশেষণভাবে উল্লেখ করা হয় হুনাইন যুদ্ধের কথা। কারণ সে যুদ্ধে এমন সব ধারণাতীত অদ্ভূত ঘটনার প্রকাশ ঘটেছে, যেগুলো নিয়ে চিন্তা করলে মানুষের ঈমানী শক্তি প্রবল ও কর্মপ্রেরণা বৃদ্ধি পায়। সেজন্য আয়াতের শাব্দিক তাফসীরের আগে হাদীস ও নির্ভরযোগ্য ইতিহাস গ্রন্থে উল্লিখিত এ যুদ্ধের কতিপয় উল্লেখযোগ্য ঘটনার বিবরণ দেওয়া সমীচীন মনে করি। এতে আয়াতের তাফসীর অনুধাবন সহজ হবে এবং যে সকল হিতকর বিষয়ের উদ্দেশ্যে ঘটনার বর্ণনা দেওয়া হয়, তা সামনে এসে যাবে। এ বিবরণের অধিকাংশ তথ্য তাফসীরে মাযহারী থেকে নেওয়া হয়েছে, যাতে হাদীস ও ইতিহাসগ্রন্থের উদ্ধৃতি রয়েছে।

'হুনাইন' মক্কা ও তায়েফের মধ্যবর্তী একটি জায়গার নাম। যা মক্কা শরীফ থেকে প্রায় দশ মাইল ব্যবধানে অবস্থিত। অষ্টম হিজরির রমজান মাসে যখন মক্কা বিজিত হয় আর মক্কার কোরাইশগণ অস্ত্র সমর্পণ করে, তখন আরবের বিখ্যাত ধনী ও যুদ্ধবাজ হাওয়াযিন গোত্র যার একটি শাখা তায়েফের বনূ ছাকীফ নামে পরিচিত, তাদের মাঝে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। ফলে তারা একত্রিত হয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করতে থাকে যে. মক্কা বিজয়ের পর মুসলমানদের বিপুল শক্তি সঞ্চিত হয়েছে, তখন পরবর্তী আক্রমণের লক্ষ্য হবে তায়েফ। তাই তাদের আগে আমাদের আক্রমণ পরিচালনা হবে বুদ্ধিমানের কাজ। পরামর্শ মতে এ উদ্দেশ্যে হাওয়াযিন গোত্র মক্কা থেকে তায়েফ পর্যন্ত বিস্তৃত শাখা গোত্রগুলোকে একত্রিত করে। আর বিশাল সে গোত্রের প্রায় সবাই যুদ্ধের জন্য সমবেত হয়।

এ অভিযানের নেতা ছিলেন মালেক ইবনে আউফ। অবশ্য পরে তিনি মুসলমান হয়ে ইসলামের অন্যতম ঝাণ্ডাবাহী হন। তবে প্রথমে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার তীব্র প্রেরণা ছিল তাঁর মনে। তাই স্বগোত্রের সংখ্যাগুরু অংশ তার সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে আরম্ভ করে। কিন্তু এ গোত্রের অপর দু'টি ছোট শাখা বনূ কাব ও বনূ কেলাব মতানৈক্য প্রকাশ করে। আল্লাহ তাদের কিছু দিব্যদৃষ্টি দান করেছিলেন। তারা বলতে থাকে, পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত সমগ্র দুনিয়াও যদি মুহাম্মদের ﷺ বিরুদ্ধে একত্রিত হয়, তথাপি তিনি সকলের উপর জয়ী হবেন, আমরা খোদায়ী শক্তির সাথে যুদ্ধ করতে পারব না।

যাহোক, এই দুই গোত্র ছাড়া বাকি সবাই যুদ্ধ তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়। সেনা-নায়ক মালেক ইবনে আউফ পূর্ণ শক্তির সাথে রণাঙ্গনে তাদের সুদৃঢ় রাখার জন্য এ কৌশল অবলম্বন করেন যে, যুদ্ধক্ষেত্রে সকলের পরিবার পরিজনও উপস্থিত থাকবে এবং প্রত্যেকের জীবিকার প্রধান সহায় পশুপালও সাথে রাখতে হবে। উদ্দেশ্য কেউ যেন পরিবার-পরিজন ও সহায়-

www.almodina.com

সম্পদের টানে রণক্ষেত্র ত্যাগ না করে। তাদের সংখ্যা সম্পর্কে ঐতিহাসিকগণের বিভিন্ন মত রয়েছে। হাফেযুল হাদীস আল্লামা ইবনে হাজার (র.) চব্বিশ বা আটাশ হাজারের সংখ্যাকে সঠিক মনে করেন। আর কেউ কেউ বলেন, এদের সংখ্যা চার হাজার ছিল। তবে এও হতে পারে যে, পরিবার-পরিজনসহ ছিল তারা চব্বিশ বা আটাশ হাজার, আর যোদ্ধা ছিল চার হাজার।

মোটকথা, এদের দুরভিসন্ধি সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কা শরীফেই অবহিত হন এবং তিনিও এদরে বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সংকল্প নেন। মক্কায় হযরত আত্তাব ইবনে আসাদ (রা.) -কে আমীর নিয়োগ করেন এবং হযরত মা'আয ইবনে জাবাল (রা.) -কে লোকদের ইমলামি তালীম দানের জন্য তাঁর সাথে রাখেন। অতঃপর মক্কার কুরাইশদের থেকে অস্ত্রশস্ত্র ধারস্বরূপ সংগ্রহ করেন। কুরাইশ সরদার সাফওয়ান ইবনে উমাইয়া এতে ক্ষেপে উঠে বলে, আমাদের অস্ত্রশস্ত্র কি আপনি জোর করে নিয়ে যেতে চান? রাসূল ﷺ বলেন, না না; বরং ধারস্বরূপ নিচ্ছি। যুদ্ধ শেষে ফিরিয়ে দেব।এ কথা শুনে সে একশত লৌহবর্ম এবং নওফল ইবনে হারেছ তিন হাজার বর্শা তাঁর হাতে তুলে দেয়। ইমাম যুহরীর (র.) বর্ণনামতে চৌদ্দ হাজার মুসলিম সেনা নিয়ে রাসূল ﷺ এ যুদ্ধের প্রস্তুতি নেন। এতে ছিলেন মদিনার বারো হাজার আনসার যাঁরা মক্কা বিজয়ের জন্য তাঁর সাথে এসেছিল। বাকি দুহাজার ছিলেন আশপাশের অধিবাসী , যারা মক্কা বিজয়ের দিন মুসলমান হয়েছিলেন এবং যাদের বলা হতো 'তোলাকা'। অর্থাৎ সাধারণ ক্ষমায় মুক্তিপ্রাপ্ত। ৮ম হিজরির ৬ই শাওয়াল শুক্রবার হযরতের নেতৃত্বে মুসলমান সেনাদলের যুদ্ধযাত্রা শুরু হয়। রাসূল ﷺ বলেন, ইনশাআল্লাহ, আগামীকাল আমাদের অবস্থান হবে খায়ফে বনী কেনানা'র সে স্থানে যেখানে মক্কার কোরাইশগণ ইতঃপূর্বে মুসলমানদের সাথে সমাজিক বয়কটের চুক্তিপত্র সই করেছিল।

চৌদ্দ হাজারের এই বিরাট সেনাদল জিহাদের উদ্দেশ্যে বের হয়ে পড়ে, তাদের সাথে মক্কার অসংখ্য নারী-পুরুষও যুদ্ধের দৃশ্য উপভোগের জন্য বের হয়ে আসে। তাদের সাধারণ মনোভাব ছিল এ যুদ্ধে মুসলিম সেনারা হেরে গেলে আমাদের পক্ষে প্রতিশোধ নেওয়ার একটা ভালো সুযোগ হবে। আর তারা জয়ী হলেও আমাদের অবশ্য ক্ষতি নেই।

এ মনোভাব সম্পন্ন লোকদের মধ্যে শায়বা ইবনে ওসমানও ছিলেন। যিনি পরে মুসলমান হয়ে নিজের ইতিবৃত্ত বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, বদর যুদ্ধে আমার পিতা হযরত হামযা (রা.) -এর হাতে এবং আমার চাচা হযরত আলী (রা.) -এর হাতে নিহত হন। ফলে অন্তরে প্রতিশোধের যে আগুন জ্বলছিল, তা বর্ণনার বাইরে। আমি এটাকে অপূর্ব সুযোগ মনে করে মুসলমানদের সহযাত্রী হলাম। যেন মওকা পেলেই রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে আক্রমণ করতে পারি। তাই আমি তাঁদের সাথে থেকে সদা সুযোগের সন্ধানে রইলাম। এক সময় যখন পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয় এবং যুদ্ধের সূচনায় দেখা যায়, মুসলমানরা হতোদ্যম হয়ে পালাতে শুরু করেছে; আমি এ সুযোগে ত্বরিতবেগে রাসূল ﷺ -এর কাছে পৌছি কিন্তু দেখি যে, ডানদিকে হযরত আব্বাস (রা.), বামদিকে হযরত আবূ সুফিয়ান ইবনে হারেছে রাসূল ﷺ -এর দেহরক্ষীরূপে আছেন। এজন্য পেছন দিকে অগ্রসর হয়ে তাঁর কাছে পৌছি এবং সংকল্প নেই যে, তরবারির অতর্কিত আঘাত হেনে তাঁকে হত্যা করব। ঠিক এ সময় আমার প্রতি তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় এবং আমাকে ডাক দিয়ে বলেন, শায়বা, এদিকে এসো। আমি তাঁর পাশে গেলে তাঁর পবিত্র হাত আমার বুকের উপর রাখেন আর দোয়া করেন, 'হে আল্লাহ! এর থেকে শয়তানকে দূর করে দাও।' অতঃপর আমি যখন দৃষ্টি উঠাই, আমার চোখ, কান ও প্রাণ থেকেও রাসূল ﷺ -কে অধিক প্রিয় মনে হচ্ছিল, তারপর তিনি আদেশ দেন, যাও, কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর। আমার তখন এ অবস্থা যে, হযরতের ﷺ জন্য প্রাণ বিসর্জন দিতেও প্রস্তুত। তাই কাফেরদের সাথে সর্বশক্তি দিয়ে যুদ্ধ করি। যুদ্ধ শেষে রাসূল ﷺ মক্কায় প্রত্যাবর্তন করলে তাঁর খেদমতে হাজির হই। তিনি আমার মনের গোপন দুরভিসন্ধি প্রকাশ করে বলেন, মক্কা থেকে মন্দ উদ্দেশ্য নিয়ে চলেছিলে। আর আমাকে হত্যার জন্য আশেপাশে ঘুরছিলে। কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছা ছিল তোমার দ্বারা সৎকাজ করানো। পরিশেষে তাই হলো।

এ ধরনের ঘটনা ঘটে নযর ইবনে হারেসের সাথে, তিনিও এ উদ্দেশ্যে হুনাইন গিয়েছিলেন। কিন্তু সেখানে আল্লাহ তাঁর অন্তরে হযরতের ﷺ ভালোবাসা প্রবিষ্ট করান। ফলে একজন মুসলিম যোদ্ধারূপে কাফেরদের মোকাবিলা করেন।

তেমনি ঘটনা ঘটে আবূ বুরদা ইবনে নাযার (রা.) -এর সাথে। তিনি 'আওতাস' নামক স্থানে পৌছে দেখেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক বৃক্ষের নীচে উপবিষ্ট। তাঁর পাশে অন্য একজন লোক। ঘটনার বর্ণনা দিয়ে রাসূল ﷺ বলেন, এক সময় আমার

www.almodina.com

তন্দ্রা এসে যায়। এ সুযোগে লোকটি আমার তরবারিটি হাতে নিয়ে আমার শির পাশে এসে বলে, হে মুহাম্মদ! এবার বল, আমার হাত থেকে তোমায় কে রক্ষা করবে? বললাম, আল্লাহ আমার হেফাজতকারী। একথা শুনে তরবারিটি তার হাত থেকে খসে পড়ে। হযরত আবূ বুরদা (রা.) বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! অনুমতি দিন, আল্লাহর এ শত্রুর গর্দান বিচ্ছিন্ন করে দেই। একে শত্রুদলের গোয়েন্দা মনে হচ্ছে। রাসূল ﷺ বলেন, তুমি থাম, আল্লাহর দীন অপরাপর দীনকে পরাজিত না করা অবধি আল্লাহ আমার হেফাজত করে যাবেন। এ বলে লোকটিকে বিনা তিরস্কারে মুক্তি দিলেন। সে যাহোক, মুসলিম সেনাদল হুনাইন নামক স্থানে পৌছে শিবির স্থাপন করে। এ সময় হযরত সুহাইল ইবনে হানযালা (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এসে বলেন, জনৈক অশ্বারোহী এসে শত্রুদলের সংবাদ দিয়েছে যে, তারা পরিবার-পরিজন ও সহায়-সম্পদসহ রণাঙ্গনে জমায়েত হয়েছে। স্মিত হাস্যে রাসূল ﷺ বললেন, চিন্তা করো না। ওদের সবকিছু গনিমতের মালামাল হিসেবে মুসলমানদের হস্তগত হবে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ হুনাইনে অবস্থান নিয়ে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে হাদ্দাদ (রা.)-কে শত্রুদলের অবস্থান পর্যবেক্ষণের জন্য গোয়েন্দারূপে পাঠান। তিনি দুদিন তাদের সাথে অবস্থান করে তাদের সকল যুদ্ধ প্রস্তুতি অবলোকন করেন। এক সময় শত্রু সেনানায়ক মালেক ইবনে আউফকে স্বীয় লোকদের একথা বলতে শোনেন, 'মুহাম্মদ এখনো কোনো সাহসী যোদ্ধাবাজদের পাল্লায় পড়েনি। মক্কার নিরীহ কুরাইশদের দমন করে তিনি বেশ দাম্ভিক হয়ে উঠেছেন। কিন্তু এখন বুঝতে পারবেন কার সাথে তাঁর মোকাবিলা। আমরা তাঁর সকল দম্ভ চূর্ণ করে দেব। তোমরা কাল ভোরেই রণাঙ্গনে এরূপ সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়াবে যে, প্রত্যেকের পেছনে তার স্ত্রী পরিজন ও মালামাল উপস্থিত থাকবে। তরবারির কোষ ভেঙ্গে ফেলবে এবং সকলে একসাথে আক্রমণ করবে'। বস্তুত এদের ছিল প্রচুর যুদ্ধ অভিজ্ঞতা। তাই তারা বিভিন্ন ঘাঁটিতে কয়েকটি সেনাদল লুক্কায়িত রেখে দেয়।

এ হলো শত্রুদের রণ প্রস্তুতির একট চিত্র। কিন্তু অন্যদিকে এক হিসাবে এটি ছিল মুসলমানদের প্রথম যুদ্ধ যাতে অংশ নিয়েছে চৌদ্দ হাজারের এক বিরাট বাহিনী। এছাড়া অস্ত্রশস্ত্রও ছিল আগের তুলনায় প্রচুর। ইতঃপূর্বের ওহুদ ও বদর যুদ্ধে মুসলমানদের এ অভিজ্ঞতা হয় যে, মাত্র তিনশ' তেরো জন প্রায় নিরস্ত্র লোকের হাতে পারাজয় বরণ করেছে এক হাজার কাফের সৈন্য। তাই হুনাইনের বিরাট যুদ্ধ প্রস্তুতির প্রেক্ষিতে হাদীস তত্ত্ববিধ 'হাকেম' ও 'বযযার'-এর বর্ণনামতে কতিপয় মুসলিম সেনা উৎসাহের অতিশয্যে এ দাবি করে বসে যে, আজকের জয় অনিবার্য, পরাজয় অসম্ভব। যুদ্ধের প্রথম ধাক্কায়ই শত্রুদল পালাতে বাধ্য হবে। কিন্তু মুসলমানরা আল্লাহর উপর ভরসা না করে জনবলের উপর তৃপ্ত থাকবে এটা আল্লাহর পছন্দ ছিল না। এটাই হুনাইনের যুদ্ধে দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে।

হাওয়াযিন গোত্র পূর্ব পরিকল্পনা মতে মুসলমানদের প্রতি সম্মিলিত আক্রমণ পরিচালনা করে। একই সাথে বিভিন্ন ঘাঁটিতে লুক্কায়িত কাফের সেনারা চুতর্দিক থেকে মুসলমানদের ঘিরে ফেলে। এ সময় আবার ধুলি ঝড় উঠে সর্বত্র অন্ধকারাচ্ছন্ন করে ফেলে, এতে সাহাবীগণের পক্ষে স্ব স্ব অবস্থানে টিকে থাকা সম্ভব হলো না। ফলে তাঁরা পিছু হটতে শুরু করেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ অশ্ব চালিয়ে সামনের দিকে বাড়তে থাকেন। আর তাঁর সাথে ছিলেন অল্পসংখ্যক সাহাবী, যাঁদের সংখ্যা ছিল মাত্র তিন শ'। অন্য রেওয়ায়েত মতে একশ' কিংবা তারও কম, যাঁরা রাসূল ﷺ-এর সাথে অটল রইলেন। কিন্তু এদেরও মনোবাঞ্ছা ছিল যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যেন আর অগ্রসর না হন।

এ অবস্থা দেখে রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত আব্বাস (রা.) -কে বলেন, উচ্চৈঃস্বরে ডাক দাও, বৃক্ষের নীচে জিহাদের বায়আত গ্রহণকারী সাহাবীগণ কোথায়? সূরা বাক্বারাওয়ালারা কোথায়? জান কুরবানের প্রতিশ্রুতিদানকারী আনসারগণই বা কোথায়? সবাই ফিরে এসো. রাসূলুল্লাহ ﷺ এখানে আছেন।

হযরত আব্বাস (রা.)-এর এ আওয়াজ রণাঙ্গনকে প্রকম্পিত করে তোলে। পলায়নরত সাহাবীগণ ফিরে দাঁড়ান এবং প্রবল সাহসিকাতার সাথে বীরবিক্রমে যুদ্ধ করে চলেন। ঠিক এ সময় আল্লাহ এদের সাহায্যে ফেরেশতাগণ পাঠিয়ে দেন। এরপর যুদ্ধের মোড় ঘুরে যায়, কাফের সেনানায়ক মালেক ইবনে আউফ পরিবার-পরিজন ও মালামালের মায়া ত্যাগ করে পালিয়ে যায় এবং তায়েফ দুর্গে আত্মগোপন করে। এরপর গোটা শত্রুদল পালাতে শুরু করে। এ যুদ্ধে সত্তর জন কাফের নেতা নিহত হয়। কতিপয় মুসলমানদের হাতে কিছু শিশু আহত হয়। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ এটাকে শক্ত ভাষায় নিষেধ করেন। যুদ্ধ শেষে মুসলমানদের হাতে আসে তাদের সকল মালামাল ও ছয় হাজার যুদ্ধবন্দি, চব্বিশ হাজার উষ্ট্রী, চল্লিশ হাজারের অধিক বকরি এবং চার হাজার উকিয় রৌপ্য যা ওজনে চার মণের সমান।

আলোচ্য ২৫ ও ২৬ নং আয়াতে যুদ্ধের এদিকটি তুলে ধরে বলা হয় যে, তোমরা নিজেদের সংখ্যাধিক্যে বেশ আত্মপ্রসাদ লাভ করেছিলে। কিন্তু সেই সংখ্যাধিক্য তোমাদের কাজে আসল না। প্রসস্ত হওয়া সত্ত্বেও পৃথিবী তোমাদের জন্য সঙ্কুচিত হয়ে গেল, তারপর তোমরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ছিলে। অতঃপর আল্লাহ সান্ত্বনা নাজিল করলেন আপন রাসূলের উপর ও মুসলমানদের উপর এবং ফেরেশতাদের এমন সৈন্যদল প্রেরণ করলেন, যাদের তোমরা দেখনি। তারপর তোমাদের হাতে কাফেরদের শাস্তি দিলেন। ২৬ নং আয়াতে বলেন– ثُمَّ اَنْزَلَ اللهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ وَعَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ "অতঃপর আল্লাহ সান্ত্বনা নাজিল করলেন আপন রাসূলের উপর ও মুসলমানদের উপর"। এ বাক্যের অর্থ হলো হুনাইন যুদ্ধের প্রথম আক্রমণে যে সকল সাহাবী আপন স্থান ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন তাঁরা আল্লাহর পক্ষ থেকে মনোবল ফিরে পাবার পর স্ব স্ব অবস্থানে ফিরে আসেন, আর রাসূলুল্লাহ ﷺ ও আপন অবস্থানে সুদৃঢ় হন। সাহাবীদের প্রতি সান্ত্বনা প্রেরণের অর্থ হলো, তাঁরা বিজয় সম্পর্কে আত্মবিশ্বাস ফিরে পেয়েছিলেন। এতে বুঝা গেল যে, আল্লাহর সান্ত্বনা ছিল দুই প্রকার। এক প্রকার পলায়নরত সাহাবীদের জন্য অন্য প্রকার রাসূল ﷺ-এর সাথে যাঁরা সুদৃঢ় ছিলেন তাঁদের জন্য। এ কথার ইঙ্গিত দানের জন্য উপর শব্দটি দু'বার ব্যবহার করা হয়। যেমন, 'অতঃপর আল্লাহ সান্ত্বনা নাজিল করলেন তাঁর রাসূলের উপর ও মুসলমানদের উপর'।

অতঃপর বলা হয়– وَاَنْزَلَ جُنُوْدًا لَّمْ تَرَوْهَا "এবং প্রেরণ করলেন এমন সৈন্যদল যাদের তোমরা দেখনি।" এটি হলো সাধারণ লোকের ব্যাপারে। তাই কেউ কেউ দেখেছেন বলে কাতিপয় রেওয়ায়েতে যে বর্ণনা আছে, তা উপরিউক্ত উক্তির বিরোধী নয়। এ আয়াতের শেষ বাক্য হলো– وَعَذَّبَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ؕ وَذٰلِكَ جَزَآءُ الْكٰفِرِيْنَ "আর শাস্তি দিলেন কাফেরদের এবং এটি হলো কাফেরদের পরিণাম।" এ শাস্তি বলতে বুঝায় মুসলমানদের হাতে পরাস্ত ও বিজিত হওয়া যা স্পষ্ট প্রতিভাত হলো। আর এটি ছিল পার্থিব শাস্তি, যা দ্রুত কার্যকর হলো।

শব্দ বিশ্লেষণ

اِقْتَرَفْتُمُوْهَا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ اثبات فعل ماضى معروف বাব اِفْتِعَال মাসদার اَلْاِقْتِرَافُ মূলবর্ণ (ق - ر - ف) জিনস صحيح অর্থ– তোমরা কামাই করেছ, তোমরা উপার্জন করেছ। আর هَا হলো ضمير منصوب متصل

تَخْشَوْنَ : সীগাহ جمع مذكرحاضر বহছ اثبات فعل مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْخَشْيَةُ ও اَلْخَشْىُ মূলবর্ণ (خ - ش - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– তোমরা ভয় পাও।

تَرَبَّصُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব تَفَعُّلْ মাসদার اَلتَّرَبُّصُ মূলবর্ণ (ر - ب - ص) জিনস صحيح অর্থ– তোমরা অপেক্ষা কর।

وَلَّيْتُمْ : সীগাহ جمع مذكرحاضر বহছ اثبات فعل ماضى معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّوْلِيَةُ মূলবর্ণ (و - ل - ى) জিনস لفيف مقرون অর্থ– তোমরা মুখ ফিরিয়ে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে পলায়ন করলে।

لَمْ تَرَوْهَا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ نفى جحد بلم در فعل مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلرُّؤْيَةُ মূলবর্ণ (ر - ء - ى) জিনস মুরাক্কাব مهموز عين ও ناقص يائى অর্থ– তোমরা দেখনি। هَا যমীর ضمير منصوب متصل-এর মার'জি جُنُوْدًا

ثُمَّ يَتُوبُ اللّٰهُ مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٢٧﴾

অনুবাদ : (২৭) অনন্তর আল্লাহ তা'আলা [সেই কাফেরদের মধ্য হতে] যাকে ইচ্ছা তওবা করার সুযোগ দান করেন, আর আল্লাহ তা'আলা হচ্ছেন, অতি ক্ষমাশীল, পরম করুণাময়।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِنَّمَا الْمُشْرِكُوْنَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هٰذَا ۚ وَاِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيْكُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖۤ اِنْ شَآءَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿٢٨﴾

(২৮) হে ঈমানদারগণ! মুশরিকরা হচ্ছে [তাদের বদ আকায়েদের দরুন] একেবারেই অপবিত্র অতএব, তারা যেন এ বৎসরের পর মসজিদে হারামের [অর্থাৎ হরম শরীফের] নিকটে [-ও] আসতে না পারে, আর যদি তোমাদের আশঙ্কা হয় দারিদ্র্যের তবে আল্লাহ তা'আলা নিজ অনুগ্রহে তোমাদেরকে অভাবমুক্ত করে দিবেন, যদি তিনি চান, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা অতি জ্ঞানী, বড়ই হেকমতওয়ালা।

قَاتِلُوا الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَلَا يُحَرِّمُوْنَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَلَا يَدِيْنُوْنَ دِيْنَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ حَتّٰى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَّدٍ وَّهُمْ صٰغِرُوْنَ ﴿٢٩﴾

(২৯) যে সকল আহলে কিতাব আল্লাহ তা'আলার প্রতি ঈমান রাখে না এবং কিয়ামত দিবসের প্রতিও [ঈমান রাখে] না, আর সেই বস্তুগুলোকে হারাম মনে করে না যেগুলোকে আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল ﷺ হারাম বলেছেন, আর সত্য ধর্ম [অর্থাৎ ইসলাম] গ্রহণ করে না, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাক, যে পর্যন্ত না তারা অধীনতা স্বীকার করে প্রজারূপে জিযিয়া দিতে স্বীকৃত হয়।

শাব্দিক অনুবাদ

(২৭) ثُمَّ يَتُوبُ اللّٰهُ مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ অনন্তর আল্লাহ তা'আলা [সেই কাফেরদের মধ্য হতে] তওবা করার সুযোগ দান করেন عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ যাকে ইচ্ছা وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ আর আল্লাহ তা'আলা হচ্ছেন, অতি ক্ষমাশীল, পরম করুণাময়

(২৮) يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا হে ঈমানদারগণ! اِنَّمَا الْمُشْرِكُوْنَ نَجَسٌ মুশরিকরা হচ্ছে [তাদের বদ আকায়েদের দরুন] একেবারেই অপবিত্র فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ অতএব, তারা যেন মসজিদে হারামের [অর্থাৎ হরম শরীফের] নিকটে [-ও] আসতে না পারে بَعْدَ عَامِهِمْ هٰذَا এই বৎসরের পর وَاِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً আর যদি তোমাদের আশঙ্কা হয় দারিদ্র্যের فَسَوْفَ يُغْنِيْكُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ তবে আল্লাহ তা'আলা নিজ অনুগ্রহে তোমাদেরকে অভাবমুক্ত করে দিবেন اِنْ شَآءَ যদি তিনি চান اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা অতি জ্ঞানী, বড়ই হেকমতওয়ালা।

(২৯) قَاتِلُوا তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাক الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ যে সকল আহলে কিতাব আল্লাহ তা'আলার প্রতি ঈমান রাখে না وَلَا بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ এবং কিয়ামত দিবসের প্রতিও [ঈমান রাখে] না وَلَا يُحَرِّمُوْنَ আর সেই বস্তুগুলোকে হারাম মনে করে না مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ যেগুলোকে আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল ﷺ হারাম বলেছেন وَلَا يَدِيْنُوْنَ دِيْنَ الْحَقِّ আর সত্য ধর্ম [অর্থাৎ ইসলাম] গ্রহণ করে না مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ আহলে কিতাব থেকে حَتّٰى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَّدٍ وَّهُمْ صٰغِرُوْنَ যে পর্যন্ত না তারা অধীনতা স্বীকার করে প্রজারূপে জিযিয়া দিতে স্বীকৃত হয়।

www.almodina.com

وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرُ ابْنُ اللّٰهِ وَقَالَتِ النَّصٰرَى الْمَسِيْحُ ابْنُ اللّٰهِ ۚ ذٰلِكَ قَوْلُهُمْ بِاَفْوَاهِهِمْ ۚ يُضَاهِئُوْنَ قَوْلَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَبْلُ ۚ قَاتَلَهُمُ اللّٰهُ ۚ اَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ (٣٠)

অনুবাদ : (৩০) আর [কতক] ইহুদিরা বলল, ওযায়ের হচ্ছেন আল্লাহ তা'আলার পুত্র এবং [অধিকাংশ] নাসারারা বলল, মাসীহ হচ্ছেন আল্লাহর পুত্র, এটা হচ্ছে তাদের কথা- তাদের মুখের কথা মাত্র, [বাস্তবে তা কিছুই নয়] এরাও তাদের ন্যায় বলছে, যারা তাদের পূর্বে কাফের হয়ে গেছে, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ধ্বংস করুন, এরা উল্টা কোন দিকে যাচ্ছে।

اِتَّخَذُوْا اَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَالْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ ۚ وَمَا اُمِرُوْا اِلَّا لِيَعْبُدُوْا اِلٰهًا وَّاحِدًا ۚ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ؕ سُبْحٰنَهٗ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ (٣١)

(৩১) তারা আল্লাহকে ছেড়ে নিজেদের আলেম ও ধর্ম-জাযকদেরকে প্রভু বানিয়ে রেখেছে এবং মারইয়ামের পুত্র মাসীহকেও, অথচ তাদের প্রতি শুধু এই আদেশ করা হয়েছে যে, তারা কেবলমাত্র ইবাদত করবে এক মা'বূদের, যিনি ব্যতীত মা'বূদ হওয়ার যোগ্য কেউই নেই, তিনি তাদের অংশী স্থির করা হতে পবিত্র।

শাব্দিক অনুবাদ

(৩০) وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ আর [কতক] ইহুদিরা বলল عُزَيْرُ ابْنُ اللّٰهِ ওযায়ের হচ্ছেন আল্লাহ তা'আলার পুত্র وَقَالَتِ النَّصٰرَى এবং [অধিকাংশ] নাসারারা বলল الْمَسِيْحُ ابْنُ اللّٰهِ মাসীহ হচ্ছেন আল্লাহর পুত্র ذٰلِكَ قَوْلُهُمْ بِاَفْوَاهِهِمْ এটা হচ্ছে তাদের কথা- তাদের মুখের কথা মাত্র [বাস্তবের তা কিছুই নয়] يُضَاهِئُوْنَ قَوْلَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَبْلُ এরাও তাদের ন্যায় বলছে, যারা তাদের পূর্বে কাফের হয়ে গেছে قَاتَلَهُمُ اللّٰهُ আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ধ্বংস করুন اَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ এরা উল্টা কোন দিকে যাচ্ছে।

(৩১) اِتَّخَذُوْا তারা বানিয়ে রেখেছে اَحْبَارَهُمْ নিজেদের আলেম وَرُهْبَانَهُمْ ও ধর্ম-জাযকদেরকে اَرْبَابًا প্রভু مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ আল্লাহকে ছেড়ে وَالْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ এবং মারইয়ামের পুত্র মাসীহকেও وَمَا اُمِرُوْا اِلَّا لِيَعْبُدُوْا অথচ তাদের প্রতি শুধু এই আদেশ করা হয়েছে যে, তারা কেবলমাত্র ইবাদত করবে اِلٰهًا وَّاحِدًا এক মা'বূদের' لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ যিনি ব্যতীত মা'বূদ হওয়ার যোগ্য কেউই নেই سُبْحٰنَهٗ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ তিনি তাদের অংশী স্থির করা হতে পবিত্র।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(২৮) قوله يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنَّمَا الْمُشْرِكُوْنَ نَجَسٌ الخ **আয়াতের শানে নুযূল– ১ :** ইমাম তাবারী (র.) ইকরিমার বরাত দিয়ে বর্ণনা করেন এবং সাঈদ ইবনে মানসূর, ইবনুল মুনযির ও আবূ হাতেম হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণনা করেন যে, মুশরিকরা যখন খাদ্য সামগ্রী নিয়ে ব্যবসা-বণিজ্যের উদ্দেশ্যে মসজিদে হারামে আসত। অতঃপর মসজিদে হারামের নিকটে আসার জন্য যখন তাদেরকে নিষেধ করে দেওয়া হলো, তখন মুসলমানরা বলতে লাগল, তারা না আসলে আমাদের খাদ্য সামগ্রী কোথা হতে আসবে? তখন আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

শানে নুযূল– ২ : ইমাম তাবারী (র.) ইবনে বাশ্শার ও সুফিয়া প্রমুখের বরাত দিয়ে সাঈদ ইবনে যুবাইরের রেওয়ায়েতে বর্ণনা করেন যে, اِنَّمَا الْمُشْرِكُوْنَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هٰذَا -এ অংশ যখন নাজিল হয়, তখন এ নির্দেশটি

www.almodina.com

সাহাবায়ে কেরামের নিকট অত্যন্ত কষ্টকর অনুভূতি হলো, ফলে তারা বললেন যে, আমাদের জন্য খাদ্য সামগ্রী ও মালামাল কে নিয়ে আসবে? তখন وَاِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ اِنْ شَآءَ অবতীর্ণ হয়েছে।–[তাবারী-৩৪৬/৪৭/৬, বাহরে মুহীত-২৮/৫, ফাতহুল কাদীর-৩৫১/২]

(২৯) قوله قَاتِلُوا الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ الخ **আয়াতের শানে নুযূল– ১ :** আবুশ শায়খ ও বায়হাকী প্রণেতা তাঁর সুনানে, মুজাহিদ কর্তৃক এক রেওয়ায়েত বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ যখন তাবূক অভিযানে অংশ গ্রহণ করার জন্য সাহাবায়ে কেরামকে আদেশ করেন, তখন উক্ত আয়াত নাজিল হয়েছে।

শানে নুযূল– ২ : ইবনুল মুনযির শিহাবের উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, কুরাইশ এবং আরব কাফেরদের সম্পর্কে وَقَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ নাজিল হয় الخ ..... قَاتِلُوا الَّذِيْنَ পর্যন্ত আহলে কিতাবদের সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। –[ফাতহুল কাদীর-৩৫২/২]

শানে নুযূল– ৩ : রাসূল ﷺ সাহাবায়ে কেরামকে হিজরি ৯ম সন যখন রোম যুদ্ধের জন্য হুকুম করেন, তখন এ আয়াত নাজিল হয়। আলোচ্য আয়াত নাজিল হওয়ার পর তাবূক অভিযান পরিচালনা করেন। কারো মতে বনূ কুরাইযা ও বনূ নযীর সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়েছে। –[বাহরে মুহীত-৩০/৫]

(৩০) قوله وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللّٰهِ وَقَالَتِ النَّصٰرَى الْمَسِيْحُ ابْنُ اللّٰهِ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** ইবনে ইসহাক , ইবনে জারীর ইবনে আবী হাতেম, আবুশ শায়খ ও ইবনে মারদুভীয়া হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন যে, একদা রাসূল ﷺ -এর নিকট সালাম ইবনে মুশকাম, নোমান বইনে আওফা, আবূ আনাস, শাস ইবনে কাইস ও মালিক ইবনে সাইফ প্রমুখ উপস্থিত হয়ে বলল, আমরা কিরূপভাবে আপনার অনুসরণ করতে পারি? অথচ আপনিতো আমাদের কেবলাকে ছেড়ে দিলেন। উযাইর আল্লাহর পুত্র বলে বিশ্বাস করছেন না। তাদের এহেন বিভ্রান্ত মূলক আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে উল্লিখিত আয়াত নাজিল হয়েছে। -[ফাতহুল কাদীর-৩৫৪/২]

قوله ثُمَّ يَتُوْبُ اللّٰهُ مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ ۗ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ "অতঃপর আল্লাহ যার প্রতি ইচ্ছা তওবা নসিব করবেন। আল্লাহ অতীব মার্জনাকারী, পরম দয়ালু।" এ আয়াতে ইঙ্গিত রয়েছে, যারা মুসলমানদের হাতে পরাস্ত ও বিজিত হওয়ার শাস্তি পেয়েছে এবং এখনো কুফরি আদর্শের উপর অটল রয়েছে, তাদের কিছু সংখ্যক লোককে আল্লাহ ঈমানের তাওফীক দেবেন। নিম্নে এ ধরনের ঘটনার বিবরণ দেওয়া হলো।

হুনাইন যুদ্ধে হাওয়াযেন ও সকীফ গোত্রের কতিপয় সরদার নিহত হয়; কিছু পালিয়ে যায়। তাদের পরিবার-পরিজন বন্দিরূপে এবং মালামাল গনিমতরূপে মুসলমানদের আয়ত্তে আসে।

অতঃপর পরাজিত হাওয়াযিন ও ছাকীফ গোত্রদ্বয় বিভিন্ন স্থানে মুসলমানদের বিরুদ্ধে সম্মিলিত হয়, কিন্তু প্রত্যেক স্থানে তারা পরাজিত হয়। শেষ পর্যন্ত তারা তায়েফের এক মজবুত দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করে। রাসূলে কারীম ﷺ পনের বিশ দিন পর্যন্ত এই দুর্গ অবরোধ করে রাখেন। ওরা দুর্গ থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে তীর নিক্ষেপ করতে থাকে। কিন্তু সম্মুখযুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার সাহস তাদের কারো ছিল না। সাহাবায়ে কেরাম বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এদের বদদোয়া দিন। কিন্তু তিনি এদের জন্য হেদায়েতের দোয়া করেন। অতঃপর সাহাবায়ে কেরামরে সাথে পরামর্শ করে সেখান থেকে প্রত্যাবর্তনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। জি'রানা নামক স্থানে পৌছে প্রথমে মক্কা গিয়ে ওমরা আদায় ও পরে মদিনা প্রত্যাবর্তনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। অপর দিকে মক্কাবাসীদের যারা মুসলমানদের শেষ পরিণতি দেখার উদ্দেশ্যে দর্শকরূপে যুদ্ধে এসেছিল, তাদের অনেকে ইসলামের সত্যতা প্রত্যক্ষ করে উক্ত জি'রানা নামক স্থানে ইসলাম গ্রহণের কথা প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন।

আত্মপ্রসাদ পরিত্যাজ্য : উল্লিখিত আয়াতগুলোর প্রথম হেদায়েত হলো, মুসলমানদের কোনো অবস্থায় শক্তি-সামর্থ্য ও সংখ্যাধিক্যের উপর আত্মপ্রসাদ লাভ করা উচিত নয়, সম্পূর্ণ নিঃস্ব অবস্থায় যেমন তাদের দৃষ্টি আল্লাহর সাহায্যের প্রতি নিবদ্ধ থাকবে, তেমনি সকল শক্তি-সামর্থ্য থাকাবস্থায়ও আল্লাহর উপর ভরসা রাখতে হবে।

হুনাইন যুদ্ধের পর্যাপ্ত পরিমাণ সাজসরঞ্জাম ও সংখ্যাধিক্য দেখে কতিপয় সাহাবী যে আত্মগর্বের সাথে বলেছিলেন, আজকের যুদ্ধে কেউ আমাদের পরাস্ত করতে পারবে না, আল্লাহর নিকট তাঁর প্রিয় বান্দাদের মুখ থেকে এ ধরনের কথা পছন্দ হচ্ছিল না। যার ফলে রণাঙ্গনে কাফেরদের প্রথম ধাক্কা সামলাতে না পেরে তাঁরা পলায়নপর হয়েছিলেন। অতঃপর আল্লাহর গায়বি সাহায্য পেয়ে তাঁরা এর যুদ্ধে জয়ী হন।

www.almodina.com

বিজিত শত্রুর মালামাল গ্রহণে ন্যায়নীতি বিসর্জন না দেওয়া : দ্বিতীয় হেদায়েত যা এই ঘটনা থেকে হাসিল হয়, তা হলো এই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ হুনাইন যুদ্ধের প্রস্তুতিপর্বে মক্কার বিজিত কাফেরদের থেকে যে যুদ্ধ সরঞ্জাম নিয়েছিলেন তা ধারস্বরূপ ছিল এবং প্রত্যর্পণ করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে নিয়েছিলেন এবং পরে এ প্রতিশ্রুতি রক্ষাও করেছিলেন। অথচ এরা ছিল বিজিত ও ভীতসন্ত্রস্ত। তাই জোর করেও সমর্থন আদায় করা যেতো। কিন্তু রাসূল ﷺ তা করেননি। এতে রয়েছে শত্রুর সাথে পূর্ণ সদ্ব্যবহারের হেদায়েত।

তৃতীয় : রাসূলুল্লাহ ﷺ হুনাইন গমনকালে 'খাইফে বনী কেনানা' নামক স্থান সম্পর্কে বলেছিলেন, আগামীকালের অবস্থান হবে আমাদের এখানে, যেখানে মক্কায় কুরাইশগণ মুসলমাদের একঘরে করে রাখার প্রস্তাবে স্বাক্ষর করেছিল। এতে মুসলমানদের প্রতি যে হেদায়েত আছে, তা হলো আল্লাহ তাদের শক্তি-সামর্থ্য ও বিজয় দান করলে বিগত বিপদের কথা যেন ভুলে না যায় এবং যাতে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে দুর্গে আশ্রয় নেওয়া হাওয়াযিন গোত্রের বাণ নিক্ষেপের জবাবে বদদোয়ার পরিবর্তে হেদায়েত লাভের যে দোয়া রাসূল ﷺ করেছেন তাতে রয়েছে এই শিক্ষা যে, মুসলমানের যুদ্ধ বিগ্রহের উদ্দেশ্যে শত্রুকে নিছক পরাভূত করা নয়; বরং উদ্দেশ্য হলো হেদায়েতের পথে তাদের নিয়ে আসা। তাই এ চেষ্টা থেকে বিরত থাকা উচিত নয়।

চতুর্থ : পরাজিত শত্রুদের থেকেও নিরাশ হওয়া উচিত নয়, আল্লাহ ইসলাম ও ঈমানের হেদায়েত তাদেরও দিতে পারেন। যেমন হাওয়াযিন গোত্রের লোকদের ইসলাম গ্রহণের তাওফীক দিয়েছিলেন।

হাওয়াযিন গোত্রের যুদ্ধবন্দি মুক্তির আবেদনের প্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবীগণের মতামত জানতে চেয়েছিলেন এবং তারা আনন্দের সাথে রাজিও হয়েছিলেন। কিন্তু এ সত্ত্বেও সকলের ব্যক্তিগত মতামত যাচাইয়ের ব্যবস্থা নেওয়া হয়। এ থেকে বুঝা যায় যে, হকদারের পূর্ণ সন্তুষ্টি ছাড়া কেউ তার অধিকারে হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। বা জনগণের চাপে কেউ নীরব থাকলে তা' সন্তুষ্টি বলে ধর্তব্য হবে না। আমাদের মাননীয় ফিকহ শাস্ত্র বিদগণ এ থেকে মাসআলা বের করেন যে, ব্যক্তিগত প্রভাব দেখিয়ে কারো থেকে ধর্মীয় প্রয়োজনে চাঁদা আদায় করাও জায়েজ নয়। কারণ অবস্থার চাপে পড়ে বা লজ্জা রক্ষার খাতিরে অনেক ভদ্রলোকই অনেক সময় কিছু না কিছু দিয়ে থাকে, অথচ অন্তর এতে পূর্ণ সায় দেয় না। এ ধরনের অর্থ কড়িতে বরকতও পাওয়া যায় না।

فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ ... সুতরাং তারা এ বছরের পর যেন মসজিদুল হারামের নিকটবর্তী না হয়।

'মসজিদুল হারাম' বলতে সাধারণত বুঝায় বায়তুল্লাহ শরীফের চতুর্দিকের আঙ্গিনাকে যা দেয়াল দ্বারা পরিবেষ্টিত। তবে কুরআন ও হাদীসের কোনো কোনো স্থানে তা মক্কার পূর্ণ হরম শরীফ অর্থেও ব্যবহৃত হয় যা কয়েক বর্গমাইল এলাকাব্যাপী। যার সীমানা চিহ্নিত করেছেন হযরত ইবরাহীম (আ.)। যেমন মে'রাজের ঘটনায় মসজিদুল হারাম উল্লেখ রয়েছে। ইমামগণের ঐকমত্যে এখানে মসজিদুল হারাম অর্থ বায়তুল্লাহর আঙ্গিনা নয়। কারণ মে'রাজের শুরু হয় হযরত উম্মে হানী (রা.)-এর গৃহ থেকে, যা ছিল বায়তুল্লাহর আঙ্গিনার বাইরে অবস্থিত। অনুরূপ সূরা তওবার শুরুতে যে মসজিদুল হারাম-এর উল্লেখ রয়েছে: الَّذِينَ عٰهَدْتُّمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ তার অর্থও পূর্ণ হরম শরীফ। কারণ এখানে উল্লিখিত সন্ধির স্থান হলো, 'হুদায়বিয়া যা হরম শরীফের সীমানার বাইরের সন্নিকটে অবস্থিত। –[জাসসাস]। এ বছরের পর মুশরিকদের জন্য পূর্ণ হারাম শরীফে প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হলো।

তবে এ বছর বলতে কোনটি বুঝায় তা নিয়ে মুফাসসিরগণের মধ্যে কিছুটা মতভেদ রয়েছে। কেউ বলেন, দশম হিজরি। তবে অধিকাংশ মুফাসসিরের মতে তা হলো নবম হিজরি। কারণ নবী করীম ﷺ নবম হিজরির হজের মৌসুমে হযরত আলী (রা.) ও আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-এর দ্বারা কাফেরদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদের কথা ঘোষণা করান, তাই নবম হিজরি থেকে দশম হিজরি পর্যন্ত ছিল অবকাশের বছর। দশম হিজরির পর থেকেই এ নিষেধাজ্ঞা জারি হয়।

কতিপয় প্রশ্ন : উল্লিখিত আয়াত দ্বারা দশম হিজরির পর মসজিদুল হারামে মুশরিকদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়। এতে তিনটি প্রশ্ন আসে। প্রথম, এ নিষেধাজ্ঞা কি শুধু মসজিদুল হারামের জন্য, না অন্যান্য মসজিদের জন্যও? দ্বিতীয়, মসজিদুল হারামের জন্য হয়ে থাকলে তা কি সর্বাবস্থার জন্য, না শুধু হজ ও ওমরার জন্য? তৃতীয়, এ নিষেধাজ্ঞা কি শুধু মুশরিকদের জন্য না আহলে কিতাব কাফেরদের জন্যও? এ সকল প্রশ্নের উত্তরে কুরআন নীরব। তাই ইজতিহাদকারী ইমামগণ কুরআনের ইশারা ইঙ্গিত ও হযরত ﷺ -এর হাদীস সামনে রেখে প্রশ্নগুলোর উত্তর দিয়েছেন।

www.almodina.com

এ প্রসঙ্গে প্রথমে আলোচনা করতে হয়, কুরআন মাজীদ মুশরিকদের যে অপবিত্র ঘোষণা করেছে, তা কোন দৃষ্টিতে? যদি প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্য জানাবত ইত্যাদি অপবিত্রতা হেতু বলা হয়ে থাকে, তবে তর্কের কিছুই নেই। কারণ দৃশ্যমান অপবিত্র বস্তুর সাথে রেখে কিংবা গোসল ফরজ হয়েছে এরূপ নারী-পুরুষের মসজিদের প্রবেশ জায়েজ নয়। পক্ষান্তরে কথাটি যদি কুফর শিরকের গোপন অপবিত্রতার দৃষ্টিকোণে বলা হয়ে থাকে, তবে সম্ভবত এর হুকুম হবে ভিন্ন।

'তাফসীরে কুরতুবী'তে বলা হয়েছে, মদিনার ফিকহশাস্ত্র বিদগণ তথা ইমাম মালিক (র.) ও অন্য ইমামদের মতে মুশরিকরা যে কোন দৃষ্টিকোণে অপবিত্র। কারণ তারা প্রকাশ্য অপবিত্রতা থেকে সতর্কতা অবলম্বন করে না। তেমনি ফরজ গোসলের ধার ধারে না। তদুপরি কুফর-শিরকের বাতেনী আপবিত্রতা তো তাদের আছেই। সুতরাং সকল মুশরিক এবং সকল মসজিদের জন্যই হুকুমটি সাধারণভাবে প্রযোজ্য।

এ মতের সমর্থনে তাঁরা হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আযীয (র.)-এর একটি ফরমানকে দলিলরূপে পেশ করেন, যা তিনি বিভিন্ন রাজ্যের প্রশাসকগণকে লিখেছিলেন। এতে লেখা ছিল, "মসজিদসমূহে কাফেরদের প্রবেশ করতে দেবে না।" এ ফরমানে তিনি উপরিউক্ত আয়াতটির কথা উল্লেখ করেছিলেন। তাঁদের দ্বিতীয় দলিল হলো নবী করীম ﷺ -এর এই হাদীস : 'কোনো ঋতুবর্তী মহিলা বা গোসল ফরজ হয়েছে এরূপ ব্যক্তির পক্ষে মসজিদে প্রবেশ করাকে আমি জায়েজ মনে করি না।" আর এ কথা সত্য যে, কাফের মুশরিকগণ ফরজ গোসল সাধারণত করে না। তাই তাদের জন্য মসজিদে প্রবেশ নিষিদ্ধ।

ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, হুকুমটি কাফের মুশরিক এবং আহলে কিতাব সকলের জন্য প্রযোজ্য, কিন্তু তা শুধু মসজিদুল হারামের জন্য নির্দিষ্ট, অপরাপর মসজিদে তাদের প্রবেশ নিষিদ্ধ নয়। –[কুরতুবী]

ইমাম শাফেয়ী (র.)–এর দলিল হলো ছুমামা ইবনে উছালের ঘটনাটি। তিনি ইসলাম গ্রহণের আগে একস্থানে মুসলমানদের হাতে বন্দী হলে নবী করীম ﷺ তাকে মসজিদে নববীর এক খুঁটির সাথে বেঁধে রাখেন।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে উপরক্ত আয়াতে মসজিদুল হারামের নিকটবর্তী না হওয়ার জন্য মুশরিকদের প্রতি যে আদেশ রয়েছে, তার অর্থ হলো, আগামী বছর থেকে মুশরিকদের স্বীয় রীতি অনুযায়ী হজ ও ওমরা আদায়ের অনুমতি দেওয়া যাবে না। তাঁর দলিল হলো, হজের যে মৌসুমে হযরত আলী (রা.)–এর দ্বারা কাফেরদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদের কথা ঘোষণা করা হয়, তাতে একথা ছিল لَا يَحُجَّنَّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ অর্থাৎ 'এ বছর পর কোনো মুশরিক হজ করতে পারবে না।' তাই এ ঘোষণার আলোকে আয়াত......فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ অর্থাৎ 'মুশরিকরা মসজিদুল হারামের নিকটবর্তী হবে না' -এর অর্থ হবে– আগামী বছর থেকে মুশরিকদের জন্য হজ ও ওমরা ছাড়া মুশরিক অন্য কোনো প্রয়োজনে আমীরুল মু'মিনীনের অনুমতিক্রমে মসজিদুল হারামে প্রবেশ করতে পারবে।

এ মতের সমর্থনে তাঁর দলিল হলো, মক্কা বিজয়ের পর ছাকীফ গোত্রের প্রতিনিধিবৃন্দ নবী করীম ﷺ-এর খেদমতে হাজির হলে সমজিদে তাদের অবস্থান করানো হয়। অথচ এরা তখনও অমুসলমান ছিল এবং সাহাবায়ে কেরামও আপত্তি তুলোছিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এরা তো আপবিত্রতায় প্রভাবিত। হযরত ﷺ তখন বলেছিলেন, 'মসজিদের মাটি এদের অপবিত্রতায় প্রভাবিত হবে না। –[জাসসাস]

এ হাদীস দ্বারা একথাও স্পষ্ট হয়ে যায় যে, কুরআন মাজীদে মুশরিকদের যে অপবিত্র বলা হয়েছে তা তাদের কুফর ও শিরক জনিত বাতেনী অপবিত্রতার কারণে। ইমাম আবূ হানীফা (র.) এ মতেরই অনুসারী। অনুরূপ হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, কোনো মুশরিক মসজিদের নিবকটবর্তী হবে না। তবে সে কোনো মুসলমানের দাস বা দাসী হলে প্রয়োজন বোধে প্রবেশ করতে পারে। –[কুরতুবী]

এ হাদীস থেকেও বুঝা যায় যে, প্রকাশ্য অপবিত্রতার কারণে মসজিদুল হারাম থেকে মুশরিকদের বারণ করা হয়নি। নতুবা দাস-দাসীকে পৃথক করা যেত না; বরং না আসার কারণ হলো কুফর ও শিরক এবং এ দুয়ের প্রভাব প্রতিপত্তির আশঙ্কা। এ আশঙ্কা দাস-দাসীর মধ্যে না থাকায় তাদের অনুমতি দেওয়া হলো। এ ছাড়া প্রকাশ্য অপবিত্রতার দৃষ্টিকোণে কাফের-মুশরিক-মুসলমান সমান। অপবিত্র বা গোসল ফরজ হওয়া অবস্থায় তো মুসলমানগণও মসজিদুল হারামে প্রবেশ করতে পারবে না।

www.almodina.com

তদুপরি, অধিকাংশ মুফাসসেরগণের মতে এখানে মসজিদুল হারাম বলতে যখন পূর্ণ হরম শরীফ উদ্দেশ্য, তখন এ নিষেধাজ্ঞা প্রকাশ্য অপবিত্রতার কারণ না হয়ে কুফর শিরকজনিত অপবিত্রতার কারণে হওয়া অধিকতর সঙ্গত। এজন্য শুধু মসজিদুল হারামের নয়; বরং পূর্ণ হরম শরীফে মুশরিকদের প্রবেশও নিষিদ্ধ করা হয়। কারণ এটি হলো ইসলামের দুর্গ।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর উপরিউক্ত তত্ত্বের সারকথা হলো, কুরআন ও হাদীসমতে মসজিদসমূহকে অপবিত্রতা থেকে বিশুদ্ধ রাখা আবশ্যক এবং এটি জরুরি বিষয়, কিন্তু আমাদের আলোচ্য আয়াতটি এ বিষয়টির সাথে সংশ্লিষ্ট নয়; বরং তা ইসলামের সেই বুনিয়াদি হুকুমের সাথে সংশ্লিষ্ট, যার ঘোষণা রয়েছে সূরা বারাআতের শুরুতে। অর্থাৎ অচিরেই হরম শরীফকে সকল মুশরিক থেকে পবিত্র করে নিতে হবে। কিন্তু আদর্শ ও ন্যায়নীতি এবং দয়া ও অনুকম্পার প্রেক্ষিতে মক্কা বিজয়ের সাথে সাথেই তাদের হরম শরীফ ত্যাগের আদেশ দেওয়া হয়নি; বরং যাদের সাথে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্তের চুক্তি ছিল এবং যারা চুক্তির শর্তসমূহ পালন করে যাচ্ছিল, তাদের মেয়াদ শেষ হয়নি; বরং যাদের সাথে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্তের চুক্তি ছিল এবং যারা চুক্তির শর্তসমুহ পালন করে যাচ্ছিল, তাদের মেয়াদ শেষ হওয়ার এবং অন্যান্যদের কিছু দিনের সুযোগ দিয়ে চলতি সালের মধ্যেই এই আদেশ কার্যকর হওয়ার প্রযোজনীয়তা ছিল। আলোচ্য আয়াতে তাই বলা হয়, 'এবছরের পর পূর্ণ হরম শরীফে মুশরিকদের প্রবেশাধিকার থাকবে না'। তারা শিরকী প্রথা মতে হজ ও ওমরা আদায় করতে পারবে না। সূরা তাওবার আয়াতে যেমন পরিষ্কার ঘোষণা দেওয়া হয় যে, নবম হিজরির পর কোনো মুশরিক হরমের সীমানায় প্রবেশ করতে পারেব না। রাসূলে কারীম ﷺ এ আদেশকে আরও ব্যাপক করে হুকুম দেন যে, গোটা আরব উপদ্বীপে কোনো কাফের মুশরিক থাকতে পারবেনা। কিন্তু রাসূল ﷺ নিজে এ আদেশ কার্যকর করতে পারেননি। অতঃপর হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)–এর পক্ষেও বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় সমস্যায় জড়িত থাকার ফলে তা সম্ভব হয়নি। তবে হযরত ওমর ফারূক (রা.)–এর শাসনামলে আদেশটি যথাযথভাবে প্রয়োগ করেন।

ইতঃপূর্বে মক্কার মুশরিকদের সাথে যুদ্ধ করার আদেশ ছিল। আর এ আয়াতদ্বয়ে আহলে কিতাবের সাথে যুদ্ধ করার নির্দেশ রয়েছে। তাবুকে আহলে কিতাবের সাথে মুসলমানদের যে যুদ্ধ অভিযান সংঘটিত হয়েছিল, আয়াত দুটি তারই পটভূমি। 'তাফসীরে দুররে মানসূরে' মুফাসসিরে কুরআন হযরত মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, উক্ত আয়াত দুটি তাবূক যুদ্ধ প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছিল।

আভিধানিক অর্থে 'আহলে কিতাব বলতে যদিও সেই কাফের দলসমূহকে বুঝায়, যারা কোনো না কোনো আসমানি কিতাবের প্রতি বিশ্বাসী। কিন্তু কুরআনের পরিভাষায় আহলে কিতাব বলতে বুঝায় শুধু ইহুদি ও খ্রিস্টানদের। কারণ আরবের আশেপাশে এ সম্প্রদায়ই আহলে কিতাব নামে সমধিক পরিচিত ছিল। এজন্য কুরআনে আরবের মুশরিকদের সম্বোধন করে বলা হয়– أَنْ تَقُولُوٓا إِنَّمَآ أُنْزِلَ الْكِتٰبُ عَلٰى طَآئِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَإِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغٰفِلِيْنَ অর্থাৎ তোমরা হয়তো বলতে পার যে, কিতাব তো শুধু আমাদের পূর্বে দু-সম্প্রদায়ের প্রতিই নাজিল হয়েছিল, আর আমরা তো এর পঠন ও পাঠন থেকে সম্পূর্ণ বেখবর ছিলাম। –[আনআম-১৫৬]

আহলে কিতাবের উল্লেখ কালে অত্র আয়াতদ্বয়ে তাদের সাথে যুদ্ধ করার যে নির্দেশ রয়েছে তা শুধু আহলে কিতাবের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং এ আদেশ রয়েছে সকল কাফের সম্প্রদায়ের জন্যই। কারণ যুদ্ধ করার যে সকল হেতু সামনে বর্ণিত হয়েছে, তা সকল কাফেরদের মধ্যে সমভাবে বিদ্যমান। সুতরাং এ আদেশ সকলের জন্যই প্রযোজ্য। তবে বিশেষভাবে আহলে কিতাবের উল্লেখ করা হয় মুসলমানদের এ দ্বিধা নিবারণ উদ্দেশ্যে যে, ইহুদি খ্রিস্টানেরা অন্তত তাওরাত ইঞ্জীল এবং হযরত মূসা ও ঈসা (আ.) -এর প্রতি তো ঈমান রাখে। অতএব, পূর্বের আম্বিয়া (আ.) ও কিতাবের সাথে তাদের সম্পর্ক থেকে মুসলমানের জিহাদী মনোভাবের জন্য বাধ্য হওয়ার সম্ভাবনা ছিল, তাই বিশেষভাবে তাদের উল্লেখ করা হয়। দ্বিতীয়ত বিশেষভাবে আহলে কিতাবের উল্লেখ করার মাঝে এ ইঙ্গিতও রয়েছে যে, তারা এই দৃষ্টিকোণে অধিক শাস্তির যোগ্য। কারণ এরা অপেক্ষাকৃত জ্ঞানী। এদের কাছে তাওরাত-ইঞ্জীলের জ্ঞান, যে তাওরাত ও ইঞ্জীলে রয়েছে রাসূলে কারীম ﷺ সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণী, এমনকি তাঁর দৈহিক আকৃতির বর্ণনা। এ সত্ত্বেও তাদের সাথে যুদ্ধের আদেশ দেওয়া হয়।

২৯ নং আয়াতে যুদ্ধের চারটি হেতুর বর্ণনা রয়েছে। **প্রথমত :** لَا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ তারা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস রাখে না। **দ্বিতীয়ত :** وَلَا بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ 'রোজ হাশরের প্রতিও তাদের বিশ্বাস নেই।' **তৃতীয়ত :** وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَرَسُولُهٗ 'আল্লাহর হারামকৃত বস্তুকে তারা হারাম মনে করে না।' **চতুর্থত :** وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ সত্য ধর্ম গ্রহণে তারা অনিচ্ছুক।'

এখানে প্রশ্ন জাগে, ইহুদি খ্রিস্টানেরা তো বাহ্যত আল্লাহ পরকাল ও রোজ কিয়ামতের প্রতি বিশ্বাসী নয়। যে ঈমান বিশ্বাস আল্লাহর অভিপ্রেত, তা না হলে তার কোনো মূল্য নেই। ইহুদি-খ্রিস্টানরা যদিও প্রকাশ্যে আল্লাহর একত্বকে অস্বীকার করে না, কিন্তু পরবর্তী আয়াতের বর্ণনা মতে ইহুদি কর্তৃক হযরত ওযাইর ও খ্রিস্টানদের কর্তৃক হযরত ঈসা (আ.) -কে পুত্র সাব্যস্ত করা প্রকারান্তরে শিরক অংশীবাদকে স্বীকার করে নিয়েছে। তাই তাদের তাওহীদ ও ঈমানের দাবি অর্থহীন।

অনুরূপ আখেরতের প্রতি যে ঈমান বিশ্বাস রাখা আবশ্যক তা আহলে কিতাবের অধিকাংশের মধ্যে নেই। তাদের অনেকের ধারণা হলো, রোজ কিয়ামতে মানুষ জড়দেহ নিয়ে উঠবে না; রবং তা হবে মানুষের এক ধরনের রূহানী জিন্দেগি। তারা এ ধারণাও পোষণ করে যে, জান্নাত ও জাহান্নাম বিশেষ কোনো স্থানের নাম নয়; বরং আত্মার শান্তি হলো জান্নাত আর আত্মার অশান্তি হলো জাহান্নাম। তাদের এ বিশ্বাস কুরআনের পেশকৃত ধ্যান ধারণার বরখেলাফ। সুতরাং আখেরাতের প্রতি ঈমানও আদের যথাযোগ্য নয়।

তৃতীয় হেতুর উল্লেখ করে বলা হয় যে, ইহুদি-খ্রিস্টানরা আল্লাহর হারামকৃত বস্তুকে হারাম মনে করে না। এ কথার অর্থ হলো তওরাত ও ইঞ্জীলের যে সকল বস্তুকে হারাম করে দেওয়া হয়েছে, তা তারা হারাম বলে গণ্য করে না। যেমন, সুদ ও কতিপয় খাদ্যদ্রব্য যা তাওরাত ও ইঞ্জীলে হারাম ছিল, কিন্তু তারা সেগুলোকে হারাম মনে করত না।

এ থেকে একটি মাসআলা পরিষ্কার হয় যে, আল্লাহ নিষিদ্ধ বস্তুকে হালাল মনে করা যে শুধু পাপ তা নয় বরং কুফরিও বটে। অনুরূপ কোনো হালাল বস্তুকে হারাম সাব্যস্ত করাও কুফরি। তবে হারামকে হারাম মনে করে কেউ যদি ভুলে অসতর্ক পদক্ষেপ নেয়, তবে তা কুফরি নয়, বরং তা গুনাহ ও ফাসেকী।

আয়াতে উল্লিখিত حَتّٰى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَّدٍ وَّهُمْ صٰغِرُوْنَ "যতক্ষণ না তারা করজোড়ে জিযিয়া প্রদান করে" বাক্য দ্বারা যুদ্ধবিগ্রহের একটি সীমা ঠিক করে দেওয়া হয়। অর্থাৎ তাবেদার প্রজারূপে জিযিয়া প্রদান না করা পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাবে।

'জিযিয়া'র শাব্দিক অর্থ– বিনিময়' পুরস্কার। শরিয়তের পরিভাষায় জিযিয়া বলা হয় কাফেরদের প্রাণের বিনিময়ে গৃহীত অর্থকে।

জিযিয়ার তাৎপর্য : কুফর ও শিরক হলো আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে বিদ্রোহ। এই বিদ্রোহের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। কিন্তু আল্লাহ নিজের অসীম রহমতগুণে শাস্তির এই কঠোরতা হ্রাস করে ঘোষণা করেন যে, তারা যদি ইসলামি রাষ্ট্রের অনুগত প্রজারূপে ইসলামি আইনকানুনকে মেনে নিয়ে থাকতে চায় তবে তাদের থেকে সামান্য জিযিয়া কর নিয়ে মৃত্যুদণ্ড থেকে তাদের অব্যাহতি দেওয়া হবে এবং ইসলামি রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে তাদের জানমালের নিরাপত্তা বিধান থাকবে। কেউ হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। শরিয়তের পরিভাষায় এগুলো জিযিয়া কর।

দুপক্ষের সম্মতিক্রমে জিযিয়ার যে হার ধার্য হবে তাতে শরিয়তের পক্ষ থেকে কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। ধার্যকৃত হারে জিযিয়া নেওয়া হবে। যেমন, নাজরান গোত্রের সাথে হযরত রাসূলে কারীম ﷺ-এর চুক্তি হয় যে, তারা সকলের পক্ষ থেকে বার্ষিক দু'হাজার জোড়া বস্ত্র প্রদান করবে। প্রতি জোড়ায় থাকবে একটা লুঙ্গি, ও একটা চাদর। প্রতি জোড়ার মূল্যও ধার্য হয়। অর্থাৎ এক উকিয়া রূপার সমমূল্য। চল্লিশ দিরহামে হয় এক উকিয়া। যা আমাদের দেশের প্রায় সাড়ে এগার তোলা রূপার সমপরিমাণ।

অনুরূপ তাগলিব গোত্রীয় খ্রিস্টানদের সাথে হযরত ওমর (রা.) -এর চুক্তি হয় যে, তারা জাকাতের নেসাবের দ্বিগুণ পরিশোধে জিযিয়া কর প্রদান করবে।

মুসলমানগণ যদি কোনো দেশ যুদ্ধ করে জয় করে নেয় এবং সে দেশের অধিবাসীগণকে তাদের সহায় সম্পত্তির মালিকানা স্বত্বের উপর বহাল রাখে এবং তারাও ইসলামি রাষ্ট্রের অনুগত নাগরিক হিসাবে থাকতে চায়, তবে তাদের জিযিয়ার হার তা হবে যা হযরত ওমর (রা.) আপন শাসনকালে ধার্য করেছিলেন। তা হলো, উচ্চবিত্তের জন্য মাসিক চার দিরহাম,

মধ্যবিত্তের জন্য দুদিরহাম এবং স্বাস্থ্যবান শ্রমিক ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী প্রভৃতি নিম্নবিত্তের জন্য মাত্র এক দিরহাম। অর্থাৎ সাড়ে তিন মাশা রূপা অথবা তার সমমূল্যের অর্থ গরিব-দুঃখী, বিকলাঙ্গ, মহিলা, শিশু বৃদ্ধ এবং সংসারত্যাগী ধর্মযাজকদের এই জিযিয়া কর থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়।

কিন্তু এই অল্প পরিমাণ জিযিয়া আদায়ের বেলায় রাসূলে কারীম ﷺ -এর তাগিদ ছিল যে, কারো সাধ্যের বাইরে কোনোরূপ জোরজবরদস্তি করা না হয়। রাসূল ﷺ হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেন, "যে ব্যক্তি কোনো অমুসলিম নাগরিকের উপর জুলুম চালাবে, রোজ হাশরে আমি জালেমের বিরুদ্ধে ঐ অমুসলিমের পক্ষ অবলম্বন করব।" –[মাযহারী]

উপরিউক্ত রেওয়ায়েতসমূহের প্রেক্ষিতে কতিপয় ইমাম একমত পোষণ করেন যে, শরিয়ত জিযিয়ার বিশেষ কোনো হার নির্দিষ্ট করে দেয়নি, বরং তা ইসলামি শাসকের সুবিবেচনার উপর নির্ভরশীল। তিনি অমুসলিমদের অবস্থা পর্যালোচনা করে যা সঙ্গত মনে হয়, ধার্য করবেন।

আমাদের এ পর্যন্ত আলোচনা থেকে একটি বিষয় পরিষ্কার হলো যে, জিযিয়া প্রথা ইসলামের বিনিময় নয়; বরং তা আদায় করা হয় কাফেরদের মৃত্যুদণ্ড মওকুফের বিনিময়ে। সুতরাং এ সন্দেহ যেন না হয় যে, অল্প মূল্যের বিনিময়ে কুফরি অবস্থায় বহাল থাকার অনুমতি কেমন করে দেওয়া হলো? কারণ এমন অনেক লোক আছে, যাদের স্বধর্মে অবিচল থেকে বিনা জিযিয়ায় ইসলমি রাষ্ট্রে বসবাসের অনুমতি দেওয়া হয়। যেমন মহিলা, শিশু, বৃদ্ধ, বিকলাঙ্গ এবং যাজক সম্প্রদায়। ইসলামের বিনিময়ে জিযিয়া নেওয়া হলে এরা কিছুতেই অব্যাহতি পেত না।

আলোচ্য আয়াতে عَنْ يَدٍ শব্দ দুটি ব্যবহৃত হয়েছে। عَنْ অর্থ এখানে কারণ, يَدٌ অর্থ শক্তি ও বিজয়। তাই জিযিয়াা যেন খয়রাতি চাঁদা প্রদানের মতো না হয়; বরং তা হবে ইসলামের বিজয়কে মেনে নিয়ে একান্ত অনুগত নাগরিক হিসাবে। –[রূহুল মা'আনী] এরপরের বাক্য হলো وَهُمْ صٰغِرُوْنَ ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর তাফসীর অনুযায়ী এর অর্থ হলো, তারা যেন ইসলামের সাধারণ আইন-কানুনের আনুকরণকে নিজেদের কর্তব্যরূপে গ্রহণ করে নেয়। –[রূহুল মা'আনী, তাফসীরে মাযহারী]

জিযিয়া প্রদানে স্বীকৃত হলে ওদের সাথে যুদ্ধ বন্ধ করার যে আদেশ আয়াতে হয়েছে, তা অধিকাংশ ইমামের মতে সকল অমুসলিমের বেলায়ই প্রযোজ্য। তারা আহলে কিতাব হোক বা অন্য কেউ। তবে আরবের মুশরিকগণ এ আদেশের অন্তর্ভুক্ত নয়, তদের থেকে জিযিয়া গৃহীত হয়নি।

দ্বিতীয় আয়াত হলো প্রথম আয়াতের ব্যাখ্যা। প্রথম আয়াতে মোটামুটিভাবে বলা হয় যে, আহলে কিতাবগণ আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখে না। দ্বিতীয় আয়াতে তার ব্যাখ্যা দিয়ে বলা হয় যে, ইহুদিরা হযরত ওযাইর (আ.) ও খ্রিস্টানরা হযরত ঈসা (আ.) -কে আল্লাহর পুত্র সাব্যস্ত করে। তাই তাদের ঈমান ও তওহীদের দাবি নিরর্থক। এরপর বলা হয় ذٰلِكَ قَوْلُهُمْ بِاَفْوَاهِهِمْ 'এটি তাদের মুখের কথা।' এ বাক্যের দুটি অর্থ হতে পারে। ১. তারা নিজেদের ভ্রান্ত আকীদার কথা নিজ মুখেও স্বীকার করে। এতে গোপনীয়তা কিছুই নেই। ২. তারা মুখে যে কুফরি উক্তি করে যাচ্ছে তার পেছনে না কোনো দলিল আছে, না কোনো যুক্তি। অতঃপর বলা হয়– يُضَاهِئُوْنَ قَوْلَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللّٰهُ اَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ "এরা পূর্ববর্তী কাফেরদের মতো কথা বলে, আল্লাহ এদের ধ্বংস করুন। ওরা কোন উল্টা পথে চলে যাচ্ছে।" এতে অর্থ হলো ইহুদি ও খ্রিস্টানরা নবীগণকে আল্লাহর পুত্র বলে পূর্ববর্তী কাফের ও মুশরিকদের মতোই হয়ে গেল, তারা ফেরেশতা ও লাত-মানাত মূর্তিদ্বয়কে আল্লাহর কন্যা সাব্যস্ত করেছিল।

উপরিউক্ত কয়েকটি আয়াতে ইহুদি-খ্রিস্টান পণ্ডিত ও পীর পুরোহিতগণের কুফরি উক্তি ও আমলের বিবরণ রয়েছে। اَحْبَارٌ -حِبْرٌ-এর এবং رُهْبَانٌ - رَاهِبٌ-এর বহুবচন। حِبْرٌ ইহুদি ও খ্রিস্টানদের আলেমকে এবং رَاهِبٌ তাদের সংসারবিরাগীদেরকে বলা হয়।

১০ নং আয়াতে বলা হয় যে, ইহুদি-খ্রিস্টানরা তাদের আলেম ও যাজক শ্রেণিকে আল্লাহর পরিবর্তে প্রতিপালক ও মাবুদ সাব্যস্ত করে রেখেছে। অনুরূপ হযরত ঈসা (আ.) -কেও মাবুদ মনে করে। তাঁকে আল্লাহর পুত্র মনে করায় তাঁকে মাবুদ বানানোর বিষয়টি তো পরিষ্কার, তবে আলেম বা যাজক শ্রেণিকে মাবুদ সাব্যস্ত করার দোষে যে দোষী করা হয়, তার কারণ হলো, তারা পরিষ্কার ভাষায় ওদের মাবুদ না বললেও পূর্ণ আনুগত্যের যে হক বান্দার প্রতি আল্লাহর রয়েছে, তাকে তারা

www.almodina.com

যাজক শ্রেণির জন্য উৎসর্গ রাখে। **অর্থাৎ** তারা সর্বাবস্থায় যাজক শ্রেণির আনুগত্য করে চলে। তা আল্লাহ-রাসূলের যতই **বরখেলাফ** হোক না কেন? **বলাবাহুল্য,** পীর-পুরোহিতগণের আল্লাহ রাসূল বিরোধী উক্তি ও আমলের আনুগত্য করা **তাদেরকে মাবুদ সাব্যস্ত করার নামান্তর।** আর এটি হলো প্রকাশ্য কুফরি

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, শরিয়তের মাসায়েল সম্পর্কে অজ্ঞ জনসাধারণের পক্ষে ওলামায়ে কেরামের ফতোয়ার অনুসরণ বা **ইজতিহাদী** মাসায়েলের ক্ষেত্রে মুজতাহিদ ইমামগণের মতামতের অনুসরণ এর সাথে অত্র আয়াতের কোনো সম্পর্ক নেই। **কারণ** এদের অনুসরণ হলো প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ রাসূলেরই আনুগত্য। এর তাৎপর্য হলো ইমাম ও আলেমগণ আল্লাহ রাসূলের আদেশ নির্দেশকে সরাসরি বিশ্লেষণ করে তার উপর আমল করেন। আর জনসাধারণ আলেমদের জিজ্ঞেস করে তারপর সে মতে আমল করেন। যে ওলামায়ে কেরামের ইজতিহাদী ক্ষমতা নেই তারাও ইজতিহাদী মাসায়েলের ক্ষেত্রে **মুজহ**তাহিদ ইমামগণের পায়রবী করেন। এই পায়রবী হলো কুরআনের নির্দেশক্রমে, কাজেই তা মূলত আল্লাহরই **পায়রবী।** কুরআনে ইরশাদ হয় فَسْئَلُوْا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ : অর্থাৎ তোমরা যদি আল্লাহ ও রাসূলের হুকুম-আহকাম **সম্পর্কে** ওয়াকিফহাল না হও, তবে বিজ্ঞ আলেমদের কাছে জিজ্ঞেস কর।

পক্ষান্তরে ইহুদি-খ্রিস্টানরা আল্লাহর কিতাব এবং আল্লাহর রাসূলের হুকুম-আহকাম আদেশ-নিষেধকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে **স্বার্থ**পর আলেম এবং অজ্ঞা পুরোহিতদের কথা ও কর্মকে যে নিজেদের ধর্ম বানিয়ে নিয়েছে, তারই নিন্দা জ্ঞাপন করা হয় এ আয়াতে। অতঃপর বলা হয়, "এই গোমরাহি অবলম্বন করেছে বটে, কিন্তু আল্লাহর আদেশ হলো একমাত্র তাঁর ইবাদত করার এবং তিনি তাদের শিরকি কার্যকলাপ থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র।"

শব্দ বিশ্লেষণ

خِفْتُمْ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ اثبات فعل ماضى معروف বাব سَمِعَ মাসদার اَلْخَوْفُ মূলবর্ণ (خ - و - ف) অর্থ– তোমরা ভয় করেছে।

عَيْلَةً : শব্দটি একটি মাসদার, বাব ضَرَبَ জিনস اجوف واوى অর্থ– মুখাপেক্ষী হওয়া।

يُضَاهِئُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ اثبات فعل مضارع معروف বাব مُفَاعَلَةٌ মাসদার اَلْمُضَاهَئَةُ মূলবর্ণ (ض - ه - ء) জিনস مهموز لام অর্থ–তারা সাদৃশ্য অবলম্বন করে।

اَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ : اَنّٰى এস্তেফহামের জন্য এসেছে। يُؤْفَكُوْنَ সীগাহ جمع مذكرغائب বহছ اثبات فعل مضارع مجهول বাব ضَرَبَ ও سَمِعَ মাসদার اَلْاَفْكُ মূলবর্ণ (ا - ف - ك) জিনস مهموز فاء অর্থ– তারা ফিরে যায়।

www.almodina.com

يُرِيْدُوْنَ اَنْ يُّطْفِـُٔوْا نُوْرَ اللّٰهِ بِاَفْوَاهِهِمْ وَيَاْبَى اللّٰهُ اِلَّاۤ اَنْ يُّتِمَّ نُوْرَهٗ وَلَوْ كَرِهَ الْكٰفِرُوْنَ (٣٢)

অনুবাদ : (৩২) তারা এরূপ চাচ্ছে যে, আল্লাহ তা'আলার নূরকে নিজেদের মুখের ফুৎকার দ্বারা নির্বাপিত করে দেয়, অথচ আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নূর [অর্থাৎ দীন ইসলাম]-কে পূর্ণত্বে পৌছানো ব্যতীত নিরস্ত হবেন না, যদিও এ কাফেররা অপ্রীতিকরই মনে করে।

هُوَ الَّذِيْۤ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ ۙ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ (٣٣)

(৩৩) সেই আল্লাহ তা'আলা এমন যে, তিনি নিজ রাসূলকে হেদায়েত [অর্থাৎ কুরআন] এবং সত্য ধর্ম সহকারে প্রেরণ করেছেন, যেন তাকে সকল ধর্মের উপর প্রবল করে দেন, যদিও মুশরিকরা অপ্রীতিকর মনে করে।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ الْاَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَاْكُلُوْنَ اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۙ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ (٣٤)

(৩৪) হে ঈমানদারগণ! অধিকাংশ আহবার এবং রোহবান [অর্থাৎ ইহুদি ও নাসারাদের আলেম ও ধর্ম যাজক মানুষের ধনসম্পদ শরিয়ত বিরুদ্ধ উপায়ে ভক্ষণ করে এবং আল্লাহ তা'আলার পথ হতে বিরত রাখে, আর যারা [অতি লোভের বশবর্তী হয়ে] স্বর্ণ ও রৌপ্য জমা করে রাখে এবং তা আল্লাহর পথে ব্যয় করে না, অতএব, আপনি তাদেরকে অতি যন্ত্রণাময় এক শাস্তির সংবাদ শুনিয়ে দিন।

শাব্দিক অনুবাদ

(৩২) يُرِيْدُوْنَ তারা এরূপ চাচ্ছে যে اَنْ يُّطْفِـُٔوْا نُوْرَ اللّٰهِ بِاَفْوَاهِهِمْ আল্লাহ তা'আলার নূরকে নিজেদের মুখের ফুৎকার দ্বারা নির্বাপিত করে দেয় وَيَاْبَى اللّٰهُ অথচ আল্লাহ তা'আলা নিরস্ত হবেন না اِلَّاۤ اَنْ يُّتِمَّ نُوْرَهٗ স্বীয় নূর [অর্থাৎ দীন ইসলাম]-কে পূর্ণত্বে পৌছানো ব্যতীত وَلَوْ كَرِهَ الْكٰفِرُوْنَ যদিও এ কাফেররা অপ্রীতিকরই মনে করে।

(৩৩) هُوَ الَّذِيْۤ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ সেই আল্লাহ তা'আলা এমন যে, তিনি নিজ রাসূলকে প্রেরণ করেছেন بِالْهُدٰى হেদায়েত [অর্থাৎ কুরআন] وَدِيْنِ الْحَقِّ এবং সত্য ধর্ম সহকারে لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ যেন তাকে সকল ধর্মের উপর প্রবল করে দেন وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ যদিও মুশরিকরা অপ্রীতিকর মনে করে।

(৩৪) يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا হে ঈমানদারগণ! اِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ الْاَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ অধিকাংশ আহবার এবং রোহবান [অর্থাৎ ইহুদি ও নাসারাদের আলেম ও ধর্ম যাজক لَيَاْكُلُوْنَ ভক্ষণ করে اَمْوَالَ النَّاسِ মানুষের ধন সম্পদ بِالْبَاطِلِ শরিয়ত বিরুদ্ধ উপায়ে وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ এবং আল্লাহ তা'আলার পথ হতে বিরত রাখে وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ আর যারা [অতি লোভের বশবর্তী হয়ে] স্বর্ণ ও রৌপ্য জমা করে রাখে الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ এবং তা আল্লাহর পথে ব্যয় করে না فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ অতএব, আপনি তাদেরকে অতি যন্ত্রণাময় এক শাস্তির সংবাদ শুনিয়ে দিন।

www.almodina.com

يَوْمَ يُحْمٰى عَلَيْهَا فِىْ نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوٰى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوْبُهُمْ وَظُهُوْرُهُمْ ؕ هٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِاَنْفُسِكُمْ فَذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُوْنَ (٣٥)	অনুবাদ : ৩৫. যা সেদিন ঘটবে, যেদিন দোজখের অগ্নিতে সেগুলোকে উত্তপ্ত করা হবে, অতঃপর সেগুলো দ্বারা তাদের ললাটসমূহে এবং তাদের পার্শ্বদেশসমূহে ও তাদের পৃষ্ঠদেশসমূহে দাগ দেওয়া হবে, [এবং বলা হবে] এটা তাই যা তোমরা নিজেদের জন্য সঞ্চয় করে রেখেছিলে, সুতরাং এখন নিজেদের সঞ্চয়ের স্বাদ গ্রহণ কর।
اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُوْرِ عِنْدَ اللّٰهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِىْ كِتٰبِ اللّٰهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ مِنْهَآ اَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ؕ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ ۙ فَلَا تَظْلِمُوْا فِيْهِنَّ اَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِيْنَ كَآفَّةً كَمَا يُقَاتِلُوْنَكُمْ كَآفَّةً ؕ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ (٣٦)	৩৬. নিশ্চয় মাসমূহের সংখ্যা হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার নিকট বারো [চন্দ্র] মাস আল্লাহর কিতাবে [অর্থাৎ শরিয়তের বিধানে] আল্লাহর জমিন ও আসমানসমূহ সৃষ্টি করার দিবস হতেই, [এবং] তার মধ্যে বিশেষরূপে চারটি মাস হচ্ছে সম্মানিত, এটাই হচ্ছে সুপ্রতিষ্ঠিত ধর্ম, অতএব, তোমরা এ মাসগুলো সম্বন্ধে [ধর্মের বিরুদ্ধাচরণ করে] নিজেদের ক্ষতিসাধন করো না, আর এই মুশরিকদের সকলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর, যেমন তারা তোমাদের সকলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। আর এটা জেনে রাখ যে, আল্লাহ তা'আলা মুত্তাকীদের সঙ্গে রয়েছেন।

শাব্দিক অনুবাদ

(৩৫) يَوْمَ يُحْمٰى عَلَيْهَا فِىْ نَارِ جَهَنَّمَ যা সেদিন ঘটবে যেদিন দোজখের অগ্নিতে সেগুলোকে উত্তপ্ত করা হবে فَتُكْوٰى بِهَا অতঃপর সেগুলো দ্বারা দাগ দেওয়া হবে جِبَاهُهُمْ তাদের ললাটসমূহে وَجُنُوْبُهُمْ এবং তাদের পার্শ্বদেশসমূহে وَظُهُوْرُهُمْ ও তাদের পৃষ্ঠদেশসমূহে [এবং বলা হবে] هٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِاَنْفُسِكُمْ এটা তাই যা তোমরা নিজেদের জন্য সঞ্চয় করে রেখেছিলে فَذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُوْنَ সুতরাং এখন নিজেদের সঞ্চয়ের স্বাদ গ্রহণ কর।

(৩৬) اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُوْرِ নিশ্চয় মাসমূহের সংখ্যা হচ্ছে عِنْدَ اللّٰهِ আল্লাহ তা'আলার নিকট اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا বার [চন্দ্র] মাস فِىْ كِتٰبِ اللّٰهِ আল্লাহর কিতাবে [অর্থাৎ শরিয়তের বিধানে] يَوْمَ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ আল্লাহর জমিন ও আসমানসমূহ সৃষ্টি করার দিবস হতে مِنْهَآ اَرْبَعَةٌ حُرُمٌ [এবং] তার মধ্যে বিশেষরূপে চারটি মাস হচ্ছে সম্মানিত ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ এটাই হচ্ছে সুপ্রতিষ্ঠিত ধর্ম فَلَا تَظْلِمُوْا فِيْهِنَّ اَنْفُسَكُمْ অতএব, তোমরা এই মাসগুলো সম্বন্ধে [ধর্মের বিরুদ্ধাচরণ করে] নিজেদের ক্ষতিসাধন করো না وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِيْنَ كَآفَّةً আর এই মুশরিকদের সকলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর كَمَا يُقَاتِلُوْنَكُمْ كَآفَّةً যেমন তারা তোমাদের সকলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। وَاعْلَمُوْٓا আর এটা জেনে রাখ যে اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ আল্লাহ তা'আলা মুত্তাকীদের সঙ্গে রয়েছেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

৩৩. قوله هُوَ الَّذِىْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফ উরফে আবূ হাইয়্যান তাফসীরে বাহরে মুহীত্বে বর্ণনা করেন যে, আলোচ্য আয়াত এমন এক পরিস্থিতিতে নাজিল হয়েছে যে, যখন আরববাসী অর্থনৈতিকভাবে পর্যুদস্থ হয়ে পড়ে। কুরাইশরা বৎসরে দু'বার বাণিজ্য কাফেলা পরিচালনা করতো– ১. শীতকালে

ইয়েমেনের পথে আর ২. গরম মৌসুমে সিরিয়া ও ইরাকের পথে। ইয়েমেন ও ইরাকী মানুষেরা যখন ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে, তখন তাদের পারস্পরিকভাবে ধর্ম ও বাণিজ্যের ভিন্নতা হয়ে যাবার কারণে তাদের বাণিজ্য কাফেলা বন্ধ হয়ে যায়। তখন সাহাবায়ে কেরাম রাসূল ﷺ-এর সাথে এ সম্পর্কে আলোচনা করেন। এহেন পরিস্থিতিতে উক্ত আয়াত নাজিল করা হয়েছে। –[বাহরে মুহীত-৩৪/৫]

৩৪. قوله يَآيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ الْاَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** আলোচ্য আয়াতের শানে নুযূল সম্পর্কে হযরত আবূ যার (রা.) ও হযরত মোয়াবিয়া (রা.)-এর মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। হযরত যায়েদ ইবনে ওহাব (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, একদা মদিনার নিকটবর্তী রাবাযা নামক স্থানে হযরত আবূ বকর (রা.)-এর সাথে আমার সাক্ষাৎ হলে, আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি এখানে কেন? তিনি জবাবে বললেন, আমি সিরিয়া গিয়েছিলাম। আলোচ্য আয়াত সম্পর্কে মু'আবিয়ার ও আমার মাঝে দ্বিমত দেখা দিয়েছিল। মু'আবিয়া বলেছিল, এ আয়াত আহলে কিতাবদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। আমি বললাম, আলোচ্য আয়াতাংশ আমরা ও আহলে কিতাব উভয় পক্ষের সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। –[কুরতুবী-১১৪/৮]

قوله يُرِيْدُوْنَ اَنْ يُّطْفِـُٔوْا نُوْرَ اللّٰهِ بِاَفْوَاهِهِمْ الخ ইহুদি খ্রিস্টানদের এহেন বাতিল পথের অনুসরণ এবং গায়রুল্লাহর অবৈধ আনুগত্যের বিবরণ দিয়ে এ আয়াতটি শেষ করা হয়। পরবর্তী আয়াতে বলা হয় যে, তারা গোমরাহি করেই ক্ষান্ত হচ্ছে না; বরং আল্লাহর সত্য দীনকে নিশ্চিহ্ন করারও ব্যর্থ প্রয়াস চালাচ্ছে। আয়াতে উপমা দিয়ে বলা হচ্ছে যে, এরা মুখের ফুৎকারে আল্লাহর নূরকে নিভিয়ে দিতে চায়। অথচ এটি তাদের জন্য অসম্ভব; বরং আল্লাহর অমোঘ ফয়সালা যে, তিনি নিজের নূর তথা দীন ইসলামকে পূর্ণরূপে উদ্ভাসিত করবেন, তা কাফের ও মুশরিকদের যতই মর্মপীড়ার কারণ হোক না কেন?

এরপর ৩৩ নং আয়াতের সারকথাও এটাই যে, আল্লাহ আপন রাসূলকে হেদায়েতের উপকরণ কুরআন এবং সত্য দীন ইসলাম সহকারে এজন্য প্রেরণ করেছেন, যাতে অপরাপর ধর্মের উপর ইসলাম ধর্মের বিজয় সূচিত হয়। এ মর্মে আরও কতিপয় আয়াত কুরআনে রয়েছে, যাতে সকল ধর্মের উপর ইসলাম ধর্মের বিজয় লাভের প্রতিশ্রুতি রয়েছে।

তাফসীরে মাযহারীতে উল্লেখ আছে যে, অন্যান্য দীনের উপর দীনে ইসলামের বিজয় লাভের সুসংবাদগুলো অধিকাংশ অবস্থা ও কালানুপাতিক যেমন, হযরত মিকদাদ (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন– "এমন কোনো কাঁচা ও পাকা ঘর দুনিয়ার বুকে থাকবে না, যেখানে ইসলামের প্রবেশ ঘটবে না। সম্মানীদের সম্মানের সাথে এবং লাঞ্ছিতদের লাঞ্ছনার সাথে। আল্লাহ যাদের সম্মানিত করবেন তারা ইসলাম কবুল করবে এবং যাদের লাঞ্ছিত করবেন তারা ইসলাম গ্রহণে বিমুখ থাকবে, কিন্তু ইসলামি রাষ্ট্রের অনুগত প্রজায় পরিণত হবে।" আল্লাহর এই প্রতিশ্রুতি অচিরেই পূর্ণ হয়। যার ফলে গোটা দুনিয়ার উপর প্রায় এক হাজার বছর যাবৎ ইসলামের প্রভুত্ব বিস্তৃত থাকে।

৩৪ নং আয়াতে মুসলমানদের সম্বোধন করে ইহুদি-খ্রিস্টান পীর-পুরোহিতদের এমন কুকীর্তির বর্ণনা দেওয়া হয়, যা লোক সমাজে গোমরাহি প্রসারের অন্যতম কারণ। ইহুদি-খ্রিস্টানের আলোচনায় মুসলমানদের হয়তো এ উদ্দেশ্যে সম্বোধন করা হয় যে, তাদের অবস্থাও যেন ওদের মতো না হয়। আয়াতে ইহুদি-খ্রিস্টান পীর-পুরোহিতগণের অধিকাংশ সম্পর্কে বলা হয় যে, তারা গর্হিত পন্থায় লোকদের মালামাল গলধঃকরণ করে চলছে এবং আল্লাহর সরল পথ থেকে মানুষকে নিবৃত রাখছে।

অধিকাংশ পীর-পুরোহিতগণের যেখানে এ অবস্থা, সেখানে সাধারণত সমকালীন; সবাইকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়। কিন্তু কুরআন মাজীদ তা না করে। كَثِيْرًا (অধিকাংশ) শব্দ প্রয়োগ করেছে। এর দ্বারা মুসলমানদেরকে শিক্ষা দেওয়া উদ্দেশ্য যে, তারা যেন শত্রুর বেলায়ও কোনো রূপ বাড়াবাড়ির আশ্রয় না নেয়।

গর্হিত পন্থায় মানুষের সম্পদ ভোগের অর্থ হলো, অনেক সময় তারা পয়সা নিয়ে তাওরাতের শিক্ষাবিরোধী ফতোয়া দান করত। আবার কখনো তাওরাতের বিধি-নিষেধকে গোপন রেখে কিংবা তাতে নানা হীলা-বাহানা সৃষ্টি করে জ্ঞানপাপীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হতো। তাদের বড় অপরাধ হলো যে, তারা নিজেরাই শুধু পথভ্রষ্ট নয়; বরং সত্যপথ অন্বেষণকারীদের বিভ্রান্ত হওয়ারও কারণ হয়ে দাঁড়াত। কেননা, যেখানে নেতাদের এ অবস্থা, সেখানে অনুসারীদের সত্য সন্ধানের স্পৃহাও আর বাকি থাকে না। এ ছাড়াও পীর-পুরোহিতগণের বাতিল ফতোয়ার দরুন সরল জনগণ মিথ্যাকেও সত্যরূপে বিশ্বাস

www.almodina.com

ইহুদি-খ্রিস্টান আলেম সম্প্রদায়ের মিথ্যা ফতোয়া দানের ব্যাধি সৃষ্ট হয় অর্থের লোভ-লালসা থেকে। এজন্য আয়াতে বর্ণিত অর্থ লিপ্সার করুণ পরিণতি ও কঠোর সাজা এবং এ ব্যাধি থেকে পরিত্রাণ লাভের উপায় বর্ণিত হয়। ইরশাদ হয়েছে– وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ "অর্থাৎ যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য জমা করে রাখে, তা খরচ করে না আল্লাহর পথে, তাদের কঠোর আজাবের সুসংবাদ দিন।"

"তা খরচ করে না আল্লাহর পথে" বাক্য থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, যারা বিধান মতে আল্লাহর ওয়াস্তে খরচ করে, তাদের পক্ষে তাদের অবশিষ্ট অর্থসম্পদ ক্ষতিকর নয়। হাদীস শরীফে রাসূলে কারীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে মালামালের জাকাত দেওয়া হয়, তা জমা রাখা সঞ্চিত ধনরত্নের শামিল নয়।" –[আবূ দাউদ, আহমদ]

এ থেকে বুঝা যায় যে, জাকাত আদায়ের পর যা অবশিষ্ট থাকে, তা জমা রাখা গুনাহ নয়। অধিকাংশ ফকীহ ও ঈমামগণ এ মতের অনুসারী।

وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا "আর তা খরচ করে না" বাক্যের 'তা' সর্বনামের উদ্দিষ্ট বস্তু হলো রৌপ্য। অথচ আয়াতে স্বর্ণ ও রৌপ্য উভয়েরই উল্লেখ রয়েছে। তাফসীরে মাযহারীর মতে এ বর্ণনাভঙ্গিতে এ ইঙ্গিত রয়েছে যে, যার অল্প পরিমাণ স্বর্ণ ও রৌপ্য রয়েছে, সে জাকাত প্রদানের বেলায় স্বর্ণকে রূপার মূল্যের সাথে যোগ করে রূপার হিসাব মতে জাকাত প্রদান করবে।

শেষের আয়াতে জমাকৃত স্বর্ণ ও রৌপ্যকে জাহান্নামের আগুণে উত্তপ্ত করে ললাট, পার্শ্ব ও পৃষ্ঠদেশ দগ্ধ করার যে কঠোর সাজার উল্লেখ রয়েছে, তা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, স্বয়ংকৃত আমলই সে আমলের সাজা।

অর্থাৎ যে অর্থসম্পদ অবৈধ পন্থায় জমা করা হয়, কিংবা বৈধ পন্থায় জমা করলেও তার জাকাত আদায় করা না হয়, সে সম্পদই তার জন্য আজাবের রূপ ধারণ করে।

এ আয়াতে যে ললাট, পার্শ্ব ও পৃষ্ঠদেশ দগ্ধ করার উল্লেখ রয়েছে, তার অর্থ সমগ্র শরীরও হতে পারে। কিংবা এই তিন অঙ্গের উল্লেখ এজন্য করা হয়েছে যে, যে কৃপণ ব্যক্তি আল্লাহর রাহে খরচ করতে চায় না, তার কাছে যখন কোনো ভিক্ষুক কিছু চায়, কিংবা জাকাত তলব করে, তখন সে প্রথমে ভ্রুকুঞ্চন করে, তারপর পাশ কাটিয়ে তাকে এড়িয়ে যেতে চায়। এতেও সে ক্ষান্ত না হলে তাকে পৃষ্ঠ দেখিয়ে চলে যায়। এজন্য বিশেষ করে এ তিন অঙ্গে আজাব দানের উল্লেখ করা হয়।

اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُوْرِ عِنْدَ اللهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا "নিশ্চয় আল্লাহর নিকট মাস গণনায় মাস হলো বারটি।" এখানে উল্লিখিত عِدَّتٌ অর্থ গণনা। شُهُوْرٌ হলো شَهْرٌ -এর বহুবচন। অর্থ– মাস। বাক্যের সারমর্ম হলো, আল্লাহর কাছে মাসের সংখ্যা বারোটি নির্ধারিত, এতে কমবেশি করার কারো ক্ষমতা নেই।

অতঃপর فِيْ كِتَابِ اللهِ বলে স্পষ্ট করা হয় যে, বিষয়টি রোযে আযল অর্থাৎ সৃষ্টির প্রথম দিনেই লওহে মাহফূযে লিখিত রয়েছে। এরপর يَوْمَ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ বলে ইঙ্গিত করা হয় যে, রোযে আযলে এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া হলেও মাসগুলোরও ধারাবাহিকতা নির্ধারিত হয় আসমান ও জমিনের সৃষ্টি পরবর্তী মুহূর্তে।

তারপর বলা হয় مِنْهَا اَرْبَعَةٌ حُرُمٌ অর্থাৎ 'তন্মধ্যে চার মাস হলো নিষিদ্ধ।' সেহেতু এ চার মাস যুদ্ধ ও রক্তপাত হারাম। অর্থ হলো, এই চারটি মাস সম্মানী, যেহেতু মাসগুলো অতীব বরকতময়। এতে ইবাদতের ছওয়াব বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। প্রথম অর্থ মতে যে হুকুম তা ইসলামি শরিয়তে রহিত। তবে দ্বিতীয় অর্থ মতে আদব ও সম্মান প্রদর্শন এবং ইবাদতে যত্নবান হওয়ার হুকুমটি ইসলামেও বাকি রয়েছে।

বিদায় হজের সময় মিনা প্রান্তরে প্রদত্ত খুতবায় নবী করীম ﷺ সম্মানিত মাসগুলোকে চিহ্নিত করে বলেন, 'তিনটি মাস হলো ধারাভাহিক জিলকদ, জিলহজ ও মহররম, অপরটি হলো রজব।' তবে রজব সম্পর্কে আরববাসীদের দ্বিমত রয়েছে। কতিপয় গোত্রের মতে রজব হলো রমজান। আর মুযার গোত্রের ধারণা মতে রজব হলো জমাদিউস সানী ও শা'বানের মধ্যবর্তী মাসটি। তাই নবী করীম ﷺ খুতবায় মুযার গোত্রে রজব বলে বিষয়টি পরিষ্কার করে দেন।

ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ "এটিই হলো সুপ্রতিষ্ঠিত বিধান।" অর্থাৎ মাসগুলোর ধারাবাহিকতা নির্ধারণ ও সম্মানিত মাসগুলোর সাথে সম্পৃক্ত হুকুম-আহকামকে সৃষ্টির প্রথম পর্বের এলাহী নিয়মের সাথে সঙ্গতিশীল রাখাই হলো দীনে মুসতাকীম। এতে কোনো মানুষের কমবেশি কিংবা পরিবর্তন-পরিবর্ধন করার প্রয়াস অসুস্থ বিবেক ও মন্দ স্বভাবের আলামত।

فَلَا تَظْلِمُوْا فِيْهِنَّ اَنْفُسَكُمْ "সুতরাং তোমরা এ মাসগুলোতে নিজেদের প্রতি অবিচার করো না।" অর্থাৎ এ পবিত্র মাসগুলোর যথাযথ আদব রক্ষা না করে এবং ইবাদত বন্দেগিতে অলস থেকে নিজেদের ক্ষতি করো না।

www.almodina.com

ইমাম জাসসাস (র.) 'আহকামুল কুরআন' গ্রন্থে বলেন, কুরআনের এ বাক্য থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, এ মাসগুলোর এমন বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যার ফলে এতে ইবাদত করা হলে বাকি মাসগুলোতেও ইবাদতের তৌফিক ও সাহস লাভ করা যায়। অনুরূপ কেউ এ মাসগুলোতে পাপাচার থেকে নিজেকে দূরে রাখতে পারলে বছরের বাকি মাসগুলোতেও পাপাচার থেকে দূরে থাকা সহজ হয়। তাই এ সুযোগের সদ্ব্যবহার থেকে বিরত থাকা হবে অপূরণীয় ক্ষতি।

শব্দবিশ্লেষণ

يُرِيْدُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ اثبات فعل مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِرَادَةُ মূলবর্ণ (ر ـ و ـ د) জিনস اجوف واوى অর্থ– তারা চায়।

يُطْفِئُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ اثبات فعل مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِطْفَاءُ মূলবর্ণ (ط ـ ف ـ ء) জিনস مهموز لام অর্থ– তারা নিভিয়ে দিতে চায়।

اَلْاَحْبَارُ : শব্দটি বহুবচন; একবচন حِبْرٌ অর্থ– জ্ঞানী, জ্ঞান।

اَلرُّهْبَانُ : শব্দটি বহুবচন; একবচন رَاهِبٌ অর্থ– বুজুর্গ, মাশায়েখ।

ذَهَبٌ : শব্দটি একবচন; বহুবচন ذُهُوْبٌ ও اِذْهَابٌ অর্থ– সোনা।

فِضَّةٌ : শব্দটি একবচন; বহুবচন فِضَاضٌ ও فِضَضٌ অর্থ– রূপা।

تُكْوٰى : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ اثبات فعل مضارع مجهول বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْكَيُّ মূলবর্ণ (ك ـ و ـ ى) জিনস لفيف مقرون অর্থ– তাকে দাগ দেওয়া হবে।

جِبَاهٌ : শব্দটি বহুবচন; একবচন جَبْهَةٌ অর্থ– কপাল।

جُنُوْبٌ : শব্দটি বহুবচন; একবচন جَنْبٌ অর্থ– পাশ, পার্শ্ব।

ظُهُوْرٌ : শব্দটি বহুবচন; একবচন ظَهْرٌ অর্থ– পিঠ।

www.almodina.com

إِنَّمَا النَّسِيْٓءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُحِلُّوْنَهٗ عَامًا وَّيُحَرِّمُوْنَهٗ عَامًا لِّيُوَاطِـُٔوْا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ فَيُحِلُّوْا مَا حَرَّمَ اللّٰهُ ۚ زُيِّنَ لَهُمْ سُوْٓءُ أَعْمَالِهِمْ ۚ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ (٣٧)	অনুবাদ : ৩৭. এই [মাসগুলোর] স্থানান্তর কুফরের মধ্যে আরো বৃদ্ধি মাত্র, যা দ্বারা কাফেরদেরকে পথভ্রষ্ট করা হয় [এরূপে] যে, তারা সেই হারাম মাসকে কোনো বৎসর হালাল করে নেয় এবং কোনো বৎসর হারাম মনে করে আল্লাহ যে মাসগুলোকে হারাম করেছেন, যেন তারা তাদের সংখ্যা পূর্ণ করে নিতে পারে, অতঃপর তারা আল্লাহর নিষিদ্ধ মাসগুলাকে হালাল করে নেয়, তাদের দুষ্কর্মগুলো তাদের নিকট ভালো মনে হয়, আর আল্লাহ এরূপ কাফেরদেরকে হেদায়েত [-এর তাওফীক দান] করেন না।
يٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَا لَكُمْ إِذَا قِيْلَ لَكُمُ انْفِرُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ ۚ أَرَضِيْتُمْ بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا مِنَ الْاٰخِرَةِ ۚ فَمَا مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا فِي الْاٰخِرَةِ إِلَّا قَلِيْلٌ (٣٨)	৩৮. হে ঈমানদারগণ! তোমাদের কি হলো, যখন তোমাদেরকে বলা হয় যে, [জিহাদের জন্য] বের হও আল্লাহর রাস্তায়, তখন তোমরা মাটিতে লেগে থাক, [অর্থাৎ অলসভাবে বসে থাক,] তবে কি তোমরা পরকালের বিনিময়ে পার্থিব জীবনের উপর পরিতুষ্ট হয়ে গেলে? পার্থিব জীবনের ভোগ-বিলাস তো আখেরাতের তুলনায় কিছুই নয়– অতি সামান্য।
إِلَّا تَنْفِرُوْا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيْمًا وَّيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوْهُ شَيْـًٔا ۚ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ (٣٩)	৩৯. যদি তোমরা বের না হও, তবে আল্লাহ তোমাদেরকে কঠোর শাস্তি প্রদান করবেন, [অর্থাৎ ধ্বংস করে দিবেন] এবং তোমাদের পরিবর্তে অন্য এক জাতি সৃষ্টি করে দিবেন, আর তোমরা আল্লাহ তা'আলার [ধর্মের] কোনোই ক্ষতি করতে পারবে না এবং আল্লাহ হচ্ছেন, সর্ববিষয়োপরি পূর্ণ ক্ষমতাবান।

শাব্দিক অনুবাদ

(৩৭) إِنَّمَا النَّسِيْٓءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ এই [মাসগুলোর] স্থানান্তর কুফরের মধ্যে আরো বৃদ্ধি মাত্র। يُضَلُّ بِهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا যা দ্বারা কাফেরদেরকে পথভ্রষ্ট করা হয় [এরূপে] যে يُحِلُّوْنَهٗ عَامًا তারা সেই হারাম মাসকে কোনো বৎসর হালাল করে নেয় وَّيُحَرِّمُوْنَهٗ عَامًا এবং কোনো বৎসর হারাম মনে করে لِّيُوَاطِـُٔوْا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ আল্লাহ যে মাসগুলোকে হারাম করেছেন, যেন তারা তাদের সংখ্যা পূর্ণ করে নিতে পারে فَيُحِلُّوْا مَا حَرَّمَ اللّٰهُ অতঃপর তারা আল্লাহর নিষিদ্ধ মাসগুলাকে হালাল করে নেয় زُيِّنَ لَهُمْ سُوْٓءُ أَعْمَالِهِمْ তাদের দুষ্কর্মগুলো তাদের নিকট ভালো মনে হয় وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ আর আল্লাহ এরূপ কাফেরদেরকে হেদায়েত [-এর তাওফীক দান] করেন না।

(৩৮) يٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا হে ঈমানদারগণ! مَا لَكُمْ তোমাদের কি হলো إِذَا قِيْلَ لَكُمْ যখন তোমাদেরকে বলা হয় যে, [জিহাদের জন্য] انْفِرُوْا বের হও فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ আল্লাহর রাস্তায় اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ তখন তোমরা মাটিতে লেগে থাক [অর্থাৎ অলসভাবে বসে থাক] أَرَضِيْتُمْ তবে কি তোমরা পরিতুষ্ট হয়ে গেলে? بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا পার্থিব জীবনের উপর مِنَ الْاٰخِرَةِ পরকালের বিনিময়ে فَمَا مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا فِي الْاٰخِرَةِ পার্থিব জীবনের ভোগ-বিলাস তো আখেরাতের তুলনায় কিছুই নয়– إِلَّا قَلِيْلٌ অতি সামান্য।

(৩৯) إِلَّا تَنْفِرُوْا যদি তোমরা বের না হও يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيْمًا তবে আল্লাহ তোমাদেরকে কঠোর শাস্তি প্রদান করবেন [অর্থাৎ ধ্বংস করে দিবেন] وَّيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ এবং তোমাদের পরিবর্তে অন্য এক জাতি সৃষ্টি করে দিবেন وَلَا تَضُرُّوْهُ شَيْـًٔا আর তোমরা আল্লাহ তা'আলার [ধর্মের] কোনোই ক্ষতি করতে পারবে না وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ এবং আল্লাহ হচ্ছেন, সর্ববিষয়োপরি পূর্ণ ক্ষমতাবান।

إِلَّا تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا ۖ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ ۗ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٤٠)

অনুবাদ : (৪০) যদি তোমরা রাসূলুল্লাহর সাহায্য না কর, তবে আল্লাহ তা'আলা [-ই তাঁর সাহায্য করবেন যেমন তিনি] তাঁর সাহায্য করেছিলেন, সে সময়ে যখন কাফেররা তাঁকে দেশান্তর করে দিয়েছিল, যখন দুজনের মধ্যে একজন ছিলেন তিনি, যে সময় উভয়ে গুহার মধ্যে ছিলেন, যখন তিনি স্বীয় সঙ্গী [হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)]-কে বলছিলেন, তুমি বিষণ্ন হয়ো না, নিশ্চয় আল্লাহ [-র সাহায্য] আমাদের সঙ্গে রয়েছে। অতঃপর আল্লাহ তাঁর প্রতি স্বীয় সান্ত্বনা নাজিল করলেন এবং তাঁকে শক্তিশালী করলেন, এমন সেনাদল দ্বারা যাদেরকে তোমরা দেখতে পাওনি এবং আল্লাহ তা'আলা কাফেরদের বাক্য নিচু [অর্থাৎ প্রচেষ্টা ব্যর্থ] করে দিলেন আর আল্লাহর বাণীই সমুচ্চ রইল, আর আল্লাহ তা'আলা হচ্ছেন, প্রবল প্রজ্ঞাময়।

انفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (٤١)

(৪১) বের হয়ে পড় স্বল্প সরঞ্জামের সাথে [-ই হোক] আর প্রচুর সরঞ্জামের সাথে [-ও হোক] এবং আল্লাহর রাস্তায় নিজেদের ধনসম্পদ ও প্রাণ দ্বারা যুদ্ধ কর, এটা তোমাদের জন্য অতি উত্তম, যদি তোমরা বিশ্বাস কর।

শাব্দিক অনুবাদ

(৪০) إِلَّا تَنصُرُوهُ যদি তোমরা রাসূলুল্লাহর সাহায্য না কর فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ তবে আল্লাহ তা'আলা [-ই তাঁর সাহায্য করবেন যেমন তিনি] তাঁর সাহায্য করেছিলেন إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا সে সময়ে যখন কাফেররা তাঁকে দেশান্তর করে দিয়েছিল ثَانِيَ اثْنَيْنِ যখন দুজনের মধ্যে একজন ছিলেন তিনি إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ যেই সময় উভয়ে গুহার মধ্যে ছিলেন إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ যখন তিনি স্বীয় সঙ্গী [হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)]-কে বলছিলেন لَا تَحْزَنْ তুমি বিষণ্ন হয়ো না إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا নিশ্চয় আল্লাহ [-র সাহায্য] আমাদের সঙ্গে রয়েছে فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ অতঃপর আল্লাহ তাঁর প্রতি স্বীয় সান্ত্বনা নাজিল করলেন وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ এবং তাঁকে শক্তিশালী করলেন এমন সেনাদল দ্বারা لَّمْ تَرَوْهَا যাদেরকে তোমরা দেখতে পাওনি وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ এবং আল্লাহ তা'আলা কাফেরদের বাক্য নিচু [অর্থাৎ প্রচেষ্টা ব্যর্থ] করে দিলেন وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا আর আল্লাহর বাণীই সমুচ্চ রইল وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ আর আল্লাহ তা'আলা হচ্ছেন, প্রবল প্রজ্ঞাময়।

(৪১) انفِرُوا বের হয়ে পড় خِفَافًا স্বল্প সরঞ্জামের সাথে [-ই হোক] وَثِقَالًا আর প্রচুর সরঞ্জামের সাথে [-ও হোক] وَجَاهِدُوا এবং যুদ্ধ কর بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ নিজেদের ধনসম্পদ ও প্রাণ দ্বারা فِي سَبِيلِ اللَّهِ আল্লাহর রাস্তায় ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ এটা তোমাদের জন্য অতি উত্তম إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ যদি তোমরা বিশ্বাস কর।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(৩৯) قوله إِلَّا تَنفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ الخ **আয়াতের শানে নুযূল– ১ :** রাসূলে আকরাম ﷺ সাহাবায়ে কেরামকে যখন তাবুক যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করে বের হবার আদেশ করেন, তখন সময়টি ছিল দুর্ভিক্ষ অনাবৃষ্টি ও গ্রীষ্মের প্রচণ্ড গরমের উত্তাপও ছিল। অপর দিকে পাকা ফল-ফলারিও সংগ্রহ করার উপযুক্ত সময়। যার কারণে এহেন

www.almodina.com

সময়ে ঘরবাড়ি ছেড়ে বাইরে যাওয়া অত্যন্ত কষ্টকর মনে হলো; বরং বাড়িতে অবস্থান করাকেই আন্তরিকভাবে ভালোবাসতেছিলেন। যারা তাবুক অভিযান থেকে বিরত থেকে গেল, তাদের সমালোচনা ও ভর্ৎসনা স্বরূপ আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। –[বাহরে মুহীত-৪৩/৫]

শানে নুযূল– ২ : ইবনে মারদুভিয়া ও বায়হাকী তাঁর সুনান গ্রন্থে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আরব গোত্রগুলোকে তাবূক যুদ্ধে বের হওয়ার জন্য আদেশ করা হলো, তখন তাঁরা এভাবে বের হওয়াকে অত্যন্ত কষ্টকর বলে মনে করল আল্লাহর তা'আলা إِلَّا تَنْفِرُوْا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيْمًا আয়াত নাজিল করে। অতঃপর তাদের উপর অনাবৃষ্টি আরম্ভ হয়ে যায়। তাই ছিল সেই কষ্টদায়ক শাস্তি।

শানে নুযূল– ৩ : ইবনে আবী হাতেম ইকরিমার উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, إِلَّا تَنْفِرُوْا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيْمًا যখন নাজিল হয়, তখন অনেক বেদুইনরাই পিছনে ছিল, যারা মানুষদেরকে বিভিন্ন কিছু বুঝাত, তখন মুমিনগণ বলল, বেদুইন ধ্বংস হয়েছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ আয়াত নাজিল হয়েছে। –[ফাতহুল কাদীর-৩৬৩/২]

(৩৭) قوله إِنَّمَا النَّسِيْٓءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** চান্দ্র মাসের হিসাব অনুপাতে মৌসুমে ও ঋতুকালের মধ্যে অনেক পরিবর্তনই হয়ে থাকে। যে কারণে যে মাসটি কোনো সময় শীতকালে ছিল সে মাসটি আবার কখনো গ্রীষ্মকালেও পরে থাকে। সেজন্য শান্তির আলোয়, যুদ্ধবিগ্রহহীন নিরাপদের ৪টি মাস থেকে কোনো না কোনো মাস পরস্পরে যুদ্ধে নেমে যাবার মাসেও ব্যবহৃত হচ্ছিল। তখন মুশরিক লোকেরা নিজ পছন্দসই মাসগুলোকে স্থানান্তরিত ও সরিয়ে দিত। তারা মহররম মাসকে সফর বানিয়ে বলত যে, বর্তমান সফর চলছে, মহররম পরে আসবে। এমনভাবে ছলচাতুরী করে যুদ্ধ নিষিদ্ধ মাসসমূহে তারা যুদ্ধবিগ্রহ করে যেত। তাদের এমন নীতিহীন কাজকে নিষিদ্ধ করে আল্লাহ তা'আলা উক্ত আয়াত নাজিল করেন। –[নূরুল কুলূব]

(৪১) قوله اِنْفِرُوْا خِفَافًا وَّثِقَالًا وَّجَاهِدُوْا بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الخ **আয়াতের শানে নুযূল– ১ :** তাবূক যুদ্ধে যখন যাওয়ার জন্য নির্দেশ হয়, তখন অনেকেই ক্ষেতখামার, ফলফসল নষ্ট হওয়ার ওজর আপত্তি জানাল, আবার কেউ কেউ বার্ধক্য এবং অসুস্থতার ছলনা করল। এ পরিস্থিতিতে সকলের ওজর-আপত্তিই অগ্রহ্য হয়ে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয় এবং নির্দেশ করা হয় যে, ইচ্ছায় অনিচ্ছায় যা কিছু অস্ত্র রয়েছে, তা নিয়ে বের হয়ে পড়। –[নূরুল কুলূব]

শানে নুযূল– ২ : ইবনে আবী হাতেম ও আবুশ শায়খ মুজাহিদের উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, সাহাবায়ে কেরাম বলেন যে, আমাদেরকে যখন তাবুক যুদ্ধে যাওয়ার জন্য নির্দেশ করা হয়, তখন আমরা বললাম, আমাদের মাঝে সমস্যায় জড়িত বিভিন্ন ধরনের কাজও ব্যবস্থা রয়েছে। যার কারণে এ নির্দেশ ভেস্তে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। তখন সে অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

শানে নুযূল– ৩ : আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম (রা.) বলেন যে, তিনি রাসূল ﷺ-এর নিকট গিয়ে আবেদন করলেন যে, আমাকেও কি বের হতে হবে? (কারণ তিনি ছিলেন একজন অন্ধ সাহাবী) রাসূল ﷺ জবাবে বললেন, হ্যাঁ। অবশেষে لَيْسَ عَلَى الْاَعْرَجِ حَرَجٌ আয়াত নাজিল হয়েছে।

শানে নুযূল– ৪ : ইবনে আবী হাতেম প্রমুখ সুদ্দীর বরাত দিয়ে বর্ণনা করেন যে, আলোচ্য আয়াত যখন নাজিল হয়, তখন মানুষের উপর তা কষ্টসাধ্য মনে হলো। ফলে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াতের আদেশ রহিত করে لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَآءِ وَلَا عَلَى الْمَرِيْضِ حَرَجٌ আয়াত নাজিল করেন। –[রূহুল মা'আনী-১০৪/৫]

قوله إِنَّمَا النَّسِيْٓءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا الخ উপরিউক্ত আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মাসের যে ধারাবাহিকতা এবং মাসগুলোর যে নাম ইসলামি শরিয়তে প্রচলিত, তা মানব রচিত পরিভাষা নয়; বরং রাব্বুল আলামীন যেদিন আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছেন সেদিনই মাসের তারতীব, নাম ও বিশেষ মাসের সাথে সংশ্লিষ্ট হুকুম-আহকাম নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। আয়াত দ্বারা আরও প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহর দৃষ্টিতে শরিয়তের আহকামের ক্ষেত্রে চান্দ্র মাসই নির্ভরযোগ্য। চান্দ্র মাসের হিসাব মতেই রোজা, হজ ও জাকাত প্রভৃতি আদায় করতে হয়। তবে কুরআন মাজীদ চন্দ্রকে যেমন, তেমনি সূর্যকেও সন তারিখ ঠিক করার মানদণ্ডরূপে অভিহিত করেছেন– لِتَعْلَمُوْا عَدَدَ السِّنِيْنَ وَالْحِسَابَ (যাতে তোমরা বৎসর গণনা ও কাল নির্ণয়ের জ্ঞান লাভ কর।) অতএব, চন্দ্র ও সূর্য উভয়টির মাধ্যমেই সন তারিখ নির্দিষ্ট করা জায়েজ। তবে চন্দ্রের হিসাব আল্লাহর অধিকতর পছন্দ। তাই শরিয়তের আহকামকে চন্দ্রের সাথে সংশ্লিষ্ট রেখেছেন। এজন্য চান্দ্র বছরের হিসাব সংরক্ষণ করা

ফরযে কেফায়া; সকল উম্মত এ হিসাব ভুলে গেলে সবাই গুনাহগার হবে। চাঁদের হিসাব ঠিক রেখে অন্যান্য সূত্রের হিসাব ব্যবহার করা জায়েজ আছে। তবে তা আল্লাহর রাসূল ও পরবর্তীগণের তরিকার বরখেলাফ। সুতারং অনাবশ্যকভাবে অন্য হিসাব নিয়ে মাথা ঘামানো উচিত নয়।

মাসের হিসাব পূর্ণ করার উদ্দেশ্যে মূল মাস বাড়ানোর যে প্রথা আছে, এই আয়াতের প্রেক্ষিতে কেউ কেউ তাকেও না জায়েজ মনে করেন। কিন্তু এই মত ঠিক নয়। কেননা এতে শরিয়তের বিধানের কোনো সম্পর্ক নেই। জাহেলী যুগে চান্দ্রমাস পরিবর্তনের ফলে শরিয়তের হুকুম পরিবর্তন হতো বিধায় তা থেকে নিষেধ করা হয়েছে। মুসলমানের দ্বারা যেহেতু পরিবর্তন হয় না, তাই তা উক্ত নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত নয়।

দুনিয়ার মোহ ও আখেরাতের প্রতি উদাসীনতা সকল অপরাধের মূল : অলসতার যে কারণ ও প্রতিকারের উপায় এখানে বর্ণিত হয়েছে, তা এক বিশেষ ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট হলেও চিন্তা করলে বুঝা যাবে যে, দীনের ব্যাপারে সকল আলস্য, নিষ্ক্রিয়তা ও সকল অপরাধ এবং গুনাহের মূলে রয়েছে দুনিয়াপ্রীতি ও আখেরাতের প্রতি উদাসীনতা। হাদীস শরীফে আছে– حُبُّ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطِيْئَةٍ অর্থাৎ দুনিয়ার মোহ সকল গুনাহের মূল। এজন্য আয়াতে বলা হয়– "হে ঈমানদারগণ! তোমাদের কি হলো, আল্লাহর পথে বের হওয়ার জন্য বলা হলে তোমরা মাটি জড়িয়ে ধর (চলাফেরা করতে চাও না)। আখেরাতের পরিবর্তে দুনিয়ার জীবন নিয়েই কি পরিতুষ্ট হয়ে গেলে।"

রোগ নির্ণয়ের পর পরবর্তী আয়াতে তার প্রতিকার উল্লেখ করা হয়েছে যে, "পার্থিব জিন্দেগির ভোগের উপকরণ আখেরাতের তুলনায় অতি নগণ্য।"

সারকথা হলো, আখেরাতের স্থায়ী জীবনের চিন্তাভাবনাই মানুষের করা উচিত । বস্তুত আখেরাতের চিন্তা-ফিকিরই সকল রোগের একমাত্র প্রতিকার এবং অপরাধ দমনের সার্থক উপায়।

ইসলামি আকিদার মৌলিক বিষয় তিনটি : তাওহীদ, রেসালত ও পরকালের বিশ্বাস । তন্মধ্যে পরকালের বিশ্বাস হলো বিশুদ্ধ আমলের রূহ এবং গুনাহ ও অপরাধের ক্ষেত্রে এক দুর্ভেদ্য প্রাচীর। চিন্তা করলে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, দনিয়ার শান্তি-শৃঙ্খলা আখেরাতের আকিদা ব্যতীত প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। বস্তুবাদী উন্নতির এখন যৌবনকাল। অপরাধ দমনে সকল জাতি ও দেশের চেষ্টা-তদবীরের অন্ত নেই। আইন আদালত ও অপরাধ দমনকারী সংস্থাসমূহের উন্নত ব্যবস্থাপনা সবই আছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমরা প্রত্যক্ষ করছি যে, প্রত্যেক দেশ ও জাতির মধ্যে অপরাধপ্রবণতা দৈনন্দিন বেড়েই চলছে। আমাদের দৃষ্টিতে সঠিক রোগ নির্ণয় ও তার সঠিক প্রতিকারের ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না বলেই আজকের এ অস্থিরতা। বস্তুত এ সকল রোগের মূলে রয়েছে বস্তুবাদী ধ্যান-ধারণা, পার্থিব ব্যস্ততা এবং আখেরাতের প্রতি উদাসীনতা। আমাদের বিশ্বাস, এর একমাত্র প্রতিকার হলো, আল্লাহর জিকির ও স্মরণ এবং আখেরাতের চিন্তাভাবনা। যে দেশে যখন এই অমোঘ প্রতিকার প্রয়োগ করা হয়, সে দেশ ও সমাজ মানবতার মূর্ত প্রতীক হয়ে ফেরেশতাগণেরও ঈর্ষার পাত্র হয়েছিল। নবী ও সাহাবায়ে কেরামের স্বর্ণ যুগ তার জ্বলন্ত প্রমাণ।

আজকের বিশ্ব অপরাধপ্রবণতার উচ্ছেদ চায়, কিন্তু আল্লাহ ও আখেরাত থেকে উদাসীন হয়ে পদে পদে এমন ব্যবস্থাও করে রাখছে, যার ফলে আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি মনোযোগ আসে না। তাই এর অবশ্যম্ভাবী পরিণতি আমরা প্রত্যক্ষ করছি যে, অপরাধ দমনের সকল উন্নত ব্যবস্থাপনাই ব্যর্থ হয়ে পড়ছে। অপরাধ দমন তো দূরের কথা ঝড়ের বেগে যেন তা বৃদ্ধি পাচ্ছে। হায়! আজকের চিন্তাশীল মহল যদি উপরিউক্ত কুরআনি প্রতিকার প্রয়োগ করে দেখত, তবে বুঝতে পারত, কত সহজে অপরাধ প্রবণতার উচ্ছেদ সাধন করা যায়।

৩৯. নং আয়াতে অলস ও নিষ্ক্রিয় লোকদের ব্যাধি ও তার প্রতিকারের উল্লেখ করে সর্বশেষ ফয়সালা জানিয়ে দেওয়া হয় যে, "তোমরা জিহাদে বের না হলে আল্লাহ তোমাদের মর্মন্তুদ শাস্তি দেবেন এবং তোমাদের স্থানে অন্য জাতির উত্থান ঘটাবনে। আর দীনের আমল থেকে বিরত হয়ে তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিন্দুমাত্র ক্ষতি করতে পারবে না। কেননা আল্লাহ সর্ব বিষয়ে শক্তিমান।"

৪০. নং আয়াতে রাসূলে কারীম ﷺ -এর হিজরতের ঘটনা উল্লেখ করে দেখিয়ে দেওয়া হয় যে, আল্লাহর রাসূল কোনো মানুষের সাহায্য-সহযোগিতার মোহতাজ নন। আল্লাহ প্রত্যক্ষভাবে গায়েব থেকে তাঁর সাহায্য করতে সক্ষম। যেমন, হিজরতের সময় করা হয়, যখন তাঁর আপন গোত্র ও দেশবাসী তাঁকে দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য করে। সফরসঙ্গী

www.almodina.com

হিসেবে একমাত্র সিদ্দীকে আকবর (রা.) ছাড়া আর কেউ ছিল না। পরব্রজী ও অশ্বারোহী শত্রুরা সর্বত্র তাঁর খোঁজ করে ফিরছে। অথচ আশ্রয়স্থল কোনো মজবুত দুর্গ ছিল না; বরং তা ছিল এক গিরিগুহা, যার দ্বারপ্রান্ত পর্যন্ত পৌঁছেছিল তাঁর শত্রুরা। তখন গুহাসঙ্গী হযরত আবূ বকর (রা.)-এর চিন্তা নিজের জন্য ছিল না; বরং তিনি এই ভেবে সন্ত্রস্ত হয়েছিলেন যে, হয়তো শত্রুরা তাঁর বন্ধুর জীবন নাশ করে দিবে, কিন্তু এ সময়েও রাসূলুল্লাহ ﷺ ছিলেন পাহাড়ের মতো অনড়, অটল ও নিশ্চিন্ত। শুধু যে নিজে, তা নয়, বরং সফরসঙ্গীকেও অভয় দিয়ে বলছিলেন, "চিন্তিত হয়ো না, আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন।" অদৃশ্য বাহিনী বলতে ফেরেশতাগণও হতে পারেন এবং জগতের গোপন শক্তিসমূহও হতে পারে। কারণ এগুলোও আল্লাহর সৈন্যদল। সারকথা, এর ফলে কুফরির পতাকা অবনমিত হয় এবং আল্লাহর ঝাণ্ডা মাথা তুলে দাঁড়ায়।

৪১ নং আয়াতে তাগিদ দানের উদ্দেশ্যে পুনরুল্লেখ করা হয়েছে যে, জিহাদে বের হবার জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন তোমাদের আদেশ করেন তখন সর্বাবস্থায় তা তোমাদের জন্য ফরজ হয়ে গেল। আর এ আদেশ পালনের মাঝেই নিহিত রয়েছে তোমাদের সমুদয় কল্যাণ।

শব্দবিশ্লেষণ

يُحِلُّوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ اثبات فعل مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِحْلَالُ মূলবর্ণ (ح ـ ل ـ ل) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– তারা বৈধ মনে করছে।

عَامٌ : শব্দটি একবচন; বহুবচন اَعْوَامٌ অর্থ– বছর।

يُوَاطِئُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ اثبات فعل مضارع معروف বাব مُفَاعَلَةٌ মাসদার اَلْمُوَاطَاةُ মূলবর্ণ (و ـ ط ـ ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ– যাতে তারা পূর্ণ করে নেয়।

غَارٌ : শব্দটি একবচন; বহুবচনে اَغْوَارٌ অর্থ– গর্ত, গুহা।

لَمْ تَرَوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ نفى جحد بلم در فعل مستقبل معروف বাব فَتَحَ মাসদার اَلرُّؤْيَةُ মূলবর্ণ (ر ـ أ ـ ى) জিনসে মুরাক্কাব مهموز عين ও ناقص يائى অর্থ– তোমরা দেখ না।

اَلسُّفْلٰى : সীগাহ واحد مؤنث বহছ اسم تفضيل বাব نَصَرَ মাসদার اَلسُّفُوْلُ মূলবর্ণ (س ـ ف ـ ل) জিনস صحيح অর্থ– অধিক নিচু।

عُلْيَا : সীগাহ واحد مؤنث বহছ اسم تفضيل বাব نَصَرَ মাসদার اَلْعُلُوُّ মূলবর্ণ (ع ـ ل ـ و) জিনস ناقص واوى অর্থ– অধিক উঁচু।

خِفَافًا : শব্দটি বহুবচন; একবচন خَفِيْفٌ অর্থ– হালকা।

ثِقَالًا : শব্দটি বহুবচন; একবচন ثَقِيْلٌ অর্থ– ভারী।

www.almodina.com

لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيْبًا وَّسَفَرًا قَاصِدًا لَّاتَّبَعُوْكَ وَلٰكِنْۢ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ ۚ وَسَيَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ ۚ يُهْلِكُوْنَ اَنْفُسَهُمْ ۚ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ (٤٢)

অনুবাদ : (৪২) যদি কিছু আশু লভ্য হতো এবং সফরও সহজ হতো, তবে তারা অবশ্যই আপনার সহগামী হতো, কিন্তু তাদের তো পথের দূরত্বই দীর্ঘতর বোধ হতে লাগল, আর তারা এখনই আল্লাহর নামে শপথ করে বলবে যে, যদি আমাদের সাধ্য থাকত, তবে আমরা নিশ্চয় তোমাদের সঙ্গে বের হতাম। তারা [মিথ্যা বলে] নিজেরাই নিজেদেরকে বিনষ্ট করছে। আর আল্লাহ তা'আলা জানেন যে, নিশ্চয় এরা মিথ্যাবাদী।

عَفَا اللّٰهُ عَنْكَ ۚ لِمَ اَذِنْتَ لَهُمْ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَتَعْلَمَ الْكٰذِبِيْنَ (٤٣)

(৪৩) আল্লাহ তা'আলা আপনাকে মার্জনা করলেন, [কিন্তু] আপনি তাদেরকে [এত শীঘ্রই] কেন অনুমতি দিয়েছিলেন? যে পর্যন্ত না সত্যবাদী লোকগণ আপনার নিকট প্রকাশ হয়ে পড়ত এবং আপনি মিথ্যাবাদীদেরকে জেনে নিতেন।

لَا يَسْتَاْذِنُكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ اَنْ يُّجَاهِدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ ۚ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِالْمُتَّقِيْنَ (٤٤)

(৪৪) যারা আল্লাহর প্রতি ও কিয়ামত দিবসের প্রতি ঈমান রাখে, তারা নিজেদের ধনসম্পদ ও প্রাণ দ্বারা জিহাদ করার ব্যাপারে আপনার নিকট অব্যাহতি প্রার্থনা করবে না, আর আল্লাহ তা'আলা এই পরহেজগার লোকদের সম্বন্ধে খুব অবগত আছেন।

اِنَّمَا يَسْتَاْذِنُكَ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوْبُهُمْ فَهُمْ فِيْ رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُوْنَ (٤٥)

৪৫. অবশ্য সেই সকল লোক আপনার নিকট অব্যাহতি চেয়ে থাকে, যারা আল্লাহ তা'আলার প্রতি ও কিয়ামত দিবসের প্রতি ঈমান রাখে না, আর তাদের অন্তরসমূহ সন্দেহে নিপতিত রয়েছে। অতএব, তারা নিজেদের সন্দেহে হয়রান রয়েছে।

শাব্দিক অনুবাদ

(৪২) لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيْبًا যদি কিছু আশু লভ্য হতো। وَّسَفَرًا قَاصِدًا এবং সফরও সহজ হতো لَّاتَّبَعُوْكَ তবে তারা অবশ্যই আপনার সহগামী হতো وَلٰكِنْۢ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ কিন্তু তাদের তো পথের দূরত্বই দীর্ঘতর বোধ হতে লাগল وَسَيَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ আর তারা এখনই আল্লাহর নামে শপথ করে বলবে যে لَوِ اسْتَطَعْنَا যদি আমাদের সাধ্য থাকত لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ তবে আমরা নিশ্চয় তোমাদের সঙ্গে বের হতাম يُهْلِكُوْنَ اَنْفُسَهُمْ তারা [মিথ্যা বলে] নিজেরাই নিজেদেরকে বিনষ্ট করছে وَاللّٰهُ يَعْلَمُ আর আল্লাহ তা'আলা জানেন যে اِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ নিশ্চয় এরা মিথ্যাবাদী।

(৪৩) عَفَا اللّٰهُ عَنْكَ আল্লাহ তা'আলা আপনাকে মার্জনা করলেন لِمَ اَذِنْتَ لَهُمْ [কিন্তু] আপনি তাদেরকে [এত শীঘ্রই] কেন অনুমতি দিয়েছিলেন? حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا যে পর্যন্ত না সত্যবাদী লোকগণ আপনার নিকট প্রকাশ হয়ে পড়ত وَتَعْلَمَ الْكٰذِبِيْنَ এবং আপনি মিথ্যাবাদীদেরকে জেনে নিতেন।

(৪৪) لَا يَسْتَاْذِنُكَ আপনার নিকট অব্যাহতি প্রার্থনা করবে না الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ যারা আল্লাহর প্রতি ও কিয়ামত দিবসের প্রতি ঈমান রাখে اَنْ يُّجَاهِدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ তারা নিজেদের ধনসম্পদ ও প্রাণ দ্বারা জিহাদ করার ব্যাপারে وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِالْمُتَّقِيْنَ আর আল্লাহ তা'আলা এই পরহেজগার লোকদেব সম্বন্ধে খুব অবগত আছেন।

(৪৫) اِنَّمَا يَسْتَاْذِنُكَ অবশ্য সেই সকল লোক আপনার নিকট অব্যাহতি চেয়ে থাকে الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ যারা আল্লাহ তা'আলার প্রতি ও কিয়ামত দিবসের প্রতি ঈমান রাখে না وَارْتَابَتْ قُلُوْبُهُمْ আর তাদের অন্তরসমূহ সন্দেহে নিপতিত রয়েছে فَهُمْ فِيْ رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُوْنَ অতএব, তারা নিজেদের সন্দেহে হয়রান রয়েছে।

অনুবাদ	আয়াত
অনুবাদ : ৪৬. আর যদি তারা [যুদ্ধে] যাত্রা করার ইচ্ছা করত, তবে তার কিছু সরঞ্জাম তো প্রস্তুত করত, কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাদের যাত্রাকে না-পছন্দ করেছেন, এজন্য তাদেরকে তৌফিক দেননি এবং এরূপ বলে দেওয়া হলো যে, তোমরাও এখানেই অক্ষম লোকদের সাথে বসে থাক।	وَلَوْ اَرَادُوا الْخُرُوْجَ لَاَعَدُّوْا لَهٗ عُدَّةً وَّلٰكِنْ كَرِهَ اللّٰهُ انْۢبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيْلَ اقْعُدُوْا مَعَ الْقٰعِدِيْنَ (٤٦)
৪৭. যদি এরা তোমাদের সঙ্গে বহির্গত হতো, তবে দ্বিগুণ বিভ্রাট সৃষ্টি করা ব্যতীত, আর কি হতো? আর তোমাদের মধ্যে ফ্যাসাদ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে দৌড়াদৌড়ি করে ফিরত, আর তোমাদের মধ্যে তাদের কতিপয় গুপ্তচর বিদ্যমান রয়েছে, আর আল্লাহ এই জালেমদের সম্বন্ধে খুব অবগত আছেন।	لَوْ خَرَجُوْا فِيْكُمْ مَّا زَادُوْكُمْ اِلَّا خَبَالًا وَّلَاَاوْضَعُوْا خِلٰلَكُمْ يَبْغُوْنَكُمُ الْفِتْنَةَ ۚ وَفِيْكُمْ سَمّٰعُوْنَ لَهُمْ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِالظّٰلِمِيْنَ (٤٧)

শাব্দিক অনুবাদ

(৪৬) وَلَوْ اَرَادُوا الْخُرُوْجَ আর যদি তারা [যুদ্ধে] যাত্রা করার ইচ্ছা করত لَاَعَدُّوْا لَهٗ عُدَّةً তবে তার কিছু সরঞ্জাম তো প্রস্তুত করত وَّلٰكِنْ كَرِهَ اللّٰهُ انْۢبِعَاثَهُمْ কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাদের যাত্রাকে না-পছন্দ করেছেন فَثَبَّطَهُمْ এজন্য তাদেরকে তৌফিক দেননি وَقِيْلَ এবং এরূপ বলে দেওয়া হলো যে اقْعُدُوْا مَعَ الْقٰعِدِيْنَ তোমরাও এখানেই অক্ষম লোকদের সাথে বসে থাক।

(৪৭) لَوْ خَرَجُوْا فِيْكُمْ যদি এরা তোমাদের সঙ্গে বহির্গত হতো مَّا زَادُوْكُمْ اِلَّا خَبَالًا তবে দ্বিগুণ বিভ্রাট সৃষ্টি করা ব্যতীত আর কি হতো? وَّلَاَاوْضَعُوْا خِلٰلَكُمْ يَبْغُوْنَكُمُ الْفِتْنَةَ আর তোমাদের মধ্যে ফ্যাসাদ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে দৌড়াদৌড়ি করে ফিরত وَفِيْكُمْ سَمّٰعُوْنَ لَهُمْ আর তোমাদের মধ্যে তাদের কতিপয় গুপ্তচর বিদ্যমান রয়েছে وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِالظّٰلِمِيْنَ আর আল্লাহ এ জালেমদের সম্বন্ধে খুব অবগত আছেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

৪২. قوله لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيْبًا وَّسَفَرًا قَاصِدًا الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** যে সকল মুনাফিকরা বিভিন্ন প্রকারের মিথ্যা অজুহাত দাঁড় করিয়ে তাবুক অভিযানে অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত থেকে যায় এবং মদিনায়ই অবস্থান করতে থাকে, তাদের সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। –[নূরুল কুলূব, জালালাইন-১৫৯ পৃ.]

৪৩. قوله عَفَا اللّٰهُ عَنْكَ لِمَ اَذِنْتَ لَهُمْ الخ **আয়াতের শানে নুযূল– ১ :** ইবনে আতিয়্যা বলেন, আলোচ্য আয়াত মুনাফিকদের মধ্যে সীমালঙ্ঘনকারী যারা ছিল, তাদের সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। এরা কোনো প্রকারের ওজর আপত্তি ছাড়াই যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকে। তারা ছিল আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই, জা'আদ ইবনে কাইস, রেফ'আহ ইবনে আত তাবূত এবং আরও যারা ছিল, তদের একান্ত অনুসারী। তাদের থেকে কেউ বলল যে, আমাকে থেকে যাওয়ার অনুমতি দান করুন, আমাকে কষ্টে ফেলবেন না। আবার কেউ বলল, আমাদেরকে ঘরে অবস্থান করার অনুমতি দান করুন। তখন তাদেরকে থেকে যাওয়ার জন্য রাসূল ﷺ অনুমতি দিলেন এবং আল্লাহর উপর ভরসা করে অত্যন্ত সহনশীলতার সাথে কর্মপন্থা অবলম্বন করলেন।

মুজাহিদ বলল, আমরা তাঁর নিকট অনুমতি তলব করেছি। আমাদেরকে ঘরবাড়িতে থেকে যাওয়ার জন্য অনুমতি প্রদান করুক আর না-ই করুক আমরা যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করে ঘরবাড়িতেই অবস্থান করব। এ বিভিন্ন মত ও প্রেক্ষাপটে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। –[বাহরে মুহীত-৪৮/৫]

শানে নুযূল– ২ : ইবনে জারীর আমর ইবনে মাইমূনের উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বললেন, রাসূল ﷺ এমন দুটি কাজ করেছিলেন যে সম্পর্কে রাসূল ﷺ -কে আদেশ করা হয়নি। ১. মুনাফিকদের স্বগৃহে অবস্থান করার অনুমতি ২. বন্দিদের থেকে ফিদিয়া গ্রহণ। এ পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা উক্ত আয়াত নাজিল করেন। –[প্রাগুক্ত]

قوله لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَّسَفَرًا قَاصِدًا الخ আয়াতে অলসতার দরুন জিহাদ থেকে বিরত রয়েছে এমন লোকদের একটি ওজরকে প্রত্যাখ্যান করে বলা হয় যে, এ ওজর গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ আল্লাহ যে শক্তি-সামর্থ্য তাদের দান করেছেন, তা আল্লাহর রাহে সাধ্যমতো ব্যয় করেনি। তাই তাদের অসমর্থ্য থাকার ওজর গ্রহণযোগ্য নয়।

প্রমাণযোগ্য ওজর ও জিহাদে বাহানার পার্থক্য : এ আয়াত থেকে একটি মূলনীতির সন্ধান পাওয়া যায়, যার দ্বারা প্রকৃত ওজর ও বাহানার মধ্যে পার্থক্য করা যাবে। তা হলো, সেই লোকদের ওজর প্রকৃত গ্রহণযোগ্য, যারা আদেশ পালনে প্রস্তুত, কিন্তু কোনো আকস্মিক দুর্ঘটনার ফলে পরে অসমর্থ হয়ে পড়ে। মাজুরগণের সকল বিষয় এ নিরিখে যাচাই করা যাবে, কিন্তু আদেশ পালনে যার কোনো কোনো ইচ্ছা ও প্রস্তুতি নেই, পরে তার যদি কেনো ওজরও উপস্থিত হয়, তবে গুনাহের এ ওজর হবে গুনাহের চাইতে নিকৃষ্ট। সুতরাং এ ওজর গ্রহণযোগ্য নয়। কেউ জুমার নামাজে শরিক হওয়ার প্রস্তুতি নিয়েছে। কিন্তু যেইমাত্র চলার ইচ্ছা করল, হঠাৎ এক ঘটনায় তার গতি স্তব্ধ হয়ে গেল। এ ধরনের ওজর গ্রহণযোগ্য এবং এতে আল্লাহ মাজুর লোকের পূর্ণ ছওয়াব দান করেন। কিন্তু যে জুমার কোনো প্রস্তুতিই নেয়নি, তার কোনো ওজর উপস্থিত হলে তা হবে বাহানার নামান্তর।

উদাহরণত দেখা যায়, ভোরে ফজরের জামাতে শরিক হওয়ার প্রস্তুতি স্বরূপ ঘড়িতে এলার্ম দিয়ে রাখে, কিংবা সময়মতো জাগাবার জন্য কাউকে নিয়োজিত রাখে, কিন্তু পরে দেখা যায়, ঘটনাচক্রে সকল চেষ্টাই ব্যর্থ। ফলে নামাজ কাজা হয়ে যায়। যেমন, রাসূলে কারীম ﷺ -এর লায়লাতুত তা'রীসের ঘটনা। সময় মতো জেগে উঠার জন্য তিনি হযরত বেলাল (রা.)-কে নিয়োজিত রাখেন যেন প্রত্যুষে সবাইকে জাগিয়ে দেন। কিন্তু ঘটনাচক্রে তাঁকেও তন্দ্রায় পেয়ে বসে। ফলে সূর্যোদয়ের পর সকলের চোখ খোলে। এ ওজর প্রকৃত ও গ্রহণযোগ্য। যে কারণে রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবায়ে কেরামকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন– لَا تَفْرِيْطَ فِى النَّوْمِ اِنَّمَا التَّفْرِيْطُ فِى الْيَقْظَةِ "অর্থাৎ ঘুমের মধ্যে মানুষ মাজুর, তাই এটি হলো যা মানুষ জাগ্রত অবস্থায় করে।" সান্ত্বনার কারণ হলো, সময়মতো জেগে উঠার সম্ভাব্য ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল। সারকথা এই যে, আদেশ পালনের প্রস্তুতি ও অপ্রস্তুতির মাধ্যমে কোনো ওজর গ্রহণযোগ্য কিনা তা জানা যাবে। নিছক মৌখিক জমা খরচ দিয়ে কিছু লাভ হবে না।

৪৭ নং আয়াতে মিথ্যা ওজর দেখিয়ে অব্যাহতি লাভকারী মুনাফিকদের প্রসঙ্গে বলা হয় যে, জিহাদ থেকে নিবৃত্ত থাকাই উত্তম। কারণ, ওখানে গেলে নানা ষড়যন্ত্র ও গুজবের মাধ্যমে সর্বত্র ফ্যাসাদ সৃষ্টি করত। অতঃপর বলা হয়– وَفِيْكُمْ سَمّٰعُوْنَ لَهُمْ অর্থাৎ তোমাদের মাঝে আছে এমন এক সরল প্রাণ মুসলমান যারা তাদের মিথ্যা গুজবে বিভ্রান্ত হতো।

শব্দবিশ্লেষণ

عَرَضًا : শব্দটি একবচন; বহুবচন اَعْرَاضٌ অর্থ– মালামাল।

سَفَرًا : শব্দটি একবচন; বহুবচনে اَسْفَارٌ অর্থ– ভ্রমণ।

قَاصِدٌ : সীগাহ واحد مذكر اسم فاعل বহছ نَصَرَ বাব اَلْقَصْدُ মাসদার (ق . ص . د) মূলবর্ণ صحيح জিনস অর্থ– মধ্যম গতি।

اَلشُّقَّةُ : শব্দটি একবচন; বহুবচন شُقَقٌ অর্থ– দূরত্ব।

اِرْتَابَتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ اثبات فعل ماضى معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِرْتِيَابُ মূলবর্ণ (ر . ى . ب) জিনস اجوف يائى অর্থ– এটা সন্দেহে নিপতিত।

يَتَرَدَّدُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ اثبات فعل مضارع معروف বাব تَفَعُّلٌ মাসদার اَلتَّرَدُّدُ মূলবর্ণ (ر . د . د) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– তারা হয়রান হচ্ছে।

اَعَدُّوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ اثبات فعل ماضى معروف বাব سَمِعَ মাসদার اَلْاِعْدَادُ মূলবর্ণ (ع . د . د) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– তারা প্রস্তুত করল।

عُدَّةٌ : শব্দটি একবচন; বহুবচন عُدَدٌ অর্থ– সরঞ্জাম, সামান।

لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوْا لَكَ الْاُمُوْرَ حَتّٰى جَآءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ اَمْرُ اللّٰهِ وَهُمْ كٰرِهُوْنَ (٤٨)	অনুবাদ : ৪৮. তারা তো পূর্বেও ফ্যাসাদ সৃষ্টির চেষ্টা করেছিল, আর আপনার [ক্ষতি সাধনের] জন্য কার্যসমূহের উলটপালট করতে [-ই] ছিল, এ পর্যন্ত যে, সত্য অঙ্গীকার এসে পড়ল এবং আল্লাহর হুকুম বিজয়ী রইল, অথচ তাদের অপ্রীতিকরই বোধ হচ্ছিল।
وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّقُوْلُ ائْذَنْ لِّيْ وَلَا تَفْتِنِّيْ ؕ اَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوْا ؕ وَاِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيْطَةٌۢ بِالْكٰفِرِيْنَ (٤٩)	(৪৯) আর তাদের মধ্যে কেউ কেউ এমনও আছে, যে বলে, আমাকে [যুদ্ধে গমন না করার] অনুমতি দিন এবং আমাকে বিপদে ফেলবেন না, ভালোরূপে বুঝে নাও যে, তারা তো বিপদে পড়েই গেছে, আর নিশ্চয় দোজখ এই কাফেরদেরকে বেষ্টন করবেই।
اِنْ تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ ۚ وَاِنْ تُصِبْكَ مُصِيْبَةٌ يَّقُوْلُوْا قَدْ اَخَذْنَاۤ اَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْا وَّهُمْ فَرِحُوْنَ (٥٠)	(৫০) যদি আপনার প্রতি কোনো মঙ্গল উপস্থিত হয় তবে তাদের জন্য তা চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আর যদি আপনার উপর কোনো বিপদ এসে পড়ে, তখন তারা বলে, আমরা তো প্রথম হতেই নিজেদের সাবধানতার দিক অবলম্বন করেছিলাম এবং তারা উৎফুল্ল হয়ে চলে যায়।
قُلْ لَّنْ يُّصِيْبَنَاۤ اِلَّا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَنَا ۚ هُوَ مَوْلٰنَا ۚ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ (٥١)	(৫১) আপনি বলে দিন, আমাদের উপর কোনো বিপদ আসতে পারে না, কিন্তু তাই যা আল্লাহ তা'আলা আমাদের জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন, তিনিই আমাদের মালিক, আর সকল মুমিনদেরই কর্তব্য যেন নিজেদের যাবতীয় কাজ আল্লাহ তা'আলারই প্রতি সমর্পণ করে রাখে।

শাব্দিক অনুবাদ

(৪৮) لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ তারা তো পূর্বেও ফ্যাসাদ সৃষ্টির চেষ্টা করেছিল وَقَلَّبُوْا لَكَ الْاُمُوْرَ আর আপনার [ক্ষতি সাধনের] জন্য কার্যসমূহের উলটপালট করতে [-ই] ছিল حَتّٰى جَآءَ الْحَقُّ এ পর্যন্ত যে, সত্য অঙ্গীকার এসে পড়ল وَظَهَرَ اَمْرُ اللّٰهِ এবং আল্লাহর হুকুম বিজয়ী রইল وَهُمْ كٰرِهُوْنَ অথচ তাদের অপ্রীতিকরই বোধ হচ্ছিল।

(৪৯) وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّقُوْلُ আর তাদের মধ্যে কেউ কেউ এমনও আছে যে বলে ائْذَنْ لِّيْ আমাকে [যুদ্ধে গমন না করার] অনুমতি দিন وَلَا تَفْتِنِّيْ এবং আমাকে বিপদে ফেলবেন না। اَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوْا ভালোরূপে বুঝে নাও যে, তারা তো বিপদে পড়েই গেছে وَاِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيْطَةٌۢ بِالْكٰفِرِيْنَ আর নিশ্চয় দোজখ এ কাফেরদেরকে বেষ্টন করবেই।

(৫০) اِنْ تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ যদি আপনার প্রতি কোনো মঙ্গল উপস্থিত হয় তবে তাদের জন্য তা চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়ায় وَاِنْ تُصِبْكَ مُصِيْبَةٌ আর যদি আপনার উপর কোনো বিপদ এসে পড়ে। يَّقُوْلُوْا তখন তারা বলে قَدْ اَخَذْنَاۤ اَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ আমরা তো প্রথম হতেই নিজেদের সাবধানতার দিক অবলম্বন করেছিলাম وَيَتَوَلَّوْا وَّهُمْ فَرِحُوْنَ এবং তারা উৎফুল্ল হয়ে চলে যায়।

(৫১) قُلْ আপনি বলে দিন لَّنْ يُّصِيْبَنَاۤ আমাদের উপর কোনা বিপদ আসতে পারে না اِلَّا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَنَا কিন্তু তা-ই যা আল্লাহ তা'আলা আমাদের জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন هُوَ مَوْلٰنَا তিনিই আমাদের মালিক وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ আর সকল মুমিনদেরই কর্তব্য যেন নিজেদের যাবতীয় কাজ আল্লাহ তা'আলারই প্রতি সমর্পণ করে রাখে।

www.almodina.com

قُلْ هَلْ تَرَبَّصُوْنَ بِنَآ اِلَّآ اِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ ؕ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ اَنْ يُّصِيْبَكُمُ اللّٰهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهٖٓ اَوْ بِاَيْدِيْنَا ؗ فَتَرَبَّصُوْٓا اِنَّا مَعَكُمْ مُّتَرَبِّصُوْنَ (٥٢)

অনুবাদ : (৫২) আপনি বলে দিন যে, তোমরা তো আমাদের জন্য দুটি মঙ্গলের মধ্যে একটি মঙ্গলেরই প্রতীক্ষায় রয়েছ, আর আমরা তোমাদের জন্য এ প্রতীক্ষা করছি যে, আল্লাহ তোমাদের উপর কোনো আজাব সংঘটন করবেন নিজের পক্ষ হতে অথবা আমাদের দ্বারা, অতএব, তোমরা অপেক্ষা করতে থাক, আমরা তোমাদের সঙ্গে অপেক্ষায় রইলাম।

قُلْ اَنْفِقُوْا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا لَّنْ يُّتَقَبَّلَ مِنْكُمْ ؕ اِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فٰسِقِيْنَ (٥٣)

(৫৩) আপনি বলে দিন যে, তোমরা সন্তুষ্টির সাথে ব্যয় কর কিংবা অসন্তুষ্টির সাথে, তোমাদের পক্ষ হতে এটা কখনোই গৃহীত হবে না, নিঃসন্দেহে তোমরা হচ্ছ আদেশ লঙ্ঘনকারী সমাজ।

وَمَا مَنَعَهُمْ اَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقٰتُهُمْ اِلَّآ اَنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ وَبِرَسُوْلِهٖ وَلَا يَاْتُوْنَ الصَّلٰوةَ اِلَّا وَهُمْ كُسَالٰى وَلَا يُنْفِقُوْنَ اِلَّا وَهُمْ كٰرِهُوْنَ (٥٤)

(৫৪) আর তাদের দান-খয়রাত গ্রহণ করাতে তা ব্যতীত আর কিছুই প্রতিবন্ধক নয় যে, তারা আল্লাহর সাথে ও তাঁর রাসূলের সাথে কুফর করেছে, আর তারা নামাজ পড়ে না কিন্তু শৈথিল্যের সাথে, আর তারা দান করে না কিন্তু অনিচ্ছার সাথে।

শাব্দিক অনুবাদ

(৫২) قُلْ আপনি বলে দিন যে هَلْ تَرَبَّصُوْنَ بِنَآ اِلَّآ اِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ তোমরা তো আমাদের জন্য দুটি মঙ্গলের মধ্যে একটি মঙ্গলেরই প্রতীক্ষায় রয়েছি وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ আর আমরা তোমাদের জন্য এ প্রতীক্ষা করছি যে اَنْ يُّصِيْبَكُمُ اللّٰهُ بِعَذَابٍ আল্লাহ তোমাদের উপর কোনো আজাব সংঘটন করবেন مِّنْ عِنْدِهٖ নিজের পক্ষ হতে اَوْ بِاَيْدِيْنَا অথবা আমাদের দ্বারা فَتَرَبَّصُوْٓا অতএব, তোমরা অপেক্ষা করতে থাক اِنَّا مَعَكُمْ مُّتَرَبِّصُوْنَ আমরা তোমাদের সঙ্গে অপেক্ষায় রইলাম।

(৫৩) قُلْ আপনি বলে দিন যে اَنْفِقُوْا طَوْعًا তোমরা সন্তুষ্টির সাথে ব্যয় কর اَوْ كَرْهًا কিংবা অসন্তুষ্টির সাথে لَّنْ يُّتَقَبَّلَ مِنْكُمْ তোমাদের পক্ষ হতে এটা কখনোই গৃহীত হবে না اِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فٰسِقِيْنَ নিঃসন্দেহে তোমরা হচ্ছ আদেশ লঙ্ঘনকারী সমাজ।

(৫৪) وَمَا مَنَعَهُمْ اَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقٰتُهُمْ আর তাদের দান-খয়রাত গ্রহণ করাতে তা ব্যতীত আর কিছুই প্রতিবন্ধক নয় যে اِلَّآ اَنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ وَبِرَسُوْلِهٖ তারা আল্লাহর সাথে ও তাঁর রাসূলের সাথে কুফর করেছে وَلَا يَاْتُوْنَ الصَّلٰوةَ আর তারা নামাজ পড়ে না اِلَّا وَهُمْ كُسَالٰى কিন্তু শৈথিল্যের সাথে وَلَا يُنْفِقُوْنَ اِلَّا وَهُمْ كٰرِهُوْنَ আর তারা দান করে না কিন্তু অনিচ্ছার সাথে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

৪৮. قوله لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوْا لَكَ الْاُمُوْرَ الخ আয়াতের শানে নুযূল : ইবনে ইসহাক ও ইবনুল মুনযির হাসান বসরীর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই, আব্দুল্লাহ ইবনে নাবতাল ও রিফাআহ ইবনে যায়েদ ইবনে তাবীত প্রমুখ মুনাফিক দলপতি ছিল। ওরা সর্বদাই ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেই আসত। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[দুররে মানসূর-২৪৭/৩]

(৪৯) قوله وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائْذَنْ لِي وَلَا تَفْتِنِّي الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** ইবনুল মুনযির , তাবারানী, ইবনে মারদুভিয়া ও আবূ নাঈম মা'রিফাত গ্রন্থে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, তখন জুদ ইবনে কায়সকে বললেন যে, হে জুদ ইবনে কায়স! বনী আসফার অভিযানে অংশগ্রহণ করতে তোমার মতামত কি? জুদ বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমি তো একজন মহিলা আকৃষ্ট লোক। আর আমার ধারণা ওরা আমাকে বিভ্রান্তিতায় ফেলে দিবে। সুতরাং আমাকে ফিতনায় নিপতিত না করে গৃহে অবস্থান করার জন্য অনুমতি দান করুন। তখন সে প্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[দুররে মানসূর-২৪৭/৩, ফাতহুল কাদীর-৩৬৮/২, বাহরে মুহীত-৩৫২/৫, কুরতুবী ১৪৬/৮, রূহুল মা'আনী-১১৩/৫, ইবনে কাছীর-৩৬৯/২]

(৫০) قوله إِنْ تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** ইবনে আবী হাতেম হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, সকল মুনাফিক মদিনায় অবস্থান করছিল, তারা রাসূল ﷺ সম্পর্কে উদ্ভট মিথ্যা খবরাখবর প্রচার করত। তারা বলত, মুহাম্মদ ও তাঁর সাথিরা সফরে অনেক কষ্ট ভোগ করে ধ্বংস হয়েছে। অতঃপর তাদের মিথ্যা প্রচারণা সম্পর্কে এবং রাসূল ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ নিরাপদে থাকা সম্পর্কীয় সঠিক সংবাদও যখন মদিনাবাসীদের নিকট পৌছে, তখন তারা মুনাফিকদের প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করে। এ পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[ফাতহুল কাদীর-৩৭০/২, দুররে মানসূর-২৪৮/৩, রূহুল মা'আনী-১১৪/৫]

৫৩. قوله قُلْ أَنْفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَنْ يُتَقَبَّلَ مِنْكُمْ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** ইবনে জারীর ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন যে, জুদ ইবনে কায়স বলল, আমি যখন কোনো মহিলাকে দেখতে পাই, তখন আমি নিজেকে নিজে সামলাতে পারি না। ফলে আমি ফিতনায় পড়ে যাব। অবশ্য মাল দ্বারা আামি আপনাকে সাহায্য করতে পারি। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, সে সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। –[ফাতহুল কাদীর-৩৭০/২, রূহুল মা'আনী-১১৫/৫; বাহরে মুহীত-৫৪/৫, দুররে মানসূর-২৪৯/২]

قوله لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ অর্থাৎ "ইতঃপূর্বেও তারা ফ্যাসাদ সৃষ্টির প্রয়াস পেয়েছিল।" যেমন ওহুদ যুদ্ধ প্রভৃতিতে।

قوله وَظَهَرَ أَمْرُ اللهِ وَهُمْ كَرِهُونَ "আল্লাহর বিজয় হলো, যাতে মুনাফিকরা মর্মপীড়া বোধ করছিল।" এর দ্বারা ইঙ্গিত দেওয়া হয় যে, জয়-বিজয় সবই আল্লাহর আয়ত্তে। যেমন ইতঃপূর্বের যুদ্ধসমূহে আপনাকে জয়ী করা হয়েছে, তেমনি এ যুদ্ধেও জয়ী হবেন এবং মুনাফিকদের সমস্ত ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়ে পড়বে।

৪৮ নং আয়াতে জুদ ইবনে কায়স নামক জনৈক বিশিষ্ট মুনাফিকের এক বিশেষ বাহানার উল্লেখ করে তার গোমরাহির বর্ণনা দেওয়া হয়। সে জিহাদ থেকে অব্যাহতি লাভের জন্য ওজর পেশ করে বলেছিল, আমি এক পৌরুষদীপ্ত যুবক। রোমানদের সাথে যুদ্ধে করতে গিয়ে তাদের সুন্দরী যুবতীদের নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। কুরআন মাজীদ তার কথার উত্তরে বলে : أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا "ভালো করে মান' এই নির্বোধ এক সম্ভাব্য আশঙ্কার বাহানা করে এ নিশ্চিত আশঙ্কা অর্থাৎ রাসূলের অবাধ্যতা ও জিহাদ পরিত্যাগের অপরাধের এখনই দণ্ডযোগ্য হয়ে গেল। وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَفِرِينَ "আর নিঃসন্দেহে জাহান্নাম এই কাফেরদের পরিবেষ্টন করে আছে।" তা থেকে নিস্তার লাভের উপায় নেই। আরেক অর্থ এই হতে পারে যে, আখেরাতে জাহান্নাম এদের ঘিরে রাখবে। দ্বিতীয় অর্থ এই হতে পারে যে, জাহান্নামে পৌছার যে সকল কারণ এদেরকে বর্তমান ঘিরে রেখেছে, সেগুলোই এখানে জাহান্নাম নামে অভিহিত। এ অর্থ হয়তো বলা যায়, এরা বর্তমানেও জাহান্নামের গণ্ডির মধ্যে রয়েছে।

৪৯ নং আয়াতে এদের এক হীন স্বভাবের বর্ণনা দিয়ে বলা হয় যে, এরা যদিও বাহ্যত মুসলমানদের সাথে উঠাবসা রাখে, কিন্তু إِنْ تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ "আপনার কোনো মঙ্গল দেখলে তাদের মুখ কালো হয়ে যায়।" إِنْ تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ فَرِحُوا এবং কোনো বিপদ উপস্থিত হলে উল্লাস করে বলে যে, আমরা আগেভাগেই তা জানতাম যে, মুসলমানরা বিপদগ্রস্ত হবেই, তাই আমাদের জান্য যা কল্যাণকর, তাই অবলম্বন করেছি।

৫০ নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মহানবী ﷺ ও মুসলমানদেরকে মুনাফিকদের কথায় বিভ্রান্ত না হয়ে আসল সত্যকে সদা সামনে রাখার হেদায়েত দান করেছেন। ইরশাদ হয়েছে– قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللهُ لَنَا هُوَ مَوْلَنَا "আপনি এ বস্তুপূজারীদের বলে দিন যে, তোমরা ধোঁকায় পড়ে আছ। এসব পার্থিব উপকরণ হলো এক যবনিকাবিশেষ। এই যবনিকার অন্তরালে যে শক্তি সক্রিয় রয়েছে, তা আল্লাহরই। আমরা যে সকল অবস্থার সম্মুখীন হই তা আগেই আল্লাহ

আমাদের জন্য নির্ধারিত করে রেখেছেন। তিনিই আমাদের কার্যনির্বাহক ও সাহায্যকারী। তাই মুসলমানদের আবশ্যক তাঁর প্রতি ভালোবাসা রাখা এবং পার্থিব উপায় উপকরণকে নিছক মাধ্যম মনে করা, আর মনে করা যে, এগুলোর উপর ভালো-মন্দ নির্ভরশীল নয়।"

তদবীর সহাকারে তকদীরে বিশ্বাস করা কর্তব্য : বিনা তদবীরে তাওয়াক্কুল করা ভুল : আলোচ্য আয়াতটি তকদীর ও তাওয়াক্কুলের মূল তত্ত্বকে স্পষ্ট করে দিয়েছে। তকদীর ও তাওয়াক্কুল (আল্লাহর প্রতি ভরসা) এর প্রতি বিশ্বাসের অর্থ এই নয় যে, মানুষ হাত পা গুটিয়ে বসে থাকবে এবং বলবে যে, ভাগ্যে যা আছে তাই হবে; এবং তার অর্থ হলো সম্ভাব্য সকল উপায় অবলম্বনের পর সাধ্যমতো চেষ্টা ও সাহস করে যাবে। এরপর বিষয়টিকে তকদীর ও তাওয়াক্কুলের উপর অর্পণ করবে, আর দৃষ্টি আল্লাহর প্রতি নিবদ্ধ রাখবে। কারণ চেষ্টা ও তদবীরের ফলাফল দানের মালিক হলেন তিনি।
তকদীর ও তাওয়াক্কুলের বিষয়টি নিয়ে যথেষ্ট বাড়াবাড়ি বিদ্যমান। ধর্ম পার্থিব উপায়-উপকরণকেই আল্লাহর স্থলাভিষিক্ত করে রেখেছে। অপর দিকে কিছু মূর্খ লোক আছে, যারা নিজেদের দুর্বলতা ও অকর্মণ্যতা চাপা দেওয়ার জন্য তকদীর ও তাওয়াক্কুলের আশ্রয় নেয়। জিহাদের জন্য নবী করীম ﷺ -এর প্রস্তুতি, অতঃপর অত্র আয়াতের অবতরণ এ সকল বাড়াবাড়ির নিরসন করে সত্য পথ কি তা দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে। ফারসি প্রবাদ আছে, بر توکل زانوے اشتر بہ بند অর্থাৎ 'তাওয়াক্কুলের মাধ্যমে উটের পা বেঁধে নাও।' অর্থাৎ দুনিয়ার উপায়-উপকরণও আল্লাহর নিয়ামত, এ নিয়ামতের সদ্ব্যবহার না করা হলো নাশোকরী ও মূর্খতা। তবে উপায়-উপকরণকে ঠিক তাই মনে কর, ফলাফল তার অধীনে নয়; বরং আল্লাহর হুকুমের অধীন, সে বিশ্বাস রাখবে।
শেষের আয়াতে মুমিনদের এক বিরল শানের উল্লেখ করে তাদের বিপদে আনন্দ উপভোগকারী কাফেরদের বলা হয় যে, আমাদের যে বিপদ দেখে তোমরা এত উৎফুল্ল, তাকে আমরা বিপদই মনে করি না; বরং তা আমাদের জন্য শান্তি ও সফলতার অন্যতম মাধ্যম। কারণ মুমিন আপন চেষ্টায় বিফল হলেও স্থায়ী ছওয়াব ও প্রতিদান লাভের যোগ্য হয় আর এটিই সকল সফলতার মূলকথা। তাই তারা অকৃতকার্য হলেও কৃতকার্য। তার ভাঙ্গনে রয়েছে গড়ার প্রতিশ্রুতি এই হলো : هَلْ تَرَبَّصُوْنَ بِنَآ اِلَّآ اِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ 'তোমরা কি আমাদের দুটি মঙ্গলের একটির প্রতীক্ষায় আছ?'
অপরদিকে কাফেরদের অবস্থা হলো তার বিপরীত। আজাব থেকে কোনো অবস্থায়ই তাদের অব্যাহতি নেই। এ জীবনেই তারা মুসলমানদের মাধ্যমে আল্লাহর আজাব ভোগ করবে এবং এভাবে তারা দুনিয়া ও আখেরাতে লাঞ্ছনা পোহাবে। আর যদি এ দুনিয়ায় কোনো প্রকারে নিষ্কৃতি পেয়েও যায়, তবে আখেরাতের আজাব থেকে রেহাই পাওয়ার কোনো উপায় নেই; তা অবশ্যই ভোগ করবে।

শব্দবিশ্লেষণ

اِبْتَغُوْا : جمع مذكر غائب বহছ اثبات فعل ماضى معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِبْتِغَاءُ মূলবর্ণ (ب ـ غ ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– তারা চায়, তারা তালাশ করে।

لَاتَفْتِنِّىْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ نهى حاضر معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْفُتُوْنُ মূলবর্ণ (ف ـ ت ـ ن) জিনস صحيح অর্থ– তুমি আমাকে ফিতনায় নিক্ষেপ করো না।

مَوْلٰى : শব্দটি একবচন; বহুবচন مَوَالِىْ অর্থ– মালিক, অভিভাবক।

كُسَالٰى : শব্দটি বহুবচন, একবচন كَسْلَانُ অর্থ– অলস।

تَزْهَقُ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ اثبات فعل مضارع معروف বাব فَتَحَ মাসদার الزهوق মূলবর্ণ (ز ـ ه ـ ق) জিনস صحيح অর্থ– তা বের হয়ে যাবে।

فَلَا تُعْجِبْكَ اَمْوَالُهُمْ وَلَآ اَوْلَادُهُمْ ؕ اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ اَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كٰفِرُوْنَ (٥٥)

অনুবাদ : (৫৫) অতএব, তাদের ধনসম্পদ এবং সন্তানাদি যেন আপনাকে বিস্মিত না করে, আল্লাহর অভিপ্রায় কেবল এটাই যে, এ সকল বস্তুর কারণে তাদেরকে পার্থিব জীবনে আজাবে আবদ্ধ রাখেন এবং তাদের প্রাণ কুফরেরই অবস্থায় বের হয়।

وَيَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ اِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ ؕ وَمَا هُمْ مِّنْكُمْ وَلٰكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَّفْرَقُوْنَ (٥٦)

(৫৬) আর তারা আল্লাহ তা'আলার শপথ করে বলে যে, তারা [অর্থাৎ মুনাফিকরা] তোমাদেরই অন্তর্ভুক্ত, অথচ তারা তোমাদের কেউই নয়; বরং তারা হচ্ছে কাপুরুষের দল।

لَوْ يَجِدُوْنَ مَلْجَاً اَوْ مَغٰرٰتٍ اَوْ مُدَّخَلًا لَّوَلَّوْا اِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُوْنَ (٥٧)

(৫৭) যদি এরা কোনো আশ্রয়স্থল পেত, অথবা গুহা কিংবা লুকিয়ে থাকার একটু স্থান, তবে তারা অবশ্য মুখ উঠিয়ে সেই দিকে ধাবিত হতো।

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّلْمِزُكَ فِى الصَّدَقٰتِ ۚ فَاِنْ اُعْطُوْا مِنْهَا رَضُوْا وَاِنْ لَّمْ يُعْطَوْا مِنْهَآ اِذَا هُمْ يَسْخَطُوْنَ (٥٨)

(৫৮) আর তাদের মধ্যে এমন কতক লোক রয়েছে, যারা সদকার [বণ্টন] ব্যাপারে আপনার প্রতি দোষারোপ করে, অতঃপর যদি তারা সেই সমস্ত সদকা হতে [অংশ] প্রাপ্ত হয়, তবে তারা সন্তুষ্ট হয়, আর যদি তারা সেই সদকা হতে [অংশ] না পায়, তবে তারা অসন্তুষ্ট হয়ে যায়।

وَلَوْ اَنَّهُمْ رَضُوْا مَآ اٰتٰىهُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ ۙ وَقَالُوْا حَسْبُنَا اللّٰهُ سَيُؤْتِيْنَا اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ وَرَسُوْلُهٗۤ ۙ اِنَّآ اِلَى اللّٰهِ رٰغِبُوْنَ (٥٩)

(৫৯) আর তাদের জন্য উত্তম হতো যদি তারা তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকত, যা কিছু তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল দান করেছেন, আর এরূপ বলত যে, আমাদের পক্ষে আল্লাহ তা'আলাই যথেষ্ট, ভবিষ্যতে আল্লাহ তা'আলা নিজ অনুগ্রহে আমাদেরকে আরো দান করবেন এবং তাঁর রাসূলও, আমরা আল্লাহরই প্রতি আগ্রহান্বিত রইলাম।

ع ٧ ١٢

শাব্দিক অনুবাদ

(৫৫) فَلَا تُعْجِبْكَ অতএব, আপনাকে যেন বিস্মিত না করে اَمْوَالُهُمْ وَلَآ اَوْلَادُهُمْ তাদের ধনসম্পদ এবং সন্তানাদি اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ আল্লাহর অভিপ্রায় কেবল এটাই যে لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا এ সকল বস্তুর কারণে তাদেরকে আজাবে আবদ্ধ রাখেন فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا পার্থিব জীবনে وَتَزْهَقَ اَنْفُسُهُمْ এবং তাদের প্রাণ বের হয় وَهُمْ كٰفِرُوْنَ কুফরেরই অবস্থায়।

(৫৬) وَيَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ আর তারা আল্লাহ তা'আলার শপথ করে বলে যে اِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ তারা [অর্থাৎ মুনাফিকরা] তোমাদেরই অন্তর্ভুক্ত وَمَا هُمْ مِّنْكُمْ অথচ তারা তোমাদের কেউই নয় وَلٰكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَّفْرَقُوْنَ বরং তারা হচ্ছে কাপুরুষের দল।

(৫৭) لَوْ يَجِدُوْنَ مَلْجَاً যদি এরা কোনো আশ্রয়স্থল পেত اَوْ مَغٰرٰتٍ অথবা গুহা اَوْ مُدَّخَلًا কিংবা লুকিয়ে থাকার একটু স্থান لَّوَلَّوْا اِلَيْهِ তবে তারা অবশ্য সেই দিকে ধাবিত হতো وَهُمْ يَجْمَحُوْنَ মুখ উঠিয়ে।

(৫৮) وَمِنْهُمْ আর তাদের মধ্যে এমন কতক লোক রয়েছে مَّنْ يَّلْمِزُكَ যারা আপনার প্রতি দোষারোপ করে فِى الصَّدَقٰتِ সদকার [বণ্টন] ব্যাপারে فَاِنْ اُعْطُوْا مِنْهَا অতঃপর যদি তারা সেই সমস্ত সদকা হতে [অংশ] প্রাপ্ত হয় رَضُوْا তবে তারা সন্তুষ্ট হয় وَاِنْ لَّمْ يُعْطَوْا مِنْهَآ আর যদি তারা সেই সদকা হতে [অংশ] না পায় اِذَا هُمْ يَسْخَطُوْنَ তবে তারা অসন্তুষ্ট হয়ে যায়।

(৫৯) وَلَوْ اَنَّهُمْ رَضُوْا আর তাদের জন্য উত্তম হতো যদি তারা তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকত مَآ اٰتٰىهُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ যা কিছু তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল দান করেছেন। وَقَالُوْا আর এরূপ বলত যে حَسْبُنَا اللّٰهُ আমাদের পক্ষে আল্লাহ তা'আলাই যথেষ্ট سَيُؤْتِيْنَا اللّٰهُ ভবিষ্যতে আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে আরো দান করবেন مِنْ فَضْلِهٖ নিজ অনুগ্রহে وَرَسُوْلُهٗ এবং তাঁর রাসূলও اِنَّآ اِلَى اللّٰهِ رٰغِبُوْنَ আমরা আল্লাহরই প্রতি আগ্রহান্বিত রইলাম।

www.almodina.com

إِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْعٰمِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغٰرِمِيْنَ وَفِىْ سَبِيْلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ۚ فَرِيْضَةً مِّنَ اللهِ ۚ وَاللهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ (٦٠)

অনুবাদ : ৬০. [ফরজ] সদকাগুলো তো হক হচ্ছে, কেবল গরিবদের এবং অভাবগ্রস্তদের, আর এই সদকা [আদায়ে]-র উপর নিযুক্ত কর্মচারীদের এবং যাদের মন রক্ষা করতে [অভিপ্রায়] হয় [তাদের], আর গোলামদের আজাদ করার কার্যে এবং করজদারদের কর্জে [অর্থাৎ কর্জ পরিশোধে], আর জিহাদে [অর্থাৎ যুদ্ধ সরঞ্জাম সংগ্রহের জন্য] আর মুসাফিরদের সাহায্যে এই হুকুম আল্লাহর পক্ষ হতে নির্ধারিত, আর আল্লাহ তা'আলা মহাজ্ঞানী, অতি প্রজ্ঞাময়।

وَمِنْهُمُ الَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ النَّبِىَّ وَيَقُوْلُوْنَ هُوَ اُذُنٌ ۚ قُلْ اُذُنُ خَيْرٍ لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ ۚ وَالَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ رَسُوْلَ اللهِ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ (٦١)

৬১. আর তাদের মধ্যে এমন কতিপয় লোক আছে, যারা নবীকে যাতনা দেয় এবং বলে যে, তিনি প্রত্যেক কথায় কর্ণপাত করে থাকেন, আপনি বলে দিন যে, এই নবী তো কর্ণপাত করে থাকেন সেই কথাতেই যা তোমাদের জন্য কল্যাণকর, তিনি আল্লাহর [কথাগুলো ওহী মারফত জ্ঞাত হয়ে তৎ] প্রতি ঈমান আনয়ন করেন, আর মুমিনদের [কথাকে] বিশ্বাস করেন, আর তিনি সেই সকল লোকের প্রতি অনুগ্রহ করেন যারা তোমাদের মধ্যে ঈমান আনয়ন করে, আর যারা রাসূলুল্লাহকে যাতনা দেয়, তাদের জন্য যন্ত্রণাময় শাস্তি রয়েছে।

শাব্দিক অনুবাদ

(৬০) اِنَّمَا الصَّدَقٰتُ [ফরজ] সদকাগুলো তো হক হচ্ছে لِلْفُقَرَآءِ কেবল গরিবদের وَالْمَسٰكِيْنِ এবং অভাবগ্রস্তদের وَالْعٰمِلِيْنَ عَلَيْهَا আর এই সদকা [আদায়ে]-র উপর নিযুক্ত কর্মচারীদের وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ এবং যাদের মন রক্ষা করতে [অভিপ্রায়] হয় [তাদের] وَفِى الرِّقَابِ আর গোলামদের আজাদ করার কার্যে وَالْغٰرِمِيْنَ এবং করজদারদের কর্জে [অর্থাৎ কর্জ পরিশোধে] وَفِىْ سَبِيْلِ اللهِ আর জিহাদে [অর্থাৎ যুদ্ধসরঞ্জাম সংগ্রহের জন্য] وَابْنِ السَّبِيْلِ আর মুসাফিরদের সাহায্যে فَرِيْضَةً مِّنَ اللهِ এই হুকুম আল্লাহর পক্ষ হতে নির্ধারিত وَاللهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ আর আল্লাহ তা'আলা মহাজ্ঞানী অতি প্রজ্ঞাময়।

(৬১) وَمِنْهُمُ আর তাদের মধ্যে এমন কতিপয় লোক আছে الَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ النَّبِىَّ যারা নবীকে যাতনা দেয় وَيَقُوْلُوْنَ এবং বলে যে هُوَ اُذُنٌ তিনি প্রত্যেক কথায় কর্ণপাত করে থাকেন قُلْ আপনি বলে দিন যে اُذُنُ خَيْرٍ لَّكُمْ এই নবী তো কর্ণপাত করে থাকেন সেই কথাতেই যা তোমাদের জন্য কল্যাণকর يُؤْمِنُ بِاللهِ তিনি আল্লাহর [কথাগুলো ওহী মারফত জ্ঞাত হয়ে তৎ] প্রতি ঈমান আনয়ন করেন وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ আর মুমিনদের [কথাকে] বিশ্বাস করেন وَرَحْمَةٌ আর তিনি সেই সকল লোকের প্রতি অনুগ্রহ করেন لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ যারা তোমাদের মধ্যে ঈমান আনয়ন করে وَالَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ رَسُوْلَ اللهِ আর যারা রাসূলুল্লাহকে যাতনা দেয় لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ তাদের জন্য যন্ত্রণাময় শাস্তি রয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

৫৭. قوله لَوْ يَجِدُوْنَ مَلْجَاً اَوْ مَغٰرٰتٍ اَوْ مُدَّخَلًا الخ **আয়াতের শানে নুযূল– ১ :** হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূল ﷺ মাল বণ্টন করছিলেন। এ মুহূর্তে খারেজী দলপতি হুরকূস ইবনে যুহাইর খুয়াইসিরা তামিমী নামে পরিচিত। সে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! ইনসাফের প্রতি দৃষ্টি রাখবেন। রাসূল ﷺ বললেন, হতভাগা! আমি যদি ইনসাফের প্রতিষ্ঠা না করি, তাহলে আর এমন কে আছে, যে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করবে। এ পরিপ্রেক্ষিতে উল্লিখিত আয়াত নাজিল হয়েছে। –[কুরতুবী-১৫১/৮, ফাতহুল কাদীর-৩৭৩/২]

শানে নুযূল– ২ : ইবনে মারদুভিয়া হযরত ইবনে মাসউদ (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ হুনাইন হতে গনিমত সূত্রে অর্জিত সম্পদ যখন বন্টন করছিলেন, তখন এক ব্যক্তিকে বলতে শুনেছি যে, আল্লাহ তা'আলা এ ধরনের বন্টনের প্রতি সন্তুষ্ট নন। এ মুহূর্তে আমি নবী করীম ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে সে সম্পর্কে আলোচনা করলাম। সুতরাং তিনি বললেন, "হযরত মূসা (আ.)-এর প্রতি আল্লাহ তা'আলার রহমত বর্ষিত হোক। তাঁকে এর চেয়েও অধিক কঠোরভাবে কষ্ট দেওয়া হয়েছে। কাজেই ধৈর্যধারণ করার প্রয়োজন। সে পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত আয়াত নাজিল হয়েছে। –[রূহুল মা'আনী-১১৯/৫]

শানে নযূল– ৩ : ইবনে জরীর প্রমুখ দাউদ ইবনে আবূ আসেম এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ-এর নিকট সদকার সম্পদ উপস্থিত করা হলে বিভিন্ন জায়গায় বন্টন করছিলেন। সে সময় তাঁর পিছনেই আনসারী এক লোক ছিল। তখন সে বলল তা ন্যায়সঙ্গত হচ্ছে না। সে পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে।

শানে নুযূল– ৪ : কালবী হতে বর্ণিত যে, উল্লিখিত আয়াত আবুল জাওয়াব নামক মুনাফিক সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। সে বলছিল যে, তোমরা তোমাদের নবীকে কী দেখছ না? তিনি তোমাদের অর্জিত সদকাসমূহকে রাখালদের মাঝে বন্টন করে দিচ্ছেন। আর ধারণা করছেন যে, এ বন্টন ন্যায়সঙ্গতভাবেই হচ্ছে। এ নরাধমের এহেন ন্যাক্কারজনক উপহাসের পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত আয়াত নাজিল করা হয়েছে। –[রূহুল মা'আনী-১৯৯-২০০/৫]

৬০. قوله إِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْعٰمِلِيْنَ عَلَيْهَا الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** ইবনে আবী হাতেম ও ইবনে মারদুভিয়া হযরত জাবের (রা.) -এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ-এর নিকট এক বেদুইন এসে দেখল, রাসূল ﷺ গনিমতের সম্পদ বন্টন করছেন। ফলে সে রাসূল ﷺ-কে বলল যে, আপনি কি এ রাখালদের মাঝে এ মাল বন্টন করছেন? আপনি তা ঠিক করেননি। রাসূল ﷺ বললেন, হতভাগা আমি যদি সুষ্ঠু বন্টন না করি, তাহলে ন্যায়সঙ্গত বন্টন করে দিবে কে? তখন সে পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[দুররে মানছূর-২৫০/৩]

৬১. قوله وَمِنْهُمُ الَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ النَّبِيَّ وَيَقُوْلُوْنَ هُوَ اُذُنٌ الخ **আয়াতের শানে নুযূল– ১ :** ইবনে ইসহাক, ইবনুল মুনযির ও ইবনে আবী হাতেম হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) -এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, নবতাল ইবনে হারেছ রাসূল ﷺ-এর নিকট এসে বসে বসে আলোচনা শোনত। অতঃপর মুনাফিকদের পর্যন্ত হাদীস পৌছাত। সে তাদেরকে বলত যে, মুহাম্মদ ﷺ তাঁর কানবিশিষ্ট যেই তাঁর নিকট কিছু বলে, তা বিশ্বাস করেন। সে পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা উক্ত আয়াত নাজিল করেন।

শানে নুযূল– ২ : ইবনে আবী হাতেম সুদ্দীর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, মুনাফিকদের থেকে খাল্লাছ ইবনে সোওয়াইদ ইবনে সামেত, মুখাশী ইবনে হুমাইর ও ওদীয়াহ ইবনে ছাবেত একত্রিত হয়। অতঃপর রাসূল ﷺ-এর খেদমতে উপস্থিত হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করল। তখন একে অপরকে নিষেধ করে বলল যে, আমাদের ভয় হয় যে, তোমাদের সম্পর্কে মুহাম্মদের নিকট খবরাখবর পৌছে যাবে। সুতরাং অন্যরা বলল, মুহাম্মদ সব কিছুই শুনে থাকেন। আমরা তাঁর নিকট কসম খেয়ে ওজর জানাব, তখন আমাদেরকে বিশ্বাস করবেন। তা ছিল বিদ্রূপাত্মকভাবেই, সে পরিপ্রেক্ষিতে উল্লিখিত আয়াত নাজিল হয়েছে। –[ফাতহুল কাদীর-৩৭৭/২]

শানে নুযূল– ৩ : ইবনে আবী হাতেম সুদ্দীর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, আলোচ্য আয়াত খাল্লাস ইবনে সোওয়াইদ ইবনে সামেত, রেফা'আহ ইবনে আব্দুল মুনযির ও ওদী'আহ ইবনে ছাবেত এক জামাত মুনাফিক সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। তারা বলল, মুহাম্মদ ﷺ সম্পর্কে আমাদের জন্য কিছুই বলা যুক্তিসঙ্গত হবে না। অতঃপর তাদের থেকেই একজন বলল, তোমরা কেউই সমালোচনা করবে না। কারণ আমাদের ভয় হয় যে, তোমরা যা কিছু বলবে, তা হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর নিকট পৌছিয়ে দেওয়া হয়। সে মুহূর্তে খাল্লাস বলল যে, আমাদের যা ইচ্ছা তাই আমরা বলব। পরবর্তীতে আমরা তার নিকট যাব তিনি আমাদেরকে বিশ্বাসও করবেন। কারণ তিনি সকল মানুষের কথাই শুনেন। সে পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে।

শানে নুযূল– ৪ : মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক হতে বর্ণিত যে, নাবতাল ইবনে হারিছ নামক এক মুনাফিক সম্পর্কে উক্ত আয়াত নাজিল হয়েছে। সে লোকটি ছিল লাল চক্ষু, বিকৃত চেহারা ও কুৎসিত আকৃতিবিশিষ্ট। সে রাসূল ﷺ-এর বাণীসমূহ মুনাফিকদের নিকট নিয়ে পৌছাত। তখন তাকে বলে দেওয়া হলো যে, তুমি এমন করো না। উত্তরে সে নরাধম বলেছিল

www.almodina.com

যে, মুহাম্মদ ﷺ তো কান কথা শুনেন, যে কেউই তার নিকট কিছু বললে, তার কথা তিনি বিশ্বাস করেন। আমরা যাই কিছু বলি না কেন, পরবর্তীতে তার নিকট আমরা গিয়ে শপথ করে বললে তিনি আমাদেরকে বিশ্বাস করবেন। কারণ তিনি সকল মানুষের কথাই শুনেন। সে পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত আয়াত নাজিল হয়েছে। রাসূল ﷺ সে নরাধম সম্পর্কে বলেছিলেন যে, مَنْ اَرَادَ اَنْ يَنْظُرَ اِلَى الشَّيْطَانِ فَلْيَنْظُرْ اِلَى نَبْتَلِ بْنِ الْحَارِثِ –[রুহুল মা'আনী-১২৫/৫, দুররে মানছূর-২৫৩/৩, বাহরে মুহীত-৬৪/৫]

قوله اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا (আল্লাহর ইচ্ছা হলো, এগুলোর দ্বারা তাদের আজাবে রাখা) বাক্যে মুনাফিকদের জন্য তাদের ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততিকে যে আজাব বলে অভিহিত করা হয়েছে, তার কারণ হলো, দুনিয়ার মোহে উন্মত্ত থাকা মানুষের জন্য পার্থিব জীবনও এক বড় আজাব। প্রথমে অর্থ উপার্জনের সুতীব্র কামনা। অতঃপর তা হাসিলের জন্য নানা চেষ্টা-তদবির, নিরন্তর দৈহিক ও মানসিক পরিশ্রম, না দিনের আরাম, না রাতের ঘুম, না স্বাস্থ্যের হেফাজত আর না পরিবার পরিজনের সাথে আমোদ-আহ্লাদের অবকাশ। অতঃপর হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম দ্বারা যা কিছু অর্জিত হয়, তার রক্ষণাবেক্ষণ ও তাকে দ্বিগুণ-চতুর্গুণ বৃদ্ধি করার অবিশ্রান্ত চিন্তাভাবনা প্রভৃতি হলো একেকটি স্বতন্ত্র আজাব। এরপর যদি কোনো দুর্ঘটনা ঘটে বা রোগ-ব্যাধির কবলে পতিত হয়, তখন যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়ে। সৌভাগ্যক্রমে সবই যদি ঠিক থাকে এবং মনের চাহিদামতো অর্থকড়ি আসতে থাকে, তখন তার নিরাপত্তার প্রয়োজনও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায় এবং তখন সে চিন্তা-ফিকির তাকে মুহূর্তের জন্যও আরামে বসতে দেয় না।

পরিশেষে এ সকল অর্থসম্পদ যখন মৃত্যুকালে বা তার আগে হাতছাড়া হাতে দেখে, তখন দুঃখ ও অনুশোচনার অন্ত থাকে না বস্তুত এসবই হলো আজাব। অজ্ঞ মানুষ একে শান্তি ও আরামের সম্বল মনে করে। কিন্তু মনের প্রকৃত শান্তি ও তৃপ্তি কিসে, তার সন্ধান নেয় না। তই শান্তির এই উপকরণকেই প্রকৃত শান্তি মনে করে তা নিয়েই দিবানিশি ব্যস্ত থাকে। অথচ প্রকৃতপক্ষে তা দুনিয়ার জীবনে তার আরামের শত্রু এবং আখেরাতের আজাবের পটভূমি।

কাফেরদের সদকা দেওয়া যায় কি? ৫৮ নং আয়াত থেকে প্রতীয়মান হয় যে, মুনাফিকরাও সদকার অংশ পেত। কিন্তু তাদের মনমতো না পাওয়ায় ক্ষুব্ধ হয়ে নানা আপত্তি উত্থাপন করত। এখানে যদি সদকার সাধারণ অর্থ নেওয়া যায়, যে অর্থ অনুযায়ী সকল ওয়াজিব ও নফল সদকা দান ইমামগণের ঐকমত্যে জায়েজ এবং তা হাদীস দ্বারাও প্রমাণিত। আর যদি সদকা বলতে ফরজ সদকা যথা, জাকাত ও ওশর প্রভৃতি বুঝানো হয়, তবে তো থেকে মুনাফিকদেরকেও এজন্য দেওয়া হতো যে, তারা নিজেদেরকে মুসলমানরূপেই প্রকাশ করত এবং কুফরির কোনো প্রকাশ্য প্রমাণও তাদের থেকে পাওয়া যায়নি। আল্লাহ বিশেষ কোনো উদ্দেশ্যে আদেশ দান করেন যে তাদের সাথে মুসলমানদের অনুরূপ আচরণ করা হোক।

–[বয়ানুল কুরআন]

وَلَا يَأْتُوْنَ الصَّلٰوةَ اِلَّا وَهُمْ كُسَالٰى "তারা নামাজে আসে না, কিন্তু আলস্যভরে" আয়াতে মুনাফিকদের দুটি আলামত বর্ণিত হয়েছে। নামাজে আলস্য ও দান-খয়রাতের কুণ্ঠাবোধ। এতে মুসলমানদের প্রতি হুঁশিয়ারি প্রদান করা হয়েছে, যেন তারা মুনাফিকদের এই দুপ্রকার অভ্যাস থেকে দূরে থাকে।

সদকার ব্যয় খাত : উপরিউক্ত আয়াতসমূহে সদকা সম্পর্কে মহানবী ﷺ-এর উপর মুনাফিকদের আপত্তির বর্ণনা ও তার জবাব দেওয়া হয়েছে। মুনাফিকরা অপবাদ রটাত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ (নাউযুবিল্লাহ) সদকা বন্টনে স্বজনপ্রীতির আশ্রয় নিয়েছেন এবং যাকে যা ইচ্ছা দিয়ে চলেছেন।

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা সদকার ব্যয় খাত ঠিক করে দিয়ে তাদের সন্দেহ নিরসন করেছেন এবং কারা সদকা পাওয়ার উপযুক্ত তা বাতলে দিয়েছেন আর দেখিয়ে দিয়েছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহর হুকুম মতেই সদকা বিলি বন্টন করেছেন, নিজের খেয়ালখুশি মতো নয়।

হাদীসগ্রন্থ আবূ দাউদ ও দারাকুতনী গ্রন্থে বর্ণিত এবং হযরত যিয়াদ ইবনে হারেস ছুদরী কর্তৃক রেওয়ায়েতকৃত এক হাদীস দ্বারাও এ সত্যটি প্রমাণিত হয়। রেওয়ায়েতকারী বলেন, আমি একদা রাসূলে কারীম ﷺ-এর খেদমতে হাজির হয়ে জানতে পারলাম যে, তিনি তাঁর গোত্রের সাথে যুদ্ধ করার জন্য সৈন্যের একটি দল অচিরে প্রেরণ করবেন। আমি আরজ করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি বিরত হোন, আমি দায়িত্ব নিচ্ছি যে, তারা সবাই আপনার বশ্যতা স্বীকার করে এখানে হাজির হবে। অতঃপর আমি স্বগোত্রের কাছে পত্র প্রেরণ করি। পত্র পেয়ে তারা সবাই ইসলাম গ্রহণ করে। এর প্রেক্ষিতে

www.almodina.com

রাসূল ﷺ আমাকে বলেন, يَا أَخَا صُدَاءِ الْمُطَاعَ فِيْ قَوْمِهِ অর্থাৎ 'তুমি তোমার গোত্রে একান্ত প্রিয় নেতা।' আমি আরজ করলাম, এতে আমার কর্তৃত্বের কিছুই নেই। আল্লাহর অনুগ্রহে তারা হেদায়েত লাভ করে মুসলমান হয়েছে। রেওয়ায়েতকারী বলেন, আমি এই বৈঠকে থাকাবস্থায়ই এক ব্যক্তি এসে রাসূল ﷺ-এর কাছে কিছু সাহায্য প্রার্থনা করল। রাসূল ﷺ তাকে জবাব দিলেন, 'সদকার ভাগ-বাটোয়ারার দায়িত্ব আল্লাহ নবী বা অন্য কাউকে দেননি; বরং তিনি নিজেই সদকার আটটি খাত নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। এ আট শ্রেণির কোনো একটিতে তুমি শামিল থাকলে দিতে পারি।

–[কুরতুবী১৬৮/১]

قوله وَفِيْ أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوْمِ : অর্থাৎ ধনীদের সম্পদে রয়েছে ফকির বঞ্চিতদের অধিকার।–[সূরা যারিয়াত] এতে বলা হয়েছে যে, ধনীদের সম্পদে গরিবদের একটি নির্দিষ্ট অংশ রয়েছে। আর এ হলো তাদের হক।

এ থেকে বুঝা যায় যে, ধনীরা যে খয়রাত করে, তা তদের এহসান নয়; বরং এটি গরিবদের হক, যা আদায় করা তাদের কর্তব্য। দ্বিতীয়ত এ হক আল্লাহ নিজেই নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। কেউ নিজের খেয়াল কুশি মতো তাতে কম বেশি করতে পারবে না। আল্লাহ নির্দিষ্ট হকের পরিমাণ এবং তা ব্যাখ্যা করার দায়িত্ব রাসূলের উপর সোপর্দ করেছেন। তিনিও এ কাজটিকে এত গুরুত্ব দিয়েছেন যে, তা সাহাবায়ে কেরামকে মৌখিক বলেই যথেষ্ট মনে করেননি এবং এ বিষয়ের বিস্তারিত ব্যাখ্যা সম্বলিত ফরমান লিখে হযরত ওমর ফারূক (রা.) ও আমর ইবনে হাযম (রা.)-কে সোপর্দ করেছেন। এতে পরিষ্কার প্রমাণিত হয় যে, জাকাতের নেসাব এবং প্রত্যেক নেসাবে জাকাতের যে হার তা চির দিনের জন্য আল্লাহ তাঁর রাসূলের মাধ্যমে নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। এতে কোনো যুগে বা কোনো দেশে কমবেশি বা রদবদল করার অধিকার কারো নেই।

নির্ভরযোগ্য তথ্যমতে মক্কায় ইসলামের প্রাথমিক অবস্থায় জাকাত ফরজ হওয়ার আদেশ নাজিল হয়। তাফসীরে ইবনে কাছীরে সূরা মুযযাম্মিলের আয়াত فَأَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ (সুতরাং নামাজ কায়েম কর ও জাকাত আদায় কর।) দ্বারা তাই প্রমাণ করা হয়। কারণ, সূরাটি ইসলামের প্রাথমিক অবস্থায় নাজিল হয়েছে। তবে বিভিন্ন হাদীস থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ইসলামের শুরুতে জাকাতের বিশেষ নেসাব বিশেষ হার নির্ধারণ করা হয়নি; বরং প্রয়োজনের অতিরিক্ত যা থাকত, তা মুসলমানগণ মুক্ত হস্তে আল্লাহর রাহে দান করে দিতেন। হিজরতের পরে মদিনা শরীফে জাকাতের নেসাব ও হার নির্ধারণ করা হয় এবং মক্কা বিজয়ের পর সদকা ও জাকাত আদায়ের সুষ্ঠু নিয়ম নীতি প্রবর্তন করা হয়।

সাহাবা ও তাবেয়ীগণের ঐকমত্যে অত্র আয়াতে সেই ওয়াজিব সদকার খাতগুলোর বর্ণনা দেওয়া হয়েছে যা মুসলমানদের জন্য নামাজের মতোই ফরজ। কারণ এ আয়াতে নির্ধারিত খাতগুলো ফরজ সদকারই খাত। হাদীসমতে নফল সদকা আট খাতের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; রবং এর পরিসর আরও প্রশস্ত।

যদিও পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে সাধারণ অর্থেই সদকা শব্দের ব্যবহার করা হয়েছে। যার মধ্যে ওয়াজিব ও নফল উভয় সদকাই শামিল রয়েছে, তবে অত্র আয়াতে ইমামগণের ঐকমত্যে কেবল ফরজ সদকার খাতসমূহের উল্লেখ রয়েছে। তাফসীরে কুরতুবীতে উল্লেখ আছে যে, কুরআনে যেসব স্থানে 'সদকা' শব্দের ব্যবহার রয়েছে, সেখানে নফল সদকার কোনো নিদর্শন না থাকলে ফরজ সদকাই উদ্দেশ্য হবে।

إِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَآءِ الخ আয়াতের শুরুতে إِنَّمَا (কেবল) শব্দ আনা হয়। তাই শুরু থেকেই বুঝা যাচ্ছে যে, সদকার যে সকল খাতের বর্ণনা সামনে দেওয়া হচ্ছে কেবল সে খাতগুলোতেই সকল ওয়াজিব সদকা ব্যয় করা হবে। এছাড়া অন্য কোনো ভালো খাতেও ওয়াজিব সদকা ব্যয় করা যাবে না। যেমন, জিহাদের প্রস্তুতি, মসজিদ ও মাদরাসা নির্মাণ কিংবা জনকল্যাণমূলক সংস্থা প্রভৃতি। এগুলোও যে ভালো এবং আবশ্যকীয় এবং তাতে ব্যয় করা যে বড় ছওয়াবের কাজ তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু যে সকল সদকায় হার নির্দিষ্ট, তা এ সকল কাজে ব্যয় করা যাবে না।

আয়াতের দ্বিতীয় শব্দ 'সাদাকাত' হলো সদকার বহুবচন। আরবি অভিধানে আল্লাহর ওয়াস্তে সম্পদের সে অংশ ব্যয় করা হয়, তাকে সদকা বলা হয়। –(কামূস) ইমাম রাগব (র.) 'মুফরাদাতুল কুরআন' গ্রন্থে বলেন, দানকে সদকা বলা হয় এজন্য যে, দানকারী প্রকারান্তরে দাবি করে যে, কথা ও কাজে সে সত্যবাদী এবং কোনো পার্থিব স্বার্থে নয়; বরং আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যেই তার এই দান-খয়রাত। বস্তুত যে দানের সাথে দুনিয়ার স্বার্থ বা রিয়াকারী যুক্ত থাকে, কুরআন সে দানকে ব্যর্থ বলে গণ্য করেছে।

www.almodina.com

সদকা শব্দটি ব্যাপক অর্থবোধক। নফল ও ফরজ উভয় দানই এতে শামিল রয়েছে। নফলের জন্য শব্দটির প্রচুর ব্যবহার, তেমনি ফরজ সদকার ক্ষেত্রেও কুরআনের বহু স্থানে শব্দটির ব্যবহার দেখা যায়। যেমন خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً এবং আলোচ্য اِنَّمَا الصَّدَقٰتُ আয়াত প্রভৃতি; বরং আল্লামা কুরতুবী (র.)-এর তত্ত্ব মতে কুরআনে যেখানে শুধু সদকা শব্দের ব্যবহার রয়েছে, সেখানে ফরজ সদকা উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। আবার কতিপয় হাদীসে সদকা বলতে প্রত্যেক সৎকর্মকেও বুঝানো হয়েছে। যেমন হাদীস শরীফে আছে, 'কোনো মুসলমানের সাথে হৃষ্টচিত্তে সাক্ষাৎ করাও সদকা, কোনো বোঝা বহনকারীর কাঁধে ভার তুলে দেওয়াও সদকা, কূপ থেকে নিজের জন্য উত্তোলিত পানির কিছু অংশ অন্যকে দান করাও সদকা।' এ হাদীসে সদকা শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে।

আলোচ্য আয়াতের তৃতীয় শব্দ হলো لِلْفُقَرَاءِ -এর শুরুতে لِ (লাম) বর্ণটি উদ্দেশ্য নির্ধারণের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। তাই বাক্যের অর্থ হবে, সকল সদকা সেই লোকদেরই হক, যাদের উল্লেখ পরে রয়েছে।

আটটি খাতের বিবরণ : প্রথম ও দ্বিতীয় খাত হলো যথাক্রমে ফকির ও মিসকিনের। আসল অর্থে যদিও পার্থক্য রয়েছে। যথা, ফকির হলো যার কিছুই নেই এবং মিসিকন হলো যে নেসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক নয়। তবে জাকাতের হুকুমে সমান। মোটকথা, যার কাছে প্রয়োজনের অতিরিক্ত নেসাব পরিমাণ অর্থ নেই, তাকে জাকাত দেওয়া যাবে এবং সেও নিতে পারবে। প্রয়োজনীয় মালামালের মধ্যে থাকার ঘর, ব্যবহৃত বাসন পেয়ালা, পোশাক পরিচ্ছেদ ও আসবাবপত্র প্রভৃতি শামিল রয়েছে।

সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণ কিংবা সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপা বা তার মূল্য যার কাছে রয়েছে এবং সে ঋণগ্রস্ত নয়, সেই নেসাবের মালিক। তাকে জাকাত দেওয়া ও তার পক্ষে জাকাত নেওয়া জায়েজ নয়। অনুরূপ, যার কাছে কিছু রূপা বা নগদ কিছু টাকা এবং কিছু স্বর্ণ আছে সব মিলিয়ে যদি সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপার সমতুল্য হয়, তবে সেও নেসাবের মালিক। তাকেও জাকাত দেওয়া নেওয়া জায়েজ নয়। তবে এ হিসেবে যে নেসাবরে মালিক নয়, কিন্তু স্বাস্থ্যবান উপার্জনক্ষম এবং একদিনের খাবার সংস্থানও যার রয়েছে, তাকে জাকাত দেওয়া অবশ্য জায়েজ, কিন্তু ভিক্ষাবৃত্তি তার জন্য জায়েজ নয়। এ ধরনের লোকের পক্ষে মানুষের কাছে হাত পাতা হারাম। এ ব্যাপারে অনেকের অসাবধানতা রয়েছে। এ ধরনের লোকেরা হাত পেতে যা লাভ করে, তাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ জাহান্নামের অঙ্গার বলে অভিহিত করেছেন। –[আবূ দাউদ (র.) হতে কুরতুবী]

অবশ্য সাধারণ সদকা অমুসলিমদেরকেও দেওয়া যায়। হাদীস শরীফে আছে– تَصَدَّقُوْا عَلٰى اَهْلِ الْاَدْيَانِ كُلِّهَا অর্থাৎ 'যে কোনো ধর্মের লোককে দান কর।' কিন্তু রাসূলে কারীম ﷺ হযরত মু'আয (রা.)-কে ইয়েমেন প্রেরণ কালে জাকাত সম্পর্কে হেদায়েত দিয়েছিলেন, যে জাকাতের অর্থ শুধু মুসলিম ধনীদের থেকে নেওয়া হবে এবং মুসলিম গরিবদেরকে দেওয়া হবে। তাই জাকাতের অর্থ শুধু মুসলমান ফকির মিসকিনদের মধ্যে বণ্টন করতে হবে। জাকাত ব্যতীত অন্যান্য সদকা-খয়রাত এমনকি সদকায়ে ফিতরাও অমুসলিমদের দেওয়া জায়েজ। –[হেদায়া]

দ্বিতীয় শর্ত নেসাবের মালিক না হওয়া। আর তা ফকির বা মিসকিন শব্দের অর্থেই প্রকাশ পায়। কেননা তার নিকট হয় কিছুই থাকবে না, অথবা নেসাবের পরিমাণ থেকে কম থাকবে। সুতরাং ফকির ও মিসকিনের মধ্যে নেসাব পরিমাণ মালের মালিক না হওয়ার ব্যাপারে কোনো পার্থক্য নেই। যা হোক, এই খাতের পর আরো ছয়টি খাতের বর্ণনা রয়েছে যার প্রথমটি হলো 'আমেলীনে সদকা" অর্থাৎ আদায়কারী। এরা ইসলামি সরকারের পক্ষ থেকে লোকদের কাছ থেকে জাকাত ও ওশর প্রভৃতি আদায় করে বায়তুল মালে জমা দেওয়ার কাজে নিয়োজিত থাকে। এরা যেহেতু এ কাজে নিজেদের সময় ব্যয় করে, সেহেতু তাদের জীবিকা নির্বাহের দায়িত্ব ইসলামি সরকারের উপর বর্তায়। কুরআন মাজীদের উপরিউক্ত আয়াত জাকাতের একাংশ তাদের জন্য রেখে একথা পরিষ্কার করে দিয়েছে যে, তাদের পারিশ্রমিক জাকাতের খাত থেকেই আদায় করা হবে। এর মূল রহস্য হলো এই যে, আল্লাহ পাক মুসলমানদের থেকে জাকাত ও অপরাপর সদকা আদায়ের দায়িত্ব দিয়েছেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে। অত্র সূরার শেষের দিকে এক আয়াতে বলা হয়েছে– خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً "হে রাসূল! আপনি তাদের মালামাল থেকে সদকা আদায় করুন।" উক্ত আয়াত মতে রাসূলের অবর্তমানে তাঁর উত্তরাধিকারী খলিফা বা আমীরুল মু'মিনীনের উপর জাকাত ও সদকা আদায়ের দায়িত্ব বর্তায়। বলাবহুল্য, সহকারী ব্যতীত আমীরের পক্ষে এ দায়িত্ব সম্পাদন করা সম্ভব নয়। আলোচ্য আয়াতে "আমেলীন" বলতে জাকাত আদায়কারী তথা সেসব সহকারীদের কথাই বলা হয়েছে।

www.almodina.com

এ আয়াত মতে নবী করীম ﷺ অনেক সাহাবীকে বিভিন্ন স্থানে জাকাত আদায়ের জন্য প্রেরণ করেছিলেন এবং আদায়কৃত জাকাত থেকেই তাদের পারিশ্রমিক দিতেন। এ সকল সাহাবীর অনেকে ধনীও ছিলেন। হাদীস শরীফে আছে, ধনীদের জন্য সদকার অর্থ হালাল নয়, তবে পাঁচ ব্যক্তির জন্য হালাল। প্রথমত যে জিহাদের উদ্দেশ্যে বের হয়েছে, কিন্তু সেখানে প্রয়োজনীয় অর্থ তার নেই, যদিও সে স্বদেশে ধনী। দ্বিতীয়ত সদকা আদায়ের দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তি। তৃতীয়ত সেই অর্থশালী ব্যক্তি, যার মওজুদ অর্থের তুলনায় ঋণ অধিক। চতুর্থত যে ব্যক্তি মূল্য আদায় করে গরিব-মিসকিন থেকে সদকার মালামাল ক্রয় করে। পঞ্চমত যাকে গরিব লোকেরা সদকার প্রাপ্ত মাল হাদিয়াস্বরূপ প্রদান করে।

সদকা আদায়কারীদের কি পরিমাণ পারিশ্রমিক দেওয়া হবে সে প্রশ্ন আসা স্বাভাবিক। এ ব্যাপারে হুকুম হলো, তাদের কাজ ও পরিশ্রম অনুসারে পারিশ্রমিক দেওয়া হবে। –[আহকামুল কুরআন : জাসসাস, কুরতুবী] তবে তাদের পারিশ্রমিক আদায়কৃত জাকাতের অর্ধাংশের বেশি দেওয়া যাবে না। জাকাতের আদায়কৃত অর্থ যদি এত অল্প হয় যে, আদায়কারীদের বেতন দিয়ে তার অর্ধেকও বাকি থাকে না, তবে বেতনের হার হ্রাস করতে হবে। অর্ধেকের বেশি বেতন খাতে ব্যয় করা যাবে না। –[তাফসীরে মাযহারী, যহীরিয়া]

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বুঝা গেল যে, জাকাত তাহবীল থেকে আদায়কারীদের যে বেতন দেওয়া হয়, তা সদকা হিসেবে নয়, বরং পরিশ্রমের বিনিময় হিসেবেই দেওয়া হয়। তাই তারা ধনী হলেও এ অর্থের উপযুক্ত এবং জাকাত থেকে তাদের দেওয়া জায়েজ। আট প্রকারের ব্যয় খাতের মধ্যে এই একটি খাতই এমন যে, সেখানে স্বয়ং জাকাতের অর্থ পারিশ্রমিকরূপে দেওয়া যায়। অথচ, জাকাত সে দানকেই বলা হয়, যা কোনো বিনিময় ছাড়াই গরিবদের প্রদান করা হয়। সুতরাং কোনো গরিবকে কাজের বিনিময়ে জাকাতের অর্থ দিলে জাকাত আদায় হবে না।

এখানে দুটি প্রশ্ন উঠতে পারে। প্রথমত জাকাত আদায়কারীদেরকে কাজের বিনিময়ে কিরূপে জাকাতের অর্থ দেওয়া যাবে? দ্বিতীয়ত ধনীর জন্য জাকাতের অর্থ কিভাবে হালাল হবে? উত্তর একটিই। তা হলো এই যে, সদকা আদায়কারীদের আসল পরিচয় জেনে নিতে হবে। তারা আসলে গরিবদেরই উকিলস্বরূপ। বলাবাহুল্য, উকিল কিছু গ্রহণ করলে তা মক্কেলের গ্রহণ বলেই গণ্য হয়। কেউ যদি অন্য লোককে কারো কাছ থেকে কর্জ আদায়ের জন্য উকিল নিযুক্ত করে, তবে কর্জের টাকা উকিলের হাতে অর্পণ করলেও যেমন কর্জদার দায়িত্ব মুক্ত হয়, তেমনি গরিবদের উকিল হিসেবে আদায়কারীর মাধ্যমে সদকা আদায় করলেও ধনীদের জাকাত আদায় হয়ে যাবে। অতঃপর উকিল হিসেবে সদকার যে অর্থ তারা সংগ্রহ করবে, গরিবরাই তার মালিক হবে। এরপর জাকাতের অর্থ থেকে আদায়কারীর যে বেতন দেওয়া হয় তা আসলে গরিবদের পক্ষ থেকেই, ধনীদের পক্ষ থেকে নয়। গরিবরা জাকাতের অর্থ যে কোনো প্রয়োজনে ব্যয় করতে পারে। সুতারাং জাকাতের অর্থ দ্বারা তাদের উকিলদের পারিশ্রমিক দেওয়ার অধিকারও তাদের থাকবে।

অতঃপর প্রশ্ন আসে যে, জাকাত আদায়কারীদেরকে তো গরিবরা উকিল নিযুক্ত করেনি, তরা কেমন করে উকিল সেজে বসল? জবাব হলো যে, ইসলামি রাষ্ট্রের আমীর স্বাভাবিকভাবেই আল্লাহর পক্ষ থেকে সে সমুদয় দায়িত্ব তাঁর। তিনি জাকাত আদায়ের জন্য যাদের নিযুক্ত করেন, তারা তাঁদের প্রতিনিধি হিসাবে গরিবদেরও উকিল সাব্যস্ত হয়।

এ থেকে বুঝা যায় যে, সদকা আদায়কারীদের বেতন হিসেবে যা দেওয়া হয় তা মূলত জাকাতের টাকা নয়; বরং জাকাত যে গরিবদের হক, সে গরিবদের পক্ষ থেকেই তার কাজের বিনিময় মাত্র।

বিশেষ জ্ঞাতব্য : এখানে উল্লেখযোগ্য যে, বর্তমান যুগে ইসলামি মাদরাসা এবং সে জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর পরিচালক বা তাদের প্রতিনিধিগণ সদকা ও জাকাত যে ধনীদের থেকে আদায় করেন, তারা উপরিউক্ত হুকুমের অন্তর্ভুক্ত নন। তাই জাকাত সদকা থেকে তাদের বেতন ভাতা আদায় করা যাবে না; বরং ভিন্ন খাত থেকে তার ব্যবস্থা করতে হবে। কারণ তারা ধনীদের উকিল, গরিবদের নয়। ধনীদের পক্ষ থেকেই জাকাতের টাকা উপযুক্ত খাতে ব্যয় করার অধিকার তাদের দেওয়া হয়। সুতরাং জাকাতের টাকা তাদের হস্তগত হওয়ার পর সঠিক স্থানে ব্যয় না করা পর্যন্ত দাতাদের জাকাতও আদায় হবে না।

তারা যে গরিবদের উকিল নয়, তা সুস্পষ্ট কারণ কোনো গরিব তাদের উকিল নিযুক্ত করেননি এবং আমীরুল মুমিনীনের প্রতিনিধিত্বও তারা করেন না। তাই তাদের পক্ষে ধনীদের উকিল হওয়া ব্যতীত আর কোনো পথ খোলা নেই। সুতরাং জাকাত খাতে ব্যয় হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত জাকাতের টাকা তাদের হাতে থাকা ও মালিকের হাতে থাকার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই।

www.almodina.com

এ ব্যাপারে সাধারণত সাবধানতা অবলম্বন করা হয় না। বহু প্রতিষ্ঠন জাকাতের বিস্তর টাকা সংগ্রহ করে বছরের পর বছর সিন্ধুকে তালাবদ্ধ করে রাখে। আর জাকাতদাতারা মনে করে যে, জাকাত আদায় হয়ে গেল। অথচ তাদের জাকাত আদায় হবে তখনই, যখন তা জাকাতের নির্ধারিত যে কোনো একটি খাতে ব্যয়িত হবে।

অনুরূপ অনেকে বর্তমান যুগের জাকাত আদায়কারীদেরকে আমীরুল মুমিনীনের প্রতিনিধিবর্গের সাথে তুলনা করে জাকাতের অর্থ থেকে তাদের বেতন পরিশোধ করে। একান্তভাবেই এটা অজ্ঞতাপ্রসূত। দাতা ও গ্রহীতা কারো পক্ষেই তা জায়েজ নয়।

ইবাদতের পারিশ্রমিক গ্রহণ : এখানে আরও একটি প্রশ্ন আসে। কুরআনের ইশারা ইঙ্গিত এবং হাদীসের স্পষ্ট উক্তি দ্বারা প্রমাণিত রয়েছে যে, কোনো ইবাদতের বিনিময় ও মজুরি নেওয়া হারাম। মুসনাদে আহমদে বর্ণিত এ হাদীসে ইরশাদ হয়েছে– اِقْرَؤُا الْقُرْاٰنَ وَلَا تَاْكُلُوْا بِهِ অর্থাৎ "কুরআন পাঠ কর, কিন্তু কুরআনকে জীবিকা নির্বাহের মাধ্যমে পরিণত করো না।" অপর হাদীসে কুরআন দ্বারা উপার্জিত বস্তুকে জাহান্নামের অংশ বলা হয়েছে। এসব হাদীসের প্রেক্ষিতে ফিকহ শাস্ত্রবিদগণ একমত যে, ইবাদত বন্দেগীর পারিশ্রমিক নেওয়া জায়েজ নয়। সুতরাং নিঃসন্দেহে সদকা খয়রাত আদায় করাও ইবাদত ও দীনের একটি সেবা। রাসূলে কারীম ﷺ একে একপ্রকারের জিহাদ বলে অভিহিত করেছেন। তাই এ ইবাদতের মজুরি গ্রহণ করাও হারাম হওয়া সঙ্গত। অথচ কুরআনের আলোচ্য আয়াতটি তা স্পষ্টরূপে জায়েজ করে দিয়েছে এবং জাকাতের আট খাতের মধ্যে একেও শামিল করেছে।

ইমাম কুরতুবী (রা.) তাঁর তাফসীরে বলেন, যে ইবাদত ফরজে আইন বা ওয়াজিবে আইন, তার পারিশ্রমিক নেওয়া সর্বাবস্থায় হারাম। কিন্তু যে ইবাদত ফরজে কেফায়াহ হলো, যা সকল উম্মত বা শহরের সকল বাসিন্দার জন্য ফরজ, কিন্তু সকলের আদায় করা জরুরি নয়, কিছু লোক আদায় করলেই সবাই দায়িত্ব মুক্ত হয়। কিন্তু কেউ আদায় না করলে সবাই গুনাহগার হয়।

ইমাম কুরতুবী (র.) বলেন, "এ আয়াত মতে ইমামতি ও ওয়াজ-নসিহতের পারিশ্রমিক নেওয়া জায়েজ রয়েছে। কারণ এগুলো ওয়াজিবে আইন নয়; বরং ওয়াজিবে কেফায়াহ।" অনুরূপ কুরআন হাদীস ও অপরাপর দীনি ইলমের তা'লীম ও প্রচার সকল উম্মতের জন্যই ফরজে কেফায়াহ। কতিপয় লোক দায়িত্ব পালন করলে সকলেই দায়িত্ব মুক্ত হয়ে যায়। তাই এর সকল ইবাদতের বিনিময় নেওয়া জায়েজ।

জাকাতের চতুর্থ ব্যয় খাত হলো 'মুআল্লাফাতুলকুলূব'। সাধারণত তারা তিন চার শ্রেণির বলে উল্লেখ করা হয়। এদের কিছু মুসলমান, কিছু অমুসলমান। মুসলমানদের মধ্যে কেউ ছিল চরম অভাবগ্রস্ত এবং নওমুসলিম, এদের চিত্তাকর্ষণের ব্যবস্থা এজন্য নেওয়া হয়, যেন তাদের ইসলামি বিশ্বাস পরিপক্ক হয়। আর কেউ চির ধনী, কিন্তু তাদের অন্তর তখনো ইসলামে রঞ্জিত হয়নি। আর কেউ কেউ ছিল পরিপক্ক মুসলমান, কিন্তু তার গোত্রকে এর দ্বারা হেদায়েতের পথে আনা উদ্দেশ্য ছিল। অমুসলমনাদের মধ্যেও এমন অনেক রয়েছে যাদের শত্রুতা থেকে বাঁচার জন্য তাদের পরিতুষ্ট রাখার প্রয়োজন ছিল। আর কেউ ছিল, যার ওয়াজ নসিহত কিংবা যুদ্ধ ও শক্তি প্রয়োগ দ্বারাও ইসলামে প্রভাবিত হচ্ছে না; বরং অভিজ্ঞতার আলোকে দেখা যাচ্ছে যে, তারা দয়া, দান ও সদ্ব্যবহারে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে। রাসূলে কারীম ﷺ-এর সমগ্র জীবনের ব্রত ছিল কুফরির অন্ধকার থেকে আল্লাহর বান্দাদের ঈমানের আলোয় নিয়ে আসা। তাই এ ধরনের লোকদের প্রভাবিত করার জন্য যে কোনা বৈধ পন্থা অবলম্বন করতেন। এরা সবই মুআল্লাফতুল কুলূবের অন্তর্ভুক্ত এবং আলোচ্য আয়াতে এদেরকে সদকার চতুর্থ ব্যয় খাত রূপে অভিহিত করা হয়েছে।

ইতঃপূর্বে বলা হয়েছে যে, এদের চিত্তাকর্ষণের জন্য সদকার অংশ দেওয়া হতো। সাধারণ ধারণা মতে মুসলিম অমুসলিম উভয় শ্রেণিই এতে রয়েছে। অমুসলিমদের চিত্তাকর্ষণ করা হয় ইসলামের প্রতি উৎসাহিত করার জন্য, আর নওমুসলিমদের পরিতুষ্ট করা হয় ইসলামের উপর অবিচল থাকার জন্য। জনশ্রুতি রয়েছে যে, নবী যুগে উল্লিখিত বিশেষ কারণে এদের সদকা দান করা হতো। কিন্তু রাসূল ﷺ-এর ওফাতের পর যখন ইসলামের শক্তি বৃদ্ধি পায় এবং কাফেরদের শত্রুতা থেকে বাঁচা ও নওমুসলিমদের আকীদা পোক্ত করার জন্য এ সকল পন্থা অবলম্বনের প্রয়োজন তিরোহিত হয়ে যায়, তখন সেই কারণ ও উদ্দেশ্য আর বাকি থাকেনি। তাই তাদের সদকা দানও বন্ধ করে দেওয়া হয়। কতিপয় ফিকহবিদ এ অবস্থার প্রেক্ষিতে হুকুমটি রহিত বলে মন্তব্য করেন। তাঁদের মধ্য রয়েছে হযরত ওমর ফারূক (রা.), হযরত হাসান বসরী, শা'বী, ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মালেক ইবনে আনাস (র.)।

তবে অপরাপর ইমাম ও ফিকহবিদগণের মতে হুকুমটি রহিত নয়; বরং হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) ও ওমর ফারুক (রা.) -এর যুগে প্রয়োজন ছিল না বলে তা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ভবিষ্যতে পুনরায় প্রয়োজন দেখা দিলে এই শ্রেণির লোকদেরকে জাকাতের অংশ দেওয়া যাবে। এ মতের অনুসারী হলেন ইমাম যুহরী, কাজী আব্দুল ওহাব ইবনে আরাবি, ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.) ।

প্রকৃত সত্য কথা হলো এই যে, কোনো যুগেই সদকা প্রভৃতি থেকে অমুসলিমদের অংশ দেওয়া হয়নি এবং তারা জাকাতের চুতর্থ ব্যয় খাত 'মুআল্লাফাতুল কুলূব' শামিল ছিল না।

ইমাম কুরতুবী (র.) স্বীয় তাফসীরগ্রন্থে রাসূলে কারীম ﷺ যাদের চিত্তাকর্ষণের জন্য সদকার খাত থেকে দান করেছিলেন, সবিস্তারে তাদের নামধামসহ উল্লেখ করে বলেছেন- وَبِالْجُمْلَةِ فَكُلُّهُمْ مُؤْمِنٌ وَلَمْ يَكُنْ فِيْهِمْ كَافِرٌ অর্থাৎ তারা ছিল মুসলমান, তাদের মধ্যে অমুসলমান বলতে কেউ ছিল না।

অনুরূপ তাফসীরে মাযহারীতে আছে- لَمْ يَثْبُتْ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اَعْطٰى اَحَدًا مِنَ الْكُفَّارِ لِلْاِيْلَافِ شَيْئًا مِنَ الزَّكٰوةِ অর্থাৎ 'কোনো রেওয়ায়েত থেকে একথা প্রমাণিত নেই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কাফেরদের চিত্তাকর্ষণের জন্য জাকাতের অংশ দিয়েছিলেন।' এ কথার সমর্থনে তাফসীরে কাশশাফের একটি উক্তি পেশ করা যায়। তাতে উল্লেখ আছে যে, "কুরআনের এ স্থানে জাকাতের ব্যয় খাতের বর্ণনার উদ্দেশ্য হলো কাফের মুনাফিকদের অপবাদ খণ্ডন করা যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সদকার অংশ থেকে তাদের বঞ্চিত করেছেন। আয়াতের এই ব্যয় খাতসমূহের বিবরণ দিয়ে জানিয়ে দেওয়া হচ্ছে যে, সদকায় কাফেরদের কোনো অধিকার নেই। মুআল্লাফাতুল কুলূবে কাফেরগণ শামিল থাকলে একথা বলার প্রয়োজন ছিল না।"

তাফসীরে মাযহারীতে সে ভ্রমটিকেও অত্যন্ত সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা করে দেওয়া হয়েছে; যা কোনো কোনো হাদীসের রেওয়ায়েতের দরুন মানুষের মনে সৃষ্টি হয়েছে। সেসব রেওয়ায়েতের দ্বারা প্রামণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কোনো অমুসলিমরদেরকেও কিছু উপঢৌকন দিয়েছেন। সুতরাং সহীহে মুসলিম ও তিরমিযীর রেওয়ায়েতে সে কথা উল্লেখ রয়েছে যে, মহানবী ﷺ সফওয়ান ইবনে উমাইয়াহকে তার কাফের থাকাকালে কিছু উপঢৌকন দান করেছেন, সে সম্পর্কে ইমাম নববী (র.)-এর উদ্ধৃতিক্রমে লেখা হয়েছে যে, এসব দান জাকাতের মালের মধ্য থেকে ছিল না; বরং হুনাইন যুদ্ধের গনিমতের মালের যে পঞ্চমাংশ বায়তুল মালের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল তার মধ্যে থেকেই দেওয়া হয়েছিল। আর একথা বলাই বাহুল্য যে, বায়তুল মালের এই খাত থেকে মুসলিম অমুসলিম উভয়ের জন্য ব্যয় করা সমস্ত ফিকহবিদগণের ঐকমত্যেই জায়েজ। অতঃপর বলা হয়েছে, ইমাম বায়হাকী (র.) ইবনে সাইয়েদুন্নাস. ইমাম ইবনে কাছীর প্রমুখ সবাই বলেছেন যে, এ দান জাকাতের মাল থেকে ছিল না; বরং গনিমতের পঞ্চমাংশ থেকে ছিল।

এ পর্যন্ত সদকার আটটি ব্যয়ক্ষেত্রের চারটির বিবরণ দান করা হলো, এ চারটি অধিকার 'লাম' বর্ণের আওতায় বর্ণনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে- لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسٰكِيْنِ পরবর্তীতে যে চারটি ব্যয় খাতের আলোচনা করা হয়েছে, সেগুলোর মধ্যে শিরোনাম পরিবর্তন করে 'লাম' -এর পরিবর্তে فِيْ (ফী) ব্যবহার করা হয়েছে। বলা হয়েছে- وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِيْنَ ইমাম যামাখশারী (র.) তাঁর কাশশাফ গ্রন্থে এর কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন যে, এতে এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা উদ্দেশ্য যে, শেষের এ চারটি ব্যয় খাত প্রথম চারটি ব্যয় খাতের তুলনায় বেশি হকদার। কারণ فِى হরফটি পাত্রকে বুঝাবার জন্য বলা হয়। ফলে তার অর্থ দাঁড়ায় এই যে. সদকাসমূহ সে সমস্ত লোকের মাঝে রেখে দেওয়া উচিত। তাদের অধিকতর হকদার হওয়ার কারণ এই যে , প্রয়োজনীয়তা তাদেরই অধিক। কেননা যে লোক কারো মালিকানাধীন দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ, সে সাধারণ ফকির মিসকিনদের তুলনায় অধিক কষ্টে রয়েছে। তেমনিভাবে যে লোক কারো কাছে ঋণী এবং পাওনাদার তার উপর তাকাদা করছে, সে সাধারণ গরিব মিসকিন অপেক্ষা অধিক অভাবে থাকে। কারণ নিজের দৈনন্দিন ব্যয়ভারের চাইতেও বেশি চিন্তা থাকে তার পাওনাদরদের জন্য।

আরেকটি ব্যয়খাত হলো اَلْغَارِمِيْنَ যা اَلْغَارِمْ-এর বহুবচন। এর অর্থ- দেনাদার, ঋণী। একথা পূর্বেই বলা হয়েছে, যে, পঞ্চম ও ষষ্ঠ ব্যয় খাত যা فِيْ-এর সহযোগে বর্ণনা করা হয়েছে, তা প্রাপ্যতার অধিকারে প্রথম চারটি ব্যয় খাত অপেক্ষা অগ্রগণ্য। সেজন্য গোলামকে তার মুক্তির জন্য কিংবা ঋণগ্রস্তকে তার ঋণমুক্তির জন্য দান করা সাধারণ ফকির মিসকিনকে দান করার চাইতে উত্তম। তবে শর্ত হচ্ছে এই যে, সে ঋণগ্রস্তের কাছে এ পরিমাণ সম্পদ থাকবে না, যাতে সে ঋণ

পরিশোধ করতে পারে। কারণ অভিধানে এমন ঋণী ব্যক্তিকেই غَارِمٌ (গারেম) বলা হয়। আবার কোনো কোনো ইমাম এ শর্তও আরোপ করেছেন যে, সে ঋণ যেন কোনো অবৈধ কাজের জন্য না করে থাকে। কোনো পাপ কাজের জন্য যদি ঋণ করে থাকে যেমন, মদ কিংবা বিয়ে-শাদির নাজায়েজ প্রথা অনুষ্ঠান প্রভৃতি, তবে এমন ঋণগ্রস্তকে জাকাতের অর্থ থেকে দান করা যাবে না, যাতে তার পাপ কাজও অপব্যয়ে অনর্থক উৎসাহ দান করা না হয়।

فِيْ سَبِيْلِ اللهِ এখানে আবারো فِيْ হরফের পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। তাফসীরে কাশশাফে বর্ণিত রয়েছে যে, এই পুনাবৃত্তিকে ইঙ্গিত করা উদ্দেশ্য যে, এ খাতটি পূর্বোল্লিখিত সব খাত অপেক্ষা উত্তম। তবে কারণ এই যে, এতে দুটি ফায়দা রয়েছে– ১. গরিব-নিঃস্বের সাহায্য এবং ২. একটি ধর্মীয় সেবায় সহায়তা করা। কারণ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ -এর মর্ম সেসব গাজী ও মুজাহিদ, যাদের অস্ত্র ও জিহাদের উপকরণ ক্রয় করার ক্ষমতা নেই অথবা এ ব্যক্তি যার উপর হজ ফরজ হয়ে গেছে, কিন্তু এখন আর তার কাছে এমন অর্থ নেই যাতে সে ফরজ হজ আদায় করতে পারে। এ দুটি কাজই নির্ভেজাল ধর্মীয় খেদমত ও ইবাদত। কাজেই জাকাতের মাল এতে ব্যয় করায় একজন নিঃস্ব লোকের সাহায্য হয় এবং একটি ইবাদত আদায়ের সহযোগিতাও হয়। এমনিভাবে ফিকহবিদগণ ছাত্রদেরকেও এর অন্তর্ভুক্ত করেছেন। কারণ তারাও একটি ইবাদত আদায় করার জন্যই এ ব্রত গ্রহণ করে থাকে। –[যাহেরিয়ার হাওয়ালায় রূহুল মা'আনী]

বাদায়ে' প্রণেতা বলেছেন যে, এমন প্রত্যেক লোকই 'ফী সাবীলিল্লাহ' খাতের আওতাভুক্ত যে কোনো সৎকাজ কিংবা ইবাদত করতে চায় যাতে অর্থের প্রয়োজন। অবশ্য এতে শর্ত এই যে, তার কাছে এমন অর্থসম্পদ থাকবে না যা দ্বারা সংশ্লিষ্ট সে কাজটি সম্পাদন করতে পারে যেমন, ধর্মীয় শিক্ষাও ও তাবলীগ এবং সে জন্য প্রচার প্রকাশনা প্রভৃতি। কোনো জাকাতের হকদার লোক যদি এ কাজ কররেত চায়, তবে তাকে জাকতের মাল দিয়ে সাহায্য করা যেতে পারে, কিন্তু কোনো মালদার লোককে তা দেওয়া যায় না।

উল্লিখিত বিশ্লেষণে বুঝা যায় যে, এ সমস্ত অবস্থাতেই যা فِيْ سَبِيْلِ اللهِ -এর তাফসীরে বর্ণনা করা হলো দারিদ্র ও অভাবগ্রস্ততার শর্তটির প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে। কোনো ধনী সাহেব নেসাবের কোনো অংশ এতে নেই। অবশ্য যদি তার বর্তমান মালামাল তার সে প্রয়োজন মেটাতে না পারে, যা জিহাদ কিংবা হজের জন্য প্রয়োজন, তবে যদিও নেসাব পরিমাণ মালামাল বর্তমান থাকার কারণে তাকে ধনী বলা যেতে পারে যেমন এক হাদীসেও তাকে غَنِيٌّ (ধনী) বলা হয়েছে, কিন্তু সেও এ হিসাবে ফকির ও অভাবগ্রস্ত বলে গণ্য হবে। যে পরিমাণ অর্থসম্পদ জিহাদ অথবা হজের জন্য প্রয়োজন তা তার কাছে বর্তমান নয়। 'ফাতহুল কাদীর' গ্রন্থে শাইখ ইবনে হুমাম (র.) বলেছেন, সদকা সংক্রান্ত আয়াতসমূহে যেসব ব্যয় খাতের কথা বলা হয়েছে, তার প্রত্যেকটির শব্দই স্বয়ং এর প্রমাণ বহন করে যে, সে তার দৈন্য ও অভাবের ভিত্তিতে হকদার । ফকির ও ফী সাবীলিল্লাহ, ইবনুসসাবীল প্রভৃতি শব্দও এরই ইঙ্গিতবহ যে, তাদের অভাব দূর করার ভিত্তিতেই তাদেরকে দান করা হয়। অবশ্য যারা عَامِلِيْنَ (আমেলীন) জাকাত উসূলকারী তাদেরকে দেওয়া হয় তাদের সেবার বিনিময়ে। সুতরাং এতে আমীর ফকির সমান। যেমন غَارِمِيْنَ -এর খাত সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে যে, যে লোকের উপর দশ হাজার টাকার ঋণ রয়েছে এবং পাঁচ হাজার টাকা তার কাছে রয়েছে তাকে পাঁচ হাজার টাকার জাকাত দেওয়া যেতে পারে। কারণ যে মাল তার কাছে মওজুদ রয়েছে, তা তার ঋণের দরুন না থাকারই শামিল।

জ্ঞাতব্য : فِيْ سَبِيْلِ اللهِ শব্দের অর্থ অতি ব্যাপক। যেসব কাজ আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে করা হয়, সে সবই এই ব্যাপক মর্মানুযায়ী فِيْ سَبِيْلِ اللهِ -এর অন্তর্ভুক্ত। যেসব লোক রাসূলে কারীম ﷺ -এর ব্যাখ্যা ও বর্ণনা এবং তাফসীর শাস্ত্রের ইমামগণের বক্তব্য থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে শুধু মাত্র শাব্দিক অর্থের মাধ্যমে কুরআনকে বুঝাতে চায়, এখানে তাদের এ বিভ্রান্তির সম্মুখীন হতে হয়েছে যে, তারা فِيْ سَبِيْلِ اللهِ শব্দটি দেখেই সে সমস্ত কাজকেও জাকাতের ব্যয় খাতের অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছে, যা কোনো কোনো দিক দিয়ে সৎকাজ কিংবা ইবাদত বলে গণ্য। মসজিদ, মাদরাসা, হাসপাতাল, সরাইখানা প্রভৃতি নির্মাণ, কূপ খনন, পুল ও সড়ক তৈরি করা এবং সেসব জনকল্যাণমূলক সংস্থার কর্মচারীদের বেতন ও যাবতীয় ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনীয়তাকে তারা فِيْ سَبِيْلِ اللهِ -এর অন্তর্ভুক্ত করে নিয়ে জাকাতের ব্যয় খাত সাব্যস্ত করে দিয়েছেন। যা একান্তই ভুল এবং সমগ্র উম্মতের ইজমার পরিপন্থি। সাহাবায়ে কেরাম, যাঁরা কুরআনকে সরাসরি রাসূলে কারীম ﷺ -এর নিকট অধ্যায়ন করেছেন ও বুঝেছেন, তাঁদের এবং তাবেয়ীন ইমামগণের যত রকম তাফসীর এ শব্দটির ব্যাপারে উদ্ধৃত রয়েছে তাতে এ শব্দটিকে হজব্রতী ও মুজাহেদীনের জন্য নির্দিষ্ট বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে।

www.almodina.com

এক হাদীসে বর্ণিত রয়েছে যে, এক ব্যক্তি তাঁর একটি উট فِيْ سَبِيْلِ اللهِ (ফী সাবীলিল্লাহ) ওয়াকফ করে দিয়েছিল। তখন মহানবী ﷺ সে লোকটিকে বলে দেন যে, একে হাজীদের সফরের কাজে ব্যবহার করো। –[মাবসূত-৩,পৃ.-১০]

ইমাম ইবনে জারীর, ইবনে কাছীর প্রমূখ হাদীসের রেওয়ায়েতের দ্বারাই কুরআনের তাফসীর করেন। তাঁদের সবাই فِيْ سَبِيْلِ اللهِ শব্দকে এমন মুজাহিদীন ও হজব্রতীদের জন্য নির্দিষ্ট করেছেন, যাদের কাছে জিহাদ কিংবা হজ করার উপকরণ নেই। আর যেসব ফিকহবিদ মনীষীবৃন্দ তালেবে ইলম কিংবা অন্যান্য সৎকর্মীদেরকে এর অন্তর্ভুক্ত করেছেন তাঁরাও এ শর্তেই তা করেছেন যে, তাদেরকে ফকির ও অভাবগ্রস্ত হতে হবে। আর একথা বলাই বাহুল্য যে, ফকির ও অভাবগ্রস্তরা নিজেই জাকাতের সর্বপ্রথম ব্যয় খাত। এদেরকে ফী সাবীলিল্লাহর অন্তর্ভুক্ত করা না হলেও এরা জাকাতের হকদার ছিল। কিন্তু চার ইমাম ও উম্মতের ফিকহবিদগণের কেউই একথা বলেননি যে, জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান ও মসজিদ মাদরাসা নির্মাণে এবং সে সমস্তের যাবতীয় প্রয়োজন জাকাতের ব্যয় খাতের অন্তর্ভুক্ত; বরং তাঁরা এ বিষয়ে ভিন্ন মত ব্যক্ত করেছেন যে, জাকাতের মালামাল এসব বিষয়ে ব্যয় করা না জায়েজ। হানাফী ফিকহবিদ ইমামগণের মধ্যে শামসুল আইম্মা সারাখসী মাবসূত দ্বিতীয় খণ্ড, ২০২ পৃষ্ঠায় এবং শরহে সিয়ার চতুর্থ খণ্ড, ২৪৪ পৃষ্ঠায়, শাফেয়ী ফিকহবিদগণের মধ্যে আবূ ওবায়েদ 'কিতাবুল আমওয়াল' গ্রন্থে, মালেকী ফিকহবিদগণের 'দার্দেজ শরহে মুখতাসারুল খলীল' প্রথম খণ্ড, ১৬১ পৃষ্ঠায় এবং হাম্বলী ফিকহবিদগণের মধ্যে মুগনী গ্রন্থে এ বিষয়টি সবিস্তারে লিখেছেন।

اِبْنُ السَّبِيْلِ (ইবনুস সাবীল)। سَبِيْل অর্থ– পথ। আর اِبْن অর্থ মূলত : পুত্র হলেও আরবি পরিভাষায় اِبْن ও اَخٌ প্রভৃতি সে সমস্ত বিষয়ের জন্যও বলা হয়, যার গভীর ও নিবীড় সম্পর্ক কারো সাথে থাকে। এ পরিভাষা অনুযায়ী اِبْنُ السَّبِيْلِ বলা হয় পথিক ও মুসাফিরকে। কারণ পথ অতিক্রম করা এবং গন্তব্য স্থানের সন্ধান করার সাথে তাদের সম্পর্কও অতি নিবীড়। আর জাকাতের ব্যয় খাতের ক্ষেত্রে এমন মুসাফির বা পথিককে বুঝানোই উদ্দেশ্য, যার কাছে সফরকালে প্রয়োজনীয় অর্থ সম্পদ নেই, স্বদেশে তার যতো অর্থসম্পদই থাক না কেন। এমন মুসাফিরকে জাকাতের মাল দেওয়া যেতে পারে, যাতে করে সে তার সফরের প্রয়োজনাদি সমাধা করতে পারবে এবং স্বদেশে ফিরে যেতে সমর্থ হবে।

শব্দ বিশ্লেষণ

مَلْجَأً : সীগাহ واحد বহছ اسم ظرف বহুবচন مَلَاجِئُ অর্থ– আশ্রয়স্থল।

مَغٰرٰتٍ : শব্দটি বহুবচন, একবচন مَغَارَةٌ অর্থ– গিরিগুহা।

وَلَّوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ اثبات فعل ماضى معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّوْلِيَةُ মূলবর্ণ (و ـ ل ـ ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ– তারা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে।

اَلْغٰرِمِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব سَمِعَ মাসদার اَلْغُرْمُ মূলবর্ণ (غ ـ ر ـ م) জিনস صحيح অর্থ– ঋণী, করজদার।

يُؤْذُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ اثبات فعل مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِيْذَاءُ মূলবর্ণ (ا ـ ذ ـ ى) জিনস মুরাক্কাব, مهموز فاء ও ناقص يائى অর্থ–তারা কষ্ট দেয়।

www.almodina.com

يَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ لَكُمْ لِيُرْضُوْكُمْ ۚ وَاللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗۤ اَحَقُّ اَنْ يُّرْضُوْهُ اِنْ كَانُوْا مُؤْمِنِيْنَ (٦٢)

অনুবাদ : ৬২. তারা তোমাদের নিকট শপথ করে থাকে, যেন তারা তোমাদেরকে রাজি করতে পারে, অথচ আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল হচ্ছেন অধিক হকদার, [এই বিষয়ে] যে, তারা যদি সত্যিকারের মুসলমান হয়ে থাকে, তবে তারা যেন তাঁকে সন্তুষ্ট করে।

اَلَمْ يَعْلَمُوْۤا اَنَّهٗ مَنْ يُّحَادِدِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَاَنَّ لَهٗ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيْهَا ۚ ذٰلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيْمُ (٦٣)

৬৩. তাদের কি খবর নেই যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে, তবে এটা সুনিশ্চিত যে, এমন লোকের ভাগ্যে রয়েছে দোজখের আগুন এরূপভাবে যে, সে তাতে অনন্তকাল থাকবে। এটা হচ্ছে বিষম লাঞ্ছনা।

يَحْذَرُ الْمُنٰفِقُوْنَ اَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُوْرَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِيْ قُلُوْبِهِمْ ۚ قُلِ اسْتَهْزِءُوْا ۚ اِنَّ اللّٰهَ مُخْرِجٌ مَّا تَحْذَرُوْنَ (٦٤)

৬৪. মুনাফিকরা আশঙ্কা করে যে, মুসলমানদের প্রতি না এমন কোনো সূরা নাজিল হয়ে পড়ে– যা তাদেরকে সেই মুনাফিকদের অন্তরের কথা অবহিত করে দেয়। আপনি বলে দিন যে, হ্যাঁ, তোমরা বিদ্রূপ করতে থাক, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা সেই বিষয়কে প্রকাশ করে দিবেন, যে সম্বন্ধে তোমরা আশঙ্কা করছিলে।

وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ لَيَقُوْلُنَّ اِنَّمَا كُنَّا نَخُوْضُ وَنَلْعَبُ ۚ قُلْ اَبِاللّٰهِ وَاٰيٰتِهٖ وَرَسُوْلِهٖ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِءُوْنَ (٦٥)

৬৫. আর যদি আপনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন, তবে তারা বলে দিবে যে, আমরা তো কেবল গল্প-গুজব ও হাসি-তামাশা করছিলাম, আপনি বলে দিন, তবে কি তোমরা আল্লাহ তা'আলার প্রতি এবং তাঁর আয়াতসমূহের প্রতি এবং তাঁর রাসূলের প্রতি হাসিঠাট্টা করছিলে?

শাব্দিক অনুবাদ

৬২. يَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ لَكُمْ তারা তোমাদের নিকট শপথ করে থাকে لِيُرْضُوْكُمْ যেন তারা তোমাদেরকে রাজি করতে পারে وَاللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗۤ اَحَقُّ অথচ আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল হচ্ছেন অধিক হকদার اَنْ يُّرْضُوْهُ তবে তারা যেন তাঁকে সন্তুষ্ট করে اِنْ كَانُوْا مُؤْمِنِيْنَ তারা যদি সত্যিকারের মুসলমান হয়ে থাকে।

৬৩. اَلَمْ يَعْلَمُوْۤا তাদের কি খবর নেই যে اَنَّهٗ مَنْ يُّحَادِدِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে فَاَنَّ لَهٗ نَارَ جَهَنَّمَ তবে এটা সুনিশ্চিত যে, এমন লোকের ভাগ্যে রয়েছে দোজখের আগুন এরূপভাবে যে خَالِدًا فِيْهَا সে তাতে অনন্তকাল থাকবে ذٰلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيْمُ এটা হচ্ছে বিষম লাঞ্ছনা।

৬৪. يَحْذَرُ الْمُنٰفِقُوْنَ মুনাফিকরা আশঙ্কা করে যে اَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُوْرَةٌ মুসলমানদের প্রতি না এমন কোনো সূরা নাজিল হয়ে পড়ে– تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِيْ قُلُوْبِهِمْ যা তাদেরকে সেই মুনাফিকদের অন্তরের কথা অবহিত করে দেয় قُلِ আপনি বলে দিন যে اسْتَهْزِءُوْا হ্যাঁ, তোমরা বিদ্রূপ করতে থাক اِنَّ اللّٰهَ مُخْرِجٌ مَّا تَحْذَرُوْنَ নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা সেই বিষয়কে প্রকাশ করে দিবেন, যে সম্বন্ধে তোমরা আশঙ্কা করছিলে।

৬৫. وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ আর যদি আপনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন لَيَقُوْلُنَّ তবে তারা বলে দিবে যে اِنَّمَا كُنَّا نَخُوْضُ وَنَلْعَبُ আমরা তো কেবল গল্পগুজব ও হাসিতামাশা করছিলাম قُلْ আপনি বলে দিন اَبِاللّٰهِ وَاٰيٰتِهٖ وَرَسُوْلِهٖ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِءُوْنَ তবে কি তোমরা আল্লাহ তা'আলার প্রতি এবং তাঁর আয়াতসমূহের প্রতি এবং তাঁর রাসূলের প্রতি হাসিঠাট্টা করছিলে?

www.almodina.com

لَا تَعْتَذِرُوْا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ ۭ اِنْ نَّعْفُ عَنْ طَاۗىِٕفَةٍ مِّنْكُمْ نُعَذِّبْ طَاۗىِٕفَةًۢ بِاَنَّهُمْ كَانُوْا مُجْرِمِيْنَ (٦٦)

অনুবাদ : (৬৬) তোমরা এখন বেহুদা ওজর করো না, তোমরা তো নিজেদেরকে মুমিন প্রকাশ করার পর কুফরি করেছ, যদিও আমি তোমাদের মধ্য হতে কতককে ক্ষমা করে দেই, তবুও কতককে তো শাস্তি দিবই, কারণ তারা অপরাধী ছিল।

اَلْمُنٰفِقُوْنَ وَالْمُنٰفِقٰتُ بَعْضُهُمْ مِّنْۢ بَعْضٍ ۘ يَاْمُرُوْنَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوْفِ وَيَقْبِضُوْنَ اَيْدِيَهُمْ ۭ نَسُوا اللّٰهَ فَنَسِيَهُمْ ۭ اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ (٦٧)

(৬৭) মুনাফিক পুরুষগণ এবং মুনাফিক নারীগণ সকলেই এক রকম। অসৎকর্মের [অর্থাৎ কুফর ও ইসলাম বিরোধিতার] শিক্ষা দেয় এবং সৎকর্ম হতে বারণ করে এবং নিজেদের হস্তসমূহকে [আল্লাহর রাহে ব্যয় করা হতে] বন্ধ করে রাখে, তারা আল্লাহ তা'আলার খেয়াল করল না, অতএব, আল্লাহ তা'আলাও তাদের খেয়াল করলেন না নিঃসন্দেহে এই মুনাফিকরা হচ্ছে বড়ই অবাধ্য।

وَعَدَ اللّٰهُ الْمُنٰفِقِيْنَ وَالْمُنٰفِقٰتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۭ هِيَ حَسْبُهُمْ ۚ وَلَعَنَهُمُ اللّٰهُ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيْمٌ (٦٨)

(৬৮) আল্লাহ তা'আলা মুনাফিক পুরুষদের ও মুনাফিক নারীদের এবং কাফেরদের সাথে দোজখের আগুনের অঙ্গীকার করে রেখেছেন, যাতে তারা চিরকাল থাকবে, এটা তাদের জন্য যথেষ্ট, আর আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে স্বীয় রহমত হতে দূর করে দিবেন এবং তাদের চিরস্থায়ী আজাব হবে।

শাব্দিক অনুবাদ

(৬৬) لَا تَعْتَذِرُوْا তোমরা এখন বেহুদা ওজর করো না قَدْ كَفَرْتُمْ তোমরা তো কুফরি করেছ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ নিজেদেরকে মুমিন প্রকাশ করার পর اِنْ نَّعْفُ عَنْ طَاۗىِٕفَةٍ مِّنْكُمْ যদিও আমি তোমাদের মধ্য হতে কতককে ক্ষমা করে দেই نُعَذِّبْ طَاۗىِٕفَةً তবুও কতককে তো শাস্তি দিবই بِاَنَّهُمْ كَانُوْا مُجْرِمِيْنَ কারণ তারা অপরাধী ছিল।

(৬৭) اَلْمُنٰفِقُوْنَ মুনাফিক পুরুষগণ وَالْمُنٰفِقٰتُ এবং মুনাফিক নারীগণ بَعْضُهُمْ مِّنْۢ بَعْضٍ সকলেই এক রকম يَاْمُرُوْنَ بِالْمُنْكَرِ অসৎকর্মের [অর্থাৎ কুফর ও ইসলাম বিরোধিতার] শিক্ষা দেয় وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوْفِ এবং সৎকর্ম হতে বারণ করে وَيَقْبِضُوْنَ اَيْدِيَهُمْ এবং নিজেদের হস্তসমূহকে [আল্লাহর রাহে ব্যয় করা হতে] বন্ধ করে রাখে نَسُوا اللّٰهَ তারা আল্লাহ তা'আলার খেয়াল করল না فَنَسِيَهُمْ অতএব, আল্লাহ তা'আলাও তাদের খেয়াল করলেন না اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ নিঃসন্দেহে এই মুনাফিকরা হচ্ছে বড়ই অবাধ্য।

(৬৮) وَعَدَ اللّٰهُ আল্লাহ তা'আলা অঙ্গীকার করে রেখেছেন الْمُنٰفِقِيْنَ মুনাফিক পুরুষদের وَالْمُنٰفِقٰتِ ও মুনাফিক নারীদের وَالْكُفَّارَ এবং কাফেরদের সাথে نَارَ جَهَنَّمَ দোজখের আগুনের خٰلِدِيْنَ فِيْهَا যাতে তারা চিরকাল থাকবে هِيَ حَسْبُهُمْ এটা তাদের জন্য যথেষ্ট وَلَعَنَهُمُ اللّٰهُ আর আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে স্বীয় রহমত হতে দূর করে দিবেন وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيْمٌ এবং তাদের চিরস্থায়ী আজাব হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(৬২) قوله يَحْلِفُونَ بِاللّٰهِ لَكُمْ لِيُرْضُوْكُمْ وَاللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَحَقُّ الخ **আয়াতের শানে নুযূল- ১ :** ইবনুল মুনযির ও ইবনে আবী হাতেম হযরত কাতাদার উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমাদেরকে মুনাফিক এক ব্যক্তি বলল, আল্লাহর শপথ মুহাম্মদ ﷺ যা কিছু বলছেন, তা যদি সত্য হয়ে থাকে, তাহলে আমরা গাধা অপেক্ষাও অতি নিকৃষ্ট হয়ে যাব। সে সময় কোনো একজন মুসলমান তা শুনে ফেলল। সে মুহূর্তে তিনি জবাবে বলেন যে, আল্লাহর শপথ মুহাম্মদ ﷺ এর সব কিছু সত্য। আর তুই গাধা থেকেও অতি নিকৃষ্ট। পরন্তু সে লোকটি নবী করীম ﷺ এর নিকট দৌড়িয়ে গিয়ে এ সম্পর্কে জানালেন। সুতরাং রাসূল ﷺ সে মুনাফিককে ডেকে এনে জিজ্ঞেস করলেন যে, তুমি কিসের জন্য এ ধরনের মন্তব্য করলে? তখন সে অভিসম্পাত ও কসম খেয়ে তা অস্বীকার করতে লাগল। অবস্থা এমন দেখে মুসলমান ব্যক্তি বলতে লাগলেন যে, اَللّٰهُمَّ صَدِّقِ الصَّادِقَ وَكَذِّبِ الْكَاذِبَ হে আল্লাহ! সত্যের জয় ও অসত্যের বিলীন করে দাও। এ পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা উক্ত আয়াত নাজিল করেন।

শানে নুযূল-২ : মুকাতিল ও কালবী কর্তৃক বর্ণিত রয়েছে যে, আলোচ্য আয়াত এক জামাত মুনাফিক সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। এ শ্রেণির মুনাফিক তাবূক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত রয়েছিল। অতঃপর রাসূল ﷺ যখন ফিরে আসলেন, তখন মুনাফিকরা মুমিনদের কাছে গিয়ে যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করার জন্য কসম খেয়ে খেয়ে ওজর পেশ করতে লাগল। সে প্রেক্ষিতে উক্ত আয়াত নাজিল হয়েছে। -[রূহুল মা'আনী-১২৮/৫, ফাতহুল কাদীর-৩৭৭/২, দুররে মানছুর-৫৫৩/৩, ইবনে কাছীর-৩৭৪/২, কুরতুবী-১৭৮/৮]

(৬৪) قوله يَحْذَرُ الْمُنٰفِقُوْنَ اَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُوْرَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِيْ قُلُوْبِهِمْ الخ **আয়াতের শানে নুযূল- ১ :** মুজাহিদ বলেন, মুনাফিকরা রাসূল ﷺ -এর প্রতি বিভিন্ন ধরনের মন্দাচারী করে বলত, হয়তো আল্লাহ তা'আলা আমাদের গোপনীয়তাকে প্রকাশ করবেন না। তখন উক্ত আয়াত নাজিল হয়েছে।

শানে নুযূল-২ : সুদ্দী বলেন, মুনাফিকদের কেউ কেউ বলেছিল যে, আমি একশত বেত্রাঘাত গ্রহণ করাকে ভালোবাসি, তবুও আমাদের অবমাননা ও লাঞ্ছনাকর কোনো কিছু নাজিল না হোক। সে পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত আয়াত নাজিল হয়েছে।

শানে নুযূল-৩ : ইবনে কায়সান বলল, মুনাফিকদের একটি দল রাসূল ﷺ -এর উদ্দেশ্যে পথে দাঁড়াল। রাসূল ﷺ তখন তাবূক যুদ্ধ হতে ফিরে আসছিলেন এবং রাতটিও ছিল অন্ধকার। তাদের উদ্দেশ্য ছিল তারা রাসূল ﷺ -এর উপর আঘাত হানবে। তাদের এহেন অসৎ উদ্দেশ্য সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূল ﷺ -কে জিবরাঈল (আ.)-এর মাধ্যমে জানিয়ে দিলেন। সে জানানোর পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত আয়াত নাজিল হয়েছে। আলোচ্য আয়াত এ কথার প্রমাণ করে যে, রাসূল ﷺ আলিমুল গায়ব ছিলেন না। অন্যথায় রাসূল ﷺ -কে অবগত করার জন্য আয়াত নাজিল করার কোনো প্রয়োজন ছিলনা। -[বাহরে মুহীত-৬৭/৫, দুররে মানছূর ২৫৪/৩, তাবারী-৪০৮/৬, কুরতুবী ১৮০/৮, ফাতহুল কাদীর-৩৭৮/২]

(৬৫) قوله وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ لَيَقُوْلُنَّ اِنَّمَا كُنَّا نَخُوْضُ وَنَلْعَبُ الخ **আয়াতের শানে নুযূল-১ :** আবূ নাইম হুলিয়া গ্রন্থে শুরাইহ ইবনে উবাইদের উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, কোনো এক ব্যক্তি হযরত আবুদ দারদা (রা.)-কে বলল, হে লোক সকল! তোমরা আমাদের অপেক্ষা অতি ভিতু কেন? তোমাদের নিকট কিছু চাওয়া হলে, কার্পণ্যতা কর কেন, যখন খেতে যাও তখন বড় লুকমা দাও কেন? তখন হযরত আবুদ দারদা (রা.) কোনো জবাব না দিয়ে সেখান থেকে চলে গিয়ে হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.)-কে এ বিষয়টি সম্পর্কে অবগত করেন। এ মন্তব্য যে লোকটি করেছিল হযরত ওমর (রা.) তৎক্ষণাৎ সে লোকটির নিকট এসে তার কাপড় ও গণ্ডদেশে ধরে টেনে হিঁচড়ে রাসূল ﷺ -এর দরবারে উপস্থিত করেন। তখন সে লোকটি বলেছিল যে, আমি এরূপভাবে খেলা করি। সে পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

-[ফাতহুল কাদীর-৩৭৮/২, দুররে মানছূর-২৫৪/৩]

শানে নুযূল-২ : ইবনুল মুনযির ও ইবনে আবী হাতেম হযরত কাতাদা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, তাবূক যুদ্ধে যাওয়ার পথে রাসূল ﷺ -এর সামনে কিছু মুনাফিক লোকদের প্রতি দৃষ্টি নিপতিত হয়। যারা বলছিল যে, এই সে ব্যক্তি

নাকি যিনি সিরিয়ার অট্টালিকা ও কিল্লাহগুলো দখল করার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন? তা তো অনেক দূরের কথা। এখন আল্লাহ তা'আলা নবীকে সে বিষয়টি জানিয়ে দিলেন। সুতরাং রাসূল ﷺ বললেন, এ সকল আরোহীদেরকে আটকে রাখ। অতঃপর রাসূল ﷺ তাদের নিকট এসে বললেন, তোমরা এমন এমন মন্তব্য করেছ? জবাবে ওরা বলল, হে আল্লাহর নবী! আমরা তো কেবল আমোদ-প্রমোদ করে থাকি। এ পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে।

–[রূহুল মা'আনী– ১৩০/৫, দুররে মানছূর– ১৫৪/৩, কুরতুবী– ১৮১/৮, তাবারী– ৪০৯/৬, বাহরে মুহীত– ৬৭/৫]

قوله لَا تَعْتَذِرُوْا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ الخ (৬৬) **আয়াতের শানে নুযূল :** ইবনে ইসহাক, ইবনে মুনযির ও ইবনে আবী হাতেম, কা'আব ইবনে মালিক এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন যে, তিনি বলেছেন, একদা মুহশী ইবনে হামির বলেছিল যে, কুরআনে আমাদের সম্পর্কে কোনো কিছু নাজিল হবার পরিবর্তে তোমাদের প্রতি জনকে একশত বেত্রাঘাতা করার শর্তে কোনো ফয়সালা করাকে আমি আন্তরিকভাবে ভালোবাসি। তখন রাসূল ﷺ আম্মার ইবনে ইয়াসির (রা.)-কে বললেন, সে লোক জনের নিকট পৌছে যাও। ওরা আন্তরিকভাবে জ্বলে দগ্ধ হচ্ছে। অতঃপর তারা কি বলছে, সে সম্পর্কে জিজ্ঞেস কর। ওরা অবশ্যই অস্বীকার করবে। না হয় গোপনীয়তা অবলম্বন করে নিবে। যদি এমনটি হয়, তাহলে বলবে যে, তোমরা তো এমন এমন বলছ অবশ্যই। সুতরাং তিনি অগ্রসর হয়ে তাদেরকে পেয়ে গেলেন। অতঃপর তিনি তাদেরকে সে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন, তারা ওজর পেশ করতে আরম্ভ করে। তাদের এ জাতীয় মন্তব্য অস্বীকার করা সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। –[দুররে মানছূর-২৫৪/৩]

قوله يَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ لَكُمْ لِيُرْضُوْكُمْ وَاللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ الخ এ পর্যন্ত জাকাতের সে আটটি খাতের বিবরণ সমাপ্ত হলো, যা উল্লিখিত আয়াতে সদকা ও জাকাত সম্পর্কে বলা হয়েছে। এবার এমন কিছু মাসআলা বর্ণনা করা হচ্ছে– যেগুলো একইভাবে সে সমস্ত খাতের সাথে সম্পর্কযুক্ত।

মালিকানা : অধিকাংশ ফিকহবিদ এ ব্যাপারে একমত যে, জাকাতের নির্ধারিত আটটি খাতে ব্যয় করার ব্যাপারেও জাকাত আদায় হওয়ার জন্য শর্ত রয়েছে যে, এসব খাতে কোনো হকদারকে জাকাতের মালের উপর মালিকানা স্বত্ব বা অধিকার দিয়ে দিতে হবে। মালিকানা অধিকার দেওয়া ছাড়া যদি কোনো মাল তাদেরই উপকার কল্পে ব্যয় করা হয়, তবুও জাকাত আদায় হবে না। সে কারণেই চার ইমামসহ উম্মাহর অধিকাংশ ফিকহবিদ এ ব্যাপারে একমত যে, জাকাতের অর্থ মসজিদ মাদরাসা কিংবা হাসপাতাল, এতিমখানা প্রভৃতি নির্মাণ অথবা তাদের অন্যান্য প্রয়োজনে ব্যয় করা জায়েজ নয়। যদিও এসব বিষয়ের উপকারিতা সেই ফকির-মিসকিনও প্রাপ্ত হয়, যারা জাকাতের খাত হিসেবে গণ্য, কিন্তু তাদের মালিকানা স্বত্ব এসব বিষয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত না হওয়ার দরুন এতে জাকাত আদায় হবে না।

অবশ্য এতিমখানাগুলোতে যদি মালিকানা স্বত্ব হিসেবে এতিমদের খাওয়া-পরা দেওয়া হয়, তবে সে ব্যয়ের অনুপাতে জাকাতের অর্থ ব্যয় করা যেতে পারে। তেমনিভাবে হাসপাতালসমূহে যেসব ঔষধ অভাবী গরিবদেরকে মালিকানা অধিকার মোতাবেক দিয়ে দেওয়া হয়, তার মূল্যও জাকাতের অর্থে পরিশোধ করা যেতে পারে। এমনিভাবে উম্মাহর ফিকহবিদগণের ব্যাখ্যা অনুযায়ী লাওয়ারিশ মৃতের কাফন জাকাতের অর্থ থেকে দেওয়া যেতে পারে না। কারণ মৃতের মালিক হওয়ার যোগ্যতা থাকে না। তবে জাকাতের অর্থ যদি কোনো গরিব হকদার লোককে দিয়ে দেওয়া হয় এবং সে স্বেচ্ছায় সে অর্থ লা ওয়ারিশ মৃতের কাফনে ব্যয় করে, তাহলে তা জায়েজ। তেমনিভাবে যদি সে মৃতের উপর ঋণ থকে, তবে সে ঋণ সরাসরি জাকাতের অর্থের দ্বারা আদায় করা যায় না। তাবে তার কোনো ওয়ারিশ যদি গরিব ও জাকাতের হকদার হয়, তবে তাকে মালিকানার ভিত্তিতে তা দেওয়া যেতে পারে। তখন সে অর্থের মালিক হয়ে নিজের ইচ্ছায় তা দ্বারা মৃতের ঋণ পরিশোধ করতে পারে। এমনিভাবে জনকল্যাণমূলক যাবতীয় কাজকর্ম যেমন, কূপ খনন, পুল নির্মাণ, কিংবা সড়ক তৈরি প্রভৃতি যদিও এসবের মাধ্যমে জাকাত পাবার যোগ্য লোকেরাও উপকৃত হয়। কিন্তু এতে তাদের মালিকানা, অধিকার প্রতিষ্ঠিত না হওয়ার দরুন এতে জাকাত আদায় হবে না।

মালিকুল ওলামা তাঁর 'বেদায়াহ' গ্রন্থে জাকাত আদায় হওয়ার জন্য মালিকানা সাব্যস্ত হওয়ার জন্য মালিকানা সাব্যস্ত হওয়ার শর্তের পক্ষে দলিল দিয়েছেন যে, কুরআনে সাধারণত জাকাত ও ওয়াজিব সদকার ক্ষেত্রে اِيْتَاءٌ শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে। বলা হয়েছে– اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ ـ وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ ـ وَاِقَامِ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَآءِ الزَّكٰوةِ ـ وَاٰتُوْا حَقَّهٗ يَوْمَ حَصَادِهٖ

প্রভৃতি। আর اِيْتَاءٌ শব্দটি অভিধানে দান করা অর্থে ব্যবহৃত হয়। ইমাম রাগেব ইস্পাহানী (র.) 'মুফরাদাতে কুরআন' গ্রন্থে বলেছেন– وَالْاِيْتَاءُ الْاِعْطَاءُ وَخُصَّ وَضْعُ الصَّدَقَةِ فِى الْقُرْاٰنِ بِالْاِيْتَاءِ অর্থাৎ 'ঈতা' অর্থ দান করা। আর কুরআনে ওয়াজিব সদকা আদায় করাকে 'ঈতা' শব্দের সাথে নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। আর একথা বলাই বাহুল্য যে, কাউকে কোনো কিছু দান করার মর্ম এটাই যে, তাকে সে বস্তুর মালিক বানিয়ে দেওয়া হবে।

তাছাড়া জাকাত ছাড়াও اِيْتَاءٌ শব্দটি কুরআন কারীমে মালিক বানিয়ে দেওয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন– وَاٰتُوا النِّسَآءَ صَدُقٰتِهِنَّ অর্থাৎ 'স্ত্রীদেরকে তাদের মোহরানা দিয়ে দাও।' আর একথা সুস্পষ্ট যে, মোহরানা পরিশোধ করা হয়েছে বলে তখনই স্বীকৃত হবে, যখন মহরের উপর স্ত্রীর মালিকানা স্বত্ব দিয়ে দেওয়া হবে।

দ্বিতীয়ত কুরআন কারীমে জাকাতকে 'সদকা' বলা হয় না। শায়খ ইবনে হুমাম 'ফাতহুল কাদীর' গ্রন্থে বলেছেন, সদকার তাৎপর্যও একই যে, কোনো কাফেরকে সে মালের মালিক বানিয়ে দেওয়া হবে। এমনিভাবে ইমাম জাসসাস 'আহকামুল কুরআনে' বলেছেন, 'সদকা' শব্দটি হলো মালিক করে দেওয়ার নাম। –[জাসসাস-১৭২/২]

শব্দবিশ্লেষণ

يُحَادِدُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ اثبات فعل مضارع معروف বাব مُفَاعَلَةٌ মাসদার اَلْمُحَادَاةُ মূলবর্ণ (ح . د . د) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– সে বিরোধিতা করে।

كُنَّا نَخُوْضُ : সীগাহ جمع متكلم বহছ اثبات فعل ماضى استمرارى বাব نَصَرَ মাসদার اَلْخَوْضُ মূলবর্ণ (خ . و . ض) জিনস اجوف واوى অর্থ– আমরা আলাপ করছিলাম।

لَاتَعْتَذِرُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ نهى حاضر معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِعْتِذَارُ মূলবর্ণ (ع . ذ . ر) জিনস صحيح অর্থ– তোমরা বাহান করো না।

اَلْمُنٰفِقٰتُ : সীগাহ جمع مؤنث বহছ اسم فاعل বাবে مُفَاعَلَةٌ মাসদার اَلنِّفَاقُ মূলবর্ণ– (ن . ف . ق) জিনসে صحيح অর্থ– মুনাফিক মহিলাগণ।

نَسُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ اثبات فعل ماضى معروف বাব سَمِعَ মাসদার اَلنِّسْيَانُ মূলবর্ণ (ن . س . ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– তারা ভুলে গেল।

www.almodina.com

كَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانُوْٓا اَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَّاَكْثَرَ اَمْوَالًا وَّاَوْلَادًا ؕ فَاسْتَمْتَعُوْا بِخَلَاقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلَاقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلَاقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَالَّذِيْ خَاضُوْا ؕ اُولٰٓئِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۚ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ (٦٩)

অনুবাদ : (৬৯) তোমাদের অবস্থা তাদের ন্যায় যারা তোমাদের পূর্বে গত হয়েছে, যারা শক্তির আধিক্যে এবং ধনসম্পদ ও সন্তানাদির প্রাচুর্যে তোমাদের চেয়েও অধিক ছিল, ফলতঃ তারা নিজেদের [পার্থিব] অংশ দ্বারা যথেষ্ট উপকার লাভ করেছে, অতঃপর তোমরাও তোমাদের [পার্থিব] অংশ দ্বারা খুব উপকার লাভ করলে, যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীগণ নিজেদের অংশ দ্বারা ফলভোগ করেছিল, আর তোমরাও অসৎকর্মে এরূপভাবে নিমগ্ন হয়েছ, যেমন তারা নিমগ্ন হয়েছিল, আর তাদের [নেক] কার্যসমূহ বিনষ্ট হয়ে গেছে দুনিয়াতে ও আখেরাতে, আর তারা ভীষণ ক্ষতির মধ্যে রয়েছে [অর্থাৎ উভয় জগতেই আনন্দ ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য হতে বঞ্চিত থাকবে।

اَلَمْ يَاْتِهِمْ نَبَاُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوْحٍ وَّعَادٍ وَّثَمُوْدَ ۬ وَقَوْمِ اِبْرٰهِيْمَ وَاَصْحٰبِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكٰتِ ؕ اَتَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ ۚ فَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلٰكِنْ كَانُوْٓا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ (٧٠)

(৭০) তাদের নিকট কি সেই সকল লোকদের সংবাদ পৌছেনি? যারা তাদের পূর্বে গত হয়েছে, যেমন নূহ সম্প্রদায় এবং 'আদ ও ছামূদ সম্প্রদায়, আর ইবরাহীমের সম্প্রদায় এবং মাদইয়ানের অধিবাসীগণ এবং বিধ্বস্ত জনপদগুলো তাদের নিকট তাদের পয়গম্বরগণ স্পষ্ট নির্দশনসমূহ নিয়ে এসেছিলেন, বস্তুতঃ আল্লাহ তো তাদের প্রতি জুলুম করেননি, পরন্তু তারা নিজেরাই নিজেদের আত্মার উপর জুলুম করছিল।

শাব্দিক অনুবাদ

(৬৯) كَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ তোমাদের অবস্থা তাদের ন্যায় যারা তোমাদের পূর্বে গত হয়েছে كَانُوْٓا اَشَدَّ مِنْكُمْ যারা তোমাদের চেয়েও অধিক ছিল قُوَّةً শক্তির আধিক্যে وَّاَكْثَرَ اَمْوَالًا এবং ধনসম্পদ وَّاَوْلَادًا ও সন্তানাদির প্রাচুর্যে فَاسْتَمْتَعُوْا بِخَلَاقِهِمْ ফলতঃ তারা নিজেদের [পার্থিব] অংশ দ্বারা যথেষ্ট উপকার লাভ করেছে فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلَاقِكُمْ অতঃপর তোমরাও তোমাদের [পার্থিব] অংশ দ্বারা খুব উপকার লাভ করলে كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীগণ ফলভোগ করেছিল بِخَلَاقِهِمْ নিজেদের অংশ দ্বারা وَخُضْتُمْ আর তোমরাও অসৎকর্মে এরূপভাবে নিমগ্ন হয়েছ। كَالَّذِيْ خَاضُوْا যেমন তারা নিমগ্ন হয়েছিল اُولٰٓئِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ আর তাদের [নেক] কার্যসমূহ বিনষ্ট হয়ে গেছে فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ দুনিয়াতে ও আখেরাতে وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ আর তারা ভীষণ ক্ষতির মধ্যে রয়েছে [অর্থাৎ উভয় জগতেই আনন্দ ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য হতে বঞ্চিত থাকবে।]

(৭০) اَلَمْ يَاْتِهِمْ তাদের নিকট কি পৌছেনি? نَبَاُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ সেই সকল লোকদের সংবাদ যারা তাদের পূর্বে গত হয়েছে قَوْمِ نُوْحٍ যেমন নূহ সম্প্রদায় وَّعَادٍ وَّثَمُوْدَ এবং 'আদ ও ছামূদ সম্প্রদায় وَقَوْمِ اِبْرٰهِيْمَ আর ইবরাহীমের সম্প্রদায় وَاَصْحٰبِ مَدْيَنَ এবং মাদইয়ানের অধিবাসীগণ وَالْمُؤْتَفِكٰتِ এবং বিধ্বস্ত জনপদগুলো اَتَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ তাদের নিকট তাদের পয়গম্বরগণ স্পষ্ট নির্দশনসমূহ নিয়ে এসেছিলেন فَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيَظْلِمَهُمْ বস্তুতঃ আল্লাহ তো তাদের প্রতি জুলুম করেননি وَلٰكِنْ كَانُوْٓا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ পরন্তু তারা নিজেরাই নিজেদের আত্মার উপর জুলুম করছিল।

وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۘ يَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَيُطِيْعُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ؕ اُولٰٓئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّٰهُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ (٧١)

অনুবাদ : (৭১) আর মুসলমান পুরুষগণ ও মুসলমান নারীগণ হচ্ছে পরস্পর একে অন্যের বন্ধু, তারা সৎ বিষয়ের শিক্ষা দেয় এবং তারা অসৎ বিষয় হতে বারণ করে, আর নামাজের পাবন্দি করে এবং জাকাত প্রদান করে, আর আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূলের আদেশ মেনে চলে, এই সমস্ত লোকের প্রতি আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই রহমত বর্ষণ করবেন, নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা অতি ক্ষমতাবান হেকমতওয়ালা।

وَعَدَ اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَمَسٰكِنَ طَيِّبَةً فِيْ جَنّٰتِ عَدْنٍ ؕ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ اَكْبَرُ ؕ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ (٧٢)

(৭২) আল্লাহ তা'আলা মুসলমান পুরুষদের এবং মুসলমান নারীদেরকে এমন উদ্যানসমূহের ওয়াদা দিয়ে রেখেছেন, যার নিম্নদেশে বইতে থাকবে নহরসমূহ, যাতে তারা অনন্তকাল থাকবে, আর [-ও ওয়াদা দিয়েছেন] সেই উত্তম বাসস্থানসমূহের যা চিরস্থায়ী উদ্যানসমূহে অবস্থিত হবে। আর আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি হচ্ছে সর্বাপেক্ষা বড় [নিয়ামত] এটা হচ্ছে অতি বড় সফলতা।

শাব্দিক অনুবাদ

(৭১) وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ আর মুসলমান পুরুষগণ ও মুসলমান নারীগণ হচ্ছে بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ পরস্পর একে অন্যের বন্ধু يَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ তারা সৎ বিষয়ের শিক্ষা দেয় وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ এবং তারা অসৎ বিষয় হতে বারণ করে وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ আর নামাজের পাবন্দি করে وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ এবং জাকাত প্রদান করে وَيُطِيْعُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ আর আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূলের আদেশ মেনে চলে اُولٰٓئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّٰهُ এই সমস্ত লোকের প্রতি আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই রহমত বর্ষণ করবেন اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা অতি ক্ষমতাবান হেকমতওয়ালা।

(৭২) وَعَدَ اللّٰهُ আল্লাহ তা'আলা ওয়াদা দিয়ে রেখেছেন الْمُؤْمِنِيْنَ মুসলমান পুরুষদের وَالْمُؤْمِنٰتِ এবং মুসলমান নারীদেরকে جَنّٰتٍ এমন উদ্যানসমূহের تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ যার নিম্নদেশে বইতে থাকবে নহরসমূহ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا যাতে তারা অনন্তকাল থাকবে وَمَسٰكِنَ طَيِّبَةً আর [-ও ওয়াদা দিয়েছেন] সেই উত্তম বাসস্থানসমূহের فِيْ جَنّٰتِ عَدْنٍ যা চিরস্থায়ী উদ্যানসমূহে অবস্থিত হবে وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ اَكْبَرُ আর আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি হচ্ছে সর্বাপেক্ষা বড় ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ এটা হচ্ছে অতি বড় সফলতা।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قوله جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ আয়াতে কাফের ও মুনাফিক উভয় সম্প্রদায়ের সাথে জিহাদ করতে এবং তাদের ব্যাপারে কঠোর হাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে নির্দেশ দেওয়া। প্রকাশ্যভাবে যারা কাফের তাদের সাথে জিহাদ করার বিষয়টি তো সুস্পষ্ট, কিন্তু মুনাফিকদের সাথে জিহাদ করার অর্থ স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কর্মধারায় প্রমাণিত হয়েছে যে, তাদের সাথে জিহাদ করার মর্ম হলো মৌখিক জিহাদ। অর্থাৎ তাদেরকে ইসলামের সত্যতা উপলব্ধি করার জন্য আমন্ত্রণ জানাতে হবে যাতে করে তারা ইসলামের দাবিতে নিষ্ঠাবান হয়ে যেতে পারে। –[কুরতুবী, মাযহারী]

وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ ; এতে غِلْظ -এর প্রকৃত অর্থ হলো এই যে, উদ্দিষ্ট ব্যক্তি যে আচরণের যোগ্য হবে তাতে কোনো রকম রেয়ায়েত বা কোমলতা যেন না করা হয়। এ শব্দটি رَأْفَتْ -এর বিপরীতে ব্যবহৃত হয়, যার অর্থ হলো কোমলতা ও করুণা।

ইমাম কুরতুবী (র.) বলেছেন যে, এক্ষেত্রে শব্দ ব্যবহারে বাস্তব ও কার্যকর কঠোরতাই বুঝানো হয়েছে যে, তাদের উপর শরিয়তের হুকুম জারি করতে গিয়ে কোনো রকম দয়া বা কোমলতা করবেন না। মুখে বা কথায় কঠোরতা প্রদর্শন করা এখানে উদ্দেশ্য নয়। কারণ তা নবী-রাসূলগণের রীতি বিরুদ্ধ। তাঁরা কারো প্রতি কটুবাক্য কিংবা গালাগালি করতেন না। এক হাদীসে রাসূলে কারীম ﷺ ইরশাদ করেন– إِذَا زَنَتْ اَمَةُ اَحَدِكُمْ فَلْيَحُدَّهَا الْحق وَلَا يَثْرِبْ عَلَيْهَا অর্থাৎ "যদি তোমাদের কোনো ক্রীতদাস জেনায় লিপ্ত হয়, তবে শরিয়ত অনুযায়ী তার উপর শাস্তি প্রয়োগ কর, কিন্তু মুখে তাকে ভর্ৎসনা বা গালাগালি করো না'।–[কুরতুবী]

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অবস্থা সম্পর্কে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা বলেছেন– وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَا نْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ "আপনি যদি কটুবাক্য ও কঠোরমনা হতেন, তবে আপনার কাছ থেকে মানুষ পালিয়ে যেত।" তাছাড়া স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর রীতিনীতিতেও কোথাও একথার প্রমাণ পাওয়া যায় না যে, কখনো তিনি কাফের ও মুনাফিকদের সাথে কথা বলতে বা তাদের সম্বোধন করতে গিয়ে কঠোরতা অবলম্বন করেছেন।

শব্দ বিশ্লেষণ

اِسْتَمْتَعُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ اثبات فعل ماضى معروف বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِسْتِمْتَاعُ মূলবর্ণ (م ـ ت ـ ع) জিনস صحيح অর্থ– তারা ভোগ করে নিয়েছে।

خَلَاقٌ : শব্দটি একবচন; এর বহুবচন হয় না। অর্থ– অংশ।

خُضْتُمْ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ اثبات فعل ماضى معروف বাবে نَصَرَ মাসদার اَلْخَوْضُ মূলবর্ণ (خ ـ و ـ ض) জিনস اجوف واوى অর্থ– তোমরা প্রবেশ করেছ।

اَلْمُؤْتَفِكٰتُ : সীগাহ جمع مؤنث বহছ اسم فاعل বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِئْتِفَاكُ মূলবর্ণ (ا ـ ف ـ ك) জিনস مهموز فاء অর্থ– উল্টানো জনপদ।

يُطِيْعُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ اثبات فعل مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِطَاعَةُ মূলবর্ণ (ط ـ و ـ ع) জিনস اجوف واوى অর্থ– তারা আনুগত্য করে।

www.almodina.com

يَٰٓأَيُّهَا النَّبِيُّ جَٰهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَٰفِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ ۚ وَمَأْوَىٰهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (٧٣)

অনুবাদ : (৭৩) হে নবী! কাফের ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করুন এবং তাদের প্রতি কঠোর ব্যবহার অবলম্বন করুন, আর তাদের বাসস্থান হবে দোজখ এবং তা হচ্ছে নিকৃষ্ট স্থান।

يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا ۚ وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَٰمِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا ۚ وَمَا نَقَمُوٓا إِلَّآ أَنْ أَغْنَىٰهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِن فَضْلِهِ ۚ فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ ۖ وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ (٧٤)

(৭৪) তারা আল্লাহ তা'আলার নামে শপথ করে বলছে যে, আমরা অমুক কথা বলিনি, অথচ নিশ্চয় তারা কুফরি কথা বলেছিল এবং নিজেদের ইসলাম [গ্রহণ] -এর কাফের হয়ে গেল, আর তারা এমন বিষয়ের সংকল্প করছিল, যা তারা কার্যকরী করতে পারেনি। আর তারা এটা কেবলমাত্র এই বিষয়েরই প্রতিদান দিয়েছিল যে, তাদেরকে সম্পদশালী করে দিয়েছিলেন আল্লাহ ও তাঁর রাসূল নিজ অনুগ্রহে। অনন্তর যদি তারা তওবা করে নেয়, তবে তা তাদের জন্য উত্তম হবে, আর যদি তারা বিমুখ হয়, তবে আল্লাহ তাদেরকে ইহকালে ও পরকালে যন্ত্রণাময় শাস্তি প্রদান করবেন, আর ভূপৃষ্ঠে তাদের না কোনো ওলী হবে, আর না কোনো সাহায্যকারী।

وَمِنْهُم مَّنْ عَٰهَدَ اللَّهَ لَئِنْ ءَاتَىٰنَا مِن فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّٰلِحِينَ (٧٥)

(৭৫) আর তাদের মধ্যে এমন কতিপয় লোক রয়েছে যারা আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে অঙ্গীকার করে যে, আল্লাহ তা'আলা যদি আমাদেরকে নিজ অনুগ্রহে প্রচুর সম্পদ দান করেন, তবে আমরা খুব দান-খয়রাত দান করব এবং আমরা খুব ভালো কাজ করব।

শাব্দিক অনুবাদ

(৭৩) يَٰٓأَيُّهَا النَّبِيُّ হে নবী! جَٰهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَٰفِقِينَ কাফের ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করুন وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ এবং তাদের প্রতি কঠোর ব্যবহার অবলম্বন করুন وَمَأْوَىٰهُمْ جَهَنَّمُ আর তাদের বাসস্থান হবে দোজখ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ এবং তা হচ্ছে নিকৃষ্ট স্থান।

(৭৪) يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا তারা আল্লাহ তা'আলার নামে শপথ করে বলছে যে, আমরা অমুক কথা বলিনি وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ অথচ নিশ্চয় তারা কুফরি কথা বলেছিল وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَٰمِهِمْ এবং নিজেদের ইসলাম [গ্রহণ] -এর কাফের হয়ে গেল وَهَمُّوا আর তারা এমন বিষয়ের সংকল্প করছিল بِمَا لَمْ يَنَالُوا যা তারা কার্যকরী করতে পারেনি وَمَا نَقَمُوٓا إِلَّآ আর তারা এটা কেবলমাত্র এ বিষয়েরই প্রতিদান দিয়েছিল যে أَنْ أَغْنَىٰهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ তাদেরকে সম্পদশালী করে দিয়েছিলেন আল্লাহ ও তাঁর রাসূল مِن فَضْلِهِ নিজ অনুগ্রহে فَإِن يَتُوبُوا অনন্তর যদি তারা তওবা করে নেয় يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ তবে তা তাদের জন্য উত্তম হবে وَإِن يَتَوَلَّوْا আর যদি তারা বিমুখ হয় يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا তবে আল্লাহ তাদেরকে যন্ত্রণাময় শাস্তি প্রদান করবেন فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ইহকালে ও পরকালে وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِن وَلِيٍّ আর ভূপৃষ্ঠে তাদের না কোনো ওলী হবে وَلَا نَصِيرٍ আর না কোনো সাহায্যকারী।

৭৫. وَمِنْهُم مَّنْ عَٰهَدَ اللَّهَ আর তাদের মধ্যে এমন কতিপয় লোক রয়েছে যারা আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে অঙ্গীকার করে যে لَئِنْ ءَاتَىٰنَا আল্লাহ তা'আলা যদি আমাদেরকে প্রচুর সম্পদ দান করেন مِن فَضْلِهِ নিজ অনুগ্রহে لَنَصَّدَّقَنَّ তবে আমরা খুব দান-খয়রাত দান করব وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّٰلِحِينَ এবং আমরা খুব ভালো কাজ করব।

www.almodina.com

অনুবাদ : ৭৬. কার্যত যখন আল্লাহ তাদেরকে নিজ অনুগ্রহে [বহু সম্পদ] দান করলেন, তখন তারা তাতে কার্পণ্য করতে লাগল এবং [আনুগত্য করা হতে] পরাঙ্মুখ হতে লাগল, আর তারা তো হচ্ছে মুখ ফিরিয়ে রাখাতেই অভ্যস্ত।	فَلَمَّآ اٰتٰىهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ بَخِلُوْا بِهٖ وَتَوَلَّوْا وَّهُمْ مُّعْرِضُوْنَ (٧٦)
৭৭. অনন্তর আল্লাহ তা'আলা তাদের শাস্তিস্বরূপ তাদের অন্তরসমূহে নেফাক [উৎপন্ন] করে দিলেন, যা আল্লাহ তা'আলার হুযূরে উপস্থিত হওয়ার দিন পর্যন্ত থাকবে, এই কারণে যে, তারা আল্লাহ তা'আলার সাথে নিজেদের ওয়াদার খেলাফ করেছে, আর এই কারণে যে, তারা [পূর্ব হতেই] মিথ্যা বলছিল।	فَاَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِيْ قُلُوْبِهِمْ اِلٰى يَوْمِ يَلْقَوْنَهٗ بِمَآ اَخْلَفُوا اللّٰهَ مَا وَعَدُوْهُ وَبِمَا كَانُوْا يَكْذِبُوْنَ (٧٧)
৭৮. তাদের কি এটার খবর নেই? যে, আল্লাহ তাদের মনের গুপ্ত কথা এবং গোপন পরামর্শ সমস্তই অবগত আছেন, আর তাদের এই খবর নেই যে, আল্লাহ তা'আলা সমস্ত গায়েবের কথা খুব জানেন।	اَلَمْ يَعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوٰىهُمْ وَاَنَّ اللّٰهَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ (٧٨)
৭৯. এরা [অর্থাৎ মুনাফিকরা] এমন যে, নফল সদকা প্রদানকারী মুসলমানদের প্রতি সদকা সম্বন্ধে দোষারোপ করে এবং [বিশেষ করে] সেই লোকদের প্রতি যাদের পরিশ্রম ও মজুরি করা ভিন্ন আর কোনোই সম্বল নেই, অর্থাৎ তাদের প্রতি বিদ্রূপ করে, আল্লাহ তাদেরকে এই বিদ্রূপের প্রতিফল দিবেন এবং তাদের জন্য যন্ত্রণাময় শাস্তি হবে।	اَلَّذِيْنَ يَلْمِزُوْنَ الْمُطَّوِّعِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ فِي الصَّدَقٰتِ وَالَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ اِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُوْنَ مِنْهُمْ ؕ سَخِرَ اللّٰهُ مِنْهُمْ ۫ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ (٧٩)

শাব্দিক অনুবাদ

(৭৬) فَلَمَّآ اٰتٰىهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ কার্যত যখন আল্লাহ তাদেরকে নিজ অনুগ্রহে [বহু সম্পদ] দান করলেন بَخِلُوْا بِهٖ তখন তারা তাতে কার্পণ্য করতে লাগল وَتَوَلَّوْا এবং [আনুগত্য করা হতে] পরাঙ্মুখ হতে লাগল وَّهُمْ مُّعْرِضُوْنَ আর তারা তো হচ্ছে মুখ ফিরিয়ে রাখাতেই অভ্যস্ত।

(৭৭) فَاَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِيْ قُلُوْبِهِمْ অনন্তর আল্লাহ তা'আলা তাদের শাস্তিস্বরূপ তাদের অন্তরসমূহে নেফাক [উৎপন্ন] করে দিলেন اِلٰى يَوْمِ يَلْقَوْنَهٗ যা আল্লাহ তা'আলার হুযূরে উপস্থিত হওয়ার দিন পর্যন্ত থাকবে بِمَآ اَخْلَفُوا اللّٰهَ এই কারণে যে, তারা আল্লাহ তা'আলার সাথে খেলাফ করেছে مَا وَعَدُوْهُ নিজেদের ওয়াদার وَبِمَا كَانُوْا يَكْذِبُوْنَ আর এ কারণে যে, তারা [পূর্ব হতেই] মিথ্যা বলছিল।

(৭৮) اَلَمْ يَعْلَمُوْٓا তাদের কি এটার খবর নেই? যে اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوٰىهُمْ আল্লাহ তাদের মনের গুপ্ত কথা এবং গোপন পরামর্শ সমস্তই অবগত আছেন وَاَنَّ اللّٰهَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ আর তাদের এই খবর নেই যে, আল্লাহ তা'আলা সমস্ত গায়েবের কথা খুব জানেন।

(৭৯) اَلَّذِيْنَ يَلْمِزُوْنَ এরা [অর্থাৎ মুনাফিকরা] এমন যে দোষারোপ করে الْمُطَّوِّعِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ নফল সদকা প্রদানকারী মুসলমানদের প্রতি فِي الصَّدَقٰتِ সদকা সম্বন্ধে وَالَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ اِلَّا جُهْدَهُمْ এবং [বিশেষ করে] সেই লোকদের প্রতি যাদের পরিশ্রম ও মজুরি করা ভিন্ন আর কোনোই সম্বল নেই فَيَسْخَرُوْنَ مِنْهُمْ অর্থাৎ তাদের প্রতি বিদ্রূপ করে سَخِرَ اللّٰهُ مِنْهُمْ আল্লাহ তাদেরকে এই বিদ্রূপের প্রতিফল দিবেন وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ এবং তাদের জন্য যন্ত্রণাময় শাস্তি হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قوله يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ الخ (৭৪) **আয়াতের শানে নুযূল- ১ :** হযরত কাতাদাহ (রা.) বলেন যে, আলোচ্য আয়াত আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। ঘটনাপ্রবাহ হচ্ছে যে, আনসারী ও জুহানী (মুহাজির)-এর পরস্পরের মাঝে ঝগড়া হয়। জুহানী আনসারীর উপর প্রধান্যতা লাভ করে । তখন আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই আউস তথা আনসারদেরকে বলল যে, তোমরা তোমাদের জাতি ভাইয়ের সাহায্য কি করবে না? আল্লাহর কসম! আমাদের ও মুহাম্মদ এবং তার সঙ্গীদের দৃষ্টান্ত হচ্ছে প্রবাদ سَمِّنْ كَلْبَكَ يَأْكُلْكَ সাদৃশ , অর্থাৎ 'কুকুর পোষে মোটা কর, তোমাকেই সে খাবে।' সে আরো বলল, আমরা যদি মদিনায় প্রত্যাবর্তন করি, তাহলে শক্তিশালীরা দুর্বলদেরকে সেখান থেকে বহিষ্কার করে দিবে। কোনো একজন মুসলমান তৎক্ষণাৎ রাসূল ﷺ -এর নিকট দৌড়ে গিয়ে এ সম্পর্কে জানালেন। সুতরাং রাসূল ﷺ তাকে ডেকে এনে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন, তখন সে কসম খেয়ে অস্বীকার করতে আরম্ভ করল। এহেন পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা উক্ত আয়াত নাজিল করেন। -[ইবনে কাছীর-৩৯৭/২, তাবারী-৪২২/৬, রুহুল মা'আনী-১৩৮/৫]

শানে নুযূল- ২ : ইবনে ইসহাক ও হযরত ইবনে আবী হাতেম হযরত কা'ব ইবনে মালেক (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, কুরআন শরীফ যখন মুনাফিকদের সম্পর্কীয় আলোচনাসহ অবতীর্ণ হয়, তখন জুলাছ ইবনে সুয়ায়িদ বলল, খোদার কসম! এ ব্যক্তি যা বলছে তা যদি সত্য হয়ে থাকে, তা হলে আমরা গাধা অপেক্ষাও নিকৃষ্ট হবো। তখন উমাইর বিন সা'আদ তা শুনে বলল, হে জুলাছ! খোদার কসম! তুমি তো আমার অত্যন্ত প্রিয়তম ব্যক্তি এবং আমার নিকট বর্ণনার দিক দিয়েও সু বক্তা। পরন্তু তুমি এমন মন্তব্য করেছ যদি তা প্রকাশ করি, তা হলে তুমি অপমাণিত হবে। আর যদি প্রকাশ না করি, তাহলে তুমি আমাকে ধ্বংস করে দিবে। একটি অপেক্ষা অপরটি অতি বিপদ জনক। সুতরাং তিনি রাসূল ﷺ -এর দরবারে উপস্থিত হয়ে জুলাছ যা বলেছিল তা রাসূল ﷺ -কে জানিয়ে দিলেন। তখন সে কসম খেয়ে অস্বীকার করে বলল যে, উমাইর আমার সম্পর্কে মিথ্যা বলেছে। উমাইর যা বলেছিলেন তার সমর্থনে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে।

শানে নুযূল- ৩ : ইবনে জারীর, আবুশ শাইখ, তাবারানী ও ইবনে মারদুভিয়া হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ একদা গাছের ছায়ায় বসেছিলেন, তখন তিনি বললেন, খুব শিঘ্রই তোমাদের নিকট এক লোক আসবে, (শয়তানের দৃষ্টি তুল্য তোমাদের প্রতি তাকাবে) সে যখনই আসবে তোমরা তার সাথে কথা বলবে না। অনতিবিলম্বেই হলুদ চক্ষু বিশিষ্ট এক ব্যক্তি উপস্থিত হয়। রাসূল ﷺ তাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন যে, তুমি ও তোমার সঙ্গিরা কিসের জন্য আমার মন্দচারিতা করলে? সুতরাং সে তার সাথিদেরকে নিয়ে আসলে তারা সকালেই কসম খেয়ে অস্বীকার করে। সে সময়ে তাদের কসমের অসারতা ও অসত্যতার বর্ণনা করার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। -[ইবনে কাছীর- ৩৮০/২, বাহরে মুহীত- ৭৩/৫, রুহুল মা'আনী-১৩৮/৫, দুররে মানছুর- ২৫৮/৩, কুরতুবী- ১৮৮/৮, ফাতহুল কাদীর- ৩৮৪/২]

শানে নুযূল- ৪ : ইবনে ওয়াকী ও আবূ মু'আবিয়া হিশাম ইবনে উরওয়ার উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি তদীয় পিতা উরওয়ার বরাত দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আলোচ্য আয়াত জুলাছ ইবনে সোওয়াইদ ইবনে সামেত সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। ঘটনাপ্রবাহ হচ্ছে যে, সে বলেছিল মুহাম্মদ যা কিছু নিয়ে এসেছে, তা যদি সত্য হয়, তাহলে আমরা গাধা অপেক্ষাও অতি নিকৃষ্ট, তখন তার স্ত্রীর অন্য পক্ষীয় পুত্র বলল, হে আল্লাহর দুশমন! আল্লাহর কসম! তুমি যা বলছ, সে সম্পর্কে আল্লাহর রাসূল ﷺ -কে আমি অবগত করে দিব আমি যদি এমনটি না করি, তাহলে তুমি আমাকেও আক্রান্ত করবে বলে ভয় হচ্ছে, অথবা তোমার অপরাধে আমি অভিযুক্ত হবো। অতঃপর নবী করীম ﷺ জুলাছকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন যে, তুমি কি এমন এমন বলেছ? তখন সে কসম খেয়ে অস্বীকার করল সে সময় সে নরাধম সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে -[তাবারী-৪২১/৬]

শানে নুযূল- ৫ : ইকরিমা বলেন, বনী আদী ইবনে কা'আবের মাওলা আনসারী এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছিল। রাসূল ﷺ সেই হত্যাকাণ্ডের বিষয়টি বারো হাজার মুদ্রা প্রদান করার শর্তে নিষ্পত্তি করেছিলেন। সেই পরিপ্রেক্ষিতে وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ ... وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ আয়াতাংশটি নাজিল হয়েছে -[তাবারী-৪২৩/৬]

শানে নুযূল- ৬ : সুদ্দী বলেন, আলোচ্য আয়াত কতিপয় মুনাফিক সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। ঘটনাপ্রবাহ হচ্ছে, কতিপয় মুনাফিকের একটি তাবূক যুদ্ধের সফরকালে কোনো এক রাতে মুনাফিকদের দশজনের একটি দল রাসূল ﷺ -কে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করেছিল তাদের সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। যাহহাকেরও অভিমত হলো যে, তাদের সম্পর্কেই আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে -[ইবনে কাছীর-৩৮০/২]

তাছাড়াও এ আয়াতের শানে নুযূল সম্পর্কে আরো বিভিন্ন রেওয়ায়েত রয়েছে। সবগুলোই উক্ত আয়াতের শানে নুযূল হতে পারে, সেগুলোর মধ্যে কোনো বৈপরীত্য নেই

www.almodina.com

৭৫-৭৮. قوله وَمِنْهُمْ مَّنْ عٰهَدَ اللّٰهَ لَئِنْ اٰتٰنَا مِنْ فَضْلِهٖ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** ইবনুল মুনযির, ইবনে আবি হাতেম, আবুশ শায়েখ, তাবারানী ইবনে মুনদা, বারুদী, আবূ নাঈম, ইবনে মারদুভিয়া, বায়হাকী ও ইবনে আসাকির আবূ উমামা বাহেলী (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, ছা'লাবা ইবনে হাতেম একদা রাসূল ﷺ -এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ তা'আলার নিকট আপনি দোয়া করুন, তিনি যেন আমাকে মাল (ধনাঢ্যতা) দান করেন। রাসূল ﷺ বললেন, হে ছা'লাবা আমার মতো জীবনযাপন করতে কি তুমি পছন্দ কর না? আমি যদি এ কামনা করি যে, আমার সাথে এ পাহাড়টি স্বর্ণে রূপান্তরিত করে ভ্রমণ করাবেন, তাহলে তাই হবে। তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর নিকট আমার জন্য দোয়া করুন, তিনি যেন আমাকে মাল দান করেন, যে আল্লাহ আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন, তাঁর শপথ করে বলছি যে, আল্লাহ যদি আমাকে মাল দেন তাহলে আমি প্রত্যেকের হককে যথাযথভাবে আদায় করব। রাসূল ﷺ বললেন, وَيْحَكَ يَا ثَعْلَبَةُ হে ছা'লাবা! তোমার জন্য আফসোস! তুমি তো শুকরিয়া আদায় করতে সক্ষম হবে না। ছ'লাবা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর নিকট আমার ধনাঢ্যতার জন্য দোয়া করুন। অতঃপর রাসূল ﷺ দোয়া করে বলেন, اَللّٰهُمَّ ارْزُقْهُ مَالًا হে আল্লাহ! তুমি তাকে মাল দাও। তখন সে বকরি পালন আরম্ভ করল। তাতে অনেক বরকত দেওয়া হলো। পরন্তু এগুলো কীট-পতঙ্গের ন্যায় সংখ্যায় বৃদ্ধি হলো। ফলে মদিনায় সংকুলান না হওয়ার কারণে অন্যত্র স্থানান্তর হয়ে যায়। তখন রাসূল ﷺ -এর সাথে শুধু রাত ও দিনের নামাজটুকু আদায় করত। তারপরও তার পশুগুলো কীটপতঙ্গের ন্যায় সংখ্যায় বৃদ্ধি হয়ে সে জায়গায়ও সংকুলান না হওয়ার কারণে অন্যত্র চলে যায়। তখন রাসূল ﷺ -এর সাথে রাত ছাড়া শুধু দিনের নামাজ গুলো এসে আদায় করত। তারপরও তার পশুগুলো কীটপতঙ্গের ন্যায় সংখ্যায় বৃদ্ধি হয়ে গেল। ফলে সে অন্যত্র চলে যায়। তখন রাসূল ﷺ -এর সাথে সপ্তাহে শুধু জুমার নামাজ আদায় করত। তারপরও পশুগুলো কীটপতঙ্গের ন্যায় সংখ্যায় আরও বৃদ্ধি পেয়ে সেই জায়গায়ও সংকুলান না হওয়ার কারণে অন্যত্র চলে যায়। তখন রাসূল ﷺ -এর সাথে গিয়ে জুমা ও জানাযার নামাজটুকুও আদায় করতে সক্ষম হয় না। তখন রাস্তার পথিক থেকে খবরাখবর জিজ্ঞাসাবাদ করে। রাসূল ﷺ -ও তাকে দেখতে না পেয়ে সাহাবায়ে কেরামের নিকট তার সম্পর্কে জানতে চান। সাহাবীগণ বলেন, সে তো বকরি পালন করছে। মদিনায় তাঁর সংকুলান না হওয়ার কারণে অন্য কোথাও চলে গিয়েছে। তখন রাসূল ﷺ বলেন, وَيْحَ ثَعْلَبَةَ بْنَ حَاطِبْ ছা'লাবার প্রতি আফসোস! ছা'লাবার প্রতি আফসোস!! ছা'লাবার প্রতি আফসোস!!! তিন বার বলেন।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূল ﷺ -কে সদকা আদায় করার নির্দেশ করেন এবং خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ আয়াত নাজিল হয়। সুতরাং রাসূল ﷺ সদকা উসুল করার জন্য জুহাইনা ও বনী সালমা গোত্রদ্বয় হতে দুজন লোক প্রেরণ করেন এবং তাদের নিকট আদায়যোগ্য উট ও বকরির বয়স লিখে দিলেন। কিভাবে সংগ্রহ করবে তাও লিখে দিলেন। তাদেরকে ছা'লাবা ও বনী সুলাইম গোত্রের এক ব্যক্তি এ দুজনের নিকট যাবার কথা বললেন। ফলে তারা ছা'লাবার নিকট গিয়ে সদকা করার কথা বলেন। তখন সে বলল, তোমরা লিখিত প্রমাণ পত্র দেখাও তো? অতঃপর পত্র দেখে মন্তব্য করল যে, তা তো একপ্রকার কর মাত্র। তোমরা এখন চলে যাও। যাওয়ার পথে আমার নিকট হয়ে যেয়ো। ফলে তারা দুজন চলে গেলেন। সুলাইমী তাদের আগমন জানতে পেরে তার উৎকৃষ্ট মানের উট ও অন্যান্য পশু নিয়ে দুজন দূতের নিকট উপস্থিত হলেন। পশু দেখে তারা বললেন, আদায়যোগ্য পশু তদপেক্ষা নিম্নমানের। তখন সুলাইমী বললেন যে, আমি সন্তুষ্ট চিত্তে আল্লাহর রাস্তায় এগুলো দিয়ে আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য অর্জন করতে চাই। অতএব, অনুগ্রহ পূর্বক তা আপনারা গ্রহণ করুন। সেখান থেকে কাজ শেষ করে ছা'লাবা ইবনে হাতেবের নিকট তারা আবারো গেলেন। তখন সে বলল যে, তোমাদের আইনগুলো দেখাও। পত্রদেখে এবারও পূর্বের ন্যায় বলল, এতো হলো কেবল জিজিয়া কর। তোমরা চলে যাও! আমি একটু ভেবে চিন্তে দেখি। ফলে তারা মদিনায় চলে গেলেন। রাসূল ﷺ তাদেরকে দেখে তাদের সাথে কথা বলার পূর্বেই বললেন– وَيْحَ ثَعْلَبَةَ بْنُ حَاطِبْ ছা'লাবার প্রতি আফসোস! আর সুলাইমীর জন্য বরকত ও কল্যাণের দোয়া করেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা وَمِنْهُمْ مَّنْ عٰهَدَ اللّٰهَ لَئِنْ اٰتٰنَا مِنْ فَضْلِهٖ لَنَصَّدَّقَنَّ তিনখানা আয়াত নাজিল করেন। কুরআন মাজীদে তার সম্পর্কীয় আয়াত নাজিল হবার কথা তার কোনো নিকট আত্মীয় তার কাছে খবর পৌঁছানোর পর, সে রাসূল ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! এ হলো আমার মালের জাকাত। রাসূল ﷺ তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করলেন যে, আল্লাহ আমাকে তোমার মাল গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন। পরবর্তীতে রাসূল ﷺ তার মাল গ্রহণ করেননি। অতঃপর হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.), হযরত ওমর ফারূক (রা.) এবং হযরত উসমান (রা.)ও তার মাল গ্রহণ করেননি। হযরত উসমান (রা.) -এর খেলাফতকালেই তার মৃত্যু হয়। কোনো বর্ণনা মতে ছা'লাবা মহানবী ﷺ -এর যুগে মসজিদে নববীর খাদেম ছিল। সে অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল ছিল। প্রকৃতপক্ষে সে ছিল একজন মুনাফিক। মুনাফিক থেকে

সদকা গ্রহণ করা যায় না। কিন্তু তার কুফরি প্রকাশ্যে না হবার কারণে তাকে হত্যা করা যাচ্ছে না। তারপরও লজ্জা থেকে বেঁচে থাকার জন্য মুসলমানদের সাথে জাকাত দিতে চেয়েছিল। তা গ্রহণ করা হয়নি। –[রুহুল মা'আনী-১৪৩/৫, তাবারী-৪২৫/৬, দুররে মানছূর-২৬০/৩, ফাতহুল কাদীর– ২৮৫/২, ইবনে কাছীর– ৩৮১/২, কুরতুবী– ১৯১/৮, বাহরে মুহীত–৭৫/৫]

ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত রয়েছে যে, হাতেম ইবনে আবী বালতাআ সম্পর্কে উক্ত আয়াত নাজিল হয়েছে। সিরিয়ায় তার মালামাল রয়ে গিয়েছিল। সুতরাং আনসারদের কোনো এক বৈঠকে শপথ করে বলেছিল যে, সে মালামাল যদি নিরাপদ থাকে তাহলে সেই মাল থেকে কিছু আমি সদকা করে দিব। অতঃপর যখন তা নিরাপদ হয়ে গেল, তখন তাতে কার্পণ্য করতে লাগল। সে পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে।। –[কুরতুবী– ১৯১/৮]

যাহহাক বলেন যে, নাবতাল ইবনে হারিছ, জাদ্দ ইবনে কায়েস ও মুআত্তিব ইবনে কুশাইর প্রমুখ মুনাফিকদের সম্পর্কে আলোচ্য আয়াতগুলো নাজিল হয়েছে। –[কুরতুবী– ১৯২/৮, বাহরে মুহীত– ৭৫/৫]

قوله الَّذِيْنَ يَلْمِزُوْنَ الْمُطَّوِّعِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ فِي الصَّدَقٰتِ الخ (৭৯) **আয়াতের শানে নুযূল–১ :** বুখারী ও মুসলিম প্রমুখ হাদীস গ্রন্থকার হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) -এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, সদকা সম্পর্কীয় আয়াত যখন নাজিল হয়, তখন আমরা মাল পিঠে বহন করে রাসূল ﷺ -এর দরবারে এনে হাজির করতাম। সুতরাং এক লোক প্রচুর পরিমাণের মালামাল নিয়ে উপস্থিত হলো। তখন মুনাফিকরা মন্তব্য করল যে, এরা হলো আত্মপ্রদর্শনকারী। আবূ আকীল অর্ধ সা' সামগ্রী নিয়ে উপস্থিত হন– মুনাফিকরা মন্তব্য করল যে, যৎসামান্য সদকা হতে আল্লাহ তা'আলা সম্পূর্ণই প্রয়োজনমুক্ত। মুনাফিকদের হঠকারিতা প্রদর্শনের পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[ফাতহুল কাদীর-৩৬৮/২, কুরতুবী-৯৮]

শানে নুযূল– ২ : কাতাদাহ বলেন, আব্দুর রহমান ইবনে আওফ তার অর্ধমাল সদকা করে দিলেন। তার মাল ছিল আট হাজার বিধায় চার হাজার দান করে দিলেন। তখন গোত্রের লোকেরা বলেছিল যে, এ ব্যক্তিটিই হলো সর্ববৃহৎ আত্মপ্রদর্শনকারী, সে পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা الَّذِيْنَ يَلْمِزُوْنَ الْمُطَّوِّعِيْنَ আয়াত নাজিল করেন। অপরদিকে আনসারীদের এক ব্যক্তি অর্ধ টাল খেজুর নিয়ে উপস্থিত হন। তখন মুনাফিকরা বলল, এমন যৎসামান্য মালের জন্য আল্লাহ তা'আলা প্রয়োজনমুক্ত, তখন সে প্রেক্ষিতে الَّذِيْنَ يَلْمِزُوْنَ الْمُطَّوِّعِيْنَ আল্লাহ তা'আলা নাজিল করেছেন। –[কুরতুবী– ১৯২/৮]

শানে নুযূল– ৩ : রাসূল ﷺ সদকা করার জন্য সাহাবীগণকে উৎসাহিত করেন। সুতরাং আব্দুর রহমান ইবনে আওফ চার হাজার মুদ্রা নিজের জন্য রেখে চার হাজার মুদ্রা সদকা করে দিলেন। যা কিছু দান করলেন এবং যা কিছু নিজের জন্য রেখেছেন, সব কিছুর মধ্যে বরকতের জন্য দোয়া করেন। হযরত ওমর (রা.) অর্ধেক মাল দান করে দিলেন। আসেম ইবনে আদী একশত ওয়াসক দান করেন। হযরত উসমান (রা.) বিরাট অংকের মাল দিান করেন, আবূ আকীল আরলশী (রা.) এক সা' খেজুর। এক ব্যক্তি বড় একটি উষ্ট্রী নিয়ে এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! এ উটনীটি এবং তার পেটে যে বাচ্চা রয়েছে, তা সদকা এবং এর সাথে উষ্ট্রীর লাগামটিও দিয়ে দিলেন। তখন মুনাফিকরা বলতে লাগল যে, ওরা তো কেবল লৌকিকতা ও সুনাম চর্চার জন্য দান-দাক্ষিণ্য করছে। আবূ আকীল তো দান করছে বড়দের সারিতে গণ্য হবার জন্য অথবা আত্মগর্ব করার জন্য। তার এক সা' আল্লাহর নিষ্প্রয়োজন। আল্লাহ তা'আলা উক্ত আয়াত এ সকল কুৎসা রটনাকারী ও উপহাসকারীদের নিন্দাবাদ প্রদান সম্পর্কে নাজিল করেন। –[বাহরে মুহীত– ৭৯/৫]

এ আয়াতের শানে নুযূলগুলো ছাড়াও আরো অনেক সাহাবায়ে কেরাম দান করেন, তারাও এ শানে নুযূলের আওতাধীন রয়েছেন। এর মধ্যে বৈপরীত্যের কিছু নেই।

قوله يَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ مَا قَالُوْا وَلَقَدْ قَالُوْا كَلِمَةَ الْكُفْرِ তে মুনাফিকদের আলোচনা করা হয়েছে যে, তারা নিজেদের বৈঠক সমাবেশে কুফরি কথাবার্তা বলতে থাকে এবং তা যখন মুসলমানরা জেনে ফেলে, তখন মিথ্যা কসম খেয়ে খেয়ে নিজেদের সুচিতা প্রমাণ করতে প্রয়াসী হয়। ইমাম বগভী (র.) এ আয়াতের শানে নুযূল বর্ণনা প্রসঙ্গে এ ঘটনা উদ্ধৃত করেছেন যে, রাসূলে কারীম ﷺ গযওয়ায়ে তাবূক প্রসঙ্গে এক ভাষণ দান করেন যাতে মুনাফিকদের অশুভ পরিণতি ও দুরবস্থার কথা বলা হয়। উপস্থিত শ্রোতাদের মধ্যে জুল্লাস নামক এক মুনাফিকও ছিল। সে নিজ বৈঠকে গিয়ে বলল, মুহাম্মদ ﷺ যা কিছু বলেন তা যদি সত্যি হয়, তবে আমরা (মুনাফিকরা) গাধার চাইতেও নিকৃষ্ট। আর এ বাক্যটি আমের ইবনে কায়েস (রা.) নামক এক সাহাবী শুনে বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যা কিছু বলেন, নিঃসন্দেহে তা সত্য এবং তোমরা গাধা অপেক্ষাও নিকৃষ্ট।

রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন তাবুকের সফর থেকে মদিনা মুনাওয়ারায় ফিরে আসেন, তখন আমের ইবনে কায়েস (রা.) এ ঘটনা মহানবী ﷺ -কে বলেন। জুল্লাস নিজের কথা ঘুরিয়ে বলতে শুরু করে যে, আমের ইবনে কায়েস (রা.) আমার উপর মিথ্যা অপবাদ আরোপ করছে

www.almodina.com

(আমি এমন কথা বলিনি)। এতে রাসূলুল্লাহ ﷺ উভয়কে 'মিম্বরে নববী'র পাশে দাঁড়িয়ে কসম খাবার নির্দেশ দেন। জুল্লাস অবলীলাক্রমে কসম খেয়ে নেয় যে, আমি এমন কথা বলিনি, আমের মিথ্যা কথা বলছে। হযরত আমের (রা.) -এর পালা এলে তিনিও (নিজের বক্তব্য সম্পর্কে) কসম খান এবং পরে হাত উঠিয়ে দোয়া করেন যে, আয় আল্লাহ! আপনি ওহীর মাধ্যমে স্বীয় রাসূলের উপর এ ঘটনার তাৎপর্য প্রকাশ করে দিন। তাঁর প্রার্থনায় স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং সমস্ত মুসলমান 'আমীন' বললেন। অতঃপর সেখান থেকে তাদের সরে আসার পূর্বেই হযরত জিবরীল আমীন (আ.) ওহী নিয়ে হাজির হন যাতে উল্লিখিত আয়াতখানি নাজিল হয়।

জুল্লাস আয়াতের পাঠ শুনে সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে বলতে আরম্ভ করে, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এখন আমি স্বীকার করছি যে, এ ভুলটি আমার দ্বারা হয়ে গিয়েছিল। আমের ইবনে কায়েস (রা.) যা কিছু বলেছেন তা সবই সত্য। তবে এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা আমাকে তওবা করার অবকাশ দান করেছেন। কাজেই এখনই আমি আল্লাহ তা'আলার নিকট মাগফেরাত তথা ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং সাথে সাথে তওবা করছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর তওবা কবুল করে নেন এবং অতঃপর তিনি নিজ তওবায় অটল থাকেন। তাতে তার অবস্থাও শুধারে যায়। –[মাযহারী]

কোনো কোনো তাফসীরবিদ মনীষী এ আয়াতের শানে নুযূল প্রসঙ্গে এমনি ধরনের অন্যান্য ঘটনার বর্ণনা করেছেন। বিশেষত এজন্য যে, আয়াতে এ বাক্যটিও রয়েছে যে, وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا অর্থাৎ তারা এমন এক কাজের চিন্তা করে, যাতে তারা কৃতকার্য হতে পারোনি। এতে প্রতীয়মান হয় যে এ আয়াতটি এমন কোনো ঘটনার সাঁথে সম্পৃক্ত যাতে মুনফিকরা মহানবী ﷺ ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে কোনো ষড়যন্ত্র করে কৃতকার্য হতে পারেনি। যেমন, উক্ত গযওয়ায়ে তাবুক থেকে প্রত্যাবর্তনের বিখ্যাত ঘটনা যে, মুনাফিকদের বারো জন লোক পাহাড়ি এক ঘাঁটিতে এমন উদ্দেশ্যে লুকিয়ে বসেছিল যে, মহানবী ﷺ যখন এখানে এসে পৌছবেন, তখন আকস্মিক আক্রমণ চালিয়ে তাঁকে হত্যা করে ফেলবে। এ ব্যাপারে হযরত জিবরীল আমীন তাঁকে খবর দিয়ে দিলে তিনি এ পথ থেকে সরে যান এবং এতে করে তাদের হীনচক্রান্ত ধূলিসাৎ হয়ে যায়।

এছাড়া মুনাফিকদের দ্বারা এ ধরনের অন্যান্য ঘটনাও সংঘটিত হয়। তবে এসবের মধ্য কোনো বৈপরীত্য কিংবা বিরোধ নেই। এ সমুদয় ঘটনাই উক্ত আয়াতের উদ্দেশ্য হতে পারে।

فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তাদের অপকর্ম ও অঙ্গীকার লঙ্ঘনের ফলে তাদের অন্তরসমূহ মুনাফেকি বা কুটিলতাকে আরো পাকাপোক্ত করে বসিয়ে দেন, যাতে তাদের তওবা করার ভাগ্যও হবে না।

হযরত আবূ উমামাহ (রা.) -এর বিস্তারিত রেওয়ায়েতের পর যা এইমাত্র উল্লেখ করা হলো, ইবনে জরীর লিখেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন ছা'লাবাহর জন্য তিন তিন বার আফসোস করেন তখন সে মজলিসে ছা'লাবার কতিপয় আত্মীয় আপনজনও উপস্থিত ছিল। রাসূল ﷺ-এর এ বাক্যটি শুনে তাদের মধ্য থেকে একজন সঙ্গে সঙ্গে রওয়ানা হয়ে ছা'লাবার কাছে গিয়ে পৌছল এবং তাকে ভর্ৎসনা করে বলল, তোমার সম্পর্কে কুরআনের আয়াত নাজিল হয়ে গেছে। এ কথা ছা'লাবাহ শুনে ঘাবড়ে গেল এবং মদিনায় হাজির হয়ে নিবেদন করল, হুজুর আমার সদাকা কবুল করে নিন। নবী করীম ﷺ বললেন, আল্লাহ তা'আলা আমাকে তোমার সদকা কবুল করতে বারণ করে দিয়েছেন। একথা শুনে ছা'লাবাহ নিজের মাথায় মাটি নিক্ষেপ করতে লাগল। রাসূল ﷺ বললেন, এটা তো তোমার নিজেরই কৃতকর্ম। আমি তোমাকে হুকুম করেছিলাম, কিন্তু তুমি তা মান্য করনি। এখন আর তোমার সদকা কবুল হতে পারে না। তখন ছা'লাবাহ অকৃতকার্য হয়ে ফিরে গেল এবং এর কিছুদিন পরই মহানবী ﷺ -এর ওফাত হয়ে যায়। অতঃপর হযরত আবূ বকর সিদ্দীকে আকবর (রা.) খলীফা হলে সা'লাবাহ সিদ্দীকে আকবর (রা,) এর খেদমতে হাজির হয়ে তার সদকা কবুল করার আবেদন জানাল। তিনি উত্তর দিলেন, যখন স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ-ই কবুল করেননি, তখন আমি কেমন করে কবুল করব। তারপর হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা.) -এর ওফাতের পর ছা'লাবাহ ফারূকে আ'যম (রা.) -এর খেদমতে হাজির হয় এবং সে আবেদন জানায় এবং একই উত্তর পায়, যা সিদ্দীকে আকবর (রা.) দিয়েছিলেন। এরপর হযরত উসমান (রা.) -এর খেলাফত আমলেও সে এ নিবদেন করে। কিন্তু তিনিও অস্বীকার করেন। হযরত উসমান (রা.) -এর খেলাফতকালেই ছা'লাবার মৃত্যু হয়। –[মাযহারী]

শব্দ বিশ্লেষণ

اَلْمَصِيْرُ : সীগাহ واحد বহছ اسم ظرف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلصَّيْرُوْرَةُ মূলবর্ণ (ص ـ ى ـ ر) জিনস اجوف يائى অর্থ– ঠিকানা।

تَوَلَّوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ اثبات فعل ماضى معروف বাব تَفَعُّل মাসদার اَلتَّوَلِّيْ মূলবর্ণ (و ـ ل ـ ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ– তারা পিঠ ফিরিয়ে নিয়েছে।

مُطَّوِّعِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব تَفَعُّل মাসদার اَلتَّطَوُّعُ মূলবর্ণ (ط ـ و ـ ع) জিনস اجوف واوى অর্থ– যারা মন খুলে খরচ করে।

www.almodina.com

اِسْتَغْفِرْ لَهُمْ اَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ ۭ اِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِيْنَ مَرَّةً فَلَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ ۭ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ۭ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ (٨٠)

অনুবাদ : (৮০) আপনি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন অথবা তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা না করেন, [উভয় সমান], যদি আপনি তাদের জন্য সত্তরবারও ক্ষমা প্রার্থনা করেন, তবুও আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ক্ষমা করবেন না, এর কারণ এই যে, তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে কুফরি করেছে, আর আল্লাহ এমন অবাধ্য লোকদেরকে পথ প্রদর্শন করেন না ।

فَرِحَ الْمُخَلَّفُوْنَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلٰفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ وَكَرِهُوْٓا اَنْ يُّجَاهِدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَقَالُوْا لَا تَنْفِرُوْا فِي الْحَرِّ ۭ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ اَشَدُّ حَرًّا ۭ لَوْ كَانُوْا يَفْقَهُوْنَ (٨١)

(৮১) এই পশ্চাদবর্তী লোকগণ উৎফুল্ল হয়ে গেল রাসূলুল্লাহর [যুদ্ধে গমনের] পর নিজেদের গৃহে বসে থাকার প্রতি এবং তারা আল্লাহর পথে নিজেদের ধন ও প্রাণ দিয়ে জিহাদ করাকে না পছন্দ করল, অধিকন্তু বলতে লাগল, তোমরা [এই ভীষণ] গরমের মধ্যে বের হয়ো না, আপনি বলে দিন জাহান্নামের আগুন [এটা অপেক্ষা] অধিক গরম, কি ভালো হতো, যদি তারা বুঝতে পারত ।

فَلْيَضْحَكُوْا قَلِيْلًا وَّلْيَبْكُوْا كَثِيْرًا ۚ جَزَاۗءًۢ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ (٨٢)

(৮২) অতএব, তারা অল্প কয়েক দিন হেসে [খেলে] নিক, আর [আখেরাতে] বহু দিন [অর্থাৎ অনন্তকাল] কাঁদতে থাকুক, সেই সকল কাজের বিনিময় যা তারা অর্জন করছিল ।

فَاِنْ رَّجَعَكَ اللّٰهُ اِلٰى طَاۗىِٕفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَاْذَنُوْكَ لِلْخُرُوْجِ فَقُلْ لَّنْ تَخْرُجُوْا مَعِيَ اَبَدًا

(৮৩) তখন যদি আল্লাহ আপনাকে [মদিনায়] তাদের কোনো সম্প্রদায়ের প্রতি ফিরিয়ে আনেন, অতঃপর তারা [কোনো জিহাদে] বহির্গত হতে অনুমতি চায়, তবে আপনি এরূপ বলে দিন যে, তোমরা কখনো আমার সঙ্গে [কোনো জিহাদে] বের হবে না

শাব্দিক অনুবাদ

(৮০) اِسْتَغْفِرْ لَهُمْ আপনি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন اَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ অথবা তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা না করেন, [উভয় সমান] اِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ যদি আপনি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন سَبْعِيْنَ مَرَّةً সত্তরবারও فَلَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ তবুও আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ক্ষমা করবেন না ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ এর কারণ এই যে, তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে কুফরি করেছে وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ আর আল্লাহ এমন অবাধ্য লোকদেরকে পথ প্রদর্শন করেন না ।

(৮১) فَرِحَ الْمُخَلَّفُوْنَ এই পশ্চাদবর্তী লোকগণ উৎফুল্ল হয়ে গেল بِمَقْعَدِهِمْ নিজেদের গৃহে বসে থাকার প্রতি خِلٰفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ রাসূলুল্লাহর [যুদ্ধে গমনের] পর وَكَرِهُوْٓا এবং তারা না পছন্দ করল اَنْ يُّجَاهِدُوْا জিহাদ করাকে بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ নিজেদের ধন ও প্রাণ দিয়ে فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ আল্লাহর পথে وَقَالُوْا অধিকন্তু বলতে লাগল لَا تَنْفِرُوْا فِي الْحَرِّ তোমরা [এই ভীষণ] গরমের মধ্যে বের হয়ো না قُلْ আপনি বলে দিন نَارُ جَهَنَّمَ জাহান্নামের আগুন اَشَدُّ حَرًّا অধিক গরম لَوْ كَانُوْا يَفْقَهُوْنَ কি ভালো হতো, যদি তারা বুঝতে পারত ।

(৮২) فَلْيَضْحَكُوْا قَلِيْلًا অতএব, তারা অল্প কয়েক দিন হেসে [খেলে] নিক وَّلْيَبْكُوْا كَثِيْرًا আর [আখেরাতে] বহু দিন [অর্থাৎ অনন্তকাল] কাঁদতে থাকুক جَزَاۗءًۢ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ সেই সকল কাজের বিনিময় যা তারা অর্জন করছিল ।

(৮৩) فَاِنْ رَّجَعَكَ اللّٰهُ তখন যদি আল্লাহ আপনাকে [মদিনায়] ফিরিয়ে আনেন اِلٰى طَاۗىِٕفَةٍ مِّنْهُمْ তাদের কোনো সম্প্রদায়ের প্রতি فَاسْتَاْذَنُوْكَ অতঃপর তারা [কোনো জিহাদে] অনুমতি চায় لِلْخُرُوْجِ বহির্গত হতে فَقُلْ তবে আপনি এরূপ বলে দিন যে لَّنْ تَخْرُجُوْا مَعِيَ اَبَدًا তোমরা কখনো আমার সঙ্গে [কোনো জিহাদে] বের হবে না

অনুবাদ	আয়াত
অনুবাদ : এবং আমার সঙ্গে হয়ে কোনো শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধও করবে না, তোমরা পূর্বেও বসে থাকাকে পছন্দ করেছিলে, অতএব, সেই সকল লোকদের সঙ্গে বসে থাক যারা পশ্চাদবর্তী থাকার যোগ্য।	وَلَنْ تُقَاتِلُوْا مَعِيَ عَدُوًّا ۚ اِنَّكُمْ رَضِيْتُمْ بِالْقُعُوْدِ اَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوْا مَعَ الْخٰلِفِيْنَ (٨٣)
(৮৪) আর তাদের মধ্য হতে কেউ মরে গেলে তার উপর কখনো [জানাযার] নামাজ পড়বেন না এবং তার কবরের নিকটেও দাঁড়াবেন না, তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে কুফরি করেছে এবং তারা কুফরের অবস্থাতেই মরেছে।	وَلَا تُصَلِّ عَلٰٓى اَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّاتَ اَبَدًا وَّلَا تَقُمْ عَلٰى قَبْرِهٖ ۚ اِنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَمَاتُوْا وَهُمْ فٰسِقُوْنَ (٨٤)
(৮৫) আর তাদের ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততি আপনাকে যেন বিস্মিত না করে, আল্লাহ তা'আলা কেবল এটাই চাচ্ছেন, সেই সমস্ত বস্তুর কারণে দুনিয়াতে তাদেরকে আজাবে আবদ্ধ রাখেন এবং তাদের প্রাণবায়ু কুফরের অবস্থায়ই বের হয়।	وَلَا تُعْجِبْكَ اَمْوَالُهُمْ وَاَوْلَادُهُمْ ۚ اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ اَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كٰفِرُوْنَ (٨٥)
(৮৬) আর যখনই কুরআনের কোনো অংশ এই বিষয়ে নাজিল করা হয় যে, তোমরা আল্লাহর উপর ঈমান আন এবং তাঁর রাসূলের সঙ্গী হয়ে জিহাদ কর, তখন তাদের মধ্যকার ক্ষমতাবান ব্যক্তিরা আপনার নিকট অব্যাহতি চায় এবং বলে, আমাদেরকে অনুমতি দিন, আমরাও এখানে অবস্থানকারীদের সঙ্গে থেকে যাই।	وَاِذَآ اُنْزِلَتْ سُوْرَةٌ اَنْ اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَجَاهِدُوْا مَعَ رَسُوْلِهِ اسْتَاْذَنَكَ اُولُوا الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوْا ذَرْنَا نَكُنْ مَّعَ الْقٰعِدِيْنَ (٨٦)

শাব্দিক অনুবাদ

وَلَنْ تُقَاتِلُوْا مَعِيَ عَدُوًّا এবং আমার সঙ্গে হয়ে কোনো শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধও করবে না اِنَّكُمْ رَضِيْتُمْ তোমরা পছন্দ করেছিলে بِالْقُعُوْدِ বসে থাকাকে اَوَّلَ مَرَّةٍ পূর্বেও فَاقْعُدُوْا مَعَ الْخٰلِفِيْنَ অতএব, সেই সকল লোকদের সঙ্গে বসে থাক যারা পশ্চাদবর্তী থাকার যোগ্য।

(৮৪) وَلَا تُصَلِّ আর [জানাযার] নামাজ পড়বেন না عَلٰٓى اَحَدٍ তার উপর مِّنْهُمْ তাদের মধ্য হতে مَّاتَ কেউ মরে গেলে اَبَدًا কখনো وَلَا تَقُمْ عَلٰى قَبْرِهٖ এবং তার কবরের নিকটেও দাঁড়াবেন না اِنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে কুফরি করেছে وَمَاتُوْا وَهُمْ فٰسِقُوْنَ এবং তারা কুফরের অবস্থাতেই মরেছে।

(৮৫) وَلَا تُعْجِبْكَ আর আপনাকে যেন বিস্মিত না করে اَمْوَالُهُمْ وَاَوْلَادُهُمْ তাদের ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততি اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ আল্লাহ তা'আলা কেবল এটাই চাচ্ছেন اَنْ يُّعَذِّبَهُمْ بِهَا সেই সমস্ত বস্তুর কারণে তাদেরকে আজাবে আবদ্ধ রাখেন فِي الدُّنْيَا দুনিয়াতে وَتَزْهَقَ اَنْفُسُهُمْ এবং তাদের প্রাণবায়ু বের হয় وَهُمْ كٰفِرُوْنَ কুফরের অবস্থায়ই ।

(৮৬) وَاِذَآ اُنْزِلَتْ سُوْرَةٌ আর যখনই কুরআনের কোনো অংশ এই বিষয়ে নাজিল করা হয় যে اَنْ اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ তোমরা আল্লাহর উপর ঈমান আন وَجَاهِدُوْا مَعَ رَسُوْلِهِ এবং তাঁর রাসূলের সঙ্গী হয়ে জিহাদ কর اسْتَاْذَنَكَ তখন আপনার নিকট অব্যাহতি চায় اُولُوا الطَّوْلِ مِنْهُمْ তাদের মধ্যকার ক্ষমতাবান ব্যক্তিরা وَقَالُوْا এবং বলে ذَرْنَا আমাদেরকে অনুমতি দিন نَكُنْ مَّعَ الْقٰعِدِيْنَ আমরাও এখানে অবস্থানকারীদের সঙ্গে থেকে যাই।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(৮০) قوله اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** মুনাফিক দলপতি আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালূল যখন মৃত্যুশয্যায় শায়িত, তখন তার পুত্র আব্দুল্লাহ রাসূল ﷺ-এর নিকট এসে তার পিতার ক্ষমা প্রার্থনার জন্য দোয়া করার আবেদন করলেন। সে প্রেক্ষিতে রাসূল ﷺ নরাধম আব্দুল্লাহ বিন উবাই বিন সালূলের জন্য সঙ্গল কামনায় দোয়া করেন। তখন উক্ত আয়াত নাজিল হয়েছে। –[বাহরে মুহীত-৭৭/৫, রুহুল মা'আনী-১৪৮/৫]

(৮১.) قوله فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** ইবনে মারদুভিয়া, জাবের ইবনে আব্দুল্লাহর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, জাদ্দ ইবনে কায়সকে যখন তাবূকের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা থেকে রয়ে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হচ্ছিল সেই মুহূর্তে মুনাফিকদের কতিপয় লোক রাসূল ﷺ-এর পাশে জড়ো হয়। উদ্দেশ্য ছিল তারা রাসূল ﷺ-এর নিকট যুদ্ধে না গিয়ে থেকে যাওয়ার জন্য অনুমতি চাইবে। সুতরাং তারা বলল, হে আল্লাহর রাসূল! স্বগৃহে থেকে যাওয়ার জন্য আমদের অনুমতি দান করুন। কারণ প্রচণ্ড গরম বাইরে যাওয়া আমাদের শক্তি সামর্থ্য ও ধৈর্যের বাইরে। রাসূল ﷺ তাদের থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে তাদেরকে থেকে যাওয়ার জন্য অনুমতি দিলেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا আয়াত আল্লাহ তা'আলা নাজিল করেন।

৮৩. قوله فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِنْهُمْ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** ইবনে আব্বাস (রা.) কর্তৃক বর্ণিত রয়েছে, তিনি বলেন যে, তাবূক অভিযানকালে জনৈক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রাসূল! গরম অতি বেশি, বের হবার মতো সাহস করছি না, সুতরাং এহেন গরমি মৌসুমে আপনি বের হবেন না। তখন قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا নাজিল হয়। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বের হবার নির্দেশ প্রদান করেন। তখন কতক লোকেরা পশ্চাতে থেকে যায় এক বর্ণনা মতে তারা বারোজন মুনাফিক থেকে যায়। পরবর্তীতে তাদের মানসপটে অনুভূতির সৃষ্টি হয়। সুতরাং তারা ভাবল যে, আমরা তো ভালো কাজ করিনি। তাই তাদের থেকে তিনজন যাত্রা করে রাসূল ﷺ-এর সাথে মিলিত হয়। রাসূল ﷺ-এর নিকট পৌঁছে তারা তওবা করে নেয়। অতঃপর যখন মদিনায় প্রত্যাবর্তন করে, তখন উক্ত আয়াত এবং পরবর্তী আয়াতের وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা নাজিল করেন। –[তাবারী-৪৩৮/৬]

(৮৪) قوله وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا الخ **আয়াতের শানে নুযূল : ইমাম বুখারী ও মুসলিম প্রমুখ হযরত ইবনে ওমর** (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন– আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালূল যখন মৃত্যুবরণ করে তখন তার পুত্র আব্দুল্লাহ হযরত রাসূলে কারীম ﷺ-এর নিকট গিয়ে রাসূলের একটি জামার আবেদন করল, তাতে তার পিতাকে কাফন দেওয়ার জন্য। সুতরাং রাসূল ﷺ তাকে একটি জামা মুবারক দান করেন। অতঃপর রাসূল ﷺ-কে জানাযার নামাজ পড়িয়ে দেওয়ার জন্য আবেদন করলে রাসূল ﷺ জানাযার উদ্দেশ্যে দাঁড়ান। তখনই হযরত ওমর (রা.) উঠে রাসূল ﷺ-এর জামা টেনে ধরে বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি তার জানাযার নামাজ আদায় করবেন? অথচ আল্লাহ তো আপনাকে মুনাফিকের উপর নামাজ আদায় করতে নিষেধ করেছেন। রাসূল ﷺ বললেন, এ ব্যাপারে আমার রব আমার উপর ছেড়ে (স্বাধীনতা) দিয়ে দিয়েছেন। –[ফাতহুল কাদীর- ৩৯০/২, রুহুল মা'আনী-১৫৩/৫, দুররে মানছূর-২৬৬/৩, তাবারী- ৪৩৯/৬, কুরতুবী- ২০০/৮]

৮৫. قوله وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** হযরত কাতাদা (রা.) বলেন, রাসূল ﷺ আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইকে জামা দান করার কারণে এ নিয়ে সাহাবায়ে কেরাম পরস্পরে আলোচনা পর্যালোচনা করতে লাগলেন। রাসূল ﷺ বললেন, আমার জামা তার কোনো উপকারেই আসবেনা। আল্লাহর কসম! এর দ্বারা বনূ খাযরাজের হাজারের ও অধিক মানুষ মুসলমান হয়ে যাক, তাই আমি ধারণা করি। তখন রাসূল ﷺ এমন প্রত্যাশা ব্যক্ত করার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা উক্ত আয়াত নাজিল করেন। –[দুররে মানছুর-২৬৬/৩]

এখানে উপর থেকেই মুনাফিকদের অবস্থার বর্ণনা ধারাবাহিকভাবে চলে আসতেছে, যারা সাধারণ নির্দেশ আসার পরেও তাবূক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি। আলোচ্য আয়াতগুলোতেও তাদেরই এক বিশেষ অবস্থার কথা বলা হয়েছে এবং এ কারণে তাদের প্রতি আখেরাতের শাস্তি, দুনিয়াতে ভবিষ্যতের জন্য তাদের নাম মুজাহিদীনের তালিকা থেকে কেটে দেওয়া এবং পরবর্তী কোনো জিহাদে তাদেরকে অংশগ্রহণ করতে না দেওয়ার বিষয় আলোচনা করা হয়েছে।

مُخَلَّفُونَ শব্দটি مُخَلَّفٌ -এর বহুবচন। অর্থ– 'পরিত্যক্ত'। অর্থাৎ যাকে পরিহার করা বা ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এরা নিজেরা একথা মনে করে আনন্দিত হচ্ছে যে, আমরা নিজেদেরকে বিপদের হাত থেকে

www.almodina.com

বাঁচিয়ে নিতে পেরেছি এবং জিহাদে শামিল হতে হয়নি, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তা'আলা তাদের এহেন সম্মান পাবার যোগ্য মনে করেননি। কাজেই এরা জিহাদ 'বর্জনকারী' নয়; বরং জিহাদ থেকে 'বর্জিত'। কারণ রাসূলুল্লাহ ﷺ -ই তাদেরকে বর্জনযোগ্য মনে করেছেন।

خِلَافَ رَسُوْلِ اللّٰهِ এতে خِلَافٌ অর্থাৎ 'পিছনে' বা 'পরে'। হযরত আবূ ওবায়দা (রা.) এ অর্থই গ্রহণ করেছেন। তাতে এর মর্মার্থ দাঁড়ায় এই যে, এরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জিহাদে চলে যাবার পর তাঁর পিছনে রয়ে যেতে পারল বলে আনন্দিত হচ্ছে যা বাস্তবিকপক্ষে আনন্দের বিষয়ই নয়। بِمَقْعَدِهِمْ শব্দটি এখানে قُعُوْدٌ (বসে থাকা) এর ধাতুগত অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

দ্বিতীয় অর্থে এক্ষেত্রে خِلَافٌ অর্থ مُخَالَفَتْ তথা বিরোধিতাও হতে পারে। অর্থাৎ রাসূলে কারীম ﷺ -এর নির্দেশের বিরোধিতা করে ঘরে বসে রইল। আর শুধু নিজেরাই বসে রইল না; বরং অন্যান্য লোকদেরকেও একথাই বুঝাল যে, لَا تَنْفِرُوْا فِى الْحَرِّ অর্থাৎ (এমন) গরমের সময়ে জিহাদে বেরিয়ো না।

একথা পূর্বেই জানা গেছে যে, তাবূক যুদ্ধে অভিযান এমন এক সময়ে সংঘটিত হয়েছিল, যখন প্রচণ্ড গরম পড়ছিল। আল্লাহ তা'আলা তাদের এ কথার উত্তর দান প্রসঙ্গে বলেছেন– قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ اَشَدُّ حَرًّا। অর্থাৎ এই হতভাগারা এ সময়ের উত্তাপ তো দেখছ এবং তা থেকে বাঁচার চিন্তা করছে। বস্তুত এর ফলে আল্লাহ ও তার রাসূলের নাফরমানির দরুন যে জাহান্নামের আগুনের সম্মুখীন হতে হবে সে কথা ভাবছেই না। তাহলে কী মওসুমের এ উত্তাপ জাহান্নামের উত্তাপ অপেক্ষা বেশি? অতঃপর বলেন :

فَلْيَضْحَكُوْا قَلِيْلًا এর শাব্দিক অর্থ এই যে, 'হাসো কম, কাঁদো বেশি'। শব্দটি যদিও নির্দেশবাচক পদ আকারে ব্যবহার করা হয়েছে, কিন্তু তাফসীরবিদ মনীষীবৃন্দ একে সংবাদবাচক সাব্যস্ত করেছেন এবং নির্দেশবাচক পদ ব্যবহারের এই তাৎপর্য বর্ণনা করেছেন যে, এমনি ঘটনা অবধারিত ও নিশ্চিত। অথাৎ নিশ্চিতই এমনটি ঘটবে যে, তাদের এ আনন্দ ও হাসি হবে অতি সাময়িক। এটা আখেরাতে তাদেরকে চিরকাল কাঁদতে হবে। এ আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে ইবনে আবী হাতেম (র.) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) -এর রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করেছেন যে, اَلدُّنْيَا قَلِيْلٌ فَلْيَضْحَكُوْا فِيْهَا مَا شَاءُوْا فَاِذَا انْقَطَعَتِ الدُّنْيَا وَصَارُوْا اِلَى اللّٰهِ فَلْيَسْتَأْنِفُوْا الْبُكَاءَ لَا يَنْقَطِعُ اَبَدًا "দুনিয়া সামান্য কয়েক দিনের অবস্থানস্থল, এতে যত ইচ্ছা হেসে নাও। অতঃপর দুনিয়া যখন শেষ হয়ে যাবে এবং আল্লাহর সান্নিধ্যে উপস্থিত হবে, তখনই কান্নার পালা শুরু হবে যা আর নিবৃত্ত হবে না।" –[মাযহারী]

পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে। لَنْ تَخْرُجُوْا এর মর্মার্থ এই যে, এরা যদি ভবিষ্যতে কোনো জিহাদে অংশগ্রহণের ইচ্ছা বা আগ্রহ প্রকাশ করে, তাহলে যেহেতু তাদের অন্তরে ঈমান নেই, সেহেতু এদের সে ইচ্ছাও নিষ্ঠাপূর্ণ হবে না; যখন রওয়ানা হবার সময় হবে, পূর্বেকার মতোই নানা রকম চলছুতার আশ্রয় নিবে। সুতরাং মাহনবী ﷺ -এর প্রতি নির্দেশ হলো যে, তারা নিজেরাও যখন কোনো জিহাদে অংশগ্রহণের কথা বলবে, তখন আপনি প্রকৃত বিষয়টি তাদেরকে বাতলে দিন যে, তোমাদের কোনো কথা বা কাজে বিশ্বাস নেই। তোমরা না যাবে জিহাদে, না আমার পক্ষ হয়ে ইসলামের কোনো শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে।

অধিকাংশ তাফসীরবিদ বলেছেন যে, এ হুকুমটি তাদের জন্য পার্থিব শাস্তি হিসেবে প্রবর্তন করা হয় যে, সত্যিকারভাবে তারা কোনো জিহাদে অংশগ্রহণ করতে চাইলেও যেন তাদেরক অংশগ্রহণ করতে দেওয়া না হয়।

গোটা উম্মতের ঐকমত্যে আলোচ্য সহীহ হাদীসসমূহের মাধ্যমে প্রমাণিত রয়েছে যে, আলোচ্য ৮৪ তম এ আয়াতটি মুনাফিক আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের মৃত্যু ও তার জানাযা সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। সহীহাইন (অর্থাৎ বুখারী ও মুসলিম)-এর রেওয়ায়েতের দ্বারা প্রমাণিত রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তার জানাযায় নামাজ পড়েন। নামাজ পড়ার পরই এর আয়াতটি নাজিল হয় এবং এরপর আর কখনো তিনি কোনা মুনাফিকের জানাযার নামাজ পড়েননি।

সহীহ মুসলিমে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) -এর বর্ণনায় এ আয়াত নাজিলের ঘটনাটি সবিস্তারে উল্লেখ রয়েছে। তা হলো এই যে, আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালূল যখন মারা যায়, তখন তার পুত্র হযরত আব্দুল্লাহ (রা.) যিনি একজন নিষ্ঠাবান মুসলমান ও সাহাবী ছিলেন রাসূল ﷺ -এর নিকট এসে নিবেদন করলেন যে, হুজুর! আপনি আপনার জামাটি দান করুন যাতে আমি তা আমার পিতার কাফনে পরাতে পারি। রাসূলে কারীম ﷺ নিজের জামা মুবারক দিয়ে দিলেন। তারপর আব্দুল্লাহ নিবেদন করেন যে, আপনি তার জানাযার নামাজও পড়াবেন। রাসূল ﷺ তাও কবুল করেন। জানাযার নামাজে দাঁড়ালে হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রা.) রাসূল ﷺ -এর কাপড় আকর্ষণ করে নিবেদন করলেন, আপনি এ মুনাফিকের জানাযা পড়ছেন? অথচ

www.almodina.com

আল্লাহ আপনাকে মুনাফিকের নামাজ পড়তে বারণ করেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আল্লাহই আমাকে এ ব্যাপারে এখতিয়ার দিয়েছেন। মাগফেরাতের দোয়া করব অথবা করব না। আর সে আয়াতে যাতে সত্তর বার মাগফেরাতের দোয়া করলেও ক্ষমা হবেনা বলে উল্লেখ রয়েছে, তা আমি সত্তর বারের বেশিও এস্তেগফার করতে পারি। সে আয়াতের দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সূরা তওবার ঐ আয়াত যা এইমাত্র বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ اِسْتَغْفِرْ لَهُمْ اَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ اِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِيْنَ مَرَّةً فَلَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তার জানাযার নামাজ পড়েন এবং নামাজের পরেই এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। وَلَا تُصَلِّ عَلٰٓى اَحَدٍ (সুতরাং এরপর কখনও তিনি কোনো মুনাফিকের জানাযা পড়েননি।)

উল্লিখিত ঘটনা সম্পর্কে কয়েকটি প্রশ্ন ও তার উত্তর : এখানে প্রথমত প্রশ্ন উঠে এই যে, আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই এমন এক মুনাফিক ছিল যার মুনাফেকি বিভিন্ন সময়ে প্রকাশও পেয়েছিল এবং সে ছিল সব মুনাফিকের সর্দার। কাজেই এর সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ এমন বৈশিষ্টপূর্ণ ব্যাবহার করলেন কেমন করে যে, তার কাফনের জন্য নিজের পবিত্র জামা মুবারক পর্যন্ত দিয়ে দিলেন।

উত্তর এই যে এর দু'টি কারণ থাকতে পারে : এক. তার পুত্র যিনি একজন নিষ্ঠাবান সাহাবী ছিলেন তাঁর আবেদন। অর্থাৎ শুধুমাত্র তাঁর মনস্তুষ্টির জন্যই তিনি এমনটি করেছিলেন। দুই. অপর একটি কারণ এও হতে পারে, যা বুখারীর হাদীসে হযরত জাবের (রা.) -এর রেওয়ায়েতক্রমে উদ্ধৃত রয়েছে যে, গযওয়ায়ে বদরের সময় যখন কিছু কুরাইশ সর্দার বন্দী হয়ে আসে, তদের মধ্যে মহানবী ﷺ-এর চাচা হযরত আব্বাস (রা.) ছিলেন। রাসূল ﷺ দেখলেন তাঁর গায়ে কোর্তা নেই। তখন সাহাবীদেরকে বললেন, তাকে একটি কোর্তা পরিয়ে দেওয়া হোক। হযরত আব্বাস (রা.) ছিলেন দীর্ঘদেহী লোক। আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ছাড়া অন্য কারো কোর্তা তাঁর গায়ে ঠিক মতো লাগছিল না। ফলে আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইর কোর্তা বা কামীস নিয়েই রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজের চাচা হযরত আব্বাস (রা.)-কে পরিয়ে দিয়েছিলেন। তার সে এহসানের বদলা হিসেবেই মহানবী ﷺ নিজের জামা মুবারকখানা তাকে দিয়ে দেন। –[কুরতুবী]

দ্বিতীয় প্রশ্ন : এখানে আরো একটি প্রশ্ন এই যে, হযরত ফারুকে আ'যম (রা.) মহানবী ﷺ -কে যে বললেন যে, আল্লাহ তা'আলা আপনাকে মুনাফিকদের নামাজ পড়তে বারণ করেছেন, তা কিসের ভিত্তিতে বলেছিলেন? কারণ, ইতঃপূর্বে কোনো আয়াতে পরিষ্কারভাবে তাঁকে মুনাফিকের জানাযা পড়তে বারণ করা হয়নি। এতে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, হযরত ওমর ফারুক বারণের বিষয়টি উক্ত সূরা তওবার সাবেক আয়াত اِسْتَغْفِرْ لَهُمْ থেকেই বুঝাতে পেরেছিলেন। এক্ষত্রে আবারো প্রশ্ন দেখা হয়েছে যে, এ আয়াতটি যদি জানাযার নামাজের বারণের প্রতি ইঙ্গিত করে থাকে, তবে মহানবী ﷺ একে বারণ হওয়া সাব্যস্ত করলেন না কেন? বরং তিনি বললেন যে, এ আয়াতে আমাকে অধিকার দেওয়া হয়েছে।

উত্তর : প্রকৃতপক্ষে আয়াতের শব্দাবলির বাহ্যিক মর্ম হচ্ছে এখতিয়ার দান। তাছাড়া একথাও সুস্পষ্ট যে, সত্তর বারের উল্লেখ নির্দিষ্টতা বুঝাবার জন্য নয়; বরং আধিক্য বুঝাবার জন্য। সুতরাং উক্ত আয়াতের সারমর্ম এর বাহ্যিক অর্থ অনুযায়ী এই হবে যে, মুনাফিকদের মাগফেরাত হবে না, যতবারই তাদের জন্য আপনি ক্ষমা প্রার্থনা করুন না কেন। কিন্তু এখানে পরিষ্কারভাবে তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে রাসূল ﷺ-কে বারণ করা হয়নি। কুরআন কারীমের অপর এরক আয়াতে যা সূরা ইয়াসীনে উক্ত হয়েছে তাতে এর উদাহরণও রয়েছে। তাতে বলা হয়েছে سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَاَنْذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ এ আয়াতে মহানবী ﷺ-কে দীনের তাবলীগ ও ভীতি প্রদর্শনে বারণ করা হয়নি; বরং অন্যান্য আয়াাতের দ্বারা তাবলীগ ও দাওয়াতের কাজ তাদের জন্যও অব্যাহত রাখা প্রমাণিত হয় – اِنَّمَآ اَنْتَ مُنْذِرٌ وَّلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ অথবা بَلِّغْ مَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ প্রভৃতি।

সারকথা এই যে, ءَاَنْذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ আয়াতের দ্বারা তো মহানবী ﷺ কে ভীতি প্রদর্শন ব্যাপারে স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে, তদুপরি বর্তমান আলোচ্য আয়াতে নির্দিষ্ট দলিলের মাধ্যমে ভীতি প্রদর্শনের ধারাকে অব্যাহত রাখা প্রমাণিত হয়ে গেল। মহানবী ﷺ উল্লিখিত আয়াতের মাধ্যমে একথা বুঝে নিতে পেরেছিলেন যে, তাদের মাগফেরাত হবে না। কিন্তু অপর কোনো আয়াতের মাধ্যমে এ পর্যন্ত তাঁকে ভীতি প্রদর্শনেও বাধা দেওয়া হয়নি।

আর মহানবী ﷺ জানতেন যে, তার জামার কারণে কিংবা জানাযা পড়ার দরুন তার মাগফেরাত হবে না, কিন্তু এতে অন্যান্য দীনি কল্যাণ সাধিত হওয়ার আশা করা যায়। এতে হয়তো তার পরিবারের লোক ও অন্যান্য কাফেররা যখন রাসূল ﷺ -এর এহেন সৌজন্যমূলক আচরণ লক্ষ্য করবে, তখন তারাও ইসলামের নিকটবর্তী হবে এবং মুসলমান হয়ে যাবে। তাছাড়া তখনো পর্যন্ত যেহেতু (মুনাফেকির) জানাযা পড়ার সরাসরি নিষেধাজ্ঞা ছিল না। সেহেতু তিনি তার জানাযা পড়েছেন।

এ উত্তরের সমর্থন হয়তো সহীহ বুখারীর বাক্যেও পাওয়া যাবে, যা হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, আমি যদি জানতে পারতাম, সত্তরবারের বেশি দোয়া ও মাগফেরাত কামনায় তার মাগফেরাত হয়ে যাবে, তাহলে আমি তাও করতাম। –[কুরতুবী]

দ্বিতীয় প্রমাণ হলো, সে হাদীস যাতে মহানবী ﷺ বলেছেন, আমার জামা তাকে আল্লাহর আজাব থেকে বাঁচাতে পারবে না। তবে আমি এ কাজটি এ জন্য করেছি যে, আমার আশা, এ কাজের ফলে তার সম্প্রদায়ের হাজারো লোক মুসলমান হয়ে যাবে। সুতরাং মাগাযী এবং কোনো কোনো তাফসীরগ্রন্থে উদ্ধৃত রয়েছে যে, এ ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করে খাযরাজ গোত্রের এক হাজার লোক মুসলমান হয়ে যায়।

মোটকথা, পূর্ববর্তী আয়াতসমূহের মাধ্যমে স্বয়ং রাসূল ﷺ-এরও এ বিশ্বাস হয়ে গিয়েছিল যে, তার এ কাজের দরুন এই মুনাফিকের মাগফেরাত তথা পাপ মুক্তি হবে না, কিন্তু যেহেতু আয়াতের শব্দাবলিতে বাহ্যত এই অধিকার দেওয়া হয়েছিল; অন্য কোনো আয়াতের মাধ্যমে নিষেধও করা হয়নি এবং যেহেতু অপর দিকে একজন কাফেরের প্রতি ইহসান করার মধ্যে পৃথিবীর কল্যাণের আশাও বিদ্যমান ছিল এবং এ ব্যবহারের দ্বারাও অন্যান্য কাফেরদের মুসলমান হওয়ার আশা ছিল,. কাজেই তিনি নামাজ পড়াকেই অগ্রাধিকার দান করেছিলেন। আর ফারূকে আযম (রা.) বুঝেছিলেন যে, এ আয়াতের দ্বারা যখন প্রমাণিত হয়ে গেছে যে, মাগফেরাত হবে না, তখন তার জন্য নামাজে জানাযা পড়ে মাগফেরাত প্রার্থনা করাটা একটা অহেতুক কাজ, যা নবুয়তের শানের খেলাফ। আর একেই তিনি নিষেধাজ্ঞা হিসাবে প্রকাশ করেছেন। পক্ষান্তরে রাসূলে মাকবুল ﷺ যদিও এ কাজটিকে মূলত কল্যাণকর মনে করতেন না, কিন্তু অন্যাণ্যদের ইসলাম গ্রহণের পক্ষে সহায়ক হওয়ার প্রেক্ষিতে তা অহেতুক ছিল না। এভাবে না রাসূলে কারীম ﷺ -এর কাজের উপর কোনো আপত্তি থাকে, না ফারূকে আজম (রা.) -এর কথায় কোনো প্রশ্ন উঠতে পারে। –[বয়ানুল কুরআন]

উল্লিখিত আয়াতগুলোতেও সেসব মুনাফিকের কথাই বর্ণনা করা হয়েছে যারা তাবূক যুদ্ধে অংশগ্রহণে নানা রকম ছলনার আশ্রয়ে বিরত থেকে ছিল। সেসব মুনাফিকদের মাঝে কেউ কেউ সম্পদশালী লোকও ছিল। তাদের অবস্থা থেকে মুসলমানদের ধারণা হতে পারত যে, এরা যখন আল্লাহর নিকট ধিকৃত, তখন দুনিয়াতে এরা কেন এসব নিয়ামত পাবে?

এর উত্তরে ৮৫ নং আয়াতে বলা হয়েছে যে, যদি লক্ষ্য করে দেখা যায়, তবে দেখা যাবে, তদের এ ধন সম্পদ ও সন্তান সন্ততি কোনো রহমত ও নিয়ামত নয়; বরং পার্থিব জীবনেও এগুলো তাদের জন্য আজাব বিশেষ। আখেরাতের আজাব তো এর বাইরে আছেই। দুনিয়াতে আজাব হওয়ার ব্যাপারটি এভাবে যে, ধনসম্পদের মহব্বত, তার রক্ষণাবেক্ষণ ও বৃদ্ধির চিন্তা ভাবনা তদেরকে এমন কঠিনভাবে পেয়ে বসে যে, কোনো সময় কোনো অবস্থাতেই স্বস্তি পেতে দেয় না। আরাম-আয়েশের যত উপকরণই তাদের থাক না কেন, তাদের ভাগ্যে সে আরাম জুটে না যা মনে শান্তি ও স্বস্তি হিসাবে গণ্য হতে পারে। এছাড়া দুনিয়ার এসব ধনসম্পদ যেহেতু তাদেরকে আখেরাত সম্পর্কে গাফেল করে দিয়ে কুফর ও পাপে নিমজ্জিত করে রাখার কারণ হয়ে থাকে, সেহেতু আজাবের কারণ হিসাবেও এগুলোকে আজাব বলা যেতে পারে। এ কারণেই কুরআনের ভাষায় لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا বলা হয়োছে। আল্লাহ তা'আলা এ সমস্ত ধনসম্পদের মাধ্যমেই তাদেরকে শাস্তি দিতে চান।

أُولُو الطَّوْلِ শব্দটি সম্পন্ন লোকদের নির্দিষ্ট করার জন্য ব্যবহৃত হয়নি: বরং এর দ্বারা যারা অসম্পন্ন এতে তাদের অবস্থা সুস্পষ্টভাবে বুঝা গেল যে, তাদের কাছে একটা বহ্যিক ওজরও ছিল (যার ভিত্তিতে তারা যুদ্ধে অংশগ্রহণে অব্যাহতি কামনা করতে পারত)।

শব্দ বিশ্লেষণ

مُخَلَّفُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم مفعول বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّخْلِيْفُ মূলবর্ণ (خ ـ ل ـ ف) জিনস صحيح অর্থ– সে পিছনে থেকে যায়।

لِيَضْحَكُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ امر غائب معروف বাব سَمِعَ মাসদার اَلضِّحْكُ মূলবর্ণ (ض ـ ح ـ ك) জিনস صحيح অর্থ– তারা যেন হেসে নেয়।

لِيَبْكُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ امر غائب معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْبُكَاءُ মূলবর্ণ (ب ـ ك ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– তারা যেন কেঁদে নেয়।

تَزْهَقُ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ اثبات فعل مضارع معروف বাব سَمِعَ মাসদার اَلزَّهْقُ মূলবর্ণ (ز ـ ه ـ ق) জিনস صحيح অর্থ– সে অবলুপ্ত হবে, সে চলে যাচ্ছে।

ذَرْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব سَمِعَ মাসদার اَلْوَذْرُ মূলবর্ণ (و ـ ذ ـ ر) জিনস مثال واوى অর্থ– আপনি ছেড়ে দিন।

رَضُوۡا بِاَنۡ يَّكُوۡنُوۡا مَعَ الۡخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلٰى قُلُوۡبِهِمۡ فَهُمۡ لَا يَفۡقَهُوۡنَ (٨٧)

অনুবাদ : (৮৭) এরা অন্তঃপুরবাসিনী নারীদের সঙ্গে থাকতে সম্মত হলো এবং তাদের অন্তরসমূহের উপর মোহর লেগে গেল, কাজেই তারা বুঝে না।

لٰكِنِ الرَّسُوۡلُ وَالَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا مَعَهٗ جٰهَدُوۡا بِاَمۡوَالِهِمۡ وَاَنۡفُسِهِمۡ ؕ وَاُولٰٓئِكَ لَهُمُ الۡخَيۡرٰتُ ۫ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الۡمُفۡلِحُوۡنَ (٨٨)

(৮৮) কিন্তু রাসূল ও তাঁর সঙ্গীদের মধ্যে যারা মুসলমান ছিল তারা [অবশ্যই এই আদেশ মানল এবং] নিজেদের ধনসম্পদ ও প্রাণ দ্বারা জিহাদ করল, আর তাদেরই জন্য রয়েছে যাবতীয় কল্যাণ এবং তারাই হচ্ছে সফলকাম।

اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمۡ جَنّٰتٍ تَجۡرِىۡ مِنۡ تَحۡتِهَا الۡاَنۡهٰرُ خٰلِدِيۡنَ فِيۡهَا ؕ ذٰلِكَ الۡفَوۡزُ الۡعَظِيۡمُ (٨٩)

(৮৯) আল্লাহ তাদের জন্য এমন উদ্যানসমূহ প্রস্তুত করে রেখেছেন যে, তাদের নিম্নদেশ দিয়ে নহরসমূহ বয়ে চলবে, আর তারা তাতে অনন্তকাল অবস্থান করবে, এটা হচ্ছে [তাদের] বিরাট সফলতা।

وَجَآءَ الۡمُعَذِّرُوۡنَ مِنَ الۡاَعۡرَابِ لِيُؤۡذَنَ لَهُمۡ وَقَعَدَ الَّذِيۡنَ كَذَبُوا اللّٰهَ وَرَسُوۡلَهٗ ؕ سَيُصِيۡبُ الَّذِيۡنَ كَفَرُوۡا مِنۡهُمۡ عَذَابٌ اَلِيۡمٌ (٩٠)

(৯০) আর গ্রামবাসীদের মধ্য হতে কতিপয় বাহানাকারী লোক আসল, যেন তারা অনুমতি পায়, আর যারা আল্লাহ তা'আলার সাথে ও তাঁর রাসূলের সাথে সম্পূর্ণরূপেই মিথ্যা বলেছিল, তারা একেবারেই বসে রইল, তাদের মধ্যে যে সকল লোকেরা কাফের থাকবে, তাদের যন্ত্রণাময় আজাব হবে।

لَيۡسَ عَلَى الضُّعَفَآءِ وَلَا عَلَى الۡمَرۡضٰى وَلَا عَلَى الَّذِيۡنَ لَا يَجِدُوۡنَ مَا يُنۡفِقُوۡنَ حَرَجٌ

(৯১) দুর্বল লোকদের উপর কোনো গুনাহ নেই, আর না রুগ্‌ণদের উপর, আর না সে সমস্ত লোকদের উপর যাদের খরচ করার সামর্থ্য নেই,

শাব্দিক অনুবাদ

(৮৭) رَضُوۡا এরা সম্মত হলো بِاَنۡ يَّكُوۡنُوۡا مَعَ الۡخَوَالِفِ অন্তঃপুরবাসিনী নারীদের সঙ্গে থাকতে وَطُبِعَ عَلٰى قُلُوۡبِهِمۡ এবং তাদের অন্তরসমূহের উপর মোহর লেগে গেল فَهُمۡ لَا يَفۡقَهُوۡنَ কাজেই তারা বুঝে না।

(৮৮) لٰكِنِ الرَّسُوۡلُ কিন্তু রাসূল وَالَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا مَعَهٗ ও তাঁর সঙ্গীদের মধ্যে যারা মুসলমান ছিল তারা جٰهَدُوۡا بِاَمۡوَالِهِمۡ وَاَنۡفُسِهِمۡ নিজেদের ধনসম্পদ ও প্রাণ দ্বারা জিহাদ করল وَاُولٰٓئِكَ لَهُمُ الۡخَيۡرٰتُ আর তাদেরই জন্য রয়েছে যাবতীয় কল্যাণ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الۡمُفۡلِحُوۡنَ এবং তারাই হচ্ছে সফলকাম।

(৮৯) اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمۡ আল্লাহ তাদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন যে جَنّٰتٍ এমন উদ্যানসমূহ تَجۡرِىۡ مِنۡ تَحۡتِهَا الۡاَنۡهٰرُ তাদের নিম্নদেশ দিয়ে নহরসমূহ বয়ে চলবে خٰلِدِيۡنَ فِيۡهَا আর তারা তাতে অনন্তকাল অবস্থান করবে ذٰلِكَ الۡفَوۡزُ الۡعَظِيۡمُ এটা হচ্ছে [তাদের] বিরাট সফলতা।

(৯০) وَجَآءَ الۡمُعَذِّرُوۡنَ مِنَ الۡاَعۡرَابِ আর গ্রামবাসীদের মধ্য হতে কতিপয় বাহানাকারী লোক আসল لِيُؤۡذَنَ لَهُمۡ যেন তারা অনুমতি পায় وَقَعَدَ আর তারা একেবারেই বসে রইল الَّذِيۡنَ كَذَبُوا اللّٰهَ وَرَسُوۡلَهٗ যারা আল্লাহ তা'আলার সাথে ও তাঁর রাসূলের সাথে সম্পূর্ণরূপেই মিথ্যা বলেছিল سَيُصِيۡبُ الَّذِيۡنَ كَفَرُوۡا مِنۡهُمۡ তাদের মধ্যে যে সকল লোকেরা কাফের থাকবে তাদের হবে عَذَابٌ اَلِيۡمٌ যন্ত্রণাময় আজাব।

(৯১) لَيۡسَ عَلَى الضُّعَفَآءِ দুর্বল লোকদের উপর নেই وَلَا عَلَى الۡمَرۡضٰى আর না রুগ্‌ণদের উপর وَلَا عَلَى الَّذِيۡنَ لَا يَجِدُوۡنَ مَا يُنۡفِقُوۡنَ আর না সে সমস্ত লোকদের উপর যাদের খরচ করার সামর্থ্য নেই حَرَجٌ কোনো গুনাহ

إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (٩١)

অনুবাদ : যখন এই সমস্ত লোক আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূলের প্রতি নিষ্ঠা রাখে, [এবং আন্তরিকতার সাথে আনুগত্য করে তবে] এই সকল নেককারদের প্রতি কোনো প্রকার অভিযোগ নেই, আর আল্লাহ তা'আলা অতি ক্ষমাশীল, পরম করুণাময়।

وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوا وَّأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنفِقُونَ (٩٢)

(৯২) আর সেই লোকদের উপরও নয়, যখন তারা আপনার নিকট এই উদ্দেশ্যে আসে যে, আপনি তাদেরকে বাহন দান করেন, আর আপনি বলে দিন যে, আমার নিকট তো কোনো কিছুই নেই, যার উপর আমি তোমাদেরকে আরোহণ করাই, তখন তারা এমন অবস্থায় ফিরে যায় যে, তাদের চক্ষুসমূহ হতে অশ্রু বইতে থাকে এই অনুতাপে যে, তাদের ব্যয় করার মতো কোনো সম্বল নেই।

إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيَاءُ ۚ رَضُوا بِأَن يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (٩٣)

৯৩. এক কথায় অভিযোগ তো কেবলমাত্র সেই লোকদের উপরই যারা সরঞ্জামওয়ালা হওয়া সত্ত্বেও [যুদ্ধে গমন না করার] অনুমতি চাইছে, তারা অন্তঃপুরবাসিনী মহিলাদের সঙ্গে থাকতে রাজি হলো এবং আল্লাহ তাদের অন্তরসমূহের উপর মোহর মেরে দিলেন, কাজেই তারা [পাপ-পুণ্যকে] জানেই না।

শাব্দিক অনুবাদ

إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ **যখন এই সমস্ত লোক আল্লাহ তা'আলা ও তাঁরা রাসূলের প্রতি নিষ্ঠা রাখে** مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ **এই সকল নেককারদের প্রতি কোনো প্রকার অভিযোগ নেই** وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ **আর আল্লাহ তা'আলা অতি ক্ষমাশীল, পরম করুণাময়।**

(৯২) وَلَا عَلَى الَّذِينَ **আর সেই লোকদের উপরও নয়** إِذَا مَا أَتَوْكَ **যখন তারা আপনার নিকট এই উদ্দেশ্যে আসে যে** لِتَحْمِلَهُمْ **আপনি তাদেরকে বাহন দান করেন** قُلْتَ **আর আপনি বলে দিন যে** لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ **আমার নিকট তো কোনো কিছুই নেই যার উপর আমি তোমাদেরকে আরোহণ করাই** تَوَلَّوا **তখন তারা এমন অবস্থায় ফিরে যায় যে** وَّأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ **তাদের চক্ষুসমূহ হতে অশ্রু বইতে থাকে** حَزَنًا **এই অনুতাপে যে** أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنفِقُونَ **তাদের ব্যয় করার মতো কোনো সম্বল নেই।**

(৯৩) إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ **এক কথায় অভিযোগ তো কেবলমাত্র সেই লোকদের উপরই** يَسْتَأْذِنُونَكَ **যারা অনুমতি চাইছে** وَهُمْ أَغْنِيَاءُ **সরঞ্জামওয়ালা হওয়া সত্ত্বেও** رَضُوا **তারা রাজি হলো** بِأَن يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ **অন্তঃপুরবাসিনী মহিলাদের সঙ্গে থাকতে** وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ **এবং আল্লাহ তাদের অন্তরসমূহের উপর মোহর মেরে দিলেন** فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ **কাজেই তারা [পাপ-পুণ্যকে] জানেই না।**

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

৯০. قوله وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ الخ আয়াতের শানে নুযূল : আসাদ ও গাতফান গোত্রদ্বয়ের লোকজন এসে দুঃসহ জীবনযাপন ও পরিবারে অধিক লোকজনের কথা প্রকাশ করে যুদ্ধে যাওয়া থেকে বিরত থেকে নিজ পরিবারের লোকজনের পাশে থাকার প্রয়োজনীতার কথা বলে ওজর পেশ করে। তাদের এ ওজরের পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়েছে। -[নূরুল কুলূব]

বিশ্লেষণের দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, এসব বেদুইন যাদের মধ্যে দু'রকম লোক ছিল। এক. যারা ছলচ্ছুতা পেশ করার জন্য মহানবী ﷺ -এর খেদমতে হাজির হয় যাতে তাদেরকে জিহাদে যাওয়ার ব্যাপারে অব্যাহতি দান করা হয়। আর কিছু লোক ছিল এমন উদ্ধত যারা অব্যাহতি লাভের তোয়াক্কা না করেই নিজ নিজ অবস্থানে নিজের মতোই বসে থাকে।

হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন জাদ্দ ইবনে কায়েসকে জিহাদে না যাবার অনুমতি দিয়ে দেন, তখন কতিপয় মুনাফিকও খেদমতে উপস্থিত হয়ে কিছু কিছু ছলছুতা পেশ করে জিহাদ বর্জনের অনুমতি প্রার্থনা করে। এতে তিনি অনুমতি অবশ্য দিয়ে দেন, কিন্তু একথাও বুঝতে পারেন যে, এরা মিথ্যা ওজর পেশ করেছে। কাজেই তাদের ব্যাপারে অমনোযোগিতা প্রদর্শন করেন। এরই প্রেক্ষিতে আয়াতটি নাজিল হয়। এতে বাতলে দেওয়া হয়েছে যে, তাদের ওজর গ্রহণযোগ্য নয়। ফলে তাদেরকে বেদনাদায়ক আজাবের দুঃসংবাদ শুনিয়ে দেওয়া হয়। অবশ্য এরই সঙ্গে اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ বলে ইঙ্গিত করে দিয়েছেন যে, এদের মধ্যে কারো কারো ওজর কুফরি ও মুনাফেকির কারণে ছিল না; বরং স্বভাবগত আলস্যের কারণে ছিল। এরা এই কাফেরদের আজাবের আওতাভুক্ত নয়।

قوله لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضٰى الخ : বিগত আয়াতসমূহে এমন সব লোকের অবস্থা বর্ণিত হয়েছিল যারা প্রকৃতপক্ষে জিহাদে অংশগ্রহণে অপারগ ছিল না, কিন্তু শৈথিল্য অজুহাত দর্শিয়ে তা থেকে বিরত রয়েছে কিংবা এমন সব মুনাফিকরা বিরত থেকেছে, যারা নিজেদের কুফরি ও কুটিলতা হেতু নানা রকম ছলছুতার আশ্রয়ে রাসূলে কারীম ﷺ-এর কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে নিয়েছিল। তাছাড়া এতে এমন কিছু উদ্ধত লোকও ছিল যারা অজুহাত দর্শিয়েও অনুমতি গ্রহণের কোনো প্রয়োজনবোধ করেনি, এমনিতেই বিরত থেকে গেছে। এদের অপারগ না হওয়া এবং তাদের মধ্যে যারা কুফরিতে লিপ্ত ছিল, তাদের বেদনাদায়ক আজাব হওয়ার ব্যাপরটি বিগত আয়াতসমূহে বিবৃত হয়েছে।

উপরোল্লিখিত আয়াতসমূহে সে সমস্ত নিষ্ঠাবান মুসলমানদের কথা আলোচনা করা হচ্ছে যারা প্রকৃতই অপারগতার দরুন জিহাদে অংশগ্রহণে অসমার্থ্য ছিল। এদের মধ্যে কিছু লোক ছিল অন্ধ বা অসুস্থতার কারণে অপারগ এবং যাদের অপারগতা ছিল একান্ত সুস্পষ্ট। আর কিছু লোক ছিল যারা জিহাদে অংশগ্রহণের জন্য প্রস্তুত ছিল; বরং জিহাদে যাবার জন্য ব্যাকুল হয়েছিল, কিন্তু তাদের কাছে সফর করার জন্য সওয়ারীর কোনো জীব ছিল না। বস্তুত সফর ছিল সুদীর্ঘ এবং মওসুমটি ছিল গরমের। তারা নিজেদের জিহাদি উদ্দীপনা এবং সওয়ারির অভাবে তাতে অংশগ্রহণে অপরাগতার কথা জানিয়ে রাসূলে কারীম ﷺ-এর নিকট আবেদন করে যে, আমাদের জন্য সওয়ারির কোনো ব্যবস্থা করা হোক।

তাফসীরের গ্রন্থসমূহে এ ধরনের একাধিক ঘটনার কথা লেখা হয়েছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এমন হয়েছে যে, প্রথমে রাসূলে কারীম ﷺ তাদের কাছে নিজের অপারগতা জানিয়ে দেন যে, আমাদের কাছে সওয়ারি বা যানবাহনের কোনো ব্যবস্থা নেই। তাতে তারা অশ্রুসিক্ত অবস্থায় ফিরে যায় এবং কেঁদেই সময় কাটাতে থাকে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্য এ ব্যবস্থা করেন যে, তখনই রাসূল ﷺ-এর নিকট ছয়টি উট এসে যায় এবং তিনি সেগুলো তাদের দিয়ে দেন। –[মাযহারী] তাদের মধ্যে তিনজনের সওয়ারির ব্যবস্থা করেন হযরত উসমান গনী (রা.) অথচ ইতঃপূর্বে তিনি বিপুল পরিমাণ ব্যবস্থা নিজ খরচ করেছিলেন।

আবার অনেক এমন লোকও থেকে যায়, যাদের জন্য শেষ পর্যন্তও কোনো সওয়ারির ব্যবস্থা হয়নি এবং বাধ্য হয়ে, তারা জিহাদে বিরত থাকে। আলোচ্য আয়াতগুলোতে তাদের কথাই বলা হয়েছে, যাদের অপরাগতা আল্লাহ কবুল করে নিয়েছেন। আয়াতের শেষাংশে এ ব্যাপারে সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে যে, বিপদ শুধু তাদের ক্ষেত্রে যারা সামর্থ্য ও শক্তি থাকা সত্ত্বেও জিহাদে অনুপস্থিত থাকাকে নারীদের মতো পছন্দ করে নিয়েছে। إِنَّمَا السَّبِيْلُ عَلَى الَّذِيْنَ يَسْتَأْذِنُوْنَكَ وَهُمْ أَغْنِيَاءُ-এর মর্মও তাই।

শব্দ বিশ্লেষণ

اَلْخَوَالِفُ : শব্দটি বহুবচন; একবচনে خَالِفَةٌ অর্থ– পিছনে রয়ে যাওয়া মহিলাগণ।

اَلْمُعَذِّرُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر اسم فاعل বহছ বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِعْتِذَارُ মূলবর্ণ (ع . ذ . ر) জিনস صحيح অর্থ– আপত্তি পেশকারীগণ, যারা বাহানা করে।

اَلْمَرْضٰى : শব্দটি বহুবচন; একবচন مَرِيْضٌ অর্থ– অসুস্থ ব্যক্তি।

تَفِيْضُ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ اثبات فعل مضارع معروف বাবে ضَرَبَ মাসদার اَلْفَيْضُ মূলবর্ণ– (ف . ى . ض) জিনস اجوف يائى অর্থ– তা প্রবাহিত হয়।

دَمْعٌ : শব্দটি একবচন; বহুবচন دُمُوْعٌ অর্থ– অশ্রু।

☼ ☼ ☼

www.almodina.com